নবীনচন্দ্র রচনাবলী

॥ প্রথম খণ্ড ॥

সম্পাদক

ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

সহ-সম্পাদক

শ্রীহরিবন্ধু মুখটি
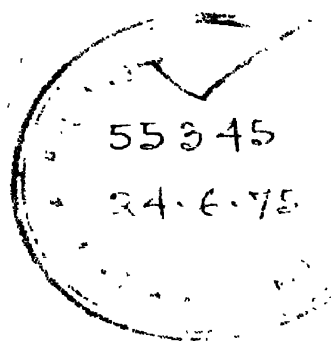
দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স
কলেজ স্ট্রিট মার্কেট
কলিকাতা-১২

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী—আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রসারকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আংশিক অর্থানুকূল্যে এই গ্রন্থের সুলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৮১

নির্ধারিত মূল্য : পঁচিশ টাকা।

নবীনচন্দ্র গ্রন্থ প্রচার সমিতির পক্ষে শ্রীসঞ্জীব দত্তচৌধুরী কর্তৃক সমিতির কার্যালয় ১৩৬ রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, দমদম কলিকাতা-২৮ হইতে প্রকাশিত এবং দি এলায়েড এণ্টারপ্রাইজার্স ২০৯ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা

হেমন্তকুমার বসুর

পুণ্য স্মৃতির

উদ্দেশ্যে

নবীনচন্দ্র গ্রন্থ প্রচার সমিতি

উপদেষ্টা

ডঃ শ্রীমতী রমা চৌধুরী

ডঃ শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়

সভাপতি

ডঃ শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত

সহ-সভাপতি

শ্রীকালীপদ সেন

শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী

সাধারণ সম্পাদক

ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

কর্মসচিব

শ্রীহরিবন্ধু মুখটি

সহ-সম্পাদক ঃ শ্রীরাম রায়

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীসঞ্জীব দত্তচৌধুরী

"আমার জীবন"

শ্রদ্ধাঞ্জলি ঃ নবীনচন্দ্র সেন

জন্ম ঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ ॥ মৃত্যু ঃ ২৩ জানুয়ারি ১৯০৯

ডক্টর রমা চৌধুরী

জীবন ত আছে সকলেরই—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ থেকে মহত্তম মহামানব পর্যন্ত সকলেরই। অবশ্য আমাদের ভারতীয় শাস্ত্রমতে, —সেই দুর্গম-দুর্জয়-দুঃসাহসী শাস্ত্রমতে, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই—প্রতি তৃণগুচ্ছে, প্রতি বারিবিন্দুতে, প্রতি ধূলিকণায়, প্রতি অণুতে পরমাণুতে স্বয়ং ব্রহ্ম বিরাজমান তাঁর পূর্ণতম সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে প্রত্যেক জীবেই, উচ্চাবচ প্রত্যেক জীবেই স্বয়ং শিব বিদ্যমান তাঁর পূর্ণতম মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়। তা সত্ত্বেও, যাঁরা শ্রীভগবানের পরম আলোক কেবল অন্তরেই ধারণ করেন না, উপরন্তু তা' বিকিরণ করেন চতুর্দিকে সাগ্রহে, সানন্দে, সগৌরবে—তাঁদেরই বলা হয়, মহাজন-মহাপুরুষ, যুগাবতার। তাঁদেরই অপূর্ব জীবনকে "আমার জীবন"রূপে সানন্দে সাগ্রহে সবিনয়ে অভিহিত করে', তাঁরা তা' জনসমাজে প্রকাশিত করতে পারেন মানবকল্যাণের জন্য, মানবসাফল্যের জন্য, মানবতৃপ্তির জন্য।

এরূপই একটি পুণ্য-ধন্য-অনন্য জীবন ছিল "আমার জীবন"-প্রণেতা পুণ্যশ্লোক, ধন্যজীবন, অনন্যচরিত্র কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের। কি অপূর্ব লীলাবিচিত্র, ঘাত-প্রতিঘাত-সংকুল ঘটনাবহুল, কর্মময় এই জীবন! কিন্তু তা' সাধারণ সাংসারিক জীবন নয়—যেহেতু, তা সংসারে থেকেও অসাংসারিক, ধরাধামে থেকেও ব্রহ্মলোকবিহারী, পার্থিবস্তরে থেকেও অপার্থিব দিব্য-গুণ-শক্তিসমন্বিত। সেই "মরণসাগর পারে অমর" জীবনের কি অনুপম অভিনব-অপরূপ-অত্যাশ্চর্য প্রকাশ এই গরিষ্ঠ গ্রন্থে! সাধারণতঃ জীবনী-গ্রন্থ হয় শুষ্ক-কঠিন, নীরস-নির্জীব। কারণ, তাতে থাকে গতানুগতিক ভাবে নিত্য-সংঘটিত কতিপয় ঘটনার নিয়মানুযায়ী উল্লেখই মাত্র। সেজন্য, এরূপ জীবনী-গ্রন্থ কেবল নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, অথবা অন্তরঙ্গতম বন্ধুবান্ধবেরই মাত্র ভালো লাগার কথা, চিত্তাকর্ষক লাগার কথা, আনন্দরসঘন লাগার কথা—অন্যদের নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু প্রকৃত-প্রকৃষ্ট-পরিপূর্ণ এই সর্বজনসমাদৃত জীবনী-গ্রন্থ সকলের তমিস্রাচ্ছন্ন জীবনপথে চির প্রদীপস্বরূপ হয়ে থাকবে নিরন্তর—যার সুবর্ণ দীপ্তিতে সকল ভয়, সকল সংশয়, সকল দৌর্বল্য, সকল দুর্ভাগ্য, সকল দীনতা, সকল হীনতা, সকল ক্ষুদ্রতা, সকল ক্ষীণতা, সকল পাপ, সকল তাপ নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যাবে ; উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি, অনন্ত সৌভাগ্য, অনন্ত সাফল্য, অনন্ত মহিমা, অনন্ত গরিমা, অনন্ত সৌন্দর্য, অনন্ত মাধুর্য, অনন্ত ঐশ্বর্য, অনন্ত শৌর্যের হীরকদ্যুতি।

যিনি এইভাবে মরজগতেও অমৃতত্বের মহিমময়ী, মঙ্গলময়ী, মধুরিমময়ী বাণী বহন করে এনেছিলেন ; সঞ্চার করেছিলেন আশার আলোক নিরাশানির্জীব হৃদয়ে ; সিঞ্চিত করেছিলেন সুধানির্ঝর সংসার-গরলভাণ্ডে ; রণিত করেছিলেন আনন্দগীতি তপ্ত-শপ্ত, তিক্ত-রিক্ত, ভীত-সন্ত্রস্ত, দলিত-মথিত জীবনে—সেই দেশজয়ী, কালজয়ী মৃত্যুঞ্জয়ী অমরকবি নবীনচন্দ্রকে শত-সহস্র-কোটী প্রণাম!

পরিশেষে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই নবীনচন্দ্র গ্রন্থ প্রচার সমিতির উদ্যোক্তাদের যাঁরা বহুলোকের আকাঙ্ক্ষিত কবি নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবন'-সহ সমগ্র রচনাবলী বর্তমান চরম দুর্মূল্যের দিনেও নামমাত্র মূল্যে পাঠক সমাজের হাতে তুলে দিচ্ছেন।

প্রকাশকের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যে নবীনচন্দ্র একটি উল্লেখযোগ্য নাম, একথা বাঙালী পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন। আজ শুভ দিনে তাঁর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। তবে বেশ দেরীতেই বেরুল প্রথম খণ্ড। এত যে দেরী হবে,—এটা আশা করিনি। গত ১লা জুন আমরা প্রথম খণ্ড প্রেসে দিই, কথা ছিল 'মহালয়ার দিন বই বেরুবে; কিন্তু বেরুল না। এরপর নভেম্বর মাসের শেষের দিকে বেরুবে বলে প্রেস আশ্বাস দিয়েছিলেন—এবারও পারলেন না। এইভাবে চারবার কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেননি তাঁরা। ফলে যা হ'বার তাই হ'ল। যাঁরা বইটির জন্য বেশী উৎসাহী ছিলেন, তাঁরা বারবার আমাদের গ্রাহক কেন্দ্রে এসে ফিরে যেতে লাগলেন। গ্রাহকদের তাগিদ এবং আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ ঘাটতি ও যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য এই বিলম্ব ঘটে গেল, [এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন লাইনো মেশিন বিদ্যুৎ ছাড়া চালানো যায় না]। এটা বোধ হয় নবীনচন্দ্রেরই ভাগ্য। তিনি নিজেও একথা বলে গেছেন যে, যখনই তাঁর বই ছাপতে দেওয়া হয়েছে তখনই কোন না কোন কারণে তা বেরিয়েছে দেরীতে। তাই কি আমাদেরও ভুগতে হচ্ছে?

আজ সবার হাতে বই তুলে দিতে পেরে খুবই আনন্দ লাগছে। তাহলেও খুব হাল্কা হতে পারছি না। কেননা এর পরে নবীনচন্দ্রের আরও তিনখণ্ড ছাপতে হবে, ছাপাতে হবে "রঙ্গলাল রচনাবলী" ও "ঈশ্বরগুপ্ত রচনাবলী"র তিনখণ্ড। এরমধ্যে রঙ্গলাল, ঈশ্বরগুপ্ত ও নবীনচন্দ্রের—২য় খণ্ড ছাপা চলছে। বইগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের করার চেষ্টা করছি। তবে বিদ্যুৎ যেভাবে আমাদের সবাইকে কষ্ট দিচ্ছে, তাতে সঠিক সময় বা তারিখ ঘোষণা করা অসম্ভব।

ক্লাসিক রচনাবলী প্রকাশের জন্য যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। যে বই ষাট্-সত্তর বছর ধরে পাঠকের ঘরে থাকবে, এবং ভবিষ্যৎ বংশধরেরা এরই সাহায্যে জানতে পারবে আমাদের পূর্ব্বতন সাহিত্য স্রষ্টাদের, তার কাগজ, ছাপা ও বাঁধাই ভালো হওয়া একান্ত প্রয়োজন, আমরা সে চেষ্টারও ত্রুটি রাখিনি। প্রেস বইটি দেরীতে দিলেও সুন্দর ছাপার জন্য তাঁরা প্রশংসার দাবী রাখতে পারেন। ভালো বাঁধাইর জন্য যা যা করণীয় আমরা সেদিকে নজর রেখেছি। দক্ষ প্রুফ রিডার দিয়ে বারবার প্রুফ দেখিয়েছি—যাতে বইটি নির্ভুল হয়, তবুও সম্পূর্ণ নির্ভুল ছেপে ছাপার জগতের 'ট্রাডিসান্'-এ ছেদ টানতে পেরেছি,—এ বড়াই করছি না।

আমাদের এই রচনাবলী ছাপার ব্যাপারে যাঁদের কাছ থেকে বিভিন্নভাবে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে প্রথমেই নাম উল্লেখ করতে হয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের। তিনি এই রচনাবলী ছাপার জন্য আংশিক অনুদান দিয়ে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। দ্বিতীয়তঃ আনন্দবাজার পত্রিকার জেনারেল ম্যানেজার শ্রীঅরূপকুমার সরকার। তিনি প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয়ের "কবিবর নবীনচন্দ্র" নিবন্ধটি ছাপতে অনুমতি দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন। তৃতীয়তঃ সাপ্তাহিক অমৃত পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও তাঁর সহকর্মী শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন—এঁদের সবাইকে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

পরিশেষে সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ডঃ শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও সহসম্পাদক বন্ধুবর শ্রীহরিবন্ধু মুখটিকে, তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। তাঁরা গত এক বৎসরের উপর নিয়মিত ভাবে সমিতির অফিসে এবং গ্রাহক কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে যাবতীয় কাজ কর্ম্মের তদারক করেছেন। তা না হলে এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করা যেত কিনা এবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইতি—

প্রকাশক

নবীন সাহিত্য ও সমালোচনার ধারা

ঊনবিংশ শতাব্দী ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, নব জাগরণের যুগ। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে, কি ধর্মক্ষেত্রে, কি সমাজসংস্কারে, শিক্ষাক্ষেত্রে, সাহিত্যে কাব্যে, শিল্পানুশীলনে, এক কথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিরাট বিরাট মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। দেড় হাজার দুই হাজার বৎসরের মধ্যে ইহার তুলনা মিলা ভার। বৈষ্ণবদের মধ্যে একটা কথা আছে, শ্রীকৃষ্ণের নরলীলার সময়, তাঁহার দিব্যবৃন্দাবন গোলোকধামের তাঁহার লীলা-সহচর দেবতাগণ ভৌমবৃন্দাবনে নরবপু গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কে সুদর্শনচক্র-ধারীর অবতার তাহা আমি বলিতে পারিব না, কিন্তু সন্দেহ হয়, দিব্যধাম হইতে মহামনীষিগণ সর্বদিকে এই হীনবীর্য হতপ্রভ বঙ্গভূমে অবতরণ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্তে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, আসিয়াছিলেন বঙ্গদেশের শেষ বিরাট পুরুষ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিংশ শতাব্দীর শেষপাদ আসন্ন, কিন্তু তাঁহাদের উত্তরসাধক দেখা যায় না। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে আবির্ভূত হন মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন প্রকৃতির রম্যোদ্যান 'শৈলকিরীটিনী, সরিন্মেখলা, সাগরকুন্তলা' চট্টলামাতার অঙ্কে।

আধুনিক সাহিত্য বিচারকেরা নবীনচন্দ্র সেনকে মহাকবি বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। তাহাতে হয়তো তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের প্রচার হইতে পারে, নিজেদের আত্মগরিমার বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু নবীনচন্দ্র সেন তাঁহার সমসাময়িক বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর হৃদয়ে কবি হিসাবে যে উচ্চ গৌরবের আসন লাভ করিয়াছিলেন, সেই আসনের পদচ্ছেদ হইবে না। আর সেই যুগের সাহিত্যমহারথী বঙ্কিমচন্দ্র, মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, কবিবর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়কুমার সরকার, 'সাহিত্য'-সম্পাদক তীক্ষ্ণবেধী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি সাহিত্যবিশারদগণ কবি হিসাবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। আজকালকার সাহিত্যরথীগণের অনেকের জানা নাও থাকিতে পারে, সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কলমের খোঁচায় কবিগুরু কি রকম মনোবেদনা ভোগ করিতেন। এহেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতির প্রিয়তম কবি ছিলেন নবীনচন্দ্র সেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মত মনীষাসম্পন্ন দার্শনিক সাহিত্যিক বাঙলা সাহিত্যে বিরল। তিনি ছিলেন কবি নবীনচন্দ্রের একান্ত ভক্ত। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে দেখিয়াছি, কোন পুরস্কার বিতরণী সভায় কবি নবীনচন্দ্রের কবিতার আবৃত্তি না থাকিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, নিজেই আবৃত্তি করিয়া যাইতেন। বঙ্কিমবাবুর মত সাহিত্য-সমালোচক বাঙলা সাহিত্যে দুর্লভ। তিনি আলোচ্য কবির 'অবকাশ-রঞ্জিনী' পাঠ করিয়া 'বঙ্গদর্শনে' কবির অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছিলেন। আর বর্তমান যুগের সাহিত্য বামনেরা ত্রিবিক্রমের অভিনয় করিয়া থাকেন। আসলে যে উচ্চ তাহাকে খাটো করা নিজেকে বড় প্রমাণ করিবার একটি সুপরিচিত প্রাচীন অপকৌশল মাত্র। আধুনিক হাটু-ভাঙ্গা-দ-মূর্তি অর্থবিহীন ছন্দোবিহীন অন্বয়বিহীন, রসশূন্য কাব্য-ওয়ালারা কেহ কেহ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও তৃতীয় শ্রেণীর কবি বলিয়া থাকে। ইহাতেও ইহাদিগকে কেহ কবি আখ্যা দেয় না। অবশ্য যাঁহারা নবীনচন্দ্রকে মহাকবি কিংবা সার্থক সাহিত্যিক বলিতে নারাজ, তাঁহারা কবিধ্বজাবাহীদের সগোত্র নহেন। তাঁহারা সত্যই সাহিত্যরসপিপাসু, সাহিত্য-সমালোচনায় সুখ্যাতিরও অধিকারী। তবে ইঁহারা সাহিত্যদর্পণ প্রভৃতি কাব্যদর্শনে মসগুল! তাঁহাদের খেয়াল থাকে না, ভাষা আগে, ব্যাকরণ অনেক পরে। সাহিত্যদর্পণে নিজের মুখ দেখিতে দেখিতে কোন সত্যকার সাহিত্যিক লেখনী চালায় না। আসলে প্রকৃত সাহিত্যিক হৃদয়ের প্রেরণাবশেই লিখিয়া থাকেন, না লিখিয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাকে লিখিতে হয়। ইহা তাঁহার সহজাত ঐশ্বর্য। কবি, এক কথায়, ক্রান্তদর্শী যেমন, তেমনি ক্রান্তকৃতি অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্রে তাঁহাদের সব সময় বাঁধা যায় না। অলঙ্কারশাস্ত্রের বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন অনুসারে নবীনচন্দ্রের ত্রয়ীকে মহাকাব্য

বলা হয়ত শক্ত, কিন্তু আসলে উহা মহাকাব্য, এবং নবীনচন্দ্র সেন মহাকবি। কেন বলিতেছি। তার আগে একটি কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। নবীনচন্দ্রের মত মহাভাগ্যবান কবি বঙ্গসাহিত্যে বিরল। তাঁহার কোন গরলকণ্ঠ সমালোচক ছিল না—চতুর্দিক হইতে তাঁহার অভিনন্দন।

এই লেখকের জন্ম ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের গোড়ায়। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলনই বস্তুতঃ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়। এই আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবাতে বঙ্গদেশ উত্তাল। আন্দোলনের সেইরকম তীব্রতা মাদকতা অসহযোগ আন্দোলনেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাত সারা ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতবর্ষে, ছড়াইয়া পড়ে। যে সমস্ত নেতারা সেই আন্দোলনের সঙ্গে তাল রাখিতে পারেন নাই, তাঁহারা তরঙ্গশীর্ষ হইতে নামিয়া পড়েন। এই পরিস্থিতির উদ্ভব মম, লেখকের অল্প বয়সে। তার আগে দেশের সামাজিক, শৈক্ষিক, ধার্মিক, নৈতিক পরিস্থিতি ছিল হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র, সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থার বিপর্যয়। রামমোহন রায় তাঁহার সর্বতোমুখী সংস্কার বেদান্ত এবং ধর্মশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন, যদিও হিন্দুরা তাঁহার এই ব্যাখ্যা মানে নাই। সে সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার সমাজসংস্কার ধর্মশাস্ত্রের অনুমোদিত এইটি প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্য নব্য শিক্ষিতগণ হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর শাস্ত্র, এমন কি হিন্দুর সম্প্রীতি সমস্তই অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের আধুনিক আলোক-প্রাপ্তি উদ্ঘোষণ করিয়া বাহাদুরী করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, প্রায় সকলেই প্রকাশ্যে গোমাংস ভক্ষণ করে, সুরাপান করিয়া মাতলামি করে, এমন কি মাতা-পিতাকেও বিদায় করিয়া সংসারের লক্ষ্মণ রেখা মাড়াইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান, তেমন পণ্ডিতও কোমতের Positivism পড়িয়া সংশয়ের ভাগ করেন। রাজনারায়ণ বসুর মত মনীষী পুরুষও যৌবনকালে এই মহামারীর অভিঘাত হইতে মুক্ত ছিলেন না। একমাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ই স্থির ছিলেন।

কিন্তু হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ হিমালয়ের মত অচল। ঝঞ্ঝাবাতে সেই হিমাদ্রি অচলের এখানে ওখানে সামান্য ধস নামিতে পারে, তাহাতে হিমাচলের স্থিরতা নষ্ট হয় না। হিন্দু সমাজের উপর দিয়ে প্লাবন গিয়াছে, ইসলামের জেহাদী আঘাত আসিয়াছে। অথচ ঠিক এই সময়েই সংস্কৃত সাহিত্যের বহু টীকা-টিপ্পনী, পুরাণাদি-ধর্মশাস্ত্রের আবির্ভাব। এই মুসলমান যুগে মহাপ্রভুর আবির্ভাব যেমন তার চেয়েও অধিকতর প্রভাবশালী রঘুনন্দনের কর্তৃত্ব। এখনও বাঙলা দেশে সমস্ত হিন্দু সমাজ রঘুনন্দনের স্মৃতির নির্দেশে চলে। শ্বেতদ্বীপের তরংগাভিঘাতের যুগেও হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ, ঠিক সেইরকম ভাবে, শনৈঃ শনৈঃ তাহার প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এক দিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, অন্যদিকে পরমহংসদেব, বিবেকানন্দ, শশধর তর্ক-চূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন প্রভৃতি বিরাট পুরুষগণ শ্বেতদ্বীপের উদ্বেল তরঙ্গ বুক পাতিয়া প্রতিহত করেন। বংগসাহিত্যে যদি কাহাকেও যুগান্তরকারী সাহিত্যিক বলিতে হয়, তবে তিনি অসাধারণ প্রতিভাধর মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু তিনি নিজে অতলান্তিক মহাসাগরের উত্তুংগ তরঙ্গাভিঘাতে ভাসিয়া গিয়াছিলেন, অতলান্তিকের তলদেশ ডুবিয়া গিয়াছিলেন। সাহিত্যে তিনি যুগান্তর সৃষ্টি করিয়া যান বটে, কিন্তু বাঙলা সাহিত্য তাঁহার লোকোত্তর সাহিত্যিক প্রতিভার পূর্ণ-পূর্ণতর অর্ঘ্যলাভের পূর্বেই এই প্রতিভার জাহাজ ডুবিয়া যায়। তিনি মহাকবি বটে, কিন্তু জাতীয় সাহিত্য রচনা করিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহার উদ্দামতা ইহার প্রতিবন্ধক। বরং সমস্ত হিন্দু জাতি খ্রীষ্টান হইলে তিনি গৌরব বোধ করিতেন। গদ্য সাহিত্যে এই মহৎ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, এবং কাব্যে নবীনচন্দ্র সেন। আর কোন কবি

অতদূর করেন নাই। বৃত্রসংহারের কবি হেমচন্দ্র, পদ্মিনী উপাখ্যানের কবি রঙ্গলাল, সারদা মঙ্গলের কবি বিহারীলাল--তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে মহনীয় হইলেও জাতির সম্মুখে কোন মহান আদর্শ, কোন পথের নির্দেশ উপস্থাপিত করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে, ধর্মতত্ত্বে সেই কাজ ঋষিজনোচিত ধ্যানদৃষ্টি এবং মহাবীরোচিত দক্ষতায় সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি মহাকবি তো বটেই, যিনি ক্রান্তদর্শী হইয়া জাতির সারথ্য গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন সেই মহাকবি নবীনচন্দ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ধর্ম-সংস্কারক শ্রীকৃষ্ণ, সমাজসংস্কারক শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করেন। হইতে পারে, এই চিত্র আরও প্রোজ্জ্বল, আরও পরিস্ফুট হইলে ভাল হইত। কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ, মথুরার শ্রীকৃষ্ণ হইতে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ পৃথক্। স্বয়ং ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণের এই দ্বৈতচরিত্রের সংমিশ্রণ সামঞ্জস্য করিতে যান নাই। কবি নবীনচন্দ্র তাহাই করিতে যাওয়াতে শ্রীকৃষ্ণের সাহিত্যিক ছবি নিষ্প্রভ হইয়াছে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঋষিদৃষ্টি ছিল তিনি সাহিত্যে এই রকম মোহের অধীন হন নাই। তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া গীতার শ্রীকৃষ্ণকে মহামানবরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র স্বভাবে অতি প্রেমপ্রবণ ভক্তিপ্রবণ ছিলেন। তিনি দেখিলেন বঙ্কিমের শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবগণের মনঃপূত হয় নাই। তিনি মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ একই প্রতিকৃতিতে মূর্ত করিতে গিয়া স্বীয় স্বভাববশে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের দিকে একটু ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। ইহাতে তাঁর কাব্য-কৃতির ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও তিনি যেইরকম ভাবে জাতির ধর্ম সংস্কৃতিকে রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন, আর কোন কবি করেন নাই। এই আদর্শে প্রণোদিত হইয়াই তাঁহার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ প্রভৃতি কাব্য রচনা। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আর্য এবং অনার্যের সম্মিলন বাঞ্ছনীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর আক্রোশ, তাঁর পারিবারিক ঘটনারই প্রতিফলন। ব্রাহ্মণসমাজের প্রতিনিধি দুর্বাসা নহেন। পুরাণে ইতিহাসে তাহা বলাও হয় নাই। দুর্বাসার ঐ চরিত্র তাঁর কাল্পনিক। তাঁর বক্তব্য, ব্রাহ্মণেরা বাধা দিলেও, আর্য অনার্যের মিলন জাতীয় সংহতির পক্ষে অপরিহার্য। এই হিসাবে আধুনিক হরিজন উদ্ধার অস্পৃশ্যতা-বর্জন প্রভৃতি জাতীয় ঐক্যের উপায় বলিয়া কবি হিসাবে একমাত্র তিনিই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুভদ্রা তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। নারী কেবল সন্তানের জননী নহেন, তিনি শত্রুমিত্র নির্বিশেষে মানব মাত্রেই সেবিকা মাতা। নারী অবলা নহে দরকার হইলে রণরঙ্গিণী। মোট কথা নবীনচন্দ্র তাঁহার জন্মভূমিতে এক স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন।

> 'প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্যে, ব্যাপিয়া ভারত
> এক মহারাজ্যছত্র। ছায়ায় তাহার
> খণ্ড উপরাজ্য গ্রাম লভিছে বিশ্রাম
> শান্তির কোমল অঙ্কে; হতেছে চালিত
> শান্তির সুখদ পথে উপগ্রহ মত।
> নাহি হিংসা, নাহি দ্বেষ।'

এই হিসাবে তিনি মহাত্মা গান্ধীর পূর্বসূরি। এই জন্যও তিনি মহাকবি। কবি শব্দের এক অর্থ ক্রান্তদর্শী। কাব্যে এই রকম ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার সামগ্রিক ছবি আর কেহ অঙ্কিত করেন নাই। জানি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই ভারতের মহামানবের 'তীর্থ' স্বপ্ন দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহা গীতি-কবিতার মাধ্যমে, মহাকাব্য মহাভারত রচনায় নহে।

কেবল এই জন্যই তিনি আমার কাছে মহাকবি নন। এই লেখক স্বাধীনতা আন্দোলনের

যুগে পরিবর্ধিত। তখন নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ যুবকমাত্রেরই হৃদয়ে অগ্নিময় উদ্দীপনা সঞ্চার করিত। মোহনলালের অনলবর্ষী গর্জন আমাদের প্রেরণা যোগাইত—

'দাঁড়ারে! দাঁড়ারে ফিরে! দাঁড়ারে যবন।
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ!
যদি ভঙ্গ দেও রণ।'
গর্জিল মোহনলাল—'নিকট শমন।'
আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির
কারো না থাকিবে শির
সবান্ধবে যাবে সবে শমন-ভবন।'

এই উত্তেজনাময় বাণী আমাদের যুগের যুবকদের মুখে মুখে। মুখে মুখে মীরজাফরের প্রতি ভর্ৎসনা।

'মূর্খ তুমি। মাটি কাটি লভি কোহিনূর
ফেলিয়া সে রত্ন হায়
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?...
কি ছার জীবন যদি নাহি থাকে মান।
রাখিব রাখিব মান,
যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
সাধিব সাধিব সবে প্রভুর কল্যাণ'
'চল তবে ভ্রাতাগণ, চল পুনর্বার:
দেখিব ইংরাজদল
শ্বেত-অঙ্গে কত বল
আর্যসুতে জিনে রণে হেন সাধ্য কার?
বীরপ্রসূতির পুত্র আমরা সকল;
না ছাড়িব একজন,
কভু না ছাড়িব রণ
শ্বেত-অঙ্গে রক্তস্রোত না হলে অচল!
দেখাব ভারতবীর্য দেখাব কেমন,
বলে যদি হিমাচল
করে তারা রসাতল,
না পারিবে টলাইতে একটি চরণ।'

আর কত উদ্ধৃত করিব? নবীন কবি বাঙলার প্রতি নবীনের মনে, প্রত্যেকের হৃদয়ে। মোহনলাল বাঙালীর বুকে গর্জন করিতেছে। সে গর্জনে আর কোন কবির মধুর নিনাদ শোনা যায় নাই—না রঙ্গলালের, না হেমচন্দ্রের, না রবীন্দ্রনাথের। তখন নবীনের হৃদয়জয়ী নবীনচন্দ্র। সমস্ত দেশকে যে জাগায়, সে যদি মহাকবি না হয়, তবে কে?

এইখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, মুসলমান সেনাপতি মুসলমান নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, তাহার মুণ্ডচ্ছেদের স্বপ্নে বিভোর আর তাঁহার অধীনস্থ হিন্দু সেনাপতি, সেই নবাবের শত সহস্র অমার্জনীয় অপরাধ অত্যাচার জানিয়াও, সেই মুসলমান নবাবের জন্য বুক ফাটাইয়া গর্জন-ক্রন্দন করিতেছে। কবি নবীনচন্দ্র ব্যতীত আর কোন কবি এই

হিন্দুমুসলমান ভ্রাতৃত্বের কল্পনা করিয়াছিল? ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও না। কে মহাকবি? কে মহাস্রষ্টা?

এখনও মনে পড়ে, আমাদের যৌবনকালে, যে কোন বিষয়ে আলোচনা উঠিলেই, অমনি প্রশ্ন হয়, 'রাণীর কি মত?' রাণীর মত তখন অনেক স্মৃতিধর নবীনচন্দ্র-ভক্তের মুখে মুখে রাজদ্রোহী জগৎশেঠের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রাণী বলিলেন—

'বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা সুবিস্তার
রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন ;
হও অগ্রসর, নহে, করি পরিহার।
জঘন্য দাসত্ব-পথে কর বিচরণ।
প্রগল্‌ভতা মহারাজ! ক্ষম অবলার,
ভয়ে ভীত যদি, আমি দেখাব—আবার।'

বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয় গায়ত্রী 'কেন মা অবলা এত বলে?' স্মরণ করাইয়া দেয়। এইখানেও নবীনচন্দ্রের নবীনতা একটি 'অবলা নারী' তখনকার দিনের নেতৃস্থানীয় পুরুষদিগকে বিশ্বাসঘাতকতার পথ পরিহারের উপদেশ দিতেছেন. প্রয়োজন হলে তিনি সম্মুখসমরে তাঁহাদের নেতৃত্ব দিবেন বলিতেছেন।

মন্ত্রীর কথাও তরুণদের মুখে মুখে—

'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র!
অনেক চিন্তার পর করিলাম স্থির,
আমা হতে এই কর্ম হবে না সাধন।
আজন্ম যাহার অন্নে বর্ধিত শরীর,
কৃতঘ্নতা-অসি, ধর্মে দিয়া বিসর্জন,
কেমনে ধরিব, আহা! বিপক্ষে তাহার।'

আবার ষড়যন্ত্রকারীর নেতা জগৎশেঠের উত্তেজক ভর্ৎসনা যুবকদের আবেগ মাতাল করিয়া তুলিত! তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অতএব জানিত—

"সাধে কি বাঙ্গালী মোরা চির পরাধীন?
সাধে কি বিদেশী আসি দলি-পদভরে
কেড়ে লয় সিংহাসন! করে প্রতিদিন
অপমান শত শত চক্ষের উপরে?
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জন!
কার্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ।"

বাঙালী চরিত্রের এই মূল্যায়ন কবি প্রায় শতবর্ষ আগে করিয়া গিয়াছেন! আমাদের চরিত্রের এই কলঙ্ক আমরা এখনও সম্পূর্ণ মোচন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে কবিদৃষ্টি। এইরকম উদ্ধৃতি দিতে গেলে সমগ্র পলাশীর যুদ্ধই ছাপাইতে হয়; তবুও এই অশীতিপর বয়সেও যাহা বার বার মনে পড়ে, তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না—

'ধন্য আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন।'

এখনও বৃটিশের কামান গর্জন কানে বাজিতেছে—

'বৃটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।'

এখনও শুনিতেছি, সভাপতি হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সানন্দ আবৃত্তি—

'কোথা যাও, ফিরে চাও, সহস্র কিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি।
তুমি অস্তাচলে, দেব, করিলে গমন,
আসিবে যবন ভাগ্যে বিষাদরজনী।'

কবির মুসলমানদের প্রতি কোন বিদ্বেষ ছিল না; আবার তাঁহার ভারতীয় নারীর উপর ছিল অসীম শ্রদ্ধা এবং আস্থা। জাতীয় উন্নতিতে তাঁহাদের মহনীয় ভূমিকা ছিল, তিনি বিশ্বাস করিতেন। এই জন্যই তিনি অর্জুনমোহিষী সুভদ্রাকে ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতন 'শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণা'-রূপে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীকে হীন চক্রান্তের ঊর্ধ্বে স্থাপন করিয়া তাঁহাকে রাজগণেরও নেত্রীরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

আমি এই নিবন্ধে পলাশীর যুদ্ধেরই প্রাধান্য দিলাম। কিন্তু আমি ভুলি নাই, ধর্মরাজ্য মহাভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা নবীনচন্দ্র পলাশীর যুদ্ধের কবি অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। যিনি সর্বরকমে অবসাদগ্রস্ত জাতির সম্মুখে মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া জাতীয় অভ্যুদয়ের পন্থা নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সত্যকারের মহাকবি ; বাংলার জাতীয় কবি, এই বিষয়ে এ লেখকের কোন সন্দেহ নাই। সাহিত্যের সমালোচকের বাঁধা সূত্র (formula) অনুসারে কবিকে নিগড়িত করিতে না পারিলে তিনি সাহিত্যিক-আখ্যা পাইতে পারেন না, কবি-সংজ্ঞার যোগ্য হইতে পারেন না—এই সব দেখিয়া একজন প্রসিদ্ধ লেখকের কঠোর মন্তব্য মনে পড়িয়া গেল—

'These arithmetical critics are the pests of literature.

এই সমস্ত গাণিতিক সমালোচকগণ সাহিত্যের দংশককীট। এই লেখক অবশ্য ততদূর যাইতে চাহে না। তবে যাঁহার কাব্যস্রোত হৃষীকেশের গঙ্গার মত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া জাতিকে পুণ্যপীযূষধারায় পবিত্র সঞ্জীবিত করিয়াছে, গাণিতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহাকে যোগ্য মর্যাদা দান না করা জাতীয় মহাপাপ।

শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত
সভাপতি
নবীনচন্দ্র গ্রন্থ প্রচার সমিতি

সম্পাদকের নিবেদন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পরাধীনতার বেদনা ভারতবর্ষের শিক্ষিত মানুষের মনকে দেশের মাটিকে বেশী করে আঁকড়ে ধরার প্রেরণা দেয়। তাই দেশের সংস্কৃতি এবং ধর্মবোধ সম্বন্ধে একটা গোঁড়ামীও দেখা দেয় চিন্তাবিদ্‌দের মনে। বাংলা দেশেও কবিচিত্তে জাগে উগ্র দেশাত্মবোধ এবং হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্ববোধ। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতিকেই শ্রেষ্ঠধর্ম বলেছেন। তার কিছু পূর্বে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদেশী ঠাকুরের থেকে স্বদেশী কুকুরকে দিয়েছেন অধিক মর্যাদা। খুব একটা বড় আদর্শের কথাও অনেকে ভাবতে চাননি। উপনিষদ্‌কার বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন সেই প্রাচীন যুগে—কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের শিক্ষিতরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবর্তিত হয়েছেন ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করে।

উপন্যাস এবং প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্যে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ভারতীয় চিন্তার আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণকে অনেকে জাতীয় বীর বলে মনে করতে না চাইলেও পরাধীনতার যুগে এ ধরনের বীর-চরিত্র সৃষ্টিকে কেউ অস্বীকার করতেও পারেননি।

নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচয়িতা বলে পরিচিত হলেও গীতিকাব্য এবং গাথাকাব্যও রচনা করেছেন। গীতিকাব্যে কবির জীবনকথা অনেকটাই প্রকাশিত হয়েছে।. ছন্দে, মিলে, স্তবক রচনায় নানা বৈচিত্র্যও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

পলাশীর যুদ্ধ এবং রঙ্গমতী নবীনচন্দ্র রচিত গাথাকাব্য। পরাধীনতার জ্বালা পলাশীর যুদ্ধে অনুভূত না হলেও বেদনার উচ্ছ্বাস এতে আছে। রঙ্গমতীতে আছে এক রাষ্ট্রীয় সংঘাত। এই কাব্যদুটোর উদ্ভব কবির স্বাদেশিকতা থেকে।

কবি আদর্শসৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন বলেই খৃষ্ট, অমিতাভ এবং অমৃতাভ রচনা করেন। স্বদেশী চিন্তার সঙ্গে সে যুগে ধর্মচিন্তার মিশ্রণ ঘটেছিল। বর্তমান কালের সঙ্গে এখানে সে কালের একটা বড় পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত কবি নবীনচন্দ্র দেশের মাটির দিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন বলেই তাঁর কাব্যে দেশের পুরাণের প্রতি শ্রদ্ধা, স্বাদেশিকতা এবং ভারতীয়বোধ বিশেষ-ভাবে প্রকাশিত। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র এবং প্রভাস-এ নবীনচন্দ্র এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক মহামানব ঃ আর্য-অনার্যের সম্মেলনের দ্বারা ভারতবর্ষকে অখণ্ড ঐক্যে বিধৃত করে জাতীয় সংহতি স্থাপনের প্রচেষ্টা এক নূতন পথের সন্ধান দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণও মহামানব। কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁকে জাতীয় সংহতি স্থাপনের ক্ষেত্রে পুরোধা করে তুলেছেন। এমন করে ভারতীয় চেতনা সমকালীন যুগে আর কারও মধ্যে জেগেছিল কিনা সে বিষয়ে আজও জিজ্ঞাসা আছে।

আজকের দিনে জাতীয় সংহতির কথা খুব বেশী করে শোনা যাচ্ছে কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক নেতারা পথ খুঁজে পাচ্ছেন না। নবীনচন্দ্র সেই উত্তরকালের নেতাদের যেন বলতে চেয়েছেন যে, নিছক তত্ত্বরূপে চিন্তা করে ঐক্য স্থাপন করা যাবে না—একান্ত আবেগে স্বপ্ন দেখা চাই। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্ন দেখেছেন, ঘটিয়েছেন হৃদয়ের জাগরণ। বর্তমান ভারতের সমস্ত রাজ্যের নেতাদের সেই হৃদয়ের জাগরণ চাই ঃ ঐক্যের স্বপ্ন দেখা চাই। হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে নিছক নিয়ম অনুযায়ী সভা-সমিতি করা বৃথা হবে। তাই আজকের দিনে নবীনচন্দ্রকে বিশেষ করে স্মরণ করা প্রয়োজন।

নবীনচন্দ্রের মন সঠিকভাবে বোঝার জন্যে এবং আমাদের মন সঠিক পথে চালনা করার জন্যে নবীনচন্দ্রের সমস্ত সাহিত্য পড়তেই হবে। এই উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে যে ক'জন যুবক নবীনচন্দ্রের সমগ্র রচনাবলী ছাপার দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের সাধুবাদ না জানিয়ে পারি না। এই মহৎকাজের অংশীদার আমার মত প্রৌঢ়কেও করেছেন বলে আমি আনন্দিত।

এই দ্রুতগতিতে দাম বাড়ার যুগে, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে এবং বিদ্যুৎ ছাঁটাইয়ের আঘাতে ছাপার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কঠিন। তাই সময়মত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বের করা যায়নি। সময়মত বের করতে না পারায় ব্যয়ও বৃদ্ধি হলো। সর্বদিক দিয়েই প্রকাশক বিপদগ্রস্ত—আশা করি সহৃদয় গ্রন্থ পাঠকগণ,—বিশেষ করে গ্রাহকগণ আমাদের ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখবেন এবং আমাদের প্রতি তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন করবেন।

ইতি—

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

দীনেশচন্দ্র সেন

সপরিবারে নবীনচন্দ্র সেন

ভূমিকা

প্রতীচ্য দর্শনের যুগ প্রবর্ত্তক মনস্বী বেকন বলেন, মলিন দর্পণে যেমন কোন প্রতিবিম্ব পতিত হয় না, তেমনই নানা সংস্কারের পাংশুজালে মলিন হৃদয়-দর্পণেও সত্য প্রতিভাত হয় না। সুতরাং বিজ্ঞান বা দর্শনের ক্ষেত্রে যাঁহারা সত্যান্বেষী তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই সংস্কারের বন্ধন হইতে যথাসম্ভব মুক্তিলাভ করিতে হইবে। কিন্তু শুধু বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের পক্ষে নহে, যথার্থ সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষেও চিত্তের সংস্কারমুক্তি ও অপক্ষপাত দৃষ্টির প্রয়োজন আছে। আবার তাঁহাকে শুধু মনস্বী হইলেই চলিবে না, তাঁহাকে সহৃদয় অর্থাৎ কাব্যরসিকও হইতে হইবে। কেননা, একমাত্র সহৃদয় ব্যক্তিই কবির সমানধর্ম্মা হইতে পারেন, অর্থাৎ কবিচিত্তের মধ্যে নিজেকে প্রক্ষেপ করিয়া দেশ-কালের বন্ধনকে অতিক্রম করিতে পারেন। সমালোচকের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে কোন যুগ-প্রবর্ত্তক কবির কাব্য-বিচারে তিনি যুগের আশা-আকাঙ্ক্ষা-উৎকণ্ঠাকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারেন। বৌদ্ধ দর্শনের পরিভাষা গ্রহণ করিয়া আমরা বলিতে পারি, এরূপ সমালোচকের দৃষ্টি হইতেছে সম্যক্‌দৃষ্টি, আর তিনি যখন অতিকথন, অল্পকথন প্রভৃতি দোষ পরিহার করেন, তখন তাঁহার বাক্‌ হয় সম্যক্‌বাক্‌।

একথা সর্ব্বদা সত্য নয় যে কালের ব্যবধানে সাহিত্য-সমালোচকের দৃষ্টি স্বচ্ছতর বা অধিকতর পক্ষপাতশূন্য হয়। একথা অবশ্য সত্য যে মধুসূদনের জীবিত কালে, এমনকি, তাঁহার লোকান্তর-গমনের পরেও বহু বর্ষ পর্যন্ত কোন সমালোচকই তাঁহার কবি-কৃতির প্রতি সুবিচার করিতে পারেন নাই. তাঁহারা শুধু বহিরঙ্গ সমালোচনাই করিয়াছেন, প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন কবি মধুসূদনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় প্রবল ব্যক্তিত্বের পরিচয় যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্যে উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট, তাঁহারা তাহা উপলব্ধি করেন নাই। এমনকি, মধুসূদনের প্রসিদ্ধ চরিতকার শ্রদ্ধেয় যোগীন্দ্রনাথ বসু কবি-জীবনের বহু মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করিলেও কাব্য-বিচারে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ঊনিশ শতকের দুইজন শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র জীবিতকালে যে বিপুল কবিযশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মূলে কিছুটা পরিমাণে পাঠকসমাজের উচ্ছ্বাস বা ভাবাতিরেক ছিল, সন্দেহ নাই। ভক্তের অতি-প্রশস্তি যে কতটা মাত্রাহীন হইতে পারে, স্বর্গীয় মন্মথনাথ ঘোষের লিখিত 'কবি হেমচন্দ্র' তাহার নিদর্শন। অবশ্য হেমচন্দ্রের গুণকীর্ত্তনে সমসাময়িক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন মিতবাক। কিন্তু এ কথা সত্য যে, একালের অনেক সমালোচক হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও অন্ধ বা যথাসম্ভব স্বল্পভাষী এবং তাঁহাদের কাব্যের দোষ-ত্রুটির উদ্‌ঘাটনেই অতিমাত্রায় উৎসাহী। এ কালের সমালোচনায় পুচ্ছগ্রাহিতা ও পল্লবগ্রাহিতা দুর্লভ নয়। মনস্বী হাড্‌সন্‌ যাহাকে সৃষ্টিধর্মী সমালোচনা বলিয়াছেন, বাংলা সাহিত্যে সেইরূপ রচনার সংখ্যা আবেগ-ধর্ম্মী সমালোচনার তুলনায় অল্প।

কবি নবীনচন্দ্র যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে সময়ে বাংলার কাব্যসাহিত্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) যুগ ও ধর্ম্মান্দোলনের ক্ষেত্রে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫) যুগ চলিয়াছে এবং স্বধর্ম্মভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতি কিয়ৎপরিমাণে আত্মস্থ হইয়াছে। এদিকে মনস্বী ও জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমার দত্ত 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সম্পাদনা ভার গ্রহণ করিয়া পত্রিকাখানিকে প্রধানত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চ্চার বাহন করিয়া তুলিয়াছেন, 'বাংলা ভাষার

প্রথম যথার্থ শিল্পী' বিদ্যাসাগরও এই সময় হইতেই সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ঊনিশ শতকের শেষার্দ্ধে বাংলা সাহিত্যের নানা বিভাগ অভাবনীয় শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, শীর্ণকায়া বৃহৎ স্রোতস্বতী যেন সহসা বর্ষাগমে বিপুলকায়া ও বিচিত্র-পথ-গামিনী হইয়াছে। একদিকে নিজেদের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত ও অপর দিকে প্রতীচ্য শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে পরিচিতি বাঙ্গালী-মানসে এক নব-চেতনা জাগাইয়া তুলিয়াছিল, বাঙ্গালীকে স্বদেশ-প্রেম ও স্বাজাত্যাভিমান, জাতীয়তা ও মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিল, ফলে বাঙ্গালী মনীষা ডারুইন, কোঁত্, বেন্থাম, জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল, স্পেন্সার, ম্যাথু আর্নল্ড্, ফিক্তে, সীলি, বাক্‌ল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহাদের মহাকাব্য, পুরাণ ও তন্ত্রাদির সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পাইয়াছিল। হেমচন্দ্রের 'দশ মহাবিদ্যার' কল্পনা ক্রমবিকাশবাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণও অভিব্যক্তিবাদের আলোকে দশাবতারের নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

নবীনচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে ঊনিশ শতকের শেষার্দ্ধে বাঙ্গালী-মানসের প্রবণতাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ঊনিশ শতকের ধর্ম্মান্দোলনের, বিশেষত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে হিন্দু ধর্ম্মের নবজাগরণের বিচিত্র ধারা সম্পর্কেও পরিচিত হইতে হইবে, কেননা, নবীনচন্দ্রের বহুমুখী কাব্য-সাধনার ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা স্মরণে না রাখিলে কবির কাব্য-বিচারেও আমরা বিভ্রান্ত হইব।

নবীনচন্দ্রের কাব্য-সাধনা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত, আবার তাঁহার গদ্য-রচনাও পরিমাণে অল্প নহে। পাঁচ খণ্ডে রচিত বহু তথ্য-সমৃদ্ধ 'আমার জীবন', 'প্রবাসের পত্র' নামক আবেগময়ী ভাষায় রচিত ভ্রমণ-কাহিনী এবং এককালে পাঠক-সমাজে সমাদৃত 'ভানুমতী' নামক উপন্যাসের পুনর্বিচার বা re-valuation-এর প্রয়োজন আছে। গদ্যলেখক নবীনচন্দ্রের শব্দচয়ন ও বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গি (style and diction) সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণও বিশেষ আলোচনা করেন নাই। অথচ স্বর্গত ঐতিহাসিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলিতেন, নবীনচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় তাঁহার গদ্য রচনায় যতখানি কাব্য-রচনায় ততখানি নহে। সম্প্রতি ডাক্তার সুবোধরঞ্জন রায় নবীনচন্দ্রের গদ্য রচনা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করিয়াছেন।

নবীনা প্রতিভা

যদি নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি প্রতিভার লক্ষণ হয়, তবে নবীনচন্দ্র নিঃসন্দেহে প্রতিভাশালী ছিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রঙ্গমতী', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' নামক কাব্যত্রয়ী প্রভৃতি রচনায় তিনি কোন পূর্ব্বগামী কবির পথ-চিহ্ন অনুসরণ করেন নাই। তাঁহার কবি-কল্পনায় যতখানি বিরাটত্ব ও মৌলিকত্ব ছিল, তদনুরূপ সিদ্ধি হয়তো তিনি লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু যথার্থ সমালোচককে ধীরভাবে ইহারও কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। 'পলাশীর যুদ্ধের' দ্বিতীয় সর্গে নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—

> 'দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি।
> নতুবা যে পথে কোন কবি বিচরণ
> করেনি, সে পথে কেন হবে মম গতি।'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য জীবনের আদি, মধ্য ও অন্ত্য লীলা অবলম্বনে কাব্যত্রয়ী-রচনার পরিকল্পনাই যে শুধু কবি-প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক তাহা নহে, মহাভারতের যে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক তাৎপর্য্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাও অভিনব। স্বদেশপ্রেম-মূলক রোমাণ্টিক আখ্যান-কাব্য রচনার পথ-প্রদর্শকও নবীনচন্দ্র। আবার ঊনিশ শতকের শেষ পাদ যদি ধর্ম্ম-সমন্বয়ের যুগ হয়, তবে নবীনচন্দ্রই সেই সমন্বয়ের কবি।

'অবকাশ-রঞ্জিনীর' ভূমিকায় স্বীয় জন্মভূমি সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন—

'বিদ্বেষবিহীন নয়নে যিনি এই স্থানটি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, বোধ হয় তিনি ইহার সৌধশির গিরিমালা, অনিবার-প্রবাহিত নির্ঝরিণী, অস্তাচল-বিলম্বী রবিকরে ইহার অনন্ত নীল ফেনিল সমুদ্রশোভা, সর্ব্বশেষে ইহার বাড়বানল কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।' বাস্তবিক, চট্টলের শান্ত-গম্ভীর গিরিমালা ও উত্তাল তরঙ্গ-মুখর সাগর যথার্থ কবি-ধাত্রীর ন্যায় কবি-প্রকৃতিকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাই তাঁহার অন্তরে যেমন বাড়বানলের দাহ ছিল, তেমনই অবাতবিক্ষুব্ধ সাগরের প্রশান্তিও ছিল। তিনি প্রচণ্ড প্রাণশক্তির অধিকারী ছিলেন, তাই তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল দুর্দ্দম চাঞ্চল্য, তাঁহার লেখনীও ছিল দ্রুতগামিনী। সকলের নিকট তিনি ছিলেন অভিগম্য অথচ অতিমাত্রায় আত্ম-সচেতন। আশাবাদী, বন্ধু-বৎসল ও শত্রুর প্রতি কতকটা নির্ম্মম। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে তিনি ছিলেন সহৃদয়, শ্রদ্ধাবান।

অবকাশরঞ্জিনী

ইংরেজি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কবির চব্বিশ বৎসর বয়সে 'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ইহার সাত বৎসর পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধের' রচয়িতারূপে বিপুল যশের অধিকারী হইয়াছেন।

'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশিত হইলে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যখানির প্রশংসা করিয়াছিলেন। মনে রাখিতে হইবে, বাংলার কাব্যক্ষেত্রে তখনও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—'বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। (গীতিকাব্য, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮০) কিন্তু এ কালের অনেক সমালোচক এই কবিতা-গুচ্ছের প্রতি অহেতুক বিরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। একজন সমালোচক বলিয়াছেন,—অবকাশরঞ্জিনী এ কালে প্রায় অপাঠ্য। 'প্রায়' এই ক্রিয়া-বিশেষণ পদটির প্রয়োগ করিয়া তিনি হয়তো কবির প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ সমালোচক বলিবেন, 'অবকাশরঞ্জিনীর' বহু কবিতায় যেমন অপটু হস্তের নিদর্শন আছে, তেমনই আবার বহু কবিতায় শক্তিমত্তার পরিচয়ও রহিয়াছে। কবি অনেক সময়েই অত্যন্ত দ্রুত কবিতা রচনা করিতেন, তরুণ কবির প্রকৃতি-সুলভ চাঞ্চল্যই এ জন্য দায়ী। 'অবকাশরঞ্জিনীর' কবিতাসমূহের মধ্যে 'পিতৃহীন যুবক', 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী', 'সায়ংচিন্তা', 'জন্মিয়া-জীবন', 'অশোকবনে সীতা', 'কেন দেখিলাম', 'কেন ভালবাসি', 'কি করি', 'শব-সাধন', 'যাই', 'ক্লিওপেট্রা', 'কীর্ত্তিনাশা', 'মেঘনা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কবিতা। 'ক্লিওপেট্রা' স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং উহার সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন আছে।

নবীনচন্দ্র আশাবাদী কবি ছিলেন, 'পিতৃহীন যুবক' কবিতায় কবি তাঁহার কৈশোর-জীবনের দুঃখদুর্দশার চিত্র অঙ্কিত করিলেও কবিতাটির শেষ দুই স্তবকে বলিষ্ঠ আশাবাদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে—

'নাহি কি ধৈর্য্যের অস্ত্র হৃদয়-ভাণ্ডারে?
যুঝিব একাকী আমি, ত্যজিব না রণ।
দেখিব নিষ্ঠুর ভাগ্য কি করিতে পারে,
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে, করিলাম পণ,
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পাতন।

'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী' কবিতায় প্রেমের তপস্যার অনবদ্য চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

কবিতাটিতে প্রত্যাখ্যাতা নারীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস আমরা শুনিতে পাই ও তাহার জীবনের শোচনীয় পরিণতি আমাদিগকে ব্যথাতুর করিয়া তোলে।

স্বীয় জন্মভূমি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন চট্টলের প্রতি কবির অনুরক্তি প্রকাশ পাইয়াছে 'চট্টগ্রামের সৌভাগ্য' কবিতায়, ইহাতে নারী জাতির প্রতি গভীর সহানুভূতিরও পরিচয় আছে। 'সায়ংচিন্তা' কবিতায় কবির ধ্যানে জাগিয়াছে অতীতের মহিমা-মণ্ডিত ভারতবর্ষের কথা— 'বল মা ভারতভূমি বল মা আমায়,

কোথায় তোমার সেই বীর পুত্রগণ?
যাহাদের কীর্ত্তিবলে, তব নাম ধরাতলে,
পূজ্যতম ছিল যেন অমরভবন,
সে সকল পুত্র তব বল না কোথায়?'

'মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক' কবিতায়ও স্বদেশপ্রেম ও পরাধীনতার বেদনা অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

'অবকাশরঞ্জিনীর' কবিতা সমূহে স্বদেশ-প্রেম, দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, লাঞ্ছিতা নারীর প্রতি সহানুভূতি, ভগবৎ-প্রেম, অনাচার ও ব্যভিচারের প্রতি বিদ্বেষ এবং নৈরাশ্যের মধ্যে বলিষ্ঠ আশাবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রেম-বিষয়ক অজস্র কবিতা কবি রচনা করিয়াছেন এবং এই জাতীয় কবিতার অনেক স্থলে একটা ব্যর্থতা ও বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে। শেলি প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের প্রেমের কবিতার ন্যায় নবীনচন্দ্রের প্রেমের কবিতায় সাধারণতঃ, কোন মিষ্টিসিজম বা রহস্যঘনতা নাই, ('কি লিখিব' কবিতাটি ইহার ব্যতিক্রম) কবি গোবিন্দদাসের মত তিনিও বলিতে পারিতেন—

'বুঝি না আধ্যাত্মিকতা,
দেহ ছাড়া প্রেমকথা,
কোথায় স্থাপিয়ে মূল,
ফোটে প্রেমপদ্মফুল,
আকাশ-কুসুম সে যে কল্পনা-কলহ।''

বিদেহ রাজ্যের প্রেম অর্থাৎ দেহাতীত প্রেমের প্রতি কবির কোন আকর্ষণ ছিল না। তবে ভিলন, বার্ণস বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের ন্যায় নবীনচন্দ্র ভোগাসক্তি বা ইন্দ্রিয়পরতার কবি ছিলেন না। 'কি লিখিব' কবিতাটিতে যে ভাবরতি বা Platonic Love-এর অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায় তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। (নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি, পৃঃ ৫৩—৫৪)

হেমচন্দ্রের বহু প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতার ন্যায় (লজ্জাবতী লতা, অশোক তরু, পদ্মের মৃণাল প্রভৃতি) নবীনচন্দ্রেরও কোন কোন প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় প্রকৃতি উপলক্ষ্যমাত্র, ব্যক্তি ও জাতির জীবন যে নিয়তির অদৃশ্য হস্তের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, ইহাই কবির প্রতিপাদ্য। 'কীর্ত্তিনাশা' ও 'মেঘনা' এই শ্রেণীর কবিতা। 'মেঘনা' কবিতায় বিশ্ব-বিধাতার বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইতেছে—

'সৃজন পালন যদি নিয়ম তোমার,
তবে বল নাথ!
আশার কুসুম যার, ছাড়িয়া জীবন-হার,
একে একে একে নাথ পড়েছে খসিয়া,—
রাখ কেন শূন্য সূত্র নাহি বিনাশিয়া?'

'একদিন' কবিতায় কবি বঙ্গনারীর যে প্রশস্তি গান করিয়াছেন, তাহার সহিত হেমচন্দ্রের একটি কবিতার ভাব-গত সাদৃশ্য আছে। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'বঙ্গ-কুল-নারী ফুল্ল সলজ্জ কমলে,
যদি এই সুধা-সার না থাকিত অনিবার
নিবাইতে রোগ শোক দারিদ্র্য-অনলে,
বাঙ্গালীর সুখ কোথা থাকিত ভূতলে?'

'শব-সাধন' কবিতায় কবি নব্য তান্ত্রিক ধর্ম্মের উদ্গাতা, পরাধীন ভারতে শক্তি-সাধনার এক নূতন তাৎপর্য্য কবির ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছে, দীর্ঘ পরাধীনতার বেদনা গৈরিক নিঃস্রাবের মত কবির অন্তর হইতে উৎসারিত হইয়াছে। নবযুগের বীরাচারী তান্ত্রিক সাধককে কবি ভারতভূমি রূপ মহাশ্মশানে বিংশতি কোটি শবের উপর বসিয়া সাধনা করিতে বলিতেছেন। কবি বলিতেছেন—

'বসিয়া এ মহাশ্মশানে
বিংশতি কোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা-মহাসুরা-পানে
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন ;
শ্মশান-অনল গর্জ্জিছে গম্ভীরে
হাহাকার শব্দে স্বনিছে পবন।
ভারত-সন্তান! দেখ না মাতার
লোলজিহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধর,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারংবার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি'
ভারত-শ্মশানে শক্তি-আরাধন?'

'অশোকবনে সীতা' কবিতায় কবি কল্পনা-নেত্রে দেখিয়াছেন—

'অন্ধকার কারাগারে বসি একাকিনী
একটি রমনীমূর্ত্তি করিছে রোদন।

জিজ্ঞাসিনু—বল মাতা-! কে তুমি দুঃখিনি?
এমন বিষাদমূর্ত্তি কিসের কারণ?
বলিলা রমনী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে—
দুঃখিনী ভারত-লক্ষ্মী আমি বাছাধন!
আমিই অশোকবনে সীতা বিষাদিনী।'

বিষাদিনী জনক-নন্দিনীর মধ্যে দুঃখিনী ভারত-জননীকে দর্শন—এ এক অপূর্ব্ব উপলব্ধি।

'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে বঙ্গনারীর প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া নবীনচন্দ্র একটি কবিতা রচনা করেন। শক্তিস্বরূপিণী নারীর বন্দনা করিয়া কবি বলেন—

'হিমাদ্রির উচ্চতম শৃঙ্গেতে বসিয়া,
কুরুক্ষেত্র, থানেশ্বর ঝলি প্রতিভায়
ঘোষ বজ্র মেঘমন্দ্রে
ভারতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে,
'একমেবাদ্বিতীয়ং'—আসিন্ধু অচল,
সিন্ধু হতে ব্রহ্মদেশ,
ধর্ম্ম, বর্ণ নির্ব্বিশেষ,
সকলি একই জাতি—একই শৃঙ্খল,
একই প্রবাহে ভেসে যেতেছে সকল।'

কাব্যত্রয়ীর মধ্যে যে অখণ্ড ভারতের পরিকল্পনা আছে, এখানে তাহার পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়।

'অবকাশরঞ্জিনীর' কবিতাবলী সম্পর্কে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন—

'This lyric craze was more a play of the fancy than of the imagination, more artificial than artistic.'

নবীনচন্দ্রের 'কাব্যত্রয়ীর' সম্পাদক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার তথ্য-সমৃদ্ধ ভূমিকায় 'অবকাশরঞ্জিনীর' আলোচনা-প্রসঙ্গে মধুসূদনের দুইটি গীতি-কবিতার (আত্ম-বিলাপ ও বঙ্গভূমির প্রতি) উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'কবিতা হিসাবে এই দুইটি গীতিকবিতা নবীনচন্দ্রের তিয়াত্তরটি [??] খণ্ড কবিতার যে কোনটি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।' কিন্তু সাহিত্য-বিচারে এই ভাবে তুলনার দ্বারা কোন কবিতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচার করা হয়তো চলে না, কেননা, এখানে মধুসূদনের যে দুইটি কবিতার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে কবির আত্ম-সমীক্ষা বা আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে, সুতরাং মধুসূদনের এই দুইটি কবিতা তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তারই পরিচয় বহন করে। নবীনচন্দ্রের একান্ত ব্যক্তিগত কথা যে কখনও বিশ্বজনীন হইতে পারে নাই, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই বিশ্বজনীনতার বিচার করিতে হইলে সহৃদয় পাঠকের কল্পনার উপরে নির্ভর করিতে হইবে। বিহারীলালের 'সর্ব্বদাই হুহু করে মন, বিশ্ব যেন মরুর মতন' প্রভৃতি পংক্তিগুলি যে সার্থক গীতি-কবিতার নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করা হয়, সেখানেও তো সহৃদয় জনের অনুভূতিই প্রমাণ।

'অবকাশরঞ্জিনী'র অন্তর্গত 'ভারত-উচ্ছ্বাস' (১৮৭৫) ও 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারতে আগমন উপলক্ষ্যে রচিত কবিতা 'ভারত-উচ্ছ্বাসে' রাজভক্তি, ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা-বোধ ও তদানীন্তন দুর্দ্দশায় বেদনা বোধের পরিচয় আছে। এই উপলক্ষ্যে হেমচন্দ্র যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সহিত 'ভারত-উচ্ছ্বাস' কবিতাটির ভাব-গত সাদৃশ্য আছে। ইংরেজ শাসন-সম্পর্কে সে কালের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-মিশ্রিত মহিমা-বোধের সঞ্চার হইয়াছিল, কবিতাটিতে তাহারই অভিব্যক্তি ঘটিয়াছে।

বিদেশীয় বিষয়-বস্তু অবলম্বনে বাংলা ভাষায় যে অল্প কয়খানি কাব্য রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনা কাব্য' ও নবীনচন্দ্রের 'ক্লিওপেট্রা' উল্লেখযোগ্য। সম্ভবত, একমাত্র আনন্দচন্দ্র মিত্রই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক অনুসরণ করিয়াছিলেন, তথাপি, নানা কারণে, তাঁহার কাব্যখানি চিরজীবী হইতে পারে নাই। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা যে নবীনচন্দ্রের রচনায় লক্ষণীয়, তিনি যে হেমচন্দ্রের ন্যায় শুধু অন্ত্যানুপ্রাস-বৰ্জ্জিত পয়ার ছন্দই ব্যবহার করেন নাই, 'ক্লিওপেট্রা' কাব্যে তাহার নিদর্শন আছে।

সম্ভবত, সেক্‌স্‌পীয়রের 'এণ্টনি ক্লিওপেট্রা' নাটক হইতেই কবি 'ক্লিওপেট্রা' কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। মিশরের অধীশ্বরী সৌন্দর্য্যের রাণী ক্লিওপেট্রার প্রচণ্ড হৃদয়াবেগের চিত্র কবি গভীর সহানুভূতির সহিত অংকিত করিয়াছেন। সখীর প্রতি মিশরের অধীশ্বরীর উক্তির মধ্য দিয়া কাহিনীটি পরিবেশিত হইয়াছে। লেখক তাই কাহিনীটির মধ্যে নাটকীয় গতির সঞ্চার করিতে পারেন নাই। সেক্‌স্‌পীয়রের নাটকে এনোবার্ব্বাস (Enobarbus) এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রথম সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করিয়াছেন। ক্লিওপেট্রার-সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন—

'Age cannot wither her, nor custom stole
Her infinite variety : other women clay
The appetites they feed, but she makes hungry,
Where most she satisfies.'

এরূপ একটি আবেগ-প্রবণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র যে নবীনচন্দ্রকে সহজেই আকর্ষণ করিবে, ইহা স্বাভাবিক।

ক্লিওপেট্রায় নবীনচন্দ্রের ভাষা আবেগময়ী, নির্ঝরিণীর ন্যায় স্বতঃউৎসারিতা। আমরা ক্লিওপেট্রা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। প্রিয়মিলনের বর্ণনা করিয়া ক্লিওপেট্রা সখীকে বলিতেছেন—

'দূরে গেল অভিমান, রমণীর প্রেম-
স্রোতে অভিমান, সখি! বালির বন্ধন।
বলিলাম, 'সত্য নাথ! এই হৃদয়ের
তুমি অধীশ্বর, কিন্তু বলিব কেমনে
এই ক্ষুদ্র রাজ্য তব? অনন্ত জলধি-
জলে যেই শশধর করে ক্রীড়া নাথ!
ক্ষুদ্র সরসীর নীরে মিটিবে কেমনে
ক্রীড়াসাধ, প্রাণেশ্বর! সেই শশাঙ্কের?
প্রণয়-বারিদ তুমি। তুমি যদি তবে
রাখ সসলিলা এই সরসী তোমার,
যোগাবে অনন্ত বারি এই প্রেমাধিনী'।

কুতুবদিয়ার শিবিরে বসিয়া নবীনচন্দ্র ক্লিওপেট্রা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদর্শনে এই কাব্যের প্রথমাংশ পড়িয়া মনস্বী কালীপ্রসন্ন ঘোষের মতের পরিবর্ত্তন ঘটে। তাঁহার চোখে ক্লিওপেট্রা ছিল পাপীয়সী। এ প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' লিখিয়াছেন—'শ্রীভগবানের একটি মধুর নাম পতিত-পাবন। তুমি আমি কে যে, পাপীকে ঘৃণা করিব! মানুষ মাত্রই অপূর্ণ। পাপী নহি কে'?

পলাশীর যুদ্ধ

'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই (১৮৭৫) কবি বিপুল যশের অধিকারী হন এবং বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নব্য ভারত, হিন্দু পেট্রিয়ট, দি বেঙ্গল ম্যাগাজিন প্রভৃতি পত্রিকা কাব্যখানির প্রশংসায় মুখর হইয়া ওঠে। এ কালের কোন কোন সমালোচক কাব্যখানির প্রতি যতই বিরূপতা প্রদর্শন করুন, সেকালে বঙ্কিমচন্দ্র এই কাব্যখানি পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন—'বায়রণের ন্যায় নবীন বাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী', কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখিয়াছিলেন—'ইহা নিশ্চয়ই বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠহারে একটি কমনীয় আভরণ স্বরূপ গ্রথিত হইবে', গঙ্গাচরণ সরকার লিখিয়াছিলেন,—'তাঁহার কাব্যে কেবল মর্ত্ত্যলোকবাসী সামান্য নরলোকের কীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে, অথচ গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় অসীম প্রতিভাপ্রভাবে এই নীরস আধারে এতই রস ঢালিয়া দিয়াছেন যে 'পলাশীর যুদ্ধ' একখানি অতি রমণীয় কাব্য হইয়াছে'। (নবীনচন্দ্র-রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।) অবশ্য, সেকালের অনেক সমালোচকই যে নবীনচন্দ্রের দোষ-ত্রুটি-সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, একথা সত্য নহে। যাহা হউক, 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা করিয়া নবীনচন্দ্র একথা প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, 'পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বম্'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে নবীনচন্দ্রই প্রথম জ্বালাময়ী ভাষায় ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনে পরাধীনতার বেদনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্রের কণ্ঠেই বাঙ্গালী প্রথম সমর-সংগীত শুনিতে পাইয়াছিল। (রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' 'ক্ষত্রিয়গণের প্রতি ভীমসিংহের উৎসাহ-বাক্য' একটি অনুবাদ-কবিতা' মাত্র, উহা সমর-সংগীত নহে।)

অবশ্য, 'পলাশীর যুদ্ধের জনপ্রিয়তার কারণ শুধু ইহার কাব্যগুণ নহে, ইহার প্রধান কারণ, একটা সমগ্র যুগের আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা কাব্যখানিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাই কাব্যখানির বহু পংক্তি সে যুগের পাঠকের কণ্ঠস্থ ছিল, যেমন প্রথম সর্গে মন্ত্রণাভবনে জগৎ শেঠের উক্তি—

"স্বর্গ মর্ত্ত্য করে যদি স্থান-বিনিময়,
তথাপি বাঙ্গালী নাহি হবে একমত ;
প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়!
কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ'।

'পলাশীর যুদ্ধ' সম্পর্কে কোন প্রসিদ্ধ সমালোচকের অভিযোগ এই—(১) পলাশীর যুদ্ধ অপরিপক্ক হাতের রচনা। (২) যুদ্ধকাণ্ড দুর্ব্বল ভাষায় বর্ণিত (৩) সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র-দৃশ্য অনেকটা ডিবেটিং সোসাইটির বক্তৃতার মত হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই—শব্দ প্রয়োগে কবি কোথাও কোথাও অসতর্ক হইলেও 'পলাশীর যুদ্ধ' মোটের উপর নিপুণ হস্তের রচনা। এই কাব্যের 'যুদ্ধকাণ্ড'ও সার্থক রচনা, বিশেষত মোহনলালের শোকউচ্ছ্বসিত হৃদয়ের অভিব্যক্তি অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। এক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের বিরুদ্ধে একমাত্র অতি-কথন দোষের অভিযোগ আনয়ন করা যায়। তৃতীয়ত মন্ত্রণা সভার পরিবেশে জগৎ শেঠ, রাজা রাজবল্লভ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতির উক্তির মধ্য দিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিন্নতাই প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং 'ডিবেটিং' ক্লাবের বক্তৃতার সহিত ইহার তুলনা হয় না। কাব্যখানির আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ উক্তি সেকালের পাঠকদের স্মৃতিতে গ্রথিত ছিল, যেমন—

'একটি কণ্টক কভু ফুটেনি যে পায়,
সে কেন না হাসিবেক দেখি শেলাঘাত?'
'যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন,
পরের কেবলমাত্র লৌকিক রোদন।'
'শীতলিতে নিদাঘের আতপ-জ্বালায়,
অনল-শিখায় পশে কোন্ মূঢ়জন?'

আশাকে সম্বোধন করিয়া কবির উক্তি—

'নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।'

ক্লাইভের প্রতি ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর উক্তির একস্থানে বাইবেলের উক্তির প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

'তাঁর রবি শশী তারা নক্ষত্রমণ্ডলে
সমভাবে দেয় দীপ্তি ধনী ও নির্দ্ধনে ;
সমভাবে, সর্ব্বদেশে, শ্বেতে ও শ্যামলে,
বরষে তাঁহার মেঘ, বাঁচায় পবনে।'

বিভীষিকা-মূর্ত্তি দর্শনে সিরাজের স্বগতোক্তি—

'পাপ পুণ্য কার্য্যকালে সমান সরল,
অনুশোচনাই মাত্র পরিচয়-স্থল।'

অথবা— 'রাজাদের ইচ্ছামত মরিতে, বাঁচিতে,
হয়েছে প্রজার সৃষ্টি এই পৃথিবীতে।'

অথবা— 'এক রাজা যাবে, পুনঃ অন্য রাজা হবে,
বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।'

অথবা অস্তমিত-প্রায় প্রভাকরের পানে চাহিয়া মোহনলালের উক্তি—

'অদৃষ্টচক্রের কিবা বিচক্ষণ গতি!
দেখিতে দেখিতে কত হয় আবর্ত্তন;
কাহার উন্নতি হবে, কার অবনতি,
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে আহা বলে কোন্ জন।'

অথবা—

'পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক।'

অথবা—

'জগতে উদয় অস্ত প্রকৃতি-নিয়ম,
কিংবা জলধর-ছায়া থাকে কতক্ষণ।'

অথবা—

'মূর্খের কল্পনাস্রোত হলে উচ্ছ্বসিত,
যত অসম্ভব তাহে হয় সম্ভাসিত।'

অথবা—

'যে চাহে পশুত্ব-বলে রমণী-প্রণয়,
অনলে সে চাহে জল, পাষাণে হৃদয়।'

কোথাও কোথাও বায়রণের ন্যায় নবীনচন্দ্রও উপদেষ্টা বা শিক্ষকের আসন গ্রহণ করিয়াছেন, যেমন—

'কি আশ্চর্য্য বিধির বিধান!
যাহার যেমত দান, তথা প্রতিদান।'

আবার—

'কর্ম্মক্ষেত্রে যেই বীজ করেছ রোপণ,
ফলিবে তেমন তরু, অনুরূপ ফল।'

'পলাশীর যুদ্ধ' মহাকাব্য নহে, অবশ্য কোন কোন সমালোচক ইহাকে ঐতিহাসিক গাথা-কাব্য বলিয়াছেন। অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায় বলেন—'এই কাব্যের উদ্দেশ্য যে মধুসূদনের ন্যায় শিল্পবস্তু-গঠন নয়, রঙ্গলাল হেমচন্দ্রের ন্যায় কাহিনী কথনও নয়; বরং বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ের উদ্‌ঘাটনমাত্র তাহা বুঝিতে না পারিলে কাব্য-আস্বাদন সম্ভব হইবে না।' তিনি কাব্যখানির কয়েকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যথা চিত্রধর্ম্মিত্ব, সঙ্গীতধর্ম্মিত্ব, স্থানে স্থানে বর্ণনার চমৎকারিত্ব ও অলঙ্কার প্রয়োগে নৈপুণ্য প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। যুগস্রষ্টা মধুসূদনের কাব্যের কথা নাই বলিলাম, রঙ্গলাল ও হেমচন্দ্রের রচনার ন্যায় নবীনচন্দ্রের রচনায়ও পাশ্চাত্ত্য কবিগণের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষত, সেক্‌স্‌পীয়র, স্কট্ ও বায়রণই নবীন-চন্দ্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। কবির মানসপ্রবণতা গীতি কবিতা-রচনার অনুকূল ছিল বলিয়াই তিনি 'পলাশীর যুদ্ধে' একাধিক গান সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু এই গীতগুলি এই জাতীয় কাব্যের রসাস্বাদনে বাধা দিয়াছে।

তথ্যবিকৃতির অভিযোগ

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধের' বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক তথ্যবিকৃতির অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি এ বিষয়ে কবির নিকট জিজ্ঞাসু হইলে কবি তাঁহাকে নিবেদন করিয়াছিলেন—'পলাশীর যুদ্ধ কাব্য, ইতিহাস নয়।' মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন—"নবীনবাবুর 'পলাশীর যুদ্ধ' যে ইতিহাস নয়, তাহা সকলে জানে না। তাঁহার ন্যায় স্বদেশভক্ত কৃতবিদ্য সাহিত্য-সেবক যে সর্ব্বথা স্বকপোলকল্পিত অযথা কলঙ্কে সিরাজদ্দৌলার আপাদমস্তক কলঙ্কিত করিয়া কাব্যরসের অবতারণা করিবেন, তাহা সহসা ধারণা করিতে সাহস না পাইয়া অনেকেই তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যকে ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন।' মৈত্রেয় মহাশয়ের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া জনৈক অধ্যাপক লিখিয়াছেন—'ইতিহাসের দিক হইতে কবি সিরাজচরিত্রের প্রতি

সম্পূর্ণ অবিচার করিয়াছেন।' যদিও নবীনচন্দ্রকে ইংরেজ ঐতিহাসিকের উপরেই সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি যে সিরাজচরিত্রের উপর সম্পূর্ণ অবিচার করিয়াছেন, একালের ঐতিহাসিক গবেষণায় তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বরঞ্চ এক বিষয়ে মৈত্রেয় মহাশয়ই কবির প্রতি অবিচার করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের মতে সিরাজের প্রতি সহানুভূতির অভাব নবীনচন্দ্রের কাব্যের একটি প্রধান ত্রুটি। কিন্তু এ কথা একেবারেই সত্য নহে। সিরাজের সম্পর্কে নবীনচন্দ্রের মন দ্বিধাগ্রস্ত থাকিলেও তিনিই যে 'গরীব সিরাজদ্দৌলার জন্য এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়াছিলেন', তাঁহার এ উক্তি সম্পূর্ণ সত্য। সিরাজের পতনে কবির এই মর্ম্ম-বেদনা প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকেরই মর্ম্ম স্পর্শ করে। যাহা হউক, আচার্য্য যদুনাথ নবীনচন্দ্রের অঙ্কিত সিরাজ-চরিত্রের সম্পর্কে বলিয়াছেন—

'Ignoble as the life of Siraj-ud-daulah had been and tragic his end, among the public of his country ; his memory had been redeemed by a poet's genius. ..The Bengali poet Nabinchandra Sen in his master-piece "The Battle of Plassey' has washed away the follies and crimes of Siraj by artificially drawing forth the readers' tears for fallen greatness and blighted youth." (অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)

আমাদের দেশের কোন কোন ঐতিহাসিক (সত্যচরণ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি) গোপন ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া লর্ড ক্লাইভের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু ক্লাইভের চরিত্রে যে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ও দুর্দ্দম সাহস দেখা যায়, তাহা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে কবি যেভাবে গভীর চিন্তামগ্ন ক্লাইভের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। তাঁহার তীব্র, অন্তর্ভেদী, স্থির, অপলক, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি, তাঁহার গম্ভীর মুখশ্রী ও বীরত্বের রঙ্গভূমিস্বরূপ প্রশস্ত ললাট, তাঁহার প্রশস্ত বক্ষ যাহার মধ্যে দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুঃসাহসের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সকলই কবি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার আত্মচিন্তার মধ্য দিয়া বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় এবং গভীর স্বদেশ প্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও ক্লাইভের আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—

'Here, to India, came an Englishman who was only a clerk, and for want of funds and other reasons he twice tried to blow his brains out ; and when he failed, he believed in himself, he believed that he was born to do great things ; and that man became Lord Clive, the founder of the empire.'

ক্লাইভের আত্মচিন্তার মধ্য দিয়া নবীনচন্দ্র তাঁহার যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। এই চিত্রে ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মীর আকস্মিক আবির্ভাব এবং ক্লাইভের প্রতি উৎসাহ-বাক্য বাস্তবিক পক্ষে ক্লাইভের আশা-আকাঙ্ক্ষারই মূর্ত্ত প্রকাশ (objectification)।

রঙ্গমতী

'১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিয়োগান্ত রোমান্টিক আখ্যানকাব্য প্রকাশিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। কাব্যখানিতে যে 'কবিজীবনের একটি বিষাদপূর্ণ অঙ্কের ইতিহাস' প্রতিফলিত হইয়াছে, তাহা কবির আত্মকথা হইতে জানা যায়। বীরেন্দ্রের উদগ্র স্বদেশ-প্রেম, বীরেন্দ্র ও কুসুমিকার বাল্যপ্রণয় ও এই প্রেমের শোচনীয় পরিণতি, মর্কট বা মরকত রায়ের ষড়যন্ত্র ও বীরেন্দ্রের জননীর বিড়ম্বিত জীবন কাব্যখানির বিষয়বস্তু।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে পূর্ণসিদ্ধি লাভ না করিলেও কবি এবিষয়ে হেমচন্দ্রের অপেক্ষা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে কবি পরিবেশ-সৃষ্টিতে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, যেমন—

'নীরব সকল
যেন তাপসীর যোগ-চিন্তার লহরী
সশঙ্কিত ভাঙ্গে পাছে ; যোগনিদ্রা হতে
জাগে পাছে যোগেশ্বর, অনন্ত শয়নে
চামুণ্ডাচরণতলে। নৈশ সমীরণ
কেবল স্বনিছে, কভু কানন-ভিতরে
চুম্বি সুধাকর-সুধা, পল্লবে পল্লবে।
কেবল কখন বনে শুনা যায় দূরে
শুষ্ক পত্রে, নিশাচর পদ-সঞ্চালন।
কেবল কখন দূরে শার্দ্দুল-গর্জ্জন,
শৃগালের খেখাধ্বনি, পেচক-চীৎকার,
ভগ্ননিদ্র বিহঙ্গের পক্ষ-সঞ্চালন,
ভাসিছে নির্জ্জনে, ভাসে যথা চক্রচয়,
স্থির সরোবর-বক্ষে শিলা-প্রক্ষেপণে।'

উদ্ধৃত অংশটির চিত্রাঙ্কন-নৈপুণ্য আমাদিগকে বঙ্কিমচন্দ্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

নবীনচন্দ্রের অন্তত পাঁচখানি কাব্যের নামকরণ হইয়াছে যুদ্ধক্ষেত্র, পর্ব্বত, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতির নামঅনুযায়ী, যেমন—পলাশীর যুদ্ধ, রঙ্গমতী (রাঙ্গামাটি), রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস। কবির স্বদেশপ্রেম যেন একটি সহজাত প্রবৃত্তি বা instinct, বীরেন্দ্রের উক্তির মধ্য দিয়া এই স্বদেশ-প্রেম উৎসারিত হইয়াছে—

'হায় মাতঃ আর্য্যভূমি! বিদরে হৃদয়,
হারায়েছ তুমি আর্য্য-স্বাধীনতা ধন :
আর্য্যের বিক্রম ; আর্য্য-গৌরব-জীবন ;
হস্তিনা অযোধ্যা তব হয়েছে শ্মশান।'

বাস্তবিক, 'রঙ্গমতী' কাব্যের নায়ক বীরেন্দ্রের জীবনের ব্রতই ছিল—স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের রক্ষণ।

কাব্যখানির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কবির জন্মভূমি চট্টলের আঞ্চলিক পরিবেশ ও নানা তীর্থস্থানাদি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। এই local colouring মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতায় নাই, যদিও মধুসূদনের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীতে কবির জন্মভূমি-সম্পর্কে দুই একটি বিক্ষিপ্ত কবিতা পাওয়া যায়।

কাব্যের দুই একটি স্থানে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত চণ্ডীর প্রভাব সুস্পষ্ট। পরবর্ত্তী কালে নবীনচন্দ্র পদ্যে শ্রীশ্রী চণ্ডীর আক্ষরিক অনুবাদও করিয়াছেন।

প্রাচীন ভারতের ঋষি যে ঋতম্-এর কথা বলিয়াছেন, উহার অর্থ moral order of the universe. নবীনচন্দ্র এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। বীরেন্দ্রের মুখে আমরা শুনিতে পাই—

'ন্যায়বান্।
তব সূক্ষ্ম নীতি, নাথ! দেবজ্ঞানাতীত,
কি বুঝিবে ক্ষুদ্র নর? পতঙ্গ কেমনে
বুঝিবে অনন্ত সৃষ্টি-রচনা-কৌশল?
কি দেখিবে জড় নেত্র, জ্ঞানের আলোক
না পায় প্রবেশ যথা? এইরূপে তুমি

অন্তরীক্ষে থাকি পাপ-পুণ্য-ফলাফল
করহ বিধান এই বিশ্ব-চরাচরে।
অন্ধ নর! দেখিয়াও দেখিতে না পায়
ভীষণ অপক্ষপাতী অসি নিয়ন্তার,
ঝাঁপ দেয় বহ্নিমুখে পতঙ্গের মত।

বিজ্ঞানে যেমন conservation of energy-র কথা বলা হয়, তেমনই ভারতবাসী conservation of moral values-এ বিশ্বাসী। তাঁহার মতে 'নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি'। এই কর্ম্মফলবাদে নবীনচন্দ্রেরও দৃঢ় প্রত্যয় ছিল।

'রঙ্গমতীর' ষষ্ঠ সর্গে কাব্যত্রয়ীর ছায়াপাত হইয়াছে। যেমন বীরেন্দ্রের প্রতি শঙ্করের উক্তিতে—

'অন্তর-বিগ্রহে, বৎস! ডুবেছে ভারত।
ইতিহাসে প্রতি ছত্রে এই বহ্নি-শিখা
জ্বলিতেছে ধক্ ধক্। এই বহ্নিশিখা
দেবচক্ষে নারায়ণ দেখিলা প্রথমে।'

সেকালের পাঠকের চিত্তে কবির দুই একটি উক্তি গ্রথিত হইয়া গিয়াছিল, যেমন—

(১) ভারত বীরত্ব বিনা হবে না উদ্ধার।
(২) দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম।
(৩) আপনার কর্ম্ম-হ্রদে আপনি মানব
ডুবে, ভাসে এ সংসারে, দেবের কি দোষ?
(৪) মূর্খের ভরসা বীর্য্য, বুদ্ধি পণ্ডিতের।

'রঙ্গমতী' কাব্যে কয়েকটি দোষ সুস্পষ্ট, যেমন তরল রসিকতার প্রয়াস, একাধিক ছন্দের প্রবর্ত্তন ও কয়েকটি গীতের সন্নিবেশ। রঙ্গমতী সম্পর্কে শশাঙ্কমোহন যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। 'এই কাব্য কবির আত্মপ্রতিভার প্রতিকৃতি। জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবি প্রত্যক্ষভাবে সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে আপন বীণাপাণিকে স্থাপন পূর্ব্বক যদৃচ্ছ সঙ্গীতে নিজের হৃদয়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ...আপনার আনন্দ-দম্ভে প্রবাহিনী আমাদের কর্ণফুলীর মতই কবিহৃদয় সমস্ত ছন্দোবন্ধ এবং শাস্ত্রবিধান, উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রবাহিত হইয়াছে।'

'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস'

[প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৮৭, ১৮৯৩ ও ১৮৯৬ খ্রীঃ]

বাংলা দেশের যে দুইজন বরেণ্য সন্তান ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই শতকে হিন্দু-ধর্ম্মের যুগোপযোগী নূতন আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং প্রতীচীর বিচিত্র ভাবধারাকে আত্মসাৎ করিয়া উহার আলোকে ভারতের ইতিহাসকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উভয়েরই দৃষ্টি মহাভারতের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—'যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে', ('যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ'।) মহাভারত যেন একটি বিশাল সমুদ্র, যেখানে নানা নদীর জল-ধারা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। অর্ককান্ত বা আতস কাচে সূর্য্যরশ্মি সংহত হইলে বহ্নি প্রকাশিত হয়, মহাভারতকে এই অর্ককান্তের সঙ্গেও তুলনা করা হইয়াছে। বাংলার দুই মনস্বী সন্তান বঙ্কিম ও নবীন ভারতের আদর্শ, সাধনা ও সংকল্পের সন্ধান করিয়াছিলেন মহাভারতে ও পুরাণে, যদিও তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল।

নবীনচন্দ্রের 'কাব্যত্রয়ী'-সম্পর্কে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' কথাটি এক হিসাবে বিশেষ অর্থপূর্ণ। মহাকাব্য-রচনায় নবীনচন্দ্র কতখানি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন অথবা তাঁহার আখ্যানবস্তু কতটা পরিমাণে ইতিহাসের অনুসারী হইয়াছিল, এ সকল প্রশ্নের বিচার

না করিয়াও একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, নবীনচন্দ্রের পরিকল্পনাই শুধু বিরাট ছিল না মহাভারতের আখ্যায়িকার যুগোপযোগী তাৎপর্য্যও তাঁহার মনে প্রতিভাত হইয়াছিল এবং একটা শতাব্দীর নানা বিচ্ছিন্ন ভাবধারা তাঁহার কাব্যত্রয়ীতে সংহত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকতা ও যুক্তিবাদ, ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ, বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ, অগাষ্ট কোঁতের মানবতাবাদ এবং কার্লাইল-এমার্সন-পার্কারের বিশ্বজনীন ধর্ম্মের পরিকল্পনার সহিত গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম ও ভাগবত ধর্ম্ম বা ভক্তিযোগের আদর্শ নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীতে অবিরোধে মিলিত হইয়াছে। অন্তত, এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হইতেও নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী 'উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' আখ্যা পাইবার যোগ্য। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বলিয়াছিলেন—

'If executed adequately, many will probably consider it as the Mahabharat of the nineteenth century,'

মহাকাব্য রচনায় নবীনচন্দ্র যেমন একদিকে মহতী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তেমনই পরিমিতি-বোধের অভাব, গীতি-প্রবণতা, উচ্ছ্বাস-প্রবণতা, তরল বা চটুল রসিকতার প্রয়াস প্রভৃতি নানা কারণের জন্য তিনি স্থানে স্থানে ব্যর্থ হইয়াছেন। পঞ্চাশটি সর্গ-সমন্বিত কাব্যত্রয়ীর মধ্যে এমন অনেক সর্গ আছে যাহাতে মহাকাব্যোচিত মহিমা ও গাম্ভীর্য্য সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন রহিয়াছে, সুতরাং মহাকাব্য-রচনার উপযোগিনী প্রতিভা নবীনচন্দ্রের ছিল না এ কথা আমরা স্বীকার করি না—যিনি এই কাব্যত্রয়ীকে 'মাইকেলের শিল্পের ব্যর্থ অনুকরণ' বলিয়াছেন তাঁহার উক্তিকেও আমরা অসতর্ক ও অসমীচীন বলিয়া মনে করি। কারণ হেমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্র যে পূর্ব্বগামী কবি মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই এবং নবীনচন্দ্রের উপর মধুসূদনের প্রভাব যে অত্যন্ত ক্ষীণ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহেরই অবকাশ নাই নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ী মহাকাব্য হিসাবে কতখানি সার্থকতা লাভ করিয়াছে, তাহার বিচার করিতে গিয়া অনেক সমালোচক এ্যারিষ্টটল্, দণ্ডী, বিশ্বনাথ, রুদ্রট প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং Authentic Epic বা Epic of growth ও Literary Epic বা Epic of Art-এর পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সেই সকল আলোচনার গহন অরণ্যে প্রবেশ করিব না। নবীনচন্দ্রের কবি-প্রতিভা যে পূর্ব্বগামী কবিগণের পদাঙ্কানুসারিণী না হইয়া স্বতন্ত্রপথগামিনী হইয়াছে, ইহা স্মরণ রাখিয়াই কাব্যত্রয়ীর আলোচনায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন, রাজকার্য্য-উপলক্ষ্যে শ্রীক্ষেত্রে বাস করার ফলেই তাঁহার বিলাসবাসনাপূর্ণ হৃদয়ে ভক্তির পবিত্র ছায়া পতিত হইয়াছিল। তিনি বলেন, 'সেখানে (দর্শনমন্দিরের দক্ষিণদ্বারস্থ সোপান পার্শ্বে) বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল।' ইহার পর কবি বিহার সাব-ডিভিশনে স্থানান্তরিত হন। 'রৈবতকের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন—'মহাভারতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিতীর্থ গিরিব্রজপুর বা আধুনিক রাজগৃহে রাজকার্য্যে অবস্থানকালে স্থানমাহাত্ম্যে উদ্বেলিত হৃদয়ে কাব্যজগতের হিমাদ্রিস্বরূপ বিপুল মহাভারতগ্রন্থ আর একবার পাঠ করি।...... মহাভারতের পাঠ সমাপন করিয়া দেখিলাম, ভারতের বিগত বিপ্লবাবলীর তরঙ্গলেখা এখনও সেই শৈলউপত্যকার, সেই শেখরমালার অঙ্কে অঙ্কে অঙ্কিত রহিয়াছে। দেখিলাম, তাহার সানুদেশে—সেই দৃশ্য ভাষাতীত—ভগবান বাসুদেব ঐশিক প্রতিভায় গগন পরিব্যাপ্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন এবং অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া পতিত ভারতবাসীর—পতিত মানবজাতির উদ্ধারের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। দেখিলাম, পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম। সেখানে রৈবতক সূচিত এবং মধাভারতের সেই পবিত্র শৈলমালার ছায়ায় তাহার প্রথমাংশ রচিত হইল।'

যিনি কাব্যত্রয়ীর রস আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহাকে কবির সহিত তদ্ভাবভাবিত হইয়াই এই 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত' পাঠ করিতে হইবে। 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ অনাসক্ত বা নিষ্কাম ধর্ম্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 'তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না।' ইহাতে নবীনচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণও পূর্ণ মানব,— শাশ্বত ধর্ম্ম, যুগ ধর্ম্ম ও আপদধর্ম্মের তিনি প্রবক্তা এবং মহাভারতের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁহার সম্পর্কে বলা যায়,—'খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ভারত এক ধর্ম্মরাজ্যপাশে বেঁধে দিলে তুমি', অথচ কবি যে শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী লীলাকেও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, 'রৈবতকের' দুই একটি সর্গে এবং 'প্রভাসে' তাহার প্রমাণ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশেই হউক, পূর্ব্বগামী কবি হেমচন্দ্রের অনুসরণেই হউক বা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের নির্দ্দেশেই হউক, নবীনচন্দ্র তাঁহার মহাকাব্যে নানা ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু এখানেও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন নাই, বরঞ্চ কাব্যত্রয়ীর যে কয়টি সর্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত হইয়াছে, সেই কয়টি সর্গেই মহাকাব্যোচিত বিশালতা, গাম্ভীর্য্য ও মহিমা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

'রৈবতকের' প্রথম সর্গেই এক ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের তত্ত্বালোচনার মধ্য দিয়া কাব্যের সূত্রপাত হইয়াছে এবং দুর্ব্বাসার অভিশাপের মধ্য দিয়া ভাবী ঘটনার ছায়াপাত হইয়াছে। ঋষিগণের সূর্য্যস্তবের পর শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

> 'হায় অন্ধ উপাসক! হেন মহাশক্তি
> নিত্য বিদ্যমান যার নয়নের কাছে,
> সে কেন পূজিবে ওই অন্ধ প্রভাকর—
> জ্ঞানহীন, ইচ্ছাহীন, নিয়মের দাস।'

শুনিলে মনে হয়, সবিতার বন্দনা যে মূলত ব্রহ্মেরই উপাসনা, কবি যেন তাহা উপলব্ধি করেন নাই, তিনি যেন জার্ম্মাণ পণ্ডিত ক্যাণ্টের মত বলিতে চাহেন—প্রকৃতির রাজ্যে আছে নিয়মানুগত্য, determinism বা heteronomy, আর মানুষের ক্ষেত্রে আছে মনের স্বরাজ্য, freedom of will বা autonomy; তাই প্রকৃতি বিরাট হইতে পারে, কিন্তু মানুষ স্বরাট্। ক্যাণ্ট বলেন, কোন মানুষকেই তোমরা উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্র করিও না। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণও এই মানবধর্ম্মেরই প্রবক্তা, তিনি একই সঙ্গে ডারুইন ও কোঁতের শিষ্য। ক্যাণ্টের উক্তিটি এই—

'Always treat humanity, either in thy own person as well as in the persons of others, always as an end, never merely as a means.'

দ্বিতীয় সর্গ 'ব্যাসাশ্রমে' ভারতের প্রাচীন শান্তরসাস্পদ তপোবনের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, কিন্তু শিশুগণ কর্ত্তৃক অর্দ্ধস্ফুট ভাষায় কৃষ্ণার্জ্জুনের সংবর্দ্ধনা এই গম্ভীর পরিবেশকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

তৃতীয় সর্গেই শ্রীকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টিতে মহাভারত-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন উদ্ভাসিত—

> 'জননি ভারত!
> শক্তি-স্বরূপিণী তুমি, শক্তি-প্রসবিনী।
> ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান, ভুজ অর্জ্জুনের,
> তোমার সেবায় মাতঃ! হলে নিয়োজিত
> কোন্ কার্য্য নাহি পারে হইতে সাধিত।'

কাব্যের চতুর্থ সর্গ হইতে যে দুর্ব্বাসার সাক্ষাৎ আমরা পাই, তিনি পৌরাণিক দুর্ব্বাসা

না হইলেও এই কপট, ছলনাময়, কূটরাজনীতিজ্ঞ 'ঋষিটির' চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার সকল কর্ম্মপ্রচেষ্টা একটি মাত্র নীতিসূত্রে বিধৃত—'The end justifies the means.' চতুর্থ সর্গে ঋজুস্বভাব, অমিতবল, দুর্দ্দম বাসুকির সঙ্গে দুর্ব্বাসার মিলন ঘটিয়াছে, ক্ষাত্রিয়সংহারের জন্য বাসুকির প্রতিজ্ঞার কথা এই সর্গেই আমরা জানিতে পারি।

যে মহাভারত-প্রতিষ্ঠা শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ব্রত ছিল, তাহার প্রথম সূত্রপাত ভদ্রার্জ্জুনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণে এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাহাদের পরিণয়-সম্পাদনে অর্থাৎ কুরুবংশ ও যদুবংশের মিলনে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ সর্গে এই অনুরাগের যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার গীতিকবিসুলভ ভাবোচ্ছ্বাসেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণের প্রতি জরৎকারুর আকর্ষণ, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক জরৎকারুর প্রণয়-প্রত্যাখ্যান, জরৎকারুর শ্রীকৃষ্ণ-বিদ্বেষ, অনার্য্য বালিকা শৈলজার বালকবেশে পিতৃহন্তা অর্জ্জুনের সেবার ভার-গ্রহণ, অর্জ্জুনের প্রতি শৈলজার ক্রম-আকর্ষণ, অর্জ্জুন ও ব্যাসদেবকে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-প্রদর্শন প্রভৃতি কাহিনীগুলি মহাকবির স্বকপোল-কল্পিত কিন্তু সুভদ্রা-হরণের বৃত্তান্ত আর্য মহাভারত ও কাশীরাম দাসের মহাভারত হইতে গৃহীত।

রৈবতক কাব্যে 'পূর্ব্বস্মৃতি' নামক সপ্তম সর্গ ও সোহহং' নামক দ্বাদশ সর্গে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অতুলনীয়। সপ্তম সর্গে অর্জ্জুনের অনুরোধে ভগবান বাসুদেব তাঁহার ঐশ্বর্য্যলীলা ও মাধুর্য্যলীলার যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে একদিকে যেমন নবীন-চন্দ্রের ভক্তিরস-বিহ্বল চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্য দিকে তেমনই তাঁহার যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গিরও নিদর্শন পাওয়া যায়। গোষ্ঠবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যদুকুল-পুরোহিত গর্গের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের অন্তর স্পর্শ করে ঃ

> 'তব গোচারণ-ক্ষেত্র হবে বসুন্ধরা ;
> সমগ্র মানবজাতি গোপাল তোমার ;
> ভ্রমিবে সংসারারণ্যে হয়ে দিকহারা,
> দেখি পদচিহ্ন, শুনি বেণুর ঝঙ্কার।'

আবার তন্দ্রাগত কৃষ্ণ বিরাট মূর্ত্তি দর্শন ও দিব্যানুভূতি লাভ করিয়া বলিতেছেন—

> 'শুনিলাম—এক জাতি মানব সকল ;
> এক বেদ—মহাবিশ্ব, অনন্ত অসীম ;
> একই ব্রাহ্মণ তার—মানব-হৃদয় ;
> একমাত্র মহাযজ্ঞ—স্বধর্ম্ম-সাধন ;
> যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ।'

আমাদের মনে পড়ে, ফরাসী দেশে ভ্রমণের জন্য রাজা রামমোহন যখন ছাড়পত্র প্রার্থনা করেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন—

'All mankind are one great family of which numerous nations existing are only various branches.

আর মনে পড়ে, উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রচিত দুইটি শ্লোক যাহাতে নববিধান সমাজের মর্ম্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে—

> 'সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
> চেতঃ সুনির্ম্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
> বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
> স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ততে॥'

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ তো শুধু দুর্বৃত্তের দমনকারীই নহেন, তিনি যে রসস্বরূপ,—

তাঁহারই শ্রীমুখের উক্তি, 'যে আমারে ভজে যৈছে তারে ভজি তৈছে'। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বৃন্দাবন-লীলার বর্ণনায় বলিতেছেন—

'কেহ দাসীভাবে মম সেবিল চরণ;
কেহ মাতৃস্নেহে মম চুম্বিল বদন;
কেহ সখীভাবে বক্ষে করিল ধারণ,
কেহ বা বিবশা প্রেমে দিল আলিঙ্গন।
পতি পুত্র পিতা মাতা ভুলেছে আলয়,
আমি পতি, আমি পুত্র, সখা প্রেমময়'।

কাব্যত্রয়ীর পরিকল্পনার সময় হইতেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত নবীনচন্দ্র বৈষ্ণবীয় রসসাধনার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, জাতিবৈরের কবি মানবতার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।

কাব্যের দ্বাদশ সর্গ 'সোহহং'এ মহাকাব্যোচিত মহিমা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। এই সর্গের উপসংহারে নবীনচন্দ্রের প্রশ্ন যেন আমাদেরই অন্তরের জিজ্ঞাসা—

'কহ দয়া করি
সশরীর আবির্ভাব আবার কখন
হইবে ভারতে? কহ হবে কি কখন?
নারায়ণ নরোত্তম! কহ দয়া করি
তব ভাগবত, প্রভো! হবে কি বিফল?
পূর্ণ কাল; পূর্ণ ব্রহ্ম! আসিবে কখন?'

নবীনচন্দ্রের দিব্য কল্পনায় যে মাতৃমূর্ত্তি উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তিনি 'রাজরাজেশ্বরী সম্রাজ্ঞীরূপিনী'। রৈবতকের সপ্তদশ সর্গে শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্য দিয়া আমরা নবীনচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টি ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টির পরিচয় পাই—

'যতদিন খণ্ডরাজ্য
রহিবে ভারতে, আর্য্য
জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ রহিবে নিশ্চয়;
রহিবে এ রাজ্যভেদ ধর্ম্ম ভেদময়।
এক ধর্ম্ম, এক জাতি
একমাত্র রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ডদেহ হবে না মিলিত।

ধর্ম্মভিত্তি নাহি যার,
বালিতে নির্ম্মাণ তার,
কি সাম্রাজ্য, কি সমাজ, নিজ পাপভারে,
নিশ্চয় পড়িবে ভাঙ্গি কাল-পারাবারে'।

কুরুক্ষেত্র

এবার আমরা ধর্ম্মক্ষেত্র 'কুরুক্ষেত্রে' প্রবেশ করিয়া নর-নারায়ণের লীলা দর্শন করিব।

'অভিমন্যু-বধ' কুরুক্ষেত্র কাব্যের প্রধান ঘটনা হইলেও নবীনচন্দ্র এখানে গীতার নিষ্কাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, এখানে অভিমন্যু ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপনের জন্যই আত্মাহুতি দিয়াছেন। অভিমন্যু-বধের পর অর্জ্জুন যে কঠোর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে যেভাবে প্রতিজ্ঞা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার শুধু উল্লেখমাত্র নবীনচন্দ্রের

কাব্যে আছে। 'কুরুক্ষেত্রে' শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

ক্ষাত্রিয়ের,
ধ্বংস বিনা ধর্ম্মরাজ্য হবে না স্থাপিত।

অভিমন্যু-বধে শোকগ্রস্ত অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

'আমরা বীরের জাতি, বীরধর্ম্ম রণ।
অযোগ্য এ শোক তব। এই বীরক্ষেত্র
করিও না কলঙ্কিত করিয়া বর্ষণ
এক বিন্দু শোক-অশ্রু। বীরর্ষভ তুমি ;
বীর-শোক অশ্রু নহে ; অসির ঝঙ্কার।'

এদিকে মূর্ত্তিমতী সেবা ও দয়ারূপিনী সুভদ্রা তাঁহার মাতৃস্নেহ সকল আর্ত্ত ও দুর্গত নরনারীর মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া অন্তরে পরম প্রশান্তি লাভ করিয়াছেন। সুভদ্রা যেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের প্রতিমূর্ত্তি নহেন, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের ন্যায় সেবাব্রতধারিণী।' অবশ্য, নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা রক্তমাংসের মানবী নহেন, যোগবাশিষ্ঠের সুলভার মত সুভদ্রাও যোগিনী কিন্তু নবীনচন্দ্র তাঁহার মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তির আরোপ করেন নাই। সুলোচনা সেবাপরায়ণা মর্ত্ত্যের মানবী,—অভিমন্যু-বধের পর তাহার দেহত্যাগ আমাদের মনকে বেদনার্দ্র করে।

আচার্য্য গুরুদাস 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের 'সুভদ্রা'-চরিত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'কুরুক্ষেত্র কাব্যে অনেক বুঝিবার, অনেক চিন্তা করিবার, অনেক শিক্ষা করিবার বিষয় আছে, কিন্তু তন্মধ্যে আমার বিবেচনায় সুভদ্রার চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী ও জ্ঞানপ্রদ।'

অভিমন্যু-চরিত্র সম্পর্কেও তিনি লিখিয়াছেন—

'অভিমন্যু চরিত্র আপনার কল্পনার আর একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রে সুভদ্রার অমানুষী কমনীয়তা ও অর্জ্জুনের অলৌকিক বীরত্ব একাধারে মিলিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে।' কিন্তু জরৎকারুর কৃষ্ণাসক্তি-সম্পর্কে গুরুদাস বাবু আপত্তি উত্থাপন করেন ও নবীনচন্দ্র উহা খণ্ডন করার চেষ্টা করেন। একথা সত্য যে মহাভারতের কারু-চরিত্রের সহিত (আদিপর্ব্ব) নবীনচন্দ্রের অঙ্কিত কারু-চরিত্রের কোন সম্পর্ক নাই। 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'কোনও এক অজ্ঞাত শক্তি যেরূপ লেখাইয়াছেন, আমি সেরূপ লিখিয়াছি'। ইনি কি নবীনচন্দ্রের জীবন-দেবতা?

নবীনচন্দ্রের সুভদ্রা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না। সুলোচনাকে তিনি বলেন,

....'আমরা নারী, বিশ্ব-জননীর ছবি,
আমাদের শত্রু-মিত্র নাই।
বরিষার ধারামত অজস্র জননী-প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই'।

আবার পুত্র অভিমন্যুকে তিনি বলেন, ধ্বংসের মধ্য দিয়াই ভগবান ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

'পাপের প্রশ্রয় দাও, নাহি কর বিনাশিত,
বিশ্বরাজ্য পরিণত নরকে হবে নিশ্চিত।
না বিনাশ বিষবৃক্ষ, না নিবাও দাবানল,
নাশিবে সুরম্য বন অনল ও হলাহল।

সর্ব্বভূত-হিত তরে ধ্বংস নিষ্ঠুরতা নয় ;
দগ্ধ করে বৈশ্বানর, তবু অগ্নি দয়াময়'।

নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণ নররূপী নারায়ণ, কবি তাঁহাকে নররূপে চিত্রিত করিলেও তাঁহার অলৌকিক লীলার কথা কখনও বিস্মৃত হন নাই। মহাভারতে ভীষ্ম কর্ত্তৃক কৃষ্ণের স্তুতি কাব্যাংশে ও তত্ত্বাংশে অতুলনীয়। 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যেও শরতল্পশায়ী ভীষ্ম সজল নয়নে কৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছেন—

'দয়াময়! ছিন্ন এবে সংসারবন্ধন ;
দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম।
আমি নহি ভীষ্ম, তুমি নহ বাসুদেব।
আমি ভক্ত ; দেখিতেছি তুমি ভগবান্,
শঙ্খচক্রধর হরি, পতিতপাবন।
দেও শিরে পদ, মুখে দেও কৃষ্ণনাম।'

কিন্তু নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ যে সকল সময়ে 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ স্থিতধী' পুরুষ, এ কথাও সত্য নহে। অভিমন্যু-বধের পর শ্রীকৃষ্ণ উদ্বেলিত হৃদয়ে আকাশ-পানে চাহিয়া বলিতেছেন—

'মানবের উষ্ণ রক্ত বিনা মানবের পাপ,
মানবের শোক বিনা মানবের পরিতাপ ;
না হয় মোচন যদি, মানবের মুক্তিপথ
রক্তসিন্ধু-গর্ভে যদি, শ্মশানে দাবাগ্নিবৎ ;
একই নির্ঘাতে নাথ! একই নিমিষে হায়!
কৃষ্ণের শোণিতে কেন ভাসালে না এ ধরায়?
একই শ্মশান মাত্র করি নাথ! প্রজ্বলিত,
কৃষ্ণের হৃদয় কেন করিলে না সমর্পিত?
এই অষ্টাদশ দিন হইয়াছে প্রবাহিত
যে শোণিত-পারাবার, কৃষ্ণের তপ্ত শোণিত
প্রতিবিন্দু সে সিন্ধুর ; হা নাথ! প্রতি শ্মশান
করিয়াছ ভস্ম আজি জীবন্ত কৃষ্ণের প্রাণ।'

এইখানেই শ্রীকৃষ্ণের মানব-মহিমা, তাঁহার Divine Personality.

প্রভাস

শ্রীকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা-অবলম্বনে রচিত এই কাব্যের বিষয়বস্তু—অনাচার ও ব্যভিচারের ফলে যদুবংশধ্বংস, দুর্ব্বাসার বিরোধিতাসত্ত্বেও সর্ব্বত্র কৃষ্ণমহিমার বিস্তার, বাসুকির কৃষ্ণপ্রেম লাভ ও সুভদ্রার প্রতি তাঁহার মাতৃভাব, কৃষ্ণের অনুরোধে প্রেমধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বলরামের পশ্চিম বিশ্বে গমন, কারুর শরে বিদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ ও তাঁহার বক্ষে কারুর প্রাণত্যাগ, মৃত্যুকালে দুর্ব্বাসার বিশ্বরূপদর্শন, বাসুকি ও শৈলজার দেহত্যাগ প্রভৃতি। আর্ষ মহাভারতের আদি, দ্রোণ ও মৌষলপর্ব্ব এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ হইতেই নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু গ্রহণ করিয়া তাহাতে স্বকপোলকল্পিত কাহিনী মিশাইয়া নূতন যুগের মহাভারত রচনা করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত 'কলিযুগে যুগধর্ম্ম নাম-সংকীর্ত্তন' তাঁহার কবি-হৃদয়কে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে, 'প্রভাসে' তাহারও নিদর্শন আছে। গুরুদাস বাবু লিখিয়াছেন—'বিশ্বব্যাপী প্রেম আপনার কাব্যের মূলমন্ত্র এবং বিশ্বপতিই ইহার নায়ক।'

'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'এই তিনখানি কাব্য লিখিবার সময়ে প্রায়ই কখন বা ভাবে, কখন বা ভক্তিতে, কখন

বা করুণ রসের উচ্ছ্বাসে কপোল বাহিয়া অশ্রুধারা বহিত। কখন বা সমস্ত প্রাতঃকাল অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতাম। 'কুরুক্ষেত্রের' শেষ কয়েক সর্গ লিখিতে আমি অনর্গল কাঁদিয়াছি। 'প্রভাসের' 'বীণা পূর্ণতান' সর্গ লিখিয়া যেখানে জরৎকারু ভগবানের শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রত্যাগ করিতেছে, সে স্থানে আসিয়াছি। অনন্ত-ভক্ত-সেবিত কুসুমকোমল শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রপাতের কথা আমি পাষাণ-হৃদয়ে কেমন করিয়া লিখিব! আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, আমার চক্ষু ফাটিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু পড়িতেছে।'

কবি আবার লিখিতেছেন—

'১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যত্রয়ের ধ্যান আরম্ভ করি এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রভাস' শেষ করি। নৈমিষারণ্যে ঋষিরা দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করিয়া মহাভারত শুনিয়াছিলেন। আমি চতুর্দ্দশ বৎসরব্যাপী এই যজ্ঞ করিয়া শ্রীভগবানের মহাভারতীয় লীলা ধ্যান করিয়াছিলাম। কিন্তু 'প্রভাসে' শ্রীকৃষ্ণের ভাগবতী লীলাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। রৈবতকের একটি সর্গে শ্রীকৃষ্ণ নিজমুখে বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণের প্রেম-লীলার বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ইহা রৈবতকের মুখ্য বিষয় নহে। প্রভাসে ভগবানের প্রেম-লীলাই কবির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হওয়াতে কাব্যত্রয়ীর মধ্যে ভাবগত ঐক্য কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আর্য্য-অনার্য্যের প্রেম-সম্মেলনের চিত্র অঙ্কন করিয়া কবি প্রভাস-কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। নিজ বংশের ভয়াবহ ধ্বংস-লীলা ভগবান নির্লিপ্তভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন. তিনি বলিয়াছেন—'নহি যাদবের, আমি মানবের স্বামী'। বাসুকি ও কারু শত্রুভাবে ভগবানকেই ভজনা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা সেই ভাবেই তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন। অবশ্য বাসুকির ন্যায় কারুর প্রেম কখনও কামনার পঙ্কিলতা হইতে মুক্তিলাভ করে নাই. কারুর কণ্ঠে আমরা শুনিতে পাই—

'তুমি নয়নের আভা,—তুমি রসনার সুধা,
তুমি মম শ্রবণের সঙ্গীত কেবল!
তুমি মম চিরসুখ, তুমি মম চিরদুঃখ,
সুখ-দুঃখ-মন্থনের অমৃত শীতল!'

এখানে কবির ভাব ও প্রকাশ-ভঙ্গি উভয়ই অতুলনীয়।

'প্রভাস' কাব্যের দশম সর্গে দুর্ব্বাসার বিশ্বরূপ-দর্শন ও দেহত্যাগের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা 'গ্র্যান্ড এপিকের' লেখকেরই উপযুক্ত. পৃথিবীর সাহিত্যেই হয়তো উহার তুলনা বিরল। দুর্ব্বাসা যতই ছলনাময়, কপটচারী ও কৌশলী হউন না কেন, মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যেও তাঁহার চরিত্রের অনমনীয় দৃঢ়তা আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এক হিসাবে তিনিও প্রতিকূলভাবে ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন, তাই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়া তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। ভারতীয় দৃষ্টিতে সুতরাং ইহার মধ্যে কোন অসঙ্গতি নাই। বিশ্বরূপ-দর্শন করিয়া ঋষি দুর্ব্বাসা উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়াছেন—

'কি অদ্ভুত! কি অদ্ভুত! নীলমণিময়
কি বিরাট দেববপু। বিরাট পুরুষ!
দ্যুলোক, ভূলোক, ওই অনন্ত আকাশ
ব্যাপিয়াছে সেই দেহ! গ্রহ, উপগ্রহ,
চন্দ্র, সূর্য্য, ধূমকেতু, অসংখ্য মণ্ডল
ভ্রমিতেছে চক্রে চক্রে সে বিরাট দেহে.
আদিহীন, অন্তহীন! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে,
মহাপারাবারে ক্ষুদ্র জলবিম্ব মত,
জন্মি জন্মি সেই দেহে হতেছে বিলীন!
এই কি সে বিশ্বরূপ? পরম নির্ব্বাণ

এ বিশ্বের, নিত্য, সত্য, 'অব্যয়, অক্ষয়?
অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা? নিয়ন্তা নীতির?
এ অনন্ত কৌশলের অনন্ত-কৌশলী?
এক, অদ্বিতীয়? ভিন্ন শক্তির নাম
বৈদিক দেবতাগণ? অদ্ভুত, অদ্ভুত!
সত্য কি এ নবধর্ম্ম? সত্য বিশ্বরূপ?
সত্য? না, না, মানিবে না, দুর্ব্বাসা কখন'।

চরিত্র-চিত্রণ

কাব্যত্রয়ী-সম্পর্কে কোন কোন সমালোচকের অভিযোগ এই—চরিত্র-চিত্রণে নবীনচন্দ্র নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—'চরিত্রের দিক দিয়া কবি খুব যে একটা কেরামতি দেখাইয়াছেন, তাহাও স্বীকার করা যায় না।' দুঃখের বিষয়, আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। নারী চরিত্রাঙ্কনে নবীনচন্দ্র যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। কবি তাঁহার কাব্যত্রয়ীতে প্রেমের বিচিত্র পরিণাম ঘটাইয়াছেন। আধুনিক মনোবিদ্যায় বলা হয় love is ambevalent, ভালবাসা ও ঘৃণা যেন একই মনোভাবের এপিঠ আর ওপিঠ, তাই অবস্থাচক্রে ভালবাসা ঘৃণায় ও ঘৃণা ভালবাসায় রূপান্তরিত হইতে পারে। প্রাচীন গ্রীকদের 'কিউপিড' বা কামদেবের পরিকল্পনা হইতে মনে হয়, তাঁহারাও এ তত্ত্ব জানিতেন। কাব্যত্রয়ীতে বাসুকি, শৈলজা ও কারুর চরিত্র অত্যন্ত জীবন্ত। ভদ্রার প্রতি বাসুকির উদগ্র, জ্বালাময় আকর্ষণ পরিণামে মাতৃভাবের মধ্যে উদ্গতিপ্রাপ্ত বা sublimated হইয়াছে, শৈলজা পরিচর্য্যার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে পিতৃহন্তা অর্জ্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন কিন্তু এই আকর্ষণ তাঁহাকে প্রেমাস্পদের মঙ্গলকামনায় আত্মসুখ-বিসর্জ্জনেই উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। আবার কারুর সকাম প্রেম শেষ পর্য্যন্ত প্রতিহিংসার মধ্য দিয়াই সার্থকতার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে। অবশ্য, সুভদ্রা যে রক্তমাংসের মানবী হইয়া উঠিতে পারে নাই, এ কথা সত্য কিন্তু মহাকাব্যে এরূপ 'আইডিয়াল' চরিত্রের কি কোন সার্থকতা নাই?

নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে অভিযোগ এই যে, তাঁহার চরিত্র পৌরুষ-দীপ্ত নহে, তিনি অনেকটা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু মহাভারতে পার্থসারথীরূপে যে শ্রীকৃষ্ণকে আমরা দেখিতে পাই, তিনিও কি কিছুটা নিষ্ক্রিয় নহেন? স্বচ্ছ দৃষ্টি ও প্রবল ব্যক্তিত্বের অধিকারী, স্বল্প-ভাষী, মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, শুধু সেখানেই অর্জ্জুনের কার্য্য-কলাপ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের দুর্ব্বাসা ক্রূরকর্ম্মা ও মায়াবী অর্থাৎ ছলনাময় হইলেও তাঁহাকে 'ভিলেন' বলা চলে না, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যত হীন উপায়ই অবলম্বন করুন না কেন তিনি হয়তো সত্যই শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্ব্বাসার সংঘর্ষ তাই মানবধর্ম্ম ও লৌকিক আচারের মধ্যে সংঘর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মহাভারতরূপ বিশাল মহাকাব্য একটিমাত্র সূত্রে গ্রথিত—'যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ'। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণেরও জীবন-ব্রত অখণ্ড ভারতে ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে দেখি, ঘটোৎকচ-বধের পর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

'যো হি ধর্ম্মস্য লোপ্তারো বধ্যাস্তে মম পাণ্ডব!
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থং হি [illegible] মমাব্যয়া॥
ব্রহ্ম সত্যং দমঃ [illegible] ধর্ম্মো [illegible] হ্রীঃ [illegible] ধৃতিঃ ক্ষমা।
যত্র তত্র রমে [illegible] অহং সত্যেন তে [illegible]॥

([illegible]রোণপর্ব্ব, ১৫৫-৫৯-৬০)।
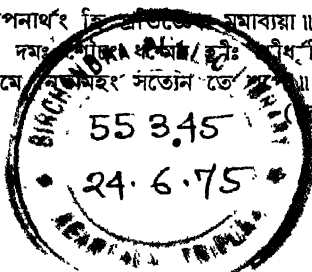
পাণ্ডুনন্দন! যাহারাই ধর্ম্মলোপী হইবে, তাহারাই আমার বধ্য হইবে ; ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য ইহাই আমার চিরন্তনী প্রতিজ্ঞা।

আর তপস্যা, সত্য, ইন্দ্রিয়দমন, পবিত্রতা, ধর্ম্ম, অকার্য্যকরণে লজ্জা, সৎকার্য্যোপযোগিনী অর্থসম্পত্তি, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, এইগুলি যেখানে থাকে, সেখানে আমি আনন্দের সহিত বাস করি। অর্জ্জুন! ইহা আমি তোমার নিকট সত্য শপথ করিলাম। (হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশের অনুবাদ)।

মহাভারত-পাঠের পূর্ব্বে নারায়ণ, নরোত্তম নর (অর্থাৎ অর্জ্জুন), দেবী সরস্বতী ও ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিতে হয়। বস্তুত মহাভারতে এই নর-নারায়ণের মহিমাই তো কীর্ত্তিত হইয়াছে। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণো হি মূলং পাণ্ডূনাং পার্থঃ স্কন্ধ ইবোদ্‌গতঃ।
শাখা ইবেতরে পার্থা পাঞ্চালাঃ পত্রসংজ্ঞিতাঃ॥
কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ।
কৃষ্ণঃ পরায়ণঞ্চৈষাং জ্যোতিষামিব চন্দ্রমাঃ'॥

(দ্রোণপর্ব্ব, ১৫৬-২৩-২৪)

কৃষ্ণই বৃক্ষতুল্য পাণ্ডবগণের মূল, অর্জ্জুন তাহার স্কন্ধের ন্যায় উঠিয়াছেন, অপর পাণ্ডবেরা শাখার তুল্য এবং পাঞ্চাল প্রভৃতি যোদ্ধারা পত্রস্থানীয়।

তারপর কৃষ্ণই পাণ্ডবগণের আশ্রয়, কৃষ্ণই তাঁহাদের বল এবং কৃষ্ণই তাঁহাদের রক্ষক, এমন কি—নক্ষত্রগণের পক্ষে চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডবগণের পক্ষে কৃষ্ণই একমাত্র উপজীব্য। (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ।)

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসংস্থাপক তাই তিনি পাণ্ডবগণের, বিশেষত, পার্থের আশ্রয়। যে সময়ে তিনি পার্থের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়ে তাঁহার চরিত্র মধুসূদনের রাবণ-চরিত্রের মত পৌরুষদীপ্ত হইলেই বরং অশোভন হইত। কিন্তু যেখানে প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে তিনি শুধু অক্লান্তকর্ম্মা নহেন, ভীমকর্ম্মা পুরুষও বটেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণও নবধর্ম্মের উদ্গাতা। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের আলোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

'যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য-স্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণের প্রচার করিয়া, তারপর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্বপ্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে বলিয়াছিলেন, বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি'।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কি সত্যই বলিয়াছিলেন, 'বেদে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে'? অবশ্য, ভগবদ্‌গীতার কয়েকটি শ্লোকে বলা হইয়াছে, বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির দ্বারা মানুষ কিছু কালের জন্য স্বর্গাদি লাভ করিতে পারে বটে কিন্তু নিঃশ্রেয়স বা summum bonum লাভ করিতে পারে না। নবীনচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণও যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছেন। (রৈবতক, ১২শ সর্গ) সুভদ্রা কিন্তু শৈলজাকে বলিয়াছেন—

বেদধর্ম্ম, শৈল!
এই বৈকুণ্ঠের পথে প্রথম সোপান'।

কর্ণপর্ব্বে উল্লিখিত যে ঘটনার উপর ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ-সম্পর্কে এই-রূপ উক্তি করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা কৃষ্ণচরিত্রে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীন-

চন্দ্রের অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে হইলে ধর্ম্মসম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণের অভিমত স্মরণীয়। (কর্ণ-পর্ব্বে কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ)

> 'শ্রুতেধর্ম্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
> তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে॥
> প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্ম-প্রবচনং কৃতম্।
> যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥
> অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্ম্ম-প্রবচনং কৃতম্॥
> ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
> যৎ স্যাদ্ধরণ-সংযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ'॥

কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন, 'শ্রুতিই ধর্ম্মের মূল। তোমার সে মতের প্রতি আমি কোন দোষ প্রদর্শন করি না। কিন্তু শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ধর্ম্ম বিহিত হয় না। প্রাণিগণের মঙ্গলের উদ্দেশ্যেই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে, যাহা অহিংসা-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম; যাহাতে প্রাণিগণের প্রতি হিংসা আচরিত না হয়, সেই জন্যই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রজাসমূহকে ধারণ করেন, এই জন্যই পণ্ডিতগণ ইহাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব যাহা ধারণা-সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল'।

এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র উভয়ের মতেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সার কথা লোকহিত অথবা সর্ব্বভূতহিত।

খৃষ্ট

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'। কিন্তু ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান তো শুধু ভারতভূমিতেই ঘটে নাই, তাই ভারতের বাহিরেও ভগবান নরবপু ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই ছিল ভক্ত নবীনচন্দ্রের প্রত্যয়। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মত তিনিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, 'সকল ধর্ম্মের জন্মস্থান এশিয়া', খৃষ্টের দিব্যজীবন ও সরল উপদেশমালা তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। খৃষ্ট তাঁহার চোখে একজন কৌপীনধারী হিন্দু সন্ন্যাসিরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, তাই তিনি কৃষ্ণোক্তি ও খৃষ্টোক্তিতে কোন ভেদ দেখিতে পান নাই। সাহিত্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম-বিদ্বেষ দূর করা ও সমন্বয়ের আদর্শ স্থাপন করার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি এই সকল জীবনী-কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'খৃষ্ট' কাব্য রচনায় (১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ তাঁহার প্রধান উপজীব্য ছিল Gospel according to St. Matthew. ইহা মূলত অনুবাদ-কাব্য, সুতরাং নবীন-চন্দ্রের কবি-প্রতিভা ইহাতে স্ফূর্ত্তিলাভ করিবার অবকাশ পায় নাই।

এ যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে রাজা রামমোহনের দৃষ্টিই সর্ব্বপ্রথম মহামানব খৃষ্টের অমর বাণীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অমানুষী লীলাকে রামমোহনের বিচার-নিষ্ঠ, যুক্তিবাদী মন স্বীকার করিয়া লয় নাই। খৃষ্টের শাশ্বত বাণী সংকলন করিয়া তিনি Precepts of Jesus : a guide to peace and happiness নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু খৃষ্টের দিব্যজীবন ও অলৌকিক কর্ম্ম আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুগামী প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। কেশবচন্দ্র জন দি ব্যাপ্টিষ্ট, খ্রীষ্ট ও সেণ্ট পল্‌কে ধ্যাননেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধদেব ও খৃষ্ট উভয়কেই মহামানব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিতে ইঁহারা কেহই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শ নহেন। পরবর্ত্তী কালে আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ ও বিশ্বের বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ লোকোত্তর পুরুষ খৃষ্টের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'বড়দিন' কবিতাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ভক্ত

নবীনচন্দ্র খৃষ্টকে অবতার হিসাবেই দেখিয়াছেন এবং তাঁহার পুণ্য চরিত-কথা পদ্যে গ্রথিত করিয়াছেন।

অমিতাভ

নবীনচন্দ্র যে কয়খানি চরিতকাব্য রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে 'অমিতাভ' (১৮৯৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে চট্টলজননীর ক্রোড়ে কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা বহু-সংখ্যক বৌদ্ধের দ্বারা অধ্যুষিত, এ কথাটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা আবশ্যক। শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর সশ্রদ্ধ কৌতূহল জাগ্রত হয়। নবীনচন্দ্র যখন রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের আদিতীর্থ গিরিব্রজপুর বা রাজগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদিকে ভগবান বাসুদেবের ঐশী লীলার মাহাত্ম্য তাঁহার অন্তরে স্ফুরিত হয়, অপরদিকে করুণাঘন ভগবান্ তথাগতের ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তিটিও তাঁহার অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'রৈবতকের' মুখবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'যে উরুবিল্ব নামক গিরি-কক্ষে বুদ্ধদেব ধ্যানস্থ থাকিতেন, যে কক্ষে তাঁহার শিষ্যগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি নীতিমাল্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন, সে পবিত্র কক্ষ এখনও দর্শকের হৃদয় পবিত্র করিতেছে'। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, 'কুরুক্ষেত্র' প্রকাশিত হইবার পরে (১৮৯৩) এবং 'প্রভাস' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে (১৮৯৬) 'অমিতাভ' প্রকাশিত হয়। (১৮৯৫)

'অমিতাভের' ভূমিকায় নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন—'আমি যথাসাধ্য তাঁহাকে (বুদ্ধদেবকে) মানুষিক ভাবাপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছি। এ অবতারদিগকে মানুষিক ভাবে দেখিলে যেন আমার হৃদয় অধিক প্রীতি লাভ করে, তাঁহাদিগকে আমাদিগের অধিক আপনার বলিয়া বোধ হয়।' ভারতবর্ষের আদিকবিও এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নায়ক 'পূর্ণব্রহ্ম সনাতন' নহেন, নরচন্দ্রমা। নবীনচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব' অবতার হইয়াও আমাদেরই ন্যায় স্নেহ-মমতার অধীন, শুধু জগতের হিতের জন্যই সংসারের বন্ধন সবলে ছিন্ন করিয়া তিনি মহানিষ্ক্রমণ করিয়াছেন। সিদ্ধার্থ পুত্র লাভ করিয়াছেন, সমস্ত নগরী উৎসব-কোলাহলে মুখর, কিন্তু সিদ্ধার্থের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে আর্ত্ত জীবের রোদন-ধ্বনি। সমস্ত পুরী যখন নিদ্রামগ্ন, তখন—

> গোপার সূতিকা-কক্ষে সিদ্ধার্থ কখন
> দেখিছে পত্নীর মুখ অতৃপ্ত নয়নে
> সদ্যোজাত শিশুমুখ, দেখিছে কখন
> ত্রিদিব কুসুম ক্ষুদ্র।

এড্‌ইন আর্নল্ডের 'লাইট অব্ এশিয়া' কাব্যেও দেখি, মহানিষ্ক্রমণের পূর্ব্বে সিদ্ধার্থ সুপ্তিমগ্না প্রিয়ার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন—

> 'I will depart', he spoke, 'the hour is come,
> Thy tender lips, dear sleeper, summon me
> To that which saves the earth but sunders us.'

ললিতবিস্তরের সঙ্গেও যে নবীনচন্দ্রের পরিচয় ছিল, 'অমিতাভ' কাব্যে তাহার প্রমাণ আছে। আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মহানিষ্ক্রমণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ছন্দকের প্রতি সিদ্ধার্থের উক্তি 'ললিতবিস্তর' হইতে গৃহীত—

> 'অসার সম্ভোগ-সুখ, অনিত্য, অধ্রুব;
> চঞ্চল চঞ্চলা মত; রিক্তমুষ্টি সম
> অসার; অস্থায়ী জল-বুদ্বুদের মত;
> দুর্ভোগ্য স্বপনসম, দুষ্পৃশ্য সফণা
> সর্পমস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।' ইত্যাদি

সিদ্ধার্থ যেখানে বলিতেছেন—

'দ্বার কর অনর্গল,
অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া।'

সেখানে রবীন্দ্রনাথের 'বিদায়' কবিতার কয়েকপংক্তি আমাদের মনে পড়িয়া যায়—

'পাখী উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার,
মহাকাশ হতে ওই বারে বার
আমারে ডাকিছে সবে,
সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।'

'অমিতাভ' রচিত হইবার পূর্ব্বে বাংলার যে সকল মনস্বী সন্তান বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও শরচ্চন্দ্র দাসের নাম স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য নববিধান ব্রাহ্মসমাজে সমন্বয় ধর্ম্ম সাধনের অঙ্গ হিসাবে 'শাক্যসমাগমের' অনুষ্ঠান হইয়াছিল (১৮৮০) এবং কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় অঘোরনাথ গুপ্ত 'শাক্যমুনি-চরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' রচনা করিয়াছিলেন। 'অমিতাভ' রচিত হইবার পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের চরিতকথা অবলম্বনে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, 'নবীনচন্দ্রের কবিকৃতি' গ্রন্থে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও চরিত-কাব্য হিসাবে বাংলা সাহিত্যে 'অমিতাভের' একটি বিশিষ্ট স্থান আছে ;—ইহা শুধু বুদ্ধের চরিত-কথা নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শনের সার মর্ম্মও ইহাতে বিধৃত হইয়াছে।

নবীনচন্দ্র হিন্দু ধর্ম্মের বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, 'বুদ্ধমত সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্মের একটি মত মাত্র। ...বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীরা হিন্দুধর্ম্মের বৃহৎ শাখার একটি শাখাবিশেষ।' আমরা ভারতের দুইজন বরেণ্য সন্তানের মুখে অনুরূপ উক্তি শুনিতে পাইয়াছি,—একজন স্বামী বিবেকানন্দ ও আর একজন বালগঙ্গাধর তিলক। নবীনচন্দ্র বলেন, ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যুগ-প্রয়োজন অনুসারে বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেব যথাক্রমে কর্ম্মপথ, জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথকে সম্প্রসারিত করেন। ভগবদ্‌গীতায় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্রও সমন্বয় বা সামঞ্জস্যের আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন।

কাব্যের উপসংহারে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মগুরুগণের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন। 'প্রভাসের' শেষেও এই উদার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

অমৃতাভ

'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—'সকল ধর্ম্মের মূলের অভিন্নতা প্রতিপাদন করাই আমার এই সকল অবতার-লীলা লিখিবার উদ্দেশ্য।' মনস্বী রমাঁ রলাঁ ভারতের যে কয়জন বরেণ্য সন্তানকে ঐক্য-সংস্থাপক বা Builders of Unity বলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের নামটিও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। 'অমিতাভ' কাব্যের উপসংহারে নবীনচন্দ্র শ্রীভগবানের কাঙ্গাল গৌরমূর্ত্তি ধ্যানদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল 'অমৃতাভ' কাব্য-রচনার মূলে, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত নানা বিপর্য্যয়ের ফলে কবি কাব্যখানি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। বাংলার বৈষ্ণব কবিগণের চোখে যিনি 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু' নিজরসাস্বাদনের প্রয়োজনেই যিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক ফল ছিল যুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তনের প্রচার, গোবিন্দদাসের ধ্যানদৃষ্টিতে যিনি জঙ্গম হেমকল্পতরুরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন, বাংলার সেই প্রাণপুরুষের প্রেমঘন বিগ্রহ-খানি যে ভক্ত নবীনচন্দ্রকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই ;

কবি যে ধীরে ধীরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, 'প্রভাস' কাব্যেও তাহার প্রমাণ আছে। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সকল চরিত-গ্রন্থ মধ্যযুগে রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুরারি গুপ্তের কড়চা, শ্রীলবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও লোচন দাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একালে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ বিপুলায়তন 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে সহজ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের চরিতকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া কবি জগদ্বন্ধু ভদ্র (ছুছুন্দরী-বধ কাব্যের রচয়িতা নামে প্রসিদ্ধ) শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক প্রায় দেড় হাজার পদ সঙ্কলন পূর্ব্বক 'গৌরপদতরঙ্গিণী' নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অতিমানুষী লীলার চেয়ে তাঁহার প্রেম-ধর্ম্মই কবি নবীনচন্দ্রকে বেশী আকৃষ্ট করিয়াছিল। অবতারগণের অতিলৌকিক লীলা-বর্ণনের দিকে কবির আগ্রহের যে অভাব,—ইহাও হিউম্যানিজম্ বা মানবতাবাদের একটি দিক। এডুইন আর্নল্ডের 'লাইট অব এসিয়া' উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ হইলেও ইহা পাঠ করিয়া কবি পরিতৃপ্ত হন নাই, কারণ, ইহাতেও অলৌকিক কাহিনী স্থান পাইয়াছে। যাহা হউক, 'অমৃতাভ' কাব্যে কবি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-বর্ণনে যে করুণ রসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আমাদের অন্তরকেও বেদনার্দ্র করিয়া তোলে।

'অমৃতাভ' কাব্যের প্রায় প্রতি সর্গে নবীনচন্দ্রের স্নেহবৎসল পিতৃ-হৃদয়ের পরিচয় আছে। কবির একমাত্র পুত্র নির্ম্মলের প্রবাস-গমন কবির অন্তরকে বেদনা-বিধুর করিয়াছিল, পুত্রের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে কাব্য পরিসমাপ্ত করিবার যে আশা কবির ছিল, তাহাও অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। চরিত-কাব্যের পক্ষে ব্যক্তিগত কথা অবান্তর হইলেও কবির আন্তরিকতা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। কবি লিখিয়াছেন—

'এস নাথ! এস ওই মনোহর বেশে,
নবীনের হৃদয়েতে। যায় দূর দেশে
আমার নির্ম্মল শিশু কাতর অন্তরে,
শিক্ষাকাঙ্ক্ষী সার্দ্ধ দুই বৎসরের তরে।
তাহার দ্বিতীয় নাই, তার শূন্য স্থান,
করিবে পূরণ নাথ। জুড়াইবে প্রাণ।
তার রূপে, তার স্থান, করিয়া গ্রহণ,
নিবারিও হৃদয়ের রক্ত-প্রস্রবণ।
রাখিও বিদেশে তারে শ্রী-অঙ্গে তোমার!
গাইব তোমার লীলা প্রেম-পারাবার।
জুড়াইতে এই দীর্ঘ বিরহ-দাহন,
এস বক্ষে, পাতিয়াছি কমল-আসন।'

মনে হয়, নবীনচন্দ্রের চিন্তাধারায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যতই বিপুল হউক, তিনি অন্তরে ছিলেন খাঁটি বাঙ্গালী আর তাঁহার জীবনে শেষ পর্য্যন্ত বাংলার সাধনাই জয়যুক্ত হইয়াছিল। এক হিসাবে বাঙ্গালী মাত্রেই তান্ত্রিক; তা সে বৌদ্ধ তন্ত্রই হউক, শাক্ত তন্ত্রই হউক, আর বৈষ্ণবীয় তন্ত্রই হউক। বেদান্তের মায়াবাদকে বাঙ্গালী গ্রহণ করে নাই, কারণ, তাহার নিকট সংসারের স্নেহ-মমতা ভক্তি-প্রীতির বন্ধন সত্য। আবার সংসারের বিচিত্র সম্পর্কের ভিতর দিয়াই বাঙ্গালী শ্রীভগবানকে আস্বাদন করিতে চাহিয়াছে। বাঙ্গালী নবীনচন্দ্রের চরিত্রে দেখি, মাতা-পিতার প্রতি অগাধ ভক্তি, গভীর পত্নী-প্রেম, অপরিসীম সন্তান-স্নেহ ও অপরিমেয় বন্ধু-বাৎসল্য। কবি ঈশ্বর গুপ্তের ন্যায় নবীনচন্দ্রও নেকীর পরম বিদ্বেষী ছিলেন। আবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যময় বৃন্দাবন-লীলা

ও করুণার অবতার শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেম-লীলা বাঙ্গালী নবীনচন্দ্রকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী বা সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্য

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী যেমন কাব্যরস-সমৃদ্ধ, তেমনই গভীর তত্ত্বপূর্ণ। কিন্তু পুরাণকার নানা আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া যে দার্শনিক তত্ত্ব পরিবেশন করিয়াছেন, সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীদের প্রায় কেহই উহার প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। যাঁহারা ভগবদ্‌গীতার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন, তাঁহাদেরও অনেকেরই ধারণা ছিল, শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে শুধু ধনসম্পদ ও শত্রুজয়ের জন্য প্রার্থনা—

'রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।'

কিন্তু জগন্মাতা বা মহাশক্তি যে ভোগমোক্ষদায়িনী, এবং ব্রহ্মজ্ঞান বা ব্রহ্মসাযুজ্যই যে শক্তিসাধকের চরম লক্ষ্য, তাহা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

নবীনচন্দ্র শ্রীশ্রীচণ্ডীর দিকে শিক্ষিত-বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ইহার অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্যানুবাদটি প্রকাশিত হয়। এই অনুবাদের লক্ষ্য ছিল, গীতা ও চণ্ডীর ঐক্য-প্রতিপাদন। কবি দেখাইয়াছেন, পুরাণকার কয়েকটি কাহিনীর মধ্য দিয়া জটিল দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের অনুবাদের মূলে ছিল সেই অধ্যাত্ম প্রেরণা যাহার বশে তিনি নানা মতবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানের প্রয়াস পাইয়াছিলেন। চণ্ডীর আভাষ বা ভূমিকায় কবি চণ্ডীমাহাত্ম্য-বিশ্লেষণে যে পরিহাস-রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, সমালোচক সুবোধরঞ্জন রায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র তন্ত্রোক্ত শক্তি-সাধনারই উত্তরাধিকারী ছিলেন. তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'রঙ্গমতীতে', এমন কি, 'অবকাশরঞ্জিনীর' 'শব-সাধন' প্রভৃতি কবিতায়ও আমরা তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষ্য করি। শুধু নবীনচন্দ্রের রচনায় কেন, শ্রীমধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়ও এই প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত নব্য তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা, আর শিক্ষিত বাঙ্গালীকে শ্রীশ্রীচণ্ডীর সঙ্গে পরিচিত করার গৌরব নবীন-চন্দ্রের প্রাপ্য।

গীতার অনুবাদ

ঊনিশ শতকে হিন্দুধর্ম্মের যে নব-অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, তাহার ফলে শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের দৃষ্টি বিশেষভাবে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার দিকেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। আধুনিক যুগে রাজা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকায় গীতার বিভিন্ন বচন উদ্ধৃত করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় তিনি সর্ব্বত্র পূর্ব্বসূরীদের অনুসরণ করেন নাই। কিন্তু শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে কয়জন বাঙ্গালী মনীষী গীতা-প্রচারে বা গীতা-ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তিনজনের নাম উল্লেখযোগ্য,—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় (গীতার সমন্বয়-ভাষ্যের রচয়িতা), নবীনচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নবীনচন্দ্রের অনুবাদের অনেক বৎসর পর মনস্বী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতার পদ্যানুবাদ (ভূমিকা ও টিপ্পনী সহ) প্রকাশিত হয়। (জানুয়ারী, ১৯০৫)।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্রের গীতার অনুবাদ ও চণ্ডীর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় নবীনচন্দ্র গীতার কোন ভাষ্য রচনা করেন নাই, সে পাণ্ডিত্যও তাঁহার ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বিচার-বিশ্লেষণের দ্বারা শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ উদ্‌ঘাটনের প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। গীতার মূল শ্লোকের অর্থ ভক্ত নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, তিনি তাহাই ছন্দোবদ্ধ বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন—'এ পর্য্যন্ত আমার জীবন আমি ইউরোপীয় দর্শনের অরণ্যে অপচয়

করিয়াছি। গীতা পাঠ করিয়া আমি যেন এক নূতন জীবন লাভ করিলাম এবং আমার স্ত্রীকে পড়াইবার জন্য উহার বাংলা অনুবাদ করিলাম।' নবীনচন্দ্রের এই অনুবাদখানি সেকালের বহু মনীষীর (শিশিরকুমার ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির) প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

আমাদের দেশে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাকে উপনিষৎ বলা হইয়াছে, আবার সর্ব্বোপনিষদের সারভূতাও বলা হইয়াছে। (গীয়তে আত্মবিদ্যা যত্র)। ভারতবর্ষে গীতার নানা ভাষ্য রচিত হইলেও সেই সকল ব্যাখ্যানে আধুনিক জিজ্ঞাসু মনের সকল প্রশ্নের উত্তর মিলে না। তাই এ-কালের কত পণ্ডিত নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা ও অনুভূতির আলোকে গীতার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র গভীর ক্ষোভের সঙ্গে বলিয়াছেন—'কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবার্ন পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি,......আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।' ইহাতে সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোবৃত্তির প্রতিফলন দেখিতে পাই।

নবীনচন্দ্রের অনুবাদ মূলের অনুগত, যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে তিনি গীতার প্রতি অবিচার করিতেন। এরূপ অনুবাদে যাঁহারা কাব্যরসের আস্বাদন করিতে চাহেন, তাঁহারা বঞ্চিত হইবেন। বিশেষত, গীতা কাব্যগ্রন্থ নহে, যদিও ইহার একাদশ অধ্যায়টি এবং প্রথম অধ্যায়ের স্থানে স্থানে কবিত্বপূর্ণ। তথাপি, কোন সমালোচক অভিযোগ করিয়াছেন যে, নবীনচন্দ্র তাহার অনুবাদটি 'মূলানুগ করিতে গিয়াই গীতার কাব্যত্ব মাটি করিয়াছেন।'

নবীনচন্দ্রের গীতার একটি বিশেষত্ব এই যে, ইহার আরম্ভে প্রতি অধ্যায়ের সারমর্ম প্রদত্ত হইয়াছে। নবীনচন্দ্র শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি প্রচারকের ব্রতও গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। বাংলা দেশে ঊনিশ শতকের ধর্ম্মান্দোলন বহু বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই ধারাগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই এ বিষয়ে নবীনচন্দ্রের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে।

প্রবাসের পত্র

নবীনচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ, স্থানে স্থানে কবিত্বপূর্ণ এবং কোথাও কোথাও হাস্যরসে সম্পৃক্ত গদ্য-রচনার নিদর্শন মিলে 'প্রবাসের পত্রে।' (১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকরূপে প্রকাশিত।) স্ত্রীর নিকট লিখিত এই আন্তরিকতাপূর্ণ পত্রগুলির সাহিত্যিক মূল্যসম্পর্কে এ যুগের কোন কোন সমালোচক যে সচেতন হইয়াছেন, ইহা সুখের বিষয়। ভারতবর্ষকে চিনিতে হইলে, ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত গভীরভাবে পরিচিত হইতে হইলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিক্রমা করিতে হয়। তাই বুদ্ধদেব ও শঙ্করাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ পর্য্যন্ত সকলেই পদব্রজে ভারত-পরিক্রমা করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের সে অবসর ছিল না, কিন্তু তাঁহার মধ্যে ছিল সহজাত সৌন্দর্য্যবোধ, কবি-দৃষ্টি ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। তাই স্বল্প তিন মাস কালের মধ্যে পশ্চিমের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি শুধু আনন্দ-আহরণ বা আনন্দ-পরিবেশনই করেন নাই, তিনি কবির চোখে ভারতবর্ষকে দর্শন করিয়া উহাকে যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। ঊনিশ শতকের প্রায় প্রত্যেক মনস্বী বাঙ্গালীই নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা রুচি-প্রকৃতি অনুসারে সনাতন ভারতকে আবিষ্কার করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নহেন। 'নবীনচন্দ্রের ভারত-আবিষ্কার' সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার 'কাব্যত্রয়ী' ও 'প্রবাসের পত্র' অপরিহার্য্য।

আমার জীবন

[প্রকাশকাল, ১ম ভাগ, ১৯০৮, ২য় ভাগ, ১৯০৯, ৩য় ভাগ, ১৯১০, ৪র্থ ভাগ ১৯১২, ৫ম ভাগ, ১৯১৩]

ঊনিশ শতকের শেষ পাদ হইতেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থরূপে 'আত্মচরিত' বা স্মৃতি-কথা জাতীয় গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে। সেই সময় হইতে আত্মচরিত-রচনার যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা আজও ক্ষীণ হয় নাই, কিন্তু এই সকল স্বরচিত জীবনচরিতের মধ্যে নবীন-চন্দ্রের বিপুলায়তন 'আমার জীবন' গ্রন্থখানির একটি বিশেষ স্থান আছে। নবীনচন্দ্রের মধ্যে গল্প বলার ও আসর জমাইবার যে একটি বিশেষ শক্তি ছিল, তাঁহার মধ্যে ভালবাসিবার বা শ্রদ্ধা করিবার এবং ঘৃণা বা উপেক্ষা করিবার যে একটা প্রবল ক্ষমতা ছিল, আত্ম-সচেতন এবং কখনও কখনও আত্মপ্রশংসায় মুখর হইলেও তিনি যে দাম্ভিক ছিলেন না, কপটতাকে যে তিনি মনে-প্রাণেই ঘৃণা করিতেন এবং প্রধানত আন্তরিকতার গুণেই যে তিনি বহুজনের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, সে পরিচয় 'আমার জীবনের' পাঠকমাত্রেই পাইয়াছেন। পরিহাস-রসিকতায় যে তাঁহার পটুত্ব ছিল, তাহার বহু দৃষ্টান্ত এই বৃহৎ গ্রন্থের স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে।

সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত 'নবীনচন্দ্র-রচনাবলীর' সম্পাদকীয় ভূমিকায় পর-লোকগত কবি-সমালোচক সজনীকান্ত দাস 'আমার জীবন' সম্পর্কে লিখিয়াছেন—

'এই গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, বাংলা দেশের সমসাময়িক সাহিত্যিক ও মনীষী-দের কথা—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ঠাকুরদাস মুখো-পাধ্যায়, হেমচন্দ্র, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কেশবজননী সারদা দেবী প্রভৃতির সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য 'আমার জীবনে' আছে। বাংলাদেশের সামাজিক চিত্র নবীন-চন্দ্র যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন—বিশেষ করিয়া 'চট্টগ্রামের দলাদলির কথা'—এমনটি আর কেহ করেন নাই।

'আজ......নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া নবীনচন্দ্রের এই অপূর্ব্ব সাহিত্য-কীর্ত্তিকে দেখার প্রয়োজন হইয়াছে। ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধের বাংলা বিহার উড়িষ্যার ঘনিষ্ঠ চিত্র, মন্দির-মেলা, পাহাড়-পর্ব্বত-নদী-নির্ঝরিণী-সমুদ্র-অরণ্য-দুর্ভিক্ষ-সাইক্লোনের এমন কথা-চিত্রকে উপেক্ষা করিলে বাংলা সাহিত্যেরই ক্ষতি। উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুতে ব্যক্তিগত বিষ আজ জ্বালাহীন হইয়াছে। এখন সত্য-সুন্দর, দেবতা ও নর-দেবতার যে জয়োচ্চারণ নবীনচন্দ্র 'আমার জীবনে' করিয়া গিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলে বাঙ্গালী জাতি, উদ্বুদ্ধ ও উন্নীত হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।'

'আমার জীবনের' ভাষা স্থানে স্থানে আবেগময়ী ও কবিত্বপূর্ণ, রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অসতর্ক পাঠকেরও চোখে পড়ে। ঊনিশ শতকের ঐতিহাসিকের চোখেও 'আমার জীবন' অপরিহার্য। ইহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর নানা ধর্ম্মান্দোলনের প্রতি—ব্রাহ্মসমাজ, থিওসফিকাল সোসাইটি, শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমন্বয়-সাধনা প্রভৃতির প্রতি নবীনচন্দ্রের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মাভিমানী নবীনচন্দ্র ছিলেন a man of strong likes and dislikes এবং এই কারণেই নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই, কিন্তু উৎকৃষ্ট আত্মচরিতের লক্ষণসমূহ আলোচনা না করিয়াও এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যে অতি অল্প আত্মচরিতই 'আমার জীবনের' ন্যায় উপভোগ্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই, 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্রের কবি-জীবন প্রাধান্য না পাইলেও গ্রন্থখানি কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্যসম্পর্কে আলোক-সম্পাত করে।

ভানুমতী

নবীনচন্দ্রের 'ভানুমতী' (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত) একালে উপেক্ষিতা হইলেও সেকালে কোন বিদেশী সমালোচকের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন— 'What has struck me is its literary form.' নবীনচন্দ্র তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রীর অনুরোধে মাত্র এক সপ্তাহ কালের মধ্যে একখানি উপন্যাস লিখিয়া সমাপ্ত করিয়াছিলেন, উপন্যাসখানি প্রণয় কাহিনী-বর্জ্জিত ও গদ্য-পদ্য-মিশ্রিত। যেখানে কথা-শিল্পী শক্তিমান, সেখানে তিনি নর-নারীর প্রেমকাহিনীকে সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলেও সার্থক সৃষ্টি করিতে পারেন। অধ্যাপক সুবোধরঞ্জন রায় ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ 'পথের পাঁচালির' উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর এল স্টীভেন-সনের The Treasure Island, Kidnapped (নামকরণ বিভ্রান্তিকর), ডক্টর জেকিল এন্ড মিঃ হাইড প্রভৃতি উপন্যাসগুলি। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' উপন্যাসের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। কিন্তু নবীনচন্দ্র এই উপন্যাসখানি নানা তত্ত্বের দ্বারা ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছেন, ফলে গল্পের রস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অবশ্য উপন্যাসখানি হইতে অবান্তর বিষয় যথাসম্ভব বর্জ্জন করিলে ইহার আখ্যান-বস্তু অনেকটা সরস ও চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে 'অনন্যা' নামক মাসিক পত্রিকায় (বাংলা ভাষায় Readers' Digest) ভানুমতীর একটি সংক্ষিপ্ত ও সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (শ্রাবণ, ১৩৬৯) নবীনচন্দ্র এই উপন্যাসখানিতে ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুদিগের প্রতিমা পূজা বা প্রতীক উপাসনা, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবীয় রসের সাধনা, হিন্দু সমাজের নানা সমস্যা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, ধর্ম্ম-সমন্বয়ের প্রয়াসও উপন্যাসখানিতে দেখা যায়, এই-জন্যই উপন্যাসের রস ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বৈষ্ণব ভাবে অনুপ্রাণিত নবীনচন্দ্র বলিয়াছেন— 'ব্রজলীলার মত ধর্ম্মশিক্ষার এমন সহজ ও মধুর উপায় আর নাই। শ্রীভগবানকে প্রেম না করিলে মানুষ ধর্ম্মপথের প্রকৃত পথিক হইতে পারে না।

'ভানুমতী' উপন্যাসের রচনাশৈলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

সেকালে নবীনচন্দ্রের 'ভানুমতী' উপন্যাসের ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গির প্রশংসা করিয়া 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—

"The influence of the scenery of the sea-shore in assisting the poet's meditation and ecstasy has been ably depicted in a recent novel by the well-known poet Babu Nabin Chandra Sen in language which reminds the reader at times of Mr Swinburne's poem of the joy and splendour of the sea.'

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর চট্টগ্রামে যে খণ্ডপ্রলয় ঘটিয়া যায়, তাহার বিশদ চিত্র নবীনচন্দ্র অঙ্কিত করিয়াছেন 'আমার জীবনে'। এই খণ্ড প্রলয় বা সাইক্লোনের পটভূমিকায় আদর্শবাদী নবীনচন্দ্র ত্যাগ ও সেবার আদর্শ স্থাপনের জন্য এই উপন্যাস-খানি রচনা করেন। উপন্যাসখানিতে শিল্পী নবীনচন্দ্রের চেয়ে শিক্ষক নবীনচন্দ্রই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

উপসংহার

আমরা নবীনচন্দ্রের রচনাবলীর আলোচনা শেষ করিলাম। নবীনচন্দ্র শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ও শেষ মহাকবিই ছিলেন না, চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি নানা দিক দিয়া যুগাতিগ পুরুষ ছিলেন, তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে যে রবীন্দ্র-ভাবধারারও

পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায়, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। এ কথাও সত্য যে, স্বদেশী যুগে যে সব খ্যাপা তরুণের দল স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধবের রচনা হইতেই আত্মত্যাগ ও মনুষ্যত্বের প্রেরণা লাভ করিতেন। নবীনচন্দ্রের রচনাকে দেশ-কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার ফলে এবং সেকালের সঙ্গে এ কালের আত্মিক সম্পর্ক ছিন্ন হইবার ফলেই একালের সমালোচকেরা নবীনচন্দ্রের কাব্য বিচারে বিভ্রান্ত হইয়া থাকেন। আবার এযুগের কোন কোন পল্লবগ্রাহী সমালোচক নবীনচন্দ্রের ন্যায় যুগের অগ্রগামী কবির দৃষ্টিকেও সংকীর্ণ ও অতীতমুখী বলিয়া মনে করেন। অবশ্য সেকালের মনীষিগণও নবীনচন্দ্রের কাব্যের আলোচনা করিতে গিয়া তাঁহাকে 'a poet of Hindu revival' বলিয়াছেন। কিন্তু 'হিন্দু' বলিতে শুধু একটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বোঝায় না, একটা বিশেষ দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান অধিবাসিবৃন্দকেও বোঝায়, আর এই অর্থেই খ্রীস্টান সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব নিজেকে 'ঈশাপন্থী হিন্দু' বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম ও নবীন যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সে ধর্ম্ম যথার্থ ভারতধর্ম্মও বটে, আবার বিশ্বধর্ম্মও বটে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ধর্ম্মের অর্থ সকল বৃত্তির (শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী)' অনুশীলন, সামঞ্জস্য ও ঈশ্বরমুখীনতা। আবার তাঁহার মতে লোকহিতই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নবীনচন্দ্রও এক উদার, বিশ্বজনীন মানবধর্ম্মের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র ছিলেন পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান, আবার তিনি ছিলেন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও প্রেমধর্ম্মের উদ্গাতা, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার কবি।

নবীনচন্দ্রের রচনাবলী হইতে যদি একালের আমরা মনুষ্যত্বের দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারি এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকার ও নৈরাশ্যের মধ্যেও যদি আলোক ও আশার ক্ষীণ রেখা দেখিতে পাই, তবেই দিব্যধামবাসী কবি আমাদের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন। হে কবি, দুঃখের ঘনতমসাবৃত রজনীর মধ্যেও তোমার এবং তোমার ন্যায় বরেণ্য মনীষীদের আত্মা আমাদের মধ্যে জায়মান হউক, সমবেত কণ্ঠে ইহাই প্রার্থনা করি। পরিশেষে বৈদিক ঋষির ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বলি—

'তোমাদের মন্ত্র এক হউক, তোমাদের সমিতি সকলের মিলন-ক্ষেত্র হউক, তোমাদের মন সমান হউক, তোমাদের চিত্ত সম্মিলিত হউক। বিধাতা তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে মিলিত করিয়াছেন।......তোমাদের সকলের আকূতি এক হউক, তোমাদের হৃদয় পরস্পর মিলিত হউক, তোমাদের মন পরস্পর সংযুক্ত হউক। এইভাবে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক।'

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী

কবিবর নবীনচন্দ্র সেন

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ। এই যুগকে 'প্রাচ্য-প্রতীচ্য সন্ধিযুগ' বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলার ভবিষ্যতের ইতিহাসকার কখনই এ যুগের প্রভাব বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। যে জাতি আপনার সভ্যতা ও জ্ঞান-গৌরব বিস্মৃত হইয়া ছয়শত বৎসর জড়ের ন্যায় পড়িয়াছিল, একটা নবীন সভ্যতার প্রখর কিরণ তাহার ঘুমন্ত চোখের উপর পড়িয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। তাড়িৎপ্রবাহ-স্পর্শ তাহার অসাড়-জড়দেহে একটা প্রাণের উত্তেজনা আনিয়া দিল। বাঙ্গালীর জাগরণ-প্রভাতের এই দিন সামান্য গৌরব-মণ্ডিত নহে। নবীন-জাতীয়তা-গঠনের ভিত্তি এই দিনেই স্থাপিত হইয়াছিল। এই গঠনের যুগে বাঙ্গালীর অনেক প্রতিভাশালী কবি, মনস্বী লেখক, দূরদর্শী নাট্যকার, অক্লান্ত সমাজ-সংস্কারক, সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী, চিন্তাশীল রাজনৈতিক ও মহাপ্রাণ ধর্মসংস্কারকের জন্ম হইয়াছে। জগতের অন্যান্য কার্যের ন্যায় একটা জাতীয় উত্থান ও পতনও বিধাতার নির্দিষ্ট নিয়মেই হইয়া থাকে। অতএব এই সকল মহাপুরুষ নবীন জাতীয় জীবনের ভিত্তিমূল গঠন করিবার জন্য বিধাতা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন ইহাই বলিতে হইবে। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ইঁহাদের অন্যতম। এই গৌরবময় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সন্ধিযুগে নবীনচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল।

বাঙ্গলার সুদূর পূর্বপ্রান্তে চট্টগ্রামপ্রদেশে নবীনচন্দ্রের জন্মস্থান। কালের ন্যায় স্থানও মানব-জীবনের গতি অনেক পরিমাণে নির্দিষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং সমুদ্র-মেখলা-পরিবৃতা, গৈরিক-কিরীটিনী পার্বতী চট্টলভূমি যে কবির জীবনের উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলা চিরকালই কবিজননী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার শ্যামল শস্যক্ষেত্র, জাহ্নবী-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র-বিগলিত সমতলভূমি, পাদবিধৌত নীল-জলরাশি ও রৌদ্ররঞ্জিত নির্মল আকাশ চিরকালই কবির প্রিয় স্থান। কিন্তু চট্টলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটু বিশেষত্ব আছে। তাহার ঝটিকাবিক্ষুব্ধ দুর্নিবার সমুদ্র ও কঠোর মূর্তি দুর্জয় পর্বতমালার ভিতর যে কঠিন সৌন্দর্যের বিকাশ পাইয়াছে তাহা বাঙ্গলার অন্যত্র দুর্লভ। নবীনচন্দ্র লীলাময় পার্বতীমাতার এই কঠিন স্নেহপূর্ণ-বক্ষে পালিত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহার কাব্যে ভাবের যে একটা দুর্দমনীয় বেগ—সৌন্দর্যের যে একটা রুদ্রমূর্তির ছায়া দেখিতে পাই, বাঙ্গলার অন্য কোন কবির সঙ্গীতের ভিতর আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। প্রাচীন কাব্য সাহিত্য গঠনে চট্টগ্রাম নিতান্ত নগণ্য ছিল না। এখনও চট্টগ্রামের জীর্ণ কুটীর অনুসন্ধান করিয়া অনেক পুরাতন রত্নের আবিষ্কার হইতেছে। আধুনিক কালেও নবীনচন্দ্রের ন্যায় কবির জন্ম দিয়া নব যুগের কাব্য-ভাণ্ডারকে চট্টগ্রাম যথেষ্ট ঋণী করিয়াছে। ইহা চট্টগ্রামের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তাঁহার ভিতর এমন একটা অসাধারণ শক্তি থাকে যাহাতে তাঁহাকে অন্য সকল মানুষ অপেক্ষা একটু বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়। এই শক্তি যাঁহার ভিতর থাকে বাল্যকাল হইতেই তিনি তাহার পরিচয় দিয়া থাকেন। বীজ দেখিলেই ভবিষ্যৎ মহাবৃক্ষকে জানিতে পারা যায়। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি যেমন চিরকালই আত্মগোপন করিতে পারে না—প্রতিভা তেমনই স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাধারণ স্থান ও কালের ভিতর এই শক্তি প্রায়ই বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। আপামর সাধারণের জীবন-প্রণালী যে একটানা ভাবে চলিয়াছে, প্রতিভাশালীর জীবন সেই পুরাতন খাতে চলিতে পারে না। নিজের অসাধারণত্ব সে কোন না কোনরূপে প্রকাশ করিবেই। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য হন যে, অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তিই বাল্যকালে বিশেষ সুবোধ বালক বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। চিরকালই ত সুবোধ বালকের দল জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছে। চিরকালই ত তোমার আমার মত দশজন অবস্থার সঙ্গে মিল দিয়া বাল্যজীবন শেষ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু

এই সমস্ত প্রতিভাকে সাধারণ স্থান ও কাল ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। চারিদিকের 'একঘেয়ে' অবস্থার সহিত তাঁহাদের অসাধারণ প্রকৃতির 'খাপ' খায় নাই। তাই তাঁহাদের প্রকৃতি এইরূপ একটা বিশেষত্বের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। নবীনচন্দ্রও বাল্য-কালে অতি দুরন্ত ছিলেন। বিদ্যালয়ে তাঁহার নাম ছিল দুষ্ট-শিরোমণি (Wicked the Great)। প্রতিবাসিগণ ও সহাধ্যায়ীবর্গ তাঁহার অত্যাচারে সন্ত্রস্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কেবলমাত্র এই দুর্দমনীয়তার ভিতরেই আত্মপ্রকাশ করিয়া নিরস্ত হয় নাই। উত্তরকালে যে মহাকার্যের জন্য তিনি নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন, তরুণ বয়সেই তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কবিতা ও সঙ্গীত রচনায় তখন হইতেই নবীনচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সেই সময় স্থানীয় বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনেক সভাতেই নবীনচন্দ্রের কবিতা শুনিয়া অনেকে মুগ্ধ হইতেন। ভবিষ্যতে যে চন্দনবৃক্ষের সৌরভে সমস্ত দেশ মুগ্ধ হইবে, এইরূপে চট্টগ্রামের এক নির্জন পার্বত্য প্রদেশে তাহার বীজ উপ্ত হইতেছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসেন। প্রকৃতি দেবী এতকাল যাহাকে সমুদ্র ও পর্বতের কঠিন সৌন্দর্যের ভিতর গড়িয়া তুলিতেছিলেন, এইবার বিধাতা তাহাকে যেন কর্মশালের কঠোর পরীক্ষার ভিতর নিক্ষেপ করিলেন। এই সময় কলিকাতার সমাজ ও সাহিত্যে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল। এক নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় সমস্ত দেশের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতীচ্য সভ্যতার প্রথম খরজ্যোতিঃ আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য সমস্তকেই এক নবীন আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিয়া-ছিল। বহুদিন যাহারা অন্ধকারের ভিতর জড়ের ন্যায় পড়িয়া ছিল, তাহাদের সম্মুখে এক আশ্চর্য আলোকরশ্মি প্রকাশিত হইয়াছিল। সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম—সর্বত্রই এই নবভাবের প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকগণ প্রতীচ্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসে সত্যের আস্বাদ পাইয়া তাহা প্রচার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রচারের ফলে বঙ্গভাষা ও বঙ্গ সাহিত্য প্রতীচ্য সাহিত্যের ভাব ও সৌন্দর্যের সংস্পর্শে আসিয়া এক নূতন পথে চালিত হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষিগণ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে বঙ্গভাষাকে ভূষিত করিতেছিলেন। মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের ন্যায় কবিগণ প্রতীচ্যের কাব্যশ্রীর গৌরবে বাঙ্গলা কাব্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তুলিতেছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সময়ই একেশ্বরবাদ ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বহুদিনকার সঞ্চিত সংস্কার মুক্ত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি উদারভাবের আন্দোলন জাগাইয়া তুলিতে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায় সমাজ-সংস্কারক বিধবা-বিবাহ প্রচার ও বহু বিবাহ নিবারণের জন্য সমস্ত প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে অসীম দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়াছিলেন। নবীন-চন্দ্রের হৃদয়ে যে কবিত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, এই নবভাবের উর্বর ক্ষেত্রের মধ্যে তাহা বর্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারই প্রথম ফল অবকাশ-রঞ্জিনী। অবকাশ-রঞ্জিনী আবার ইংরাজী শিক্ষিত কবির তরুণ বয়সের রচনা। তাই অবকাশ-রঞ্জিনীতে আমরা যুগধর্ম, যৌবনধর্ম এবং ইংরাজী কাব্যের নূতনত্বের ছায়া এই সমস্তই পূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাই। সমসাময়িক সমাজের পুঞ্জীকৃত অচল সংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি সরল সহানুভূতি, অনাথা বিধবার দুঃখে করুণ হৃদয়ের অশ্রুজল, অবকাশ-রঞ্জিনীতে এ সমস্তই আমরা লক্ষ্য করিতে পারি। আবার নিরাশ ও ব্যর্থ প্রণয়ের তীব্র হা-হুতাশ, প্রতীচ্য কাব্যের Romantic Love এর অনুকরণে পূর্বরাগ ও অনুরাগের কোমল উচ্ছ্বাস, এ সমস্তও অবকাশ-রঞ্জিনীর পত্রে পত্রে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যে গীতিকাব্য তখনও খুব পূর্ণতা লাভ করে নাই। ইংরাজীতে Lyric বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাকেই যদি আমরা গীতিকাব্য নামে অভিহিত করি, তবে বলিতে হয় যে, বাঙ্গলাকাব্যে কোনদিনই প্রকৃত Lyric ছিল না। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির অমূল্য পদাবলী এক হিসাবে Lyric বটে, কিন্তু তাহা ভিন্ন ঈশ্বর গুপ্তের সময় পর্যন্ত এই বিপুল মধ্যযুগের কোথাও আমরা গীতিকাব্যের লক্ষণ দেখিতে পাই না। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাও খাঁটী Lyric নহে। তৎপূর্ববর্তী কবি ও পাঁচালীরই তাহা এক উচ্চ সংস্করণ বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনই ইউরোপীয় আদর্শে বাঙ্গলার প্রথম গীতিকাব্যের রচনা করেন। ব্রজাঙ্গনা ও চতুর্দশপদী কবিতাবলীই বাঙ্গলার প্রথম গীতিকাব্য, একথা বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। অবকাশ-রঞ্জিনী মধুসূদনের গীতিকাব্যের অনুকরণেই রচিত। বলিতে গেলে গীতিকাব্য হিসাবে 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র স্থান খুব উচ্চ নহে। গীতিকাব্যের সেই সংক্ষিপ্ত গতি, ভাবের নিবিড়তা, সৌন্দর্যের গাঢ়তা ও ছন্দের সহজ লঘুতা অবকাশ-রঞ্জিনীতে নাই। তাহা Epic-এর মন্থর গতি ও সৌন্দর্যের বিস্তৃতিকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও অবকাশ-রঞ্জিনীর মূল্য নিতান্ত সামান্য নহে। অবকাশ-রঞ্জিনীর কবিতার ছন্দে যে একটা তেজস্বিতা ও ভাষার সরল প্রবাহ দেখিতে পাই, এক হেমচন্দ্র ভিন্ন সমসাময়িক কোন কবিতেই আমরা তাহা পাই না। ভবিষ্যতের 'পলাশী' ও 'কুরুক্ষেত্রে'র কবির যে উদাত্ত গম্ভীর রাগিণীতে আমরা মুগ্ধ হইয়া পড়ি, অবকাশ-রঞ্জিনীতেই যে তাহার বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু তখনকার নব্যবঙ্গে একটি ভাব সকলকে অতিক্রম করিয়া প্রবলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সমগ্র সমাজ ও সাহিত্যের ভিতরে নানা ভাবে নানা আকারে সেই একটি ভাবকেই আমরা প্রকাশ পাইতে দেখি। সেটি স্বদেশ-ভক্তি বা স্বদেশ-প্রেম। এই দেশভক্তি জিনিসটা যে অন্ততঃ বঙ্গসাহিত্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংঘর্ষণের ফল, এই নিষ্ঠুর সত্য আমাদিগের অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইংরাজকবি ও ঐতিহাসিকের গভীর স্বদেশ-প্রেম যখনই আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখনই আমরা আমাদের জাতীয় অধঃপতন ও জন্মভূমির পূর্বগৌরব যেন স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিলাম। তখনই যেন দেশমাতৃকার প্রতি যে বহুশত বৎসরের অনাদর, তাহাই সহস্র ধারায় ভক্তিরূপে উৎসারিত হইয়া উঠিল। নব্যবঙ্গের প্রথম কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভিতরেই আমরা দেশভক্তির বীজ দেখিতে পাই। রঙ্গলালে এই ভাব অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল। নবীনচন্দ্র যখন কাব্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করিলেন, তখন ত দেশভক্তির পূর্ণ জোয়ার বহিয়াছিল। মধুসূদনের ভেরীনিনাদ সবেমাত্র নীরব হইয়াছিল। দীনবন্ধুর নাটকাবলী তখনও বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে দর্শকগণকে দেশের দুঃখে ও দুর্দশায় ব্যথিত করিয়া তুলিতেছিল। তখনই সবেমাত্র 'বঙ্গদর্শনে'র গৌরবময় নবপ্রভাত আরম্ভ হইয়াছিল। সেনাপতি বঙ্কিমচন্দ্রের পতাকাতলে স্বনামখ্যাত অনেক মহারথী সমবেত হইয়া বঙ্গসাহিত্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের হৃদয় নবযুগের এই স্বদেশ-প্রেমের স্রোতে পূর্ণ হইয়া গেল। তরুণ কবির অন্তর স্বদেশের দুঃখে ও অধঃপতনে ব্যথিত হইয়া উঠিল। 'অবকাশ-রঞ্জিনী'তেই আমরা এই দেশভক্তির বহু পরিচয় পাই। কিন্তু 'পলাশীর যুদ্ধ'ই এই স্বদেশ-প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর আম্রবনে ভারতের যে ভাগ্য নির্ণয় হইয়াছিল, জগতের ইতিহাসে তাহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহা শুধু ইংরাজের সঙ্গে বাঙ্গালীর যুদ্ধ নহে—পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের যুদ্ধও নহে; ইহা মানুষের সঙ্গে দৈবের যুদ্ধ—জাতির সঙ্গে বিধাতার যুদ্ধ। পলাশী শুধু কেবল একটা ছোটখাট অস্ত্র পরীক্ষার ক্ষেত্র নহে। ইহা জাতীয় ইতিহাসের একটি বিষাদপূর্ণ অধ্যায়—জাতীয় নাটকের একটি অতি শোকপূর্ণ দৃশ্য। নবীনচন্দ্র এই জাতীয় শোককাব্য লিখিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

লেখনী ধন্য হইয়াছে। জন্মভূমির জন্য যে গোপন ক্রন্দন তাঁহার অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছিল, পলাশীর জাতীয় মহাশ্মশানে বসিয়া তিনি অন্তরের সেই রোদন-সঙ্গীত প্রাণ ভরিয়া গাহিয়া লইয়াছেন। তাই 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য, কেবলমাত্র সিরাজের অশ্রুতে নহে, সমস্ত বাঙ্গালীর অশ্রুজলে ইহার প্রত্যেক পংক্তি সিক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের একটি বিষাদময় দিবসের কাহিনী মাত্র নহে, একটি পরাধীন জাতির সাতশত বৎসরের সঞ্চিত মর্মব্যথা ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। আহত ভুজঙ্গের জ্বলন্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় ইহার প্রত্যেক দীর্ঘশ্বাস যেন হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া দেয়, তপ্ত ধাতুস্রাবের ন্যায় ইহার প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু যে মর্মস্থানে আসিয়া স্পর্শ করে! স্বীকার করি যে, বিজেতা-কীর্তিত ইতিহাস-অবলম্বনে 'পলাশীর যুদ্ধ' লিখিত। ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে হতভাগ্য সিরাজের চরিত্র ইহাতে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁর জন্য কবিকে বেশী দোষ দিতে পারি না। তার জন্য যদি কোন পাপ তাঁহার স্পর্শিয়া থাকে, তবে সিরাজের জন্য যে পবিত্র শোকাশ্রু তিনি বিসর্জন করিয়াছেন, তাহাতেই তাহা ধৌত হইয়া যাইবে। কঠোর ঐতিহাসিক কবিকে ক্ষমা করিতে না পারেন, কিন্তু বাঙ্গলার প্রত্যেক হৃদয়বান নরনারীই 'পলাশী'র কবিকে আনন্দের সঙ্গে ক্ষমা করিবেন ইহা আমরা নিশ্চয় জানি।

'পলাশীর যুদ্ধ'ই নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্য। নবযৌবনের আরম্ভে এই কাব্য রচিত হইয়াছিল। তাই নবযৌবনের যে একটা দুর্দমনীয় ভাবের বেগ—তাহা ইহার ভিতর আমরা অনুভব করিতে পারি। অমর বঙ্কিমচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনাকালে ইহাকে বায়রনের কবিতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিকই বায়রনের কবিতায় তাঁহার দুর্জয় মনোবেগ যেরূপ জ্বালাময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে দেখি 'পলাশীর যুদ্ধে'ও কবির দুর্জয় স্বদেশপ্রেম তেমনি জ্বালাময়ী ভাষাতেই প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কাব্যজগতে 'পলাশীর যুদ্ধের' স্থান অনেক উচ্চে। পলাশীর নবীন চিত্রকর সৌন্দর্যের সৃষ্টিতে যেরূপ অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়াছেন তাহা অনুকরণীয়, এক একটি Stanza যেন এক একটি সুন্দর চিত্র। সমগ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' যেন একটি মাত্র সূত্রে গ্রথিত ফুলসমষ্টির একখানি মালা। জলস্রোতের ন্যায় ইহার ঝঙ্কার যেন কবির হৃদয় হইতে স্বতঃই বাহির হইয়া পড়িতেছে। কোথাও অস্বাভাবিকতা বা কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। ঐতিহাসিক কাব্যরচনা বড় কঠিন কাজ। সেই অতি কঠিন কার্যে হস্তার্পণ করিয়া রঙ্গলাল তেমন কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু নবীনচন্দ্র সেই দুষ্কর ব্রত সুন্দররূপে উদ্‌যাপন করিয়াছেন। বাঙ্গালীও কবির উপযুক্ত সম্মান করিতে ত্রুটি করে নাই। এক 'পলাশীর যুদ্ধে'ই নবীনচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়াছিলেন।

কবির দ্বিতীয় কাব্যসৃষ্টি 'রঙ্গমতী'। 'পলাশীর যুদ্ধে'র ন্যায় 'রঙ্গমতী'ও জাতীয়তার কাব্য। কিন্তু 'পলাশী' অতীতের জন্য বিলাপ, 'রঙ্গমতী' ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা। 'পলাশী' অতীতের দিকে ব্যাকুল দৃষ্টিপাত, 'রঙ্গমতী' ভবিষ্যতের আশাপূর্ণ প্রতীক্ষা। 'পলাশী' গৌরব-রবির অস্তাচল দৃশ্য—'রঙ্গমতী' নবোদিত ঊষার আবাহন-কাহিনী! 'পলাশীর' মহাশ্মশানে যে শোককাব্যের অভিনয় হইয়াছিল, 'পলাশীর যুদ্ধে'র তরুণ কবি সেই বিলাপ গাথা উচ্চকণ্ঠে গাহিয়াছেন। বিশ্বাসঘাতক দেশবৈরীর যে মহাপাপের ফলে জন্মভূমি বিজেতার পদতলদলিত হইয়াছিল, যে পাপের ফল তাহাদের বংশধরগণ এখনও পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছে, 'পলাশীর যুদ্ধ' সেই মহাপাপের জন্য অনুতাপের অশ্রুজল। কিন্তু নবযৌবনের হৃদয়াবেগ যখন কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল, জাতীয় দুর্দশার শোকের মোহ যখন কিয়ৎপরিমাণে শান্ত হইয়াছিল, তখন কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অতীতের জন্য শুধু বিলাপে কোন ফল নাই। অতীতের বিলাপের প্রয়োজন আছে—আত্মপাপ ও হীনতাকে বুঝিবার জন্য ; আপনার মলিনতা ও কলঙ্ককালিমা অনুতাপের অশ্রুজলে ধুইয়া ফেলিবার

জন্য। কিন্তু জাতীয় দুর্দশা মোচনের জন্য—জাতীয় উত্থানের সূচনার জন্য, শুধু অতীতের বিলাপ হইবে না—তার জন্য ভবিষ্যতের ভিত্তিমূল রচনা চাই ; ভবিষ্যতে যে দেশমাতৃকার আবাহন করিতে হইবে, তাঁহার জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা চাই। 'রঙ্গমতী'র সেই অতীত বাঙ্গালী রাজ্য ; জলস্থলে বাঙ্গালী বীরের সেই ভীষণ অনলক্রীড়া ; বর্মাবৃত, নিষ্কোষিত-কৃপাণ, পর্তুগীজদমী, সিংহশিশু বীরেন্দ্র বিনোদ ; বীর-প্রণয়িনী, স্বপ্ন-সুন্দরী কুসুমিকা ; প্রভুভক্ত, জ্ঞানী, বৃদ্ধ শঙ্কর, সমস্তই সেই ভবিষ্যতের আশার তুলিকাপাতে চিত্রিত। রঙ্গমতী কেবল একটি সপ্তদশ শতাব্দীর রাজ্যধ্বংসের চিত্র নহে—কেবল বিয়োগান্ত নাটকের একখানি করুণ দৃশ্যপট নহে। ইহা ভবিষ্যতের অরুণোদয়-রেখাপাতে রঞ্জিত, আশার সুবর্ণ-জ্যোতিঃতে মনোহর, দূরদর্শী কবি-প্রতিভার আশ্বাসবাণীতে পূতোজ্জ্বল। অধঃপতিত জাতির সম্মুখে আদর্শের দর্পণ ধরিবার জন্যই ত কবির প্রয়োজন, নিমজ্জমান পথহারা জাতীয় তরণীকে ধ্রুবতারা দেখাইবার জন্যই ত কবির আগমন। ভবিষ্যতের সেই আদর্শ—অকূলসাগরে সেই ধ্রুবনক্ষত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যই কবিপ্রতিভা 'রঙ্গমতী' প্রসব করিয়াছে। 'রঙ্গমতী' বিজ্ঞ ব্যক্তির কথায় 'অনাগত বীর ও অনাগত মনুষ্যের কাহিনী', নবীনচন্দ্রের কাব্যেতিহাসে 'রঙ্গমতী' একটি অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

'পলাশীর যুদ্ধ' অপেক্ষা 'রঙ্গমতী'র কাব্য গাঢ়তা লাভ করিয়াছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' কতকগুলি বিভিন্ন চিত্রের একত্র সমাবেশ, সেগুলি একটি নিবিড় ঐক্যের ভিতর তেমন সুন্দররূপে মিশিয়া যাইতে পারে নাই। 'পলাশীর যুদ্ধে'র ঘটনাগুলি ঐতিহাসিক, ব্যক্তি-বর্গ ঐতিহাসিক, তাহারা জ্বলন্ত সত্য—তাহারা স্বাধীন দুর্দান্ত। কবি তাহাদিগকে লইয়া কাব্য গড়িতে গিয়া আপনার প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করা যাইতে পারে না। তাই এই দুর্দান্ত, জীবন্ত সত্যগুলিকে কবি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু 'রঙ্গমতী' কবির মানস-উদ্যান। ইহার প্রত্যেক ফুল পত্র কবির স্বহস্ত রচিত। তাই সুনিপুণ মালীর ন্যায় তিনি এই মানস-উদ্যানকে সুন্দর-রূপে সাজাইতে পারিয়াছেন। আপন মানসী-কন্যাকে ইচ্ছামত অলঙ্কারে ভূষিত করিয়াছেন। তাই রঙ্গমতীর চিত্রিত কার্যপ্রবাহের ইতিহাস এক সুসম্বদ্ধ ঘটনার ভিতর ঐক্যলাভ করিয়াছে। ইহার ভিতর যে মানবজীবন চিত্রিত হইয়াছে—তাহা ছাড়িয়া দিলেও রঙ্গমতী এক বিরাট প্রাকৃতিক কাব্য। চিত্রের চারিদিকে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছায়াপাত করা হইয়াছে, বঙ্গসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। সুন্দরবনের ভীষণ অরণ্যভূমি, চট্টলের বিচিত্র কঠিন পার্বত্য সৌন্দর্য, ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নদীপ্রকৃতির ভীষণ মাধুর্য রঙ্গমতীর ভগ্নাবশেষ, হিন্দুদুর্গের ধ্বংসচিত্রসমূহ, সমস্তই কি এক অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা পার্বতী মাতার বক্ষে প্রতিপালিত নবীনচন্দ্রেরই তুলিকাপাতের যোগ্য। যে গভীর শোকদৃশ্যের ভিতর এই আশাকাব্যের দৃশ্য শেষ হইয়াছে তাহার চারিদিকে এই ভীষণ সৌন্দর্যরাশি অদৃষ্টরূপিণী 'কাননকালীর' করাল অট্টহাসের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভাবের নিবিড়তায় ও ছন্দের গাম্ভীর্যেও 'রঙ্গমতী'কে আমরা 'পলাশীর যুদ্ধ' হইতে পৃথক বলিয়া বুঝিতে পারি। নবীনের যে কোমল কঠোর সৌন্দর্যচিত্রে, জলদ-গম্ভীর রাগিণীতে বঙ্গবাসীমাত্রেই মোহিত, 'রঙ্গমতী'তেই আমরা তাহা পরিস্ফুটতর হইবার সূচনা দেখি।

যে সময়ে 'রঙ্গমতী' সূচিত হইয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্গদেশে এক নবীন আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। 'অবকাশ-রঞ্জিনী' রচিত হইবার পূর্বকালে বাঙ্গলাদেশের সমাজের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই সময়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংঘর্ষণের ফলে বঙ্গদেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। প্রতীচ্য সভ্যতার স্রোত প্রবলবেগে আসিয়া বঙ্গদেশের উপর আঘাত করিতেছিল। ধর্মে, সমাজে ও সাহিত্যে সর্বত্রই ইহার প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছিল। কিন্তু সকল বিষয়েই প্রয়োগভেদে ভাল মন্দ দুই ফলই হইতে

পারে। গ্রহণ ও অনুকরণ এই দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। একটার ফলে সমাজের উৎকর্ষ সাধিত হয়, অন্যটিতে সমাজ উত্তরোত্তর ধ্বংসের দিকে নীত হইতে থাকে। গ্রহণ জীবলোকের সাধারণ ধর্ম। ভিতরে যে শক্তি আছে শুধু তাহার উপর নির্ভর করিয়াই কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না, বাহির হইতে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবেই। উদ্ভিদ যেমন বাহির হইতে সূর্যালোক ও বায়ু গ্রহণ করিয়া আপনার পরিপুষ্টি সাধন করে, মানুষও তেমনি বাহিরের শিক্ষা ও সাধনা হইতে গ্রহণ করিয়াই আপনাকে গঠন করিয়া তোলে। সমাজের পক্ষেও এই কথাই প্রযোজ্য। যে সমাজ চিরকাল আপনার মধ্যেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহার জীবনীশক্তিই থাকে না। বাহিরের পরিবর্তনের সঙ্গে যে সমাজ আপনার সমন্বয় করিয়া লইতে সমর্থ, সেই সমাজই প্রকৃতরূপে উন্নত হইতে পারে। কিন্তু অনুকরণ ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। 'গ্রহণ' সমাজকে বাঁচাইয়া পরিবর্তন করিতে চায়, 'অনুকরণ' তাহাকে ধ্বংস করিয়াই তাহার পরিবর্তন সাধন করিতে যত্নবান হইয়া উঠে, আপনার ব্যক্তিত্ব লোপ করিয়াই সে বাহিরের সঙ্গে মিশিতে প্রয়াস পাইতে থাকে। যে মূর্খ পিতৃপিতামহের পুরাতন পাকা বনিয়াদের সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়াই নূতন অট্টালিকা নির্মাণের কল্পনা করে, সে যে কেবল পুরাতনকেই ধ্বংস করে তাহা নহে, নূতনকেও হয়ত তাহার গঠন করিবার সামর্থ্য হইয়া উঠে না। পুরাতনকে নষ্ট করিলেই ত চলিবে না ; তাহার ভিতর যে সত্যশক্তি আছে তাহার উপরেই নূতনত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংঘর্ষণের যুগে বাঙলাদেশে এক সময়ে এই সত্যের অপমান করা হইয়াছিল। তাই 'গ্রহণ' ছাড়িয়া 'অনুকরণকেই আশ্রয় করিয়া আমরা ধ্বংসের দিকে নীত হইতেছিলাম। পশ্চিম সূর্যের জ্বলন্ত জ্যোতিতে আমাদের নয়ন ঝলসাইয়া গিয়াছিল ; আমরা আপনাদের মহামূল্য মরকতকেও ফেলিয়া দিয়া, তাহাদের কাচখণ্ডগুলিও আদরে কুড়াইয়া লইতেছিলাম। য়ুনানী সভ্যতার তীব্র-সুরা-পানে আমরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলাম : তাই নিজেদের সুধাভাণ্ডও দূরে ফেলিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত বিষপানের জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। ধর্মে ঔদার্যের পরিবর্তে নাস্তিকতা ও বিশ্বাসহীনতাই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সমাজে স্বাধীনতার স্থানে উচ্ছৃঙ্খলতা ও দাম্ভিকতাকেই আমরা গৌরব বলিয়া মনে করিতেছিলাম। স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলের নামে, স্বদেশ ও স্বজাতিকে আমরা ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেছিলাম। সমাজের কু-সংস্কার দূর করিতে যাইয়া নূতনরূপে কু-সংস্কারের মোহে অন্ধ হইয়াছিলাম। সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতা নাশ করিতে যাইয়া গভীরতর সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার কূপে নামিয়া যাইতেছিলাম। সাম্য ও মৈত্রীর মন্ত্র প্রচার করিতে গিয়া শিক্ষিতের ও অশিক্ষিতের মধ্যে এক নূতন জাতিভেদ সৃষ্টি করিয়া তুলিতে-ছিলাম। বাঙ্গালীর আকাশে পশ্চিমের প্রলয়-ঝটিকার কালমেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। 'রুদ্রের ক্রোধাগ্নি চিহ্ন' যে সেই সমাজ-বিপ্লবের কোলাহলের মধ্যে ক্রমেই পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছিল।

কিন্তু এই বিপ্লবের মধ্যে এক মহাপুরুষ দাঁড়াইয়াছিলেন, যিনি এই প্রলয়ের বজ্র মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন। সেই সমুদ্রমন্থনে যে বিষ উঠিয়াছিল, তাহা পান করিয়া দেবাসুরের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি মহামনস্বী অমর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রতীচ্য সংঘর্ষণের ফলে সমাজে নবভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে বহু পূর্বেই রক্ষণশীল দল দাঁড়াইয়াছিলেন। এই নবভাবের মূলোচ্ছেদ করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সমাজকে এই নূতনত্বের মোহ হইতে টানিয়া তাঁহারা পুরাতনের দিকে লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়েও স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ এই নবভাবের বিপ্লবের বিরুদ্ধে মত প্রচার করিতেছিলেন। নবভাবের এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও দাম্ভিকতা তাঁহাদিগের

শক্তিকে আরও উদ্বোধিত করিয়া দিয়াছিল, কিন্তু তাহারা অসম্ভব সম্ভব করিতে চাহিয়াছিলেন; সময়ের স্রোতকে বর্তমান হইতে অতীতের দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই, তাঁহারা এই বিপ্লবের সমাধানের পরিবর্তে রহস্যকে আরও জটিলতর করিয়া তুলিতেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা দেখিতে পাইয়াছিলেন, বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রাচ্যকে প্রতীচ্য হইতে বিযুক্ত করিয়া নহে,—প্রতীচ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়া নহে,—প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সমন্বয় করিয়াই কেবল এই বিপ্লবের সমাধান হইতে পারিবে। প্রাচ্যের চির সুন্দর সনাতন যে সত্যগুলি আছে, তাহাদিগকে পরম যত্নে রক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্য দিয়াই প্রতীচ্যের নবসত্য গ্রহণ করিতে হইবে, স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে হইবে এবং ভালবাসিয়াই তাহাদিগকে প্রতীচ্য সভ্যতার সম্মুখীন করিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই নূতনভাবে সমাজ ও ধর্মের সংস্কারে তাঁহার প্রতিভাকে চালিত করিয়াছিলেন। স্বদেশ ও স্বধর্মের দিকে প্রতীচ্য শিক্ষিতের দৃষ্টি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সর্বলোকপূজ্য নিষ্কামধর্ম মহিমময় বাসুদেব কৃষ্ণের চরিত্রকথা, হিন্দু ধর্মের উদার মত ও সমাজতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও প্রচারে তাঁহার জীবনের উৎকৃষ্টাংশ উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল, প্রতীচ্যকে ত্যাগ করিয়া নহে, পরন্তু তাহাকে সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অসাধারণত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল।

এই যুগকে 'হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগ' বলা যাইতে পারে। নবীনচন্দ্রকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে হইলে এই পুনরুত্থানের যুগের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। এই 'পুনরুত্থানের আন্দোলনে'র বঙ্কিমচন্দ্র মস্তক, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি ইহার বাহু এবং নবীনচন্দ্র ইহার হৃদয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইহার অস্ত্র, নিষ্কামধর্ম ইহার মন্ত্র এবং "নবজীবন" ও "প্রচার" প্রভৃতি ইহার বাহন। নবীনচন্দ্র এই "পুনরুত্থানের" কবি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে মন্ত্র প্রচার করিয়াছিল, চন্দ্রনাথ ও অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতির জ্ঞান যাহার ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল, নবীনচন্দ্রের কবিত্ব কাব্য-সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া তাহাকেই মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। রঙ্গমতীর কবিকে আমরা 'প্রতিষ্ঠা'র অন্বেষণে ব্যস্ত দেখিয়াছি, অতীতের বিলাপকে ত্যাগ করিয়া ভবিষ্যতের আশার জন্য ব্যাকুল দেখিয়াছি। 'পুনরুত্থানে'র কবির এই লক্ষ্য আরও স্থির হইয়াছে। 'পুনরুত্থানে'র কবি এই ভবিষ্যতের আদর্শকে এক নূতন আলোকে দেখিতে পাইয়াছেন। সনাতন ধর্ম, অক্ষয় কর্ম ও অমর সাধনার উপর এই জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইতিহাসের আলোকে প্রাচীন আর্য-গৌরবের যে চিত্র আমরা দেখিতে পাই, মহাভারতের চিত্রই তন্মধ্যে সমুজ্জ্বল। মহাভারত আর্যসভ্যতার সর্বাপেক্ষা গৌরবমণ্ডিত যুগ। উদার নিষ্কামধর্ম ও কৃষ্ণচরিত্রের অতুলমহিমায় এই মহাভারতের যুগ আলোকিত। 'পুনরুত্থানে'র কবি নবীনচন্দ্র 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' 'প্রভাসে' এই মহাভারতের গৌরবময় যুগকেই চিত্রিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কবি প্রতিভার দিব্য আলোকে মহান নিষ্কামধর্ম ও মহিমময় কৃষ্ণচরিত্রকে আমাদের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, সুদূর অতীতের অস্পষ্ট কুয়াসান্ধকারের মধ্যে আর্য ও অনার্যের সেই ভীষণ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ; বৈদিক যজ্ঞীয় ধূম-কলুষিত সনাতন-আর্য-ধর্মের সেই শোচনীয় অবনতি; স্বার্থপর ক্ষমতালোভী ব্রাহ্মণের সেই গভীর অধঃপতন, বাসুদেব-কৃষ্ণের অপূর্ব-জীবন-কাহিনী; সমুন্নত উদার গীতাধর্মের সেই সাধনা ও প্রচার; জ্ঞানরূপী ব্যাস, কর্মরূপী অর্জুন ও ভক্তিরূপিণী সুভদ্রার সেই অপূর্ব সম্মিলন; ভারতময় হিংসা ও অশান্তির সেই লেলিহান শিখা কুরুক্ষেত্রের বক্ষে প্রজ্জ্বলিত সেই ভীষণ সমরবহ্নি, নির্বেদের শোক, শ্মশানে চিতাভস্মের উপরে এক ধর্মরাজ্যের সেই মহাপ্রতিষ্ঠা; ভারতময় কৃষ্ণনাম ও ধর্মরাজ্যের সেই প্রচার; একই ভক্তির বেদীমূলে আর্য ও অনার্যের সেই মহা সম্মিলন—সকলই

কি মহান কল্পনা ও দূর প্রসারিণী দৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। মহাভারতের মহান কাহিনীতে নূতন কাব্য চিত্রে প্রতিফলিত করা অতি কঠিন কার্য। সেই দুর্গম বিরাট অরণ্যের ভিতর পথ কাটিয়া লওয়া বড়ই দুরূহ ব্রত। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রও প্রথমে নবীনচন্দ্রের এই দুষ্কর ব্রতের সফলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু যে প্রতিভা 'পলাশীর যুদ্ধে' জয়-লাভ করিয়াছিল 'কুরুক্ষেত্রে'র মহাতীর্থ হইতেও সেই প্রতিভা দেবপ্রসাদ নির্মাল্য লাভ করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছে। অতীতের অন্ধকার হইতে মহাভারতের প্রাণময়, আলোকময় রাজ্যকে আমাদের সম্মুখে আনিতে তিনি সম্পূর্ণই কৃতকার্য হইয়াছেন। কোন কোন, অতি সতর্কবুদ্ধি, ধর্মভীরু পণ্ডিতব্যক্তি নবীনচন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন, মহাভারতের চিত্র বিকৃত করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু হায়, কবি প্রতিভা সকল সময়ে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসরণ করিয়া চলে না। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের বুদ্ধির ন্যায় সেই বুদ্ধি কালের সঙ্কীর্ণতার ভিতর বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। ক্ষুদ্র ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া কবি-প্রতিভা যে অনন্তকাল ও অনন্ত দেশের ভিতর ধ্যানমগ্ন হইয়া যায় ইতিহাসের সতর্কবুদ্ধি তাহাকে কল্পনায়ও আনিতে পারে না। 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' মহাভারতের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র অতীতেরই গৌরব চিত্র নহে, তাহা দূরাগত ভবিষ্যতের দিব্যালোকপাতে রঞ্জিত ভূত ও ভবিষ্যত, গত ও অনাগত, জাহ্নবী ও যমুনার সম্মিলনে পবিত্র প্রয়াগ মহাতীর্থ। যাহা গিয়াছে তাহার গৌরব, যাহা আসিবে তাহার আশায় আলোকিত। কেবলমাত্র সঙ্কীর্ণ অতীতের ভিতর এই মহাচিত্র বদ্ধ নহে ; ইহা অতীত ও বর্তমানকে অতিক্রম করিয়া ভবিষ্যতের অনন্ত আদর্শকে স্পর্শ করিয়াছে। নিষ্কাম ধর্ম ও অক্ষয় ধর্ম সাধনার উপর এই 'জাতীয় মহাকাব্যে'র ভিত্তি গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। যে 'মহাভারত'-চিত্র কবি আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা কবে আসিবে জানি না, কিন্তু একথা নিশ্চয় যে ইহা জাতীয় জীবনের অমর আদর্শ,—লক্ষ্যহারা জাতীয় তরণীর সম্মুখে ধ্রুবতারার ন্যায় চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। কি উদার ধর্ম, কি অমর বীর্যের উপর এই মহান অতীতের কল্পনা! 'কুরুক্ষেত্রে'র মহাতীর্থের উপর 'মহাভারতে'র উপর মহান্ চিত্র—ধর্মরাজ্যের যে মহাপ্রতিষ্ঠা.. তাহা কি গম্ভীর, কি মর্মস্পর্শী, কি আশার আলোকে উজ্জ্বল!

"উঠিল সে অগ্নি হতে ত্রিভুবন আলো করি
মহাভারতের মূর্ত্তিমাতা রাজরাজেশ্বরী
নব ধর্ম্ম-বেদিমূলে বসিয়া দেবতাগণ
আর্য্য অনার্য্যের ধ্যানে, বেদীবক্ষে নিরুপম
নিষ্কামের মহামূর্তি, তদুপরি বিরাজিতা
জননী আনন্দময়ী অতুলা প্রতিভান্বিতা।
বিদগ্ধ অধর্ম্মমন, রক্তবর্ণ কলেবর ;
অর্দ্ধেন্দু-কিরীট শিরে পাশাঙ্কুশ ধনুঃশর
সমরাস্ত্র, শাসনাস্ত্র হইয়াছে শোভমান
চারিভুজে চারি দিকে, ত্রিনেত্র ত্রিকালজ্ঞান।
ধর্ম সম্রাজ্ঞীর মুখ অনন্ত মহিমা-ছবি,
ভাসিল প্রভাতাকাশে যেন শান্ত বালরবি।
অনন্ত মানবব্যাপী ভবিষ্যত, বর্ত্তমান,
নয়নে আনন্দ অশ্রু গাইতেছে কৃষ্ণনাম।"

'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' কবির পরিণত বয়সের সৃষ্টি। যে কবিত্ব অবকাশ-রঞ্জিনীতে উন্মেষিত, 'পলাশীর যুদ্ধে' ও 'রঙ্গমতী'তে পরিস্ফুট হইয়াছিল, 'রৈবতক',

'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' তাহাই পূর্ণ বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্রোতস্বতী পর্বত-সানুমূলে তীব্র বেগে বহিয়াছিল, তাহাই এখানে বিশাল বেগে গ্রাম-জনপদ প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ছন্দের গাম্ভীর্য ও ঝঙ্কার, মধুসূদনের কাব্য ছাড়া আর কোথাও আমরা দেখিতে পাই না। গভীর সমুদ্র-কল্লোলের ন্যায় ইহা আমাদের কর্ণে আসিয়া আঘাত করে, যে তুলিকা স্পর্শে এই বিশাল দূরব্যাপী সৌন্দর্য চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন মাইকেল এঞ্জেলো বা ফিডারের অনুপযুক্ত নহে। মহাভারতের বিরাট ঘটনাস্তূপ কবির অসামান্য-গঠনশক্তিবলে এক অপূর্ব কাব্যসৃষ্টির ভিতর সঙ্গতি লাভ করিয়াছে। 'রৈবতকে' এই মহানাটকের আরম্ভ, এখানে নায়কগণ একে একে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন। এইখানেই ধীরে ধীরে মহাভারতের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে। 'কুরুক্ষেত্রে' কর্মের পূর্ণতা। ভারতব্যাপী যুদ্ধানল ও অধর্মের মধ্যে মহাভারতের মহাপ্রতিষ্ঠা হইতেছে। 'প্রভাসে' এই মহানাটকের অবসান, একে একে সমস্তই 'লীলাশেষে' রঙ্গভূমি হইতে অদৃশ্য হইতেছে, সূর্য অস্ত যাইতেছে, কেবলমাত্র ভবিষ্যত আশার সুবর্ণ কিরণ অস্তাচল রক্তিম করিয়া তুলিয়াছে, কাব্য-চিত্রিত চরিত্রগুলি যেন এক একটি জীবন্ত সত্যের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কৃষ্ণ ও দ্বৈপায়ন, রুক্মিণী ও সত্যভামা, উত্তরা ও অভিমন্যু, শৈলজা ও সুলোচনাকে যেন আমাদের চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াই আমরা আনন্দে বিহ্বল ও ভক্তিতে প্রণত হইয়া পড়ি, এই অধঃপতিত জাতির সম্মুখে যে প্রতিভা সুভদ্রার মত জননী ও পত্নী, অভিমন্যুর মত স্বধর্মপালক পুত্র ও অর্জুনের মত কর্মবীরের আদর্শ ধরিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট আমরা চিরকালই ঋণী হইয়া থাকিব সন্দেহ নাই। এই জাতীয় মহাকাব্যের রত্নহারে 'কুরুক্ষেত্র' আবার মধ্যমণি। 'কুরুক্ষেত্র' কেবলমাত্র নবীনচন্দ্রেরই শ্রেষ্ঠ কাব্য নহে, বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্যে ইহা অতুলনীয়। 'কুরুক্ষেত্র' যে কোন মহাকবির গৌরবস্বরূপ হইতে পারিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেকে নবীনচন্দ্রকে 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি বলিয়াই জানেন। কিন্তু 'কুরুক্ষেত্র'ই আমাদের মনে নবীনচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গৌরব. 'পলাশীর যুদ্ধে'র তরুণ কবির কণ্ঠে যে উদ্দীপনার সঙ্গীত উঠিয়াছিল কুরুক্ষেত্রের গম্ভীর ঝঙ্কারের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। 'পলাশী'র কবির দুর্জয় হৃদয়াবেগে আগ্নেয়গিরির মত বাহির হইয়া পড়ে—জ্বালাময়ী বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ইহার জ্যোতি নয়নকে ঝলসাইয়া দেয়। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের সঙ্গীত ঝঙ্কার গম্ভীর-মেঘ-ঝঙ্কার তুল্য। ইহার কবিত্ব আবাতাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় বহুদূর বিস্তৃত—শান্তিময়—স্থির—অচঞ্চল, হৃদয়ে কি মহান্ গাম্ভীর্যের ছায়া সঞ্চার করিয়া দেয়। 'পলাশী' তরুণ হৃদয়ের রক্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলে, কুরুক্ষেত্রের পরিণত কবিত্ব হৃদয়কে গম্ভীর সৌন্দর্যের রসে ডুবাইয়া দেয়। 'পলাশী'র তরুণ কবির অঙ্কিত চিত্র বর্ণের উজ্জ্বলতায় নয়নকে মুগ্ধ করিয়া দেয়—কুরুক্ষেত্রের দক্ষশিল্পীর অঙ্কিত চিত্র কলাকৌশলের পূর্ণ উৎকর্ষ, সমস্ত হৃদয় তাহার মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করে। কবির 'রৈবতক', 'প্রভাস' ও 'কুরুক্ষেত্র' পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় বাঙ্গলাদেশে সমাদৃত হয় নাই, তাহা আমরা জানি। কিন্তু জগতের অনেক মহাকবিকেই তাঁহাদের সমসাময়িক সমাজ বুঝিতে পারে না—তাঁহারা তাঁহাদের সময়ের বহুপূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। মহাকবি মিলটনকেও সামান্য মূল্যে 'প্যারাডাইস্ লস্টে'র স্বত্ব বিক্রয় করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কবির সৃষ্টি কখনও নিষ্ফল হয় না। যে সত্য ও সৌন্দর্যের দান কবি রাখিয়া যান—তাহা অবিনশ্বর। তাই আমাদের আশা আছে নবীনচন্দ্রের এই কাব্যত্রয় আধুনিক বাঙ্গালীর নিকট সমাদর লাভ না করিলেও ভবিষ্যতের বাঙ্গালী ইহার গৌরব নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন।

'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কবি নিজের মধ্যেই আবদ্ধ, নিজের সুখ-দুঃখের বোঝা লইয়াই তিনি বিব্রত, সমাজ ও দেশের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে বটে; কিন্তু তাহা আত্ম-

প্রেমেরই নামান্তর—আত্মপ্রেমেরই পারিপার্শ্বিক মাত্র। আত্মপ্রেমেরই আলোকে তরুণ কবি দেশকে যতটুকু দেখিতে পাইয়াছেন ততটুকুই তাহার কথা বলিয়াছেন, তাই যৌবনের সুখ-দুঃখ, পূর্বরাগ ও বিরহের কোমল উচ্ছ্বাস, তরুণ হৃদয়ের বেদনা ও নৈরাশ্যের কাহিনী—এক কথায় নিজের ছোট জগতের মধ্যেই 'অবকাশ-রঞ্জিনী'র কবি অধিকতর আবদ্ধ। কিন্তু 'পলাশী' ও রঙ্গমতীর কবি স্বার্থকে অনেকটা অতিক্রম করিয়াছেন। নিজেকে ছাড়িয়া দেশের প্রতি তাঁহার প্রেমের স্রোত সম্পূর্ণ ফিরিয়া গিয়াছে। নিজের দুঃখ ভুলিয়া দেশের দুঃখেই পলাশীর কবি কাঁদিয়াছেন। নিজের দুঃখ ভুলিয়া মাতৃভূমির গৌরব ও আদর্শ কল্পনাতেই 'রঙ্গমতী'র কবি আনন্দ পাইয়াছেন। 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে'র কবির হৃদয় আরও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তখন কবি সম্পূর্ণরূপেই দেশের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছেন। জাতীয়-জীবনের অক্ষয়-ভিত্তি-রচনাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়াছে। জাতীয়-জীবনের অমর আদর্শস্থানেই তাঁহার দূরপ্রসারিণী দৃষ্টি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। 'পলাশী' ও 'রঙ্গমতী'র কবি বঙ্গের কবি, কিন্তু 'কুরুক্ষেত্রের' ও 'রৈবতকে'র কবি সমগ্র ভারতের। মহাভারতের অমর আদর্শেই প্রৌঢ় কবির হৃদয় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই যে মহান্ জাতীয় প্রেম—এই যে মহাভারত-ব্যাপিনী দৃষ্টি—এর চেয়েও মহান ভাব—এর চেয়েও উদার আদর্শ আছে আমিত্বের প্রসারেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমিত্বের প্রসারেই মানবজীবনের মহালক্ষ্যের গন্তব্যপথ নিরূপিত। স্বার্থকে ক্ষুদ্র আত্মজ্ঞান হইতে ক্রমে বৃহৎ পরিবারে—সমাজে—স্বদেশে—তারপর সর্বজগতে ও সর্বভূতে বিস্তার করিতে হইবে। কেবল নিজের দেশ ও সমাজ নহে; সমগ্র জগৎ, সমগ্র মানবজাতি, সমগ্র প্রাণী-লোককে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে হইবে। কেবল স্বদেশের ও সমাজের গৌরব ও আদর্শের কথা নহে,—সমগ্র পৃথিবীর—সমগ্র মানবজাতির গৌরব ও আদর্শকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। যে কবির কণ্ঠে সমগ্র জগতের এই গৌরবের মহাসঙ্গীত উঠিয়াছে, তিনিই ধন্য। যিনি সমস্ত মানবের মুক্তির গাথা গাহিতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃত মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছেন। নবীনচন্দ্রের কার্যে এই উচ্চস্তর আমরা দেখিতে পাই, 'মহাভারতে'র মহান্ আদর্শ ছাড়িয়া তিনি আরও উচ্চে উঠিয়াছেন। স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম ছাড়াইয়া তিনি বিশ্বপ্রেমে উপনীত হইয়াছেন। সর্বজগতের প্রেমে তাহার হৃদয় দ্রব হইয়া গিয়াছে। 'অমিতাভ' ও 'ভানুমতী'তে কবির এই বিশ্বপ্রেম পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্ম-জরা-মরণ ব্যাধি-পীড়িত জগতে এক-দিন যে মুক্তির সঙ্গীত উঠিয়াছিল; এই বহুতৃষ্ণা-দুঃখ-সমন্বিত মানবের জন্য একদিন যে শান্তির বার্তা আসিয়াছিল—'অমিতাভে' সেই উদার সঙ্গীত—সেই মহতী বার্তার কথা আছে। বহুশত বর্ষ পূর্বে সমস্ত জগতের দুঃখে, 'হিমাচলপাদমূলে শৈলজারোহিণী কূলে' একদিন যাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—একদিন যিনি সমস্ত জগতের দুঃখ মোচন করিবার জন্য রাজ্য, ঐশ্বর্য, পিতামাতা, পত্নী-পুত্র ও আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া ভিখারীর বেশে গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন—দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা ও আত্মনিগ্রহ করিয়া একদিন যিনি এই মৃত্যুপীড়িত সংসারের জন্য অমৃত আনিয়াছিলেন—যাহা এখনও পৃথিবীর অর্ধেক লোক পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছে,—'অমিতাভ' সেই অমিতাভ বুদ্ধের মহান চরিত্রগাথা। 'অমিতাভে' সর্বজগতের দুঃখ-মোচনের সেই অমর সঙ্গীত, সর্বভূতহিতের সেই অক্ষয় কাহিনী গীত হইয়াছে। 'ভানুমতী' চট্টগ্রামের একটি ঝটিকা বিপ্লবের কাহিনী। কিন্তু ইহাতে মহা ঝড়-প্রমথিত চট্টগ্রামের জনপদসমূহের সেই করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্যের কথাই যে কেবল আমরা বলিতেছি তাহা নহে; ইহার মধ্যে যে গভীর মানবপ্রেম, যে নিষ্কাম পরহিত ব্রত, যে উদার স্বার্থত্যাগ, জমিদার অনাথনাথ ও 'বেদিয়া বালিকা' ভানুমতীর যে অপূর্ব চিত্র তাহার কথাই আমরা বিশেষ করিয়া বলি-

হতেছে। কুরুক্ষেত্রে যে নিষ্কাম ধর্মের ও অমিতাভে যে সর্বভূত হিতের মহতী বাণী আমরা পাইয়াছি—'ভানুমতী'তে সেই নিষ্কাম ধর্ম ও সর্বভূত হিতেরই কথা আমরা শুনিতে পাই। যে কবি অমিতাভের বিশ্বপ্রেমের ভিতর ডুবিয়া গিয়াছেন, সেই সৃষ্টি তাঁহারই উপযুক্ত বটে।

'অমিতাভ' নবীনচন্দ্রের শেষ বয়সের রচনা। ইহা 'কুরুক্ষেত্র' ও প্রভাসের পরে লিখিত, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা স্বভাবতঃ যেরূপ আশা করিতে পারি তাহা দেখিতে পাই না। 'অমিতাভে'র কবি, 'কুরুক্ষেত্রে'র উপরে উঠিতে পারে নাই। 'কাব্যশিল্পে' 'অমিতাভ'কে কুরুক্ষেত্রের নিম্নে স্থান দিতে আমরা বাধ্য। প্রতিভারও বিকাশের একটা আশ্চর্য নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। জড়জগতের ন্যায় মনোজগতেও পরিণতির পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট সীমার বেশী উঠিতে পারে না। প্রাণী ও উদ্ভিদ্-দেহ কিছুদিন পর্যন্ত বাড়িয়া আবার হ্রাস পাইতে থাকে, পর্বত যেমন ক্রমোচ্চ হইতে হইতে ঊর্ধতম শিখর পর্যন্ত উঠিয়া আবার নিম্নগামী হইয়া পড়ে, কবি-প্রতিভার বিকাশেও আমরা অনেক সময় সেইরূপ দেখিতে পাই। নবীনচন্দ্রের কবিত্বের ঊর্ধ্বতম শিখর "কুরুক্ষেত্র"। তাহার উপরে আর তাহা উঠিতে পারে নাই, কিন্তু তাহা হইলেও নবীনের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি 'অমিতাভ'কে সৌন্দর্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার যে কোমল-কঠোর সৌন্দর্য চিত্র ও জলদগম্ভীর ধ্বনিতে আমরা মুগ্ধ, 'অমিতাভে' তাহার প্রভাব সর্বত্রই অনুভব করিতে পারি। যে মহৎ জীবনের মহতী কাহিনী ইহাতে কীর্তিত, নবীনের উদাত্তরাগিণী তাহার অনুপযুক্ত হয় নাই। স্থানে স্থানে কবি অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়া পড়িয়াছেন, 'মহানিশি' 'মহানিষ্ক্রমণ', 'সংসার-শ্মশান', 'মহানির্বাণ' প্রভৃতি সর্গ পড়িলে বোধ হয় নবীনের কবিত্ব যেন মন্ত্রবলে আবার তাহার যৌবনের পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। 'ভানুমতী' গদ্যকাব্য, এ স্থানে আমাদের বলা উচিৎ যে নবীনচন্দ্র গদ্য রচনাতেও সামান্য ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না। তাঁহার গদ্যরচনাতে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যে ইহা বঙ্গসাহিত্যে একটি পৃথক স্থান অধিকার করিয়া রাখিবে। ইহাতে অক্ষয়কুমারের তেজস্বিতা, ভূদেবের প্রাঞ্জলতা ও যুক্তিবত্তা, বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ মার্জিত কলাকৌশল, কালীপ্রসন্নের গাম্ভীর্য ও চিন্তাশীলতা, বা রবীন্দ্রনাথের আবেগময় সৌন্দর্য ও ভাবের প্রবাহ দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে এমন একটা লীলাময়ী—এমন একটা সরল সৌন্দর্য আছে যে তাহা আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করিয়া দেয়। ইহা গদ্য ও পদ্যের সম্মিলন, গদ্যে কবিতাময়ীভাষা।

কবি সৌন্দর্যের উপাসক। যে অনন্ত সুন্দর সমস্ত বিশ্বের মধ্যে দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, কবি তাহারই পূজা করেন। এই যে জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য, ইহা সেই একেরই বিকাশ; নহিলে ইহা কি বিশৃঙ্খল হইত। এই যে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও সংগ্রাম ইহারা কি অনন্ত মিলনের রজ্জুতে বাঁধা পড়িয়া আছে; নহিলে এই সৃষ্টি চূর্ণিত হইয়া যাইত! তিনি এক—তিনি বহু হইয়াছেন। বিশ্বের এই অনন্ত সত্তার ভিতরে তিনি জ্ঞানরূপে, চিন্তারূপে জাগ্রত আছেন; তাই তিনি সত্য। এই বিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে তাঁহারই অনন্ত শক্তির লীলা বিকাশ হইতেছে ও তাই তিনি শিব। আবার তিনিই এই সমস্ত আনন্দের মধ্যে—শোভার মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন, তাই তিনি সুন্দর। কবি এই সুন্দরকে লক্ষ্য করিবার জন্য—তাহাকে এই প্রকাশের মধ্যে অনুভব করিবার জন্যই সাধনা করেন, প্রত্যেক সূর্যরশ্মিতে, প্রত্যেক চন্দ্রকরোজ্জ্বলে, পুষ্পগুচ্ছে, প্রত্যেক নীহার-মণ্ডিত তৃণশীর্ষে, প্রত্যেক মেঘাচ্ছায়ানীল কানন-পত্রে তিনি তাঁহারই সৌন্দর্যের লীলা বিকাশ দেখিতে পান, তোমার আমার চক্ষে এই জগতের কোন অর্থ না থাকিতে পারে, এই বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রাণ না থাকিতে পারে; কিন্তু কবি এই জগতের প্রত্যেক ধূলিকণার

ভিতরই অর্থ খুঁজিয়া পান—সমস্ত বিশ্বের মধ্যেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করেন। তাই তিনি কবি।

কিন্তু বলিয়াছি ত তিনি এক বহুধা হইয়াছেন। তিনি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পাইতেছেন। তিনি কখনও কোমল, কখনও কঠোর, কখনও করুণ, কখনও রুদ্র, কখনও শান্ত, কখনও বীভৎস। প্রকৃতি লীলাময়ী—বিচিত্ররূপিণী, কখনও নবারুণোদয়ে হাস্যময়ী —কখনও রৌদ্রবসনা ভয়ঙ্করী—কখনও চন্দ্রকরস্নাতা বিলাস-বিবশা—কখনও পুষ্পাভরণ-ভূষিতা, বিহগ-কাকলীকণ্ঠা উৎসবগমনা—আবার কখনও ঝটিকা-বিক্ষুব্ধা করালবদনা প্রলয়ঙ্করী। কিন্তু সকলেই কিছু এই সকল রূপ সমান ভালবাসে না। কেহ কোমল, কেহ কঠোর, কেহ করুণ, কেহ রুদ্রকেই ভালবাসেন। কেহ তাঁহার প্রিয়াকে লীলাময়ী হাস্যময়ী দেখিতে চান, কেহ বিবশা আত্মহারার রূপে মুগ্ধ, কেহ আনন্দময়ী সঙ্গীতময়ীর রসে রসিক আবার কেহ বা নিষ্কাম-শান্তিরূপিণীর ধ্যানে মগ্ন। তাই সকল চিত্রকর সকল সৌন্দর্য সমান ভালবাসেন না। সকল সৌন্দর্যকে সমানরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন না। কেহ সূক্ষ্ম কোমল সৌন্দর্যের বিকাশে নিপুণ—আবার কেহ বা মহান্, বিশাল বা ভয়ঙ্করের মূর্তি-চিত্রণে প্রতিভাশালী। ইউরোপের ফ্লেমিস চিত্রকরেরা প্রথম শ্রেণীর—আর ইটালীর চিত্রকরেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর। কালিদাস সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের বর্ণনায় মন্ত্রসিদ্ধ—আবার ভবভূতি গম্ভীর ও মহানের গঠনে সমধিক পারদর্শী। 'কণ্বের' তপোবনমধ্যস্থা শকুন্তলাকে আঁকিতে কালিদাসের সমকক্ষ কেহ নাই। কিন্তু হিমালয়ের বর্ণনায় তিনি তেমন সফল হইতে পারেন নাই, আর ভবভূতি মেঘনীলপর্বত-শিখর-পরিবৃত 'গদগদনদ্য-গোদাবরী'-বারি মুখরিত জনস্থানের অরণ্যবর্ণনায় সকলকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছেন। কালিদাস সূক্ষ্ম, ললিত ও কোমলের কবি; ভবভূতি করুণ, শান্ত ও গম্ভীরের কবি। নবীনচন্দ্র ভবভূতির শ্রেণীর কবি। ভবভূতির সঙ্গে এই বিষয়ে আমরা তাঁহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাই। তিনি ভবভূতির মত করুণ, শান্ত ও গম্ভীরেরই অধিক প্রিয়; কারণ, শান্ত ও গম্ভীরের বিকাশেই তিনি সুনিপুণ। করুণ চিত্রে ভবভূতি অদ্বিতীয়। জনস্থানে সীতা ও রামের সঙ্গে অশ্রু-বিসর্জন না করিয়া কেহ থাকিতে পারেন? নবীনচন্দ্রও করুণ চিত্রে ভবভূতিরই ন্যায় সুনিপুণ। 'পলাশী'র জাতীয় শোককাব্যেই তরুণ কবি ইহার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য 'কুরুক্ষেত্রই' তাঁহার এই ক্ষমতার পূর্ণ-বিকাশ। কুরুক্ষেত্র এক অতি অপূর্ব শোককাব্য। চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সর্গ পড়িতে পড়িতে বোধ হয় অতি পাষাণের হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়। নিজে না কাঁদিলে অন্যকে কেহ কাঁদাইতে পারে না, ইহা অতি পুরাতন ও সত্য কথা। কুরুক্ষেত্রের পবিত্র ক্ষেত্রে কবি অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন; ইহার প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক অক্ষর কবির সেই অশ্রুতে সিক্ত রহিয়াছে। তাই কুরুক্ষেত্রে আমাদিগকে কাঁদিতে হয়—কবির সঙ্গে সমবেদনার অশ্রু ফেলিতে হয়। করুণের ন্যায় শান্ত চিত্রেও নবীনের অসীম ক্ষমতা। উত্তেজনা অপেক্ষা শান্তির সঙ্গীতেই তিনি সমধিক নিপুণ। পলাশীর তরুণ কবির ওজস্বিনী সঙ্গীতে 'ধমনী-ভিতরে' রক্ত নাচিয়া উঠে বটে। কিন্তু তদপেক্ষা যখন রৈবতকের সমুদ্রনীরে ও ব্যাসাশ্রমে আমরা নবীনচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি তখনই তাঁহাকে প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারি। প্রভাসের সমুদ্র-সৈকতে যে শেষ লীলার অভিনয় দেখি তাহাতে ধ্বংসের অবসাদের মধ্যেই আমাদের হৃদয় একটা নির্মল শান্তিতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কুরুক্ষেত্রের বিশাল সমরক্ষেত্রে, চিতাভস্মের উপরে মহাভারতের প্রতিষ্ঠায়, রঙ্গমতীর ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ অরণ্যভীষণ গিরি প্রকৃতির বর্ণনায় নবীনের চিত্রের গাম্ভীর্য আমরা অনুভব করিতে পারি। অমিতাভে এই শক্তি অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। যে মহাপুরুষের মহতী কাহিনী ইহাতে কীর্তিত, কবির গভীর সঙ্গীত তদনুরূপই হইয়াছে!

ভাষার ভিতর দিয়া সৌন্দর্যের বিকাশ বড় কঠিন কাজ। সৌন্দর্য মনোজগতের জিনিষ, ভাষা জড়জগতের। সৌন্দর্য চৈতন্য—ভাষা জড়। জড়কে ভেদ করিয়া চৈতন্যকে পরিস্ফুট করা অতি দুরূহ কার্য। যে কবি এই ভাষাকে এই জড়কে যত আয়ত্ত করিতে পারিবেন তিনি তত কৃতী। যে চিত্রকর বর্ণকে যত অতিক্রম করিতে পারিবেন, ভাবকে ততই তিনি জাগ্রত করিতে পারিবেন। অক্ষম কবি ভাষাকে অতিক্রম করিতে পারেন না ; ভাষাই তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া ফেলে। নিপুণ কবির ভাষা, তাঁহার ভাবের সহচর বাহন মাত্র। ভাষা তাঁহার নিকট

'ডমরুর রবে যথা নাচে কালফণী।'

এই যে ভাষাকে নাচাইবার ক্ষমতা, এই যে ভাষার ভিতর সৌন্দর্যের প্রতিধ্বনি, এই ক্ষমতা নবীনচন্দ্রের ভিতর সমধিক পরিস্ফুট দেখিতে পাই। পলাশীর যুদ্ধ বর্ণনা অতি প্রসিদ্ধ ও সর্বজনবিদিত। নবীনচন্দ্র যখন গাহিতেছেন—

ব্রিটিশের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল কাঁপাইয়া গঙ্গাজল
কাঁপাইয়া আম্রবন উঠিল সে ধ্বনি।
নাচিল সৈনিক রক্ত ধমনীভিতরে ;
মাতৃকোলে শিশুগণ করিলেন আস্ফালন
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।

তখন বাস্তবিকই যেন আমরা ব্রিটিশের রণবাদ্য শুনিতে পাই ; 'আম্রবন' ও 'গঙ্গাজল' কাঁপাইয়া 'রক্ত ধমনী ভিতরে' নাচিয়া উঠে ও উৎসাহে বুক পূর্ণ হইয়া যায়। 'রঙ্গমতী'তে বীরেন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনায়ও আমরা এই উৎসাহ অনুভব করি। আবার যখন শিবিরে উপস্থিত হইয়া শুনি—

"বিবসনা লো সুন্দরী, সুরাপাত্র করে
কোথা যাও নেচে নেচে? নবাবের কাছে?
যাও তবে সুধা হাসি মাখি বিম্বাধরে,
ভুজঙ্গিনী সম বেণী দুলিতেছে পাছে।"

তখন যেন নৃত্যশীলা বিবসনার বীভৎস দৃশ্য সম্মুখেই দেখিতে পাই। কখনও বা নবীনের কবিতা হরিপ্রেমে উন্মত্ত-বৈরাগ্যে আত্মহারা!

কালা হইয়াছে গোরা জীর্ণ-বাস পীত ধরা,
হয়েছে মোহন বাঁশী দন্ড বৈরাগীর।
চন্দন হয়েছে ধূলা প্রেমে গোরা আত্মহারা
নয়ন যুগলে ধারা প্রেম জাহ্নবীর।
'হরিবোল! হরিবোল!' নাচে গোরা বাহুতুলি
ধূলায় সোনার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি।

পড়িতে পড়িতে 'পুণ্যবতী' শৈলজার মত আমরাও হরিপ্রেমে উন্মত্ত গৌরাঙ্গকে দেখিতে পাই, প্রেমে আমাদের অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে! সুভদ্রা যখন 'নারীধর্ম' কহিতেছেন, তখন সুলোচনা শুনুন আর না শুনুন, নবীনের ভাষা ভক্তি-প্রণতা শিষ্যার ন্যায় সুভদ্রা দেবীর পদতলে বসিয়া যেন 'নারীধর্ম' শিক্ষা করিতেছে—

না দিদি, আমরা নারী বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই ;
বরিষার ধারা সম অজস্র জননী প্রেম
সর্বত্র ঢালিয়া চল যাই।

মিত্রকে যে ভালবাসে সকাম সে ভালবাসা
সে ত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার,
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেই জন দেবতা আমার!

কি শান্ত—কি গম্ভীর—কি মহতী বাণী! ইহার ভিতর দিয়া যেন বিশ্বজননীরূপিণী সুভদ্রার মূর্তি আমাদের অন্তর পটে ভাসিয়া উঠে! যেখানে পতিবিয়োগ-বিধুরা বালিকা বধূ উত্তরা মর্মভেদী বিলাপ করিতেছেন, নবীনের ভাষাও সেখানে তাঁর সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল। তাঁহার প্রতি অক্ষর যেন অশ্রুতে সিক্ত হইয়া গিয়াছে!

"—দেব! কহ একবার,
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তাহার পুতুল খেলা নাহি ফুরাইতে নাথ
ফুরাইল জীবনের খেলা কি তাহার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?

*   *   *

সমরে যাইতে আজি শুলাগ্রে ছিঁড়িল হার
রহিয়াছে সেই হার অঞ্চলে আমার
উত্তরা কি সেই হার পরিবে না আর?
শিবিরে সজ্জিতা বীণা এখনো রয়েছে পড়ি
উত্তরার বীণাটি কি বাজিবে না আর?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?
তুমি উত্তরার হাসি কত যে বাসিতে ভাল
মুছাইলে এইরূপে সে হাসি কি তার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?

*   *   *

দয়াময়! দয়া কর দুঃখিনী কন্যায়।
নহে যুগ নহে বর্ষ কেবল ছয়টি মাস
লিখিলে কি এই স্বর্গ কপালে তাহার?
ভাঙ্গিয়াছে কপাল কি তব উত্তরার?"

এই বিলাপ শুনিতে শুনিতে আমরা পার্থের ন্যায় শোক-বাষ্প রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারি না। কিন্তু হায়, উপাসক চিরকালই দরিদ্র! পূজো যাহাকে পাইতে চায়, সে যে চিরকালই দূর বলিয়া বোধহয়। প্রাণের দেবতাকে চিরদিনই পাইতে আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু হায়, তাহাকে ধরিয়াও যে ধরিতে পারি না। কবি চিরকাল সৌন্দর্যকে পাইতে চায়, সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে তাহাকে ধরা দেয় কই? চিত্রকর চিরদিনই ভাবকে জাগ্রত করিতে চাহেন, কিন্তু সে চিরদিনই লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়। এই যে প্রকৃতি, এই যে সৌন্দর্যের বিকাশ, এও ত চিরদিনই সেই সাক্ষ্যই দিতেছে। চিরদিনই এ যেন কাহাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সে যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে না। এই স্বর্ণরবিকর—এই সান্ধ্য-গগনের সিন্দুর মেঘমালা এই পূর্ণিমার ফুল্ল-পুষ্প-আভরণ—এই নীল আকাশ—এই উন্মত্ত জলধি এই চিত্রে কাহাকে যেন আঁকিতে চাহিতেছে!—সম্পূর্ণ আঁকিয়া উঠিতে পারিতেছে কই? এই যে প্রকৃতির অন্তরে অহর্নিশি একটা ব্যাকুল সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

কাহার গান যেন সে গাহিতে চাহিতেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ গাওয়া হইতেছে না—বীণার তার অর্ধপথে থামিয়া যাইতেছে। জগতের সমস্যাই যেন অর্ধেক! অর্ধেক দেখা যায়, অর্ধেক চিরকালই দৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া যায়। অর্ধেক গান গাওয়া হয়—অর্ধেক অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কবি যে অনন্ত সুন্দরের কথা বলিতে চান, তাঁহার কেবল অর্ধেক যেন বলিতে পারেন। অর্ধেক অকথিত থাকিয়া যায়। চিত্রকর যে মহানের চিত্র প্রতিফলিত করিতে চান—তাহার অর্ধেক যেন কেবল তুলিতে উঠে, অর্ধেকই চিত্রকরের হৃদয়ে থাকিয়া যায়। কবি কেবল বর্তমানের কথা—কোন বিশেষ একটি ঘটনা বা বিশেষ একটি সৌন্দর্যের কথা বলেন না ; কিন্তু এই বর্তমান ও বিশেষের মধ্য দিয়া তখন কিছু বলিতে চান, যাহা সর্বকালব্যাপী—সর্বস্থানব্যাপী ; যাহা বর্তমানের যাহা অতীতের—যাহা ভবিষ্যতের যাহা চিরসুন্দর—যাহা চির আনন্দময়! অর্ধেক তিনি বলেন—অর্ধেক আমি বলি। কবি যে বীণার সাধনা করিতেছেন, আমার মধ্যেও ত সেই সৌন্দর্যের বীণা আছে! তিনি তাঁহার বীণার তার এমন করিয়া আঘাত করেন—যাহাতে আমার হৃদয়ের বীণার তার বাজিয়া উঠে!—সে যে এক সুরে বাঁধা হইয়া আছে। সমস্তখানি কবি সাজাইলে ত আমার হইত না। আমার সৌন্দর্যকে আমি পাইতাম না। আমার আনন্দকে আমি অনুভব করিতে পারিতাম না! তাই কবি কেবল অর্ধেক বাজাইয়া দেন। তিনি কেবল আভাস দিয়াছেন—পূর্ণতা আমি করিয়া লই। এই যে আভাস দেওয়ার ক্ষমতা, এইটিই কবির বড় ক্ষমতা, ক্ষুদ্র কবির সম্বল অল্প। তাহার যাহা কিছু সে বলিয়া ফেলে ; তাহাতে আমার আনন্দ হয় না। প্রতিভাবান কবি সমস্যাটুকু বলেন না—আমার জন্য রাখিয়া দেন। সবটুকু আঁকিয়া ফেলেন না, আমার তুলিকার জন্য অবসর রাখেন। তিনি আমাকে কেবল কবিতা শুনান না ; কিন্তু আমার নিদ্রিত কবিত্বকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। অন্য একজনকে যে কবি করিতে পারে, সেই ত বড় কবি। এই যে আভাস দেওয়ার ক্ষমতা—এই যে অন্যের কবিত্বকে জাগ্রত করিবার ক্ষমতা, এই ক্ষমতা নবীনচন্দ্রের আছে। তাই তাঁহাকে বড় কবি বলি। নবীনচন্দ্রের কবিতার মধ্যে একটা সৌন্দর্যের ব্যাকুলতা, একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ছায়া সর্বত্র দেখিতে পাই। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন কবি কি বলিতে চাহিতেছেন, সবখানি বলিতে পারিতেছেন না। এই ক্ষুদ্র—এই বর্তমান এই বিশেষকে ছাড়িয়া কি যেন অনন্তের দিকে যাইতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। চারিদিক হইতে ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী যেমন এক অনন্ত সমুদ্রেরই দিকে ধাবমান হয়,—তেমনি কবির সমস্ত বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য যেন এক অনন্ত সুন্দরের দিকে ধাবিত হইয়াছে। এই স্থান, কাল, সমাজ, দেশ, সমগ্র জগৎ—সমস্ত ভুলিয়া এক স্থানহীন কালহীন মহান সত্যের দিকেই যেন তাহার গতি দেখিতে পাই। এই যে প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্য, ইহাতে যেন আর তৃপ্তি হয় না, কি এক অক্ষয় সৌন্দর্যের সিন্ধু আছে ; তাহাকেই পাইতে ইচ্ছা হয়। এই যে জগতের ক্ষুদ্র প্রেম, ইহাতে হৃদয় ভরিয়া উঠে না,—

"অনন্ত এ বিশ্ব ছাড়ি, কি যেন অনন্ত আছে,
প্রেম সিন্ধু সেই দিকে ধায়!"

পাশ্চাত্য সভ্যতার স্রোত যখন প্রবল বেগে আমাদের দেশের উপরে আসিয়া আঘাত করিয়াছিল, তখন তাহার প্রতাপ সমাজ ও সাহিত্যের সর্বত্রই পরিলক্ষিত হইয়াছিল, ইহা আমরা বলিয়াছি। সেই সময়ে যদি আমরা আমাদের সাহিত্যকে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত রাখিতে চাহিতাম ; তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইত না, ভাষাকে রক্ষা করিবার পরিবর্তে আমরা তাহার ধ্বংসই সাধন করিতাম। আমাদের গৌরবান্বিত মাতৃ-ভাষার অস্তিত্ব থাকাই হয়ত কঠিন হইত। কিন্তু ধন্য আমাদের তখনকার সাহিত্যের কর্ণধারগণ! তাঁহারা এই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন নাই, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বহু

ভাষার সমন্বয় করিতেই তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের যে অতুল সম্পদ, তাহা হইতে মাতৃভাষাকে বঞ্চিত করিয়া অনুদারতা ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন নাই; তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কেবল মৃত সংস্কৃত ভাষার মুখাপেক্ষী হইয়া দুহিতা বঙ্গভাষার চলিবে না ; বর্তমান সভ্যজগতের একটা প্রাণময়, জীবন্ত ভাষার সঙ্গে তাহার সাখ্য করিতে হইবে, কাব্য-সাহিত্যে মধুসূদন প্রথমে এই পথ প্রদর্শন করেন। তিনি বহু-ভাষাবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে অনন্ত ঐশ্বর্যের পরিচয় তিনি পাইয়া-ছিলেন, তাহা দ্বারা জননী বঙ্গভাষাকে তিনি বিবিধরূপে সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে পাশ্চাত্য আদর্শে কাব্য, গীতিকাব্য ও নাটক প্রণয়ন করেন। বঙ্গীয় কাব্যের ছন্দ ও ভাষার গতি নূতন পথে ফিরাইয়া দেন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র তাঁহারই পন্থানুসরণ করিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যে আমরা তাই বঙ্গভাষার সঙ্গে পাশ্চত্য ভাষার এই সমন্বয় চেষ্টা দেখি। নবীনচন্দ্র ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষাতেই সুশিক্ষিত ছিলেন। তাই এই উভয় ভাষার প্রভাবই তাঁহার কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের ভাব ও চিন্তাপ্রণালীর ছায়া বহুল পরিমাণে তাঁহার কাব্যে মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাই তাঁহার কাব্যের সর্বত্র একটা দুর্জয় বেগ, ভাবের স্বাধীন লীলাময়ী ভঙ্গী যেমন আমরা অনুভব করি, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার ছন্দের জলদগম্ভীর ঝঙ্কার ও ভাষার লালিত্য ও মাধুর্য, শব্দভাণ্ডারের ঐশ্বর্য, অনন্ত ঐশ্বর্যশালিনী সংস্কৃত ভাষাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু যদিও ইংরাজী ও সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য বহুল পরিমাণে নবীনচন্দ্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাই বলিয়া তাঁহার প্রতিভা অনুকরণ-দোষ-দুষ্ট, একথা আমরা বলিতে পারি না। অনুকরণ ও গ্রহণ যে সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সাহিত্য জগতে চিরকালই চিন্তা ও ভাবের বাণিজ্য চলিয়া থাকে। সেগুলি যে সর্বত্রই জঘন্য চৌর্যবৃত্তি এ কথা বলা যায় না। জগতে কয়জন কয়টি নূতন কথা বলিয়াছেন ; কয়জন নূতন ভাব ও নূতন সত্য প্রচার করিতে পারিয়াছেন। সত্য চিরকালই সুন্দর। জগতের সেই সনাতন সত্যগুলিকে যিনি নূতন আলোকে উজ্জ্বল করিয়া ও নূতন বর্ণে সুন্দর করিয়া ধরিতে পারেন—তিনিই প্রতিভাবান্—তিনিই ধন্য। সত্য ত চিরকালের ; সত্য ত কাহারো নিজস্ব নয়। কিন্তু এই যে আলোক, এই যে বর্ণ, ইহাই কবির নিজস্ব—ইহাই কবির প্রতিভা। মহাকবি সেক্সপিয়র ও মিলটনও ত অনেক পুরাতন সত্য প্রচার করিয়া-ছিলেন। কিন্তু সেগুলিকে তাঁহারা তাঁহাদের কবিপ্রতিভার দিব্য জ্যোতিতে অপূর্বরূপে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতিও ত ব্যাস ও বাল্মীকির পদাঙ্কঅনুসরণ করিয়াছেন! কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহাদের গৌরব হ্রাস হয় নাই। তাঁহারা তাঁহাদের অসামান্য সৃষ্টিচাতুর্যে জগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্রেরও এই দিব্য আলোক—এই মোহিনী শক্তি ছিল, তাই তিনি অনেক পুরাতন কাহিনী ও পুরাতন সত্য কীর্তন করিলেও—সেগুলিকে আরও মহীয়ান্ করিয়া গিয়াছেন। বৈদেশিক কবিগণের চিন্তা ও ভাবের অনুবর্তন করিলেও সেগুলিকে নিজস্ব করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি ভাব ও সৌন্দর্যের রাজ্যে যে অতুল কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকালই বাঙ্গালীর কাব্যসাহিত্যকে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিবে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র বাঙ্গালীর স্বদেশ-প্রেমের তিন মহাকবি। নব্যবঙ্গের প্রথম প্রভাতে এই চারণ-কবিরাই স্বদেশপ্রেমের উদাত্ত সংগীতে চারিদিক পূর্ণ করিয়া দিয়া-ছিলেন। 'মধুরকোমলকান্ত পদাবলী' রচনায় বাঙ্গালী চিরকালই যশস্বী ছিল। প্রেম-রাজ্যের কুহক-কল্পনায়, বিরহ মিলনের বিচিত্র-স্বপ্ন সৃষ্টিতে চিরকালই বাঙ্গালী পটু ছিল। বহির্জগতের বিপুল কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়া নারীজনোচিত অবসাদের সংগীতে তাহারা একান্ত আসক্ত বলিয়া তাহাদের একটা অপবাদ বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। নব্য-বঙ্গের

এই কবিগণ বাঙ্গালীর সেই অপবাদ দূর করিয়াছিলেন। অতীতের কোমল বীণার পরিবর্তে তাঁহাদের সুগম্ভীর ভেরীনিনাদে বাঙ্গালার জল-স্থল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। নবীন-চন্দ্রের মত এমন মর্মস্পর্শী, প্রাণময় পুরুষোচিত ভাষায় কে আর বলিতে পারে?—

"হায় মা ভারতভূমি বিদরে হৃদয়,
কেন স্বর্ণপ্রসূ বিধি করিল তোমারে?
কেন মধুচক্র বিধি করে সুধাময়
পরাণে বধিতে হায় মধুমক্ষিকারে?
পাইত না অনাহারে ক্লেশ মক্ষিকায়
যদি মকরন্দ নাহি হ'ত সুধাসার,
স্বর্ণপ্রসবিনী যদি না হইতে হায়,
হইতে না রঙ্গভূমে অদৃষ্ট ক্রীড়ার!

এই ক্রন্দন নবীনচন্দ্রের সমস্ত কাব্যজীবনেই আমরা দেখিতে পাই। তিনি পূর্ণভাবেই জাতীয় কবি ছিলেন। স্বদেশের দুঃখ ও গৌরবের সঙ্গীতেই তাঁহার গম্ভীর কণ্ঠ নিয়োজিত হইয়াছিল। অবকাশ-রঞ্জিনী হইতে আরম্ভ করিয়া পলাশী, রঙ্গমতী, কুরুক্ষেত্র রৈবতক ও প্রভাস সর্বত্রই সেই একই স্বদেশ-প্রেমের স্রোত বহিতেছে। অনেকে মনে করেন, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের কবি পলাশী ও রঙ্গমতীর কবি হইতে ভিন্ন। আমরা কিন্তু পলাশী ও কুরুক্ষেত্রে একই কবি-প্রতিভার কার্য দেখিতে পাই। রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস কবির স্বদেশ-প্রেমের পরিণত চিত্র। এখানে কবি কেবল অতীতেই তৃপ্ত হন নাই, ভবিষ্যতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়াছেন। কবির দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি। তাহা কালের আবরণ ভেদ করিতে পারে। যদি তাহাই হয়, তবে কবি ভবিষ্যতের যে মহান চিত্র আঁকিয়াছেন. তাহা সত্য হইবে না কে বলিতে পারে?

"এক ধর্ম এক জাতি,
এক রাজ্য এক নীতি
সকলের এক ভিত্তি—সর্বভূত-হিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম
একমেবাদ্বিতীয়ং! কবির নিশ্চিত
ওই ধর্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত" (রৈবতক)

কবির মহাস্বপ্ন সফল হউক! এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইব।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র ইঁহাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট তাহা নির্ণয় করিবার এখনও সময় আসে নাই। নব্যবঙ্গের জীবনপ্রভাতে যে তিন সূর্য উদিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের সকলেই একে একে অস্ত গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের গৌরব-কিরণ বর্তমানকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, সুদূর ভবিষ্যতকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের কবিত্বের তুলনায় সমালোচনা এখন আমাদের পক্ষে নানা কারণে সহজ নহে। মনস্বী হীরেন্দ্রনাথের সুন্দর উপমা প্রয়োগ করিতে গেলে বলিতে হয় এখনও আমরা পর্বত শিখরে রহিয়াছি। সুতরাং তাহার উচ্চত্ব আমরা বুঝিতে পারিব না। ভবিষ্যতের দূরত্বই তাহার প্রকৃতি নিরূপণে সমর্থ হইবে। বঙ্গের কাব্য-সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের স্থান কোথায়, তাহাও নির্ণয় করিতে এখন আমরা চেষ্টা করিব না। সে দুরূহ কার্য সাধনের উপযোগী ক্ষমতাও এ অধম লেখকের নাই। নবীনচন্দ্র যে অমূল্যদান আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, এখন কেবল তাহার কথাই আলোচনা করিবার সময় আমাদের উপস্থিত হইয়াছে। পতিত জাতির

উদ্ধারের জন্য, তাহাকে গন্তব্যপথ নির্দেশ করিবার জন্যই মহাপুরুষ ও কবির আগমন। সত্য ও সৌন্দর্যই জাতীয় জীবনের চরম লক্ষ্য। অধঃপতিত জাতি এই সত্য ও সৌন্দর্যের পথ হইতে নিয়তই স্খলিত হইয়া পড়ে। মহাপুরুষ ও কবি তাই সত্য ও সৌন্দর্যের দান লইয়া জাতীয় জীবনের সম্মুখে উপস্থিত হন, দুর্দিনের অন্ধকার-রজনীতে আপনার প্রতিভার আলোকে তাহাকে সুপথ দেখাইয়া দেন ; লক্ষ্যহীন জাতীয় তরণীর সম্মুখে আদর্শের ধ্রুবতারা স্থাপিত করেন। নবীনচন্দ্র আমাদিগকে এই ধ্রুবতারা দেখাইয়া গিয়াছেন। যে জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম, গভীর আত্মত্যাগ এবং নিষ্কাম ধর্ম ও কর্মের মহান আদর্শের সঙ্গীত তিনি গাহিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদিগের কলঙ্কমণ্ডিত জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছে। এই মরণশীল জগতে কবি অমর! তিনি যে ভাব ও সৌন্দর্যের দান রাখিয়া যান, তাহার মধ্যেই তিনি অমর হইয়া থাকেন। আপনার প্রদর্শিত সত্যের মধ্যেই তিনি প্রকৃতরূপে সত্য হইয়া উঠেন। এই সত্য ও সৌন্দর্যরূপী নবীনচন্দ্রকে লইয়া জাতীয় জীবন পথে অগ্রসর হইতে হইবে ; তিনি আদর্শের ধ্রুবতারা আমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই দুর্যোগের নিশিতে তাহাকেই স্থির লক্ষ্য করিয়া, আমাদের জাতীয়-জীবনতরণী ভাসাইয়া দিতে হইবে।

প্রফুল্লকুমার সরকার

ভানুমতী

(পাঠ=প্রথম সংস্করণ, ১৩০৭)

উৎসর্গ পত্র

[স্বয়ং নবীনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন : 'ভানুমতী প্রকাশিত হইল, এবং তাহার মুখপত্রের কবিতায় আমার ভাইঝি 'আশা'র আবদার রক্ষা করিয়া উহা তাহাকে উপহার দিলাম।" (আমার জীবন/৫ম ভাগ)। কিন্তু ক্ষোভের বিষয়, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেও উল্লিখিত উৎসর্গপত্রের সন্ধান পেলাম না।—সম্পাদক]

PREFACE

"I asked for several men I had known well here. Many of them were drowned and the tales of the survivors were pitiful. Wealthy Talukdars were wandering about aimlessly. One man who had 12,000 *aris* of paddy (about 2850 mounds) in his godown had been drowned with all his family, a large one. Nothing was standing of his houses, even the mud plinth had been washed away, and the clods lay strewn over the neighbouring fields. The only remnant of the once comfortable homestead was the timber posts, on which the godown had stood. In this village as in Raja-Khali, Ujantia, and Pekua, there are very few men surviving, and practically no women or children. There is therefore, but little present need of relief."

Diary of MR. C. G. H. ALLEN,
Settlement Officer, Chittagong,
Ajent the Chittagong Cyclone of the 2nd October, 1897.

প্রথম অধ্যায়

কমলে কামিনী

শরৎকাল। প্রকৃতির লীলাভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুলকিরণে হাসিতেছিল। পশ্চিমে অনন্ত সাগরের নীলাম্বুরাশি; পূর্ব্বে বৃক্ষপল্লব-সমাচ্ছন্ন শ্যামল পর্ব্বতমালা। উভয়ের মধ্যে নাতিবিস্তৃত দীর্ঘায়ত হরিৎ-শস্যক্ষেত্রখচিত তটভূমি। তাহার স্থানে স্থানে নিবিড় তরুকানন-শোভিত ছনুয়া, বড় ঘোনা, বড় বাঁকিয়া, পেকুয়া, গণ্ডামারা প্রভৃতি গ্রামাবলীর বর্ষাবিধৌত শ্যামকান্তি। উত্তরে বর্ষার পর্ব্বতপ্রবাহে পূর্ণকলেবর শঙ্খনদের ও দক্ষিণে মাতামুহুরী নদীর বিশাল রজতধারা। বালসূর্য্যের তরলসুবর্ণকরে মণ্ডিত হইয়া এই দৃশ্যাবলী যে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, তাহা কবির কল্পনাতীত, এবং চিত্রকরের চিন্তাতীত। কিঞ্চিৎ দক্ষিণে সমুদ্রগর্ভে কুতুবদিয়া; মহেশখালী, সোনাদিয়া প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ বিশাল মরকতখণ্ডের মত ভাসিতেছিল। কুতুবদিয়ার উত্তরপ্রান্তস্থিত "বাতিঘর" একটি গগনস্পর্শী তালবৃক্ষের মত, মহেশখালী-দ্বীপস্থ আদিনাথ পর্ব্বত মরকতস্তূপের মত, এবং তাহার শেখরস্থ আদিনাথের মন্দির প্রকাণ্ড হীরকখণ্ডের মত, নীলাকাশপটে শোভা পাইতেছিল। সোনাদিয়া বা সুবর্ণ-দ্বীপের ভূম্যধিকারী অনাথনাথ সমুদ্রতীরসংলগ্ন বজরার ছাদে বসিয়া, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ-হৃদয়ে প্রকৃতির এই মহাশোভা সন্দর্শন করিতেছিলেন,—

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু; সুনীল সলিলরাশি,
রবির সুবর্ণ-করে বিকাশি সুনীল হাসি,
নাচিতেছে, গাহিতেছে দিয়া সুখে করতালি
তরঙ্গে তরঙ্গে, তীরে ফেনপুষ্পমালা ঢালি।
অনন্ত সিন্ধুর সেই অনন্ত অস্ফুট গীত
কি যেন স্মৃতি করিতেছে জাগরিত—
অতীত ও অনাগত, সুখ-দুঃখ-বিজড়িত,
সিন্ধু-নীলিমায় যেন রবিকর সংমিশ্রিত।
সুনীল আকাশ দূরে সিন্ধু সহ নীলতর
মিশিয়াছে মহাচক্রে—সম্মিলন কি সুন্দর!
খেলিছে তরঙ্গমালা—শিরে ফেনপুষ্পরাশি,—
সমুদ্রমন্থনে যেন অমৃত উঠিছে ভাসি।
নীলাকাশ বিশ্বরূপ—অনন্তের মহাভাস,
তরলহৃদয় সিন্ধু, তরঙ্গ-অনন্তোচ্ছ্বাস।

প্রৌঢ় অনাথনাথ স্তম্ভিতভাবে, ভক্তিপ্রপূরিতহৃদয়ে, এই মহাদৃশ্য দর্শন করিতেছিলেন, এবং মনে মনে ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্ত্তা যে উভয় অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী ও অসীমশক্তিসম্পন্ন, এই সিন্ধুগর্ভে বসিয়া, সিন্ধু ও আকাশ দর্শন করিলে যেমন হৃদয়ঙ্গম হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। তিনি মাধবাচার্য্যের "জাগরণ" বা চণ্ডীকাব্য সর্ব্বদা পড়িতেন ও তাহার গীত শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। শরৎ-প্রভাতে এই সমুদ্র-শোভা দেখিতে দেখিতে দূরে তরঙ্গ-ভঙ্গে যে ফেনরাশি উদ্গীর্ণ হইতেছিল, উহা তাঁহার যেন একটি কমলকানন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এবং সেই কমলবনে যেন তিনি শ্রীমন্তের মত সেইরূপ শিশু সহ ক্রীড়াশীলা একটি অপূর্ব্ব কামিনীও দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইল। তিনি তখন উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে সিন্ধুতীর মুখরিত করিয়া এবং তাঁহার সুকণ্ঠে সিন্ধুনিনাদ প্লাবিত করিয়া স্থানীয় কবি শ্যামাচরণের একটি গীত গাহিতে লাগিলেন,—*

১

অপরূপ অতি শুন নরপতি,
কালীদহের জলে দেখেছি নয়নে,
পদ্মেতে পদ্মিনী, জিনি সৌদামিনী,
হেরিলাম কামিনী কমল-বনে।

২

বঙ্কিম-নয়নী, জিনিয়া হরিণী,
কেশবেণী ফণী, বিদ্যুৎ-বরণী,
ধরি' করিবরে ধনী গ্রাস করে,
ক্ষণেকে উদ্গার করিছে বদনে।

৩

ক্ষণেকে দেখি জলে, ক্ষণেকে কমলে,
চঞ্চলা লুকায় ক্ষণেকে অঞ্চলে,
চপলা চমকে, ক্ষণে কুতূহলে,
ক্ষণে গজরাজ নিক্ষেপে গগনে।

কিন্তু এ কি ভ্রম! এ কি তাঁহার ভক্তিপ্রণোদিত কল্পনামাত্র? না, তিনি যেন সত্য সত্যই সেই ফেনপুঞ্জের মধ্যে শিশু সঙ্গে ক্রীড়াশীলা একটি রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মূর্ত্তি তরঙ্গপৃষ্ঠে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টা—স্পষ্ট-তরা হইতেছে। ক্রমে তাঁহার মনে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। তিনি বিস্মিত ও আত্মহারা হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তরঙ্গফেনায় প্রচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা, যাহা এতক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, ক্ষুদ্র তরীর ক্ষুদ্র কর্ণখানি ধরিয়া যেন গৌরী স্বয়ং তরঙ্গে তরঙ্গে তরী সহ নাচিতে-ছেন, এবং নৌকার ছাদের উপর যে একটি ক্ষুদ্র শিশু নির্ভয়ে বসিয়া আছে, তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া এক হস্তে আলিঙ্গন করিতেছেন ও তাহার ক্ষুদ্র মুখখানি চুম্বন করিতে-ছেন। তরীর অন্য প্রান্তে বসিয়া একটি পুরুষ ও নারী দাঁড় টানিতেছে। নৌকা আরও নিকটে আসিলে তিনি দেখিলেন,—

কিশোরী বালিকা সোনার পুতুল,
দুই হাতে হাল চাপি বক্ষে ধরি,
হেলিছে দুলিছে, উঠিছে পড়িছে,
তরঙ্গে তরঙ্গে কি লীলা করি!
নাচিছে তরণী, নাচিছে তরুণী,
এই উঠিতেছে, পড়িতেছে এই,
মোচার খোলার মত ক্ষুদ্র তরী,
এই দেখি আছে, এই দেখি নেই।
এই তরী-আগা উঠিল আকাশে
হেলিয়া সম্মুখে হা'লে ভর করি
চুম্বিল কিশোরী শিশুর বদন
বাম-করে তারে হৃদয়ে ধরি।
এই তরী-পাছা উঠিল এবার,
তরঙ্গে দ্বিতীয় আরোহণ করি,

পড়িল সরিয়া কিশোরী কৌশলে
তরী-কর্ণ বক্ষে সাপটি ধরি।
আরক্ত-বসনে আঁটা ক্ষীণ কটি,
মুক্ত কেশরাশি কেতন মত
উড়িছে পশ্চাতে সমুদ্র-অনিলে,
সৌন্দর্য্যের লীলা করিয়া কত।
গৌর বরণে, আরক্ত বসনে,
সদ্যঃস্নাত লীলাময়ী অলকায়,
শারদ রবির প্রভাত-কিরণ
ঝলসিছে, শোভা নাহি এ ধরায়।
তরঙ্গ-আঘাতে ক্ষুদ্র তরী যবে
ফেনরাশিগর্ভে হয় নিমজ্জিত,
কক্ষে বক্ষে হাল চাপিয়া কৌশলে,
দুই ভুজে শিশু করিয়া উত্থিত,
কভু শূন্যে তুলি, দেখে তার মুখ
কভু বক্ষে রাখি চুম্বে আদরিণী ;
বোধ হয় মনে, এ নহে মানবী,—
সত্য কালীদহে "কমলে কামিনী!"

নৌকা ক্রমে আরও নিকটস্থ হইলে রমণীকণ্ঠের গীতধ্বনি যেন অনাথনাথের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল। ধ্বনি ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল ; কিছুক্ষণ পরে তাঁহার বোধ হইল, যেন সমুদ্রের জীমূতগর্জ্জনের সঙ্গে মিশিয়া একটি বাঁশী বাজিতেছে ; কণ্ঠ এত উচ্চ, এমন মধুর এমন প্রাণস্পর্শী! মরুসদৃশ সেই নির্জ্জন সমুদ্রগর্ভে একখানি তরী, তাহাতে শিশু সঙ্গে সেই ক্রীড়াময়ী কিশোরীমূর্ত্তি, এবং সেই কিশোরীর কণ্ঠে এই গীত। গীতের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ নাচিতেছে, তরণী নাচিতেছে, তরুণী নাচিতেছে. এবং দুই দাঁড়ে তাল রাখিতেছে। সাগরানিল রহিয়া রহিয়া স্বরলহরী বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্রকপোত পক্ষসঞ্চালনে করতালিবৎ শব্দ করিয়া উড়িতেছে ও বসিতেছে, এবং তরঙ্গপৃষ্ঠে শ্বেত পদ্মফুলের মত শোভা পাইতেছে। দূর হইতে ইহারা ফেনরাশির সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার চক্ষে কমলকাননের ভ্রান্তি সঞ্চারিত করিয়াছিল। অনাথনাথ একমাত্র কর্ণসর্ব্বস্ব হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

"কেঁদ না কেঁদ না বাছা কাতর অন্তরে ;
আমি এই চলিলাম অভয় দিতে বিজয়বসন্তেরে।
আমি আছি সদা,
ভক্তের প্রেমে বাঁধা,
(তা কি তুমি জান না হে?)
আমি মশানে করেছি রক্ষা সাধু শ্রীমন্তেরে।"

অনাথনাথের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিতেছিল, এই গীতে তাহা চরিতার্থ হইল। তাঁহার হৃদয়বীণা ও কিশোরীর হৃদয়-বাঁশী প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভায় নিনাদিত হইয়া একই তানে বাজিতেছিল। তাঁহার আবার ভ্রান্তি হইল ; তিনি ভাবিলেন, এই তরুণী সত্য সত্যই শ্রীমন্তের বিপৎসঞ্চারিণী এবং মশানে রক্ষাকারিণী "কমলে কামিনী।"

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুক্তকেশী

নৌকা তাঁহার বজরার নিকটস্থ হইলে অনাথনাথ দেখিলেন, হালে দুর্গাপ্রতিমার মত একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা, এবং তাহার সম্মুখে নৌকার ছাদের উপর বসিয়া চারি পাঁচ বৎসরের একটি অতি সুন্দর শিশু। দুইটিই স্নেহমণ্ডিত মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি। কোমলতা, স্নেহ ও লাবণ্য, উভয়ের দেহ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। দেখিলেই বোধ হয়, উভয়ের মধ্যে যেন ভ্রাতা-ভগ্নীর মত স্নেহসম্পর্ক। যে দু'জন দাঁড় টানিতেছিল, অনাথনাথের তাহাদিগকে স্বামি-স্ত্রী বলিয়া বোধ হইল, এবং উভয়ের উৎকট দাম্পত্যপ্রেমালাপ শরতের দক্ষিণানিল এইরূপে তাঁহার কর্ণে আনিতে লাগিল।

স্বামী। না, সম্মুখে যদি বজরা দেখিয়া থাক, উহা স্থানীয় জমিদারের হইবে। নৌকা তাহার কিঞ্চিত দূরে উত্তরে লাগাও।

স্ত্রী। তোর যেমন বুদ্ধি, উত্তরে কেন, দক্ষিণে লাগাও।

স্বামী। দক্ষিণের বাতাস। দক্ষিণে লাগাইলে আমাদের নৌকার বাতাস ও রান্নার ধোঁয়া জমিদারের বজরায় যাইবে, তিনি বিরক্ত হইবেন।

স্ত্রী। এখন বুঝি দক্ষিণের বাতাস? অন্ধ কি সাধে! বাতাস যে উত্তরদিক্ হইতে বহিতেছে, তাহাও টের পাইতেছ না? আর কোথাকার জমিদার যে, তাহার ভয়ে আমরা উত্তর দিকে নৌকা লাগাইব? লাগা নৌকা দক্ষিণদিকে।

বালিকার মুখ ম্লান হইল, সে সভয়ে নৌকা দক্ষিণদিকে লাগাইতেছিল, এমন সময়ে অনাথনাথের নৌকার মাঝি ও ভৃত্যগণ গর্জ্জন করিয়া নৌকা উত্তরদিকে লাগাইতে বলিল।

স্ত্রী। ওরে নবাব সিরাজদ্দৌলার বেটা রে! ওদের হুকুমমত নৌকা লাগাইতে হবে!

"কি! থাক্ মাগি!"—বলিয়া বজরা হইতে ভৃত্যগণ লাফাইয়া ডাঙ্গায় পড়িতেছিল। অনাথনাথ তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন।

রমণী তখন তাহার স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"আমাকে ইহারা গালি দিতেছে, মারিতে আসিতেছে, আর তুই ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া আছিস্। অন্ধ আর কাহাকে বলে?"

স্বামী। আমি ত তখনই দক্ষিণদিকে নৌকা লাগাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

স্ত্রী। তুই নিষেধ করিয়াছিলি, না আমি নিষেধ করিয়াছিলাম? আমি বলিয়াছিলাম না, উত্তরের বাতাস বহিতেছে, নৌকা দক্ষিণে লাগান ভাল হইবে না? আমারই দোষ, সর্ব্বদা আমারই দোষ, আমি মন্দ।

শেষ কথা কটি রমণী তাহার বদনব্যাপী বিপুল নাসিকা হইতে নির্গত করিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে নৌকার 'পালা' পুতিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল,—"এখনও ধর্ম্ম আছে; এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উদয় হয়। আমি ভালমানুষের মত কথাটি বলিলাম, তার জন্য তাহারা এত গালি দিল, মারিতে আসিল। তার উপর স্বামীর এই গালি ও তিরস্কার। হা ঈশ্বর! তুমি ইহার বিচার করিবে। আমি মন্দ, আমার জিহবা বিষ, আর সকলের জিহবায় অমৃত।"

পালা পোতা হইলে উঠিয়া গিয়া বালিকাটিকে এক প্রস্থ প্রহার করিল,—"লক্ষ্মীছাড়ি! আমার খাস্, আমার কথা শুনিস্ না? আমি বলিলাম, নৌকা উত্তরদিকে লাগা, তুই দক্ষিণদিকে লাগাইলি কেন?" বালিকা চুপ করিয়া মার খাইল। রমণী নাসিকাপথে ক্রন্দন করিতে করিতে—যেন সমস্ত জগৎ তাহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে,—ছহির মধ্যে গিয়া শয্যা লইল। বজরার মাঝিমাল্লারা এই দৃশ্য দেখিয়া হাসিতে লাগিল।

বালিকা অশ্রুমোচন করিয়া ছহির মধ্যে গিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া সাধিতে লাগিল।—

"উঠ মা, নৌকাতে কিছুই খাবার নাই, কি রাঁধিব মা? গোপাল এখনই খিদেয় কাঁদিতে আরম্ভ করিবে; জমিদারের বজরার কাছে খেলা করিলে দু' পয়সা পাইতে পারিব।"

স্ত্রী। আমি যাইতে পারিব না, আমার শরীরে সুখ নাই। এক দিকে খাটিতে খাটিতে মরি; দিন রাত্রি অষ্ট-প্রহরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও অবসর পাই না। আমার সোনার শরীর মাটী হইল। তাহার উপর এই গাল।

স্বামী নৌকার 'পাছায়' বসিয়া তাম্রকূট সাজিতে সাজিতে নেপথ্যে ইহার টিপ্পনী করিয়া বলিতেছেন, "খাটুনির মধ্যে যাহা হইতেছে এই। মেয়েটি সমস্ত দিন বাজি করে, তাহার পর রাঁধে, তাই বাপ বেটা দুটো খাইতে পায়!"

পতিপরায়ণা পত্নী এই টীকা শুনিতে পাইলেন না; মাঝিরা শুনিল ও হাসিয়া উঠিল!

দাম্পত্যপ্রেমের এই মধুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় বজরা হইতে এক জন ভৃত্য ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমরা কি বাজিকর?" বৃদ্ধা উত্তর করিল,—"হাঁ। হুজুর কি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের বাজি দেখিবেন?" ভৃত্য বলিল,—"দেখিবেন, তোমরা শীঘ্র আইস।"

বেদেনী ঠাকুরাণী তখন অশ্রুজল মোচন করিয়া নৌকার ভিতর হইতে পূর্ব্ববৎ মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দিবে কি?" তাহার স্বামী বলিল—,"বাবুর যাহা খুসি দিবেন। তাহা কি আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়?" বেদেনী তখন আবার জীমূতমন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"তুই আবার আমার সঙ্গে লাগ্‌তে আসিলি, আমি বাবু টাবু চিনি না, এই খাটিয়া আসিয়াছি, যদি বাবু হয়, দুই টাকা দেয় ত খেল্‌ব।"

অনাথনাথ স্বীকৃত হইলেন, বেদেনীর মন তখন বড়ই প্রসন্ন হইল। সে আট গণ্ডার বেশী কখনই পায় নাই, তাহাতে দুই টাকা। তার উপর বাবুকে সন্তুষ্ট করিলে টাকাটা সিকাটা আরও কোন্ দিবেন না? তখন সে মধুর কণ্ঠে "এই আমরা আসিতেছি" বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া, সাজসজ্জা করিতে লাগিল।

আর পাঁচ মিনিট পরে ঢোল বাজাইয়া তাহারা বজরার সম্মুখে উপস্থিত হইল। বালক-বালিকা দুটি রাধাকৃষ্ণবেশে সজ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। বালিকার হাত ধরিয়া বালক আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মাথার চূড়া নাচিতেছে। ঢোলের শব্দ শুনিয়া সমস্ত দ্বীপের নরনারী ও বালকবালিকাগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে লোকারণ্য হইল, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খেলা আরম্ভ হইল। প্রথম বাজিকর নিজে কয়েকটি অদ্ভুত কৌশল দেখাইল। বেদেনীর খাটুনির মধ্যে মন্দিরাবাদন, এবং বালকবালিকা যে বেদের সঙ্গে সঙ্গে গান করিতেছিল, সময়ে সময়ে তাহার সঙ্গে তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠের যোগদান। তাহা না দিলেই ভাল হইত। বেদের খেলার সময়ে বালিকা ঢোল বাজাইতেছিল। তাহার পর সে ও বালক ধড়াচূড়া ও মুকুট খুলিয়া ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যায়াম দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের বোধ হইল, রমণীর দেহ নবনীতময়; তাহাতে অস্থি নাই। সেই নবনীতাঙ্গে অদ্ভুত শক্তি ও কৌশল। এক একটি ব্যায়াম দেখিতে দেখিতে অনাথনাথের হৃদয়ে তাহার জীবনের জন্য আশঙ্কা উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার চক্ষে জল আসিল; কিশোরী কখন চরণে মহিষের বক্রশৃঙ্গ বাঁধিয়া বহু ঊর্দ্ধে দুই খুঁটার মধ্যে টাঙ্গান দড়ির উপর দিয়া শিশুটিকে অঙ্কে লইয়া দ্রুতবেগে হাঁটিয়া যাইতেছে; কখন বা দড়ির উপর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া এক এক পা সরাইয়া নাচিতেছে; কখন বা শিশুটিকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া লুফিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিতেছে। অনাথ এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন যে, কিরূপে তরঙ্গে দোলায়মান তরীর হালে দাঁড়াইয়া সে "কমলে কামিনী"র অভিনয় করিতে পারিয়াছিল। কখন সে বেদিয়ার নাভিস্থ একটি উচ্চ বাঁশের উপর উঠিয়া, কখন এক পা, কখন এক হস্ত, কখন বক্ষঃ, কক্ষ, পৃষ্ঠমাত্র স্থাপন করিয়া নিরালম্ব নিরাশ্রয়ভাবে দীননয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়াছে। কখন সে চিৎ হইয়া

ক্ষুদ্রদেহলতাটিকে একটি চক্রে পরিণত করিয়া এবং বক্ষের উপর শিশুটিকে দণ্ডায়মান রাখিয়া, মাটী হইতে একটি ক্ষুদ্র দুয়ানি গোলাপসন্নিভ অধরোষ্ঠে তুলিয়া লইতেছে। তাহার সেই স্বেদাক্ত, কুসুমকোমল মুখখানি দেখিয়া, অনাথনাথের হৃদয় করুণায় উছলিয়া উঠিল। বালিকা তাঁহার এই করুণভাব লক্ষ্য করিতেছিল, এবং এক একবার তাঁহার দিকে সস্নেহ করুণ কাতর-দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। তাহার পর বালিকা এক আম্রের আঁটি পুতিল। কিঞ্চিৎ পরে, সে আঁটিতে বৃক্ষ হইল ; আরও কিছু পরে তাহাতে আম্র ফলিল। সকলে দেখিল, প্রকৃত আম্রের ডাল ও তাহাতে আম্রের ফল। সর্ব্বশেষে বাজিকর একটি ক্ষুদ্র শিবির প্রস্তুত করিল, তাহার ভিতর সেই বালিকা প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে বাজিকর বাহির হইয়া আসিয়া সম্মুখের আবরণ উন্মোচন করিল। দর্শকগণ সবিস্ময়ে দেখিল, বালিকা নয়ন মুদ্রিত করিয়া নিশ্চল স্বর্ণপ্রতিমূর্ত্তির মত একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি অগ্রভাগের উপর বসিয়া আছে।

কিশোরী তখন অবলম্বন-বিহীনা,
মুদ্রিত লীলাজনেত্র, বসি শূন্যোসীনা।
বিমুক্ত কবরী আলুলায়িত কুঞ্চিত,
করিয়াছে গ্রীবা অংস উরস আবৃত।
কেশ-অন্তরালে চারু মুখ অনিন্দিত,
শোভিতেছে পূর্ণচন্দ্র মেঘরেখাঙ্কিত।
ঈষৎ হেলিয়া গ্রীবা পড়িয়াছে বামে,
মাধুরী বসিয়া যেন করুণার ধ্যানে।
শোভিতেছে দেহলতা রক্তবাসাবৃতা,
সন্ধ্যার রক্তিমা যেন মেঘরেখাঙ্কিতা।
অবশ যুগল কর পড়ি অযতনে,
যেন অঙ্কপুষ্পপাত্রে চর্চ্চিত চন্দনে।
ক্রমে আরও মেঘাচ্ছন্ন হ'তেছে আকাশ,
বহিতেছে আরও বেগে সমুদ্রবাতাস।
কুঞ্চিত অলক কৃষ্ণ উড়িতেছে ধীরে,
তুলিয়া হিল্লোল নীল সরসীর নীরে।
মেঘাচ্ছন্ন সিন্ধুবেলা পর্ব্বত. কানন,
ঢোলের গম্ভীর শব্দ, সমুদ্রগর্জ্জন,
গাম্ভীর্য্যপূর্ণিত বাজিকরের সঙ্গীত,
সোনার প্রতিমা শূন্যে বসিয়া মূর্চ্ছিত।
নিরাশ্রয়া, দীনাহীনা, চেতনবিহীনা,
কি করুণা, কাতরতা, কিবা মধুরিমা,
ভাসিছে নিশ্চল মুখে দেহ অবয়বে,
কি যেন করুণা ভিক্ষা করিছে নীরবে!
শিশুটি সে মুখ-পানে চাহি অবিরল,
গাহিছে করুণকণ্ঠে নেত্র ছল-ছল।

বাজিকর কিছুক্ষণ পরে তরবারিখানিও সরাইয়া নিল, এবং অনাথনাথের দিকে চাহিয়া গদগদ-কণ্ঠে বলিল,—"ভানুমতি!"

অনাথনাথ এবার কাঁদিয়া ফেলিলেন, দর্শকমণ্ডলী স্তব্ধ, নীরব, নিশ্চল।

তৃতীয় অধ্যায়

অনাথা

কয়েক দিন হইতে বড়ই গরম পড়িতেছিল। শরৎকালে এমন গ্রীষ্ম কখনও অনুভব করে নাই। সে উত্তাপও কেমন এক রকমের। প্রকৃতির কেমন এক প্রকার নির্ব্বাতনিষ্কম্প ভাব। বসুন্ধরা যেন কি এক প্রকার সূক্ষ্ম প্রতপ্ত বাষ্পাকীর্ণা। সমুদ্রে সামান্য হিল্লোলমাত্র লক্ষিত হইতেছিল না। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিবার সময়ে, অনাথনাথ যেন স্থানে স্থানে গন্ধকের গন্ধ পাইয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে মেঘ হইতেছিল। বেলা প্রহরাতীত হইলে সমুদ্রগর্ভ হইতে যেন ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের পর মেঘ উঠিতে লাগিল, এবং কেমন লিক লিক করিয়া বাতাস বহিতে লাগিল। তিনি সেই ঋতুনুচিত গ্রীষ্ম অনুভব করিয়াই একটি দুর্য্যোগের আশঙ্কা করিতেছিলেন। এখন এই মেঘ দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা বদ্ধমূল হইল। অতএব এই মেঘের গতিক না বুঝিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবেন না, স্থির করিয়া, তিনি এক জন ভৃত্যের দ্বারা সেই বালিকা ও শিশুটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেদেনী নৌকায় ফিরিয়া ইতিমধ্যে তাহার মধুময় চরিত্রের আর একটি পালা অভিনয় করিতেছিল। অনাথনাথ ভানুমতীকে ২৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। আরও কিছু বেশী চাহিতে বেদেনী তাহাকে অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া, এবং তাহার কোটরস্থ চক্ষু ঠারিয়া, ইঙ্গিত করিয়াছিল। বালিকা কি যে করুণ স্নেহদৃষ্টিতে অনাথনাথের মুখের দিকে চাহিয়া হাত পাতিয়া রহিয়াছিল, সে ইঙ্গিত লক্ষ্য করে নাই কিংবা তাহার অর্থ বুঝে নাই। এই অপরাধে নৌকায় ফিরিয়া সে আর এক প্রস্থ মার খাইয়াছে। বেদেনী,—"পোড়ামুখি! দেখিলি না বাবুটি বোকা। ৷৷০ গণ্ডার জায়গায় ১৲ টাকা দিল, তাহার উপর আবার ২৲ টাকা বকসিস্। চাহিলে আরও কিছু দিত। বোকা না হইলে কি বাজি দেখিয়া চক্ষের জল ফেলে।" এই বলিয়া তিনি আবার শয্যা লইলেন। বালিকা চক্ষু মুছিয়া শিশুটির হাত ধরিয়া খাদ্য আনিতে বাজারে যাইতেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল। বেদেনীর মেজাজের আগুনে যেন জল পড়িল। সে বুঝিল বোকা বাবুটির কাছে আরও কিছু পাওয়া যাইবে। তখন সাদরে বালিকাকে বলিল—"মা! তোরা যা! আমি বাজার করিতে যাইতেছি, কিন্তু বাবু হইতে আরও ২৲ টি টাকা না লইয়া ফিরিস না। বাবু বড়লোক।"

বালক বালিকার সজল চক্ষু যেন আনন্দে হাসিল। তাহারা দুই জনে বাবুর বড় ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে যে করুণা, যে দয়া ও যে স্নেহ দেখিয়াছিল, এমন তাহারা দেখে নাই। এমন স্নেহপূর্ণ মধুর কথা তাহারা শুনে নাই। তাহারা আবার তাঁহাকে দেখিবে, আবার তাঁহার কথা শুনিবে, অতএব তাহাদের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বজরার মধ্যে প্রবেশ করিলে তাহার বহুমূল্য সজ্জায় প্রথম তাহাদের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগিল। অনাথনাথ তাহাদের গায়ে হাত দিয়া কতই আদর করিলেন। তাহার পর তাঁহার স্ত্রী,—তাহারা ভাবিল, "ইনি কি মানুষ?" তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপ্রতিমা। মাতৃস্নেহ যেন তাঁহার মুখ হইতে জ্যোৎস্নার মত ঝরিতেছে। এমন সুন্দরী, এমন স্নেহশীলা, তাহারা কখনও দেখে নাই। তিনি তাহাদিগকে একেবারে বুকে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন। দরিদ্র বেদের ছেলে মেয়েকে এত দূর দয়া, এত দূর স্নেহ কি মানুষে করিতে পারে? তাহার পর তাঁহাদের একটি পুত্র—সেটি কি ছেলে, না শরৎকালের প্রভাতকিরণমণ্ডিত কুসুমরাশি? তাহার সেই আয়ত চক্ষু, সরল স্নেহ-ভরা মুখ, এবং সর্ব্বশেষে তাহার সেই মধুর কথা। সে তাহার পিতার একটি ক্ষুদ্র প্রতিচিত্রের মত। সে একেবারে ছুটিয়া আসিয়া বালিকার গলা জড়াইয়া তাহার কোলে বসিয়া কত মধুমাখা কথায় তাহার বাজির প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার নাম অমিয়। উভয়েরই একই বয়স। শীঘ্র

উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুতা জন্মিল। অনাথনাথের পুত্রের খেলার ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। দুই শিশু চিরপরিচিত বন্ধুর মত খেলিতে লাগিল। শিশুর মত সরল সমদর্শী বুঝি মহাযোগীও নন। তাই বুঝি মহর্ষি খৃষ্ট বলিয়াছেন,—

"দেও ওই শিশুদের আসিতে নিকটে মম!
স্বর্গ রাজ্য তাহাদের, যারা শিশুদের সম।"

নৌকাতে নানাবিধ খাদ্য ছিল। অনাথনাথের পত্নী বড় আদরে দুটিকে খাওয়াইলেন। তাঁহাদের দুজনের দয়া তাঁহাদের জমিদারিতে প্রবাদের মত প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রজাদিগকে সন্তানের মত স্নেহ করিতেন। তাহাদের সুখে সুখী, তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন, এবং দুঃখের উপশম করিতে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। প্রজারা তাঁহাদিগকে দেবতার মত পূজা করিত। এই দরিদ্র দেশে প্রজাভূম্যধিকারীর এই সম্পর্ক নিয়ম ছিল। এখন জটিল আইন ও আইন-ব্যবসায়ীদের কল্যাণে তাহার ব্যতিক্রম হইয়া উঠিলেও এখনও দুই এক স্থানে, বিশেষতঃ বুনিয়াদি জমিদারে দৃষ্ট হয়।

বালকবালিকা আহার করিলে অনাথনাথ বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি?"

উত্তর। ভানুমতী।

প্রশ্ন। তোমার অন্য কোন নাম নাই?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। এই বেদে কি তোমার পিতা?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তোমার পিতা তবে কে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তোমার মাতা কে?

উত্তর। জানি না।

বালিকা অধোমুখে অতিশয় করুণ বিষন্ন ভাবে উত্তর দিতেছিল।

প্রশ্ন। তুমি কোথায় ইহাদের সহিত মিলিত হইলে?

উত্তর। জানি না।

প্রশ্ন। তুমি কেন ইহাদের সঙ্গে মিলিত হইলে?

উত্তর। অদৃষ্ট।

অনাথনাথ শুনিলেন, বালিকা বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে তাঁহার শেষ প্রশ্নের উত্তর দিল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার প্রশ্নে বালিকার মর্ম্মস্থলে আঘাত করিয়াছে, এবং তাহার মনে গভীর শোকের সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার পত্নীর নয়ন সজল হইল। অনাথনাথ আর তাহার পরিচয় লইবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে একটি গান গাইতে বলিলেন, এবং নিজে হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিলেন।

বালিকা। কি গাইব বাবা?

অনাথ। তুমি কি কীর্ত্তন জান মা?

উত্তর। জানি।

বালিকার 'বাবা' সম্বোধনে অনাথনাথের কর্ণে, এবং তাঁহার 'মা' সম্বোধনে বালিকার কর্ণে যেন অমৃত সঞ্চারিত হইল। দুটি প্রাণ যেন সেই অমৃতের সঙ্গে দ্রবীভূত, মিশ্রিত হইয়া গেল। বালিকা হারমোনিয়মের সঙ্গে অতি কোমল করুণ কণ্ঠে স্থানীয় কবি ত্রিপুরা-চরণ রায়ের একটি গীত গাহিতে লাগিল,—

১

বাছারে জীবন-জুড়ানে! এস বস কাছে!
বেঁধে দি ধড়া চূড়া,
ও বাপ! গোঠের বেলা ব'য়ে গেছে!

২

বেণু স্বরে ডাকছে বলাই,—
আয় আয় আয় রে কানাই,
তুই বিনে যে যায় না রে গাই।
তোর পানে চেয়ে আছে।

৩

বাছা রে। তোর মা মাথা খা,
গহিন বনে যাস্‌নে একা।
তুই বিনে প্রাণ যায় না রাখা,
তোর মুখ চেয়ে বাঁচে।

মাতৃপ্রেমের উচ্ছ্বাসে অনাথনাথের পত্নীর নয়ন অশ্রু-জলে ছল ছল করিতে লাগিল। অনাথনাথ বলিলেন,—"তুমি মা পদাবলী জান?"

উত্তর। জানি।

হারমোনিয়মে মধুর পদাবলীর প্রাণদ্রবকর সুর বাজিয়া উঠিল। বালিকা তাহার সঙ্গে কণ্ঠ আরও কোমল আরও করুণ করিয়া, গাইতে লাগিল,—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে
সকলি-গরল ভেল। ইত্যাদি।

এবার অনাথনাথের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। গীত শেষ হইলে তিনি আত্মহারা হইয়া বজরার গবাক্ষপথে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ গীত যে প্রেমের উচ্ছ্বাস, সে অনন্ত প্রেম-সমুদ্র যেন তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ তুলিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। কিন্তু তাঁহার সরলা পত্নী পদাবলীর এই উচ্চ প্রেমের ভাব গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মাতৃপ্রাণে মাতৃপ্রেমের সরল ভাব প্রীতিপ্রদান করিত। তিনি বলিলেন "মা! তুই শ্যামা বিষয়ের গান জানিস?" বালিকা এক একবার তাঁহার মাতৃপ্রেমপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া, এক একবার সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, গাইতে লাগিল,—

"মা! আমি তোর কি করেছি?
শুধু তোরে জনম ভরে মা বলে মা! ডেকেছি।
চিরজীবন পাষাণীরে!
ভাসালি আঁখি-নীরে,
চিরজীবন দুখানলে জ্বলেছি।
আঁধার দেখে তরাসেতে
চাহিলাম তোর কোলে যেতে,
আমারে ত কোলে তুলে নিলি না;—
মা-হারা শিশুটির মত,
কেঁদে বেড়াই অবিরত,

নয়নের জল মুছায়ে ত দিলি না,—
সন্তানেরে ব্যথা দিয়ে,
যদি মা, তোর জুড়ায় হিয়ে,
ভাল ভাল তাই তবে হোক,
অনেক দুঃখ সয়েছি।"

বালিকা তাহার করুণকণ্ঠে ভৈরবীরাগিণীর চিত্তদ্রবকারী মূর্চ্ছনা খেলাইয়া তাঁহার মুখের দিকে কাতর ছল ছল বিস্মিত নয়নে চাহিয়া "মা" বলিয়া গাইতেছিল। অনাথনাথের পত্নীর হৃদয় মাতৃপ্রেমোচ্ছ্বাসে আকুল হইল। তাঁহার ফুল্লকোকনদসন্নিভ কপোল বহিয়া দুই প্রেমধারা বহিতে লাগিল। গীত শেষ হইলে তিনি ছুটিয়া গিয়া বালিকাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিয়া বলিলেন,—"মা! আমি তোর মা! আমি তোকে বুকে বুকে রাখিব, তোকে মেয়ের মত রাখিব, তুই আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবি না।" বালিকাও কাঁদিতে লাগিল। অনাথনাথেরও অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বেদে শিশুটিও সজল চক্ষে তাঁহার পত্নীকে বলিল,—"মা! তুমি দিদিকে লইয়া যাও। দিদির বড় দুঃখ। দিদিকে মা বড় মারে।"।

বালিকার মাথা অনাথনাথের পত্নীর বুকে। বালিকা শিশুটিকে বক্ষে লইয়া সজলনয়নে ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"হারে গোপাল! তুই আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিবি?"

উত্তর। পারিব। তুমি ত আর মার খাইবে না। এই মা যে এমন করিয়া তোমায় আদর করিবে।"

অনাথনাথের শিশুও এমন সময়ে গোপালের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বালিকাকে জড়াইয়া ধরিয়া ও সস্নেহে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল,—

"গোপালও যাইবে, আমার সঙ্গে খেলিবে, আমাকে বাজি দেখাইবে। আমিও তোমাকে গোপালের মত আদর করিব। কেমন দিদি! যাইবে? বল, যাইবে।"

বালিকা তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ বহুবার চুম্বন করিল, এবং তাহার চক্ষের জলে সে ক্ষুদ্র মুখখানি সিক্ত গোলাপ ফুলটির মত করিয়া তুলিল।

অনাথনাথের পত্নী আবার বলিলেন,—"সত্যি মা! তুই যাবি?"

বালিকা অঞ্চলে নয়নের জল মুছিয়া বলিল, "মা"—সেই মা সম্বোধনে সে কি মধুরতা, কি প্রাণের আবেগই ঢালিল! বলিল,—"মা! এমন করুণাসাগর দেবদেবীতুল্য পিতা মাতা পাইব, তাঁহাদের চরণসেবা করিব, অভাগিনীর পক্ষে ততোধিক সৌভাগ্য কি হইতে পারে? কিন্তু মা, এই অন্ধ পিতার ও পাগলী মাতার উপায় কি হইবে? তাহাদিগকে এ সাগরে ভাসাইয়া কেমন করিয়া যাইব?"

অনাথনাথ সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"কি! বাজিকর অন্ধ!"

বালিকা বলিল, "অন্ধ! অভ্যাসবশতঃ তিনি এমন কঠিন বাজি সকল এমন সুচারুরূপে করেন।"

চতুর্থ অধ্যায়

রণরঙ্গিণী

দ্বিতীয় প্রহর বেলা। আকাশমণ্ডল
ঘনকৃষ্ণ মেঘাচ্ছন্ন। কৃষ্ণ ঘোরতর,
উঠিতেছে সিন্ধুগর্ভ হইতে উত্তাল
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ; মহাদৈত্য মত,
মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিতেছে বেগে।
মহাকালী প্রকৃতির যেন মহাসেনা
ছুটিয়াছে মহাহবে প্রচণ্ড বিক্রমে।
কি যেন ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লব ভীষণ
আসন্ন করিতে বিশ্ব দলিত পেষিত।
অল্প অল্প বৃষ্টিধারা ; থাকিয়া থাকিয়া
সবেগে বহিছে বায়ু উড়াইয়া ধারা,
ছুটাইয়া বেগে সিন্ধুগর্ভে ঘোরতর
কৃষ্ণমেঘছায়াচ্ছন্ন তরঙ্গের পর
তরঙ্গ বিশালতর লহরে লহরে।
স্তম্ভিতা প্রকৃতি-বক্ষে কি যেন উচ্ছ্বাস,
ঘোর বিশ্বসংহারক হইতে নির্গত
চাহিতেছে মহাবাতে মহা বরিষণে,
সিন্ধুর তরঙ্গভঙ্গে, ভীষণ গর্জ্জনে।

অমিয়কে কোলে লইয়া অনাথনাথের পত্নী একটি গবাক্ষের কাছে বসিয়া বিস্তৃতনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন। অনাথনাথও বিস্তৃতনয়নে অধোমুখে গম্ভীরভাবে বজরার বক্ষে ধীরে ধীরে পদচারণ করিতেছিলেন, এবং থাকিয়া থাকিয়া গবাক্ষপথে চাহিয়া, পত্নীর সঙ্গে কি গুরুতর পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহারা কেহই যে প্রকৃতির সেই ভীষণ ভাব অবলোকন কি লক্ষ্য করিতেছিলেন, তাহা বোধ হইল না। বজরা যে তরঙ্গাঘাতে টলিতেছিল, সেই টলন যে তাঁহারা অনুভব করিতেছিলেন, কি সেই তরঙ্গাঘাত যে তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল, এমন বোধ হইতেছিল না। শিশু অমিয়ও যেন তাহার কিছু বুঝিতেছে না। সে কেবল তাহার জননীর চিবুক ধরিয়া একবার তাঁহাকে বলিতেছিল, “হাঁ মা! উহাদিগকে আমাদের সঙ্গে লইয়া চল।” অন্যমনস্কা জননীর কাছে কোনও উত্তর না পাইয়া আবার কাতরভাবে তাহার পিতাকে বলিতেছিল, “হাঁ বাবা। তুমি উহাদের সঙ্গে লইয়া চল, উহাদের বড় দুঃখ। কিন্তু কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন? অজ্ঞাতকুলশীলা একটি বালিকাকে লইয়া গিয়া কি করিবেন? সে কি উপস্থিত জীবন ছাড়িয়া অন্য জীবন গ্রহণ করিবে? তাঁহারা কি তাহাকে সুখী করিতে পারিবেন? বালিকাটিই বা কে? তাঁহারাও এই বিষয়েরই পরামর্শ করিতেছিলেন। প্রকৃতির বক্ষের মত তাঁহাদের হৃদয়ও কি এক অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল। সেই রুদ্ধ উচ্ছ্বাস যেন অশ্রুতে এবং আবেগতরঙ্গময়ী ভাষায় প্রকাশিত হইতে চেষ্টা পাইতেছিল। শেষে একটি পরামর্শ স্থির করিয়া সেই বেদে ও তাহার প্রেমময়ী ভার্য্যাকে ডাকাইলেন। তখন দর্শকগণ চলিয়া গিয়াছে। সমুদ্রতীরে জনমানবের চিহ্ন মাত্র নাই।

বেদে প্রৌঢ়, দেখিতে যেন ভালমানুষ ; আর বেদেনী তাহার ঠিক বিপরীত। তাহার

গোবরের বর্ণ, স্থূল অঙ্গ, চক্ষু কোটরস্থ, নাসিকা বিপুল, কিন্তু অগ্রভাগের উপর দিয়া যেন কি একটা বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। মুখের এমনি এক বিকট ভঙ্গী যে, বজরার মধ্যে অমিয় তাহাকে দেখিয়া ভীত হইয়া তাহার মায়ের কোলে লুকাইল।

অনাথনাথ বেদেকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভানুমতী কি তোমার মেয়ে?" সে উত্তর করিল,—"না"।

বাবু ডাকিয়াছেন শুনিয়া, বেদেনী তাঁহার প্রতি বড় প্রসন্না হইয়া আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, তাহার ছেলেমেয়ের উপর বোকা বাবুটির একটা ভালবাসা হইয়াছে। তাহার সূচ্যগ্রবৎ তীক্ষ্ন বুদ্ধি। অনাথনাথের প্রশ্নমাত্রই সে বুঝিতে পারিল যে, ভানুমতীর উপর অনাথনাথের বিশেষ চক্ষু পড়িয়াছে, এবং তিনি তাহাকে কোনরূপ বিশেষ আনুকূল্য করিবেন। সে যদি তাহার কন্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে না পারে, কিংবা তাহার উপর কোনরূপ বিশেষ অধিকার দেখাইতে না পারে, তবে সে সেই আনুকূল্যের ভাগ পাইবে না। অতএব সে বেদের উত্তরে মহা চটিয়া গেল! তাহার মেজাজটা স্বভাবতই পঞ্চমে বাঁধা থাকে, উহা একেবারে সপ্তমে উঠিল। সে সেই অপূর্ব্ব সানুনাসিক স্বরে তাহার অযোগ্য স্বামীকে তিরস্কার করিয়া বলিল,—"আহাম্মকের কথা শুন? তোর মেয়ে নয় ত কার মেয়ে রে?" তারপর অনাথনাথের পালা। সে তাঁহার দিকে তাহার বিকট মুখ ফিরাইয়া এবং তাহার একটা বিকট ভঙ্গী করিয়া বলিল,—"আমার মেয়ে নহে ত কি তোমার মেয়ে? তোমার কথা শুনে যে গা জ্বালা করে।" তাহার পর আবার হতভাগ্য স্বামীর পালা—"কাণা না হ'লে কি এমন কথা বলে?" তাহার পর সে বুঝিল যে, কেবল তিরস্কার করিলে—বাবু বিশ্বাস করিবেন না। 'আহাম্মক' স্বামীর উত্তরটা কাটাইয়া দিতে হইবে। তখন সে বলিল,—"বাবু। তুমি ইহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিও না! ওর বুদ্ধিশুদ্ধি কিছুই নাই, তাতে আবার কাণা! এই যে চোখ দেখছ, এতে কিছুই দেখিতে পায় না। আমি হাড় কালী করিয়া, খাটিয়া, উহাকে খাওয়াই, তাহাতে উহার চলে। ও 'না' বলিল কেন, তা জান? মেয়েটি আমার পূর্ব্ব স্বামীর! তাই ওর মেয়ে নয় বলিয়াছে।" তখন আবার স্তম্ভিত স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"ওকে আপনার মেয়ে বলিতে যেন ওঁর লজ্জা হয়, পোড়া কপাল আমার! আমি এমন কাণার হাতেই পড়িয়াছি। আমার শরীরটা জ্বলিয়া কাল হইয়া গেল।" ক্রমে সানুনাসিক স্বর বর্দ্ধিত হইয়া কৃত্রিম রোদনে পরিণত হইল, এবং অঞ্চলের দ্বারা কোটরস্থ চক্ষু দুটি মার্জ্জিত হইতে লাগিল।

অনাথনাথ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"কই, মেয়েটি ত তোমাদের মেয়ে—বলিল না। সে ত বলিল, তাহার মা বাপ কে, সে জানে না।"

একেবারে শিমুলস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়া ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বেদেনী ক্রোধে অধীরা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল,—"কি! সেও আমার মেয়ে বলিয়া বলে নাই! তারও আমাকে মা বলিতে লজ্জাবোধ হয়, পোড়ারমুখী! আমি আসি, তুই কোন্ বাদশাজাদী, আমি এখনই ঝাঁটার চোটে পরিচয় লইব।"

রমণীরত্ন উঠিয়া যাইতেছিলেন, অনাথনাথ যাইতে নিষেধ করিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ কর্ত্তৃত্বভাবের সহিত বলিলেন,—"যাইও না, ব'স! তুমি সকাল হইতে মেয়েটিকে দুবার মারিয়াছ।"

সেই কণ্ঠ শুনিয়া ও সেই কর্ত্তৃত্বভাবাপন্ন মুখ দেখিয়া সে কিছু ভীত হইল, এবং বসিয়া বলিল,—"মারিব না? মারিব না? এমন পোড়াকপালী মেয়েও গর্ভে ধরিয়াছিলাম। আমাকে যেখানে সেখানে গাল খাওয়ায়—ওর জন্যে আমার যেখানে সেখানে গঞ্জনা!" বেদেনী সানুনাসিক স্বরে কাঁদিতে লাগিল, এবং চক্ষু মুছিতে লাগিল।

অনাথনাথের পত্নী মনে করিলেন, অভাগিনী যে পোড়াকপালী, তাহার আর সন্দেহ নাই। এমন দেবীতুল্য মেয়ে না হ'লে এমন পাপিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অনাথনাথ আবার সেইরূপ গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন,—"তোমার মেয়ে হউক, আর যার মেয়ে হউক; মেয়েটিকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি আমার বড় স্নেহ হইয়াছে। মেয়েটিকে আমাকে দিতে হইবে। তোমরা টাকা চাও দিব, জায়গা চাও, আমার এ জমিদারীতে জায়গা দিব। বাড়ী ঘর করিয়া দিব,—তোমরা যাহাতে আর এ ব্যবসা না করিয়া একজন ভাল গৃহস্থের মত থাকিতে পার।"

বেদে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে মেয়েটিকে বড় ভালবাসিত। অনাথনাথ জমিদার। তিনি মেয়েটিকে যখন এরূপ করিয়া চাহিতেছেন, তখন তাহাকে কত সুখেই রাখিবেন! তাহার নিজেরও বাড়ী, ঘর, জায়গা জমী করিয়া দিবেন। অন্ধের প্রতি ইহার অপেক্ষা দয়া আর কি হইতে পারে? সে আনন্দে অধীর হইল, এবং কৃতজ্ঞতাসূচক গদগদ-কণ্ঠে বলিল,—"অন্ধ ভিখারীর প্রতি বাবুর এই দয়া! বাবুকে ঈশ্বর আরও বড়মানুষ করুন! বাবুর সোণার কলম রূপার দোয়াত হউক!" তাহার আর বাক্য সরিল না।

বেদেনীও হাতে চাঁদ পাইল। সে বাবুটিকে আরও বোকা সাব্যস্ত করিল। সে মনে মনে সংকল্প করিল, এ চাঁদ পূর্ণিমার চাঁদ, সোণার চাঁদ করিতে হইবে। সে রুক্ষ কণ্ঠে বলিল,—"ভাল দয়া! আমার পেটের মেয়েটি, আমার সাত রাজার ধনটি, এ'কে দিব, আর উনি আমাকে একটা ঘর আর একটু জমী দিবেন। কাজ নাই ওঁর দয়ায়। আমরা গরিব মানুষ, গতর খাটাইয়া খাইব। আমার মেয়ে থাকিলে আমি বাজি করিয়া কত টাকা পাইব। আমি লাখ টাকা পাইলেও আমার মেয়ে দিব না।" এ বলিয়া সে গাত্রোত্থান করিল।

অনাথনাথ বুঝিলেন এ সহজ পাত্র নহে। তাহার সঙ্গে শিষ্টালাপে চলিবে না। তখন তিনি চক্ষু রাঙ্গা করিয়া ক্রোধাকুল কণ্ঠে বলিলেন,—"বটে! তবে আমি তোকে লাখ টাকা খাওয়াইতেছি! তোর মত পাপিষ্ঠার এরূপ কন্যা কখনও হইতে পারে না। ভানুমতী আমাকে নিজে বলিয়াছে, তাহার পিতা মাতা নাই। আমি তাহাকে জোর করিয়া লইয়া যাইব!"

বেদেনী এতক্ষণে বুঝিল, লোকটা তত বোকা নহে। আরও বুঝিল যে, গতিকটা ভাল নহে। আর ভানুমতীকে তাহার কন্যা বলিলে চলিবে না। তখন সে পটপরিবর্ত্তন করিয়া বড় প্রসন্নমুখে বলিল,—"বাবু আপনি বড় লোক; আপনি রাগ করিবেন না। আসল কথা,—মেয়েটি বড় সুন্দরী দেখিয়া বাজি শিখাইবার জন্যে অনেক টাকা দিয়া এক বৈরাগীর কাছ থেকে আমার পূর্ব্ব স্বামী কিনিয়া লইয়াছিল। আমার টাকার কি হইবে?"

অ। কত টাকা?

বে। ঢের টাকা।

অ। কত?

বে। ৫০০৲ টাকা।

অ। বেশ কথা; আমি তাহা দিব।

বে। তার পর তাহাকে এই ২০ বৎসর খাওয়াইয়াছি,—পরাইয়াছি। আমার সে খরচের টাকা কে দিবে?

অনাথনাথ এবার একটুকু হাসিলেন। কারণ মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ বৎসরের বেশী হইতে পারে না। তথাপি তিনি বলিলেন,—"আচ্ছা, তাহাও আমি দিব!"

বে। তার পর এই ২০ বৎসর তাহাকে বাজি শিখাইয়াছি। আমার সে টাকা কোথায় পাইব?

অনাথনাথ তাহার জন্যেও টাকা দিতে স্বীকার করিলেন।

বে। তার পর সে আমাদের সঙ্গে থাকিয়া বাজি করিলে—সে আরও ৩০ বৎসর বাজি করিতে পারিবে,—সে টাকাটা এক বার হিসাব করিয়া দেখ।

অনাথনাথ তাও হিসাব করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

বে। তার পর এ সব টাকা আমাকে দিতে হইবে। তাহার উপরে অন্ধকে দয়া করিয়া তুমি যেরূপ বাড়ী ও জায়গা জমী দিবে বলিয়াছ, তাহা তো দিবেই।

এতক্ষণে এ পাপিষ্ঠার প্রাপ্য তালিকার শেষ হইল দেখিয়া, অনাথনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার বক্ষ হইতে একটা গুরুভার নামিয়া গেল; কারণ তিনি বালিকাকে এই পিশাচীর হস্ত হইতে যেরূপে হউক উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এমন সময়ে প্রবলবেগে ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বেগে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সমুদ্র ও আকাশ ভয়ঙ্কর আকৃতি ধারণ করিল। বজরা উলট পালট হইতে লাগিল। আকাশে বিকটাকার ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ডের পর ঘনকৃষ্ণ মেঘখণ্ড ভীষণবেগে ছুটিতেছে। মধ্যে মধ্যে মেঘবিচ্ছেদে আকাশ দেখা যাইতেছে। আকাশের সেই নীলকৃষ্ণ বিচিত্র আকৃতি এবং ঝড়ের ঘূর্ণ্যমান-ভাব লক্ষ্য করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন যে,—একটা ভীষণ ঘূর্ণ্যবাত্যা (cyclonc), যাহা তিনি ২।৩ দিবস যাবৎ আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহা আগত প্রায়। তিনি ব্যস্ত হইলেন, এবং কাল উপস্থিত কথার একটা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া তাহাদিগকে টাকা, বাড়ী ও জমি দিবেন বলিয়া, বেদেনীকে বিদায় করিয়া বলিলেন,—"ঝড় বেশী হইলে তোমরা আমার কাছারীতে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিও।" তাহারা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার বজরার বন্ধনাদি দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময়ে শুনিলেন যে. বালিকা তাঁহার নৌকায় বসিয়া আকাশ ও সমুদ্রের সম্মিলনের দিকে চাহিয়া—আর এক জন স্থানীয় কবির রচিত গীত গাহিতেছে।

১

কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে.
নাচে কালী রণরঙ্গিণী!
কালী বল, কালা বল,
নাচে কাল-বক্ষে কাল-কামিনী;
নাচে কালী কাল-কলনী।

২

নিশ্চল পুরুষ বক্ষেতে তামসী
নাচিছে প্রকৃতি, করে ধ্বংস-অসি.
ছিন্ন শির, কি রুধির
প্লাবে শ্যাম অঙ্গ.—শ্যাম-অবনী!

৩

দুই কর লয়. দুই বরাভয়,
—লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,—
সদা শিব, ঊর্দ্ধগ্রীব
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

৪

প্রকৃতি উলঙ্গ।—মাতা বিবসনা,
ললাটে অনল, অঙ্গার-বরণা,
চারি ভুজ, ত্রিনয়ন,
ও মা! ধ্বংসরূপে সর্ব্বব্যাপিনী।

৫
জরা ব্যাধি আদি বিকৃতা কিঙ্করী,
নাচে রণ-রঙ্গে ধ্বংস-সহচরী,
অট্টহাস, কি উল্লাস,
ধরা শ্মশানে নৃমুণ্ডমালিনী।

৬
জন্মে চণ্ড মুণ্ড সৃষ্টি-বিবর্ত্তনে,
রক্তে পশুবীজ রক্তবীজ সনে,
কদাকার, দুরাচার
নাশি', সৃজিলে মানব, জননি।

৭
ঘোর অমানিশি, হৃদে ওমা! আসি
নাচ, রক্তবীজ—কাম ক্রোধ গ্রাসি',
চণ্ড—ক্রোধ, মুণ্ড—দ্বেষ,
নাশি', কর সুর-রাজ্য অবনী।

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্গা

অপরাহ্ন ৩টা হইতে প্রকৃত ঘূর্ণ্যবাত্যা (cyclone) বহিতে আরম্ভ হইল। ঝড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া, থাকিয়া থাকিয়া, এরূপ বেগে বহিতে লাগিল, এবং তরঙ্গে অনাথনাথের বজরা তীরে এরূপ আহত হইতে লাগিল যে, আর উহাতে থাকা তিনি নিরাপদ মনে করিলেন না। তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার নিকটবর্ত্তী কাছারি-বাটীতে যাইবেন, স্থির করিলেন; কিন্তু যাইবেন কিরূপে? এরূপ ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে যে, বজরা হইতে মুখ বাহির করিবার সাধ্য নাই। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে ঝড়ে বজরার গবাক্ষ উড়াইয়া লুইতে লাগিল, এবং ভীষণ বিক্রমে ঝড় বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সম্মুখে বসন বিছানা যাহা পাইলেন, তাহার দ্বারা তাঁহার স্ত্রীকে আবৃত করিয়া ও আপনি ক্রোড়স্থ শিশু পুত্র সহ আবৃত হইয়া বজরা হইতে অতি কষ্টে অবতীর্ণ হইলেন, এবং কাছারীর দিকে চলিলেন। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে বাম হস্তে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন, কিন্তু সাধ্য কি, এক পা অগ্রসর হইবেন? ঝড়বেগ তাঁহাদিগকে এক দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। গায়ের আবরণ ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা বন্দুকের গুলির মত শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহারা কাঁপিতে লাগিলেন, কাঁদিতে লাগিলেন, শেষে চলিতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন। সিন্ধুগর্জ্জনে ও ঝটিকা-গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের বোধ হইল, যেন মহাবিক্রমে ধরা প্লাবিত করিতে সিন্ধু ঘোর গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ইতিমধ্যেই—এই ৩টা ৩।॰ টার সময়ই,—প্রায় চারি দিক সন্ধ্যার মত অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। অবিরল বৃষ্টিধারায় যে ক্ষীণালোক আছে, তাহাতেও কিছুই দেখিতে দিতেছে না। তাঁহার ভৃত্য ও মাঝিগণ আসিয়া তাঁহাদিগকে ধরিল, এবং জড়াইয়া লইয়া হাহাকার করিতে করিতে তাঁহাদিগকে জড়পদার্থের মত লইয়া চলিল। কাছারি, গ্রাম, পাহাড়, সমুদ্র, কিছুই দেখা যাইতেছিল না। বৃষ্টি এরূপ বেগে পড়িতেছিল যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য ছিল না। চক্ষে যেন কঙ্কর প্রবিষ্ট হইতেছে, ঝড়ের বেগে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা কেবল গর্জ্জনমাত্র লক্ষ্য

করিয়া এবং উহা পশ্চাতে রাখিয়া, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার কাছারি-বাটী সমুদ্রের তীরে বলিলেও চলে। তথাপি ঝড়ের বেগে ঘুরিয়া ফিরিয়া, পড়িয়া, উঠিয়া, প্রায় এক ঘণ্টাকাল পরে, তিনি মৃতবৎ পত্নীপুত্র সহ কাছারিতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে প্রাণ আরও শুকাইয়া গেল। কাছারির গৃহ সকল নরনারী ও শিশুতে, কোলাহল ও ক্রন্দনধ্বনিতে, এরূপ পরিপূর্ণ যে, সেখানে দাঁড়াইবার স্থান নাই, কথা কহিবার সাধ্য নাই। তিনি বুঝিলেন যে, প্রজাদের ঘর বাড়ী সকলই পড়িয়া গিয়াছে। তাহারাও তাঁহার মত অর্দ্ধমৃতাবস্থায় কাছারিতে আশ্রয় লইয়াছে। অনাথনাথকে দেখিয়া তাহারা সকলেই প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। সকলে বলিতে লাগিল, —"বাবা! বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের কি উপায় হইবে?" কেহ বলিতেছিল, —"ওরে বাড়ী ঘর যাক্, এখন জান্ থাকিলে হয়।" কেহ—"আমার ছেলে কোথায় গেল," কেহ বা—"মেয়ে কোথায় গেল"—কেহ বা "আমার বুড়া মা-বাপ কোথায় গেল"—বলিয়া হাহাকার করিয়া কাছারি হইতে তাহাদের অন্বেষণে উন্মত্তের মত ছুটিয়া যাইতেছে। অনাথনাথের কাছারি ও ছোট ছোট ঘর সকল পড়িয়া গিয়াছে, কেবল কয়েকখানি বড় ঘর আছে, কিন্তু ঝড়ের প্রত্যেক আঘাতে সশব্দে এরূপ কম্পিত হইতেছে যে, তাহাও যে বহুক্ষণ থাকিবে, এমন বোধ হইল না। অনাথনাথ পত্নীপুত্রসহ আর্দ্র বসনাদি ত্যাগ করিয়া কাছারিস্থ ভৃত্যাদিগের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া একখানি তক্তপোষের উপর বসিলেন। প্রজাদিগের এই দুরবস্থা দেখিয়া তখন তিনি আপনার বিপদ ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রথম ভাবনা হইল, সেই অনাথা বালিকা, ভানুমতীর জন্যে।

বজরা ত্যাগ করিবার সময়ে বেদেদিগকেও কাছারিতে আশ্রয় লইতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু সকল ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করাইয়া তাহাদের কোনও খবর পাইলেন না। তিনি সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা যদি কেহ সেই বেদেদের কি তাহাদের পুত্রকন্যা দুটিকে এখানে আনিতে পার, আমি ১০০ ৲ টাকা পুরস্কার দিব।" কেহই সাহস করিল না। এক জন বলিল,—"কর্ত্তা! তাহারা কি এতক্ষণ আছে? কোন কালে সে ছোট নৌকা খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাসিয়া গিয়াছে।" তিনি ক্রমে পুরস্কারের অঙ্ক বাড়াইলেন। কিন্তু সকলে নীরবে শুনিল। তিনি তখন নিজে যাইতে চাহিলেন। তাঁহাকে তাহারা বলে ধরিয়া রাখিল। বলিল,—"কর্ত্তা কি পাগল হইলেন? কোথাকার বেদে, তাহাদের জন্যে আপনার প্রাণটা দিবেন?" তিনি প্রকৃতই আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের ছাড়াইয়া, তাঁহার পত্নী পুত্রের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া ছুটিলেন; কিন্তু গৃহের প্রাঙ্গণেই ঝড়ের বেগে এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলেন যে, আর চলিবার শক্তি রহিল না। তাঁহাকে আবার তাঁহার ভৃত্য ও প্রজারা ধরিয়া গৃহে আনিয়া বসন পরিবর্ত্তন করাইল। তিনি বসিয়া, উহাদের কি হইল, কাছারি হইতে দূরবর্ত্তী প্রজাদের কি হইল, ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ৫টার সময় ঝড় ও বৃষ্টির বেগ এরূপ বর্দ্ধিত হইল, এমন অন্ধকার হইয়া উঠিল যে, তাঁহার কণ্ঠ শোকে রুদ্ধ হইল।

ঘোর অন্ধকার ঘোরা নিশীথিনী
যেন অপরাহ্ন হইল আমার;
অভ্রান্ত কালের অভ্রান্ত গতিতে
যেন ঘোর ভ্রান্তি হইল সঞ্চার।
ঘোর গরজন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
ভৈরববিক্রমে ঝটিকা ঘূর্ণিত;
রহিয়া রহিয়া, আসিছে যাইছে,
আঘাতে পৃথিবী করিয়া কম্পিত।

ভীষণ আঘাত সহিতে না পারি,
হইতেছে যেন ঘন ভূকম্পন ;
ঘোর হুহুঙ্কার, ঝড় বৃষ্টি মিলি,
ধরাধ্বংসকারী করিতেছে রণ।
ঝড়ের গর্জ্জন, সিন্ধু-আস্ফালন,
কি ঘোর আরাব উঠিছে ভাসি!
যেন ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী কালী,
নাচিছে তাণ্ডব ঘোর অট্টহাসি।
ঝলকে ঝলকে, সে ভীষণ হাসি,
ঝলসি বিদ্যুতে জলদ-নীলিমা,
ভাসে স্তরে স্তরে, ঘোর কৃষ্ণাকাশে,
দেখাইয়া কিবা ধ্বংসমূর্ত্তি ভীমা।
সমুদ্রের গর্ভে উঠিছে জ্বলিয়া
বাড়বাগ্নি মত অনলরাশি ;
রুদ্ধ ক্রোধানল, বক্ষ বিদারিয়া,
বসুধার যেন উঠিছে ভাসি।
সে ভীম আলোকে, বক্ষে জলধির
কি মহাবিপ্লব দেখায় ভীষণ,
পর্ব্বত-প্রতিম কি তরঙ্গমালা
করিছে ফেনিল সিন্ধু বিলোড়ন!
ঝটিকার সনে যেন মহাসিন্ধু
মাতিয়াছে মহা প্রলয়-আহবে ;
অসংখ্য কামান, বজ্র সংখ্যাতীত,
গর্জ্জিতেছে যেন অবিরাম রবে।
উচ্চ গৃহাবলী, মহা মহীরুহ,
পড়িছে ভাঙ্গিয়া তৃণযষ্টি মত ;
পড়িছে অসংখ্য রথ রথী যেন,
ভৌতিক সংগ্রামে হইয়া হত।
কোথাও পতিত গৃহ, গৃহস্থিত
অনলে হঠাৎ উঠিছে জ্বলিয়া :
করিছে ঝটিকা, কি কৌতুকক্রীড়া,
অগ্নিশিখা মেঘে মেঘে মাখাইয়া।
ঘন ঘন ঘোর ঝটিকা-গর্জ্জন,
গুলিধারা মত বৃষ্টিবরিষণ ;
ঘন ভূকম্পন, মেঘ স্তরে স্তরে
ঘন ঘন স্থায়ী বিদ্যুৎস্ফুরণ
মেঘে তরঙ্গিত অগ্নি ঘোরাকাশে,
অগ্নি নীলাম্বুধি-গর্ভে তরঙ্গিত ;
গৃহের পতন, বৃক্ষ-উৎপাটন,
ভৈরব আরাবে বিশ্ব বিলোড়িত।

আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী। কালি কালীপূজা। অনাথনাথের কর্ণে ভানুমতীর সেই গীত যেন কি ভীমকণ্ঠে ধ্বনিত হইতে লাগিল ;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী।"

তাঁহার বোধ হইল, যেন সেই মহামেঘ প্রভা সৃষ্টিসংহারিণী ধ্বংসরূপিণী মহাশক্তি সৃষ্টি সংহার করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছেন। সেই ঘোর অন্ধকার তাঁহারই বর্ণ ! সেই ঝটিকা তাঁহারই গতি ও নৃত্য। ঝটিকার রহিয়া রহিয়া সেই ভীষণাঘাত, তাঁহারই অসি প্রহার তাঁহারই পদদলনে সিন্ধু বিলোড়িত হইয়া, অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে। মেঘস্তরে যে আলোক দেখা যাইতেছে, উহা তাঁহার নেত্রানল, এবং বারিধার তাঁহারই লোলজিহ্বাবিগলিত রুধিরধারা। অনাথনাথ বুঝিতে পারিলেন যে, ঘূর্ণ্যবাত্যায় সহস্র সহস্র লোক, সংহার-কারিণীর গ্রাসে পতিত হইয়া, তাঁহাকে রুধিরপ্লাবিতা নরমুণ্ড মালিনী সাজাইতেছে। সমুদ্রে ও আকাশে আলোকরাশি দেখিয়া সকলের মনে সমধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ আলোক কিসের, কেহই স্থির করিতে পারিতেছিল না। কয়েক দিবস যাবৎ যেরূপ দারুণ গ্রীষ্ম পড়িয়াছিল, অনাথনাথ যেরূপ গন্ধকের গন্ধ অনুভব করিয়াছিলেন এখনও ঝটিকা যেরূপ গন্ধকের গন্ধ বহিয়া আনিতেছিল. তাঁহার বোধ হইল, ভূগর্ভস্থ গৈরিকাগ্নি সমুদ্রে নির্গত হইতেছে। আকাশেও তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রজ্বলিত গৃহাগ্নিতে মেঘমালা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হইতেছে। স্থানে স্থানে যেন বিদ্যুদালোকে মেঘস্তর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিতেছে, এবং ঝটিকা ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। ৫টার সময় হইতে ঘোরতর অন্ধকার হইয়াছিল। ৬টার সময়ে ঠিক যেন অমাবস্যার নিশীথের মত অন্ধকার হইল ; এবং দক্ষিণ দিক হইতে এরূপ ভীষণ বেগে ঝড় বহিতে লাগিল যে, আর তাঁহাদের ঘরে থাকা অসাধ্য হইয়া উঠিল। যে কাছ্যারি-ঘরে তিনি আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পার্ব্বত্যবৃক্ষের ২০০ খুঁটি ছিল। কিন্তু তথাপি গৃহখানি প্রত্যেক আঘাতে মড় মড় শব্দে কাঁপিতে লাগিল। প্রত্যেক আঘাতের পর ঝটিকা আবার ঘুরিয়া আসিয়া যেন বল-সঞ্চয় করিতে একটু বিরাম লইয়া, আবার সমধিক বিক্রমে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। যেন থাকিয়া থাকিয়া শত সহস্র মত্ত বারণ গৃহের দক্ষিণ দিকে এক সঙ্গে আক্রমণ করিতেছে। বাঁশের নিবিড় দৃঢ় বেড়া ভেদ করিয়া বন্দুকের গুলির মত বৃষ্টির ফোঁটা তাঁহাদের গায়ে পড়িতে লাগিল, এবং জলপূর্ণ করিয়া ফেলিল। দারুণ শীতে দাঁতে দাঁত লাগিয়া কাঁপিতে লাগিল। শিশু পুত্রটির জন্য তিনি বিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন। কিন্তু ঘর যেরূপ কাঁপিতেছে এবং প্রত্যেক আঘাতে পড়-পড় হইতেছে, দক্ষিণ দিকে যেন শত সহস্র কামানের গোলা বর্ষিত হইতেছে —অনাথনাথ আর এ ঘরে থাকা নিরাপদ মনে করিলেন না। কি করিবেন, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে অন্য গৃহস্থিত লোকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। অন্য দুইখানি ঘর, যাহা এতক্ষণে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও পড়িয়া গেল। তখনই এই ঘরের লোকও আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—"ঘর পড়িতেছে, ঘর পড়িতেছে, বাবু ! বাহির হউন !" এবং জনতা পরস্পরকে দলিত করিয়া বাহিরের দিকে ছুটিল। কত লোক পড়িয়া গেল, তাহাদের উপর দিয়া কত লোক চলিয়া গেল।

অনাথনাথ পুত্রটিকে বুকে লইয়া ও পত্নীকে বাম করে জড়াইয়া বহির্গত হইলেন ; আর তখনই ঝড়ে ২০০ বৃহৎ কাঠের খুঁটি মধ্যভাগে তৃণবৎ ভাঙ্গিয়া গৃহখানি ভূতলশায়ী করিল। কয়েক জন ঘর চাপা পড়িয়া মরিল, কয়েক জন মৃত্যুমুখে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সে আর্ত্তনাদ ঝড়ে উড়িয়া গেল, কেহ শুনিল না। আর শুনিবেই বা কে? ঝটিকার ও সিন্ধুর মিশ্রিত ভৈরব-নিনাদে পৃথিবী যেন কাঁপিতেছে, বিদীর্ণ হইতেছে। যাহারা বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহারাও "হা ঈশ্বর। হা আল্লা।" রবে আর্ত্তনাদ করি-

তেছে। কিন্তু কার আর্ত্তনাদ কে শুনে? তখন সকলেই আত্মরক্ষার জন্যে ব্যাকুল। এ দিকে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে ; বৃষ্টিধারাও এরূপ বেগে পড়িতেছে যে, চক্ষু মেলিবার সাধ্য নাই ; শরীরের অস্থিতে পর্য্যন্ত যেন সে ধারা প্রবেশ করিতেছে, এবং দারুণ শীত-সঞ্চার করিতেছে! তাহাতে রহিয়া রহিয়া শিলাবৃষ্টিও হইতেছে। লোক পতিত বৃক্ষের ডালের নীচে, পতিত গৃহের চালের নীচে, যে যেখানে পারিল, আশ্রয় লইল। অনাথনাথও সপরিবারে একখানি চালের নীচে গেলেন, এবং পুত্রটিকে বুকে লইয়া পতিপত্নী সেই বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। তখন এরূপ গাঢ় অন্ধকার যে, হস্ত প্রসারিত করিলেও দেখা যাইতেছিল না। কেবল অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া হাতড়াইয়া, পতিত চালের আশ্রয় লইয়াছিলেন! কেবল কখন কখন সমুদ্রগর্ভে সেই ভীষণ অগ্নিশিখা, কখন কখন স্থায়ী বিদ্যুৎপ্রদীপ্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তর মাত্র দেখা যাইতেছিল, এবং সেই আলোকে ভীষণ সংহার-ক্রীড়া নেত্রগোচর হইয়া হৃদয়ে আরও ভীতি সঞ্চারিত হইতেছিল। পতিপত্নী উভয়ে জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া কেবল শিশুটিকে রক্ষা করিতে শ্রীভগবানকে ডাকিতে-ছিলেন।

রাত্রি অনুমান এক প্রহরের সময়ে সমুদ্র যেন ক্রমে ভীষণ হইতে ভীষণতর, এবং নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। তখন অনাথনাথ প্রথম হইতে যে সমুদ্রপ্লাবনের আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাঁহার সেই আশঙ্কা আরও গুরুতর হইল। ঝড় তখন পশ্চিম সমুদ্রের দিক হইতে বহিতেছে বুঝিয়া, সে আশঙ্কায় তাঁহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া গেল। এ আশঙ্কা মনে উদিত হইবামাত্রই চারি দিকে লোকেরা "গর্কি! "গর্কি" বলিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল, এবং "চালে উঠ! গাছে উঠ!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনাথনাথও পত্নীপুত্রকে লইয়া একটা চালের উপর উঠিলেন, এবং তখনই অন্ধকার ভেদ করিয়া একটি প্রকাণ্ড সমুদ্রতরঙ্গ আসিয়া তাঁহাদিগকে গুরুতর আঘাত করিয়া মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এবং চালাখানি সেই সঙ্গে ভাসাইয়া নিল। অনাথনাথ একখানি উড়ানি দ্বারা তাঁহার পত্নীপুত্রকে আপনার দেহের সঙ্গে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়াছিলেন। মুহূর্ত্ত পরে দ্বিতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া সে চালখানি উলটাইয়া দিল, এবং তাঁহাদিগকে ডুবাইয়া ভীষণ বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। অনাথনাথ খুব বলিষ্ঠ পুরুষ ও সন্তরণপটু ছিলেন। জল-রাশির উপর ভাসিয়া উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার সেই লক্ষ্মী-স্বরূপা পতিপ্রাণা পত্নী নাই। তরঙ্গে উড়ানি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহার হৃদয় যেন ঝটিকা অপেক্ষাও বিরাট শব্দ করিয়া বিদীর্ণ হইল : তিনি ডুবিয়া গেলেন। আবার যখন উঠিলেন তখন একখানি কাষ্ঠ বেগে ভাসিয়া আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার বক্ষঃস্থ পুত্রটিকে ভীষণ আঘাত করিল। আঘাতে উভয়ে চীৎকার করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ঝড়ে ভাসিয়া গেল। তিনি বাম হস্তে পুত্রকে ধরিয়া সন্তরণ করিতেছিলেন, কিন্তু দক্ষিণ হস্তে ও বক্ষে এরূপ ব্যথা অনুভব করিলেন যে পুত্রকে ও আপনাকে রক্ষা করিবার আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহেও যেন মূর্চ্ছা সঞ্চারিত হইতেছিল। তিনি সেই অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা-বস্থায় চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন,—"কেহ যদি আমার পুত্রটিকে রক্ষা কর, আমার সমস্ত বিষয় তাহাকে দিব।" এমন সময়ে দৈববাণীর মত তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইল,— "বাবা! ভয় নাই, তুমি মাকে রক্ষা কর। আমি অমিয়কে রক্ষা করিব।" অনাথনাথ কেবল বলিলেন,—"মা! তুই কে? তুই কি সত্যই 'কমলে কামিনী দুর্গা?" এমন সময়ে কর্দ্দমময় তৃতীয় এক তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে আহত করিল। নাকে মুখে কর্দ্দমাক্ত জল প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ফেলিল। অনাথনাথ মূর্চ্ছিত হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রণক্ষেত্র

চৈতন্য লাভ করিয়া অনাথনাথ দেখিলেন, এক কাষ্ঠখণ্ড জড়াইয়া ধরিয়া তিনি তাহার উপর মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। তিনি সম্পূর্ণ বস্ত্রহীন। ধীরে ধীরে উঠিয়া কাষ্ঠখণ্ডের উপর বসিলেন। কর পদ সঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, কর্দ্দমাবৃত দৃঢ়ভূমি। একি সমুদ্র বেলা, না সমুদ্রগর্ভস্থ কোনও চূড়াভূমি? তখন আকাশ নির্ম্মল। সেই ঘটনার চিহ্নমাত্র নাই। কদাচিৎ কোথাও দুই এক খণ্ড মেঘ নীল-সমুদ্রের চড়ার মত দেখা যাইতেছে। সেই ঘোর ঘূর্ণ্য-ঝটিকাও নাই। কেবল থাকিয়া থাকিয়া শ্রান্ত পবনদেবের নিশ্বাসের মত এক একবার বাতাস বহিয়া যাইতেছে, এবং তাঁহার আর্দ্র দেহে দারুণ শীতসঞ্চার করিতেছে। কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীর আকাশে অনন্ত নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া আছে। নক্ষত্রের অবস্থান অবলোকন করিয়া অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। চারি দিক শান্ত, স্থির, নীরব—নিশ্চল। অনাথ-নাথের আবার ভানুমতীর সেই গীত মনে পড়িল ;—

"কি ভীষণ রণে, দেখ ত্রিভুবনে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

সেই তাণ্ডবনৃত্যের পর এই শান্তি! অনাথনাথ সেই ভীষণ ঝড় ও সেই দৃশ্য সকল তবে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন? না ;—তিনি উলঙ্গ, পত্নীপুত্রহারা ; অজ্ঞাত স্থানে নিপাতিত ও শীতে কম্পিত : স্বপ্নই বা হইবে কেন? তিনি কাঁদিতে লাগিলেন এবং মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"হায় মা! তোর এ কি বিচিত্র পটপরিবর্ত্তন! সেই ঘূর্ণ্যবাত্যার পর এই শান্তি! সেই ঘোর অট্টহাসির পর এই মৃদু হাসি। সেই ঘোর উল্লম্ফনের পর এই নিশ্চল ভাব! সেই সৃষ্টি-সংহারিণী মূর্ত্তির পর এই মোহিনী রূপ! হায় মা! তুই আমার সেই পতিপ্রাণা পত্নী এবং পিতৃপ্রাণপ্রতিম শিশু পুত্রটিকে গ্রাস করিয়া তোর মোহিনী শোভা দেখিবার জন্য কি হতভাগ্য আমাকে জীবিত রাখিলি!" তিনি এবার উচ্চৈঃস্বরে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এরূপ কাঁদিলেন, এবং বহুক্ষণ এরূপ ভাবিলেন। সেই রোদন, সেই চিন্তা, যে কখনও এরূপ অবস্থায় পতিত হয় নাই, সে কেমন করিয়া বুঝিবে? অনেকক্ষণ তাঁহার হৃদয়েও যেন ঘূর্ণ্যবাত্যা বহিল। অনেকক্ষণ রোদনের পর সেই বাত্যা বর্ষণ শেষ হইয়া হৃদয় কিছু শান্তভাব ধারণ করিলে, তিনি ভাবিলেন, তিনি যেরূপ রক্ষা পাইয়াছেন তাঁহার পত্নী ও পুত্র সহ সেই দুর্গতিহারিণী দুর্গারূপিণী ভানুমতীও ত রক্ষা পাইতে পারে। এই ক্ষীণ আশার সঞ্চারে হৃদয়ে ও দেহে ক্ষীণ শক্তিরও সঞ্চার হইল। তিনি চারিদিকে কতকগুলি চঞ্চল আলোক দেখিলেন। এ সকল কিসের আলোক? এ কি কোনও রূপ ভৌতিক আলোক? সিন্ধু-সৈকতে তরঙ্গাভিঘাতে লবণাম্বুকণারাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া যে আলোক এই ঘূর্ণ্যঝটিকার পর সমুদ্র-গর্ভে কিংবা সৈকতে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে? কিছুক্ষণ মনোনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে অনাথনাথের বোধ হইল, যেন আলোকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ছায়া দেখা যাইতেছে। আরও কিছুক্ষণ দেখিলে তাঁহার নিশ্চয় বোধ হইল, যেন মানুষ আলোক লইয়া কি দেখিতেছে! ক্রমে ক্রমে দূর হইতে যেন মানুষের অস্ফুট আর্ত্তনাদও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাঁহার মত কি তবে আরও কেহ সমুদ্র-তরঙ্গে ও ঝটিকায় তাড়িত হইয়া আহত অবস্থায় এখানে পড়িয়া আছে? তাহাদের মধ্যে কি তাঁহার পত্নীপুত্র ও সেই অনাথা বালিকা থাকিতে পারে না? এ সন্দেহে তাঁহার শরীরে আরও বল সঞ্চারিত হইল। তিনি সেই উলঙ্গ অবস্থায় সে সকল আলোক লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলেন। কয়েক পদ যাইবার পর তাঁহার পায়ে কি যেন ঠেকিল। তিনি স্বচ্ছ অন্ধকারে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন,—একটি মৃত মানবদেহ। এই-রূপে পদে পদে মৃত মানব ও গো, মহিষ, ছাগ, পালিত পশু-পক্ষীর দেহ তাঁহার চরণে

ঠেকিতে লাগিল। একটি দেহে পা পড়িবামাত্র ক্ষীণকণ্ঠে রোদনব্যঞ্জক চীৎকার উঠিল, কণ্ঠ স্ত্রীলোকের। অনাথনাথ চমকিয়া এক পা সরিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি কে?” উত্তরে একটি যবনী নাম শুনিলেন। সে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—“আমি কোথায়?” অনাথনাথ উত্তর করিলেন,—“বলিতে পারি না।” তখন “হা আল্লা!” বলিয়া রমণী একটি বেদনাব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। অনাথনাথ তাহাকে উঠিতে বলিলেন। সে আর উত্তর দিল না।—তিনি নিজে বসিয়া তাহাকে উঠাইতে গিয়া দেখিলেন, সেও তাঁহার মত উলঙ্গ। তাহাকে অতি কষ্টে তুলিয়া বসাইলে সে যেরূপ ভাবে পড়িয়া গেল, তাহাতে অনাথনাথ বুঝিলেন, তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। যাইতে যাইতে কোথাও শিশুর ক্রন্দন, কোথাও রমণীর রোদন, কোথাও পুরুষের আর্ত্তনাদ শুনিতে লাগিলেন। অনাথনাথের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি একটি আলোকের দিকে ছুটিলেন। সে আলোকটি এবং সে আলোকধারীকে আনিয়া তিনি এই আর্ত্তনাদের কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না, দেখিবেন। কিন্তু আলোকের নিকট গিয়া যাহা দেখিলেন, তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। দেখিলেন, এক জন মুসলমান একটা বাঁশের “বোঁধা”* জ্বালাইয়া মৃত ব্যক্তির দেহ হইতে বস্ত্র অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিতেছে। এক স্থানে ২৩টা লোক একটা কাষ্ঠের সিন্দুক লইয়া টানাটানি করিতেছে। কেহ কেহ থালা, ঘটী, বাটি ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য কুড়াইতেছে। অনাথনাথ বুঝিলেন যে, এ সকল মৃতদেহ ও দ্রব্যাদি সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছে, এবং এ সকল তস্কর নিকটস্থ কোনও গ্রামবাসী। এক জনকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কোন্ স্থান?” সে এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল,—“দেখছ না, তোমার শ্বশুরবাড়ী। এই যে এক শাশুড়ী পড়ে আছে।” এই বলিয়া সে একটা কর্দ্দমাক্ত স্ত্রীলোকের দিকে ছুটিল, এবং তাহাকে উলঙ্গ করিয়া তাহার বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি খুলিয়া লইতে লাগিল। হাতের সোনার বালা খুলিবার জন্য সবলে টানিলে স্ত্রীলোকটি সংজ্ঞালাভ করিয়া যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন পাপিষ্ঠ তাহার মাথায় এক লাঠি প্রহার করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়া আবার বালা টানিতে লাগিল। অনাথনাথ আর সহিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহে মত্তমাতঙ্গ-বল সঞ্চারিত হইল। তিনি ছুটিয়া গিয়া তাহারই হাতের লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে আঘাত করিলেন। সে হাতের “বোঁধা” ফেলিয়া চীৎকার করিয়া পলায়ন করিল, এবং তাহার চীৎকার শুনিয়া আরও কয়েকজন তাহার পথ অনুসরণ করিল। অনাথনাথ সেই হতভাগিনীকে ‘মা! মা!’ বলিয়া ডাকিলেন। কিন্তু কোনও উত্তর না পাইয়া বুঝিলেন, হতভাগিনীর দুঃখ-যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। তিনি সেই বোঁধার আলোকে খুঁজিয়া একখানি বস্ত্র কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন, এবং যাহারা জীবিত অবস্থায় রোদন করিতেছিল, তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি শুশ্রূষা করিবেন? কেহ সমুদ্রের লবণজল পান করিয়া দারুণ পিপাসায় জল চাহিতেছে। তিনি ভাল জল কোথায় পাইবেন? কেহ বলিতেছে,—“আমি কোথায়”, কেহ “আমার পুত্র কোথায়” কেহ “আমার পতি কোথায়?” তিনি কি উত্তর দিবেন? কেহ উলঙ্গ অবস্থায় শীতে কাঁপিতেছে, বসন চাহিতেছে। ভাসিয়া আসিয়া স্থানে স্থানে যে সকল বসন পড়িয়া আছে, তিনি কুড়াইয়া আনিয়া দিলেন। এক দিকে স্থানে স্থানে এই হাহাকার, অন্য দিকে স্থানে স্থানে তস্করদিগের আনন্দোচ্ছ্বাস, কোথাও বা অপহৃত বস্তু লইয়া কাড়াকাড়ি, মারামারি। হাতের বোঁধাও জ্বলিয়া গেল। অন্ধকারে কোথায় যাইবেন, কি করিবেন? অনাথনাথ একখানি কাষ্ঠের উপর অবসন্ন অবস্থায় বসিয়া আপনার অবস্থা ভুলিয়া এই হতভাগ্যদের

* অনেকগুলি বাখারি একত্র বাঁধা, এ অঞ্চলে বোঁধা বলে।

অবস্থা দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন আবার সেই বালিকার গীত যেন শূন্য হইতে তাঁহার কাণে বাজিতে লাগিল ;—

"কি ভীষণ রণে, দেখনা নয়নে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

ধীরে ধীরে রাত্রি প্রভাত হইতে লাগিল। উষার প্রথম আলোকেই সেই ভীষণ রণরঙ্গিণীর সংহারক্রীড়া ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে সমুদ্র-প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়াছেন! শত শত নর-নারী, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ,—মৃত বা অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় স্থানে স্থানে পড়িয়া আছে। সহস্র সহস্র গো মহিষ ছাগ প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষী, ভগ্ন গৃহখণ্ড ও গৃহস্থের নানাবিধ সম্পত্তি—সিন্দুক, পালঙ্ক, তৈজষপত্র, কাপড়, বিছানা পড়িয়া আছে। স্থানটি যেন একটি ভীষণ রণ-ক্ষেত্র। রণরঙ্গিণী প্রকৃতি যেন মানুষের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া একটি মহাপ্রলয় সাধিত করিয়াছেন। তিনি বুঝিলেন, সমুদ্র-তরঙ্গ এ পর্য্যন্ত আসিয়া পর্ব্বত মালায় প্রতিহত হইয়া ঝড়ের পর সরিয়া গিয়াছে, এবং পশ্চাতে এই ভীষণ দৃশ্য রাখিয়া গিয়াছে। যত দূর চক্ষে দেখা যাইতেছে, সমস্ত স্থানে ক্রোশের পর ক্রোশ কেবল নর, পশু, পক্ষীতে এবং ভগ্ন গৃহখণ্ডে ও গৃহস্থিত দ্রব্যাদিতে আচ্ছন্ন। স্থানে স্থানে তাঁহার মত দুই এক জন নর-নারী স্তম্ভিত অবস্থায় বসিয়া আছে। পশ্চাতে একখানি ঝটিকাবিধ্বস্ত গ্রাম দেখা যাইতেছে। অনাথনাথ উঠিয়া সেই গ্রামের দিকে চলিলেন। দেখিলেন, বৈরাগীর মত একটি লোক কয়েক জন রমণী ও বালক বালিকাকে লইয়া গ্রামের দিকে যাইতেছে। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজি! এ কোন্ স্থান?" বৈরাগী বলিল,—"বাবা এ গ্রামের নাম চম্বল। ইহাতে আমার একখানি ক্ষুদ্র আখড়া আছে। গৃহাদি পড়িয়া গিয়াছে। ইহারা নানা স্থান হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। দেখি, যদি চাল তুলিয়া তাহার নীচে আশ্রয় দিয়া ইহাদের জীবন রক্ষা করিতে পারি। হরি হে! তোমার একি লীলা!"

অনাথনাথ বিস্ময়-বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন,—"চম্বল!" বাবাজি স্থিরকণ্ঠে কহিলেন—"চম্বল।"

সপ্তম অধ্যায়

প্রকৃতির কুরুক্ষেত্র

সুবর্ণদ্বীপ সমুদ্র-তীরে। তাহার পশ্চিমে অনন্ত নীল ফেনিল দিগন্তপ্রসারিত মহা-পারাবার। তাহার পূর্ব্বে ও উত্তরে বিস্তীর্ণ মহেশ-খালি ও কুতুবদিয়া দ্বীপ-শ্রেণী। তাহার পূর্ব্বে প্রায় দুই ক্রোশ প্রশস্ত সমুদ্র-শাখা এবং তাহার পূর্ব্বতীরে চম্বল-গ্রাম। ক্রোশদ্বয়ব্যাপী গ্রামের পূর্ব্বে চম্বল-গিরিমালা। অনাথনাথ তবে কি সেই স্বল্পক্ষণের মধ্যে সমুদ্রতরঙ্গে এতদূর ভাসিয়া আসিয়াছেন? এত গ্রাম, প্রান্তর, বিশেষতঃ একটি সমুদ্র-শাখা—তিনি কেমন করিয়া ভাসিয়া আসিলেন? তাই তিনি চম্বল নাম শুনিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। প্রায় ১০ দশ ক্রোশ ব্যবধান ঝটিকাতাড়িত-সমুদ্র-প্লাবনে আসিয়া এরূপে গিরিপাদমূলে পতিত হইয়া জীবিত থাকা ত সামান্য বিস্ময়ের কথা নহে। একি স্বপ্ন? একি কোনও অপদেবতার খেলা? একি আরব্য-উপন্যাস? এরূপ অদ্ভুত ঘটনা কি কেহ কখন শুনিয়াছে, না শুনিলে বিশ্বাস করিবে? তাঁহার কি মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে? এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার ত সত্য হইতে পারে না? বৈরাগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাহার মুখে গ্রামের পরিচয় কি বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনামাত্র? তাহা কেমন করিয়া হইবে? ঝটিকাবিধ্বস্ত হতভাগ্য নরনারী, বৈরাগীকে

যে এখনও দেখা যাইতেছে। সে তাঁহাকেও তাহার আখড়ায় যাইতে বলিয়াছিল, কিন্তু গ্রামের নাম চম্বল শুনিয়া তিনি বিস্ময়ে এমন অভিভূত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিলেন যে, তাহার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেন নাই। তিনি আরও দেখিলেন, বহুবিস্তীর্ণ শবক্ষেত্রের মধ্যে তাঁহার মত আরও জীবিত লোক আছে। তাঁহার সম্মুখে কেহ কেহ আত্মীয়স্বজনের অন্বেষণ করিতেছিল। তাহাদের মুখে শুনিলেন, তাহারাও তাঁহার মত কেহ মহেশখালি, কেহ কুতুবদিয়া, কেহ বহুদূরস্থ অন্যান্য গ্রাম হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মুখেও অদ্ভুত রক্ষার গল্প শুনিলেন। তখন তিনি নীলিমামণ্ডিত শান্ত প্রভাত-গগনের দিকে ভক্তি-উচ্ছ্বসিতনয়নে চাহিয়া বলিলেন,—"কৃপাসিন্ধো! বিপদভঞ্জন! তুমি আমাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছ, আমার পতিপ্রাণা সরলা পত্নীকে ও আমার সুকুমার শিশু সহ সেই অনাথাকে কি সেরূপ রক্ষা কর নাই?" দর দর ধারায় তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তিনি তাহাদের অন্বেষণে চলিলেন। রাত্রিতে যে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ঊষালোকে যাহা আরও স্ফুটতর হইয়াছিল, এখন দিবালোকে তাহার ভীষণ ছবি ভীষণতর হইয়া চারিদিকে ভাসিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিলেন,—

যত দূর যাইতেছে নরনেত্রে দেখা—
আসমুদ্র গিরিতল—কালি সন্ধ্যাকালে
ছিল যাহা জনাকীর্ণ পল্লীতে প্রান্তরে
শ্যামশস্যসমাচ্ছন্ন, ছিল সুশোভিত
পাদপে, পল্লবে, গৃহে, চারু সরোবরে,—
রজনী-প্রভাতে এবে—বিস্তীর্ণ শ্মশান!
নাহি বাস-চিহ্ন, নাহি চিহ্ন পাদপের ;
যত দূর যাইতেছে, নরনেত্রে দেখা—
শবাকীর্ণ প্রেতভূমি, মহারণভূমি!
শবের পশ্চাতে শব, শবের উপরে!
সম্মুখে পশ্চাতে শব, দুই পার্শ্বে শব!
শরতের শস্যক্ষেত্র—শবক্ষেত্র এবে—
সারি সারি, স্তরে স্তরে, শব রাশি রাশি।
পশুপক্ষিশব সহ শব মানবের,
কীট পতঙ্গের শব ; শব সংখ্যাতীত
শস্যক্ষেত্রে, সরোবরে, প্রাঙ্গণে, প্রান্তরে।
ভগ্নগৃহ-চালে শব, শব চাল-তলে,
ভূপতিত বৃক্ষগণ শব-সমাবৃত—
কত শব ডালে ডালে, শিকড়ে শিকড়ে!
নরনারী ফল যেন, শিশুগণ ফুল,
বিজড়িত ডালে ডালে বিচিত্র বসন
পাদপের, শোচনীয় কালের কেতন।
ভাসিতেছে সরোবরে, প্লাবনে পূর্ণিত—
শবরাশি অগণিত শব অজানিত।
শবে ক্ষুদ্র গৃহ গড় হয়েছে পূর্ণিত—
নর, ছাগ, গো, মহিষ, পড়ি স্তরে স্তরে!
যেই দীর্ঘ রাজপথ উত্তরে দক্ষিণে

গিয়াছে বহিয়া ভেদি' এই ধ্বংসভূমি,
করি অবরোধ সেই সমুদ্র-প্লাবন
হইয়াছে সমাচ্ছন্ন শবে অগণিত,
জালে যেন মৎস্যগণ। রয়েছে পড়িয়া
মহাকালী-কণ্ঠভ্রষ্ট মুণ্ডমালা মত,—
নাহি তিল মাত্র স্থান নিক্ষেপিতে পদ।
স্থানে স্থানে কি করুণ দৃশ্য শোকময়!
কোথাও সন্তান বক্ষে পড়িয়া জননী,
মাতৃস্তন শিশুমুখে; কোথাও পড়িয়া
শিশু ভ্রাতা ভগ্নী দুটি গলায় গলায়!
গলায় গলায়, বুকে বুক, মুখে মুখ,
পড়িয়া কোথাও পতিপত্নী প্রেমময়ী;
কোথা পুত্র, পৃষ্ঠে বৃদ্ধ জনকজননী!
কটিসহ দৃঢ়াবদ্ধ পত্নী সহ পড়ি
কোথাও শোকের ছবি প্রণয়ি-যুগল।
হায়! হতভাগ্য যুবা বাঁচাইতে প্রাণ
প্রেয়সীর, এইরূপে আপনার প্রাণ
করিয়াছে বিসর্জ্জন! অনিন্দ্যসুন্দর
যৌবনের প্রস্ফুটিত রূপ মনোহর
এখনো মৃত্যুর ছায়া করে নি হরণ।
প্রেম-আলিঙ্গনে যেন রয়েছে নিদ্রিত
যৌবনের সুখ-স্বপ্নে, হৃদয়ে হৃদয়,
মুখে মুখ, বেষ্টি গ্রীবা দুই ভুজলতা!
রমণীর কর্দ্দমাক্ত দীর্ঘ কেশরাশি
আবরিয়া উভয়ের উরস বদন,
করিতেছে হায়! যেন লজ্জানিবারণ।
কোথাও মুমূর্ষু জীব মৃত্যুযন্ত্রণায়,
লবণাক্তজলপানে ঘোর পিপাসায়
করিতেছে ছট্‌ফট্! মৃত্যুমুখে কেহ
পতি, পত্নী, পুত্র তরে করে হাহাকার।
কোথাও বা নরনারী প্রেমমূর্ত্তি মত
নগ্ন, কর্দ্দমাক্ত, শির জানু-মধ্যে রাখি
রয়েছে বসিয়া স্তব্ধ, যেন বজ্রাহত।
কালের কি কুরুক্ষেত্র নয়ন নিমেষে
হইয়াছে সংঘটিত, নর-চিন্তাতীত!
মানবের কুরুক্ষেত্র তুলনায় তার
বালকের ক্রীড়াভূমি ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রতর!

অনাথনাথ এই শোচনীয় চিত্তবিদারক দৃশ্য অতিক্রম করিয়া চলিলেন। কোথায়, কি জন্যে যাইতেছেন, কিছুই জানেন না। যাইতে যাইতে আর্ত্তের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। স্থানে স্থানে ভাসিয়া আসিয়া যে বসন পড়িয়া আছে, তাহা কুড়াইয়া লইয়া নগ্নের নগ্নতা নিবারণ করিলেন। শব-স্তূপের নীচে পড়িয়া যাহারা জীবিত অবস্থায় হাহাকার করিতেছিল,

তাহাদিগকে বহু কষ্টে উদ্ধার করিতে লাগিলেন, এবং মুমূর্ষুকে শ্রীভগবানের নাম শুনাইয়া শান্তি দিতে লাগিলেন। জীবিতদিগকে নানারূপ সান্ত্বনার কথা আশার কথা বলিলেন। কিন্তু ক্ষুধিত ও পিপাসিতকে কি দিবেন? আহার্য কোথাও কিছু নাই। পানীয় জলও অপ্রাপ্য। অসংখ্য পুষ্করিণী আছে। কিন্তু সমস্তই সমুদ্র-সলিলে প্লাবিত হইয়া ঘোর লবণাক্ত এবং নানাবিধ প্রাণীর মৃতদেহে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ক্রোশের পর ক্রোশ ব্যাপিয়া আবাসের কোনও চিহ্নমাত্র নাই। এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে, কেহ দেখিলে বিশ্বাস করিতে পারেন না,—এ মহা-শ্মশানক্ষেত্র সন্ধ্যাকালে সমৃদ্ধিশালী গ্রামে সজ্জিত ছিল। কোথাও একটি বৃক্ষ পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল না; ঝটিকাবেগে সমস্ত বৃক্ষ ধরাশায়ী হইয়াছে। কোথাও বা এক স্থানের বৃক্ষ অন্য স্থানে, এক গ্রামের বৃক্ষ আর এক গ্রামে উড়িয়া গিয়াছে। কোন বৃক্ষ কোথায় ছিল, অনেক স্থানে তাহা স্থির করিবার সাধ্য নাই। গৃহস্থদের বাড়ীর গৃহের চিহ্নমাত্রও নাই,—চাল, বেড়া খুঁটি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। এমন কি, বাড়ীর ভিত্তি পর্যন্ত জলবেগে এরূপ বিলীন হইয়া গিয়াছে যে, কাহার বাড়ী কোথায় ছিল, তাহাও চিনিবার উপায় নাই। এই সকল গ্রামে পরিচিত বহু সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ী কাল সন্ধ্যার সময় ধনধান্যে ও বহু পরিবারে পরিপূর্ণ ছিল। আজ প্রাতে সে সকল আবাসের কোথাও বা দু একটা ভগ্ন খুঁটির শেষভাগ, কোথাও বা পুষ্করিণীটি মাত্র অবশিষ্ট আছে! পরিবারের মধ্যে কেহ বা বাড়ীতে স্থানে স্থানে, কেহ বা বাড়ীর বাহিরে স্থানে স্থানে, জলাশয়ে, গড়ে, মৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কেহ বা ভাসিয়া গিয়াছে। গ্রামের শত শত লোকের মধ্যে ২।৪।১০ জন তাঁহার মত দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছে। তাহারা শূন্য ভিটায় মৃত পত্নী, পুত্র মাতা পিতাকে লইয়া হাহাকার করিতেছে। সকলেরই মুখে একই কথা—"হা ভগবান! সকলেই গিয়াছে। আমাকে কেন রাখিলে?" রাশি রাশি অপরিচিত জনের মৃত দেহ কাহার বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। হিন্দুর বাড়ী মুসলমানের শবে আচ্ছন্ন, মুসলমানের বাড়ী হিন্দুর শবে পরিপূর্ণ! এই অপরিচিত লোকদের মধ্যে যাহারা অনাথনাথের মত জীবিত আছে তাহাদের কেহ বা জানুর মধ্যে মাথা দিয়া কর্তব্যবিমূঢ় আত্মহারা জড়পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া আছে। অনাথনাথ জিজ্ঞাসা করিলে অবনত মস্তক তুলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেছে, কোনও উত্তর দিতেছে না। তাহাদের বাহ্যজ্ঞান যেন তিরোহিত হইয়াছে। অন্য জীবিত জীবজন্তুর চিহ্নমাত্র নাই। তাহাদের অগণিত শব মানব-শবের সঙ্গে পড়িয়া রহিয়াছে।

অনাথনাথ আপনার অবস্থা ভুলিয়া গেলেন। প্রথম কিছুক্ষণ এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিতেছিলেন। কিন্তু কত দেখিবেন কত কাঁদিবেন? দেখিতে দেখিতে মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল ও নয়নের জল অজ্ঞাতে শুকাইয়া গেল। স্বপ্নপরিচালিত লোকের মত যথাসাধ্য আর্তের সেবা করিতে করিতে তিনি লক্ষ্যহীন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই ভীষণ শবক্ষেত্রে সমস্ত দিন পর্যটন করিয়া অনাথনাথ তাঁহার পত্নী, পুত্র ও সেই বালিকাকে জীবিত কি মৃত দেখিতে পাইলেন না। পূর্বাহ্নের পর মধ্যাহ্ন আসিল, মধ্যাহ্নের পর অপরাহ্ন আসিল। অপরাহ্নের পর সন্ধ্যাচ্ছায়ায় সমুদ্র ও বেলাভূমি ছাইতেছিল। এ সময়ে তিনি সমুদ্রসৈকতে উন্মত্তের মত ভ্রমিতেছিলেন। সমুদ্রবেলা অবিরাম তরঙ্গাঘাতে অন্য সময় কেবল চঞ্চল ফেনমালায় শোভিত থাকে! আজি অচঞ্চল শবমালায় যেন মুণ্ডমালী সাজিয়াছে। নানা জীবজন্তুর অচঞ্চল শবমালার সঙ্গে সচঞ্চল ফেনমালা কি ভীষণ ক্রীড়া করিতেছে। শবরাশির সঙ্গে এখানেও ভগ্ন গৃহ ও গৃহস্থের উপকরণ এবং কোথাও ভগ্ন নৌকাখণ্ড সকল পড়িয়া আছে। কাল অপরাহ্নে যে সমুদ্রগর্ভ অনাথনাথ নানাবিধ অর্ণব-যানে খচিত দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা কেবল ভাসমান মৃতদেহে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে সেই গীতধ্বনি প্রবেশ করিল,—

"কি ভীষণ রণে, দেখ না নয়নে, নাচে কালী রণরঙ্গিণী!"

একি তাঁহার ভ্রান্তি? তিনি ত সমস্ত রাত্রি ভানুমতীর সেই গান শুনিয়াছেন। ঘোরারাব-পূর্ণ প্রলয়ের মধ্যে তিনি অবিরাম ঘোরারাবী মহারৌদ্রী প্রলয়কারিণীর সেই রূপ নয়নে দর্শন করিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার সেই ঘোরা ভীষণ মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তিনি সমস্ত রাত্রি সেই গীত শুনিয়াছেন, সেই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়াছেন। এ নিশ্চয় তাঁহার ভ্রান্তি। কিন্তু আবার তিনি সেই গীত শুনিলেন। ক্রমে যত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই স্ফুটতররূপে সেই শান্ত সায়াহ্নে সমুদ্র-নিনাদে মিশ্রিত সমুদ্রানিলে বাহিত সেই মধুর গাম্ভীর্য্যময় রমণীকণ্ঠ শুনিতে লাগিলেন। সম্মুখে বেদের ক্ষুদ্র পট-গৃহের মত একটি কি যেন দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, ঝটিকার পর কেহ এই ক্ষীণ ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাঁহার ক্রমে বোধ হইল, সেখান হইতে সেই গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে। তিনি উর্দ্ধশ্বাসে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়

ভগবতী

আশায়, আনন্দে, সেই আনন্দাশা মিশ্রিত উৎসাহে, তাঁহার হৃদয়ে কি এক নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী হইলে, কণ্ঠ যে ভানুমতীর, সে যে গীত গাহিতেছে, তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অনাথনাথ দেখিলেন, প্লাবনের ভাসা কাপড় ও যষ্টি কুড়াইয়া বালিকা একটি ক্ষুদ্র আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে বসিয়া শান্ত, বিষণ্ণ, গম্ভীর, উদাস কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল কি এক গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করিয়া গাইতেছে—

দুই কর লয়, 'দুই বরাভয়,
লয় বিনা সৃষ্টি স্থিতি নাহি হয়,
সদা শিব উর্দ্ধগ্রীব
দেখ ধ্বংস-মূলে স্থির আপনি।

এই মহা ধ্বংসক্ষেত্রই ধ্বংসকারিণীর ধ্বংসমূর্ত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যার স্থল। গীত শুনিয়া অনাথ নাথের হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল। গীত ক্রমে বন্ধ হইল। ক্রমে সমুদ্র নিনাদে সেই স্বরলহরী মিশিয়া গেল। কিছুক্ষণ রমণী নীরব; অনাথনাথ চৈতন্যহীন জড়মূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"হাঁ দিদি! আমাদের বাড়ীতে যে কালী পূজা হইয়া থাকে, তুমি তাঁহারই গীত গাইতেছ? না?"

বালিকা তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "হাঁ ভাই! এ তাঁহারই গীত।"

"কাল যে এ ঝড় হইল, এত মানুষ মরিল, এ কি সব তিনিই করিলেন?"

"হাঁ ভাই! এ সকল তাঁহারই লীলা।"

শিশু একটি ক্ষীণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি আর একটি গীত গাও! তোমার গান আমার বড় ভাল লাগে।"

বালিকা আবার সাদরে তাহার মুখচুম্বন করিয়া আর একটি গান আরম্ভ করিল।

আবার সেই শব-সমাচ্ছন্ন বেলাভূমি, সেই সন্ধ্যারাগরঞ্জিত সমুদ্রগর্ভ ও সুনীল আকাশ ছাইয়া সেই করুণ মধুর কণ্ঠ ফুটিল, উঠিল, মিশাইল। সেই সুধাময়ী বীণা নীরব হইলে কেবল সিন্ধুনিনাদমাত্র শুনা যাইতেছিল আর সকলই নীরব। অনাথনাথ বুঝিলেন, দ্বিতীয় শিশু-কণ্ঠ তাঁহারই পুত্র অমিয়ের। তবে অমিয়ও রক্ষা পাইয়াছে? তিনি জানু পাতিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া গলদশ্রুনয়নে বলিলেন,—"তোর কি অপূর্ব্ব লীলা! তোর যেই

ধ্বংস-ক্রীড়ায় মহামহীরুহ ও শৈলশৃঙ্গ পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে, সেই ঝড়ে তুই এই ক্ষুদ্র শিশুকে রক্ষা করিয়াছিস্! দয়াময়ী মা!" অনাথনাথ কিছুক্ষণ এইরূপে জননীর চরণে আপনার হৃদয়ের তরল ভক্তিধারা বর্ষণ করিয়া উঠিলেন, এবং তিনি এ সময়ে তাহাদের সম্মুখে যাইবেন কি না, তাহা ভাবিতে লাগিলেন।—শিশুর ক্ষীণকণ্ঠে বুঝিলেন, সে নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিলে তাহার হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিবে, দুর্ব্বল হৃদয় তাহা সহিতে পারিবে ত? তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে শিশু আবার ক্ষীণকণ্ঠে কহিল,—

"দিদি! সত্যসত্যই আমি কালীমার মুখ দেখিয়া বড় ভয় পাইতাম। কিন্তু মা বলিলেন. তিনিও মা। হাঁ দিদি! তিনি কি সত্যই মা?"

বা। হাঁ অমিয়! তিনি মা।

শি। তিনি মা হইয়া কেমন করিয়া এমন ঝড় করিলেন, এত মানুষ মারিলেন?

বা। তোমার মা কি তোমার উপর কখন রাগ করেন নাই, তোমাকে কখনও মারেন নাই? তিনি যেমন ঝড় তুলিয়াছিলেন, এখন আবার কেমন সুন্দর শান্তভাব ধারণ করিয়াছেন! তিনি যেমন এত মানুষ মারিয়াছেন, তেমন তোমায় রক্ষা করিয়াছেন।

শি। আমাকে ত রক্ষা করিয়াছ তুমি। তুমি কি তবে সেই মা? তুই যে দিদি দুর্গা-মার মত! তুই তেমনই সুন্দর, তোর মুখে তেমনি আদর! তুই আমাকে কত আদর করিস্।

বালিকা আবার প্রেমভরে তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বলিল. "না ভাই! তিনি তোমাকে রক্ষা না করিলে, আমি পারিতাম না। দেখ নাই, কত ভগ্নীর বুকে ভাই মরিয়া রহিয়াছে?"

শি। না, দিদি, তুই আমার তেমন দিদি নহিস্।

বালিকা গলদশ্রু-নয়নে শিশুকে বুকে আঁটিয়া ধরিল, এবং শিশু পুষ্পনির্ম্মিত দুই ক্ষুদ্র ভুজে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুষ্পনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি তাহার স্বর্গসম বুকে লুকাইল। বালিকা গদগদ কণ্ঠে বলিল, "তুই ভাই! দেব-শিশু! তাই দেবী তোরে রক্ষা করিয়াছেন।"

আবার কিছুক্ষণ উভয়ে প্রেমাবেশে অবশ হইয়া নীরব রহিল। বালকবালিকার হৃদয়ে যে প্রেম-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই বুঝি স্বর্গের মন্দাকিনীধারা। উভয়ে নীরব, কেবল সান্ধ্যঅনিল সন্ সন্ রবে জলকল্লোল বহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে শিশু আবার বলিল, "দিদি! সমুদ্র সর্ব্বদা কি বলিতেছে?"

বা। অমিয়! আমার পিতা বৈরাগী ছিলেন। তিনি বলিতেন, যিনি এ সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, পারাবার নিরন্তর তাঁহারই প্রেম-গীত গাইতেছে। সমুদ্র কহিতেছে,—'আমার যেমন অনন্ত জল, প্রেমময় হরির তেমনি অনন্ত প্রেম। আমার বুকে যেমন কত ঢেউ খেলিতেছে, তাঁহার প্রেমেও সেরূপ কত ঢেউ উঠিতেছে, ফুটিতেছে, মিশিতেছে। তাহাতে এ সংসার জন্মিতেছে, চলিতেছে, মরিতেছে।' এ সমুদ্রের কত শক্তি! কাল দেখিয়াছ. কেমন ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। কত নৌকা, জাহাজ, দেশ, বাড়ী, ঘর উড়াইয়া ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। সেই হরিরও তেমনি শক্তি। সমুদ্র মানুষকে বলিতেছে—"দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র; তোমার শক্তি তোমার সংসার—কত অসার! অতএব সেই প্রেমময়. লীলাময় হরিকে ডাক. তাঁহার ভজনা কর।"

শি। সেই হরি কে? আমাদের বাড়ীতে রাসের সময় যাঁহার পূজা হয়?

বা। হাঁ ভাই।

শি। সেই প্রহ্লাদ-চরিত্র যাত্রায় যিনি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন. তিনি?

বা। হাঁ, তিনি।

শি। বড় সুন্দর! কেমন সুন্দর চূড়া! কেমন সুন্দর বাঁশী। তুমি তোমার ভাই

গোপালকে কেমন সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইয়াছিলে। আমাকে কি তেমনই করিয়া সাজাইয়া দিবে? আমি তেমনই কৃষ্ণ হইতে পারিব কি? আমার বড় সাধ, তেমনই কৃষ্ণ সাজি।

বালিকা ছল ছল নয়নে বলিল,—"তুমি তাহার অপেক্ষা সুন্দর সাজিতে পারিবে। সে ত তোমার মত সুন্দর, তোমার মত দেব শিশু ছিল না। সে যে গরীব দুঃখীর ছেলে। আমি তোমাকে সুন্দর কৃষ্ণ সাজাইব। ভাই ভগ্নী দুজনে সুন্দর সংকীর্ত্তন করিব। তুমি সাজিবে কেন? তুমি যে নিজেই আমার—ঠিক কৃষ্ণটি।" এই বলিয়া বালিকা আবার তাহার মুখচুম্বন করিল।

শিশুর মুখ গম্ভীর হইল। সে অনেকক্ষণ নীরব হইয়া কি ভাবিল। পরে আবার বালিকার বুকে মুখ লুকাইয়া অতি ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি! হরি কি প্রহ্লাদের মত আমার বাবাকে ও মাকে রক্ষা করিয়াছেন? আমি কৃষ্ণ সাজিলে কি রক্ষা করিতে পারিতাম না?" শিশু কাঁদিতে লাগিল অশ্রুজলে বালিকার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। বালিকার বহুক্ষণরুদ্ধ অশ্রুধারা শিশুর অঙ্গ সিক্ত করিতে লাগিল। বালিকা বলিল, "হরি বড় দয়াময়। তিনি বাবা ও মাকে অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। আমি যদি এত বৎসর এই বালিকার প্রাণ ঢালিয়া বৃথা না ডাকিয়া থাকি, তবে অবশ্য তিনি এই অনাথিনীর প্রার্থনা শুনিয়াছেন। আমি সমস্ত রাত্রি তাঁহাকে ডাকিয়াছি, এবং বাবা ও মাকে রক্ষা করিতে বলিয়াছি। অমিয়! আমরা শীঘ্রই তাঁহাদের দেখিব। বাবা আমাদের খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিবেন।"

"মা!"—অনাথনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বস্ত্রাচ্ছাদনের বহির্ভাগে থাকিয়া—রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ের মত এই পবিত্র দৃশ্য যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছিলেন। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না! বস্ত্রাচ্ছাদনের সম্মুখে গিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন,—"মা ভগবতি। তুই আমার অমিয়কে রক্ষা করিয়াছিস্ এবং তোর বরে সেই দয়াময় হরি আমাকেও রক্ষা করিয়াছেন।"

বালক বালিকা উভয়ে প্রেমানন্দে এক কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"বাবা!" যে এরূপ মহাপ্রলয়ের গ্রাসে পতিত হইয়া রক্ষা পায় নাই, সে এই প্রেম, এই আনন্দ বুঝিবে না। অনাথনাথ পুত্রকে বক্ষে লইয়া সাশ্রুনয়নে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। বালিকা সাষ্টাঙ্গে ভূতলপ্রণত হইয়া শ্রীভগবানকে প্রণাম করিয়া তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের সুশীতল কৃতজ্ঞতাবারি তাঁহার চরণকমলে ঢালিয়া দিল। তাহার পবিত্র চক্ষের জলে সৈকতবালুকা সিক্ত হইতেছিল। বালকও পিতার বুকে কমলকোরকনিভ ক্ষুদ্র মুখখানি রাখিয়া কাঁদিতেছিল। কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব। শিশু যে কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। তাহার পিতৃদর্শনজনিত আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে যেন সেই আশঙ্কার গাঢ়তর মেঘ তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ছাইয়া ফেলিতেছিল। শেষে বহু চেষ্টার পর তাহার ক্ষীণকণ্ঠকে আরও ক্ষীণতর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা মা—কোথা?" প্রশ্ন মুখ হইতে নির্গত হইবামাত্র তাহার ক্ষুদ্র-হৃদয়ের ধৈর্য্যের বন্ধন ভাসাইয়া তাহার সমস্ত দিবসের রুদ্ধ শোকস্রোত অমিতবেগে ছুটিল। বালক মুখ ফুটিয়া আকুলহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল। অনাথনাথ আত্মশোক সংবরণ করিয়া বলিলেন,—"বাবা! যিনি আমাদের তিন জনকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি তোমার পুণ্যপ্রতিমা মাকেও অবশ্য রক্ষা করিয়াছেন। তিনিও শীঘ্র আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন।" বালক আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, "উঃ! বুকে কত ব্যথা! বাবা আমি দিদির কোলে যাইব। হাঁ বাবা তিনি কে? আমার দিদি? আমাকে ত আমার দিদি রক্ষা করিয়াছে।"

অনাথনাথ শিশুকে আবার বালিকার কোলে দিয়া বলিলেন, "বাবা! সত্য সত্যই তোমার দিদি সেই ভগবতী। আমি এমন বালিকা দেখি নাই।"

শিশুর মুখে তাহার সেই শোকের মধ্যে, মেঘের বিরামে জ্যোৎস্নার মত একটুকু আনন্দ দেখা দিল। সে প্রেমভরে তাহার সজল-বিস্তৃতনয়নে বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বালিকা বার বার সেইরূপ সজল-নেত্রে তাহার মুখচুম্বন করিল। শিশু তাহার পর বহুক্ষণ সান্ধ্যছায়াসমাচ্ছন্ন সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যদেব সমুদ্রগর্ভে রক্তজবা বিকীর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিলেন। সে অবর্ণনীয় অননুভবনীয় শোভা বালক অতৃপ্ত-নয়নে দেখিতে লাগিল। শিশু জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! সূর্য্য কোথায় যাইতেছে? ও কি সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেছে?"

অ। না বাবা! সমুদ্রের অন্য পারেও অনেক দেশ আছে, অনেক লোক আছে। সূর্য্য এখন সে সকল দেশে আলো দিতে যাইতেছে।

শি। বাবা মানুষও কি সেইরূপ এক দেশ হইতে আর এক দেশ আলো করিতে যায়? আমার মাও কি সেইরূপ আর এক দেশে আলো করিতে গিয়াছে? হাঁ বাবা! আমি সে দেশ দেখিয়াছি! বড় সুন্দর দেশ। দিদির কোলে শুইয়া সে দেশ অনেকবার দেখিয়াছি। সেথায় কেমন জ্যোৎস্না, কত ফুল, কেমন সুগন্ধ!—কেমন সুন্দর ফুলের উপর আমাদের বাড়ীর লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মত মা বসিয়া হাসিতেছেন! আমাকে "অমিয়! অমিয়!" বলিয়া ডাকিতেছেন। সেই যাত্রার প্রহ্লাদের মত কত সুন্দর সুন্দর ছেলে, কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে, কেমন ফুলের পোষাক পরিয়া মার চারিদিকে গায়িতেছে, নাচিতেছে! আর মার মাথার উপর বাবা! আমাদের বাড়ীর রাসের সেই কৃষ্ণ বসিয়া কি সুন্দর বাঁশী বাজাইতেছেন! মা তাঁহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ঐ দেখ কেমন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। মা! মা!"

শিশু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে নয়ন মুদ্রিত করিয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় রহিল। অনাথনাথের ও বালিকার মুখ গম্ভীর—বড় গম্ভীর হইল। অনাথনাথ শিশুর গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, খুব জ্বর। ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" শিশু "বাবা!" বলিয়া অতি ক্ষীণ মৃদু-কণ্ঠে উত্তর দিল, এবং বলিল,—"উঃ! বুকে বড় ব্যথা।" অনাথনাথ বুঝিলেন যে ঝটিকা-প্লাবন সময়ে শিশু বুকে দারুণ আঘাত পাইয়াছে। বালক একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আবার নয়ন মেলিয়া বলিল,—"দিদি! আমার মা আমাকে প্রহ্লাদ সাজাইয়া একটি গান গায়িতেন ও আমাকে গায়িতে শিখাইতেন। তুই সেই গানটি জানিস্? তুই একবার সেই গানটি গায়িবি; আমি উঠিতে পারিতেছি না, তেমন করিয়া নাচিতে পারিব না। আমিও তোর সঙ্গে গাইব।" বালিকা তাহার সেই অমৃতময় কণ্ঠে সান্ধ্য সৈকতবেলা অমৃতাকীর্ণ করিয়া সেই গানটি গায়িতে লাগিল, এবং অমিয়ও তাহার অমিয়পূরিত কণ্ঠে সেই সঙ্গে গায়িতে লাগিল;—

"তোর নাম রেখিছি হরিবোলা।
মনের সাধে ও আমার মন খেল না
হরিনামের খেলা।"

অনাথনাথ এ গীত অনেকবার শুনিয়াছেন। মাতা-পুত্রের এ গীতাভিনয় দেখিয়াছেন। কিন্তু গীতটি এমন মধুর, এমন পবিত্র, এমন প্রাণদ্রবকারী তাঁহার আর কখনও বোধ হয় নাই। তিনি আত্মহারা হইয়া এই গীত শুনিতে লাগিলেন। গীত ধীরে ধীরে সমাপ্ত হইল। বালিকা নীরব হইলেও শিশু ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে ক্ষুদ্র হাতে ক্ষুদ্র তালি দিয়া ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। তাহার নয়ন মুদ্রিত, মুখ শান্ত,—প্রস্ফুটিত কুসুমনিভ শোভা পাইতেছিল। ক্ষীণ—ক্ষীণতর কণ্ঠে গীত শেষ হইল। তালি বন্ধ হইল। হাত শ্লথ হইয়া পড়িল। শিশু নীরব হইল; সে তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে চলিয়া গেল। বালিকা ডাকিল,—"দাদা! দাদা!" উত্তর পাইল না। অনাথনাথ ডাকিলেন,—"বাবা! বাবা!" উত্তর পাইলেন না। শিশু তাহার মাতার কোলে, সেই প্রেমময়ের পদতলে, চলিয়া গেল। অনাথনাথ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার ছায়া ক্রমে গাঢ়—গাঢ়তর হইয়া এই পবিত্র দৃশ্য ঢাকিয়া ফেলিল।

নবম অধ্যায়

মহাশক্তি

অমাবস্যার ঘোর কৃষ্ণা মহানিশি প্রভাত হইতেছে। জননী প্রকৃত নৃমুণ্ডমালিনী সাজিয়া এ মহানিশিতে এ অঞ্চলে পূজা গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রকৃত পূজা সৃষ্টিসংহার-কারিণীর বুঝি আর কখনও হয় নাই। শ্মশানবাসিনীর পূজার রাত্রিতে এমন প্রকৃতি মহাশ্মশান বুঝি আর কখন সজ্জিত হয় নাই। সমস্ত বঙ্গদেশ সারারাত্রি উৎসবক্ষেত্র—আর এ অঞ্চল মহাশ্মশান! আনন্দআলোকের পার্শ্বে এরূপে নিরানন্দের ছায়া ধরিয়া, হায় মা। তুই উভয়ের কি মহত্ত্বই প্রতিপাদন করিস্! আনন্দ না থাকিলে নিরানন্দ, নিরানন্দ না থাকিলে আনন্দ, আমরা বুঝিতে পারিতাম না;—মানবজীবন্ বৈচিত্র্যশূন্য হইয়া অসহনীয় হইয়া উঠিত। আনন্দের পার্শ্বে নিরানন্দ,—এ গঙ্গা-যমুনাসম্মিলনে তোর সংসার প্রয়াগক্ষেত্র!

রাত্রি প্রভাত হইতেছে। বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া প্রভাত-আরতি বাজিতেছে। অনাথনাথ সমস্ত রাত্রি শোকে এবং শারীরিক ও মানসিক অবসাদে অচৈতন্য ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণে স্বপ্নে বহুদিন শ্রুত, বহুদিনবিস্মৃত, মধুর বংশীরবের মত "বাবা!" সম্বোধন প্রবেশ করিল। সম্বোধন যেন তাঁহার মৃতবৎ দেহে সঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ করিল। ক্রমে তিনি চৈতন্যলাভ করিতে লাগিলেন। আবার শুনিলেন,—"বাবা!" এবং অনুভব করিলেন, তাঁহার চরণে যেন সুকোমল সুশীতল কুসুম বর্ষিত হইয়াছে। নয়ন উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন, দুই হাতে ভানুমতী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া তাঁহাকে জাগাইতেছে। কি শান্ত, কি সুন্দর, কি পবিত্র মুখখানি! কি শান্ত, কি সুন্দর, , কি পবিত্র আয়ত নয়ন। সেই মুখে সেই নয়নের কি কোমলতা, কি স্নেহ কি শোক। অনাথনাথ স্থিরনয়নে সেই মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইল,—এ বালিকা কে? এ কি মানবী? বালিকা আবার "বাবা" বলিয়া ডাকিলে, অনাথনাথ বলিলেন,—"কি মা!" বালিকা বলিল—"বাবা! আমি চললাম। আমি ২। ১ দিন পরে আবার আসিব। যদি পাই, তোমার জন্যে একখানি নৌকা লইয়া আসিব। তুমি চম্বল গ্রামে কোথাও আশ্রয় লইয়া এই দুই দিন কিঞ্চিৎ বিশ্রাম কর।"

অ। সে কি মা! তুই কোথায় যাইবি?

ভা। আমি আদিনাথ যাইব।

অ। কেন?

ভা। অমিয়কে বাঁচাইতে।

অনাথনাথ উচ্চ কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিলেন,—"হায়! মা! অমিয় কি আর বাঁচিবে?"

ভা। বাঁচিবে।

অ। না মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিয়া উঠে?

ভা। উঠে। লক্ষ্মীন্দর আবার বাঁচিয়াছিল। সত্যবান্ আবার বাঁচিয়াছিল। অমিয় আবার বাঁচিবে না কেন? পত্নী যদি পতিকে বাঁচাইতে পারে, ভগ্নী ভাইকে বাঁচাইতে পারিবে না কেন?

অ। হায় মা! সে সব উপাখ্যান। রমণীদিগকে সতীধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য কবিগণ এ সকল উপাখ্যানের রচনা করিয়াছেন।

ভা। না বাবা। সে সকল গল্প নহে। সকলই সত্য কথা। বেহুলা ভেলায় ভাসিয়া দেবপুরে গিয়া স্বামীকে বাঁচাইয়াছিল, আমি এ সমুদ্র সাঁতারিয়া ঐ দেবলোক আদিনাথে গিয়া অমিয়কে বাঁচাইব।

বালিকা বিদ্যুদ্বেগে অনাথনাথের চরণে প্রণাম করিয়া, তাঁহার চরণধূলি ললাটে মাখিয়া, অনাথনাথ চক্ষুর নিমেষ ফেলিবার পূর্ব্বে, সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। তিনি তাহাকে বারণ করিবার অবসর পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, বেদে-রমণীরা যেরূপ কাপড়ের দোলা করিয়া শিশুদিগকে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া পথ চলে, ভানুমতী সেইরূপে মৃতশিশুকে তাহার পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, একখানি কাষ্ঠমাত্র ভর করিয়া, দু' হাতে বিশাল তরঙ্গ কাটিয়া, অবলীলাক্রমে বেগে সন্তরণ করিয়া যাইতেছে।* এ শক্তি ত মানবীর নহে! এ কি তবে সত্য সত্যই সেই "কমলে কামিনী" মহাশক্তি! তিনি আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

দুই ক্রোশব্যাপী সমুদ্রশাখা সন্তরণ করিয়া বালিকা অপরাহ্নে আদিনাথ গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চশেখরসানুস্থিত দেবমন্দিরে উপস্থিত হইল। বালিকার বৈরাগী পিতা গৌরদাস ভারতপূজিত স্বনামখ্যাত 'শংকরপুরীর শিষ্য ছিলেন। তিনি এ অঞ্চলে পুরী গোস্বামী বা পুরী বাবাজি বলিয়া পরিচিত ও পূজিত ছিলেন। গৌরদাস দেহত্যাগের সময়ে বালিকাকে বলিয়াছিলেন যে, ছয় বৎসর পরে তাঁহার গুরুদেব আদিনাথ দর্শন করিতে আসিবেন। সে কথাটাতে কি এক শক্তি নিহিত ছিল, তাহা বালিকার প্রাণে যেন জাগিয়া রহিয়াছিল। সে দিন গণিতেছিল। সেই ছয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তাহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, এ সময়ে আদিনাথের মন্দিরে গেলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। সে বেদে-বেদেনীকে এই সকল কথা বলিয়াছিল। বেদে নিজেও বড় সন্ন্যাসীভক্ত ছিল। আর বেদেনী—সেও 'পুরী গোস্বামীর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার যেরূপ গল্প শুনিয়াছিল, তাহার মনে নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাহার মত রূপ-গুণ-বুদ্ধি-কৌশলসম্পন্ন রমণীরত্নকে দেখিলেই ঘড়া-ঘড়া টাকা দিবেন। অতএব উভয়ে আনন্দের সহিত বালিকার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বাজি করিতে 'সোণাদিয়া' হইয়া আদিনাথ যাইবার পথে ঝটিকাগ্রস্ত হইয়াছিল।

বালিকা সেইরূপ উত্তরীয়বৎ বসনে পৃষ্ঠে বদ্ধ মৃত শিশু সহ অবলীলাক্রমে পর্ব্বত আরোহণ করিয়া আদিনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইল, এবং একজন ভৃত্যের কাছে শুনিতে পাইল যে, সত্য সত্যই একজন মহাপুরুষ সন্ন্যাসী সে সময়ে মন্দিরে অবস্থিতি করিতেছেন। আনন্দে, আবেগে, অজ্ঞাত আশায় নিরাশায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় কম্পিত হইল। সন্ন্যাসী একটি বিশাল পার্ব্বত্যপাদপচ্ছায়ায় স্থির নয়নে অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ বসিয়াছিলেন। কি মূর্ত্তি!

বীরবপু, ক্ষীণ কটি, প্রশস্ত উরস,
তেজঃপুঞ্জ স্বর্ণকান্তি ভস্মে আচ্ছাদিত।
জটার মুকুট উচ্চ শোভিতেছে শিরে,
আদিনাথ-অদ্রিশিরে শোভিতেছে যেন
উচ্চচূড়া মন্দিরের। বসি যোগাসনে,
মহাযোগী, দীর্ঘ দেহ স্থির সমুন্নত।
যোগস্থ আয়ত নেত্র আকর্ণবিস্তৃত,
চাহি অর্দ্ধ-নিমীলিত মহাসিন্ধু পানে।
স্থির, শান্ত, অপলক। রুদ্রাক্ষের মালা

*"Mohabat Ali of Tafalier Char in Kutubdia (I cannot refrain from putting his name in record) was washed from his home across the Kutubdia Channel to Chhanua. He spent the whole of the next day in swimming back to the Island with the help of a plank."

অচল দক্ষিণ করে। শোভিছে বরদ
বাম কর বাম অঙ্কে, যেন মহাযোগী
করিছেন বরদান জীবে, চরাচরে।
শেখর নীরব স্থির, স্থির চরাচর।
কেবল সমুদ্রানিল বহিতেছে ধীরে
কাঁপাইয়া বৃক্ষপত্র, উত্তরীয়-বাস
বাম-অংস-বিলম্বিত, ধীরে ধীরে ধীরে।
অপরাহ্ন-রবিকরে ভাসে চারি দিকে
কি দৃশ্য কল্পনাতীত সিন্ধু-বসুধার।
চারি দিকে জলরাশি, অনন্ত অতল ;
পশ্চিমে দক্ষিণে মহালীলা নীলাম্বুর।
উত্তরে ধূসর সিন্ধু শোভা সুবিস্তৃত
সুপবিত্র পাদমূলে চন্দ্রশেখরের ;
নীলাকাশে সুশোভিত মেঘমালা মত,
গিরিশ্রেণী তরঙ্গিত শোভে চিত্রাঙ্কিত।
পূর্ব্বে শাখা সিন্ধু ; শ্বেতভুজ সুবিশাল
প্রসারি পয়োধি যেন রয়েছে প্রণত
আলিঙ্গি আদিনাথের পবিত্র চরণ।
শোভিতেছে পূর্ব্বতীরে সমুদ্রশাখায়
চট্টলের গিরিশ্রেণী অনন্ত শৃঙ্খলে
বসুধার বক্ষে শ্যাম মরকত-মালা।
ভাসিতেছে আদিনাথ গর্ব্বে জলধির
কি সুন্দর!—সিন্ধুগর্ব্বে যেন নারায়ণ।

বালিকার বোধ হইল, তাহার সম্মুখে সেই যোগস্থ নারায়ণ। চারি দিকের এই মহাদৃশ্য সেই ঝটিকার পরে অপরাহ্ন-রবিকরে কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ শান্তমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে! স্থান কাল, তাহার হৃদয়ের অবস্থা, সম্মুখস্থ মহাযোগী,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভক্তিতে পরিপূরিত হইল। সমাধিশেষে যোগীবর নয়ন উন্মীলন করিলে, বালিকা তাহার পৃষ্ঠেস্থিত শিশুশব তাঁহার চরণতলে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। সন্ন্যাসী কোমল সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! তুমি কে?"

ভা। আমি গৌরদাসের শিষ্যা-কন্যা।

স। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ?

ভা। পুরী বাবাজি এ সময়ে এখানে আসিতে গুরুদেবের কাছে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

স। শঙ্কর পুরীর মৃত্যু হইয়াছে বহু বৎসর।

ভা। তাঁহার মত মহাযোগীর মৃত্যু নাই। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়া থাকিবেন।

স। তুমি মা! কি তাহা বিশ্বাস কর?

ভা। করি।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিলেন।

স। কেন কর?

ভা। গুরুবাক্য কর্ণে শুনিয়াছি—আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। দেহ মৃত্যুর অধীন। আত্মা অমর। চক্ষে দেখিয়াছি, শত শত মৃত জীব পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের দেহ যেরূপ

ছিল, সেই রূপেই আছে। অতএব দেহ হইতে স্বতন্ত্র কিছু একটা ছিল, তাহা চলিয়া গিয়াছে। সে যদি এ দেহ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল, অন্য দেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না কেন?

সন্ন্যাসী বালিকার তেজস্বিনী বুদ্ধিতে প্রীত হইয়া আবার একটু সস্নেহ হাসি হাসিলেন। যেন তুষারাবৃত হিমালয়শৃঙ্গে দ্বিতীয়বার চন্দ্রালোক একটু দেখা দিয়া আবার লুকাইল।

স। তুমি আমার কাছে কি চাও?

ভা। এই শিশুর প্রাণভিক্ষা।

স। মা! মানুষ মরিলে কি আবার বাঁচিতে পারে?

ভা। আমি কিরূপে মরিয়া বাঁচিয়াছিলাম? পুরী বাবাজির বাঁচাইবার শক্তি আছে।

স। অবস্থাবিশেষে জলমগ্ন জীবকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে। তাহাতেই বোধ হয় শঙ্কর পুরী তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহার সে অবস্থা নহে।

ভা। নহে কেন?

স। ইহার মৃত্যু জলে ডুবিয়া হয় নাই। বিশেষতঃ এই শিশু যোগভ্রষ্ট। ইহার কিঞ্চিৎ কর্ম্মফল ভোগ করিবার ছিল সে তাহা ভোগ করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৎসে! ওই সমুদ্রের স্রোতে একখানি ভগ্ন যান ভাসিয়া যাইতেছে দেখিতেছ? উহা যতক্ষণ স্রোতের আকর্ষণে থাকিবে, ততক্ষণ ভাসিবে। মানুষের আত্মাও যতক্ষণ এই পার্থিব কামনা-স্রোতের আকর্ষণে থাকে, ততক্ষণ এই পৃথিবীতে তাহার পুনর্জ্জন্ম হয়। এই স্রোতের অতীত হইলে আর হয় না। তোমার এ জগতে কর্ম্ম আছে। তোমার দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইবে বলিয়া তোমাকে পুরী গোস্বামী পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই শিশু পুনর্জ্জীবিত হইলে তাহার পক্ষে অধোগতি হইবে, এবং সেই কর্ম্মে বিঘ্ন হইবে।

ভা। আমি অনাথা ভিখারিণী, বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা বাবা! কি মহৎ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে?

স। সনাতনধর্ম্মরক্ষা। যিনি ধর্ম্মরক্ষার্থ যুগে যুগে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তুমি তাঁহারই ক্ষুদ্রাংশ। মা! এই চট্টগ্রাম বড় পুণ্যভূমি! এই আদিনাথ, আর ঐ সুদূরে মেঘের গায়ে চন্দ্রনাথ দর্শন কর। জগতের কোথাও এক স্থানে এত তীর্থ নাই। কিন্তু এই পবিত্র তীর্থ সকলের কি দুরবস্থাই হইয়াছে। যে আসনে পূজ্যপাদ *গোমতীবন ও রত্নবনের মত মহযোগী বসিয়াছিলেন, আজ তাহাতে কি মোহন্তরা বসিয়াছে! ইহারা ত মোহন্ত নহে মোহান্ধ! * গোমতীবন ও রত্নবনের বাৎসরিক ব্যক্তিগত ব্যয় ছিল ৪০ টাকা। তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় দেব ও অতিথি সন্ন্যাসীর সেবায় ব্যয়িত হইত। তাঁহারা স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির-সমীপবর্ত্তী 'আস্তানে' কৌপীনমাত্র-পরিহিত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিতকলেবরে সমাধিস্থ অবস্থায় অহর্নিশ অতিবাহিত করিতেন। যাত্রিগণ তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া দেবসেবার্থ যথা ইচ্ছা 'প্রণামী' প্রদান করিয়া এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইত। কিন্তু বর্ত্তমান মোহন্তগণের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। যাত্রিগণও মোহন্তগণকে প্রণাম করিয়া 'প্রণামী' দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের কোনরূপ সংস্রবে পর্য্যন্ত আসিতে চাহে না। কাজেই তীর্থধামে 'রেলওয়ে' পরিণত হইয়াছিল। মোহন্তরা টিকিট কাটিয়া, তীর্থধামের সমক্ষে ঘেরা দিয়া, প্রহরী রাখিয়া, বলপূর্ব্বক প্রণামীর স্থলে এত কাল 'কর' বা 'টেক্স' আদায় করিতেছিল। মহামান্য হাই-কোর্ট সেই ঘোরতর উৎপীড়ন হইতে আপাততঃ যাত্রিগণকে উদ্ধার করিয়াছেন। এই অর্থরাশি এবং তীর্থের প্রায় সমস্ত আয় মোহন্তদের আত্মসেবায় নিঃশেষিত হইতেছে।

দেব এবং অতিথি সন্ন্যাসীর সেবা নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে। মন্দির ও সোপানাবলি পর্য্যন্ত সংস্কারাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। জলাশয় সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এ ভাবে আর কিছু দিন চলিলে এ দেশের তীর্থধাম সকল লুপ্ত হইবে। কেবল এখানে বলিয়া নহে মা! ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই শোচনীয় অবস্থা।

ভা। বাবা! রাজা কেন এই ভণ্ড মোহন্তদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তীর্থগুলি রক্ষা করেন না?

স। ইংরাজ রাজ্য রামরাজ্য। আসমুদ্র হিমাচল, আগান্ধার চট্টগ্রাম, এরূপ প্রগাঢ় শান্তি যুধিষ্ঠিরের সেই ধর্ম্মরাজ্যের পর, ভারত আর কখনও ভোগ করিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ইংরাজ বিদেশী, ইংরাজ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী। এক দিকে আমাদের সনাতন ধর্ম্মের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, আমাদের দর্শনের সূক্ষ্ম জটিলতা, তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ইহাকে 'পৌত্তলিকতা' বলেন। বাক্য মনের অগোচর পরমব্রহ্মের বিভিন্ন শক্তির বিভিন্ন 'প্রতিমা' যে পুতুল নহে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। অতএব আমাদের সার্ব্বভৌম ধর্ম্মকে তাঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া তাহার প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য মনে করেন। অন্য দিকে প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ না করাই তাঁহাদের রাজ্যের একটি মূলনীতি। বহু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে বিভক্ত ভারতবর্ষে ইহা যে উত্তম নীতি, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা না করিলে ধর্ম্ম কে রক্ষা করিবে? পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, রাজ-শক্তি ভিন্ন ধর্ম্ম রক্ষিত হয় না; এক এক জন অবতার আসিয়া যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপন করেন। যতদিন রাজশক্তি তাহার পশ্চাতে থাকে, ততদিন তাহা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হয়। রাজ-শক্তি অপসারিত হইলে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়। এইরূপে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মরাজ্যচ্ছায়া, এবং বুদ্ধোক্ত ধর্ম্মের পশ্চাতে অশোকের রাজ্যচ্ছায়া ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়। রাজশক্তির অবলম্বন অভাবে আর্য্যধর্ম্মের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। ইংরাজ রাজা বলেন, তাঁহাদের নীতির রাজ্য। তীর্থ সম্বন্ধেও রাজনীতি আছে। প্রজাগণ সেই নীতির অনুসরণ করিয়া আপন আপন তীর্থ রক্ষা করুক।

ভা। বাবা! প্রজারা তাহা করে না কেন?

স। মা! কে করিবে? হিন্দু ধর্ম্ম জীবনহীন: হিন্দু সমাজ মৃত। তবে চট্টগ্রামবাসী-দের সাহস আছে, উৎসাহ আছে, উদ্যম আছে। মহাঝড়েও অর্ণবযানের পালদণ্ডের শীর্ষ-দেশে উঠিতে চট্টগ্রামবাসী ভয় করে না। পুরী গোস্বামী মনে করিয়াছিলেন, এখানে যদি হিন্দু ধর্ম্মে ও সমাজে জীবন সঞ্চার করিতে একটি শিষ্যসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে নৈসর্গিকশোভাসম্পন্ন এই পুণ্যস্থানের তীর্থগুলি রক্ষা করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ এখানের তীর্থগুলির যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, এমন আর কোথাও হয় নাই। এই কারণে তিনি মুক্তহস্তে শস্য ছড়াইয়াছিলেন। পাত্রাপাত্র কিছুরই বিচার না করিয়া শিষ্য করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন, যে বীজ উর্ব্বর ক্ষেত্রে পড়িবে, তাহা হইতে সুফল উৎপন্ন হইবে। কিন্তু হায়! প্রায় সকল বীজই ঊষর ক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিল। তাঁহার অভিসন্ধির মহত্ত্ব, তাঁহার দীক্ষার গভীরত্ব, এবং তান্ত্রিক ধর্ম্মের তাৎপর্য্য, উদারতা, সমপ্রাণতা, ইহারা কিছুই বুঝে নাই। শুনিলাম, কোনও এক জন অবস্থাপন্ন শিষ্য অম্লানমুখে বলিয়াছেন যে, তিনি তীর্থরক্ষাব্রতে যোগদান করিতে পারেন না, কারণ কোন মোহন্ত ও তিনি উভয়েই পুরী গোস্বামীর শিষ্য। হা পুরী গোস্বামী! তুমি কি এই ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলে? তুমি কি শিক্ষা দিয়াছিলে যে, কোনও শিষ্য ঘোরতর পাপকার্য্যে লিপ্ত হইলেও তোমার শিষ্যগণ তাহাকে সেই কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার প্রশ্রয় দিবে? বারংবার এ অঞ্চলে আসিয়া তোমার বুঝি স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল, তাহাদের

এই অধোগতি দেখিয়া বুঝি তুমি ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলে, তাহাতেই বুঝি তোমার অকালে দেহত্যাগ ঘটিল!

সন্ন্যাসীর নয়নে জল আসিল। বালিকার নয়নেও জলধারা বহিল। বালিকা গলদশ্রুনয়নে জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা! ইংরাজ রাজা দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে রাজ্যশাসন করিতেছেন। দস্যু তস্করের দণ্ড দিতেছেন। যাহারা দেববিত্ত চুরি করিতেছে, তাহারাও কি চোর নহে? তাহাদেরও অন্য চোরের মত দণ্ড দেওয়া কি রাজার উচিত নহে?"

স। উচিত। কিন্তু এ পথেও দুটি অন্তরায়। ইংরাজ রাজপুরুষেরা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া যদি ইহাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করেন, তাঁহারা ভয় করেন যে,—"রাজা হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলেন"—বলিয়া সমস্ত দেশ চীৎকার করিয়া উঠিবে। তাঁহাদের এই আশঙ্কা অমূলক। সমস্ত দেশ বরং তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। চীৎকার করিবে কেবল মুষ্টিমেয় লোক। ইহাদের অধিকাংশই মোহন্তদের উচ্ছিষ্টভোজী। কেবল কয়েকজন মাত্র আশঙ্কা করেন যে, ইংরাজ রাজাকে তীর্থে হস্তক্ষেপ করিতে দিলে তীর্থবিত্ত যাহা এখন মোহন্তরা ভোগবিলাসে ও পাপকার্য্যে ব্যয়িত করিতেছে, তাহা রাজকোষে যাইবে। ইহারা ইংরাজ রাজপুরুষদের সাধু উদ্দেশ্যে প্রায় সকল বিষয়েই অল্পাধিক বিশ্বাসহীন। কিন্তু তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তীর্থগুলির রক্ষা না করিলে দুরাচার মোহন্তদের প্রতিকূলে অভিযোগ উপস্থিত করিবে কে? এ দরিদ্র দেশে যাহারা ধনী, তাহারা সকলেই উপাধিব্যাধিগ্রস্ত। ইহাদের এখন ধর্ম্ম—উপাধি, অর্থ—উপাধি, কাম—উপাধি, মোক্ষ—উপাধি! অন্য দিকে দেবতার কৃপায় মোহন্তদের প্রভূত অর্থবল। ইহাদের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কে সর্ব্বস্বান্ত হইবে? মোহন্তরা বিলাত পর্য্যন্ত না লড়িয়া ছাড়িবে না। ২০ বৎসরেও এই বিবাদ বিচারালয়ে শেষ হইবে না। ইতিমধ্যে বিবাদী মোহন্ত সমস্ত দেববিত্তের ধ্বংস করিয়া মরিয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে এই বিবাদে তীর্থের কোন উপকার হইবে না! কেবল অভিযোগকারীর সর্ব্বনাশ। যদি এই হিমালয়স্বরূপ অন্তরায় না মানিয়া কেহ সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অভিযোগ করিতে অগ্রসর হয়, তখন দ্বিতীয় অন্তরায় উপস্থিত হয়। রাজপুরুষেরা পূর্ব্বে সমাজের নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। এখন আর তাহা করেন না। সুতরাং ক্রমে নেতৃগণ এই কারণে নেতৃত্ব হারাইতেছেন, দেশ নেতৃহীন হইতেছে, সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। নেতার স্থানে এখন চাটুকারের আবির্ভাব হইয়াছে. এই চাটুকারেরা সামান্য স্বার্থের জন্যে না কহিতে পারে, এমন মিথ্যা কথা নাই, না করিতে পারে, এমন পাপ নাই; না জানে. এমন প্রবঞ্চনা নাই। এই নীচাশয়দের চক্রান্তে অভিযোগ নিষ্ফল হয়।

ভা। তবে কি হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু তীর্থের, কোনও মতে রক্ষা হইবে না?

স। হইবে। তবে হিন্দু পুরুষপুঙ্গবদের দ্বারা হইবে না। হইবে—হিন্দু রমণীর দ্বারা। সতী সাধ্বী ধর্ম্মপ্রাণা হিন্দু রমণী আছে বলিয়া দেশে এখনও ধর্ম্ম আছে, তীর্থ আছে। কোনও পুণ্যবতী সোপানশ্রেণীর নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এখনও যাত্রিগণ চন্দ্রশেখর আরোহণ করিয়া চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে পারিতেছে। তোমার মত হিন্দু রমণীরাই এ সকল তীর্থ রক্ষা করিবে।

ভা। হায় বাবা! আমি ভিখারিণী বেদের মেয়ে। আমার দ্বারা কেমন করিয়া এত বড় একটা মহৎকার্য্য হইবে?

স। মা! তোমাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার সময়ে পুরী গোস্বামী তোমার কর্ণে শক্তিসম্পন্ন মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাই। যথাসময়ে তিনি তোমার হৃদয়ে ইহার উপায় উদ্ভাসিত করিয়া দিবেন।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। বালিকা পাদপদ্মে প্রণত হইলে, তিনি

তাহার শিরে সেই বরদ পদ্মপাণি স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মনোরথ পূর্ণ হউক।"

দশম অধ্যায়

ঝড়ের ও সমুদ্রপ্লাবনের ভীষণ সংবাদ প্রথমতঃ জনরবের ক্ষীণকণ্ঠে, পরে এ অঞ্চলস্থ কর্ম্মচারীদের পত্রে ঘোরারাবে চট্টগ্রাম নগরে উপস্থিত হয়, এবং দেশ ব্যাপিয়া হাহাকার-ধ্বনি, প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। উত্তরে কুমিরা হইতে দক্ষিণে কক্সবাজার, অনুমান ৩৫ ক্রোশ, এবং পশ্চিমে সমুদ্রতট হইতে পূর্ব্বে দক্ষিণ লুসাই পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত, অনুমান ৪০ ক্রোশ পরিসর স্থানে, বৃক্ষ ও গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে। অনুমান দশ লক্ষ লোক একপ্রকার গৃহহীন হইয়াছে, এবং সহস্র সহস্র লোক গৃহপিষ্ট হইয়া ও বৃক্ষচাপা পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শত্রুসৈন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, কামানের অজস্র বজ্রবর্ষণে নগর যেরূপ বিধ্বস্ত হয়, চট্টগ্রাম নগর সেইরূপ শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইয়াছে। নগরে পর্ণ-গৃহমাত্র নাই ; শৈলশেখরস্থ অট্টালিকা সকল ভগ্নাঙ্গ ও শ্রীহীন ; বৃক্ষাদি পড়িয়া রাজপথ সকল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মহামহীরুহ সকল পর্য্যন্ত সমূলে উৎপাটিত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। কর্ণফুলিস্থ অর্ণবযান সকল বিধ্বস্ত বা জলমগ্ন হইয়াছে। জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ফিলিমোর নগর পরিষ্কার করিয়াছিলেন, এবং বিপন্নদের সাহায্যের জন্যে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন ও সদাশয়তা দেখাইয়াছিলেন, চট্টগ্রামবাসী তাহা শীঘ্র ভুলিবেন না।

অনাথনাথের বাটীতে এ ভীষণ সংবাদ পঁহুছিলে, তাঁহার লোকজন খাদ্যদ্রব্যাদি ও শিবির লইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে জলপথে ছুটিল। তাঁহার জমিদারী সুবর্ণদ্বীপ-রূপ মহাশ্মশানে শিবিরস্থাপন করিয়া তিনি কয়েকদিন যাবৎ ধ্বংসাবশিষ্ট প্রজাদের প্রাণপণে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার পত্নীর ও বেদেদের বহু অনুসন্ধান করিয়াছেন, কোনও সংবাদ পান নাই। পত্নীপুত্রসর্ব্বস্ব অনাথনাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় লইয়া, আত্মশোক ভুলিয়া, প্রজাদের ভগ্নহৃদয়ে শক্তি ও শান্তির সঞ্চার করিতেছেন। শোকার্ত্তের অশ্রু মুছাইতেছেন, ক্ষুধার্ত্তের ও তৃষ্ণাতুরের অন্নজলের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রত্যহ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ ও তাঁহার পক্ষ হইতে খাদ্য ও জল আসিতেছে ; কারণ, সমুদ্র-প্লাবনে সমস্ত সরোবর ও দীর্ঘিকা লবণাক্ত ও মৃত গলিত শবে দূষিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কূপ খনন করা হইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য্য শবের সংকার। শত শত সহস্র সহস্র নর-পশু-পক্ষি শবে দ্বীপাবলী ও সমুদ্রতটস্থ গ্রামসমূহ সমাচ্ছন্ন। শৃগাল, কুক্কুর, গৃধিনী, কিছুই জীবিত নাই। মৃতদেহ সকল এরূপ লবণাক্ত হইয়াছে যে, তাহা অতি ধীরে ধীরে পচিতেছে এবং অসহনীয় দুর্গন্ধ বিকীর্ণ করিতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত্ত করিয়া এই শবরাশি পুঁতিয়া ফেলিতে হইতেছে। তাঁহাকে ও চিরস্মরণীয় একজন ইংরাজ রাজপুরুষকে এই ভীষণ কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইতেছে। কারণ, যে সকল লোক ঝটিকাপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছে, তাহারা এরূপ হতসাহস, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের দ্বারা কোনও কার্য্যই হইতেছে না। এই পুণ্যব্রতে ভানুমতীই অনাথনাথের একমাত্র সহায় ও শান্তি। সমস্ত দিবস বালিকাকে লইয়া সব্বস্বান্ত দুর্ব্বল প্রজাদের সেবা শুশ্রূষা করেন, এবং সবল প্রজাদের দ্বারা কূপখনন ও জমিদারি-রক্ষার্থ সমুদ্রতীরস্থ ভগ্ন বাঁধের ও প্রজাদের গৃহের সংস্কার করেন, এবং রাত্রিতে নির্জ্জন শিবিরে বালিকার মুখ দেখিয়া, তাহাকে বুকে লইয়া, পত্নীপুত্রের শোক নিবারণ করেন। ডিক্সন সাহেব (Dixon) পর্য্যন্ত বালিকার শক্তি, বুদ্ধি ও সহৃদয়তা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তিনিও তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং

বলেন, ভারতবর্ষে এমন রমণীরত্ন আছে, তিনি চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতেন না।

অপরাহ্ন। শিবিরচ্ছায়ায় সিন্ধুসম্মুখে অনাথনাথ একখানি চেয়ারে দিবসের পরিশ্রমে অবসন্নদেহে বসিয়া আছেন। পদতলে ভানুমতী, যেন দেবপদতলে চম্পকফুলরাশি। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র অপরাহ্ন-রবি-করে তরঙ্গিত তরল সুবর্ণরাশির মত শোভা পাইতেছে। অনতিদূরে বাষ্পযান ও অর্ণবযান সকল পাল প্রসারিত করিয়া নানাবিধ অর্ণবচর পক্ষীর মত ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

অ। মা! এতদিনে আমি বৃটিশরাজ্যের ও বৃটিশ রাজপুরুষদের একটি মহত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখিলাম। যাহা দেখিলাম, তাহাতে বৃটিশ রাজ্যকে ও বৃটিশ রাজাকে পূজা করিতে ইচ্ছা করে। এ অঞ্চল সমুদ্রতরঙ্গমগ্ন হইবার সংবাদ চট্টগ্রাম নগরে প্রচারিত হইবামাত্র, আমাদের করুণহৃদয় কমিশনার কলিয়ার সাহেব (F. R. S. Collier) একখানি "ষ্টিমলঞ্চ" লইয়া ছুটিয়া আসেন। এমন শান্ত, স্থির, শিবতুল্য ব্যক্তি,—এমন নির্ব্বাক, আড়ম্বর-শূন্য, দৃঢ়, কর্ম্মজ্ঞ লোক, ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বিরল। তাঁহারই কৃপায় এই ধ্বংসাবশিষ্ট হতভাগ্যগণ অন্নজল পাইতেছে। তাহার পর ওই দেবপ্রতিম ডিক্সন সাহেব একটি কর্ম্মাবতারের মত উপস্থিত হইয়া কি অদ্ভুত কর্ম্ম করিতেছেন, তুমি তাহার কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখিয়াছ। তাঁহার নয়নে অশ্রু, হৃদয়ে করুণা, শরীরে অসাধারণ শক্তি ও সহিষ্ণুতা। মৃতদেহের শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া, জীবিতদের হাহাকার শুনিয়া, তাঁহাকে কত বার কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাঁহার আহার নিদ্রা নাই বলিলেও হয়। তিনি অনবরত গ্রামে গ্রামে দ্বীপে দ্বীপে ঘুরিয়া কিসে হতভাগ্যদের দুঃখের উপশম হইবে, এবং এ সকল স্থান আবার বাসোপযোগী হইবে, দিবারাত্রি তাহারই জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। ইঁহার ঘৃণা নাই, দুর্গন্ধজ্ঞান নাই, ক্ষুধা নাই, পিপাসা নাই, মুখে চিরশান্তি, চিরপ্রসন্নতা। ঐ দেখ, পাদুকাশূন্যপদে কর্দ্দমে দাঁড়াইয়া, আস্তিন গুটাইয়া, তিনি কখন বা স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন করিতেছেন, কখন বা গলিত শবদেহ নিজে টানিয়া গর্ত্তে ফেলিতেছেন। তাঁহার এই অক্ষয়কীর্ত্তি এ দেশে প্রবাদের মত প্রচলিত থাকিবে, এবং আবহমানকাল এ অঞ্চলের লোকে তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করিবে।

ভা। বাবা! ইনি কি মানুষ?

অ। মানুষ। তবে আমাদের মত মানুষ নহেন। ইঁহার কার্য্য দেখিয়া আমি এত দিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কেন রাজা, আমরা কেন তাঁহার প্রজা। এতদিনে বুঝিয়াছি, ইংরাজ কি শক্তিবলে এরূপ বিস্তীর্ণ রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না। ইহার এক অংশে সন্ধ্যা, অন্য অংশে প্রভাত ; এক অংশে নিশীথসময়, অন্যাংশে মধ্যাহ্ন। এমন কর্ম্মবীর আর এ জগতে নাই। ইহার পর এলেন সাহেব (C. G. H. Allen) আসিয়াছিলেন। তিনি বন্দোবস্তির ভার প্রাপ্ত হইয়া দশ বৎসর এ অঞ্চলে আছেন, এবং আবালবৃদ্ধ সকলের কাছে পরিচিত। তিনি যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কর্ম্মপটু, তেমনি সহৃদয়। এ দেশের নওয়াবাদ বন্দোবস্ত কার্য্যের মত বিরক্তিকর ও অপ্রিয় কার্য্য বুঝি আর নাই। কিন্তু কেহ তাঁহাকে কখনও বিরক্ত হইতে দেখে নাই, কখনও মুখে রুক্ষ্মভাষা শুনে নাই। কেবল মাত্র প্রিয় ব্যবহারে তিনি সকলের নিকট প্রিয়। এ অঞ্চলের অনেক তালুকদার ও প্রজাকে তিনি চেনেন। এক এক জন তালুকদারের শূন্য ভিটা ও বহু পরিবার সহ ধ্বংসের কথা শুনিয়া অশ্রুপাত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, তাঁহারই প্রস্তাবে ও কলিয়ার সাহেবের পৃষ্ঠপোষকতায় গবর্ণমেণ্ট দুর্ভিক্ষের দানভাণ্ডার হইতে ৫০,০০০ টাকা প্রজাদের সাহায্যার্থ দিয়াছেন। সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বাঁধিবার জন্য এবং কৃষকদের হাল গরু কিনিবার জন্য ১,৫০,০০০ টাকা ঋণ দিতেছেন, এবং এ অঞ্চলের দুই বৎসরের খাস-মহলের রাজস্ব—লক্ষাধিক টাকা রেহাই দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে প্রণালীতে এ অঞ্চলের

প্রজাদের সাহায্য করা হইতেছে, শুনিয়াছি, তাহার উদ্ভাবকও এলেন সাহেব। ইঁহার পর আমাদের প্রিয়ভাষী কালেক্টর সাহেব আসিয়া প্রজাদিগকে স্বহস্তে ঋণ দিয়াছেন ও তাহাদের বিপদে সহানুভূতি দেখাইয়া তাহাদের আশ্বস্ত করিয়াছেন।

এমন সময়ে আর একজন সাহেব আসিলেন, এবং অনাথনাথের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের পর তাঁহার পার্শ্বস্থিত একখানি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—"একটি লোক কতকগুলি পুরাতন কাপড় ও পয়সা স্থানে স্থানে বন্যাবিধ্বস্ত লোকদিগকে বিলাইতেছে। সে বলিল, সে ব্রাহ্ম।"

অ। সম্ভব। ব্রাহ্মসমাজ একদিন দেশরক্ষা করিয়াছে। পূজ্যপাদ রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে, এতদিন অর্দ্ধেক হিন্দু খৃষ্টান কি মুসলমান হইত। এখনও ব্রাহ্মসমাজে বহু পূজনীয় ব্যক্তি আছেন।

সাহেব। আচ্ছা বাবু! ব্রাহ্ম ধর্ম্মে ও হিন্দু ধর্ম্মে বিভেদ কি?

অ। কিছুই না। হিন্দু ধর্ম্মের উচ্চতম শাখাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। তবে ব্রাহ্মরা এক লাফে সে শাখায় উঠিতে চাহেন। অষ্টমবর্ষীয় শিশুও একবার নয়ন মুদ্রিত করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বলিলেই ব্রাহ্ম হইল। হিন্দুরা বলে, গোড়া বাহিয়া বৃক্ষের আগায় উঠিতে হইবে।

সাহেব। হিন্দুরা কি পৌত্তলিক নহে?

অ। না। পৌত্তলিক শব্দ হিন্দুদের অভিধানে কি ভাষায় পর্য্যন্ত নাই। হিন্দুরা পুতুল পূজা করে না। পরম ব্রহ্ম মানবেন্দ্রিয়ের, বাক্য মনের অতীত। তাঁহাকে কেবল তাঁহার শক্তির দ্বারা ধারণা করিতে পারি। হিন্দুরা এক একটি শক্তির প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সম্মুখে রাখিয়া সেই সেই শক্তির পূজা করে। অদ্ভুত জ্ঞান ও কবিত্বপূর্ণ প্রতিমাতত্ত্ব বুঝাইবার এ স্থান নহে। আপনিও সহজে বুঝিবেন না। তবে এইমাত্র বুঝিয়া রাখুন, খৃষ্টানদের ক্রশ যেমন খৃষ্টের আত্মবলিদানের নিদর্শন, এ সকল প্রতিমাও এক একটি শক্তির ও সত্যের নিদর্শন মাত্র।

সা। কিন্তু এই প্রতিমার প্রয়োজন কি?

অ। ক্রশের প্রয়োজন কি? যে কোনও বিদ্যা শিখিতে হইলেই তাহার অক্ষর চাই, গ্রন্থ চাই, শ্রেণী চাই, প্রণালী চাই। সকল বিদ্যা অপেক্ষা যে দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ববিদ্যা, তাহা শিক্ষা করিতে কি কিছুই চাহি না? হিন্দুদের প্রতিমাগুলি সেই পরম বিদ্যা শিক্ষার অক্ষর, শাস্ত্র তাহার গ্রন্থ, সম্প্রদায় সকল শ্রেণী, এবং পূজা বা সাধনাপদ্ধতি তাহার প্রণালী। এখানে অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের পার্থক্য ও বিশেষত্ব। অন্য ধর্ম্মে শিশু, বৃদ্ধ, মূর্খ, জ্ঞানী অভেদে এক। হিন্দুধর্ম্মে অধিকারিভেদে স্বতন্ত্র সোপান আছে। যাহার যেরূপ শিক্ষা, ও জ্ঞানলাভ হইয়াছে, যেরূপ মানসিক শক্তি আছে, সে সেইরূপ সোপান অবলম্বন করে।

সা। কিন্তু অধিকাংশ লোক নিম্নতম সোপানে থাকিয়া যায়। ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। তাহারা এ সকল পুতুলকেই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে।

অ। তাহা নহে। আপনি সামান্য একজন মূর্খ কৃষককেও জিজ্ঞাসা করুন, সেও বলিবে, এতগুলি ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর এক। প্রতিমারা বিভিন্ন দেবতার বা ঐশিকশক্তির প্রতিমামাত্র। লক্ষ্মী ধনদার, সরস্বতী জ্ঞানদার, দুর্গা দুর্গতিহারিণীর, কালী ধ্বংসকারিণীর প্রতিমা। তাহারা মারীভয় হইলে কালী পূজা করে, লক্ষ্মী কি সরস্বতী পূজা করে না। আর অধিকাংশ লোক ত নিম্নতম সোপানে থাকিবার কথা। অন্য বিদ্যায়—দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পেও ত তাহারা নিম্নতম সোপানে। হিন্দু ধর্ম্মের সোপানগুলিও এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহার সকল সোপানে, এমন কি, নিম্নতম সোপানে থাকিয়াও মানুষ সচ্চরিত্র হইতে

পারে, নিষ্পাপ হইতে পারে, মানুষ হইতে পারে। ধর্ম্মের ইহাই ত উদ্দেশ্য। আপনাদের নিম্নশ্রেণীর সঙ্গে মুসলমানদের নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, হিন্দু নিম্নশ্রেণী কত শান্ত, শিষ্ট ও সাধু, মনুষ্যত্বে কত উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ, অন্যান্য ধর্ম্মে হিন্দু ধর্ম্মের মত অক্ষর নাই, অধিকারিভেদে শাস্ত্র নাই, শ্রেণী নাই, শিক্ষাপ্রণালী নাই।

সা। যদি হিন্দুদের উচ্চতম ধর্ম্মশৃঙ্গই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুদের সঙ্গে ব্রাহ্মদের মতভেদ কি লইয়া?

অ। কতকগুলি ছাই ভস্ম লইয়া, বিধবাবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, যুবতীবিবাহ।

সা। এগুলি কি মন্দ?

অ। মন্দ! জনসংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক বেশী। প্রত্যেক পুরুষ বিবাহ করিলেও বহুসংখ্যক নারী অবিবাহিতা থাকিবার কথা। তাই ভারতে বহুবিবাহপদ্ধতি আছে। ইহার উপর যদি বিধবারা আবার দুই বার, বহুবার বিবাহ করে, তবে অবিবাহিতা রমণীর সংখ্যা আরও বেশী হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিধবারা একবার স্বামী পাইয়াছিল। তাহাদের স্বামী না দেওয়া, কিংবা অন্য রমণীগণকে একেবারে স্বামীর মুখ পর্য্যন্ত দেখিতে না দেওয়া, অধিকতর নিষ্ঠুরতা। তৃতীয়তঃ, এই ভারতে এখনই অন্নজলের জন্যে হাহাকার। আপনারা বলেন, জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া এরূপ হইয়াছে। তবে ভারতের লক্ষ লক্ষ বিধবাকে বিবাহ করিতে দিলে কি জনসংখ্যা আরও বাড়িবে না? আপনাদের দেশে জনসংখ্যা নিবারণের জন্যে কৃত্রিম উপায় সকল অবলম্বিত হয়। আর্য্য ভারতের শাস্ত্রকার বলেন, হিন্দুবিবাহ শরীরে শরীরে সম্ভোগার্থ নহে। উহা আত্মায় আত্মায়, ধর্ম্মসাধনার্থ। আত্মার মৃত্যু নাই। দেহের মৃত্যুতে উহা ছিন্ন হয় না। অতএব বিধবারা মৃত পতির স্মৃতির হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য বা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া, জীবন পুণ্যময় করিয়া যাপন করিলে পরলোকে আবার পতির সঙ্গে অনন্তকালের জন্যে সম্মিলিত হইবে। সাহেব! দুইটার মধ্যে কোনটি মহৎ উপায়?

সা। কিন্তু অসবর্ণ বিবাহে দোষ কি? নূতন রক্তের সংমিশ্রণে তাহাতে জাতির উন্নতি সাধিত হয়।

অ। হয়। নূতন সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে হয়, কিন্তু ভিন্নজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণে হয় কি? ঘোড়ার ও গাধার রক্তের সংমিশ্রণে যে খচ্চর হয়, উহা না হয় গাধা, না হয় ঘোড়া। গাধায় ঘোড়ায় যেরূপ পার্থক্য আছে, মানুষে মানুষে, ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে, ক্ষত্রিয়ে বৈশ্যে, এবং বৈশ্যে শূদ্রে ততোধিক প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। যাহারা জ্ঞানপ্রয়াসী, তাহারা ব্রাহ্মণ, যাহারা যুদ্ধপ্রয়াসী, তাহারা ক্ষত্রিয়, যাহারা বাণিজ্যপ্রয়াসী, তাহারা বৈশ্য, এবং যাহাদের এ তিন কার্য্যের কোনটিরই প্রকৃতি ও শক্তি নাই, তাহারা শূদ্র। ভারতে প্রথমে এইরূপ চারি বর্ণের উৎপত্তি হয়। পুরুষানুক্রমে বিশেষ গুণ ও কর্ম্মের অনুশীলনের দ্বারা প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি ও সংস্কার এত বিভিন্ন হইয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের এক মানবজাতি বলা যাইতে পারে না। এক জন ব্রাহ্মণ আর এই ডোমকে দেখুন। ইহারা কি এক জাতি? এক জন জ্ঞানপ্রয়াসী ব্রাহ্মণ যদি এই ডোমের কন্যা বিবাহ করে, তাহার সন্তানে কি সচরাচর জ্ঞান বর্দ্ধিত হইবে? ভারতীয় বিবাহের দুইটি উচ্চ অভিসন্ধি। প্রথমতঃ সমজাতীয় রক্তের সংমিশ্রণ, দ্বিতীয়তঃ সমজাতীয় দুইটি আত্মার সংমিশ্রণ। এই উভয় সংমিশ্রণের দ্বারাই জাতীয় গুণ ও কর্ম্মের ক্রমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে। কেবল সবর্ণে বিবাহ হইলে হইবে না। জ্যোতিষের সাহায্যে যথাসম্ভব দুইটি সমধর্ম্ম বিশিষ্ট আত্মার সম্মিলন চাই। আর্য্যবিবাহের সমস্ত প্রক্রিয়াই দুইটি আত্মার বৈদ্যুতিক (Mesmeric) সংমিশ্রণ। উহা বুঝাইবার এ স্থান কি সময় নহে। আর্য্যদের দশকর্ম্মের

ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পদ্ধতি একটু চিন্তা করিয়া বুঝিতে গেলে উহাদের বৈজ্ঞানিকতায়, দার্শনিকতায়, এবং আধ্যাত্মিকতায় অভিভূত হইতে হয়। যাক্ সে কথা। আপনাদের দেশেও অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু এক জন রাজপুত্র কি আপনি, একজন মুচি মুদ্দাফরাসের কন্যা বিবাহ করিবেন কি? ব্রাহ্মসমাজেরও ত বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ মূলনীতি। কিন্তু কয়টি এইরূপ বিবাহ হইয়াছে। সে দিন ব্রাহ্মসমাজের এক জন ভক্তি-ভাজন নেতা বলিতেছিলেন যে, ব্রাহ্মবিধবা কেহ বিবাহ করিতে চাহে না। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্ম ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মের কন্যা চাহে, বৈদ্য ব্রাহ্ম বৈদ্য ব্রাহ্মের কন্যা চাহে। মোট কথা মানুষের আকৃতি এক নহে, প্রকৃতি এক নহে। যেখানে ভগবান এইরূপ বৈষম্য ঘটাইয়াছেন, মানুষ কেমন করিয়া সাম্য আনিবে? জলে জল মিশিবে, অনলে অনল মিশিবে। জগতে সর্ব্বত্র সমপ্রকৃতিই মিশে। অতএব সমপ্রকৃতিই জাতীয়তার ঈশ্বরাভিপ্রেত ভিত্তি। তাহা মানুষ কেমন করিয়া উড়াইবে? এ জন্য সকল দেশেই একরূপ না একরূপ জাতিবিভাগ আছে। আপনাদের দেশে উহা ধন ও পদমর্য্যাদাগত। আর্য্যদের উহা প্রকৃতিগত। বলুন দেখি, কোন্‌টি অধিক স্বাভাবিক? আর আপনি যে নূতন রক্তের কথা বলিয়াছেন, সেই কথা হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ভুলেন নাই। তাঁহারা বর-কন্যার কয়েক পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষেধ করিয়া, সমজাতীয় রক্তের নূতনত্বের বিধান করিয়াছেন।

সা। আচ্ছা যুবতীবিবাহ অপেক্ষা কি বাল্যবিবাহ ভাল?

অ। ভাল। তিনটি কারণে ভাল। প্রথমতঃ কি যুবক, কি যুবতী, অবিবাহিত থাকিলে উভয়ের পদস্খলিত হইবার কথা। চরিত্রের বাঁধ, সংযমের বাঁধ, এক বার ভাঙ্গিলে উহা রক্ষা করা বড় কঠিন। দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ না হইলে কন্যা কিরূপ অবস্থাপন্ন পাত্রের হাতে পড়িবে, তাহা জানা অসাধ্য। ধনীর গৃহের উপযোগী করিয়া দুহিতাকে শিক্ষা দিলে, সে যদি দরিদ্রের ঘরে পড়ে, তাহার দুঃখের সীমা থাকে না। সেরূপ দরিদ্রোপযোগী শিক্ষা দিলে সে যদি ধনীর ঘরে পড়ে, অন্ধকারের কীট আলোতে গেলে যেরূপ অবস্থা হয়, তাহারও সেরূপ হয়। বিবাহ হইয়া গেলে যেরূপ ঘরে পড়িল, তাহার উপযোগী করিয়া পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী তাহার চরিত্র গঠিত করিতে পারেন। যুবতীবিবাহে এ সুবিধা থাকে না। বিবাহের পূর্ব্বে বর-কন্যা উভয়ের চরিত্র গঠিত হইয়া গিয়াছে। গঠিত চরিত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করা, প্রস্তরমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া নূতন করার মত অসাধ্য। যুবক যুবতী পরস্পরকে গুণ দেখাইয়া আকর্ষিত করে। পরস্পরের দোষ কখন প্রকাশ করে না। যৌবনের মোহে নির্ব্বাচনশক্তিও আচ্ছন্ন করে। এই জন্যেই এই দেশে বর-কন্যা নির্ব্বাচনের ভার পিতা মাতার উপর। কোনও কার্য্যের ভার অদূরদর্শীর অপেক্ষা দূরদর্শীর উপর অর্পণ করা কি সঙ্গত নহে? যৌবনের মোহ অন্তর্হিত হইলে পরস্পরের প্রকৃতি অনাবৃত হইয়া পড়ে। তখন উভয়ের প্রকৃতি যদি বিভিন্ন হয়, বিপরীত হয়, উহা পরিবর্ত্তন করিবার আর সময় থাকে না। কাজে কাজেই বিবাহবন্ধনের ছেদন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। অন্যথা, উভয়ের জীবন ঘোরতর অসুখের হইয়া উঠে। তৃতীয়তঃ, একস্থানে একটি বৃক্ষ ও লতার চারা রোপণ করিলে উহারা পরস্পরের উপযোগী হইয়া, কেমন সুন্দররূপে বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু একটি বর্দ্ধিত লতা রোপণ করিলে সেরূপ হয় কি? বিবাহের পর হিন্দুদের বরকন্যা বুঝে, তাহারা এ জীবনের জন্যে সম্মিলিত হইয়াছে; আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারিবে না। তখন চেষ্টা করিয়া হইলেও, একে অন্যের ভালবাসার পাত্র হইতে চাহে, এবং পরস্পরের সন্নৈকট্য এই চেষ্টার অনুকূল হয়। এরূপে উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেমের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ, উভয়ের ভালবাসা অন্য কাহারও প্রতি সঞ্চারিত হইবার অবসর থাকে না। এইটি একটি গুরুতর কথা। যৌবনসঞ্চারেই ইন্দ্রিয় সতেজ হইতে আরম্ভ হয়। যদি এ সময়ে কাহারো উপর চক্ষু পড়ে, এবং তাহার সঙ্গে বিবাহ না হয়, এই প্রেমের ছায়া পতি পত্নীর

মধ্যে একটি আবরণের মত থাকিয়া ঘোরতর অসুখের কারণ হয়। এ সকল কারণেই হিন্দুর বিবাহ এত সুখশান্তিপ্রদ, পতি-পত্নীর বিচ্ছেদ অপেক্ষাকৃত এত অল্প।

সা। বালকবালিকার বিবাহের ফলে কি সন্তান নিস্তেজ ও ক্ষীণজীবী হয় না?

অ। হইতে পারে। কই ভারতের ইতিহাসে তাহার প্রমাণ নাই। আবহমানকাল হইতে বাল্যবিবাহ ভারতে চলিতেছে। তথাপি এতকাল রাজস্থান, পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত, এমন কি, এ বঙ্গদেশ কি অপূর্ব্ব বীরভূমি ছিল! তদ্ভিন্ন বিবাহ হইলেও যৌবন-সঞ্চার পর্য্যন্ত দম্পতিকে স্বতন্ত্র রাখাই হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থা। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহা এখনও প্রচলিত। বঙ্গদেশে শাস্ত্রাজ্ঞা যে সকল সময়ে প্রতিপালিত হয় না, সেই দোষ শাস্ত্রের নহে।

সা। কিন্তু স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা কি ভাল?

অ। পরাধীন দেশে ভাল বৈ কি? আপনারা স্বাধীন, পরাধীনের দুঃখ বুঝিবেন না। পরাধীন পুরুষ শত লাঞ্ছনা নীরবে সহিতে পারে, কিন্তু পত্নীর লাঞ্ছনা পশু পক্ষীও সহিতে পারে না। ভারত যে দিন হইতে পরাধীন হইয়াছে, সে দিন হইতে হিন্দুদের মধ্যে এই অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রপ্রদেশ তাহার সাক্ষী।

সা। কিন্তু ইহারই কারণ আমরা আপনাদের সঙ্গে মিশিতে পারি না।

অ। হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যে এই অবরোধ-প্রথা আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি হিন্দু মুসলমান মেশামেশি করিতেছে না? বিশেষতঃ, এই দেশের লোক দরিদ্র। তাহারা তাহাদের স্ত্রীদিগকে ইংরাজি শিখাইবে, গাউন পরাইবে, উহা তাহাদের সাধ্যাতীত। আপনারা কি আপনাদের মহিলারা কখনও বাঙ্গালা কি দেশীয় ভাষা শিখিবেন না। সামান্য শাড়ীপরা স্ত্রীলোক দেখিলে, নাক সিট্‌কাইবেন। এরূপ অবস্থায় অবরোধপ্রথা উঠাইয়া দিলে উভয় জাতির সম্মিলনের কি সাহায্য হইবে? ভারতীয় সম্প্রদায়বিশেষ ত উহা উঠাইয়া দিয়াছেন; সম্যক্‌রূপে আপনাদের সভ্যতা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কই, তাঁহাদের সঙ্গে আপনাদের কি খুব মেশামিশি আছে? বরং আপনারা কি তাহাদের জাতিভ্রষ্ট (out caste) বলিয়া অবজ্ঞা করেন না।

[সা। আপনি কি বলিতে চাহেন, আপনাদের ধর্ম্মের কি সমাজের কোনোরূপ সংস্কারের প্রয়োজন নাই?

অ। না, আমি এমন কথা বলিতেছি না। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ ৭০০ বৎসর দাসত্বের ফলে একরাশি আবর্জ্জনায় চাপা পড়িয়াছে। আমরা এখন ধর্ম্মের ও সমাজের নামে সেই আবর্জ্জনা ঘাঁটিয়াই মরিতেছি। আর কিছুদিন এভাবে চলিলে কেবল আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম নহে, আমরাও লুপ্ত হইব। আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সংস্কারের নিতান্ত প্রয়োজন। তবে সংস্কার করিবে কে? পূর্ব্বে রাজা করিতেন। এখন রাজা বিদেশী ও বিধর্ম্মী, আর আমরা?—আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষা করিব কি, আমাদের জীবন-রক্ষাই বিষম সমস্যা হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কাহারো ঘরে অন্ন নাই, পুষ্করিণীতে জল নাই। এই অন্নজলের হাহাকারে দেশ পরিপূর্ণ।

সা। তাহার কারণ কি?

অ। কারণ বৃটিশরাজ্যের ত্রিদোষ,—কারণ তিনটা প্রণালী। তিনটা tion—Foreign Competition, Litigation এবং Education—অবাধ-বাণিজ্য-প্রণালী, বিচার-প্রণালী ও শিক্ষা-প্রণালী। অবাধ-বাণিজ্যে ভারতের তাঁতী, কামার, কুমার, সর্ব্বপ্রকার শিল্পীর অন্ন মারিয়াছে। ভারতবাসী সকলেরই কৃষি বা মাটিমাত্র সম্বল হইয়াছে। এরূপে মাটির ব্যবসায়ী বাড়িয়াছে, কিন্তু মাটি ত বাড়ে না। দীর্ঘি-পুষ্করিণীর পার পর্য্যন্ত লোকে চষিয়া ফেলিয়াছে। তাহার ফলে দেশের গরু-বাছুর মারা যাইতেছে। তাহাদের

চরিবার স্থানমাত্র নাই। সাহেব, হিন্দুরা কি সাধে গাভীকে মা ভগবতী বলিয়া পূজা করে এবং গোমাংসভক্ষণ মহাপাতক মনে করে? দেশের বিশকোটি হিন্দু যদি গোখাদক হইত, তবে এই কৃষিজীবী দেশের গোজাতি লুপ্ত হইয়া কি শোচনীয় অবস্থা হইত? অবাধ-বাণিজ্যের ফলে একদিকে এরূপ দেশীয়-শিল্প ধ্বংস হইয়াছে।* অন্যদিকে কৃষি-সংখ্যা বাড়িয়াছে, এবং দেশের গরু কঙ্কালসার ও খর্ব্বাকৃতি হইয়া ধ্বংস হইতেছে। মোট কথা, এখন ত্রিশকোটি ভারতবাসীর ব্যবসায় চাষ ও চাকরি। অন্নজলের জন্যে হাহাকার করিবে না কেন?

সা। বিচার-প্রণালীতে কি ক্ষতি হইতেছে? এমন সুশাসন ও সুবিচার কি ভারতবর্ষে কখনো ছিল?

অ। সাহেব, আমাদের ভাষায় আদালত, দেওয়ানি, ফৌজদারি, মকদ্দমা, উকিল, মোক্তার, এ সকল কথা নাই। এ সকল এ দেশে ছিল না। আপনি 'এল্‌ফিন্‌স্‌টোনের' ইতিহাস পড়িয়াছেন,—ছিল গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েত। গ্রামের প্রধান ৫ জনে মিলিয়া কেবল ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া গ্রামের সমস্ত বিবাদ মিটাইত। গ্রামের কোন্‌ জমি কাহার, কাহার সঙ্গে কাহার কি কারবার, কি কথা লইয়া মতান্তর, এই ৫ জনে প্রত্যক্ষভাবে জানিত। অতএব কোনো বিবাদ মিটাইতে সাক্ষী, দলিল, কোর্ট-ফি, প্রোসেস্‌ ফি, উকিল, মোক্তার ও জটিল আইন, কিছুই আবশ্যক হইত না। তাহারা গ্রামের সকল অবস্থা জানিত বলিয়া এবং তাহাদের কাছে বিচার হইত বলিয়া বিবাদও কম হইত। দেশময় শান্তি ও সদ্ভাব বিরাজ করিত। যিনি রাজা হোন না কেন, তাঁহাকে কেবল গ্রামের রাজস্ব দিলেই হইল। গ্রামে চোরডাকাত পড়িলে তাহাদের ধরিয়া রাজকর্মচারীর কাছে পাঠাইলেই হইল। এইজন্যেই ভারতে রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির কখনো সংঘর্ষণ হয় নাই। রাজা নিজেও সিংহাসনে সন্ন্যাসী মাত্র; প্রজারঞ্জন তাঁহার একমাত্র কর্ম্ম ও ধর্ম্ম। প্রজা জানিত—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" তাহার ধর্ম্ম রাজভক্তি। বলুন দেখি, এমন সবল ও সুন্দর স্বায়ত্তশাসন (Home Rule or Republic) এমন রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির সামঞ্জস্য জগতে কোথাও আছে কি? আর এখন বিচারক বিদেশী। বিচারালয় গ্রাম হইতে বহুদূরে,—বিদেশে। বিচারক স্থানীয় অবস্থা কিছুই জানেন না। বিচারে যাহার টাকা আছে, যে মিথ্যা সাক্ষী ও ভাল উকিল ও ব্যারিষ্টার দিতে পারে, তাহারই জয়। আইন জটিল। মকদ্দমা মাদকের মত উত্তেজক, এবং তাহার পরিণাম জুয়াখেলার মত অনিশ্চিত। যে একবার ধর্ম্মাধিকরণের ত্রিসীমায় পদার্পণ করে, একবার উকিল, মোক্তার, এটর্ণী ও আমলার পাল্লায় পড়ে, তাহার ধর্ম্ম ভ্রষ্ট, অর্থ কষ্ট, মনঃকষ্ট, ত্রিবর্গই লাভ হয়। গ্রামে গ্রামে মকদ্দমা, গ্রাম্যে গ্রামে দলাদলি। মকদ্দমায় মকদ্দমায় দেশ উৎসন্ন ও দরিদ্র হইতেছে। অন্নজলের জন্যে হাহাকার উঠিবে না কেন?

আর শাসনপ্রণালী?—তাহার ফলে ভারতবর্ষ নিরস্ত্র। বন্যপশু হইতে কৃষি ও জীবন রক্ষা করিতে ভারতবাসীর সামান্য অস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। ভারত ইতিমধ্যেই এরূপ নির্বীর্য্য হইয়াছে যে, আপনাদের নেপাল হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিতে হইতেছে। বীরভূমি

---

* আমাদের কোনো কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন—

"ভারতের তন্তু নীরব সকল;
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যানচেষ্টার।
লবণাম্বুরাশিবেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে লিভারপুলে লবণ তাহার!"

পঞ্চনদ ও রাজস্থান আজ বীরহীন। অন্যদিকে ভারতের ৭০ কোটি রাজস্বের মধ্যে প্রায় ৫০ কোটি বিলাতের ব্যয়ে, সৈন্যবিভাগের ও সিবিল্‌বিভাগের ব্যয়ে প্রত্যেক বৎসর বিলাত চলিয়া যাইতেছে। তাহার উপর অবাধ-বাণিজ্যে ও ঋণে বৎসর কত কোটি যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এরূপে ভারতবর্ষের মত একটি দীরিদ্রদেশের উপার্জ্জনের অর্দ্ধাধিক অংশ ভিন্নদেশে চলিয়া গেলে, সে দেশে অন্নজলের হাহাকার উঠিবে না কেন? সে দেশে নিত্য দুর্ভিক্ষ এবং কোটি কোটি লোক দুর্ভিক্ষগ্রাসে মরিবে না কেন? আপনাদেরই অঙ্কপাত—১০ বৎসরে ৮০০০০০০ লোক দুর্ভিক্ষে মরিতেছে!]

সা। আর শিক্ষাপ্রণালী?

অ। এই অবাধবাণিজ্য ও মোকদ্দমার দাবানলে ইন্ধন যোগাইতেছে ও বাতাস দিতেছে। আগে লেখাপড়াও, শিল্প ও বাণিজ্যের মত, জাতিগত ছিল। রাজ-শাসনে জাতিগত থাকিত। এখন তাঁতির ছেলে, কুমারের ছেলে, কামারের ছেলে, জেলের ছেলে এমন কি, মেথরের ছেলে পর্য্যন্ত লেখাপড়া শিখিতেছে। উদ্দেশ্য চাকরি। ইহার ফলে ধ্বংসোন্মুখ শিল্প ও বাণিজ্য আরও ধ্বংস হইতেছে; যাহাদের লেখা-পড়া পুরুষানুক্রমিক একমাত্র উপজীবিকা ছিল, তাহাদের অন্ন মারা যাইতেছে, এবং আপনারা উমেদারের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছেন। আর শিক্ষা-প্রণালীই বা কি। স্বয়ং নৃমুণ্ডমালিনী কালী! করে এক দিকে ভীষণ পরীক্ষাখড়্গ ও শিশুর সদ্যছিন্ন শির। অন্য দিকে "সেনেটের" সদস্যদের ও শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষদের জন্য অভয়, ও স্বদেশীয় ও বিদেশীয় অপূর্ব্ব পাঠ্যপুস্তক লেখকদের জন্য বরদ কর। শবরূপী বঙ্গদেশের বক্ষে শিক্ষা-প্রণালী তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন। যে দেশে পরীক্ষার নাম গন্ধ ছাড়া মহাপণ্ডিতসকলের অভ্যুত্থান হইয়াছে, সে দেশে প্রায় ভূমিষ্ঠ হইলেই শিশুর পরীক্ষা আরম্ভ হয়। বৎসর বৎসর পরীক্ষা ত আছেই, তাহার উপর ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, আবার "টেষ্ট" (Test)। পরীক্ষাও আবার এক প্রকার অগ্নিপরীক্ষা। আবার এক সঙ্গে এত পুস্তক পড়িতে হয় যে, শিশুর সাধ্য নাই যে, একত্র বহিয়া লইয়া যায়। তাহাতে নাই, এমন বিষয়ই নাই। ১০/১২ বৎসরের শিশুকে ক্ষেত্রতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব না শিখিতে হয়, এমন তত্ত্ব নাই! কেবল নাই অনাবশ্যক ধর্ম্মতত্ত্ব। তাহাদের খেলা নাই, পুস্তকের চাপে খেলার কথা দূরে থাকুক, অবসর পর্য্যন্ত নাই। আমোদ নাই, উৎসব নাই। তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয় স্বাস্থ্য-তত্ত্বের বহি পড়িয়া। তার পর প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রত্যেক বিষয়ের নূতন পুস্তক কিনিতে হইবে। তাহা না হইলে শিক্ষাবিভাগের নিজের ও আত্মীয়ের অপূর্ব্ব পাঠ্যপুস্তক সকল বিক্রয় হইবে কিরূপে/ইহাই এখন শিক্ষা-প্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য। এই তত্ত্ব সকল আবার গলাধঃকরণ করিতে হইবে বিদেশীয় একটি জটিল ভাষায়। একখণ্ড মাটির চারিদিকে জল থাকিলেই দ্বীপ বলে,—এ কথা শিশুকে বলিলেই সে বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহা হইবে না। তাহাকে এক ঘণ্টাকাল ব্যাপিয়া মুখস্থ করিতে হইবে Island is a piece of land surrounded by water. ইহার একটি অক্ষরও সে বুঝে না। দ্বীপ কি, তাহা বুঝা দূরের কথা পক্ষান্তরে, ঈশ্বর অনেক দিন হইল স্কুল ও কলেজ হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া-ছেন। ছিলেন তিনি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়। সেখানে শিশুরা নানাপ্রকার স্তব কণ্ঠস্থ করিত, নানারূপ ধর্ম্মোপাখ্যান শিখিত। অক্ষর লিখিতে শিখিলেই দেবদেবীর নাম লিখিতে শিখিত, এবং গৃহে গৃহে সেই দেব-দেবীর পূজা দেখিত। এইরূপে দেবভক্তির অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে অঙ্কিত হইত। দেব-দেবীর নামের পর আপনার পিতা-মাতার, আত্মীয়স্বজনের নাম লিখিতে শিখিত। তাহাদের পিতা-মাতার কাছে পরমপূজনীয় ও

[ ] বন্ধনীর মধ্যে উদ্ধৃত অংশটুকু বর্ত্তমান "দত্তচৌধুরী" সংস্করণে পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক।

সেবক-সেবকাধম পাঠে পত্র লিখিতে শিখিত। পূর্ব্বপুরুষদের নাম শিখিত, তাহাদের কাহিনী শুনিত। এইরূপে গুরুজনদের প্রতি ভক্তির অংকুর শিশুর কোমল হৃদয়ে অংকুরিত হইত। এখন পাঠশালাতেও ধর্ম্মশিক্ষা নিষিদ্ধ, এবং পিতার কাছে ইংরাজি স্কুলের ছেলে বাঙ্গালায় পত্র লিখিতে হইলেও লেখে "মাই ডিয়ার ফাদার।" আর সুশিক্ষার বাকি কি? ইহাতে না আছে ধর্ম্মশিক্ষা, না আছে কর্ম্মশিক্ষা। দু' পাত ছাই ভস্ম পড়িয়া আপনার ব্যবসার প্রতি অবজ্ঞা জন্মে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, কামার, কুমার, তাঁতি, সকলেই চাহে—চাকরী, ডাক্তারী, উকিলি, মোক্তারি অধিকাংশ টন্নিগিরি। এক একটি পাপিষ্ঠ অর্থপিপাসু উকিল, মোক্তার, টন্নি যেখানে আছে, মোকর্দ্দমার চোটে তাহার আশে পাশে দূর্ব্বা গাছটি পর্য্যন্ত গজায় না। কালে কালে এই শিক্ষার ফলেও দেশ উৎসন্ন যাইতেছে! অন্নজলের হাহাকার উঠিতেছে। দেহ খর্ব্ব হইতেছে, আপনারা এই বীরভূমিতে সামান্য সৈন্যের যোগ্য লোক পাইতেছেন না। আত্মা জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে,—দেশে প্রকৃত পণ্ডিত জন্মিতেছে না।

সাহেব নীরব, স্তম্ভিতভাবে স্থিরনয়নে সমুদ্রের সান্ধ্যশোভায় চাহিয়া রহিয়াছেন। ভানুমতী চরণতল হইতে বলিল, "বাবা! ইহার প্রতিকারের কি কোন উপায় নাই?"

অ। এই ত্রিদোষের প্রতিকার আছে। রাজা সহজে প্রতিকার করিতে পারেন। অবাধ-বাণিজ্য উঠাইয়া দিয়া কিংবা স্থানে স্থানে রাজভাণ্ডার হইতে কল-কারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পীর অন্ন যোগাইতে পরেন। পূর্ব্ববৎ, গ্রামবাসীর দ্বারা পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করাইয়া ফৌজদারি, দেওয়ানি মোকদ্দমার ভার তাহার হস্তে দিতে পারেন। শিক্ষাপ্রণালী পূর্ব্ববৎ সরল, সহজ, স্বাভাবিক করিয়া সম্প্রদায়বিশেষে স্বেচ্ছায় যেরূপ সংস্কৃত ও আরব্য-ভাষা শিক্ষা দিবার বিধান করিয়াছেন, সেরূপ ছাত্রদিগের ধর্ম্মশিক্ষারও বিধান করিতে পারেন। আর পারি আমরা। পারে একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। পারে ধর্ম্ম ও জাতিবিদ্বেষহীন একটি মাতৃসেবক প্রকৃত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়। ইঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ধর্ম্মের সঞ্জীবনী-সুধায় গ্রামবাসীর হৃদয় আর্দ্র করিয়া, আবার সেই ধর্ম্মমণ্ডলী বা পঞ্চায়েত এবং সেইরূপ পাঠশালার সৃষ্টি করুন, এবং স্বদেশীয় শিল্প ব্যবহার করা এবং এই পঞ্চায়েতের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিবাদ মিটাইয়া লওয়া, গ্রামবাসীদের প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিউন। আপনার ভাল মন্দ বুঝাইয়া দিলে বুঝে না, এরূপ মানুষ নাই। এইরূপে গ্রামে গ্রামে বুঝাইয়া দিলে আমাদের দেশের লোকেও, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, বুঝিবে।

সাহেব একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং অনাথনাথের করমর্দ্দন করিয়া বিদায় লইয়া বলিলেন, "অনাথবাবু! বলা বাহুল্য, আপনার সঙ্গে আমি সকল বিষয়ে একমত হইতে পারি নাই। তবে ইহা মুক্ত-কণ্ঠে বলিতে পারি যে, অনেক বিষয় আমি বুঝিলাম, এবং চিন্তা করিয়া দেখিবার অনেক বিষয় পাইলাম। ইহার জন্যে আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।"

একাদশ অধ্যায়

মহামুনি

দেখিতে দেখিতে শীত কাটিয়া গেল। বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া এবং অবিশ্রাম পরিশ্রম করিয়া অনাথনাথ হতাবশিষ্ট প্রজাদিগের জীবনরক্ষা করিয়াছেন; পার্ব্বত্য-অঞ্চল হইতে গৃহনির্ম্মাণের উপকরণ আনাইয়া তাহাদের গৃহ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন; প্লাবনবিধ্বস্ত বাঁধ—এ অঞ্চলে তাহাকে "কাঠি" বলে—বাঁধিয়াছেন; ভবিষ্যৎ প্লাবনে পানীয় জল রক্ষা করিবার জন্যে স্থানে স্থানে প্লাবনতরঙ্গ হইতে উচ্চতর পাড়বিশিষ্ট দীর্ঘিকা খনন করিয়াছেন। এবং তাহাদের আশ্রয়ের জন্যে স্থানে স্থানে ইষ্টকনির্ম্মিত দ্বিতল কাছারী-

বাড়ীর নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনাথনাথ প্রজাদের মা বাপ। চিরদিন তাঁহার এরূপ সুনাম। তাহাতে ঝটিকার পর প্রজাদের যে এরূপ সাহায্য করিয়াছে, জনবর তাহা বিদ্যুদ্বেগে সংখ্যাতীত কণ্ঠে প্রচারিত করিয়াছে। এ সুখ্যাতিতে স্থানান্তর হইতে প্রজা সমাগত হইতেছে। জমিদারি আবার প্রজাপূর্ণ হইতেছে, এবং সকলে জমিদারের কৃতিত্বে ও দেবত্বে উৎসাহিত হইয়া আবার কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। এখন আর জমিদারিতে তাঁহার বিশেষ কোনও কার্য্য নাই। ভানুমতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী যাইবেন, সংকল্প করিলেন। কিন্তু ভানুমতী যাইতে অস্বীকার করিল। সে বলিল, তাহার অমিয় এখানে, তাহার গোপাল এখানে, তাহার সেই লক্ষ্মীস্বরূপা মাতা—অনাথনাথের পত্নী—এখানে, সে এখানে থাকিবে। সে বেদের মেয়ে, এ সকল গরীব দুঃখীর পুত্রকন্যাকে বুকে লইয়া, তাহাদের মাতাকে মাতা বলিয়া, সে সেই শোক হৃদয়ে বহন করিবে। দরদর ধারায় তাহার অশ্রু বহিতে লাগিল। অনাথনাথেরও পুত্রপত্নীর শোক আবার এত দিন পরে উথলিয়া উঠিল। তিনি সংযত, স্থির প্রকৃতির লোক। প্রজার দুঃখনিবারণব্রতে সেই শোক চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাণাধিক পত্নীপুত্রকে এখানে রাখিয়া গৃহে ফিরিবেন, এই স্মৃতিতে বহু-দিন পরে তাঁহারও চক্ষে জল আসিল। আত্মসংযমবলে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"মা! তুই ভিন্ন আমার আর কে আছে? তুই আমার এ জীবনের একমাত্র শান্তি! তোকে ফেলিয়া আমি সেই শ্মশানে শূন্য হৃদয়ে কি আকর্ষণে ফিরিব? আমিও তবে আর বাড়ী ফিরিব না।" ভানুমতী কিছুক্ষণ নীরবে শান্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। শেষে তাঁহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল।

অদ্য প্রাতে অনাথনাথ গৃহে যাত্রা করিবেন। ঘাটে সজ্জিত বজরা নানা বর্ণের পতাকা উড়াইয়া সমুদ্রের শান্ত লহরীতে মৃদু মৃদু দুলিতেছে। সমুদ্রসৈকতে লোকারণ্য। প্রজাগণ—নরনারী, বালকবালিকা,—তাঁহাকে বিদায় দিতে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। কেহ কেহ চরণতলে গড়াগড়ি দিতেছে। বৃদ্ধা রমণীরা সাশ্রুনয়নে পুত্রবৎ তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া কত আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সকলেরই কণ্ঠে ভানুমতীর প্রতি 'মা' বা 'দিদি' সম্বোধন। তাহাকে রমণীরা বুকে লইয়া গলা জড়াইয়া কাঁদিতেছে। সকলে বলিতেছে—"তুই মা! কোনও দেবকন্যা। শাপক্রমে বেদের মেয়ে হইয়াছিস্।" অনাথনাথ ও ভানুমতী গলদশ্রুনয়নে তাহাদের নানারূপে সান্ত্বনা দিয়া বজরায় উঠিলেন। প্রজাগণ সমুদ্র-কল্লোল প্লাবিত করিয়া, তাঁহার জয়জয়কার করিতে লাগিল। চৈত্রমাস; পূর্ণ বসন্ত। বজরার শ্বেত পাল দক্ষিণানিলে প্রসারিত হইল; তরণী পক্ষপ্রসারিতা রাজহংসীর ন্যায় সমুদ্রের নীলগর্ভ বিদারিত করিয়া ছুটিল।

পুণ্যতোয়া শৈলজায়া কর্ণফুলী নদীর তীরে পাহাড়তলী গ্রামের পার্শ্বস্থিত একটি শৈলশেখরে অনাথনাথের অট্টালিকাখচিত ভদ্রাসন। নদীতীর হইতে গিরিশ্রেণীর স্তরে স্তরে বৃক্ষরাজিসজ্জিত শ্যামবপু উত্থিত হইয়াছে। তাহার সর্ব্বোচ্চ শেখরে বৃক্ষপল্লবা-ন্তরালে অর্দ্ধলুক্কায়িত, অর্দ্ধপ্রকাশিত, মনোহর অট্টালিকা। বিস্তীর্ণা কর্ণফুলীর

—"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

এক দিকে নদী। অন্য দিকে গিরিপাদমূলে নাগেশ্বর-উপবনে সমাচ্ছন্ন একটি সমুন্নত প্রান্তরে বৌদ্ধদিগের মহামুনির মহাক্ষেত্র। নাগেশ্বরের উপবন হইতে ভগবান বুদ্ধদেবের চূড়া গগনে উত্থিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার বিকাশ করিতেছে। অনাথনাথের অট্টালিকা হইতে এই শোভা অতুলনীয়। চৈত্র-সংক্রান্তির দুই দিন পূর্ব্ব হইতে এখানে প্রস্ফুটিত নাগেশ্বরবনে পর্ব্বত ও সমতলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি মেলা বসিয়া থাকে। অনাথনাথ বাটী ফিরিবার কিছুদিন পরে এই মেলার আরম্ভ হইয়াছে। এই মহামেলার কথা আমি

চট্টগ্রামবাসী কিছু না বলিয়া "বঙ্গবাসী"র একজন বিদেশীয় প্রবন্ধ লেখকের ভাষায় বলিব ;—

"মহামুনি চট্টলবাসী বৌদ্ধদিগের একটি সুপ্রসিদ্ধ মেলা। প্রতি বৎসর বিষুবসংক্রান্তিতে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীতে এই মেলা মিলিয়া থাকে। এ দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিবেষ্টিত ; ঐ পাহাড়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী মগদের বসতি, এবং সমতল উপত্যকায় নানা স্থানে বৌদ্ধ-ভদ্রলোকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী আছে। ঐ সকল বৌদ্ধদের আগ্রহ, উৎসাহ ও ধর্ম্মপিপাসায় মেলা-স্থান এক অপূর্ব্ব ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। বাস্তবিক যিনি সংসারে স্বর্গ দেখিতে চাহেন, যিনি ঘোর অশান্তিতে দগ্ধ হইয়া শীতল হইতে চাহেন, যিনি দুখের বোঝা বহিয়া বহিয়া কাতরপ্রাণে সুখের অন্বেষণ করেন, তিনি একবার এই মহামুনির মহাভাব প্রত্যক্ষ করুন। সকল জ্বালা, সকল অশান্তি, মুহূর্ত্তমধ্যে কি এক কুহকে কোথায় লুকাইয়া পড়িবে! * * *

"মরি! মরি! কি প্রাণারাম স্থান। কি মনোহর দর্শন! এমন ত জীবনেও দেখি নাই! এ দৃশ্য যে কল্পনারও অতীত। অতি ক্ষুদ্র শৈল,—উপরিভাগ সমতল। সেই সমতল স্থান নবীন পল্লবে নবীন মুকুলে সুশোভিত নানা জাতি তরুলতায় আচ্ছন্ন। মধুর মলয় সততই মৃদুপ্রবাহে প্রবাহিত। নাগেশ্বর পুষ্প শোভা ও সুবাস দানে সততই তৎপর। বসন্ত পূর্ণমূর্ত্তিতে বিরাজিত। অতি সম্পূর্ণ, অতি সম্পন্ন! বিলাসিনী বাসন্তীর এই পূর্ণবিকশিত পরিণত মূর্ত্তি, এ মূর্ত্তি ধারণায় আইসে না। সে দৃশ্যে প্রাণ মন ডুবিয়া যায় ; উত্তেজনা ফুরায়, দেহগ্রন্থি শিথিল হইয়া পড়ে। আজ সেই বসন্তের নির্জ্জন ক্রীড়া-কানন অগণিত মানব ও শত শত দোকান পসারিতে পরিপূর্ণ। সকল দোকানেই মহা ভিড় : এমন কি, পথ চলিতে কষ্ট বোধ হয়। এই জনস্রোতের মধ্য দিয়া অতি কষ্টে যেখানে মহা-মুনির প্রকাণ্ড মন্দির, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান। চতুষ্পার্শ্বেই সমান আয়তনের বারেণ্ডা আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের বিরাটমূর্ত্তি। ইঁহারই অর্চ্চনা-উপলক্ষে এই মহামেলায় অসংখ্য মগের সমাগম হইয়া থাকে। মূর্ত্তিটি লম্বে ১০।১২ হাত এবং তদনুসারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণতা। বিরাটরূপে অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট। কি প্রশান্ত মূর্ত্তি! কি গভীর ভাব! দেখিলাম, ৭।৮ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু মহামুনির পদতলে বসিয়া একাগ্রপ্রাণে আরাধনায় নিমগ্ন। তাঁহাদের মস্তক মুড়ান —দাড়ি গোঁপ কামান,—পরিধানে গেরুয়া বসন।"

অনাথনাথ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অন্য ধর্ম্মের প্রতি ও ধর্ম্মশিক্ষকের প্রতি ভক্তি-পরায়ণ। তিনি এই মেলার সাহায্যার্থ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধদের সেবায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। তিনি ভানুমতীকে লইয়া অপরাহ্নে মেলাস্থলে আসিলেন। উভয়ে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে মহামুনি বুদ্ধদেবের মহামূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া মেলা দর্শন করিতে লাগিলেন। প্রশস্ত উপবন ব্যাপিয়া মেলা বসিয়াছে। যতদূর দেখা যাইতেছে, নানা পার্ব্বত্যজাতীয় নরনারীতে মেলা-স্থান পরিপূরিত ; তাহাদের গীতে, হাস্যে ও বংশীধ্বনিতে মুখরিত। মস্তকের উপর বসন্তের কোকিল, 'বউ কথা কও' নাগেশ্বরের ডালে বসিয়া, গগনে উড়িয়া, অমৃতকণ্ঠে সেই বংশীনিনাদের সঙ্গে যোগ দিতেছে। পার্ব্বত্য জাতিদের স্বর্ণগৌর কান্তি। পুরুষের মস্তকে সম্মুখে কৃষ্ণের চূড়ার মত ঘোর ঘনকৃষ্ণ কেশের চূড়া। সেই বিদেশীয় প্রবন্ধ লেখকের ভাষায়,—

"সকলেরই এক বেশ। মগপুরুষের মাথায় রেশমী রুমাল, গায়ে কুর্ত্তা, পরিধানে হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি, হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার আঙটি! তাহারা বৃদ্ধ বয়সেও গয়না পরিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। মগমহিলাদের খোপা প্রকৃত ফুলের ন্যায় কৃত্রিম ফুলের তোড়ায় সুশোভিত ; বক্ষঃস্থল একটি রেশমী রুমালে বাঁধা, পরিধানে রেশমী শাড়ী,

গলায় টাকার মালা ; হাতে রূপার বালা, এবং কাণে রূপার গহনা। ইহাদের কাণের ছিদ্র এত বড় যে, এক বুরুল পুরু রৌপ্যখণ্ড ইহারা কাণে অনায়াসে ঢুকাইয়া দেয়। মগ মহিলারা প্রকৃতির প্রবাসে স্বভাবতই লাবণ্যময়ী। সকলেই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। তাহাদের দেহমন সততই প্রফুল্ল। মগ পুরুষেরা সকলেই বলশালী ও কর্ম্মঠ ; কিন্তু খর্ব্বাকৃতি। স্ত্রীপুরুষ; সকলেরই নাসিকাটি চাপা। মগেরা বড় আমোদপ্রিয়! নৃত্যগীত তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য। শত সহস্র লোকের সম্মুখে যুবকেরা অসঙ্কোচে যুবতীদের নৃত্যে বংশীবাদন করে ও উত্তেজিত হইয়া তাহাদিগের বাহুলতার আশ্রয়ে নৃত্য করিতে থাকে ; অথচ মুখে নির্ম্মল হাসি, প্রাণে অপার আনন্দ।"

তাহারা দলে দলে অন্ন ও পুষ্প লইয়া বুদ্ধদেবকে পূজিতে যাইতেছে। অনাথনাথকে দেখিয়া দলে দলে ভূতলে জানু রাখিয়া ললাটে ভূমিতল স্পৃষ্ট করিয়া প্রণাম করিল। তাহারা সকলে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করে। আলুলায়িতকুন্তলা, গৈরিকবসনপরিহিতা, প্রায়নিরাভরণা স্বর্ণপ্রতিমাস্বরূপা ভানুমতীকে তাঁহার পশ্চাতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত-নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। কেহ কেহ তাহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী মনে করিয়া প্রণাম করিল, অনাথনাথ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া নানাবিধ কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া, মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানে একটি আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। তিনি পূর্ণচন্দ্রের মত যেন আনন্দজ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। ক্রমে উৎসব ক্ষেত্রের এক নির্জ্জন প্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি নাগেশ্বরবৃক্ষতলায় কোমল মকমলসন্নিভ শ্যাম দূর্ব্বাসনে বসিলেন। ভানুমতী তাঁহার চরণতলে বসিল।

ভা। বাবা! আপনি ত মহামুনিকে প্রণাম করিলেন ; হিন্দুর কি মগের দেবতাকে প্রণাম করা উচিত?

অ। উচিত। মা! এই নাগেশ্বর পুষ্পকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি মগ সকলেই কি আদর করিতেছে না? যিনি দেবতা, তিনি নরজাতির নাগেশ্বর। দেবতা মগের হউন, মুসলমানের হউন, খৃষ্টানের হউন, তাঁহাকে প্রণাম করা, পূজা করা উচিত। বিশেষতঃ হিন্দুর কাছে তিনি পূজ্য। স্বয়ং ভগবান বলিয়াছেন, "যেখানে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তিনি দুষ্কৃতের দমন ও সাধুদের পরিত্রাণ করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার জন্যে, সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।" ঠিক এই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায়, বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে, খৃষ্টদেব 'নেজারতে', এবং মহম্মদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবদ্বাক্য মানিতে গেলে, হিন্দুর সকলকে অবতার বলিয়া মানিতে হয়। তিনি যে কেবল এ ক্ষুদ্র ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন, এমন কথা বলেন নাই। এই জন্যে হিন্দুরা সকল ধর্ম্মে বিদ্বেষহীন।

ভা। বাবা! এই মহামুনি বুদ্ধদেব কে?

তখন অনাথনাথ বুদ্ধদেবের সেই বিচিত্র জীবনের আখ্যায়িকা তাহাকে সংক্ষেপে শুনাইলেন। সিদ্ধার্থের জন্ম, কৈশোর, জীবের জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-দুঃখ-নির্ব্বাণের, উপায়-উদ্ভাবনের জন্যে রাজপুত্রের সন্ন্যাস, ঘোরতর তপস্যা, অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ-ধর্ম্মপ্রচার, তিরোধান, ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে শুনাইলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে বুদ্ধলীলা শ্রবণ করিল। অনাথনাথ বসন্তের সান্ধ্য নীলাকাশের দিকে চাহিয়া সাশ্রুনয়নে সেই তিরোধান-কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বালিকা স্তম্ভিতহৃদয়ে যেন সেই মহাদৃশ্য বহুক্ষণ নীরবে বসন্তের সান্ধ্য আকাশপটে অঙ্কিত দেখিল। বহুক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—"বাবা! আমার পূজনীয় বৈরাগী পিতা আমাকে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। তিনি

আমাকে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতের ব্রজলীলা, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্যচরিতামৃত পড়াইয়াছিলেন। আমি ইহার বেশী কিছুই জানি না।”

অ। ইহার বেশী রমণীদিগের শিখিবার আর কিছু নাই। কিন্তু হায়। এখানকার শিক্ষা-প্রণালী কেবল আমাদের বালকদের মুণ্ডপাত করিয়া ক্ষান্ত হইতেছে না, বালিকাদেরও বলিদান দিতেছে। এখন বালকদের মত বালিকারাও পড়ে ছাইভস্ম ; শিখে,—না ধর্ম্ম, না কর্ম্ম। যে দেশে ঘরে ঘরে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ছিল, এখন সেই দেশে ঘরে ঘরে সূর্য্যমুখী, ভ্রমর ও কুন্দনন্দিনী। রমণীরা বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের সূক্ষ্ম উচ্চ শিক্ষা বুঝিতে পারে না, শিখিতে পারে না। শিখে ঘোরতর আত্মাভিমান, স্বার্থপরতা ও পতি-প্রতিযোগিতা। যাক্ সে কথা।

ভা। আমি দেখিতেছি, চৈতন্যদেবের ও বুদ্ধদেবের লীলা প্রায় একরূপ।

অ। খৃষ্টদেবের লীলাও তাই। তাঁহার জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর কি করিয়াছিলেন, কেহই জানে না। তার পর ২॥ আড়াই বৎসর তিনি একজন হিন্দু বৈরাগী। তুমি আমার গৃহে তাঁহার চিত্রে দেখিয়াছ, তিনিও একজন কৌপীন-উত্তরীয়-পরিহিত বৈরাগী মাত্র। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও মহম্মদ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা যেরূপ স্থানে যেরূপ সময়ে, যেরূপ সমাজে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, দুষ্কৃতের দমন, সাধুদের পরিত্রাণ, ও ধর্ম্মের সংস্থাপন হইত না। উভয়ের কুরুক্ষেত্রের প্রয়োজন হইয়াছিল। দুষ্কৃতের দমনের জন্যে স্বয়ং অসি ধরিতে হইয়াছিল। খৃষ্ট ধরেন নাই বলিয়া দুষ্কৃতেরা তাঁহাকে “ক্রশে” নৃশংসরূপে হত্যা করিল। সেই হত্যাতেই তিনি অবতারত্ব লাভ করিলেন। বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব যে সময়ে অবতীর্ণ হন, তখন ভারত জ্ঞানের চরমসীমায় উন্নত। তাঁহাদের জ্ঞানের ও ভক্তির অসি ভিন্ন অন্য অসির প্রয়োজন ছিল না।

ভা। ইঁহারা কি পরস্পর বিরুদ্ধমতাবলম্বী নহেন?

অ। না ; শ্রীভগবান এক,—কেবল সাধনার পথ প্রকৃতিভেদে স্বতন্ত্র। এই মহামুনির মেলা ত এক, কিন্তু ওই দেখ, কত পথে ইহাতে লোক আসিতেছে। যে পথ যাহার পক্ষে সহজ, সে সেই পথে আসিতেছে। মানুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, শিক্ষা বিভিন্ন। অতএব প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে ধর্ম্মের পথও স্বতন্ত্র হইবে। তুমি মা! তোমার বৈরাগী পিতার কাছে ষড়্‌রসের কথা কি শুনিয়াছ?

ভা। শান্ত, বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, কান্ত, মধুর।

অ। তান্ত্রিক হিন্দু ও খৃষ্টান শান্তরসাশ্রিত। তাহারা ঈশ্বরকে পিতামাতার মত প্রেম করে। হিন্দু দেবদেবীরা পিতামাতা। খৃষ্টের ঈশ্বরও পিতা। এই রসের সঙ্গে দাস্যরসও সংমিশ্রিত। কারণ, পিতামাতার দাস কোন্ পুত্র নহে? মুসলমান ধর্ম্মে সখ্যরস। মহম্মদ ঈশ্বরের সখা। কিন্তু সখ্য এবং অপর তিনটি রস বৈষ্ণবধর্ম্মের নিজস্ব। নন্দযশোদা শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেইরূপ প্রেম করা, বাৎসল্যরস। শ্রীদাম সুদাম যেরূপ করিত, সেরূপ করা, সখ্যরস। ব্রজগোপীরা যেরূপভাবে তাঁহাকে পতিভাবে দেখিত, জগৎপতিকে সেইভাবে প্রেম করা—পতিপত্নীর মত প্রেম করা—কান্ত রস। আর শ্রীমতী যেরূপ পতির অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তর ভাবে প্রেম করিতেন, ঈশ্বরকে সেরূপ প্রেম করা মধুর রস। ইহা পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর। ইহাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে শ্রীভগবানে আত্মহারা হয় ও তাঁহাকে অভিন্ন দেখে। তাই রাসের শেষে গোপীরা মনে করিয়াছিল, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার লীলার অভিনয় করিয়াছিল। এই অবস্থা হিন্দু যোগীর ‘সোঽহং’ এবং বুদ্ধের ‘নির্ব্বাণ’। এরূপে যাহার যেরূপ প্রকৃতি, মানুষ তদনুরূপ রস বা ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এক এক ধর্ম্ম একটি সাধনার পথমাত্র—গন্তব্য

স্থান শ্রীভগবান। মূল পথ তিন—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি। তিন পথেরই প্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণ। যোগীর জ্ঞানপথ, বুদ্ধের কর্ম্মপথ, অপর ধর্ম্ম ভক্তিপথের বিভিন্ন শাখা।

তখন মহামুনির মন্দিরে সান্ধ্য আরতি বাজিয়া উঠিল। বাসন্তী জ্যোৎস্নায় নাগেশ্বরের উপবন ও সমীপবর্ত্তী পর্ব্বত ও প্রান্তর হাসিতে লাগিল। মেলাস্থল আনন্দকোলাহলে পূরিত হইল। বিদেশীয় দর্শক সেই দৃশ্য এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন :—

"দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। চারিদিকের শ্যামল গিরিরাজি দূর সুনীল প্রাচীরের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। মাথার উপর গাছে গাছে পাখীগুলি একবার কিচিমিচি করিয়া উঠিয়া আবার পরক্ষণেই নীরব হইল। কিন্তু নিম্নে সেই আনন্দকোলাহলের এক বিন্দুও হ্রাস হইল না। বরং সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া বৌদ্ধ মগদের আনন্দলহরী আরও উছলিয়া উঠিল। শত শত দোকান পসারিতে অগণিত দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র শৈলশেখর যেন শ্রীকৃষ্ণের মুক্তাবনের মত শোভা পাইতে লাগিল। মগ-মহিলাগণ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া দলে দলে চারিদিকে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। একি! একি! আমি স্বর্গে! এরা কি দেববালা! না গন্ধর্ব্বকুমারী অথবা অপ্সরী! এদের চতুষ্পার্শ্বে যেন কি এক মোহের মদিরা ছড়াইয়া পড়িতেছে। লাবণ্য ঢলিয়া পড়িতেছে। পূর্ব্বে ভাবিতাম, পাহাড়ীদের আবার রূপ কি? বেশভূষাই বা কোথায়? আজ আমার সেই ভ্রম সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। আজ আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি—যদি রূপ থাকে, তবে এদের মধ্যেই আছে, যদি বেশভূষার বাহার থাকে, তবে এই মগ-মহিলাদের বেশভূষাতেই আছে।"

"যুবতীগণ যুবকের দলে, কিশোরীগণ কিশোরের দলে, এবং বালিকাগুলি বালকের দলে এক হইয়া সেই মহামুনির প্রকাণ্ড মন্দিরের প্রশস্ত বারাণ্ডায় নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুদ্ধনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল, আর একবার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া কেমন এক রকম অস্বাভাবিক চীৎকারে মন্দির-প্রাঙ্গণ বারংবার কাঁপাইতে লাগিল।

"যখন এবংবিধ নৃত্যগীতে, মন্দিরে, প্রাঙ্গণে, রাস্তা, ঘাটে আনন্দের ঢেউ ছুটিতে লাগিল, কার সাধ্য সে তরঙ্গে স্থির থাকিতে পারে? তুমি আতুর হও, উঠিয়া নাচিবে,—বোবা হও, আনন্দে আনন্দধ্বনি করিবে,—বধির হও, যেন সব শুনিতে থাকিবে,—অন্ধ হও প্রত্যক্ষ দেখিতে থাকিবে। এ মেলার এমনই মহান ভাব!"

"রাত্রি কিছু অধিক হইল, মগ স্ত্রীপুরুষ দলে দলে যে যেখানে পাইল, গাছের তলে বিনা শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম 'তোমরা মাটিতে শুইলে কেন? হাসিমুখে উত্তর হইল,—'প্রভুর বাড়ী,—এ যে আমাদের ফুলশয্যা ; এমন শয্যা আর কোথায় পাব?'

দ্বাদশ অধ্যায়

ব্রজলীলা

সুন্দর বৈশাখ মাস সুন্দর সুনীলাকাশ,
কি সুন্দর বহিছে মলয়,—
শান্ত সুশীতল!
কি সুন্দর শৈলশোভা তরঙ্গিত মনোলোভা
উপত্যকা তরুশোভাময়,—
সুন্দর শ্যামল!
সুন্দর বৈশাখ মাসে, সুন্দর জ্যোৎস্না হাসে
নীলাকাশে শ্যামল ধরায়,—
কি হাসি সুন্দর!

যূবতী পার্ব্বতী সতী হাসিতেছে পুণ্যবতী,
সরলার হাসি নিরমল,—
প্রাণ স্নিগ্ধকর।
সে যূথিকা হাসি মাখি শোভিতেছে কর্ণফুলী
পার্ব্বতীর পদপ্রান্তে,
মালা মালতীর।
পার্ব্বতীর প্রেমধারা পুণ্যবতী স্রোতস্বতী
কি তরল সুধা নিরমল,—
কি শান্ত গভীর!

অনাথনাথ ও ভানুমতী অট্টালিকার ছাদে বসিয়া প্রকৃতির এই বৈশাখী ফুল্লচান্দ্রিকামণ্ডিতা শোভা দেখিতেছিলেন। প্রকৃতির এই লীলাভূমির শীর্ষস্থানে বসিয়া যে এই শোভা দেখে নাই, কবির সাধ্য নাই, চিত্রকরের সাধ্য নাই, তাহাকে উহা বুঝাইবে। গিরিপাদমূলে, নদীর উভয় কূলে, গ্রামগুলি এক একটি বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবনের মত শোভা পাইতেছে। বৃক্ষ-অন্তরালে গ্রামের প্রদীপাবলী জ্যোৎস্নায় ক্ষীণালোক হইয়া প্রস্ফুটিত মালতীপুষ্পের মত শোভা পাইতেছে। পল্লবে গুল্মে ও তৃণে সমাবৃতা পার্ব্বত্য ও সমতলভূমি জ্যোৎস্নালোকে কি মনোহর শ্যামশোভা ধারণ করিয়াছে। এই শ্যামক্ষেত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কর্ণফুলীর কি নয়নানন্দকর বঙ্কিমগতি! শ্যামার ও শ্বেতভুজার এই আলিঙ্গনে পরস্পরের সৌন্দর্য্য কত বর্দ্ধিত হইয়াছে। গিরিশেখরে অনাথনাথের মনোহর পুরীর অট্টালিকা ও উদ্যান চন্দ্রকরে খণ্ড-ত্রিদিবের মত বোধ হইতেছিল। বৃক্ষে বৃক্ষে, গুল্মে গুল্মে, পূর্ণবসন্তের প্রস্ফুটিত ফুলরাশির সেই কৌমুদী-প্রোদ্ভাসিত শোভা কল্পনাদুর্লভ। অট্টালিকার ছাদের টবে নানাজাতীয় ক্রোটন, ফুল ও লতার মনোহর উদ্যান ও নিকুঞ্জ, স্থানে স্থানে নানা অবয়বের ছায়া নিক্ষেপ করিয়া জ্যোৎস্নায় একটি স্বপ্নদৃষ্ট শোভার বিকাশ করিতেছে। নিম্নে নাগেশ্বরের উপবন হইতে মহামুনির মন্দিরের চূড়া উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া, মানবকে নির্ব্বাণের পথ দেখাইতেছে, যেন বলিয়া দিতেছে যে, পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা মানবহৃদয় তাহার মত জ্যোৎস্নাবিধৌত শ্বেত নির্ম্মল কান্তি ধারণ করিলে তবে নির্ব্বাণের দিকে উত্থিত হইতে পারে।

অনাথনাথ একখানি 'লাউঞ্জ চেয়ারে' এবং ভানুমতী তাঁহার পদতলে আরক্তিমকমলমণ্ডিত 'ফুটষ্টুলে' বসিয়া স্থিরচিত্তে এই শৈলকিরীটিনী, সরিৎমালিনী, জ্যোৎস্নাহাসিনী প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিলেন। যদিও বিগত ঝটিকায় এই শোভা অনেক বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তথাপি উহা অতুলনীয়া। উভয়ের মুখ প্রশান্ত। অধরে প্রীতির হাসি। প্রকৃতির প্রশান্ত প্রীতিময়ী জ্যোৎস্না যেন তাঁহাদের হৃদয়েও প্রবেশ করিয়া সেই ঝটিকার বিষাদচ্ছায়া কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়াছে।

কিছুক্ষণ স্থির নয়নে এই শোভা দেখিয়া, এবং উভয়ে উহার আলোচনা করিয়া অনাথনাথ বলিলেন,—"মা! আমি স্থির করিয়াছি, তোকে আমার কন্যারূপে গ্রহণ করিব।"

ভা। বাবা! তুমি ত সেই ঝড়ের দিন হইতেই আমাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিয়াছ।

অ। শাস্ত্রানুসারে গ্রহণ করিব।

ভা। সে কি বাবা! বেদের মেয়েকে কি ব্রাহ্মণে শাস্ত্রমতে গ্রহণ করিতে পারে?

অ। পারে। পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া গ্রহণ করিতে পারিব। তুমি বেদের মেয়ে নও, বৈরাগীর মেয়ে। সকলে বলিতেছে, তুমি কোনও শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা। এত রূপ, এত গুণ, এরূপ চরিত্র, বেদের মেয়ের হইতে পারে না। আমাদের

পুণ্যশ্লোক শাস্ত্রকারেরা শ্রীভগবানের একটি মধুর নাম রাখিয়াছেন—পতিতপাবন। তিনি ঘোরতর পাপীকেও পবিত্র করিয়া মুক্ত করেন। তখন, অবস্থাক্রমে যাহারা সামাজিক ভাষায় জাতিভ্রষ্ট, তাহাদিগকে পতিত করিয়া রাখা আমাদের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এই নির্ম্মম বিদ্বেষমূলক অধর্ম্মে আজ ভারতের কত হিন্দু মুসলমান হইয়া হিন্দুসমাজকে কেবল যে দুর্ব্বল করিয়াছে, এমন নহে ; উহারা মহাশত্রু হইয়া সোণার ভারতকে জাতীয় বিদ্বেষে উচ্ছিন্ন করিতেছে। হিন্দু সমাজের এই জড়ত্বহেতু অনেক পূজনীয় ব্যক্তিকে, শিক্ষার্থ বিলাত গিয়াছিলেন বলিয়া, আমরা হারাইতেছি। বীরভূমি পঞ্চনদ প্রদেশে এইরূপ সমাজচ্যুতকে শুদ্ধ করিয়া সমাজে লইবার জন্য "শুদ্ধিসভা" স্থাপিত হইয়াছে। মাড়ওয়ারীরাও এইরূপ করিয়াছেন। কলিকাতায়ও দুই এক জন শ্রদ্ধার্হ ব্যক্তি এইরূপে সমাজে গৃহীত হইয়াছেন।

ভা। সে কি বাবা! হিন্দু খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক, দেশদেশান্তরে যাউক, সে আবার হিন্দু হইতে পারিবে?

অ। কেন পারিবে না? হিন্দু শব্দ আমাদের কোনও শাস্ত্রে কি অভিধানে নাই। শুনিয়াছি, যবনদের সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ভারত-জয় হইতেই এই শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে ; তাহারা 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না। ইংরাজেরাও পারেন না। তাহারা সিন্ধু নদকে হিন্দু নদ বলিত। তৎপ্রদেশবাসীদিগকে হিন্দু বলিত। সেই হইতে এ দেশের নাম হিন্দুস্থান ও আমাদের ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম? যাহা হউক, এই হিন্দুধর্ম্মের মূলনীতি কি? এই ভারতের আসমুদ্রগিরি, আচটুল গান্ধারে যে অসংখ্য লোক বাস করিতেছে, ইহাদের বিশ্বাস এক নহে, আচার এক নহে, আহার এক নহে, পরিচ্ছদ এক নহে, আকৃতি এক নহে, ভাষা এক নহে। অথচ সকলেই হিন্দু। ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস পর্য্যন্ত হিন্দু-ধর্ম্মের মূল নহে। নিরীশ্বর সাংখ্য ও চার্ব্বাকও হিন্দু। দেবদেবীর পূজা হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। আমাদের যোগী সন্ন্যাসীরা কোনও দেবদেবীর পূজা করেন না, অথচ তাঁহারা হিন্দুসমাজের শীর্ষস্থানীয়। বঙ্গদেশে যে সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির পূজা আছে, ভারতের অন্যত্র তাহা প্রায় নাই বলিলেও চলে। বেদান্তের ঈশ্বর নির্গুণ, নিরাকার,—বৈদান্তিকেরাও হিন্দু। পুরাণ ও তন্ত্রের ঈশ্বর সগুণ ও সাকার। পৌরাণিকেরা ও তান্ত্রিকেরাও হিন্দু। আচার হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে,—ভারতের নানা দেশে নানা আচার। পরিচ্ছদও তদ্রূপ। আহার হিন্দুধর্ম্মের মূল নহে। ঘোরতর মদ্যমাংসাশীও হিন্দু এবং মদ্যমাংসবিদ্বেষী নিরামিষাহারীও হিন্দু। তবে হিন্দুধর্ম্মের মূল কি? এই বিস্তীর্ণ ভারতব্যাপী হিন্দুদের মধ্যে কি সাধারণ কিছু নাই? যদি কিছু থাকে, তবে নিশ্চয় উহাই হিন্দুধর্ম্মের মূল ভিত্তি। আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের তিনটি সাধারণ সম্পত্তি আছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া পদ্ধতিসহ দশকর্ম্মপদ্ধতি ও বর্ণভেদ। কি বঙ্গে, কি তৈলঙ্গে, কি মহারাষ্ট্রে, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিয়া পূজিত। সর্ব্বত্র কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলের দ্বারা শ্রীগীতা অধীত ও পূজিত ; সর্ব্বত্র উক্ত পদ্ধতি এবং বর্ণধর্ম্মানুসারে অল্পাধিক পরিমাণে সমাজ পরিচালিত। তবেই বোধ হইতেছে, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মূল শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার শ্রীগীতা, এবং সামাজিক তত্ত্বের মূল উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণানুসারে কর্ম্মের দ্বারা সমাজসংরক্ষণ। ভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন, গুণ ও কর্ম্মানুসারে তিনি চারি বর্ণ বিভক্ত করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ণ জন্মগত করিলে গুণ ও কর্ম্মের পুরুষানুক্রমে আরও উন্নতি সাধিত হইবে। ফলে তাহাই হয়। একটি দ্বাদশবর্ষীয় তাঁতীর ছেলে যেরূপ কাপড় বুনিবে, একজন মহাপণ্ডিত দশ বৎসর শিক্ষা করিয়াও তাহা পারিবেন না। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বুঝেন নাই যে, তাহার পরিণাম এই হইবে যে, ব্রাহ্মণের পুত্র মহামূর্খ ও ঘোরতর পাপী হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে। বর্ণ এইরূপে জন্মগত হইয়া গুণ ও কর্ম্মের ভিত্তি ক্রমশঃ লুপ্ত

হইয়া গিয়াছে। তাই বৌদ্ধধর্ম্মের সাম্যবাদে হিন্দুসমাজ এরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছে যে, আবার সেই বর্ণাশ্রমমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু তাহা হইলেও কোনও রূপ সামাজিক পদ্ধতি যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিলে, সমাজ বন্ধনহীন হইয়া আরও ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবে। সমাজের কিছু একটা বন্ধন চাই। উক্ত পদ্ধতি ও বর্ণাশ্রমের তুল্য এমন সুন্দর জ্ঞানগর্ভ বন্ধন আর কি হইতে পারে? অতএব হিন্দু কেহ খৃষ্টান হইয়া, মুসলমান হইয়া, কি দেশান্তরে গিয়া যদি (প্রচলিত কথায়) জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়, হিন্দুধর্ম্মের মূল এই ত্রিনীতি বা মূলনীতি অবলম্বন করিলে সে হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইবে।

ভা। তাহার কি কোনও প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক নহে?

অ। আমি এ কথা একদিন নরনারায়ণ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, দুই প্রকার পাপের জন্যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা। আধ্যাত্মিক পাপ ও সামাজিক পাপ। বিদ্যাশিক্ষার্থ কি কোন সৎকর্ম্মার্থ বিলাত কি দেশান্তরে যাওয়া আধ্যাত্মিক পাপ নহে। তবে সামাজিক রীতিনীতির লংঘনের জন্যে সামাজিক পাপ হইতে পারে। কিন্তু একজন বিলাতপ্রত্যাগত ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যখন তাহাকে পদে পদে সেই রীতি নীতির লঙ্ঘন করিয়া চলিতে হইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করা ধর্ম্মকে বিদ্রূপ করা বই নহে। আর দেশে থাকিয়াই কোন হিন্দু ইংরাজ মুসলমানকে স্পর্শ করিতেছে না? যাহা দশ বৎসর পূর্ব্বে অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, আজ তাহা খাইতেছে না কে? যাহারা যদৃচ্ছাক্রমে খাইতেছে কই তাহারা ত প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে না? আর যাহারা বিলাত কি অন্য দেশে যাইতেছে, তাহারা অবস্থার বাধ্য হইয়া খাইতেছে, তবে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে কেন?

ভা। কিন্তু বাবা। আমাকে সেরূপে গ্রহণ করিয়া কি করিবে?

অ। তোমাকে আমার উত্তরাধিকারিণী করিব, এবং বিবাহ দিয়া আমার শ্মশানসদৃশ এই পুরীতে অধিষ্ঠিত করিব।

ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। সে মাথা হেঁট করিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। লজ্জাবনত মুখে বলিল,—"তাহা হইলেই বা কি হইবে?"

অ। তুমি সুখী হইবে; আমি সুখী হইব।

ভা। সুখ কি বাবা? একটি কবিতায় পড়িয়াছি,—

> সুখ যাহা বল কথার কথা,
> দেখেছে কি কেহ পেয়েছে কখন?
> আকাশকুসুম, মুকুতার লতা,
> জীবনেতে মৃগতৃষ্ণিকার ভ্রম!
> ওই আকাশের নীলিমার মত
> দুঃখ(ই) জীবনের স্থিতি ও বিস্তার;
> সুখ যাহা বল বিদ্যুৎ মতন,
> বাড়ায় দ্বিগুণ নীলিমা তাহার!

আহা! অভাগিনী অনাথিনী বালিকা সুখ কি তাহা কখনও জানে নাই,—প্রশ্ন শুনিয়া অনাথনাথের এ কথা মনে পড়িল। তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি একবার তাহার মুখের দিকে দেখিলেন—কিন্তু কই, তাহাতে ত সেরূপ কোনও ভাব নাই। সে স্থির গম্ভীর চিন্তাকুল মুখে জ্যোৎস্নাপ্রোদ্ভাসিত নির্ম্মল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারও মুখ গম্ভীর ও চিন্তান্বিতের ভাব ধারণ করিল। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"বড় কঠিন প্রশ্ন। তবে ইহা বুঝিয়াছি, সুখ পদে নহে, সম্পদে নহে, গৌরবে নহে, বিভবে নহে; ধনে নহে, জনে নহে। পদে পদের আকাঙ্ক্ষা, সম্পদে সম্পদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ে মাত্র। ক্ষণিক তৃপ্তির

পর অতৃপ্ত বাড়ে মাত্র। সেকেন্দার সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, আর জয় করিবার কিছু নাই বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন! আজ ইয়ুরোপীয় জাতিদের অবস্থাও তাই। ইঁহারা রাজ্য রাজ্য করিয়া আকুল। কই, রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে, বিভবে, কেহ তৃপ্ত হইয়াছে, সুখী হইয়াছে, —একথা ত কাহারও মুখে শুনি নাই।

ভা। আমার বৈরাগী পিতা বলিতেন, কেবল ধর্ম্মেই সুখ।

অ। তোমার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তিনি বড় বিচক্ষণ লোক ও একজন পরম সাধু ছিলেন। ধর্ম্মই সুখের একমাত্র পথ। ইহার দ্বিতীয় পথ নাই। থাকিবার কথাও নহে। আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি প্রবৃত্তির উপর পক্ষীর পক্ষিত্ব, পশুর পশুত্ব নির্ভর করিতেছে। এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই তাহাদের সুখ। যে নীতিবলে তাহাদের এ সকল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হয়, সে সকল নীতি তাহাদের পক্ষিত্ব ও পশুত্ব ধারণ করে। তাহাই তাহাদের পক্ষিধর্ম্ম ও পশুধর্ম্ম। তদ্রূপ যে সকল শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক প্রবৃত্তির উপর মানবের মানবত্ব নির্ভর করে, তাহাদের চরিতার্থতাই মানব-সুখ। এবং যে নীতিমালায় ইহাদের চরিতার্থতা ধারণ করে, অর্থাৎ যাহাদের উপর ইহাদের চরিতার্থতা নির্ভর করে, সেই নীতিমালাই মানব-ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মই একমাত্র সুখের পথ।

ভা। গুরুদেব বলিতেন, ব্রজলীলার মত ধর্ম্ম শিক্ষার এমন সহজ ও মধুর উপায় আর নাই। তিনি অনেক ব্রাহ্ম ও ইংরাজিওয়ালা বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করিতেন। আমি কাছে বসিয়া শুনিতাম। বাবুরা কৃষ্ণের বড়ই নিন্দা করিতেন।

অ। আমিও করিতাম। একদিন একটি ঘটনায় ইংরাজী শিক্ষার ও সভ্যতার আবরণ আমার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়ে। রথের সময়ে 'নবযৌবনের' মেলার দিন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-দেবের দর্শন-মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটি সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া আছি। জল-স্রোতের মত ভারতের নানাদেশীয় যাত্রীর স্রোত জগন্নাথদেব দর্শন করিয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইয়া সেই দ্বার দিয়া বহির্গত হইতেছে। সেই ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইয়াছে, চক্ষে অশ্রুজল দেখা দিয়াছে। এমন সময়ে তোমারই মত একটি ষোড়শী কিশোরী উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আমি বড় হতভাগিনী। আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি। আমার ভাগ্যে জগন্নাথদর্শন ঘটিল না। তুমি আমাকে জগন্নাথদর্শন করাও।" তাহার বসন বিশৃঙ্খল হইয়াছে। তাহার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিতেছে. তাহার ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। বলিলাম,—"তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দেখাইতেছি।" কিন্তু তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। তাহার কেবল একমাত্র প্রলাপের মত কথা,—"আমি বড় অভাগিনী। আমার ভাগ্যে জগন্নাথ-দর্শন ঘটিল না।" একজন কনেষ্টবল আমার আজ্ঞামতে আমার গ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার মুষ্টি খুলিয়া দিলে, আমি তাহাকে শববৎ জড়াইয়া লইয়া যাত্রীদের স্রোত বন্ধ করিয়া শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলাম। সে অতৃপ্ত স্থির নির্নিমেষনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। দর দর ধারায় অশ্রু তাহার কপোল বাহিয়া পড়িতেছে। সে বেদী প্রদক্ষিণ করিল। আবার অতৃপ্তনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। তখন তাহার বাহ্যজ্ঞানের উদয় হইল। সে অবগুণ্ঠন টানিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে. বহু আত্মীয় সহ সে মন্দিরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে স্বজনগণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে মন্দিরের বাহিরে লইয়া আমার কাছে বসাইয়া রাখিলাম। তখন সে লজ্জাশীলা অবগুণ্ঠনবতী। পরে অন্বেষণ করিয়া তাহার আত্মীয় স্বজনের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আমি শ্রীমন্দিরের সেই দক্ষিণ দ্বারে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ কি ঘটনা! শ্রীভগবানের মূর্ত্তিদর্শনের জন্য ভক্তিতে

অধীরা হইয়া যদি একটি কিশোরী এরূপভাবে একজন অজ্ঞাত পুরুষের গলায় পড়িতে পারে, তবে ব্রজকিশোরীরা অদ্ভুতকর্ম্মা ও দৈবশক্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া—যে শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সে শারীরিক বলে এত অসুরের বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং জ্ঞানবলে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া নবধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন,—সেই 'সজল জলদ-স্নিগ্ধ কান্তি' ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া রাসের শেষে ভক্তিতে, ভক্তির চরম প্রেমে অধীরা হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গ আলিঙ্গন করিবে, তাঁহার শ্রীমুখ চুম্বন করিবে, তাহাতে নিন্দার বিষয় কি? বুদ্ধদেব কি পত্নীপুত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? চৈতন্যদেব কি কৃষ্ণের জন্যে মাতা পত্নী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান নাই? তবে সরলা ব্রজগোপীরা স্বয়ং যে শ্রীভগবানকে পতি-পুত্র হইতে অধিক প্রেম করিত, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্যে পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া যাইত, তাহাতে আর নিন্দার বিষয় কি? এখনও কি গ্রামে একজন সাধু সন্ন্যাসী আসিয়াছে শুনিলে গ্রামবাসিনীরা পতিপুত্র ত্যাগ করিয়া তাহাকে দেখিতে ছুটে না? বিশেষতঃ, শ্রীকৃষ্ণ তখন কিশোর মাত্র; কিশোরত্বের সীমা পঞ্চদশ বর্ষ।

আর একদিন আমি কার্য্যস্থান হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, একটি কিশোর সন্ন্যাসী-শিশুকে লইয়া পরিবারস্থ মহিলারা এত আত্মহারা হইয়াছে যে, আমার জলখাবার প্রস্তুত করিতে হইবে—আমার পতিপ্রাণা পত্নী পর্য্যন্ত ইহা ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহারা শিশুটিকে লইয়া একরূপ পাগল হইয়াছে। তখন আমার মনে হইল যে, একটি মূর্খ কিশোরসন্ন্যাসীকে লইয়া যখন ইহারা এরূপ করিতেছে, তখন স্বয়ং ভগবান নবীন-কিশোর শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলে ইহারা কি করিবে? কালে যমুনাতীরাভিনীত এই সরল ও সহজ, যমুনার সলিলের মত নির্ম্মল, শীতল ও মধুর, ধর্ম্মও আবিল ও পঙ্কিল হইল। বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়, মহম্মদীয় ও গৌরীয় ধর্ম্মের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। হইবারই কথা; শ্রীভগবানের প্রতিভা মানুষ কোথায় পাইবে? এইরূপ আবিল ও পঙ্কিল হইয়াছিল বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অবতার প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি জাহ্নবীতীরে ও সিন্ধুতীরে সেই ব্রজলীলার অভিনয় করিয়া বঙ্গদেশ ও ভারতের নানা স্থান কৃষ্ণ নামে ও কৃষ্ণপ্রেমাশ্রুতে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন। আহা! কি করুণ মধুর লীলা! জগতে এমন প্রাণশীতলকারী আর কি আছে? তিনি কখন শ্রীকৃষ্ণের দাসভাবে বিভোর হইয়া ব্রজলীলার শান্তিরস, কখন নন্দযশোদার ভাবে বিভোর হইয়া বাৎসল্যরস, কখন শ্রীদাম সুদামের ভাবে বিভোর হইয়া সখ্যরস, কখন বা গোপ-কিশোরীদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পতিপ্রেমে বিভোর হইয়া কান্তরস, শ্রীরাধার প্রেমে বিভোর হইয়া মধুররস—সর্ব্বশেষে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এই ষড়রসভোগের অভিনয় দেখাইয়া, শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তের প্রেম এবং ভক্তের প্রতি শ্রীভগবানের প্রেমই যে ব্রজলীলা, তাহা জলের মত বুঝাইয়া দিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্য দেবের লীলা না বুঝিলে ব্রজলীলা বুঝিতে পারি না। জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ বড় কঠিন। যদি সরল ও সহজ পথ চাও, তবে "সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণ লও।" ব্রজের গোপীরাই সর্ব্বধর্ম্ম, এমন কি, পতিপুত্র পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র তাঁহার শরণ লইয়াছিল। যে রাসলীলা নিন্দনীয় মনে করিতাম, এরূপে তাহার মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য ক্রমে আমার শিলাসম কঠিন বক্ষ দ্রব করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম, ধর্ম্মপথই একমাত্র সুখের পথ। বুঝিলাম, শ্রীভগবানকে প্রেম না করিলে মানুষ ধর্ম্মপথের প্রকৃত পথিক হইতে পারে না। বুঝিলাম সে প্রেম শিক্ষা দিবার জন্যে ব্রজলীলার মত সহজ, সরল ও মধুর আদর্শ আর হইতে পারে না। শ্রীভগবানকে প্রভুর মত, পিতার মত, পুত্রের মত, সখার মত, পতির মত, পত্নীর মত, ভালবাসিতে সকল নরনারীই পারে। এ সকল প্রেমের মধ্যে পতিপত্নীর প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গাঢ়তম। কিন্তু পতিপত্নীপ্রেমের অপেক্ষাও গাঢ়তর যে প্রেম, তাহাই চরম প্রেম—তাহাই রাস। মা! তুমি একবার সেই গানটি গাও না।

ভানুমতী তখন বংশীবিনিন্দিত সুমধুর কণ্ঠে হর্ম্ম্যশীর্ষ মুখরিত করিয়া মধুর কীর্ত্তন গাহিতে লাগিল,—

১

ওরে ব্রজবাসী আয় রে আয়!
রাসে তোরা কে নাচিবি আয়!
ওরে চন্দ্র নাচে তারা নাচে,
ধরা নেচে নেচে যায়।

২

কার্ত্তিক পূর্ণিমা নিশি
গ্রহে গ্রহেতে ভাসি,
বাজিছে কৃষ্ণের বাঁশি, প্রাণ-উদাসী
বুদ্ধ হেসে, গৌর নেচে, গৃহ ছেড়ে ছুটে যায়।

৩

সদ্যঃপ্রসূত কুমার
ছাড়ি, বুদ্ধ অবতার,
ছাড়ি বিষ্ণুপ্রিয়া পত্নী, শচী মা, নিমাই,
পত্নীপুত্র ছেড়ে তোরা ব্রজবধূ আয় রে আয়।
পত্নীপুত্র না ছাড়িলে কৃষ্ণধনে নাহি পায়।

৪

প্রেমে কিশোর বিহ্বল,
দুই নেত্র ছল ছল,
মাঝে কৃষ্ণ,—কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত গোপীদল
নাচে করে কর, দেখে কৃষ্ণ সবারি গলায়—
নীল শশী বেড়ি যেন তারা নাচিছে ধরায়।

৫

প্রেমে হাসে জ্যোছনা,
প্রেমে হাসে যমুনা,
প্রেমে হাসে বৃন্দাবন,—নাহি উপমা।
নীলমণিধারাপ্রেমে যমুনা উছলি যায়।

৬

আহা আছেন ঈশ্বর
বিরাজিত নিরন্তর
সর্ব্বভূত-হৃদয়েতে, কৃষ্ণ রাসেশ্বর।
রাসচক্রে সর্ব্বভূত প্রেমে নাচিয়া বেড়ায়,
ঘুরিছে প্রকৃতি নেচে ধরি পুরুষ-গলায়।

৭

প্রেমের ব্রজ এ ধরা,
প্রেমের গোপী আমরা,
কাল-কালিন্দীর তীরে প্রেমেতে ভরা ;
জন্মে জন্মে কর্ম্মফলে ভ্রমি ভব রাসলীলায়,—
(নাথ!) নবীনের নাহি দুঃখ যদি হৃদে তোমায় পায়!

অনাথনাথ দেখিলেন, ভানুমতী বৈশাখী জ্যোৎস্নায় পুলকিত আকাশের দিকে চাহিয়া গাহিতেছে, এবং তাহার কপোলযুগল বহিয়া গঙ্গাধারার মত ভক্তি-বিগলিত অশ্রুধারা ঝরিতেছে। অনাথনাথ ভাবিলেন, "আমি কি তবে ভ্রান্ত?"

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিজয়া

অনাথনাথ বড়ই পত্নী-পুত্র-পরায়ণ ছিলেন। নিমিষের জন্যেও তাহাদিগকে চক্ষুর অন্তর করিয়া থাকিতে পারিতেন না। কার্ত্তিক ঝটিকাসঙ্কুল মাস ; তথাপি স্ত্রী পুত্র সঙ্গে করিয়া আপনার জমিদারি পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তাই সকলে মনে করিয়াছিল যে, পত্নী পুত্র হারাইয়া তিনি উন্মত্ত হইবেন ; কিন্তু ভানুমতীকে সঙ্গে করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন সকলে দেখিল, তাঁহার গম্ভীর, শান্ত ও মধুর প্রকৃতি আরও গম্ভীর শান্ত ও মধুর হইয়াছে। এই নিদারুণ শোকের সময়ে তিনি কি যেন এক শান্তিছায়া পাইয়াছেন ; কি যেন এক সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শোকের চিহ্ন কেহ দেখিল না ; শোকের কথা কেহ শুনিল না। অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। ইহা তাঁহার চির অভ্যাস। তাহার পর ভানুমতীকে লইয়া পুরোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া গ্রাম পরিদর্শন করেন। সকলের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইয়া, নিজ বাটীর ঔষধালয় হইতে রোগীর ঔষধের ব্যবস্থা করাইয়া, বিপন্নের বিপদ উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়া, এবং যাহার যেরূপ অভাব, যথাসাধ্য তাহার অপনোদন করিবার চেষ্টা করিয়া, তিনি গৃহে ফিরেন। ভানুমতী ইহাতে তাঁহার এক জন প্রধান সহায়। অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া গেলেও সে অনেকক্ষণ গ্রামে গ্রামে বেড়াইত, এবং গ্রামবাসিগণের সুখ-দুঃখের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিত। সে যেন তাহাদের পরিবারস্থ একজন হইয়া পড়িয়াছিল। শিশুরা তাহাকে দেখিলেই আনন্দে ছুটিয়া আসিত, রমণীরা জোর করিয়া তাহাকে আপন আপন বাড়ী লইয়া যাইত, পুরুষেরা তাহার উপর অজস্র আদর বর্ষণ করিত। সকলের মুখে সেই এক কথা, "মা! তুই কোন দেবকন্যা?" সেও জাতিনির্ব্বিশেষে গ্রামস্থ বৃদ্ধ বৃদ্ধাকে বাবা ও মা. ও যুবক যুবতীকে দাদা ও দিদি বলিয়া ডাকিত এবং শিশুদিগকে পুত্র কন্যার মত আদর করিত। তাহাকে দেখিবামাত্র গ্রামে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হয়।

অনাথনাথ গৃহে ফিরিয়া ইতিমধ্যে আপনার বিষয়কার্য্য করিতেন। তিনি এখন যেরূপ মনোযোগের সহিত ও পরিশ্রমের সহিত জমিদারির কার্য্য দেখিতেন পূর্ব্বে এরূপ দেখেন নাই ; কর্ম্মচারীরা বুঝিল যে, তিনি সমস্ত সুশৃঙ্খল করিয়া সেরেস্তার কাগজপত্র গোছাইয়া লইতেছেন ; কি যেন তাঁহার একটা অভিসন্ধি আছে। তাহার পর অপরাহ্নে ভানুমতীর মুখে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি নানা গ্রন্থ শুনিতেন, এবং তাহার সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন। কখন বা দ্বারস্থ পণ্ডিত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া উভয়কে শুনাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার উদ্যানে, নদীতীরে, কিংবা পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভানুমতীকে লইয়া বেড়াইতেন, এবং কখন বা কোন বৃক্ষতলায়, কি গিরিশেখরে উপলখণ্ডে. কি উদ্যানবাটীতে বসিয়া, ভানুমতীর মুখে বেহালা, হারমোনিয়ম, এস্রাজ, সারঙ্গীর সঙ্গে কীর্ত্তন শুনিতেন। ভানুমতী বৈরাগীর মেয়ে, সে পূর্ব্বে বেহালা, সারঙ্গী বাজাইতে জানিত। ইতিমধ্যে সে অবলীলাক্রমে অন্য দুই যন্ত্রও বাজাইতে শিখিয়াছিল। এই সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে কখন সে নিজে বাজাইয়া গাইত ; অনাথনাথ তাহার সঙ্গে গাইতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি বাজাইতেন, এবং আত্মহারা হইয়া তাহার গান শুনিতেন। এইরূপে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত।

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, বড় পুণ্য দিন ; ইহা শ্রীবুদ্ধদেবের জন্ম ও তিরোধানের দিন। অনাথনাথ দিবস ও নিশার্দ্ধ আনন্দে মহামুনির মন্দিরে ও উপবনে কাটাইয়াছেন। রাত্রি

যখন শেষ হইয়া আসিতেছে, এমন সময়ে সুষুপ্ত অবস্থায় তাঁহার বোধ হইল, যেন কে অতি মধুর ভক্তিবিহ্বল কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন গাইতেছে—তিনি যেন শুনিতে পাইলেন,—

"শ্যাম পরশমণি, কি দিব তুলনা!
সে অঙ্গপরশে আমার এ অঙ্গ সোনা।
হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন ;
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন ;
বদনের ভূষণ আমার সে নাম কীর্ত্তন।

তাঁহার বোধ হইল, কণ্ঠ ভানুমতীর। সে যেন উদ্যানে, গৃহে, ছাদে, আকাশে বিচরণ করিয়া গাইতেছে ; ফুল্লজ্যোৎস্নাকীর্ণ জগৎ যেন শ্যামনামে মুখরিত ও ভক্তিরসে সিক্ত হইয়াছে ; চারি দিকে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে আত্মহারা হইয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং সেই পুণ্যদৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে সঙ্গীত থামিল ; তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল ; বুঝিলেন তাঁহার নয়নে অশ্রু। এ কি? তিনি উঠিয়া উদ্ঘাটিত গবাক্ষের নিকটে গিয়া উদ্যানের দিকে দেখিলেন। নির্ম্মল ধবল জ্যোৎস্নালোকে পত্রপুষ্পশোভিত উদ্যান হাসিতেছে। কই, সেখানে ত ভানুমতী নাই! তখন অনাথনাথ ভাবিলেন, তিনি রাত্রিতে এ সঙ্গীত ভানুমতীকে গলদশ্রুনয়নে, বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে সারঙ্গীর সঙ্গে গাইতে শুনিয়াছিলেন, স্বপ্নে আবার সেই গীত শুনিয়াছেন। কিন্তু এ স্বপ্নে তাঁহার হৃদয় যেন ভক্তিতে আর্দ্র, দ্রব হইয়াছে, প্রাণে যেন কি অমৃত প্রবেশ করিয়াছে, ধমনীতে যেন কি অমৃত সঞ্চারিত, সঞ্চালিত হইয়াছে। ভক্তিতে আত্মহারা অবশ ভাবে রজনীর অবশিষ্ট কাল না নিদ্রিত, না জাগ্রৎ অবস্থায় অতিবাহিত করিলেন। প্রত্যূষে উঠিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কই, অন্য দিন যেরূপ ভানুমতী তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে, আজ ত নাই। তিনি মনে করিলেন, সে নদীতীরে গিয়াছে ; তিনি পুরীগিরি অবতরণ করিয়া কর্ণফুলীর তীরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কই, ভানুমতী এখানেও নাই। তিনি তখন মনে করিলেন, বালিকা কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আনন্দ করিয়াছিল, তাই এত সকালে জাগিতে পারে নাই। তিনি কিছুক্ষণ নদীতীরে বেড়াইলেন। বৈশাখের প্রভাত স্বভাবতঃ সুন্দর। তাহাতে এই গিরিতল-বিচারিণী গিরিকন্যার তীরে উহা আরও কত সুন্দর। অবস্থার পর্ব্বতজাল ভেদ করিয়া ভক্তিস্রোতের মত কর্ণফুলী বহিয়া যাইতেছে। ভক্তিতে জ্ঞানের আলোক সঞ্চারিত হইলে উহা যেরূপ আরও প্রসন্নভাব ধারণ করে, বসন্তের বালসূর্য্যকিরণে কর্ণফুলী সেইরূপ প্রসন্নসলিলা হইয়াছে। দৃশ্যটি ঠিক যেন অনাথনাথের হৃদয়ের একটি প্রতিকৃতি। গত সন্ধ্যায় সেই সঙ্গীত শুনিয়া, গত নিশিতে সেই স্বপ্ন দেখিয়া অবধি তাঁহার হৃদয়েও এরূপ একটি শান্তসলিল ভক্তিস্রোত সেই 'শ্যাম' পরশমণির দিকে ছুটিয়াছে। ক্রমে বেলা হইল ; কই ভানুমতী আসিল না। তখন তাঁহার মনে আর একটি সন্দেহ হইল। তিনি বড় মধুর ঈষৎ হাসি হাসিলেন। কাল উৎসবের শেষে শয়ন করিতে যাইবার সময় অনাথ-নাথ একখানি পুরু কাগজ ভানুমতীর হাতে দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মা ইহা আমার দানপত্র। আজ হইতে আমার এই বিপুল সম্পত্তি তোমার। এই পুণ্যতিথিতে আমার পূর্ব্বপুরুষের এই পবিত্র পুরীতে তোমাকে লক্ষ্মীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলাম।" ভানুমতীর মুখ গম্ভীর হইল। তাহার সমস্ত শরীর যেন কম্পিত হইল। সে প্রসারিত দানপত্র গ্রহণ করিল, এবং অঞ্চলে কণ্ঠ বেষ্টিত করিয়া তাঁহার চরণযুগলে প্রণত হইল, এবং পদযুগল অশ্রুসিক্ত করিল। অনাথনাথ তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বুকে তুলিয়া তাহার মুখচুম্বন করিলেন। দেখিলেন শিশিরসিক্ত শতদলের ন্যায় সেই মুখ শান্ত, স্থির, পবিত্র। সে আর কিছু বলিল না। অনাথনাথ আবার তাহার মুখচুম্বন করিয়া সানন্দা-

শূন্যনয়নে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি মনে করিলেন ভানুমতীর বুঝি সেই কারণে হৃদয়ে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, এবং সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছে, তাই উঠিতে বিলম্ব হইয়াছে।

তিনি পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া বসিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার কার্য্যাধ্যক্ষ কর্ম্মচারী আসিয়া বলিলেন, "যে কর্ম্মচারীটি মরিয়া গিয়াছে, এবং যাহার পরিবার প্রতিপালনের আপনি সেদিন মাত্র সংস্থান করিয়া দিয়াছেন, তাহার কাগজপত্র বুঝিয়া লইবার জন্যে তাহার একটি বাক্স খুলিলে তাহাতে আপনার নামাঙ্কিত এই পুরাতন পত্র অনেক কাগজের নীচে পাইলাম। পত্রখানি বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হইতেছে, আপনি দেখেন নাই।" কার্য্যাধ্যক্ষ এই বলিয়া একখানি 'তুলট' কাগজে লেখা অতি পুরাতন পত্র অনাথনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনাথনাথ পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

"শ্রীহরিঃ শরণং।

মহামহিমার্ণব

শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ রায়, জমীদার মহাশয়

মহিমার্ণবেষু—

শ্রীকৃষ্ণের নিকট আপনার মঙ্গল ভিক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন। ১২৮৮ সনের কার্ত্তিক মাসের মহা ঝড়ে রাজখালী গ্রামের নিকটে সমুদ্রতীরে আপনার বজরা জলমগ্ন হয়। ঝটিকার সময় আমি ও আমার বৈরাগিণী যে একটি ভূপতিত বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তাহার কাছ দিয়া একটা কি ভাসিয়া যাইতে আমার পায়ে লাগে। স্পর্শ করিয়া দেখিলে একটি শিশু বলিয়া বোধ হইল। আমি উহাকে উঠাইয়া লইয়া আমার বক্ষের মধ্যে রাখিয়া রাত্রি অতিবাহিত করি। প্রভাতে দেখিলাম, আপনার দুই বৎসর বয়স্কা কন্যা। আপনার বজরায় ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম। তখন তাহার জীবনের কোন লক্ষণ ছিল না। সে সময়ে 'পুরী গোস্বামী এই পথে আদিনাথ যাইতেছিলেন। তিনি শিশুটিকে তাঁহার দৈবশক্তি দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করেন। আমার বৈরাগিণী কাঁদিতে লাগিল। সে কোনও মতে মেয়েটিকে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতে দিবে না। সেই রাত্রিতেই তাহাকে লইয়া পলায়ন করে, এবং বহু অন্বেষণে আমি অনেক দিন পরে ত্রিপুরার অন্তর্গত একটি গ্রামে তাহাকে প্রাপ্ত হই। দেখিলাম, দুটিতে বড় আনন্দে আছে, মেয়েটি বৈরাগিণীর জীবনসর্ব্বস্ব হইয়া এবং মেয়েটি তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। তখন আমার সাধ্য নাই যে, তাহাকে বৈরাগিণীর কাছ হইতে সরাইয়া লইয়া আপনাকে প্রত্যর্পণ করি। 'পুরী গোস্বামীও নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মেয়েটি শ্রীভগবতীর অংশসম্ভূতা। কোনও মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যর্পণ করিলে তাহার বিঘ্ন হইবে। বিশেষতঃ সে যখন আমাকে তাহার কচি মুখে ঈষৎ হাস্য করিয়া 'বাবা' বলিয়া ডাকিল, তখন আমার হৃদয়ে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণের লীলা,—আমি মায়াপাশে আবদ্ধ হইলাম। এই দশ বৎসর আমি তাহাকে সঙ্গীত ও শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছি। মা আমার স্বয়ং সেই ব্রজকিশোরী কৃষ্ণপ্রেমানুরাগিণী শ্রীরাধা। এমন রূপ, এমন গুণ, এমন ভক্তি, মানুষের হইতে পারে না।

আমি বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত। আপনি এই পত্র যখন পাইবেন, আমি তখন ধরাধামে থাকিব না। বৈরাগিণী আমার পূর্ব্বেই বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রাজনগর গ্রামে শ্রীহরিচরণ দত্তের দোকানে আপনার হারাণ লক্ষ্মীকে পাইবেন। আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবেন, এবং এই মহাপাতকী তস্করের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইতি ১২ই মাঘ, ১২৯৮ সন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস

শ্রীগৌরদাস বৈরাগী।"

পত্রপাঠ শেষ করিয়া "ভানুমতী আমার অমিয়া! মা অমিয়া! মা অমিয়া!" বলিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে উন্মত্তের মত অন্তঃপুরে ভানুমতীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের দ্বিতল গৃহে তাঁহার শয়ন কক্ষের পার্শ্বে একটি কক্ষ অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করিয়া ভানুমতীকে থাকিতে দিয়াছিলেন। কক্ষ ত নহে,—একটি ক্ষুদ্র ত্রিদিব। কিন্তু কক্ষে ভানুমতী নাই। সমস্ত বাড়ী, সমস্ত পুরী, সমস্ত উদ্যান ও উপবন, সমস্ত নদীতীর অন্বেষণ করিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। পুরীতে মহা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। কর্ম্মচারী, দাস, দাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব সকলে চারি দিকে অন্বেষণে ছুটিল। সকলের মুখেই—"ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত পুরী যেন আনন্দে এককণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" সমস্ত উদ্যান ও উপবন আনন্দে পত্রের মর্ম্মরে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" শৈলসমীরণ আনন্দে সন্ সন্ রবে, পার্ব্বত্য পক্ষিগণ কল কল রবে বলিতে লাগিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" কর্ণফুলী আনন্দে তর তর স্রোতে বহিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া।" উপত্যকাস্থ গ্রামসমূহে আনন্দকোলাহল উঠিল, "ভানুমতী বাবুর হারাণ মেয়ে অমিয়া!" কিন্তু ভানুমতী কোথায়? এ আনন্দ উচ্ছ্বাসের সময় ভানুমতী কোথায়? যাহাকে বুকে লইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে যেন জগৎ আকুল হইয়াছে, সে ভানুমতী কোথায়? অনাথনাথ স্বয়ং বারবার পুরী, উদ্যান, নদী-তীর, সর্ব্বশেষে গ্রামে গ্রামে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেন, ভানুমতীকে পাইলেন না। তিনি ভগ্নহৃদয়ে গলদশ্রুনয়নে গৃহে ফিরিয়া আবার তাহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শূন্য গৃহের প্রত্যেক সজ্জা ও উপকরণ যেন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ভানুমতী কোথায়?" তিনি বাতা-য়নপথে পুরোদ্যান, নীলমণিমালানিভ গিরিগর্ভস্থ কর্ণফুলী ও বৃক্ষসমাচ্ছন্ন উপবন সদৃশ গিরিপদতলস্থ গ্রামসমূহ দেখিতে লাগিলেন,—সকলই যেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, —"ভানুমতী কোথায়?" তাঁহার হৃৎকম্প হইল। তিনি ভানুমতীর শয্যার উপর বক্ষ রাখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়া শয্যা সিক্ত করিলেন। হৃদয়ের বিপ্লব একটু উপশমিত হইলে তিনি শূন্যহৃদয়ে কক্ষমধ্যে দেখিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাহার লিখিবার মেজের উপর তিনি যেন একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। তিনি উঠিয়া গিয়া দেখিলেন, পত্র ভানুমতীর সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখিত, এবং শিরোনামায় তাঁহার নাম। বিদ্যুদ্বেগে পত্রের আবরণ ছিন্ন করিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

বাবা! আজ তোমাকে আমার অতীত কাহিনী কহিব। সে সময় উপস্থিত হইয়াছে। শৈশবে কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, মনে নাই। এইমাত্র স্মরণ আছে, বৈরাগী পিতা ও বৈরাগিণী মাতার বড় স্নেহভাগিনী ছিলাম। তখন আমার নাম ছিল স্বর্ণ। তাঁহাদের সঙ্গে নানা স্থানে বেড়াইয়া গান গাইয়া শৈশব বড় সুখে কাটাইয়াছি। অষ্টম বর্ষ বয়সে আমার স্নেহপ্রতিমা করুণাময়ী বৈরাগিণী মাতা আমাকে বক্ষে লইয়া কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যান। তাহাতে আমার ক্ষুদ্র হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বহুকাল মাতার জন্যে, কি ভিক্ষার সময়, কি গান গাইবার সময়, কি গৃহে বিশ্রাম করিবার সময়— কাঁদিতাম, পিতার সমুদয় সান্ত্বনা এই শোকস্রোতে ভাসিয়া যাইত। এই শোকের শান্তি না হইতেই দুই বৎসরের মধ্যে পিতাও পুণ্যবতী জননীর অনুসরণ করেন। রাজনগর গ্রামে একটি দোকানে তাঁহার জীবলীলার অবসান হয়। আমাকে সেই দোকানদারের কাছে রাখিয়া যান, বলিয়াছিলেন,—'মা! তুই আমাদের মেয়ে নহিস্। আমরা মহাপাতকী, তোর মত দেব-কন্যা কোথায় পাইব? তুই ঝড়ের সময় সমুদ্রের বন্যায় আমাদের কাছে ভাসিয়া আসিয়াছিস; আমরা মহাপাপী, মায়াতে মুগ্ধ হইয়া তোর পিতাকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি নাই। তিনি কুবেরসদৃশ ভাগ্যবান্। বৈরাগিণী চলিয়া গিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, এবার চট্টগ্রাম

অঞ্চলে গেলে তোকে তোর পিতার হাতে অর্পণ করিব। কিন্তু শ্রীভগবানের বুঝি তাহা ইচ্ছা নহে। আমি তাঁহার কাছে পত্র লিখিলাম। তুমি এই দোকানে থাকিবে। তিনি আসিয়া তোমাকে লইয়া যাইবেন।' আমি এই প্রহেলিকা কিছুই বুঝিতে পারি নাই। পিতার পরলোকগমনে সংসার শূন্য হইল। আমি আশ্রয়হীনা হইলাম। এবার হৃদয় একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি শোকে এরূপ অভিভূতা হইয়াছিলাম যে, তিনি কি বলিয়াছিলেন, ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। একটি ক্ষুদ্র কুসুমের উপর পার্ব্বত্য শিলাখণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে ফুলটি যেরূপ নিষ্পিষ্ট হয়, পিতার মৃত্যু সমাগত জানিয়া, আমার হৃদয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। দোকানদার পিতার কিছু সঞ্চিত অর্থ পাইয়াছিল। সে কয়েক দিন আমাকে খুব যত্ন করিল। ক্রমে সে যত্ন শিথিল হইল। এমন সময়ে এক দল বেদে সেখানে উপস্থিত হইল। দোকানি আমাকে গোপনে তাহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া প্রকাশ্যে বলিল, 'তুমি বৈরাগীর মেয়ে। কোন গৃহস্থ তোমাকে স্থান দিতে চাহে না। তুমি আর বেশী দিন আমার এখানে থাকিলে আমার জাতি যাইবে! অতএব তুমি বেদেদের সঙ্গে চলিয়া যাও।' জগৎ অন্ধকার দেখিলাম! আর কোথাও যাইবার স্থান দেখিলাম না। আমি এইরূপে বেদেদের ক্রীতকন্যা হইলাম। বেদিনী মাতা কিছু উগ্রপ্রকৃতি হইলেও, বেদে পিতা বড় ভালমানুষ। তখন আমার নাম হইল—আশা। সর্ব্বশেষ তাহাদের শিশুপুত্র গোপাল—(এখানে পত্রে এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়াছে) বাছা! আমার কোথায় গেল! তাহার আদরে আমি সকল দুঃখ ভুলিয়াছিলাম। এইরূপে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পরে সুবর্ণদ্বীপে তোমাদের দর্শনলাভ করি। দর্শনমাত্রই কে যেন আমার হৃদয়ে বলিয়া দিল, 'অভাগিনী! এই তোর পিতা, তোর মাতা, তোর ভ্রাতা।' হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ছুটিয়া গিয়া তোমাদের চরণতলে পড়িতে, ভাইটিকে বুকে লইতে, প্রাণ আকুল হইল। কত দেশে কত লোকের কাছে বাজী করিয়াছি ; কত লোক কতরূপ স্নেহমমতা দেখাইয়াছে ; কিন্তু মনের এমন ত ভাব কখনও হয় নাই ; কাহাকেও ত পিতা মাতা বলিয়া মনে হয় নাই। তোমাদেরও আমার প্রতি সেই অপার স্নেহ ও করুণা। তাহার পর সেই প্রলয়কারী ঝড়। মাকে হারাইলাম, ভাইকে হারাইলাম। আমার গোপালকে হারাইলাম। সেই দরিদ্র আশ্রয়দাতা দুটিকে হারাইলাম। (এখানে অশ্রুতে লেখা ভাসিয়া গিয়াছে।)

কিন্তু বাবা! শ্রীভগবানের কি লীলা! যে ঝড়ে পৃথিবী দলিত নিষ্পিষ্ট করিয়া গেল, আমার মত ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বনফুলটিকে উড়াইয়া আনিয়া তোমার দেবচরণে অর্পণ করিল! যে ঝড়ে জগৎ বিধ্বস্ত করিল, আশ্রয়হীনা আমার জন্য কি এই স্বর্গের সৃষ্টি করিল! আমি এই কয়েক মাস তোমার হৃদয়ে কি স্বর্গ দেখিলাম, তোমার মুখে কি স্বর্গের সংবাদ শুনিলাম, তোমার স্নেহে কি স্বর্গ ভোগ করিলাম। সর্ব্বশেষে আমি পথের ভিখারিণী, রাজনন্দিনী ;—একটি বিপুল রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী।

কিন্তু বাবা! বৈরাগিণী কি রাজনন্দিনী হইতে পারে? তোমার ওই উদ্যানের লতাটি যে ভাবে তরুটিকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে, বলপূর্ব্বক তাহার সেই ভাবের, সেই গতির কি পরিবর্ত্তন করিতে পার? যে জীবনলতা বৈরাগ্যবৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এতদূর উঠিয়াছে, তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া সংসারবৃক্ষের ছায়ায় রোপণ করিলে কি সুখী হইতে পারে? বাবা এই কয়েক মাস ত তোমার বিপুল সংসারের শীতল ছায়ায় কাটাইলাম। কিন্তু কই? তোমার ইন্দ্রপুরীসদৃশ রাজপুরী, তোমার সেই বিস্তৃত রাজ্য, এই গৌরব, এই সম্পদ, এ সকল ত কিছুই আমার চক্ষে পড়িল না। তোমার ওই দেবমূর্ত্তি, তোমার ওই দেব-হৃদয়ে তোমার দেব-দুর্লভ জ্ঞান। তোমার পাদপদ্মে মাথা রাখিয়া তোমার পূজা করিতে পারিলেই ভানুমতী সুখী। তাহার অধিক সুখ সে চাহে না,—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণা করিতে পারে না।

বৈরাগী পিতা তাহার হৃদয়ে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, তুমি এই কয়েক মাস তাহাতে জল-সেক করিয়া অঙ্কুরিত করিয়াছ। তুমি কি উহার ফুল ফল হইতে দিবে না? বৈরাগী পিতা আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে একটি ক্ষুদ্রমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন,—কৃষ্ণ। তোমার মুখে সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে সে হৃদয় বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্থাপিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি বড়ই মহিমাময় হইয়াছে। এখন কেবল সেই রূপ দেখিতে পারিলে, সেই নাম গাইতে পারিলেই আমার সুখ; এ হৃদয়ে অন্য সুখ স্থান পায় না।

"হস্তের ভূষণ আমার চরণসেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপদরশন,
বদনের ভূষণ আমার শ্যামগুণগান।"

এত দিন দেবদেবী কি, আমি বুঝিতাম না। রাধাকৃষ্ণ কিরূপ ছিলেন, বুঝিতাম না। যে দিন তোমাকে ও মাকে দেখিলাম, সেদিন বুঝিলাম, দেব দেবী কি, রাধাকৃষ্ণ কি! বৈরাগী পিতা আমাকে একটি ক্ষুদ্র বালগোপাল দিয়াছিলেন। আমি উহাকে বুকে বুকে রাখিতাম, এখনও রাখি। পিতা হাসিয়া আমাকে তাই যশোদারাণী বলিয়া ডাকিতেন। বেদের পুত্র গোপালকে পাইয়া মনে করিতাম, বালকৃষ্ণ বুঝি এইরূপ ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও যেন তৃপ্তি পাইতাম না। যে দিন অমিয়কে বুকে পাইলাম, সে দিন বোধ হইল, আমি প্রকৃতই বালগোপালকে পাইলাম। আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। কিন্তু তাহাকে পাইতে পাইতে হারাইলাম। আমি রাজ্য লইয়া কি করিব? এখন যে পাথরের বালগোপালটি আমার বুকে আছে, আমি উহাকে আমার সেই হারাণ গোপাল ও অমিয় বলিয়া জানি। তাহারাই কালে সেই যশোদার দুলালকে আমার বুকে আনিয়া দিবে। তুমি যে ছয় রসের ব্যাখ্যা করিয়াছ, আমি তাহার মধ্যে বাৎসল্য রসটি বুঝিয়াছি। উহাতে প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

আজ তুমিও আমার চক্ষে সেই বালগোপাল। আমি তোমার যশোদা মা। তুমি যখন আমাকে বুকে লও, আমি সেই যশোদার ভাবে বিভোর হই। তবে তুমি এত স্নেহে যখন এই রাজ্য দান করিয়াছ, তখন আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। গ্রহণ করিলাম। গুরুদেব পুরী গোস্বামী আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন। আমার অমিয়কে লইয়া তাঁহার কাছে আদিনাথে গিয়াছিলাম। তিনি কলেবর পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, আমাকে বাঁচাইয়াছিলেন, আমার দ্বারা কোন মহৎ কার্য হইবে বলিয়া। অমিয়কে বাঁচাইলেন না; বলিলেন, তাহার দ্বারা সে কার্য্যের বিঘ্ন হইবে। সেই মহৎ কার্য্য কি, আমি যেন এত দিনে বুঝিতেছি। এই বিপুল রাজ্যের আয়ের দ্বারা একটি ভাণ্ডার গঠিত হইবে। তাহার নাম হইবে 'অনাথ-ভাণ্ডার।' উহা পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া নিম্নলিখিত বিষয়ে নিয়োজিত হইবে।

১। যে সকল তীর্থধাম মোহন্তদের পাপাচরণে বিনষ্ট হইতেছে, তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল তীর্থের উদ্ধার ও রক্ষা করিতে হইবে।

২। কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীকে বৃত্তি দিয়া পূর্ব্ববৎ টোল স্থাপন করিতে হইবে, এবং পতিত ব্রাহ্মণদিগকে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগের মত স্বতন্ত্র করিয়া দিয়া, একটি প্রকৃত ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং ইহাদের দ্বারা যাহাতে গ্রামে গ্রামে পূর্ব্ববৎ পঞ্চায়ত সৃষ্ট হইয়া গ্রামের শান্তিবিধান হয়, এবং স্বদেশীয় শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। যাহাতে অন্য শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে, বালক-বালিকাগণের জন্যে সেইরূপ কয়েকটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

৪। এই পুরীতে সেইরূপ দুটি প্রধান টোল ও বিদ্যালয়ই তোমার ও জননীর নামে স্থাপিত হইবে, এবং 'অনাথনাথ' ও 'রাজরাজেশ্বরী' নামে তোমাদের হরগৌরী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া সমারোহে পূজিত হইবে, এবং ভোগের দ্বারা দরিদ্রের ও অতিথি সন্ন্যাসী ও আতুর নিরন্নের সেবা হইবে।

৫। আদিনাথের পশ্চিমে সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে আমার গুরুদেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার আদেশমতে সেই পবিত্র স্থানে মহামহীরূহ অশ্বত্থের ছায়ায় আমার অমিয়কে গুরুদেবের চরণকমলতলে রাখিয়া আসিয়াছি। সেখানে 'অমিয়গোপাল' নামে একটি বালগোপালমূর্ত্তি একটি সুন্দর মন্দিরে স্থাপিত হইবে, এবং 'অমিয়াশ্রম' নামে আদিনাথ-শৈলশ্রেণীর উপর একটি সুন্দর আশ্রম স্থাপিত হইবে। উহা ঠিক ভারতের পূর্ব্বকালীন আশ্রমের মত হইবে, যেন সাধু, বৈরাগী, সন্ন্যাসীরা সেই মনোহর শৈলাশ্রমে তপস্যা করিতে পারেন। সেখানে একটি টোল ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে, এবং পূজার ভোগের দ্বারা দরিদ্র ও তপস্বীদের সেবা হইবে। সমুদ্রপ্লাবনের সময় দ্বীপবাসীরা সেই আশ্রমে আশ্রয় পাইবে, এবং সেই 'অমিয়-ভাণ্ডার' হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য পাইবে। সেই আশ্রমের মন্দিরে তোমার ও জননীর প্রতিকৃতি থাকিবে।

বাবা! তোমার আমার জন্যে কিছুই রাখিলাম না। আমরা পিতাপুত্রীর,—মাতাপুত্রের, —আশ্রয়ের স্থান শ্রীভগবানের চরণাম্বুজ। আমি সেই আশ্রয়ে চলিলাম। তুমিও আসিও। বদরিকাশ্রমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণতলে উভয়ে আবার মিলিত হইব। তপস্যা সিদ্ধ হইলে পিতাপুত্রী 'অমিয়াশ্রমে' আসিয়া তাহার দেহমৃত্তিকার সঙ্গে আমাদের দেহমৃত্তিকা মিশাইব।

তোমার স্নেহের কন্যা

"ভানুমতী।"

অনাথনাথ পত্রখানি একবার, দুইবার, বহুবার পড়িলেন। পড়িতে পড়িতে অশ্রুতে পত্রখানি সিক্ত হইল। শেষবার পাঠ সমাপন করিয়া বলিলেন, "মা! তাহাই হইবে। তুই প্রকৃত মায়ের কাজ করিলি, তোর এই পতিত পুত্রকে উদ্ধার করিলি।" তিনি জেলার কালেক্টরকে পত্র লিখিলেন, "আমার সমস্ত বিষয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিলাম। দেশের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা একটি সমিতি গঠিত হইবে, এবং তাহাদের অধিকাংশের মতে একজন সাধু কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োজিত হইয়া আমার কন্যা অমিয়া (প্রকাশ ভানুমতীর) পত্রের লিখিত অনুষ্ঠানে আমার সম্পত্তির বার্ষিক আয় ব্যয়িত হইবে। 'অমিয়াশ্রমে' ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার বক্ষে 'অমিয়গোপাল' মূর্ত্তি সন্নিবেশিত করিতে হইবে, এবং মা আমার যশোদা-রূপে পূজিতা হইবেন।"

কক্ষে আলনার উপর ভানুমতীর দুইখানি গৈরিক বসন ছিল। ভানুমতী রাজনন্দিনী হইয়াও বৈরাগীর বসন ত্যাগ করে নাই। একখানি পরিধেয় ও আর একখানি উত্তরীয় সঙ্গে করিয়া সেই বিপুল রাজ্যের অধিকারী অনাথনাথ পথের ভিখারী হইলেন।

সমাপ্ত।

প্রবাসের পত্র

ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

(পাঠ = প্রথম সংস্করণ, ১২৯৯)

উৎসর্গ

যাঁহার উদ্দেশে প্রবাস হইতে
পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল,
তাঁহার নামে এই

প্রবাসের পত্র

উৎসর্গ করা হইল।

বিজ্ঞাপন

প্রবাসের পত্রের অধিকাংশ আমার 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত হইল। পুণা, দণ্ডকারণ্য ও ভারতরমণীর চিত্র, এই তিনখানি পত্র নূতন প্রকাশিত হইল।*

কবিবর নবীন বাবু, আমার অনুরোধে, পত্রগুলি মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়াছেন। সাধারণের জন্য পত্রগুলি লিখিত হয় নাই। নবীন বাবু ভ্রমণ-উপলক্ষে যেখানে যাইতেন, সেখান হইতে সহধর্ম্মিণীকে পত্র লিখিতেন। পত্রগুলিও তাড়াতাড়ি লেখা, হয়ত রেলওয়ে ষ্টেশনে ট্রেণের অপেক্ষায় বিশ্রামগৃহে বসিয়া আছেন, এবং পত্র লিখিতেছেন। তবু পত্রগুলি মনোরম হইয়াছে। 'সাহিত্যে'র অনেক পাঠক প্রবাসের পত্রের প্রশংসা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রবাসের পত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল; আশা আছে, সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

২রা আশ্বিন।
১২৯৯।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
প্রকাশক।

* বর্তমান দত্তচৌধুরী-সংস্করণে "হরিদ্বার" বিষয়ক আরও একটি নূতন পত্র সংযোজিত হল। অসাবধানতা-বশতঃ যথাসময়ে মূল-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট না হওয়ায়—"বহুদিনের লিখিত এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত"—সুদীর্ঘ সতের বছর বাদে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৬) প্রচারিত হয়েছিল।—সম্পাদক।

দার্জ্জিলিঙ্গ।

ঈশ্বরের কৃপায়, আমার এই বিপদ্‌সঙ্কুল জীবনের একটি সুখস্বপ্ন অংশতঃ সফল হইল,—আমি দার্জ্জিলিঙ্গ দেখিলাম। সেই মহিমার মূর্ত্তি হিমাচল দেখিলাম। বাল-সূর্য্য-কিরণে প্রদীপ্ত, তপ্তকাঞ্চনাভ কাঞ্চনশৃঙ্গ দেখিলাম, জগতে বুঝি এমন মহান দৃশ্য আর নাই! হিমাদ্রি পার্শ্ব ও সানুস্থিত, শৈবিমালায় পুষ্পিত, শীতল-পাদপ-শ্রেণীতে উপবনী-কৃত, দার্জ্জিলিঙ্গের মনোহারী চিত্রখানি নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। ততোধিক সুখের কথা, আমার শৈশবসুহৃদ্ অভিন্নহৃদয়, সহৃদয়তায় কামিনী-কোমল, উমেশকে দেখিলাম। আর দেখিলাম তাহার উমাকে! স্বামী উমেশ, ভার্য্যা কেদার-কামিনী! "অখণ্ডপুণ্যানাং ফলমিব" না হইলে, বোধ হয় পতি এমন পত্নী, ও পত্নী এমন পতি লাভ করিতে পারেন না।

শৈশব হইতে প্রকৃতির মহাপ্রদর্শনভূমি পার্ব্বতী-মাতার (চট্টগ্রাম) অঙ্কে যে বিরাজ করিয়াছে, দার্জ্জিলিঙ্গে তাহার পক্ষে দেখিবার অভিনব দৃশ্য তত কিছুই নাই। গিরিপার্শ্ব-বাহী 'রেলওয়েটি' যেরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া,—স্তরে স্তরে, পর্ব্বতের পাদমূল হইতে ঊর্দ্ধে মেঘমালা ভেদিয়া উঠিয়াছে, নগরাজ যেন বক্ষে স্তরে স্তরে উপবীত ধারণ করিয়াছেন,—উহাই কেবল দেখিবার যোগ্য। স্থানে স্থানে যখন মেঘজাল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিলাম, তখন স্থানে স্থানে নীচে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। জগৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল! কেবল হিমাদ্রি, আকাশের সীমা দেখাইয়া, হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও আতঙ্ক জন্মাইতেছিল। আর দেখিবার যোগ্য প্রভাত-অরুণালোকে সুবর্ণমণ্ডিত কাঞ্চনশৃঙ্গ বা কাঞ্চন-জঙ্ঘা।

উমেশের উমা সম্বন্ধে আর দু'চার কথা না লিখিলে, তুমি বিরক্ত হইবে। হিমালয়ের অঙ্কে, উমা-উমেশ-শোভা, এই শরৎকালে সন্দর্শন, আমি আমার জীবনের একটি প্রকৃত দুর্গোৎসব বলিয়া চিরদিন মনে রাখিব। দার্জ্জিলিঙ্গ আজ আমার চক্ষে একটি পুণ্যতীর্থ। ঠাকুরাণীটিকে দেখিতে প্রথম আমাদের মধু বাবুর ফুলেশ্বরীর মত বোধ হয়। কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে, এ ফুলেশ্বরী সম্বন্ধে বলিতে হয়,—

"ওরে প্রিয় ফুল তুলনা যে নাই,
কি দু না দিব?
মিছে কি বলিব?
অতুলন তোরে বলিছে সবাই।"

এ ফুলেশ্বরীর গাম্ভীর্য্যমাখা ঈষৎ হাসিটুকু,—জ্যোৎস্নার কোলে ঈষৎ বিজুলী সঞ্চার,—মধুমাখা স্নেহটুকু, বৈশাখী জ্যোৎস্নার অমৃতভরা ভাবটুকু, বুঝি সেই ফুলেশ্বরীতে নাই। তাঁহার অঙ্কে দুইটি পুত্র কুসুম বিরাজিত। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, তাহারা দীর্ঘ-জীবী হইয়া মাতার উজ্জ্বল মুখ আরো উজ্জ্বল করুক! আমারও দুই বন্ধুর অদৃষ্ট সমান। আর একটি পুত্র অঙ্ক শূন্য করিয়া, মাতার ঐ দেবীমূর্ত্তিতে বিষাদের ছায়া মাখাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। পতি-পত্নীর ভালবাসায় আজ দার্জ্জিলিঙ্গ আমার চক্ষে যথার্থই কৈলাস,—দুইটি দিন স্বর্গসুখে অতিবাহিত করিতেছি।

বৈদ্যনাথ।

পথে কয়েক ঘণ্টা কাল বৈদ্যনাথে ছিলাম। শ্রীক্ষেত্র যে দেখিয়াছে, তাহার কাছে বৈদ্যনাথে দেখিবার কিছুই নাই। শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের অনুকরণে একটি প্রাঙ্গণ। মধ্যস্থলে একটি মন্দিরে বৈদ্যনাথ। বলিতে হইবে না যে, তিনি লিঙ্গরূপী। প্রাঙ্গণের চারি দিকে,

মন্দিরে নানা দেব দেবী। অধিকাংশই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, যেখানে বুদ্ধ-মূর্ত্তি কোনও মতে লুকাইবার যো নাই, সেখানে তাঁহার নাম "কাল-ভৈরব" হইয়াছে। বৈদ্যনাথ, দেওঘর বা দেবঘর, অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমার তত ভাল লাগিল না।

বৈদ্যনাথে, "অমৃতবাজার পত্রিকা"র সম্পাদক শিশির বাবু ও তাঁহার সহোদর মতি বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইঁহারা যশোহরের বন্ধু—বেশ আদর করিলেন। প্রাতে তাঁহারা আহার করাইলেন। সেই ঘোরতর ব্রাহ্ম দুই ভাই এখন ঘোরতর বৈরাগী ; এখন প্রত্যহ তাঁহারা পূজা আহ্নিক করেন। কলিকাতা ছাড়িয়া, শিশির বাবু বৈদ্যনাথে আশ্রমবাসী হইয়া, সস্ত্রীক নির্জ্জনে থাকেন। দেখিলাম,—আমার জীবনের সেই স্বপ্ন, শিশির বাবু কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী রাঁধেন, তিনি পার্শ্বে বসিয়া "অমৃতবাজারের" সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। বৈরাগ্য এত দূরে যে, ঘরে বসিবার আসন খানি পর্য্যন্ত নাই। খবরের কাগজ বিছাইয়া বসিয়া, অতি তৃপ্তির সহিত, তিন জনে আহার করিলাম। তাঁহারা এক জন বৈরাগী সঙ্গে রাখিয়াছেন। তিন জনে মিলিয়া, বৈষ্ণব কবিদিগের সেই কবিতা গাইলেন। কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইল, হৃদয় গলিয়া গেল, চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ভায়ে ভায়ে মিলিয়া এ কীর্ত্তন, আমি ত জীবনে ভুলিব না। বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতায় কি যে প্রেমামৃত আছে, তাহা যত পান করা যায়, কিছুতেই পিপাসা মেটে না। তাঁহারা গাইলেন,—

"দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তোমারে নয়নে দেখি,
বেড়াইয়া ভুজলতা হৃদয়ে হৃদয়ে রাখি।"

প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। সেই অবস্থায় দেওঘর ছাড়িলাম।

প্রয়াগ।

"স্থানীয় ন্যাশন্যাল কংগ্রেস্" সভার দুইটি অধিবেশন দেখিতে গিয়াছিলাম। কোট্-হ্যাট্-ধারী বাঙ্গালী দাঁড়কাকগুলির মধ্যস্থলে,—মরি! মরি!—কি একটি মূর্ত্তি দেখিলাম। মাথায় উষ্ণীষ, গলায় উড়ানি, গায়ে চাপকান, পরিধানে ধুতি। ইঁহার নাম—মদনমোহন মালবী। এই ত জাতীয় বেশ। কিন্তু যখন লোকটি কথা কহিতে লাগিলেন, আমার ভ্রম হইল, পশ্চাৎ হইতে বুঝি খ্যাতনামা ডব্লিউ, সি, বনার্জ্জি,—হায় রে বাঙ্গালী নামের দুর্গতি—ইংরাজি বলিতেছেন। লোকটির প্রতি আমার বড় শ্রদ্ধা হইয়াছিল। কাল হরি-মোহনকে সঙ্গে করিয়া, তাঁহাকে দেখিতে যাই। তিনি হরিমোহনদের সহপাঠী ছিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল দুই জনে আলাপ করিলাম, যেন দুই জনের প্রাণে প্রাণে মিশিয়া গেল। ইঁনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে পারদর্শী। তাহা ছাড়া অন্য অন্য ভাষাও জানেন ; বাঙ্গালা পর্য্যন্ত বুঝেন। আমার নাম পূর্ব্বে জানিতেন। তিনি স্বধর্ম্মাবলম্বী, সাহিত্যানুরাগী, স্বদেশের ও স্বজাতির মঙ্গলের জন্য সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে প্রস্তুত। আমি যখন গীতার উল্লেখ করিলাম, তিনি আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, তিনি প্রত্যহ প্রাতে এক অধ্যায় গীতা পাঠ করেন। আমাদের উভয়ের হৃদয়ের গতি এক। সেই মহাভারতীয় মহানীতিচক্র কেন্দ্রস্থলে যেমন মদনমোহন, পশ্চিম ভারতের বর্ত্তমান নীতি-যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে—তেমনই এই মদনমোহন। ইংলণ্ডের "ওকবৃক্ষ"—অতিশয় সারবান বৃক্ষ, কিন্তু ভারতের চন্দনবৃক্ষের সৌরভ তাহাতে নাই। আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি যে, আমি তাঁহাতে ইংলণ্ডের "ওকের" সারবত্তার সঙ্গে, ভারতের চন্দনের সুগন্ধ দেখিবার প্রত্যাশা করি।

আজ আমি কানপুরে। সৌজন্যতার প্রতিমূর্ত্তি, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কানপুরের খ্যাতনামা ডাক্তার, আমাকে ষ্টেশন হইতে সাদরে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া আসেন। তিনি দাসত্ব-শৃঙ্খল চরণে ঠেলিয়া, এখানে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতেছেন, কানপুরে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহের নিম্নতল ডাক্তারখানা, উপরের প্রকোষ্ঠ সকল আবাসগৃহ। ডাক্তারখানা শুনিয়া তুমি হয় ত কেষ্টার-অয়েল, চিরতা ও কুইনাইন মনে করিয়া নাক সিট্‌কাইতেছ। এ তাহা নহে, মহেন্দ্র বাবুর ডাক্তারখানা একটি ক্ষুদ্র ইন্দ্রালয়।। এমন সুন্দর সুসজ্জিত বাঙ্গালীর ডাক্তারখানা কোথাও দেখি নাই। ডাক্তারখানার মধ্যে তাঁহার বসিবার কক্ষটির গবাক্ষ সকল সুরঞ্জিত চিত্র দৃশ্যাবলির দ্বারা সুসজ্জিত! কক্ষের প্রাচীরে চীনদেশীয় নরনারীর বিচিত্র চিত্র শোভিতেছে! কক্ষস্থিত দ্রব্যাদি ঝক্ ঝক্ করিতেছে! তাঁহার সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপের পর এতদূর সমপ্রাণতা হইয়াছে, এবং তিনি এত আদর করিতেছেন যে, আমার কানপুর ছাড়িতে ইচ্ছা করিতেছে না।

অদ্য প্রাতে কানপুর পরিদর্শনে বাহির হই। প্রথমতঃ গঙ্গার পয়ঃপ্রণালী দর্শন করিয়া নয়ন তৃপ্ত করি। হরিদ্বারে গঙ্গার গর্ভে বাঁধ দিয়া একটি জল-স্রোত সোপানে সোপানে উর্দ্ধ হইতে এই কানপুরে আসিয়া আবার গঙ্গায় পড়িয়াছে। জগৎপ্রাণ হইতে যেন একটি মানব-জীবন-স্রোত উৎপন্ন হইয়া, আবার জগৎ-প্রাণ-গর্ভে বিলীন হইয়া, যাইতেছে। এক সোপান হইতে সোপানান্তরে জলরাশি গর্জ্জন করিয়া শ্বেত-কুসুম-নিভ ফেনমালায় বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, সে দৃশ্য অতি সুন্দর! তবে তুমি যখন উড়িষ্যার 'কেনাল' দেখিয়াছ, তখন তোমার ইহা তত নূতন ও চমৎকার বলিয়া বোধ হইবার কথা নহে। এই 'কেনেলের' স্রোতোবেগে পরিচালিত হইয়া, স্থানে স্থানে যে সকল ময়দার কল চলিতেছে, তাহা কিন্তু তুমি দেখ নাই।

কৃষ্ণের একটি মধুমাখা নাম 'কানাই' বা 'কান', তাহা তুমি জান। বোধ হয়, 'কান' হইতেই এ স্থানটির নাম কানপুর হইয়াছে। এরূপ পবিত্রস্থান আজ একটি শোকসিন্ধু। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে যেরূপ নৃশংস দৃশ্য সকল এখানে অভিনীত হইয়াছিল, এমন আর কোথাও হয় নাই। বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে, স্থানীয় ইংরাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ যে স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া একবিংশতি দিবস অতুল সাহসে বিদ্রোহীদিগের প্রতিকূলে আত্মরক্ষা করেন, সে স্থানটি আজ একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান। তাহার মধ্যস্থলে, উচ্চ সৌধ-চূড়ায় শোভিত, কারুকার্যশোভিত—একটি গির্জ্জা! তাহার প্রাচীরে শ্বেত ও কৃষ্ণ মর্ম্মর প্রস্তরে, আত্মরক্ষায় যাঁহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহাদের আত্মীয় ও সহযোদ্ধারা, তাঁহাদের স্মরণলিপি লিখিয়া রাখিয়াছেন। মাতা পিতা পুত্রের জন্যে কাঁদিতেছেন, ভগিনী ভ্রাতার জন্যে কাঁদিতেছেন, অনাথিনী বিধবা পতির জন্যে কাঁদিতেছেন। এ সকল শোকলিপি পড়িবার সময়ে, অশ্রুসংবরণ বড় কঠিন হইয়া পড়ে। একজন সৈনিক, দুর্গা-বদ্ধ, প্রপীড়িত ও পিপাসাতুর রমণী ও শিশুদের জন্যে, পার্শ্বস্থিত কূপ হইতে জল আনিতে গিয়া, আহত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হন। তাঁহার শোকলিপির নিম্নে একটি কৃত্রিম কূপ গির্জ্জার মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার পবিত্র জলে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়া থাকে। আমার ইচ্ছা হইল, এই আত্মবিসর্জ্জনের পবিত্র সলিলে দীক্ষিত হইয়া জীবন সার্থক করি। বেদীর ঊর্দ্ধে গবাক্ষ শ্রেণীতে নানাবর্ণের কাচে খৃষ্ট-জীবনের নানাবিধ দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। অথচ আমরাই পৌত্তলিক! কেন্দ্র-স্থলে মহর্ষি খৃষ্টের ক্রুশে মৃত্যুর সেই শোকাবহ দৃশ্য চিত্রিত রহিয়াছে। এমন পবিত্র শোকচিত্র বুঝি আর নাই। চিত্রতলে একটি শ্বেতপ্রস্তরের ক্রুশ, তিনটি রক্তবর্ণ রত্নে খচিত

হইয়া শোভা পাইতেছে। গিৰ্জ্জার বাহিরে একটি সুন্দর সমাধি। যে সকল ইংরাজেরা কানপুরের শেষ যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অস্থিরাশি এখানে প্রোথিত রহিয়াছে। যে কূপ হইতে উক্ত সৈনিক জল আনিতে গিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে প্রাণত্যাগ করেন, সে কূপটি এখনও সেইরূপ অবস্থায় আছে! তাহার দুই স্থানে এখনও তোপের গোলার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে।

২১ দিবস যুদ্ধের পর, ইংরাজগণ অনাহারে ও যুদ্ধের উপকরণ অভাবে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে, বিদ্রোহনায়ক নানার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। নানা তাঁহাদিগকে লক্ষ্ণৌ যাইবার অনুমতি দিলে, তাঁহারা নৌকারোহণ করিবামাত্র, বিদ্রোহিগণ তীর হইতে গোলাগুলি বর্ষণ করিয়া, সমস্ত তরণী দগ্ধ ও জলমগ্ন করিয়া দেয়। যে ঘাটে তাঁহারা নৌকায় উঠেন, তদবধি উহা "বধঘাট" বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। এই ঘাটে শিব-শূন্য একটি মন্দির এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। মানুষ যখন হিংসাপ্রণোদিত হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, তখন এরূপ পবিত্র স্থান,—মাতা ভাগীরথীর বক্ষ পর্য্যন্ত কলুষিত করিতে শঙ্কিত হয় না। মানুষ-পশুর মত এমন হিংস্র পশু জগতে নাই। এই বধঘাটে দাঁড়াইয়া আমার বোধ হইল, যেন আমি সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য নয়নে দেখিতেছিলাম। সেই শত শত নর-নারীর ও সুকুমার শিশুর রোদননিনাদে যেন পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর বক্ষ প্লাবিত করিয়া, আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। পার্শ্বে রজকেরা সারি বাঁধিয়া কাপড় ধুইতেছিল। আমি ভাবিতেছিলাম, ভারতমাতার বক্ষ হইতে কি কেহ এ কলঙ্ক এইরূপে ধুইয়া ফেলিতে পারে না?

সেখান হইতে সৈন্যনিবাসমালা অতিক্রম করিয়া, 'সবেদা কুঠি' দেখিতে যাই। এটি নানার কানপুরস্থ আবাস-গৃহ ছিল। গৃহটি এখন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহার পার্শ্বে, বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজদের কানপুরের শেষ যুদ্ধ হয়। তিন দিক হইতে তিন জন খ্যাতনামা সৈন্যাধ্যক্ষ আক্রমণ করিলে, ত্রিবেণীর তরঙ্গতাড়িত তৃণরাশির ন্যায়, সেন্যাধ্যক্ষ-বিহীন বিদ্রোহীরা গঙ্গার সেতু বাহিয়া পলাইতে আরম্ভ করে। তখন প্রতিহিংসা-মত্ত ইংরাজেরা তোপের দ্বারা সহস্র সহস্র নর-নারীকে জলমগ্ন করিয়া নিহত করেন। কেবল এক পক্ষেই নৃশংসতার অভিনয় হয় নাই।

তাহার পর, মহেন্দ্র বাবু স্বয়ং আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া, কানপুরের শীর্ষঘাট দেখান। ইহাতে এক দিকে পুরুষ ও অন্যদিকে স্ত্রীলোকের স্নান করিবার স্থান নির্দ্ধারিত রহিয়াছে। অসংখ্য নর-নারী—আজ একাদশী—গঙ্গায় অবগাহন করিতেছিল। তুমি, কাশীর ঘাট দেখিয়াছ। কানপুরের শীর্ষঘাট তাহার কাছে অতি ক্ষুদ্র হইলেও, দেখিতে অতি সুন্দর। সম্মুখের মিউনিসিপাল উদ্যানের উপর দিয়া ঘাটের খিলান-শ্রেণী দেখিতে অতি সুন্দর।

তাহার পর যাহা দেখিলাম, তাহা এ জীবনে ভুলিব না। একটি গৃহে আবদ্ধ করিয়া, অসংখ্য নর-নারী ও শিশুগণকে নানাসাহেবের অনুচরেরা বধ করিয়া, হত ও আহত অবস্থায়, তাহাদিগকে পার্শ্বস্থিত একটি কূপে নিক্ষেপ করে। গৃহটি এখন নাই। এরূপ পাপচিহ্ন না থাকাই ভাল। তাহার স্থানে একখানি মার্ব্বেল-ফলক মাত্র আছে ; তাহার বক্ষে 'বধ-গৃহ' এই কথাটি মাত্র লেখা আছে। আর যে কূপে হত ও আহতদের নিক্ষেপ করিয়াছিল, তাহার উপর কি বিষাদময়ী মূর্ত্তিই স্থাপিত হইয়াছে! একটি অনিন্দ্যসুন্দরী, শ্বেত-প্রস্তরনির্ম্মিতা যুগলপক্ষবিশিষ্টা স্বর্গীয় দেবী, বক্ষের উপর হস্ত রাখিয়া, করে দুইটি তালের অস্ফুট শাখা ধরিয়া, অধোবদনে কূপের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন! মূর্ত্তিটি জীবন্ত শোক! দেখিলে হৃদয়ে কি শোক, কি পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়, তাহার ভাষা বুঝি নাই। চারি দিকে উচ্চ প্রস্তরের "রেলিংয়ের" মধ্যে মূর্ত্তিটি রক্ষিত হইয়াছে। মহেন্দ্র বাবুর কৃপা ভিন্ন আমি উহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। সমস্ত স্থানটি

ব্যাপিয়া, এখন একটি বিস্তৃত, পুষ্পবৃক্ষশোভিত উদ্যান। এমন হৃদয়স্পর্শী স্থান বুঝি আর জগতে নাই!

লক্ষ্ণৌ।

১

কাল সকালের ট্রেণে লক্ষ্ণৌ গিয়া, একজন ইংরাজের হোটেলে ছিলাম। তাঁহাকে আড়কাটি করিয়া, কাল সমস্ত দিন, নগর দর্শন করিয়াছিলাম। আজ আবার মহেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে পত্র লিখিলাম।

ভগবান্ বিশ্বরূপ, তাঁহার বিশ্বও বহুরূপী। কাল, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাহার রূপান্তর করিতেছে। রামচন্দ্রের রাজ্যের নাম কোশল ও রাজধানীর নাম অযোধ্যা ছিল। কালে, রাজ্য ও রাজধানী, উভয়ই মোগল-সাম্রাজ্যের ছায়ায় বিলীন হইয়া যায়। ক্রমে, সেই মোগল-সাম্রাজ্যে কালের ছায়া পতিত হইলে, রামরাজ্যে যিনি দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন, তিনি তাঁহার মস্তকোপরি স্বাধীনতার ছত্র উড়াইলেন। তাঁহার রাজ্যের নাম হইল অযোধ্যা, রাজধানী লক্ষ্ণৌ। তাঁহার রাজপ্রাসাদশিরে, স্বর্ণছত্র উড়াইয়া, তাহার নাম রাখিলেন "ছত্র-মঞ্জিল।" কালে আবার বৃটিশসিংহ কবলে করিয়া, সেই ছত্রধারীকে 'মেটিয়াবুরুজে' বন্দী করিয়া রাখিলেন,—তিনি সেই কারাগার হইতে 'লক্ষ্ণৌ টপ্পায়' কাঁদিলেন! ভারত কাঁদিল, সেই হৃদয়দ্রবকারী শোক-সঙ্গীতে চিরদিন কাঁদিবে। বন্দী ওয়াজিদ আলি সাহার মৃত্যু হইয়াছে; তাঁহার সকল যন্ত্রণার শেষ হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ সুহর, আজ অযোধ্যার নবাবদিগের সমাধিমাত্র। কালে সেই রাজ্যের নাম হইয়াছে "আউড্" রাজধানীর নাম "লখ্নাও"। ভারতব্যাপী বৃটিশ-ছত্রের ছায়াতে "ছত্র-মঞ্জিলের" ছত্র বিমলিন হইয়া লুকাইয়া গিয়াছে।

সিপাহি-বিদ্রোহের সময়ে লক্ষ্ণৌও একটি কেন্দ্রস্থান হইয়াছিল! চারি দিক্ হইতে সহস্র সহস্র বিদ্রোহী লক্ষ্ণৌতে সমবেত হইয়া, যে স্থানে ইংরাজ-প্রতিনিধি বা 'রেসিডেন্ট' বাস করিতেন, তাহা আক্রমণ করে। এই আবাসস্থানের নাম "রেসিডেন্সি।" স্বল্প সৈন্য এবং এ অঞ্চলের ইংরাজ নরনারী সমবেত হইয়া, ছয়মাস কাল এ স্থান রক্ষা করেন। তাহার পর, বহির্ভাগ হইতে ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া, বিদ্রোহীদিগকে পরাজয় করিয়া, তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে। এই ছয় মাসের দারুণ অবরোধের ইতিহাস, স্থানটির অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। তোপের গোলাঘাতে সমস্ত গৃহাদির ছাদ ধসিয়া গিয়াছে। যে সকল দেওয়াল এখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহাও তোপের ও বন্দুকের গোলা গুলিতে বাহির দিক্ বোলতার বাসার মত হইয়াছে। ভিতরের দিক্ নর-শোণিতে রঞ্জিত রহিয়াছে। স্ত্রীলোক-দিগকে মাটির ভিতরে 'তয়খানাতে' রাখা হইয়াছিল। তাহার ভিতর পর্য্যন্ত একটি গোলা গিয়া, একটি রমণীর মস্তক উড়াইয়া লইয়া যায়! সেই গোলার দাগ, রমণীর শোণিতচিহ্ন, এখনও দেয়ালে আছে। ইংরাজ জাতির মধ্যে 'হেনরি লরেন্সের' মত দেবতুল্য ব্যক্তি ভারতে কখন আইসেন নাই। তাঁহার হৃদয় ভারতের দুঃখে নিরন্তর দুঃখী ছিল তাঁহার মত-অনুসারে রাজ্য পরিচালিত হইলে, বিদ্রোহ ঘটিত না। তিনি লক্ষ্ণৌ হইতে পলায়ন করিলে, আজ ভারতে ইংরাজ থাকিত কি না, সন্দেহ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি 'রেসিডেন্সি' ছাড়েন না। যেখানে তিনি আহত হন, যেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়, উভয় স্থান এখনও চিহ্নিত রহিয়াছে। তাঁহার সমাধির উপর এই কয়েকটি কথা লেখা আছে—"এখানে সার হেনরি লরেন্স নিদ্রা যাইতেছেন, যিনি আপন কর্ত্তব্য সাধন করিতে যত্ন করিয়াছিলেন।" কি হৃদয়গ্রাহী কথা! গৃহ সকল সেইরূপ ভগ্ন অবস্থায় রক্ষিত হইয়াছে। স্থানটি একটি উৎকৃষ্ট উদ্যানে পরিণত করা হইয়াছে। তাহার বৃক্ষচ্ছায়ায় কত বীর ও বীরাঙ্গনা নিদ্রা যাইতেছেন।

পত্রখানি এই পর্য্যন্ত লেখা হইবার পর, মহেন্দ্রবাবু বাড়ী ফিরিয়া আইসেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হন ; সুতরাং আর লেখা হইল না ; পর দিবস বিঠুর যাই, সায়াহ্নে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আবার কানপুরে ফিরিয়া আসি। কাল কানপুর হইতে রওনা হইয়া, এইমাত্র ১৯এ মে' তারিখে ১টার সময়ে, হরিদ্বার পঁহুছিয়াছি। কাল রাত্রি হইতে আহার হয় নাই। এ দিকে আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানেও কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীর মেলা হইয়া থাকে। পথে ঘাটে ভারতবর্ষের নানা স্থানীয় কুসুমরাশি ফুটিয়া যেমন মন মোহিত করিতেছে, অন্যদিকে, বাড়ী ঘর সকল এত অপরিষ্কার করিয়াছে যে, এক মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না। অতি কষ্টে, একটি বাড়ীর ত্রিতলে, একটি অষ্টকোণ পায়রার খোপ-বিশেষ কক্ষ পাইয়াছি। নিম্নে সুনীলা ক্ষীণ-কলেবরা মাতর্গঙ্গা, কুলু কুলু রবে বহিয়া যাইতেছেন, সংখ্যাতীত নরনারী তাহাতে অবগাহন করিতেছে। অপর পারে হিমাচল, নাট্যশালার যবনিকার মত শোভা পাইতেছেন। শরীর অবসন্ন, হৃদয়ও তোমাদের পত্র না পাইয়া ডুবিয়া রহিয়াছে ; অতএব এইখানেই শেষ করিলাম। লাহোরে পঁহুছিয়া. লক্ষ্ণৌ, বিঠুর ও হরিদ্বারের বর্ণনা করিয়া, দীর্ঘ পত্র লিখিব।

লক্ষ্ণৌ।

২

আজ আবার লক্ষ্ণৌর কথা লিখিব। কিন্তু কি লিখিব? লক্ষ্ণৌ মুসলমানদের শোকসিন্ধু। রেসিডেন্সির কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। তাহার পার্শ্বেই কিঞ্চিৎ দূরে 'কেশরবাগ'। একটি প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ কল্পনা কর। তাহার চারি পার্শ্বে সারি সারি দ্বিতল ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহশ্রেণী। স্থানে স্থানে গোল ও অন্যবিধ বারাণ্ডা বাহির হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অতি পরিপাটী একতল গৃহ। বিস্তৃত খিলানাবলীর উপর সুরঞ্জিত ছাদ, সারি সারি শোভা পাইতেছে। ইহার নাম 'বারদ্বারী'। ইহার চারি দিকে পুষ্পোদ্যান। একদিকে ভগ্ন স্নানের 'হামাম', অন্যদিকে একটি জলপ্রণালী, তাহার উপর এক পোল। চারি দিকের অট্টালিকাতে শেখ নবাব ওয়াজিদ আলি সাহার ৩৫০ কি ৪০০ পত্নী থাকিতেন। তাহাদিগকে লইয়া, নবাব এই 'কেশরবাগে" রাস, দোল ইত্যাদি জীবন্ত লীলা করিতেন। ইহাতে স্ত্রীলোক ও নপুংসক ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। এক এক কক্ষে এক একটি অতুলনীয়া রূপসী। পৃথিবীর যত স্থান রমণীর পুষ্পোদ্যান বলিয়া খ্যাত, সর্ব্বত্র হইতে এ ফুল রাশি, নবাব বাহাদুরের ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য সঞ্চিত হইত। যখন 'কেশর-বাগের' পুষ্পোদ্যানে রমণীগণ প্রভাতে ও সায়াহ্নে বিচরণ করিতেন, মনে কর দেখি, তখন ফুলের সঙ্গে জীবন্ত ফুল মিশিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই হইত। কিন্তু ইহাদের অনেকের সঙ্গে পতি-প্রবরের জীবনে এক দিনও সাক্ষাৎ হইত কি না, সন্দেহ। আমি ২।৪টি প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম। এক একটি কক্ষ. সম্মুখে একটুকু বারাণ্ডা। আমার কাছে স্থানটি বড় আরামের কি আয়েসের যোগ্য বোধ হইল না। এরূপ নরাধম ইন্দ্রিয়পরায়ণের রাজ্য থাকিবে কেন? ছলে কৌশলে বৃটিশ সিংহ বাহাদুর, গরিব নির্দ্দোষ ওয়াজিদ আলির রাজ্য কাড়িয়া লন। সিপাহিবিদ্রোহের ইহাও একটি প্রধান কারণ। যাহার উপর এরূপ অত্যাচার হইয়াছে, সিপাহিরা মনে করিয়াছিল, সে অবশ্য তাহাদের সঙ্গে যোগ দিবে। বিদ্রোহের পর, ইংরাজ বাহাদুর, অযোধ্যার তালুকদারগণকে কেশরবাগ দিয়াছেন। তাঁহারা কেহ কেহ, স্থানে স্থানে গৃহটি সংস্কার করিতেছেন, এবং সামান্য পথিকগণকে ভাড়া দিতেছেন। হায় পার্থিব গৌরবের পরিণাম! অযোধ্যার দুর্দ্দান্ত নবাব-পত্নীদিগের বিলাস স্থলে আজ কি না পান্থনিবাস! এক দিক্ ভাঙ্গিয়া প্রকাণ্ড 'কেনিং কলেজ' স্থাপিত করা হইয়াছে। এক দিকে একটি অতি উচ্চ 'গেট'

রহিয়াছে। ইহার নাম 'লক্ষ্মী-দরওয়াজা'। প্রস্তুত করিতে লাখ টাকা লাগিয়াছিল। তাই নাম 'লক্ষ্মী'। অনেক দরিদ্রের 'লক্ষ্মী'র মূল্য যে লাখ টাকারও অধিক। টাকায় ত তাহার মূল্য হইতে পারে না।

তাহার পর 'বড় ইমামবারা' দেখিতে যাই। এক পার্শ্বে রুম দেশের অনুকরণে একটি প্রকাণ্ড গেট বা তোরণ। তাহার পর, ইমামবারার মূল তোরণ। তাহা পার হইয়া গেলে, এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। চারি দিকে সারি সারি কক্ষসমন্বিত প্রাচীর। এক পার্শ্বে একটি অতি প্রকাণ্ড, অতি সুন্দর মসজিদ, মধ্যাহ্ন রবিকরে ধক্ ধক্ জ্বলিতেছে। প্রাঙ্গণের সম্মুখে ইমামবারা। মধ্যে একটি বিস্তীর্ণ কক্ষ। পৃথিবীতে নাকি এত বড় কক্ষ আর নাই। তাহাতে ইমামবারা-নির্ম্মাতা জনৈক ভূতপূর্ব্ব নবাব সমাধিস্থ রহিয়াছেন। কক্ষের উপরে রক্তবর্ণ প্রস্তরের বারাণ্ডা চারিদিকে শোভা পাইতেছে। তাহাতে বসিয়া নবাব-পুর-বাসিনীগণ, নীচে যে কোরাণ পাঠ হইত, তাহা শুনিতেন। বারাণ্ডায় প্রবেশ করিবার দ্বার সকল এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, একটি গোলক-ধাঁধা বলিলেও হয়। পথপ্রদর্শক একজন সঙ্গে না থাকিলে পথ খুঁজিয়া পাওয়া ভার। নবাব-রমণীগণ, এখানে নাকি নবাব-পতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতেন। কথাটা ঠিক্! দিল্লী হইতে চুরি করিয়া, তাঁহারা এ রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। আর তাহা লুকাইয়া গিয়াছে। জগতের রাজত্ব ও সম্পদ্ মাত্রই এরূপ লুকোচুরি। এক জন চুরি করিয়া রাজ্য ও সম্পত্তির সৃষ্টি করে—যুদ্ধই বল, বাণিজ্যই বল, আর ওকালতিই বল,—তাহা দুই দিন পরে লুকাইয়া যায়। ইহার সুখ বা গৌরব যে স্থাপন করে, সে প্রকৃতই দয়ার পাত্র। মনুষ্যত্বই প্রকৃত সুখ। মানুষের সকলই যায়, মনুষ্যত্বই যায় না। অযোধ্যার রাজ্য নাই। বাল্মীকির কবিত্ব অমর! তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া, শত শত নরনারী প্রতিদিন মনুষ্যত্ব লাভ করিতেছে। কি কথায় কি কথা আনিয়া ফেলিলাম! মধ্য কক্ষের দুই পার্শ্বে অষ্ট-কোণ-সমন্বিত আর দুইটি কক্ষ আছে। তিনটি কক্ষই বহুমূল্য ঝাড় ইত্যাদিতে সজ্জিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরেই ছোট ইমামবারা। এটিও ঠিক বড় ইমামবারার মত। তবে আকৃতিতে ছোট হইলেও, দেখিতে এবং কারুকার্য্যে এটি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বড় ইমামবারার প্রাঙ্গণ মরুভূমির মত। একটি বৃক্ষচ্ছায়া, একটি ফুলের চারাও নাই। কিন্তু ইহার প্রাঙ্গণে একটি সুন্দর উদ্যান রচিত হওয়াতে, স্থানটি অতীব সুন্দর ও শান্তিপ্রদ বোধ হয়।

কেশরবাগের পার্শ্বেই 'ছত্র-মঞ্জিল'। একটি নহে, পাঁচটি গৃহ লইয়া ভূতপূর্ব্ব নবাব-দিগের এই বাসস্থান নির্ম্মিত। প্রধান ভবনটির শীর্ষদেশে একটি স্বর্ণছত্র বিরাজিত। তাই ইহার নাম ছত্রমঞ্জিল। ধাতুনির্ম্মিত ছত্রটি এখনও শোভিত রহিয়াছে, নিম্নস্থ গোমতীর সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে! কিন্তু সেই ছত্রধর এখন কোথায়? তাঁহার রাজ্যের যে একটি ক্ষুদ্র ছায়া মেটিয়াবুরুজে ছিল, তাহা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। ছত্র-প্রাসাদের নিম্নতলের এক কক্ষ এখন সাধারণ পুস্তকালয়। ঊর্দ্ধ্বতলের কক্ষ সকল শ্বেত-পুরুষদের ক্লব-ভবন। অন্য একটি গৃহ এখন মিউজিয়ম—এ অঞ্চলের লোক বলে, 'আজায়ের ঘর'। আবার বলি, হায় পার্থিব সম্পদের ও গৌরবের পরিণাম!

তার পর, 'সাহা-নিজা' দেখিতে যাই। এটিও একটি প্রকাণ্ড সমাধিভবন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে এখানে ঘোরতর যুদ্ধ হয় বলিয়া, এ স্থানটি এখন বিশেষ বিখ্যাত! এতদ্ভিন্ন, (বলা বাহুল্য) লক্ষ্ণৌতে ইংরাজদিগের পার্ক বা পঞ্চবটী উদ্যান আছে। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের বাড়ী আছে। পুরাতন রাজপ্রাসাদ সকল দেখিয়া আসিয়া, উহা দেখিতে ঠিক যেন একটি কপোতের বাসা বোধ হয়। ২।৪টি ইংরাজকে, যেখানে বিদ্রোহের সময়ে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার উপর অবশ্য একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। আর, যে শত শত নিরপরাধদিগকে ইংরাজেরা হত্যা করিয়াছিলেন, এখন আর তাহার চিহ্নমাত্র নাই!

রুড়কি।

আজ প্রাতে হরিদ্বার হইতে ১২টার সময়ে রুড়কি পঁহুছি। ডাক বাঙ্গলাতে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া নগরদর্শনে যাই। এইমাত্র ষ্টেশনে আসিয়া, গাড়ীর ঘণ্টা খানিক বিলম্ব দেখিয়া, অপেক্ষাকক্ষে বসিয়া তোমাকে পত্র লিখিতে বসিলাম। চিরদিনই তোমাকে পত্রলেখা আমার পক্ষে এক আনন্দ! তথাপি এ দূর দেশ হইতে পত্র লিখিতে যে সুখ বোধ হয়, এমন সুখ বুঝি জগতে অল্পই আছে।

পূর্ব্বদৃষ্ট স্থান সকলের কথা এখন হাতে রাখিয়া, রুড়কিতে যাহা দেখিলাম, আজ তাহাই লিখিব। সলিলস্বরূপা গঙ্গা দেবীর শক্তি আমাদের পুণ্যশ্লোক পূর্ব্ব পুরুষেরা বুঝিয়াছিলেন। তাই সলিলশক্তির পূজা প্রচলিত করিয়াছেন। তাই বলিয়াছেন,—তাঁহার শক্তিপ্রভাবে ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ, তাঁহারা যে শক্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। মাতার প্রকৃত পূজা আমরা শিখিলাম না। গীতার কর্ম্মবাদ ঘুচিয়া, দেশে বেদান্তদর্শনের মায়াবাদ আসিল। সংসার কিছুই নহে. মায়ামাত্র। জীবন কিছুই নহে নলিনীদলগত জলমাত্র। পড়িয়া গেলেই ভাল। এ শিক্ষাও মহৎ বটে ; কিন্তু জ্ঞানের এক অঙ্গমাত্র। আমরা এই এক অঙ্গকে, এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান-কাণ্ডকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া, প্রকৃত কর্ম্মকাণ্ড ভুলিয়া গেলাম। আমরা তাই ডুবিলাম। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল, যে শক্তি ঐরাবতকে উড়াইতে পারে, তাহার দ্বারা কলের চাকা ঘুরান যাইতে পারে। ততোধিক দেখিলেন, দেশে জলাভাবে কৃষি হয় না, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, অথচ জীবনস্বরূপা ভাগীরথীর জলরাশি বহিয়া সমুদ্রে পড়িতেছে। যেখানে গঙ্গা প্রথম তাঁহার জন্মস্থান বা পিত্রালয় হিমাচল হইতে পদতলস্থ সমতল ভূমিতে পড়িয়াছেন, সেখানে গঙ্গার পার্শ্বে হরিদ্বারে গঙ্গা অপেক্ষা গভীরতর করিয়া খাল বা কেনেল কাটিয়া,—এ অঞ্চলে "নহর" বলে, কথাটা বোধ হয় লহর—গঙ্গার স্রোত ফিরাইয়া, জলশূন্য স্থানের মধ্যে বহুতর স্রোত বহাইয়া, শেষে কানপুরে নিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আবার গঙ্গার পূর্ব্ব স্রোতে ফেলিলেন। ইহাতে অন্তরবর্ত্তী স্থানসমূহে স্বর্ণ ফলিতেছে। রুড়কিতে কেনেল আসিয়া সোনালী নদীর পার্শ্বে উপস্থিত। নদীর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে খালের জলও নদীপথে বহিয়া যাইবে। বিজ্ঞান, অদ্ভুত কৌশলে, নদীর বক্ষে প্রায় ৩ মাইলব্যাপী এক মহাসেতু নির্ম্মাণ করিয়া, সেতুর উপর দিয়া গঙ্গার লহর বা কেনেল বহাইয়া লইয়াছে। নীচে সোনালী নদী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বহিয়া যাইতেছে। সেতুর উপর দিয়া লহর উত্তর দক্ষিণে বহিয়া যাইতেছে। বর্ষাকালে স্থানটির যে কি শোভা হয়, বলা যায় না। ঐরাবতও ভাসিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কেনেলের দুই পার্শ্বে দুই বিরাট সিংহমূর্ত্তি ব্রিটিশদিগের জাতীয় চিহ্ন—ভ্রূকুটি করিয়া স্রোতের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। ভগীরথ গঙ্গা আনিয়া-ছিলেন, তাহা উপাখ্যান। ব্রিটিশ সিংহ যে এ অঞ্চলে গঙ্গা আনিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। ঐরাবত ভাসিয়া গিয়াছিল, মাতা এখন ব্রিটিশ সিংহের সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া প্রবাহিতা হইতেছেন। কেনেলের জলের বেগে, স্থানে স্থানে কল ঘুরিয়া ময়দা পিষিতেছে। এ সকলকে জলের কল বলে। তাই বলিতেছিলাম, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা যথার্থ শাক্ত। তাহারাই শক্তির প্রকৃত পূজা করিতেছে। আমাদের পূজা কেবল পুতুল-পূজাই বটে। আমরা সত্যই অন্তঃসারশূন্য পৌত্তলিক।

জল সিদ্ধ করিলে বাষ্প উঠে, জলপাত্রের মুখে আচ্ছাদন থাকিলে, তাহা ঢক ঢক করিয়া নাড়িতে থাকে, একবার উঠে, একবার পড়ে—ইহা আবহমান কাল হইতে আমরা দেখিয়া আসিতেছি! পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বুঝিল, এ ক্ষুদ্র শক্তিকেও বড় করিয়া মানবের বৃহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে। জলপাত্রের আচ্ছাদন ঢক ঢক করিয়া নাড়িতেছে দেখিয়া, জনৈক

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক' বাষ্পের শক্তির প্রথম আবিষ্কার করেন। আজ তাহার উত্তরাধিকারিগণ, সেই বাষ্পের দ্বারা, বৃহৎ বৃহৎ কলের আচ্ছাদন নাড়িয়া, তদ্দ্বারা চক্রের পর চক্র ঘুরাইয়া, স্থলে শকট, জলে অর্ণবযান চালাইতেছেন। রুড়কিতে ইহা দ্বারা কর্ম্মকার ও সূত্রধরের কার্য্য করিতেছে। কলে লোহা গলিতেছে, গড়িতেছে, ছেঁচিতেছে, কাটিতেছে, এবং জগতের যাবতীয় লোহার বস্তু নির্ম্মাণ করিতেছে! আবার কলে কাঠ কাটিতেছে, রেঁদা করিতেছে, এবং এইরূপে কাষ্ঠের নানাবিধ উপকরণ প্রস্তুত করিতেছে। কল-ঘর দেখিয়া, রুড়কির ইঞ্জিনিয়ারিং কালেজ দেখিতে যাই। মধ্যস্থলে একটি গোল কক্ষ, উপরে গম্বুজ, অতি-পারিপাটী, তাহার দুই পার্শ্বে দুই গলির দুই সীমায়, আবার দুইটি ঈষৎ গোলাকার কক্ষ। অতি সুরঞ্জিত, ইঞ্জিনিয়ারিং চিত্রাদিতে সজ্জিত। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারদিগের মূর্ত্তি প্রকোষ্ঠ-কেন্দ্রে, এবং চিত্র দেয়ালে, শোভিতেছে। গলির দুই পার্শ্বে, ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রেরা বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। গৃহটি অতি সুন্দর। আর না। গাড়ী আসিতেছে। ভরসা করি, কাল লাহোর গিয়া তোমাদের পত্র পাইব। মন আকুল বলিয়া কোথাও তিষ্ঠিতে পারিতেছি না।

বিঠুর।

আজ বিঠুরের কথা লিখিব। বিঠুরে প্রথমে নানা সাহেবের বাড়ী দেখিতে যাই। ইংরাজেরা মহারাষ্ট্র জয় করিয়া, মহারাষ্ট্রপতি বাজিরাওকে বিঠুরে বন্দী করিয়া রাখেন। নানা ধুন্দুপন্থ বা নানা সাহেব তাঁহারই পোষ্যপুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, ইংরাজ বাহাদুর তাঁহার বৃত্তির লাঘব করেন, এবং তাঁহার সহিত নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করেন। আজিমুল্লা নামক একজন নীচবংশীয় মুসলমান যুবককে, ইংরাজ, নানার পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এই ব্যক্তি শীঘ্র নানার বিশ্বাসভাজন হয়। তাঁহার পক্ষে উকিল হইয়া বৃত্তি বাড়াইবার জন্যে, বিলাতে দরবার করিতে যায়। বহুতর অর্থব্যয় করিয়া, বিফল হইয়া, দেশে আসিয়া নানাকে বলে যে, ইংলন্ড একটি ক্ষুদ্র স্থান মাত্র। সে শীঘ্র নানাকে ভারত-বর্ষের সম্রাট করিয়া দিবে। এই পাপিষ্ঠই বিদ্রোহের প্রধান কারণ। তাহার দ্বারাই কানপুরে সেই সকল শোচনীয় হত্যাকান্ড হয়। নানা অতি ধর্ম্মাত্মা লোক ছিলেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতেন না। বিদ্রোহের সময়ে, ইংরাজেরা নানার বাড়ী তোপে উড়াইয়া দিয়া-ছিলেন। তাঁহার হাতার প্রাচীর এবং তোরণটি মাত্র এখন অবশিষ্ট আছে। দেখিলে, হৃদয়ে যুগপৎ শোক ও দয়ার উদয় হয়। মহারাষ্ট্রপতির সঙ্গে বহুতর মহারাষ্ট্র এ অঞ্চলে আসিয়াছিল। আজ তাহারা অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে।

তাহার পর, ধ্রুব-ঘাট দেখিতে যাই। প্রবাদ, এখানে ধ্রুব তপস্যা করিয়াছিলেন। পার্শ্বে একটি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিধৌত করিয়া, গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। এখান হইতে ঘাটের সারি লাগিয়াছে। কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীর মেলা উপলক্ষে, অদ্য গঙ্গাসলিল-বিধৌত কামিনীকুসুমরাশির অতুলনীয় শোভা। ব্রহ্মাবর্ত্তের ঘাটে যাই। এখানে একটি লোহার শলাকা প্রস্তরগ্রথিত রহিয়াছে। ইহাকে ব্রহ্মাবর্ত্তের খুঁটা বলে। আর্য্যগণ প্রথম যখন ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন, বোধ হয়, এই পর্য্যন্তই ব্রহ্মাবর্ত্তের সীমা ছিল। তাহার পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত। শেষ যে ঘাটে লক্ষ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে মাতা জানকীকে বনবাসে রাখিয়া চলিয়া যান, যেখানে মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে পাইয়া আশ্রমে লইয়া যান, সেই ঘাট দেখি। স্থানটি দেখিবামাত্র—যদিও দেখিবার কিছুই নাই, একটি সামান্য ঘাটমাত্র —স্মৃতির উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর, জগতের কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম। কবিতার জন্মস্থান, মহাকাব্যের জন্মস্থান, ভারতের অতুলনীয় রামায়ণের জন্মস্থান, রামসীতার যে চরিত্রবলে তাঁহারা চিরদিন দেবদেবীস্বরূপ পূজিত, সেই চরিত্রের জন্মস্থান দেখিয়া, যে ভক্তি ও শান্তির উদ্রেক হইল, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই। স্থানটি এখন কথঞ্চিৎ অরণ্য, পিলোয়া বৃক্ষে ও তেঁতুল ইত্যাদিতে

সমাচ্ছন্ন। গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাতে বালুকাস্তর স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকার ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ এইরূপ একটি ক্ষুদ্র বালুকাস্তূপে, মহর্ষির আশ্রম কুটীর ছিল। এরূপ পবিত্র স্থানে কোথায় একটি দেবতুল্য মহর্ষিমূর্ত্তি দেখিব, না নিকৃষ্ট লিঙ্গ-উপাসকেরা এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া, তাহার উপর এক সামান্য মন্দির স্থাপন করিয়াছেন। পার্শ্বে যেখানে সীতাদেবীর কুটীর ছিল, সেখানে একটি অতি কদর্য্য মূর্ত্তি আছে। কিঞ্চিৎ দূরে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহে তাঁহার এবং রামচন্দ্রাদির মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। সীতাদেবীর শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। পবিত্র আশ্রমমূল প্রক্ষালিত করিয়া, এখানে শৈলসুতা প্রবাহিতা হইতেছেন। বাল্মীকি যদি ইংরাজদের কেহ হইতেন, তবে আজ আমরা এখানে বাল্মীকির মূর্ত্তিসমন্বিত একটি প্রকৃত আশ্রম দেখিতাম, এবং পদে পদে কালিদাসের আশ্রমের বর্ণনা মনে পড়িত। বাল্মীকির দুর্ভাগ্য, তিনি আমাদের বাল্মীকি। তথাপি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপা কটাক্ষ পড়িয়াছে। তিনি তালার উপর তালা তুলিয়া, একটি কবুতরের বাসার মত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইতেছেন। পার্শ্বে একটু পুষ্পোদ্যানও দেখিলাম। গৃহটি দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, মহারাজের উদ্দেশ্য যে, উহার চূড়া দূর হইতে দেখা যাইবে, এবং তদ্দ্বারা বাল্মীকির না হউক, তাঁহার নাম ঘোষিত হইবে। বাল্মীকি এক অমর অদ্বিতীয় মহাকাব্য লিখিয়াও, কোথাও আপনার নাম সন্নিবেশিত করেন নাই। আর মহারাজ যে তাঁহার আশ্রমে সামান্য একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন, তাহাতেও সর্ব্বাগ্রে নামের জন্যে লালায়িত। হায় রে আমাদের দুর্গতি!

এ অবধি যত স্থান দেখিয়াছি, কোনও স্থান তোমাকে দেখাইতে ইচ্ছা হয় নাই। কেবল মহর্ষির পবিত্র আশ্রমে দাঁড়াইয়া, জাহ্নবীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, তুমি সঙ্গে থাকিলে কত সুখ হইত। অথচ, এ পুণ্য তীর্থটি কোনও বিদেশীয় যাত্রিক দর্শন করে না। এ দিকে ভারতবর্ষে এমন ঘর নাই, যেখানে রামায়ণ নাই, যেখানে রামসীতার পূজা নাই। কয় জনে বুঝে, এ পূজা বাল্মীকির অদ্ভুত প্রতিভার? মহর্ষির কৃপা ভিন্ন আজ রামসীতাকে কে চিনিত?

হরিদ্বার।

আজ আমি হরিদ্বারে। এখানে এ সময়ে এক মেলা। উত্তর পশ্চিম ভারতের রূপসী-বৃন্দে স্থানটি এখন একটি বৃহৎ পুষ্পোদ্যানের শোভা ধারণ করিলেও তাঁহাদের কৃপায় সমস্ত গৃহাবলী নরকে পরিণত হইয়াছে। নাসিকা রুমালে আবৃত করিয়া বহু গৃহ ঘুরিয়া শেষে গঙ্গার উপর একটি ক্ষুদ্র ত্রিতল কক্ষে আমার নীড় বাঁধিলাম, নীড়—কারণ উহা একটা কবুতরের খোপ বিশেষ। এই খোপটি হরিদ্বার নগরের শীর্ষ দেশে, একরূপ আকাশে অবস্থিত। অতএব এই কক্ষে উঠিয়াই নগরাজ হিমালয়ের এবং নগররাজ হরিদ্বারের এবং উভয় মধ্যবর্ত্তিনী নগেন্দ্রনন্দিনী জাহ্নবীর যে শোভা আমার নয়ন সমক্ষে খুলিল তাহা অবর্ণনীয়। নগবালা বহুদূর নগাঙ্কে স্নেহময়ী কন্যার মত বিহার করিয়া এবং বহু কল্পনাতীত পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলী সৃষ্টি করিয়া শেষে এই হরিদ্বারে ভারতবক্ষে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গস্পর্শে এই স্থান মহাতীর্থ। তিনি যে দিন প্রথম এখানে পদার্পণ করেন জানি না, সেই দিন মহাকালের কোন চিন্তাতীত সুদূর অতীত গর্ভে এইরূপ মহাতীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। সে দিন ভারতের ও জগতের মহাদিন। জাহ্নবীধারা ভারতের জীবনধারা। জননীর কৃপায় গণনাতীত কাল হইতে ভারত স্বর্ণ-প্রসবিনী। জননীর এই জীবনদায়িনী পতিতপাবনী ধারার সহিতই ভারতের ধর্ম্ম ও জাতীয় ইতিহাস প্রবাহিত হইয়াছে। জননী এখানে নিতান্ত শীর্ণকলেবরা তুষারশীতলনীলামৃতভরা। তাঁহার এক তীরে দীর্ঘ প্রস্তর-সোপানাবলি শোভিত হরিদ্বার নগর। অপরতীরে গগনভেদী স্বয়ং

নগরাজ হিমাচল। তাঁহার জাহ্নবী তীরস্থ এক উচ্চ শৃঙ্গে শ্বেত শতদলের মত চণ্ডিকার মন্দির, অপর তীরে রক্ত-ধ্বজ সূর্য্যকুণ্ডের পর্ব্বত। হিমাচলের সেই বিরাট দোলিত ভৈরব দৃশ্য বহুক্ষণ স্তম্ভিত হৃদয়ে দর্শন করিয়া কক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া ঘাটে ঘাটে বেড়াইতে লাগিলাম। অসংখ্য নরনারীতে আজ সোপানাবলি সমাচ্ছন্ন, এবং 'হর হর' 'বম বম' নিনাদে হিমালয় মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত। স্নানরতা ও সদ্যস্নাতা রমণীবৃন্দে নদীগর্ভ ও সোপানশ্রেণী হিমাচল পদতলে একটি প্রকাণ্ড পুষ্পপাত্রের মত শোভা পাইতেছে। শত শত নরনারী সুললিত গঙ্গোষ্টক আবৃত্তি করিতে করিতে অবগাহন করিতেছে। সোপানের স্থানে স্থানে বহুসন্ন্যাসী, কেহ বা ছত্রতলে, কেহ বা শূন্য গগনতলে, ভক্তিভরে ভজন করিতেছেন, গীতা পাঠ করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, অথবা গঞ্জিকা সেবন করিতেছেন।

এক যুবা পাণ্ডা আমাকে রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছিল।—খাঁটি ব্রাহ্মণের সন্তান, দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি চতুর। পাণ্ডা জাতির মধ্যেও চতুর, শিষ্টাচারী ও সদালাপী। দক্ষযজ্ঞের ও সতীর দেহত্যাগের স্থানই এখানে অন্যতর তীর্থ। কোনো কার্য্য বশতঃ সে নিজে যাইতে পারিল না বলিয়া তাহার বয়সী আর একটা পাণ্ডাকে আমার সঙ্গে দিল। তাহার নাম ঠাণ্ডারাম। তাহাকে দেখিবা মাত্র বুঝিলাম তাহার বুদ্ধিখানিও ঠাণ্ডারাম। সে আমাকে পশ্চিম ভারতের পৌরাণিক রথ 'এক্কায়' আরোহণ করাইয়া দক্ষযজ্ঞের স্থান দেখাইতে চলিল। 'এক্কার' মধুর সঞ্চালনে সে একবার আমার অঙ্গে পড়িয়া তাহার অঙ্গ সুবাসে আমাকে মোহিত করিতেছে, আমি একবার তাহার অঙ্গে পড়িয়া তাহাকে আপ্যায়িত করিতেছি : কখন বা চিৎ হইয়া কখন বা দুজনেই দুজনের উপর পড়িতেছি। বসিয়াছি—চরণ দুখানি আকাশে তুলিয়া। ইহার উপর 'এক্কার' নানাবিধ বাদ্য যন্ত্র 'ঝাঝর' নানা অবতারে নানা শব্দে সমস্ত দেশটা সঙ্গীতপূর্ণ করিয়া চলিয়াছে। যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য আমি ঠাণ্ডারামের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলাম। মনে করিলাম—

> "রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা ;
> এ বিষম জ্বালা যদি পারি ভুলিবারে।"

'ঠাণ্ডারাম! আমরা কি দক্ষিণ দিকে যাইতেছি?' গম্ভীরভাবে সে উত্তর করিল 'ঠিক।'

'ঠাণ্ডারাম! না, আমরা উত্তরদিকে যাইতেছি?' আবার সেরূপ উত্তর করিল—'ঠিক।' 'ঠাণ্ডারাম! উত্তরদিকও নহে বোধ হয় আমরা পশ্চিমদিক যাইতেছি।' উত্তর—'ঠিক!' 'ঠাণ্ডারাম! বোধ হয় যেন, পূর্ব্বদিক যাইতেছি। উত্তর—'ঠিক।' হাসিতে হাসিতে আমি এক্কা হইতে পড়িবার উপক্রম হইলাম। 'ঠাণ্ডারাম! ঐ যে দেখা যাইতেছে ওটাই কি হিমালয়?'—সে দিকে পর্ব্বতের গন্ধও নাই! উত্তর—'ঠিক।' 'ঠাণ্ডারাম!—ওই যে কি দেখা যাইতেছে উহা কাহার বাড়ী? উহাই হিমালয়?' উত্তর—'ঠিক।' আমার বোধ হইল মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়া অবধি সে এই এক 'ঠিক' কথা মাত্র শিখিয়াছে। এমন মানুষগরু আমি দেখি নাই। যাহা হউক তাহার 'ঠিক' কথা শুনিতে শুনিতে পথ কষ্ট ভুলিয়া আমরা একটা কদর্য্য স্থানে পঁহুছিলাম। মধ্যে একটা গর্ত্ত, তাহার আশে পাশে কতগুলি পাথর, ছোট বড়, পড়িয়া আছে। ঠাণ্ডারাম বলিলেন, এই গর্ত্তই দক্ষের যজ্ঞকুণ্ড, এখানেই সতী-মাই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। আর পাথর সকল উক্ত যজ্ঞে সমবেত দেবতাবৃন্দ! হায়, হিন্দু ধর্ম্মের পরিণতি! মোট কথা, দক্ষ-যজ্ঞটা বোধ হয় আর্য্য ও অনার্য্য ধর্ম্মের বা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংঘর্ষণের একটা রূপক মাত্র। মহাযোগী মহাদেব অনার্য্যদের দেবতা, কিম্বা মহাযোগী বুদ্ধদেব এবং বিকৃত মূর্ত্তি প্রমথগণ অনার্য্যজাতি বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। মহাদেবের সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া ঘুরিয়া বেড়ান, এবং সতী দেহের দ্বারা তীর্থ সৃষ্টি,—

পুরুষের স্কন্ধে প্রকৃতির সৃষ্টির প্রারম্ভে আবর্ত্তন ও তাহার খণ্ড খণ্ড আবর্ত্তনে কুম্ভকারের যন্ত্র বিক্ষিপ্ত মৃত্তিকার মত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। অথবা সতীদেহ মৃত বৌদ্ধধর্ম্ম, তাহার দ্বারা সৃষ্ট বৌদ্ধ তীর্থ সকলই এখন হিন্দু-তীর্থ। গয়া যে বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ এবং গয়াসুর বধ যে এরূপ একটা রূপক রাজেন্দ্রলাল তাঁহার "বৌদ্ধগয়া" গ্রন্থে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। এই রূপকের মূল অর্থ—বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম রূপান্তরিত বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, বুদ্ধদেব এখন হিন্দুদের অষ্টম অবতার এবং জগন্নাথদেব এখনও বুদ্ধাবতার বলিয়া শ্রীক্ষেত্রে পরিচিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হরিদ্বার এখনও উত্তর ভারতের 'কেনেলের দ্বার।' এখান হইতে পতিতপাবনী গঙ্গা পতিত অনুর্ব্বর ক্ষেত্র সকল পাবন বা উদ্ধার করিতে 'কেনেলে' প্রবাহিত হইয়া আবার কানপুরে গিয়া মূল গঙ্গায় পড়িয়াছেন। যজ্ঞ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময়ে আমার পূর্ব্ব পাণ্ডা লচমনের সঙ্গে এই 'কেনেল' গঙ্গার গঙ্গোত্তরী দেখিতে গেলাম। কি বিস্ময়কর ব্যাপার! এই কেনেলই রুর্কির সেই সেতুর উপর দিয়া কানপুরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

তাহার পর সমস্ত রাত্রি নির্ম্মল-জ্যোৎস্নালোকে প্রায় সমস্ত রাত্রি হিমালয়, গঙ্গা, ও হরিদ্বারের শোভা প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া পর দিন প্রাতে নিতান্ত অনিচ্ছায় হরিদ্বার ত্যাগ করিলাম! মেলার দরুণ হরিদ্বার যেরূপ নরকে পরিণত হইয়াছিল, এখানে আর এক দিন থাকাও নিরাপদ মনে করিলাম না। অন্যথা আরো ২/১ দিন থাকিয়া কিছুদূর হিমালয় বেড়াইয়া দেখিতাম। ষ্টেশনের পথে শৈলপাদ মূলে একটি সুন্দর আশ্রয় দেখিয়া গেলাম। এ স্থানটি আমার কাছে বড়ই শান্তিপ্রদ বোধ হইল। লাক্‌সার ষ্টেশনে পঁহুছিয়া লাহোরা-ভিমুখে ট্রেণের জন্যে অপেক্ষা করিবার সময়ে দুই পঞ্জাবিনী মাতা কন্যার সহিত পরিচিত হই। উভয়ে পরমাসুন্দরী। ঐ উপাখ্যান স্থানান্তরে বলিব। সাহারণপুর ট্রেণ পঁহুছিলে মধ্যভারতের ট্রেণ হইতে দুজন পঞ্জাবী ভদ্রলোক আমার কক্ষে আসিলেন। ট্রেণ খুলিলে তাঁহারা সুরাপান আরম্ভ করিলেন এবং আমার সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন। একজন পণ্ডিত জীবানন্দ, যোধপুরের সহকারী মন্ত্রী। দ্বিতীয় জন আম্বালার কমিসেরিয়েটের কর্ম্মচারী। দুজনেই আদর্শ ভদ্রলোক। কয়েক মিনিটের আলাপেই তাঁহারা আমাকে এরূপ পাইয়া বসিলেন যে পণ্ডিত জীবানন্দ এবং সেই মাতা কন্যা তিন জনেই আমাকে জলন্ধরে আসিয়া কেবল সেই রাত্রিটা মাত্র তাঁহাদের অতিথি হইতে জিদ করিতে লাগিলেন। দ্বিতীয় ভদ্রলোক আম্বালায় নামিতে সেরূপ করিলেন। পর দিন প্রাতে লাহোরের খ্যাতনামা উকিল এবং সহপাঠী বন্ধু অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন বলিয়া আমি অনেক কষ্টে তাঁহাদের এই স্নেহ হইতে অব্যাহতি লাভ করি। কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম বিষয়টি কি? একজন অপরিচিতের প্রতি ইহাদের এতাদৃশ্য স্নেহ কেন? আমি এই ভারত-ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বে আমার গুরুদেবের চট্টগ্রামস্থ উচ্চপদাসীন শিষ্যকে গুরুদেবের সমাধি কোথায় জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম। কিন্তু আমি তাঁহার উগ্র তান্ত্রিকতার পক্ষপাতী নহি বলিয়া—তিনি তখন ধ্যানেশ্বরীর স্রোতে চট্টগ্রাম ভাসাইতে-ছিলেন,—তিনি আমার পত্রের উত্তর দেন নাই। এই ভ্রমণের পর আমার শৈশবসুহৃৎ চন্দ্রকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন যে এই জলন্ধরেই গুরুদেবের সমাধি। তখন কি যে মনস্তাপ হইল বলিতে পারি না। গুরুদেব! তবে তুমিই কি তোমার এই শিষ্যকে এরূপ আকর্ষণ করিয়াছিলে? হায়! আমি তোমার পুণ্যতীর্থ সমাধি দর্শন করিবার অযোগ্য বলিয়াই বুঝি আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিল না।

তোমার পত্রের জন্য ব্যাকুল হইয়া আমি হরিদ্বার কি রুড়কিতে তিষ্ঠি নাই। ঊর্দ্ধ-শ্বাসে আসিয়া আজ প্রাতে লাহোরে পেঁছিয়াছি। লাহোরে প্রথম মিউজিয়ম দেখি। বিশেষ কিছু বলিবার নাই। সম্মুখে বিখ্যাত ঝমঝম তোপ। হিন্দু ও শিখদিগের সময়ের এইটি সাম্রাজ্যের প্রধান লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত। ইংরেজদের সঙ্গে চিলেনওয়ালার যুদ্ধেও শিখেরা এই প্রকাণ্ড তোপ ব্যবহার করিয়াছিল। তোপটি পিতলের, দেখিতে অতি সুন্দর। তাহার পর সার জন লরেন্সের প্রস্তরের মূর্ত্তি। ইঁহাকে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ ভারত-বর্ষের ত্রাণকর্ত্তা বলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে, ইনি পঞ্জাবের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার নিভীকতা ও বুদ্ধিপ্রভাবে, পঞ্জাব বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। তাহাতেই কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত হয়, শিখদের দ্বারা সিপাহিরা পরাভূত হয়। তাঁহার এক হস্তে কলম, অন্য হস্তে তরবার, বীরভাবে দণ্ডায়মান।

তাহার পর, "সালেমার বাগ" দেখিতে যাই। সম্রাট সাহাজাহান এক দিন স্বপ্নে স্বর্গ দেখেন। এ তোমার আমার স্বপ্ন নহে, সম্রাটের স্বপ্ন, তাহা বিফল হইতে পারে না। সেই স্বপ্ন-দৃষ্ট স্বর্গ সৃষ্টি করিবার জন্য আদেশ প্রচারিত হইল। মুসলমানদের স্বর্গ সপ্ত-স্তরবিশিষ্ট। তদনুসারে সপ্ত স্তরে সজ্জিত "সালেমার" উদ্যান প্রস্তুত হইল। ইংরাজ বাহাদুর ঘোরতর পার্থিব সুখপরায়ণ। অতএব স্বর্গের উপরের সিঁড়ি চারি স্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নিম্নের তিনটি স্তরমাত্র রক্ষা করিয়াছেন। মরি! মরি! কি কল্পনা! কি দৃশ্য! স্তরে স্তরে এই তিন স্তর মাটির ভিতর নামিয়াছে! প্রথম স্তরে 'গেট' পার হইলে, তাজমহলের সম্মুখে যেরূপ জল-প্রণালী আছে, সেইরূপ। তাহার দুই পার্শ্বে রাস্তা, রাস্তার দুই দিকে সুফল বৃক্ষের উপবন। তাহার পর একটি সুন্দর বসিবার ঘর, সম্মুখে একটি কৃত্রিম সরোবর। মধ্যস্থলে একটি বসিবার স্থান, অতি সুন্দর। সরোবরের দুই পার্শ্বে উপবন। তৃতীয় স্তরে আবার জলপ্রণালী ও উপবন। প্রণালীতে ও সরোবরে, সর্ব্বত্র, সংখ্যাতীত ফোয়ারা খেলিতেছে। স্থানটি কি সুশীতল ও শান্তিপ্রদ!

পর দিবস "সাহাদরা" দেখিতে যাই। এটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধিগৃহ। শুনিলাম, নুরজাহান ইহা পতিভক্তির নিদর্শনস্বরূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। গৃহটি দেখিতে যেন একটি অতি প্রকাণ্ড বৈঠকখানা বাড়ী। কোথাও মুসলমানের সমাধির গুম্বেজ নাই। চারি কোণে বহুতল কক্ষবিশিষ্ট, চারিটি উচ্চ স্তম্ভ। তুমি তাজমহলে এরূপ দেখিয়াছ। তাহার উপর হইতে দূরস্থ লাহোরের ও নিম্নস্থ রাবীনদীর শোভা দেখিতে অতি মনোহর। ফিরিয়া আসিবার সময়, কয়েকটি মসজিদ ও রণজিৎ সিংহের—যাঁহাকে ইংরাজেরা পঞ্জাবের সিংহ বলেন,—সমাধি দেখিলাম। এটি গৌরবের সমাধি বলিলেও হয়। এই সিংহের ঘরে, হা বিধাতঃ কি কেবল শৃগাল জন্মিল? তাঁহার শেষটি আজ রুষিয়াতে ভিক্ষা করিয়া জীবন-যাপন করিতেছেন।

তাহার পর লাহোরের দুর্গ দেখিলাম। যে সকল গৃহে রণজিৎ থাকিতেন, তাঁহার সেই প্রিয় শিখ-মহল এখনও বর্ত্তমান। তুমি হাজারি-আয়না দেখিয়াছ। মনে কর, কতকগুলি কক্ষের ভিতরের প্রাচীর ও ছাদ, সেইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়নার দ্বারা খচিত। একটি গৃহে শিখদিগের নানাবিধ অস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে। তাহাদের বর্ম্ম বা বক্ষস্ত্রাণ ও পৃষ্ঠত্রাণ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এ গুলি ধাতুময় এবং ওজনে এক একটি ২০।৩০ সেরের কম হইবে না। এই ভার অলঙ্কারের স্বরূপ ব্যবহার করিয়া, যাহারা সেই বিস্ময়কর যুদ্ধ সকল করিয়াছিল, জানি না, তাহারা কি অসাধারণশক্তিসম্পন্ন লোকই ছিল। তাহারা কত প্রকারের অস্ত্র, বন্দুক ও তোপই প্রস্তুত করিয়াছিল! আমার চক্ষে জল আসিল, আর মনে হইল, "—যুবরাজ! আজি সে জাতি কোথায়?"

লিখিতে ভুলিয়াছি যে, জাহাঙ্গীরের সমাধি দেখিয়া আসিবার সময়ে, তাঁহার প্রিয়তমা মেহের-উন্-নেসা (অর্থ, স্ত্রীজাতির চন্দ্র) বা নুরজাহান (অর্থ পৃথিবীর আলোক) সুন্দরীর সমাধি দেখিয়া আসি। তুমি জান, নুরজাহান তখন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয়া সুন্দরী ও অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্না রমণী বলিয়া, তাঁহার স্বামী সের আফগানকে বধ করিয়া, জাহাঙ্গীর তাহাকে বিবাহ করেন। একটি গল্প শুনিলাম। এক জন কবি তাঁহাকে দেখিবার জন্য, বহুদূর হইতে আসিয়া, রাজপথের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। যখন তাঁহার গাড়ী চলিয়া যায়, সে বলিয়া উঠিল,—

খোল আবরণ, বহু দূর হ'তে
এসেছি দেখিতে মুখ।

নুরজাহান উত্তর করিলেন, তাও কবিতায়,—

খুলিলে, ভূতলে উদিবে চন্দ্রমা,
তারাগণ পাবে দুখ।

এ হেন রমণীরত্নের সমাধিটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে যে কি কষ্ট হইল, বলিতে পারি না। উপরের কবর পর্য্যন্ত ভাগিয়া গিয়াছে। নিম্নের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, রাবীর বন্যাস্রোত প্রবেশ করিয়া, সেখান হইতেও কবরের চিহ্ন পর্য্যন্ত ধুইয়া লইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমবাবু যথার্থই নুরজাহানের মুখে বলিয়াছেন, 'এ রূপের ছাঁচ কবরের মাটীতে থাকিবে।' সেই রূপের, সেই প্রতিভার চিহ্ন বহুদিন লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অরস্থার ঘূর্ণচক্রে পড়িয়া, এই ভুবনমোহিনী যে পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, রাবীরও সাধ্য নাই যে, তাহা ইতিহাস হইতে মুছিয়া ফেলে।

অমৃতসর।

তোমাকে অমৃতসরের কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। লাহোর হইতে দিল্লী আসিবার সময়ে, পথে অমৃতসর দর্শন করি। প্রতুল, তাঁহার একজন মুন্সীকে আমার সঙ্গে দিয়াছিলেন। আমার গাড়ীস্থিত জনৈক পঞ্জাবী যুবক,—পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বি-এ,—উক্ত মুন্সীর কাছে আমার কথা শুনিয়া বড় আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করে। তাহার নাম হরিচন্দ্। তাহার পিতা ডেপুটী কালেক্টর, ভ্রাতা অমৃতসরের তহশিলদার, সে নিজেও এবার ডেপুটী-কালেক্টরী পরীক্ষা দিয়াছে। প্রতুলের বাসায় ঠিক যেন আমি কলিকাতায় ছিলাম। বাঙ্গালা কথা, বাঙ্গালী আহার, বাঙ্গালী ব্যবহার। আমি প্রতুলকে বলিতাম যে, ইহার জন্য আমার পঞ্জাব আসিয়া কি ফল? কিন্তু প্রতুল-ভায়ার সময় নাই যে, আমাকে কোনও পঞ্জাবীর বাড়ী লইয়া গিয়া, পঞ্জাবের আচার ব্যবহার দেখান। অতএব এ যুবকের সহিত আমিও আগ্রহের সহিত আলাপ করিলাম। ফল এই হইল, অমৃতসরে গাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বেই, সে আমাকে পাইয়া বসিল। সে আমাকে সঙ্গে করিয়া, সমস্ত অমৃতসর দর্শন করায়, এবং তাহার বাড়ীতে আহার করায় ;—সে আহারে বেশ নূতনত্ব আছে। গোলাকার এক চৌকির উপর বসিলাম, এবং গোলাকার আর এক চৌকিতে রুটী, ডাল তরকারী এবং মাংস প্রভৃতি আহারীয় সামগ্রী প্রদত্ত হইল। আমি বড় আনন্দে খাইলাম। লোকটি এত ভালবাসা জানাইল যে, গাড়ী ছাড়িবার সময়েও আমার হাত তাহার হাতে গাঁথা ছিল। অথচ, এ দিকের বাঙ্গালীরা বলেন যে, এ দেশস্থ লোকেরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করে ; তাই তাঁহারা তাহাদের সঙ্গে মিশেন না।

অমৃতসরে প্রথমে বিখ্যাত সুবর্ণ-মন্দির দেখিতে যাই। ইহাকে শিখেরা "দরবার সাহেব" বলে। তুমি বেহারের 'পাওপুরীর' দৃশ্যটি স্মরণ কর। একটি বৃহৎ সরোবর। ইহারই নাম অমৃতসর। তাহার চারি তীরে, সারি সারি দ্বিতল ও ত্রিতল অট্টালিকা। শুনিলাম,

একটিতে রোগী ভিন্ন আর কেহ প্রবেশ করিতে পারে না; এখানে রোগী ধন্না দিলেই রোগ আরোগ্য হয়।

অমৃতসরোবরের মধ্যস্থলে সলিল-গর্ভে সুবর্ণ-মন্দির, চতুর্থ শিখগুরু রামদাস কর্ত্তৃক ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। মন্দিরটি অনতিবৃহৎ হইলেও, সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। উহার সুবর্ণে সমাচ্ছন্ন দেহ ও উচ্চ গুম্বেজ, মধ্যাহ্নরবিকরে প্রদীপ্ত অগ্নিবৎ ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছিল। অন্তর্ভাগও সুবর্ণ কারুকার্য্যে এবং স্থানে স্থানে মূল্যবান্ পান্না, মরকত, হীরক ইত্যাদি দ্বারা খচিত। স্তম্ভসারি দ্বারা শোভিত মধ্যকক্ষে, গুরুগোবিন্দের রচিত গ্রন্থদ্বয় বহুমূল্য আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে, এবং বহুমূল্য চামরে উভয় পার্শ্ব হইতে ব্যজনিত হইতেছে। এক দিকে বসিয়া দুই জন গায়ক গাহিতেছে। যাত্রী নর-নারী কক্ষের চারি দিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। দ্বিতল গৃহে, গুরু-গোবিন্দের যোদ্ধৃবেশে অশ্বারূঢ় একটি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। সেখানে রণজিৎ সিংহেরও একটি চিত্র আছে। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে, গুরু নানকের একটি মূর্ত্তি স্বর্ণে খোদিত রহিয়াছে। এক দিকে মর্ম্মর সেতুর দ্বারা মন্দিরটি সরোবরের তীরের সঙ্গে সংযুক্ত রহিয়াছে। শুনিলাম, জাহাঙ্গীর ও তাঁহার অদ্বিতীয়া রূপসী পত্নী নূরজাহানের সমাধি ও সালেমার উদ্যান হইতে বহুমূল্য মর্ম্মর ও রত্ন ইত্যাদি আনীত হইয়া, এই মন্দির নির্ম্মিত ও সজ্জিত হইয়াছিল। নূরজাহানের সমাধির বর্ত্তমান দূরবস্থার ইহাই প্রধান কারণ। শুনিয়া আমি দীর্ঘনিশ্বাস সংবরণ করিতে পারিলাম না। এই ধার্ম্মিক ও বীর-পুরুষেরা, কিরূপে যে এতাদৃশ হৃদয়হীন কার্য্য করিয়াছিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না।

শিখদিগের ধর্ম্মের স্রষ্টা নানক। ইঁনিই ইহাদের প্রথম গুরু। গুরু গোবিন্দ দ্বিতীয় গুরু। ইনি ঘোরতর যোদ্ধা ছিলেন। নানক-প্রচারিত ধর্ম্মে ও গীতোক্ত ধর্ম্মে, আমি বড় প্রভেদ দেখিলাম না। শিখেরা জাতিভেদ মানে না, আহারসম্বন্ধে কোনও রূপ ধরা-বাঁধা নাই। তাহারা কোনও ধর্ম্মের বিদ্বেষী নহে, একমাত্র নারায়ণের উপাসনা করে, এবং গ্রন্থ দুখানির পূজা করে। আমার ধারণা হইয়াছে যে, গুরু নানক, বিলুপ্ত গীতোক্ত ধর্ম্মই প্রচার করেন। নানক শিখদিগের কৃষ্ণ, রণজিৎ সিংহ অর্জ্জুন, এবং "যুদ্ধস্ব বিগত জ্বর"ই ইঁহাদের মূল মন্ত্র। এই মন্ত্র সাধিয়া, ধর্ম্মবলে কর্ম্মকে বলবান্ করিয়া, অমিতপরাক্রমে ইহারা পঞ্জাবে মোগলসাম্রাজ্যের বক্ষের উপর, শিখরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং এই মন্ত্রবলেই শিখেরা ভারতীয় ইতিহাসে, অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

মন্দিরদর্শনের পর, আমি 'গোবিন্দগড়' দুর্গ দেখিতে যাই। এ দুর্গ রণজিৎ সিংহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কলিকাতার দুর্গের মত ইহা দেখিতে একটি প্রসারিত-দল পদ্মের মত। তাহার পর নগর দর্শন করি। অমৃতসর নগরও রণজিৎ কর্ত্তৃক স্থাপিত, দেখিতে অতি সুন্দর। একটি দোকানে গিয়া, কিরূপে শাল প্রস্তুত হয়, তাহা দেখিলাম। স্বতন্ত্র স্থানে আলোয়ান প্রস্তুত হয়। সেই আলোয়ানের উপর, এই সকল দোকানে কারুকার্য্য করা হয়। এক এক বর্ণের সূতা, এক এক জন কারীকরের হাতে। এক জন কারীকর, একখানি শালের ফুলের সর্ব্বত্রে কাল সূতার কার্য্য করিতেছে, আর এক জন তাহাতে লাল সূতার কার্য্য করিতেছে। সূচের দ্বারা কি সূক্ষ্মভাবে এবং কি পরিশ্রমের সহিতই কার্য্য করিতে হয়। একখানি 'দোরোখা শাল' দেখিলাম। ইহার দুই পিঠেই রোখ। আমি এরূপ শাল দেখি নাই। মূল্য ২০০্ টাকা বলিল। এরূপ এক যোড়া শাল লইতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইল! কারীকরদের বেতন ৭্। ৮্ টাকা হইতে ২০্ পর্য্যন্ত।

তাহার পর, অমৃতসরের উদ্যান এবং প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের জন্য যে গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া অমৃতসর দর্শন শেষ করিলাম। আমি এখানে ৬।৭ ঘণ্টামাত্র ছিলাম।

ইন্দ্রপ্রস্থ।

দিল্লীর কথা তোমাকে আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? "বিশপ হিবার" হইতে "নীহারিকা"-রচয়িত্রী পর্য্যন্ত, যিনি দিল্লী আগ্রা দেখিয়াছেন, তিনিই তাহার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তুমিও তাহা অনেক বার পড়িয়াছ। অতএব দিল্লীর কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? দিল্লী, হিন্দু-সাম্রাজ্যের মহাশ্মশান মুসলমান সাম্রাজ্যের মহা সমাধি, মহাকালের মহা রঙ্গভূমি। শ্মশানের ছাই উড়িয়া গিয়াছে, যমুনার পবিত্রজলে প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। সমাধির প্রস্তররাশিতে দিল্লী আজ সমাচ্ছন্ন। বর্ত্তমান দিল্লী হইতে পুরাতন দিল্লী পর্য্যন্ত পঞ্চ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া, কেবল সমাধির পর সমাধি, তাহার পর সমাধি। যে দিকে চাহিবে, দেখিতে পাইবে—"ঘোরারাবী, মহারৌদ্রী, শ্মশানালয়বাসিনী," ধ্বংসরূপিণী,—মহাকালী, দিগম্বরীবেশে নৃত্য করিয়া, বেড়াইতেছেন। ধ্বংসগত সাম্রাজ্য সকলের ভস্মের নীরবতার মধ্য হইতে যেন জননীর ঘোর অট্টহাস্য ভাসিয়া উঠিতেছে। দিল্লীতে পা দিয়াই আমার সেই বাইরণের মহাকাব্য স্মরণ হইল;—

"দাঁড়াও! চরণ তব সাম্রাজ্য ধূলায়।
"দুইটি সাম্রাজ্য নীচে রয়েছে প্রোথিত!"

দিল্লী যত দেখিতে লাগিলাম, তত অন্য একজন কবির আক্ষেপ মনে পড়িল,—

"বীরত্বের গর্ব্ব আর প্রভুত্ব বিভব,
"সম্পদ সংসার সব যাহা করে দান,
অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর হায়! মুখাপেক্ষী সব,
"গৌরবের পথ মাত্র মৃত্যুর সোপান।"

সর্ব্ব প্রথম হিন্দুর শ্মশানের কথা বলিব, কারণ হিন্দু সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। হিন্দু সাম্রাজ্য, ভগবান্ কৃষ্ণের কীর্ত্তি,—যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য,—উপন্যাসের কথা নহে, কাব্যকারের সৃষ্টি নহে। ইন্দ্রপ্রস্থের রাশি রাশি ভগ্নাবশেষ স্তূপাকারে, বর্ত্তমান দিল্লীর এক ক্রোশ দক্ষিণে এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকেরা ইহাকে এখনও ইন্দ্রপাট বলে। যুধিষ্ঠিরের রাজপুরীর দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। বলা বাহুল্য, কালে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। প্রথম যবন সম্রাটেরা ইহার সংস্কার করেন। দুর্গের এক কোণে ভগ্ন রাজ-পুরীর প্রস্তররাশিতে নির্ম্মিত, এক উচ্চ মসজিদ এবং ইহার পার্শ্বে আর একটি অতি সুন্দর, গোল ত্রিতলকক্ষসমন্বিত, স্বল্পায়তন গৃহমাত্র বর্ত্তমান আছে। হিন্দু রাজপুরীর প্রস্তরে নির্ম্মিত মুসলমান রাজপুরীও আবার কালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় গৃহের ত্রিতল কক্ষে বসিয়া, যমুনার শীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে, প্রথম মোগল সম্রাট হুমায়ুন অধ্যয়ন করিতেন। ইহার তৃতীয় সোপান হইতে পড়িয়া, তাঁহার অপমৃত্যু হয়। মোগল রাজ্য, তাঁহার পুত্র, প্রাতঃস্মরণীয় আকবর আগ্রায় তুলিয়া লইয়া যান। ইন্দ্রপ্রস্থের দ্বিতীয়বার কপাল ভাঙ্গিল। ইদানীং ইহাতে একটি গ্রাম বসিয়াছে। বহুবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকগৃহও নির্ম্মিত হইয়াছে। যেখানে সেই বিচিত্র রাজপুরী, সেই অতুলনীয়, ময়দানবের নির্ম্মিত সভাগৃহ ছিল, আজ সেখানে দরিদ্রের কুটীরসমূহ বিরাজ করিতেছে। ভগবানের সেই অমানুষিক লীলার কেন্দ্রস্থান ইন্দ্রপ্রস্থের এই দশা! মসজিদের ছাদের প্রস্তরে বক্ষ রাখিয়া, পুরাতন দুর্গের প্রাচীর দেখিয়া দেখিয়া শোকের ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমি কাঁদিলাম। হয় ত, এ স্থানে এখনও সেই নরোত্তমের পদধূলি পড়িয়া আছে,—প্রহ্লাদের মত তাহা অঙ্গে মাখিয়া, এই অকিঞ্চিৎকর মানবজীবন সার্থক করি! সকলই গিয়াছে, কেবল এখনও দুর্গের পদমূল ভক্তিভরে প্রক্ষালন করিয়া, যমুনা দেবী শোকে নীরবে বহিয়া যাইতেছেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

পুরাতন দিল্লী।

ইন্দ্রপ্রস্থের কথা লিখিয়াছি। যে অমানুষিক প্রতিভাবলে ভারতে মহাভারত স্থাপিত হইয়াছিল, প্রভাসতীরে অকালে তাহার তিরোধান হইলে, সেই ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তি এরূপ দৃঢ়ভাবে ধর্ম্মে স্থাপিত হইয়াছিল যে, তাহা কিছু কালের জন্যে কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইলেও, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া স্থায়ী হইয়া, ভারতে সুখ ও শান্তির বিধান করিয়াছিল। কালে গীতার ধর্ম্ম লুপ্ত হইল। অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রকারদের জ্ঞানান্ধ উত্তরাধিকারিগণ, ভারতের শক্তি জাতিভেদ-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে বাঁধিলেন। ধর্ম্ম কেবল যাগযজ্ঞে এবং নরহত্যা ও জীবহত্যায় পরিণত হইল। আবার সেই অবস্থা,—

"যখন যখন ঘটে ভারত! ধর্ম্মের গ্লানি,
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, আপনাকে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ দুষ্কৃতদের
করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম, করি আমি যুগে যুগে
জনম-গ্রহণ।"

আবার ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিলেন। ভগবান্ বুদ্ধদেব এক ফুৎকারে জাতিবন্ধন উড়াইয়া দিয়া, সাম্যগীতে ভারত প্লাবিয়া, গীতার কর্ম্মবাদ ঘোষণা করিলেন। ভারত নবজীবন পাইয়া নাচিয়া উঠিল। আবার অশোকের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হইল। অসংখ্য শৈলস্তম্ভ, বৌদ্ধ ধর্ম্মনীতি বক্ষে ধারণ করিয়া, ভারত ব্যাপিয়া, ধর্ম্মরাজ্য ঘোষণা করিল। কিন্তু জগতের পরিবর্ত্তননীতি অলঙ্ঘ্য। উন্নতি না হইলে অবনতি হইবে। জগৎ স্থির থাকিতে পারে না। আবার জ্ঞানান্ধ বৌদ্ধ যাজকের হস্তে পড়িয়া, বৌদ্ধধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইল। ভগবান্ আবার জন্মগ্রহণ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য, অদ্বৈত শৈববাদে ভারত মাতাইয়া তুলিলেন। ভারতে তৃতীয় বার ধর্ম্মসাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে চলিল। চৌহান পৃথ্বীরাজ ইহার শক্তি। ইন্দ্রপ্রস্থের চারি ক্রোশ উত্তরে, যমুনাতীরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। তাহারই নাম দিল্লী। পৃথ্বীরাজের দুর্গের প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ বা কুতুব মিনার, এখনও বর্ত্তমান আছে। নূতন দিল্লীর বহির্ভাগে, এখনও তাঁহার নীতিস্তম্ভ দুইটি বিরাজ করিতেছে। পুরাতত্ত্ববিৎ ইংরাজ বলেন, কুতুব মিনার কুতুবুদ্দিনের নির্ম্মিত। মোল্লাগণ ইহার সানুদেশে দাঁড়াইয়া, "আজাহার" দিবে বলিয়া, নির্ম্মিত হইয়াছিল। হিন্দুরা বলেন, পৃথ্বীরাজের কন্যা যমুনা দর্শন করিবেন বলিয়া, এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুইটি প্রবাদের কোনটিই ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। এই পর্ব্বতবৎ উচ্চ স্তম্ভে উঠিলে, কথা কহিবার শক্তি থাকে না! অতএব মোল্লা সাহেবগণ এত সোপান বহিয়া উঠিয়া যে আজাহার দিতে পারিতেন, এমন বোধ হয় না। বিশেষতঃ পার্শ্বস্থিত বিপুল কারুকার্য্যখচিত, বিচিত্র, অতুলনীয় হিন্দু দেবালয় ভগ্ন করিয়া, যে মসজিদ নির্ম্মিত হইতেছিল, তাহা শেষ হয় নাই। মসজিদের পূর্ব্বে আজাহারের স্থান নির্ম্মিত হওয়া সম্ভবপর নহে। অন্য দিকে, অনতিপরিস্ফুটিতা, কুসুমকোমলা, পৃথ্বীরাজ-দুহিতা যমুনাদর্শনের জন্য যে এত সোপান বাহিয়া উঠিতেন, তাহাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমার বোধ হয়, চিতোরে যেরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, ইহাও সেইরূপ কোনও বিরাট যুদ্ধের শেষে, পৃথ্বীরাজ কর্ত্তৃক বিজয়ের নিদর্শন-স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কালে ইহা জীর্ণ হইলে, কুতুবুদ্দিন ইহা সংস্কৃত এবং আরবী অক্ষরে শোভিত করেন। আমার অনুমানের প্রধান কারণ এই যে, চিতোরের স্তম্ভ ও এই স্তম্ভটী ঠিক একরূপ।

বলিয়াছি, পৃথ্বীরাজের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতেছিল, কিন্তু হইল না। মহম্মদীয়

ধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড়াইয়া, মুসলমান দিগ্বিজয়ীরা ঘন ঘন ভারতের দ্বারে হানা দিতে লাগিলেন; অন্যূন দশ বার পৃথ্বীরাজের বাহুবলে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। কিন্তু হায়! হায়! এমন সময়ে ভারতের চিরকলঙ্ক, চিরসর্ব্বনাশের কারণ অন্তর-বিরোধানল জ্বলিয়া উঠিল। পৃথ্বীশ্রীকাতর, কুলাঙ্গার, কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র, মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যোগ দিল। বীরকুলোত্তম পৃথ্বীরাজ রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। ভারতের কপাল বুঝি চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিল; ভারতের শেষ সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

বর্ত্তমান দিল্লী।

পূর্ব্বে তোমাকে যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ এবং পৃথ্বীরাজের দিল্লীর কথা লিখিয়াছি। যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থের প্রাচীর, বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের একটিমাত্র লৌহ স্তম্ভ, এবং পৃথ্বীরাজের "পিথোরা"-দুর্গের ভগ্নাবশেষমাত্র বর্ত্তমান আছে। ভারতের বক্ষের উপর দিয়া, এমনই সর্ব্বধ্বংসী বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বকৃত দেবালয়ের প্রাঙ্গণে যে লৌহস্তম্ভটি আছে, লোকে তাহাকে "ভীমের গদা" বলিত। প্রবাদ, কোনও রাজা তাহার মূল দেখিবার চেষ্টা করেন। তাহাতে স্তম্ভ হইতে রক্ত উঠে এবং স্তম্ভ "ঢিলা" হইয়া যায়। "ঢিল্লী" হইতে "দিল্লী" নাম হইয়াছে। কিন্তু স্তম্ভের অঙ্গে যে লিপি খোদিত আছে, তাহা এখন পুরাতত্ত্ববিৎগণ পড়িয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, রাজা "ধ্রুব" কর্ত্তৃক, ১,৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। দিল্লীর উপর দিয়া এমন বিপ্লব গিয়াছে যে, এ ঘটনাটি পর্য্যন্ত দিল্লীর পরবর্ত্তী অধিবাসিগণ কেহ জানিত না।

পৃথ্বীরাজের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। কুতুবুদ্দিন প্রভৃতি প্রথম পাঠান সম্রাটেরা, পৃথ্বীরাজের দিল্লীতে রাজধানী রাখেন। এই ঐতিহাসিক মহাশ্মশানে, ঈশ্বরের নৈতিক রাজ্যের প্রমাণ, সর্ব্বত্রে বিরাজমান রহিয়াছে। আলাউদ্দিনের পদ্মিনী-উপাখ্যান এবং চিতোরধ্বংস শ্রবণ কর। আর এখানে দেখ, সেই আলাউদ্দিন যে প্রকাণ্ড হিন্দু দেবালয় ভাঙ্গিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেছিল, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, তাহার রাজবাটী ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আফগান রাজ্যের জনৈক অধিনায়কের সমাধি, এখন ইংরাজদিগের "ডাকবাঙ্গলাতে" পরিণত হইয়াছে! তাহার কবরের প্রস্তরখানি বারাণ্ডায় পড়িয়া রহিয়াছে। হরি! হরি! মানুষ কেমন করিয়া এমন হৃদয়হীনতার কার্য্য করিতে পারে?

'টোগলক' সম্রাটেরা, ইহার কিঞ্চিৎ দূরে, যমুনাতীরে, নূতন দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। "পিথোরা"-গড়ে, একদিকে এক ব্রাহ্মণ ঠাকুর অর্থ উপার্জ্জনের জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, "যোগমায়া" নাম দিয়া, এক যোগী পূজা করিতেছেন; পূজার মন্ত্রটিও জানেন না। অন্য দিকে দুটি পুরাতন গোলাকার কক্ষে, ডাকবাঙ্গলা স্থাপিত হইয়াছে। কালের বিচিত্র গতিতে এই মহা বীরভূমির কি পরিবর্ত্তনই ঘটাইয়াছে। ডাকবাঙ্গলাতে বিশ্রাম করিয়া, বর্ত্তমান বা নূতন দিল্লীতে ফিরিয়া আসি। পথে "সপ্দর জঙ্গের" বিরাট সমাধিমন্দির। তাহার চারিদিকে, বিচিত্র-কারুকার্য্যখচিত আরও অনেকগুলি বহু পুরাতন সমাধিমন্দির বিষণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া আছে। এ সকল পার হইয়া আসিয়া নূতন দিল্লী। আফগান সাম্রাজ্যও কালে মোগল সাম্রাজ্যের ছায়াতে বিলুপ্ত হইল। তুমি পড়িয়াছ যে, মোগল সম্রাটেরা যদুবংশের সন্তান। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর এবং হুমায়ুন, অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। বীরত্ব এবং বিদ্যা একাধারে সম্মিলিত করিয়াছিলেন। যদুবংশের সন্তান বলিয়া হউক, কিংবা মহাভারতের পুণ্য ঐতিহাসিক ভূমি

বলিয়াই হউক, তাঁহারা বিলুপ্ত ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলেন। হুমায়ুন, শের আফগান কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া মারবারের মরুভূমিতে পলায়নকালে অমরকোটে সম্রাটচূড়ামণি আকবর জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে, হুমায়ুন যে মসজিদ নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সের শা তাহা শেষ করেন। তাহার নাম "কিল্লাকোনা" মসজিদ। তাহার পার্শ্বে একটি উচ্চ ত্রিতল ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করেন। তাহার নাম "সের মঞ্জিল।" হুমায়ুন সের শাকে পরাভূত করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার পর, ইহাতে তাঁহার পুস্তকালয় স্থাপন করেন। একদা তিনি সর্ব্বোচ্চ কক্ষে বসিয়া নিবিষ্টমনে পড়িতেছেন, এমন সময়ে পার্শ্বস্থিত মসজিদ-শীর্ষ হইতে, 'মোয়াজিন' নমাজের সময় বিজ্ঞাপন করিল। হুমায়ুন ব্যস্ত হইয়া যেমন অবতরণ করিতেছিলেন, অমনই পদস্খলিত হইয়া, তৃতীয় সোপান হইতে গড়াইতে গড়াইতে একেবারে নীচে পড়িয়া যান। তাহাতে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে।

তাঁহার কুলতিলক পুত্র আকবর, আগ্রাতে দুর্গ ও রাজধানী নির্ম্মাণ করেন, এবং তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীরও তথায় রাজত্ব করেন। সাহাজাহান পুনরায় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিয়া, নূতন দিল্লীর দুর্গ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। ইহাঁর সময়েই আগ্রা এবং দিল্লীর দুর্গের বিখ্যাত অট্টালিকা সকল ও "তাজমহল" নির্ম্মিত হয়। স্থাপত্যকার্য্য, ইহাঁর সময়ে যেন ভারতবর্ষে চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখন দিল্লীর দুর্গের মধ্যে চল। প্রথমে "দেওয়ান আম্" বা সাধারণ দর্শনগৃহ। রক্ত প্রস্তর স্তম্ভ সারির উপর একটি সুন্দর গৃহ। তিন দিক খোলা, এক দিকে প্রাচীর, তাহার পশ্চাতে কয়েকটি কক্ষ। মধ্য কক্ষটির দ্বিতলে, সম্রাটের সিংহাসন থাকিত। এই কক্ষটি শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তরের কারুকার্য্যে খচিত। এখানেই ময়ূরসিংহাসন থাকিত। তাহার নিম্নে একটি শ্বেত মর্ম্মরবেদী আছে। তাহার উপর উজির বসিতেন। আবেদনপত্রাদি তিনি পাঠ করিয়া এক স্বর্ণপাত্রে রাখিতেন। এবং তাহা রজতশৃঙ্খলে উত্থিত হইয়া সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত হইত। তাহার পশ্চাতে, যমুনাতীরে, শ্বেতপ্রস্তরের শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। কেন্দ্রস্থলে বিখ্যাত "দেওয়ান খাস।" ইহারও তিন দিক খোলা। যমুনার দিকে প্রস্তরের ছিদ্রবিশিষ্ট গবাক্ষ। ইহার স্তম্ভ সকল এবং উপরের ছাদ, সুবর্ণে এবং নানাবিধ বর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। চারি কোণের স্তম্ভের উপর, প্রাচীরে লেখা আছে,—

"যদ্যপি স্বরগ থাকে এই ধরাতলে,
এখানে—এখানে—তাহা এখানে কেবল।"

তাহার বামপার্শ্বে সেইরূপ কক্ষ সারি, সম্রাটের অন্তঃপুর! কক্ষগুলি অতিক্ষুদ্র, কিন্তু অতি মনোহর। যমুনার দিকে একটি গোল প্রাচীরহীন কক্ষ, গৃহের বহির্ভাগে শোভা পাইতেছে। স্তম্ভের বিরামস্থানে আয়না বসান রহিয়াছে। কিন্তু এই অন্তঃপুরের কক্ষে, কি অন্য কোথাও কপাট নাই। বহুমূল্য পুরু পর্দ্দা, প্রত্যেক দ্বারে ঝুলান থাকিত। দেওয়ানখাসের অন্য পার্শ্বে স্নানের গৃহ। ইহার কক্ষগুলি অতি মনোহর। প্রাচীর এবং ছাদ কাচে সুসজ্জিত! যে দিকে চাহিবে, তোমার শত শত প্রতিবিম্ব দেখিবে। জানি না নূরজাহান প্রভৃতি কত সুন্দরীর প্রতিবিম্বই এ সকল কাচকক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। একদিকে একটি কক্ষে জল গরম হইয়া প্রণালীপথে মর্ম্মরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুণ্ডে আসিত। ইহাতে সুন্দরীরা অবগাহন করিতেন। চারিদিকে তাহাদের তৈলমর্দ্দনের এবং আরামের কক্ষ রহিয়াছে। যখন শত শত সুন্দরীরা সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া স্নান করিতেন, কেহ জলে অর্দ্ধ বা পূর্ণ নিমজ্জিতা, কেহ কক্ষে মদালসে উপবিষ্টা বা অর্দ্ধশায়িতা, কেহ জলক্রীড়া করিতেছেন, কেহ বেড়াইতেছেন, কেহ হাসিতেছেন, কেহ গাহিতেছেন, কেহ রসালাপ করিতেছেন, মরি! মরি! কি রূপের ফোয়ারাই চারিদিকে খেলিতে থাকিত। সম্মুখে আর একটি কক্ষ। তাহার মধ্যস্থলে পদ্মের মত একটি কুণ্ড। তাহাতে গোলাপজল রক্ষিত

হইয়া, গৃহ সুবাসিত করিয়া রাখিত! এরূপ আরও ৩।৪টি কক্ষ আছে। কে বলিবে, তাহা কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। স্নানকক্ষের সম্মুখেই "মতিমসজিদ"। শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহাতে রঙের কার্য্য নাই, কেবল শ্বেত মর্ম্মরের উপর কারুকার্য্য। প্রকৃতই ইহা মসজিদের মধ্যে একটি মতি। গৃহটি কি সুন্দর! এখানে সম্রাটকে বেষ্টন করিয়া, অন্তঃপুরবাসিনীরা নমাজ পড়িতেন।

পুরাতন দিল্লী হইতে নূতন দিল্লীতে আসিতে, পথে একটি প্রকাণ্ড সমাধিস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে নিজামুদ্দিন নামক জনৈক বিখ্যাত ফকিরের একটি শ্বেত-মর্ম্মরনির্ম্মিত সমাধি আছে। গৃহটি অতি সুন্দর। তাহার কিঞ্চিৎদূরে, একই প্রাঙ্গণে, কবি খসরুর সমাধি। ইহাতে তুমি বুঝিবে, মুসলমান সম্রাটেরা কবিদিগের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। তাহারই পার্শ্বে মরি! মরি! কি হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য! যখন মোগলকুলের কংস আরঙ্গজিব, আপন পিতা সাহাজানকে বন্দী করিলেন, তাঁহার কন্যা জেহানারা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া, পিতার সেবার জন্য, তাঁহার সঙ্গে কারাবাসিনী হন। তাঁহার একটি ক্ষুদ্র মর্ম্মর কবর, মধ্যস্থান শ্যামল দূর্ব্বাদলে শোভিত। কবরের শীর্ষদেশে, একটি শ্বেত মর্ম্মরফলকে, তাঁহার নিজের রচিত একটি কবিতা লিখিত রহিয়াছে ;—

"বহুমূল্য আবরণে করিও না সুসজ্জিত
কবর আমার।
তৃণ শ্রেষ্ঠ আবরণ দীন-আত্মা জেহানারা
সম্রাট-কন্যার।"

পিতৃপরায়ণা জেহানারা, রমণীদিগের জন্য, পিতৃভক্তির এবং পবিত্রতার কি আদর্শই রাখিয়া গিয়াছেন! আমি আকবরের সমাধিকে ভিন্ন, আর কোনও সমাধিকে প্রণাম করি নাই। জেহানারার সমাধিকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম। স্থানটি দেখিয়া আমার কলুষিত হৃদয়ও যেন পবিত্র হইল। স্থানটি একটি মহাতীর্থ।

সমদর্শিনী নীতিতে মহামতি আকবর যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, নরাধম আরঙ্গজিবের দুর্নীতিতে এবং ধর্ম্মোৎপীড়নে শিবজীর অসিঘাতে, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িল। দুর্গের বাহিরে প্রকাণ্ড "জুম্মা মসজিদের"গগনস্পর্শী স্তম্ভ-শিরে দাঁড়াইয়া দিল্লী দর্শন করিলে বোধ হয়, যেন মুসলমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস, চক্ষের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে। হৃদয় কি ঐতিহাসিক স্মৃতিতেই আন্দোলিত হইতে থাকে! মানুষের সম্পদ ও গৌরব কি জলবিম্ব বলিয়াই ধারণা হয়! ইচ্ছা করে না যে, সেই স্তম্ভশিরে অধিরোহণ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করি। পাপমতি আরঙ্গজিবের সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্য ডুবিল। শিবজী তাহার ভিত্তি পর্য্যন্ত চঞ্চল করিয়া গিয়াছিলেন। ভারতের অদৃষ্ট ক্ষেত্র পাণিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে, তাহা নাদের সাহার অসিপ্রহারে টলিয়া পড়িল। নৃশংস 'নাদের' দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া, নগর কেন্দ্রস্থলস্থিত এক মসজিদের উপর হইতে দিল্লীবাসীদের বধাজ্ঞা প্রচার করিল। নরশোণিতে দিল্লী ভাসাইয়া, যমুনাকে রক্তবর্ণা করিল। দিল্লী বিলুপ্তপ্রায় হইল। মোগল সাম্রাজ্য শোণিতস্রোতে ভাসিয়া কালসাগরে চিরদিনের জন্য বিলীন হইল।

"আহা! কি কুদিবসে গ্রাসিল রাহু, মোচন হইল না আরও।
ভাঙ্গিল চূর্ণিল, উলটি পালটি, লুটি নিল যাহা ছিল সারও।"

সেই বধ্যভূমি এখন একটি ফোয়ারার দ্বারা চিহ্নিত আছে। আজ আর না। আজ দিল্লী-দর্শন-কাহিনী শেষ করিব। নরপশু নাদের সাহা দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া এবং নরহত্যা-স্রোতে দিল্লী ভাসাইয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মোগলরাজলক্ষ্মী আর মাথা তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার ছায়া ক্রমে বৃটিশ-বৈজয়ন্তী-ছায়াতলে বিলীন হইল। যে ইংরাজ মোগলের ছায়াতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আইসে, সে মোগলের সিংহাসনে

বসিল। আকবরের উত্তরাধিকারীকে তাহার বৃত্তিভোগী হইয়া, সামান্য ব্যক্তির মত দিল্লী নগরে বসতি করিতে হইল। ময়ূরসিংহাসন নাদের সাহা লইয়া গিয়াছিল, দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস বৃটিশ সৈন্যনিবাস হইল। ভারত বীরশূন্য, পদতলে দলিত, দেখিয়া বৃটিশ সিংহের রাজ্যলিপ্সা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঘোরতর অধর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাহারা ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের পঞ্জাব পর্য্যন্ত উদরসাৎ করিল। রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইল। ভারতের মানচিত্র লাল হইয়া গেল। কিন্তু রাজার উপর একজন মহারাজা, শক্তিমানের উপর একজন মহাশক্তিমান আছেন। তাঁহার রাজনীতি, তাঁহার শক্তি অলঙ্ঘ্য। ঝান্সির বীররাণী লক্ষ্মী বাই, সিংহিনীর মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"মেরা ঝান্সী নেহি দেংগে!" সিপাহি-বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল, ইংরাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল, বৃটিশ সিংহাসন টল টল করিতে লাগিল। দিল্লী ভারতের যুগ-যুগান্তরীন রাজধানী। বিদ্রোহীগণ চারিদিক হইতে দিল্লীতে সমবেত হইল। বৃত্তিভোগী বৃদ্ধ মোগল সম্রাটের উত্তরাধিকারীকে, বলে যষ্টির মত দাঁড় করাইয়া, মোগল সাম্রাজ্য বিঘোষিত করিল। শিখ সৈন্য সহায় করিয়া ইংরাজ দিল্লী আক্রমণ করিলেন। দিল্লীর চারিদিকে দৃঢ় উচ্চ প্রাচীর। তাহার বিশাল নগর-দ্বার সকল রুদ্ধ। পার্শ্বস্থিত অনুচ্চ শৈল-শেখর হইতে ইংরাজ "কাশ্মীর-দ্বারের" উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দ্বার এত দৃঢ় যে, প্রায় চারি মাস কাল গোলা বর্ষণ করিয়াও তাহা বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। অবশেষে মৃত্যু সংকল্প করিয়া, কতক সৈন্য বিদ্রোহীদিগের অগ্নিবৃষ্টি পার হইয়া আসিয়া, প্রাচীরের এক তলে স্তূপাকার বারুদ রাখিয়া, অগ্নিসংযোগ দ্বারা প্রাচীরের এক স্থলে সুরঙ্গ করিয়া, অমিতপ্রতাপে সেই সুরঙ্গ দিয়া দিল্লী প্রবেশ করিল। বারুদের নির্ঘাতে এবং নির্ঘোষে ভূমিকম্প হইল, দিল্লী কাঁপিল, বিদ্রোহীরা টলিল, পলায়ন করিতে লাগিল। দিল্লী আবার নরশোণিতে প্লাবিত হইতে লাগিল। বিদ্রোহীদিগের নায়ক কেহই ছিল না, প্রকৃত যুদ্ধবিদ্যা কেহই জানিত না। যদি নগরে অবরুদ্ধ হইয়া না থাকিয়া, তাহারা বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিত, ৪০,০০০ বিদ্রোহী এক ফুৎকারে ক্ষুদ্র ইংরাজ-সৈন্য উড়াইয়া দিতে পারিত। সেনাপতি এবং নীতিশূন্য বিদ্রোহীগণ, কর্ণধারশূন্য অর্ণবযানের ন্যায়, এই ঝটিকায় উড়িয়া গেল। বিজয়ী নিকলসন, নগর প্রাচীরের উপর দাঁড়াইয়া পলায়নপর বিদ্রোহীদিগের ধ্বংসসাধন করিতেছিলেন, পার্শ্বস্থিত একটি কক্ষে লুক্কায়িত জনৈক বিদ্রোহীর গুলিতে তিনি পতিত হইলেন। কাশ্মীরদ্বারের অবস্থা ঠিক সেইরূপ ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক তোপের গোলার দাগে প্রত্যেক ভগ্নাংশে, সিপাহিবিদ্রোহের ইতিহাস অঙ্কিত রহিয়াছে। নিকলসন বিজয়ের সময়ে যেখানে পড়িয়া-ছিলেন, সেই স্থানটিতে একটি স্মৃতিলিপি আছে। শৈলমালার যে শৃঙ্গ হইতে দিল্লীতে গোলা বর্ষণ করা হয়, তথায় এখন মনোহর "বিজয়স্তম্ভ" বিরাজ করিতেছে। যুদ্ধে যাঁহারা পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম তাহার চারি পার্শ্বে মুদ্রিত রহিয়াছে। অনতিদূরে, যে "হিন্দু রাওর" অট্টালিকাতে ইংরাজগণ সমবেত হইয়াছিলেন, এবং যে গৃহে মহিলাগণ রক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের মধ্যস্থলে ধর্ম্মাশোকের ২,০০০ বৎসর পূর্ব্বের নির্ম্মিত, একটি নীতিস্তম্ভ উপরি-উক্ত বীরত্বের নিদর্শনের সঙ্গে ধর্ম্মের প্রতিযোগিতা করিতেছে, এবং নীরবে পার্থিব গৌরব ও সাম্রাজ্যের নশ্বরতা বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

দিল্লীবিজয়ের পর, বৃত্তিভোগী সম্রাটের পুত্রগণ প্রাণভয়ে হুমায়ুনের সমাধিতে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই বৃহৎ ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ সমাধি, ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে অবস্থিত। হুমায়ুনের পত্নী হাজি বেগম ইহা নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহার পুত্র সম্রাট আকবর শেষ করেন।* সমাধিটি একটি ক্ষুদ্র দুর্গ বলিলেও হয়। ইংরাজ সেনাপতি

হড্‌সন্ ইহা আক্রমণ করেন, এবং আত্মসমর্পণ করিবার জন্য, সম্রাটকুমারদিগের কাছে সংবাদ প্রেরণ করেন। তাঁহাদের প্রাণের কোনও বিঘ্ন হইবে না বলিয়া আশ্বস্ত করা হইলে, তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন। তখন, নৃশংস হড্‌সন্, এই শিশুদিগকে দিল্লীদ্বারের কাছে, বন্দীভাবে লইয়া গিয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগকে গুলি করিয়া বধ করেন। কেবল তাহাই নহে, মৃত কুকুরের ন্যায়, তাঁহাদের দেহ দিল্লীর প্রকাশ্য স্থানে ফেলিয়া রাখেন। নীচ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, মানুষ হিংস্র পশু হইতেও অধম হইয়া পড়ে। অবশ্য হড্‌সনের এই কসাইকার্য্যের স্থানদ্বয়ে কোন স্মৃতিলিপি নাই। কিন্তু যত কাল অতীত হইয়া যাইতেছে, যত লোকের মস্তিষ্ক সিপাহিবিদ্রোহ-সম্বন্ধে নৃশংসতাশূন্য হইতেছে, ততই হড্‌সনের নরপশুতা এরূপ জ্বলন্ত অক্ষরে ইতিহাসের অঙ্গে ভাসিয়া উঠিতেছে যে, তাহার উত্তরাধিকারী ও বন্ধুগণ, এ কলঙ্ক অপনয়ন করিবার জন্য এখন যত চেষ্টাই করুন না কেন, হতভাগ্য সম্রাটকুমারদিগের রক্ত তাহার হস্ত হইতে সর্ব্বপাপহারী অগ্নি কি পারাবারও অপনয়ন করিতে পারিবেন না। এইরূপে হড্‌সন্ আততায়ীর হস্তে, জগদ্বিখ্যাত মোগল-সাম্রাজ্যের শেষ ছায়াটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইল। সুকুমার শিশুর রক্তে, ইংরাজ-রাজ্য দিল্লীতে পুনরভিষিক্ত হইল। মানবের ইতিহাস কি শিক্ষার স্থল! বিশ্বেশ্বরের বিশ্বরাজ্যের নীতিসমূহ কি দূরদর্শী, কি দুর্লঙ্ঘ্য! তাই বলিয়াছি, দিল্লী হিন্দুদিগের মহাশ্মশান; মুসলমানদিগের পাঁচটি সাম্রাজ্য দিল্লীর ধূলোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। একে একে পাঁচটি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, পাপের পতন, দুর্ব্বলের ধ্বংস, সবলের উত্থান, কর্ম্মহীনের লয়, কর্ম্মীর বিজয়, নররাজ্যের নশ্বরতা, সৃষ্টিরাজ্যের অবিনশ্বরতা, অধর্ম্মের ক্ষয়, ধর্ম্মের জয়, দিল্লীর অঙ্গে অঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। পাঁচটি সাম্রাজ্যের ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, দিল্লী আজি কি উদাসীন মূর্ত্তিই ধারণ করিয়াছে। এত সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, এত বিপ্লব, পৃথিবীর আর কোনও নগর দর্শন করে নাই, ভারত ভিন্ন পৃথিবীর আর কোনও দেশ দর্শন করে নাই, হিন্দুজাতি ভিন্ন অন্য কোনও জাতি এত বিপ্লবতরঙ্গাভিঘাতে জীবিত থাকিতে পারে নাই। রোম নাই, গ্রীস নাই, তাহাদের অপেক্ষা প্রাচীন ভারত আছে। সেই রোমজাতি, সেই গ্রীকজাতি নাই, কিন্তু তদপেক্ষা পুরাতন হিন্দুজাতি কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়াও এখন আছে। ভারত পড়ে, মরে না। হিন্দুজাতি বলহীন হয়, জীবহীন হয় না। কর্ম্মহীন হয় না। ধর্ম্মহীন হয় না। ধর্ম্মের সঙ্গে কর্ম্মের যোগ হইলে, আবার মাথা তুলিয়া উঠিবে। বাহুবল নশ্বর, ধর্ম্মবল অমর।

আগ্রা।

পূর্ব্ব-পত্রে দিল্লীর কথা শেষ করিয়াছি। দিল্লীতে এক দিন হোটেলে, এবং দুই দিন বন্ধু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কালেজের প্রফেসরের বাসায় ছিলাম; আহার যোগাইতেন, দিল্লীর স্বনামখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র সেন। ইঁহারা দুটি দিন কি যত্নই করেন! দার্জিলিঙ্গে যে সর্দ্দি হইয়াছিল, তাহা দিল্লী পর্য্যন্ত ভুগিতেছিলাম। হেম বাবু খাওয়াইলেন, চিকিৎসা করিলেন, আসিবার সময়ে ঔষধ সঙ্গে দিলেন। আমি বলিলাম, আমি ঠিক যেন কবি হেম বাবুর 'বাঙ্গালীর মেয়ের' অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম,—

"খেয়ে যায়, নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে,
হায়! হায়! ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!"

দিল্লী হইতে আগ্রায় আসি। আগ্রায় প্রথম সেকেন্দরা দেখিতে যাই। সেকেন্দরা সম্রাট আকবরের সমাধি, আগ্রা হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। বাবর ও আকবরের হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি যে প্রবণতা ছিল, তজ্জন্য গোঁড়া মুসলমানেরা যে তাঁহাদিগকে কাফের বলিত,

—সেকেন্দরা দেখিলে তাহা বিলক্ষণ বলিতে পারা যায়। সেকেন্দরাটি ঠিক যেন একটি হিন্দুর দেবালয়। মুসলমান সমাধির সেই গোলাকার গুম্বেজের চিহ্ন মাত্র নাই। হিন্দু-দেবালয়ের চূড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সকল সমাধিতেই মূল কবর মাটিতে; তাহা মাটির স্তূপমাত্র। এই স্তূপের উপরের গৃহে, ঠিক একটি কবরাকৃতি, প্রস্তর কিংবা ইষ্টকের দ্বারা নির্ম্মিত হয়। এই কবরকক্ষটি সেকেন্দরাতে বড় অন্ধকার। সম্রাট আকবরের পোষাক যেমন আড়ম্বরশূন্য ছিল, তাঁহার কবরও সেইরূপ। তাহা কেবল একটি নির্ম্মল শ্বেতপ্রস্তরের বেদীমাত্র। গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক, এক সহস্র টাকা মূল্যের একখানি ছাদ না কি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাও শুনিলাম, মোল্লাগণ চুরি করিয়াছেন। অট্টালিকার ত্রিতলে একটি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত অতি সুন্দর কক্ষ আছে। ইহাতেও শ্বেত-মর্ম্মরের একটি কবরাকৃতি আছে। পূর্ব্বে দ্বিতল সুবর্ণে ও অন্য বর্ণে, রঞ্জিত ও চিত্রিত ছিল। তাহা কালে মলিন হইয়া গেলে, পুনঃসংস্কার করা বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া, ইংরাজরাজ তাহার উপর চূন-কাম্ করিয়া দিয়াছেন। সমাধিটি এখন দেখিতে ঠিক যেন শ্বেতবসনাবৃতা শোকাতুরা হিন্দুবিধবা। চারি দিকে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ উদ্যানে সজ্জিত ছিল। এখনও দুই চারিটি গাছ ও ফুল আছে। একটি সুন্দর গোলগৃহ সেই প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে এখন ইংরাজদিগের আরামগৃহের কার্য্য করিতেছে। আমি যে দিন দেখিতে যাই, সে দিন বহুতর সৈন্য ও তাহাদের কর্ম্মচারীরা বিহার করিতে আসিয়াছিলেন। সেকেন্দরা বহুকক্ষবিশিষ্ট। দুই একটি কক্ষে আরও দুই একটি কবর আছে। আকবর মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার উদার রাজনীতিবলে হিন্দুমুসলমানকে মিলিত করিয়া যে সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, তাহা অক্ষয় হইবে। কক্ষে কক্ষে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কবর হইবে। তিনি জানিতেন না যে, তিন পুরুষ না যাইতে, আরঙ্গজিব সেই নীতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া, সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিয়া যাইবেন। আজ সেকেন্দরার সমুদয় কক্ষ শূন্য পড়িয়া আছে। প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে আর একটি প্রাঙ্গণবিশিষ্ট ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকা আছে। শুনিলাম, আকবরের মৃত্যুর পর, তাঁহার পত্নী, যোধপুররাজকন্যা, যোধা বাই ইহাতে বাস করিতেন। মুসলমানী হইবার পরও, রাজপুত মহিষীগণ হিন্দুরমণীর পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেন।

অপরাহ্ণে প্রথমতঃ যমুনা পার হইয়া "রাম বাগ" বা "আরাম বাগ" দেখিতে যাই। এটি যমুনার উপর একটি বৃহৎ উদ্যান। যমুনার গর্ভ হইতে ইহার প্রাচীর সরলভাবে উঠিয়াছে!

তাহার পর এতমাদদ্দৌলা দেখিতে যাই। এটি নূরজাহানের মাতার এবং পিতার সমাধিগৃহ। সেই ভুবনমোহিনীর জনক-জননী পাশাপাশি নিদ্রা যাইতেছেন। সমাধিটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও, শ্বেতমর্ম্মর প্রস্তরের এরূপ সুচারু অট্টালিকা, যেন আর দেখি নাই। ঠিক যেন একটি ছবি। চারিদিকে সুন্দর ফলপুষ্পের উদ্যান এখনও রক্ষিত হইয়াছে।

তাহার পর যমুনা পার হইয়া আসিয়া, জগদ্বিখ্যাত তাজমহল এ জীবনে দ্বিতীয় বার দেখিতে যাই। তাজ তুমি দেখিয়াছ, অতএব তাহার কথা আর কি লিখিব? যিনি তাজ দেখিয়াছেন, তিনি যিনিই হউন, মোহিত হইয়াছেন। এক জন লিখিয়াছেন,—

"তাজ প্রকৃতই একটি কবিতা। উহা কেবল স্থাপত্যের একটি বিশুদ্ধ আদর্শ নহে; উহা এরূপ সৃষ্টি যে তাহাতে কল্পনার পরিতৃপ্ত হয়, কারণ সৌন্দর্য্যই উহার বিশেষ লক্ষণ। তুমি কি কখনও আকাশে দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছ? এই দেখ, এইটি আকাশ হইতে মর্ত্ত্যে আনীত হইয়াছে, এবং অনন্তকালের বিস্ময়ের জন্য এখানে স্থাপিত হইয়াছে। তথাপি উহা এমনই লঘুভার, এমনই বায়ুবৎ বোধ হয়, দূর হইতে দেখিলে, উহার গগনস্পর্শী চূড়াবলী-সহ এমনই শিশির এবং সূর্য্যালোকে নির্ম্মিত অট্টালিকা, সূর্য্যকিরণে ফুটনোন্মুখ একটি রজতবিম্ব বলিয়া বোধ হয় যে উহাকে স্পর্শ করিবার এবং উহার চূড়াতে চড়িবার পরও,

উহা প্রকৃত কি না তোমার সন্দেহ হয়।” শ্লীমেন বলেন,—“তাজদর্শনের পর, আমি আমার স্ত্রীকে অট্টালিকাসম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তর করিলেন, আমি কি মনে করি, তাহা তোমাকে বলিতে পারি না, কারণ এরূপ একটি অট্টালিকা সমালোচনা করিবার শক্তি আমার নাই। তবে আমার হৃদয়ের ভাব তোমাকে বলিতে পারি। এরূপ একটি সমাধি পাইবার জন্যে আমি কাল মরিতে পারি।” তাজ দর্শন করিয়া যে পথে তোমাকে লইয়া বেড়াইয়াছিলাম কেবল সেই পথেই বেড়াইলাম। যে স্থানে তোমাকে লইয়া বসিয়াছিলাম, কেবল সেই স্থানেই বসিলাম। উদ্যানের অন্য পথে যাইতে কি অন্য অংশ দেখিতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সেই পূর্ব্ব-দর্শন-স্মৃতিতে এবং আর একখানি মুখের স্মৃতিতে আমি বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছিলাম।

তাহার পর আগ্রার দুর্গ দেখিতে গেলাম। সেই দুর্গ আকবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা বলেন, তিনি এই নগরের নাম এ জন্যে আকব্বরাবাদ রাখিয়াছিলেন। তাহা হইতে আগ্রা। হিন্দুরা বলেন, ‘অগ্রবণ’ ইহার পূর্ব্ব নাম ছিল, তাহা হইতেই আগ্রা। দিল্লীর মত আগ্রাতে ঠিক সেইরূপ দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস, শিশমহল, মতিমসজিদ, দুর্গের বাহিরে জুম্মা মসজিদ পর্য্যন্ত আছে। তবে আগ্রার অট্টালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত বড়। কিন্তু দিল্লীর অট্টালিকা আমার চক্ষে অপেক্ষাকৃত সুন্দর বোধ হইয়াছিল। গৃহ সকল ঠিক দিল্লীর মত যমুনার তীরে অবস্থিত, ঠিক সেইরূপ—

“পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ অঞ্জন ও।”

দেওয়ান-খাসের ও স্নানাগারের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণে এক পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ এবং অন্য পার্শ্বে আর একটি শ্বেতমর্ম্মর আসন রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের পাণ্ডা বলিলেন, প্রথমটিতে স্বয়ং আকবর এবং দ্বিতীয়টিতে তাঁহার হিন্দুমন্ত্রী খ্যাতনামা বীরবল বসিয়া সান্ধ্য গগনতলে যমুনার লহরী দেখিতে দেখিতে মন্ত্রণা ও গল্প করিতেন। যাট সূর্য্যমল দিল্লী জয় করিয়া প্রথম আসনে বসিলে, আসন মনোদুঃখে বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং রক্ত উদ্গিরণ করে। পাণ্ডা সেই বিদীর্ণ রেখা ও একটি লাল দাগ রক্ত বলিয়া দেখাইলেন। অন্যদিকে অন্তঃপুরকক্ষের সংলগ্ন, রক্তপ্রস্তরে নির্ম্মিত, আর একটি প্রকাণ্ড অন্তঃপুর মহল আছে। এটি রাজপুতকন্যা যোধা বাইয়ের মহল বলিয়া খ্যাত। তিনি মুসলমান মহিষীগণ হইতে স্বতন্ত্র থাকিতেন এবং এই মুসলমান অন্তঃপুরেও হিন্দু আচার ব্যবহার রক্ষা করিতেন।

দেওয়ান-খাসে দাঁড়াইয়া যমুনার দিকে চাহিয়া মনে হইল,—

“তব জল কল্লোল সহ কত সেনা
নাদিল কোনও দিন সমরে ও।
তব জল বুদ্‌বুদ্ সহ কত রাজা
পরকাশিল, লয় পাইল ও।
আজি সব নীরব রে যমুনে! সব
গত তব বিভব কালে ও।”

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, সুললিত ‘যমুনা-লহরী’ বিষাদমগ্ন-হৃদয়ে গাহিতে গাহিতে আগ্রা দর্শন শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

আগ্রা হইতে আমরা জয়পুর যাই। দিল্লীর ডাক্তার হেম বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসারচন্দ্র সেন জয়পুরের মহারাজার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। তাঁহার মন্ত্রীও এক জন বাঙ্গালী—কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইহাঁরা উভয়ে জয়পুর স্কুলের শিক্ষক হইতে এরূপ উচ্চ পদ অধিকার করিয়াছেন। আমরা সংসার বাবুর অতিথি হই। যেখানে বাঙ্গালী, সেখানে দুর্গাকালী, সেখানে পাঁঠাবলি, আর সেখানেই দলাদলি।

জয়পুরে পঁহুছিয়াই আমরা প্রথমতঃ রাজবাটী দর্শন করিতে যাই। একটি প্রকাণ্ড নগরের অষ্টম ভাগ ব্যাপিয়া এই রাজবাটী। অতএব ইহার বর্ণনা কি করিব? ইহা একটি মনোহর হর্ম্ম্যাবলীর উদ্যান বলিলেও হয়। এক পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণের চারিদিকে সমুদয় বিচারালয় ও কার্য্যগৃহ সজ্জিত রহিয়াছে। রাজাদিগের রাজ্যে উচ্চতম কর্ম্মচারীরাও ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, যাবতীয় রাজকার্য্য ও বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এখানে আইনকানুনের তত ঘটা নাই, নর-রক্ত-শোষক জলৌকা উকিল মোক্তারের হট্টগোল নাই। বিচারকার্য্য একরূপ মোটামুটি সরল ও সহজভাবে নিষ্পন্ন করা হয়। বৃটিশ রাজ্যের ন্যায়, ধর্ম্মাবতারদের সুবিচার ও সূক্ষ বিচারের জালে পড়িয়া, প্রজাদের প্রাণান্ত হয় না। প্রেমিক বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন,—

"পরাণ ছাড়িলে পিরীত না ছাড়ে।"

বৃটিশরাজ্যেও তাই,—

"পরাণ ছাড়িলে উকিলে না ছাড়ে।"

হিন্দুরাজ্যে বিচারকার্য্য কিরূপ সহজে নিষ্পন্ন হইত, এ সকল স্থান দেখিলে কতক বুঝিতে পারা যায়। তবে ক্রমে ক্রমে সকলই "লাল" হইয়া যাইতেছে!

অন্য প্রাঙ্গণে "দেওয়ান-আম", তৃতীয় প্রাঙ্গণে "দেওয়ান-খাস," শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের দুগ্ধ ফেননিভ অমল ধবল শোভায় শোভা পাইতেছে। ইহাদের স্তম্ভের অবসরে, নানা বর্ণের পুরু পর্দ্দা ঝুলান রহিয়াছে এবং গৃহ বহুমূল্য উপকরণে ও স্ফটিক ঝাড়ে সজ্জিত রহিয়াছে। এই দুই গৃহ দেখিলে, দিল্লীর ও আগ্রার দেওয়ান-গৃহ সকল কিরূপ সজ্জিত থাকিত, বুঝিতে পারা যায়। রাজবাটীর কেন্দ্রস্থলে মহারাজার আবাস-ভবন 'চন্দ্রমহল।' একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা, বহুমূল্য ইংরাজী উপকরণে সজ্জিত। তাহার পশ্চাতে প্রশস্ত পুষ্পোদ্যান, জলপ্রণালীতে বিভক্ত এবং ফোয়ারাতে শোভিত। উদ্যানের অপর প্রান্তে 'গোবিন্দজীর' মন্দির। বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়া গোবিন্দজী এই রাজপুরী মধ্যে স্থাপিত হন। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত, বড় সুন্দর বলিয়া শুনিলাম। কিন্তু আমি তেমন অসামান্য সৌন্দর্য্য কিছু দেখিলাম না। পূজক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালী। এক দল রাজপুতনী বসিয়া কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন করিতেছে, মধ্যস্থলে একজন অর্দ্ধনগ্ন পুরুষ দাঁড়াইয়া ভক্তিভরে নৃত্য করিতেছে। দৃশ্যটি হৃদয়স্পর্শী, অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম ও শুনিলাম। তাহার পর, মৃত মহারাজ রাম সিংহের বৈঠকখানা দেখিলাম। উহা এখন বিলিয়ার্ড খেলার গৃহ হইয়াছে। উহার উপকরণে এখন 'চন্দ্রমহল' সজ্জিত হইয়াছে! তাহার পর 'বাদলমহল।' ইহা একটি বৃহৎ নীল সলিলপূর্ণ সরসীতীরে শোভিত। সম্মুখে উদ্যান, পশ্চাতে সরোবর। অট্টালিকা সুন্দর, সুশীতল। বর্ষাকালে মহারাজ এখানে একদিন দরবার করেন। রাজবাটীর আর এক প্রান্তে 'হাওয়াই মহল' বহু তলায় একটি অতি উচ্চ রথের মত শোভা পাইতেছে। বোধ হয়, এই অট্টালিকাতে গ্রীষ্মকালে বেশ বাতাস খেলে বলিয়া, ইহার নাম 'হাওয়াই মহল।' মহল হইতে মহলান্তরে এবং রাজবাটির সর্ব্বত্রে বিচরণ করিবার জন্যে, আবৃত ইষ্টকনির্ম্মিত পথ সকল শ্বেত লতার মত চারিদিকে নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরবাসী অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসীরা এই সকল পথে সর্ব্বত্রে যাতায়াত করেন। মহারাজ যে রাত্রি যে মহিষীর সঙ্গে অতিবাহিত করিবেন, আদেশ করিলে, তিনি সজ্জিতা হইয়া, এই সকল পথে,

'চন্দ্রমহলের' অপর পার্শ্বস্থিত অন্তঃপুর মহল হইতে প্রোষিতভর্ত্তৃকা হইয়া অভিসারে উপস্থিতা হন। তুমি যদি একজন রাজমহিষী হইতে, তবে কি করিতে বল দেখি? অথচ ইহাঁরাই অম্লানবদনে স্বামীর চিতারোহণ করিতেছেন। শুধু তাহা নহে। বর্ত্তমান মহারাজ এক জন বৃন্দাবনের ভিখারীমাত্র ছিলেন। সে কথা পরে বলিব। তিনি জয়পুরের সিংহাসন পাইবার পর, যোধপুরের রাজকন্যাকে, ইহাঁদের রাজনীতি অনুসারে, বিবাহ করেন। কিন্তু, তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্ত্রীকে, শুনিলাম, সমধিক ভাল বাসেন। একদা রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কিছু যদি বাঞ্ছনীয় থাকে, আমাকে বল, তুমি আমায় কখনও কিছু চাহ নাই।" পতিব্রতা সতী উত্তর করিলেন ;—"আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। লোকে আশীর্ব্বাদ করে, 'তোর স্বামী মহারাজ হউক।' বিধাতা আমার স্বামীকে মহারাজ করিয়াছেন, অতএব আমার আর বাঞ্ছনীয় কি হইতে পারে?" মহারাণী হইয়াও ইহাঁর চরিত্রের কিছুমাত্র রূপান্তর হয় নাই। ইনি রাজার মহিষীভার গ্রহণ না করিয়া, দাসীভাবে পূর্ব্ববৎ তাঁহার সেবা করেন। এক পাত্রে আহার করেন, ছায়ার মত তাঁহার সংগে থাকেন। সতিনী মহাতেজস্বিনী রাজপুত-কন্যা। গল্প এরূপ যে, মহারাজ এক দিন তাঁহার কি একটি কথা গ্রাহ্য করেন নাই। বীরবালা লম্ফ দিয়া প্রাচীর হইতে অসি লইয়া নিষ্কোষিত করেন, ভয়ে মহারাজ চণ্ডিকার পদানত হন। এরূপ সপত্নীর ছায়াতে থাকিয়াও, পূর্ব্ব পত্নী যে সতীত্বের ও নারীত্বের আদর্শ দেখাইতেছেন, তাহাতে সমস্ত জয়পুর মোহিত।

অপরাহ্নে আমরা জয়পুরের শিল্প বিদ্যালয় দেখিতে যাই। মৃত মহারাজ রাম সিংহের এটি একটি মহৎ কীর্ত্তি, তিনিই ইহা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এখানে চিত্রের, কাষ্ঠের, পিত্তল কাঁসা এবং মাটির পাত্র ও পুতুল ইত্যাদি নির্ম্মাণের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শিল্পবিদ্যার বেশ উৎকর্ষ দেখিলাম। একটি কমণ্ডলু কিনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল। তাহারা কিনিতে দিল না। বোধ হয়, ভেক লইব বলিয়া ভয় হইয়াছিল!

তাহার পর, মহারাজের 'রামবাগ' দেখিতে যাই। এত বড় এবং মনোহর উদ্যান, বুঝি, আর কোথাও নাই। তাহার এক পার্শ্বে মিউজিয়াম বা 'আজবের ঘর' নির্ম্মিত হইতেছে। এই গৃহটির নির্ম্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে? ঘর ত নহে, একখানি ছবি। একটি প্রশস্ত দুই তল উচ্চ 'হল', তাহার তিন পার্শ্বে কক্ষের সারি, তাহার পার্শ্বে একটি প্রাঙ্গণ এবং চতুঃপার্শ্বে আবার কক্ষের সারি। কক্ষ সকল স্বর্ণমিশ্রিত নানা বর্ণে সুকৌশলে চিত্রিত। হলের উপরিস্থ গবাক্ষে, কাচে, নানা বর্ণে কৃষ্ণের ব্রজলীলা চিত্রিত রহিয়াছে। অট্টালিকার প্রাচীরের গায়ে স্থানে স্থানে মহাভারত ও রামায়ণের নানা দৃশ্য চিত্রিত হইয়াছে। উদ্যানে ফোয়ারা ছুটিতেছে, চক্রাকারে ঘুরিতেছে ; ব্যাণ্ড বাজিতেছে ; তালে তালে রাজপুত সর্দ্দার-গণের অশ্ব ছুটিতেছে। এখনও তাহাদের পার্শ্বে তরবারি ঝুলিতেছে, অস্তমিত বীরত্বের ও রাজপুত ইতিহাসের সাক্ষী দিতেছে। গ্যাসের আলোকে, অট্টালিকা ও উদ্যান অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মুহূর্ত্ত সেই শোভা নয়ন ভরিয়া দেখিলাম।

পর দিবস প্রাতে, হস্তিপৃষ্ঠে, ঐতিহাসিক 'আম্বের' দেখিতে গেলাম। জয়পুরের নগরতোরণ পার হইয়াই আম্বেরে প্রবেশ করি। প্রবাদ, আম্বেরে মহামারী হওয়াতে, রাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক তাহার পার্শ্বে জয়পুর নগর স্থাপিত হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পুরাতন আম্বেরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম একটি প্রশস্ত ঝিল ও তাহার মধ্যস্থলে একটি সুন্দর অট্টালিকা জীর্ণাবস্থায় শোকের মূর্ত্তির মত দণ্ডায়মান দেখিলাম। পশ্চাতে পর্ব্বতশ্রেণী। তাহার পর, আম্বের-দুর্গের তোরণে প্রবেশ করিয়া, দুর্গে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলাম। আম্বের দুর্গ গিরিশেখরে। তাহার পাদমূলে আর একটি ঝিল, তাহার মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র ফলপুষ্পের উদ্যান কি শোভাই বিকাশ করিতেছে! এই ঝিলের পার্শ্ব বহিয়া, আমরা খ্যাতনামা আম্বের-দুর্গে প্রবেশ করি। প্রথম একটি প্রশস্ত

প্রাঙ্গণ। তাহার চারি পার্শ্বে অশ্বশালা ও সৈনিকনিবাস। এক দিকে, দ্বিতলে একটি সুন্দর মন্দিরে, 'যশোরেশ্বরী কালী' বিরাজ করিতেছেন। প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া আনিবার সময়ে, মানসিংহ, জননীকেও বন্দিনী করিয়া আনিয়া তাঁহার রাজপুরী মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। আমরা যখন দর্শন করি, তখন পূজা শেষ হইয়াছে। প্রত্যহ একটি অজমুণ্ড মাতাকে বলিদান দেওয়া হয়। মাতার সঙ্গে বঙ্গদেশের এই নৃশংস জীবহিংসা-পাপও এখানে প্রবেশ করিয়াছে। তবে ইহারা বীরপুরুষ। ইহাদের বলিদান পদ্ধতি বঙ্গদেশের মত তেমন নিষ্ঠুর ব্যাপার নহে। মানুষ যত কাপুরুষ হয়, ততই নিষ্ঠুর হয়। নিতান্তই বলিদান দিতে হইবে, তাই যেন অনিচ্ছায়, প্রাঙ্গণের এক কোণে এই কার্য্য সমাপন করা হয়। খানিকটা বালির উপর ছাগলটিকে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া, অকস্মাৎ খড়্গাঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করা হয়। রক্তটা বালির উপর মাত্র পড়ে, এবং প্রাঙ্গণভূমি স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হয়। আমাদের দেশের সেই বাদ্য, সেই নৃত্য, সেই মহিষ পাঁঠার উপর বীরত্ব, সেই ফাঁস, সেই হাঁড়িকাঠ, সেই টানাটানি, সেই পশুত্ব, সেই হৃদয়-বিদারক নিষ্ঠুরতা এখানে নাই। হরি! হরি! ধর্ম্মের নামে জগতে কত অধর্ম্মই সাধিত হয়। মানুষ যখন অম্লানবদনে নরবলি, এমন কি পুত্র কন্যা বলি পর্য্যন্ত দিতে পারে, তখন এই নির্ব্বাক নিরপরাধ পশুহত্যা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে কেন?

মন্দিরের পর, দেওয়ান-আম, দেওয়ান-খাস, অন্তঃপুর-মহল ইত্যাদি ঠিক দিল্লীর অনুকরণেই সজ্জিত রহিয়াছে। সকলই শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, শিশমহলটি যেন দিল্লী আগ্রা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। একটি কক্ষে কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থস্থানের দৃশ্য প্রাচীরে চিত্রিত রহিয়াছে। চিত্রকর যে বর্ত্তমান শিল্প-বিজ্ঞানে নিতান্ত অপটু ছিল, এমন বোধ হইল না। ইহারই পার্শ্বে আবার প্রকাণ্ড অন্তঃপুর-মহল। তাহাতে যাবতীয় অন্তঃপুরবাসিনীগণ বাস করিতেন। আজ তাহা ব্যাঘ্রের বাসস্থান হইয়াছে। কালের ও মানব-অদৃষ্টের কি বিচিত্র গতি! শুনিলাম, ব্যাঘ্রে সম্প্রতি মানুষ মারিয়াছে। তাই বাঙ্গালী বীরমন্ত্রী, অন্তঃপুরমহলের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া, অন্তঃপুর-মহলে ব্যাঘ্রদিগের নির্ব্বিবাদ অধিকার করিয়া দিয়াছেন। বীরকুলর্ষভ মানসিংহ এই আম্বের-দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করেন। যে মানসিংহ কাবুল হইতে বঙ্গদেশের যশোর পর্য্যন্ত বিজয় করেন, যাঁহার অসির অগ্রভাগে আকবরের মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত ছিল, যে আম্বেরের নামে সমস্ত ভারত আসিন্ধু হিমাচল কম্পিত হইত, এবং যাঁহাকে মোগল সম্রাট আকবর পর্য্যন্ত ঈর্ষ্যা ও রাগরক্ত নয়নে দর্শন করিতেন, আজ সেই আম্বেরের, সেই মানসিংহের আম্বেরের এই অবস্থা। তাঁহার অন্তঃপুর ব্যাঘ্রপুরে পরিণত হইয়াছে। মানসিংহ, তোপের মুখে বীর-কুলতিলক প্রতাপসিংহকে অপমানের উত্তর দিয়াছিলেন, তোপের মুখে চিতোর ধ্বংস করিয়াছিলেন। আজ চিতোরের যে দশা, তাঁহার প্রাণপ্রতিম আম্বেরেরও সেই দশা! কাল, মনুষ্যগর্ব্বের ও পাপের কি ভীষণ পরীক্ষক ও দণ্ডবিধাতা! আম্বেরের দুর্গস্থিত রাজ-বাটীর শীর্ষকক্ষ হইতে, পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত, ভগ্নগৃহপূর্ণ হত গৌরব আম্বের, এবং পার্শ্বস্থিত জয়পুর দেখিতে দেখিতে, হৃদয় কি বিষাদে, কি গাম্ভীর্য্যেই পরিপূর্ণ হইয়াছিল! এখনও শৃঙ্গে শৃঙ্গে দুর্গ বিরাজিত। ঠিক যেন প্রাণশূন্য শব, ঠিক যেন বীরপুরুষের দেহ-কঙ্কাল শৃঙ্গে শৃঙ্গে দেখা যাইতেছে। তাহার ভিতর ছিন্ন বস্ত্রে, ভগ্ন অস্ত্রে সজ্জিত, কতকগুলি শৃগালকুক্কুরাধম সৈন্য আছে। দেখিলে লোকের ঘৃণা হইবে। সেই জন্যে, এ সকল দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি এই শৃঙ্গস্থিত দুর্গমালা, গহ্বরস্থিত মৃত নগরের সমাধি এবং জীবিত নগরের চাক্‌চিক্য দেখিয়া ভাবিলাম,—

"ভারতে যেমতি পুরাকালে হায়!
শোভিত আসর আলোকমালায়

যেমতি গাইত গীত গায়িকায়,
পূরিয়া যামিনী সংগীত সুধায়।
সেই নৃত্যগীত রয়েছে সকল,
কিন্তু কোথা গেল সেই বীর্যবল?"

ভাবিতে ভাবিতে চিন্তাবসন্ন হৃদয়ে জয়পুরে ফিরিলাম। জয়পুর বাঙ্গালীর বড় গৌরবের স্থান। নগরটি অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত ও সজ্জিত। প্রশস্ত রাজপথ সকল জয়পুরকে ঠিক যেন একটি শতরঞ্চ খেলার ঘরের মত বিভক্ত ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিমে সরল রেখায় রাজপথ সকল সারি সারি ছুটিয়াছে। দুই দিকে একরূপ দ্বিতল গৃহশ্রেণী। কি নগর কি রাজবাটী, হুগলীর বিদ্যাধর নামক জনৈক জ্যোতিষী ব্রাহ্মণের কল্পনাপ্রসূত। আজও বাঙ্গালী জয়পুরের মন্ত্রী এবং রাজসহায়; তাই বলিতেছিলাম, জয়পুর বাঙ্গালীর বড় গৌরবের স্থান। মহারাজ জয়সিংহ এক জন প্রতিভাসম্পন্ন জ্যোতির্যবিৎ ছিলেন। আপন প্রতিভাবলে, নানাবিধ জ্যোতিষ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া, ইনি জ্যোতিষ অনুশীলনের জন্যে, স্থানে স্থানে মান-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দিল্লীর বহির্ভাগে এরূপ একটি অদ্ভুত মন্দির ছিল। এই অধঃপতনের দিনে লোকে ইহার নাম 'যন্ত্র-মন্ত্র' দিয়াছে। জয়পুর রাজবাটীর এক কোণেও এইরূপ একটি প্রশস্ত মান-মন্দির আছে। জয়সিংহের সিংহাসনে এমনি শৃগাল সকল বসিয়া তাঁহার অনির্ব্বচনীয় অবমাননা করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষের এই অদ্বিতীয় অতুলনীয় গৌরবনিদর্শন সকল সর্ব্বত্র ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই হস্তি-মূর্খদের কাছে এতাদৃশ প্রতিভার সম্মান হইবে কেন? যে অর্থ ইঁহারা প্রতি-বৎসর ইংরাজের পদসেবায় ব্যয়িত করেন, যে অর্থ বর্ত্তমান 'রামবাগের' মিউজিয়মে ব্যয়িত হইতেছে, তাহার ভগ্নাংশমাত্রে এ সকল সংস্কৃত ও রক্ষিত হইতে পারে। এ কথাটা মহারাজকে বলিতে আমি সংসার বাবুকে বলিয়াছি। তিনি বলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যে উদ্যান নির্ম্মিত হইতেছে, তাহা যদি আম্বেরের দুর্গের পাদমূলে উপত্যকায় নির্ম্মিত হইত, মিউজিয়মটি যদি প্রথমোক্ত ঝিলের কেন্দ্রস্থলে নির্ম্মিত হইত, তবে পুরাতন আম্বের পুনর্জীবিত হইত, এবং শিল্পের সঙ্গে প্রাকৃতিক শোভা মিলিয়া কি অপূর্ব্ব দৃশ্যেরই সৃষ্টি করিতে পারিত! কিন্তু সে সহৃদয়তা, সে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, দেশীয় রাজাদের থাকিবে কেন? তাহা হইলে তাঁহারা ভারতীয় রাজা হইতেন না।

জয়পুরের বর্ত্তমান মহারাজ কায়েম সিংহ সম্বন্ধে গোটা দুই-গল্প বলিব। ইনি জয়পুর রাজ্যের এক জন সামান্য সর্দ্দার ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে তাঁহার বিরোধ হয়, এবং তিনি রাজবিচার অগ্রাহ্য করিয়া যুদ্ধ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ এবং তাঁহার দমনার্থ রাজসৈন্য প্রেরিত হইলে, ইনি পরাভূত হইয়া পলায়ন করিয়া বৃন্দাবনে যান, এবং সেখানে ভিক্ষুকের মত সস্ত্রীক থাকেন। এ দিকে অপুত্রক রাজা রাম সিংহ মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন, এবং কায়েম সিংহের বীরত্বে এবং তেজস্বিতায় প্রীত হইয়া, তাঁহাকে উত্তরাধি-কারিত্বে মনোনীত করেন। কায়েম সিংহ, 'মাধো সিংহ' নাম গ্রহণ করিয়া, জয়পুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অদৃষ্টের আবর্ত্তনে বৃন্দাবনের ভিক্ষুক জয়পুরের মহারাজ হইল। তিনি নির্ব্বাসন সময়ে অসাধারণ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার অনেক অদ্ভুত গল্প করেন। এখন যাহারা রাজবাটীর এবং তাঁহার নিজের ভৃত্য ও রাজ-কর্ম্মচারী, তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া বলেন, "এই ব্যক্তি ঘুষ না পাইলে আমাকে গলায় ধাক্কা দিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে দিত না, এই কর্ম্মচারী ঘুষ না পাইলে আমার কারাবাসী সহচরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে দিত না। রাজকর্ম্মচারীদের সকলের দোষগুণ আমি জানি এবং রাজনীতি সকল কি কৌশলে ব্যর্থ করিতে পারা যায়, আমি তাহাও

জানি," অথচ তিনি সিংহাসনে বসিয়া একটি কর্ম্মচারীকেও কর্ম্মচ্যুত করেন নাই।

একদিন সংসার বাবুকে দেখাইয়া, তাঁহার পরিচারকবর্গের সমক্ষে, সংসার বাবুর ছোট ভাই পূর্ণ বাবুকে বলেন—"তোমার যে এই দাদাটি দেখিতেছ, ইনি বড় সহজ পাত্র নহেন। ইনি স্কুলে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমাকে মারিবার জন্য বলিতেন, 'কায়েম সিংহ! হাত লাও।' আরে! মার খানেকে ওয়াস্তে কোই ক্যা হাত লাতায়? আমি প্রাণান্তে হাত বাড়াইতাম না, এবং উনি মারিতে আসিলে, আমি টেবিলের চারিদিকে ঘুরিতাম। উনি তাড়াইয়া তাড়াইয়া আমাকে মারিতেন। আমি এক এক বার মনে করিতাম, ধরিয়া হাড় গুঁড়া করিয়া দি। এখন করযোড় করিয়া আমার সমক্ষে দাঁড়াইয়া আছেন। আর এখন যদি আমি বলি, 'হাত লাও!'—বাপ! কি মারটাই আমাকে মারিয়াছে!" সকলে হাসিতে লাগিল। সংসার বাবুও হাসিয়া বলিলেন—"মহারাজ! আমি যদি জানিতাম, তুমি জয়পুরের মহারাজ হইবে, আমি তোমাকে আরও বেশী করিয়া মারিয়া শিক্ষা দিতাম।" দেখিলে, যেমন শিষ্য, তেমনি গুরু কিনা? এখন তিনি সংসার বাবুকে ছায়ার মত সঙ্গে রাখেন, এবং একজন সামান্য লোকের ন্যায় যখন তখন কান্তি বাবুর বাড়ী যান। এই দুই গল্পে তুমি লোকটি কি প্রকার চতুর, তেজস্বী ও সহৃদয়, তাহা বুঝিতে পারিবে।

আর কত লিখিব। জয়পুরে দু'দিন রাজভোগ খাইয়াছি, রাজার গাড়ীতে ও হাতীতে রাজার মত সম্মানে রাজ্য পরিদর্শন করিয়াছি। মহারাজ যদিও তখন জয়পুরে ছিলেন না, তথাপি রোজ সংসার বাবুর বাড়ীতে রাজার পাকশালা হইতে আহারীয় আসিত। রান্নাতে ঝালটুকু যেন বেশি। ভারতীয় রাজারা দিন দিন ইংরাজ পলিটিকেল দ্বারা যেরূপ অপমানিত হন, ঝাল খাইয়াই সেই ঝাল নিবারণ করেন। এক দিন মহারাজ গবর্ণর-জেনেরেলের ইভিনিং পার্টিতে গিয়াছেন। আমাদের দেশের এক জন বিলাসী, ইংরাজ-পছন্দ, সাহেবী ধরণের মহারাজকে, সেখানে সুরাপান করিতে ও কেক খাইতে দেখিয়া, সংসার বাবুকে বলিলেন, "ইহার বাড়ীতে কি খাওয়া মেলে না? এখানে ঝুটা খাইয়া বেড়াইতেছে কেন?"

পুষ্কর।

কাল প্রাতে আজমীর পঁহুছিয়া পুষ্কর দেখিতে যাই। পুষ্কর যেমন মনে করিয়াছিলাম, তেমন কিছুই নহে। গোবর্দ্ধনের মত একটি নৈসর্গিক সরোবর মনে কর। গোবর্দ্ধন হইতে কিঞ্চিৎ বড় হইলেও, দেখিতে তেমন মনোহর নহে। সেইরূপ একটি ঝিল। তাহার দুই পার্শ্বে সারি সারি অট্টালিকা। অন্য দুই দিকে অট্টালিকাশ্রেণী কিছু বিরল। কিঞ্চিৎ দূরে, চারি দিকে রাজগিরের পাহাড়ের মত পাহাড় তরঙ্গিত ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। জলের বর্ণ নীল, কিন্তু এত ময়লা যে, ব্রহ্মা তাঁহার যজ্ঞের উপযোগী মনে করিয়া থাকিলেও, আমি তাহা কোনও মতে স্পর্শ করিতে মনে প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারিলাম না। তারাচরণ পাঁচ ডুব দিয়াছেন, যদি কিছু পুণ্য হইয়া থাকে, অবশ্য আমি তাহার অংশ পাইব। কারণ তারাচরণ আমাকে যেরূপ ভালবাসে, স্বর্গের ভাগ দিতেও কখন কাতর হইবে না। পুষ্করের মধ্যস্থলে, একখানি উপলখণ্ডের উপর, জনৈক মকর মহাশয় নিদ্রা যাইতেছিলেন, কি তপস্যা করিতেছিলেন, বলিতে পারি না। যজ্ঞ-জলে তাঁহারও যেন অতৃপ্তি হইয়াছে, কারণ আমরা যতক্ষণ ছিলাম, ততক্ষণ তিনি নিশ্চল ছিলেন; একটি বারও জলে নামিলেন না।

পুষ্কর দর্শন করিয়া, একখানি ক্ষুদ্র খাটুলি চড়িয়া, সাবিত্রী দেবীর দর্শনলাভ করিতে পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করি। খাটুলি সামান্য দড়ির বন্ধন, স্থানে স্থানে ঠক ঠক

করিয়া পাথরে লাগিতেছিল, আর আমি ভাবিতেছিলাম, ভারতভ্রমণ বুঝি এই খানেই শেষ হইল। প্রায় এক ঘণ্টাকাল আরোহণ করিবার পর, আমরা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। একটি ক্ষুদ্র মন্দির। দুটি শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি—সাবিত্রী ও সরস্বতী। দুটি মূর্ত্তিই যেন জৈন বলিয়া বোধ হইল। পর্ব্বতশেখর হইতে দৃশ্যটি মনোহর, কিন্তু কঠোর। শ্রেণীর পর শ্রেণী বাঁধিয়া বন্ধুর পর্ব্বতমালা শোভা পাইতেছে। মধ্যে মধ্যে মাড়োয়ারের বন্ধুর উপত্যকা, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে ও শস্যক্ষেত্রে বিচিত্রিত। পাদমূলে পুষ্কর ও বাপী-তীরস্থিত নগর, শ্বেত পুষ্পে পুষ্পিত, একটি মনোহর উদ্যানের মত শোভা পাইতেছে। কিন্তু, চন্দ্রশেখরের দৃশ্যের কাছে ইহা কিছুই নহে।

অবতরণসময়ে ব্রহ্মার মন্দির দর্শন করি। লোকটি নিতান্ত অরসিক ছিলেন না, তাঁহারও শুক্লপক্ষের ও কৃষ্ণপক্ষের দুই বনিতা। সাবিত্রী দেবীর যজ্ঞে আসিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখিয়া, তিনি নবযৌবনসম্পন্না 'বালস্ত্রী' গায়ত্রী দেবীকে বিবাহ করেন। সাবিত্রী দেবীও আমাদের বঙ্গলক্ষ্মী, তিনি চটিয়া লাল। পাহাড়ে চড়িয়া নব দম্পতীকে অভিশাপ দিলেন যে, তাঁহার চরণধৌত জল তাঁহাদের মস্তক পাতিয়া লইতে হইবে। বড় বেজায় কথা! স্বয়ং ব্রহ্মার যদি এই দশা হয়, তবে আমরা গরিব কোথায় যাই? মন্দিরে ব্রহ্মার শ্বেত প্রস্তরের চতুর্ম্মুখ মূর্ত্তি এবং পার্শ্বে সেই ছোট ঠাকুরাণী। বুড়া এত চোটের পরও নব যৌবনের মায়া ছাড়িতে পারে নাই!

মোট কথা, পুষ্কর সত্যযুগে বোধ হয় একটি অতি মনোজ্ঞ ও অতি পবিত্র স্থান ছিল। শৈলমালাবেষ্টিত একখণ্ড গভীর নির্ম্মল সলিল দর্পণ, তাহার চারি পার্শ্বে বৃক্ষলতা-শোভিত, নানাবিধ পক্ষীর কলগানে মুখরিত, এবং যজ্ঞধূমে সমাচ্ছন্ন, আশ্রমাবলী হইতে বেদধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে: দৃশ্যটি না জানি কি পবিত্র, কি হৃদয়গ্রাহী ছিল। যদি ইউরোপীয় কোন জাতির তীর্থ স্থান হইত, তবে পুষ্কর আজ ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইতাম। সেই দৃশ্যটির সৃষ্টি করা বড় বেশী ব্যয়সাধ্যও নহে। ইহার চারিদিকে এখনও কত হিন্দু রাজা আছেন। কিন্তু তাঁহারা এরূপ মহাপাতক করিবেন কেন?

ফিরিয়া আসিয়া, সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, আজমীরস্থ বিখ্যাত ফকিরের দরগা দেখিতে যাই। ইনিই কুক্ষণে আমাদের ভারতবর্ষে মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্যে প্রথম প্রবেশ করেন। পার্শ্বে জৈনদিগের একটি অতি বৃহৎ, অতি প্রশস্ত, এবং মনোহর কারুকার্য্যে খচিত দেবালয় ছিল। মহম্মদ ঘোরি আজ্ঞা প্রচার করেন যে, এই মন্দিরে তিনি জুম্মার নমাজ পড়িবেন। জুম্মার ২৷৷ দিন বাকি। ২৷৷ দিবসের মধ্যে হিন্দুর দেবালয় ভগ্ন করিয়া কথঞ্চিৎ মসজিদের আকৃতি করা হয়। ইহার নাম সেই জন্য ২৷৷ দিনের ঝোপরা। সেই দেবালয়ের প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ, কারুকার্য্যে এখনও শোভা পাইতেছে। বোধ হয়, এই দেবালয়ের প্রস্তরের দ্বারা পার্শ্বস্থিত দরগা নির্ম্মিত হয়। কবরের চারিদিকে রূপার রেলিং। প্রশস্ত প্রাঙ্গণের এক সীমাতে বাদসাহ আকবর ও সাহজাহান নির্ম্মিত মসজিদ, দেওয়ান-খাস ইত্যাদি গৃহ বর্ত্তমান আছে। প্রবাদ, সমস্ত একটি শিবালয় ছিল। কাপুরুষের দেবতাও কাপুরুষ হইয়া থাকে। কালা পাহাড়ের ভয়ে শিব পাতালে প্রবেশ করেন। মুসলমানেরা বলেন, ফকির এই পথে তিরোহিত হইয়াছিলেন। এই দরগাতে দুটি প্রকাণ্ড তামার ডেক, দুটি ইষ্টকনির্ম্মিত চুল্লির উপর বিরাজ করিতেছে। দেখিতে যেন এক একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। ১৫০০৲ এবং ৯০০৲ টাকা ব্যয় করিলে, ইহার এক একটিতে খিচুড়ী পাক হয়, এবং লোকেরা কম্বল জড়াইয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া তাহা লুটিয়া খায়।

একটি শোক-ইতিহাস ইহার সঙ্গে জড়িত আছে। আলাউদ্দিন চিতোর জয় করিয়া, এক যোড়া রজত-খচিত চন্দনের কপাট, একটি পিত্তলনির্ম্মিত প্রদীপের বৃক্ষ বা ঝাড়, এবং দুইটি নাকাড়া এখানে আনিয়া, তাহার বিজয়পতাকা চিহ্ন-স্বরূপ প্রকাশ্য স্থানে রাখে।

তাহা এখনও আছে। অপমানে, অভিমানে, চিতোরাধিপতি প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্য্যন্ত তাহা উদ্ধার করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত মেবারেশ্বর আজমীরে প্রবেশ করিবেন না। তিনি বহু যুদ্ধেও এই প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারেন নাই। রাজপুতনার সেই সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, তথাপি, উদয়পুরের রাণা একবার ইংরাজ কর্ত্তৃক বাধ্য হইয়া এখানে আসিয়াও নগরের বাহিরে ছিলেন, মধ্যে প্রবেশ করেন নাই।

রাজপুতানার অধঃপতন, হিন্দুধর্ম্মের এই দুর্গতি, তারাগড় নীরবে শৈলসানু হইতে চাহিয়া দেখিতেছেন। এ দুর্গ পৃথ্বীরাজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহার তোরণে এখন বৃটিশ বৈজয়ন্তী উড়িতেছে।

অদ্য প্রাতে আনা-সাগর দেখিতে যাই। আনা নামক রাজা, নদী স্রোত বন্ধ করিয়া, এই সাগর সৃষ্টি করেন। ইহার তিন দিকে শৈলমালা, এক দিকে বাঁধ এবং তদুপরি ভগ্ন হিন্দু রাজভবনের উপর মোগলদিগের রাজপ্রাসাদাবলী বিরাজিত রহিয়াছে। ইহার শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত দেওয়ান-আমে. জাহাঙ্গীর প্রথম ইংরাজ রাজদূত সার টমাস রোয়ের সঙ্গে কুক্ষণে সাক্ষাৎ করেন। এইরূপে এইখানে দুইটি সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হয়, ভারতের দুইটি মহা-কুদিন এখানে আমাদের অদৃষ্টগগনে সঞ্চারিত হয়। সেই সকল শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকাতে এখন কমিশনর বিহার করিতেছেন, এবং তাহাতে তাঁহার আফিস ও মিউনিসিপাল আফিস বিরাজ করিতেছে। জগতের কি বিচিত্র গতি! বাদসাহরমণীদের ক্রয়-বিক্রয় করিবার জন্যে যে "মিনাবাজার" ছিল, এখন তাহা উদ্যানের কুলির নিবাস!

একটি বড় সুন্দর গল্প শুনিলাম। এই উদ্যানের ও সাগরের উপরিস্থ এক অনুচ্চ শিখরে রাজপুতানার এজেন্টের উপনিবাস। একদা তিনি এখানে পদার্পণ করিলে, সৌধ-চূড়ায় তাঁহার বৈজয়ন্তী উড়িল। কিন্তু ততোধিক উচ্চ শৈলে, হনুমানজীর আস্তানায়, তাঁহার বৈজয়ন্তী উড়িতেছে। রাজপুরুষ তাহা সহিতে পারিলেন না। তিনি আস্তানার সন্ন্যাসীকে ডাকিয়া বলিলেন যে, রাজপ্রতিনিধির বৈজয়ন্তী অপেক্ষা হনুমানের বৈজয়ন্তী ঊর্দ্ধে থাকিতে পারিবে না। সন্ন্যাসী হনুমানের চেলা, তাহার কিঞ্চিৎ বীরত্ব থাকিবার কথা। সে বলিল, রাজপ্রতিনিধির অপেক্ষা ঈশ্বরের বৈজয়ন্তী ত ঊর্দ্ধে উড়িবেই, তাহাতে আবার আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

চিতোর।

এ পত্রে চিতোরের কথা লিখিব। কারণ, চিতোরের কথা তুমি শুনিতে বোধ হয় নিতান্ত উৎসুক হইয়া রহিয়াছ। কিন্তু কি লিখিব? চিতোরের নাম করিতেই আমার হৃদয় কি শোকের ও স্মৃতির উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়, তাহা বলিতে পারি না।

নিশীথসময়ে চিতোর ষ্টেশনে উপস্থিত হই। আমাদিগকে ডাকবাঙ্গালা দেখাইয়া দিবার জন্য, ষ্টেশনে একটি লোক চাহিলাম। শুনিলাম যে, এই অল্প পথটুকু যাইতেই পথে এত 'ভেঁড়িয়া' (নেকড়ে বাঘ) যে গলায় কামড়াইয়া ত ধরেই, তাহা ছাড়া, "ছোড়তা বি নেহি।" কেহ প্রাণান্তে যাইতে স্বীকার করিল না। ইহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, কি বীরভূমি, কি অরণ্য ও কাপুরুষের বাসভূমি হইয়াছে। কাযে কাযেই সে রাত্রি, ষ্টেসনের মেজেতে পড়িয়া কাটাইলাম। প্রাতে চিতোরস্থ 'হাকিমে'র নিকট হইতে হস্তী এবং পাশ লইয়া আমরা দুর্গ দর্শন করিতে যাই। দুর্গপদমূলে এখনও একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামটি পার হইয়া আমরা চিতোরশৈলে আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। আরাবলী গিরি-শ্রেণী হইতে একটি পর্ব্বত স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। তাহাই চিতোর দুর্গ। অতি প্রশস্ত পথ, ঘুরিয়া শৈলশেখরে উঠিয়াছে। পর্ব্বতটি রাজগিরের পর্ব্বতের মত প্রস্তরময়। ক্রমে পদ্মদ্বার, হনুমানদ্বার, গণেশদ্বার, দুটি ঝুলনদ্বার, সূর্য্যদ্বার, সর্ব্বশেষে পুরদ্বার অতিক্রম

করিয়া, প্রায় এক ঘণ্টাকাল আরোহণের পর, সানুদেশে উপস্থিত হই। সানুদেশ উত্তর দক্ষিণে মাইল তিন দীর্ঘ, এবং এক মাইল সমতলভূমি। ইহার উভয় পার্শ্ব হইতে মধ্যস্থল ঈষৎ নিম্ন। তাহাতে নানা স্থানে জলাশয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই প্রশস্ত সানুদেশ বেষ্টিয়া দুর্গপ্রাচীর এবং প্রাচীরের মধ্যে লক্ষ বীরপুরুষের পুণ্যধাম চিতোর নগর অবস্থিত ছিল। এখন তাহার ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। চিতোর এখন একটি মহাশ্মশান। এখনও স্থানে স্থানে তৈলকুণ্ড, ঘৃতকুণ্ড ইত্যাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যুদ্ধের সময় তাহা পূর্ণ রাখা হইত। হায়! হায়! আজ সেই বীরনগর, সেই বীরপুরুষ সকল কোথায় গেল?

আমরা প্রথমে মাতা পদ্মিনী দেবীর আবাসস্থান দেখিতে যাই। শুনিলাম, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভূতপূর্ব্ব মহারাজ সজ্জন সিংহ এক জন প্রকৃত সজ্জন ছিলেন! তিনি চিতোরের ঐতিহাসিক স্থানগুলির পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তাহা বন্ধ করিয়াছেন। সজ্জন সিংহ পদ্মিনীর আবাসস্থানের ভিত্তি খুঁজিয়া কয়েকটি দেওয়াল তুলিয়াছেন এবং কয়েকটি ক্ষুদ্র কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। অট্টালিকাশিরে স্ফটিকের নক্ষত্র, সতীত্বের ধ্বজার মত, সূর্য্যালোকে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র সরোবরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ। পদ্মিনী দেবী তাহাতে ক্রীড়া করিতেন। যে সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্বমাত্র দিল্লী উন্মত্ত করিয়াছিল, সেই ঘোরতর শোকনাটক ঘটাইয়াছিল, যাহার জন্যে এত বীরগণ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উপবীত পরিমাণে ৭৪৷৷০ মণ হইয়াছিল; সেই সৌন্দর্য্যের এইমাত্র স্মৃতিচিহ্ন চিতোরে বিদ্যমান রহিয়াছে!

পদ্মিনীর মহল দর্শন করিয়া আমরা 'কালী মাইর' মন্দির দেখি। একটি শ্বেতপ্রস্তরের মূর্ত্তি, তাহার পার্শ্বে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের মূর্ত্তি। প্রথমটি জৈন বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরটিও যেন জৈনমন্দিরের প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত বোধ হইল। মূর্ত্তি দুইটির ইতিহাস কেহ কিছুই জানে না। এই কুলাঙ্গারদের অপেক্ষা চিতোরের ইতিহাস আমরা অধিক জানি। এই মন্দিরেই সেই চিতোরেশ্বরী কালী ছিলেন। তিনিই স্বপ্ন দেখাইয়াছিলেন—"ম্যয় ভুখা হো!" হায় মা! এখন কি তোমার ক্ষুধা নিবারণ হইয়াছে? আজ যে চিতোরের কয়েকটি কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে!

তাহার পর, মীরা বাইয়ের নির্ম্মিত মন্দির ও তাহাতে স্থাপিত রাধাকৃষ্ণের মনোহর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, আমরা কুম্ভরাণার কীর্ত্তিস্তম্ভে আরোহণ করি। এই স্তম্ভটি আমার কাছে সর্ব্বপ্রশংসিত, কুতুব মিনার বা পৃথ্বীরাজের স্তম্ভ অপেক্ষা অধিক মনোহর বোধ হইল। স্তম্ভটি উপর্য্যুপরি নয়টি প্রকোষ্ঠ দ্বারায় নির্ম্মিত। কুতুব মিনারে ক্রমাগত কেবল সোপান বাহিয়া উঠিতে হয়। এই স্তম্ভের এক প্রকোষ্ঠ হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে উঠিয়া, প্রকোষ্ঠ প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার পর আবার সোপান আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে এক একটি দেব দেবীর মূর্ত্তি বিরাজমান রহিয়াছে। দিল্লীশ্বরকে উপর্য্যুপরি পরাজয় করিয়া, মহাবীর কুম্ভরাণা এই কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তাহার পর যে স্থান দর্শন করিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। স্থানটির নাম গোমুখী। গিরি-পার্শ্বে দেব দেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ একটি অতি সুন্দর কক্ষ। তাহার পশ্চাৎ পার্শ্ব দিয়া চন্দ্রশেখরের মন্দাকিনীর মত, দুইটি নির্ঝরধারা প্রবাহিত হইয়া সম্মুখস্থ প্রস্তর-নির্ম্মিত সরোবরে পড়িতেছে। নির্গমপথ বন্ধ করিলে সরোবরটি মুখে মুখে জল হয়। সমস্ত স্থানটি বৃক্ষচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। শীতল, নির্জ্জন এবং শান্তিপ্রদ এমন স্থান আমি যেন দেখি নাই। রাজপুরী হইতে একটি গুপ্ত পথ, পর্ব্বতের অভ্যন্তর দিয়া এখানে আসিয়াছে। রাজমহিষীরা এই পথ দিয়া আসিয়া অবগাহন করিতেন এবং দেব দেবীর পূজা করিতেন। মূর্খ স্থানদর্শক আমাদিগকে বলিল, এই সুড়ঙ্গের মধ্যে 'জোহর' হইত; যুদ্ধাবশেষে

ইহাতেই বীরনারীরা পুড়িয়া মরিতেন। আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম না। অনেক জিজ্ঞাসার পর বলিল, রাজপুরীর মধ্যে এই সুড়ঙ্গের অন্য মুখ আছে। আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেখানে গেলাম। ইহা টড সাহেবের বর্ণনার সঙ্গে মিলিল। এই সেই পর্ব্বতাভ্যন্তরীণ কক্ষের পথ, যাহাতে সহস্র সহস্র বীরনারীরা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া, জগতের বিস্ময়কর সতীত্বের এবং সাহসের জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই। শুনিলাম, বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি এই পবিত্র স্থানকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলাম এবং ললাটে ইহার ধূলা মাখিলাম। এইটি আমাদের একটি প্রকৃত মহাতীর্থ।

হায়! হায়! কি কুলাঙ্গারেরা, কি হৃদয়হীন নরাধমেরা, কি শৃগালেরাই সিংহদিগের আসনে বসিয়াছে। যদি এই চিতোর ইংরাজদিগের কোনও রূপ ঐতিহাসিক ক্ষেত্র হইত, আজ সেই পদ্মিনীর পবিত্র আবাসগৃহ, সেই রাজপুরী, আমরা একটি বৃহৎ উদ্যানে বিরাজিত দেখিতাম। সেই পবিত্র জোহর-কক্ষ, আজ শত আকাশ-গবাক্ষে আলোকিত হইত, কক্ষটি ঐতিহাসিক চিত্রে সজ্জিত হইত। আমরা চিত্রে দেখিতাম, সময়ে সময়ে কিরূপে বীরনারীরা সহস্রে সহস্রে অগ্নিপ্রবেশ করিতেছেন, দেখিতাম, একস্থানে চিতোরেশ্বরী কাণপুরস্থ সেই স্বর্গীয়া দেবীর ন্যায় দাঁড়াইয়া, অধোবদনে রোদন করিতেছেন। চিতোরের অঙ্গে অঙ্গে তাহার ঐতিহাসিক গৌরব সকল স্বর্ণ-অক্ষরে লিখিত থাকিত। তুমি জান, প্রতাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যত দিন দিল্লী জয় করিয়া তিনি চিতোর অধিকার করিতে না পারিবেন, তত দিন তিনি তৃণে ভিন্ন শয়ন করিবেন না, পত্রে ভিন্ন আহার করিবেন না। শুনিলাম, তাঁহার অযোগ্য উত্তরাধিকারিগণ এখনও স্বর্ণশয্যার নীচে তৃণ রাখিয়া শয়ন করেন, স্বর্ণপাত্রের নীচে পত্র রাখিয়া আহার করেন। সেই বীরপ্রতিজ্ঞা এখনও তাঁহারা ভুলেন নাই। তথাপি, চিতোরের পদ্মিনীর, চিতোরের প্রতাপসিংহের, প্রাণপ্রতিম চিতোরের আজ এই অবস্থা! এটি যে চিতোর, তাহা পথিককে বলিয়া দিবার জন্য একটি অঙ্গুলি নির্দ্দেশমাত্র কোথাও নাই। আছে—ইতিহাসে আছে! তারাচরণ বলিলেন, "রক্তধমনী-বিশিষ্ট প্রস্তররাশিতেও যেন সেই বীরপুরুষদের শোণিতধারা বর্ত্তমান আছে।" আছে বলিয়াই আমি দরিদ্র দুর্ব্বল বাঙ্গালী এই মহাতীর্থ দর্শন করিতে চিরজীবন লালায়িত ছিলাম। আজ দেখিয়া জীবন সার্থক মনে করিলাম। চিতোর অমর, চিতোর ঊনবিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র। চিতোর ভারতের ভবিষ্যৎ আশা। সে বীরত্ব, সে সতীত্ব ভিন্ন ভারতের অন্য আশা নাই।

প্রায় ১টার সময়ে অবরোহণ করিয়া আসি। উদয়পুরের জনৈক মহারাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর পাচক মহাশয়, আমাদের জন্যে বীরত্বপূর্ণ আহার প্রস্তুত করিতেছিলেন। একদিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাউল ; অন্যদিকে তদুপযোগী কলাইয়ের ডাল। কোনটাই সিদ্ধ হয় নাই।

যোধপুর।

ভগবানের কৃপায়, বড় সুখে বড় সম্মানে, যোধপুর দর্শন করিয়া আসিলাম। কাল যে কার্ড লিখিয়াছি, তাহাতে জানিয়াছ, যোধপুরের এসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পণ্ডিত জীবানন্দের সহিত লাহোর যাইবার সময়ে রেলে সাক্ষাৎ হয়। আর একটি লোক অম্বালার কমিশরিয়েটের ছিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার আলাপের পর, তাঁহারা এত প্রীত হন যে, উভয়ে আমাকে অম্বালা ও যোধপুরে যাইতে নিতান্ত অনুরোধ করেন। অম্বালায় যাইতে পারিলাম না। যোধপুরে পণ্ডিত জীবানন্দের কাছে টেলিগ্রাফ করি। ষ্টেসনে পৌঁছিয়া দেখি, রাজার বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বাবু হরিশচন্দ্র মিত্র, 'এথিনিয়ম' পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, আমার অপেক্ষা করিতেছেন। পণ্ডিতের বাড়ী পঁহুছিয়া দেখি, আমার অভ্যর্থনার জন্যে

একটি কক্ষ সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এবং রাজার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হরদয়াল সিংহ—ইনি কাউন্সেলেরও মেম্বর—এক বাড়ীতে থাকেন। ইঁহারা দুজন যে কি আদর করিলেন, বলিতে পারি না। দুই বেলা পরিপাটী আহার। বসিতে হয় আসনে. কিন্তু থাল থাকে একখানি অতি সুন্দর চৌকির উপর। থাল রূপার, তাহার উপর সমুদয় রূপার বাটী সাজান রহিয়াছে। চামচ দিয়া তরকারী লইয়া খাইতে হয়। রান্না পঞ্জাবী ধরণের। কারণ, ইঁহারা পঞ্জাবী।

সন্ধ্যার সময়ে, হরদয়াল সিংহ আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া রাজার ভ্রাতা ও মন্ত্রী কর্ণেল সার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করান। আমরা জানিতাম যে, কেবল নরাধম সিবিলিয়ানগুলোই বুঝি খোসামুদির প্রিয়। কিন্তু দেখিলাম, এ রাজাদের কাছে তাহারা কোথায় লাগে! হরদয়াল সিংহ আমাকে ইহার ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। আমি যদিও এ কার্য্যে অনভ্যস্ত, তথাপি সেই সুরে বীণা বাঁধিয়া আলাপ করিলাম। তিনি এত সন্তুষ্ট হন যে, অপরাহ্নে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যের ব্যায়াম দেখিতে বলেন। আমি নূতন রাজবাড়ী দেখিতে যাই। সম্মুখের একটি বাড়ীতে—এটিই শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা—শুনিলাম, রাজার উপপত্নী থাকেন এবং রাজা দিন রাত্রি এখানেই পড়িয়া থাকেন। তাহার পশ্চাতে অন্তঃপুরমহল। তাঁহার মহিষী কয়েক জন তাহাতে আবদ্ধ আছেন। রাজকার্য্যের সম্যক্ ভার প্রতাপসিংহের হস্তে, তিনিই প্রকৃত রাজা। নূতন বাড়ী, আমাদের চক্ষে কিছুই লাগিল না। তবে নূতন যে একটি কার্য্যালয়বাড়ী হইতেছে, তাহা অতি জাঁকাল রকমের। ফিরিয়া আসিয়া, প্রতাপসিংহের কাছে বসিয়া অশ্বক্রীড়া দেখি। মাড়ওয়ার রাজ্যের সর্দ্দারদিগের শিশুদিগকে পর্য্যন্ত তিনি অশ্বারোহণে শিক্ষা দিতেছেন। খোকার অপেক্ষা ছোট ছোট শিশুরাও নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইতেছে। প্রতাপসিংহকে দেখিলে, রাজপুত-কুলতিলক হিন্দুগৌরবসূর্য্য প্রতাপসিংহকে মনে পড়ে। লোকটি দেখিতে ক্ষুদ্র, কিন্তু তেজ যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। শুনিলাম, ইনি জীবন্ত ব্যাঘ্রের দন্ত উৎপাটন করেন। তাঁহার ডান হাতে এক ব্যাণ্ডেজ এবং ডান পায়ে অন্য ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রহিয়াছে। তদ্রূপ, তাঁহার পারিষদবর্গেরও হস্তে, পদে, চক্ষে, ব্যাণ্ডেজ শোভা পাইতেছে। সকলেই ঘোড়া হইতে পড়িয়া আহত হইয়াছে। ইহাতেই বুঝিবে যে, ইহারা কিরূপ অশ্বারোহণে ব্রতী। সন্ধ্যার পর, জ্যোৎস্নালোকে আবাসে ফিরিয়া আসি।

পরদিবস প্রাতে যোধপুরের দুর্গ দেখিতে যাই। একটি প্রায় চন্দ্রনাথের মত উচ্চ শৈলের সর্ব্বাঙ্গ এবং এক পার্শ্বের উপত্যকা আবৃত করিয়া দুর্গপ্রাচীর চলিয়া গিয়াছে। উপত্যকায়, যোধপুরের গৃহাবলী অসংখ্য হংসমালার মত শোভা পাইতেছে। শৈলশৃঙ্গ ব্যাপিয়া দুর্গের অট্টালিকা। এই দুর্গ ও নগর, তুমি জান, যোধাসিংহ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাই ইহার নাম যোধপুর। শৈলশেখর যেরূপ স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, সেই রূপ স্তরে স্তরে অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে ; তলার উপর তলা উঠিয়া, গগনস্পর্শী বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার করিতেছে। ইহার কক্ষগুলি অনতিবিস্তৃত, কারণ তাহারা পুরাতন, কিন্তু সুচিত্রিত ও সুসজ্জিত। তবে ইংরাজি সাজ-সজ্জার তত বাড়াবাড়ি নাই। একটি কক্ষে রজত দোলা রজত-শৃঙ্খলে দুলিতেছে। তাহার পশ্চাতে এক বিরাট আরসি। যখন যোধপুরাধিপতি এই দোলায় দুলিতে থাকেন, ভুবন-মোহিনী মহিষীগণ কেহ বা অঙ্কে বসিয়া আছেন, কেহ বা চন্দ্রকে ঘেরিয়া তারামালার মত চারিদিকে দোলা আলো করিয়া বসিয়া আছেন, কেহ বা অলঙ্কার-ঝনৎকারে কক্ষ পূর্ণ করিয়া তালে তালে দোলাইতেছেন, দুলিতেছে রূপসী, দোলাইতেছে রূপসী, তখন কি প্রতিবিম্বই না জানি আরসিতে প্রতিভাত হয়! ইচ্ছা হয়, আরসি হইয়া একবার সে রূপ-তরঙ্গের প্রতিবিম্বমাত্রও অনুভব করিয়া জীবন সার্থক করি। চটিতেছ না ত? কিন্তু কি

নরকুলাঙ্গারই যোধার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। এহেন রাজপুরীতে তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি কতকগুলো অশ্বশালার মত গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে উপপত্নী লইয়া বিরাজ করিতেছেন, রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কও নাই।

দুর্গদ্বারে কি পবিত্র দৃশ্য! রাজপত্নীগণ সহমরণে যাইবার সময় হস্তে যে চন্দন মাখিয়া স্বামীর শবের সঙ্গে দুর্গের বাহিরে শ্মশানে যাইতেন, দুর্গের বাহির হইবার সময়ে, তাহার দুই পার্শ্বের প্রাচীরে পবিত্র করপদ্মের চিহ্ন রাখিয়া যাইতেন। আমাদের সঙ্গে 'পাওনিয়ারের' সংবাদদাতা একটি সাহেব ছিলেন। তিনি গণিলেন, এরূপ ৩২টি কর-চিহ্ন আছে। কিন্তু আহা! কি অযত্নে পড়িয়া আছে। আমাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সাহেবটিকে বলিলাম—"তোমার 'পাওনিয়ার' পত্রিকা আমাদিগকে অজস্রধারায় গালি দিতে পারে, কিন্তু এই যে পুরাতন ঐতিহাসিক কীর্ত্তি ধ্বংস হইয়া যাইতেছে; এই যে পবিত্র আত্মবিসর্জ্জনের নিদর্শন সকলের একটি টেবলেট্ মাত্রও নাই, ইহার প্রতি কি তোমাদের কখনও চক্ষু পড়ে না? কোন্ কোন্ সাধ্বী এরূপে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের নামের একটি তালিকা ও ঘটনার কাল, এস্থানে কি রাখা কর্ত্তব্য নহে? এ স্থানটি একটি পবিত্র তীর্থের মত কি রক্ষিত হওয়া উচিত নহে? এই দুর্গে কত ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার অঙ্কে কি সে সকল লিখিত থাকা উচিত নহে?" সাহেব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, এই প্রথম ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, যে এরূপে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল। তিনি ১৩ বৎসর ভারতে কাটাইয়াছেন, কই, কেহ ত এরূপ কথা বলেন নাই। তিনি এখন ভারত ছাড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি ইহা ভুলিবেন না। তিনি এত প্রীত হইলেন যে, বরদার সহকারী মন্ত্রীর কাছে, আমার সাহায্যের জন্যে, এক পত্র দিলেন, এবং বম্বে গেলে, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে অনেক করিয়া বলিলেন। রাজার জনৈক উচ্চ কর্ম্মচারী, এরূপ কথা শুনিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং এ বিষয়ে তিনি মনোযোগী হইবেন, বলিলেন। তাহার পর, সেই তিন সহস্র ফুট উচ্চ শৈলশেখরের উপরে অশ্বপদাঘাতে প্রস্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তুলিয়া, আমরা রাজার প্রকাণ্ড একখানি ঘুড়িতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

আসিবার সময়ে পণ্ডিত জীবানন্দ, শ্বেত-প্রস্তরের দুই সেট চার পেয়ালা ও রেকাবি দিলেন। তাঁহার এবং হরদয়াল সিংহের ফটোগ্রাফ দিলেন। উক্ত সাহেব এবং হরিশ বাবু রাজার ঘুড়িতে আমাদিগকে ট্রেণে উঠাইয়া দিলেন। ষ্টেশনে আবার প্রতাপ সিংহের সঙ্গে দেখা। তাঁহার এক জন শরীররক্ষককে দিল্লীর সৈন্য-ব্যায়ামে যোগ দিবার জন্যে পাঠাইতে আসিয়াছেন। তিনি আমাকে বলিলেন যে, তুমি যোধপুরে অতি অল্প সময় থাকিয়া চলিয়া যাইতেছ, আবার আসিও। আমি বলিলাম, আপনার অনুগ্রহ থাকিলে আসিতে পারি। যাহা লিখিলাম, তাহাতে বুঝিবে, কি সুখে ও সম্মানে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে যোধপুর দর্শন করিয়া গেলাম।

তারাচরণ বলিতেছেন, আমি লিখিতে ভুলিয়াছি যে, যোধপুর দুর্গে এক সুবর্ণরঞ্জিত কক্ষ এবং সুবর্ণ ও রজতে নির্ম্মিত সিংহাসন দেখিয়াছি।

বরদা।

আমরা জয়পুর হইতে আজমীর, পুষ্কর, চিতোর, এবং যোধপুর—ইহাদের বিষয় পূর্ব্বে লিখিয়াছি—দর্শন করিয়া, বরদায় যাই। বরদার সহকারী দেওয়ান বা মন্ত্রী, আমাদিগকে তাঁহার অতিথির মত গ্রহণ করেন। তারাচরণ সঙ্গে বলিয়া, আমি আপা সাহেব রোডের ধর্ম্মশালায় অবস্থান করি। সহকারী মন্ত্রী মনিভাই যশোভাই, আমাকে

অনেক অনুযোগ করেন যে, পূর্ব্বে তাঁহাকে কোনও সংবাদ দিই নাই। তাহা হইলে তিনি আমাদের জন্যে যথোচিত বাসস্থান নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন। রাজার গাড়ী, রাজার সিপাই ও কারকুন, আমাদের জন্যে নিয়োজিত হয়। আমরা অতি সম্মানের সহিত বরদা দর্শন করি।

বরদায় দেখিবার জিনিস দুই। রাজবাড়ী এবং গুর্জ্জরী। গুর্জ্জর ও গুজরাটের কামিনীকুসুমের সৌন্দর্য্যের গীত সময়ান্তরে লিখিব। বরদার মহারাজকে গাইকোয়ার বলে। অর্থ, গাভীরক্ষক। গো ব্রাহ্মণ এক। অতএব রাজার উপাধি গাভীরক্ষক বলিয়া এক জন ব্যাখ্যা করিলেন। আমার বোধ হয়, মহারাষ্ট্র ভূপতি গাভীরক্ষক ছিলেন বলিয়া, গাইকোয়ার নাম হইয়াছে। তেমনি তাঁহার মন্ত্রী বা পেশকার ছিলেন বলিয়া সেতারা এবং পুণার রাজার নাম পেশোয়া ছিল। শিবজীর উত্তরাধিকারীরা হীনবল হইলে, পেশোয়া এবং গাইকোয়ার স্বাধীন নরপতি হন। আমার এ অনুমান কত দূর সত্য, জানি না। বর্ত্তমান রাজার নাম জিয়াজী গাইকোয়ার। ভূতপূর্ব্ব গাইকোয়ার জনৈক 'পলিটিকেলে'র বিষচক্ষে পড়েন, এবং তাঁহার চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার দূরসম্পর্কীয় একটি দরিদ্র বালককে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই বৃহৎ রাজ্যের অধিকারী করেন। ইনিই বর্ত্তমান গাইকোয়ার। বরদা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে 'মাখনপুরা' রাজবাটী নামক এক বৃহৎ রাজপুরী আছে। খাণ্ডেরাও গাইকোয়ার এখানে পাশাপাশি দুইটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান গাইকোয়ার তাহার পার্শ্বে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া আর একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। নগরের মধ্যে আর এক রাজবাড়ীতে অন্যান্য রাজমহিলারা বাস করেন। মাখনপুরার তিনটা অট্টালিকা এক শৃঙ্খলে গাঁথা, এবং আবরিত এক গৃহপথ দিয়া নূতন অট্টালিকা হইতে পুরাতন অট্টালিকায় যাইতে পারা যায়। পুরাতন দুটি বৈঠকখানমাত্র, এবং নূতনটি অন্তঃপুর। বহুমূল্য ইংরাজি উপকরণের দ্বারা সকল অট্টালিকা সজ্জিতা, বিশেষতঃ; অন্তঃপুরমহলের সজ্জা কল্পনাতীত। যে সকল রাজবাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি, ইহার তুলনায় কিছুই নহে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, মহারাজ সস্ত্রীক শৈলবিহারে গিয়াছিলেন। সমুদায় গৃহ জনশূন্য। সহকারী মন্ত্রীর আদেশে, আমরা মহারাজার শয়নকক্ষ পর্য্যন্ত নয়ন ভরিয়া দেখিলাম। দেখিবে কি, যে দিকে নয়ন ফিরাইবে, চক্ষু ঝলসিয়া যাইবে। বোধ হইল, মহারাজ ইউরোপীয়ের মত থাকেন। স্নানাগার পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট মর্ম্মরের ইউরোপীয় উপকরণে সজ্জিত। নরচক্ষে যাহা দেখে নাই, তাহাও আমরা দেখিলাম। একটি কক্ষের প্রাচীর এক বৃহৎ তৈলচিত্রে কি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইনি মহারাজার মৃতা রাণী লক্ষ্মীবাই। এই চিত্রখানির প্রতি আমরা বহুক্ষণ নিমেষশূন্য চিত্রবৎ চাহিয়া ছিলাম। চিত্রখানি মানুষের বলিয়া ত বোধ হইল না। কি মুখ, কি চোক্, কি শরীরের দীর্ঘগঠন, কি চম্পক কোরক-নিভ বর্ণ, কি অতুলনীয় অঙ্গভঙ্গী, কিছুই যেন মানুষের বলিয়া বোধ হইল না। আমাদের বোধ হইল, যেন একটি রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। মহারাষ্ট্রীয় বেশে চিত্রময়ী ভূষিতা। সম্মুখের কুঞ্চিত কোঁচাগ্র, সম্মুখ হইতে বঙ্কিমভাবে পদ মধ্য দিয়া অসাবধানে পশ্চাৎ দিকে পড়িয়া কি শোভারই বিকাশ করিতেছে! জয়পুরের আয় ৬০ লক্ষ, যোধপুরের ৪০ লক্ষ, এবং বরদার ১॥ ক্রোর! যদি বিধাতা আমাকে বলিতেন, তুমি এ সুন্দরীকে চাহ, কি বরদার সিংহাসন চাহ, আমি অম্লানবদনে এই পার্থিব রাজ্য না চাহিয়া, এই অপার্থিব রূপরাজ্য ভিক্ষা চাহিতাম। ভৃত্যেরা বলিল, চিত্রে কিছুমাত্র অত্যুক্তি নাই। তাহারা তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। আবার যেমন রূপ, তেমনই মন, তেমনই হৃদয়। ভৃত্যগণ এখনো তাঁহার জন্যে হাহাকার করিতেছে। তিনি একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। শিশুটিরও তৈল-

চিত্র অন্য কক্ষে দেখিলাম। যদিও মার সম্পূর্ণ রূপ পায় নাই, তথাপি মরি! মরি! কি রূপ! শিশু ত নহে, যেন একটি স্বর্গীয় কুসুমকোরক! কক্ষান্তরে মহারাজার বর্ত্তমান মহিষীর একখানি অসম্পূর্ণ তৈলচিত্র দেখিলাম। তিনিও কিছু কুৎসিতা নহেন। তথাপি, এই মোহিনীর ছায়াতে তাঁহাকে কি কুৎসিতই দেখাইল। ভৃত্যেরাও আমাদের মতের প্রতি-পোষণ করিল। এই রমণীরত্নের দৃষ্টিতলে, এবং তাঁহার শিশুপুত্রের মুখখানি দেখিয়া, মহারাজ যে কি প্রকারে দ্বিতীয় রমণীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছেন, আমি ত বুঝিতে পারি না। কর্ম্মচারীরা বলিলেন, রাজকার্য্যে অধিক পরিশ্রম নিবন্ধন গাইকোয়ারের শিরোরোগ হইয়াছে! তাই তিনি বারংবার ইউরোপে ও শৈলে শৈলে এমন করিয়া বেড়াইতেছেন। মধ্যে সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম যে, তিনি উন্মত্ত হইয়াছেন। আমার মতে, কার্য্যাধিক্য ইহার কারণ নয়, এই স্ত্রীবিয়োগই ইহার কারণ।

কিন্তু এ হেন ইন্দ্রপুরীতেও মহারাজার সাধ মিটিল না। আর একটি কি অপূর্ব্ব রাজবাটীই প্রস্তুত হইতেছে! ইহাতে ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ হইতে আরও ২৫ লক্ষ লাগিবে। যে ইহার কল্পনা করিয়াছিল, সে এক জন অদ্ভুত কবি। ময়দানব তাহার শিষ্য হইবার যোগ্য নহে। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? প্রথম একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল উচ্চ হল। তাহার পর প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া গাইকোয়ারের বহির্ম্মহল, তাহার পর অন্তঃপুরমহল। এই উভয় মহল, হলের' সমান উচ্চ, ত্রিতল। মহলে মহলে প্রাঙ্গণ বেষ্টিয়া অসংখ্য কক্ষ। এক একটি কক্ষ, এক একটি গৃহ বলিলেও চলে,—এত প্রশস্ত। চিতোরের 'কীর্ত্তি-স্তম্ভে'র মত একটি স্তম্ভ, ত্রিতল ভেদ করিয়া গগনমার্গে উঠিয়া কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে! স্তম্ভটি দশ কি দ্বাদশ তল। তবে, চিতোরের তলায় তলায় মধ্য কক্ষে এক একটি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। এখানে স্তম্ভারোহী রমণীদিগের বসিবার জন্যে তাহা শূন্য রাখা হইয়াছে। বোধ করি, উপযোগী উপকরণে সজ্জিত হইবে। এই বৃহৎ অট্টালিকার সমস্ত কক্ষগুলি—এমন কি প্রবেশপথ পর্য্যন্ত—সুবর্ণমিশ্রিত বর্ণে বিচিত্র কৌশলে চিত্রিত হইতেছে। বিলাত হইতে শিল্পকর আসিয়া, ইহার চতুর্দ্দিকে উদ্যান সৃষ্টি করিবে, এবং উপযোগী সজ্জা ও উপকরণ প্রস্তুত করিবে। কাণ্ডখানা কি বুঝিতে পারিলে কি? এই রাজবাটীর নাম "লক্ষ্মীমহল"। কিন্তু যে লক্ষ্মীর জন্যে এই অতুলনীয় পার্থিব স্বর্গ সৃষ্ট হইতেছিল, তিনি আজ কোথায়? প্রজারাও, তাঁহার স্মরণার্থ, নগরমধ্যে একটি 'ঘটীকাস্তম্ভ' প্রস্তুত করিয়াছে। আজ সেই লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠে।

বোম্বাই।

বরদায় এক দিন মাত্র থাকিয়া আমরা বোম্বাই যাই। বোম্বাই নাম সম্বন্ধে দুটি প্রবাদ আছে। ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে যখন পর্ত্তুগীসেরা এ স্থানটি অধিকার করে, তখন ইহার 'বুয়েন বাহিয়া'—উৎকৃষ্ট বন্দর—নাম রাখে। তাহা হইতে বোম্বাই হয়। দ্বিতীয় প্রবাদ—'মম্বাই' বলিয়া এক দেবী ছিলেন। তাঁহার নাম হইতে ইংরাজেরা বোম্বাই বা বম্বে করিয়াছেন। এখনও বোম্বাই সহরের একটি অংশের নাম মম্বাই দেবী আছে। আর একটি অংশের নাম কামদেবী। বোম্বাইর অংশাশেষ প্রকৃতই কামদেবীর স্থান। সে কথা পরে লিখিব।

বোম্বাই আমার কাছে শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা বলিয়া বোধ হইয়াছিল। জননীর পশ্চিম তীর ব্যাপিয়া, উত্তর দক্ষিণ ঘাট গিরিমালা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরবৎ শোভা পাইতেছে। এই গিরিশ্রেণীই আমাদের কবিকল্পনার সম্বল 'মলয়াচল'। এই শৈল সমাচ্ছন্ন তীর হইতে জিহ্বার মত একটি ভূমিখণ্ড সমুদ্রবক্ষে ভাসমান। শ্যামার জিহ্বা রক্তবর্ণা। শ্যামা ভারতমাতার জিহ্বা শ্যামপত্র-সমাচ্ছন্ন সৌধ ও শৈলমালায় উদ্যানবৎ শোভিত। শ্যামার

জিহবার চারিদিকে রক্ত-ফোঁটা চিত্রিত হইয়া থাকে। এ শ্যামা জিহবার চারিদিকে ফোঁটার মত ক্ষুদ্র শৈল-দ্বীপরাশি নীল সমুদ্রগর্ভে শোভা পাইতেছে। এখন বুঝিলে, বোম্বাই কি মনোহর উপদ্বীপ? ইহার তিন দিকে সমুদ্র পরিখার মত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এ সমুদ্রে তরঙ্গ নাই, লহরী নাই, গর্জ্জন নাই। শান্ত, স্থির, নীরব। যেন একখানি অনন্ত নীল আরসি পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ যেন এক একটি সুন্দর ফুলের মত শোভা পাইতেছে। বোম্বাইর উভয় পার্শ্বে নানা স্থানে সমুদ্র-শাখা ভূমিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ সকল শাখার উপর দিয়া রেলওয়ের দীর্ঘ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। গাড়ী এই সলিলরাশির উপর দিয়া, উভয় পার্শ্বে সুপারি, তাল, নারিকেল, খর্জ্জুর বৃক্ষ-শোভিত গিরিমালার মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে, কি চঞ্চল চিত্ত-বিনোদন প্রাকৃতিক শোভাই প্রাণ মন মোহিত করিয়া দেয়।

আমরা প্রথমেই জিহবার অগ্রভাগস্থ পর্ব্বতস্থিত ইংরাজদিগের বসতিস্থান দেখিতে যাই। এই পর্ব্বতটির নাম "মেলেবার হিল", তাহার প্রান্ত সীমাগ্রে শৈবালসমাবৃত হংসের ন্যায়, বোম্বাইয়ের গবর্ণরের রাজপ্রাসাদ সমুদ্রে ভাসিতেছে। এই পর্ব্বতটি ইংরাজদিগের গৃহাবলীতে সমাচ্ছন্ন। উভয় পার্শ্বের সমুদ্র সকল গৃহ হইতে দেখা যায়; পর্ব্বতটির সর্ব্বত্রে পথমালা এরূপ বিচিত্র কৌশলে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, সকল দিকে গাড়ী চলিয়া যায়। রক্তবর্ণ রাজপথসমূহ গিরি-অঙ্গে যেন প্রবালহারাবলীর মত শোভা পাইতেছে। উভয় পার্শ্বে মনোহর সৌধ ও উদ্যানমালা, এবং তাহার বিরাম-স্থান-পথে সমুদ্রের নীল কান্তি দর্শন করিয়া শকট-ভ্রমণ কি মনোহর!

ফিরিবার সময়ে এই পর্ব্বতস্থিত পার্সিদিগের "নীরব মন্দির" বা সমাধিস্থান দর্শন করি। মূল সমাধিস্থানটি একটি গোলাকার প্রাচীর মাত্র। তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থানটি চক্রাকারে তিন মণ্ডলে বিভক্ত কর হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে একটি কূপ; তাহাকে বেষ্টিয়া যে মণ্ডল, তাহাতে শিশুদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে রমণীদিগের, তাহার বাহিরের মণ্ডলে পুরুষদিগের শব রক্ষিত হয়। প্রাচীরের এক স্থানে একটি গবাক্ষ আছে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা এই গবাক্ষ পর্য্যন্ত শব লইয়া গেলে, সমাধিস্থ দুই জন ভৃত্য এখান হইতে শব ভিতরে লইয়া যায়। তাহারা ভিন্ন অন্য কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহার পর শবটির বসন মোচন করিয়া, উপযুক্ত মণ্ডলে রাখিয়া দেয়। অল্পকাল মধ্যেই শকুনে তাহা নিঃশেষ করিলে, ভৃত্যেরা অস্থি সকল মধ্য কূপের গর্ভে ফেলিয়া দেয়। কালে উহা চূর্ণে পরিণত হইয়া, কূপতলস্থ জলপ্রণালী দিয়া পর্ব্বতের উপত্যকায় গিয়া, ভূমির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষকে এরূপ শকুনের আহার্য্য করা আপাততঃ শুনিতে বড়ই নিষ্ঠুরতা বলিয়া বোধ হয়। তবে চক্ষের উপর পোড়াইয়া ফেলা, কিংবা ভূমিগর্ভে অসংখ্য কীটের আহার করিয়া দেওয়াই কি নিষ্ঠুরতা নহে? যখন আর্য্যজাতিরা কেবল বৈদিক অগ্নির উপাসক মাত্র ছিলেন, তখন দুই ভাগ হইয়া উত্তর কুরু হইতে এক শাখা ভারতে প্রবেশ করেন, অন্য শাখা পারস্য দেশে গমন করেন, ইহারাই পার্সি। ভারতীয় আর্য্যদিগের ধর্ম্মের অনন্ত রূপান্তর ও উন্নতি হইয়াছে। পার্সিরা এখনও অগ্নি-উপাসক। উত্তর কুরু শীতপ্রধান দেশ, অতএব অগ্নি তথায় মনুষ্যের প্রধান অবলম্বন, প্রধান দেবতা। শব দাহ করিতে অগ্নির ও ইন্ধনের অপব্যয় বৃক্ষাবিরল শীত-প্রধান দেশে সম্ভব নহে। সেই জন্যে উত্তর কুরুতে শব এরূপে পশু পক্ষীর আহারের জন্যে ফেলিয়া রাখা হইত, ইউরোপে এখনও ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। পার্সিরা সেই পূর্ব্ব নিয়ম রক্ষিত করিয়া আছেন। ভারতে কাষ্ঠের অভাব নাই, কাযেই এই নিষ্ঠুর নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এরূপে দেশ, কাল ও অবস্থাই মানুষের জাতীয় আচার ব্যবহারের রূপান্তরের মূলীভূত কারণ।

তদ্ভিন্ন আর একটি গভীর তত্ত্ব পার্সী ও হিন্দুদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভিতরে নিহিত আছে। উভয় জাতির ধর্ম্মনীতির মূল—সর্ব্বভূতহিত। শবটি পোড়াইয়া ফেলিয়া কি কবর দিলে, আপাততঃ কাহারও হিতসাধন করা হয় না। কালে তাহা ভূমি, জল, ইত্যাদি পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া, শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া, জীবহিত সাধন করে সত্য, তবে যে বহুকাল সাপেক্ষ এবং তত্ত্বটি জটিল। পার্সীদিগের শব তৎক্ষণাৎ পশু পক্ষীর আহার হইয়া প্রত্যক্ষ জীবহিত সাধন করে, এবং অস্থিও কালে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। আমি ত মরিয়া গিয়াছি, সুখ দুঃখের অতীত হইয়াছি; অতএব, আমার লোষ্ট্রবৎ জীবশূন্য দেহটি আহার করিয়া যদি কয়টি প্রাণীর তৃপ্তি হয়, ক্ষতি কি? দেহটি ধ্বংস করা ও ভূগর্ভে পচিতে দেওয়া অপেক্ষা, এরূপ জীবহিতে নিয়োজিত হওয়া কি ভাল নহে?

পর দিবস নগর দর্শন করিতে করিতে আমরা খ্যাতনামা 'হস্তিগুম্ফা' দেখিতে যাই। বোম্বাই নগরটি দেখিতে অতি সুন্দর। কলিকাতার মত এমত বৃহৎ অট্টালিকা নাই, তবে অট্টালিকাগুলি বহুতলবিশিষ্ট এবং বড় কবিত্বপূর্ণ। প্রত্যেক গৃহ নানারূপ বারাণ্ডা ও নানারূপ কোণবিশিষ্ট। আকৃতিবৈচিত্র্য বড় মনোহর। বোম্বাই নগরের দুইটি বিশেষ লক্ষণ। অধিকাংশ অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ তলার ছাদ খোলার, এবং ফুল অতি বিরল। সমুদ্রের লবণাক্ত বাতাসে ফুল বাঁচে না, বোধ হয়। সমুদ্রানিল সলিলসিক্ত বলিয়া বোম্বাই অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রখরতা নাই, এবং লবণাক্ত বলিয়া শীতেরও প্রবলতা নাই। এই পৌষ মাসের মধ্যভাগেও আমরা কিছুমাত্র শীত অনুভব করিলাম না। এ জন্যেই কবিরা মলয়াচলকে চিরবসন্তের আলয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই জন্যেই মলয়ানিলের এত গুণগান। তবে এ বসন্ত পুষ্পহীন বোধ হইল, এবং মলয়াচলে চন্দনবৃক্ষ ও ভুজঙ্গ নাই বলিয়া তারাচরণের দৃঢ় বিশ্বাস,—মলয়াচল ব্রহ্মদেশে। জানি না, সেই চিরবসন্তের দেশে থাকিয়া তোমার ভায়া কি দারুণ বিরহযন্ত্রণাই ভোগ করিতেছেন!

আমরা একখানি 'জালিবোট' ভাড়া করিয়া, সমুদ্রগর্ভস্থ এলিফেণ্টা বা হস্তি গুম্ফা-দ্বীপ দেখিতে গেলাম। এই সমুদ্রবিহার আমি এ জীবনে ভুলিব না। স্থানে স্থানে খণ্ড-পর্ব্বত সমুদ্রগর্ভে যেন এক একটি দোল কিংবা এক একখানি রথের মত ভাসিতেছে। তাহার মধ্য দিয়া আমাদের তরণী ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছে। কোনো খণ্ড-শৈলে ইংরাজ-রাজ বোম্বাই রক্ষণার্থ অস্ত্রাগার, কোথাও বা বারুদাগার নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্বেত অট্টালিকাটি দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন একটি রাজহংস গিরিশিরে বসিয়া সমুদ্র শোভা দেখিতেছে। স্থানে স্থানে যুদ্ধযান এবং বৃহৎ বৃহৎ বাষ্পীয় যান সকল সগর্ব্বে ভাসিতেছে। আমাদের ক্ষুদ্র তরণী হংসিনীর মত তাহার পার্শ্বে ক্রীড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। বহু দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—অহো! কি দৃশ্য!

> "দূরে চক্রনিভ তন্বী, তমাল তালের লীলা,
> কলঙ্ক রেখার মত শোভে লবণাম্বু বেলা।"

তমাল দেখি নাই। কিন্তু তালজাতীয়-বৃক্ষশীর্ষ-বনরাজি-মণ্ডিতা, সৌধমালায় বিচিত্রিতা বোম্বাই নগরী কি শোভার ভাণ্ডারই লবণাম্বুতীরে খুলিয়া রাখিয়াছে, এবং কি মনোহর নীলদর্পণে কি মনোহর মুখমণ্ডলের প্রতিবিম্ব দেখিতেছে। যে ব্যক্তি একবার সমুদ্রগর্ভ হইতে, এই 'মলয়াধারের তীর সুবঙ্কিম' এবং এই মধ্যাহ্ন রবিকরে "মলয়াচলের-উজ্জ্বল -নীলিমা" নয়ন ভরিয়া দেখিয়াছে, সে কখনও উহা ভুলিতে পারিবে না।

এলিফেণ্টা দ্বীপের পর্ব্বতটি বৃক্ষাবলীতে বড় সুন্দররূপে শোভা পাইতেছিল। এই পর্ব্বতের কটীদেশে 'হস্তিগুম্ফা', তাহা হইতে ইহার নাম 'এলিফেণ্টা' হইয়াছে। এই গুম্ফা-দ্বারে পুরাকালে একটি প্রস্তরের হস্তী ছিল। সমুদ্র-তীর হইতে গুম্ফা পর্য্যন্ত সোপানশ্রেণী উঠিয়াছে। জনৈক শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ও তাঁহার শ্বেতাঙ্গিনী প্রিয়া এখন গুম্ফার

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহাদের পাশ লইয়া গুহা দর্শন করিতে হয়। দুইটিই বেশ ভদ্রলোক। যদিও বহুতর শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গিনীরা তখন গুহাদ্বারে বিরাজ করিতেছিলেন, কেহ পান করিতেছেন, কেহ ভক্ষণ করিতেছেন, কেহ সমুদ্র শোভার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া বৃক্ষ-দোলায় দুলিতেছেন, তথাপি তাঁহারা আমাদের প্রতি খুব ভদ্রতা দেখাইলেন। পর্ব্বতের প্রস্তর বক্ষ কাটিয়া, 'রাজগিরের' শোনভাণ্ডার কক্ষের মত, কিন্তু তদপেক্ষা বড়, একটি কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছে। কক্ষ, প্রাচীর বড় সুচারুপে নির্ম্মিত নহে। 'বরাবরের' গুহা সকল এতদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, তাহাদের প্রাচীরে মুখ দেখা যায়, এমনি মসৃণ! তবে কক্ষটির প্রাচীরের গায়ে বহুতম হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবী মূর্ত্তি স্থাপিতা রহিয়াছে। মূর্ত্তিগুলি তত শিল্পনৈপুণ্য পূর্ণ না হউক, নিতান্ত মন্দ নহে। তাহার পার্শ্বে অসম্পূর্ণ আরো ২।৩টি ক্ষুদ্র গুহা আছে। আমার বোধ হইল, এই গুহা বৌদ্ধদের কর্ত্তৃক তপস্যার জন্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, পরে বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর, হিন্দুরা অধিকার করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ দুই স্থানে দুইটি শিবলিঙ্গ বসান হইয়াছে, দেখিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে, সেখানে অন্য কোনও মূর্ত্তি ছিল, তাহা উঠাইয়া শিবলিঙ্গ স্থাপিত করা হইয়াছে। গর্ত্তটি লিঙ্গ অপেক্ষা বড়। এই পর্ব্বত হইতে চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্রগর্ভে ভাসমান পার্ব্বত্য দ্বীপ-পুঞ্জ ও সমুদ্রশোভা দেখিলে চোক ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মুহূর্ত্ত এই শোভা দেখিয়া আমরা ফিরিলাম। প্রতিকূল বাতাস নিবন্ধন অর্দ্ধ পথ আসিলেই সন্ধ্যা হইল, জ্যোৎস্না উঠিল; পটপরিবর্ত্তন হইয়া জ্যোৎস্নাপ্রোদ্ভাসিত, পর্ব্বত-দ্বীপ-খচিত, সমুদ্রের কি মনোমুগ্ধকর শোভা হইল। মনের আনন্দে সকলে মিলিয়া গাহিতে গাহিতে বোম্বাই ফিরিয়া আসিলাম। গীত যেন আপনি হৃদয় উচ্ছ্বসিত করিয়া বহিতেছে, তরণী যেন সেই গীতের তালে তালে মনের আনন্দে নাচিতেছে। পূর্ব্ব দিন মলয় পর্ব্বত-শিরে দাঁড়াইয়া এই সমুদ্রের দিকে চাহিয়া, আমিও বাইরণের মত স্বপ্ন দেখিতেছিলাম—

মলয় বোম্বাই বক্ষে;
বোম্বাই সমুদ্র তীরে;
তথা দাঁড়াইয়া একা দেখিনু স্বপনে,—
ভারতের সুখসূর্য্য আসিবে রে ফিরে।

বাইরণের স্বপ্ন ফলিয়াছে;—গ্রীসের সুখের দিন ফিরিয়াছে। আমার স্বপ্ন ফলিবে কি?

পুনা।

কাল প্রাতে বম্বে ছাড়িয়া অপরাহ্ন ৫টার সময়ে পুনা পঁহুছি। বম্বে ২টা দিন কি কষ্টে কাটাইয়াছি বলিতে পারি না। তারাচরণের হিন্দুয়ানীর কল্যাণে যে এক মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু হোটেলে উঠিয়াছিলাম, তাহার বিচিত্র নাম পূর্ব্বে লিখিয়াছি। ইনি মহারাষ্ট্রীয় এবং মহারাষ্ট্রীয়দিগের দস্যুপ্রবৃত্তির একটি জীবন্ত মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিখানি দেখিয়াই আমার চমক লাগিয়াছিল। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম যে, আমরা এক ব্যাধের ফাঁদে পড়িয়াছি। তিনি আমাদের অর্থ শোষণ করিবার জন্যে জাল পাতিতেছিলেন। আর একটি ভুক্তভোগী বাঙ্গালী, তাঁহার হোটেলে ছিলেন, ইঁহার কৃপায় আমরা রক্ষা পাই। যাহা হউক, অর্থ না হউক, দুই দিন যাবৎ আমাদের শোণিত শোষিয়া, ইনি সাত টাকা চার আনা লইয়া আমাদিগকে ছাড়েন। লইলেন সাত টাকা চার আনা, খাইতে দিয়াছিলেন ছটাক দুই চাউল, আর খানিকটা মূলার শাক। তাঁহার বিচিত্র হোটেলে যদি আধ ঘণ্টা কালও থাক, তবে সমস্ত দিবসের ভাড়া দিতে হয়। কাযে কাযে আমাদিগকে কাল অনাহারে ছাড়িতে হয়, এবং সমস্ত দিন অনাহারে থাকিতে হয়। যাহা হউক, সেই "নারায়ণ-ভোজন-বস্তি-গৃহ" বা গ্রহ হইতে উদ্ধার পাইয়া,

আমি নারায়ণকে ধন্যবাদ দিয়াছিলাম। হোটেল কর্ত্তার নাম নারায়ণ। তিনি আমাদিগকে ভোজন না করিয়া যে গ্রাসমন্ত করিয়াছেন, তাহা দুইটি রমণীর এয়োস্তির জোর বলিতে হইবে।

'কল্যাণ' ষ্টেশন হইতে আমরা ঘাট পর্ব্বত বা মলয়াচল আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। গরজাট ষ্টেশন হইতে দুই খানি এঞ্জিন ট্রেণের অগ্রে ও পশ্চাতে সংযোজিত হয়। কখন বা পশ্চাতের এঞ্জিনে টানিয়া আমাদিগকে দেখিতে দেখিতে পর্ব্বতসানুদেশে, অর্থাৎ সমুদ্র-উপকূল হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে তুলিয়া ফেলে। এই গগনবিহার বিজ্ঞানের একটি চরম গৌরব। কখন বা উচ্চ সেতুর উপর দিয়া, কখন বা গিরিপার্শ্ব, বহিয়া, ট্রেণ নক্ষত্র বেগে ছুটিতেছে। যদি এক পা এ-দিক ও-দিক হয়, তবে সহস্র সহস্র ফিট গভীর গিরিগহ্বরে পতিত হইবে। আর কখন বা গিরিগর্ভ ভেদ করিয়া, সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়া, অন্ধকারে ছুটিয়া যাইতেছে। এরূপে ২৫টি সুড়ঙ্গ পার হইয়া আসি। গাড়ীতে আলো দেওয়া আছে, সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলে ঠিক যেন রাত্রি। এক একটি সুড়ঙ্গ এত দীর্ঘ যে, ট্রেণ ২।৩ মিনিট তাহার ভিতরে থাকিয়া যায়। রেলপথের দুইদিকের দৃশ্যই বা কত মনোহর। অনন্ত গিরি-শ্রেণী স্তবকের পর স্তবকে সজ্জিত রহিয়াছে। সুদূরে, কোনও শৃঙ্গে, পুরাতন মহারাষ্ট্র দুর্গের ভগ্নাবশেষ শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে নির্ঝর স্রোত নীল-মণি-হারের মত দেখাইতেছে।

সেই যে ২০০০ ফিট উপরে উঠিয়াছি, আর আমরা নামি নাই। উপরে উঠিলে রেল প্রায় সমসূত্রে পুনা পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। অতএব বুঝিতে পারিতেছ যে, পুনা নগর সমুদ্রতীর হইতে ২০০০ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত। এই আকাশের উপর মহারাষ্ট্রের কি বিশাল রাজ্যই অবস্থিত ছিল।

এলাহাবাদের জনৈক ডাক্তার, পুনার জন্যে একখানি পরিচয়পত্র দিয়াছিলেন। আসিয়া দেখিলাম, যাঁহার নামে পত্র, তিনি এক জন ছাত্র। ইহাঁরা কয়েক জন বাঙ্গালী ছাত্র এখানের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছেন। তাঁহাদের ছাত্র-আবাসে বসিয়া তোমার কাছে পত্র লিখিতেছি। তাঁহারা আমাদের বড় যত্ন করিতেছেন। একটি ছাত্র ভিন্ন এখানে আর বাঙ্গালী নাই।

অদ্য প্রাতে প্রথমে পার্ব্বতীর পর্ব্বত আরোহণ করি। যাইবার পথে পর্ব্বতের পাদমূলে একটি ঝিল, তাহার মধ্যস্থানে একটি দ্বীপ। ঝিল এখন শুষ্ক, দ্বীপ এখন জঙ্গল। পর্ব্বতে উঠিয়া প্রথমেই পার্ব্বতীর মন্দিরে যাই। মধ্যস্থলে রজতনির্ম্মিত শিব। 'রজতগিরিনিভং' ধ্যানবাক্যের প্রতিমূর্ত্তি। এক পার্শ্বে স্বর্ণপার্ব্বতী "তপ্তকাঞ্চনাভা", অন্য দিকে সোণার গণেশ। উভয়কে অঙ্কে লইয়া, মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার মহারাষ্ট্র বেশ, মাথায় একটি প্রকাণ্ড পাগড়ি। আমার বোধ হইল—সিদ্ধি, শক্তি এবং নিষ্কামতা, যেন একাধারে এই ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। এই ত্রিমূর্ত্তির বা ত্রিশক্তির সাধনা দ্বারা শিবজী মহারাষ্ট্র রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মোগল রাজ্যের অধঃপতন ঘটাইয়াছিলেন। এই মহাসাধনা ভুলিয়া, তাঁহার কাপুরুষ উত্তরাধিকারী বাজিরাও, সেই সাম্রাজ্য হারাইলেন, ভারতকে ইংরাজ-কবলে কবলিত করিলেন। ত্রিমূর্ত্তিকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, পার্শ্বস্থিত সৌধশিরে আরোহণ করিলাম। এই মন্দিরের পার্শ্বে, শেষ মহারাষ্ট্রাধিপতি পেশোয়া বাজিরাওর অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অদূরে শৈলশেখরে শিবজীর খ্যাতনামা দুর্গত্রয়—সিংহগড়, রাজগড় এবং রায়গড়—আকাশের গায়ে চিত্রপট দেখাইতেছে; চারিদিকে গিরিশ্রেণী আকাশে তরঙ্গ খেলিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। ইহাদের প্রত্যেকের অঙ্গে অঙ্গে মহারাষ্ট্রীদিগের গৌরবের ও অধঃপতনের ইতিহাস লিখিত রহিয়াছে। একটি পর্ব্বতের কক্ষদেশে "চতুঃসিংহ" মন্দির একটি শ্বেত কুসুমের মত শোভা পাইতেছে।

ইহাতেও হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি আছে। দশমী দিবসে মহারাষ্ট্রীয়গণ তাঁহাদের পূজা করিয়া, দেশলুণ্ঠনে এবং যুদ্ধে যাত্রা করিতেন। আমার কর্ণে যেন সেই বীরকণ্ঠ, সেই "বম বম বম হর হর" রব স্বপ্নশ্রুত শব্দের ন্যায় প্রবেশ করিতে লাগিল—

"হর হর হর বলে ; কি কাণ্ড করিলে বলে ;
সেই সিংহনাদ আজি হয়েছে স্বপন!
মহারাষ্ট্র ইতিহাস অদ্ভুত যেমন!"

শিব-শক্তির মন্দিরের পদমূলে, সেই কির্কির যুদ্ধক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রে পেশোয়ার রাজমুকুট খসিয়া পড়ে। কাপুরুষ বাজিরাও, প্রাণভয়ে পার্ব্বতীর মন্দিরের একটি কক্ষে বসিয়া, এই যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার অদৃষ্টের পরীক্ষা দেখিতেছিল। ইংরাজদিগের জয় হইলে, সেই কক্ষ হইতে পলায়ন করে, এবং ধৃত হইয়া বিঠুরে বন্দী হয়। নানা সাহেব তাহারই পোষ্যপুত্র। সেই হরপার্ব্বতীর, সেই শিবশক্তির মন্দির এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীদিগের শিব (মঙ্গল) ও শক্তি (বীরতা) চিরদিনের জন্যে অস্তমিত হইয়াছে। আজ সেই যুদ্ধক্ষেত্রে, হর-পার্ব্বতীর মন্দিরের ছায়াতলে, বম্বের গবর্ণরের বাড়ী এবং সৈন্য-গৃহাবলী শোভা পাইতেছে। ইহাদের এত দূর অধঃপতন ঘটিয়াছে যে, মন্দিরের পূজক শিবের ধ্যানটি পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না, এবং পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, মৃত ভাষা সংস্কৃত তিনি কি জন্য শিখিবেন। তিনি ইংরাজিতে আমাদের কাছ হইতে কিছু উশুল করিবার জন্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন অর্থগৃধ্নু নরপিশাচ আমি যেন আর দেখি নাই। সে তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের কিছুই জানে না। আমি তাহাকে সেই জন্যে দুই আনা পয়সা মাত্র দিয়া আপনার ইতিহাসখানি পড়িতে বলিলাম।

ছাদ হইতে অবতরণ করিয়া, পার্শ্বস্থিত এক মন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত কার্ত্তিকের ও অন্য মন্দিরে নারায়ণের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করি। দেবতারা সকলেই এখন ইংরাজ রাজ্যের বৃত্তি-ভোগী। বিষ্ণুর মন্দিরে অতি সুন্দর সঙ্গীত হইতেছিল। পূজক ব্রাহ্মণও একটি অতি সুন্দর ধ্যান বলিলেন। আমি লিখিয়া লইয়াছি।

পার্ব্বতীর পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া, পুনার 'শিল্প প্রদর্শনী' দেখিতে যাই। প্রদর্শনী কাল বন্ধ হইয়াছে। কর্ম্মচারিগণ প্রথম বলিলেন, আমাদিগকে না দেখিতে দিবেন, না কোনও জিনিস কিনিতে দিবেন। দুই এক কথা বলিলে বলিলেন, কি করিবেন, নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। নিতান্ত পক্ষে সম্পাদকের মত চাহি। তাহার পর দু'চার কথা তীব্র বিদ্রূপ শুনিয়াই নিয়মও লঙ্ঘন করিলেন, দেখিতেও দিলেন, কিনিতে দিতেও স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর সহর দেখি। দেখিলাম, পেশোয়াদের পুরাতন রাজবাটীর একটিতে বৃটিশদিগের পুলিস ষ্টেশন বিরাজ করিতেছে। তাহার পর দুর্গ দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে আমাদের জনৈক পুলিস প্রভু বিরাজিত। বলা বাহুল্য যে আর দেখা হইল না। ভিতরে, দেখিবারও কিছু নাই। তাহার পর, বাজার দেখিয়া গৃহে আসিলাম। শিবজী, আপন গুরুকে দান করিয়া পুণ্য করিয়াছিলেন বলিয়া এ স্থানটির নাম—শুনিলাম—পুনা হইয়াছে। আজ সেই পুনা নগর, মহারাষ্ট্রীয়দের একটি ঐতিহাসিক মহাশ্মশান। পুনা 'সার্ব্বজনিক' সভাগৃহে, পেশোয়াদিগের জনৈক খ্যাতনামা মন্ত্রীর এক-খানি চিত্র দেখিলাম। এখন সেই বীর রাজা নাই, সেই গভীর রাজনৈতিক মন্ত্রীও নাই! মহারাষ্ট্রের ভাগ্যে, ভারতের ভাগ্যে, আবার সে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইবে কি না, কে বলিবে?

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বোম্বায়ের "নারায়ণ-ভোজনবস্তি গৃহ" হইতে দুই দিনে উদ্ধার হইয়া পুনায় যাই। পুনার কথা লিখিয়াছি। পুনা হইতে 'নাসিক' যাই। পুনার মত নাসিকও মধ্যভারতের অধিত্যকায় ২০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। কল্যাণ ষ্টেশন হইতে ক্রমশঃ ১৩টি গিরিসুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া গাড়ী এই অধিত্যকায় আরোহণ করে। কিন্তু একবার উঠিলে অনন্ত সমতল ভূমি। তুমি এত উচ্চ স্থানে উঠিয়াছ বলিয়া বোধ হইবে না। শুধু তাহা নহে, অধিত্যকাটি স্বর্ণপ্রসূ। চারিদিকে সুন্দর শস্যক্ষেত্র এবং নিবিড় আম্রবন দেখিলে ঠিক যেন বঙ্গ দেশ বলিয়া বোধ হয়। ইহার জল বাতাস এত উৎকৃষ্ট যে, একবার নাসিককে ভারতের রাজধানী করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। লক্ষ্মণ এখানে সুর্পণখার নাসিকা কাটিয়াছিলেন বলিয়া, স্থানটির নাম "নাসিক" হইয়াছে বোধ হয়। ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল ব্যবধানে নাসিক নগর। টোঙ্গায় যাইতে হয়। এখানকার টোঙ্গাগুলি এক নূতন জিনিস। দেখিতে যেন কেনভাসের ছাদওয়ালা টম-টম। লাঙ্গলে যেরূপে গরু জুতিয়া থাকে, ইহাতে সেইরূপ দুটি ঘোড়া যুড়িয়া দেয়। কিন্তু নক্ষত্রবেগে চলিয়া যায়!

আমরা অপরাহ্নে নাসিকে গিয়া, পাণ্ডা অমৃতরাম অনন্তরাম সিঙ্গারিয়ার বাড়ীতে অতিথি হই, এবং তাহার ভ্রাতৃ-বধূ আম্বা দেবী আমাদের অন্নপূর্ণার কার্য্য করেন। পর দিবস প্রাতে, প্রথমে গোদাবরী দর্শন করি। গোদাবরীর গর্ভ প্রস্তরময়। তাহা কাটিয়া, দীর্ঘাকৃতি কুণ্ডরাশি সৃষ্টি করা হইয়াছে। কুণ্ডের দুই পার্শ্বে জলের রন্ধ্র রাখা হইয়াছে। তাহার দ্বারা কুণ্ড হইতে কুণ্ডান্তরে গোদাবরী স্রোত বহিয়া যাইতেছে। উপর দিয়া লোক এ পার হইতে ও পারে যাতায়াত করিতেছে। তারাচরণ গঙ্গাষ্টক আবৃত্তি করিতে করিতে "তুঙ্গস্তনাস্ফালিত" জলে স্নান করিলেন। তাঁহার জন্যে ত এক ডুব দিলেনই। তাঁহার পিতা, মাতা, সর্ব্বশেষ আজন্ম পতিবিরহিণী পত্নীর জন্যেও এক ডুব দিলেন। আমার মাতা নাই, পিতা নাই। তাঁহারা উভয়ে বৈকুণ্ঠে; বহুদিন এই অযোগ্য পুত্রের পাপ পুণ্যের অতীত হইয়াছেন। আছেন পত্নী, কিন্তু তাঁহার স্বামী অবগাহন করিলে, সেই স্বামীর পুণ্যের ভাগী তিনি হইতে পারিবেন কি না, আমার সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। সংসারসমুদ্রে ডুবিয়া ত তাঁহার জন্যে কোন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি নাই। গোদাবরীতে ডুবিয়া কি পারিব? তদ্ভিন্ন, এ স্থানের জলের এরূপ বর্ণ যে, তাহা কেবল নিমজ্জিতা সুন্দরীদের "তুঙ্গ স্তন" মাত্র আস্ফালিত করিয়া আসিতেছে বলিয়া ত আমার বোধ হইল না। চক্ষের উপর দেখিলাম, কতরূপ ময়লাই এ স্থানে প্রক্ষালিত হইতেছে। এখানে স্নান করিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না।

গোদাবরীর অপর পারেই 'দণ্ডকারণ্য।' এখন তাহা একটি ক্ষুদ্র গৃহারণ্য। গোদাবরী পার হইয়া আমরা প্রথম একটি বৃহৎপ্রাঙ্গণসম্বলিত মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্ত্তি দর্শন করি। প্রবাদ আছে যে, এখানে রামচন্দ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বনবাস করিয়াছিলেন! এই সেই রামায়ণের আরণ্যশোভাপূর্ণ পঞ্চবটী। প্রাঙ্গণে অনেকগুলি উদরসর্ব্বব সন্ন্যাসী বসিয়া রহিয়াছে। এক জন আমাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ রসিকতা করিলেন। তাহার পর আর একটি মন্দিরে যাই। এখানে কৃষ্ণমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। পাণ্ডা বলিলেন, এ মন্দিরে যাহা মানস করিব, তাহা পাইব। আমি বলিলাম, আমার কিছুই বাঞ্ছনীয় নাই। নারায়ণ আমাকে যাহা দিয়াছেন, আমি তাহাতেই সুখী। তারাচরণ বলিলেন, কিছু আমাকে প্রার্থনা করিতে হইবে। তখন আমি প্রার্থনা করিলাম—প্রভো। আমার নির্ম্মল তোমার কার্য্যের উপযোগী হউক। মনে মনে আর একটি প্রার্থনা করিলাম—তাহা বলিব না। তাহার কিঞ্চিৎ দূরে, ভূগর্ভে, একটি কক্ষে সীতা দেবীর একটি মূর্ত্তি স্থাপিতা আছে। আমি ইহার ভিতর কষ্টে প্রবেশ করিয়াছিলাম, যেন নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আইসে। তারাচরণের সাহস হইল না। মূর্খ পাণ্ডা বলিল, রামচন্দ্র রাবণের ভয়ে সীতাকে এইখানে লুকাইয়া রাখিতেন। তাহার

রামায়ণের জ্ঞানও এই পর্য্যন্ত। সীতা এখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল অবরুদ্ধা থাকিলে, রাবণ সবংশে মরিত না, বাল্মীকিকেও এত শ্রম করিতে হইত না। তিনি এখানেই মরিতেন।

তাহার পর প্রায় এক ক্রোশ দূরে তপোবন দেখিতে যাই। প্রবাদ, এখানে তপস্যা করিয়া লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত-বধের শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এ স্থানটির মত এমন শান্তিপ্রদ স্থান আমি অল্প দেখিয়াছি। আমার বোধ হয়, এইটিই প্রকৃত বাল্মীকি-কল্পনার লীলাভূমি 'পঞ্চবটী'। এখনও পাঁচটি বট গাছ একস্থান আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। এখনও তাহার চারিদিকে নানাবিধ বনবৃক্ষ রহিয়াছে এবং দেখিলে এককালে যে এই অধিত্যকাটি সম্যক অরণ্য ছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অনতিদূরে আরাবলীর শেখরমালা এক পার্শ্বে আকাশের গায়ে চিত্রের মত দেখা যাইতেছে। অন্য দিকে রামায়ণের বর্ণনার সার্থকতা করিয়া, এখনও গোদাবরী নদী গদ্‌গদ্‌ রবে শিলা হইতে শিলান্তরে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র জলপ্রপাত পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। এক পার্শ্বে নিবিড় অরণ্যময় তীরে নানাবিধ বনফুল ফুটিয়া রহিয়াছে ; অন্য পার্শ্বে তৃণশূন্য বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী দৈত্যব্যূহের মত ভীমবেশে দাঁড়াইয়া আছে। এক স্থানে জল কিঞ্চিৎ গভীর। পাণ্ডা বলিলেন, লক্ষ্মণ এখানে সূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। আর এক বিদ্যাবাগীশ। তিনি এক ক্ষুদ্র গর্ত্ত সম্মুখে করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, রামচন্দ্র রাবণের ভয়ে আসল সীতাকে এই কাঁকড়ার গর্ত্ত দিয়া পাতালে পাঠাইয়াছিলেন। রামায়ণের এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া একটি পয়সা চাহিলেন। এখানে একটি জলপ্রপাতে আমি বড় প্রীতিভরে স্নান করিলাম। জননী শৈলসুতা, নীলমণিহারনিভ সুশীতল বারিধারা আমার মানব দেহে ঢালিয়া দিয়া মন প্রাণ, পবিত্র করিলেন।

নর্ম্মদা।

এক দিন মাত্র নাসিকে থাকিয়া, ছাব্বিশ ঘণ্টা রেলে কাটাইয়া আমরা অবসন্ন প্রাণে জব্বলপুর পঁহুছি। সেই রাত্রিতেই তারাচরণ চলিয়া আইসেন। পর দিন প্রাতে আমি নর্ম্মদা দর্শন করিতে যাই। জব্বলপুর হইতে এ স্থান এগার মাইল ব্যবধান : পথ অতি সুন্দর এবং ছায়াসমাচ্ছন্ন। প্রথমেই নর্ম্মদার জলপ্রপাত দেখিতে যাই। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে 'ধূমধারা' বলে। ঊর্দ্ধ্ব হইতে নিম্নে, প্রস্তরগর্ভে বেগে জলধারা পড়িয়া যে জলকণা উৎকীর্ণ করে, তাহা দূর হইতে ঠিক ধূমের মত বোধ হয়। সেই জন্যে এই জলপ্রপাতের নাম ধূমধারা হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে শ্বেত শৈলশ্রেণী। তাহাদের পাদমূল প্রক্ষালন করিয়া, প্রস্তরগর্ভা নর্ম্মদা প্রবাহিতা। দেখিলেই মেঘদূতের সেই কবিত্বপূর্ণ চরণটি মনে পড়ে।

"রেবাং দ্রক্ষস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্‌।"

অর্থ,—

"বিষম উপল মাঝে—
বিন্ধ্যপদে শীর্ণা রেবা করিও দর্শন।"

নর্ম্মদার অন্য নাম রেবা, তাহা তুমি জান। অনুমান পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধ্ব হইতে, বহু ধারায় গর্জ্জন করিয়া, নর্ম্মদা ভীষণ বেগে পতিত হইয়া এই অপূর্ব্ব জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়াছেন। নর্ম্মদা যেন অবিরাম সংখ্যাতীত শ্বেতকুন্দকুসুম রাশি বর্ষণ করিয়া বিন্ধ্য-পাদ পূজা করিতেছেন। জল তুষারবৎ শীতল। তথাপি এই প্রাকৃতিক কবিত্বস্রোতে অবগাহন না করিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। প্রপাতের নীচে নামিবার সাধ্য নাই। উপরিভাগে বসিয়াও স্নান করিবার সময় আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। স্রোতের বেগ এত প্রখর; কিন্তু চারি আঙ্গুলের অধিক জলের গভীরতা নাই।

ফিরিবার সময়ে, গৌরী-শঙ্কর দর্শন করি। জলপ্রপাত হইতে এই মন্দির পর্য্যন্ত,

ইহাঁরমূলে অসংখ্য আমলকী, বেল ও নানাবিধ বনজাত ফল বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে, ঋষিদিগের পুরাতন আশ্রমের চিত্র মনে পড়ে। আমি কোনও কোনও ফল খাইয়া দেখিলাম। মন্দিরটি একটি শৃঙ্গে অবস্থিত। মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—কেশবচন্দ্রের নববিধান! মধ্যস্থলে বৃষারূঢ়া হরপাৰ্ব্বতী। তাহার উভয় পার্শ্বে স্থানে স্থানে গণপতির সঙ্গে বুদ্ধদেব নীরবে শোভা পাইতেছেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণের চারি দিকে, প্রাচীরের মত শ্রেণীবদ্ধ কক্ষমালা। প্রত্যেক কক্ষে এক একটি মূৰ্ত্তি বিরাজিত। অল্প বেশী সকলেরই ভগ্নাবস্থা। পাণ্ডা ঠাকুর বলিলেন, চৌষট্টি যোগিনী। কিন্তু আমি তাহাতে যোগিনীর গন্ধও দেখিলাম না। আমি দেখিলাম, অধিকাংশই মাহেশ্বরী প্রভৃতি রক্তবীজ-বধের মহাবিদ্যা দুরবস্থাপন্না হইয়া পড়িয়া আছেন। মন্দিরটি এক সময়ে গৌরবাপন্ন ছিল, সন্দেহ নাই। এ পৰ্ব্বতের সানুদেশ হইতে নৰ্ম্মদার উভয়তীরস্থ শৈলমালা ও উপত্যকার শোভা মনোমুগ্ধকর।

পৰ্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া আমি ভারতখ্যাত 'মাৰ্ব্বলরক' বা মৰ্ম্মর পৰ্ব্বত দেখিতে যাই। এখানে নৰ্ম্মদার উভয়তীরস্থ পৰ্ব্বতই মৰ্ম্মর, কিন্তু উপরিভাগ তৃণ-গুল্ম-সমাচ্ছন্ন এবং বৃষ্টির দ্বারা বিবর্ণ হইয়াছে। সেরূপ অমল শ্বেতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। জলপ্রপাত হইতে কিঞ্চিৎ দূরে জলপতন-বেগে গর্ভস্থ প্রস্তর কাটিয়া একটি দীর্ঘাকার বিচিত্র সরোবর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। যেখানে স্বয়ং প্রকৃতিই শিল্পী, সেখানে তাহার বিচিত্রতা এবং শোভার কথা কি বলিব? গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এখানে দুটি বাঙ্গলা এবং দুখানি প্লেজার বোট বা আমোদতরণী রক্ষিত হইয়াছে। তীরস্থিত গৃহ দুইখানি যেন দুখানি ছবি। ডিষ্ট্রীক্ট বাঙ্গলাটি এত সুন্দর, এবং স্থানটি এত হৃদয়মুগ্ধকর যে, আমার ইচ্ছা হইল, এখানে তোমাকে লইয়া যদি কিছুদিন থাকিতে পারি! আমি একখানি জালিবোটে নৰ্ম্মদার গর্ভে বেড়াইতে লাগিলাম। আমি ইহার কি বর্ণনা করিব? অমল ধবল হইতে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, এবং উভয় বর্ণের সংমিশ্রিত নানাবর্ণের, মৰ্ম্মরশৈলশ্রেণী উভয় পার্শ্বে সরল ভাবে মধ্যাহ্ন রবিকরে কি মহিমাপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পদতলে ঘুরিয়া ফিরিয়া নীল তরল অমৃতখণ্ডের মত নৰ্ম্মদার গর্ভস্থ সরসী শোভা পাইতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণের মৰ্ম্মর প্রাচীরের ছায়া নীলদর্পণে প্রতিভাত হইয়া, নানাবর্ণের মেঘমালায় খচিত এক খণ্ড আকাশের মত শোভা পাইতেছে। স্থানে স্থানে মৰ্ম্মর গর্ভে কি সুন্দর সুন্দর কক্ষই নিৰ্ম্মিত হইয়া রহিয়াছে। কক্ষপ্রাচীর শ্বেত মৰ্ম্মরের; কক্ষতল নৰ্ম্মদা সলিলে নীল-মণিময়. স্থানে স্থানে মৰ্ম্মরখণ্ড নৰ্ম্মদার স্রোত অবরোধ করিতে চাহিতেছে, যেন গিরি হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। আবার স্থানে স্থানে এক এক খণ্ড বিচ্ছিন্ন মৰ্ম্মর নদীগর্ভে ভাসমান। ঠিক যেন প্রকৃতি বিচিত্র বেদী নিৰ্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই সলিলখণ্ডে বেড়াইতে বেড়াইতে আমি সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছিলাম। আমার বোধ হইল, আমি যেন একটি অপ্সরাপুরীর স্বপ্ন দেখিতেছি। সেখানে সকলই যেন সুন্দর, কোমল, তরল। সেখানে সকলই প্রেম, সহৃদয়তা এবং মহাপ্রাণতা। আমার মনে হইল, এই সলিলখণ্ড বিন্ধ্যাচলের হৃদয়। বিন্ধ্য-সুতা নৰ্ম্মদা দুহিতা-প্রেমামৃতে ইহা পূর্ণ করিয়া, কলু কলু রবে কাঁদিতে কাঁদিতে পতিগৃহে চলিয়াছেন। অদূরে জলপ্রপাতের শব্দ এখান হইতে শুনিতে কি মধুর, কি করুণ! অথবা যেন কোন সতী সাধ্বী আকুলে হৃদয়ে পতিহৃদয়ে হৃদয় ঢালিতে চলিয়াছেন। সতী যে পথে যাইতেছেন, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ সংসার-প্রস্তর-রাশিও যেন নিৰ্ম্মল, পবিত্র ও সুশীতল করিয়া যাইতেছেন। বোম্বাই নগরের পার্শ্বস্থ আরব সমুদ্রে নৌকাবিহার, সে এক দৃশ্য—তাহা মহিমাপূর্ণ, অনন্ত প্রেমের আভাসপূর্ণ। নৰ্ম্মদার নৌকাবিহার, সে অন্য দৃশ্য—তাহা মাধুর্য্যময়, ক্ষুদ্র বালিকার পিতৃপ্রেমের ক্ষুদ্র অথচ গভীর

উচ্ছ্বাস। একটি বীর পতির বিরাট হৃদয়, অন্যটি বালিকানবোঢ়া বধূর ক্ষুদ্র বক্ষ!

প্রাণ ভরিয়া নর্ম্মদার এই মোহিনী শোভা সন্দর্শন করিয়া, আসিবার সময়ে, পথে দুর্গাবতীর রাজধানী 'গড়া' এবং শৈলশেখরস্থিত তাঁহার আবাসস্থান 'মদনমহল' দেখিয়া আসি। দুর্গাবতীর নাম তুমি 'পলাশিতে'ও পড়িয়াছ।

"তথাপি সমরে যেন রাণী দুর্গাবতী।"

ইনি পরম রূপসী গোন্ডজাতীয়া বীরাঙ্গনা ছিলেন। স্বয়ং মোগল সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। স্বয়ং অশ্বারোহিণী হইয়া সম্মুখ সমরে অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া ভারতবর্ষ তাঁহার কীর্ত্তিতে পর্য্যপ্লাবিত করিয়াছিলেন। এই দানবদলনীর দুর্গটির একটি মাত্র অট্টালিকা এখনও বর্ত্তমান আছে। উচ্চ শৈলশৃঙ্গের উপরে একখানি প্রকান্ড গোলাকৃতি পাথর। তাহার পার্শ্ব হইতে সরল ভাবে প্রাচীর তুলিয়া একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পাথরের এক পার্শ্বেও একটি কক্ষ আছে। ইহা শুদ্ধ ধরিলে গৃহটি ত্রিতল। এই গৃহের দ্বিতীয়তল হইতে 'গড়া' নগরের দৃশ্য চিত্রিতবৎ সুন্দর দেখায়। পর্ব্বতটির চতুষ্পার্শ্বে স্থানে স্থানে প্রাকৃতিক গড় বা ঝিল স্ফটিকখন্ডের মত শোভা পাইতেছে। এই সকল গড় হইতে স্থানটির নাম গড়া হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গৃহটি পর্য্যন্ত এতদিন কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু সেই নিরুপমা সুন্দরী, সেই দিল্লীশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী বীরনারী আজ কোথায়। বিংশতি কোটী নরাধমে আজ ভারতমাতার বক্ষ গুরুভারে পীড়িত না করিয়া, যদি এরূপ একটি বীরনারী, একটি দুর্গাবতী থাকিত, জননীর কি দুর্গোৎসবই হইত। হায়! হায়! দুর্গাবতীর কি চিরদিনের জন্যে বিজয়া হইল! আবার কি তাহার বোধন হইবে না?

জব্বলপুরে ফিরিয়া শিল্পবিদ্যালয় দেখিতে যাই। যে সকল 'ঠগেরা' ইংরাজ সাম্রাজ্যের আরম্ভে, গামছা মোড়া দিয়া সহস্র সহস্র পথিকের প্রাণহত্যা করিয়া ডাকাতি করিত, বৃটিশ শাসনের প্রভাবে, আজ তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা এই জব্বলপুরে আবদ্ধ থাকিয়া, অপূর্ব্ব শিল্প কার্য্য সকল করিতেছে। এই বিদ্যালয় হইতে আমাদের তাঁবু শতরঞ্চি ইত্যাদি যাইয়া থাকে। যে হস্ত ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাণসংহারক গামছা মুড়িত, আজ তাহা তাঁত বুনিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইংরাজ রাজ্যের অধিক গৌরবের কথা কি হইতে পারে? ইহার যতই দোষ থাকুক না কেন, আজ ভারতবক্ষে যে সার্দ্ধ শতবৎসরব্যাপী অভিন্ন শান্তি আসমুদ্রগিরি বিরাজ করিতেছে, ভারতমাতা ইহা কখনও উপভোগ করেন নাই। ইংরাজ-সাম্রাজ্যের এই শান্তি অক্ষয় হউক!

সেই রাত্রিতেই এলাহাবাদ রওনা হই। পরদিন প্রাতে এখানে পঁহুছিয়া, ঈশ্বরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিলাম। আমার ভারতভ্রমণবৃত্তান্ত শেষ হইল। কাল প্রাতে কলিকাতা যাইতেছি। যদি সময় পাই, তোমার স্বজাতীয়াদের সম্বন্ধে একখানি পত্র কলিকাতা হইতে লিখিব। স্থানবর্ণনায় সে সকল কথা কিছু লিখিবার অবসর পাই নাই।

ভারত-রমণীর চিত্র।

তুলনায় সমালোচনা।

তোমাকে আমার উত্তর-ভারত-ভ্রমণ সম্বন্ধে আর একখানি পত্র লিখিব বলিয়াছিলাম। তুমি তোমার স্বজাতীয়াদের সম্বন্ধে ২।১ কথা অবশ্য শুনিতে চাহিবে। এলাহাবাদ পর্য্যন্ত কুম্ভোদরীদের তুমি দেখিয়াছ, তাঁহাদের বেশ-ভূষার কথা অবগত আছ। দিল্লী পর্য্যন্তও প্রায় সেইরূপ। তবে সে অঞ্চলের রূপসীরা কাপড় একেবারে নাভির নীচে নগ্নতার শেষ সীমায় পরেন না। কিঞ্চিৎ উপরে কিঞ্চিৎ কসিয়া পরেন। উদরটি তত তানপূরার অধোভাগের মত দেখায় না। তাহার পর পঞ্জাব। পঞ্জাবিনীরা বেশ সুন্দরী। প্রকৃত আর্য্য আকৃতি ইহাদেরই আছে। রং যেন ফুটিয়া পড়িতেছে। নাসিকা প্রকৃতই গৃধিনীগঞ্জিত। তবে মুখের রেখাবলী আমাদের চক্ষে কিছু অধিক তীক্ষ্ণ বোধ হয়। তাহাদের পোষাক—পায়জামা, পিরাণ এবং চাদর। পায়জামা হাঁটু হইতে পা পর্য্যন্ত পায়ের সঙ্গে আঁটা। হাঁটুর উপর ঢিলা। পিরাণটি প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত পড়ে। শুনিলাম, সুন্দরীরা শয়ন করিবার সময় পায়জামা একেবারে খুলিয়া ফেলিয়া কেবল পিরাণটি মাত্র অঙ্গে ধারণ করেন। পিরাণটি ইংলণ্ডীয় ললনাদের নাইট্ সার্টের কার্য্য করে।

বঙ্গ সুন্দরীদের মত ইহাদের পর্দ্দা আছে, তবে অপেক্ষাকৃত ইহারা স্বাধীন এবং সে স্বাধীনতায় কিঞ্চিৎ বীরত্ব আছে। একটি গল্প বলিব। হরিদ্বার হইতে গাড়ী আসিয়া লাকসার ষ্টেশনে পঁহুছিল। এখানে অন্য গাড়ীতে যাইতে হয়, এবং তাহা আসিতে প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্ব হয়। আমি গাড়ীর পার্শ্বে প্ল্যাট্‌ফরমে বেড়াইতেছি। এক জন মধ্যবয়স্কা পঞ্জাববাসিনী আমাকে আহ্বান করিলেন। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পার্শ্বে জ্বলন্ত অগ্নিশিখানিভ একটি পূর্ণকিশোরী কন্যা। মুখখানি কি লাবণ্যফুটনোন্মুখ কমলকোরকের শোভার ন্যায় নয়ন মোহিত করিতেছে। অর্দ্ধবয়সী আমার সঙ্গে অসঙ্কুচিত ভাবে আলাপ করিলেন। * * * এই নবীন পরিচিতার সঙ্গে বহুক্ষণ বেশ কৌতুকে কাটাইলাম। তাহার পর অন্য গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। আমার গাড়ীতে জিনিষ তুলিয়া আমি দ্বারের কাছে প্ল্যাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া আছি ; পিঠে কি কোমল হাত লাগিল। ফিরিয়া দেখিলাম, মাতা ও কন্যা। যুবতী বলিলেন,—সাহেব! আমাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া দেও"। আমি আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। তখন হুকুম হইল,—"আমার বৃদ্ধ পিতাকেও তুলিয়া দিয়া আইস।" আমি বলিলাম, "আমি তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে কি প্রকারে চিনিব ? " এমন সময়ে বৃদ্ধ আসিয়া স্ত্রীলোকের গাড়ীতে একটা মোট দিয়া ছুটিল। কোনও গাড়ীতে স্থান নাই। বৃদ্ধ, লোকের গোলে পড়িয়া গেল। যুবতী চীৎকার করিয়া হুকুম দিতে লাগিলেন, "তুমি আমার বাপকে উঠাইয়া দেও।" আমি দেখিলাম, আমার মন্দ হাকিম জোটে নাই। গাড়ীতে স্থান নাই। ষ্টেশনমাষ্টারের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একখানি গাড়ী জুড়িয়া লইলাম। তখন বহুতর অন্য লোকের সঙ্গে বৃদ্ধ উঠিল। সুন্দরী আবার আমাকে তলপ দিলেন। বলিলাম, "তোমার বাপ উঠিয়াছে।" প্রশ্ন—"তুমি স্বচক্ষে দেখিয়াছ?" উত্তর—"দেখিয়াছি।' তখন তিনি আমাকে ছাড়িলেন। শুনিলাম, তিনি একজন মহাজনের বনিতা। প্রত্যেক ষ্টেশনে আমি বেড়াইবার সময় আমার সঙ্গে আলাপ করিতেন। তিনি জলন্দরে নামিয়া গেলেন, আমি লাহোরে চলিয়া গেলাম।

আমি কাশ্মীর যাইবার অবসর পাই নাই। শীতে যাইবারও সুবিধা নাই। অতএব কাশ্মীরকুসুমরাশি আমি বড় একটা দেখি নাই। তবে যাহা দেখিলাম এবং শুনিলাম, তাহাতে তাঁহাদের উপর আমার শ্রদ্ধা কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। তাঁহাদের আকৃতিতে কিঞ্চিৎ পুরুষে পুরুষে ভাব, যদিও রং অতুলনীয় এবং শুনিলাম, তাঁহারা নিতান্ত অপরিষ্কার। সকলে বলিলেন, ইঁহাদের অপেক্ষা শিমলা-অঞ্চলবাসিনী হিমালয়কন্যারাই সুন্দরী। ইহাদিগকে পাহাড়িয়া বলে। তাহার একটিমাত্র আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। প্রতুলের বাড়ীর পার্শ্বে একটি পাহাড়িয়া গৃহস্থ বাস করেন। তাঁহার একটি কন্যা সর্ব্বদা প্রাচীরের সে পাশে দাঁড়াইয়া, প্রতুলের দাসীর সঙ্গে কথা কহিত এবং প্রায়ই সে ও তাহার মাতা, নানা কায কর্ম্ম করিয়া বেড়াইত। মরি! মরি! কি রূপ। আমি অমন রূপ যেন কখনও দেখি নাই। শুনিলাম, তাহার নাম পার্ব্বতী এবং সে রূপেও ঠিক আমাদের পার্ব্বতী। তাহাকে দেখিয়া আমি বুঝিলাম, আমাদের শাস্ত্রকার কেন আমাদের উমাকে হিমালয়ের কন্যা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। তাহাকে অসুর এবং সিংহের পিঠে চড়াইয়া দিলে, সে একটি জীবন্ত পার্ব্বতী হইবে। রূপে, লাবণ্যে, বর্ণে, শরীরের দৈর্ঘ্যে, সে যেন দক্ষ শিল্পকরের নির্ম্মিত একটি অপূর্ব্ব প্রতিমা। দূর হইতে যতদূর বুঝা যাইতেছিল, তাহার এই প্রথম যৌবন; এবং যে ভাবে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, তাহাতে আমার বোধ হইত,—সে একটি ফুল অপেক্ষা ভারি হইবে না। মরি! মরি! কি মুখ, কি চোক, কি নাসিকা, কি বর্ণ, কি ক্ষুদ্র অবয়ব, সর্ব্বশেষ কি মধুমাখা ঈষৎ হাসি। তাহাকে আমি যতবার দেখিতাম, আমার বোধ হইত, যেন একটি রূপের স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহার পোষাক পঞ্জাবী রমণীদিগের মত। তবে কখন কখন হিন্দুস্থানীদের মত সাড়ীও পরিতে দেখিতাম।

তাহার পর রাজপুতানা যাই। কি জয়পুরের, কি যোধপুরের, কি আজমীরের, কোন স্থানের রাজপুতনী আমি সুন্দরী দেখি নাই। কেবল চিতোরের রমণীরা একরূপ ইহার ব্যতিক্রম। মাড়ওয়ারের রমণীরা সর্ব্বাপেক্ষা রূপহীনা। রাজপুতনীদের পরিধান ঘাঘরা, কাঁচুলী ও ওড়না। ঘাঘরাটিও আবার এক প্রকাণ্ড ব্যাপার, এবং উলঙ্গ না হইয়া যতদূর সাধ্য, তত দূর নাভির নীচে ঘাঘরার সম্মুখটি নামাইয়া পরিয়া থাকে। অতএব কৃশাঙ্গিনীরা ছাড়া, অন্য মহিলারা বেহার-অঞ্চল-বাসিনীদের ন্যায় মহোদরী। কাঁচুলীও এরূপ ভাবে পরেন যে, ভারতচন্দ্রের কদম্বের ও দাড়িম্বের নিম্নের এক তৃতীয়াংশ তাহার বাহিরে থাকে, এবং তাহাতে বন্ধনের দাগ থাকে।

তাহার পর গুজরাটে চল। বরদার গুর্জ্জরীদের রূপ বর্ণনীয় নহে। যে দিক চাহিয়া দেখ, ষ্টেশনের মেথরাণী পর্য্যন্ত নয়ন মোহিত করিয়া দিবে। গুর্জ্জরীর "উরজরঞ্জন" ত আছেই, তাহা ছাড়া, ইহাদের মধ্যে 'তন্বী শ্যামা' প্রায় দেখিতে পাইবে না। গাইকোয়ারের মৃতা মহিষী লক্ষ্মীবাই হইতে পথের ভিখারিণী পর্য্যন্ত সকলই সুন্দরী। ইহারা বেহারের স্ত্রীলোকদের মত সাড়ী পরে, তবে শ্রাদ্ধটি তত নীচে গড়ায় না। কেবল ভারতচন্দ্রের কামদেবের প্রবেশার্থ, "নাভিকূপ" মাত্র অনাবৃত থাকে। মুসলমান সাম্রাজ্যের তরঙ্গ রাজপুতানার দক্ষিণে বড় আইসে নাই। মারওয়ার ছাড়িয়া আসিলে অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়ে; তখন আর রমণী, অবগুণ্ঠন মধ্যে বদনচন্দ্র ঢাকিয়া, দর্শকের কৌতূহল বৃদ্ধি করে না। স্ত্রীস্বাধীনতাও ক্রমশঃ এখান হইতে মাথা তুলিয়া উঠিতেছে, দেখা যায়। আর এক-পা অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাইবে একেবারে চাঁদের হাট। মহারাষ্ট্রমহিলারা এখন "কামরঙ্গ পরিহরি "রণরঙ্গে" নাই বা মাতুন, তবে সেই পশ্চাৎ-কোঁচাআঁটা বসন পরিধান, সেই অবগুণ্ঠন-শূন্য প্রফুল্ল পদ্মমুখ, সেই অসঙ্কোচ গমন দেখিলে, ইহারা এক কালে যে রণরঙ্গে মাতিতেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যায়। মস্তকমুণ্ডিত, পর্ব্বতবৎ-পাগড়ী-সজ্জিত, মহারাষ্ট্রীয়

পুরুষদিগকে দেখিতে বড় ভাল দেখায় না, কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গনারা পরম রূপসী। তাঁহাদের কেবল কপোলদেশটার অস্থিটা যেন কিঞ্চিৎ বেশী পরিদৃশ্যমান। তাঁহাদের বসন-পরিধানের নিয়মটিই কেবল স্বতন্ত্র ; এরূপ নহে ; তাঁহাদের কবরীবন্ধনেও কিঞ্চিৎ নূতনত্ব আছে। কবরী একবেণীবন্ধ করিয়া তাহা চক্রাকারে পশ্চাৎ দিকে রাখা হয়। মাথার পশ্চাতে যেন একটি চাঁচর চক্র,—প্রেমফাঁসির গ্রন্থি! প্রাণে প্রাণে যে ফিরিয়া আসিয়াছি, সে কেবল তোমার কপালের জোরে। মহারাষ্ট্রীয় সুন্দরীরা সর্ব্বত্র অবলীলাক্রমে বিরাজ করেন ; কি উদ্যানে, কি বাদ্যস্থানে, তাঁহারা সম্মুখ কোঁচার অগ্রভাগ বামহস্তে লীলা করিয়া ধরিয়া, পাদুকাশূন্য চরণে বিচরণ করিয়া বেড়ান। সঙ্গে কিন্তু একটি পুরুষ মানুষ থাকেন। এ দৃশ্য ঘোমটা মধ্য হইতে উঁকি-বিক্ষেপিণী বঙ্গমহিলাদের ও তাঁহাদের আড়ে-ঠারে-দৃষ্টি সঞ্চালনকারী রসিক পুরুষদিগের দেখিবার যোগ্য, শিখিবার যোগ্য। এই পুণ্যবতীদের দর্শনেও মনে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এবং পবিত্রতা সঞ্চারিত হয়। রাজস্থান ছাড়িয়া গেলে আমার বোধ হইল, যেন সম্পূর্ণ একটি সৌন্দর্য্যপূর্ণ নূতন জগতে প্রবেশ করিলাম। কবি বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত রমণীর হাসিতে আলোকিত না হইয়াছিল, জগৎ অরণ্য ছিল। কথাটা বড় গভীর। আমাদের বঙ্গসমাজ রমণীর হাসিশূন্য, আমাদের জীবন তাই এত উৎসাহহীন, এত আনন্দশূন্য। যবন রাজ্য আমাদের আর যে সকল অনিষ্ট করিয়াছে, তাহা অতি সামান্য। নিপীড়িত হিন্দুধর্ম্ম মাথা তুলিয়াছে, ব্যক্তিগত নিপীড়ন সমাজহৃদয় স্পর্শ করে নাই। কিন্তু আমাদের সমাজে এই স্ত্রী-অবরোধস্বরূপ যে অর্দ্ধাঙ্গ বা পক্ষঘাত রোগ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার উপসর্গে সমাজ এই ৭০০ বৎসর পরেও মাথা তুলিতে পারিল না।

কেবল মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে বলিয়া নহে, পার্শীদের মধ্যেও এই পাপ প্রবেশ করে নাই। তাহাদের রমণীরাও রূপে চারিদিক আলোকিত করিয়া সর্ব্বত্র বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। হিন্দু-সুন্দরীরা চম্পকবরণী। পার্শী রূপসীদের বর্ণ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত শিশিরসিক্ত পদ্ম ফুলের মত। ইহুদীরা ভিন্ন ইহাদের তুলনার স্থান আর নাই। ইহাদের সাড়ীই বোম্বাই সাড়ী। সাড়ীর উপর একটি মলমলের আজানুলম্বিত পিরাণ ; তাহার উপর জ্যাকেট্। ইহাঁরা মাথার চুল ঢাকিয়া একখানা সাদা রুমাল বাঁধিয়া তাহার উপর খোঁপা মাত্র ঢাকিয়া মাথায় কাপড় দিয়া থাকে। পিরাণের দৈর্ঘ্য এবং কাল চুলে সাদা কাপড়ের বন্ধনটি কেমন আমাদের চক্ষে ভাল লাগে না।

আমরা অপরাহ্নে নাসিকে পেঁাছি। যে পাণ্ডার বাটীতে গিয়া উঠি, তিনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহারা পাঁচ সহোদর। পাঁচটি স্ত্রীই সুন্দরী। আমি মাথা ধুইয়া উপরে যাইতেছি, নীচে ক্ষুদ্র অগ্নিশিখার ন্যায় একটি বালিকা বসিয়া আছে। আমি তাহাকে ডাকিলে সে এক লম্ফ দিয়া আমার বুকে উঠিয়া পা দুখানি দিয়া আমার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া আমার মুখের উপর মুখ রাখিয়া কি বলিতে লাগিল। বুঝিলাম একটি কথা দকষীণা (দক্ষিণা)। তাহার নাম ভগ্‌গু্য। বয়স ৬।৭ বৎসর ; বিবাহ হইয়াছে তিন বৎসর। বালিকা দিনে শ্বশুরবাড়ীতে, রাত্রিতে পিতার বাড়ীতে থাকে। আর একখানি ঈষৎশ্যাম বদন পার্শ্বের কক্ষ হইতে উঁকি মারিতেছিল। ভগ্‌গু্যকে তাহাকে ডাকিতে বলিলাম। সে হি হি করিয়া হাসিয়া, বীণার পঞ্চমে ডাকিল—"রুক্কু! ইক্রি আ।" রুক্কু আসিল। তাহার বয়স ৮ কি ৯ বৎসর হইবে। বড় সুন্দরী! তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আনিলে সে কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে দাঁড়াইয়া, অমনি হাত বাড়াইয়া বলিল—"দকষীণা"। অমনি তাহার শাশুড়ী আসিতেছে বলিয়া ছুটিয়া গেল। আমি উপরে গেলে আবার যাইয়া বলিল "দক্‌ষীণা"। যাইবার সময় দিব বলিলে বলিল, তাহার শাশুড়ী দেখিবে, সে আসিতে পারিবে না। তাহার পর দুটিতে সিঁড়ির উপর বসিয়া কত গান গাহিতে লাগিল। আমি কাছে গেলে ভগ্‌গু্যটি গলায় জড়াইয়া ধরে, রুক্কু পালায়। সে এ ঝাড়ীর পুত্রবধূ। অতএব দেখিলে, ইহাদের

মধ্যে বাল্য-বিবাহ যেরূপ ভাবে প্রচলিত; শুনিলে সমাজসংস্কারকগণ মূর্চ্ছা যাইবেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত স্ত্রী-সংস্কার না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সঙ্গে স্বামীর সাক্ষাৎ হয় না। ইঁচড়ে পাকান ব্যাপার আমাদের বঙ্গদেশের লোকে যেমন মোক্ষ মনে করেন, ইহারা সেরূপ মনে করে না। এই জন্যই বঙ্গদেশের রমণীরা অকালকুষ্মাণ্ড হইয়া পড়ে। যৌবনের প্রারম্ভে বৃদ্ধা, ফুল ফুটিতে না ফুটিতেই ঝরিয়া পড়ে।

পতিপত্নীর জীবনের সুখ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়; তাহা ছাড়া সন্তানেরা ক্ষীণপ্রাণ, ও রোগগ্রস্ত হইয়া, পিতা মাতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। ভগবান কতদিনে সমাজকে এ পাপের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, তাহা তিনিই জানেন!

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আহার করিতে বসিলাম। সম্মুখে পাতা দেখিয়া আমি হাসিতেছি দেখিয়া, সুন্দরী তাহা উঠাইয়া লইয়া আমাকে একখানি থালা দিলেন। আমরা খাইতে বসিলাম। সুন্দরী পরিবেশন করিয়া সম্মুখে বসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। এ আলাপ--

"সীতা নাড়ে হাত, রাবণ নাড়ে মাথা।"

তিনি হিন্দি বুঝেন না, আমি মহারাষ্ট্রীয় বুঝি না। প্রেমিক খুড়া গাইয়াছেন—

"নয়নে নয়নে যদি হৃদয়ে হৃদয়,
বালির বাঁধে রোধে কি হে অসীম সলিলে?"

দুটি মানব হৃদয় যদি কথা কহিতে চাহে, ভাষা তাহার প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে না। আমরা নয়নে নয়নে, হৃদয়ে হৃদয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। ঠাকুরাণীটির নাম অম্বা, সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নারায়ণ না দিলে কি করিব?" আমি বলিলাম, নারায়ণের দিবার এখনও বিস্তর সময় পড়িয়া আছে। তিনি আমার নাম ধাম, সর্ব্ব শেষ লক্ষ্মীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়া আসিয়াছি কেন, তাহারও কৈফিয়ৎ চাহিলেন। পুত্রটির কথাও অনেক জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি পা ছড়াইয়া সম্মুখে বসিয়া এরূপে ঈষৎ হাসিয়া হাসিয়া, প্রীতিবিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া চাহিয়া, বীণার কোমল স্বর-মালা সংমিলিত করিয়া, আলাপ করিতেছিলেন, আর সময়ে সময়ে আমাকে "চাউল দে। ওয়ারণ দে" (ভাত দি, ডাল দি) বলিতেছেন। যদিও খাইবার কিছুই ছিল না, তথাপি সে ডাল ভাত কি আনন্দেই আহার করিলাম!

শুইলাম। পুনা হইতে দীর্ঘকাল রেলবিহারে শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। শুইবা-মাত্র নিদ্রা আসিল। রাত্রি ১০।১১ টা হইবে। নীচে রমণীকণ্ঠেরও হাসির মিশ্রিত তরঙ্গ উঠিয়াছে। আমি উঠিয়া একটা প্রয়োজনে নীচে গেলাম। মরি—কি দৃশ্য! ইহারা স্বামীকে "ধনী" বলেন। কথাটা সার্থক। এরূপ রূপরত্ন যাহাদের, তাহারা ধনী বই কি? সংসারের সাররত্ন রমণীরত্ন। যাঁহাদের "ধনী" বাড়ী আছেন, তাঁহারা আপন আপন কক্ষে গিয়া ধনভোগ করিতেছেন। তিন সুন্দরীর "ধনী" বাড়ী নাই। ইঁহারা এক প্রদীপের আলোকে বসিয়া হাঁটু হইতে পায়ে এ রাত্রিতে তৈল মাখিতেছেন, হাসিতেছেন, গল্প করিতেছেন। রূপ, আনন্দ, বীণার ঝঙ্কার ছড়াইয়া পড়িতেছে। আমি মুহূর্ত্ত মাত্র দাঁড়াইয়া এই আনন্দবাজার দেখিলাম, চলিয়া গেলাম। তাঁহারা কোন সঙ্কোচই মনে করিলেন না। তারাচরণেরও নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ পরে অম্বাদেবী, তাঁহার পশ্চাতে প্রদীপ হস্তে অন্য এক সুন্দরী, আমাদের কক্ষদ্বারে আসিয়া হাসিতে লাগিলেন! না বুঝি হাসি, না বুঝি ভাষা। মহা বিপদে পড়িলাম। তারাচরণের মুখ শুকাইয়া গেল। অম্বা দেবী আমাকে ইঙ্গিত করিয়া, আমার বিছানা গুড়াইতে বলিলেন আমি গুড়াইতেছি, তিনি বিদ্যুৎবৎ ছুটিয়া যাইতে শ্রীচরণ একখানিতে তড়িদাহত হইলাম।

তিনি একটি চোরকুঠারি খুলিলেন, এবং সেখান হইতে একটি বিছানার তাড়া টানিতে টানিতে হাসিতে লাগিলেন। সোপানের শীর্ষ-দেশস্থা দীপহস্তা সুন্দরীও হাসিতেছেন। উভয়ের সে উচ্চ হাসি, সেই উচ্চ রসিকতাপূর্ণ কথা, দুর্ভাগ্যক্রমে কিছুই বুঝিতেছি না। তারাচরণ ভয়ে কাঁপুক, আমি ভাবিলাম, মেয়ে মানুষের কাছে অপ্রস্তুত হইব কেন, দাঁড়াইয়া সে হাসিতে যোগ দিলাম। তারাচরণ চীৎকার করিতে লাগিল,—"আরে ও বাবু বৈস!" আমি বলিলাম, 'ভয় নাই ; হরনেত্রানল নহে, আমরা কামদেবের মত ভস্ম হইব না।" রমণীদের রঙ্গরসও কিছুই বুঝিতেছি না, কিন্তু তারাচরণ যেন ঠিক দুই ফাঁসি-কাষ্ঠের মধ্যে অবস্থিত। দুই দিকে দুই সুন্দরী। পলাইবারও পথ নাই। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমার হাসিতে হাসিতে পার্শ্ব ফাটিয়া যাইতেছিল। বোধ হয় রমণীরাও তাহা দেখিয়া হাসিতেছিলেন। আমাদের একতরফা সমাজের কল্যাণ ভদ্ররমণীর কাছে পড়িলে বাঙ্গালীকে কি বিভ্রাটেই পড়িতে হয়। দেবীরা একটি বালিশ লইয়া, বাকি বিছানা ছড়াইয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। আমি বলিলাম,—"কেমন তারা! ইহাদের 'ধনীদের' আজ বাড়ী না থাকাটা ভাল হয় নাই।" এতক্ষণে তাহার মুখে হাসি আসিল, বিপদ কাটিয়া গেল। সুন্দরীরা নীচে গেলে বোধ হয়, এক জন পুরুষ আসিয়া, অতিথি বাড়ীতে আছে, তথাপি এইরূপ হৈ-রৈ করিতেছেন বলিয়া ভর্ৎসনা করিল। তাহার পর গৃহ নীরব হইল। পর দিন অম্বাদেবী আর বড় কাছে ঘেঁষিলেন না। একবার বিষণ্ণ ভাবে দূর হইতে দেখা দিয়া যেন নয়নের ভাবে বলিলেন, "পোড়ার মুখ! তুমি আমাকে গাল খাওয়াইয়াছ।" এ বেলা প্রদীপধারিণী আমাদের অন্নপূর্ণা হইলেন। তিনি অম্বাদেবী অপেক্ষা প্রাচীনা। আহার করিতেছি, আহা কি দৃশ্য! নীচে একটি বকুলবৃক্ষের তলায় একখানি শ্রীমদ্ভাগবত রাখিয়া, একটি গৃহলক্ষ্মী তাহা প্রদক্ষিণ করিতেছেন, এবং প্রত্যেকবার ঘুরিয়া আসিয়া গ্রন্থকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার মধ্যম যৌবনের উত্তাল তরঙ্গায়িত রূপ, তাঁহার সেই ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ, মুখশ্রী, সেই চক্রাকার ভ্রমণ, সেই গ্রীবাভঙ্গী, সেই কক্ষ-আন্দোলন, সেই পদসঞ্চালন আমি এ জীবনে ভুলিব না। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরের সহধর্ম্মিণী, গৃহের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মী। শুনিলাম, প্রতিদিন এ পরিবারের মঙ্গল কামনা করিয়া, এরূপে সহস্রবার প্রদক্ষিণ করেন। বুঝিলে কি একবার কাণ্ডখানা কি? বঙ্গদেশে এ পবিত্র দৃশ্য একদিন দেখিতে পাওয়া যাইত। এখন সে স্বর্গ বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গসুন্দরীদের স্বামী এখন গুরু নহে, দেবতা নহে, একটি সামান্য শাসনের বস্তু। স্বামীর পরিবার পরম শত্রু। তাহার ধর্ম্ম এখন স্বামীশাসন, ** কিংবা স্বামীর চরিত্র সমালোচন করিতে করিতে ২।৪ বার অঙ্গুলীভঙ্গী, ২।৪টি সাপের মন্ত্রের মত মন্ত্রপাঠ।! এরূপ ভাবে যদি কাহাকেও একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ২।৪ বার প্রদক্ষিণ করিতে বল, তখনই ডাক্তার ডাকিতে হইবে ; মাথায় বরফ ঢালিতে হইবে। আমরা সভ্য হইতেছি, উন্নত হইতেছি, এবং অন্ধকার হইতে আলোকে আসিতেছি। এই সাধ্বীর এই প্রদক্ষিণব্রত দেখিয়া, হৃদয় আমার কি পবিত্র, কি মহিমাপূর্ণ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমাদের এ সকল সীতা সাবিত্রী কোথায় গেল?

আহার করিয়া আমরা রওনা হইলাম। কাপড় পরিতেছি, প্রদীপধারিণী বড় কোমল স্নেহময় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি সত্য আজই যাইবে?" আমি বলিলাম, —"তোমাদের স্নেহের জন্য ধন্যবাদ, আজই যাইব।" তাহাদের শাশুড়ীর হস্তে বধূদের জন্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিয়া, আমরা বাড়ী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটি দোকানে একটি ঘটী কিনিলাম। যখন গাড়ীতে উঠিতেছি,—অপরদিকের দোকানে দাঁড়াইয়া কে?—সেই প্রদীপধারিণী!

তাহার পর নর্ম্মদা। এখান হইতে অবরোধপ্রথার আরম্ভ হইয়াছে। যে পাণ্ডার বাড়ীতে আহার করিলাম,—ঘরখানি কুটীর, কিন্তু কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন!—পাণ্ডা বলিলেন, আমি সস্ত্রীক থাকিলে ব্রাহ্মণীরা বাহির হইতেন।

নর্ম্মদা হইতে প্রয়াগ, প্রয়াগ হইতে উষায় হাবড়া পঁহুছিয়া, সেতু বাহিয়া যখন গঙ্গা পার হইতেছি, তখন দেখিলাম, দুই ধারে উষাস্বরূপিণী বঙ্গদিগম্বরীগণ অবগাহন করিতেছেন। তখন মনে হইল,—

"কে চায় খাইতে মধু বিনা বঙ্গকুসুমে?
কোথা হেন শতদল,
বুকে কার পরিমল,
থাকে পতিমুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে?
বঙ্গকুল বধূ বিনা মধু কোথা কুসুমে?"

সমাপ্ত

আমার জীবন

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ

(পাঠ = প্রথম সংস্করণ, ১৩১৪/১৩১৬/১৩১৭)

উৎসর্গ পত্র

যিনি আমার অসংখ্য ও অসহনীয়
উৎপীড়ন সহ্য করিয়া,
শৈশবে অতুলনীয় স্নেহে এই জীবন
গড়িয়াছিলেন,
আমার সেই পরমারাধ্যা
পিতামহী
৺অমলাসুন্দরী দেবীর
পবিত্র চরণে
এই জীবনী প্রেমাশ্রুপূর্ণ নয়নে
উৎসর্গ করিলাম।

নিবেদন

বহু বৎসর ব্যাপিয়া লেখকের অবসর ক্রমে এই জীবনী লিখিত, এবং তিনি সুদূর রেঙ্গুনে পীড়িত থাকিতে উহা কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। একারণে স্থানে স্থানে পুনরুক্তি হইয়াছে, এবং স্থানে স্থানে মুদ্রাঙ্কনে ভুল হইয়াছে। পাঠকগণ দয়া করিয়া উভয়ই ক্ষমা করিবেন।...

[প্রথম ভাগ/প্রথম সংস্করণে সন্নিবিষ্ট]

"Life is real, life is earnest"

Longfellow.

উপক্রমণিকা

আমার জীবন?—আমার মত লোকের জীবন লিখিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন? অসংখ্য কুসুমরাশির মধ্যে যে একটি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সৌরভ ও শোভাবিহীন ফুল কোথায় অনন্ত অরণ্যের নিভৃত স্থানে ফুটিয়া ঝরিতেছে; অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত আকাশতলে অসংখ্য জোনাকিরাশির মধ্যে যে একটি জোনাকি কোথায় অনন্ত প্রান্তরের অন্ধকারতম প্রদেশে ফুটিয়া নিবিতেছে; অনন্ত জগতের অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্রতম পরমাণু কি অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার জীবন কে জানিতে চাহে? তথাপি ইহারা এই জ্ঞানাতীত বিস্ময়পূর্ণ বিশ্বের অংশ! অহো কি রহস্য। তাহাদের দ্বারাও এই মহা সৃষ্টি-যন্ত্রের কোনও কার্য্য সাধিত হইতেছে; তাহা না হইলে তাহাদের সৃষ্টি হইবে কেন? বিধাতার সৃষ্টি নিষ্ফল নহে। সেইরূপ আমার মত ক্ষুদ্র মানবের দ্বারাও অবশ্য কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে, যাহা আমার ক্ষুদ্র মানব-জ্ঞানে বুঝিতে পারিতেছি না। যখন মনে এরূপ ভাবের উদয় হয়, যখন ভাবি যে, এই মহারঙ্গভূমে, যেখানে সৌরজগৎ প্রভৃতির অনন্ত কাল হইতে অনন্ত অভিনয় হইতেছে, আমিও তাহাতে রূপান্তরে অনন্ত কাল হইতে অভিনয় করিয়া আসিতেছি, তখন হৃদয় কি আত্ম-গরিমায় পূর্ণ হয়! তখন আমাকে আর একটি ক্ষণজীবী ক্ষুদ্র পতঙ্গবিশেষ বলিয়া বোধ হয় না। তখন আমি এই অনন্ত অভিনয়-ক্ষেত্রের অনন্ত অভিনয়ের এক জন অনন্ত অভিনেতা। কিন্তু যখন চিন্তারাজ্য হইতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তখন আবার আপনার ক্ষুদ্রত্বে আপনি ম্রিয়মাণ হই। কই, এই জীবনের কার্য্যকারিতা ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমার জীবন জানিবার জন্যে সময়ে সময়ে অনেকে পত্র লিখিয়াছেন। এক জন বারংবার অনুরোধ করাতে তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আমার জীবন তিনটি মহাঘটনায় পরিপূর্ণ—জন্ম, বিবাহ, দাসত্ব। আর একটি ঘটনা এখনও বাকি আছে, তাহা—মৃত্যু। তাঁহাকে আরও লিখিয়াছিলাম যে, এ শিরস্ত্রাণ বাঙ্গালার বড়লোক মাত্রকেই খাটিবে।

তবে আজ স্বয়ং আপনার জীবন লিখিতে বসিলাম কেন? ইচ্ছা—ভূত জীবনের দর্পণে একবার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া কিরূপ দেখায়, দেখিব। দেখিয়া তাহার একটি মন্দ রেখাও পরিবর্ত্তন করিতে পারি কি না, চেষ্টা করিব। এই মধ্য-জীবনে দাঁড়াইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলে, যে সকল ঝটিকাবিলোড়িত অরণ্যানী ও ভূধরমালা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যতের জন্যে সাহস ও শান্তিলাভ করিতে পারিব; সমাজের ও সংসারের যে সকল বিশ্বাসঘাতক বালুকাচর ও গহ্বর পার হইয়া আসিয়াছি, তাহা দেখিয়া অনেক শিক্ষা, অনেক সতর্কতা লাভ করিতে পারিব; এবং মেঘান্তরিত প্রাবৃট্ চন্দ্রমার ন্যায় কদাচিৎ যে সুখের, শান্তির ও স্নেহের মুখ দেখিয়াছি, তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ কথঞ্চিৎ আশায় পূর্ণ করিতে পারিব;—এই সাহস, এই শিক্ষা, এই সান্ত্বনার আশায় আজ আত্ম জীবনের আলোচনা করিতে বসিলাম।

জন্ম

"শুভ জন্মপত্রিকা'য় দেখিলাম,—১৭৬৮ শকাব্দায় "শ্রীমদ্ভানুগতোত্তরায়ণে সৌরমাঘ-স্যৈনাত্রিংশদিবসে বুধবাসরে তমিস্রপক্ষে" দশমী তিথিতে তৃতীয় দণ্ড বেলার সময়ে "বহুতর শুভযোগে" আমার "শুভ জন্ম।" পিতা, স্বর্গীয় গোপীমোহন রায়। মাতা স্বর্গীয়া

রাজরাজেশ্বরী। চট্টগ্রামে নয়াপাড়া গ্রামে বিখ্যাত শ্রীযুক্ত রায়ের বংশে আমার জন্ম। আমি জাতিতে বৈদ্য।

আমাদের কুলজীর শীর্ষস্থানে লেখা আছে, "রাঢ়ভঙ্গ।" ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মহারাষ্ট্র-বিপ্লবের সময়ে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা রাঢ় হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। তাহার আর একটি প্রমাণ, আমাদের স্থানীয় ভাষা। ইহার সঙ্গে রাঢ়দেশীয় ভাষায় বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পূর্ব্ববঙ্গের গন্ধমাত্র নাই। তাঁহারা বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী বকাসাইর পরগণায় প্রথম বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। সেখানে এখনও আমাদের বংশীয় একটি শাখা আছে শুনিয়াছি। তাহার পর দ্বিতীয় বাসস্থান হাটহাজারি থানার অন্তঃপাতী "মেখল" বা "মেখলা" নামক গ্রামে স্থাপিত হয়। সেই পূর্ব্ববাসস্থান এখনও আমাদের প্রজাবর্গের অধিকারে আছে। তাহাও মনোনীত না হওয়াতে, পুণ্যতোয়া কর্ণফুলী নদীর উত্তর তীরের অব্যবহিত দূরে নয়াপাড়া গ্রামে শেষ বাসস্থান স্থিরীকৃত হয়। কুলজীর শীর্ষস্থানীয় নাম—বৌদ্ধ সেন। তাঁহার ৭ম স্থানে রাজারাম রায়। সম্ভবতঃ ইনিই চট্টগ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ইনি ঢাকার নবাবের এক জন কার্য্যকারক ছিলেন। ইঁহার কার্য্যদক্ষতার পারিতোষিকস্বরূপ নবাব ইঁহাকে "রায়" উপাধি দিয়া ফেণী নদী হইতে টেক্‌নাফ অন্তরীপ, এবং পশ্চিমসমুদ্র হইতে পূর্ব্ব-গিরিশ্রেণী পর্য্যন্ত,—অর্থাৎ বর্ত্তমান চট্টগ্রাম জেলার,—করদ অধীশ্বর করিয়া দেন। সনন্দ-পত্রসংবলিত তাম্রফলক আমাদের বংশীয়দের হস্তে বহু পুরুষ যাবৎ ছিল। শেষে গৃহদাহে দগ্ধ হইয়া যায়। "রায়" উপাধি এখনও আমাদের বংশীয়েরা ধারণ করিতেছেন। "রায়" সম্মানসূচক উপাধি বলিয়া আমরা কেহ কেহ নিজ পক্ষে তাহা ব্যবহার না করিয়া আপনাদের জাতীয় উপাধি "সেন" ব্যবহার করিতেছি।

রাজারাম রায়ের চারি পুত্র। শ্রীযুক্ত রায়, দুর্গাপ্রসাদ রায়, শ্যাম রায় ও চাঁদ রায়। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত রায় ও শ্যাম রায় বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। শ্যাম রায় সম্বন্ধে একটি গল্প এখনও প্রচলিত আছে। নবাব চট্টগ্রাম পরিদর্শনে আসিয়া শ্যাম রায়ের ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য বলেন যে, এক রাত্রির মধ্যে তিনি যদি নবাবের বাসস্থানের সম্মুখে একটি সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম দেখাইতে পারেন, তবে তিনি অতীব আনন্দিত হইবেন। রাত্রি প্রভাত হইলে নবাব দেখিলেন, তাঁহার বাসস্থানের সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ সরসীগর্ভে প্রস্ফুটিত পদ্মরাজি ভাসিতেছে। সেই সরোবর অদ্যাপি বর্ত্তমান চট্টগ্রাম সহরের উত্তরাংশে "কমলদহ" নামে খ্যাত রহিয়াছে। কমলদহের পূর্ব্ব পার্শ্বে তখন কর্ণফুলী নদী প্রবাহিতা ছিল। শ্যাম রায় দীর্ঘিকা খনন করিয়া নদী হইতে জল আনিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন।

নবাবের কৌশলক্রমে শ্যাম রায় জাতিভ্রষ্ট হন। একদিন "রোজা"র সময়ে নবাব পুষ্পের ঘ্রাণ লইতেছেন দেখিয়া শ্যাম রায় তাঁহাকে বলেন যে, তাঁহার "রোজা" ভঙ্গ হইয়াছে ; কারণ "ঘ্রাণ অর্দ্ধেক ভোজন।" নবাব ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য একদিন তাঁহার আবাসস্থানে অধিকমাত্রায় পেঁয়াজ দিয়া গো-মাংস রন্ধন আরম্ভ করাইয়া শ্যাম রায়কে ডাকিয়া পাঠান। রায় মহোদয় নাসিকারন্ধ্র আচ্ছাদিত করিয়া উপস্থিত হইলে, নবাব তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। তিনি বলিলেন, কি এক দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছেন। উহা নিবারণের জন্যে নাসিকা আচ্ছাদিত করিয়াছেন। তখন নবাব বলিলেন, তবে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন ; কারণ, "ঘ্রাণ অর্দ্ধেক ভোজন।" শ্যাম রায় আপন অস্ত্রে আপনি আহত হইয়া, তাহা স্বীকার করিলেন। সে দিন হইতে তিনি জাতিভ্রষ্ট হইলেন। তাঁহার বংশীয়েরা চট্টগ্রামের মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অগ্রগণ্য। ইঁহারা মুসলমান হইলেও আমরা ইঁহাদিগকে কুটুম্বের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করি।

শ্রীযুক্ত রায় আপন রাজ্যে আপনার পিতা অপেক্ষাও অধিক খ্যাত্যাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ যে, আমরা তাঁহার বংশীয় বলিয়া পরিচিত। তিনি ত্রিবেণীতে তীর্থযাত্রায় গিয়া আত্ম-জীবনও ত্রিবেণীতে পরিণত করেন। তাঁহার প্রথমা ভার্য্যার সন্তান না হওয়াতে, তিনি সেই তীর্থধামে এক বৈদ্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে বোধ হয় যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান হইতে চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন; অন্যথা, এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল কোনও তীর্থযাত্রীকে কাহারও কন্যাদান করা সম্ভবপর নহে। শ্রীযুক্ত রায় একান্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তদীয় পিতা স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া "নরবলি" প্রদানপূর্ব্বক নদীগর্ভ হইতে যে দশভুজা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, এবং যিনি এখনও আমাদের কুলমাতা বলিয়া চট্টগ্রামে বিখ্যাত, তিনি এই দশভুজা-মন্দিরে "ন দিবা ন রাত্রি" ভেদে পূজায় নিবিষ্ট থাকিতেন। একদা তিনি সেইরূপ পূজায় বসিয়াছেন, তাঁহার শিশুকন্যা আসিয়া নানা উৎপাত আরম্ভ করিলেন। তিনি বিরক্ত হইয়া বালিকাকে "দূর হও" বলিলেন। বালিকা গ্রীবা বাঁকাইয়া বলিল,—"তুমি আমাকে 'দূর হও' বলিলে। আচ্ছা, আমি চলিলাম।" বালিকা চলিয়া গেলে, তিনি তাঁহার মাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি কেন বালিকাকে তাঁহার পূজার সময়ে তাঁহাকে বিরক্ত করিতে দেন। তাঁহার মাতা বিস্মিতা হইয়া বলিলেন যে, বালিকা বহুক্ষণ নিদ্রিতা। শ্রীযুক্ত রায় শিরে করাঘাত করিলেন; বুঝিলেন, কুলমাতা তাঁহাকে ছলনা করিয়াছেন। তিনি সেই যে ধ্যানস্থভাবে প্রণত হইলেন, আর মস্তক তুলিলেন না। প্রবাদ এইরূপ যে, কুলমাতা তাঁহাকে পূজান্তে দর্শন না দিলে তিনি অহর্নিশ ভূতল-প্রণত-শিরে থাকিতেন। রাত্রি প্রভাত হইল। ভৃত্য মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, প্রভু ছিন্নশির ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছেন। সে তাঁহার মাতাকে যাইয়া সংবাদ দিল,—

"বড় ঘরে ঠাকুরাণি! কি কর বসিয়া?
শ্রীযুক্ত কাটা গেছে, রক্ত যায় ভাসিয়া।"

আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি-কবিতারাশির মধ্যে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ নানা গ্রাম্য কবিতা আছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চাঁদ রায় তাঁহার প্রভুত্বে ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে রাত্রিতে প্রণত অবস্থায় হত্যা করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। আদিপুরুষ ইষ্টক-মন্দিরে এইরূপে হত হওয়াতে, আমার বংশে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ নিষিদ্ধ। শ্রীযুক্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কনকমঞ্জরী প্রতিজ্ঞা করিলেন,—পিতৃহন্তার মস্তক না দেখিয়া জলগ্রহণ করিবেন না। চারি দিকে গুপ্তচর প্রেরিত হইল। জনৈক নাপিত তাঁহাকে কামাইবার ছলনায় তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া কনকমঞ্জরীর ভীষণ ব্রত প্রতিপালন করিল।

শ্রীযুক্ত রায়ের তীর্থ-লব্ধ পত্নীর গর্ভে কনকমঞ্জরী এবং তদীয় কনিষ্ঠ মনোহর রায়ের জন্ম হইবার পরে, তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভে জগদীশ রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হত্যার সময়ে সন্তানেরা সকলেই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ অপঘাত মৃত্যুতে রাজ্যে বিশৃংখলা উপস্থিত হইল। রাজস্ব বাকী পড়িয়া গেল। ভান্ডার-ঘরের ব্যয়ের নিমিত্ত যে ২৫০০০ টাকা মুনাফার একটি ভূসম্পত্তি ছিল, তাঁহার সন্তানদিগের প্রতি-পালনার্থ তাহা মাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া নবাব সমস্ত রাজ্য "বাজেয়াপ্ত" করিলেন। এই জমিদারীর অধিকাংশ এখনও আমাদের বংশীয়দের হস্তগত আছে।

কালে দুই ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইল। এক দিকে "জননী" (দশভুজা), অন্য দিকে "জন্মভূমি" (ভদ্রাসন বাড়ী) তুলাদণ্ডে উঠিল। জ্যেষ্ঠ মনোহর রায় জননীকে লইয়া স্বতন্ত্র বাড়ী নির্ম্মাণ করিলেন। উল্লিখিত ভূসম্পত্তিও দুই অংশ হইয়া গেল। এই উভয়ের, বিশেষতঃ মনোহর রায়ের, সন্তানগণ আপন আপন পারিষদ, পুরোহিত ও গোলাম-গণ সহ "কর্ণফুলী"র তীর হইতে তাহার শাখা মগধেশ্বরীর তীর পর্য্যন্ত দুই ক্রোশ স্থান

ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। এই স্থানটি কুলপতি রাজারাম রায় হইতে বংশীয় প্রায় প্রত্যেক পুরুষ ও স্ত্রীর নামীয় বিস্তৃত দীর্ঘকামালায় পরিপূর্ণ। মনোহর রায় হইতে আমি পুরুষানুক্রমে ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিত। কুলমাতার কৃপায় এ বিপুল বংশ সচ্ছল অবস্থায় থাকিয়া এই দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম-সমাজের শীর্ষদেশে আপনার স্থান রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহার ছায়া অক্ষয় রহুক।

শৈশব

পূর্বেই বলিয়াছি যে, "বহুতর" শুভক্ষণে আমার জন্ম হয়। জন্মপত্রিকায় রাশিচক্র এইরূপ অঙ্কিত রহিয়াছে। ভবিষ্যৎ এইরূপ লিখিত হইয়াছিল,—
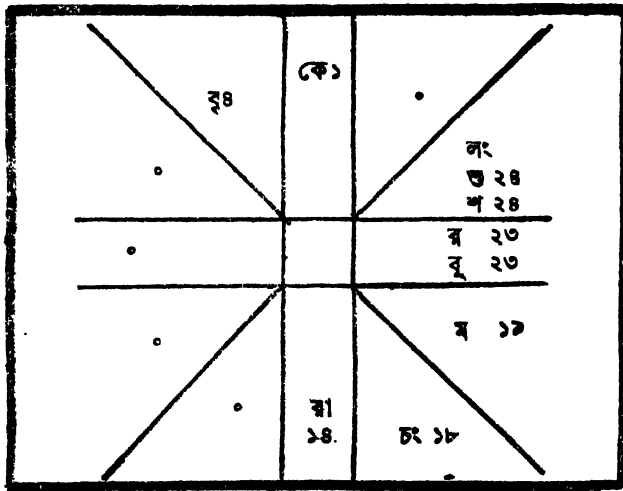
"জীবশ্চ কেন্দ্রী বহুশাস্ত্রপাঠী
নৃপস্য মন্ত্রী বিভবাদিযুক্তঃ।
সুকান্তাকান্তঃ ধনরত্নযুক্তঃ
ন্যায়বিবেকী বহুপুত্রমিত্রঃ॥"

আবার— "সুখী সুবেশী সুজনানুরাগী
সদারযুক্তো গুণবান্ ধনাঢ্যঃ।
শাস্ত্রেষু বুদ্ধিঃ স্বকুলপ্রদীপঃ
শুক্রশ্চ কেন্দ্রী চিরকালজীবঃ॥"

আবার— "মিত্রোপকারী বিভবাদিযুক্তো
বিনীতমূর্ত্তিঃ স্মৃতিশাস্ত্রশীলঃ।
প্রাপ্নোতি দেশং সুতকান্তিগেহং
চন্দ্রশ্চ কেন্দ্রী নৃপতিঃ সমানঃ॥"

যেখানে এরূপ "মহাসত্ত্বের" উদয় হইয়াছে, সেখানে আর উৎসবের কথাই বা কি? বিশেষতঃ, কেবল পিতার প্রথম পুত্র নহে, বংশেও আমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর

প্রমাণের জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। জন্মের তৃতীয় দিবসে উৎসবের আয়োজন উপলক্ষে গৃহে অগ্নি লাগিয়া সমুদায় গ্রামটি ভস্মীভূত হইয়াছিল। সেই ভস্মরাশির মধ্যে বিধাতা পুরুষ পূজা গ্রহণ করিলেন, এবং প্রতিদানে আমার ভবিষ্যৎও জ্বলন্ত ভস্মে পরিপূর্ণ করিয়া গেলেন।

এই অগ্নিকাণ্ডের দ্বারা সমস্ত গ্রামটি নূতন করিয়াছিলাম বলিয়া, রসিকা নামদাসী গুরুপত্নী আমার নাম "নবীন" রাখিয়াছিলেন। রামায়ণ হইতে পৌরাণিক নামটি গ্রহণ করিলে নামের তদপেক্ষা সার্থকতা হইত, এবং পশ্চিমভারতে সে নামের পূজা দেখিয়া বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতাম। "নবীনচন্দ্রের" প্রতিভা দেখিতে দেখিতেই বিভাসিত হইতে লাগিল। যখন ২॥ বৎসর মাত্র বয়স, চট্টগ্রামে তখন মহাঝড় প্রবাহিত হয়। রজনী দ্বিতীয় প্রহর। গৃহাদি ধরাশায়ী হইয়াছে। প্রবলবেগে ঝটিকা বহিতেছে, এবং অজস্রধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। আমার একবার সাধ হইল, ঘুড়ি উড়াইব। বৃদ্ধ পিতামহ লাঠির মাথায় তার, তারের মাথায় কাগজ বাঁধিয়া দিয়া, আমার সেই সাধ মিটাইলেন। তখন দ্বিতীয় সাধ হইল, প্রাঙ্গণের জলে বড়শি খেলিব। পিতামহ সেই মহাঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের মধ্যে পতিত গৃহের প্রান্তভাগে আমাকে লইয়া গিয়া সেই আবদারও পূর্ণ করিলেন। এরূপ শান্ত প্রকৃতির জন্যে মাতা কোন দিন কি বলিয়াছিলেন। বৃদ্ধা পিতামহী দশভুজার সম্মুখে প্রণত হইয়া পূজা মানস করিলেন, যেন আমি মাতার কাছে আর না যাই। দেবী বুড়ীর প্রার্থনা শুনিলেন। মাতার সঙ্গে আমার কোনরূপ সংস্রব রহিল না। কিন্তু বুড়ী প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে ইহার ফলভোগ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ পিতামহ মুমূর্ষু শয্যাশায়ী। আমি বুড়ীকে তাঁহার পার্শ্বে মুহূর্তের জন্যও বসিতে দিব না। বুড়া সেই মুমূর্ষু মুখে ঈষৎ হাসিয়া পিতামহীকে বলিলেন,—"তোমার আর আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন নাই। তুমি আমার প্রতিনিধিকে লইয়া থাক।" আমিও প্রতিনিধিত্ব সংস্থাপন করিতে আর বিলম্ব করিলাম না। পিতামহ তুলসীতলায় মানবলীলা সংবরণ করিতেছেন, বাড়ী হাহাকারে পরিপূর্ণ। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, বুড়ী সেখানে যাইতে পারিবে না, কাঁদিতে পারিবে না। পিতামহ চিতারোহণ করিলেন ; পিতামহী আমাকে বুকে লইয়া শুইয়া শুইয়া নানা উপকথা বলিতে লাগিলেন। প্রতিনিধির শাসন শেষে এত দূর গুরুতর হইয়া উঠিল যে, বুড়ী প্রতি দিন আধমরা হইয়া থাকিত। কিন্তু তাঁহার রাজভক্তি অটল ছিল। আমার প্রায় দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তাঁহার বিশেষ অনুরোধমতে আমি তাঁহার বৈতরণীকার্য্য সম্পন্ন করি। সেই শোকোদ্দীপক মন্ত্রাবলী পাঠ করিতে করিতে অশ্রুর দ্বারা তাঁহার অশেষ যন্ত্রণার ও অতুল স্নেহের প্রতিদান করিয়াছিলাম। কেন অশ্রু এ বিড়ম্বনা? আমি কি বুড়ীর জন্যে এ বুড়া বয়সেও কাঁদিব?

যেমন হইয়া থাকে, পঞ্চম বৎসর বয়সে গুরুমহাশয় হাতে খড়ি দিলেন। তখন অত্যাচারের স্রোতের আর দুই শাখা বহির্গত হইয়া, এক ধারা গুরুমহাশয়ের দিকে, এবং অন্য ধারা পাড়া প্রতিবাসীদের দিকে ভীষণ বেগে ধাবিত হইল। পিতামহীর আবদারের জন্যে কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই। কেবল আমার বড় কাকাকে ভয় করিতাম। আমার পিতার তিন সহোদর। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। তাঁহার কনিষ্ঠ আনন্দমোহনকে আমার স্মরণ নাই। তৎকনিষ্ঠ মদনমোহন, আমার বড় কাকা, এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র আমার ছোট কাকা। বড় কাকা দেখিতে বড় সুন্দর ছিলেন। আমি তেমন সুপুরুষ অতি অল্পই দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গবিশেষ ছিলেন। দেশশুদ্ধ তাঁহাকে 'গোঁয়ার চৌধুরী' বলিত। তখন চট্টগ্রামে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার তাহা শিক্ষা হইল না। একদিন শিক্ষক কি বলিয়াছিল ; তিনি তাহার সঙ্গে শিক্ষা-বিভাগের নিয়মবহির্ভূত ব্যবহার করিয়া যে পৃষ্ঠ দেখাইলেন, আর ফিরিলেন না। পিতা তাঁহাকে

কোনও মুন্‌সেফের সেরেস্তার লেখা পড়া শিখিতে দিলেন। সে কালের ১০০ টাকা মূল্যের মুসলমান মুন্‌সেফ ; পদব্রজে কাচারী যাইতেন। কিন্তু বড় কাকা বাহকের স্কন্ধে ভিন্ন চলিতেন না। পিতার একদল বেহারা চাকর থাকিত। মুন্‌সেফ এক দিন তাঁহাকে বলিলেন যে, এক জন 'এপ্রেন্টিস' পাল্কি চড়িয়া গেলে তাঁহার সম্মান থাকে না। বড় কাকা বলিলেন যে, পাল্কি মুন্‌সেফের পিতা, কি প্রপিতামহ ত বহন করে না ; অতএব তাহাতে তাঁহার এত ব্যথা লাগে কেন? মুন্‌সেফ বেচারী নাচার হইয়া পিতার কাছে নালিশ করিলেন। পিতা তিরস্কার করিলে বড় কাকা বলিলেন, তিনি অমন ছোটলোকের চাকরী করিবেন না। বলা বাহুল্য, সেই দিন হইতে তাঁহাকে আর চাকরী করিতে হইল না। এক দিকে তিনি ঘোরতর "বাবু" ছিলেন ; অন্য দিকে হস্তপদাদি ক্ষিপ্রবেগে অন্যের শরীরের প্রতি চলিত। তাঁহার দুইটি প্রধান সখ ছিল ;—পাখী মারা ও মানুষ মারা। চট্টগ্রাম সহর হইতে বাড়ী চলিলেন ; পথের দুই ধারের পাখী মারিলেন, এবং দুই এক জনের পৃষ্ঠে করচিহ্ন রাখিয়া গেলেন। দেশশুদ্ধ লোক তাঁহাকে ভয় করিত। কেবল একটি গোলামের কাছে তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। তাহাকে একদিন কি জন্য খুব প্রহার করিলেন। সে বলিল,—"আর কেন, তোমার হাতে ব্যথা হইবে ; ছাড়িয়া দাও, আর দুই আনা গাঁজার পয়সা দাও।" সে এইরূপে প্রায়ই গায়ে পড়িয়া মার খাইত এবং গাঁজার পয়সার যোগাড় করিত। একদিন পিতামহের শ্রাদ্ধ উপস্থিত। মহাসমারোহ ; বাড়ী লোকাকীর্ণ। একটি মুসলমান প্রজাকে তিনি কলাপাত যোগাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। সে কলাপাত অল্প আনিয়াছিল। বড় কাকা সেই পাতের বোঝা শুদ্ধ একটি প্রকাণ্ড শিলা তাহার গলায় বাঁধিয়া দিয়া চলিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। বেচারী তাহা পারিল না। আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল না বলিয়া বড় কাকা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তাহার চীৎকার শুনিয়া, বাবা সেখানে আসিয়া, বড় কাকাকে তিরস্কার করিয়া লোকটিকে মুক্ত করিয়া দিলেন। বড় কাকা রাগভরে যাইয়া শয়ন করিলেন। পিতা পীড়িত ; শ্রাদ্ধ করিবার জন্যে বড় কাকাকে ডাকিতে গেলে, তিনি বলিতে লাগিলেন,—"সেই আকবর শাহা শ্রাদ্ধ করিবে।" বহু অনুনয়ের পর শেষে বাবা যাইয়া হাত ধরিয়া তুলিলে শয্যা ত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন।

যেমন কুকুর, তেমনই মুগুর না হইলে হয় না। আমি একমাত্র তাঁহাকে ভয় করিতাম, তাহার বিশেষ কারণও ছিল। এক দিন তিনি বড়শি খেলিতে যাইবেন। ছিপ প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে গিয়াছেন। আমি এই অবসরে একে একে সব ছিপ ভাঙ্গিয়া রাখিলাম। তিনি আসিয়া একটির আগা আমার পৃষ্ঠে উড়াইলেন। এরূপ শাসনেও "স্বকুল-প্রদীপ" নিস্তেজ হইলেন না। দিন দিন জ্যোতি এত বৃদ্ধি হইতে লাগিল যে, ক্ষুদ্র গ্রামে আর তাহা ধরে না। অষ্টম বৎসর বয়সে বড় কাকা আমাকে চট্টগ্রাম সহরে লইয়া গেলেন।

ঘোরতর বিপ্লব

সহরে আসিলাম। পিতা প্রত্যেক শনিবার বাড়ী যাইতেন, এবং নানাবিধ মিঠাই লইয়া যাইতেন। আমি জানিতাম যে, আকাশে যেমন ছোট বড় নানাবিধ নক্ষত্র ফলে, সহরেও তেমনই ছোট বড় নানাবিধ মিঠাই ফলে, এবং ৭ দিন থাকিলে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা যায়। অতএব নিতান্ত আগ্রহের সহিত সহরে আসিলাম, এবং কেবল মিঠাইর আকর সকল নানাবিধ মিঠাইরত্নে সজ্জিত দেখিয়া অপূর্ব আনন্দ লাভ করিলাম, তাহা নহে। গাড়ী, ঘোড়া, হাতী, পাকা বাড়ী, প্রশস্ত রাস্তা ও বিচিত্র বিপণীসারি ও সৌধ-শীর্ষ গিরি-মালা, অবিরলবাহী নির্ঝর, আমার হৃদয়-রাজ্যে এক ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিল। সেই জীবনের নব আনন্দোৎসাহ আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। সেরূপ আনন্দ, সেরূপ উৎসাহ, এ জীবনে আর কখনও অনুভব করি নাই।

পিতা তখন চট্টগ্রাম জজ আদালতের পেস্কার। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। ইংরাজ-মহলে পর্য্যন্ত তিনি প্রকৃত জজ বলিয়া পরিচিত। একে সুকণ্ঠ ; তাহাতে আবার পারস্য ভাষায় তাঁহার এরূপ অধিকার ছিল যে, তিনি পারস্য কাগজ হাতে লইয়া অবিরল বাঙ্গালা পড়িয়া যাইতে পারিতেন, এবং বাঙ্গালা কাগজ হাতে লইয়া অবিরল ফার্শি পড়িয়া যাইতে পারিতেন। গিরিশেখরস্থ ধর্ম্মাধিকরণের দ্বিতল গৃহ কলকণ্ঠে পরিপূর্ণ করিয়া 'মিসিল' পড়িতে লাগিলেন ; জজ টানা পাখায় আন্দোলিত শেখরজাত স্নিগ্ধ সমীরণে নাসিকা-ধ্বনি করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। 'মিসিল' পড়া তাঁহার এত দূর স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছিল যে, অনেক সময় তাঁহাকে নিদ্রাতেও 'মিসিল' পড়িতে শুনিয়াছি। মিসিল বন্ধ হইলে জজের নিদ্রাভঙ্গ হইল ; পিতার প্রদত্ত হুকুম দস্তখত করিলেন ; বিচারকার্য্য শেষ হইল। তথাপি সেই সময়ের যাঁহাদের সঙ্গে আমার এ বিষয়ে আলাপ হইয়াছে, সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন যে, তখন বিচার এখন অপেক্ষা অনেক স্বল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হইত, এবং স্বল্প আয়াসসাধ্য ছিল, এবং অনেক ভাল হইত। তাহার কারণও ছিল। তখন ব্যবহার-নীতি (Law) এতদূর কঠিনতা ও জটিলতা প্রাপ্ত হয় নাই। প্রমাণের আইনের এরূপ কচকচি, উকীলগণের এরূপ গলাবাজি ছিল না। পিতার সদৃশ্য বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণ দেশীয় লোক। দেশের অবস্থা, লোকের চরিত্র, তাঁহাদের নখদর্পণে ছিল। অনেক সামাজিক ও পারিবারিক তত্ত্ব, যাহা অনেক বিবাদের মূলীভূত কারণ, থাকে, তাহা তাঁহারা স্বয়ং অবগত থাকিতেন। এমন অবস্থায় তাঁহার দ্বারা যে ভাল বিচার হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এখন ব্যবহার-নীতি-সকল একটা বিশাল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। দিন দিন ইহাদের সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হইতেছে যে, সময়ে ভারতবাসীর সংখ্যা অপেক্ষা ভারতীয় ব্যবহার-নীতির সংখ্যা অধিক হইবার সম্ভাবনা। এই বিশাল অরণ্যে এক একটি ধর্ম্মাধিকরণ এক একটি প্রকাণ্ড জাল ; ব্যারিষ্টারগণ ব্যাঘ্র এবং উকীল মোক্তারগণ শৃগালপাল। বিচারক ব্যাধ সহস্র যোজন ব্যবধান হইতে শুভাগমন করিয়া আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া অঙ্গদের সিংহাসনে বসিয়াছেন। "মহা-মান্য হাইকোর্ট" এই বনভূমি নজীররাশিতে কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিতেছেন। মৃগরূপী অর্থী প্রত্যর্থী যদি একবার ইহার সান্নিধ্যে আসিল, অমনই শৃগাল ও শার্দ্দূলগণ ঘোরতর কলরব করিয়া উভয়কে জালে ফেলিল। "ফিস"-রূপী নানাবিধ রক্ত-শোষকের দ্বারা হৃত-শোণিত হইয়া যদি শিকার জীবিত অবস্থায় মুক্ত হইতে পারিল, অমনই আর এক দল তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত দ্বিতীয় তৃতীয় প্রকাণ্ড জালে নিপাতিত করিল। ইহাদের নাম "আপীল আদালত"। যখন শেষ জাল হইতে ইহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অরণ্যের বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হইল,—তখন তাহারা কঙ্কালাবশিষ্ট। এইরূপ কঙ্কাল-রাশিতে ভারত পরিপূর্ণ হইতেছে। এখানে নহে ; এই সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব। দুই একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইব।

পিতার তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। প্রাতঃকালে তিনি পূজাতে বসিয়াছেন ; বৈঠকখানা লোকারণ্য। কাপড়ের বস্তা সম্মুখে হিন্দুস্থানী কাপড়ওয়ালারা ; খাতা হস্তে দোকানদারগণ ; ক্ষুধিত উমেদার-পাল ; অর্থী প্রত্যর্থী ; আত্মীয় কুটুম্ব ; যাত্রার দলের অধিকারী ও দীর্ঘকেশ-ধারী বালকগণ ; বহু দূর হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণ ; দুই এক জন সদর-আলা মুনসেফ, আমীন, সদর আমীন প্রভৃতি দ্বারা বৈঠকখানা পরিপূর্ণ, এবং বহুতর তাম্রকূট-যন্ত্রে শব্দায়িত। আমার আদরের আবদারের সীমা নাই। অঙ্কে অঙ্কে বিরাজ করিতেছি। কাপড়-ওয়ালারা নানা কাপড় দিতেছে, দোকানদারেরা নানাবিধ খেলানা ও খাদ্যসামগ্রী আনিয়াছে ; মুনসেফ ও সদর আমীন মহাশয়েরা আমাকে কোলে লইয়া মুষ্টিমধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা "নজর" দিতেছেন ; কেহ ময়ূর, কেহ হরিণ, কেহ খরগোশ, কেহ পাখী আনিয়াছেন। ৯টার সময় পিতা পূজা শেষ করিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। আমার রূপের, গুণের ও

তেজস্বিতার প্রশংসার ঝটিকা বহিতে লাগিল। পিতা সস্নেহে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমাকে পায় কে?

আবার সন্ধ্যার সময়ে বৈঠকখানার অন্য ছবি। আলোকমালায় ঝলসিত; সঙ্গীত-শব্দে তরঙ্গায়িত এবং আনন্দ-ধ্বনিতে নিনাদিত। এক এক জন "ওস্তাদের" মুখভঙ্গি ও ঘর্ঘর-ধ্বনি, এক এক জন সুগায়কের কলকণ্ঠ, আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। বৈঠকখানার কোনও অংশে তাস, কোনও অংশে দাবা চলিতেছে; কোনও অংশে পিতার একটি বিদূষক বন্ধু নানারূপ অভিনয় করিতেছেন, হাসির তুফান বহিতেছে। যাহারা মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াছে, তাহাদের পক্ষ হইতে থালা থালা সন্দেশ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্য ও খাসী ইত্যাদি উদরপূজার নানাবিধ সামগ্রী আসিতেছে। সন্দেশের থাল বৈঠকখানায় রাখিবা মাত্র শূন্য হইয়া যাইতেছে। আমার হৃদয় আমোদ উৎসাহে পরিপূর্ণ। চট্টগ্রামস্কুলে পড়িতেছি। এই অবস্থায় বিদ্যুৎবেগে তিন বৎসর চলিয়া গেল। জীবনের অদ্বিতীয় সুখের অঙ্ক শেষ হইল।

প্রথম শোক

শীতকাল। বাৎসরিক পরীক্ষা বা বিভীষিকা নিকটবর্ত্তী। শেষ রাত্রিতে পড়িতে উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে চাকরকে প্রদীপ জ্বালিয়া দিবার জন্য ডাকিতে লাগিলাম। বড় কাকা ভগ্নকণ্ঠে বৈঠকখানা হইতে বলিলেন,—"তাহাকে এখানে আসিতে দিও না।" সেই ক্ষীণ কণ্ঠে আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"কর্ত্তা তোমাকে তাঁহার বিছানায় যাইয়া শুইত বলিয়াছেন। তোমার বড় কাকার ওলাউঠা হইয়াছে। আজ পড়িতে পাইবে না।" ওলাউঠা কি, তখন তাহা জানিতাম না। এই মাত্র জানিতাম যে, একটা মারাত্মক রোগের নাম। প্রাণ শুকাইয়া গেল। পুতুলের মত ভৃত্য আমাকে ধরিয়া পিতার বিছানায় লইয়া গিয়া শোয়াইল। পিতার শয়ন-কক্ষ বৈঠকখানা হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে ছিল। আমার মনে কি এক অনিশ্চিত ভয়, শোক ও চিন্তার উদয় হইল। আমি উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বোধ হয় ভৃত্য যাইয়া সে কথা বলিয়াছিল। বড় কাকা রোরুদ্যমান কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—"বাবা! এস! আমাকে এ জীবনের মত একবার দেখিয়া যাও।" আমি ছুটিয়া গেলাম; বড় কাকা বাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে দৃঢ়রূপে বক্ষে লইলেন। তিনি কাঁদিতেছিলেন; আমিও তাঁহার বক্ষে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। করুণহৃদয় পিতাও শয্যার শীর্ষদেশে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। বৈঠকখানা লোকপূর্ণ, কিন্তু নীরব। মিট মিট করিয়া ২।৩টি প্রদীপ জ্বলিতেছে মাত্র। পাঁচ মিনিট কাল বড় কাকা আমাকে দৃঢ়রূপে বক্ষে ধরিয়া,—আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন তাঁহার ইচ্ছা, আমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দেন,—আমাকে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার গলা হইতে সোনার মালাছড়া খুলিয়া আমার গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"বাবা! আর কাঁদিও না। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি দীর্ঘজীবী হইবে। আর আমার কাছে বসিও না।" পার্শ্বস্থিত ভৃত্যকে বলিলেন,—"ইহাকে লইয়া যা।" আমি তখন তাঁহার বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছিলাম। বালকের কান্না,—অজস্র, অবারিত, উচ্ছ্বাসপূর্ণ। ভৃত্য সজোরে আমার বাহুবন্ধন খুলিয়া আমাকে ধরিয়া আবার পিতার শয্যায় লইয়া গেল। আমি শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছে, এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন আস্তে আস্তে সেই কক্ষে আসিয়া আমাকে বলিলেন,—"নবীন! তোমার কাকাকে বাড়ী লইয়া যাও। যে ঔষধ আছে, তাহা নিয়মিত খাওয়াইও।" অতি কষ্টে তিনি এই কয়টি কথা বলিলেন। তিনি পিতার ও বড় কাকার বড় বন্ধু ছিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে কক্ষের পশ্চাৎদ্বার

দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি চীৎকার করিয়া শয্যা হইতে পড়িয়া গেলাম। পিতা সে চীৎকারের অর্থ বুঝিতে পারিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে কয়েক জন লোকে ধরিয়া অন্য গৃহে লইয়া গেল। বড় কাকা তখন মূর্চ্ছাপন্ন। পিতার বেতনভোগী বেহারা ছিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শিবিকায় উঠাইয়া লইয়া বাড়ী চলিলাম। অর্দ্ধপথে শিবনেত্র হইল ; বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গেল। পরদিন প্রাতে বাড়ীতে বড় কাকা এই বালকের একটি স্নেহকক্ষ চিরদিনের জন্যে অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন। রোদন-ধ্বনিতে গ্রাম বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু আমি কাঁদিলাম না। আমার হৃদয় মরুভূমির মত হু হু করিতেছিল। বড় কাকা আমাকে ভয়ানক শাসন করিতেন ; কিন্তু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতাম। বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় সেই স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল। পিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল না। আমি বড় কাকার সঙ্গে খাইতাম, শুইতাম, শিকার করিতে যাইতাম, ছায়ার মত অঙ্গে লাগিয়া থাকিতাম। বালকের ক্ষুদ্র হৃদয় একটিমাত্র ছায়াতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সেই ছায়া আমার বড় কাকার। তিনি নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু সেই অগ্নিরাশির মধ্যে স্নেহের একটি নির্ম্মল ধারা প্রবাহিত ছিল। তিনি নিতান্ত সরলহৃদয় ও সৌখীন ছিলেন, এবং যেরূপ তেজস্বী, সেইরূপ উচ্চমনা ছিলেন। মৃত্যুশয্যায় পিতাকে কেবল একটিমাত্র অনুরোধ করিয়াছিলেন. —"আমাকে ঋণগ্রস্ত রাখিবেন না।" তাঁহার চিতানলে আমার নবাঙ্কুরিত উৎসাহ ভস্মীভূত হইল. এবং হৃদয়ে একপ্রকার বয়োধিক চিন্তাশীলতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান সঞ্চারিত হইল। সেই মগধেশ্বরীর তীরে, সেই বংশীয় শ্মশান সমক্ষে, সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের দিকে চাহিয়া, সদ্যোবিধবা পিতৃব্যপত্নীর বুকে মাথা রাখিয়া, এবং তাঁহার শিশুপুত্র কোলে লইয়া, একাদশ-বর্ষীয় বালক প্রতিজ্ঞা করিল, তাঁহাদিগকে আপনার মাতা ও ভ্রাতার অপেক্ষা অধিক যত্ন করিবে। তাহাদিগকে সুখী করিতে পারিলে আপনার জীবন সার্থক মনে করিবে। কুলমাতা বালকের প্রতিজ্ঞা শুনিয়াছিলেন, এবং তাহা রক্ষা করিয়াছেন। এইটি আমার জীবনের একটি প্রধান সান্ত্বনা, প্রধান সুখ।

তাহার কিছুদিন পরে ছোট কাকাও সেই সাংঘাতিক রোগে একই সময়ে, একই বারে, আক্রান্ত হইয়া, একরূপ অবস্থায়, একই সময়ে বড় কাকার অনুসরণ করিলেন। পিতা বলিলেন, তাঁহার—"উভয় বাহু ভগ্ন হইল।" উৎসাহভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বাস্থ্যও ভঙ্গ হইল। আমি ঘোরতর পীড়িত হইলাম ; এক এক দিন মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতাম। প্লীহাতে উদর এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, আমার ছোট ভ্রাতা ভগ্নীগণও আমাকে "গণেশ" বলিয়া ক্ষেপাইত। স্কুলে যাওয়া একরূপ বৎসর যাবৎ বন্ধ হইয়াছিল। আমি পঞ্চম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে আপন ইচ্ছায় নামিয়া গেলাম। সেই সময়ে আমাদের সহরের বাসাবাড়ী পুড়িয়া গেল। এই স্থানের প্রতি পিতার হতশ্রদ্ধা হওয়াতে আমরা স্থানান্তরে গেলাম। ঈশ্বর মঙ্গলময়। এই অধোগতি ও গৃহদাহ, আমার ভাবি উন্নতির দুইটি প্রধান কারণ হইল।

কৈশোর

পিতার এক জন বন্ধু বিদেশে চাকরী করিতেন। তাঁহার বাসাবাড়ী খালি পড়িয়াছিল। সেই বাসা সহরের মধ্যস্থানে একটি অনুচ্চ গিরিশেখরে। আমরা সেই বাসায় গেলাম। তাহার পার্শ্বে চন্দ্রকুমারের বাসা। চন্দ্রকুমারের মাতার মৃত্যুর পর তাহার পিতা আমার ছোট পিসীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব চন্দ্রকুমার আমার একপ্রকার পিসতুত ভাই, এবং কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া, আমি তাহাকে "দাদা" বলিয়া ডাকিতাম। আমি অবতীর্ণ

হইয়া চন্দ্রকুমারের সমপাঠী হইয়াছিলাম। চন্দ্রকুমারের ও আমার চরিত্র ঠিক দুইটি বিপরীত চিত্র। চন্দ্রকুমার শান্ত, সুশীল ; আমার অশান্ত চরিত্রের কথা স্মরণ হইলে এখনও লজ্জা হয়। চন্দ্রকুমার নিতান্ত স্থির ; আমি একান্ত চঞ্চল। চন্দ্রকুমার জিতেন্দ্রিয় ; আমি ঘোরতর ইন্দ্রিয়পরায়ণ। চন্দ্রকুমার ভীরু, আমি নির্ভীক। চন্দ্রকুমার নম্র ; আমি উদ্ধত। চন্দ্রকুমার লোকের সঙ্গে কথাটি কহে না ; আমি যাহাকে পাই, না ক্ষেপাইয়া ছাড়ি না। চন্দ্রকুমার পুস্তকাসক্ত ; আমি ক্রীড়াসক্ত। চন্দ্রকুমার তখনও সংসার বুঝে। আমার এখনও সে জ্ঞান হয় নাই। চন্দ্রকুমার বিবেকের প্রতিমূর্ত্তি ; আমি কল্পনার ক্রীড়াপুত্তল। চন্দ্র-কুমারের চরিত্র "জুডিসিয়াল" ; আমার চরিত্র "এক্সিকিউটিভ।" চন্দ্রকুমার মুনসেফ ; আমি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট। এইরূপে আমাদের দুই জনের চরিত্র পৃথিবীর দুই অন্তের ন্যায় ব্যবহিত। কিন্তু কি শুভক্ষণে উভয়ের সাক্ষাৎ হইল! এই দুইটি এতাদৃশ বিপরীত হৃদয় এক হইয়া গেল। আমি অধঃপাতে যাইতেছিলাম। কিন্তু চন্দ্রকুমারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাকে আকর্ষণ করিয়া আমার উন্নতির দিকে লইয়া চলিল। চন্দ্রকুমারের বন্ধুতা আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তিভূমি হইল। আজি আমি যাহা, তাহা চন্দ্রকুমারের সৃষ্টি। আমার যাহা কিছু ভাল, তাহা চন্দ্রকুমারের। যাহা কিছু মন্দ, তাহা আমার নিজের। তাহা দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তির বেগে চন্দ্রকুমারের যত্ন ভাসিয়া যাইবার ফল।

বিদ্যালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি ক্রীড়াতে উন্মত্ত হইয়া গিরিশৃঙ্গ নিনাদিত করিতাম। চন্দ্রকুমার নীরবে বসিয়া অভিধান খুলিয়া অর্থ লিখিত ; অঙ্ক কষিত। সন্ধ্যা হইলে আমি তাহা গোগ্রাসে মুখস্থ করিয়া চম্পট দিতাম। কোনও কোনও দিন চন্দ্রকুমারের কাছে এই কুঁড়েমির জন্য মার খাইতাম। এক দিকে মার পিঠে দাখিল হইত ; অন্য দিকে শব্দার্থসকল স্মৃতিমন্দিরে যাইয়া দাখিল হইত। একে অন্যের ব্যাঘাত করিত না। এই কার্য্য শেষ হইলে, একেবারে পিতার বৈঠকখানায় যাইয়া দাখিল হইতাম। নানাবিধ সঙ্গীত ও খোসগল্প শুনিয়া, কিংবা পিতা বাসায় না থাকিলে আবার কোনওরূপ খেলায় রত হইয়া, কিংবা কাহকেও ক্ষেপাইয়া, সন্ধ্যা অতিবাহিত করিতাম। আমি দীপালোকে পড়িতে পারিতাম না। এখনও কোনও কার্য্য করিতে পারি না। স্মরণ হয়, সন্ধ্যার সময়ে আমাকে পড়িতে বাধ্য করিবার জন্য চন্দ্রকুমার ইচ্ছা করিয়া এক একদিন অনেক বেশী পড়া লইত। সে দিন ক্রীড়াঙ্গনে প্রবেশ করিতে আমার অর্দ্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইত মাত্র।* আমার স্মৃতি-শক্তি কিঞ্চিৎ প্রখর ছিল। শিক্ষক মহাশয় চন্দ্রকুমারকে "চির-চিরা," আমাকে "বেগ-বেগা" বলিতেন। অর্থাৎ, চন্দ্রকুমার চিরকষ্টে যাহা শিখে, তাহা চিরকাল ভুলে না ; আমি বেগে শিখি, বেগে ভুলি। শিক্ষক মহাশয় যে জহুরী মন্দ ছিলেন, এমন বলিতে পারি না।

তখনও আমার চরিত্র এত অশান্ত যে, বিদ্যালয়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমি Wicked the great—"দুষ্টশিরোমণি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এখন অনেকে টাকা দিয়া উপাধি ক্রয় করেন। কেহ যদি আমার এই উপাধিটি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিবেন। আমি বিনা মূল্যে বিক্রয় করিব। বর্ত্তমান উপাধি সকল অপেক্ষা ইহার একটি গুরুতর মহত্ত্ব আছে। ইহার জন্য ভবিষ্যতে চাঁদার ও চাপরাসীর ভয়ে অনিদ্রায় নিশিযাপন করিতে হইবে না। দেশীয় সম্পাদকগণ এই অংশটি উদ্ধৃত করিবেন।

স্কুলের ছাত্রের দ্বারা যেখানে যাহা গোল হইত, শিক্ষক মহাশয়েরা আমাকে আসিয়া গ্রেপ্তার করিতেন। বলিতেন,—"তোমার সম্প্রদায় দ্বারা হইয়াছে।" বাস্তবিক আমার একটি সম্প্রদায় ছিল, এবং তাহার জন্যে সময়ে সময়ে আমাকে কিঞ্চিৎ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত। চট্টগ্রামের তদানীন্তন উচ্চতম দেশীয় কর্ম্মচারীর পুত্রমাত্রই এই দলভুক্ত ছিলেন, এবং তদ্ভিন্ন সমস্ত স্কুলে যাঁহারা প্রধান বলবান্ ও খেলোয়াড় বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন, তাঁহারাও এই দলভুক্ত ছিলেন। ইঁহারা আমার Body guard (শরীররক্ষক) ছিলেন।

গিরিগহ্বরে পর্য্যটন, বলপূর্ব্বক ফলমূল-ভক্ষণ, নির্ঝরিণী-পার্শ্বে বসিয়া মিঠাই-ভোজন, নিশিতে যাত্রা-শ্রবণ এবং প্রতিরুদ্ধ হইলে ভুজবল-প্রদর্শন, এই সম্প্রদায়ের কার্য্যাবলি ছিল। কিন্তু সকলেই ভাল ছেলে ছিল। বড় সুখের বিষয় যে, আজ সকলেই ভাল অবস্থায় অবস্থিত। কেবল দুই এক জন অকালে তাহাদের স্থান শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

সকাল বেলার আহার নিয়মিতরূপে আমার অদৃষ্টে ঘটিত না। কারণ, আমি ৮টার সময় স্কুলে যাইয়া উপস্থিত হইতাম। বলিতে হইবে না, আমার সম্প্রদায়ও প্রায় সেই সময়ে উপস্থিত হইতেন। দুই ঘণ্টা কাল ক্রিকেট ইত্যাদি নানাবিধ ক্রীড়ায় অতিবাহিত হইত। কেহ যেন মনে না করেন যে, কেবল স্কুল-গৃহেই আমার সৎকীর্ত্তির শেষ হইত। পিতামহীর প্রতিপালিত বলিয়া মাতার সঙ্গে আমার একেবারে সদ্ভাব ছিল না। তিনি একদিন কি বলিয়াছিলেন,—রাগ করিয়া এক শিশি Smelling salt খাইয়া ফেলিলাম। আর একদিন পিস্তল দিয়া শিকার করিতে গিয়া নিজের মস্তকের সচক্ষু বাম পার্শ্ব শিকার করিয়া ছয় মাস যাবৎ অর্দ্ধ-অন্ধ ও শয্যাশায়ী ছিলাম। শৈশবে পিসীর সঙ্গে কচুগাছ বলিদান করিতে গিয়া আপনার দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলির অগ্রভাগ বলিদান করিয়াছিলাম। এবংবিধ কীর্ত্তির ইতিহাস আমার অঙ্গে অঙ্গে লিখিত হইয়াছিল। তবে কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে বলিয়া মরি নাই। কোনও কোনও কল্পনাপরায়ণ শিক্ষক আমাকে তজ্জন্য ক্লাইবের সঙ্গে তুলনা করিতেন। তুলনার সার্থকতা হইয়াছে। ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধের দ্বারা ভারতরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন ; আর আমি আমার "পলাশীর যুদ্ধে"র দ্বারা ভারত-রাজ্যের ধ্বংসকারী বলিয়া রাজপুরুষদের কাছে পরিচিত। ক্লাইব পলাশীযুদ্ধের দ্বারা খ্যাত্যাপন্ন, আমিও "পলাশীর যুদ্ধে"র দ্বারা খ্যাত্যাপন্ন। তবে আমি কম কিসে?

মুন্সী সাহেব ও পণ্ডিত মহাশয়

তৃতীয় শ্রেণীতে আমাদের একটি মুসলমান শিক্ষক ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ খোঁড়া ছিলেন, এবং শিক্ষাকার্য্যে তাঁহার তত দূর ব্যুৎপত্তি ছিল না। কিন্তু লোকটি নিতান্ত ভাল মানুষ। অঙ্কের সময় উপস্থিত হইলেই মুনসী সাহেবের লাইব্রেরির কার্য্য আসিয়া পড়িত। তিনি স্কুলের Librarian ছিলেন। অঙ্ক আমরা চন্দ্রকুমারের কাছেই শিক্ষা করিতাম। এমন সুন্দর সুযোগ হারাইবার পাত্র আমি নহি। দুই একদিন অন্তর, ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত খেলিয়া, যেই স্কুল বসিল, অমনই মাথায় এক প্রকাণ্ড পাগ্ড়ী বাঁধিয়া মুন্সী সাহেবের কাছে হাজির হইলাম। জ্বর। মুন্সী বড় দুঃখিত হইলেন। চন্দ্র-কুমারকে পড়া লইতে বলিলেন। চন্দ্রকুমার ২।৪টি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। মুন্সী সাহেব সকল বিষয়ে পুরা নম্বর দিলেন। নবীনচন্দ্র দ্বিতীয়ার চন্দ্রের ন্যায় এক সেলাম দিয়া বহির্গত হইলেন। মুন্সী সাহেব উত্তরাধিকারী স্বত্বে একটি ইতিহাসের 'নোটবুক' পাইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রগণকে তিনি তাহাতে নিঃস্বার্থভাবে অংশী করিতেন। এই নোটবুক লইয়া আমরা বড় জ্বালাতন হইতাম। তিনি এই নোটবুক ভিন্ন অন্য কোনও ইতিহাস পড়েন নাই ; অতএব তিনি আমাদিগকে পড়াইবেন কেন? তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এই নোটবুক ভিন্ন অন্য ইতিহাস সকল অশুদ্ধ। যে দিন নিতান্ত নোটবুক মুখস্থ করিতে না পারিতাম, আমি এক সংখ্যা "প্রভাকর" লইয়া যাইতাম। মুন্সী সাহেব তাহাকে "পর্ভাকর" বলিতেন। তিনি কবিতা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। "পর্ভাকর" দেখিবামাত্র আমাকে পড়িতে বলিতেন। তাঁহার নিজে পড়া কিছু কণ্টকর ছিল। আমি একখানি টুল টানিয়া লইয়া মুন্সী সাহেবের কাণের কাছে পড়িতে বসিতাম। মুন্সী

সাহেব খঞ্জ পদদ্বয় টেবিলের উপর উঠাইয়া, জ্যামিতির একটি অর্দ্ধ-চক্র-রেখাকৃতি হইয়া, পদ্ম-নেত্রদ্বয় নিমীলিত ও আমাকে পেঁয়াজের গন্ধে মোহিত করিয়া বসিতেন। গুপ্তজার কবিতার কি শক্তি ছিল, জানি না। দুই চারি চরণ পড়িতে পড়িতেই মুন্‌সী সাহেবের নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইত। নোটবুকের জ্বালা ফুরাইত। কবিতা ভিন্ন মুন্‌সী সাহেব 'গাজির গান'ও বড় ভালবাসিতেন। ক্লাসে খঞ্জপদে গজেন্দ্র-গমনে পাদচারণ করিতে করিতে তাহা অস্ফুটকণ্ঠে গায়িতেন, এবং ফিরিয়া 'কপিবুক' লিখিবার সময়ে আমাদের পৃষ্ঠে তালরক্ষা করিতেন। "কাফের" ছাত্রদের নাম মুন্‌সী সাহেবকে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ বিপদ্‌-গ্রস্ত করিত। তিনি ক্ষীরোদকে দাঁড়াইতে বলিবেন, কিন্তু বলিলেন, Mohesh ! stand up ! "মহেশ দাঁড়াও।" মহেশ বেচারী দাঁড়াইল, এবং তজ্জন্য "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" মার খাইল। মহেশের নামে কোনও অপরাধের জন্যে রিপোর্ট করিতেছেন, লিখিয়া দিলেন, "ক্ষীরোদ !" হেড মাষ্টার তাহাকে দণ্ড দিতে ডাকিয়া লইয়া গেলেন ; মুন্‌সী সাহেব ভুল সংশোধন করিতে ছুটিলেন। স্কুলে হাসির তুফান উঠিল।

বিচ্ছেদ প্রকৃতির একটি অখণ্ডনীয় নিয়ম। একদিন সকলকে সকল ত্যাগ করিতে হয়। পিতা পুত্রকে ; পুত্র পিতাকে ; পত্নী পতিকে ; পতি পত্নীকে। একদিন মুন্‌সী সাহেবকেও তাঁহার মহামূল্য নোটবুক ত্যাগ করিতে হইল। বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষাসনে এক জন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। ইতিহাসের পরীক্ষা হইতেছে। মুন্‌সী সাহেব ছাত্রদের পৃষ্ঠদেশে এক একটা গুপ্ত গুঁতো দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বেটারা, আমার নোটমতে লিখ্‌ছিস্‌ না ?" ছাত্রেরা এই অভ্রান্ত ইঙ্গিতমতে একবাক্যে মুখস্থ নোটবুক অনুসারে উত্তর লিখিয়া দিল। পরীক্ষকের নিকট হইতে যখন পরীক্ষার্থীর তালিকা ফিরিয়া আসিল, স্কুলে একটা গোল পড়িয়া গেল। পরীক্ষক সমস্ত পরীক্ষার্থীর নাম ব্যাপিয়া একটি প্রকাণ্ড ব্রেকেট দিয়াছেন, এবং তাহার কেন্দ্রস্থলে একটি প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড দিয়াছেন। নীচে মন্তব্য লিখিয়া দিয়াছেন,—"ছোট তোতারা বুড়া তোতার কাছে শিখিয়াছে।" সাতাশ পাউণ্ডার কামানের গোলার মত, এই ব্রহ্মাণ্ডে মহামূল্য নোটবুক বিধ্বস্ত করিল, এবং মুন্‌সী সাহেবের হৃদয়-রাজ্যে একটা বিপ্লব উপস্থিত করিল। অকস্মাৎ আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলে তিনি অধিক অপ্রস্তুত হইতেন না। এই পৃথিবীতে মূল্যবান্‌ জিনিসের আদর কোথায় ? অগত্যা মুন্‌সী সাহেবকে "নোটবুক" কবরস্থ করিতে হইল। আহা ! আজ সেই মহাপুস্তক কোথায় ? তাঁহার ছাত্রগণের মানসমন্দিরে প্রতিধ্বনি হইবে,— "কোথায় ?" কিন্তু সম্ভবতঃ তাহার অনেক পৃষ্ঠা এখনও তাঁহাদের স্মৃতিতে অঙ্কিত আছে। মুন্‌সী সাহেব উপর্য্যুপরি ঘুষির দ্বারা তাহা মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার সকল ছাত্রের স্মৃতি একত্র করিলে তাহার পুনরুদ্ধার হইতে পারে।

পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বত্রই একটি আমোদের বস্তু। আমাদের পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয়ও তাহার ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁহার বাড়ী কুষ্ঠিয়ার এলেকায় গোঁসাইদুর্গাপুর। আমার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আমোদ হইত। আমরা কয়েক জন একটু বেশী হাসিতাম। অতএব তাঁহার নির্দ্দেশ ছিল যে, তাঁহার ঘণ্টায় আমরা এক স্থানে বসিব। ব্রাহ্মণ শুধু আমাদিগকে মারিবার জন্যে ক্লাসে প্রবেশ করিবামাত্র, তিম্পান্ন রকম মুখভঙ্গি করিতেন। আমরা হাসি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া হাসিয়া উঠিতাম। আর অমনই পণ্ডিত মহাশয় ঠেঙ্গাইতে আরম্ভ করিতেন। কিন্তু এই মার খাইতাম, এই হাসিতাম। প্রহারের পূর্ব্বে যথাশাস্ত্র নানাবিধ মন্ত্রও উচ্চারিত হইত। কখনও—

"অতি হাসায় কান্না ;
বলে গেছে দ্বিজ রামশর্ম্মা !"

কখনও—

"ননী ছানা খাইয়া
মাখন লইয়া,
কদম্বের ডালে বসিয়া,
বাঁশীটি বাজাও হে?"

আমাদের রোদনধ্বনির নাম বংশীধ্বনি! আবার কখনও—

"মস্তকেতে পক্ককেশ,
দন্ত লড়ে অশেষ,
তুমি ভাল পড় বেশ!"

(তাহার পর বিকট মুখভঙ্গি ও প্রহার, এবং ছাত্র চীৎকার করিতে থাকিলে)—"আহা! মার! বেশ! বেশ!" এই মন্ত্রে বয়োধিক ছাত্রগণ উৎসর্গিত হইত। কৃষ্ণবর্ণ ফিরিঙ্গী ছাত্রদের জন্যে একটি সংস্কৃত ধ্যান ছিল। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহা পাঠ করিতেন। "সাহেবং শুক্লবর্ণং চেয়ারোপরি উপবেশনং" ইত্যাদি। উহা চট্টগ্রামের পণ্ডিতদের সংস্কৃতের বিদ্রূপাত্মক অনুকরণ। আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে ইহার প্রতিশোধ দিতে ত্রুটি করিতাম না। শীতকালে চট্টগ্রামে তখন বড় বাঘের ভয় হইত। পণ্ডিত মহাশয় নিতান্ত ভীরু ছিলেন। তাঁহার বাসার নিকট আমার সম্প্রদায়ভুক্ত একটি ছাত্র থাকিত। সে রাত্রিতে হাঁড়ির মধ্যে বাঁশের চোঙ্গা দিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের ঘরের পার্শ্বে ব্যাঘ্রের ন্যায় বিকট গর্জ্জন করিত। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ে কখনও বা বিছানায়, কখনও বা গৃহের মধ্যে অকার্য্য করিয়া ফেলিতেন। পরদিবস তাহা লইয়া বৃদ্ধ ভৃত্যের সঙ্গে অনেক বাদানুবাদ হইত এবং স্কুলে হাসির তুফান ছুটিত।

কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় এক জন উৎকৃষ্ট শিক্ষক ছিলেন। আমরা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতাম। তাঁহার কাছে যাহা বাঙ্গালা শিখিযা আসিয়াছিলাম, বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমরা তাহাতেই পার পাইয়া গিয়াছি। তখন স্কুল কলেজে সংস্কৃত প্রচলিত ছিল না। তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অতি উত্তমরূপে জানিতেন, এবং কবিত্বশক্তিতেও তাঁহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের তিনিও এক জন বড় পক্ষপাতী শিষ্য ছিলেন। আমি যাহা কবিতা লিখিতে শিখিয়াছি, তাহার জন্য তাঁহার নিকট আমি সম্পূর্ণরূপে ঋণী। কবিতা রচনা সম্বন্ধে তিনি আমায় বড় যত্ন করিতেন, এবং এক জন প্রধান উৎসাহী ছিলেন। যদিও তাঁহার ভালবাসাটি কিছু "গিরিজায়া-দিগ্বিজয়" ধরণের ছিল, সময়ে সময়ে তিনি আমাকে 'শাপ' দিতেন, এবং আমি তাঁহাকে "বেগ" দিতাম, তথাপি তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং আমি তাঁহাকে অন্তঃকরণের সহিত শ্রদ্ধা করিতাম। আমার শিক্ষক-মাত্রেরই প্রতি আমার অচলা ভক্তি। নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষককে দেখিলেও আমার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ হয়, এবং তাঁহার সঙ্গে এখনও সঙ্কোচের সহিত আলাপ করি।

ভগ্নদূত

চন্দ্রকুমারের বাসার সম্মুখে আমাদের ক্রীড়াভূমি। তাহার অপর পার্শ্বে মজুমদার মহাশয়ের আশ্রম। মজুমদার মহাশয় দেখিতে একটি অর্দ্ধদগ্ধ, সরল কাষ্ঠযষ্টি। এক চক্ষু অন্ধ। ক্ষুদ্র মুখখানি বসন্ত রোগের গিরিগহ্বরে পরিপূর্ণ: তাহাতে ছায়ালোক খেলিতেছে। মস্তকে স্থানে স্থানে কয়েকটি শ্বেতকৃষ্ণ ক্ষুদ্র কেশ আছে: তালুকাদেশ একটি অর্দ্ধপক্ক তালের মত। তিনি একজন ঘোরতর তান্ত্রিক। উভয়ের কি শুভক্ষণে সাক্ষাৎ, বলিতে পারি না। তিনি আমাকে দেখিলেই ক্ষেপিয়া উঠিতেন! আমিও তাঁহাকে

দেখিলে না ক্ষেপাইয়া থাকিতে পারিতাম না। তাঁহার নাম শঙ্করাচার্য্য রাখিয়াছিলাম, এবং তাঁহাকে দেখিলেই আমার প্রায়ই দক্ষিণ চক্ষু বুজিয়া যাইত,—জড় পদার্থের কি দুর্জ্জেয় আকর্ষণ, জানি না। চট্টগ্রামে আমার নিন্দা প্রকাশের জন্য মজুমদার মহাশয় একটি জীবন্ত 'গেজেট'। আমিও এই গেজেটের "আর্টিকেলে'র ও বিজ্ঞাপনের বিষয় যোগাইতে ত্রুটি করিতাম না। মজুমদার মহাশয় তান্ত্রিক। বাম হস্তের অঙ্গুলিত্রয়ের শীর্ষদেশে 'পাত্র' (দেশীয় সুরাপূর্ণ আঁচি) লইয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেছেন, আমি বজ্রশব্দে সম্মুখের বাঁশের বেড়ায় "বল' নিক্ষেপ করিলাম। ধ্যানস্থ মজুমদার চমকিয়া উঠিলেন। পাত্র পড়িয়া গেল। বেড়ার ছিদ্রের মধ্যে কাঠি দিয়া কখনও বা ধ্যানমগ্নাবস্থায় তাঁহার করস্থ পাত্রটি, পার্শ্বস্থ খোলা যন্ত্রটি (মদের বোতল), এবং পুষ্পপাত্রস্থ শিবলিঙ্গটি ফেলিয়া দিতাম। যখন তিনি বেতালা বেসুরা চীৎকার করিয়া আমাকে নানারূপ বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন, এবং শিবলিঙ্গকে বিল্বপত্র দিয়া আমার জন্য নানারূপ বর প্রার্থনা করিতেন। কখনও বা বৃহৎ ঠেঙ্গা লইয়া ছুটিয়া আসিতেন। কিন্তু একটি চক্ষু বই নহে ; তাহাতে এক মুষ্টি ধূলি প্রয়োগ করিলে আমার আর পলায়নের বিঘ্ন কে করে? কখন বা তাঁহার অসাক্ষাতে তাঁহার ভৃত্যের সঙ্গে পিরীত করিয়া মজুমদার মহাশয়ের যন্ত্রের ধান্যেশ্বরীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ অন্য উদ্ভিজ্জের রস মিশাইয়া রাখিয়া আসিতাম। ধান্যেশ্বরীর মহিমায় তাহার গন্ধ ঢাকিয়া যাইত। মজুমদার মহাশয় তাহা মন্ত্রপূত করিয়া ভক্তিভরে পান করিতেন, এবং উদ্গারশব্দে গিরিশেখর প্রতিধ্বনিত করিতেন। তান্ত্রিকেরা গোপনে সুরাপান করে ; কিছু বলিবার যো নাই। এইরূপে মধ্যে মধ্যে মজুমদার মহাশয়ের ও আমার নানারূপ অভিনয় হইত। তিনি একদিন ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

আমার পিতার এক বন্ধু ছিলেন। এ ভদ্রলোকের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার তুল্য বাঙ্গালা ভূভারতে কেহ জানে না। প্রভাকরের তখন মধ্যাহ্ন-প্রভা, এবং গুপ্তজার গদ্য পদ্য বাঙ্গালার আদর্শ। যিনি যত দীর্ঘ অনুপ্রাসের হার গাঁথিতে পারিতেন, তিনি তত মুনসী। যখন ইহা এত দূর হইল যে, অর্থগ্রহণ করা কঠিন, তখন মুন্সীয়ানার পরাকাষ্ঠা হইল। আমার পিতৃবন্ধুও এরূপ ভাষায় নিতান্ত খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। তিনি অঙ্কশাস্ত্র হইতে ইতিহাস পর্য্যন্ত অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; নিজে অর্থ ব্যয় করিয়া ছাপিয়াও ছিলেন ; কিন্তু মুন্সী সাহেবের মহামূল্য "নোটবুকে'র মত এই গুণগ্রহণাক্ষম জগতে কেহ তাহা পড়িল না। তাহা না হইলে অনুপ্রাসের দ্বারা পৃথিবীর যাবতীয় শাস্ত্র অধীত হইতে পারিত ; অঙ্ক পর্য্যন্ত কসা যাইত।

এই বঙ্গভাষা-বিশারদ বিদেশে চাকরী করিতেন। দেশে আসিলে আমাকে আর চন্দ্রকুমারকে বড়ই জ্বালাতন করিতেন। পথে ঘাটে যেখানে আমাদিগকে পাইতেন, পরীক্ষা করিয়া লইতেন। তিনি বিদেশে চাকরী করিতেন, তাই আমাদের রক্ষা। একদিন ঊর্দ্ধশ্বাসে ক্রীড়াভূমে ছুটিয়াছি ; তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ। যেই সাক্ষাৎ, সেই প্রশ্ন,—সন্ধি কাহাকে বলে? অমনই বলিলেন,—'যদি উত্তর দিতে না পার, তবে কাণ মলিয়া দিব।' আমি দেখিলাম, ইঁহার সঙ্গে আর ভদ্রতা করিলে চলিবে না। বলিলাম,—"তাহারই নাম সন্ধি, কর্ণের সঙ্গে করের সংযোগ।' বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল। তিনি গর্জ্জন করিয়া আমাকে নানা স্বরে বহু বার 'বেল্লিক' উপাধি দিয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে ঠাট্টা? তোমার বাবার কাছে বলিয়া পাঠাইব, যেন কাণ দুখানি কাটিয়া দেন।' উত্তর,—"একরূপ ভাল। কাণমলা আর খাইতে হইবে না।' এই বলিয়া আমি ছুটিলাম। আমি জানিতাম যে, আমার কাণ দুখানি এত নিষ্প্রয়োজনীয় নহে যে, পিতা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিবেন। এ যাত্রা এক প্রকার নিষ্কৃতি পাইলাম।

তাহার পরের যাত্রায় আমার টীকা হওয়ায় আমি বাড়ীতে ছিলাম। সহরে আসিয়া

চন্দ্রকুমারের কাছে শুনিলাম যে, চট্টগ্রামে পদার্পণ করিয়াই তিনি আমাদের উপর প্রশ্নমালা ঝাড়িয়াছেন।—

১। সন্তান উৎপাদন করিবার সময় পিতার মনে কি আশা থাকে?

২। পিতার সে আশা বিফল হইলে মনে কিরূপ কষ্ট হয়?

৩। পিতার সেই আশা পূরণ করিবার জন্য সন্তানের কি করা কর্ত্তব্য?

এরূপ আরও দুই একটি ছিল। ছাই ভুলিয়া গিয়াছি। আদেশ,—এই প্রশ্নের উত্তরে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। চন্দ্রকুমার বেচারী ভাবিয়া অস্থির, ইহার উত্তর মাথা মুণ্ড কি লিখিবে? আমাদের তখন বয়স বড় জোর ১৪ বৎসর। অতএব আমরা সন্তান উৎপাদনের কি ধার ধারি? তথাপি চন্দ্রকুমার এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতেছে। আমার তত অবকাশ কোথায়? বিশেষতঃ এই ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইবে। আমি সংক্ষেপে উত্তর লিখিলাম যে, আমি বালক; পিতা হই নাই। অতএব সন্তান উৎপাদনের কোন খবর রাখি না। উত্তর পাইয়া পিতৃবন্ধু একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। মজুমদার মহাশয়কে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। শুক্রাচার্য আমার উত্তর লইয়া পিতার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, এবং আমার দুষ্টচরিত্র সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা করিয়া উত্তর পিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। পিতা উত্তর পড়িয়া একটু হাসিলেন, এবং তাঁহার বন্ধুর নাম করিয়া বলিলেন,—"তিনিও পাগল, বালককে এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন কেন?" আমার তলব হইল। আমি অতি শান্তভাবে নতশিরে পিতার আদালতে উপস্থিত হইলাম। পিতা কিঞ্চিৎ তিরস্কার করিলেন। মজুমদার মহাশয়ের এক চক্ষু হাসিতে লাগিল। আজি তাঁহার এক দিন! তাই বলিয়াছি যে, এক দিন তিনি প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

তিনি বিজয়ী বীরের ন্যায় গর্ব্বভরে এক চক্ষু লইয়া চলিলেন। রাস্তায় প্রবেশ করিবা মাত্র, আমার এক চর, তাঁহার এক চক্ষুতে একখানি কাগজ বসাইয়া, তাঁহার সম্মুখে যাইয়া "শুক্রাচার্য্য! সেলাম" বলিয়া কিঞ্চিৎ অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া এক সেলাম করিল। তিনি দাঁত খিঁচিয়া তাহাকে প্রহার করিতে উঠিলেন; অমনি পশ্চাৎ হইতে একটি পট্‌কা বাজি ফুটিল। তিনি জানিতেন, আমি সেই বয়সেও শিকার করিতাম। "গুলি করিয়াছে, খুন করিয়াছে" বলিয়া সপ্তস্বরে এক চীৎকার নির্গত করিয়া তিনি ধরাশায়ী হইলেন। রাস্তা লোকাকীর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর যখন লোকেরা বুঝাইয়া দিল যে, তিনি খুন হন নাই, তিনি উঠিয়া যাইতে লাগিলেন; আর রাস্তার ইতর বালকেরা তাঁহাকে তাড়াইতে আরম্ভ করিল। ইতি শুক্রাচার্য্য দৈত্যনামা মহাসর্গ সমাপ্ত।

পিতৃবন্ধু দূতের দুর্গতি শুনিয়া ক্ষেপিলেন। তিনি বিদেশে যাইতেছেন। তাঁহার পুত্রকে দেশে পিতার কাছে রাখিয়া চট্টগ্রাম স্কুলে পড়াইতে পিতা বলিলেন। তিনি সেই সুযোগ পাইয়া বলিলেন, "তোমার ছেলেকে তুমি যে শিক্ষা দিতেছ, তাহা দেখিতেছি। আমার ছেলে; আমরা টাঙ্গন ঘোড়া।" পিতার মুখ মলিন হইল। সেই দৃশ্য আমার অন্তস্থলে যাইয়া আঘাত করিল। প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমি যে পিতার অপরিসীম স্নেহের অপব্যবহার করিতেছি না, তাহা এক দিন ইঁহাকে দেখাইব। তিনি যে তাহা দেখিয়াছেন, এটি আমার জীবনের আর একটি মহৎ সুখ।

কিছু দিন পরে "টাঙ্গনের ঘোড়া" বিদেশস্থিত পিতৃ ষ্টড্ হইতে দেশে আসিলেন। এক বিচিত্র অদ্ভুত জানোয়ার! অল্প জলখাবার দ্রব্যে তাঁহার উদর পূর্ণ হয় না। তিনি স্কুলে যাইবার সময়ে এক সের চিঁড়ে ভিজাইয়া রাখিয়া যাইতেন। ফিরিয়া আসিয়া তাহাতে এক কাঁদি কলা মাখিয়া খাইতেন। আমরা কোনও দিন তাহা ঘাঁটিয়া গোবর করিয়া রাখিতাম। তাঁহার পিতৃদেব এক এক পদাম্বুজাঘাতে তাঁহাকে বৈঠকখানার কেন্দ্রস্থল হইতে প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিতেন, এবং আমার পিতাকে এরূপে পুত্র-শিক্ষার আদর্শ দেখাইতেন। কিন্তু

আমার করুণাময় পিতা তাহা শিখিতে পারিবেন কেন? এই জ্ঞানোদ্দীপক পদাঘাতপুঞ্জের এমনি মহিমা যে, বেচারি জ্যামিতির and the শব্দদ্বয়কে "এন দি" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে সারা রাত্রি কাটাইত! সেই "টাঙ্গানো ঘোড়া" আজি চট্টগ্রামের একটি বিখ্যাত মূর্খ।

"See what a grace was seated on this brow:
Hyperion's curls; the front of jove himself;
An eye like mars to threaten command;
A station, like the herald mercury
New lighted on a heaven-kissing hill:
A combination and a form indeed.
Where every god did seem to set his seal."

আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিতে না উঠিতেই অদৃষ্টচক্র ঘুরিল। সুখ-সূর্য্য বহুদিন হইল মধ্যাহ্ন গগন অতিক্রম করিয়াছিলেন; এখন অপ্রতিহত গতিতে অস্তাচলাভিমুখে ছুটিলেন। এই আবর্ত্তনের প্রধান কারণ পিতার দানশীলতা এবং প্রশস্তহৃদয়তা। আমাদের বাসায় এত দরিদ্র ভদ্রসন্তান প্রতিপালিত হইতেন যে, যখন ভৃত্যেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আহারান্তে বাসন-পত্র ধুইতে যাইত, লোকে তাহাদিগকে পিতার "পল্টন" বলিত। আমি-এক-ছেলের সঙ্গে বহুতর আত্মীয় অনাত্মীয়ের ছেলেরা শিক্ষা লাভ করিত। পিতা কেবল তাহাদের প্রতিপালনের ও শিক্ষার ভার বহন করিতেন না, তাহাদের পরিবারবর্গেরও অনল্প সাহায্য করিতেন। এমন কি, প্রার্থী মাত্রই প্রত্যাখ্যাত হইত না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাতঃকালে কিরূপ ব্যবসায়িমণ্ডলীর দ্বারা বৈঠকখানা সজ্জিত থাকিত। প্রত্যেক খাতায় প্রতি দিন কিছু না কিছু না উঠিয়া যাইত না। তদ্ভিন্ন একজন লোক প্রায় দোকানে চিঠি কাটিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত। যে যাহা চাহিতেছে, তাহারই জন্যে দোকানে চিঠি যাইতেছে। শারদীয় পার্ব্বণ উপলক্ষে দেশীয় বিদেশীয় এত লোকের "বার্ষিক" প্রদত্ত হইত যে, প্রভাত হইতে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত বাসা লোকারণ্য হইয়া থাকিত। সহরে এইরূপ।

আবার পূজার সময় পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীর জন্যে কাপড় ও খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া নিয়া কুলাইত না। এ জন্য একখানি কাপড়ের ও ময়দার দোকান বাড়ীতে উঠিয়া যাইত। পিতা দেখিতে বড় সুন্দর ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ সুভঙ্গি দেহ, কাঞ্চনবর্ণ, সুগোল মুখ, সুন্দর নাসিকা, করুণাসিক্ত আয়ত লোচন, বিস্তৃত ললাট, তদুপরে কুঞ্চিত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশ, বিস্তৃত বক্ষ এবং ক্ষীণ কটি। যে দেখিত, সেই তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইত। আমি এমন সুন্দর দেব-অবয়ব আর দেখি নাই। নিজে নিতান্ত সুখী ও সৌখীন ছিলেন। একরূপ পোষাক পরিয়া প্রায়ই দুদিন কাচারি যাইতেন না। আমার বড় কাকা পর্য্যন্ত ১২।১৪ টাকার কম মূল্যের ধুতি জোড়াটি পরিতেন না। প্রধান চাকরটি পর্য্যন্ত শাল ব্যবহার করিত, এবং প্রত্যেক দোকানে তাহার নামেও স্বতন্ত্র বাকি হিসাব ছিল। অন্য দিকে টাকা কখনও পিতা নিজের হাতে স্পর্শ করিতেন না। আয়ের ব্যয়ের হিসাব কখনও দেখিতেন না। সম্মুখ হইতে ভৃত্য টাকা উঠাইয়া লইয়া গেলে, একবার জিজ্ঞাসা করিতেন না—কত? ভৃত্য, বলিল—টাকা নাই; পরিষদ একজন যাইয়া ৫/৬ টাকা মাসিক সুদে টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিল। কিছু দিন পরে সুদ আসল একত্র করিয়া আবার নূতন তমসুক দেওয়া হইল। এরূপ দেখিতে দেখিতে শত সহস্র হইতে চলিল। এক পাপিষ্ঠ হইতে ২০০ টাকা মাত্র ধার করিয়া তাহাকে ১১০০ শত টাকা দিয়াছিলেন, তথাপি সে তাঁহার মৃত্যুর পর ৬০০ শত টাকার ডিগ্রী করিয়াছিল।

এ দিকে দোকানদারেরা ১ টাকার জায়গায় খাতায় ২ টাকা লিখিয়া রাখিতেছে। যদি তাহা লইয়া কোনও কর্ম্মচারী গোলযোগ উপস্থিত করিল, সে কাঁদিয়া পিতার কাছে উপস্থিত হইল। পিতা হিতৈষী কর্ম্মচারীকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"গরীব দুই পয়সা না পাইলে তাহার চলিবে কেন?"

এরূপে তিল তিল করিয়া অলক্ষিতে অদৃষ্টাকাশে মেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল। ক্রমে উহা ঘনীভূত হইতে লাগিল। পিতা তথাপি গ্রাহ্য করিলেন না। কেহ যদি অন্ততঃ সন্তানদের জন্য কিছু সংস্থান রাখিয়া যাইতে বলিতেন, পিতা আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন,—"আমার পিতা আমাকে কিছু দিয়া গিয়াছিলেন না, আমিও আমার পুত্রকে কিছু দিয়া যাইব না। আমি আপন কলমের উপর নির্ভর করিয়া কাল কাটাইয়া যাইব। পুত্রকেও তাহা করিতে হইবে।" ক্রমে অবস্থাকাশ আরও মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। মাতা পর্য্যন্ত অনেক সময়ে আমাদের জন্য আক্ষেপ করিয়া অনেক কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নিতান্ত সরলা ছিলেন। পিতা তাঁহাকে দু-চারি কথায় প্রবোধ দিয়া রাখিতেন। শুধু তাহা নহে. বাড়ীর জন্য মাতাকে যে টাকা দেওয়া হইত, যদি পিতা টের পাইতেন যে, মাতা তাহা হইতে কিছু সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তবে তাহাও কোন প্রকারে বাহির করিয়া লইতেন। এক দিন মাতা বলিলেন,—"আমাদের অবস্থা এত মন্দ হইয়াছে, মাথার চুল অপেক্ষা ঋণের সংখ্যা বেশী হইয়াছে। সহরে যে এত লোক রহিয়াছে, তাহাদিগকে এখন স্থানান্তরে যাইতে বল।" পিতা হাসিয়া বলিলেন—সে প্রসন্নতাপূর্ণ হাসি আমার স্মৃতিতে এখনও চিত্রিত রহিয়াছে.—"তুমি নির্ব্বোধ। তুমি জান না, আমি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেছি, ইহাদের ভাগ্যে পাইতেছি। যদি ইহাদিগকে তাড়াইয়া দিই, তবে আমি কিছুই পাইব না।" পিতা তখন উকিল।

তাঁহার দুই জন পিতৃব্য-ভ্রাতার মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। ইঁহারা দুই জন সহোদর। তাঁহারা দুইজন উৎসন্ন যাইতেছেন। জ্যেষ্ঠ আমাদের সমুদায় বংশ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন। তিনি আসিয়া পিতার আশ্রয় লইলেন। সমুদায় বংশ পিতার প্রতি খড়্গহস্ত হইল। কিন্তু পিতা পরিষ্কার বলিলেন,—"আমি আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে পারিব না।" তখন ইঁহারা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপ্রকার নীচাশয়তার দ্বারা পিতার অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতার জনৈক কর্ম্মচারী পিতার নামে জজের কাছে বহুতর "বেনামা দরখাস্ত" দেওয়ার পর, আর একখানি দরখাস্ত আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া দাখিল করিল, এবং অসংখ্য অভিযোগের প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হইল। পিতা তখন জজ আদালতের ক্ষমতাশালী সেরেস্তাদার। জজ তীব্রভাবে তাহার তদন্ত করিতে লাগিলেন। এই কর্ম্মচারীর একটি পুত্র বহু দিন হইতে আমাদের বাসায় প্রতিপালিত হইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছিল। এক দিন কাছারি হইতে নিতান্ত চিন্তাকুল ও বিপদস্থ হইয়া পিতা ফিরিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার বহুতর বন্ধু তাঁহাকে তাহার পিতার দুষ্কৃতির জন্য এই বালকটিকে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বারম্বার জেদ করিতে লাগিলেন। পিতা অন্যমনা হইয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন। বহু ক্ষণ পরে একটুকু ঈষৎ হাসিয়া ফরসির নল রাখিয়া, সেই দরখাস্তকারীর নাম করিয়া বলিলেন,—"সে চাকর মাত্র। আপন মুনিবের আদেশমত কার্য্য করিতেছে. অতএব তাহার প্রতি রাগ করা অন্যায়। বিশেষতঃ তাহার ছেলে আমার কোন্ অপরাধ করিয়াছে যে, আমি তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিব?" বন্ধুগণ বিরক্ত হইয়া আর কিছুই বলিলেন না। পিতা আমার যে দেবতা, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। সেই অবস্থা, সেই বিপদ্, এবং সেই প্রসন্নতাপূর্ণ মহাহৃদয়তা,—এরূপ সহস্র দৃষ্টান্ত যখন আমার স্মরণ হয়, আমি এই স্বার্থপূর্ণ জগৎ হইতে উত্থিত হইয়া যেন কোনও পবিত্র রাজ্যে উপস্থিত হই। এই স্মৃতিতে এত গৌরব যে, আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয় তাহার স্থান হয় না। এই স্মৃতি আমার হৃদয়ে কি

এক অনির্ব্বচনীয় অপার্থিব অপরিসীম শক্তি সঞ্চার করে। আমি এই জীবনে যত বার ঘোরতর বিপদর্ণবে পতিত হইয়াছি, তত বার এই স্মৃতি একটি দেবমূর্ত্তিরূপে সেই ঝটিকা-বিদ্যুৎ-বিপ্লাবিত আকাশমন্ডল বিভাসিত করিয়া আমাকে বলিয়াছে—"তুমি তেমন পিতার পুত্র, তোমার ভয় নাই।"

পরহিতৈষিতা-বৃত্তি এত দূর প্রবল ছিল যে, কাচারিতে কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে কেহ কোন দোষ করিলে পিতা নিজে তাহা মস্তক পাতিয়া লইতেন। তিনি জজের নিতান্ত প্রিয়-পাত্র ছিলেন বলিয়া এরূপে সমস্ত কর্ম্মচারিবর্গকে বাঁচাইয়া চলিতেন। সময়ে সময়ে ইহার জন্যে তিনি ঘোরতর বিপদস্থ হইতেন। আমার স্মরণ হইতেছে, আমি এক দিন কাচারিতে বেড়াইতে গিয়াছি। আমার প্রতি কর্ম্মচারিবর্গের আদরের সীমা নাই। জজের হেড্ক্লার্ক আমাকে বলিলেন—"বাবু! আমরা সকলে তোমার পিতার গোলাম। আমাদের চর্ম্মের দ্বারা তাঁহার পাদুকা প্রস্তুত করিয়া দিলেও তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি তেমন পিতার উপযুক্ত পুত্র হইবে।" কথাগুলি আমি স্মৃতিতে মুদ্রিত করিয়া রাখিলাম।

অলৌকিক কার্য্য

"There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy."

একে ত অবস্থার আকাশ সহজেই মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে বিধাতাও আবার সেই ঘনঘটা বাড়াইতে লাগিলেন। বলিয়াছি, আমার জন্মের অব্যবহিত পরেই আমাদের গ্রাম শুদ্ধ ভস্মীভূত হয়। তাহার পর ৮।১০ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত ৮ বার আমাদের বাড়ী এবং সহরের বাসাবাড়ী পুড়িয়া যায়। এক এক বার এমনি হইত—বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে, সংবাদ শুনিয়া বাড়ী গিয়াছি, পরদিন বাড়ীতে শুনিলাম, সহরের বাসা-বাড়ী পুড়িয়া গিয়াছে! অথচ উভয় স্থলে দৈবিক আগুন! আমাদের বংশে পাকা বাড়ী করিবার নিয়ম ছিল না। তাহার কারণ, আদিপুরুষ শ্রীযুক্ত রায় দশভুজার পাকা মন্দিরে কাটা পড়িয়াছিলেন। তাহার পর যিনি পাকা বাড়ী করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার কোনও না কোন অমঙ্গল হওয়াতে, এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়া গিয়াছিল। অতএব সকলেরই মাটির ও বাঁশের ঘর। প্রথম বার অগ্নিতে অনেক পুরাতন ; বহুমূল্য ও বহু কারুকার্য্যযুক্ত বাঁশের ঘর ধ্বংস হইয়াছিল।

এ সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য গল্প বলিব। আমার বয়স যখন অনুমান ১০ বৎসর তখন চট্টগ্রামে পশ্চিম অঞ্চল হইতে শঙ্করপুরি স্বামী নামক একজন সন্ন্যাসী উপস্থিত হন। তিনি ভারতীয় সন্ন্যাসীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় এবং ভক্তিভাজন। এমন প্রশান্ত, গম্ভীর, চিন্তাশীল, উন্নত মূর্ত্তি আমি দেখি নাই। আমি তাঁহার কাছে সন্ন্যাসনিয়মে কর্পূরালোকে সর্ব্বপ্রথমে দীক্ষিত হইলাম। তাহার পর এ অঞ্চলে তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। এই সময় এক-বার আমাদের বাড়ী পুড়িয়া গেল। পুরি বাবাজী উপর্য্যুপরি এই অগ্নিকান্ডের কথা শুনিয়া আমাদের বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। পিতা তাঁহাকে লইয়া গেলেন। ঠাকুরঘরের ভিটিতে একটি আচ্ছাদন নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে থাকিতে দেওয়া হল। পরদিন প্রাতে তিনি পিতাকে বলিলেন—আমি পিতার কাছে শুনিয়াছি যে, রাত্রিতে তাঁহার শরীরে কয়েক বার অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনি এরূপ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, আমাদের বাড়ী কোনও অপদেবতার ক্রীড়াভূমি। তিনি সেই রাত্রিতে কি একটি পুরশ্চরণ করিলেন, তাহা আমি জানি না। তিনি আমাকে মাতার কাছে শুইয়া থাকিতে

আদেশ দিয়াছিলেন, এবং রাত্রিতে পুরস্ত্রী কেহ যেন একাকিনী গৃহের বাহিরে না যান নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। আমার নিদ্রা। মাতা বাহিরে গিয়াছেন। নিদ্রিত বলিয়া আমাকে, কি দাসীকে জাগান নাই। তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জাগাইলেন। বলিলেন,—"তোমার বৈদ্য দাদা কি জন্যে এত রাত্রিতে ছাদে গেলেন, দেখিয়া আইস ত?" ইনি তদানীন্তন চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রধান বিখ্যাত চিকিৎসক। সমুদায় গৃহ পুড়িয়া যাইয়া কেবল মাটির কোঠা ঘর মাত্র ছিল। আমি যাইয়া দেখিলাম, কেহ কোথায় নাই। বাহিরে একটি আচ্ছাদনের নীচে পুরশ্চরণ হইতেছিল। আমি সেখানে যাইয়া বৈদ্য দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কি এখন বাড়ীর মধ্যে গিয়াছিলেন?" প্রশ্ন শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। মাতা অন্তঃসত্ত্বা। পুরি বাবাজী শুনিয়া কিঞ্চিত ভীত হইলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "ভয় নাই। মাতা যেন আর একাকিনী বাহিরে না যান।" আমি ফিরিয়া আসিলাম ; মাতা পাছে ভয় পান বলিয়া বলিলাম,—"হাঁ, বৈদ্য দাদা আসিয়াছিলেন।" কিঞ্চিৎ পরে মাতা ব্যথা বোধ করিতে লাগিলেন। আমি পিতাকে সংবাদ দিতে গেলাম। পুরি বাবাজী ভীত হইলেন। তখন যজ্ঞ হইতেছিল। আমাকে অল্প ভস্ম দিলেন, এবং মাতাকে খাওয়াইয়া দিতে বলিলেন। মাতা খাইলেন, এবং তাহার পর, কই, আর কোনও অসুখের কথা বলিলেন না। রাত্রিতে কি হইল, আমি জানি না। পিতার কাছে পরদিন শুনিলাম যে, পুরি বাবাজী আমাদের বাড়ীর চতুঃসীমা পরিক্রমণ করিয়া দক্ষিণ পশ্চিম কোণাতে বলিদানের পাঁঠাটি পুতিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, আর আমাদের বাড়ীতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিবে না। তাহার পর প্রায় ৪০ বৎসর যাবৎ আমাদের কোনও কোন ঘরের চালসংলগ্ন আত্মীয়দের ঘর দুই বার জ্বলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমার নিজ বাড়ীর একটি তৃণও দগ্ধ হইয়াছিল না। কবিগুরু! তোমার কথাই যথার্থ! "স্বর্গে, মর্ত্তে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা এখনও দর্শনশাস্ত্রের আয়ত্ত হয় নাই।"

যাহা হউক, এতাবৎ কারণে আমাদের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে চলিল। পিতা সেরেস্তাদারী ত্যাগ করিয়া উকিল হইলেন। দেশ শুদ্ধ লোক বলিতে লাগিল, উকিলিতে তাঁহার উপার্জ্জনের সীমা থাকিবে না। ফলতঃ সেই লোকবাণী সত্য হইল। কিন্তু উকিলিতে যে পরিমাণ সময়ের আবশ্যক পিতার সে সময় কোথায়! তিনি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া আহ্নিক করিতে বসিতেন। তাহা ৯টার পূর্ব্বে শেষ হইত না। বৈঠকখানা অর্থী প্রত্যার্থীতে লোকাকীর্ণ। কিন্তু ১০টার সময়ে কাচারিতে যাইতে হইবে, তাহাদের সঙ্গে কথা কহিবারও সময় হইল না। কাচারি হইতে সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া আবার পূজাতে বসিলেন। দীর্ঘ পূজা প্রাতে সমাপন হইবে না বলিয়া কেবল আহ্নিক মাত্র করিতেন। এই পূজা রাত্রি ৩।৪ টার সময়ে সমাপন হইত। কাজে কাজেই উকিলের পসার কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় দিন দিন হ্রাস হইতে চলিল। দুরবস্থাও দিন দিন সেই পরিমাণ শুক্লপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বাড়িতে লাগিল। পিতা অগত্যা মুনসেফী গ্রহণ করিলেন। ২৫০ টাকা বেতন সমুদ্রে জলবিন্দুবৎ হইল। তাহাতে ঋণের সুদও কুলাইয়া উঠে না। একটি মাত্র আশা-সূত্র যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এ সময়ে ছিঁড়িয়া গেল।

সর্ব্বস্বান্ত

বিষয়ে বীতরাগ আমাদের একটি পুরুষানুক্রমিক লক্ষণ। প্রপিতামহ শিশুবৎ সরল, সঙ্গীত ও আমোদপ্রিয় ছিলেন। নেমকমহালের পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোনও নেমকহারাম দেওয়ানের জামিনিতে জমিদারি আবদ্ধ রাখিয়া প্রপিতামহ তাহার চাকরির সংস্থান করিয়া দেন। এ ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের টাকা চুরি করিয়া পিট্টান দিয়া, এই সকল উপকারের প্রতিদান করে।

সরল প্রপিতামহ জনৈক চতুর ভ্রাতুষ্পুত্রের চক্রান্তে জমিদারি জামিনের দায় হইতে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় রাজস্বের জন্য নিলাম করাইয়া অন্য এক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নামে নিলাম খরিদ করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে মূল্যের টাকা আংশিক কর্জ্জ দিয়া একখানি একেরারের দ্বারা এই নিয়মে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত করেন যে, তিনি তাহার অর্দ্ধেক উপস্বত্ব প্রপিতামহকে দিবেন, এবং বাকি অর্দ্ধেকের দ্বারা তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া সমস্ত জমিদারি পিতামহকে ছাড়িয়া দিবেন। নানারূপ ছলনা করিয়া তাঁহার ঋণ বহুগুণ শোধ হইবার পরও তিনি জমিদারি প্রপিতামহ, কি তাঁহার পুত্রদ্বয়কে ছাড়িয়া দেন না। আমার পিতামহ ত্রিপুরাশরণ এক জন জন্মতঃ প্রতিভান্বিত শিল্পী ছিলেন। যদিও তিনি কখনও গৃহের বাহিরে যান নাই, তথাপি এমন কোনও শিল্পবিদ্যা নাই, যাহাতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন না। তিনি ঘড়ি, বন্দুক, কামান প্রস্তুত করিতেন : এমন কি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টিমার পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া বাড়ীর সম্মুখে দীঘিতে চালাইতেন। তাঁহার হাতের ২/৪টি জিনিস আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা ঠিক ইউরোপীয় শিল্পীর নির্ম্মিত বলিয়া ভ্রম হয়। তিনি বিষয়কার্য্যের ভাবনা দ্বারা তাঁহার শিল্পকার্য্যের ব্যাঘাত করিতেন না। তাঁহার ভ্রাতাও দিন রাত্রি পূজা লইয়া থাকিতেন। যাহা হউক, প্রপিতামহের ভ্রাতুষ্পুত্রের মৃত্যুসময়ে বোধ হয় অনুতাপ উপস্থিত হয়। ইঁহাদের প্রতি আর অধর্ম্মাচরণ না করিয়া জমিদারি ছাড়িয়া দিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিয়া যান। তিনিও তাঁহার পিতার যোগ্য পুত্র। পিতামহকে ত জমিদারি ছাড়িয়াই দেন না, পিতা ক্ষমতাপন্ন হইয়া জমিদারি ফেরত চাহিলেন, প্রথমতঃ অর্দ্ধেক মাত্র, যাহার উপস্বত্ব প্রপিতামহের সময় হইতে আমরা পাইতেছিলাম, ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন। অবশেষে তিনি উক্ত অর্দ্ধেকের উপস্বত্ব দেওয়াও বন্ধ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের মত বলিলেনঃ—

"বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী।"

অতএব পিতা সেই নিলাম খরিদদার হইতে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার মাতুলভ্রাতার নামে বিনামা কবালা করিয়া লইয়া এই কবালামূলে মকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন পূর্ব্ব একেরার গোপন করিয়া একখানি জাল একেরার উপস্থিত করিয়া বলিলেন, এই 'একেরার' মতে ১ বৎসরের মধ্যে তাঁহার পিতার ঋণ পরিশোধ না হওয়াতে সমস্ত জমিদারির তাঁহারা মালিক হইয়াছেন! তাঁহারা ইতিমধ্যে ঋণের ২৫ গুণ অর্দ্ধেক জমিদারি হইতে পাইয়াছিলেন। বিধাতার ধর্ম্মনীতি অলঙ্ঘনীয়। মানুষের কর্ম্মফল, শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, অনিবার্য্য। এই জবাব দাখিল করিবার কিছু দিন পরে তিনি প্রকৃতই ধৃতরাষ্ট্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অন্ধ হইলেন, এবং তাঁহার ২খানি জাহাজ ডুবিয়া, যে বাণিজ্যের দ্বারা তিনি উন্নত হইতেছিলেন, তাহাও হারাইলেন। তথাপি তিনি ধৃতরাষ্ট্রের স্থান গ্রহণ করিয়া চট্টগ্রামের এই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং বংশের এই সমুন্নত শাখার ধ্বংস সাধন করিলেন। তিনি বড় ফকিরভক্ত ছিলেন। কত ফকির এই যুদ্ধে সারথিত্বে বরিত হইলেন। তথাপি ত্রেতায় যাহা হইয়াছিল, এ কালেও তাহা হইল,— পাণ্ডবেরা জয়ী হইলেন। কিন্তু সে কালে আপিল আদালত ছিল না। কৌরবেরা আপিল করিতে পারিয়াছিল না। এ কালের কৌরবেরা হাইকোর্টে আপিল করিলেন। সেখানে যুদ্ধ প্রতিনিধির দ্বারা হইবে। তাঁহাদের এক প্রতিনিধি প্রেরিত হইল। সে কিছু টাকার শ্রাদ্ধ করিয়া "বেগুণবাড়ী" প্রাপ্ত হইল। তাঁহার পর দ্বিতীয় প্রতিনিধি কার্য্যক্ষেত্রে উপনীত হইল। আবার ফকিরদের নমাজ, ব্রাহ্মণের স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হইল। ধৃতরাষ্ট্রেরা ত্রেতায় অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল। অতএব তাহাও হইল। কিন্তু তাঁহারা নারায়ণ দ্বারা বহুপ্রকার প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় প্রতিনিধিও এ কালে নারায়ণের পরিবর্ত্তে এক জুয়াচোরের হস্তে পড়িল। সে বুঝাইয়া দিল যে, মুল্লুকের মালিক "লর্ড বিশপ।" বড় লাটই, হউন, আর ছোট লাট হউন, আর "হাইকোর্টে"র জজই

হউন, সকলকে তাঁহার অনুরোধ মস্তক পাতিয়া লইতে হয়। অতএব তাঁহাকে কিঞ্চিৎ "দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্যং" দিতে হইবে ও তাঁহার বাড়ীতে একটি ভোজ দিয়া তাঁহার দ্বারা জজ্‌দিগকে চট্টগ্রামের এই কুরুপাণ্ডব-যুদ্ধের জন্যে অনুরোধ করাইতে হইবে। কৌরবদিগের মধ্যে আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। ৩,০০০ সহস্র রজতমুদ্রা প্রেরিত হইল, এবং উত্তর আসিল —কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতা "স্বার্থ" এক শব্দ কি, তাহা জানিতেন না। মকদ্দমার প্রথম আদালতে জয়ী হইয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববাঙ্গলার একটি মোক্তারের হস্তে সম্যক্ ভার দিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের অন্য কৌশলের মধ্যে একটি কৌশল এই হইয়াছিল যে, এই ব্যক্তিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়াছিলেন এবং মোক্তার মহাশয় "বঙ্গচন্দ্রে"র ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অপলাপ করেন নাই। আপিলের বিচারের দিন কৌরব-পক্ষে তদানীন্তন শীর্ষস্থানীয় কাউনসেল ডইন (Doyne) উপস্থিত ছিলেন; আর আমাদের পক্ষে মোক্তার মহাশয় একটি সদ্যপ্রসূত উকিল মাত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনিও মুখ খুলিয়াছিলেন কি না জানি না।

বিদ্যুতে সংবাদ বহন করিয়া আনিল। পিতৃব্য আমাকে ডাকিয়া তাহা পড়িতে দিলেন। সংবাদ—তাঁহারা মকদ্দমায় জয়ী হইয়াছেন। আমি বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পিতার কাছে সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি সন্ধ্যার সময়ে মহকুমা হইতে সহরে আসিলেন। আমাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কি এ জন্যে দুঃখিত হইয়াছিস্? আমার কি এত কাল কোনও জমিদারি ছিল?" পিতার প্রশ্নে আমার হৃদয় নব স্ফূর্ত্তি সঞ্চারিত হইল। আমি দৃঢ় স্বরে বলিলাম—"না।" পিতা আমাকে বুকে লইয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। আমি যদি একটি রাজ্য হারাইতাম, তাহাও আমার কাছে সে সময়ে তুচ্ছ বোধ হইত।

পরে যখন প্রকাশ হইল—আমাদের মোক্তার বিপক্ষের হস্তগত হইয়া কোনওরূপ তদ্বিরই করে নাই, পিতা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, যে দুই জন দূত কলিকাতায় বিপক্ষ-পক্ষে প্রেরিত হইয়াছিল, এবং বিবাদ নিষ্পত্তি না হওয়া সম্বন্ধে যাহারা প্রধান উদ্যোগী ছিল, তাহাদের নাম করিয়া বলিলেন—"তাহারা যদি এরূপ অন্যায় করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে, ঈশ্বর তাহাদের ভিটিতে দুর্ব্বাগাছটিও রাখিবেন না।' এই ভীষণ অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। তাহাদের ভিটায় আজ দুর্ব্বাগাছটিও নাই।

"হাইকোর্ট"ও ইংরাজরাজ্যে যেরূপ সুবিচার হইয়া থাকে, সেইরূপই করিয়াছিলেন। কয়েকটি অদ্ভুত তত্ত্বও আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিলাম-খরিদ্দার ব্রাহ্মণ, পিতামহ বৈদ্য; হাইকোর্ট স্থির করিলেন, নিলাম-খরিদ্দার তাঁহার কুটুম্ব! পিতামহ কোনও কালে নেকম-মহলের ত্রিসীমার মধ্যে যান নাই। হাইকোর্ট স্থির করিলেন, তিনি নেমকমহলের দারগা ছিলেন! এই অপূর্ব্ব বিচারের প্রতিকূলে বিলাত-আপিলের ভয়ে ধৃতরাষ্ট্র আবার নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলেন। বিলাত-আপিল দুর্ব্যয়সাধ্য বলিয়া পিতা সম্মত হইয়া জমিদারির দুই আনা অংশ মাত্র লইলেন। বলিয়াছি, ইতিপূর্ব্বেই শ্রীভগবান্ ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়ের বিচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অলঙ্ঘ্য ধর্ম্মনীতিচক্রের আবর্ত্তনে পিতা অবশিষ্ট চৌদ্দ আনার মধ্যে নিজের অংশে যাহা পাইতেন, তাহার অধিক শ্রীভগবান্ আমাকে দিয়াছেন। সে কথা স্থানান্তরে বলিব।

আমার পিতা

চাণক্য ঠাকুর বলিয়াছেন—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি
দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে
পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

পঞ্চম বর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত তাড়না,—তাহার জীবন্ত দৃষ্টান্ত আমার উল্লিখিত পিতৃবন্ধু সর্ব্বদাই "সন্তান উৎপাদক" পিতাদিগকে শিক্ষা দিতেন। তিনি বৈঠকখানায় তাঁহার পুত্রদিগকে পদাঘাত করিতেন, আর পাদপদ্মে আঘাতের গুরুত্বনিবন্ধনই হউক, আর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণী শক্তিনিবন্ধনই হউক, তাহারা একেবারে উঠানে গিয়া চিত হইয়া পড়িয়া আকাশ সন্দর্শন করিত। তাহাদের অপরাধ, দেবনাগর অক্ষরের রূপ দর্শন না করিতে করিতেই তাহারা "মুগ্ধবোধে"র ব্যাখ্যা করিতে পারিতেছে না। কিন্তু আমার স্নেহময় পিতা এরূপ শিক্ষাপদ্ধতি শিখিবেন দূরে থাকুক, তাহার ঠিক বিপরীত আচরণ করিতেন। আমার পাঠ্যভ্যাস সম্বন্ধে তিনি একটি ঘোরতর প্রতিবন্ধক ছিলেন। আমি পড়াশুনা করিতেছি কি না, তাহা ত কখন জিজ্ঞাসাই করিতেন না, বরং তাঁহার পরিচিত কেহ যদি তাঁহাকে আসিয়া বলিত—ইঁহারা অনেকে আমার উৎপীড়নে অস্থির ছিলেন—যে, "তোমার ছেলেটি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল, তুমি একবার দৃক্‌পাতও কর না," পিতা সস্নেহনেত্রে আমার দিকে দৃক্‌পাত করিয়া একটুক ঈষৎ হাসিয়া বলিতেন—"পড়াশুনা না করেন, কষ্ট পাইবেন, আমি কিছু রাখিয়া যাইব না।" পিতা ইহা অপেক্ষা গুরুতর তাড়না জানিতেন না। রাত্রি জাগিয়া আমার পড়িবার সাধ্যই ছিল না। তিনি কিছুতেই তাহা দিতেন না। প্রত্যেক শনিবার আমার ঘোরতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইত। তিনি প্রত্যেক শনিবার বাড়ী যাইতেন। একে বাড়ীতে গেলে সোমবারের পড়া প্রস্তুত করিতে পারিতাম না ; দ্বিতীয়তঃ, সোমবার ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইলে আমার স্কুল, তৎসঙ্গে এক দিনের "মার্ক" (mark) মারা যাইত। শনিবার স্কুল হইতে আসিয়া আমি জ্বর হইয়াছে বলিয়া চন্দ্রকুমারের বাসায় শুইয়া থাকিতাম। বাবা কাছারি হইতে আসিয়া লোকের উপর লোক পাঠাইতেন, অবশেষে স্বয়ং উপস্থিত হইতেন। আমি কত আপত্তি করিতাম, চন্দ্রকুমার কত নিষেধ করিতেন, কিন্তু কিছুই মানিতেন না, আমাকে পাল্কিতে পুরিয়া দিতেন। তিনি চন্দ্রকুমারকে বলিতেন—"তোমার পিতা বিদেশে থাকেন বলিয়া তোমরা পিতৃস্নেহ কি, বুঝিতে পার না। আমি তাহাকে বাড়ী না নিলে তাহার মা আমাকে কি বলিবে, এবং আমারই বা মনকে কি প্রকারে প্রবোধ দিব? আমি সোমবার সকালে সকালে আসিব।" একটি মাত্র ঘটনা বলিব। চট্টগ্রামে কাপড় ব্যবসায়ীরা মহা আড়ম্বরের সহিত সরস্বতী দেবীর পূজা করিয়া থাকে। মা সরস্বতীর সঙ্গে তাহাদের কি সম্পর্ক, আমি জানি না। কই, তিনি লোকের সর্ব্বনাশকারিণী প্রবঞ্চনাময়ী-খাতাধারিণী কাপড়ের বস্তাসনা, কিম্বা নিরেট নিরক্ষরতা ও নির্জ্জলা মিথ্যাকথাপ্রসবিনী বলিয়া ত তাঁহার ধ্যানে লেখে না। যাহা হউক, কাপড়ব্যবসায়ী পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ তাঁহাকে বাই খেম্‌টা উপচারে পূজা করিয়া থাকেন। আজ এই উৎসবের মহাষ্টমী। আমার সম্প্রদায়ভুক্ত মহামহোপাধ্যায়গণের শিস্‌ধ্বনিতে নৈশ গগন পরিপূরিত হইতেছে। তাঁহাদের সকলেরই আপাদমস্তক বস্ত্রে আচ্ছন্ন, কেবল পন্থচারিণী ইহুদীয় মহিলাগণের ন্যায় দুইটি নেত্রনীলোৎপল মাত্র দৃষ্ট হইতেছে। তাহার কারণ, সকলেই উচ্চপদবীস্থ ও চিহ্নিত লোকের সন্তান। ভয়—পাছে ধরা পড়িলে টানিয়া নিয়া কেহ মজলিসে বসাইয়া দেয়। সেখানে গুরুজনের ছায়াতে, এবং সাধারণের দৃষ্টির অধীনে, শান্তভাবে বসিয়া হাই তোলা আমরা একটি গুরুতর দণ্ড বিবেচনা করিতাম। হায়! হায়! সেটুকু পরাধীনতাও বালকের প্রাণে সহিত না। পিতা তখন স্থানান্তরে মুন্সেফ ছিলেন ; আমার "চাৰ্জ্জ" মাতুল মহাশয়ের

হস্তে ছিল। উক্ত শিস্‌ধ্বনিতে তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ এক বিকৃতি সঞ্চার করিল। তিনি আমাকে যাইতে দিলেন না। আমি শিসের দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করিলাম। সঙ্গীদিগের ট্রেন চলিয়া গেল। আমি রাগে গর্ গর্ করিয়া শয়ন করিলাম। এমন সময়ে পিতা আসিয়া পঁহুছিলেন। আমি নমস্কার করিতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুই যে তামাসা দেখিতে না গিয়া শুইয়া রহিয়াছিস?" আমি উত্তর দিলাম না। মাতুল মহাশয় বিপদে পড়িলেন। তিনি বলিলেন, তিনি যাইতে দেন নাই। কিন্তু তিনি এরূপে আমার সচ্চরিত্রের রক্ষা করিতে-ছেন বলিয়া পিতা কোথায় তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবেন, না তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া আমাকে আপন হস্তে বিছানা হইতে তুলিয়া যাইতে জিদ করিলেন। আমি তখন সজ্জিত হইয়া, ছিন্ন-শিরস্ত্রাণ মাতুলের প্রতি একটি কটাক্ষ করিয়া নৈশ অন্ধকারে গা ঢালিয়া দিলাম। মাতুল মহাশয় বসিয়া আমার ভবিষ্যৎ গণনা করিতে লাগিলেন।

আর এক দিন। আমাদের অবস্থা দিন দিন বড় মন্দ হইতেছে। পিতা ঋণজালে জড়িত হইতেছেন ; অথচ সেইরূপ অবারিত দান, অবারিত দয়া। তজ্জন্য তাঁহার মাতুলভ্রাতা মহাশয় তাঁহাকে বহু তিরস্কার করিয়া আমাদের ব্যয়ের একটি কড়া হিসাব প্রস্তুত করিতেছেন। অদৃষ্টের এমনি গতি, আমার সেই পিতৃব্য তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি ঋণে হারাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। হিসাব প্রস্তুত হইতেছে ; সকল ব্যয় তাহাতে লিখিত হইতেছে। পিতা নীরবে চিন্তা ও বিষাদে মগ্ন হইয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় গুড়্গুড়ি টানিতেছেন। আমি বলিলাম—"কই, আমার খরচ ত ধরা হইল না " পিতা একটুক কষ্টের হাসি হাসিলেন ; দুইটি চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। আত্মীয় মহাশয় আমাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন— "যাও, বাবা! তুমি এখনও ছেলে মানুষ। তোমার খরচ কি আটকাইবে? তোমার খরচ আমি দিব।" কিন্তু এই তিরস্কার নিষ্প্রয়োজন ছিল। পিতার মুখভঙ্গি দেখিয়া আমি যখন বুঝি-লাম যে, আমি তাঁহার কোমল পুষ্পনিভ হৃদয়ে গুরুতর আঘাত করিয়াছি, আমার আপন হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তাহাতে গুরুতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। আমি উঠিয়া গিয়া একটি বালিসে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমি পিতার মনে আর কখনও কোনও কষ্ট দিই নাই। সেই এক দিনের অনুতাপ এখন যাবৎ আমার হৃদয়ে জাগিতেছে। যদি এক দিন, এক মুহূর্ত্তও পিতাকে সুখী করিতে পারিতাম. তাহার কিঞ্চিৎ শান্তি হইত। পিতৃদেব! তখন বালকের মনে কি ঘোরতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহা দেখিলে—তুমি স্নেহময়,— তাহাকে নিশ্চয় ক্ষমা করিতে। বালক সেই যন্ত্রণা তোমাকে দেখাইতে পারিল না ; তোমার ক্ষমা লাভ করিতে পারিল না। তোমার সেই মনঃকষ্ট তুমি তখনই ভুলিয়াছিলে ; অবোধ বালক বলিয়া মনে মনে ক্ষমা করিয়াছিলে ; কিন্তু বালকের সেই যন্ত্রণা আজীবন নিবিল না।

প্রবেশিকা পরীক্ষা

দেখিতে দেখিতে প্রবেশিকা পরীক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি "বিশ্ববিদ্যালয়"কে যমালয় বলিয়া জানি। "চেনসেলার" স্বয়ং যম ; "রেজেষ্ট্রার" চিত্রগুপ্ত ; "সিণ্ডিকেট" যমদূতসমিতি ; পরীক্ষা "বৈতরণী" ; এবং পরীক্ষকগণ গাভী। তাঁহাদের লাঙ্গুল অব-লম্বন করিয়া এই বৈতরণী পার হইতে হয়। তবে বিভিন্নতা এই, যমালয়ে যাইতে কেবল একটি মাত্র বৈতরণী পার হইতে হয়, আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশ করিতে তিনটি, এবং প্রবেশ করিয়া আরও তিনটি বৈতরণী পার হইতে হয়।

—"Could not onc suffice? Thy shaft flew thrice,
and thrice my peace was slain."

অষ্টম বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া আর দ্বাবিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত কেবল পরীক্ষা।

যমালয় যাইতে হইলে একবার মরিতে হয় ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হইলে, এই দীর্ঘ সময়ে প্রায় প্রতি বৎসর একবার মরিতে হয়। আমি অনেক বার ভাবিয়াছি, অপোগণ্ড কোমলপ্রাণ শিশুর উপর এই অত্যাচার কেন? নিম্নশ্রেণী হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত বৎসর বৎসর পরীক্ষা না করিলে যে কি গুরুতর পাপ হয়, তাহা ত আমি বুঝি না। প্রত্যহ পড়া লইয়া প্রত্যেক বিষয়ে নম্বর দিলেই ত বৎসরের শেষে ছাত্রের কৃতিত্ব বুঝা যায়, এবং শিক্ষকদেরও তাহা অবিদিত নাই। প্রবেশিকার পর আবার একটি "আর্ট" কেন? একেবারে "বি. এ." পর্য্যন্ত বিদ্যার্থী হতভাগ্যদিগকে যাইতে দিলে কি ক্ষতি? ইহাতে "বৃষোৎসর্গে"র কোন্ অঙ্গহানি হয়? উপর্য্যুপরি এই পরীক্ষারূপ শেলাঘাতে দ্বাদশ বার মরিয়া মারিয়া যখন হতভাগ্যগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কবল হইতে মুক্তি লাভ করে, তখন তাহারা প্রাণহীন, উদ্যমহীন, রোগ-জর্জ্জরিত কঙ্কালবিশেষ। এরূপ কঙ্কালে বঙ্গদেশ পরিপূরিত হইতেছে। আমার মতে "মেলেরিয়া" অপেক্ষাও এই "বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যাধি" বঙ্গদেশের অধিক সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে। জানি না, "বিশ্ববিদ্যালয়"-বেদিতে এই অপোগণ্ড শিশুবলিদান আর কত কাল চলিবে!

একে ত এক এক পরীক্ষাতে প্রাণান্ত, তাহাতে আবার সঙ্গে সঙ্গে একটি "নির্ব্বাচনী" পরীক্ষা। একেবারে পরীক্ষা-হাড়িকাঠে নিয়া গ্রীবা নিক্ষেপ কর,—না, তাহা হইবে না। শিক্ষক কসাইরা তাহার পূর্ব্বে একবার "জবাই" করিয়া অর্দ্ধেক রক্ত শুষিয়া লইবেন। যাহা হউক, আমার এই "নির্ব্বাচনী" পরীক্ষা উপস্থিত। বৎসরের প্রথম ৬ মাস আমাদের এক জন বেশ উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার শিক্ষা-প্রণালীও এমন সুন্দর ছিল যে, যদিও তিনি বহু পরিশ্রম করাইতেন, তথাপি আমরা তাহা অনুভব করিতাম না। তিনি স্থানান্তরিত হইলেন ; অশ্রুপূর্ণ-লোচনে আমাদের কাছে বিদায় হইয়া গেলেন। আমিও বিদ্যালয় হইতে এক প্রকার বিদায় লইলাম। অবশিষ্ট ৬ মাস তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তীর মূর্ত্তি আমি প্রায় দেখি নাই। মিথ্যা কথা কেন বলিব—দেখিয়াছিলাম। কারণ, যেটুক সময় ক্লাশে থাকিতাম, আমি "শ্লেটে" তাঁহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি আঁকিতাম। সেই খর্ব্বাকৃতি, চতুষ্কোণ মুখচন্দ্র, স্ফীত মহোদর, তাহাতে স্থানে স্থানে বাম করে করাঘাত,—মূর্ত্তিখানি আমার কাছে একটি রহস্যের ভাণ্ডার বলিয়া বোধ হইত। তিনি লোক অনুপযুক্ত ছিলেন না,—অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তবে মনের ভাব বিশদরূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। কিছু জিজ্ঞাসা করিলে "গুচ গুচ" (goose goose) করিয়া খর্ব্ব বাম হস্তে উদরাঘাত করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন।

পড়াশুনা না করিবার আর এক কারণ ছিল। পিতা বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এ বৎসর আমার পরীক্ষা দেওয়া হইবে না। তাঁহার ভয়, পাছে পাশ হইয়া বিদেশে পড়িতে যাই। নির্ব্বাচনী পরীক্ষা নিকট হইলে আমি শিক্ষক মহাশয়কে কবুলে জবাব দিলাম যে, আমি পরীক্ষা দিব না। তিনি আমাকে কঠোর কণ্ঠে গুচ্ গুচ্ করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি আলস্যপরতন্ত্র হইয়া অসম্মত হইতেছি। শেষে বলিলাম, পিতা নিষেধ করিয়াছেন। তিনি একেবারে পিতার কাছে উপস্থিত হইলেন, এবং "ধন্যা" দিয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন, [illegible] তিন জন ছাত্র নিম্নতম শ্রেণী হইতে পারিতোষিক পাইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে আ[illegible] জন। বোধ হয়, এ জন্যে আমার উপর তাঁহার কিঞ্চিৎ আশা ছিল। পিতা ঘোরতর [illegible]পত্তি করিলেন। অবশেষে তিনি যখন বুঝাইয়া দিলেন যে আমাকে বিদেশে যাইতে দেওয়া না [illegible]দেওয়া পিতার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, তখন পিতা বলিলেন—"আচ্ছা, পরীক্ষা দিক, কিন্তু বিদেশে যাইতে পারিবে না।"

"নির্ব্বাচনী" পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বলিতে হইবে না যে, আমি কি পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিলাম। তাহাতে আমাদের তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় আমার রন্ধ্রগত শনি হইলেন। ইনি একজন তরুণবয়স্ক যুবক ; শিক্ষকদিগের মধ্যে "নেপোলিয়ান বোনাপার্টি" ; ধরাকে সরা জ্ঞান

করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার মত বিদ্বান্ পৃথিবীতে কেহ পদার্পণ করে নাই। তিনি "কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাস।" বক্তৃতায় স্বয়ং "ডিমসথেনিস।" প্রতি শনিবার আমাদের একটি সভা হইত। যদিও চাটগেঁয়ে কথা বাঙ্গালাই নহে, তথাপি আমি আশৈশব পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার ঘোরতর বিদ্বেষী ছিলাম। তিনি আসল পীঠস্থান শ্রীপাট বিক্রমপুরের লোক। অধরোষ্ঠ আকণ্ঠ আকর্ষণ করিয়া, এবং প্রত্যেক কথায় সপ্ত স্বর প্রয়োগপূর্ব্বক উদারা হইতে মুদারা পর্য্যন্ত টানিয়া আমাদিগের উপর বিক্রমপুরী রসিকতা বর্ষণ করিতেন। আমি সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র অভিমন্যুর মত সুদ সমেত প্রতিঘাত করিতাম বলিয়া, তিনি দু চক্ষে আমাকে দেখিতে পারিতেন না। তিনি শিক্ষকদিগকে বলিলেন যে, আমি একজন "পাকা নকলনবীশ।" অতএব আমার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খোঁড়া পণ্ডিত মহাশয় এই সংগ্রামে তাঁহার লেফ্‌টেনেণ্ট হইলেন। তিনিও পূর্ব্ববঙ্গবাসী,—প্রধান শিক্ষক সকলেই তাই। তাঁহার সানুনাসিক উচ্চারণের আমি কিঞ্চিৎ নকল করিতাম বলিয়া, আধুনিক "পাইওনিয়ারে"র মত তিনিও এই নকলনবীশের উপর বড় বিরক্ত ছিলেন। আমার সম্মুখে. বেঞ্চের অপর দিকে একখানি চেয়ার রক্ষিত হইল, এবং উভয়ে পালা করিয়া সেখানে বসিতে লাগিলেন। আমার তাহাতে আমোদ বাড়িল। আমরা দুই তিন জন পরামর্শ করিয়া বন্দুকের ছড়্‌রা পকেটে করিয়া নিতাম, এবং তাহা কাগজে পুরিয়া পরীক্ষাকক্ষের সীমা হইতে সীমান্তরে নিক্ষেপ করিতাম। তৃতীয় শিক্ষক এবং পণ্ডিত মহাশয় মনে করিলেন, একে অন্যের কাছে এরূপে প্রশ্নের উত্তর চাহিতেছে, এবং সেই গুলি লুফিতে লাগিলেন। কিছু কাল এরূপ নৃত্যের পর আর একবার আর একটি গুলি পণ্ডিত মহাশয় লুফিতে যাইতেছেন. দুর্ভাগ্যবশতঃ পাদেকের খর্ব্বতানিবন্ধন পড়িয়া গেলেন। হাস্যধ্বনিতে পরীক্ষাগৃহ নিনাদিত হইল। পণ্ডিত মহাশয় পরাজয় স্বীকার করিয়া সে অবধি রণে ভঙ্গ দিলেন। কিন্তু তৃতীয় শিক্ষক মহাশয় ছাড়িবার লোক নহেন। এক দিন বড় জ্বালাতন করিতে লাগিলেন। আমি কি উত্তর লিখিতেছি, তিনি তাহা বেঞ্চের অপর দিকে আমার সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছেন, এবং মধ্যে মধ্যে পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে গিয়া রসিকতা করিতেছেন। আর একবার এরূপে গলা বাড়াইয়া পড়িতেছেন. আমি ঘাড় হেঁট করিয়া লিখিতেছি। আমার দক্ষিণ চরণ দেখিলেন বড় সুযোগ। তিনি শিক্ষক মহাশয়ের উদরদেশে আশী সিক্কা ওজনের একটি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। উদরস্থ বিক্রমপুরী রসিকতারাশি দারুণ যন্ত্রণায় তোল-পাড় করিয়া উঠিলে, তিনি যেমন উঠিলেন, আমি অমনি গলবস্ত্র হইয়া বলিলাম—"beg your pardon sir"; আমি পা নাড়িতেছিলাম, সার "(sir)" যে এত নিকটে, তাহা আমি জানিতাম না।" আর বাক্য ব্যয় না করিয়া,—বোধ হয়, করিবার শক্তিও ছিল না,—"সার" একেবারে পেটে হস্ত দিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। পরদিন রথ (চেয়ার) খানিও স্থানান্তরিত হইল।

প্রবেশিকা-বিভীষিকা

নির্ব্বাচনী পরীক্ষা শেষ হইল। আমি কোনো বিষয়ে পূর্ণচন্দ্র, কোনো বিষয়ে বা তাহার কলাংশ প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও হেড মাষ্টার মহাশয়ের মন উঠিল না। তিনি আমাকে প্রবেশিকা পরীক্ষার হাড়িকাঠে নিক্ষেপ করিতে কৃতসংকল্প। কিন্তু পিতা তাহাতে সম্মত হইবেন কেন? শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে আবার অনেক বুঝাইলেন। অবশেষে পিতা শিক্ষক মহাশয়কে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তিনি আমাকে কলেজে যাইয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে পরামর্শ দিবেন না। শিক্ষক মহাশয় প্রতিশ্রুত হইলেন এবং আমাকে বলিদানের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া রাখিলেন।

জানিতাম, পিতা পরীক্ষা দিতে দিবেন না। আমি সম্বৎসর যাবৎ কিছুই পড়ি নাই। এমন কি, বড় একখানি শিক্ষক মহাশয়ের মুখচন্দ্র পর্য্যন্তও দেখি নাই। যদি কদাচিৎ দেখিয়াছি, তবে ক্লাসে বসিয়া তাহার ছবি আঁকিয়াছি। সম্মুখে শারদীয় দীর্ঘ অবসর। পরীক্ষা দিতে হইবে বলিয়া তাহার ত অপব্যয় করা যাইতে পারে না। শুভ দশমীপ্রভাতে একবার পাঠ্য পুস্তকসকলের সঙ্গে সম্ভাষণ করিলাম। তাঁহাদের প্রায় অস্পৃষ্ট নূতনত্বে নয়ন জুড়াইয়া গেল। অবশিষ্ট অবসরকাল পাখী মারিয়া, দীঘি সাঁতরাইয়া এবং এই প্রকার নানাবিধ অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে অতিবাহিত করিলাম। স্কুল খুলিল ; পরীক্ষার দু মাস মাত্র বাকি। কিন্তু স্কুলের সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হইল না। একে ত সময় অল্প ; তাহাতে পিতার দৃঢ় আদেশ, যেন রাত্রি জাগিয়া না পড়ি। সমস্ত দিন মুখস্থ করিতাম। সন্ধ্যার পর আহার করিয়া শয়ন করিতাম। পিতা সমস্ত রাত্রি পূজা করিতেন। পূজা করিতে যাইবার সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ঘুমাইতাম। তিনি পূজায় বসিলে আমি আবার মুখস্থ আরম্ভ করিতাম। রাত্রি ৪টার সময়ে পিতা যখন পূজান্তে ভক্তিপূর্ণ গীতধ্বনিতে নীরব গৃহ প্লাবিত করিতেন, আমি দীপ নির্ব্বাণ করিয়া শুইতাম। পিতা আহার করিতে যাইবার সময়ে আমার মাথায় জপ করিয়া শির চুম্বন করিয়া যাইতেন। মনে করিতেন, আমার ঘোর নিদ্রা। তিনি আহারান্তে শয়ন করিবামাত্র ফরসির শব্দ বন্ধ হইলে আমি আবার মুখস্থকার্য্য আরম্ভ করিতাম। মুখস্থ, মুখস্থ, দিবা রাত্রি মুখস্থ! বিশ্ববিদ্যালয়ের বীজমন্ত্র—"মুখস্থ!" ইহাতে যথোচিত দীক্ষিত হইয়া পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইলাম। আমি, চন্দ্রকুমার এবং জগবন্ধু—আমাদের তিন জনের স্থান বিশাল কক্ষের তিন বিপরীত কোণায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলিতে হইবে না, এই বন্দোবস্ত পণ্ডিত এবং তৃতীয় শিক্ষক মহাশয়ের statesmanship, কৌশলনীতি। পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যেও আমি তাঁহাদিগকে লইয়া কিঞ্চিৎ আমোদ করিতাম। কখনও বা সন্দিগ্ধ ভাবে অঙ্গসঞ্চালন করিতাম, আর তাঁহারা উভয়ে তীব্র বেগে ছুটিয়া আসিয়া আমার 'খানা তালাশি' করিতেন। মেজ পরীক্ষা করিতেন, কখন বা অঙ্গ টিপিতেও ত্রুটি করিতেন না। কখনও বা আমি জগবন্ধুর দিকে চাহিয়া হাসিতাম, কাশিতাম,—তাঁহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিতেন, এবং আমাদিগকে এই অশিষ্টাচারের জন্য যথোচিত ভর্ৎসনা করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে ওই হাসিতে কাশিতে আমরা কোনও প্রশ্নের উত্তর বলা কহা করিতেছি। মিথ্যা কথা বলিব না ; হাসি কাশি নহে ; একদিন অঙ্গুলিসঙ্কেতে জগবন্ধু হইতে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার তারিখ জানিয়া লইয়াছিলাম। তাঁহারা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু —"সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা, কেমনে বুঝিব নর বানরের কথা"—কিছুই বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। তবে পরীক্ষাগৃহে ঐরূপ করসঞ্চালনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা পরীক্ষার দিন আমাকে এবং জগবন্ধুকে রসিকতা করিয়া বলিলেন —"আমাগোরে দিলা না কেন্? আমরা শুদ্ধ কর্যা লেখ্যা দিতাম।" জগবন্ধু কিছু রোখাল ছিল। ইহার আশী সিক্কা হিসাবে একটা উত্তর দিল।

প্রথম অনুরাগ

"শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল।
শ্রবণক পথ দুঁহু লোচন নেল॥
বচনক চাতুরী লহু লহু ভাষ।
ধরণীতে চাঁদ ভেলত পরকাশ॥"

প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হইল। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। শেষ দিন যখন পরীক্ষার

গৃহ হইতে বাহির হইলাম, বোধ হইল—হৃদয়ে যেন একটি নবীন উৎসাহ, শরীরে যেন একটি নবীন জীবন সঞ্চারিত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কথা যখন মনে করি, তখন আমার আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে—বলিদান। অজশিশুগুলিকে প্রক্ষালন করিয়া আনিল। পরীক্ষার ফিস দাখিল হইল। ছাগল চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—বালক অনাহার অনিদ্রায় রাত্রি জাগিয়া চীৎকার করিয়া পড়িতে লাগিল। ছাগলের ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা এবং গলায় বিল্বপত্রের মালা অর্পিত হইল,—বালকের "নমিনেশন রোল" পঁহুছিল। ছাগল তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে হাড়িকাষ্ঠে নিক্ষিপ্ত হইল,—বালক কাঁপিতে কাঁপিতে পরীক্ষাগৃহে দাখিল হইল। তাহার পর উভয়ের বলিদান। তারতম্যের মধ্যে এই—ছাগল তখনই মরে, সকল যন্ত্রণা শেষ হয়। বালক যাবজ্জীবনের জন্যে আধমরা হইয়া থাকে, তাহার যন্ত্রণা আরম্ভ মাত্র হয়।

যাহা হউক, বলিয়াছি প্রবেশিকা শেষ হইল : শরীরে নবীন জীবন, নবীন উৎসাহ প্রবেশ করিল ; প্রকৃতি নবীন সৌন্দর্য্যে হাসিল। হৃদয় হইতে কি একটি পাহাড় নামিয়া গিয়া হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। নানা আনন্দে আমরা দলে দলে গিরিশৃঙ্গের উপত্যকায় এবং নির্ঝরের ধারে বেড়াইতে লাগিলাম। কখন কখন প্রশ্নের কাগজ খুলিয়া যে যে প্রকার উত্তর দিয়াছি, সেরূপ নম্বর ধরিতাম, কিন্তু কিছুতেই "পাশ মার্ক" কুলাইয়া উঠিত না।

বিদ্যুৎ আমার কোনও দূর আত্মীয়ার কন্যা। তাহার ভ্রাতা আমাদের সঙ্গে পড়িত। দিনরাত্রি আমরা প্রায় একসঙ্গে পড়িতাম, খেলিতাম ; কখন কখন ঝগড়া করিতাম। বিদ্যুৎ তখন ক্ষুদ্র বালিকা—চঞ্চলা, মুখরা, হাস্যময়ী। বিধাতার হস্তের একটি অপরূপ একমেটে প্রতিমা। যখন সে তাহার নাতিদীর্ঘ কুঞ্চিত অলকরাশি দোলাইয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া যাইত দেখিতাম, তখন সে শত ত্যক্ত করিয়া গেলেও তাহাকে মারিতে ইচ্ছা হইত না ; সেও আমাদিগকে বিরক্ত করাটি একরূপ বিজ্ঞানশাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভ্রাতা আমাদের অপেক্ষা ভাগ্যবান্। যখন বিদ্যুৎ সপ্তম, কি অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা, সে একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সে ভাবী সংসারযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করে। তদবধি আমি আর তাহার গৃহে বড় একটা যাইতাম না : গেলে মনে কি যেন দুঃখ, হৃদয়ে কি যেন এক অভাব বোধ হইত। ৪ কি ৫ বৎসর চলিয়া গিয়াছে, প্রবেশিকা পরীক্ষার পর এক দিন, বিদ্যুতের মাতা আমাকে ডাকিলেন। আমি অপরাহ্নে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে কথা কহিতেছি, পাশে ও কে ধীরে ধীরে কোমল পদবিক্ষেপে আসিয়া বসিল? বিদ্যুৎ! কি চমৎকার পরিবর্ত্তন! যে বালিকা ছুটিয়া, বাতাসে কুন্তলের কুঞ্চিত অলকাবলি এবং অঞ্চল উড়াইয়া ভিন্ন চলিতে পারিত না, সে আজি ধীরে ধীরে কোমল পাদক্ষেপে,—পায়ের নীচে ফুলটি পড়িলেও নমিত হইত না,—এরূপ অলক্ষিত ভাবে আসিয়া বসিল। যাহার হাসি ও কণ্ঠ বাঁশীর মত অনবরত বাজিত, আজি তাহার সে তরঙ্গায়িত অধরবিপ্লাবী হাসি, কমলাভ অধরপ্রান্তে বিলীনপ্রায় হইয়া কি এক অস্ফুট ভাব ও শোভা বিকাশ করিতেছিল! কণ্ঠ নীরব। যে কখনও গলা জড়াইয়া ধরিয়া অংসে উরসে ভিন্ন বসিত না, কি আশ্চর্য্য, আজি তাহার সঙ্গে চোখে চোখে দেখা হইলে, সে চোখ নামাইয়া লইতেছে ; আমি অন্য কাহারো সঙ্গে কথা কহিতে, সে তাহার কমলদলায়ত দুই ভাসা চক্ষু আমার মুখের দিকে স্থির ভাবে স্থাপিত করিয়া অতৃপ্তভাবে চাহিতেছে। কি দৃষ্টি! কি অর্থ! কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে কল কণ্ঠে কাকলি বর্ষণ না করিয়া থামিত না, সে আজি ঈষৎ হাসিয়া নিরুত্তরে অধোমুখে চাহিতেছে।

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মে বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।

কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখী সা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥"—শকুন্তলা।

আমারও হৃদয়ে কি একটি ভাবের উদয় হইতেছিল, আমি বড় বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমারও সেই মুখখানি বড় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছিল, অথচ নয়ন ভরিয়া দেখিতে পারিতেছিলাম না। কে যেন চোখ ফিরাইয়া দিতেছিল। চোখে চোখে দেখা হইলে কি যেন একটি কোমল কুসুম-স্পর্শ মৃদু-মধুর আঘাত হৃদয়ে পঁহুছিতেছিল। সেখান হইতে যে উঠিতে পারিতেছিলাম না, সে কথা আর বলিতে হইবে না। বসিতে বসিতে সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ রাত্রি হইল। অবশেষে উঠিলাম; আত্মহারাবৎ চলিয়া যাইতেছিলাম, অন্ধকারে বারান্ডা পার হইতে বক্ষে কি লাগিল? আমি এক পা পিছাইলাম, কিন্তু আবার সে কুসুমস্তবকনিভ স্পর্শ হৃদয়ে লাগিল—আহা! কি স্পর্শ! বুঝিলাম, আমার বুকে মাথা রাখিয়া বিদ্যুৎ। অজ্ঞাতে আমার দুই ভুজ তাহাকে আরো বুকে টানিয়া ধরিল। আমার সমস্ত শরীরের যন্ত্র কি এক অমৃতে আপ্লুত হইয়া নিশ্চল হইল। বালিকা আমার করে একটি গোলাপফুল দিল। আমি তাহার ললাটে একটি চুম্বন দিয়া উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে গুরু ঠাকুর চন্দ্রকুমারের কাছে ঊর্ধ্বশ্বাসে উপস্থিত হইলাম। গুরু মহাশয় আমাকে যথাশাস্ত্র বুঝাইয়া দিলেন যে, বিদ্যুতের সঙ্গে আমার বিবাহ হইতে পারিবে না। অতএব সেখানে আর যাইতে আমাকে নিষেধ করিলেন।

কলিকাতা যাত্রা

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইল। তাহাতে আমি বিস্মিত; দেশশুদ্ধ লোক তটস্থ হইল। যে ছেলের জেঠামিতে এবং দুর্বৃত্তিতে একখানি নূতন কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ড রচিত হইতে পারিত, সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইল, কথাটি কেহ বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তিও সাধারণ প্রতিযোগিতার উপর নির্ভর করিত। চন্দ্রকুমার এবং জগবন্ধুও দ্বিতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিল। পিতা শুনিয়া একটুক হাসিলেন, পরক্ষণে অশ্রুপাত করিলেন। হাসিলেন—আমি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছি। কাঁদিলেন—পাছে আমি বিদেশে পড়িতে যাইতে চাহি। তাহার পর যখন শুনিলেন যে, আমি বড় রাত্রি জাগিয়া পরিশ্রম করিয়াছিলাম, তখন মহা-বিরক্ত হইয়া আমাকে তিরস্কার করিলেন। যদি কেহ আমাকে কলেজে পড়িতে পাঠাইবার কথার উল্লেখ মাত্র করিত, বাবা তাহাকেও ন ভূত ন ভবিষ্যতি তিরস্কার করিতেন। ঐ হৃদয়ের তুলনা কি জগতে আছে?

একে ত পিতার হৃদয়ের ভাব এরূপ, তাহাতে আবার পিতৃব্য ধৃতরাষ্ট্র মহাশয় কূট সাংসারিক যুক্তির দ্বারা তাহা দৃঢ়তর করিতে ব্রতী হইলেন। তিনি পিতাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, পিতার অবস্থা মন্দ, তিনি তাহার উপর আবার আমার কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাসের ব্যয় কি প্রকারে নির্ব্বাহ করিবেন! অপিচ যদি আমি ২০ টাকারও একটি চাকরি করি, তবে তাহা বৎসরে ২৪০, ১০ বৎসরে ২৪০০ হইবে। তাহাতে পিতার অমোঘ সাহায্য হইবে। তাঁহার এই যুক্তির কারণ তিনি এক দিন খুলিয়া বলিয়াছিলেন। আমার কলেজে অধ্যয়নকালে পিতা ঋণে জড়িত হইয়াছেন। পিতৃব্য তাঁহার পিতার ধর্ম্মরক্ষার্থে যে সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, পিতা তাহা তাঁহার কাছে আবার বন্ধক রাখিতেছেন। পিতৃব্য মহাশয় বন্ধকনামার লেখা লইয়া বড় কচকচি এবং মুনসিয়ানা আরম্ভ করিয়াছেন। পিতা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এত বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। তখন পিতৃব মহাশয় অকাতরে বলিলেন —"তোমার সঙ্গে আমি মকদ্দমা করিয়া জিতিয়াছি। তোমার পুত্র যেরূপ উপযুক্ত হইতেছে,

আমি যদি লেখায় আঁটাআঁটি করিয়া না যাই, আমার পুত্র তাহার সঙ্গে পারিবে কেন?" আমি কাছে বসিয়া ছিলাম; দেখিলাম, পিতার মুখ মলিন হইল। তিনি গভীর মনঃকষ্টে নীরব হইয়া রহিলেন। তবে পিতৃব্য মহাশয় অন্ধ।

যাহা হউক, পিতা সেই ২০ টাকার যুক্তির মাহাত্ম্য বড় একটা বুঝিলেন না। যে শত ২০ টাকা প্রত্যেক মাসে অকাতরে দান করিয়াছে, তাহার তাহা না বুঝিবারই কথা। তবে তাঁহার একমাত্র আপত্তি—আমাকে বিদেশে পাঠাইতে হইবে। আমার সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রকুমারের পিতা সে সময় দেশে আসিলেন। তাঁহার উপর্য্যুপরি ভর্ৎসনায় পিতা অগত্যা আমাকে কলিকাতা পাঠাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহার পর আমি যত দিন দেশে ছিলাম, আমার পিতার অশ্রুজল থামিল না। মাতা আমার এরূপ সরলা ছিলেন যে তিনি ১ হইতে ১০ পর্য্যন্তও গণিতে পারিতেন না। পরীক্ষা, ছাত্রবৃত্তি, কলেজ, তিনি এ সকল কথা বুঝিবেন দূরে থাকুক, উচ্চারণও করিতে পারিতেন না। অতএব তিনি এত দিন নিশ্চিন্ত ছিলেন। যখন কলিকাতা যাইবার আয়োজন হইতে লাগিল, তখন মা বুঝিলেন যে, বিষয়টা কি। তখন পিতার অশ্রুস্রোতে তাঁহার অশ্রুস্রোতও যোগ দিল। আমি ভাগ্যবান্; এই পবিত্র স্বর্গসম্ভূতা গঙ্গা যমুনার সম্মিলিত স্রোতে পবিত্র হইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। শুধু এবার বলিয়া নহে, আমি কলেজের অবসরসময় যখনই বাড়ী আসিতাম, ফিরিবার ৭ দিন পূর্ব্বে তাঁহাদের সম্মুখীন হইতাম না। আমাকে দেখিলেই নীরবে তাঁহাদের অশ্রু প্রবাহিত হইতে থাকিত। যখনই স্মরণ হয়, আমার বোধ হয়, যেন সেই পবিত্র অশ্রুধারা এখনও তাঁহাদের মুখ বাহিয়া আমার মস্তকে ও মুখে পড়িতেছে। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে কি তাহার এক বিন্দুরও প্রতিদান করিতে বিধাতা আমার অদৃষ্টে লিখিয়াছিলেন না?

বাষ্পীয় পোত প্রস্তুত। ঘনকৃষ্ণ বাষ্পরাশি স্তম্ভাকারে বাষ্পপ্রণালী হইতে গগনপথে উত্থিত হইতেছে। পিতা আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমিও সেই স্নেহ-স্বর্গে মুখ লুকাইয়া বালকের কোমল প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। দৃশ্যে জাহাজের শ্বেত কর্ম্মচারিগণের পর্য্যন্ত চক্ষু ভিজিয়া আসিল। জাহাজ খুলিতেছে। চন্দ্রকুমারের পিতা আমাকে বলপূর্ব্বক সরাইয়া পিতাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"তুমি নবীনের মা না বাপ?" পিতা আমার উভয়।

জাহাজ খুলিল। আমি সপ্তদশ বৎসর বয়সে বিদেশ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। জীবন-কাব্যের তৃতীয় অধ্যায় খুলিল।

কলিকাতা

জাহাজ খুলিল। দেখিতে দেখিতে সমুদ্রে পড়িল। দেখিতে দেখিতে জন্মভূমি সাগরপ্রান্তে চিত্রবৎ ভাসিতে লাগিল। কালেজের অবসরসময়ে একবার বাড়ী আসিতে এই দৃশ্যটি তখনকার একটি কবিতায় এরূপ চিত্র করিয়াছিলাম স্মরণ হয়;—

"দেখিলাম ওই মোহন শ্যামল মূরতি,—
সজ্জ পল্লব-বসনে,
সুন্দর অচল ব্যূহ, ধবল কিরীটি সহ,
দেখিতেছে মুখ-কান্তি সাগর-দর্পণে।
ভাবিনু মা বুঝি করি উন্নত বদন,
দেখিছেন আসে কি না দীন বাছাধন।"

দেখিতে দেখিতে সেই সৌধশীর্ষ-গিরিমালা-সজ্জিত চিত্র সমুদ্রপ্রান্তে মিশাইয়া গেল।

তখন কেবল অনন্ত সমুদ্র! আকাশ বিশাল নীল কটাহের মত সমুদ্র ঢাকিয়া রহিয়াছে। সমুদ্র প্রথম সমল শ্বেত, ক্রমে পীত, ক্রমে নীল ক্রমে নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল। তখন কেবল উপরে সেই নীল আকাশ, নীচে সেই ঘননীল পারাবার। সেই অমল নীল বক্ষ কাটিয়া, সেই নীলিমায় অমল শ্বেত পুষ্পনিভ ফেনরাশি বিকীর্ণ করিয়া, গর্ব্বভরে আমাদের জাহাজ চলিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য সেই সিন্ধুগর্ভ হইতে উঠিতেছে, আবার সেই সিন্ধুগর্ভে ডুবিতেছে। যখন প্রথম এই অনন্তের মুখ দেখিলাম, তখন হৃদয়ে কি এক গভীর ভাব উদয় হইল, তাহাতে কি এক নূতন জগৎ খুলিয়া গেল! যে সমুদ্র দেখে নাই, ইহাতে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখে নাই ; সূর্য্যকিরণতলে ইহার উচ্ছ্বাসপূর্ণ লহরীমালার গম্ভীরত্ব, এবং ফুল্ল চন্দ্রকরে ইহার অনন্ত হাস্য দেখে নাই ; যে ইহার শান্ত এবং ঝটিকা-বিলোড়িত সৃষ্টিসংহারকারী মূর্ত্তি দেখে নাই ; তাহার মানবজন্ম বৃথা।

দুই দিন এই অনন্তের কোলে ভাসিয়া আমি এবং চন্দ্রকুমার তৃতীয় দিন গোধূলি সময়ে কলিকাতায় পঁহুছিলাম। আমাদের পূর্ব্বে কলিকাতায় চট্টগ্রামের কেহ কখনও বিদ্যার অন্বেষণে যায় নাই। অতএব কলিকাতা এ সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে এক প্রকার অনাবিষ্কৃত দেশ। চট্টগ্রামের প্রতিষ্ঠাভাজন সব্‌জজ হরগৌরী বাবু পিতার পরম বন্ধু। তাঁহার একটি আত্মীয় আমাদিগের পাণ্ডা। কলিকাতার পর্ব্বতাকৃতি জাহাজের বিশাল অরণ্য ভেদ করিয়া আমাদের জাহাজ শেষে ঘন ঘর্ঘর শব্দে ভাগীরথী-বক্ষ শব্দায়িত করিয়া থামিল। পাণ্ডা মহাশয় আমাদিগকে গঙ্গাতীরে একটি কাষ্ঠ ও খড়নির্ম্মিত দ্বিতল গৃহে নিয়া দাখিল করিলেন। পাণ্ডা মহাশয় আমাদিগকে কলিকাতা সম্বন্ধে অনেক 'রূপকথা' বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গৃহে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ কাষ্ঠরাশিতে, এবং অননুভূত-পূর্ব্ব সৌরভে, তাঁহার গল্পের উপর আমাদের বড় অবিশ্বাস হইল। এই কি সেই কলিকাতা?

এই অপরূপ স্থানে রাত্রিবাসের পর পাণ্ডা মহাশয় আমাদিগকে কলিকাতা লইয়া চলিলেন। তবে তাঁহার গৃহ কলিকাতা নহে,—মনে কিঞ্চিৎ আশা হইল। কিন্তু যাইতে যাইতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে ঘোরতর আতঙ্ক এবং ঘৃণা হইতে লাগিল। সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় সেই অট্টালিকা-তরঙ্গ দেখিয়া মনে আতঙ্ক উপস্থিত হইল, এবং পঞ্চরঙ্গ অনাঘ্রাতপূর্ব্ব গন্ধে ঘ্রাণেন্দ্রিয় দেশে রাখিয়া আসিলে ভাল হইত বলিয়া বিবেচনা হইতেছিল। যদিও এতদুভয় সম্পর্কে কলিকাতার প্রতিষ্ঠা এখনো অটুট রহিয়াছে, তথাপি অন্যান্য বিষয়ে সে কালের কলিকাতায় এবং এ কালের কলিকাতায় কত প্রভেদ! উড়ে বারিবাহকগণ কলিকাতাবাসীদিগের ভগীরথ। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে গঙ্গা আনিতেন। তাহা জল, কি কর্দ্দম, স্থির করা বড় কঠিন কথা ছিল। শুনিয়াছিলাম, কর্দ্দমের বড় উর্ব্বরতাশক্তি আছে। কলিকাতার তৈলাক্ত মোটা অথর্ব্ব মানব-সৃষ্টিগুলি দেখিয়া আমাদের তাহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনওরূপ সংশয় রহিল না। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন "Extremes meet"। কলিকাতা এখনও তাহার জীবন্ত সঙ্গমস্থল।

হরগৌরী বাবুর অন্যতম আত্মীয় সিংহ মহাশয়ের দৌলতখানা পটুয়াটোলা লেনে। তিনি সেই লেনে আমাদের জন্যে একটি সামান্য দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেখানে আমাদিগকে অধিষ্ঠিত করিলেন। সিংহ মহাশয়ের একটি পা পরিমাণে কিঞ্চিৎ কম ছিল। তিনি যখন হুঁকা হস্তে করিয়া আমাদের অভিভাবকত্ব করিতে আসিতেন, আমি মনে করিতাম, 'নোটবুক' হস্তে মুন্সী সাহেব! কিন্তু তিনি লোক ভাল ছিলেন ; আমাদের বড় যত্ন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে তির্য্যগ্‌গতিতে গম্ভীরভাবে পাদচারণ করিতে করিতে আমাদিগকে কলিকাতার অনেক রহস্য শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একটি অপরূপ কালো জিনিস ছিল। তিনি তাহাকে তাঁহার পোষ্যপুত্র বলিতেন। আমাদিগের হস্তে

তাহার শিক্ষকতার ভার দিলেন। কিন্তু বোধ হয়, তাহার বর্ণ এবং অবয়ব মা সরস্বতীর ঠিক বিপরীত বলিয়া তিনি তাহার প্রতি প্রসন্না হইলেন না।

প্রেসিডেন্সি কলেজ

"বাসার সংসার" হইলে "আশার সংসারে" চলিলাম। কলেজে ভর্ত্তি হইতে গেলাম। "যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত হয়।" প্রথমেই খ্যাতনামা অধ্যাপক রিজ (Recs) সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁহার সেই দীর্ঘকালোটুপিশীর্ষ দীর্ঘ দেশীয় ফিরিঙ্গিমূর্ত্তি, তাঁহার সেই মসৃণ ক্ষৌরীকৃত মুখভঙ্গি, তাহাতে সেই বিশ্বনিন্দুক ঈষৎ হাসি, তাঁহার চারি দিকে মদিরাগন্ধে মুগ্ধ মাছিগণের বিহার, তাঁহার সেই বাক্যপ্রবাহের বৈদ্যুতিক গতি, অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার সেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, তাঁহার ছাত্রগণের হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া থাকিবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ যেমন কুকুর, রিজ মহোদয় তেমনি মুগুর। তিনি একসঙ্গে তিন সেক্সনে (section) অঙ্ক কষাইতেন অথচ ভয়ে তিনটি শ্রেণীই নীরব। তিনি যে সকল অঙ্ক কষিতে দিতেন, গর্ব্ব করিয়া বলিতেন যে, তাহা অনায়াসে কষিতে পারে, ভারতবর্ষে এমন লোক নাই। এরূপ দুরূহ অঙ্ক ছাত্রদিগকে দেওয়ার কারণ কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন যে স্পার্টানদিগকে সর্ব্বদা গুরুতর ভারি অস্ত্রের দ্বারা শিক্ষা দেওয়া হইত, যেন রণক্ষেত্রে লঘু অস্ত্রে তাহারা অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। তিনি পরীক্ষামন্দির ছাত্রদের যুদ্ধক্ষেত্র বলিতেন। মাদক-প্রিয়তা নিবন্ধনী তিনি অবশেষে কর্ম্মচ্যুত হন। কটকে এক দিন মাত্র তাঁহার সঙ্গে আমার কলেজ ছাড়িবার পর সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়াছিল।

কলেজে প্রবেশ করিতেই তাঁহার হস্তে পড়ি। আমাদিগকে দেখিবা মাত্র তাঁহার কথার রেলগাড়ী ছুটিল। মুহূর্ত্তে দুই হাজার প্রশ্ন হইল। চট্টগ্রাম হইতে গিয়াছি শুনিয়া কত রসিকতাই করিলেন। আমরা বাক্যের বিদ্যুৎপ্রবাহে তটস্থ। ছাত্রগণ চারি দিকে হাসিতেছে। পাঁচ মিনিট কাল এরূপে উৎপীড়িত করিয়া নাম লিখিলেন। গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া আমরা সর্ব্বশেষের একখানি বেঞ্চে বসিলে, সূর্য্য জিজ্ঞাসা করিল—"সাহেবের বিলাত তোমাদের দেশে না?" সূর্য্যকুমার মিত্রর বাড়ী বর্দ্ধমান, তাহার গলা বড় মিষ্ট; তাহার কথা বড় মধুর।* এই উৎপীড়নের পর তাহার কথা যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। তাহার স্নেহে যেন হৃদয় ভরিয়া গেল, কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। সে সেই দিন হইতেই আমাদের বড় যত্ন করিতে লাগিল। কলেজের পর সঙ্গে করিয়া তাহার বাসায় নিল। বলা বাহুল্য যে, সেটি বর্দ্ধমানী আড্ডা। আমরা চাটগেঁয়ে ছেলে বলিয়া সকলেই বড় আদর করিল। সূর্য্য সঙ্গে করিয়া, উদ্দেশ করিয়া আমাদের বাসায় নিয়া রাখিয়া আসিল। বলা বাহুল্য তাহা না হইলে খুঁজিয়াই পাইতাম না। কত দিন রাস্তা ভুলিয়া ঘোল খাইয়া বেড়াইয়াছি বলিতে পারি না। সুখে অসুখে সূর্য্য আমাদিগকে ঠিক ভাইয়ের মত যত্ন করিত। তাহার নামটি সে জন্যে লিখিলাম। সূর্য্য পরে পোষ্টাফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা যেখানে যান, সেখানে একটা দল চাহি। কলেজেও তাই। ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের ছাত্রদের এক স্বতন্ত্র বেঞ্চ; তাঁহারা পশ্চিম-বাঙ্গালার ছাত্রদের সংস্রবে মাত্র আসিতেন না, কারণ, তাহারা "বাঙ্গাল" বলিয়া ডাকে। যে একবার "বাঙ্গাল" ডাকিয়াছে, তাহার অপরাধ আর মোচন হইবার নহে। সে চিরশত্রু। শুধু ছাত্র বলিয়া নহে; কই দেখি, ধীর স্থির গম্ভীর একজন ব্রাহ্ম ভ্রাতাকে একবার বাঙ্গাল বলিয়া ডাক দেখি! আর কিছু না, একবার তাহার কাছে হতভাগ্য দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'খানির নাম কর দেখি। অমনি কার্পাস-স্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইবে। আমাদিগকেও সকলে অজস্র ধারায় "বাঙ্গাল" ডাকিত, "চাটগেঁয়ে ভূত" ডাকিত; কিন্তু

কই, আমাদের ত কোনরূপ অপমান বোধ হইত না। আমরা পশ্চিম-বাঙ্গালার ছাত্রদের সঙ্গে বসিতাম, এবং যদিও আমাদের মাতৃভাষা একরূপ বাঙ্গালাই নহে, তথাপি প্রাণ খুলিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতাম, মাখামাখি করিতাম। অনেকেই আমাদের নিতান্ত বন্ধু ছিলেন। তাঁহাদের টপ্পাবাজ অনেকেই আমাদের বাসায় দিনরাত্রি কাটাইতেন। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রদিগকে চিমটি কাটিয়া রক্তপাত করিয়া ফেলিলেও কথা কহিতেন না, পাছে "বাঙ্গাল" ডাকে। ইংরাজি বাঙ্গালা, উভয়েতেই তাঁহাদের কথা কালীঘাটে আরম্ভ হইয়া, সা রি গা মা খেলিয়া বাগবাজারে গিয়া শেষ হয়। যেখানে আমোদ পায়, লোক সেখানে বেশী ঝোঁকে। বিশেষতঃ বালকেরা। কাজে কাজে ছাত্রেরাও তাঁহাদের উপর বেশী অত্যাচার করিত। "জগচ্চন্দ্র"কে তাহারা "ঝগ্‌গেত ছন্দ্র" বই ডাকিতে পারিত না, এবং "ঝগ্‌গেত ছন্দ্র" ও নয়নকোণ হইতে তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া নানাবিধ কুটুম্বিতা করিতেন।

কলিকাতার নানা স্থান দেখিয়া, কেশব সেনের ও লালবেহারীর কবির লড়াই শুনিয়া,—তাঁহাদের দুজনেরই তখন নব অভ্যুত্থান,—কলিকাতায় প্রথম বৎসর কাটিয়া গেল।

নিষ্ফল পর্ব্ব

গ্রীষ্মের শেষ ভাগে আমাদের দেশীয় কোন প্রতিষ্ঠাভাজন ব্যক্তি কার্য্যবশতঃ কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার মুখে এবং তাঁহার সঙ্গীদের মুখে তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যাদ্বয়ের রূপ গুণের কথা শুনিয়া আমার "হৃদয়কপাট" খুলিয়া গেল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার সঙ্গে আমার এক খুড়তত ভাইয়ের বিবাহ প্রস্তাব করেন। তিনি জাত্যংশে কিছু দূষিত হইয়াছেন বলিয়া তাহাতে অকৃতকার্য্য হন। এবার কলিকাতা আসিয়া আমাদের দুই জনের সঙ্গে দুই কন্যার বিবাহ প্রস্তাব করেন। চন্দ্রকুমার শীঘ্র বড়শি গিলিবার পাত্র নহেন, আমি গিলিলাম। আমি তাঁহার সঙ্গে তাঁহার কার্য্যস্থানে যাইয়া কন্যাদ্বয়কে দেখিতে আকুল হইলাম। চন্দ্রকুমার সৎকর্ম্মে শত বাধা। তাহার যন্ত্রণায় বিমুখ হইয়া বাড়ী গেলাম। সেই দুইটি বালিকার অদৃষ্ট ভাল। তাহারা এই দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইয়া দুই ভাগ্যবানের গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছিল। সেবার চন্দ্রকুমারের বিবাহ হইয়া গেল। আমার মাতা আমার বিবাহের জন্যে আকুল হইলেন। পরের শীতের বন্ধ উপলক্ষে বাড়ী গেলে তিনি অস্থির হইলেন। আমার চূড়া ও বিবাহ, উভয়ই সেবার নিষ্পন্ন করিবেন। বলিয়াছি, মাতা আমার বড় সরলা ছিলেন। তিনি দশের অধিক গণিতে জানিতেন না। ওই দেবীমূর্ত্তি-খানি কেবল স্নেহে ও তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি স্বামী এবং সন্তানের সুখসংকল্পে পরিপূরিত ছিল। কিসে আমরা সুখে থাকিব, এই ভাবনা ভিন্ন মাতার অন্য ভাবনা ছিল না। পূর্ণ গর্ভাবস্থায়ও আমাদিগকে স্বহস্তে রাঁধিয়া না খাওয়াইলে, তাঁহার যেন সেই সংকল্প পূর্ণ হইত না। আমার একজন পিতৃব্য কিঞ্চিৎ দক্ষিণালাভাশয়ে আমার জন্যে অনুগ্রহ করিয়া একটি পাত্রী স্থির করিলেন। তাঁহার বিশেষণের মধ্যে ধন। তিনি মাতাকে লওয়াইলেন যে, আমি সে ধনের অধিকারী হইতে পারিব। মাতা তাহাই বুঝিলেন। পিতা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও অর্থ সম্বন্ধে উদাসীন; দানব্রতে ঋণী। হাজার টাকার নাম শুনিলেই মাতা মনে করিতেন কুবেরত্ব। আমি বড় দায়ে ঠেকিলাম। নূতন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি। স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, প্রণয়মূলক বিবাহ, তদ্দ্বারা ভারত উদ্ধার প্রভৃতিতে মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। তাহাতে কোথায় না একটি "টাকার থলে" আনিয়া নির্ব্বোধ মাতা পিতা গলায় বাঁধিয়া দিবেন। আমি অসম্মত হইলাম। পিতৃব্য মহাশয় বুঝাইলেন যে, আমি মূর্খ। তাঁহার নির্ব্বাচিত কন্যা রূপগুণহীনা হইলেও তাহার এক যুবতী ও অসামান্য রূপবতী বিধবা ভ্রাতৃজায়া আছে। এক গুলিতে দুই পাখী মারিতে

পারিব। এমন সুযোগও ছাড়িতে আছে! তিনি এই দুই নাল চালিয়াও আমার ব্রহ্মজ্ঞান-স্ফুরিত বিবাহনীতি ধ্বংস করিতে পারিলেন না। এই ষড়্‌যন্ত্র ভেদ করিবার উপায় ভাবিতে লাগিলাম। চূড়া উপলক্ষে নিমন্ত্রণ-পত্রের জন্যে একটি কবিতা লিখিয়া দিতে পিতা আদেশ করিলেন। আমি মালঝম্প, কি ছাই-ভস্ম ছন্দে এক "প্রভাকরী" ধরণের কবিতা লিখিয়া, সে কাগজখানির পৃষ্ঠে পিতা মাতা যে পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখ বিবাহযূপে বলিদান দিতেছেন, তাহার এক উচ্ছ্বাস লিখিয়া দিলাম। কাগজখানি যথা সময় পিতার হস্তগত হইল, পিতা উভয় পৃষ্ঠা পড়িলেন। অলক্ষিত থাকিয়া দেখিলাম যে, মুখের ফরসীর নল শ্লথ হইয়া আসিল; তাম্রকূটযন্ত্রের গুরুগম্ভীর ধ্বনি ধীরে ধীরে হাল্কা হইয়া উঠিল; পিতা অন্য মনে ভাবিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, ঔষধ ধরিয়াছে, কোমল হৃদয়ের কোমলতম স্থানে নালিশ পঁহুছিয়াছে, আর ভয় নাই। তাহার দুই দিন পর পিতার জ্বর, আমি মাতার বুকে মাথা দিয়া বসিয়া আছি। সেই আইবুড় ছেলে, তথাপি এরূপে বসিতে ভাল বাসিতাম। আজি যে ঘাটের ছায়ায় পড়িয়াছি, আজিও যদি একবার এই চিন্তাক্লান্ত মস্তক সেই স্বর্গে রাখিতে পারিতাম! বিধাতা সে স্বর্গ আমার অদৃষ্টে বহু দিন লিখিয়াছিলেন না। পিতা জ্বরের প্রলাপে শয্যাতে উঠিয়া বসিয়া, মাতাকে তিরস্কার করিয়া ও একজন পিতৃব্যকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, তিনি কখনও আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে বিবাহ দিবেন না। না, তাহা ত পারিবেন না। তাহা আমার পিতার অসাধ্য কর্ম্ম! অনিন্দ্যসুন্দর সেই পবিত্র মূর্ত্তি, সেই উত্তেজনা, সেই উচ্ছ্বাস, এখনও চক্ষের কর্ণের উপর ভাসিতেছে। তাহাতে সরলা মাতার মনও ভিজিয়া গেল। মাতা আমাকে বুকে আঁটিয়া ধরিয়া আমার ললাট চুম্বন করিলেন। কে বলে স্বর্গ-সুখ পৃথিবীতে নাই? অদ্ভুত বিবাহ-নীতিপরায়ণ পিতৃব্যের ষড়্‌যন্ত্র নিষ্ফল হইল। আমি বিজয়ী বীরের মত কলিকাতা চলিয়া গেলাম।

ষষ্ঠীমাহাত্ম্য

দাদা অখিলবাবু ঢাকা কলেজ হইতে বি. এ. দিয়া কলিকাতায় এম. এ. দিতে আসেন। আমরা এক বৎসর কলিকাতায় থাকাতে সকলের কলিকাতা আসিতে ভরসা হইয়াছে। তাঁহার মাতুল ষষ্ঠীও 'ফার্ষ্ট আর্ট' পড়িতে আসিয়াছেন। ষষ্ঠী নামটি যেমন অপূর্ব্ব, লোকটিও তেমন,—একজন মহাপুরুষ। এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ সরল ও সহজ প্রকৃতির লোক বড় দেখা যায় না। তাহার আকৃতি প্রকৃতি, চলা ফিরা, সকলই হাস্যকর। আমি আশৈশব ক্ষেপান বিদ্যায় মন্ত্রসিদ্ধ। বাবার অসাক্ষাতে যে সকল লোক বাসায় কার্য্যে অকার্য্যে আসিত, তাহারা যেমন বড় বা ছোট হউক, আমি না ক্ষেপাইয়া ছাড়িতাম না। স্কুলে পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত নিত্য এক একখানি প্রহসন অভিনীত হইত। অতএব এরূপ গুণগ্রাহী লোকের ষষ্ঠীকে চিনিয়া লইতে বড় বিলম্ব হইল না। ষষ্ঠী দাদার মামা, কাজেই আমার মামা। আমার মামা ত বাসাশুদ্ধ সকলেরই মামা, আমাদের পরিচিত সকলেরই মামা, পটলডাঙ্গার সকলেরই মামা। এরূপে কলিকাতা শহরে 'একাউণ্টেণ্ট জেনেরেল', 'রেজিষ্টার জেনেরেল', 'ইন্‌সপেক্টার জেনেরেল' প্রভৃতি নানাবিধ জেনেরেল উপাধিধারী উচ্চ রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে ষষ্ঠীও এক জন 'মামা জেনেরেল' হইয়া উঠিল। দিন রাত্রি হাসিতে বাসা তোলপাড়, পটলডাঙ্গা তোলপাড়। ষষ্ঠী কখন একখানি ১১ ইঞ্চি হস্তে সিঁড়ির শিরোদেশে আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে, কখন বা ঘোর নিশীথে আমার শয্যার শিরোভাগে অধিষ্ঠিত, কখন বা বৃক্ষশাখা হস্তে আমাকে তাড়াইয়া চাঁপাতলার পুকুর প্রদক্ষিণ করিতেছে,—উদ্দেশ্য, আমাকে half murder (অর্দ্ধ খুন) করিবে। এ অর্দ্ধ-হত্যা ব্যাপারটাও আমাদের শিক্ষক মুন্সী সাহেবের শিক্ষা। শুধু মামার লীলা দেখিবার জন্যে কলিকাতার অনেক বন্ধু আমাদের

বাসায় আসিতেন। নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুরোধে, ভবিষ্যৎ মানবজাতির উপকারার্থ এতাদৃশ মহাপুরুষের দুই চারিটি মাহাত্ম্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিত।

প্রথম মাহাত্ম্য।—কলিকাতা সহরের গাড়ীর হুটাহুটি ছুটাছুটি দেখিয়া ষষ্ঠী কোথায়ও প্রাণপণে যাইতে চাহিত না॥ একদিন আমি কিছুতেই ইচ্ছা করিয়া গেলাম না, ষষ্ঠীকে তাহার একখানি বহি কিনিবার জন্যে 'থেকার স্পিঙ্কে'র বাড়ীতে যাইতে হইল। যাইবার সময়ে, দুপুর বেলা, ষষ্ঠী কোন মতে বিপদ্ কাটাইয়া গিয়া বহি কিনিয়াছে। মনে তখন বড় আনন্দ হইয়াছে। সে আনন্দে অধীর হইয়া, কয়েকটা কমলা লেবু কিনিয়া, আমার সৌখীন ছাতাখানা মস্তকের উপর প্রসারিত করিয়া, মহাগৌরবের সহিত বউবাজারের মোড় পর্য্যন্ত উপস্থিত। এখন অপরাহ্ন। মহাকালের ভীষণ যন্ত্রের মত শকটমালা নক্ষত্রবেগে চারি দিকে ছুটিতেছে। মোড়টি ষষ্ঠীর চক্ষে যেন চতুর্ম্মুখ মহাকাল! ষষ্ঠী এক এক বার অসম সাহসে রাস্তা পার হইবার চেষ্টা করিতেছে, অকৃতকার্য্য হইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছে। কলিকাতা সহর, ষষ্ঠীর এই লীলা, সেই মুহুর্ম্মুহু অগ্রসর ও পলায়ন, সেই অঙ্গভঙ্গি, মুখভঙ্গি, শনৈঃ শনৈঃ হাঃ হুঃ রবে ঢাকার ভাষায় চীৎকার,—একটা ক্ষুদ্র জনতা হইয়া গিয়াছে। আর উপহাস সহ্য করিতে না পারিয়া ষষ্ঠী একবার যেই প্রাণপণ করিয়া পাড়ি যোগাইয়াছে, অমনি একখানি গাড়ী ছুটিয়া আসিয়াছে। তখন বিকট চীৎকার ছাড়িয়া—হায় রে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব গৌরব!—ষষ্ঠী একবারে নর্দ্দমায় গিয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার রাস্তার সুশীল বালকবৃন্দ—বালক কেন, বৃদ্ধবৃন্দ বলিলেও বড় অসাহসের কথা হয় না—ষষ্ঠীর সাধের লেবুগুলি, চাদরখানি, গরিবের মাথার ছাতাটি, এমন কি, বহিখানি পর্য্যন্ত লইয়া চম্পট দিয়াছে। ষেটের বাছা ষষ্ঠী কোনও মতে ধড়খানি লইয়া গৃহাভিমুখী হইয়া, সমুদায় রাস্তা হাসাইতে হাসাইতে গৃহে চলিল। কিন্তু একটা বিভ্রাট যে হইবে, তাহা আমি ভবিষ্যৎজ্ঞানে জানিয়াছিলাম, এবং তদপেক্ষায় ছাদের উপর বসিয়া ষষ্ঠীর প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম, ষষ্ঠী আসিতেছে। কি অপূর্ব্ব রূপ! গায়ের পিরান ও ধুতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ও কর্দ্দমরাশিতে বসনদ্বয় স্থানে স্থানে, এবং মুখের অর্দ্ধভাগ সম্পূর্ণ-রূপে সমাচ্ছন্ন ও সুবাসিত হইয়াছে। বদনের অপরার্দ্ধের স্থানে স্থানে চর্ম্ম উঠিয়া রক্ত পড়িতেছে। কর্দ্দমাচ্ছন্ন এক চক্ষে, এবং রক্তাচ্ছন্ন অন্য চক্ষে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, আর হৃদয়হীন কলিকাতার অল্পসংখ্যক বাল-বৃদ্ধ পশ্চাতে হাততালি দিতে দিতে আসিতেছে। আমার অপরাধ—আমি হাসিলাম। ষষ্ঠী আমাকে half murder করিতে ছুটিল। তাহার স্থির বিশ্বাস, আমি 'ষ্টুপিড' (stupid) তাহার সকল দুর্গতির কারণ। আমি বহি কিনিতে গেলে ত তাহার এই দশা হইত না। বাসাশুদ্ধ লোক একত্র হইয়া এ যাত্রা আমাকে কোন মতে অর্দ্ধখুন হইতে রক্ষা করিল।

দ্বিতীয় মাহাত্ম্য।—ষষ্ঠীর বিশ্বাস, তাহার বড় কফের ব্যারাম। ইহার অন্য কোন কারণ ষষ্ঠী কি আমরা অবগত নহি। একদিন একজন মেডিকেল কলেজের নেটিব ডাক্তার শ্রেণীর ছাত্র বলিয়াছিল,—'মামার বড় ভয়ানক কফের ব্যারাম।' সে দিন হইতে ষষ্ঠী যেখানে বসিত, তাহার চতুর্দ্দিকে মুখামৃত বর্ষণ করিত এবং মুহুর্ম্মুহু এত কাসিত যে, কাহার সাধ্য কাছে বসে! আর একদিন সেই ছাত্রটি কলেজ হইতে আসিয়া একটা পুরিয়া ষষ্ঠীর হস্তে দিয়া বলিল—"মামা! ডাক্তার ফ্রেয়ার আজ লেকচার দিবার সময় বলিয়াছিল, এটি কফের বড় 'ঝবর' —কথাটা ষষ্ঠী ঢাকা হইতে আমদানি করিয়াছিল—ঔষধ। এক পুরিয়া খাইলেই ভেদ বমি হইয়া কফ বাহির হইয়া যায়।" সে আমাকে কাণে কাণে বলিয়া গেল যে, সে পুরিয়াতে কলেজ ষ্ট্রীটের বহু শকটনিষ্পেষিত এবং বহু পদদলিত সুরকি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এখন মামার দুইটি বিশেষ গুণ ছিল। এক,—তুমি তাহাকে যে রোগের কথাই বল, সে বলিবে—তাহার শরীরে সে রোগ ষোল আনা আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছে। একদিন

একটি যক্ষ্মারোগী বাসায় আসিল ; ষষ্ঠী বলিল, তাহারও যক্ষ্মা হইয়াছে। যখন তাহার মধ্যম বয়স, তখন তাহার একটি ভাগিনার বহুমূত্র হইয়াছে ; ষষ্ঠী বলিল, তাহারও বহুমূত্র হইয়াছে ; দেশশুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিল। দ্বিতীয়, সে ঔষধের গুণ কখনও প্রাণান্তে অপলাপ করিত না। ষষ্ঠী সন্ধ্যার সময় সেই মহাপুরিয়া পরম ভক্তিসহকারে ভক্ষণ করিল। অর্দ্ধরাত্রে তাহার কণ্ঠ-নিনাদে কলিকাতা সহর তোলপাড়, কার সাধ্য ঘুমায়! সকলে ব্যস্ত হইয়া জাগিয়া বসিলাম। ব্যাপারখানা কি? ষষ্ঠী বলিল, তাহার ভেদ ও বমি হইতেছে। ঘন ঘন পায়খানাযাত্রা ও ঘন ঘন মহা উদ্‌গারধ্বনি! বলা বাহুল্য, বমি কিছুই হইতেছে না। সকলে মহাব্যস্ত হইয়া উঠিল। ডাক্তার ডাকিয়া আনিবার জন্যে দাদা আমাকে জিদ করিতে লাগিলেন। দুপুর রাত্রিতে আমি এরূপ অভিযানে অসম্মত হইলাম। কিছুক্ষণ এ অভিনয় হইলে, আমি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—বমিতে বাহির হইতেছে কি? ষষ্ঠী অমনি ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল—"আজ্ঞা অখিলবাবু—what are these আজ্ঞা?" এ সকল কি? ইহা ষষ্ঠীর দরখাস্তের বাঁধা ফারম। আর তাহার প্রত্যেক কথার পূর্ব্বে ও পরে 'আজ্ঞা' থাকা চাহি। "আমি আজ্ঞা মরিতেছি, আর সে আজ্ঞা ঠাট্টা করিতেছে। আমি আজ্ঞা তাহাকে কি murder do (খুন) করিতে পারি না?" ষষ্ঠীর রসময়ী ইংরাজি ভাষা এরূপই ছিল। সে বলিত "read করিতেছি," "cat করিতেছি।" আমি আবার বলিলাম, সেই ছাত্রটি আমাকে বলিয়া গিয়াছে যে, সে পুরিয়াতে কলেজ ষ্ট্রীটের খাঁটি সুরকি মাত্র ছিল। তখন বাসাশুদ্ধ হাসিয়া উঠিল। ষষ্ঠী আবার দরখাস্ত পেশ করিল—"আজ্ঞা, অখিলবাবু what are these?" সে উচ্চারণ করিল water thesc. দাদা বিষয়টি কি, বুঝিয়া বলিলেন—"মামা! আমি কি ভিস্তি!" তখন ষষ্ঠী এক বজ্রলম্ফে বাঘের মত আমার ঘাড়ে পড়িল। এবার আর 'হাফ মর্ডার' নহে, পুরো 'মর্ডার' সংকল্প।

তৃতীয় মাহাত্ম্য।—দাদা এম. এ. দিতে আসিবার পূর্ব্বে রামপুর বোয়ালিয়া স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। মামা মহোদয় তাঁহার সংগে ছিলেন। তাঁহার বাসার পাশাপাশি আর একটি ভদ্রলোকের বাসা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা 'কামিনী'। সে ষষ্ঠীর 'ডলসিনিয়া', দিগ্‌গজ ঠাকুরের আসমানি। ষষ্ঠী কলিকাতা আসিয়া অবধি তাহার প্রেমে বিভোর। সেই আশ্চর্য্য ইংরাজি বাংগালা মিশ্রিত ভাষায় তাহার রূপের গুণের ব্যাখ্যা, আমাকে নির্জ্জনে পাইলেই, কাসির ও মুখামৃত বর্ষণের অবসরে আমার কর্ণে ঢালিত। একবার গ্রীষ্মের বন্ধে দাদার অনুরোধে আমি ও ষষ্ঠী রামপুর বোয়ালিয়া চলিলাম। পথে আমাদের একজন সংগী দূরে পলাশির মাঠ দেখাইয়া যুদ্ধের অনেক অপূর্ব্ব অনৈতিহাসিক গল্প বলিলেন। এখানে 'পলাশির যুদ্ধে'র অংকুরপাত হইল। বোয়ালিয়া গিয়া দেখিলাম কামিনীর বয়স জোর ১০ বৎসর, বর্ণটা সাদা-গৌর, চুল কটা, চক্ষু মার্জ্জারের। এই বালিকাই ষষ্ঠীর প্রেমময়ী নায়িকা শ্রীমতী রাধিকা। তাহার মুখে ইহার বর্ণনা শুনিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, কামিনী নব-যৌবনসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা একটি অদ্বিতীয়া সুন্দরী, ষষ্ঠী-প্রেমে ঢল ঢল। বালিকার পঞ্চ ক্রোশের মধ্যেও প্রেমের গন্ধ নাই। না থাকুক, গরিব ষষ্ঠীর প্রেমভাব বোয়ালিয়া বাজার পর্য্যন্ত রাষ্ট্র। কামিনীর বাপ পর্য্যন্ত তাহা লইয়া তাহাকে বর সাজাইয়া নাচাইতেন। কখন বা বিবাহের কথা হইতেছে, কখন করিলেন ; ষষ্ঠী মাথা নেড়া করিয়া ফেলিল। তখন তিনি নেড়া বলিয়া আপত্তি করিলেন, ষষ্ঠী মাথায় দিন রাত্রি 'মেকেসার' ঘষিতে লাগিল। তাঁহারও মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ ছিট ছিল। তা না হইলে এমন জামাতা জুটিবে কেন? তাস খেলিতে ষষ্ঠীকে তাঁহার খেরু করিয়া দেওয়া হইত, আর আমি অপর পক্ষে বসিতাম। আমি তাস খেলায়ও মন্ত্রসিদ্ধ ছিলাম। দুজনকে ক্ষেপাইয়া দিয়া, পিট হইতে কাগজ বারম্বার তুলিয়া আগাগোড়া খেলিতেছি ; তাহাদের লক্ষ্য মাত্র নাই। যোগস্থ হইয়া আপনাদের হাতের তাস চিন্তা

করিতেছে। ঘন ঘন দুজনে ঝগড়া করিতেছে। বৈঠকখানাশুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছে। দেখিতে দেখিতে কত ছক্কা, কত পাঞ্জা হইতেছে। শেষে ইহারা প্রতিজ্ঞা করিল, আমি যে ঘরে থাকি, তাহারা সে ঘরে খেলিতে বসিবে না।

একদিন বেলা অপরাহ্নে আমি একখানি 'লাউঞ্জ' চেয়ারে' বসিয়া সংস্কৃত শকুন্তলা পড়িতেছি। কামিনী আসিয়া আমার লাউঞ্জ চেয়ারের হাতের উপর পুতুলটির মত বসিয়া ফুলের মালা গাঁথিতেছে। বলা বাহুল্য, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ষষ্ঠী আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু এ জগতে প্রকৃত প্রণয়ের প্রতিদান নাই। কামিনীও তাহাকে দেখিয়া হাসিত ও ঠাট্টা করিত। সে মূর্ত্তিরই এমন হাস্যকর মহিমা যে, একটি বালিকা পর্য্যন্ত না হাসিয়া, ঠাট্টা না করিয়া থাকিতে পারিত না। ষষ্ঠী অনেক সময়ে তাহা দুষ্মন্তের মত অনুরাগের লক্ষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। কামিনী আমার এত কাছে বসিয়া মালা গাঁথিতেছে, গল্প করিতেছে, ষষ্ঠী পার্শ্বে এক তক্তপোষের উপর পদ্মাসনে বসিয়া মনোবেদনায় অধীর হইয়া অঙ্কের উপর হাতে হাত রগড়াইতেছে, কটমট করিয়া এদিক্ ওদিক্ কটাক্ষ বর্ষণ করিতেছে, কখন আপন মনে হাসিতেছে, কখন গম্ভীর ভাব অবলম্বন করিয়া কি এক বহি পড়িতেছে। তাহার উপর সেই মহাকফরোগ নিবন্ধন শনৈঃ শনৈঃ কাসি আর নিষ্ঠীবন-বর্ষণ ত আছেই। প্রেম চাগিয়া উঠিলে ইহাদের সংখ্যা ও পরিমাণ বেশী হইত মাত্র। কামিনীর মালা গাঁথা শেষ হইল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন হইয়াছে?" আমি বলিলাম,—"বেশ হইয়াছে। এ মালা কি করিবে?" "আপনার গলায় দিব"—বলিয়া সে আমার গলায় মালা দিয়া হাসিতে লাগিল। আমি ষষ্ঠীর দিকে চাহিয়া একটুক ঈষৎ হাসিলাম, ষষ্ঠী লাফাইয়া আসিতে আমি ছুটিলাম। ষষ্ঠী একখানি প্রকাণ্ড কাঠ লইয়া—একটা ছোটখাট গন্ধমাদন—আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল। আমার ভাগ্য ভাল, কেবল পায়ে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়া মাংস এক টুকরা উঠিয়া গেল। একটুক উপরে পড়িলে আমার ভবলীলা শেষ হইত। বালিকা চীৎকার করিতে লাগিল। রাস্তা হইতে লোক আসিয়া বাসা লোকারণ্য হইল। দাদা এ সময়ে স্কুল হইতে পঁহুছিলেন। কামিনীর পিতা ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও আফিস হইতে আসিলেন। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কামিনী প্রত্যেকের কাছে জলের মত অম্লানমুখে এই পুষ্পমালা-বিভ্রাট ব্যাখ্যা করিল। তাঁহারা প্রথম স্তম্ভিত হইলেন; পরে হাসির তুফান উঠিল। কেবল গরিব ষষ্ঠী—নিরাশ প্রেমে হউক, কি চারি দিকের গালির চোটে হউক, নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতেছিল। তাও পারে কই? তাহাকে একবার এক একজন টানিয়া আনিতেছে, আর সে নানারূপ মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গির সহিত অদ্ভুত interjection (ক্রোধোক্তি) ছড়াইয়া ছুটিয়া যাইতেছে।

চতুর্থ মাহাত্ম্য।—একবার গ্রীষ্মের বন্ধের সময় সকলে বাড়ী যাইব। আমি সকলের বাজার করিয়া ও ষ্টীমারের পাশ লইয়া,—এ সকল কার্য্য অন্য কেহ আমাদের মাতৃভাষার কল্যাণে করিতে চাহিত না,—অবসন্ন ও ধূলিসমাচ্ছন্ন দেহে গৃহে অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়াছি। দেখিলাম দাদা মহাচিন্তাকুল হইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, তাঁহার বাড়ী যাওয়া হইবে না। কেন? না, ষষ্ঠীর সাটিনের এক পিরান নিজের জন্যে, এবং এক গাউন তাহার ভাইঝিয়ের জন্যে না পাইলে সে বাড়ী যাইবে না। তিনি তাহাকে ফেলিয়া কিরূপে যাইবেন? অথচ সে রাত্রিতে আমরা ষ্টীমারে উঠিবে। তিনি সাটিন কিনিতে টাকাই বা কোথায় পাইবেন, আর সময়ই বা কোথায়? আমি বলিলাম—"এ জন্যে এত ব্যস্ত হইয়াছেন, আমি তাহার কিনারা করিতেছি।" আমি ষষ্ঠীকে লইয়া সাটিন কিনিতে যাত্রা করিলাম। বলিলাম, বাকি লইতে পারিব। ষষ্ঠী বিশ্বাস করিল। আমি ষষ্ঠীর সোনার কাঠি রূপার কাঠি জানিতাম। এক কাঠি দেখাইলে ষষ্ঠী আমাকে 'হাফ মর্ডার' করিতে আসিত, আর এক কাঠি দেখাইলে আনন্দে আটখানা হইয়া আমার গায়ে ঢলিয়া পড়িত। এই

শেষোক্ত কাঠি চালাইলাম ; সেই কামিনীর উপাখ্যান আরম্ভ করিলাম। ষষ্ঠীর প্রতি তাহার অসাধারণ প্রেম, তাহার সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব,—ষষ্ঠী "স্টুপিড, স্টুপিড" বলিয়া আনন্দে আমার গলা জড়াইয়া ধরিল, একেবারে অবশ ও আত্মহারা হইয়া চলিল। সময়ে সময়ে গাড়ী চাপা পড়িবার উপক্রম হইল। এ ভাবে মাধব দত্তের বাজারে উপস্থিত হইয়া বলিলাম—"মামা! বেলা শেষ, বড়বাজারে কি চিনাবাজারে এ সময়ে সাটিন কিনিতে বড় ঠকিব। এখানে আমাদের পরিচিত যে দোকানদার আছে, তাহার কাছে সাটিন আছে কি না, আমি দেখিয়া আসি।" তাহাকে গিয়া আমাদের বিপদের কথা বলিয়া কোনও একটা কাপড় সাটিন বলিয়া পাশ করিয়া দিতে বলিলাম। সে ষষ্ঠীকে চিনিত ; বলিল—ভয় নাই। আমি অভয় পাইয়া ষষ্ঠীকে ডাকিলাম। কলিকাতার দোকানদার, সে একটা লম্বাচৌড়া গৌরচন্দ্রিকা দিয়া, কাগজে ঢাকিয়া খানিকটা ক্রেপ বাহির করিয়া, একটুক কোণা উল্টাইয়া, একটা প্রকাণ্ড ফুলের কিঞ্চিৎ অংশ ষষ্ঠীকে দেখাইয়া বলিল—"মামা! এমন সাটিন তুমি কলিকাতা সহর ঘুরিয়া পাইবে না। আহেল বিলাতি আমদানি!" ষষ্ঠী আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"Good thing কি?" ষষ্ঠী কোনও জিনিসকে বাঙ্গালায় 'ভাল' না বলিয়া, good thing বলিত। পাওরুটি একটা বিশেষ good thing। আমি বলিলাম যে, আমি এমন সাটিন দেখি নাই। সাটিন লইয়া একটা দর্জ্জির দোকানে গিযা কি করিতে হইবে, আমি তাহাকে বেশ করিয়া শিখাইয়া আসিয়া রাস্তার পার্শ্বে গাড়ীর ভয়ে ভীত ও কামিনী-প্রেমে গদগদ ভাবে দণ্ডায়মান ষষ্ঠীকে বলিলাম—"গাউন এত অল্প সময়ে পারিবে না। তোমার পিরানটা দিবে বলিয়াছে।" তখন আবার প্রেম-তরঙ্গে ভাসাইয়া ষষ্ঠীকে বাসায় নিলাম। দাদা ও বাসাশুদ্ধ অবাক্। রাত্রি ৮টার সময়ে দর্জ্জি পিরান কাগজে মজবুত করিয়া বাঁধিয়া ষষ্ঠীর হাতে দিয়া ও সাটিনের বহু প্রশংসা করিয়া বলিল—"খবরদার, ২। ৩ দিনের মধ্যে খুলিও না, শেলাই নষ্ট হইবে। বেশ করিয়া চাপা দিয়া রাখিতে হইবে।" ষষ্ঠী তাহার কথা বেদবাক্যবৎ বিশ্বাস করিয়া, কাপড়ে চাপা দিয়া সে পুটুলি তাহার ট্রঙ্কের তলায় রাখিল ; আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। স্টীমারে পরদিন গোপনে এই রহস্য সহপাঠীদের কাছে প্রকাশিত হইলে হাসির তরঙ্গে সমুদ্রের তরঙ্গ দুই দিন দুই রাত্রি পরাভূত হইল। কিন্তু পাছে ষষ্ঠী আমার সমুদ্রশয্যা ব্যবস্থা করে, তাহার কাছে কেহ প্রকাশ করিল না। চট্টগ্রাম পঁহুছিয়া, ষষ্ঠী ট্রঙ্ক খুলিয়া সাধের সাটিনের পিরান গায়ে দিয়া বাহির দিবার জন্যে বাহির করিয়া যখন দেখিল যে, সাটিন দুই দিন দুই রাত্রিতে চালিতাপ্রমাণ বুটা-সম্বলিত অতি নিকৃষ্ট ও হাস্যকর 'ক্রেপে' পরিণত হইয়াছে, তখনই সে পিরান গায়ে দিয়া সক্রোধে সটান আমার বাসায় ছুটিয়া আসিয়া, আমাকে না পাইয়া চন্দ্রকুমারের বাসায় উপস্থিত। চন্দ্রকুমারের পিতার কাছে আমরা সসম্ভ্রমে বসিয়া আছি। সেখানে আমার প্রতি আইনবহির্ভূত ব্যবহার করিবার সুযোগ নাই দেখিয়া, ষষ্ঠী এক পার্শ্বে বসিয়া এরূপ ভাবে চাদরের দ্বারা পিরান ঢাকিতেছিল যে, তাহাতে বরং চন্দ্রকুমারের পিতার চোখ আরও বেশি আকর্ষণ করিল। তিনি বলিলেন—"তুই কি পিরান গায়ে দিয়াছিস! অমন করিয়া লুকাইতেছিস কেন?" আমরা হাসিয়া উঠিলাম। আর না। বারুদস্তূপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িল। ষষ্ঠী একলম্ফে আসিয়া আমার গালে এক প্রকাণ্ড চড় কসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। চন্দ্রকুমারের পিতা অবাক্। আমরা হাসিয়া আকুল। গল্পটা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে তিনিও উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। বিকাল বেলা দাদা অখিল বাবুর বাসা লোকে পরিপূর্ণ। সকলে বসিয়া আছি। অপূর্ব্ব সাটিনের পিরানের গল্প উঠিয়াছে। বৈঠকখানা হাসিতে পরিপূর্ণ। এমন সময়ে মামার আগমন, আর আমার ঘাড়ে পতন। বৈঠকখানাশুদ্ধ লোক পড়িয়া কোনও মতে সে যাত্রায় আমাকে রক্ষা করিল।

পঞ্চম মাহাত্ম্য।—ষষ্ঠী ছেলে ভাল। আমাদের সকলের অপেক্ষা বেশি পরিশ্রম করিত,

রাত জাগিয়া পড়িত। সকল বিষয় আমাদের অপেক্ষা অধিক না হউক, কম জানিত না। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? পরীক্ষাগৃহে যাইবার সময়ে গাড়ীতে আমরা সমস্ত রাস্তা তাহাকে কিরূপে পরীক্ষা দিবে, তাহার উপদেশ দিতাম। তথাপি ষষ্ঠী কোনও দিন হয় ত একটি কঠিন 'প্রব্লেমে' হাত দিয়া দিন কাটাইয়া আসিয়াছে। কোনও দিন কাগজের এক পৃষ্ঠের প্রশ্নের মাত্র উত্তর দিয়া আসিয়াছে; অপর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখে নাই। কোন দিন বা তাড়াতাড়িতে উত্তর-লেখা কাগজগুলি ঘরে লইয়া আসিয়াছে; কতকগুলি সাদা কাগজ তৎপরিবর্ত্তে দিয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, বহু বার মাটিকাটা পরিশ্রম করিয়াও ষষ্ঠী কোনও মতে 'ফাষ্ট' আর্ট'রূপ দুর্লঙ্ঘ্য সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

ষষ্ঠ মাহাত্ম্য।—এতদ্ভিন্ন ষষ্ঠীর ক্ষুদ্র কীর্ত্তি অনেক আছে। তাহাকে যে যেখানে পায়, পাগল সাজাইত। একদিন সেই সাটিনবিক্রেতা দোকানদার হইতে ষষ্ঠী ১০ হাত এক ধুতি কিনিয়া আনিয়াছে। বাসায় আনিয়া মাপিলে হইল ৮ হাত। ষষ্ঠী আবার তাহার দোকানে গেলে সে মাপিয়া দিল ১০ হাত। ষষ্ঠী কাঁদিতে কাঁদিতে বাসায় আসিয়া বলিল —"তোমরা আমাকে পাগল পাইয়াছ?" আবার মাপিল, আবার ৮ হাত। ষষ্ঠী আবার দোকানদারের কাছে গেল। সে আবার মাপিয়া দিল ১০ হাত। ষষ্ঠী এবার ক্রোধে গর গর করিয়া আসিয়া কাপড় তাহার ট্রঙ্কে বন্ধ করিয়া রাখিল। বলিল—"হউক ৮ হাত, তোদের বাপের কি?" একদিন দিগ্‌গজ ঠাকুরের মত সেই ধুতি পরিল। ধেড়ে ছেলে ৮ হাত কাপড়ে কুলাইবে কেন? কেহ হাসিলে তাহাকে বাপান্ত করিয়া গালি দিতে লাগিল। পরে দোকানদার একদিন আসিয়া প্রকৃত ১০ হাত একখান কাপড় দিয়া বহুরূপী কাপড়খানি লইয়া গেল। ষষ্ঠী বহি কিনিত দপ্তরিপাড়া হইতে, সের ও মণ হিসাবে। কোনও বহির অর্দ্ধাংশ, কাহারও চতুর্থাংশ, কাহারো বা মলাট মাত্র আছে। এরূপে এক এক দিন এক এক ঝাঁকা বহি কিনিয়া আনিত। একদিন বেথুন সোসাইটিতে গিয়া ভিড়ের জন্যে ষষ্ঠী বসিতে পারিল না। পরের বার সে সমুদায় শরীরে 'কড্‌লিভার অয়েল' মাখিয়া গিয়া উপস্থিত। যেখানে গিয়া বসিল সে দিকের বেঞ্চকে বেঞ্চ শূন্য করিয়া নাকে হাত দিয়া লোক পলাইল। ষষ্ঠী মনের আনন্দে একলা এক বেঞ্চে বসিয়া অবিভক্ত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। ষষ্ঠী এক নিলামে একটি বালকের ব্যবহার্য্য খাট কিনিয়া, তাহাতে কোণাকুণি হইয়া শুইয়া থাকিত। পুঁথি বাড়ান নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয়, এই ষষ্ঠীমাহাত্ম্যে ভবিষ্যৎ মানবগণ ষষ্ঠী নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রৌঢ় বয়সে উকিল হইয়াও তাহার প্রকৃতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছিল না। সে আপনার পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছেও হাস্যকর কৃপাপাত্র ছিল। তাহাদের উপর রাগ করিয়া সে নিজে কাঁদিত। এখনো সে ঠিক যেন একটি শিশু। ওকালতিতে মক্কেলেরা ঠকাইয়া যাহা দিত, সে তাহা লইত। গরিব বলিলে তাহার সমস্ত ফিস মাপ। তাহার এ সামান্য আয়ের দ্বারা একটা সৈন্য প্রতিপালন করিত। এরূপ পরোপকারে সে জীবনপাত করিয়াছে। তাহার চরিত্র কি পবিত্র, কি সুন্দর, কি সরল! আজ ষষ্ঠী সেরূপ পবিত্র, সুন্দর ও সরল স্বর্গে।

পূর্ব্বরাগ

"কিবা রূপ কিবা গুণ কহিলেক ভাট।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কপাট।"

ভাট আর কেহ নহে, ভায়া ষষ্ঠী। তাহার খুড়া ঢাকায় চাকরি করিতেন। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যা লক্ষ্মী। তাহার বয়স তখন ১০ বৎসর। এই বালিকা সম্বন্ধে "একমে হাজার রাত্ বানাইয়া" দাদা ও ষষ্ঠী গল্প করিতেন। শুনিতে শুনিতে আমার "মনের কপাট" খিল কবজা

ছাড়িয়া খুলিয়া গেল। Love at first sight—"প্রথম দর্শনে প্রেম" তাহা ত শুনিয়াছ। কিন্তু Love at no sight—'অদর্শনে প্রেম" কি কেহ শুনিয়াছ? বাঙ্গালীর ত শুনিবার কথাই নহে। ইহাদের দুরদৃষ্ট, কি শুভাদৃষ্টবশতঃই হউক—ঘোরতর মতভেদ আছে—ঘোড়ার আগে গাড়ী, লেখার আগে রেজেস্টারি, আগে বিবাহ, পরে প্রেম। কিন্তু যাহাদের প্রেমের শ্রাদ্ধটা গড়াইয়া গেলে তাহার পর শুভ বিবাহ হয়, তাদৃশ ভাগ্যবানদের মধ্যেও কেহ বোধ হয়, এতাদৃশ পূর্ব্বরাগ অনুভব করেন নাই। যদি বৈষ্ণব ঠাকুরদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করা যায়, তবে করিয়াছিলেন কেবল শ্রীমতী—

"কেবা শুনাইল শ্যামনাম?
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু, শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?"

তবে শ্রীমতীর "কুল-মজান" বাঁশী শোনা, কদম্বতলায় বেড়ান, আর—

"জলে ঢেউ দিও না সখি!
জলের ছায়াতে শ্রীকৃষ্ণ দেখি"

ভিন্ন অন্য কোন কাজ ছিল না। কিন্তু আমি-গরিবের কুলের অধিক কলেজ আছে, আয়ানের অধিক রিজ সাহেব আছে, বংশীর অধিক রিজ সাহেবের মুখভঙ্গি ও "লগেরেথিম" (Log) আছে। আমার যে মারা পড়িবার কথা। আমার পড়াশুনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কেবল সেই নাম "জপিতে জপিতে অবশ করিল গো"। শুধু তাহা হইলেও ক্ষতি ছিল না। তাহার উপর—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥"

আমি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলাম—

"হইতে হইতে অধিক হইল সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর পাগলী হইয়া গেনু॥"

দিন রাত্রি একই ভাবনা "কেমনে পাইব সই তারে?"

কিন্তু দারুণ কলির দৌরাত্ম্যে এখন 'মেঘদূত'ও জোটে না 'হংসদূত'ও জোটে না। জুটিল কেবল আমার পিসতত ভাই 'জগৎ'। তাহার দ্বারা অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রাম্য ভাষায় শ্রীমতীর একখানি আলেখ্য আনাইলাম। "এক্‌মে হাজার বাত" হইতে বাদসাদ দিয়া দেখিলাম, শ্রীমতী দেখিতে নিতান্ত মন্দ নহেন; চতুরা, বুদ্ধিমতী ও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া জানেন। দেশে তখন লেখাপড়া কেহ জানে না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা মহাপাপ বলিয়া গণ্য। যদিও পড়িয়াছিলাম—Little learning is a dangerous thing (অল্প শিক্ষা ভয়ানক জিনিস), তথাপি এই "কিঞ্চিৎ লেখাপড়া" আমার পক্ষে মহা মূল্যবান্ বোধ হইল। কিন্তু "কেমনে পাইব সই তারে?"

তাহার পিতা দশ বৎসরবয়স্কা এই কন্যা ও ৭ বৎসরের এক পুত্র ও বিধবা স্ত্রী রাখিয়া অকস্মাৎ ঢাকায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি আমার পিতার মত বড় সদাশয় ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। পরোপকারে জীবন সমর্পণ করিয়া আপনার পরিবারকে সংসার-

সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যান। ইহাদের এক বেলা অন্নের সংস্থানও ছিল না। এই দরিদ্র অনাথা বিধবার কন্যাকে গ্রহণ করিতে মাতা স্বীকার করিবেন কেন? শুনিয়াছি, তাহার পিতা ও আমার পিতা এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে আমার প্রথমা ভগিনীর এবং তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। কিন্তু তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদরকেও কলেজে পড়িবার সময়ে ঢাকা গ্রাস করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে সেই প্রতিজ্ঞার সূত্রও ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তথাপি পিতা অর্থ চরণে ঠেলিতেন। তাঁহার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু মাতা এরূপ বিবাহে ঘোরতর বিরোধিনী। অতএব আমি—

"এখন তখন করি দিবস গোঁয়াইনু,
দিবস দিবস করি মাসা।
মাস মাস করি বরিখ গোঁয়াইনু,
খোয়াইনু এ তনুকি আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঁয়াইনু
খোয়াইনু এ তনুকি আশ।
হিমকর কিরণে নলিনী যদি জাড়ব
কি করব মাধবী মাস?"

দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল। একদিন হঠাৎ তাহার জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতি দাদার কাছে পত্র লিখিলেন যে, আমার জন্যে এত কাল তাঁহারা অপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু আমার মাতার ঘোরতর অনিচ্ছা। অতএব তাঁহারা অন্যত্র বিবাহের কথা দিয়াছেন। So sweet was never so fatal! আমার স্বপ্নভঙ্গ হইল। আমি বুঝিলাম—

"হিমকর কিরণে নলিনী যদি জাড়ব
কি করব মাধবী মাস?"

অনেক চিন্তার পর একমাত্র অস্ত্র পাইলাম। উহা করুণাময় পিতার বক্ষে প্রহার করিলাম।

বিবাহবিভ্রাট

"পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
ভুবনে আনিল কে?
মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু
তিতায় তিতিল দে॥" —চণ্ডীদাস।

উপায়টিও শ্রীমতী যাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা পৌরাণিক। বলিয়াছি, পিতা আমার মাতার অধিক ছিলেন। আমার হাতের লেখা পত্র যাহার নামে হউক না, তিনি দেখিলেই খুলিয়া ফেলিতেন। এই কারণে জগতের কাছে যে দিন আমার "হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি"র কথা লিখিতাম, সে দিন পিতার কাছে স্বতন্ত্র এক পত্র লিখিতাম। তিনি তাঁহার পত্রখানি পাইলে আর জগতের পত্র খুলিতেন না। অতএব এই দিন কেবল জগতের কাছে এক পত্র লিখিলাম, যদি এখানে আমার বিবাহ না হয়, তবে হয় আমি সেই স্বদেশী ব্রাহ্ম মহাশয়ের বিখ্যাত কন্যা একটি বিবাহ করিব, না হয়—

"যমুনাসলিলে সখি! অব তনু ডারব,
আন সখি! ভখিব গরল।"

যাহা মনে করিয়াছিলাম—পিতা পত্র খুলিয়া পড়িলেন, পড়িয়া ব্যাকুল হইলেন। এত দিন এ কথা তাঁহাকে বলে নাই বলিয়া গরিব জগৎকে বহু তিরস্কার করিলেন, এবং তখনই কন্যার

ভগ্নীপতি ও মাতুলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা উভয়ে উচ্চ কর্ম্মচারী। তাঁহারা আসিলেন। পিতা পূজায় বসিয়াছেন। সেই বালিকার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলে তাঁহারা বলিলেন—"তাহার বিবাহের দিন কল্য। এখন কি করিব? তথাপি আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন, তবে আমরা আজ্ঞা পালন করিব।" পিতা কোষা হইতে জল হস্তে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহারা তখনই সহর হইতে ছুটিলেন। কিন্তু কন্যার পিত্রালয় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই বরপক্ষ বস্ত্রালঙ্কার দিয়া বিবাহের অধিবাস করাইয়া গিয়াছেন। বরের প্রায় পাশা-পাশি বাড়ী এবং তাহারা ক্ষমতাশালী লোক। তথাপি নির্ভয়ে বস্ত্রালঙ্কার ফিরাইয়া দিয়া মাতুল মহাশয় সে রাত্রিতে তাঁহার ভাগিনেয়ীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আমাকে সে দিনের ষ্টীমারে বাড়ী পাঠাইতে পিতা দাদার কাছে টেলিগ্রাফ করিলেন।

First Art পরীক্ষার আর এক মাস মাত্র বাকি। আজ কলেজ সে জন্যে বন্ধ হইতেছে। বিদ্যুৎদূত—ধন্য ইংরাজরাজের মাহাত্ম্য—মুহূর্ত্তে সংবাদ বহন করিয়া আনিলেন, এবং প্রথম আঘাতে আমাকে বজ্রাহত করিলেন। মহাসংকট—যাই কি না যাই। "To be or not to be," এক দিকে পরীক্ষা, অন্য দিকে জীবনের সুখের তিতিক্ষা। বাসা তোলপাড়। যাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে, তাঁহাদের মত নহে আমি যাই। তাঁহারা তখনকার দিল্লীর লাড্ডু শিক্ষিতা পত্নী পান নাই, আমি পাইব কেন? বেলঘরিয়ার উমেশ সংস্কৃত কলেজে পড়ে। তাহার বড় ভাই নবীন অন্য কলেজে পড়ে। দুই ভাই আমাদের বাসা হইয়া রোজ বাড়ী যায়. অনেক সময় আমাদের বাসায় থাকে। দুজনেই আমাকে বড় ভালবাসে। দুজনেই আমার মনের ভাব জানিত। সহপাঠী তারকও কলেজে অবস্থা শুনিয়া বলিল—যাইতে হইবে। তাহার বাড়ী স্মরণ হয় চাঙ্গড়িপোতা, ডায়মণ্ড হারবার। তারক এণ্ট্রেন্সে প্রথম হইয়াছিল। ফার্ষ্ট আর্টেও প্রথম কি দ্বিতীয় হইয়াছিল। কিন্তু এ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার ২/৩ দিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের এ উজ্জ্বল নক্ষত্র অস্তমিত হয়। আমি কলেজে তাহার পার্শ্বে বসিতাম এবং সে আমাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করিত। নবীন ও উমেশ দুই ভাই জোর করিয়া আমাকে অর্দ্ধরাত্রিতে জাহাজে তুলিয়া দিয়া আসিল। দেশে কি হইয়াছে জানি না। তথাপি কেমন মেঘাচ্ছন্নহৃদয়ে যাত্রা করিলাম।

অকূল সাগরের নীল-মণিময় পথ বাহিয়া বাষ্পীয় তরী তৃতীয় দিবসে ঘাটে পঁহুছিল। আমার আত্মীয়-স্বজন আমার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকে কিঞ্চিৎ পকেটস্থ করিবার বন্দোবস্ত করিয়া সেই "কুবেরের কন্যা" বিবাহ করাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। আমি সমুদায় ষড়যন্ত্র বিফল করিয়াছি। আমার যে পিতৃব্য "এক গুলিতে দুই পাখী মারিতে পারিব" বলিয়া বিবাহের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া জাহাজে আসিয়াছেন। নমস্কার করিলে আশীর্ব্বাদ মাত্র না করিয়া একটুক কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন—"বেশ সুপুত্রের কার্য্য করিয়াছ। ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছে. পুলিশ তদন্ত করিতেছে। তোমার পিতা মাতা শাশুড়ী সকলকেই জেলে যাইতে হইবে।" এবার যথার্থই মাথায় বজ্রাঘাত হইল। আমি কিছু দেখিতেছিলাম না. কিছু শুনিতেছিলাম না, কিছু বুঝিতেছিলাম না। আমি মূর্চ্ছিত অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। ফৌজদারী মোকদ্দমা কি, জেল কি, কিছুই জানি না। তবে জানি. দুইটি কোনো ভীষণ জিনিষ। পিতৃব্য মহাশয়ের তখনো দয়া হইল না। তিনি তখন পূর্ব্বোক্ত ঘটনাবলী মহাঘোরাল বর্ণে রঞ্জিত করিয়া, আমি ঊনবিংশ বর্ষ বয়স্ক বালকের মর্ম্মে অস্ত্রের উপর অস্ত্র প্রহার করিয়া ব্যাখ্যান করিলেন। আমি কিঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া পিসতত ভাই জগৎকে লইয়া এক পার্শ্বে গেলাম। পিতৃব্য মহাশয় তাহার উপর কত বাক্যাস্ত্র ও কটাক্ষাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। কিন্তু সে আমার উপযুক্ত ভাই। শুনিলাম, পূর্ব্ববরপক্ষ কন্যা হরণের জন্য ভাবী পত্নীর মাতুল ও ভগ্নীপতির নামে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে।

দেশটা উলট পালট হইতেছে। সমুদয় দেশীয় বিদেশীয় ভদ্রলোকেরা দুই দলে বিভক্ত। মহাযুদ্ধ চলিতেছে। এ সকল কথা বলিয়া সে নির্ভয়হৃদয়ে বলিল—"আপনি কোন ভয় করিবেন না। আমার মামার প্রতাপে সকলই উড়িয়া যাইবে।"

আমি কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তীরে উঠিলাম। তীরে লোকে লোকারণ্য। কত বন্ধু, অবন্ধু, পরিচিত, অপরিচিত লোক আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। রাস্তার দুই ধারে লোক সারি সারি; সকলের অঙ্গুলি আমার দিকে; কেহ বলিতেছে "বিদ্যাসুন্দর," কেহ বলিতেছে "সাবিত্রী সত্যবান্", কেহ বলিতেছে "নল দয়মন্তী", কেহ বলিতেছে "সীতাহরণ।" কত অপূর্ব্ব উপাখ্যানই সৃষ্ট হইয়াছে—আমাদের আশৈশব প্রেম, ঢাকার দুজনে একসঙ্গে পড়িতাম, খেলিতাম, বুড়ীগঙ্গায় সাঁতার দিতাম, জন্মাষ্টমীর মেলা দেখিতাম। তিনি রাঁধিয়া দিতেন আমি খাইতাম। উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম—"তুমি রাধা, আমি শ্যাম"। অন্যত্র বিবাহের প্রস্তাব হইলে ১০ বৎসরের নায়িকা অশ্রুজলে একটা পুষ্করিণী পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহাকে বস্ত্রালঙ্কার পরাইতে গেলে তিনি লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন, —"আমাকে যে বিবাহ করিবে. সে কলিকাতায়।" তিনি রুক্মিণীর মত আমার কাছে স্বহস্তে লিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তাই আমি আসিতেছি। আমার সমবয়স্ক বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া যাইতে যাইতে এরূপ কত মনোহর উপাখ্যানই শুনিলাম। বালিকার বিপন্ন মাতুল মহাশয় পথ চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার বাসার কাছ দিয়া যাইতে তিনি রোরুদ্যমান ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বুকে লইয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলেন—"আমাদের যাহা হইবে, হউক। তুমি আসিয়াছ, আর ভয় নাই।" বাসায় পঁহুছিলাম। পিতা টাকা কর্জ্জ করিতে ও নিমন্ত্রণ করিতে বহির্গত হইয়াছেন। দুই দিন পরে বিবাহ। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানের সত্যাসত্য সম্বন্ধে কত লোক, কত কথা, কত ছন্দে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি ম্রিয়মাণ। পিতা ফিরিলেন। আমি সে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিলাম। আজ ৩৮ বৎসর আমি সেই স্বর্গসুখ হইতে—অশ্রু, সরিয়া যাও, দেখিতে পারিতেছি না,—সে মহাতীর্থ দরশন ও পরশন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি! পিতা গলদশ্রু নয়নে ললাট চুম্বন করিয়া বুকে লইয়া বলিলেন—"তুই কোন চিন্তা করিস না। কুলমাতা ও ইষ্টদেবতা আমাদের সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন। যেমন নাম, মেয়েটি তেমনি লক্ষ্মী। আমি বড় সুখী হইয়াছি। কেবল আমার এক দুঃখ—সময় নাই, আমি মনের মত উৎসব করিতে পারিলাম না।" পিতা পুত্রের সম্মিলিত অশ্রুতে পিতার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল। দর্শকগণেরও চক্ষু ভিজিল। যে চিন্তার মেঘে আমার হৃদয় ছাইয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যে উড়িয়া গেল।

বাড়ী গেলাম। সরলা স্নেহময়ী মাতা বড় নিরাশ হইয়াছিলেন। কোথায় একটা বড়-মানুষের কন্যা বিবাহ করিয়া যৌতুকে ঘর ভরাইব, না একটা "কাঙ্গালিনীর কন্যা"—মা এই নামে তাহাকে অভিহিত করিতেন, বিবাহ করিতে চলিলাম। তথাপি প্রথম পুত্রের বিবাহ-আনন্দে মার প্রাণের সে নিরাশা চাপা পড়িল। পাছে পথে বিপক্ষ কোন বিভ্রাট ঘটায়—অনেক গল্প উঠিয়াছিল—পিতা স্বয়ং কন্যা আনিতে গেলেন। আমাদের বংশের বর শ্বশুরবাড়ী বিবাহ করিতে গেলে এত আড়ম্বরে, এত লোক সঙ্গে নিতে হয়—আমাদের "৩৬ জাতি" প্রজা আছে—যে 'কাঙ্গালিনীর' কথা দূরে থাকুক, অর্থশালী লোকও চোট সামলাইতে পারে না। এ জন্যে আমাদের বংশের অধিকাংশের বিবাহ নিজ বাড়ীতে হয়। শাশুড়ী এক হস্তে কন্যাকে ও অন্য হস্তে তাঁহার ৭ বৎসরের অনাথ শিশুকে পিতার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। ইহাই আমার বিবাহের যৌতুক! পিতা তখন এরূপ ঋণজালগ্রস্ত যে, আমার শিক্ষাভার বহন করাও কষ্টকর হইয়াছে। তথাপি অম্লানবদনে বলিলেন—"ঠাকুরাণি! আজ হইতে এই পুত্রও আমার হইল।" এ হৃদয় কি মানুষের?

পিতার প্রতাপান্বিত নাম, বিপক্ষেরা টুঁ শব্দ করিল না। পিতা মাতার অশ্রুজলে

আমার শুভ বিবাহ আড়ম্বরে সুসম্পন্ন হইল। মাতার অশ্রুর কারণ—যৌতুকের স্থান শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। পিতার অশ্রুর কারণ—তিনি সময়াভাবে আরো অধিক ঋণ করিয়া, আরো অধিক আড়ম্বর করিতে পারিলেন না। এরূপে ১৮৬৫ ইংরাজি নবেম্বর (কার্ত্তিক) মাসে আমার সংসার-জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইল। আমার বয়স তখন ১৯, স্ত্রীর ১০। চত্বারিংশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। হায় মা! তোমাদের পবিত্র অশ্রু কত বার মনে পড়িয়াছে। ভাবী ঘটনার ন্যায় সময়ে সময়ে—"ভাবী জীবনের ছায়া পড়ে পুরোভাগে।"

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ

আমার বিবাহবিভ্রাটের একটি প্রত্যক্ষ ফল অবিলম্বে ফলিয়াছিল। ইহাও আমার এক উদ্দেশ্য ছিল। আমার বিবাহের পরদিন হইতেই দেশের ভদ্রলোকেরা আপনার কন্যাদিগকে পাঠশালায় পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। এত দিন অনেক চেষ্টা করিয়া, অনেক বক্তৃতা করিয়া, অনেক সমাজ সংস্কারের দোহাই দিয়া একটি বালিকারও লেখাপড়া আরম্ভ করাইতে পারি নাই। এরূপ প্রস্তাব করিলেই অভিভাবকেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিতেন—"কেন? মেয়েদের লেখাপড়ার কি প্রয়োজন? তাহারা কি চাকরি করিবে?" চাকরি করাই যে এই হতভাগ্য দেশে লেখাপড়া শেখার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা বোধ হয় এখন দেশব্যাপী বিশ্বাস। তাহার উপর সকলের স্থির বিশ্বাস, লেখাপড়া শিখিলে মেয়ে বিধবা হইবে, দুশ্চরিত্র ত হইবেই। আমিও তখন একজন ক্ষুদ্র "সমাজসংস্কারক।" বুঝিলাম—Example teaches better than precepts, বক্তৃতায় এ "কুসংস্কার-রাক্ষসী" মরিবে না। তাহার জন্যে ব্রহ্মাস্ত্র চাই। গণনার ভুল হইল না। এই বিবাহ-বিভ্রাট ব্রহ্মাস্ত্রে পাপীয়সী প্রাণে মারা পড়িল। অভিভাবকেরা বুঝিলেন যে, ঘোর কলি উপস্থিত,—ঘটকালির স্থলে নির্বাচন-প্রণালী! কোথায় বিবাহের পঞ্চ বর্গ—রূপ, গুণ, ধন, কুল ও মিষ্টান্ন, মুষ্টিমুদ্রা (আমার পিতৃব্যদের সংস্কার মতে), আর সব উড়িয়া গিয়া এখন লেখাপড়া। তাঁহারা দেখিলেন, লেখাপড়া না শিখাইলে আর এই 'শিক্ষিত' যুবকদের কাছে মেয়ে বিকাইবে না। অতএব স্ত্রীশিক্ষা খরস্রোতে চলিতে আরম্ভ হইল এবং ধূমের দ্বারা যেমন পর্ব্বতে বহ্নির অস্তিত্ব ন্যায়শাস্ত্রমতে প্রতিপন্নাদিত হয়, যদি লেখাপড়ার দ্বারাও স্ত্রীশিক্ষা প্রমাণিত হয়, তবে আজ দেশ স্ত্রীশিক্ষায় টলটলায়মান। যদি অশিক্ষিতা শাশুড়ীর, কি আত্মীয়ার, কি শিক্ষিত প্রিয়তমের ঘাড়ে গৃহকর্ম্ম, এমন কি, সন্তান প্রতিপালন পর্য্যন্ত চাপাইয়া দিয়া বাঙ্গালার উপন্যাস ও বিদ্যাসুন্দর পাঠ করাই শিক্ষা হয়, তবে আজ দেশ স্ত্রীশিক্ষায় টলটলায়মান। যদি কথায় কথায় সূর্য্যমুখীর মত গৃহত্যাগ, কুন্দনন্দিনীর মত বিষপান, ভ্রমরের মত দারুণ অভিমান স্ত্রীশিক্ষা হয়, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি বিমলার চতুরতা, গিরিজায়ার চটুলতা, এবং আসমানীর বণিকতার অনুকরণে স্ত্রীশিক্ষা বল, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান। যদি অহোরাত্রি স্বামীর দোষ অনুসন্ধান ও তস্য শাসন, উপন্যাসোদ্ধৃত তীব্র বাক্যানলে তস্য অস্থি মজ্জা দাহন ও পরিবারবর্গের মর্ম্ম পীড়ন স্ত্রীশিক্ষা, তবে আজ স্ত্রীশিক্ষায় সত্য সত্যই দেশ টলটলায়মান। যদি সংসারে অসচ্ছলতা, হৃদয়ে অশান্তি, কর্ত্তব্যে ভ্রান্তি, স্ত্রীশিক্ষার ফল হয়, তবে আর ভাবনা নাই, আজ স্ত্রীশিক্ষায় দেশ টলটলায়মান।

সে দিন বাড়ী গিয়াছিলাম। শ্রাবণ মাস,—চৌদ্দ বৎসর পর শ্রাবণ মাসে বাড়ী গিয়াছিলাম। কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। পূর্ব্বে সমস্ত শ্রাবণ মাস মনসা দেবীর মূর্ত্তি সকল ভদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে স্থাপিতা হইত; সন্ধ্যার সময়ে গ্রামটি মনসা-পুঁথি পাঠের উচ্চ ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইত। প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী তাহা মহাসমারোহে পঠিত হইত। সেরূপ

অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত বৎসর বাড়ী বাড়ী রামায়ণ, মহাভারত, কবিকঙ্কণ পাঠ হইত। এক এক জন কি মধুর কণ্ঠে কি ভাবতরঙ্গ তুলিয়া সে সকল পবিত্র কাব্য পাঠ করিতেন। নবীনা, প্রবীণা, বাল বৃদ্ধ দিবসের কার্য্য সারিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সে সকল উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে শোকে ও ভক্তিতে অশ্রুবর্ষণ করিতেন, এবং প্রেমে পবিত্রিত, বীরত্বে উদ্দীপিত, পুণ্যে মোহিত, পাপে রোমাঞ্চিত হইতেন। এই মহাগ্রন্থ সকল তাঁহাদের অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদের শোণিতে শোণিতে সঞ্চারিত হইয়া, তাঁহাদের শরীর ও চরিত্র গঠন করিত, এবং কর্ম্মে নিষ্কামতা, ধর্ম্মে ভক্তি, অবিচলতা, অধর্ম্মে ঘৃণার পরাকাষ্ঠা, পুণ্যে প্রবৃত্তি, পাপে নিবৃত্তি, জীবে দয়া, সত্যনিষ্ঠা, সতীত্বে সুখ শিক্ষা দিত। এমন উচ্চ শিক্ষা, তাহার এমন সহজ উপায়, তাহার এমন দেশব্যাপী সুফল, আর কোনো দেশ কি কখনও দেখাইতে পারিয়াছে? এখন মনসা দেবী কোন কোন বাড়ী আসিয়া থাকেন। কিন্তু মনসা-পুঁথি ও অন্য পুঁথি পাঠ একরূপ বন্ধ হইয়াছে। মনসা-পুঁথি শুনিবার জন্যে আমি দেশ খুঁজিয়া লোক সংগ্রহ করিলাম। দেখিলাম, আমার বাল্যকালে যাহারা পাঠক ছিল, তাহাদের মধ্যে এখন ২/৪ জন যাহারা জীবিত আছে, তাহারাই এখনকার খ্যাতনামা পাঠক। তাহাদের উত্তরাধিকারী কেহ আর গ্রামে জন্মে নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম,—"দেশে পুঁথি কে শুনে যে, পাঠ করিতে কেহ শিক্ষা করিবে? কোন বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা এখন আর এ সকল পুঁথি শুনে না।" বুঝিলাম স্ত্রীশিক্ষায় দেশ যথার্থই টলটলায়মান। এ সকল পুঁথির স্থান উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। সীতার স্থান সূর্য্যমুখী, রামচন্দ্রের স্থান সীতারাম, সাবিত্রীর স্থান কুন্দনন্দিনী, বিপুলার স্থান বিমলা, শ্রীকৃষ্ণের স্থান সত্যানন্দ, অর্জ্জুনের স্থান জীবানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ভরত লক্ষ্মণের স্থান শূন্য। কাজে কাজেই কেবল স্ত্রীশিক্ষায় নহে, পুরুষশিক্ষায়ও দেশ টলটলায়মান। তবে আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, এই শিক্ষাবিভ্রাটের জন্যে কেবল আমার বিবাহবিভ্রাট দায়ী নহে। দায়ী সেই মহামান্য শিক্ষাবিভাগ ও বাঙ্গালার উপন্যাস।

বন্ধুর ঈর্ষা

"কি করি শকুনী মামা! বল না করি মন্ত্রণা।
পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য দেখি প্রাণ ত বাঁচে না॥

সত্য সত্যই পিতার প্রতাপে সকল বিপদ্ উড়িয়া গেল। ফৌজদারী মোকদ্দমার আর কিছু শুনা গেল না। পুলিশ না কি রিপোর্ট করিয়াছিল, 'কোন প্রমাণই পাওয়া গেল না।' শিবলাল বাবু একজন ক্ষমতাশালী কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার। তিনিও অন্য পক্ষে ছিলেন। এ শুভ বিবাহের ৬ বৎসর পর যখন রাজকার্য্যে দেশে নিয়োজিত হইয়া আসিলাম, তিনি একদিন কথায় কথায় বলিতেছিলেন—"তোমার পিতার কি দেশব্যাপী প্রতাপ ও প্রভুত্ব ছিল, তাহা আমি সে মোকদ্দমায় বুঝিয়াছিলাম। এরূপ একটা অত্যাচার হইল, অথচ আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে পারিলাম না। দেশের একটি লোক আমাদের দিকে হইল না।" এ দিকে অধিকাংশই পিতার প্রতাপে ঈর্ষান্বিত বিদেশীয় লোক ছিলেন। কিন্তু বড় সুখের বিষয় যে, যাঁহার সঙ্গে বিবাদের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাঁহাতে আমাতে কখনও কোন মনান্তর ঘটে নাই। তিনি আজ দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর অর্থ ও পদসম্পন্ন লোক এবং আমার একজন পরম বন্ধু। এ ঘটনার সময় তাঁহার সহিত আমার পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না। তবে তিনি বয়সে আমার বড় এবং তখনও একজন যোগ্য লোক বলিয়া পরিচিত; সংসার- ঘূর্ণচক্রে পড়িয়া ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কেবল আপনার

মানসিক শক্তিবলে ভাসিয়া উঠিতেছিলেন। অতএব তিনি বুঝিয়াছিলেন এই বিভ্রাটে তিনি ও আমি, উভয়েই নির্দ্দোষী। দোষী কেবল সেই অঘটনঘটনকারী প্রজাপতি ঠাকুর।

বিবাহের পর সহরে আসিয়া ৭ দিন ছিলাম। তখনও আন্দোলন অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে। আমি দিনে গৃহের বাহির হইতাম না। তাহাতেও কি রক্ষা, কত লোক বাবাকে পর্য্যন্ত আমার বিখ্যাতা স্ত্রীর এবং বিখ্যাত বিবাহের গল্পের সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা করিত। স্ত্রী সেই বালিকাবয়সেই এমন বুদ্ধিমতী ও চতুরা যে. ইতিমধ্যেই পিতা মাতার পরম আদরের পাত্রী হইয়াছিলেন। পিতার মুখে তাঁহার প্রশংসার স্রোত বহিত। আমি সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির হইলে রাস্তার উভয় পার্শ্বের দোকানে ও বাসায় আমাদের প্রণয়ের কত অপূর্ব্ব গল্পই শুনিতাম। ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য যাহাই থাকুক. মনুষ্যসমাজও বালকের মত কল্পনাপ্রিয়। বোধ করি. সেই জন্যেই পৌত্তলিক। কিন্তু বড় সুখের কথা যে. এ সকল গল্পে কুৎসা কিছুই ছিল না। থাকিবার কথাও নহে।

সেই অভাবটুকু আমার শিক্ষিত সহপাঠিগণ কলিকাতায় বসিয়া পূরণ করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহিত ছিলেন এবং নিরক্ষরা স্ত্রী বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আমার এ বিবাহে মত ছিল না। তখন "শিক্ষিতা স্ত্রী" এমন একটি "পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য" মধ্যে পরিগণিত ছিল যে, আমি চট্টগ্রাম চলিয়া আসিলে তাঁহাদের একটা ঘোরতর গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। আমার ও বালিকা ভার্য্যার উদ্দেশে এক শব্দভেদী শর ত্যাগ করিলেন। হঠাৎ এক দিন "চট্টগ্রাম স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রতি আগে" এক বিনামা পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি ছাত্রগণের কাছে বড় প্রিয় ছিলাম। বলিয়াছি, আমি সকল শ্রেণীর ছাত্রগণের সেনাপতি ছিলাম। তাহাদের সঙ্গে খেলিতম, গান শুনিতাম, তাহাদের পড়া বলিয়া দিতাম, গরিব ছাত্রদের দুঃখে কাঁদিতাম, যথাসাধ্য সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎ সাহায্যও করিতাম। নিম্নশ্রেণীর সে সকল ছাত্র এখন প্রথম শ্রেণীতে। পত্র পাইয়া তাহারা চটিয়া লাল। আমি সহরে গেলে পত্রখানি আমাকে আনিয়া দিল। তাহাতে "ট্রোজন" যুদ্ধের সঙ্গে আমার বিবাহের তুলনা করিয়া রসিকতা করা হইয়াছে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ সহপাঠীদের মধ্যে কল্পনাশক্তি কাহারও ছিল না, রসিকতার ধার কেহ ধারিতেন না। কাজে কাজেই পত্রখানি ইতর ও পচা রসিকতাপূর্ণ ছিল। তাহার সুদ সহ প্রতিশোধ দিয়া ছাত্রগণ "কলিকাতাস্থ চট্টগ্রামী ছাত্রদের ··· ীপে" এক প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়া দেখাইলেন। উভয় পত্র দেখিয়া আমি বড় হাসিলাম। বন্ধুদিগের এহেন ব্রহ্মাস্ত্র বায়ব্যাস্ত্রে উড়িয়া গেল। ছাত্রগণকে ভারতচন্দ্রের সেই মহাবাক্য স্মরণ করাইয়া দিলাম—

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে।"

তখন সকলেই নূতন 'কপালকুণ্ডলা' পড়িয়াছে। বঙ্কিমবাবুর সেই মহাবাক্যও স্মরণ করাইয়া দিলাম—"পাঠক! তুমি অধম, তাহা বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?" এরূপ শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণের দ্বারা ছাত্রগণকে প্রত্যস্ত্রত্যাগ হইতে নিরত করিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া গেলাম।

পত্রখানি যাহার লেখা, আমি বুঝিয়াছিলাম—রচনা তাহার নহে। লেখক সিদা ছেলে। বাসায় পঁহুছিয়া তাহাকে গোটা দুই ব্যঙ্গোক্তি করিলে সে কাঁদিয়া ফেলিল এবং সকল রহস্য ভেদ করিয়া দিল। তখন শুনিলাম, এ মহাপত্রের ব্যাস আমার দাদা মহাশয়, গণেশ আমার পরম বন্ধু চন্দ্রকুমার। পৌরাণিক সময়ে 'নকলনবিশ' ছিল না; কারণ, হাতের লেখা ধরা পড়িবার ভয় ছিল না। এই ঐংরাজিক সময়ে নকলনবিশ সর্ব্বেসর্ব্বা। গরিব নকলনবিশ আমার মর্ম্মভেদী ব্যঙ্গোক্তিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বার বার ডাকিয়া বলিতে লাগিল—"ও চন্দ্রকুমার বাবু ও অখিল বাবু! এখন চুপ করিয়া রহিলেন কেন?" তাঁহারা ও বিবাহিত সহ-অধ্যায়িগণ লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে পড়িতে লাগিলেন। অবিবাহিত সহ-

অধ্যায়িগণ মুখ টিপিয়া, কেহ বা হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল—দৃশ্যটি বড় Serio-comic বা লঘুগম্ভীর হইয়া উঠিল। চন্দ্রকুমার একেবারে মর্ম্মান্তিক লজ্জিত হইয়া সন্ধ্যার পর নির্জ্জনে ছাতের উপর আমার কাছে গিয়া বসিল এবং বলিল,—"কি যে অন্যায় করিয়াছি. পত্রখানি প্রেরিত হইবার পর আমি বুঝিয়াছি। আমি অখিলবাবুর তাড়নায় ভ্রান্ত হইয়া এরূপ করিয়াছি। আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি উপহাস বলিয়া উড়াইয়া দিবে। তুমি যদি তাহাতে মনঃকষ্ট পাইয়া থাক, তবে আমাকে ক্ষমা কর।" আমি বলিলাম—"পত্রে আমি কষ্ট পাই নাই. তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। তবে কষ্ট পাইয়াছি তোমার মনের ভাব দেখিয়া। আমি তোমাকে যেরূপ প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি ও শ্রদ্ধা করি, তুমি আমাকে যে সেরূপ ভালবাস না, এই প্রথম পরিচয় পাইলাম। তোমার মনের কোণায় কোথায় যেন অলক্ষিত ভাবে একটুকু ঈর্ষা লুকাইয়া আছে। কেন ভাই! আমি ত লেখাপড়া কিছুতেই তোমার সমকক্ষ নহি, কখনও তোমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারি নাই। তোমাকে আমার গুরু ও অভিভাবকের মত জানি। তোমার মনে এমন ভাব হইবে কেন?" চন্দ্রকুমার বলিল, তাহার ভুল হইয়াছে। আমিও বিশ্বাস করিয়া লইলাম যে, বাসায় আমার বিবাহের আন্দোলনের তরঙ্গে পড়িয়া চন্দ্রকুমারও ভুল করিয়াছে। কিন্তু এ জীবনে আরো ২/১ বার এরূপ সন্দেহ হইয়াছে, অন্য লোকেরও হইয়াছে। আমি এখনও বুঝিতে পারি না. চন্দ্রকুমারের আমার প্রতি মনের ভাব এরূপ হইবে কেন? তাহার অনিচ্ছায় সময়ে সময়ে কথঞ্চিৎ ঈর্ষার দাগ তাহার পবিত্র হৃদয়ে পড়িবে কেন? চন্দ্রকুমারের কোন সুখের. সৌভাগ্যের, সৎকর্ম্মের কথা শুনিলে আমার ত হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। চন্দ্রকুমারকে আমি এই বয়সেও একটি দেবতার মত পূজা করি।

পরদিনই First Art পরীক্ষা আরম্ভ হইল। আমি ত এক মাস কিছুই পড়িতে পারি নাই, শুনিলাম, এই এক মাস চট্টগ্রামের মত কলিকাতাস্থ চট্টগ্রামী উপনিবেশটিও উলট পালট হইয়া গিয়াছে। দিন নাই, রাত্রি নাই, কেবল আমার বিবাহের কথা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন ও সমালোচনা। কখন কখন ঘোরতর বিবাদ ও হাতাহাতি। পড়াশুনা একপ্রকার বন্ধ। তাহার এক ফল,—সেই মহাপত্র। দ্বিতীয় ফল—পরীক্ষার নিষ্ফলতা। যদিও প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইলাম বটে, কিন্তু আমি কি চন্দ্রকুমার, কেহই বৃত্তি পাইলাম না। জগবন্ধু ঢাকা গিয়াছিল। সে এই আন্দোলনের তরঙ্গে পড়ে নাই। কেবল জগবন্ধু বৃত্তি পাইল : পাইয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিল।

নৌযাত্রা

"হংসডিম্ব হেন ডিঙ্গা মধুকর ভাসে।
ঝলকে ঝলকে জল লয় চারি পাশে॥
ঘুরনিয়া জলে ডিঙ্গা ঘন দেয় পাক।
পাকে ফিরে ডিঙ্গা যেন কুম্ভকারের চাক॥"—কবিকঙ্কণ।

পরীক্ষার পর সকলে বাড়ী চলিলাম। দেশের একজন ভদ্রলোক দোকানদার এক 'বালাম' নৌকায় তাঁহার জিনিষপত্র লইয়া যাইতেছিলেন। তিনি আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন এবং কিঞ্চিৎ কবিকল্পনা খাটাইয়া আমাকে বলিলেন যে, নানা দেশ দেখিতে দেখিতে, নাচিতে নাচিতে ৭/৮ দিনে গিয়া দেশে পৌঁছিব। আমিও মনে করিলাম, সমুদ্র-পথে যাইতে কেবল জল ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। কেবল নীলাম্বুর পশ্চাতে নীলাম্বু, তাহার পশ্চাতে নীলাম্বু। অতএব এবার এ পথে যাইতে আমারও বড় সাধ হইল। তাহার উপর বাঙ্গালী

unadventurous বলিয়া চির-নিন্দিত, সে কলঙ্কও দূর হইবে। চন্দ্রকুমারকে আমি কবিত্বপূর্ণ ছবি দেখাইয়া অনেক অনুনয় করিয়া সম্মত করিলাম। তিনিও সঙ্গী হইলেন। আর হইলেন সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ষষ্ঠী। তাহাকে আর বিশেষ কিছু বলিতে হইল না। কেবল পথে পথে কামিনীর গল্প করিব বলাতে প্রেমিক পুরুষ হাসিতে হাসিতে অধীর হইয়া বলিল—"Yes, আমিও তোমার সঙ্গে go করিব। ষ্টীমারে যাওয়া good thing নহে।" অন্য সহপাঠীদের অদৃষ্ট ভাল, তাঁহারা ষ্টীমারে গেলেন। ষষ্ঠী তাহাদিগকে বাঙ্গালীর adventure হীনতা লইয়া প্রত্যেক কথায় এক এক "আড্ডা" বসাইয়া তাহার না ইংরাজি না বাঙ্গালা ভাষায় অনেক বক্তৃতা ও উপহাস করিল।

বেলেঘাটা হইতে তরী গজেন্দ্রগমনে চলিল। বরিশাল ফেলিয়া গেলাম। নূতন নূতন স্থান দেখিতে বেশ একটুকু আমোদ বোধ হইতে লাগিল। কেবল "ঝালকাঠী"তে সিঁড়ির উপর বসিয়া স্নান করিবার সময় ঘটি পড়িয়া গেলে আমি তাহার পশ্চাতে ঝাঁপ দিলাম। ঘটি উদ্ধার করা দূরে থাকুক, আমি বিশাল নদীর খর স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। তবে আমি সন্তরণপটু, শিকারপটু ও ক্রীড়াপটু ছিলাম। অতি কষ্টে সাঁতারিয়া বহু দূর ভাসিয়া গিয়া কূল পাইলাম। তাহার পর নিরাপদে স্বনামখ্যাত নাবিকাতঙ্ক "জালছিড়া"তে উপস্থিত। "জালছিড়া" চর-সমাচ্ছন্ন বঙ্গোপসাগরের একটি সঙ্কটপূর্ণ অংশ। অতি প্রভাতে ভাটায় পাড়ি আরম্ভ করিয়া প্রায় 'বার্মানি'র উপকূলে পঁহুছিয়াছি, সকলের মুখ শুষ্ক, ভয়ে প্রাণ গতিহীন। মাঝি-মাল্লাগণ প্রাণপণ করিয়া নৌকা চালাইতেছে। আর দুই চারি মিনিট সময় পাইলে কূল পাইয়া খালে প্রবেশ করিতে পারি। এমন সময়ে দূর হইতে গর্জ্জন করিতে করিতে শ্রেণীবদ্ধ উর্দ্ধফণা অযুত ভুজঙ্গের মত জোয়ারের বিশাল তরঙ্গ-শ্রেণী আসিতে লাগিল। মাঝিগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। জোয়ারের আঘাতে আমাদের হাল ভাঙ্গিয়া গেল ; মাঝিগণ "আল্লা আল্লা" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, এবং "ঘুরনিয়া জলে ডিঙ্গা ঘন পাক" দিতে দিতে জোয়ারের মাথায় সমুদ্রের দিকে ছুটিল। আমাদের মহাবিপদ্ দেখিয়া, যে সকল তরী তীরে লাগিয়াছিল, তাহাদের আরোহিগণ হাহাকার করিতে লাগিল ও দক্ষ মাঝিগণ "পাল তুলিয়া দে! পাল তুলিয়া দে!"—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। দোকানদার মহাশয় মাথা কুটিয়া তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের জন্যে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ও চন্দ্রকুমার নীরব স্তম্ভিত। চন্দ্রকুমারের চক্ষে জলধারা নীরবে বহিতেছে। বিপদে আমি তাঁহার অপেক্ষা সাহসী ও স্থির। আর ষষ্ঠী? ষষ্ঠী কাঁদিতে কাঁদিতে একবার দাঁড় টানিতেছে, একবার "ভাই! কি হইল" বলিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিতেছে। ঘোরতর বিপদের সময় না হইলে সে মূর্ত্তি ও তাহার কার্য্য দেখিয়া কাহার সাধ্য, না হাসিয়া থাকিতে পারে? যাহা হউক, মাঝিগণ পাল তুলিয়া দিলে, নৌকা বহুদূরে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে তীরে লাগিল। সেখান হইতে নৌকার 'বহর' প্রায় তিন মাইল। বহরের এক নৌকায় একজন মুন্‌সেফের সেরেস্তাদারকে দেখিয়াছিলাম। অগত্যা তাঁহার নৌকায় আমরা তিন জন যাইব স্থির করিয়া আমি তাঁহার নৌকার অন্বেষণে চলিলাম। নৌকায় গিয়া শুনিলাম, তিনি প্রায় দুই মাইল ব্যবধান এক গ্রামে আহার করিতে গিয়াছেন। সেখানে গেলাম। তিনি রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বিপদের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন। "তোর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, তুই স্নান করিয়া আহার কর্"—বলিয়া এক বাটি তৈল আমার মাথায় ঢালিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, আমার সঙ্গীদের উপবাসে ফেলিয়া আমি আহার করিব না। লোকটি আমার পিতার আশ্রিত ছিলেন, বড় জিদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৌকায় যাইব স্থির করিয়া, আমি আহার না করিয়া চলিয়া গেলাম। এখন আর এক বিপদ্। যে সকল চরস্থ খাল আমি কাদা হাঁটিয়া পার হইয়া আসিয়াছিলাম, এখন জোয়ারের জলে তাহারা বিস্তৃত নদী হইয়া

পড়িয়াছে। কয়েকটি ত আমি সাঁতারিয়া পার হইলাম। কিন্তু শেষটি এত বিস্তৃত ও স্রোত এত প্রখর, এবং সমুদ্রের এত নিকট যে, সাঁতারিয়া পার হওয়া অসম্ভব। পৌষ মাস, সন্ধ্যা সমাগত, গ্রাম বহু দূর। সমস্ত দিবসের বিপদে, অনাহারে ও পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন। আবার যে সে সকল নদী সন্তরণ করিয়া গ্রামে যাইব, সে শক্তি নাই। সূর্যদেব জ্বলন্ত সুবর্ণ-কলসীর ন্যায় সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবিতে লাগিলেন। তাহা দেখিতে দেখিতে, বস্ত্র-হীন সিক্ত দেহে, পৌষের শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সমস্ত দিনের মধ্যে প্রথম আমার চক্ষে জল আসিল। স্নেহপ্রতিমা মাতা ও পিতার মুখ মনে পড়িতে লাগিল, নববিবাহিতা বালিকা ভার্য্যার মুখ, ছোট ভাই ভগিনীদের মুখ মনে পড়িতে লাগিল। নদীর অপর পারে আমাদের নৌকা দেখা যাইতেছিল। সঙ্গিগণ আমার বিপদ্ দেখিয়া ছুটাছুটি করিতেছেন। কি বলিতেছেন, কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। কোনও উপায় না দেখিয়া স্থির গম্ভীর ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে ভগবান্‌কে ডাকিতেছি, এমন সময়ে কোথা হইতে একখানি ঘাসভরা নৌকা আসিল। উহা প্রকৃতই আমার পক্ষে রবিবাবুর সোনার তরী হইল। বহু দূর জল ভাঙ্গিয়া গিয়া, সেই নৌকায় উঠিয়া অবশেষে নদী পার হইলাম। শুনিলাম, নৌকার হাল মেরামত হইয়াছে। আমরা রাত্রিতে নৌকা খুলিলাম, পরদিন দ্বিপ্রহর সময়ে সীতাকুণ্ডের সম্মুখে সমুদ্রতীরে পঁহুছিলাম। সমুদ্র হইতে প্রভাত অবধি চন্দ্রশেখর শৈলমালার পূর্ব্ব আকাশ-সীমায় কি অবর্ণনীয় শ্যামল তরঙ্গায়িত শোভাই দেখিতেছিলাম। নয় দিন অতীত হইয়া গিয়াছে। এখান হইতে নৌকায় চট্টগ্রাম সহরে যাইতে, শুনিলাম—আরো তিন চারি দিন লাগিবে। তখন দোকানদার মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া, সেখান হইতে হাঁটিয়া যাইব স্থির করিলাম। কারণ, নৌকায় আহার্য্য কিছুই নাই, দুই তিন দিন যাবৎ প্রায় উপবাসেই কাটাইয়াছি। হাতে টাকা পয়সাও কিছুই নাই। কোথায় সাত দিনে চট্টগ্রাম পঁহুছিব, আর কোথায় বার তের দিন! প্রস্তাব আমার; সঙ্গীরাও নিরুপায় হইয়া সম্মত হইলেন। দুই তিন মাইল হাঁটিয়া সন্ধ্যার পর সীতাকুণ্ডে পঁহুছিলাম। সেখানে আমাদের দুইটি পৈতৃক বাসাবাড়ী আছে। তাহাতে আমাদের পুরোহিত অন্যূন একজন সর্ব্বদা থাকেন। শম্ভুনাথ-বাড়ীতে নিত্য পূজা দিবার জন্যে ইঁহাদের ব্রহ্মোত্তর আছে। আমরা যেন আকাশ হইতে খসিয়া পড়িয়াছি—পুরোহিতগণ দেখিয়া একেবারে অবাক্। শেষে সীতাকুণ্ডে একটা হুলুস্থূল হইবার উপক্রম হইল। সকলে বলিলেন, প্রাতে মোহন্তের হাতী ঘোড়া আনাইয়া দিবেন। আমরা তাহাতে যাইব। কিন্তু আমাদের মনে এক ভয় হইল। আমি ও চন্দ্রকুমার বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, এরূপ কাঙ্গালের বেশে সীতাকুণ্ডে আসিয়া একটা হুলুস্থূল করিয়া গেলে আপন আপন পিতার কাছে বড় তিরস্কারভাজন হইব। অতএব অর্দ্ধ-রাত্রিতে যখন চন্দ্রোদয় হইল, আমরা নিঃশব্দে সীতাকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া চলিলাম। সর্ব্বাগ্রে আমি, পশ্চাৎ চন্দ্রকুমার, মধ্যে ষষ্ঠী। সে আগে কি পিছে চলিবার লোক নহে। শৈলমালার পাদমূল বাহিয়া পথ চলিয়াছে। চন্দ্রালোকে নীরব গিরিশ্রেণী, পাদমূলস্থ অটবীসমাচ্ছন্ন গ্রাম, দীর্ঘ রজতসূত্রের মত পথ ও তাহার উভয় পার্শ্বস্থ নানাবিধ শস্যশোভিত ক্ষেত্রসকল খণ্ডে খণ্ডে কি শোভাই বিকাশ করিতেছিল। আশৈশব আমি প্রকৃতির উপাসক। আমার হৃদয় এরূপ আনন্দে উচ্ছ্বসিত যে, পথশ্রম আমার কাছে কিছু বোধ হইতেছিল না। শীত-কালে এ পথে ব্যাঘ্রের ভয়। তাহার উপর ষষ্ঠীর ভূতের ভয় ত আছেই। অস্ত্রের মধ্যে আমার হাতে একটি কাষ্ঠের প্রকাণ্ড বাঁশী। যখন পর্ব্বতের বড় নিকটে আসিয়া পড়ি, যখন অন্য পার্শ্বস্থ কোন বৃক্ষশ্রেণীর নিবিড় ছায়ার অন্ধকারে প্রবেশ করি, তখন ষষ্ঠী ভয়ে আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে। আমি উচ্চ হাসি হাসিয়া খুব উচ্চৈঃস্বরে বাঁশী বাজাই ও পর্ব্বত তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনি তুলিতে থাকে। কখন বা পার্শ্বের দোকানের ভগ্ননিদ্র দোকানদার তজ্জন্যে কিঞ্চিৎ মিষ্ট সম্ভাষণ করে। একে আমরা তিন জনই বালক, তাহাতে

কখনও দূরপথ হাঁটিয়া যাই নাই। চলিতে পারিব কেন? দুই তিন ক্রোশ যাইতে যাইতেই পায়ে ফোস্কা পড়িয়া গেল। তখন জুতা খুলিয়া পদাতিক মহাশয়দের মত চাদরের দ্বারা কোমরে বাঁধিয়া লইলাম। ক্বচিৎ দুই একজন পথিকের সঙ্গে, দুই একখানি গরুর গাড়ীর সঙ্গে দেখা হইতেছিল। তিনটি এরূপ আকৃতির বালক এরূপ ভাবে চলিতেছে দেখিয়া, তাঁহারা সকলে অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কুল শীলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর না পাইয়া বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কেহ বা গালি দিলেন। উষা দেবী যখন আপন মনোহারিণী শোভা পূর্ব্বাকাশে ধীরে ধীরে ভাসাইতে লাগিলেন, আমরা কুমিরা ষ্টেশনের সমক্ষে একটি পুষ্করিণীর পাড়ে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। পুলিশ সব-ইন্‌সপেক্টার মহাশয় মুখ ধুইতে আসিয়া আমাকে চিনিয়া ফেলিলেন ও গ্রেপ্তার করিলেন। তিনি বলিলেন—তিনি আমার পরোপকারী পিতার কাছে অশেষরূপে উপকৃত। তিনি আমাদিগকে পাল্কী করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। আমাদের অবিলম্বে সহরে পঁহুছিবার বিশেষ প্রয়োজনতা-ব্যঞ্জক এক উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার হস্ত হইতে বহু কষ্টে অব্যাহতি লাভ করিয়া, আমরা তখনই আবার চলিলাম।

ব্যাঘ্র-ভয়ে ও ভূত-ভয়ে ষষ্ঠী সমস্ত রাত্রি নীরব ছিল। যেই প্রভাত হইল, তাহার মুখে শতমুখী গালির স্রোতস্বতী বহিতে লাগিল। ষষ্ঠী একজন ছোটখাট গালির ভগীরথ। পূর্ব্ববাঙ্গালা, পশ্চিম-বাঙ্গালা, তাহার মধ্যে মধ্যে ইংরাজি-সম্মিলিত সে গালি এক অপূর্ব্ব জিনিস। আমি তাহার সকল বর্ত্তমান দুঃখের মূল। অতএব গালির স্রোত অজস্র ধারায় আমার মস্তকে বহিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে "আমার বড় ক্ষিধা পাইয়াছে, আমি না খাইলে যাইতে পারমু না," বলিয়া বসিয়া পড়িল। সম্মুখে মদনের হাট। পাওয়া যায়—ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডের মত চিড়া ও মাটি কাঁকর মাছি মিশ্রিত গুড়। এই উভয় উপকরণে তাহার এক কচ্ছ পুরিয়া দিলে ষষ্ঠী চলিতে লাগিল। বাম হাতে অর্দ্ধখোসামুক্ত পক্ব রম্ভা ও দক্ষিণ হস্ত কচ্ছে, উহা মুখগহ্বরে দ্রুতবেগে উঠিতেছে পড়িতেছে। রাস্তার লোক যে দেখিতেছে, সে একবার না হাসিয়া যাইতেছে না। চট্টগ্রাম সহরের প্রবেশ-পথে চক্রাকারে এক গিরিশ্রেণী দুর্গবৎ দাঁড়াইয়া আছে। তাহা ভেদ করিয়া সংকীর্ণ পথ। নাম 'খুলসি'। ষষ্ঠীর আহার ফুরাইয়াছে। সে এখানে আবার বসিয়া পড়িল, কিছুতে যাইবে না। আমি কিছু দূরে গিয়া একজন পথিকের সঙ্গে দু-চারটা কথা কহিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহাভয়াকুল কণ্ঠে বলিলাম—"শুনিয়াছ মামা! এখানে কাল ঠিক এমন সময়ে বাঘে একটি লোক মারিয়াছে।" ষষ্ঠী আর কথাটি মাত্র না কহিয়া, তোপের গোলার মত ছুটিয়া এক দৌড়ে খুলসি পার হইয়া গিয়া, এক বৃক্ষতলায় পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আমাকে গালি দিতে লাগিল। এখান হইতে সে কিছুতেই যাইবে না। আমরা চলিয়া গেলাম। বাসাবাটীর পশ্চাৎদ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া, পদাতিকের পোষাক ছাড়িয়া, পিতার পবিত্র চরণে গিয়া প্রণত হইলাম। বিলম্ব দেখিয়া করুণাময় পিতা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছিলেন। বুকে লইয়া কাঁদিয়া কত স্নেহামৃত বর্ষণ করিলেন। সেই স্বর্গে মাথা রাখিয়া আমি সকল শ্রম ভুলিয়া নব জীবন পাইলাম। আমি তাঁহাকে বিপদ ও কষ্টের কথা কিছুই বলিলাম না। কিন্তু কিছু পরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ষষ্ঠী আসিয়া আমার নামে নালিশ করিতে উপস্থিত। প্রত্যেক কথার অগ্রে ও পশ্চাতে এক একটি "আজ্ঞা' বসাইয়া তাহার সে অদ্ভুত ভাষার সমস্ত নৌ-যাত্রার বিবরণ তিলকে তাল করিয়া পিতাকে বলিয়া ফেলিল। সে ভাষা, সে বর্ণনা ও সে মুখভঙ্গি আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই। আর বুঝাইয়া দিল, আমি দুর্বৃত্ত এ সমস্ত বিপদের কারণ। পিতা আবার কাঁদিয়া ফেলিলেন ও আমাকে বহুতর ভর্ৎসনা করিলেন। সে ভর্ৎসনাই কত মধুর! ষষ্ঠী উঠিয়া যাইবার সময় আমি সঙ্কেত করিয়া বলিলাম—"আচ্ছা, ইহার প্রতিশোধ লইব।" সে আবার মুখ ফিরাইয়া, আমার নামে এক

নম্বর নালিশ দাখিল করিয়া, ভেনর ভেনর করিয়া চলিয়া গেল। আমোদটা হইয়াছিল ভাল।
চব্বিশ মাইল পথ হাঁটিয়া সমস্ত পায়ে এরূপ অবিরল ফোস্কা পড়িয়াছিল যে, সাত দিন
আর এক পা চলিতে হয় নাই।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন

অদৃষ্টাকাশ ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। পিতা কিছু দিন মুনসেফি করিয়া আবার ওকালতিতে উপস্থিত হইয়াছেন। দেশব্যাপী বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ওকালতি করিলে অশেষ অর্থ উপার্জ্জন করিবেন। এ বিশ্বাসের বিশেষ কারণও ছিল। তিনি যেরূপ নামে গোপীমোহন, রূপেও গোপীমোহন ছিলেন। সুন্দর, সুগোল, সুগৌর, সমুজ্জ্বল, মাধুর্য্যমণ্ডিত দীর্ঘ মূর্ত্তি। সুকেশ ও সুগুম্ফশোভিত মুখমণ্ডলে বিস্তৃত ললাট। আয়ত বিস্ফারিত নয়নে নীলমণিসন্নিভ তারাযুগল মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-তেজে প্রজ্বলিত এবং সতত স্নেহসিক্ত। সমুন্নত সুবঙ্কিম নাসিকা। ঈষৎস্থূল ওষ্ঠাধর। প্রশস্ত বক্ষ, ক্ষীণ কটি, আজানুলম্বিত ভুজবল্লী। সমস্ত দেহ হইতে যেন মাধুর্য্যমণ্ডিত বীর্য্য ও সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির ঐশ্বর্য্য উছলিয়া পড়িতেছে। সুরসিক, সুচতুর, সুবক্তা। শত্রুও একবার মুখ দেখিলে, একবার কথা শুনিলে মুগ্ধ হইত। রূপের আভায়, গুণগরিমায়, বংশগৌরবে, পদমর্য্যাদায়, সম্পদে নিষ্কামতায়, বিপদে নির্ভীকতায় পিতা তখন দেশে অদ্বিতীয়।

> "সমাজের শিরোমণি, সদ্‌গুণ-ভাণ্ডার,
> বিপদে প্রসন্নমুখ, মোহন আকার,
> সরল হৃদয় পর-দুঃখে ম্রিয়মাণ,
> প্রীতিরসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান।
> চতুর, মধুর-ভাষী সাহসে অতুল
> এ দেশে দুজন নাহি তাঁর সমতুল।"

তিনি সমস্ত জীবন মোকদ্দমা ঘাঁটিয়া কাটাইয়াছেন। অতএব তিনি যে একজন শ্রেষ্ঠ উকিল হইবেন, লোকে বিশ্বাস করিবে না কেন? ব্যবসায়ের আরম্ভেই তিনি একেবারে উকিলদিগের শীর্ষস্থানে উঠিলেন। কিন্তু কৃতী উকিলের সেই নীচতা ও ধূর্ত্ততা; সেই প্রবঞ্চনা ও অর্থগৃধ্নুতা, তাঁহার প্রশস্ত দয়ার্দ্র হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে নাই। সর্ব্বশেষে তাঁহার অবসর নাই। প্রভাতে উঠিয়া পূজায় বসিতেন, উঠিতেন নয় কি সাড়ে নয়টার সময়ে। বৈঠকখানাভরা মক্কেল। তাহাদের সকলের সঙ্গে কথা কহিবারও সময় হইত না। তাহার পর কাচারি। কাচারি হইতে চার পাঁচটায় ফিরিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেন ও বন্ধুদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন। সন্ধ্যা হইবা মাত্র আবার পূজায় বসিতেন, রাত্রি তিন চারিটার পূর্ব্বে উঠিতেন না। ওকালতির কার্য্য করিবেন কখন্? এতাবৎ কারণে ও বিশেষতঃ ব্যবসায়টিও তাঁহার কাছে এত মনুষ্যত্বশূন্য ও জঘন্য বোধ হইল যে, তিনি আবার মধ্যে মধ্যে মুনসেফিতে যাইতে লাগিলেন। তাহাতে মক্কেলের বিশ্বাস উবিয়া যাইতে লাগিল এবং ব্যবসায় একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। তিনি আর কিছু দিন জীবিত থাকিলে পাকা মুনসেফ হইতেন। তাঁহার সমসাময়িকেরা সবজজি করিয়া এখন পেন্‌সন্ লইয়াছেন। কিন্তু সে ভাগ্য আমাদের ছিল না। এখন অবস্থা এত শোচনীয় হইল এবং পিতা এত ঋণগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি আমার শিক্ষাভার বহন করিতেও অসমর্থ হইয়া উঠিলেন। বাড়ী গিয়া শুনিলাম, আমি টাকার জন্যে পত্র লিখিলে মাতাকে পড়িয়া শুনাইয়া দুজনে অশ্রু বর্ষণ করিতেন,—না, আমি আর লিখিতে পারিতেছি না। অশ্রুতে আমার নয়ন অন্ধকার করিয়া

ফেলিতেছে। বুক ভাসিয়া যাইতেছে। মাতা কাঁদিতেন, আর এ অবস্থার কথা আমাকে বলিতেন। হায়! এই অশ্রুর এক বিন্দুও যে মুছাইব, আমার ভাগ্যে বিধাতা লিখিয়াছিলেন না।

ভগ্নহৃদয়ে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলাম। আমার বিবাহের কল্যাণে আমি ও চন্দ্রকুমার উভয়ে বৃত্তি হারাইলাম, 'প্রেসিডেন্সি' কলেজে পড়িবার আশাও সেই সঙ্গে অতল জলে ডুবিল। জগবন্ধু ঢাকা হইতে বৃত্তি লইয়া আসিয়া সে কলেজে পড়িতে লাগিল। আমরা দুই জন জেনেরেল এসেম্‌ব্লি কলেজে (General Assembly College) পড়িতে লাগিলাম। পিতাকে আর আমার শিক্ষার ব্যয়ের জন্যে বিরক্ত করিব না স্থির করিয়াছিলাম। দুইটি ছাত্র-শিক্ষার (private tution) জোগাড় করিলাম। একটি বড়বাজারে—ছাত্র আশু। আর একটি সিমলায়—ছাত্র নিবারণ। আশু ছেলেমানুষ, হিন্দু স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। নিবারণ আমার সমবয়স্ক, মেট্রপলিটন একাডেমির প্রথম শ্রেণীতে পড়ে। দুইটি বড় সুন্দর, সরল ও স্নেহময়। আমাকে বড় ভালবাসিত। নিবারণ, হাইকোর্টের জজ অনুকূল বাবুর জামাতা। আমার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করিত। তাহাদের সেই আদর, সেই সহৃদয়তা, আমি এ জীবনে ভুলিব না। দুটিই আমার বড় দুঃখের দুঃখী, সুখের সুখী ছিল। আমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। বালকেই বালককে কেবল এরূপ ভালবাসিতে পারে। আমার কষ্ট যত দূর লাঘব করিতে পারে, তাহার যথাসাধ্য তাহারা চেষ্টা করিত। আপনারা চেষ্টা করিয়া পড়া শিখিয়া রাখিত। আমি গেলে আমাকে কবিতা আওড়াইতে ও গল্প করিতে বলিত। বৃষ্টির দিন গেলে রাগ করিত। তাহারা আগে ভাল ছেলে ছিল না। কিন্তু স্নেহের এমনি মোহিনী শক্তি, তাহারা এখন বেশ ভাল ছেলে হইয়া উঠিল। অভিভাবকেরা আমার উপর বড় সন্তুষ্ট। বেতনের উপর পারিতোষিক দিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন, আমি বড় পরিশ্রম করিয়া পড়াইতেছি। তাঁহারাও আমাকে বড় ভালবাসিতেন এবং আমার চেহারার ও চরিত্রের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ১০৲ টাকা করিয়া ২০৲ টাকা বেতন পাইতাম। আনিয়া চন্দ্রকুমারের ছোট ভাই হরকুমারকে দিতাম। হরকুমার আমার বাসা খরচ চালাইত। আমার ছাত্র দুটির জন্যে আমার এখনও প্রাণ কাঁদে। জানি না, এখন তাহারা কোথায় কি অবস্থায় আছে। চেষ্টা করিয়াও তাহাদের উদ্দেশ পাই নাই।

যাহা হউক, খরচ এক প্রকার চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে পিতাও কিছু টাকা পাঠাইতেন। আমি এরূপ ভাবে পড়িতেছি বলিয়া লোকের মুখে শুনিয়া করুণার দেব দেবী উভয়ে সর্ব্বদা কাঁদিতেন। হায়! স্নেহপ্রাণ যুগল। আমার মনে ত কোন দুঃখ বোধ হইত না। টাকা চাহিয়া আর তোমাদের মনে কষ্ট দিতে হইতেছে না—ইহাতে বরং আমার হৃদয় এক অভিনব আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পটুয়াটোলা লেনে বাসা। বড়বাজারে, সিমলার ও হেদোয়া পুকুরে কলেজে যাইতে আসিতে আমায় দিন প্রায় বার তের মাইল রাস্তা হাঁটিতে হইত। সকালে সিমলায় ও সায়াহ্নে বড়বাজারে যাইতে হইত। অতএব পড়িব কখন্? ছাত্র দুটি আমার উপর এরূপ দয়া না দেখাইলে আমার পড়াই হইত না। তাহার উপর বি. এ. শ্রেণীর সমুদায় পুস্তক কিনিতে টাকা কোথায় পাইব? চাহিলে পিতা কর্জ্জ করিয়া পাঠাইতেন। অতএব চাহিলাম না। দুই এক্খানি বহি মাত্র কিনিলাম। সহপাঠীদের অবসরমতে অবশিষ্ট বহি চাহিয়া লইয়া পড়িতে হইত। কেহ কেহ তজ্জন্যে বিরক্ত হইতেন, কটূক্তি করিতেন। দুঃখের মুখ দেখিয়া অবধি আমার উদ্ধত স্বভাব ঘুচিয়া হৃদয় কোমল ও তরল হইয়া উঠিতেছিল। তাহা বিনীতভাবে সহিতাম। অধিকাংশ চন্দ্রকুমারের বহি নিয়া পড়িতাম। এরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। শীতের সময় বাড়ী গেলাম।

বিচার-বিভ্রাট

"A Daniel come to judgment!"

ইংরাজ-রাজ্যের গর্ব্বপূর্ণ একটি সুবিচারের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি। এখানে আর একটি দিব। কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাদের কিছু দিন হইতে একটি উড়ে চাকর আছে, নাম রঘু। সে একজন সহবাসীর সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করাতে তাহাকে আমরা সম্যক্ বেতন দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম। কলিকাতাবাসী উড়িয়াদের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। কিছু দিন পরে কলিকাতা Small Cause কোর্ট হইতে আমার, চন্দ্রকুমার ও জগবন্ধুর নামে নিমন্ত্রণপত্র উপস্থিত। বাদী রঘুনাথ। দাবি তাহার ৩০৲ টাকা বেতন বাকি! সে যত দিন চাকরি করিয়াছে, তাহার সমুদায় বেতন একত্র করিলেও ৩০৲ টাকা হইবে না। আমরা স্তম্ভিত হইলাম। কলিকাতারূপ মহা অরণ্যে আমরা তিনটি ক্ষুদ্র বিদেশী ছাত্র। ধর্ম্মাধিকরণের—ইংরাজের প্রতিষ্ঠিত বিচারালয় ধর্ম্মাধিকরণই বটে—কি মামলা মোকদ্দমার কোন খবরই রাখি না। ঘোরতর বিপদ উপস্থিত। নিরূপিত দিবসে শুষ্কপ্রাণে ধর্ম্মতলার ধর্ম্মাধিকরণে—ধর্ম্মের উপযুক্ত স্থান ও গৃহ!—গিয়া উপস্থিত হইলাম। অমনি কালীঘাটের পাণ্ডার মত এক পাল লোক আসিয়া আমাদিগকে টানাটানি আরম্ভ করিল। কিছুই বুঝিতেছি না। শেষে একজন জয়ী হইয়া আমাদিগকে বলিদানের পাঁঠার মত টানিয়া লইয়া চলিল। তখন তাহার পরাজিত সহযোদ্ধারা তাহাকে ও আমাদিগকে গালি দিয়া অন্য শিকার ধরিতে চলিল। পাণ্ডা বা টর্নি মহাশয় আমাদিগকে একজন সামলা-ওয়ালার কাছে দাখিল করিলেন। শুনিলাম, ইনি একজন উকিল। তখন আমাদের যাহা কিছু ছিল, দুই জনে অনুগ্রহ করিয়া তাহার ভার আপনাদের 'পকেটে' নিয়া যথাসময়ে আমাদিগকে হাড়িকাষ্ঠে নিয়া ফেলিলেন। বিচারপতি খ্যাতনামা হরচন্দ্র ঘোষ। রঘু ও তাহার দুই উড়িয়া সাক্ষী 'হলফ' করিয়া বলিল, বেতন চাহিলে আমরা তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছি। আমরা ও আমাদের সহপাঠী সাক্ষীরা 'হলফ' করিয়া প্রকৃত কথা কি, তাহা বলিলাম। বিচারক মহাশয়ের শ্বেতশ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল হইতে একটি কথা মাত্র নির্গত হইল—"ডিক্রি"। উকিল ও টর্নি মহাশয়েরা আমাদিগকে বলিলেন—"তোমরা মকদ্দমা হারিলে, টাকা দিতে হইবে।" আর আমাদের সঙ্গে কথাটি না কহিয়া দুই জন অন্য শিকার অন্বেষণে ছুটিলেন। জগবন্ধুর মুখখানি বড় সংস্কৃত ছিল না। সে ধর্ম্মাধিকরণের বাহিরে আসিয়া সেই বিচারক ও তাঁহার চৌদ্দ পুরুষ, ধর্ম্মাধিকরণ-প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁহার চৌদ্দ পুরুষ, বিপন্নের উপকারী "সাধারণ-সেবক" (Public servant) মহাশয়দের,—উকিল মহাশয়েরা তাঁহাদের নির্ম্মম জলোকাবৃত্তির এরূপ সদ্‌ব্যাখ্যাই করিয়া থাকেন—ও তাহাদের চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে নানারূপ কুটুম্বিতা ও তদনুযায়ী সৎকারের ব্যবস্থা করিতেছিল। চন্দ্রকুমার কাঁদিতে লাগিল। আমি স্তম্ভিত। মহাপ্রতাপান্বিত ইংরাজ-রাজ্যের মহামান্য বিচারালয়-সকলের 'সুবিচার' এই প্রথম আমাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম হইল, এবং তাহার সমালোচনা করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। এই নিরীহ সংসারানভিজ্ঞ বিদেশবাসী বালকদিগের কথা অপেক্ষা তিন জন উড়িয়া চাকরের কথা যে কেন বিচারক মহাশয় বিশ্বাস করিলেন, এই সমস্যার আমি এখন পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পঁহুছিতে পারি নাই। আর হরচন্দ্র ঘোষের মত লোকের বিচারের যদি এই আদর্শ হয়, তবে না জানি, অন্য বিচারকদের দ্বারা দেশের কি সর্ব্বনাশই হইতেছে! তবে আমার একটি ধারণা আছে, সত্য মিথ্যা ভগবান্ জানেন, "বাঙ্গাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু"—পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গবাসীদিগের পৌরাণিক বিদ্বেষ বোধ হয়, এই সুবিচারের মূলে ছিল। আমরা পূর্ব্ববঙ্গবাসী। অতএব পশ্চিমবঙ্গবাসী বিচারক সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা 'বাঙ্গাল',

সুতরাং মিথ্যুক। বালক বলিয়া কি? সর্পশিশুর কি বিষ থাকে না? কাজে কাজেই 'উড়ে জন্তুর' উপর বাঙ্গাল বালকেরা অত্যাচার করিবে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ।

কিছু দিন পরে রঘু আসিয়া আমাদের কাছে ক্ষমা চাহিল ও চাকরি চাহিল। আমরা অস্বীকার করিলাম। তখন ডিক্রী বাহির করিয়া টাকাটা উশুল করিয়া লইল। আমরা সকল ছাত্রে ভাগ করিয়া ঘোষজার দক্ষিণা দিলাম। কিন্তু ঘোষজার উপরও বিচারক একজন আছেন। কিছু দিন পরে শুনিলাম, হতভাগা রঘু মরিয়াছে। আমরা বড় দুঃখিত হইলাম।

এ সময়ে আবার একটি সুবিচারের দৃষ্টান্তে ইংরাজ-রাজ্যের বিচারের উপর আমি আরো অশ্রদ্ধাবান্ হই, এবং ইংরাজেরা কিরূপে যদৃচ্ছাক্রমে দেশীয় লোক হত্যা করিয়া অব্যাহতি পায়, তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। চট্টগ্রাম নগর বিস্তৃতসলিলা কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। তাহার অপর পারে একটি গ্রামে কয়েক জন ইংরাজ নাবিক (English Sailor) শিকার করিতে গিয়া একটি ছাগলকে গুলি করে। তাহাতে গ্রামের লোক আসিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিলে, গ্রামের লোকদিগের একজনকে তাহারা গুলি করিয়া হত্যা করে। ইংরাজ আসামী বিচারার্থ সুপ্রিম কোর্টে প্রেরিত হয়। সে সময়ে উক্ত কোর্ট টাউনহলের নিম্ন তলায় অধিষ্ঠিত ছিল। ইন্‌স্পেক্টার বাবু উমাচরণ দাস সাক্ষী লইয়া চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতায় আসেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা (ছাত্রেরা) তামাসা দেখিতে যাই। যিনি পরে শের আলির ছুরিকায় সেই টাউনহলের দ্বারে নিহত হইয়াছিলেন, সেই জষ্টিস নরমেন বিচারক। টাউনহল সামলাধারী উকিল, টর্নি, এবং ঘোর কৃষ্ণ গাউনধারী ব্যারিষ্টারবর্গে পরিপূর্ণ। মকদ্দমা আরম্ভ হইল। কিন্তু সাক্ষীদিগের মুখে আমাদের স্থানীয় বাঙ্গালা ভাষা শুনিয়া সকলে অবাক্! খ্যাতনামা শ্যামাচরণ সরকার তখন ইণ্টারপ্রেটার। তিনি একজন বহুভাষাভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার মনে বড় গৌরব ছিল। কিন্তু কুব্‌জার দর্প চূর্ণ হইল। তিনি প্রথমতঃ বলিয়াছিলেন, অনুবাদ করিতে পারিবেন। কিন্তু ১০।১৫ মিনিট এ অসাধ্য সাধন করিতে চেষ্টা করিলে, বিবাদীর ব্যারিষ্টার উড্রফের ধমক খাইয়া কবুল জবাব দিলেন। আমার মাতৃভাষা বিদেশীয় পক্ষে অসাধ্য ভাষা। বুঝিতে ত পারিবেই না, তাহা শিক্ষা করাও অসাধ্য। ঢাকা অঞ্চলের ভাষার মত প্রত্যেক শব্দে অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা ইহাতে নাই। তথাপি ঢাকা অঞ্চলের শব্দ অন্ততঃ বাঙ্গালা। উক্ত বিস্তৃত মূর্চ্ছনা সত্ত্বেও কলিকাতা অঞ্চলের লোক উহা বুঝিতে পারেন এবং অনুকরণ করিতে পারেন। বাইরন মেনফ্রড লিখিয়া বলিয়াছিলেন, 'অবশেষে আমি একখান কাব্য লিখিয়াছি, যাহার অভিনয় অসম্ভব।" আমার মাতৃভাষা শিক্ষাও অসম্ভব। ইহাতে ঢাকা অঞ্চলের বিশেষ কোনও শব্দ নাই। উচ্চারণও সেরূপ নহে। অনেক শব্দই রাঢ় অঞ্চলের, কিন্তু তাহার উচ্চারণ এত সংক্ষিপ্ত এবং কোমল যে, বিদেশীয় লোক, যাহারা এক জীবন চট্টগ্রামে আছে, তাহারাও উহা উচ্চারণ করিতে পারে না। অতএব এই ভাষার অনুবাদ করিয়া কে কোর্ট এবং কাউন্‌সিলদিগকে বুঝাইয়া দিবে? মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল। জজ বলিলেন, চট্টগ্রাম হইতে যে ইন্‌স্পেক্টার আসিয়াছে, সে অনুবাদ করুক। বিবাদীর পক্ষে অন্যান্য কাউন্‌সিলের সঙ্গে উড্রফ সাহেব ছিলেন। তখন ইঁহার খ্যাতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তিনি আপত্তি করিলেন যে, ইন্‌স্পেক্টার যখন এ মকদ্দমা তদন্ত করিয়াছেন, তাঁহার উপর এ কার্য্যের ভার দেওয়া যাইতে পারে না। তখন জজ চট্টগ্রামের অন্য কোনও লোক কোর্টে আছে কি না, ইন্‌স্পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, কয়েক জন কলেজের ছাত্র আছে। তাহাদের একজনকে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত করিতে জজ আদেশ দিলেন। আমার সহপাঠীরা কেহই অগ্রসর হইতে সম্মত হইল না। সকলে আমাকে ঠেলিতে লাগিল, এবং ইন্‌স্পেক্টারও আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া বলিদানের ছাগশিশুর মত নিয়া উপস্থিত করিলেন। শত শত লোকের চক্ষু আমার উপর পড়িল। আমার তখন ১৭।১৮ বৎসর মাত্র বয়স। এফ. এ. পড়িতেছি। পরিধান ধুতি, চাদর ও পিরান। তাহাও মলিন

এবং তৈলাক্ত। বদনচন্দ্র ও চাঁচর চিকুর কলিকাতার তদানীন্তন মসৃণ রক্ত ধূলিতে সমাচ্ছন্ন। আমাকে দেখিয়া সকলে সস্নেহ হাসি হাসিলেন, এবং জজও সস্নেহকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক! তোমার বাড়ী চট্টগ্রামে?" উত্তর—'হাঁ, মি লর্ড!" প্রশ্ন—"তুমি এ সাক্ষীদের কথা অনুবাদ করিতে পারিবে?" উত্তর—"বলিতে পারি না, মি লর্ড! আমি চেষ্টা করিতে পারি।" যে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহাতে মি লর্ডের (my Lord) ছড়াছড়ি শুনিয়া বুঝিয়াছিলাম, যে এই প্রভুদের মি লর্ড বলিতে হয়। কিন্তু শব্দটির অর্থ কি বুঝিতাম না। বিশেষতঃ আমাদের জমিদারি মকদ্দমার সূক্ষ্ম বিচারের পর এই প্রভুদের উপর আমার অবিরত অশ্রদ্ধা হইয়াছে। জজ আমার উত্তর শুনিয়া বলিলেন,—"এ বালক বেশ পারিবে।" উড্রফও সায় দিলেন। তখন শপথ পাঠ করাইয়া আমাক শ্যামাচরণ বাবুর পার্শ্বে সেই উচ্চ স্থানে আসন দিয়া বসান হইল। শ্যামাচরণ বাবুও আমাকে অভয় দিয়া বলিলেন—ভয় নাই, যেখানে আমি ঠেকি, সেখানে তিনি সাহায্য করিবেন। সাক্ষীর জবানবন্দি আরম্ভ হইল। আমি ইংরাজি প্রশ্ন অনুবাদ করিয়া সাক্ষীকে আমার চট্টগ্রামী ভাষায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, এবং তাহাদের উত্তর লিন্ডসে মরের ও হাইলির ব্যাকরণের (Lindsay Murray's and Highly's Grammar) মুণ্ডপাত করিয়া ইংরাজিতে অনুবাদ করিতে লাগিলেন। আমার সাক্ষীর মুখে চট্টগ্রামী ভাষা শুনিয়া প্রথম কয়েক মিনিট হাসির তরঙ্গে কার্য্য করা অসাধ্য হইল। কিন্তু ২।৪টি সন্দেশ খাইলেও আর খাইতে ভাল লাগে না। অতএব আমার মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রূপের হাসি ক্রমে থামিয়া গেল। আমি প্রথম ভয়ে কাঁপিতেছিলাম। কিন্তু জজ ও উভয় দিকের কাউন্সিল আমাকে অভয় দিতে লাগিলেন—"বেশ ছেলে তুমি বেশ অনুবাদ করিতেছ। ভয় পাইও না।" কয়েক মিনিট পরে আমার ভয় ঘুচিয়া গেল। টিফিনের সময়ে শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন—"বাপ! কি বিট্‌কেলে ভাষা!" আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কক্ষে লইয়া গিয়া আমার চৌদ্দ পুরুষের ইতিহাস পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যেন ভূগর্ভ হইতে একটি নূতন জীব উৎপন্ন হইয়াছি। আমাকে দেখিবার জন্য কর্ম্মচারিবৃন্দে তাঁহার কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। চাট্‌গাঁ খালাশির দেশ—সেখান হইতে এ অপূর্ব্ব জীব আসিয়াছি—সমুদ্র পার হইয়া আসিয়াছি—ইহাই আমার অপরাধ! তাহার উপর, আমি খাঁটি কলিকাতার বাঙ্গালা বলিতেছি; তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। এরূপ দুই দিনে মকদ্দমার বিচার শেষ হইল, এবং সে হইতে এই অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ এরূপ মকদ্দমার যেরূপ বিচার হইয়া থাকে, তাহাই হইল। পরিষ্কার নরহত্যা প্রমাণিত হইল। কিন্তু উড্রফ বহুক্ষণ যাবৎ বুঝাইলেন যে, ভীষণ গ্রাম্য অসভ্য দস্যুরা গোরাদের আক্রমণ করিয়াছিল। অতএব তাহারা আত্মরক্ষার্থ গুলি করিয়াছিল। তদানীন্তন কসাইটোলার জুরি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—'নির্দ্দোষী'। জজ বলিলেন—'খালাস।' কাউন্সিলেরা গাউনের একটা সন্‌সানি, জুতার একটা মস্‌মসি তুলিয়া উঠিয়া গেলেন। আর সহস্রাধিক দেশীয় দর্শক বিচারের ফল শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। আমার স্বদেশীয় ইন্‌স্পেক্টার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আমারও চক্ষু সজল হইল, এবং কিশোর-কোমল হৃদয়ে যে আঘাত পাইলাম, তাহা আমি ভুলিতে পারি নাই। জজ আমাকে সস্নেহ-কণ্ঠে বলিলেন—You are a brave boy! You have done very well. (তুমি সাহসী বালক, তুমি বেশ কাজ করিয়াছ)। আমাকে ইণ্টারপ্রেটারের পুরা ফিস ২ দিনের জন্যে দিতে আদেশ করিলেন। আমি ৩২ টাকা লইয়া বিচারের ফল সহপাঠীদের সঙ্গে সমালোচনা করিতে করিতে গৃহে আসিলাম। তাঁহারও আমার কত প্রশংসা করিলেন. এবং উক্ত টাকা হইতে একটা জলযোগের বন্দোবস্ত করিলেন। অতএব আমার প্রথম চাকরি খুব বড় চাকরি বলিতে হইবে।

আত্মবলি

"তুলিব না এ কমল ছিল যদি মনে,
প্রেমসরোবরে কেন দিলাম সাঁতার?
কেন সহি এত জ্বালা ভুজঙ্গদংশনে?
কেন ছিঁড়িলাম আহা! মৃণাল তাহার?"—অবকাশ-রঞ্জিনী।

সেই সান্ধ্য সম্মিলনে হৃদয়ে কি এক বিপ্লব উপস্থিত করিল। আমার বয়স তখন সপ্তদশ, বিদ্যুতের দ্বাদশ, কেহ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তবে উভয় উভয়কে দিনে অন্ততঃ একবার না দেখিলে থাকিতে পারিলাম না। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আর স্কুলে যাইতে হয় না। আহারের পর বিদ্যুতের বাসায় গিয়া সমস্ত দিন কাটাই, তাহাতেও আমার তৃপ্তি হয় না। তাহার বাসার নিকট দিয়া যাইতে শিস্ দিলে, সে বিজুলির মত বাহির হইয়া আসিত, এবং যতক্ষণ দেখা যায়, দুইজনে দুই জনকে অতৃপ্ত নয়নে চাহিয়া দেখিতাম। কেন? কিছুই জানি না। কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাসের সময়ে, বাড়ী গেলে সহরে যে কয় দিন থাকিতাম, তাহার সঙ্গে দিবাভাগের অধিকাংশ কাটাইতাম। আমি গেলে সে একটুকু আড়ালে দাঁড়াইত। তাহার কি উদাসিনী কিশোরীমূর্ত্তি! একখানি সামান্য লাল শাড়ী মাত্র পরিধান, দুই হাতে দুইগাছি সামান্য শঙ্খের বালা। দীর্ঘ নিবিড় কুঞ্চিত অলকা-রাশি অযত্নে সেই আকর্ণবিশ্রান্ত ও বিস্ফারিত নয়ন শোভিত অনিন্দ্য ক্ষুদ্র মুখখানি ছাইয়া অংসে, উরসে ও পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। সে কেশরাশির অবসরে বিদ্যুতের সুগোল মুখমণ্ডলের ও শরীরের বর্ণ বিদ্যুতের মত ঝলসিতেছে। শান্ত, বিস্ফারিত, ছল ছল নেত্রদ্বয় আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমি কাছে গিয়া আদর করিয়া তাহার ক্ষুদ্র ললাট চুম্বন করিয়া না আসিলে সে আসিত না। দুজনে প্রায়ই বারান্দায় একখানি কৌচের উপর বসিতাম। আমার বাম হস্ত তাহার ক্ষীণ কটি জড়াইয়া যেন কুসুমস্তবকের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। কটিখানি যেন ভাঙ্গিয়া আসিয়া আমার অঙ্গে লাগিতেছে—কি কমনীয়! কি নমনীয়! বিদ্যুৎ সমস্ত দিন তাহার অঙ্কস্থিত আমার বাম হাতের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি ধরিয়া বসিয়া আছে। কিছুতে ছাড়িবে না। সম্মুখে কয়েকটি গোলাপগাছ। স্তরে স্তরে গোলাপ ফুটিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। দিবা দ্বিপ্রহর; গৃহ নীরব; সকলেই নিদ্রিত। কেন যে এরূপে বসিয়া আছি, বালক বালিকা কেহই জানি না। কত কথাই বলিতেছি। কেন বলিতেছি, তাহা জানি না। আমি যে বহিখানি ভালবাসি, সে তাহা পড়িত। আমি 'ব্রজাঙ্গনা' 'বীরাঙ্গনা' ভালবাসিতাম; সর্ব্বদা আওড়াইতাম। সে দুইখানি কণ্ঠস্থ করিয়াছিল। এই গভীর অনুরাগে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই, আবিলতা নাই। এক মাত্র আকাঙ্ক্ষা—উভয় উভয়কে দেখি, উভয় উভয়ের কাছে বসিয়া থাকি, উভয় উভয়ের কথা শুনি। কথা আমিই বেশী কহিতাম, সে নীরবে অতৃপ্তমনে আমার মুখের দিকে বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া শুনিত। হতভাগ্য সংসারে যাহা প্রেম বলিয়া পরিচিত ও নিন্দিত, এই ভালবাসায় সে প্রেমের গন্ধ মাত্র ছিল না। এরূপ বালক বালিকার মধ্যে থাকিবার কথাও নহে। এই অনুরাগ কি সুন্দর, কি সরল, কি স্বর্গীয়!

এরূপে চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বিদ্যুতের এখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স। এবার শীতের সময়ে বাড়ী আসিয়াও বিদ্যুৎকে দেখিতে গেলাম। কই, আমার শিস্ শুনিয়া ত বিদ্যুৎ চঞ্চলচরণে চঞ্চলার মত ছুটিয়া আসিল না। গৃহে প্রবেশ করিলাম। ধীরে ধীরে হলে বিদ্যুৎ প্রবেশ করিল। মুখ গম্ভীর; বারি-ভরা মেঘের মত গম্ভীর, স্থির। আনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি বলিলাম—"কি বিদ্যুৎ! তুই আমাকে নমস্কার করিবি না?" সে তখন প্রণতা হইল। আমি তাহাকে উঠাইতে গেলে—এ কি? সে পশ্চাতে সরিয়া গেল। আমি একখানি চেয়ারে বসিলাম। দাঁড়াইতে পারিতেছিলাম না। সে স্থির ভাবে আনতমুখে

দাঁড়াইয়া রহিল। আমি অনেক বলিলে টেবিলের অপর পার্শ্বে একখানি চেয়ারে বসিল। ইতিমধ্যে তাহার বিবাহ হইয়াছে। আমি তাহাকে আমার সহপাঠী একটি সৎপাত্রের সহিত বিবাহ দিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহা হয় নাই। গৃহপালিত জীবের মত 'ঘর-জামায়ে'র হস্তে সে সমর্পিতা হইয়াছে। আমি বলিলাম—"বিদ্যুৎ! তোমার বিবাহ হইয়াছে?" এতক্ষণ পরে মুখখানি তুলিয়া, একটুকু ঈষৎ হাস্য করিয়া, সতৃষ্ণনয়নে আমাকে চাহিয়া উত্তর করিল—"আপনার কি হয় নাই?" উত্তর আমার মরমের মরমে প্রবেশ করিয়া গুরুতর আঘাত করিল। তাহার পিতা একজন শিক্ষিত ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী লোক। আমি জানিতাম, তিনি বিদ্যুতের অনভিমতে বিবাহ দিবার লোক নহেন। এ জন্যে তাহাকে এত বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ দেন নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার পিতা কি তোমার মত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন না?" বিদ্যুৎ নীরব। অনেক বার জিজ্ঞাসা করিলে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল —"হাঁ"। আমি তখন জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কেন এ বিবাহে মত দিলে? আমি যে পাত্রের প্রস্তাব করিয়াছিলাম, এই পাত্র কি তাহার অপেক্ষা ভাল?" আবার অনেক বার জিজ্ঞাসা করিলে মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল—"না"। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তবে কেন তুমি এ বিবাহে সম্মত হইলে?" এবার অনেকক্ষণ অধোমুখে নীরবে রহিল। অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর পাইলাম না। আমি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতে দাঁড়াইলাম। সে কাতর নয়নে চাহিয়া বলিল—"বসুন।" কিন্তু আবার নীরব হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে বলিল —"সে কথা শুনিয়া কি হইবে?" আমি তখনি শুনিতে জিদ করিতে লাগিলাম। আবার অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে মুখ তুলিল। অধরে ঈষৎ কষ্টের হাসি। সজল চক্ষু দুটি আমার প্রতি স্থাপিত করিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল—"এখন ত আপনাকে এক এক বার দেখিতে পাইব। সেখানে বিবাহ হইলে তাহাও যে হইত না।" জগতের এই চরম সুখ-দুঃখভরা, এই স্বর্গ-মর্ত্ত্যভরা, এই উগ্র বিষামৃত ভরা এই আত্মবলিদানের সংবাদ আমার মরমের মরমে পঁহুছিল। মরমের মরমে ঘোরতর আঘাত করিল। মরমের মরম চূর্ণ হইয়া গেল। তখন আমার বয়স বিংশতি বৎসর। আমি এই উত্তরের গভীর অর্থ, প্রেমের প্রথম তত্ত্ব মরমে মরমে অনুভব করিলাম। এত দিন পুস্তকে পড়িয়াছি, হৃদয়ে অনুভব করি নাই। সুখে হৃদয় অধীর, দুঃখে অস্থির; নয়নের আগে স্বর্গ খুলিয়াছিল। কর্ণে সে উত্তর স্বর্গ-সঙ্গীত বাজাইতেছিল; মর্ত্ত্যের কণ্টকে ও কঠিনত্বে আবার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। অমৃতে হৃদয় পরিপূরিত, বিষে হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছিল। আমি আত্মহারা হইলাম। টেবিলের কিনারায় মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ কাঁদিলাম। কি ভাবিলাম, কিছু মনে নাই। কিছুক্ষণ পরে অতি কষ্টে দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, বিদ্যুতের ফুল্ল কপোল বাহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বহিতেছে। সে অধোমুখ তুলিয়া আর একবার আমার দিকে চাহিল। দৃষ্টি কোমল, কাতর, করুণাময়। দৃষ্টি—সরল, সুন্দর, স্বর্গ। আমি পাগলের মত ছুটিয়া, আমার গৃহে আসিয়া, পর্য্যঙ্কে বক্ষ চাপিয়া দারুণ হৃদয়-ব্যথায় অধীর হইয়া পড়িলাম, আর সমস্ত দিন রাত্রি মাথা তুলিলাম না। তাহার দুই একদিন পরে হৃদয়ের সে দারুণ ব্যথা লইয়া কলিকাতায় ফিরিলাম।

কবিতানুরাগ

আমি শৈশবে বড় পুঁথিভক্ত ছিলাম। যখন ৭। ৮ বৎসর বয়স, গুরু মহাশয়ের বেত্রাঘাতের ও দন্তঘর্ষণসম্বলিত আতঙ্ক-সঞ্চারী তর্জ্জন তাড়নার কৃপায় প্রাঙ্গণের ধুলাতে ক খ লিখিয়া রয়ে আকার রা ও ম=রাম, পড়িতে শিখিয়াছি, তখন হইতেই সুর করিয়া "রাম রাম" বলিয়া রামায়ণ মহাভারত ঠাকুরমার কাছে পা ছড়াইয়া বসিয়া পড়িতাম। হায়! হায়! তখনকার শিক্ষাপ্রণালীতে ও এখনকার শিক্ষাপ্রণালীতে কি শোচনীয় তারতম্য। তখন অক্ষরশিক্ষা

হইলেই আপনার পূর্ব্বপুরুষদের ও আত্মীয় স্বজনের এবং দেবদেবীর নাম লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। এক দিকে কুলজিখানি, অন্য দিকে দেবদেবীর পবিত্র নামাবলী মুখস্থ হইত ও তাঁহাদের পূজা দেখিতাম। তাহার পর এক দিকে সেবকাধীন সেবক পাঠে পিতা মাতা গুরুজনের কাছে পত্রাদি লেখা শিক্ষা দেওয়া হইত, অন্য দিকে দাতা কর্ণ ও চৌত্রিশ অক্ষরী স্তবমালা ও নীতিগর্ভ সুললিত শ্লোকমালা শিক্ষা দেওয়া হইত। এরূপে এক দিকে আপনার গুরুজনের প্রতি ভক্তির, অন্য দিকে ধর্ম্মের অঙ্কুর বালকের কোমল হৃদয়ক্ষেত্রে রোপিত হইত। তাহার পর রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির দ্বারা সে ধর্ম্মভাব তিল তিল করিয়া বৃদ্ধি করা হইত। তৎসঙ্গে সঙ্গে এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষিসম্বন্ধীয় যাবতীয় অঙ্ক ও দলিলাদি লিখিবার প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইত। লেখা অধিকাংশই কলাপাতে, গৃহনির্ম্মিত কালিতে ও গ্রামের বাঁশের কলমে হইত। এমন সুন্দর, এমন সহজ এমন স্বাভাবিক, এবং এমন দরিদ্রোপযোগী শিক্ষা-প্রণালী কি কোন দেশে কোন সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? আর আজ তাহার স্থানে প্রাইমারি স্কুলে দেশ ছাইয়া যাইতেছে। তাহাদের উদ্দেশ্য কি, মহামান্য শিক্ষা-বিভাগই কেবল জানেন। এখন বালকেরা পূর্ব্বপুরুষের ও দেবদেবীর কোন খবর রাখে না। ধর্ম্মশিক্ষার কোন ধার ধারে না। তাহাদের জীবনের উপযোগী কিছুই শিখে না। শিখে 'প্রশ্নাবলী', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব', 'উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব', ও শিক্ষা-বিভাগের ও তস্য শালা সম্বন্ধীদের মাথা-মুণ্ডের আমসত্ব। দেশ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। অথচ কলাপাতের স্থান শ্লেট, পেন্‌সিল ও শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তাদের ও তাহাদের শ্যালকদের অতিরিক্ত রজতমূল্যে বিক্রীত অদ্ভুত পুস্তকরাশি গ্রহণ করিয়াছে। শিশুর বয়সের সংখ্যা হইতে তাহার পুস্তকের সংখ্যা অধিক। তাহার উপর আবার সম্প্রতি কিণ্ডার-গার্টেন সুরু হইয়াছে। শিক্ষার অবস্থা দেখিলে মিল্টনের শয়তানের আক্ষেপ মনে পড়ে—

"Into what pit thou seest from what height fallen."

যাহা হউক, আমি সুর করিয়া ও শব্দ জোড়াইয়া পুঁথি পড়িতাম। আর পিতামহী বুড়ী ও আমার মা খুড়ীরা সেই অপূর্ব্ব পাঠ শুনিয়া হাসিতেন, কাঁদিতেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের চক্ষে জলের ধারা বহিত। ইংরাজি বিদ্যালয়ে দাখিল হইবার পরও আমার এই পুঁথি পড়া রোগ ঘুচিল না। তখন বঙ্গ-সরস্বতী দেবীর দীনা ক্ষীণা মূর্ত্তিখানি বটতলায় স্থাপিতা। সেইখানে নিকৃষ্ট কাগজে অস্পষ্ট অক্ষরে জননী যন্ত্রমুখে যে সকল ছাই মাটি প্রসব করিতেন, আমি সকলই পড়িতাম। ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দেবপ্রতিম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গসাহিত্যাকাশে উদয় হইতে লাগিলেন। ইঁহারা উভয়েই যে বাঙ্গালার পদ্য গদ্যের ঈশ্বর, তাহা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। তখন গুপ্তজার 'প্রভাকরে'র প্রভায় বঙ্গদেশ ঝলসিত।

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

তাঁহার এই শ্লেষপূর্ণ গর্ব্ববাক্য সকলের কণ্ঠস্থ ও বেদবাক্যবৎ স্বীকার্য্য ছিল। ধীরে ধীরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল' 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' প্রভাকর-প্রদীপ্ত রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। 'বেতাল' গুপ্তজার তাল কাটিল। তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া নবাগত শিশুকে কতই বিদ্রূপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাস' বাহির হইলে গদ্য রচনার সৃষ্টিতে বঙ্গসাহিত্যে নব যুগ সঞ্চারিত হইল। আমাদের পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার ওরফে পাগলা পণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শিষ্য ও পরম ভক্ত। তিনি জোর করিয়া এই অভিনব গদ্য গ্রন্থসকল আমাদিগকে স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াইতেন। কিন্তু পিতা গুপ্তজার বড় পক্ষপাতী। গুপ্তজা একবার দেশভ্রমণে চট্টগ্রাম আসিয়া প্রতিভায় সকলকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। পিতা, বন্ধুদের লইয়া সর্ব্বদা প্রভাকর পড়িতেন, তিনি কবিতা

পড়িতে বড়ই ভালবাসিতেন। এমন কি, এক এক দিন তিনি আহার নিদ্রা ভুলিয়া পড়িতেন। তিনি এমন সুপাঠক ও সুকণ্ঠ ছিলেন, তাঁহার মূর্ত্তি এমন মনোমোহন ছিল, তাঁহার কবিতা পড়া, বিশেষতঃ পুঁথি, যে একবার শুনিয়াছে, সে ভুলিতে পারিবে না। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ও কবিকঙ্কণ পাঠ এখন যেন আধ স্বপ্ন-বিস্মৃত সুদূরশ্রুত বীণা-সঙ্গীতের মত শুনিতে পাই। মনসা পুঁথির 'দংশন', 'বিষ নামান' ও বিপুলা লক্ষীন্দরের 'সন্ন্যাস'—এই তিনটি অংশ তিনি নিজে বাড়ী গিয়া পড়িতেন। 'দংশন' ও সন্ন্যাসে'র সুকোমল কণ্ঠোচ্ছ্বসিত করুণরসে শ্রোতাগণ চিত্রিতবৎ বসিয়া কাঁদিত ; রমণীগণ কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মহারা হইত। 'বিষ নামান' পাঠে তাঁহার সেই গগনস্পর্শী গলার ঝঙ্কারে সমস্ত গ্রামখানি যেন কম্পিত হইত। শ্রাবণ মাসে আমি এখনো যেন শুনিতে পাই, পিতা কণ্ঠ-ঝঙ্কারে শ্রাবণের বারি-বজ্র-জলদপূর্ণ আকাশ কম্পিত করিয়া গাইতেছেন—

"মূলমন্ত্র পড়ি পদ্মা ছাড়িল হুংকার।
লক্ষীন্দরের পঞ্চ প্রাণ দিল আগুসার॥"

পিতা সুগায়ক, সুরসিক, সুকবি। তিনি কবিতা রচনাও করিতেন। নিজে ও বন্ধুগণে মিলিয়া একটি যাত্রা রচনা করিয়া আপনারাই তাহা অভিনয় করেন। তাহাতে দেশ শুদ্ধ লোক মোহিত হয়। আমি তখন শিশু, কিন্তু একটি দৃশ্য আমার স্মৃতিতে সেই বয়সেও অঙ্কিত হইয়া যায়। যাত্রার মধ্যভাগে একটি যবনিকা অপসারিত হইলে, অকস্মাৎ সমস্ত মূর্ত্তিপূর্ণ একখানি দশভুজার কাঠাম ভাসিয়া উঠিল। তাহার সমুদায় মূর্ত্তিগুলি অসুর সিংহ—পর্য্যন্ত সজীব ; কারণ, সকলই মানুষ। কাংস্য, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল, রমণীগণের সুমধুর হুলুধ্বনি শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, সুগন্ধ ধূপের ধূমে ও গন্ধে প্রতিমা ও আসর সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সংসারের স্বার্থে উদাসীন পিতা উদাসীনবেশে প্রতিমার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া, ভক্তিতে বাষ্পাকুললোচনে গদগদ কণ্ঠে সুমধুর পঞ্চমে স্বরচিত ভগবতীর স্তব বেহালার সঙ্গে গলা মিলাইয়া গাহিতে লাগিলেন। শ্রোতাগণ প্রথমে ভক্তিতে রোমাঞ্চিত, পরে ভক্তিতে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা স্তবের এক স্থানে 'মা রাজরাজেশ্বরী" বলিয়া জগজ্জননীকে ডাকিতেছেন। আমার মাতার নাম 'রাজরাজেশ্বরী'। প্রাচীনারা তাহা লইয়া অনেক সময়ে মাতাকে ঠাট্টা করিতেন।

কেবল পিতার নহে, কবিতানুরাগ আমার বংশগত। আমার পিতৃব্য মদনমোহন রোগ-শয্যায় শুইয়া চট্টগ্রামপ্রচলিত ২২ জন কবির রচিত একখানি মনসা পুঁথি নকল করিয়া, তাহার শেষ ভাগে নিজ নামে কবিতায় একটি ভণিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন।—

"গুজরানিবাসী দীন মদনমোহন।
বহু কষ্টে করিলাম গ্রন্থ সমাপন॥"

আর একজন পিতৃব্য অতি সামান্য লেখাপড়া জানিয়াও একটি প্রকাণ্ড যাত্রা রচনা করিয়াছিলেন। পিতৃব্য ত্রিপুরাচরণ সঙ্গীতে মন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও পারসী জানিতেন। অতি সুপুরুষ, সুগায়ক, সুকবি এবং সকল বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার দুই একটি গান এখানে স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রকৃতিবর্ণনা—

"বিশাল বট-বিটপি-কানন সুখ-সম্বল।
ইহার ছায়াতে হবে রাজসভা সুবিমল।
কি আশ্চর্য্য ফলগুলি,
লোহিত কমলকলি,
নীল নভে যেন শোভে আরক্ত তারামণ্ডল।
উড়ে প'ড়ে ঘুরে ফিরে কোকিল কোকিলাদল।"

প্রেমবর্ণনা—

"আমার কোথায় গেল রণ, কোথায় গেল মন,
কি হলো সখি?
শুনিয়ে তার গুণ উড়ে মন-পাখী।
নাচে হৃদয় অনুরাগে,
আঁখি বলে দেখি আগে,
মরমে মিলন জাগে হ'লো এ কি?
যদি পাই সে রতনে,
হৃদয়ে রাখি যতনে,
নয়নে নয়নে তারে সদায় রাখি।"

প্রেম ও প্রকৃতি,—'পার্থপরাজয়' পালা হইতে—

"কোথায় কুসুম রথ মলয় মারুত রে!
মনোরথ মত বেগে চল রে, চল রে!
কল কল কোকিল,
মৃদুরবে অলিকুল,
তরুদল ফুল ফলে সকলি সাজ রে!
অনুরাগ গুণময় ফুলধনু ধর রে!
মম পঞ্চ পরাণ সম,
পঞ্চ কোকিল স্বর,
কলকলে প্রমীলার হৃদয় ভেদ রে!"

গোষ্ঠ—

(১)

"বাছা রে! জীবনজুড়ানে! এস ব'সো কাছে!
বেঁধে দি ধরা চূড়া, ও বাপ! গোঠের বেলা বয়ে গেছে।
বেণুর স্বরে ডাক্‌ছে বলাই,—
'আয়! আয়! আয়! আয় রে কানাই!'
তুই বিনা যে যায় না রে গাই
তোর পানে চেয়ে আছে।"

(২)

"বাছা রে! তোর মার মাথা খা,
গহনে বনে যাস না একা,
তুই বিনা প্রাণ যায় না রাখা,
তোর পানে চেয়ে বাঁচে।"

তিনি বলিতেন, যাহার প্রাণে কবিতা ও কাণে সুর লাগিয়াছে, তাহার আর সংসার নাই। এরূপ উদাসীনতায় তিনি অম্লানমুখে একটি বিশাল সম্পত্তি ভাসাইয়া দিয়া অতি দীন-হীন অবস্থায় সংসার-পিশাচের হস্ত হইতে অপসৃত হন।

কেবল আমার বংশীয়েরা বলিয়া নন, চট্টগ্রামবাসী মাত্র কবিতাপ্রিয়। শ্যামাচরণ কাস্তগিরি পিতার পরম বন্ধু ও পুত্রবৎ ভক্ত। তাঁহার এবং পিতৃব্য ত্রিপুরাচরণের মত সঙ্গীতজ্ঞ বুঝি চট্টগ্রামে আর জন্মিবে না। শ্যামাচরণের কণ্ঠের তুলনা নাই। আগে পশ্চিমদেশীয় যাত্রার দল আসিয়া চট্টগ্রাম হইতে বৎসর বৎসর বহু অর্থ লইয়া যাইত। শ্যামাচরণ দেশে প্রথমতঃ সখের, তার পর ব্যবসায়ী দল সৃষ্টি করিয়া স্বদেশীয় বহু লোকের একটি উপ-

জীবিকার এবং সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলনের পথ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে একটি দৃশ্য শৈশবে আমার হৃদয়ে গভীর রেখায় অঙ্কিত হইয়াছিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, শীত-কাল। শ্যামাচরণ পর্ব্বতোপরি হরচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় গৃহে বসিয়া স্বরচিত চণ্ডী-যাত্রার গীত পিতাকে ও হরচন্দ্র রায়কে শুনাইতেছেন। পরীক্ষা নিকট, আমরা পড়িতে উঠিলাম। শ্যামাচরণ ঢোলক বাজাইয়া একা গাইতেছেন। তাঁহার অমৃতবর্ষী ফুল্ল কণ্ঠ পর্ব্বত ভাসাইয়া নীরব নৈশ গগনে মূর্চ্ছনা খেলিয়া উঠিতেছে, পড়িতেছে। আমরা খোলা পুস্তক ফেলিয়া, মন্ত্রমুগ্ধবৎ ছুটিয়া সেই দ্বিতল গৃহের নীচে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, স্থানটি জনাকীর্ণ। যতদূর পর্য্যন্ত শ্যামাচরণের কণ্ঠ শুনা যাইতেছে, কেহ নিদ্রা যায় নাই। সকলে আমাদের মত সুপ্তোত্থিত হইয়া আসিয়া নীরবে এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শ্যামাচরণ গাইতেছেন—

> "অপরূপ অতি, শুন নরপতি!
>   কালীদহের জলে দেখেছি নয়নে।
> পদ্মেতে পদ্মিনী, জিনি সৌদামিনী,
>   হেরিলাম কামিনী কমলবনে।
> বঙ্কিম-নয়নী, জিনিয়া হরিণী,
>   কেশবেণী ফণি, বিদ্যুৎবরণী,
> ধরি করিবরে, ধনী গ্রাস করে,
>   ক্ষণেকে উদ্গার করিছে বদনে।
> ক্ষণে দেখি জলে, ক্ষণেকে কমলে,
>   চঞ্চলা লুকায় ক্ষণেকে অঞ্চলে,
> চপলা চমকে ক্ষণে কুতূহলে,
>   ক্ষণে গজরাজে নিক্ষেপে গগনে।"

কি কবিত্বপূর্ণ গীত, কি কবিত্বপূর্ণ শ্যামাচরণের কণ্ঠ! আমি সেই যে শৈশবে একবার এই গানটি শুনিয়াছি, আর ভুলি নাই।

এরূপ কত লোকের কত গীত, কত কবিতা, কত বারমাস, কত সারিগান দেশে এক সময়ে প্রচলিত ছিল। তাহার কারণ, আমার মাতৃভূমি প্রাকৃতিক কবিত্বময়ী। বনমাতার দিগন্তব্যাপী পর্ব্বতমালায় কবিতা তরঙ্গায়িত হইতেছে, তাঁহার পাদস্থিত নির্ঝর-কণ্ঠে কবিতা অবিরল গীত হইতেছে, তাঁহার নীল ফেনিল সিন্ধু-গর্ভে তরঙ্গ-ভঙ্গে কবিতা লীলাতরঙ্গ দেখাইতেছে, তাঁহার বহু নদ-নদী-স্রোতে রজতধারে কবিতা বহিয়া সেই সিন্ধু-মুখে ছুটিতেছে। মাতার অধিত্যকায়, উপত্যকায়, বনে বনে কবিতা; বৃক্ষে বৃক্ষে, লতায় লতায়, ফুলে ফলে কবিতা; পর্ব্বত-বিভক্ত পীত শ্যামল শস্যক্ষেত্রে কবিতা। মাতার সমুদ্র-গর্জ্জনে কবিতা, নির্ঝরিণীর তর তর কণ্ঠে কবিতা; সংখ্যাতীত বর্ণবিহঙ্গের কলকণ্ঠে কবিতা। যাহার এরূপ পিতা, এরূপ বংশ, এরূপ মাতৃভূমি, তাহার হৃদয়ে যে শৈশব হইতেই কবিতানুরাগ সঞ্চারিত হইবে, কল্পনার অস্ফুট হিল্লোলমালা খেলিবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

কবিতাপ্রকাশ

"I rose one morn and found myself famous."

অতএব পাখীর যেমন গীত, সলিলের যেমন তরলতা, পুষ্পের যেমন সৌরভ, কবিতানু-রাগ আমার প্রকৃতিগত ছিল। কবিতানুরাগ আমার রক্তে মাংসে, অস্থি মজ্জায়, নিশ্বাস

প্রবাসে আজন্ম সঞ্চালিত হইয়া অতি শৈশবেই আমার জীবন চঞ্চল, অস্থির, ক্রীড়াময় ও কল্পনাময় করিয়া তুলিয়াছিল। বলিয়াছি, আমি শৈশবে অতিরিক্ত অশান্ত ও ক্রীড়াপ্রিয় ছিলাম। আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হইতেই গুপ্তজার অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম। বলা বাহুল্য, সে কবিতার ছন্দোবন্ধ কিছুই থাকিত না। সে যেন বিহঙ্গশিশুর প্রথম কাকলি। কলিকাতার ভাড়াটে গাড়ীর অপূর্ব্ব ঘোটকদ্বয়ের মত পয়ারের এক চরণ আর এক চরণ হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইত। তবে এখন বাঙ্গালায় তাহা আর দোষের নহে। সেই হিসাবে অভিধান, অর্থপুস্তক, এমন কি, কলিকাতা গেজেট, টি. টমসনের বাড়ীর ক্যাটালগও উৎকৃষ্ট কবিতা। কেবল সুর করিয়া আওড়াইলেই হইল। রসিকচূড়ামণি দীনবন্ধু বলিয়াছেন—"গদ্য কি পদ্য চৌদ্দয় পরিচয়।" এখন আর সে চৌদ্দেরও প্রয়োজন নাই। এখন গদ্য পদ্য হরি হর একাত্মা; জাতিভেদ নাই। শুধু তাহা নহে, পদ্য গদ্যে এবং গদ্য পদ্যে পরিণত হইয়াছে। তাহার উপর আবার সেই পুরাতন কথা—History repeats itself (ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়)। তখন যে গদ্য রচনার অর্থ করা যাইত না, তাহা চূড়ান্ত "মুন্সীয়ানা" বলিয়া পরিগণিত হইত, যে সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইত, তাহা চূড়ান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া জয়জয়কার উঠিত; এখনও তাহাই হইয়াছে। কবিতাদেবী এখন কায়া ত্যাগ করিয়া ছায়া হইয়াছেন। কায়া সাকার, কাজে কাজে পৌত্তলিক ও অশ্লীল। ছায়া নিরাকার। কিন্তু আমরা মূর্খ পৌত্তলিকেরা নিরাকার ব্রহ্মকে যেমন বুঝিতে পারি না, তেমন এই নিরাকার কবিতাও কিছু বুঝি না। যখন দেশে 'মেঘনাদে'র বড় প্রাধান্য, তখন গুরুগম্ভীর "দন্তভাঙ্গা" শব্দ যোজনা করিতে পারিলেই মহাকাব্য হইত! আমরা এরূপ একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি—

ত্বিষাম্পতি মহেষ্বাশ সৌমিত্রী কেশরী,
দ্বিরদ রদ নির্ম্মিত ইন্দুনিভাননা,
পরিবরাতিলা. আর নমিলা গমিলা,
মেঘনাদ শবদে স্তবধে গৌড়জন।"

এরূপ কাব্যের পরাকাষ্ঠা "দশস্কন্ধবধ মহাকাব্য" এবং 'সাধারণী'তে তাহার মহাসমালোচনা। 'দশস্কন্ধ' গয়াতে পিণ্ড লাভ করিয়াও যেন আবার ছায়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বন্ধু ঈশান একদিন একজন বিখ্যাত নিরাকার কবির কবিতা সমালোচনা করিতে গিয়া "গঙ্গার জলে গঙ্গাপূজা" করিয়াছিলেন।

"ও সে ছুঁয়ে গেল, নুয়ে গেল না।
ও সে ব'য়ে গেল, ক'য়ে গেল না।"

ঈশান এ কবিতাটি আওড়াইয়া বলিলেন—"এখনকার ছায়াময়ী কবিতাও ছুঁয়ে যায়, নুয়ে যায় না। ব'য়ে ত যায়ই, কিন্তু কিছুমাত্রই ক'য়ে যায় না।"

আমি সেই বয়সেই অনেক কবিতা লিখিতাম। বঙ্গসাহিত্যের অদৃষ্ট ভাল যে, তাহার ছায়াও নাই। থাকিলে একটা জাহাজ বোঝাই হইত এবং অতি সুপ্রসিদ্ধ কবিতা বলিয়া বিকাইত। কারণ, তাহার ছন্দ আওড়াইতে ও অর্থ বাহির করিতে বিজ্ঞ সমালোচকেরও মাথা ঘুরিত। সে সকল আমার সহপাঠীদের ও খেলার সঙ্গীদের পড়িয়া শুনাইতাম। তাঁহারা তাহার অপূর্ব্ব সমালোচনা করিতেন। দুঃখ, তখন বঙ্গদেশ মাসিকে ছাইয়াছিল না। তাহা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। চন্দ্রকুমার অতি বিজ্ঞতার সহিত বলিতেন, কবিতা অন্ধকার যুগে (Dark age) ভিন্ন প্রতিষ্ঠা লাভ (flourish) করে না। অতএব এই আলোকের যুগে এরূপ ব্রতে ব্রতী না হইয়া, যে অঙ্কের নামে আমার মনে ঘোরতর আতঙ্কের সঞ্চার হইত, তিনি তাহারই সেবা করিতে আমাকে বহু জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিতেন। এরূপে চতুর্থ

শ্রেণীতে উঠিলে এক দিন ঘটনাক্রমে গোঁসাই-দুর্গাপুরবাসী পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার মহাশয় আমার সে অপূর্ব্ব কবিতা একটি দেখিলেন। তিনি চন্দ্রকুমারের অন্ধকার যুগের লোকও ছিলেন না, এ ছায়াযুগের লোকও ছিলেন না। তিনি আমাকে অত্যন্ত উৎসাহ দিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বুঝাইয়া দিলেন যে, চৌদ্দের ত প্রয়োজন আছেই। তাহা ছাড়া কবিতার একটা সরল ও সহজ অর্থও থাকা চাই। কবিতা কেবল কাণ 'ছুঁইয়া' যাইবে না, হৃদয়ও ভাবে 'নোয়াইবে'। কেবল মধুর স্রোতে বহিয়া যাইবে না, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পঁহুছিবে. প্রাণের প্রাণে তাহার প্রাণের কথা কহিয়া যাইবে, এমন কি, গভীর রেখায় সেই কথা অঙ্কিত করিয়া যাইবে। তিনি নিজেও কবিতা লিখিতেন, আর সে কবিতা চোরের মত ছায়া দেখাইয়া লুকাইত না, উচ্চৈঃস্বরে হাসিতে হাসিতে তোমাকে সকল কথা খুলিয়া কহিয়া যাইত। তাহাতে ঘোমটার ভিতর খেমটা থাকিত না। সকলই খোলা-মেলা। গুপ্তজা গ্রীষ্মবর্ণনায় লিখিলেন—

"দে জল্ দে জল বাবা! দে জল্ দে জল!"

সে বৎসর যেমন গ্রীষ্ম, তেমনই বর্ষা। এক পক্ষ যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্যের সাক্ষাৎ নাই. মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, দেশ ভাসিয়া যাইতেছে। পণ্ডিত মহাশয় তাহার উত্তরে লিখিলেন—

"খা জল্, খা জল্ বাবা! যত পেটে ধরে।"

পণ্ডিত মহাশয় কিঞ্চিৎ ক্ষেপা হইলেও বড় সরল ও সহৃদয় লোক ছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার অতি সুন্দর অধিকার ও অনুরাগ ছিল। তিনি "বুড় বক্কেশ্বর" নামক 'হুতুমি' ধরণের হাস্যরসোদ্দীপক কাব্য ও "বাসন্তিকা" নামক আর একখানি সুন্দর গদ্য কাব্যও লিখিয়াছিলেন। এমন শিক্ষক, যে ছাত্রগণকে পুত্রবৎ যত্ন করিয়া শিখায়, আজকাল দুর্লভ। এখন শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। কোথায়ও বা শিক্ষক খাদক, কোথায়ও বা ছাত্র খাদক। মহামান্য শিক্ষাবিভাগের জয় হউক! দেখিতে দেখিতে যে শিক্ষার উপর মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে, তাহার কি দুর্গতিই হইয়াছে। "অপরম্ বা কিং ভবিষ্যতি!" পণ্ডিত মহাশয় দুষ্টামির জন্যে আমাকে যেমন ঠেঙাইতেন,—রোজ প্রায় গুরু-শিষ্যের মধ্যে একটা scene (দৃশ্যাভিনয়) হইত—আমাকে তেমনি ভালবাসিতেন। প্রহার কার্য্যটাও তিনি এত রসিকতার সহিত সম্পাদন করিতেন যে, এক দিকে তাহা গলাধঃকরণ করিতাম, অন্য দিকে হাসিতাম। তিনি আমাকে এখন হইতে বড় যত্ন করিয়া কবিতা লেখা শিখাইতে লাগিলেন। তিনি এমন বিচক্ষণ শিক্ষক ছিলেন যে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে আমাদিগকে সমুদায় ব্যাকরণ অলঙ্কার পর্য্যন্ত পড়াইয়াছিলেন। অতএব আমিও তাঁহার শিক্ষা সহজে গ্রহণ করিতে পারিলাম। ষষ্ঠ শ্রেণী হইতেই আমাদের একটি সাপ্তাহিক সভা ছিল। শনিবার স্কুলের পর উহার অধিবেশন হইত। ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক চট্টগ্রামের ভুরসীনিবাসী বাবু দুর্গাচরণ দত্ত এবং পণ্ডিত মহাশয় উহার প্রবর্ত্তক। তাঁহাদের নাম আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। সভার নাম "বিদ্যোৎসাহিনী"। ইহাতে আমিই অধিকাংশ লিখিতাম। প্রায় প্রত্যেক শনিবার আমি এক একটি দীর্ঘ কবিতা প্রসব করিয়া ফেলিতাম। সে যেন—I lisped in numbers and numbers came." পূজোপলক্ষ্যে স্কুল বন্ধ হইতেছে। আহা! সে বন্ধের দিনটা কি সুখের দিনই বোধ হইত! আমি সে দিন এক দীর্ঘ কবিতায় শারদোৎসব বর্ণনা করিয়া সহপাঠীদের কাছে বিদায় লইতাম। পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট দীক্ষালাভ করিবার পরের সভায় আমি যে কবিতাটি লিখিলাম, পণ্ডিত মহাশয় তাহা পাইয়া একটা তোলপাড় করিয়া ফেলিলেন। স্কুলে ত একটা হুলস্থূল করিলেনই। সব্‌জজ হুগলীনিবাসী নবীনকৃষ্ণ পালিত মহাশয়দের এক সভা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় সেই সভায় আমার কবিতাটি পাঠ করেন। সেখানে আমার জয়জয়কার পড়িয়া যায়। নবীন বাবু আমার পিতার বড় বন্ধু। তিনি পরদিবস কাচারিতে গিয়া পিতার কাছে এ কথা বলেন, এবং আমার যশোধ্বনিতে জজ আদালত

বিঘোষিত হয়। বাবা কাচারি হইতে আসিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, নবীন বাবু আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। আমার মাথায় বজ্রাঘাত। একে ত আমি ক্রীড়া ভিন্ন ইহ সংসারে কিছুরই ধার ধারি না। তাহার উপর এখন আবার অপরাহ্ন, খেলার সময়। বেহারারা আমাকে পিতার তানযানে তুলিয়া রাবণসভাগামী পৌরাণিক বীরের মত লইয়া গিয়া নবীন বাবুর বৈঠকখানায় দাখিল করিল, সভা পদস্থ লোকে পূর্ণ। পণ্ডিত মহাশয় স্বয়ং উপস্থিত। তাঁহার 'গরব' দেখে কে? তিনি আমাকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। নবীন বাবু বুকে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া কবিতাটি পড়িতে আদেশ দিলেন। শিক্ষকের কাণমলা খাইয়া শিশুরা যেমন পড়ে, আমিও সেইরূপ ভাবে পড়িলাম। সকলে ধন্য ধন্য বলিলেন। নবীন বাবু আমাকে "মিতা, মিতা" বলিতে লাগিলেন। অবশেষে উৎকৃষ্ট আহার্য্য বস্তুতে উদর এবং উৎসাহে হৃদয় পূর্ণ করিয়া আমাকে সস্নেহে বিদায় দিলেন। হায়! সে কাল আর একাল! আমি কি বাইরণের মত বলিতে পারি না—

"আমি একদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিলাম, আর দেখিলাম আমি বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছি।" আর এক দিন পণ্ডিত মহাশয় আমার ও চন্দ্রকুমারের আঁকা একখানি মানচিত্র (Map) নিয়া নবীন বাবুকে দেখান। দুর্গাচরণ বাবুর কৃপায় আমরা অতি সুন্দর মানচিত্র আঁকিতে পারিতাম এবং তিনি আমাদিগকে এমন অভ্যস্ত করাইয়াছিলেন, যে কোন স্থানের চিত্র আমরা না দেখিয়া আঁকিতে পারিতাম। নবীন বাবু দেখিয়া এত ব্যগ্র হইলেন যে, তিনি আমাদিগকে দেখিতে স্কুলে আসিলেন, এবং তাঁহার কাচারির একটি নক্সা আঁকিতে বলিলেন। তিনি ভাল ইংরাজি জানিতেন না, অথচ ইংরাজি বলিতে চাহিতেন। তাই অনেক সময়ে এক কথায় আর এক কথা বলিয়া সেরিডানের "স্কুল অফ স্কেণ্ডেলে"র অভিনয় করিয়া ফেলিতেন। আমাদের দুই জনকে বলিলেন,—Draw a plant of my cachery. তাহা লইয়া স্কুলে একটা হাসি পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি বড় তীক্ষ্নবুদ্ধি, তেজস্বী, সদনুরাগী ও সুবিচারক ছিলেন। এই দুই দৃষ্টান্তেই তিনি কিরূপ সহৃদয়, তাহা বুঝা যাইবে। তাই বলিতেছিলাম —"হায়! সেই দিন, আর এই দিন!" এখন আমাদের উচচপদবীস্থ ধর্ম্মাবতারেরা অংগদের সিংহাসনস্থ। কোন বিদ্যালয়ের চতুঃসীমার মধ্যে পাদপদ্ম নিক্ষেপ করেন না। দেশের কোন হিতব্রতে তাঁহাদের তর্জ্জনী পর্য্যন্ত দেখিতে পাইবে না। তাঁহাদের উপাস্য জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট। জীবনব্রত—প্রভুদের স্খলতায় তৈলমর্দ্দন। অভিমানে ও পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষে উদর স্ফীত, বদন পেচকবৎ গম্ভীর, আলাপও তথৈবচ। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এখনো আগেকার মত কুকার্য্য করেন, তাঁহাদিগকে প্রভুরা বিষচক্ষে দেখেন।

যাহা হউক, আমার হৃদয় নবীন বাবুর উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। আমার স্বাভাবিক প্রবল কবিতানুরাগে জোয়ার ছুটিল। চতুর্থ শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত কত বৎসর, কত শনিবার। প্রতি শনিবার আমার এক এক কবিতা জন্মগ্রহণ করিত। তৃতীয় শ্রেণীতে এক শনিবার এক কবিতায় লিখিয়া ফেলিয়াছি—

"মুসলমানগণ ছুরি নিয়া হাতে,
বিস্‌মল্লা স্মরিয়া দেয় গরুর কল্লাতে।"

পণ্ডিত মহাশয় সে কবিতা অতি গম্ভীর ভাবে মুন্‌সী সাহেবকে শুনাইয়া তাঁহাকে ক্ষেপাইতেন। এই কবিতা দুই চরণে এমন ত কিছুই ছিল না। তথাপি মুন্‌সী সাহেব আমার উপর চটিয়া লাল। ক্রোধে তাঁহার খঞ্জ পদ আরো খঞ্জ হইয়া পড়িল। তিনি ছুটাছুটি করিয়া লাইব্রেরীর অর্দ্ধেক পুস্তক আনিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, এই কবিতা দুচরণের দ্বারা আমি মাহমদীয় ইতিহাসের উপর এক চন্দ্রাদিত্যব্যাপী কলঙ্ক সন্নিবেশ করিয়াছি, এবং চন্দ্রাদিত্যব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করিলেও আমার এই মহাপাপ ক্ষালন হইবে না। বলা বাহুল্য, সে দিন আমাদের আর পড়া হইল না। তার পর এমন বিভ্রাটে আর কখনো পড়ি নাই।

My shame in public, my solitary Pride.

কলিকাতায় আসিয়াও কবিতা সম্বন্ধে আমার কর-কন্ডূয়ন ঘুচিল না। অবসর পাইলে কি ঘরে, কি ক্লাসে, ছাইমাটি লিখিতাম। ক্লাসে এ কার্য্য বড় ভয়ে, বড় গোপনে করিতাম। বাঙ্গাল দেশের ছেলে, তাহার আবার কবিতা! একদিন সহপাঠী তারক একটি কবিতা জোর করিয়া দেখিল। পড়িয়া বিস্মিত হইয়া আমার গালে একটি ক্ষুদ্র চড় মারিয়া বলিল—"হাঁ রে বাঙ্গাল! তোর পেটে এত বিদ্যে আছে, আমি ত জানিতাম না। এ তো বেশ হইয়াছে। তুই লিখিতে অভ্যাস কর্।" তারক কবিতাটি সহপাঠীদিগকে পড়িয়া শুনাইতে চাহিল, আমি কাড়িয়া নিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। বাঙ্গাল কবিতা লিখিয়াছে,—শুনিয়া খাঁটি ইয়ারসম্প্রদায় কতই হাসিলেন।

একজন ব্রাহ্ম 'ভ্রাতা' এক 'ভগিনী'র প্রেমে মোহিত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্যে আকুল এবং দেশাচার-রাক্ষসকে বধের জন্য সশস্ত্র। ভগিনীর কাছে একখানি প্রেমলিপি লিখিবার ভার আমার স্কন্ধে পড়িল। লিপিখানি পদ্যে ব্রাহ্মপ্রেমে পূর্ণ করিয়া, দুই ছত্র কবিতা উপরে ও দুই ছত্র নীচে লিখিয়া 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করিলাম। শেষ কবিতাটি স্মরণ আছে—

"ছিঁড়িয়াছে আশালতা, মৃণালের সূত্র যথা
ছিঁড়ে মত্ত করিপদদলনে।
সংসারের সুখ যত, সকলই হয়েছে গত,
কি কাজ আর দুঃখ-ভার জীবনে!"

ভ্রাতা এই অমোঘ পত্র পড়িয়া মোহিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় ছিল। তিনি উহা একেবারে মাইকেলের দরবারে উপস্থিত করিলেন। একে মনসা, তাহাতে ধুনার গন্ধ। মাইকেল সেই ভ্রাতৃপ্রেম লইয়া "স্পেনস হোটেল" হাসিতে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। কবিতা দুটির নাকি বড় প্রশংসা করিলেন, এবং লেখক তাঁহার একজন "চেলা" বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে একদিন মধ্যাহ্নে আমি কলেজ হইতে বাসায় আসিয়াছি। বাসায় আমরা তিন ব্রাহ্ম। তখন আর একজন মাত্র বাসায় আছে। সে একজন দিগ্‌গজ ব্রাহ্ম। মেডিকেল কলেজে পড়িত। এই "পটাস, পটাস" করিয়া পড়িতেছে। তখনি চোক বুজিয়া "হা নাথ!" বলিয়া ধ্যানস্থ। তাহার এক "ডায়ারি" ছিল। তাহাতে মনে যখন যে আধ্যাত্মিক ভাব উদয় হইত, তাহা ভবিষ্যৎ মানবজাতির উপকারার্থে লিখিয়া রাখিত। এই দিন আমি কক্ষের এক দিকে বসিয়া পড়িতেছি। ভায়া অন্য দিকে, একবার সেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূর্ণ 'ডায়ারি' খুলিতেছেন, বাঁধিতেছেন, পড়িতেছেন ও চোখ বুজিয়া ভাবিতেছেন। আবার পড়িতেছেন, আবার ভাবিতেছেন। থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ; মুখ সেই ব্রাহ্মজাতীয় গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ; চক্ষু ছল ছল। ভায়ার 'দশা'য় পড়িবার উপক্রম। আমার বড় কৌতূহল হইল। কাছে গিয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম—"তুমি এত তদ্‌গদচিত্তে কি পড়িতেছ?" ভায়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কিছুই না"।

আমি। কিছুই না?—এই প্রকাণ্ড ডায়ারি সম্মুখে,—তোমার এই ভাব?

সে। তোমাকে বলিলে, তুমি ঠাট্টা করিবে।

আ। কি কথাটা বল না?

সে কিছুক্ষণ নীরবে শ্রীরামপুরী কাগজের ডায়ারির দিকে চাহিয়া বলিল—"সত্য সত্যই ঠাট্টা করিবে না ত? তোমার পেটে কথা থাকে না। তুমি সকলকে বলিয়া ফেলিবে।" আমি গম্ভীর মুখ করিয়া বলিলাম—"তুমি আমাকে এমন পাপিষ্ঠ মনে কর যে, আমি একটা

এমন serious matter লইয়া ঠাট্টা করিব, এবং তুমি নিষেধ করিলেও অন্যের কাছে বলিব?" "তবে বেশ স্থিরভাবে পড়"—বলিয়া ডায়ারিখানি আমাকে দিল। আমি পড়িলাম, পড়িতে পড়িতে আমি কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিলাম। তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে প্রথম ভাটা পড়িয়াছে। "পরম কারুণিক পরমেশ্বর"—"পাপ তাপ, পরিতাপ, অনুতাপ,"—'ভ্রাতা', 'ভগিনী,' 'পবিত্র প্রেম,' 'বিধবার উদ্ধার'—কুসংস্কার রাক্ষস,' 'নিৰ্ম্মম দেশাচার', "দেশের নরপিশাচ কুসংস্কারাপন্ন আলোকবিহীন নরাধমগণ"—ইত্যাদি ইত্যাদি। চারি পৃষ্ঠা লেখা হইতে এ সকল ব্রাহ্ম বুলি বাদ দিলে মূল কথাটা এই থাকে যে, সে তাহার ভগিনীর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়া এক বিধবা চাকরাণী দেখিয়াছে; দেখিয়া ভ্রাতৃভাবে দেশাচার-রাক্ষস হইতে হতভাগিনীকে উদ্ধার করিতে অধীর হইয়াছে। পড়া শেষ হইলে আমি অতি কষ্টে হাসি ও উদরস্থ উপহাসের তরঙ্গভঙ্গ চাপিয়া রাখিয়া গম্ভীর মুখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া করুণস্বরে বলিলাম—"a pathetic story!" সে বলিল—"বড় শোচনীয়, না?" আমি স্থিরভাবে উত্তর করিলাম—"বড়।" কিঞ্চিৎ নীরবে থাকিয়া মনে করিলাম, রগড়টা আরো একটুক পাকাইতে হইবে। বলিলাম—"তুমি যদি বল, আমি একটা কবিতা লিখিব।" সে গম্ভীর স্বরে বলিল—"আমি বড় সুখী হইব।" যেই কথা, সেই কাজ। কবিতাদেবী আমার লেখনীর মাথায় চড়িলেন, এবং বাজিকরেরা যেমন বাঁশের মাথায় চড়িয়া বাঁশকে চালাইয়া থাকে, তেমনি আমার লেখনী তিনি চালাইতে লাগিলেন। অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে "কোনো এক বিধবা কামিনীর প্রতি" কবিতাটি লিখিয়া তাহাকে খুব গম্ভীরভাবে পড়িয়া শুনাইলাম। সে একেবারে ঢলিয়া পড়িল। বলিল, "কি চমৎকার! কি চমৎকার! তুমি অবিকল আমার হৃদয়ের কথাগুলিন লিখিয়াছ।" সে নিজে একবার দুইবার কবিতাটি পড়িল। এমন সময়ে বেলঘরিয়ার পাগলা উমেশ উপস্থিত। সে উমেশকে বলিল, কারণ উমেশও ব্রাহ্ম—যে তাহার ডায়ারি হইতে একটি ঘটনা লইয়া আমি অতি চমৎকার এক কবিতা লিখিয়াছি। উমেশ ঠাট্টা করিয়া বলিল, "বটে? এ পাগলের পেটে এত বিদ্যা আছে?" উমেশ জানিত না যে, আমি কবিতা লিখিতে পারি। উমেশ একজন সুপাঠক, সাহিত্যে ঘোরতর অনুরক্ত। সে সুর করিয়া অতি সুললিত কণ্ঠে কবিতাটি পড়িল। পড়িয়া গম্ভীর ও বিস্মিতভাবে আমার দিকে চাহিয়া র[illegible]লে। আমি তাহার মুখখানি দেখিলেই হাসিতাম, এ গাম্ভীর্য্যে আরো আমার হাসি উথলিয়া উঠিল। উমেশ সেই বিস্মিত ভাবে বলিল—"হাঁ রে পাগলা! তোরে এত দিন আমি চিনি নাই। তুই যে একটি Genius।" তখন একে একে সহবাসী অন্য ছাত্রেরা কলেজ হইতে আসিতে লাগিলেন, আর সেই কবিতা লইয়া একটা তোলপাড় হইল। সকলে এক এক বার পড়িলেন। চন্দ্রকুমার কবিতার নায়ককে বলিল—"বটে? এই তোমার ব্রাহ্মধর্ম্ম?" চন্দ্রকুমারটি চিরকাল অব্রাহ্ম। তাহার যে কেমন বেজায় স্থির মাথা, কোন হুজুগে টলে না। ধর্ম্মের উপর আঘাত। নায়ক চটিয়া আগুন হইল। আমার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী ললিত ভৈরবে গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। আমি কবিতাটি কাড়িয়া নিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া গবাক্ষপথে নিক্ষেপ করিলাম। আমার সমস্ত কবিতা সে পথে প্রেরণ করিলে এ জীবনে এত ঈর্ষা, এত শত্রুতা, এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না।

তখন সঙ্গীরা বড় ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। দুই এক জন, যাঁহারা কবিতাটির প্রশংসা শুনিয়া বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন,—পরের প্রশংসা শুনিয়া ও ভাল দেখিয়া, এ জগতে কয় জন মর্ম্মাহত না হইয়া থাকিতে পারেন?—অতীব সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু উমেশ ধরিয়া পড়িল যে, কবিতাটি আবার লিখিতে হইবে। আমি এক দিকে অভিমান করিয়া বসিয়া আছি। ব্রাহ্মভায়া আর এক দিকে গম্ভীরভাবে বীভৎস-

রস পরিপূর্ণ 'মেডিকেল' পুস্তক তন্ময়চিত্তে পাঠ করিতেছেন। আমি বলিলাম, সে না বলিলে আমি লিখিব না। উমেশ অনেক অনুনয় করিলে সে পুস্তকনিবিষ্ট গম্ভীর ভাবে বলিল—"আমার আপত্তি নাই।" কবিতাটি আমার প্রায়ই কণ্ঠস্থ হইয়াছিল। আমি তখনই লিখিয়া দিলাম। উমেশ উহা লইয়া চলিয়া গেল।

পরদিন কলেজের পর উমেশ তাঁহার একটি সহপাঠীকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত। সহপাঠী ব্রাহ্মণ, দীর্ঘকায়, শ্যামবর্ণ; আমাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ। মূর্ত্তিখানিতে সৌন্দর্য্য কিছুই নাই; ভাব-মাধুর্য্য আছে। মুখখানি হাসি হাসি, সরল, সুন্দর, স্নেহময়। দেখিলেই শ্রদ্ধা হয়। ইনিই স্বনামখ্যাত পূজনীয় শিবনাথ শাস্ত্রী। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের একজন খ্যাতনামা ছাত্র, সেই বয়সেই 'কবি' বলিয়া পরিচিত। উমেশ তাঁহার পরিচয় দিলে, আমরা তাঁহাকে যেন এক জন ছোট 'কেষ্ট বিষ্ণু'র মত দেখিতে লাগিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন,—আমার কবিতাটি পড়িয়া আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি আমাকে বড়ই আদর করিলেন, বড় বাড়াইলেন, বড় উৎসাহ দিলেন। তিনি সুরসিক, সুপাঠী ও মধুরভাষী। সংস্কৃত, ইংরাজি, বাঙ্গালা কবিতা অমৃতধারায় আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন স্বচ্ছ সরোবর—তরল, কোমল, প্রীতিময়। তাঁহার সদ্‌গুণে, আলাপে ও চরিত্রে আমরা মোহিত হইলাম। তিনি আমাদের মুখে আমাদের শৈল-সমুদ্র-নদ-নদী-নির্ঝরিণী-শোভিতা মাতৃভূমির শোভার বর্ণনা শুনিয়া উচ্ছ্বাসিতপ্রাণে বলিলেন—

"O Caledonia! stern and wild
Meet nurse for a poetic child!"

তাঁহার ব্রাহ্ম শাস্ত্রী মূর্ত্তি আমি বড় একটা দেখি নাই, কিন্তু তাঁহার সেই কিশোর কবিমূর্ত্তি আমি ভুলিতে পারি নাই। উমেশ ও শিবনাথ বলিলেন, তাঁহারা আমার সেই কবিতাটি 'এডুকেশন গেজেটে' ছাপিতে দিবেন। সর্ব্বনাশ! আমার কবিতা মুদ্রিত হইবে ও কাগজে উঠিবে! এত বড় সম্মান!—এত বৃহৎ ব্যাপার!—আমার হৃৎকম্প হইল। এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, লুকাইয়া লুকাইয়া যে কবিতা লিখি, তাহা ছাপা হইবে ও কলিকাতার লোকে তাহা পড়িবে। 'এডুকেশন গেজেটে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ সরকার আমাদের প্রোফেসার। ভগবানের কি রহস্য, তাহা বুঝিতে পারি না। বিদ্যাসাগর মহাশয়, প্যারীবাবু ও কৃষ্ণদাস পাল তখন বাঙ্গালার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। তিনেরই চরিত্র দেবতুল্য, কিন্তু তিনেরই কদাকার। তিনি আমাদের শ্রেণীতে আসিয়া আমার নামে ছাত্র কে আছে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"উমেশ শিবনাথ যে একটি কবিতা আমাকে দিয়াছে, উহা কি তোমার লেখা?" আমি মাথা হেঁট করিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন,—"তোমার বেশ শক্তি আছে। তুমি ইহার অনুশীলন কর। তুমি সর্ব্বদা 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবে।" শ্রেণীস্থ ইয়ার অনইয়ার সকলের বিস্ময়পূরিত চক্ষু আমার উপর। এত বিদ্যুতাঘাত সহিতে পারিব কেন? আমি অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় বসিয়া পড়িলাম। কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"আরে! এ বাঙ্গাল ত কম পাত্র নহে।" কবিতা যথাসময়ে প্রকাশ হইল। Recreation সময়ে কবিতা পাইয়া ছাত্রেরা দলে দলে সে কবিতাটি পড়িতে লাগিল ও আমাকে ঘেরিয়া নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি উচ্চ দরের সহপাঠীরা কত উৎসাহ দিলেন। "ইয়ারের দল" দুর্গতির একশেষ করিল। তাহাদের মুখে পূর্ব্ববঙ্গের কত কবিতা কত রূপেই উচ্চারিত হইতে লাগিল। ক্রোধে অধীর হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের সহপাঠীরা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের অমার্জ্জিত, ততোধিক ক্রোধবিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ হালারা বলছিলো

কি?" আমি বলিলাম—"খুব প্রশংসা করিতেছিল।" তাঁহারা তখন মুরুব্বিয়ানা ভাবে একটুক হাসিয়া বলিলেন—"তুমি fool, তাই এ হালাদের কথা বিশ্বাস কর। যাহা কিছু বল্‌ছে, সব maliciously।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম ত্যাগ

"Religion! What treasure untold resides in that heavenly word."

আমি শৈশবে বড় দেবদেবীভক্ত ছিলাম। পুতুল না বলিয়া দেব দেবী বলিলে যদি "ভ্রাতারা" বিরক্ত হন, তবে না হয় বলিব—আমি বড় পৌত্তলিক ছিলাম। তবে পৌত্তলিক শব্দটি শুনিয়াছি অভিধানবহির্ভূত; কারণ, এ দেশে উহা নাই। এমন কি, নিজের হস্তে কত দেব দেবী গড়িতাম,—ঠাকুর বলিতাম না বলিয়া পশ্চিম-বঙ্গবাসীরা ক্ষমা করিবেন—নিজে পূজা করিতাম, নিজে বলিদানের কার্য্যটাও নির্ব্বাহ করিতাম। ব্যায়াম-সুখটা বিশেষ তাহাতে ছিল। এই দেব দেবী পূজার জন্য সর্ব্বদা গালি খাইতাম, সময়ে সময়ে বেত্রাঘাতও দক্ষিণাস্বরূপ পাইতাম। কারণ, এক দিকে গ্রামের সমস্ত ছেলে মেয়ে জড় হইয়া যে কোলাহল করিত, তাহাতে কেবল পরিবারস্থের বলিয়া নহে, গ্রামস্থের পর্য্যন্ত দিবানিদ্রার ও সায়াহ্নগল্পের ব্যাঘাত হইত। তাহার উপর খড়্গাঘাতে ঘরের ভিত্তি পাতালে যাইত, এবং বলিদানের কলাগাছ ও এরেণ্ডায় বাড়ীর অপূর্ব্ব শোভা হইত। এই রোগ আমার এরূপ স্বভাবসিদ্ধ ও এত বেশি ছিল যে, শুনিয়াছি—২॥ বৎসর বয়সে আমি কচুর ডগা ধরিয়াছিলাম, আর আমার ছোট পিসী উহা বলিদান করিবার সময়ে আমার দক্ষিণ হস্তের মধ্য অঙ্গুলীর অগ্রভাগ বলি দিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহার সাক্ষী, এখনো চিংড়ি মাছের চোখের মত নখের দুটি কোণা মাত্র অগ্রভাগশূন্য অঙ্গুলিতে বর্ত্তমান আছে। দেব দেবীর প্রকৃত পূজারও অভাব ছিল না। গৃহে নিত্যস্থাপিত দেবতারা ত আছেনই। তাহার উপর ধাতুময়ী ছোট ও বড় দুই দশভুজা বংশের এ শাখার সন্তানদের বাড়ীতে পালা খাটিয়া বেড়ান। তাহা ছাড়া দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি ১২ মাসে ১৩ পার্ব্বণ যথাসমারোহে নির্ব্বাহিত হইত। এরূপ প্রত্যেক মাসে হৃদয়ে কি আনন্দ, কি উৎসাহ, কি প্রীতি, কি নব-জীবন সঞ্চারিত হইয়া বাল-হৃদয়কে কি ধর্ম্মের, কি ভক্তির, কি পবিত্রতার দিকেই আকর্ষিত করিত! ক্রমে দেশ নিরন্ন ও বিজাতীয় শিক্ষার কল্যাণে অন্তঃসারশূন্য হইয়া এই অমানুষিক প্রতিভাকল্পিত উৎসব সকল, প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আর আজ উচ্ছৃঙ্খল বালকদিগকে চরিত্রশিক্ষা দিবার জন্যে আমাদের চিরনিন্দুক সাহেবগণ ও তাঁহাদের পাদুকা-বাহকগণ পাঠ্য পুস্তক সংকলন করিতেছেন! দুর্গতির আর বাকি কি?

যাহা হউক, কেবল পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা চরিত্রশিক্ষা আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। এই দেবদেবীর ভক্তিতেই আমার বাল্য-জীবন জ্যোৎস্নাময় করিয়াছিল। আমি 'রঙ্গমতী'র বীরেন্দ্রের মত—

"মা! মা! ডাকিতাম দশভুজায় যখন,
ভাবিতাম সত্য সেই জননী আমার।
নিরখি হীরকোজ্জ্বল সেই ক্ষুদ্র মুখ,
পাইতাম কত সুখ; কত ভক্তিভরে
নমিতাম, চাহিতাম লইবারে বুকে
সেই ক্ষুদ্র প্রতিমায়! গিয়াছে শৈশব;

জননী অভিন্ন জ্ঞান সেই প্রতিমায়
এখনো রহেছে বৎস! হৃদয়ে আমার।"

বীরেন্দ্রের মত আমারও—

"এখনো
সপ্তমী প্রভাতে যবে আনন্দ আরতি
বাজে, কর্ণে করি স্নিগ্ধ সুধা বরিষণ,
নিদ্রান্তে নিরখি নব প্রতিমার মুখ,
কাঁদি আমি অবিরল বালকের মত।"

আমিও বীরেন্দ্রের মত—

"নিশা পূজাকালে সেই অষ্টমী নিশীথে
মায়ের কোলেতে বসি, শৈশবে বিস্ময়ে
দেখিতাম প্রতিমার শোভা অপার্থিব,—
শত দীপালোকে গৌরী মৃন্ময়ী কেমন
হাসিতেন চারু হাসি! হাসিত কেমন
তপ্ত কাঞ্চনের বিভা! কাঁপিত করের
কৃপাণ, ত্রিশূল, চারু কিরীটের ফুল;
পাইতাম ভয় দেখি বিকট অসুর,—
কেশরী ভীষণতর; দেখিতাম যেন
ঘুরিছে নয়নতারা, ফাটিছে ধমনী।
নীরব মণ্ডপে সেই গভীর নিশীথে
পূজকের মন্ত্রধ্বনি কেমন গম্ভীর
মধুর ঝঙ্কারপূর্ণ, কত সুললিত,
লাগিত বালককর্ণে! শঙ্কর এখনো
দেখিলে সে অপার্থিব দৃশ্য মনোহর,
শৈশবস্মৃতিতে ভরে উন্মত্ত হৃদয়;
কাঁদি বালকের মত।"

কিন্তু স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিলে মাষ্টার আনন্দবাবু আমার হৃদয়ে এক বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। বিদেশীয় ইংরাজি-নবিশেরা ব্রাহ্ম হইয়াছেন, তিনি আমাকেও ব্রাহ্ম করিলেন। ইতর খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা হিন্দুদিগকে ঠাট্টা করিয়া বলিত—

"আসিলে আশ্বিন হিন্দু হয় পাগল।
গিড়ার কড়ি দিয়ে কেনে ছাগল।
কায়স্থে কাটে, বামনে খায়।
মাটির ঠাকুর হাঁ করে চায়।"

এত দিন উহা হাসিয়া উড়াইতাম। কিন্তু আনন্দ বাবু বুঝাইয়া দিলেন, এই মহাবাক্যের মধ্যে গভীর তত্ত্ব আছে। খড় মাটির দ্বারা মানুষের গঠিত ঠাকুর কি প্রকারে ঈশ্বর হইতে পারে? এরূপ পুতুলপূজা 'পৌত্তলিকতা,'—কুসংস্কার—ঈশ্বরের অবজ্ঞা। আর বুঝাইলেন যে, ব্রাহ্ম হইলে গোপনে লাড়ু-গোপাল-সন্নিভ বিস্ফারিতাধর পাঁওরুটি ভক্ষণ করা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য ও সত্যতা হৃদয়ঙ্গম বা উদরস্থ করিতে, আমি-পেটুকের জন্যে আর অন্য যুক্তির আবশ্যক হইল না। গ্রাম হইতে সহরে আসিয়া অবধি এই মণ্ডলাকার মহাপদার্থ পাঁওরুটিকে কলিযুগের অমৃতফল বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। দেশের প্রধান জমিদার হরচন্দ্র রায় শীত ঋতুতে তাঁহার বন্ধুদিগকে একটা ব্রাহ্মণ-পক্ক পাঁওরুটির ভোজ দিতেন। পাছে

এই দুর্ল্লভ বস্তুর আস্বাদ পাইয়া বালকেরা জাতি দেয়, সে জন্যে আমাদের সেই ভোজে যোগদান করিবার অধিকার ছিল না। পিতা ইহার বড় প্রশংসা করিতেন। বাইবেলের ঈশ্বরের যে ভুল হইয়াছিল, শাস্ত্রকারদের যে ভুল হইয়াছিল, হরচন্দ্র রায়েরও সে ভুল হইল। ঈশ্বর যদি জ্ঞান-বৃক্ষের ফল "নিষিদ্ধ" করিয়া না রাখিতেন, শাস্ত্রকার যদি হিন্দুদিগকে পাঁওরুটি ও কুক্কুটমাংস খাইতে দিতেন, হরচন্দ্র রায় যদি আমাকে একবারও সেই ব্রাহ্মণ-পক্ক পাঁওরুটির আস্বাদ লইতে দিতেন, তবে আমি কেবল পাঁওরুটির খাতিরে ব্রাহ্ম হইয়া "বঙ্গবাসী"র হিন্দুধর্ম্মে পতিত হইতাম না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। এই মহাপ্রলোভনে পড়িয়া বাহ্ম হইতে স্বীকৃত হইলাম।

একদিন অপরাহ্নে আনন্দ বাবুর বাসায় গেলাম। তিনি জবাকুসুমসঙ্কাশ মলাটে বাঁধা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ব্রাহ্মধর্ম্ম" খুলিয়া, (দেবেন্দ্র বাবু তখনও মহর্ষি হন নাই) গম্ভীর-ভাবে পড়িলেন—"নমস্তে সতে তে"। কিছুই বুঝিলাম না। "নারায়ণি নমোঽস্তু তে"—মনে পড়িল। আনন্দ বাবু পড়িলেন—"আমাদিগকে অসৎ হইতে সতে লইয়া যাও"—বড় চটিলাম। আমার পিতা মাতা, আত্মীয় বন্ধু, কেহ ত অসৎ নহে, সকলেই দেবতার তুল্য। আমি কোন্ অসৎ হইতে কোন্ সতের কাছে যাইব? আনন্দ বাবু পড়িলেন—"আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও"—হাসি পাইল, কিছুই বুঝিলাম না। অন্ধকারের পর আলোক ত আপনিই আসিয়া থাকে। অন্ধকার না থাকিলে ত ঘোরতর বিপদ্, ঘুমাইব কি প্রকারে? যাহা হউক, চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, পাঁঠার যেমন উৎসর্গমন্ত্র আছে, এ সকলও বুঝি পাঁওরুটির উৎসর্গমন্ত্র। মন্ত্রপাঠ শেষ হইলে পাঁওরুটি খাইলাম,—ব্রাহ্ম হইলাম। এইরূপেই দিগ্‌গজ ঠাকুর "আতপ চাউল, ঘৃতের পাক" খাইয়া মুসলমান হইয়াছিলেন। কিন্তু হায় রে হায়! এই পাঁওরুটিই কি জাগরণে ধ্যানে, এবং শয়নে স্বপনে দেখিতাম! ইহার জন্যেই কি পেশাদারি হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্মটা খোয়াইলাম! এ যে যথার্থই "দিল্লীকা লাড্ডু"! অতিরিক্ত শর্করার সাহায্য না পাইলে যে এই শুষ্ক স্বাদহীন বস্তু গলাধঃকরণ করিতেই পারিতাম না। সহপাঠী অধিকবয়স্ক ভগবান্ বলিলেন, 'ফাউল কারি' না হইলে ইহাতে মজা হয় না। এই দ্বিতীয় পদার্থটা যে কি, তাহা আমার কল্পনায়ও আসিল না। আমি ভাবিতেছিলাম, এই প্রস্ফুটিত শ্বেতপুষ্পনিভ সুকোমলহৃদয় পাঁওরুটি কি প্রকারে হিন্দুর ধর্ম্ম ও জাতি-ধ্বংসের বজ্ররূপে পরিগণিত হইল? উহা খাইয়া আমার জাতি ও ধর্ম্ম কোন্ দিক্ দিয়া কিরূপে বাহির হইয়া গেল তাহাও কিছুই বুঝিলাম না। দেশে তখন হিন্দুধর্ম্ম ব্যবসার সাপ্তাহিক, কি মাসিক কলকারখানা খোলে নাই, কথাটা কেহ বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না।

কলিকাতায় আসিলাম। তখন মনস্বী রামমোহন রায়ের সদ্যপ্রসূত ব্রাহ্মধর্ম্মের আন্দোলনে কলিকাতা সহর বিধ্বস্ত। এই আন্দোলনের নেতা এক দিকে কিশোর কেশবচন্দ্র; অন্য দিকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লালবিহারী। দুই জনের মধ্যে বক্তৃতায় কবির লড়াই আরম্ভ হইয়াছে। বাগ্মিতায় কেশবচন্দ্র এবং বিদ্রূপে লালবিহারী অদ্বিতীয়। পরমজ্ঞানী রাম-মোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মকে বেদ-উপনিষদ্‌মূলক প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া সংস্থাপিত করেন, এবং তদ্দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মের তরঙ্গ অবরোধ করিয়া দেশ রক্ষা করেন। 'পৌত্তলিকতা' পর্য্যন্ত তিনি নিম্ন অধিকারীর জন্যে প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করেন। ইতিমধ্যেই দেশের উজ্জ্বল রত্ন কয়েকটি খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং কেশবচন্দ্রও সেই আকর্ষণে পড়িয়াছিলেন। ক্ষণজন্মা রামমোহন রায়ের অভ্যুত্থান না হইলে আজ দেশ অর্দ্ধেক খ্রীষ্টান হইয়া যাইত। কিন্তু জ্ঞানে, মানসিক প্রতিভায়, এবং চিন্তাশীলতায় কেশবচন্দ্র রামমোহন রায়ের সমকক্ষ ছিলেন না। বিশেষতঃ তখনও তিনি ইংরাজের শিষ্য; তাঁহার অপরিণত বয়স। তিনি revelation অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রচারিত শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না। বেদ উপনিষদ্ও

revelation মনে করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হইতে তাহা ক্রমে ক্রমে সরাইয়া, তাহার স্থানে intuition বা স্বতঃসিদ্ধ সংস্কার স্থাপন করিলেন। এই কেশবচন্দ্রই শেষে কুচবিহারী বিবাহের গরজে ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই revelation বা "আদেশবাদ" দ্বারা আত্মসমর্থন করিয়াছিলেন। এইজন্যেই বুঝি, মহাজ্ঞানী শাস্ত্রকারগণ যুগযুগান্তর ধ্যান করিয়া, অবশেষে বলিয়া গিয়াছেন—"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্"।

যাহা হউক, যখন কেবল মনুষ্যের বিবেকশক্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইল, তখন লালবিহারীর পোয়াবার। লালবিহারী শ্রোতৃবৃন্দকে হাসাইয়া বলিলেন,—"যদি ব্রাহ্মধর্ম্মটা কি, আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে, আমি বলিব—যাহা কেশবচন্দ্র সেন বিবেচনা করেন, যাহা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিবেচনা করেন। বিবেচনা ক্রিয়াপদ বর্ত্তমান কালে সাধন করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মটা কি, তাহা বুঝা যাইবে,—যাহা আমি বিবেচনা করি, যাহা তুমি বিবেচনা কর, যাহা তিনি বিবেচনা করেন, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।" কথাটা ঠিক। কেশবচন্দ্রের বিবেচনা-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম গড়াইতে গড়াইতে আজ ৩৷৷০ সমাজে বিভক্ত হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের ৩৷৷০ মূর্ত্তি হইয়াছে। অতএব সাড়ে তিন মূর্ত্তয়ে নমঃ।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'পিরালি' হইলেও একেবারে হিন্দুর বেদ উপনিষদ্, যজ্ঞোপবীত ও জাতিভেদ এক নিশ্বাসে উড়াইয়া দিয়া intuition বা স্বতঃসংস্কার সম্বল করিতে নারাজ হইলেন। কেশবচন্দ্র গোপাললাল মল্লিকের অপদেবাশ্রিত ছাড়াবাড়ী কণ্ঠস্বরে কম্পিত করিয়া, এবং দেবেন্দ্রনাথের অব্রাহ্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া, সরিয়া পড়িলেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র একজন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন,—"আমিও বক্তৃতা করিব।" অধ্যক্ষ বলিলেন, সেখানে বক্তৃতা করিবার তাঁহার অধিকার নাই। তিনি তখন চীৎকার করিয়া শ্রোতাদিগকে বলিলেন,—"অন্য স্থানে আপনারা ঢালের অন্য দিক্ দেখিবেন।" তাহা আর বড় দেখিলাম না। বিশেষতঃ আমরা অজাতশ্মশ্রু বাগ্মিতা-বিমুগ্ধ বালকেরা বুঝিতাম, কেশবচন্দ্রই ব্রাহ্মসমাজ। আমরাও তাঁহার দলভুক্ত হইয়া পীঠস্থান মেছুয়াবাজারস্থ সমাজ ছাড়িয়া, তাঁহার কলুটোলা বাড়ীর সমাজে যোগ দিয়া, কলুর বলদের মত ঘুরিতে লাগিলাম। ঈশ্বর গুপ্ত জীবিত ছিলেন না। না হইলে তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া আবার লিখিতেন,—

"বাধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল।
ব্রাহ্মদের দুই জাতি, বেজে গেল ঢোল॥"

লালবেহারী বগল বাজাইতে লাগিলেন। তাহার পর 'বেথুন সোসাইটি'তে কেশবের "Jesus Christ, Europe and Asia" বক্তৃতা। মিশনরিদের মধ্যে ঢি ঢি পড়িয়া গেল —কেশব খ্রীষ্টান হইয়াছেন। কেশব যে একজন প্রকৃত কৈশবিক বিভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষ, তাহা তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

বলিয়াছি, আমাদের বাসায় আমরা তখন তিন ব্রাহ্ম ছিলাম—নবীন, প্যারী ও আমি। তিন জনের ব্রাহ্মত্বের পর্য্যায়ক্রমে নাম লেখা হইল। ইংরাজী নিয়মে বলিতে গেলে—আমি ব্রাহ্ম, প্যারী ব্রাহ্মতর, নবীন ব্রাহ্মতম। প্যারী golden mean ছিল। তাহার অদৃষ্ট ভাল, তাই সে আজ একজন 'নববিধানী' প্রচারক, আমরা দুই Extremes পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছি। আমি আজ অব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইলে,নবীন অব্রাহ্মতম। যেমন ক্রিয়া, তেমন প্রতিক্রিয়া। মাঘ মাসে দারুণ শীতে পাতকুয়ার বরফের মত জলে প্রত্যূষে স্নান করিয়া, আমরা পাতলা ফিন্‌ফিনে উড়ানি মাত্র গায়ে দিয়া,—না হয় 'ত্যাগ-স্বীকার'—প্রত্যেক রবিবার কেশব বাবুর বাড়ীতে ছুটিতাম। রবিবার ব্রাহ্মদের উপাসনার দিন হইল কেন? রবিবাবুর এক গানে আছে—"নিশি দিন তোমায় ভালবাসি, তুমি অবসরমতো বাসিও।" এও অবসরমতো উপাসনার জন্যে কি? বর্ত্তমান ব্রাহ্মদের উপাসনার দিন, উপাসনার মন্দির, উপাসনার পদ্ধতি, আচার

-ব্যবহার, সকলই খ্রীষ্টানদের নকল। তবে না মাছ, না পক্ষী অবস্থায় না থাকিয়া, তাঁহারা সোজাসুজি খ্রীষ্টান বলিয়া স্বীকার করেন না কেন? কেশব বাবুর বৈঠকখানায় কথিত নূতন দলের সমাজ বসিত। এরূপে কিছু দিন গেল। আর একদিন প্রভাত হইতে বেলা ১১টা হইল, তথাপি উপাসনা শেষ হয় না। বড় বিপদের কথা। একে ত মানুষের মন। গোশৃঙ্গে সর্ষপ যতক্ষণ থাকিতে পারে, ততটুকু কালও অবলম্বনহীন হইয়া মানুষের মন থাকিতে পারে না। তাহাতে বালকের মন। খাঁটি ৫ ঘণ্টাকাল নিরাকারের চিন্তা কিরূপে করিবে? আমি চক্ষু না খুলিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। কি হাস্যকর দৃশ্য! ব্রাহ্মগণ চক্ষু বুজিয়া এত বিভিন্ন ও বিকট প্রকারে মাথা ঘুরাইতেছেন যে, তাহার আকৃতি কোন ক্ষেত্রতত্ত্ববিদের চৌদ্দ পুরুষেও কল্পনা করিতে পারে নাই,—কত circle, semi-circle, elipse, parabola, hyperbola! আমি আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদিও কার্য্যটা মুখে কাপড় দিয়া করিয়াছিলাম, তথাপি পার্শ্বস্থ পাগল উমেশের ধ্যানভঙ্গ হইল। সে আমাকে একটা বিষম ভ্রূকুটি করিল। কিন্তু দৃশ্যটা দেখাইলে, সেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। কেবল স্বয়ং কেশব বাবু মাত্র স্থিরভাবে শিবনেত্র করিয়া, স্থাপিত দেবমূর্ত্তির মত বসিয়া আছেন। কত ক্ষণ পরে তাঁহারও উপাসনা শেষ হইলে, চক্ষু মেলিয়া চশমা পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রচারকাঙ্কুরদের শিরোঘূর্ণন আর থামে না। আমি শেষে জ্বালাতন হইয়া শিষ্টাচারের খাতির না করিয়া উঠিলাম। উমেশও উঠিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, প্যারী নবীন রহিল। পথে আমি উমেশকে বলিলাম, আমি আর ব্রাহ্মসমাজে যাইব না। একে ত সে দিনের অব্রাহ্ম হাসি ও ব্যবহারে সে আমার উপর চটিয়াছিল, ইহাতে আরো চটিল। আমি বলিলাম—"আমি ভাই! নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনন্ত, অচিন্ত্য ব্রহ্মের চিন্তা করিতে এক মুহূর্ত্তও পারি না, পাঁচ ঘণ্টা ত অনেক দূর। আচ্ছা ভাই! মন খুলিয়া বল দেখি, তুমি কিসের উপর মন স্থাপিত করিয়া চিন্তা কর? একটা কিছু ত মনের অবলম্বন চাই?" উমেশ, বলিল, সে উপাসনার সময়ে একটা কালো মহাবিরাট্ পুরুষের মূর্ত্তি কল্পনা করে। পাপীর দণ্ডের জন্য তাহার কাঁধে এক ভীষণ গদা। আমি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"তবে তোমার মত এমন জড় পৌত্তলিক ত ভূভারতে নাই। আমাদের এমন সুন্দর দেবদেবীর মূর্ত্তি ফেলিয়া, এই মহাদৈত্যমূর্ত্তির উপাসনা করি কেন?" পাগলের চক্ষু স্থির হইল। সে আমার স্কন্ধে হাত দিয়া, আমার দিকে বিস্মিতনয়নে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে মূর্ত্তি দেখিয়া আমার আরো হাসি পাইল। কিছু ক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"আচ্ছা, চল এক কর্ম্ম করি। এখন হইতে আমরা সূর্য্যের মত একটা প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ কল্পনা করিয়া, তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া উপাসনা করিব।" আমি বলিলাম—"তাহা হইলে আমরা সূর্য্য-উপাসক, কি পার্শিদের মত অগ্নি-উপাসক হইয়া জড় পদার্থের উপাসক হইব।" উমেশ এবার একেবারে অবাক হইল। কিছুক্ষণ পরে হাসিয়া বলিল—"পাগল! তোর পেটে এত বিদ্যা আছে, আমি ত জানিতাম না। আচ্ছা, কথাটা কাল দুজনে কেশব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিব।" আমি বলিলাম, যেরূপ হইয়া থাকে, তিনি এক মহাদার্শনিক ব্যাখ্যা করিবেন, আমি তাহার কিছুই বুঝিব না। আমি যাইব না। উমেশ পরদিন কেশব বাবুর কাছে গেল। ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"তুই ঠিক বলিয়াছিলি। তিনি কি যে এক দার্শনিক ব্যাখ্যা করিলেন, আমি কিছুই বুঝিলাম না।" আমি সে দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িলাম, এবং কর্ণহীন ক্ষুদ্র তরীর মত সংসারসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলাম।

বজ্রাঘাত

"Hold, hold, my heart;
And you, my sinews, grow not instant old,
But bear me stiffly up!"

ভাদ্র মাস। ৪টার পর কলেজ হইতে আমি ও চন্দ্রকুমার যেরূপ সর্ব্বদা আসিয়া থাকি, একসঙ্গে আসিলাম। দেখিলাম, সহপাঠীরা সকলে কেমন বিমর্ষভাবে বসিয়া আছেন; কেহ যেন পড়িতেছেন, কেহ যেন কি ভাবিতেছেন। দুই একজন সকরুণভাবে আমার দিকে চাহিতেছেন, বাসাবাটী নীরব। কেহ একটি কথাও কহিতেছে না। আমি পুস্তক রাখিয়া, আমার বড়বাজারের ছাত্রকে পড়াইতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, দাদা বলিলেন,—"আজ তুমি কোথায়ও যাইও না।" বুক যেন ধড়াস্ করিয়া উঠিল। দারুণ ব্যথা অনুভব করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কেন? তিনি অধোমুখে সজলনয়নে নিরুত্তর রহিলেন। তাঁহার কাছে বসিয়া বসিয়া চন্দ্রকুমার একখানি পত্র পড়িতেছেন, তাঁহার মুখ মলিন, চক্ষু ছলছল। আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। বসিয়া পড়িলাম। চন্দ্রকুমার উঠিয়া, আমার কাছে সজলনেত্রে আসিয়া পত্রখানি আমার হাতে দিল। গৃহ নিস্তব্ধ, সহপাঠীদের যেন নিশ্বাস পর্য্যন্ত বহিতেছে না। হরকুমার ও আমার বন্ধু দ্বিতীয় চন্দ্রকুমারও সজলনয়নে আমার কাছে আসিয়া বসিল। আমার হাত কাঁপিতেছিল, শরীর কাঁপিতেছিল, প্রাণ কাঁপিতেছিল। আমি পড়িতে পারিতেছিলাম না। অতি কষ্টে বহু ক্ষণে পড়িলাম,—আমার মাতৃপ্রতিম কোমল-হৃদয় করুণাসাগর পিতা তাঁহার পার্থিব দেবলীলা শেষ করিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। আর পড়িতে পারিলাম না। আমার মস্তক যেন বোমের মত বিরাট্ শব্দে শতধা ফাটিয়া গেল। আমার হৃদয়ে কি এক প্রলয়ঝটিকা বহিয়া, হৃদয় উড়াইয়া নিয়া, কি এক জ্বলন্ত মহামরুভূমির মধ্যে ফেলিল। আর আমার মনে নাই।

যখন সংজ্ঞালাভ করিলাম, দেখিলাম—আমার আজীবনসুহৃদ্ সহোদরশ্রেষ্ঠ চন্দ্রকুমারের স্নেহক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শুইয়া আছি। সহবাসীরা সকলে আমাকে ঘেরিয়া বসিয়া আছেন। দুই এক জন ছাড়া সকলের চক্ষু সজল। হরকুমার ও দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার আমার দুই হাত অতি স্নেহে ধরিয়া চন্দ্রকুমারের মত কাঁদিতেছে। আমার চক্ষে জল নাই। হৃদয়ের ও শরীরের ক্রীড়া যখন রুদ্ধ হইয়া যায়, তখন চক্ষে জল কোথা হইতে আসিবে? তখনও আমার মস্তিষ্ক, কর্ণ, হৃদয় সাঁ সাঁ করিতেছিল। বিশ্ব-সংসারে যেন প্রকাণ্ড ঝটিকা বহিতেছিল। যেন পৃথিবী, গ্রহ, উপগ্রহসকল কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। বন্ধুগণ অতি করুণকণ্ঠে আমাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। নানারূপ সান্ত্বনার কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি কিছুই বুঝিতেছিলাম না। তাঁহারা যেন আমার অজানিত কোন ভাষায় কি দুর্জ্ঞেয় কথা বলিতেছেন। কিছু ক্ষণ পরে সে ঝটিকাগর্জ্জন কিঞ্চিৎ থামিয়া আসিল। পত্রখানি আবার শুষ্কনয়নে পড়িলাম। জনৈক পিতৃব্য পত্রখানি দাদার কাছে লিখিয়াছেন। আমার করুণাময় পিতা হাসিতে হাসিতে, কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গিয়াছেন।

স্বভাবতঃ তাঁহার শরীর সুদীর্ঘ, সবল, সরল ও সুন্দর ছিল। তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। কিন্তু তিনি কঠোর তপস্যায় সে শরীর ধ্বংস করিতেছিলেন। কার্য্যস্থানে যে ৫।৬ ঘণ্টা থাকিতেন, তদ্ভিন্ন সমস্ত সময় পূজায় ও আহ্নিকে অতিবাহিত করিতেন। আহারের নিয়ম মাত্রও ছিল না। নিদ্রা প্রায় ঘটিত না। সমস্ত রাত্রি পূজা করিয়া, শেষ রাত্রিতে অতি সামান্য আহার করিয়া ২ ঘণ্টাকাল নিদ্রা যাইতেন। কোনও দিন তাহাও হইত না, পূজায় রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত। এত অত্যাচার শরীর সহিবে কেন? তন্নিবন্ধন বৎসর

বৎসর এ সময়ে "জ্বররোগগ্রস্ত" হইতেন। তাহার উপর ডাব ও আনারস ভিন্ন আর কিছুই খাইতেন না। তাঁহার দূর সম্পর্কে খুড়া এবং অভিন্নহৃদয় কালীকিঙ্কর সেন কবিরাজের ভিন্ন অন্য কারো ঔষধ খাইতেন না। তিনি অতি বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। এত অত্যাচারের, এত কুপথ্য ব্যবহারের পরও তাঁহাকে বৎসর বৎসর বাঁচাইয়া তুলিতেন। এবারও সেরূপ রোগাক্রান্ত হইয়া গ্রামের বাড়ীতে আসেন। রোগ দেখিতে দেখিতে বৃদ্ধি পায়। কবিরাজ মহাশয় পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার তিরোধান হয়। তিনি যে এবার বাঁচিবেন না, তিনি নিজে বুঝিয়াছিলেন। বাড়ী যাইবার সময়ে তাঁহার বন্ধুদিগের কাছে এ কথা বলিয়া ইহ-জীবনের মত বিদায় লইয়া গিয়াছিলেন। যে দিন পৃথিবী ত্যাগ করিলেন, সেই দিন প্রাতে আমাদের গোমস্তার কাছে বলিয়াছিলেন—"আমি সকলকে দেখিলাম, আমার নবীনকে দেখিলাম না।" না পিতঃ! এই আসন্ন সময়ে তোমার চরণসেবা করিবে, নয়ন ভরিয়া একবার দেখিয়া লইবে, চরণ দুখানি বক্ষে ও শিরে ধারণ করিয়া অশ্রুজলে প্রক্ষালন করিয়া তাহার অকৃতিত্বের জন্য ক্ষমা চাহিবে ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবে, তাহার অদৃষ্টে বিধাতা লিখিয়াছিলেন না। তোমার সন্তানদের মধ্যে সে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী। সে তোমার, কি মাতার অন্তিম সময়ে দর্শনলাভ করিবে, তাহার এমন পুণ্য ছিল না। একবার ইহজীবনের জন্য প্রাণ ভরিয়া বাবা ও মা বলিয়া ডাকিয়া লইবে, তাহাও তাহার কপালে ছিল না। ৩৮ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনের সূর্য্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। তথাপি আজ তাহার হৃদয়ে এই কাতরতা, এই দুঃখ, এই শোক সজীব রহিয়াছে।

বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিলে বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল, বাহিরে বারাণ্ডায় বিছানা করিয়া দিতে পিতা ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। মাতা তাহাতে অসম্মতা হইলেন। পিতা বলিতেন, এবং মাতাও বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার কক্ষে থাকিলে পিতাকে কখনও মৃত্যু স্পর্শ করিতে পারিবে না। কারণ, সে কক্ষে পিতার পূজার বেদী স্থাপিত আছে। মাতা সে জন্যেই বিছানা বারাণ্ডায় নিতে দিবেন না। সত্য সত্যই এখানে থাকিলে আমার সাবিত্রী মাতার অঙ্ক হইতে মৃত্যু আমার সত্যবান্ পিতাকে বুঝি লইয়া যাইতে পারিত না। পিতারও সেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তবে কঠোর সংসারযন্ত্রণায় তাঁহার কোমল হৃদয় এত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল যে, তিনি মৃত্যু কামনা করিতেছিলেন। তিনি কিন্তু মাতার কাছে সে ভাব গোপন করিতেন। মাতা সংসারচিন্তায় অস্থিরা হইলে, পিতা আমাকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন—"তোমার ভয় নাই। আমি আশা-লতা রোপণ করিয়াছি। তোমার কোন দুঃখ হইবে না।" সে দিন যদিও তিনি জানিতেন উহা তাঁহার পার্থিব জীবনের শেষ দিন, তথাপি মাতাকে স্থির রাখিবার জন্যে মধ্যাহ্নে আহারের সময় তাঁহার বালিকা পুত্রবধূকে বলিলেন—"মা! মাছের ব্যঞ্জন বড়ই ভাল হইয়াছে। আধা আমার রাত্রির আহারের জন্য রাখিয়া দেও।" তাহার রান্না তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। মাকে বলিলেন—"তুমি দেখিতেছ না, কত লোক আমাকে দেখিতে আসিয়াছে। এখানে তাহাদের বসিবার স্থান হইবে কেন?" মা আর আপত্তি করিলেন না। তিনি জানিলেন না যে, পিতা তাঁহার কক্ষ হইতে এরূপে সজ্ঞান স্থিরভাবে ইহজীবনের মত বিদায় লইয়া চলিলেন। জানিলেন না যে, সেই দিন তাঁহার জীবন-দুর্গোৎসবের বিজয়া দশমী। জানিলেন না যে, তাঁহার গৃহকক্ষের, তাঁহার হৃদয় কক্ষের অধিষ্ঠিত দেবতা কক্ষ শূন্য করিয়া চলিলেন।

বারাণ্ডায় শুইয়া প্রসন্নমুখে সমবেত পিতৃব্য ও আত্মীয় ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ মধুর সম্ভাষণ করিতে ও গল্প করিতে লাগিলেন। কেহ ঘুণাক্ষরেও বুঝিল না যে, তাঁহার আসন্ন সময়। কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া চলিলেন ; ভৃত্য ধরিতে চাহিল, নিষেধ করিলেন। যষ্টি ভর করিয়া দুই চারি পা গেলে, মস্তক হেলিয়া পড়িল। পড়িয়া যাইতেছিলেন, ভৃত্য ও পিতৃব্যেরা উঠিয়া ধরিলেন। দেখিলেন, সময় উপস্থিত ; একবারে প্রাঙ্গণে তুলসীতলায়

লইয়া গেলেন। অকস্মাৎ বাড়ীতে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। সেই হাহাকার গ্রামময় হইল। সমস্ত গ্রামের লোক হাহাকার করিয়া ছুটিয়া আসিল। সে হাহাকারের মধ্যে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, তাঁহার স্নেহ-পাত্র, ভাগ্যবান্ ভ্রাতুষ্পুত্র বালক রমেশ নির্ব্বাহ করিল। পিতা হাসিতে হাসিতে প্রসন্নমুখে যেন নিদ্রিত হইলেন। সে অনিন্দ্য সুন্দর বদনের একটি রেখাও বিকৃত হইল না। সেই সমুজ্জ্বল গৌরবর্ণ কিঞ্চিৎমাত্র বিবর্ণ হইল না। পিতা পূজার সময়ে যেরূপ শিবনেত্র হইয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন, ঠিক সেইরূপ হইয়া রহিয়াছেন। আমার ৪ কনিষ্ঠা ভগিনী,—দুই বিবাহিতা, দুই অবিবাহিতা, এবং তাহাদের ছোট ৬ শিশু ভ্রাতা। তাহার মধ্যে একটি ইতিপূর্ব্বেই স্বর্গে গিয়া পিতার অপেক্ষা করিতেছিল। তাহা না হইলে এতাদৃশ সন্তানবৎসল পিতার স্বর্গের বুঝি তৃপ্তি হইত না। ভাদ্র মাস। প্রাঙ্গণ এখনো কর্দ্দমময়। অনাথ শিশু পুত্রকন্যাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে গড়াগড়ি দিয়া শরীর কর্দ্দমময় করিতেছিল, এবং পিতাকে জড়াইয়া আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরও কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিল। মাতার ও অন্য আত্মীয়গণের শরীরও কর্দ্দমময় করিয়া ফেলিল। তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। যে পিতা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সোনার শরীর কর্দ্দমে শোয়াইয়া রাখিয়াছে দেখিয়া তাহারা সকলকে গালি দিতে লাগিল, এবং টানাটানি করিয়া ঘরে নিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আত্মীয়েরা কিছুতেই বারণ করিতে পারিতেছেন না। কেই বা বারণ করিবে? এই দৃশ্য দেখিয়া কে স্থির থাকিতে পারিতেছে? কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়া পিতা প্রকৃত সন্ন্যাসীর রূপ ধারণ করিয়াছেন। ভ্রাতা ভগিনীগণ ক্ষুদ্র সন্ন্যাসিশিশু সাজিয়াছে। পিতা আজীবন সন্ন্যাসী; সংসার কি, চিনেন নাই। ভ্রাতা ভগিনীগণ! তোরা তাঁহাকে উপযুক্ত বেশে বিদায় দিয়াছিস। কেবল তোদের এই হতভাগা দাদা পিতার সে পবিত্র বেশ দেখিল না। পিতাকে সেই পবিত্র বেশে সাজাইতে পারিল না, পিতার সেই পবিত্র অঙ্গলিপ্ত কর্দ্দম একবার আপনার অঙ্গে মাখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিল না।

এ সকল বৃত্তান্ত পত্রে লেখা ছিল না। আমি পরে বাড়ী গিয়া শুনিয়াছিলাম। কিন্তু পত্র পাঠ শেষ করিয়া এই শোকদৃশ্যের অভিনয় আমি কল্পনার চক্ষে পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। এত ক্ষণে আমার চক্ষে জল আসিল। সে অশ্রুস্রোত এ জীবনে রুদ্ধ হইবে না। ৩৮ বৎসর পরে আজ ঠিক সেইরূপে এই কাগজ সিক্ত করিল।

অকূল সাগর

"A shipwrecked Sailor hast thou been,—misfortune's mark?"

আমার এমন পিতা। দুই দণ্ড প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া, শোকের আবেগ অশ্রুধারায় প্রবাহিত করিয়া, শান্তি লাভ করিব, বিধাতা তাহাও আমার কপালে লিখিয়াছিলেন না। পিতা যে আমাদিগকে কি অকূল সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন, তাহার ভাবনায় নয়নের বারি নয়নে নিবারিত হইল। পিতার যে কোনরূপ পীড়া হইয়াছিল, আমি তাহার সংবাদ মাত্রও পাই নাই। এক মুহূর্ত্তমধ্যে যে মানুষের অদৃষ্টে এমন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, এক মুহূর্ত্তমধ্যে মানুষ যে এরূপ অকূল অনন্ত বিপদ্‌সাগরে আকাশ হইতে অকস্মাৎ বিক্ষিপ্ত হইতে পারে, তাহা প্রথমতঃ আমি ধারণাই করিতে পারিলাম না। আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলাম না যে, আমার পিতা নাই, এক মুহূর্ত্তমধ্যে আমার এ অবস্থা ঘটিল। পিতা যাবজ্জীবন যাহা বলিয়া আমাকে শাসাইতেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাই করিয়া গিয়াছেন; তিনি বাক্সে একটি পয়সাও রাখিয়া যান নাই। তাহার উপর বহু সহস্র ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন। একটি

প্রকাণ্ড পরিবার—পাঁচটি শিশু ভ্রাতা, এবং দুটি অবিবাহিতা ভগ্নী, একটির বিবাহকাল উপস্থিত, বিধবা মাতা, বিধবা খুড়ী ও এক খুড়তত ভ্রাতা। তাহার পর আমার শাশুড়ী ও তাঁহার অনাথ শিশুপুত্র। মাতুলের একটি অনাথ পরিবার। অনাথা মাসী। দুই পিসী ও তাঁহাদের দুটি পরিবার। এতগুলি পরিবার আশ্রয়হীন হইয়াছে। ফলতঃ আমার রক্ত যত দূর গিয়াছে, সর্ব্বত্র দরিদ্রতা। সকলেই এক বজ্রাঘাতে আশ্রয়হীন, উপায়হীন হইয়াছে। পৈতৃক জমিদারির ক্ষুদ্রাংশ, যাহা মোকদ্দমার পর পিতৃব্যেরা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহাও আবার তাঁহাদের বন্ধক দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বয়বাদ সিদ্ধ করিয়া তাহাও লইয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারা পিতার সহোদর ভ্রাতা নহেন। সহোদর ভ্রাতা তিন জন ইতিপূর্ব্বেই পার্থিব যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা আমার বংশসম্পর্কে পিতৃব্য মাত্র। অন্য এক পাপিষ্ঠ তাহার ঋণের তিনগুণ পাইয়াও অবশিষ্ঠ টাকার জন্যে ডিক্রি জারি করিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তি, ভদ্রাসন বাড়ীখানি পর্য্যন্ত, পিতার শ্মশানের অগ্নি নির্ব্বাণ না হইতে নিলামে তুলিল। মাতা অতি সরলা। সংসারের কিছুই বুঝেন না। পিতৃব্যেরা বুঝাইলেন, এমন সম্পত্তি আমি হাইকোর্টের জজ হইলেও মাতা পাইবেন না। হতভাগিনী মাতার, এবং তাঁহার অভাগিনী বালিকা পুত্রবধূর যাহা অলঙ্কার ছিল, তাহাও বিক্রয় করিতে পরামর্শ দিলেন। আর আপনারা বণ্টন করিয়া সকলে কিনিয়া লইলেন। সে টাকার দ্বারা নিলাম ডাকিলেন। কিন্তু অবশিষ্ট টাকা মা কোথা হইতে দিবেন? সে টাকাটা পিতৃব্য একজন দিয়া নিজে সম্পত্তিটা কিনিয়া নিলেন। সম্পত্তি ত গেলই, এ কৌশলে মাতার ও স্ত্রীর যাহা অলঙ্কার ছিল, তাহাও গেল। শুনিয়াছি, বালিকা পুত্রবধূর অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া লইতে স্নেহময়ী মা বড় কাঁদিয়াছিলেন। পিতা সংসারে এত বীতরাগী ছিলেন, অর্থ প্রতি তাঁহার এত অশ্রদ্ধা ছিল যে, কখনো মাতা কোন অলঙ্কার গড়াইয়া দিতে বলিলে বরং মহাবিরক্ত হইতেন। মাতা গৃহস্থি খরচ চালাইয়া যাহা বাঁচাইতে পারিতেন, তাহার দ্বারা এ সকল অলঙ্কার গড়াইতেন। অম্লানবদনে আপনার ও আপনার সন্তানদের অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া দিলেন, কিন্তু পুত্রবধূর অলঙ্কার খুলিয়া দিতে মাতার হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল। পিতার শোকের উপরে এই দারুণ আঘাতে, আহা! মা আমার যে অসহনীয় দুঃখ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহারও অকালমৃত্যু ঘটিল। এত দুঃখের অলঙ্কারগুলিও শেষে পিতৃব্যেরা বণ্টন করিয়া নিলেন। বহু বৎসর পরে মাতার নিদর্শনস্বরূপ রাখিবার জন্যে একখানি গহনা উচিত মূল্যেরও অধিক দিয়া আমি তাঁহাদের কাছে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম। পাইলাম না। সরলা মাতা শেষ সম্বলও এইরূপে হারাইলেন। এখন এতগুলি পরিবারের উপায় কি? এ দারুণ চিন্তায় আমার চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইয়া গেল। এ প্রশ্নের কে উত্তর দিবে? ইহার উত্তর যে মনুষ্যবুদ্ধির অতীত। নিরুপায়ের উপায় ভগবান্ ভিন্ন ইহাদের উপায় কি আছে? সেই অনাথের নাথকে ডাকিলাম। তাঁহার চরণে ইহাদিগকে সমর্পণ করিলাম।

পিতৃব্যগণ আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির এরূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া, আমার উপর ঘোরতর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ যে আমার শিক্ষার ঘোরতর প্রতিকূল ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন বিধাতা তাঁহাদের প্রতিকূলতার পথ আরো পরিষ্কার করিয়া দিলেন। তাঁহারা যুক্তির উপর যুক্তি খাটাইয়া, আমার সরলা মাতার নামে পত্র লিখিয়া আমাকে তৎক্ষণাৎ শিক্ষার আশা বিসর্জ্জন দিয়া বাড়ী যাইতে লিখিলেন। কখন বা লিখিলেন, তোমার যে সম্পত্তি চলিয়া যাইতেছে, তুমি হাইকোর্টের জজ হইলেও তাহা পাইবে না। কখনও বা ঘোরাল বর্ণে আমার নিরাশ্রয় পরিবারের দুরবস্থার ছবি চিত্র করিয়া পাঠাইলেন। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় আমি পিতার কাছে সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, পিতা সে সকল পত্র

তাঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। তাঁহারা আজ আমারই ভাষার দ্বারা শাণিত অস্ত্র সৃষ্টি করিয়া আমার বিদীর্ণ হৃদয়ে অজস্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এক একখানি পত্রে আমার দেবী মাতার ও দেবশিশু ভ্রাতা ভগিনীদের এমন হৃদয়বিদারক বর্ণনা অঙ্কিত হইত যে, আমি মাটিতে বুক রাখিয়া কাঁদিতাম। এ দিকে কলিকাতার দুই চন্দ্রকুমার ও হরকুমার ভিন্ন আর সকলেই, দাদা পর্য্যন্ত, বাড়ী যাওয়া উচিত বলিতে লাগিলেন। যাইতেছি না বলিয়া কেহ কেহ তিরস্কার, কেহ মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। নির্ম্মম সংসারের চারি দিকের অস্ত্রাঘাতে আমি ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিলাম। কিন্তু আমি বাড়ী যাইয়া কি করিব? সম্পত্তি রক্ষা করা দূরে থাকুক, এক মুষ্টি অন্নও ত দুঃখিনী মাতাকে দিতে পারিব না। বি. এ. পরীক্ষার আর তিন মাস মাত্র বাকি। এ সময়ে বাড়ী গেলে পরীক্ষা আর দিতে পারিব না। ভবিষ্যতের বিদ্যাভ্যাসের আশা গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিয়া যাইতে হইবে। তাহা হইলে ২০।২৫ টাকার কেরানিগিরি, কি অন্য কোন চাকরি ভিন্ন আর কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তদ্দ্বারা এ পরিবার কি প্রকারে প্রতিপালন করিব? পিতা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও যাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া ঋণগ্রস্ত হইয়া গিয়াছেন, আমি ২০/২৫ টাকা দ্বারা কি করিব? অথচ কলিকাতায় থাকিয়াই বা কি করিব? থাকিবই বা কি প্রকারে? পিতার মামাত ভাই কাশী বাবু কলিকাতায় আমাদের বাসায় থাকিয়া হাইকোর্টে এক মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। পিতা কত বার আপনার পদও পণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহার ধন প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার অবস্থা খুব ভাল। তিনি দেশের মধ্যে একজন প্রধান জমিদার ও সহৃদয় লোক বলিয়া পরিচিত। তিনি পিতাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলে শত টাকা ব্যয় করিতেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ যখন কলিকাতায় পঁহুছে, তখন তিনি আমাদের বাসায় ছিলেন। কিন্তু তিনি যেরূপ শোকাতুর হইবেন মনে করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই দেখিলাম না। আমি কিছু বিস্মিত হইলাম। আমি দেখিয়াছিলাম পিতার সাংসারিক অবস্থা যত মন্দ হইতেছিল, তত তাঁহার আত্মীয়তাও কিছু কমিয়া আসিতেছিল। আমরা মনে করিতাম, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পিতা আমাদের জমিদারী মোকদ্দমার আপীল করিয়াছিলেন না বলিয়া তিনি এরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার দারুণ জিদ ও মোকদ্দমাপ্রিয়তা দেশখ্যাত। আদালত কুরুক্ষেত্রে তিনি একজন ভীষ্ম মহারথী। আমার অদৃষ্ট-আকাশ হইতে পিতৃসূর্য্য অস্তমিত হইলে, আমি ধ্রুব নক্ষত্রের মত তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলাম। এ বাসায় থাকিয়া আমার সাহায্য না করিলে লোকে নিন্দা করিবে; কেন না, পিতার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা, এবং পিতার কাছে তিনি যে অশেষরূপে উপকৃত। পিতা না থাকিলে তাঁহার যে, গৃহের ভিটার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকিত না, তাহা সকলেই জানে। অতএব তিনি ম্লানমুখে আমাকে পাঁচটি টাকা মাত্র ভিক্ষা দিয়া, পিতার মৃত্যুসংবাদ আসিবার পর ৪।৫ দিন পর খিদিরপুরে গিয়া এক বাসা করিলেন। হায় রে সংসার! অকূল সমুদ্রে পড়িয়া যে এক ভেলার উপর বক্ষ রাখিতে পারিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, তাহাও ভাসিয়া গেল। তখন সম্পূর্ণরূপে উপায়হীন হইয়া ধরাতলে বক্ষ রাখিয়া অশ্রুজলে মাতা বসুন্ধরার বক্ষ প্লাবিত করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলাম—"মাতা, তোমার বক্ষই দীনহীনের একমাত্র আশ্রয়।" স্বর্গীয় পিতাকে ডাকিলাম। দেখিলাম, পিতা পূজায় যেরূপ পদ্মাসনে বসিতেন, সেরূপ ত্রিদিবে পুণ্যলোকে বসিয়া সুপ্রসন্নমুখে সস্নেহনয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। আমি পিতার এ প্রসন্ন মূর্ত্তি সর্ব্বদা স্বপ্নে দেখিতাম। পিতা জপ করিতেছেন, ললাট চন্দন করিতেছেন। আর সেই অলৌকিক সাহসভরা হৃদয়ে বলিতেছেন—"বৎস! মাভৈ!" আর ডাকিলাম সেই দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু বিপদ্ভঞ্জন হরিকে। অনাথের প্রার্থনা অনাথনাথ শুনিলেন। কলিকাতায় পথের ভিখারী পিতৃহীন যুবকের মনে অপরিমেয় সাহস ও শক্তি সঞ্চারিত হইল,

এত উৎসাহ একটি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীর মনেও সঞ্চারিত হইতে পারে না। স্থির করিলাম—বাড়ী যাইব না। জীবন্ত উৎসাহে মাতার কাছে এরূপভাবে লিখিলাম—"মা! ভয় নাই। তুমি তিনটা মাস কোন মতে দুঃখে কষ্টে কাটাও। আমি তিন মাস পরে বি. এ. পরীক্ষা দিয়া বাড়ী আসিব। পিতা সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই ; আমাকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এত পুণ্য, আমাদের কখনও কোন কষ্ট হইবে না। তাঁহার পুণ্যে তাঁহার 'আশালতা'য় সুফল ফলিবে। দুর্গতিহারিণী দুর্গা আমাদের কুলমাতা। তুমি তাঁহার চরণে আমাদিগকে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাক। কুলমাতা আমাদিগকে কূল দিবেন।" প্রত্যেক পত্রে আমার সহৃদয় পিতৃব্যগণ লিখিতেন—"তোমার পিতা এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহার শতাংশের একাংশ রাখিয়া গেলেও তোমার আজ লক্ষ টাকার সম্পত্তি থাকিত। তিনি তোমাদিগকে একেবারে ডুবাইয়া গিয়াছেন।" এরূপ প্রত্যেক পত্রে পিতার প্রতি কত শ্লেষ লেখা থাকিত। এই পিতৃনিন্দা আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার মত লাগিত। এই দারুণ শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে দারুণ আঘাত করিত। আমি তীব্রস্বরে তাহার উত্তর লিখিতাম—"আমার পরম ভাগ্য যে, পিতা আমাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী না করিয়া অশেষ পুণ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া গিয়াছেন। আমার জন্যে সম্পত্তিরূপ তৃণস্তূপ রাখিয়া গেলে আমি এ বংশের আর সকলের মত একটি প্রকাণ্ড গরু হইতাম।" পিতৃব্যগণ স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। দেশশুদ্ধ লোক বিস্মিত হইল। এরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াও এত স্পর্দ্ধা, এত সাহস, এত অহঙ্কার! আমার নিন্দায় দেশ পরিপূর্ণ হইল। আমার কত কুৎসা, কত নিন্দার সৃষ্টি হইল। দুই একটির নমুনা পরে দিব।

এ দিকে কলিকাতায়ও বাসাশুদ্ধ লোক আমার সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া বিস্মিত। দুই একটি ইতরবংশসম্ভূত সহবাসী ঘোরতর মর্ম্মাহত হইল। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ইহাদের কাছে কখনও ম্লান মুখ, কি নতশির দেখাইব না। সাহস দেখিয়া চন্দ্রকুমার পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বলিলেন—"নিতান্ত যদি বাড়ী না যাওয়া স্থির করিয়া থাক, তাহা মন্দ নহে। তবে আমার পিতার কাছে তোমার কলিকাতার খরচ বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত পাঠাইতে লিখি।" চন্দ্রকুমারের পিতা আমার পিসা, তাহার বিমাতা আমার পিসী ; আমার পিতার সহোদরা ভগ্নী। তিনিই বলিদান করিতে গিয়া আমার একটা আঙ্গুলে বলিদান করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমারের পিতা তখন মুন্‌সেফ, কি সবজজ। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া বলিলাম, তাহার প্রয়োজন নাই। আমার দুই private tuition আছে, তাহাতে ২০ টাকা পাই, তাহার দ্বারা আমার কলিকাতার খরচ চলিবে। আমার খরচের জন্যে আমার ভাবনা নাই। চন্দ্রকুমার বলিলেন, পরীক্ষার তিন মাস মাত্র বাকী। এখন সকালে বিকালে দুই বেলা ৪ মাইল করিয়া ৮ মাইল হাঁটিয়া ছাত্র পড়াইতে গেলে, তোমার আপনার পড়া চলিবে কেন? আমি বলিলাম,—"ভাই! ইহা আমার অতি সামান্য ক্লেশ। আমার হতভাগিনী মাতা, ভার্য্যা, শিশু ভাই ভগিনীরা অর্দ্ধাহারে কি অনাহারে দিন কাটাইতেছে। আমি কি এই ক্লেশটুকুও সহ্য করিব না? হাঁটা আমার সহিয়া গিয়াছে। আর পড়া? সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িব। যদি নিতান্ত না পারি, তবে অবশ্য তোমার পিতার কাছে সাহায্য চাহিব। তিনি আমার পিতৃতুল্য, তাহাতে আমার লজ্জা নাই।" দুই এক দিন পরে চন্দ্রকুমার বলিলেন, দাদা বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত আমার কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে চাহিতেছেন। অনেক চিন্তা করিয়া স্বীকৃত হইলাম। কেন, পরে বলিব।

পিতৃব্যগণ তখন মাতাকে এই কুপুত্রের আশা ত্যাগ করিয়া, তাঁহাদের কাছে ভিক্ষা করিবার পরামর্শ দিলেন। সরলা মাতা উপায়ান্তর না দেখিয়া, উত্তরীয় গলায় শিশু পুত্র-গণ লইয়া তাঁহাদের ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিলেন। সুখে, সোহাগে, গৌরবে, বিলাসে, বেশবিন্যাসে পিতৃব্যপত্নীগণ, কেহ এত দিন মাতার দুয়ারেও আসিতে পারেন নাই। আজ

তাঁহাদের সুদিন। সে সব কথা ভুলিয়া মাতার উপর তীব্র অস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একজন বলিলেন—"শূকরীর মত ইহার কত সন্তান দেখ। এতগুলিকে কে ভিক্ষা দিবে ?" কেহ বলিলেন—"তোমার ত দাঁড়াইবার স্থানটুকুও নাই। আমার স্বামী বাড়ী ভিটা পর্য্যন্ত কিনিয়া নিয়াছেন। থাকিতে দিয়াছি, ইহা যথেষ্ট। তাহার উপর আবার ভিক্ষা কি দিব ?" যাহা হউক, পিতৃব্যেরা জমিদারী হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য দিয়া পিতার এক "অন্নজল" শ্রাদ্ধ মাত্র করাইলেন। আমি মাতাকে লিখিয়াছিলাম, আমি গঙ্গাতীরে পিতার শ্রাদ্ধ করিব। তিনি কেবল তিলমাত্র স্পর্শ করাইয়া আমার ভ্রাতাদের কাচা কাটাইবেন। কিন্তু পিতার যে গৌরবে আমার হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়াছিল, মাতার তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা ছিল না। ভিক্ষালব্ধ অর্থের দ্বারা দানসাগর করার অপেক্ষা এরূপ তিলস্পর্শ করা শ্রেষ্ঠতর শ্রাদ্ধ। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মহাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন, শ্রাদ্ধের অর্থ দানসাগর, কি বৃষোৎসর্গ নহে। শ্রাদ্ধের অর্থ শ্রদ্ধার কার্য্য। অতএব তাঁহারা তিলস্পর্শ হইতে দানসাগর পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিয়া সকল অবস্থার লোকের ধর্ম্মরক্ষার পথ করিয়া দিয়াছেন। বিরলে শ্রাদ্ধাযুক্ত হইয়া তিলস্পর্শ করিলে যে শ্রাদ্ধ হয়, শ্রদ্ধাহীন একটা প্রকাণ্ড দানসাগরে তাহার বিপরীত হয় মাত্র। কিন্তু মূর্খ ধর্ম্মযাজকের কল্যাণে আজ আমরা শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়াছি। আজ পিতৃশ্রাদ্ধ শোকের কার্য্য না হইয়া সুখের কার্য্য। প্রাণের শোকোচ্ছ্বাসের কার্য্য না হইয়া উহা উৎসবের কার্য্য। আবার ভিক্ষা করিয়া হইলেও এ উৎসব করিতে হইবে। না হয় ধর্ম্ম যায়, জাতি যায়। হরি হরি ! এ জাতির অধঃপতনের আর বাকি কি আছে ? আমি কলিকাতায় কাশী বাবুর ভিক্ষাদত্ত ৫৲ টাকায় বিগলিত পবিত্র অশ্রুধারায় মাতা ভাগীরথীর পবিত্র স্রোত বৃদ্ধি করিয়া যে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা কুবেরের ভাগ্যেও ঘটে না। তাহার স্মৃতিতে এখনো আমার হৃদয় পবিত্র হইয়া উঠে, নয়নে পবিত্র শ্রদ্ধার ধারা বহিতে থাকে। আমার পুত্র যেন আমার জন্যে এমন পিতৃশ্রাদ্ধ করে।

ভেলা ভগ্ন

"There would have been a time for such a word."
Macbeth.

নয়নের অশ্রু মুছিয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। নয়নের অশ্রু জোর করিয়া মুছা যায়, কিন্তু হৃদয়ের অশ্রুর উপর জোর চলে না। বুঝিয়াছি, বি. এ. পরীক্ষা আমার জীবনের শেষ পন্থা। ইহার উপর আমার জীবনখেলার জয় পরাজয় নির্ভর করিতেছে। অনন্ত বিপদর্ণবে ইহাই আমার শেষ তৃণ। অতএব সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পড়িতেছি। রাত্রি প্রভাত হইল। চমকিয়া দেখিলাম, যেই পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছিলাম, সেই পৃষ্ঠাই এখনো পড়িতেছি। সমস্ত রাত্রি জড় পুতুলের মত পুস্তকের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি সত্য, কিন্তু কিছুই পড়ি নাই। পুস্তকের একটি অক্ষরও দেখি নাই। দেখিয়াছি, আমার অনাথ পরিবারের মুখ। দেখিয়াছি অনাথিনী মাতা অনাথ শিশুটিকে বুকে লইয়া, অনাহারে সমস্ত রাত্রি আমার দিকে চাহিয়া জাগিতেছেন, এবং অবিরল অশ্রুধারায় শয্যা ভিজাইতেছেন। দেখিয়াছি—

"এইখানে মা দুখিনী পড়ে ধরাতলে,
বাতাহত সুবর্ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রায়,

স্থির নেত্র, স্থির গাত্র ; বদনমণ্ডলে
নাহি জীবনের চিহ্ন, অচেতন কায়।
দুগ্ধপোষ্য শিশু-ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া,
কাঁদিছে অভাগা! আহা! মা মা মা বলিয়া।"

ভাবিয়াছি—

"পিতার সে শান্তমূর্ত্তি দেখিব না আর।
শুনিব না আর সেই মধুর বচন,
নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার।
শুনিব না আর আমি যাবত জীবন,
মধুমাখা 'বাবা' কথা বলিব না আর।
শ্রদ্ধার আলয় মম হইল আঁধার।"

আমি কলিকাতায় মাদুর-বিছানায় বুক ও মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলে অবস্থা কি বলিলাম। চন্দ্রকুমার বলিল,—"এরূপ হইলে তুমি কেমন করিয়া পরীক্ষা দিবে? তুমি যে পাগল হইবে। তখন তোমার পরিবারের উপায় কি হইবে?" আমারও সেই ভাবনা। কিছুতেই পড়িতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া পরীক্ষা দিব? তাহার উপর আবার চন্দ্রকুমার ও জগবন্ধুর বই লইয়া তাহাদের পড়ার অবসরমতে পড়িতে হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি সম্যক্ বহি কিনিতে পারি নাই।

এরূপে দিন কাটিতে লাগিল। ঈশ্বর দয়াময়, দুঃখীর দিন দীর্ঘ হইলেও কাটিয়া যায়। দাদা আহার দিতেছেন। চারিটা ভাত খাইতেছি মাত্র। দুধ ও জল খাওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছি। কেন দাদার দয়ার অপব্যবহার করিব? তবে চন্দ্রকুমার হরকুমার জল খাওয়ার যাহা খাইবে, তাহার তৃতীয়াংশ আমার জন্যে রাখিত। আমাকে জিদ করিয়া খাওয়াইত। কাহারো সহোদর ভাইও কি এত দূর করিয়া থাকে? তাহাদের যত্ন দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিতাম, এখনো ভাবি, ইহারা দুটি পূর্ব্বজন্মে আমার সহোদর ছিল। আমি তাহাদের যোগ্য ছিলাম না বলিয়া, এই জন্মে আমার সেই ভাগ্য হয় নাই, এবং যোগ্য সহোদর আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাহারা দুই ভাই ও দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার ছাড়া সহবাসীদের মধ্যে গরীব মহেশও আমাকে কত শুশ্রূষা করিত। সে আমার জন্যে কত ক্লেশ সহ্য করিত। উমেশের ভালবাসা এ সময়ে আরো দ্বিগুণ হইল। এক দিন সে তাহার উড়ানির মধ্যে লুকাইয়া আমার জন্য এক হাঁড়ি সন্দেশ লইয়া আসিয়াছে। আমাকে নীচের ঘরে ডাকিয়া নিয়া গোপনে দিল। আমি খাইব কি, তাহার স্নেহ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সেও কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোর সুন্দর শরীর শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তোর সুন্দর মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। একে ত এই বিপদ্, তাহার উপর কিছুই খাইতে পাইতেছিস্ না। তুই এ সন্দেশগুলি খা।" আমি কাঁদিতে কাঁদিতে খাইতে লাগিলাম। উমেশ গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমার হাতে তুলিয়া দিতে লাগিল। সন্দেশ ত নহে—স্নেহামৃত। এরূপ স্নেহামৃত কেবল দরিদ্র বালক দরিদ্র বালককে দিতে পারে। দরিদ্রতানলে গলিয়া কোমল বিষ্ণুপদসন্নিভ পবিত্র শিশুহৃদয় তরল হইলেই কেবল এরূপ অমৃতময়ী ভাগীরথীর উদ্ভব সম্ভবে। উমেশ নিজেও তখন একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণবালক। অতি কষ্টে বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। না জানি, কত কষ্টে—কত অসীম স্নেহে এ সন্দেশের মূল্য সংগ্রহ করিয়াছিল!

এরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল। বি. এ. পরীক্ষা আরম্ভ হইল। দুঃখের দীর্ঘ দিবস আমাদের হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া শেষ হইল। তখন যদি বিশ্ববিদ্যালয় ও তস্য অদ্ভুত পরীক্ষা ও অপূর্ব্ব পরীক্ষক সকল থাকিত, তবে নিশ্চয় চাণক্য ঠাকুর এই সকল পরীক্ষাকেও

তাঁহার "সদ্যঃ প্রাণহরাণি ঘটে"র মধ্যে গণ্য করিতেন। ছাত্র মাত্রেরই জন্যে এ পরীক্ষা, প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা হইলেও আমার পক্ষে উহা জীবন্ত তুষানলস্বরূপ হইয়াছিল। কারণ, ইহার উপর আমার সর্ব্বস্ব নির্ভর করিতেছিল। পরীক্ষাগৃহে যাইবার সময়ে যে দারুণ হৃৎকম্প হইত, তাহা মনে হইলে আমার এখনো সীতা দেবীর মত রাবণভীতি উপস্থিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বের সকলেই অনিত্য। সকলেরই আদি অন্ত আছে। এহেন পরীক্ষাও শেষ হইল। শেষ দিন পরীক্ষাগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিতে হৃদয় যে কি আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, যাহারা পরীক্ষা দিয়াছে, কেবল তাহারাই জানে। পিতার পরলোকগমনের পর এই প্রথম হৃদয়ে একটি আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল। কিন্তু উঠিবা মাত্রই মিশাইয়া গেল।

গাড়ী হইতে নামিয়া উপরের ঘরে গিয়া বসিয়া আছি। চন্দ্রকুমার নীচের ঘর হইতে বিষণ্ণমুখে ছল ছল নেত্রে উঠিয়া আসিতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। আমি মনে করিলাম, আমার আর কোন সর্ব্বনাশের সংবাদ আসিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, পিতার শোকে আমার সাধ্বী সরলপ্রাণা মাতা অধিক দিন বাঁচিবেন না। হতভাগ্যের এ বিশ্বাসও অমূলক হয় নাই। আমি ব্যস্ত হইয়া চন্দ্রকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম যে, তাহার মুখ এরূপ হইয়াছে কেন? সে আমার ব্যাকুলতা দেখিয়া "কিছুই না, কিছুই না" বলিয়া উড়াইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে আমি অধিকতর ব্যাকুল হইতেছি দেখিয়া বলিল—"তুমি ব্যস্ত হইও না। তোমার বাড়ীর কোন অমঙ্গল-সংবাদ আসে নাই। অন্য কথা। এস, জলখাবার খাই, পরে বলিব।" কিন্তু আমার হৃদয়ের অবস্থা এরূপ হইয়াছিল, আমি এরূপ বিপদ্‌জালে বেষ্টিত যে, উচ্চ শব্দে বাতাস বহিলেও আমি ভয় পাইতাম। আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমার বোধ হইল, নিশ্চয় কোন নূতন বিপদ্ ঘটিয়াছে। চন্দ্রকুমার তাই খুলিয়া বলিতেছে না। আমি ইহা জানিবার জন্যে আরো ব্যাকুল হইয়া জিদ করিতে লাগিলাম। তখন চন্দ্রকুমার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল —"অখিল বাবু আমাকে এই মাত্র নীচের ঘরে বলিতে বলিলেন যে, তিনি তোমাকে বি. এ. পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাহায্য করিবেন বলিয়াছিলেন। আজ বি. এ. পরীক্ষা শেষ হইল। অতএব কাল হইতে তিনি আর তোমার ব্যয় বহন করিবেন না।" তাই বলিয়াছি, পরীক্ষা শেষ হইল বলিয়া আমার আনন্দ উচ্ছ্বাস উঠিবা মাত্র মিশাইয়া গিয়াছিল। আমি ও চন্দ্র-কুমার উভয়ে অধোমুখে নীরব হইয়া রহিলাম। চন্দ্রকুমারের অশ্রু প্রতিরোধ না মানিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আমার চক্ষে জল আসিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে আমার পিতৃদেবের অদম্য হৃদয়বল ও অতুল সাহস আমার হৃদয়ে যেন তড়িৎরূপে সঞ্চারিত হইল। আমি স্থির ধীর কণ্ঠে একটুক করুণাপূর্ণ ঈষৎ হাসির সহিত বলিলাম—চন্দ্রকুমার! তুমি ইহার জন্যে কাঁদিতেছ কেন? দাদা দয়া করিয়া আমাকে এ পর্য্যন্ত যে সাহায্য করিয়াছেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি ইহার জন্যে তাঁহার কাছে চিরঋণী থাকিব। আমি কাল হইতে আমার ছাত্র দুটিকে পড়াইতে যাইব। তাহা হইলে আমার মাসে ২০৲ টাকা আসিবে এবং পূর্ব্ববৎ খরচ চলিবে।" চন্দ্রকুমার আবার গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—"আমি তাহার জন্যে দুঃখিত হই নাই। তোমার private tuition না থাকিলেও আমরা ত আছি। আমার পিতা কি ২।১ মাস তোমার খরচ চালাইতে পারেন না? আমার দুঃখ এই, অবসন্ন হৃদয়ে পরীক্ষাঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছ, এ সময়ে এ নিষ্ঠুর কথাটা না বলিলে কি হইত না? দুদিন পরে ত বলিতে পারিতেন। আর দুদিনের খরচে কি তিনি মারা যাইতেন?" আমি আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"তুমি তাহার জন্যে দুঃখিত হইও না। তুমি জান, দাদা আমার অস্থিরমতি লোক। তিনি নিষ্ঠুরতা করিয়া যে এরূপ করিলেন, তাহা নহে। তাঁহার চরিত্রই এরূপ অস্থির।" চন্দ্রকুমার দাদার ভগ্নীপতি হইলেও তাহার বিবাহের

যৌতুক লইয়া উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মনান্তর ছিল, এবং সদা সর্ব্বদা উভয়ের মধ্যে, বিশেষতঃ স্পষ্টবাদী "খাতিরনদারত" পাগলা হরকুমারের সঙ্গে সর্ব্বদা ঘোরতর কলহ হইত, এবং হরকুমার তাহাকে শিষ্টাচার-সাহিত্যের বহির্ভূত ভাষায় সম্ভাষণ করিত। হরকুমার এ সময়ে আসিয়া এ কথা শুনিয়া একেবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল এবং দাদার প্রতি অজস্র শব্দভেদী অস্ত্রসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

যদিও আমি তাহাদিগকে এরূপ বুঝাইলাম বটে, ফলতঃ দাদা যে কেন এরূপ ব্যবহার করিলেন, আমি নিজেও বড় বুঝিলাম না। দুই একজন বিচক্ষণ সহবাসী আমাকে যেরূপ বুঝাইলেন, সত্যের অনুরোধে তাহা বলিব।

আমাদের বংশের চারি শাখা। এক শাখার সন্তান দাদা, অন্য এক শাখার সন্তান আমি। তাঁহার পিতামহ এরূপ দুর্ব্বৃত্ত ছিলেন যে, দেশের লোক তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে নৌকা ডুবাইয়া মারিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। মনুষ্যের দুষ্প্রবৃত্তিসকল দোধারা অসি। পরের প্রতি সঞ্চালিত করিলে আপনাকেও পুরুষানুক্রমে, জন্মজন্মান্তরে প্রতিঘাত পাইতে হয়। জগতে কিছুরই ধ্বংস নাই। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তিরও ধ্বংস নাই। মানুষ কেবল আপনার পূর্ব্বজন্মের দুষ্প্রবৃত্তির পরজন্ম প্রাপ্ত হয় ও তাহার ফলভোগ করে, এমত নহে ; তাহার পুত্রপৌত্রদিগকেও তাহার ভাগী করিয়া যায়। দাদার পিতামহের 'বংশবিদ্বেষ' ও লোকবিদ্বেষ তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের মধ্যে ঘনীভূত হইয়া ঘোরতর ভ্রাতৃ-বিরোধে পরিণত হইল। ভ্রাতৃবিবাদে ঘরখানি যায় যায় হইয়াছে, পুরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবার উপায় দেখিতেছেন। বংশের সকলে তাঁহার পিতৃব্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার পিতা নিতান্ত অসামাজিক লোক ছিলেন। কাহারো সঙ্গে তাঁহার দেখা সাক্ষাৎও ছিল না। এমন সময়ে তিনি এক দিন আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহাকে পূর্ব্বে আমরা কখনই দেখি নাই। তাঁহার নাম ধূর্জ্জটি, দেখিতেও একটি যেন জীবন্ত ধূর্জ্জটি। বিরাট্ ভীষণ মূর্ত্তি, শরীরে অপরিমিত বল। আমার ছোট ভাই ভগ্নীরা দেখিয়া চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া পলাইতেছে। বাড়ীশুদ্ধ হাসিয়া আকুল। তিনি ঘোরতর তান্ত্রিক, পিতাও তান্ত্রিক। দুজনে একত্রে আহ্নিকে বসিলেন। এ সময়ে তিনি পিতার পায়ের উপর পড়িয়া আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। পিতার তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ. জজ-আদালতের তিনি সর্ব্বময় কর্ত্তা' পিতা প্রথমতঃ তাঁহাদের ভ্রাতৃবিরোধে হস্তক্ষেপ করিয়া আপনার সমস্ত বংশের প্রতিকূলে যাইতে অসম্মত হইলেন। তাঁহাকে আবার বুঝাইলেন, অনেক প্রকারে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পিতার করুণ হৃদয় গলিয়া গেল। তিনি পিতার হস্তে আহ্নিকের জল দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইলেন, যে, পিতা তাঁহাকে আশ্রয় দিবেন। দাদা তখন ঢাকা কলেজে পড়িতেছেন। আমি মাতার বুকে বসিয়া এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পিতা ঘোরতর বিপদ্গ্রস্ত হইলেন। সমস্ত বংশ আমাদের উপর খড়্গহস্ত। ৩ বৎসর কাল পিতা তাঁহাকে লইয়া একঘ'রে হইয়া রহিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ও তৎপক্ষীয়েরা পিতার নামে বেনামা কত দরখাস্তই দিল। তখন দুরন্ত, অথচ বিচক্ষণ সেণ্ডিস সাহেব চট্টগ্রামের জজ। পিতা সেরেস্তাদার। পিতা একদিন কাচারী হইতে যেরূপ চিন্তাকুল ও মলিনমুখে ফিরিয়া আসিলেন, যখন ঋণজালে জড়িত হইয়া যাইতেছিলেন, তখনও আমি তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখি নাই। দেশশুদ্ধ লোক বলিতে লাগিল—"তুমি এই ধূর্জ্জটি বাবুর পক্ষ ত্যাগ কর।" এই উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও পিতা অম্লানমুখে বলিতেন, তিনি আশ্রিতকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। সেই মহাভারতক্ষেত্রের অর্জ্জুনসারথির ন্যায় অবিচলচিত্তে নিরস্ত্রভাবে শত্রুপক্ষের শত অস্ত্রাঘাত সহিয়া এমন কৌশলে ধূর্জ্জটি বাবুর বিজয়-সাধন করিলেন যে, তিনি সকল মোকদ্দমাতে জয়ী হইলেন, অথচ উভয়ের ঘর রক্ষা হইল, এবং

সকল বংশ তাঁহাকে আবার গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য, পিতার ও তাঁহার মধ্যে নিতান্ত সৌহার্দ্দ জন্মিল। একবার আমাদের বাড়ী পুড়িয়া গেল। আমরা বাড়ী পঁহুছিবার পূর্ব্বে তিনি নিজে কিন্তু টাকা দিয়া বাড়ী প্রস্তুত আরম্ভ করাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি না চাহিলেও পিতা এ টাকার তমস্সুক লিখিয়া দিলেন। টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করিলেন। বহুদিন পরে ধুর্জ্জটি বাবুর মৃত্যু হইল। দাদা বাড়ী গিয়া দেখিলেন যে, তমস্সুকে আসল টাকা উশুল আছে, কিন্তু সুদ ৭৫্ টাকা বাকী আছে। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বলিলেন,—"তোমাদের আমাদের মধ্যে মোকদ্দমা হওয়া উচিত নহে। এ ৭৫্ টাকা দিতে তোমার পিতার কাছে লেখ।" সহবাসীদের সাক্ষাৎ এ কথা বলাতে আমি বড় অপমানিত হইয়া পিতাকে ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি সে টাকা দিয়া, তাহার রসিদ আমার কাছে পাঠাইয়া, তমস্সুকের ইতিহাস লিখিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে জিদ করিয়া এ তমস্সুক দিয়াছিলেন, এবং সুদের কথা দূরে থাকুক, আসল টাকা পর্য্যন্ত ধুর্জ্জটি বাবু অনিচ্ছায়, কেবল পিতা ছাড়িতেছেন না বলিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, কলিকাতায় আসিয়া আমাকে অপমানিত না করিয়া, টাকাটা তাঁহার কাছে চাহিলেই তিনি পাঠাইয়া দিতেন। দাদা বড় অপ্রতিভ হইলেন ; হরকুমার তাঁহার প্রতি এ ঘটনা লইয়া শাণিত অস্ত্রসকল প্রহার করিতে লাগিল। দেশেও তাঁহার বড় নিন্দা হইল। অতএব কেহ কেহ আমাকে বুঝাইলেন যে, ৩ মাসের বাসাখরচ ৪৫্ টাকা ও বি. এ. পরীক্ষার ফিস ৩০্ টাকা দিয়া, দাদা সেই ৭৫্ টাকা আমাকে প্রত্যর্পণ করিলেন মাত্র। সহৃদয়তা নহে, সাংসারিকতা। এই জন্যই বি. এ. পরীক্ষার শেষ দিন এরূপ জবাব দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি এই ব্যাখ্যা বিশ্বাস করি নাই। আমার বিশ্বাস, তিনি কেবল দয়া করিয়া আমার এরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। এই ঘোরতর বিপদের সময়ে এই দয়ার জন্যে আমি তাঁহার কাছে চিরঋণী রহিয়াছি। নানা বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার ঘোরতর মতভেদ হইলেও আমি তাঁহাকে আমার পিতার মত ভক্তি করিতাম। সেই ভ্রাতৃবিদ্বেষানল তাঁহার ও তাঁহার পিতৃব্যভ্রাতার মধ্যে দাবানলের মত জ্বলিয়া আমৃত্যু তাঁহাদের জীবন ভস্মীভূত করিয়াছিল। হরি! হরি! মানুষের কর্ম্মফল কি অলঙ্ঘনীয়! কি সুদূর-স্পর্শী!

নরনারায়ণ

"যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥—গীতা।

যে এক ভেলার ভরসা করিয়া ভাসিতেছিলাম, তাহাও ত ডুবিয়া গেল। এখন কি করি? অবস্থার ঘোর ঘটায় চারি দিক্ সমাচ্ছন্ন। মস্তকের উপর ঝটিকা গর্জ্জিতেছে। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতেছে। ঘোরতর অন্ধকার ভিন্ন কিছুই দেখিতেছি না। একটি ক্ষীণ জ্যোতিঃ, একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্রও কোন দিকে দেখিতেছি না যে, উহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ভাসিয়া থাকি। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া এরূপ আহত ও নিমজ্জিত করিতেছে যে, আর ভাসিয়া থাকিবার আশা দেখিতেছি না। একটি কিশোরবয়স্ক কলিকাতার পথের কাঙ্গাল কেমন করিয়া কূল পাইবে? সকল অবলম্বন ভাসিয়া গিয়াছে, সকল আশা নিবিয়া গিয়াছে। একমাত্র আশা সেই বিপদ্ভঞ্জন হরি। ভক্তিভরে, অবসন্ন প্রাণে, কাতর অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলাম। তিনি প্রহ্লাদের মত আমাকেও তাঁহার নরমূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। সেই নরনারায়ণ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি সম্প্রতি স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন। সেই

ভগবদ্বাক্য—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"—মানবের একমাত্র সান্ত্বনার কথা। "পুণ্যং পরোপকারশ্চ পাপঞ্চ পরপীড়নে"—এই মহাধর্ম্ম সংস্থাপন করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অবতার। সেই মহাব্রত সাধন করিয়া, তাঁহার অবতারে বঙ্গদেশ পবিত্র করিয়া তিনি তিরোহিত হইয়াছেন মাত্র। তাঁহার মৃত্যু নাই। তিনি চিরজীবী। তিনি চিরদিন শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই থাকিবেন।

আমরা প্রথম কলিকাতা আসিবার কিছু দিন পরে আমাদের মাতৃভূমির বরপুত্র খ্যাতনামা ডাক্তার *অন্নদাচরণ কাস্তগিরি এম. ডি. পরীক্ষা দিবার জন্যে কলিকাতায় আসিলেন। ইঁহারা বংশপরম্পরা কাস্তগিরি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি যে কেন তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া, কর্কশ ও কষ্ট-উচ্চারিত খাস্তগিরি উপাধি শেষ জীবনে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা জানি না। তিনি আমার পিতার একজন পরম বন্ধু ছিলেন। আশৈশব আমাকে বড় ভালবাসিতেন, এবং যখন কার্য্যস্থান হইতে দেশে আসিতেন, আমার শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন। তখন কলিকাতায় কেবল আমি ও চন্দ্রকুমার মাত্র আছি। তিনি বলিলেন—"তোমরা দুটি বালক কলিকাতায় এরূপ অভিভাবক ও আশ্রয়শূন্য হইয়া কিরূপে থাকিবে। চল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়া দিব।" আমাদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিল না। আমরা তাঁহার সঙ্গে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহের আন্দোলনে দেশ তখন প্রকম্পিত হইতেছে। ডাক্তার অন্নদাচরণ এ সমাজযুদ্ধে তাঁহার একজন দক্ষ সেনাপতি। তখন তিনি বরিশালে, এবং বরিশালের একজন খ্যাতনামা লোকের বিধবা বিমাতার পর্য্যন্ত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ও আমাদিগকে অত্যন্ত সমাদরে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ও হরি! এই কি খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর? সমস্ত বঙ্গদেশ যাহার বেতালে আমোদিত, শকুন্তলায় মোহিত, এবং সীতার বনবাসে আর্দ্রিত হইতেছে, এই কি বঙ্গভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা সেই বিদ্যাসাগর! যাঁহার নাম প্রত্যেক নরনারীর মুখে, যিনি মৃত হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন, ইনিই কি সেই বিদ্যাসাগর? এই খর্ব্বাকৃতি, চক্রাকারে মুণ্ডিতমস্তক, নিমজ্জিত তীক্ষ্ন নেত্র, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক অধরভঙ্গি, গগনোপম উচ্চ প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত উরস, বলিষ্ঠ শরীর, কৃষ্ণবর্ণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ কি সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর? চরণে চটি, পরিধানে সামান্য ধুতি, গলায় বিশদ অমল-ধবল মুক্তাহারসন্নিভ যজ্ঞোপবীত, হস্তে ক্ষুদ্র রজতনলসংযুক্ত একটি সামান্য হুঁকা, মুখে হাসি, মূর্ত্তিতে শান্তি, হৃদয়ে অমৃতরাশি,—আমাদের ন্যায় বালকের সঙ্গে পর্য্যন্ত সমান ভাবে চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত সস্নেহ আলাপ করিতেছেন—এই কি সেই বিদ্যাসাগর! আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, মোহিত হইলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন তাঁহার পরম বন্ধু প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে থাকিতেন। দুই বন্ধুর মূর্ত্তিতে কি অপূর্ব্ব তারতম্য! আমি রাজকৃষ্ণ বাবুকে যখনই দেখিতাম, তখনই আমার পরমপ্রেমাস্পদ অনিন্দ্য-সুন্দর পিতাকে মনে পড়িত। রাজকৃষ্ণ বাবুর সেইরূপ মাধুর্য্যপূর্ণ গৌরবর্ণ দীর্ঘ দেব-অবয়ব, প্রীতিপূর্ণ প্রসন্ন মুখ। রাজকৃষ্ণ বাবুও সেইরূপ মূর্ত্তিমন্ত সন্তানস্নেহ। বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন এবং মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ী গিয়া আমাদিগকে দেখিয়া আসিবেন বলিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে, কোন অসুখ হইলে সংবাদ দিতে আমাদিগকে বলিলেন। এ সকল কথা এরূপ সরল ও সস্নেহভাবে বলিলেন যে, শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিতেছিল। আমার বোধ হইল, কোন দেবতা আমাদের উপর তাঁহার পদছায়া প্রসারিত করিলেন। আমাদিগকে তাঁহার অভয়-বরদ দুই করপদ্ম দেখাইলেন। আমরা বাস্তবিকই সে দিন হইতে নির্ভয় হইলাম।

ইহার কিছু দিন পরে আমার একজন খুল্ল পিতামহ কালীঘাট আসিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের একজন খ্যাতনামা ডেপুটি কালেক্টর। আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

ফিরিয়া আসিলে আমাদের স্বদেশীয় ভৃত্যটি বলিল যে, একটি লোক আমাদের বাসায় আসিয়া আমাদের তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় তখন "সিংহ মহাশয়" ভিন্ন আমাদের পরিচিত দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। অতএব লোকটি কে, কিছুই বুঝিলাম না। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া আমি বলিলাম—বিদ্যাসাগর মহাশয় নহে ত? চাকরটি দোহাই কুটিয়া বলিতে লাগিল যে, এমন কদাকার পুরুষ কখনও বিদ্যাসাগর হইতে পারে না। পোষাকও সেরূপ। সে কোনও দরিদ্র সামান্য লোক হইবে। অহো! ইহার অপেক্ষা তাঁহার দেবত্বের প্রমাণ আর কি হইতে পারে? দরিদ্রের জন্যে এরূপ দরিদ্রতার দৃষ্টান্ত, এরূপ সংসারে সন্ন্যাস, জগতে আর কে দেখাইয়াছে? চাকরের বর্ণনায় আমার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইল। কেবল একটা সন্দেহ। যদিও তিনি বলিয়াছিলেন বটে, তথাপি কি চট্টগ্রামের দুইটি দরিদ্র বালককে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখিতে আসিবেন—ইহা কি সম্ভব? আমি পরদিন তাঁহার কাছে গেলাম। সকল সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। তিনিই আসিয়াছিলেন। আমার হৃদয় ভক্তিতে অচল হইল। আমাদের ঘরখানি পশ্চিমদুয়ারি ছিল। তিনি ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"পশ্চিমদুয়ারি ঘর এত কষ্টকর যে, রামরাজ্যে তাহার টেক্স ছিল না। চল, তোমাদের জন্যে আর একটি বাড়ী দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া মোটা চাদরখানি গায়ে দিয়া উঠিলেন, এবং চটি পায়ে চটাস্ চটাস্ করিয়া চলিলেন। আমি প্রথমে স্তম্ভিত হইলাম, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের জন্যে বাড়ীর অন্বেষণে চলিলেন! পরে পুতুলের মত পশ্চাতে ছুটিলাম। আমি ছাতাখানি খুলিলে তিনি ছাতার নীচে আসিয়া আমার হাতের উপর হাত দিয়া বাঁটটি ধরিলেন। লজ্জায় আমার পা উঠিতেছে না। কত বলিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার হাত সরাইলেন না। যেন চিরপরিচিত আত্মীয়ের মত এরূপে আমার সঙ্গে চলিলেন। এম্‌হার্ষ্ট ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে তখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছাপা হইত, তাহার উপরের ঘরগুলি খালি ছিল। স্থানটি বেশ ভাল, ঘরগুলি অতি পরিষ্কার, এবং আয়তনবিশিষ্ট। তিনি বলিলেন, এ ঘরগুলো আমাদের ভাড়া করিয়া দিবেন। তাঁহার আদেশমতে দুই দিন পরে আমি আবার গেলে আমাকে বলিলেন—"ঘরগুলির বড় অতিরিক্ত ভাড়া চাহিতেছে। অতএব অন্য একটি বাড়ী আমি দেখি। আপাততঃ তোমরা এ বাড়ীতে থাক।" পরে আমরা ১১নং পটুয়াটুলি বাড়ীতে যাই। আমি ইহার পর মধ্যে মধ্যে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। কখনও বা তিনি রাজকৃষ্ণ বাবুর দ্বারা তাঁহার সংগে দেখা করিতে সংবাদ দিতেন। তিনি এ সময় কলিকাতায় বড় একটা থাকিতেন না।

আজ এই উত্তাল বিপদর্ণবের ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে আমি নরনারায়ণ মূর্ত্তি দেখিলাম। দেখিলাম, এ সংসারে আমি-দীনহীনের আর কেহ নাই। আছেন কেবল সেই দীনবন্ধু। পরদিন প্রাতে তাঁহারই শরণ লইতে চলিলাম। রাজকৃষ্ণ বাবুর বৈঠকখানাভরা লোক। কিন্তু আভূতল নত হইয়া প্রণাম করিবা মাত্র তাঁহারা দুই জনে আমার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—আমি পিতৃহীন, ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত। তখন দুজনে পিতার মৃত্যুর ঘটনা সকল জিজ্ঞাসা করিয়া অত্যন্ত সহানুভূতি দেখাইলেন। আমি কাঁদিতেছিলাম, তাঁহারা চক্ষের জল পুঁছিতেছিলেন, দর্শকগণ করুণ-নয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছিলেন। ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় দিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে নির্জ্জন বারান্দায় ডাকিয়া নিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার বিপদ্ কি? আমি তখন অতি কষ্টে অশ্রু ও কণ্ঠবাষ্প অবরোধ করিয়া ভগ্নকণ্ঠে আমার দুঃখের কাহিনী তাঁহার কাছে নিবেদন করিলাম। তিনি অধোমুখে নিবিষ্টমনে শুনিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কপোলযুগল বহিয়া ধীরে ধীরে গোমুখী হইতে সুরধুনীধারার মত দুটি সন্তাপহারিণী প্রেমধারা ঝরিতে লাগিল। আমার শোকের আখ্যান শেষ হইলেও অনেক ক্ষণ এইরূপ ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তুমি এখনও বালক, আর তোমার উপর এ বিপদ্! কিন্তু ভাই! তুমি কাতর হইও না। আমিও এক দিন তোমার

মত দুঃখী ছিলাম। সংসারে দুঃখীই অধিক। তোমার পিতা আর কিছু দিয়া না যান, তোমাকে ত শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মোট কথা, তোমার এখন বাড়ী যাওয়া হইবে না। এখনে কিছু দিন থাকিয়া বি. এ. পরীক্ষার ফল প্রতীক্ষা ও চাকরীর চেষ্টা করিতে হইবে। তোমার মাসিক খরচ কি লাগে?" আমি বলিলাম—কুড়ি টাকা। আমার দুটি 'প্রাইভেট টুইশন' আছে, তাহার দ্বারা আমার বাসা-খরচ চলিবে। ভাবনা কেবল পরিবারের জন্যে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—এখন তাহাদের কিরূপে চলিতেছে? আমি বলিলাম—বলিতে পারি না। মাতা আমার কাছে সে কথা কিছু লিখেন নাই। তিনি আবার কিঞ্চিৎ ভাবিয়া বলিলেন,—"তোমার মাতার কাছে সে কথা জিজ্ঞাসা কর। কোনরূপ সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না জান। আর তোমারও এখন 'প্রাইভেট টুইশন' রাখিলে কর্ম্মের চেষ্টার ত্রুটি হইবে।" এই বলিয়া উঠিয়া গেলেন। একখানি চিঠি লিখিয়া আনিয়া, তাহা সংস্কৃত লাইব্রেরিতে দিতে ও কিছুদিন পরে কলিকাতায় তিনি ফিরিয়া আসিলে দেখা করিতে বলিলেন। চিঠি-খানি সংস্কৃত লাইব্রেরিতে দিলে তাঁহারা আমাকে ৪০৲ টাকা দিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। বলিলাম—আমি ত কোনও টাকা চাহি নাই। তাঁহারা বলিলেন—তাঁহারা তাহা বলিতে পারেন না; তাঁহারা উক্ত পত্রের আদেশ মতে টাকা দিয়াছেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া ছলছল নেত্রে এ দয়ার উপাখ্যান চন্দ্রকুমারকে বলিলাম এবং টাকা ৪০৲ টি হরকুমারকে দিলাম।

এ সময়ে আমাদের দেশের একজন সঙ্গতিপন্ন যুবক গোপীমোহন ঘোষ কলিকাতায় বেড়াইতে, কি কোন কার্য্য উপলক্ষ্যে আসেন। আমার সহবাসীরা কেহ প্রায় বাসাবাটীর বাহিরে যাইতেন না। দেশস্থ কলিকাতাযাত্রী মাত্রেরই পাণ্ডাগিরি আমাকে করিতে হইত। আমি তাঁহাকে কলিকাতা প্রদর্শন করাইলাম, এবং তাঁহার সকল দ্রব্যাদি কিনিয়া দিলাম। দেশে ফিরিয়া যাইবার তিন তিনি আমাকে নীচের ঘরে নিৰ্জ্জনে ডাকিয়া নিয়া একখানি ৫০৲ টাকার নোট দিলেন, এবং স্নেহবিগলিত কণ্ঠে বলিলেন,—"আমার হাতে এখন আর টাকা নাই। তুমি এই নোটখানি নেও। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার বুক ফাটিতেছে। দুর্ভাবনায় তোমার সুন্দর শরীরের অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তুমি এ টাকার দ্বারা একটুক খাওয়াদাওয়া ভাল করিয়া করিও।" আমি কাঁদিতে লাগিলাম। দেখিয়া আমাকে জড়াইয়া বুকে লইয়া গোপীও কাঁদিতে লাগিলেন। গোপী স্কুলে আমার কয়েক ক্লাশ উপরে পড়িতেন। আমি তাঁহাকে চিনিতাম, তিনি আমাকে চিনিতেন মাত্র। আমার প্রতি তাঁহার অকস্মাৎ এই দয়া! তাঁহার যে এরূপ দেবতুল্য হৃদয় ছিল, আমি জানিতাম না। তাঁহাকে চিরকাল আমোদপ্রিয় যুবক বলিয়াই জানিতাম। আমি এই দয়ার কি উত্তর দিব? আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম —"বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে ৪০৲ টাকা দিয়াছেন। তাহাতে আমার খরচ চলিতেছে।" তিনি বলিলেন—"তাহাতে কি। তুমি এ টাকাটা না রাখিলে আমি বড় দুঃখিত হইব। ইহার পরও টাকার প্রয়োজন হইলে তুমি আমার কাছে লিখিও।" তাঁহার সেই স্নেহ, সেই দয়া, সেই দয়াবিগলিত অশ্রু! আমি নীরবে নোটখানি লইলাম, এবং আরও কিছুক্ষণ তাঁহার সেই দয়ার্দ্র বক্ষে মস্তক রাখিয়া কাঁদিলাম,—পিতৃহীন নিরাশ্রয় বালক যেরূপ কাঁদিতে পারে সেরূপ কাঁদিলাম,—কাঁদিয়া পিতার পরলোকগমনের পর এই প্রথম শান্তি লাভ করিলাম। এই ৯০৲ টাকার উপর নির্ভর করিয়া আমার জীবনযুদ্ধে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এবং এই ৯০৲ টাকার উপর নির্ভর করিয়া আমার জীবনযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলাম। এই ৯০৲ টাকা আমার জীবনের ভিত্তিভূমি। আজ আমার অবস্থা যাহা, এই ৯০৲ টাকা তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি এই ৯০৲ টাকা এবং দাদার সাহায্যের টাকা প্রত্যর্পণ করি নাই। প্রত্যর্পণ করিবার কথা মুখেও আনি নাই। কারণ, এরূপ দানের প্রতিদান নাই; এই দান সামান্য হইলেও ইহার তুলনা করিতে পারে, জগতে এমন কি আছে? ইহার একমাত্র প্রতিদান ভক্তির অশ্রু।

আমি যাবজ্জীবন তাঁহাদিগকে তাহাই উপহার দিয়া পূজা করিব। গোপীমোহন আজ আমার একজন পরম বন্ধু। গোপীমোহন নামই বুঝি আমার জীবনের প্রেম-মন্ত্র। গোপীর হৃদয়ের তুলনার স্থল আমি আমার দেশে দেখি নাই। ঈশ্বর তাঁহার শেষ জীবন শান্তিময় ও সুখময় করুন!

ভীষণ সমস্যা

"To be or not to be, that is the question.—
Whether, 'tis nobler in the mind, to suffer
The slings and arrows of outrageous Fortune;
Or to take arms against a sea of troubles,
And, by opposing end them?—To die,—to sleep,—
No more;—and by a sleep, to say we end
The heart-ache, and the thousand natural shocks
That flesh is heir to—'its a consummation
Devoutly to be wish'd."

Hamlet.

সমুদ্রের প্রবল স্রোতে তরঙ্গাভিঘাতে তৃণগাছটি ভাসিয়া যাইবার সময়ে যেমন সময়ে সময়ে তীরস্থ কোন পদার্থকে অবলম্বন করিয়া এক এক বার তিষ্ঠিতে চেষ্টা করে, আবার স্রোতোবেগে তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া যায়, আমারও সে দশা হইল। আমি কলিকাতারূপ মহাসমুদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া কত লোকের কাছে গেলাম, কত লোককে অবলম্বন করিয়া আশ্রয় পাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিলাম না। অবস্থার খর স্রোতে ও তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া চলিলাম। এই অন্ধকারের মধ্যে একটি ক্ষীণ আশার আলোক দেখিলাম। আমি বি. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলাম। যেরূপ অবস্থায় পরীক্ষা দিয়াছিলাম, উত্তীর্ণ হইবার আমার কিছুমাত্র আশা ছিল না; দ্বিতীয় শ্রেণী দূরের কথা। কিছু দিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া, যাহা যাহা করিয়াছি, সকল বলিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন, নিজেও চেষ্টা করিবেন। শ্রদ্ধাস্পদ রাজকৃষ্ণ বাবু এক পত্র দিয়া খ্যাতনামা বাবু দিগম্বর মিত্রের কাছে পাঠাইলেন। তিনি তখনও রাজা হন নাই। অনেকক্ষণ তাঁহার গোমস্তা মহাশয়ের কাছে নীচের ঘরে বসিয়া তাঁহার কৃপা ভোগ করিয়া, শেষে উপরের ঘরে যাইতে আদেশ পাইলাম। দিগম্বর বাবুর কাছা খোলা, হাতে দৈনিক সংবাদপত্র, অন্য সজ্জিত কক্ষ হইতে একটি সামান্য ফরাস-বিছানার কক্ষে আসিয়া আমাকে দর্শন দিলেন। আমাকে একখানি সংবাদপত্র ফেলিয়া দিয়া নিজে একখানি পড়িতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে অন্যমনস্ক হইয়া এক আধটা কথা কহিতে লাগিলেন। শেষে যখন শুনিলেন, আমার বাড়ী চট্টগ্রাম, তখন বিস্মিত হইয়া আমাকে আপাদমস্তক দেখিলেন। বোধ হয়, চট্টগ্রামের মানুষ একটা স্বতন্ত্র প্রকারের জীব বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। যখন সে সন্দেহ ঘুচিল, তখন বলিলেন,—"তুমি ত বড় Enterprising lad, তুমি চট্টগ্রাম হইতে এত দূরে পড়িতে আসিয়াছ?" তখন চট্টগ্রাম সম্বন্ধে এবং তাহার সমুদ্রপথ সম্বন্ধে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার উত্তর শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বাঙ্গালের তস্য বাঙ্গাল হইয়া যে আমি খাঁটি কলিকাতার ভাষায় কথা কহিতেছি, তাহাতে বড় বিস্মিত হইলেন। অবশেষে আমার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে

আমি শোকসন্তপ্তহৃদয়ে ধীরে ধীরে অবনত-মস্তকে সকলই বলিলাম। তাঁহার হৃদয় ভিজিল। তিনি সস্নেহকণ্ঠে বলিলেন—"আমার মতে তোমার পড়া ত্যাগ করা উচিত নহে। আমি খরচ দিব, তুমি বি. এল. পাশ কর। তুমি যেরূপ ভাল ছেলে দেখিতেছি, অবশ্য পাশ করিতে পারিবে। আর তাহা হইলে সকল দুঃখ ঘুচিবে। নিশ্চয়ই তোমার বেশ পসার হইবে।" আমি বলিলাম, আমার নিজের পড়ার জন্যে ভাবনা নাই ; 'প্রাইভেট টুইশন' অবলম্বন করিয়াও পড়িতে পারিব। কিন্তু আমার বিশাল অনাথ পরিবারের উপায় কি হইবে? তিনি জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, তাঁহাদের জন্যে আমার মাসিক অনুমান ১০০৲ টাকা প্রয়োজন। তিনি বলিলেন—তবে আমার কলিকাতার খরচশুদ্ধ আমার মাসিক ১৫০৲ টাকা চাহি। তিনি কিঞ্চিৎ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন—"যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়, কি অন্য কেহ অর্দ্ধেক খরচ দেন, তবে তিনি অর্দ্ধেক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন।" আমার আর কথা সরিল না। তাঁহার এরূপ অসাধারণ দয়া পাইব, তাহা আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই। বিদ্যাসাগর ও রাজকৃষ্ণ বাবুর কাছে গিয়া এ কথা বলিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন—"বেশ কথা। নিতান্ত না হয় তাহাই করা যাইবে। কিন্তু বি. এল. পাশ করিয়া উকিল হইলেই যে তুমি টাকা পাইবে, তাহার বিশ্বাস কি?" আমিও তাহা বুঝিলাম। তাহার উপর ভগ্নী একটির বিবাহ এখন না দিলেই হয় না। কোন্ প্রাণে সেই ব্যয়ও তাঁহাদের কাছে চাহিব? পুণ্যবান্ পিতার কোন কথাই প্রায় ব্যর্থ হয় নাই। আমি আমার ভগ্নীদিগকে আদর করিতেছি দেখিলে তিনি সর্ব্বদা হাসিয়া বলিতেন—"দুজনকে আমি বিবাহ দিয়া যাইব, আর দুজনকে তোমায় দিতে হইবে।" ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। আমার দুই ভগ্নী অবিবাহিতা রাখিয়া গিয়াছেন। দেবপ্রতিম কেশব বাবুর পত্র লইয়া হাইকোর্টের খ্যাতনামা জজ দ্বারিকনাথ মিত্রের কাছে গেলাম। তিনি তখন কাশীপুরে থাকিতেন। কৃষ্ণবর্ণ বীরমূর্ত্তি। উচ্চ ললাটগগন ও তীব্র নয়নযুগল হইতে যেন প্রতিভা ফুটিয়া পড়িতেছে। তাঁহারও কাছা খোলা, একটি তাকিয়ার উপর পেট রাখিয়া উপুড় হইয়া বসিয়া কি একখানি বহি পড়িতেছেন। কেশব বাবুর পত্রখানি পড়িয়া সংক্ষেপে আমার অবস্থার কথা শুনিয়া বলিলেন—"ইংলিশ ডিপার্টমেণ্ট জেকসন সাহেবের হাতে। তাহার সঙ্গে আমার বড় সম্প্রীতি নাই। তথাপি কোন কার্য্য খালি হইলে আসিও, আমি তোমার জন্যে অনুরোধ করিব।" বেঙ্গল অফিসের কার্য্যবিভাগের 'হেড এসিস্টেণ্ট' রাজেন্দ্র বাবু। বেঁটে, পেট মোটা, বেশ সদাশয় লোক। তাঁহার সঙ্গেও পরিচয় হইয়াছে। তিনিও অত্যন্ত স্নেহ করিতেছেন ও আশা দিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ যদিও ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষার পর ছাড়িয়াছি, তথাপি তাহার প্রাতঃস্মরণীয় প্রিন্সিপেল সার্টক্লিফ সাহেবও বড় অনুগ্রহ করিতেছেন। তিনি প্রথমতঃ আমাকে ডাকিয়া নিয়া, আসাম শিবসাগর স্কুলের ৪০৲ টাকা বেতনের এক শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। তাহা গ্রহণ করিবার জন্যে সহবাসী সকলে পরামর্শ দিলেন। দাদা জিদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, ৪০৲ টাকাতে আমার কোনও মতে কুলাইবে না। আমার নিজের অন্ততঃ ২০৲ টাকা লাগিবে। বাকি ২০৲ টাকাতে এত বড় একটা পরিবারের অন্ন নির্ব্বাহ হইবে না। আমি অস্বীকার করিলাম। দাদা চটিলেন; বাসাশুদ্ধ সকলেই চটিল। দু এক জন ইতরবংশীয় সহবাসী, আমি তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরেল সার্ জন লরেন্স হইব বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। আমার এ দুরবস্থায় তাহারা বরং তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল। রক্তের এমনি যে অপূর্ব্ব মহিমা, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। কিন্তু সার্টক্লিফ সাহেব আমার আপত্তি সঙ্গত মনে করিয়া কিছু দিন পরে গোয়ালপাড়া স্কুলের হেডমাষ্টারের পদের জন্যে সুপারিস করিয়া ডিরেক্টার এটকিনসন সাহেবের কাছে পাঠাইলেন। সাহেব মহোদয় ধূলা-বিজড়িত, ধুতি-চাদর-পরিহিত একটা বালক দেখিয়া বলিলেন—এরূপ একটা "green lad" (কাঁচা যুবককে) তিনি একটা হেডমাষ্টারি দিতে

পারেন না। আজ যে শ্মশ্রু ও গুম্ফের বাড়াবাড়িতে অস্থির হইয়াছি, তাহার অভাবও একদিন এরূপে আমার অদৃষ্টের উপর ক্রীড়া করিয়াছিল! সার্টক্লিফ সাহেব এ কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি মনে করিলেন, আমি ইচ্ছা করিয়া গেলাম না। আবার কিছু দিন পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া নিয়া এক মাসের জন্যে হেয়ার স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে একটিংগ্ নিযুক্ত করিলেন। আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। আমি বলিলাম, আমি চট্টগ্রামের লোক, আমি কি হেয়ার স্কুলের বড়মানুষের দুরন্ত ছেলেদের পড়াইতে পারিব? তিনি চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন—"কেন পারিবে না! অবশ্য পারিবে। আমি হেয়ার স্কুলের হেডমাষ্টার গিরিশ বাবুকে বলিয়া দিব।" হায়! হায়! ছাত্রদিগেক এরূপ পিতৃতুল্য দেবমূর্ত্তি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া তাঁহার পবিত্র স্থান "Monumental liar" মহাশয়ের মত কি ছাত্রন্বেষিগণই কলুষিত করিতেছেন! মিঃ সার্টক্লিফের খর্ব্বাকৃতিতে এত কার্য্যদক্ষতা. তেজস্বিতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা ছিল যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের দুরন্ত বালকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার কথার অবাধ্য হইত না। আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অর্দ্ধমৃতাবস্থায় গিরিশ বাবুর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে নিয়া সে অবস্থায় তৃতীয় শিক্ষকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিলেন। আমার বোধ হইল, যেন ফাঁসিকাষ্ঠের মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, না জানি ভগবান্ কি দুর্গতিই কপালে লিখিয়াছেন। তিনি চলিয়া গেলে আমি অতি কষ্টে ভয়ে ভয়ে ছাত্রদিগের কৃপা ভিক্ষা চাহিয়া বলিলাম—"আমি কেবল এক মাসের জন্যে আসিয়াছি মাত্র। আমি তোমাদিগকে খুব ভাল বাসিব। এবং আশা করি যে, তোমাদের ভালবাসা লইয়া যাইতে পারিব।" বালকেরা যত দুরন্ত হউক না কেন, তাহাদের হৃদয় কোমল। এই কোমলতা তাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিল। তাহারা সকলে একবাক্যে মহা উৎসাহ-সহকারে বলিল, তাহারা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করিবে। যাহারা কেবল শাসনের দ্বারা বালককে শিক্ষা দিতে চাহে, তাহারা বড় মূর্খ। আমি সাহিত্য পড়াইতে লাগিলাম। তাহারা বড় সন্তুষ্ট হইল ; সকলে একবাক্যে বলিল যে, তাহাদের শিক্ষক অঙ্ক খুব ভাল জানেন। অতএব তাহারা অঙ্ক বেশ শিখিয়াছে। কিন্তু সাহিত্য ভাল শিখে নাই। আমি যত দিন থাকি, তাহারা আমার কাছে কেবল সাহিত্য পড়িবে। তাহারা গিরিশ বাবুকেও এরূপ বলিল। তিনিও আমাকে তদনুযায়ী আদেশ দিলেন। অঙ্ক শিখাইতে হইবে না শুনিয়া আমারও ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। কারণ, অঙ্কশাস্ত্রে আমি এক দিগ্‌গজ পণ্ডিত। এক দিন স্বনাম-খ্যাত ডাক্তার দুর্গাদাস কর মহাশয়ের একটি পুত্র বড় জ্বালাতন করিতে লাগিল। আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলাম। সে রাগে গর্ গর্ করিয়া পুস্তক লইয়া ক্লাশ হইতে চলিয়া গেল। ছাত্রেরা বলিল—"সার্ (Sir), আপনি হেডমাষ্টারের কাছে রিপোর্ট করুন।" আমি কিছুই করিলাম না, একটুক হাসিয়া পড়াইতে লাগিলাম। ছেলেটি পড়াশুনায় ভাল। বারান্দায় গবাক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া বহি খুলিয়া শুনিতে লাগিল। অন্য ছেলেরা তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল। সে আর সহ্য করিতে না পরিয়া, কাঁদিয়া আমার পায়ে আসিয়া পড়িল, এবং বলিল—"অন্যায় দেখিলে সার্! জুতা মারিবেন, তথাপি মিষ্ট ভর্ৎসনা করিবেন না। বড় গায়ে লাগে।" আমি তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া বলিলাম—"আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি এখন তোমার স্থানে গিয়া বস।" সে আমার এই স্নেহ পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আপন স্থানে গিয়া বসিল। ছাত্রেরা সকলে বলিতে লাগিল—"এমন 'সারে'র সঙ্গে কি এরূপ করিতে আছে?" তাই বলিতেছিলাম, যাহারা শিক্ষার জন্যে বালককে কঠোর শাসন করে, তাহারা বড় মূর্খ। দেখিতে দেখিতে এক মাস ফুরাইয়া গেল। এ অল্প সময়ের মধ্যে ছাত্রেরা আমাকে এত ভালবাসিতে লাগিল যে, মাস ফুরাইয়া আসিলে তাহারা বলিল যে, তাহাদের শিক্ষক বুড়া হইয়াছেন, শীঘ্র পেন্‌সন লইবেন। আমি যদি সম্মত হই তবে আমাকে রাখিবার জন্যে তাহারা প্রিন্‌সিপেলের কাছে

আবেদন করিবে। আমি বলিলাম—তাহাতে তিনি আমার প্রতি বিরক্ত হইবেন মাত্র। তাহার পর তাহারা বলিল—তাহারা আমাকে একটি ঘড়ি ও চেন অভিনন্দনস্বরূপ দিতে চাহে। আমি গিরিশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম। শেষ দিন উপস্থিত। আমি তাহাদের কাছে বিদায় হইয়া গিরিশ বাবুর কাছে বিদায় হইতে গেলাম। তাহারা ক্লাশ ভাঙ্গিয়া সজলনেত্রে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্য শিক্ষক মহাশয়েরা ঈর্ষাকষায়িত নয়নে এ দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন—"আরে! ছেলেগুলো এক মাসের মধ্যে কি এ বাঙ্গালটার জন্যে ক্ষেপিয়া উঠিল!" তাঁহারা অধিকাংশ ছাত্রদিগকে গালি দিতেন ও গালি খাইতেন। মারিতেন ও পথে ঘাটে মার খাইতেন। গিরিশ বাবুও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেছিলেন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলে তিনি বলিলেন—"তুমি কি যাদু করিয়াছ, ছেলেরা ত তোমার জন্যে ক্ষেপিয়াছে। তাহারা বলে, তাহারা আর তাহাদের পূর্ব্ব মাষ্টারের কাছে পড়িবে না। তোমাকে ঘড়ি চেন দিতে চাহে। কিন্তু সাটক্লিফ সাহেব বলেন, এরূপ অভিনন্দন লওয়া নিষিদ্ধ। যে পর্য্যন্ত তৃতীয় শিক্ষক পেন্‌সন না লন, আমি তোমাকে অন্য একজন শিক্ষকের পদে রাখিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন, তুমি শিক্ষকতা করিবে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা উচ্চ রকমের।" আমি সেই 'গ্রিন্‌ লেডে'র গল্পটা তাঁহাকে বলিলাম, এবং বিদায় হইলাম। স্কুলের পর পটুয়াটুলী লেন গাড়ী-যুড়িতে ভরিয়া গেল। সমুদায় ছাত্র আমার বাসায় আসিল। তাহাদের সেই ভালবাসা আমার জীবনের প্রারম্ভভাগে কি একটি পবিত্র আলোকরেখা নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছে! তাহাদের ২।৪ জনের চেহারা আমার এখনও মনে আছে। একটি বড়লোকের ছেলে বলিল—"মাষ্টার মহাশয়! আপনি ত আশুর 'প্রাইভেট টিচার' ছিলেন। আমি বাবাকে বলিয়াছি। আপনি আমার 'প্রাইভেট টিচার' হউন, আমি ডবল বেতন দিব।" আর একজন বলিল—"তাহা হইলে তিনি বি. এল. পড়িতে পারিবেন কেন? আচ্ছা, সার্‌! আমরা আপনার এক বৎসরের খরচ চাঁদা করিয়া তুলিয়া দি, আপনি বি. এল পাশ করুন। আপনি নিশ্চয় একজন বড়লোক হইবেন। এখনই ত একজন poet (কবি)।" তাহাদের কেহ কেহ 'এডুকেশন-গেজেটে' আমার কবিতাসকল পড়িতেছিল। এরূপ সরল শিশু-হৃদয়-নিঃসৃত স্নেহামৃতে আমার সন্তপ্ত হৃদয় ভাসাইয়া তাহারা চলিয়া গেল। তাহার পর তাহাদিগকে আর দেখি নাই। এ শেষ জীবনেও তাহাদেরে একবার দেখিতে পাইলে কত সুখী হই। ভরসা করি, তাহারা সকলে সংসারে সুখে ও উন্নত অবস্থায় আছে।

তাহাদের স্নেহে আমি এই এক মাস কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছিলাম ও আপনার বিপদ্‌ ভুলিয়াছিলাম। কিন্তু আবার—"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" কেবল তাহারা বলিয়া নহে, আমার পিতার পুণ্যে এ দুরবস্থার সময়ে যাহার কাছে যাইতেছিলাম, আবালবৃদ্ধ সকলেই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেছিল। আবার কলিকাতা সহর প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এমন বড় আফিস নাই, যেখানে একজন মুরুব্বি না জোটাইলাম। কিন্তু দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, এ বিপদ্‌সাগরের ত কূল পাইলাম না। হৃদয় দিন দিন নিরাশার অতল জলে ডুবিতে লাগিল।

"প্রতিদিন ত্যজি শয্যা মুদিয়া নয়ন
বেড়াই মনের দুঃখে কত শত স্থানে!
কত পাষাণের কাছে করেছি রোদন,
চাহিয়াছি দীনভাবে কত মুখপানে!
মধ্যাহ্নরবির করে দহি কত বার
স্বেদ সহ অশ্রুধারা ঝরেছে আমার।
* * *

প্রভাকর তীব্র করে অনাবৃত শিরে,
নিশির শিশিরে, ডুবি ধূলির সাগরে,
বেড়াইয়া পথে পথে প্রাচীরে প্রাচীরে,
যে ফল লভেছি ভেবে হৃদয় বিদরে।
প্রতিদিন প্রাতে যাই আশা ভর ক'রে,
প্রদোষে নিরাশ হয়ে ফিরে আসি ঘরে।"

ঘরে সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলেই প্রথমতঃ সেই ইতরজন্মা ইতরমনা সহবাসিগণের বিদ্রূপ,—"আজ কি গবর্ণর জেনেরালের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? তাঁহার কাজটি জুটিবে ত?" তাহার পর মাতার হৃদয়বিদারক পত্র। আমার পিতৃব্যগণ আবার আমার প্রতি উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক এক দিন পরিবারদের সেই উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ-কাহিনী আসিত। এক এক দিন মা লিখিতেন যে, আমি বাড়ী না গেলে তিনি পরের ষ্টীমারে অনাথ পুত্রকন্যা সহ কলিকাতায় আসিবেন। কোন পিতৃব্য আমাকে সাংসারিক যোগ বুঝাইয়া লিখিতেন, দেশে গিয়া ২০৲ টাকার চাকরি পাইলেও ত এ দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইবে। সময়ে সময়ে অবিবাহিতা ভগ্নীর দশারও উল্লেখ করিতে ছাড়িতেন না। তথাপি দেশে যাইতেছি না দেখিয়া কেহ কেহ আমার খুড়ীকে স্বতন্ত্র হইতে পরামর্শ দিলেন। সম্পত্তিতে তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর যে অংশ আছে, তাহা পিতার ঋণের জন্যে বিক্রয় হয় নাই এবং তাহার দ্বারা কোন মতে অন্নসংস্থান হইতেছে। তাঁহাকে তাঁহার পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবার জন্যে তাঁহারা পরামর্শ দিলেন। তিনি কেন আমাদের জন্যে ডুবিবেন? তাঁহার মনও ফিরিয়াছিল। কেবল তাঁহার ভ্রাতার তীব্র ভর্ৎসনায় তিনি বিরত হইয়াছিলেন। মাতা গোপনে এক পত্রে এ কথা জানাইলেন।

এ সকল পত্র পড়িয়া অন্ধকার ছাদের উপর গিয়া বসিতাম। চন্দ্রকুমার, হরকুমার, কখন বা দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিত। খুব কতক্ষণ বসিয়া কাঁদিতাম। দুঃখীর হৃদয়গত অতিরিক্ত দুঃখবাষ্প এরূপে নির্গত করিতে না পারিলে অতিরিক্ত বাষ্পে, বাষ্প-যন্ত্রের মত বোধ হয় তাহার হৃদয়ও শতধা হইয়া যাইত। শোকাবেগ কিঞ্চিৎ থামিলে, দিবসের পর্য্যটনকাহিনী ও মাতার পত্রের কথা তাহাদিগকে বলিতাম। ইহারা তিন জন ভিন্ন আর সে সকল কথা কেহ জানিত না। তাহাদের সান্ত্বনায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে কতক্ষণ চিন্তা-কুলহৃদয়ে বাঁশী বাজাইতাম, এবং মনে মনে পরদিবসের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতাম।

"প্রিয়তম বংশী মম প্রাণের দোসর,
আলিঙ্গিয়া দুই করে কহি তার কাণে
বিরলে দুঃখের কথা; যথা পিকবর
কহে ঋতুকুলেশ্বরে মোহিয়া সুতানে।
সন্তাপের স্রোত তবু মানে না বারণ,
উচ্ছ্বসিত হয় দুঃখে, ভাসে দুনয়ন।"

তাহার পর নয়নের অশ্রু মুছিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে প্রবেশ করিতাম, এবং বিদ্রূপের প্রতিবিদ্রূপ করিয়া সেই ইতর সহবাসীদের ক্ষতবিক্ষত করিতাম। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলাম যে, এই নীচকুল-সম্ভবদের কাছে কখনও নতশির, কি ম্লানমুখ দেখাইব না। কক্ষে হাসির তুফান ছুটিত।

কিন্তু আমার এ বাহ্যিক আমোদে ও বিদ্রূপে যে অজ্ঞাতসারে এক শোচনীয় ফল ফলিতে-ছিল, তাহা আমি জানি নাই। আমাদের দেশের মুন্সেফির উকিল পালে পালে আমার পিতা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার একজন এ সময়ে কলিকাতা হইয়া গয়াশ্রাদ্ধ করিতে

গিয়াছিলেন। তিনি দেশে গিয়া রাষ্ট্র করিয়া দিয়াছেন যে, আমার শরীরের পঞ্চ ক্রোশের মধ্যেও কোনরূপ চিন্তার, কি দুঃখের চিহ্ন নাই। দিন রাত্রি বাঁশী বাজাইয়া ও বেড়াইয়া বেড়াইতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক কন্যা বিবাহ করিব স্থির হইয়াছে। দেশে আর যাইব না। এই উপাখ্যান আমার সরলা বুদ্ধিহীনা মাতার মৃত্যু-অস্ত্র হইল। বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। মাতা তাঁহার ইষ্টদেবতার নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ বাড়ী না গেলে তিনি নিশ্চয় আত্মহত্যা করিবেন।

আমি জানিতাম, আমার সরলা মাতার যেই কথা, সেই কার্য্য। এই পর্য্যন্ত সকল বিপদ্ বুক পাতিয়া সহিয়াছিলাম। কিন্তু এ আসন্ন মাতৃহত্যার আশঙ্কায় সেই বুক ভাঙ্গিয়া গেল। আমি ঊনবিংশ বৎসরের যুবক, আর কত সহিব? আমি পাগলের মত হইলাম। চন্দ্রকুমারেরা আমার আত্মহত্যার আশঙ্কা করিতে লাগিল। আমার মনেও এ আকাঙ্ক্ষা এবার প্রথম হয় নাই।

"উত্তরীয় যেই দিন করিনু ছেদন
জাহ্নবি! তোমার তীরে বিষাদিত মন,
ভেবেছিনু একেবারে কাটিব তখন
উত্তরীয় সহ এই সংসারবন্ধন।
সংসারের মায়া কিন্তু না জানি কেমন,
দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন।"

আজ আমার সেই দুঃখিনী মাও আমাকে ছাড়িয়া চলিলেন। আর কাহার জন্যে বাঁচিয়া থাকিয়া এ দুর্গতি ভোগ করিব? একদিন সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া, সন্ধ্যার পর নিরাশ হইয়া ভাগীরথীর তীরে গিয়া বসিলাম। সেই অসংখ্য লোককোলাহল আমার শ্রবণে প্রবেশ করিতেছে না। সেই অসংখ্য তরী ও সেই ঘন অর্ণবপোতারণ্য আমার নয়নে দেখা যাইতেছে না। শুনিতেছি কেবল মাতার রোদনধ্বনি। আর দেখিতেছি—

"দুঃখের আবর্ত্তশ্রেণী আসিতেছে বেগে
ডুবাইতে জীর্ণ তরী ভীষণ প্রহারে।
ঢেকেছে হৃদয় কাল-চিন্তারূপ মেঘে,
নিশ্চয় উঠিবে ঝড়, কে রাখিতে পারে?
ডুবাবে নিশ্চয় যদি তবে কেন আর?
ডুবিব জাহ্নবি! আজি সলিলে তোমার।"

* * *

"কোথায় জননী মা গো! র'লে এ সময়ে
তব ক্রোড়ে এ অভাগা ফিরিবে না আর।
চিত্রিবে না দূর দেশে তোমারে হৃদয়ে,
মা মা বলে মা! তোমারে ডাকিবে না আর।
জননি! জন্মের মত হইনু বিদায়।
হৃদয় কাঁদিলে আর কি হইবে হায়!"

* * *

"দীননাথ! তুমি মাত্র অনাথ আশ্রয়
তব প্রেমক্রোড়ে নাথ করিনু অর্পণ
পিতৃহীন ভ্রাতৃহীন দীন নিরাশ্রয়
প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ।

বল নাথ! ইহাদের কি হবে উপায়?
অভাগার পরকালে কি হইবে হায়?"

আর লিখিতে পারিতেছি না। সেই দুঃখস্মৃতিতেও আজি আমার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। আমার সেই জীবনের ছবি আমার "পিতৃহীন যুবক" কবিতা। আমিই সেই "পিতৃহীন যুবক," এবং আমার হৃদয়ের রক্তে ও নয়নের অশ্রুতে উহা সেই সময়েই লিখিত হইয়াছিল। উহা হইতেই উপরে কবিতা সকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, মরিলাম না। পিতার পুণ্য এ মহাপাতক হইতে রক্ষা করিল।

"কে আমার কাণে কাণে বলিল তখন—
যুবক! নিরাশ এত বল কি কারণ?
জান না কি সুখ দুঃখ নিশার স্বপন?
সুখ চিরস্থায়ী কবে? দুঃখ বা কখন?
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী।
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী।"

পিতা তাঁহার বল ও উদাসীনতা হৃদয়ে সঞ্চারিত করিলেন। বুঝিলাম—

"কি ছার বিষয়চিন্তা, কি ছার সংসার!
কি ছার সম্ভোগলিপ্সা, অর্থই কি ছার!
মরিব কি তারি তরে করি হাহাকার?
নিশ্চয় লঙ্ঘিব এই দুঃখপারাবার।
কি ভাবনা?—গেছে সুখ, ফিরিবে আবার।
কিবা চিন্তা?—আছে দুঃখ, রহিবে না আর।"

* * *

"নাহি কি ধৈর্য্যের অস্ত্র হৃদয়ভাণ্ডারে?
যুঝিব একাকী আমি, ত্যজিব না রণ।
দেখিব নিষ্ঠুর ভাগ্য কি করিতে পারে;
পাষাণে হৃদয় এই করিনু বন্ধন।
এই চলিলাম গৃহে, করিলাম পণ—
'মন্ত্রের সাধন, কিম্বা শরীর পতন'।"

অকূলে কূল

In the broad field of battle,
In the bivouac of life
Be not like a dumb driven cattle
But be a hero in the strife." *Longfellow.*

অমিত উৎসাহে আবার জীবনযুদ্ধে প্রবেশ করিলাম। আমার স্মরণ হইল, চট্টগ্রাম জজের হেড ক্লার্ক আমাদের দেশের সুগায়ক শ্যামাচরণ বাবু একবার লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পাণ্ডা হইয়া, তাঁহাকে বেলভিডিয়ারে লইয়া গিয়াছিলাম, এবং জানিয়াছিলাম যে, লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হইলে, আগে "প্রাইভেট সেক্রেটরি"র

কাছে পত্র লিখিতে হয়। কি সামান্য ঘটনায় অজ্ঞাতে মানুষের জীবন অচিন্ত্য পথে লইয়া যায়। মনে মনে স্থির করিলাম, একবার বঙ্গের সেই বিধাতাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার কাছে আমার দুঃখ নিবেদন করিব। যিনি বঙ্গের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তিনি কখনও হৃদয়হীন লোক হইতে পারেন না। দুঃখীর দুঃখ শুনিলে অবশ্য তাঁহার দয়া হইবে। পিতঃ! তুমি ভিন্ন কলিকাতায় একটি ভিখারী বালকের হৃদয়ে এ সাহস কে সঞ্চারিত করিবে? প্রাইভেট সেক্রেটরির কাছে ডাকে পত্র লিখিলাম। ডাকে যথাসময়ে উত্তর পাইলাম—আমি কি জন্যে লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে দেখা করিতে চাহি, তাহা তিনি জানিতে চাহেন। আমি উত্তর লিখিলাম, আমি একটি দরিদ্র দুঃখী বালক, তাঁহাকে আমার দুঃখের কথা বলিতে চাহি মাত্র। পত্রখানি নিজে 'বেলভিডিয়ারে' লইয়া গেলাম, এবং একজন চাপরাশি বা রক্তশোষী দ্বারা 'প্রাইভেট সেক্রেটরি'র কাছে পাঠাইলাম। অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কত বড় বড় লোক আসিলেন ও লাট সাহেবকে সেলাম বাজাইয়া চলিয়া গেলেন। বঙ্গের বড় লোকদিগের জন্মই এজন্য। বহুক্ষণ পরে একজন চাপরাশি মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"তোমার নাম কি নবীনচন্দ্র সেন?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"হাঁ।" তিনি তখন খুব মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিলেন—"তুমি এতক্ষণ বল নাই কেন? আমি কোন্ কালে তোমার সঙ্গে সাহেবের সাক্ষাৎ করাইয়া দিতাম। তুমি চল, সেক্রেটরি সাহেব তোমাকে তলব দিয়াছে।" আমি আরও বিস্মিত হইলাম। আমার পরিধান সামান্য ময়লা ধুতি, ময়লা লাল ফেলালিনের পিরান ও ময়লা চাদর। পায়ে এক জোড়া ছেঁড়া জুতা। সের পরিমাণে না হউক, অন্ততঃ ছটাক পরিমাণে প্রত্যেক পাটির মধ্যে ধুলার চড়া পড়িয়া আছে। আপাদমস্তক কলিকাতা সহরের মসৃণ আরক্ত ধূলারাশিতে রঞ্জিত ও সমাচ্ছন্ন। আমি বলিলাম আমি এ বেশে কেমন করিয়া সাহেবের কাছে যাইব? মুরুব্বি বলিলেন—"ভয় নাই। সাহেব বড় ভাল মানুষ। তোমার ভাল করিবে। তুমি চল, আর দেরি করিও না।" আমি সেই স্বর্গের সোপানের মত বিস্তৃত, সজ্জিত, এবং বহুমূল্য বস্ত্রাবৃত সোপানাবলী বাহিয়া সশরীর সেই পার্থিব স্বর্গে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু চরণ উঠিতেছে না। হৃদয় ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া যেন খসিয়া পড়িতে চাহিতেছে। স্বর্গদূতের ইঙ্গিতমতে পুরু বহুমূল্য পর্দ্দা ধীরে ধীরে কম্পিতকরে সরাইয়া আমি একটি বৃহৎ কক্ষে সেক্রেটরির সম্মুখে দাঁড়াইলাম। সেক্রেটরি কেপ্টেন ষ্টান্সফিল্ড (Captain Stansfield)। লেঃ গবর্ণর তখন সার্ উইলিয়ম গ্রে। সেক্রেটরি সাহেব যুবক, সুন্দর, সুপুরুষ। মুখে যেন হৃদয়ের সহৃদয়তা প্রতিবিম্বিত হইতেছে। তিনি আমাকে মুহূর্ত্তেক আপাদমস্তক দেখিয়া একটি অতি সুন্দর, শীতল, স্নেহমাখা হাসি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বালক! তুমি লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে কেন দেখা করিতে চাহ?" সে হাসিতে এবং সেই স্নেহকণ্ঠে আমার ভয় তিরোহিত হইল। আমি কোমল করুণকণ্ঠে বলিলাম—"আমার পত্রে ত তাহা লিখিয়াছি। আমি তাঁহার কাছে আমার দুঃখের কথা নিবেদন করিতে চাহি।" তিনি করুণকণ্ঠে বলিলেন—"তুমি আমাকে বলিবে কি তোমার কি দুঃখ?" আমি বলিলাম—"আমি কৃতজ্ঞতার সহিত বলিব, কিন্তু আমার এ দীর্ঘ দুঃখকাহিনী আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া শুনিবেন কি?" তিনি বলিলেন—"আমি শুনিব।" কি একটুক লেখা শেষ করিয়া, লেখনী রাখিয়া, আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"বল।" আমি ধীরে ধীরে ছলছল নয়নে অধোমুখে আমার বিপদের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস বলিলাম। তিনি অনিমিষ নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া শুনিলেন। তারপর নখ কাটিতে কাটিতে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন—"You are a brave boy! তুমি একজন সাহসী ছেলে। তুমি আর এক দিন একখানি দরখাস্ত লইয়া আমার কাছে আসিতে পার কি?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিরূপ দরখাস্ত?" তিনি আবার সেই সুন্দর ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"সাধারণ দরখাস্ত। তুমি গবর্ণমেণ্টের কোনও চাকরি চাও, এই মাত্র। যদি

তৎসঙ্গে কোনও বিশিষ্ট লোকের ২।১ খানি সার্টিফিকেট আনিতে পার, তবে আরও ভাল হয়। তাহাতে কেবল এই মাত্র থাকিবে যে, তুমি ভদ্রবংশের সন্তান। তোমার চরিত্র ভাল।" আমি অধোমুখে চিত্রপুত্তলির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম। এই আশাতীত কল্পনাতীত দয়াতে আমার চক্ষু ভিজিয়া গিয়াছে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি যে, তাঁহার কাছে আমার খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। কিন্তু মুখে কথা সরিতেছে না। আমি অতি কষ্টে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—"একটি বিপন্ন বালকের প্রতি আপনার এই দয়ার জন্যে ঈশ্বর আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।" তিনি আমার অবস্থা বুঝিতে পারিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল। তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"Poor boy!" তাহার পর বলিলেন—"তুমি দরখাস্ত লইয়া আসিও। আমি তোমার জন্যে কি করিতে পারি দেখিব।" আমি ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার বুট-মণ্ডিত পা দুখানি বক্ষে লইয়া তাঁহাকে দেবতার মত পূজা করি।

আজ হৃদয় আনন্দে উৎসাহে পরিপূর্ণ। আমার মাটিতে পা পড়িতেছে না। অবসন্ন শরীরে যেন বিদ্যুৎ ছুটিয়াছে। নক্ষত্রবেগে সেই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া পটুয়াটোলার বাসায় আসিলাম। আজ আর দৈনিক বিদ্রূপকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে ছাদে গেলাম। দুই চন্দ্রকুমার ও হরকুমারকে আজিকার আনন্দসংবাদ বলিলাম। শুনিয়া তাহাদের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার বলিল—"তোমার যে সুন্দর মুখ, এবং যেরূপ কহিবার শক্তি, স্বয়ং লেঃ গবর্ণরও মোহিত হইত। আর কি, তুমি বড় লোক হইতে চলিলে। আমাদিগকে তখন চিনিতে পারিবে ত?" আনন্দে সকলের চক্ষু ভিজিয়াছিল। সেই সন্ধ্যা কি সুখের সন্ধ্যা! সে দিনের বাঁশীতে সেই ইতর সহবাসীরা গৃহ ত্যাগ করিয়া নীচের ঘরে পড়িতে গেলেন।

পরদিন প্রাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গেলাম। শুনিয়া তিনি আনন্দে অধীর হইলেন। বলিলেন—"বিপদে এরূপ সাহস চাই।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেপ্টেন ষ্টার্ন্সফিল্ড আমার কি করিতে পারেন?" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"পাগল, লেঃ গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটরি, কি করিতে না পারেন? তোমাকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত করিয়া দিতে পারেন। তিনি একটি কথামাত্র বলিলে তুমি অন্ততঃ বেঙ্গল আফিসের এসিস্টেণ্ট একটিও অনায়াসে পাইতে পারিবে। তুমি একখান দরখাস্ত লিখিয়া কাল আমার কাছে লইয়া আসিও।" বেঙ্গল আফিসে কয়েকজন এসিস্টেণ্ট নিযুক্ত হইবে; আমিও দরখাস্ত করিয়াছি। আশা হইল, তবে তাহার একটি পাইব। দাদা একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দিলেন। তিনি ভিতরের কথা কিছুই জানেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে তাহা নিলে তিনি একখানি পত্র সহ আমাকে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের কাছে পাঠাইলেন।

কৃষ্ণদাস বাবুর নক্ষত্র তখন বঙ্গের আকাশে উদিত হইতেছে মাত্র। কে জানিত যে, অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিতে না করিতে তাহা অকালে কালগর্ভে খসিয়া পড়িবে? তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সেক্রেটরি-পদে তখন অধিষ্ঠিত, এবং 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন। একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় 'পেট্রিয়ট' পড়িতে পড়িতে বলিতেছিলেন—"কৃষ্ণদাস ক্রমে ক্রমে কাগজখানি একরূপ চলনসহি করিয়া তুলিল। সুদক্ষ লেখক হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর 'পেট্রিয়ট' যেন এত দিনে একটুক মাথা তুলিয়া উঠিতেছে।" খুঁজিতে খুঁজিতে বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটের একটি ক্ষুদ্র গলিতে একখানি ক্ষুদ্র একতল বাড়ী, শুনিলাম কৃষ্ণদাস বাবুর বাড়ী। বাড়ীর ভিতরে কি বাহিরে আস্তরের চিহ্ন নাই। কোনও কালে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোনাধরা ইটগুলি দাঁত বাহির করিয়া নিতান্ত দরিদ্রতা প্রকাশ করিতেছে। এ বাড়ী কৃষ্ণদাস বাবুর, আমার সাহস বিশ্বাস হইল না। কিন্তু এক জন, দুই জন, তিন জনে বলিল, ইহাই তাঁহার বাড়ী। তখন অগত্যা প্রবেশপথে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম,

পার্শ্বের একটি ক্ষুদ্র ময়লা ঘরে একখানি camp-bed, কি তক্তপোষের উপর পড়িয়া, সামান্য ধুতিমাত্র পরিহিত একটি কদাকার পুরুষ একখানি খবরের কাগজ পড়িতেছেন। আমি মনে করিলাম, একজন চাকর হইবে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কৃষ্ণদাস বাবু বাড়ী আছেন?" উত্তর—"কেন?" বলিলাম—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একখানি চিঠি আছে।" তিনি হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"কই? দেখি।" আমি বলিলাম—"পত্রখানি কৃষ্ণদাস বাবুর হাতে দিতে বলিয়াছিলেন।" আমার ইচ্ছা, আমি একবার নিজে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় করিব। তিনি প্রসারিত হস্ত কুঞ্চিত না করিয়া বলিলেন—"দেও না।" আমি লজ্জিত ও বিস্মিত হইলাম। তবে এই কি সেই কৃষ্ণদাস বাবু! আমি পত্রখানি দিলাম। তিনি খপ করিয়া লেফাফাটি ছিঁড়িয়া চক্ষের নিকটে নিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার সন্দেহ ঘুচিল, এবং এ অবসরে তাঁহার মূর্ত্তি আমি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। কৃষ্ণদাসের সেই স্থূল কৃষ্ণ কলেবরের, সেই স্থূল গণ্ড ও অধরোষ্ঠের, সেই প্রতিভাপূর্ণ বিশাল ভাসমান নেত্রদ্বয়ের, সেই প্রকাণ্ড মস্তকের, এবং সেই দরিদ্র বেশের, আমি আর নূতন করিয়া কি বর্ণনা করিব? আজ এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী কে আছে যে, তাহা দেখে নাই! দেখিলাম, বঙ্গের তিন জন বড় লোকই—বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস ও প্যারীমোহন—তিনটি কুরূপের আদর্শ। ভগবান্ নিজেও কি এ জন্যে কৃষ্ণবর্ণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং এককালে বিকৃত বামন হইয়াছিলেন? তিনি পত্র পড়িয়া দরখাস্তখানি চাহিলেন। পড়িয়া, দরখাস্ত কে লিখিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন। দাদার নাম বলিলাম। প্রশ্ন—"তিনি কি গ্রেজুয়েট?" বলিলাম—"এম. এ.।" তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তুমি কি?" উত্তর—"বি. এ.।" প্রশ্ন—তোমার বাড়ী কোথায়?" উত্তর—"চট্টগ্রাম।" তাঁহার বিশাল চক্ষু বিস্ময়ে বিস্তৃত হইল। প্রশ্ন—"ষ্টান্সফিল্ডের সঙ্গে তোমার কিরূপে পরিচয় হইল?" আমি সংক্ষেপে আত্মকাহিনী বলিতে লাগিলে তিনি আবার বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তোমার ভাষায় ত বাঙ্গাল দেশের কোনও গন্ধ নাই। তুমি না বলিলে আমি তোমার বাড়ী নিশ্চয় কলিকাতায় মনে করিতাম।" তাহার পর আমার আত্মবিবরণ শুনিয়া বড় প্রীত হইয়া বলিলেন—"You are a wonderful young man! (তুমি একজন আশ্চর্য্য যুবক!)" তাহার পর চট্টগ্রাম সম্বন্ধে অনেক বিষয় আলাপ করিয়া আমাকে বলিলেন—"এ দরখাস্তে হইবে না। তুমি কাল আসিও। আমি নিজে তোমার জন্যে একখানি দরখাস্ত লিখিয়া রাখিব।" পরদিন গেলে তিনি তাঁহার লিখিত দরখাস্তখানি পড়িয়া শুনাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন, হইয়াছে ত?" আমি ধন্যবাদ দিলাম। তিনি বলিলেন—"এ দরখাস্তের কি ফল হয়, তুমি আমাকে জানাইবে। আমি নিজে যদি তোমার কোনও উপকার করিতে পারি, অত্যন্ত সুখী হইব। আমি তোমাকে দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছি। নিরাশ্রয়ের ঈশ্বর অবশ্য তোমার ভাল করিবেন।" তাঁহার স্নেহে আমার বড় ভাসা চক্ষু দুটি ছলছল হইল। আমি ভাবিলাম, বুঝি বন্ধু দ্বিতীয় চন্দ্রকুমারের কথা ঠিক। আমার মুখখানিতে বুঝি কিছু আছে। না হইলে সকলে আমাকে এত দয়া করিবে কেন?

গুরু চন্দ্রকুমার দরখাস্ত নকল করিয়া দিল। আমি যথাসময়ে আবার বঙ্গের ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। কার্ড কোথায় পাইব? একখানি কাগজে নাম লিখিয়া পাঠাইবা মাত্র কেপ্টেন ষ্টান্সফিল্ড আমাকে ডাকিলেন। কি শুভ ক্ষণে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ! তিনি দেখিয়াই সেই সুন্দর হাসি হাসিয়া বলিলেন—"Well boy! what is the news? (ভাল, বালক! কি খবর?)।" আমি দরখাস্ত ও সার্টিফিকেট তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি আমার কাছে আইস।" কি আদর! আমি চেয়ারের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখের প্রাচীরের বিরাট আয়নাতে উভয়ের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! বঙ্গেশ্বরের ঘনিষ্ঠ সচিবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া একটা ধূলোবিমণ্ডিত বাঙ্গালি দরিদ্র বালক! সাহেব আয়নাতে এ ছবি দেখিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন। আমি লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি।

আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, দিগম্বর বাবুর, কেশব বাবুর, দ্বারিকানাথ মিত্রের, এবং জেনারেল এসিম্বিলির প্রিন্সিপেল পুণ্যাত্মা আগিলভি (Rev. Ogilvie) সাহেবের সার্টিফিকেট নিয়াছিলাম। রাজকৃষ্ণ বাবু মিঃ সাট্‌ক্লিফ সাহেবের কাছে সার্টিফিকেট চাহিলে, তিনি রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ওঃ! সে লেঃ গবর্ণরের কাছে পর্য্যন্ত যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার কি দুরাকাঙ্ক্ষা! আমি সার্টিফিকেট দিব না।" মিঃ ষ্টান্সফিল্ড পড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তুমি ত বড় কম পাত্র নহ। তুমি বঙ্গের এতগুলি সর্ব্বপ্রধান বড় লোকের কেমন করিয়া এমন প্রিয়পাত্র হইলে?" তাহার পর দরখাস্তের উপর আমার বয়স খুব বড় ছাঁদে নীল পেন্‌সিলে লিখিয়া বলিলেন—"তুমি এখন যাও। আমি তোমার অভিভাবক বিদ্যাসাগরের ঠিকানায় তোমাকে ইহার ফল জানাইব। তুমি আর এ রৌদ্রে কষ্ট করিয়া এত দূর হাঁটিয়া আসিও না।" আমি ভাবিলাম—"ইনি মানুষ, না দেবতা?" ইংরাজদের মধ্যে এরূপ দেব-চরিত্র আছে, আমি জানিতাম না। মাতার কাছে এই দেব-দয়ার কথা লিখিয়া পাঠাইলাম। মাতা কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। আজ সেই সকল দেবতুল্য ইংরাজ কোথায় গেল?

অদৃষ্ট পরীক্ষা

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

দিন গেল। দিন দিন গণিয়া পক্ষ গেল। কই, কৃপাময় কেপ্টেন ষ্টান্সফিল্ড হইতে কোনও খবর পাইলাম না। আবার হৃদয় নিরাশায় ডুবিয়া গেল। বুঝি ষ্টান্সফিল্ড এ দরিদ্র বালকের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি রাজসচিব; গুরুতর কার্য্যভারে প্রপীড়িত; ভুলিয়া যাইবারই কথা। অথচ তাঁহার কাছে আর যাইতে সাহসও হইতেছে না। তিনি আর যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যদিও আমাকে এত পথ হাঁটিয়া যাইতে হয় বলিয়া, দয়া করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি কি জানি, আরবার গেলে যদি তিনি বিরক্ত হন? এ বিপদ্‌সাগরে তিনিই যে একমাত্র ধ্রুবতারা। অথচ এরূপ অনিশ্চিত অবস্থায়ও ত আর থাকা যায় না। অতএব অস্থির হইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় আসিয়াছেন কি না দেখিতে গেলাম। তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার সেই দেবমূর্ত্তিখানি দেখিয়াই মনে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। তিনি বলিলেন—"এরূপ অস্থির হইলে চলিবে কেন?" আমি বলিলাম—"এত চেষ্টা করিলাম, এখন পর্য্যন্ত কিছুই হইল না।" তিনি বলিলেন—"চেষ্টা করিলেই যদি মানুষের দুঃখ দূর হইত, তবে এ সংসারে দুঃখ থাকিত না। চেষ্টা না করে কে? তুমি ত চেষ্টার আর ত্রুটি কর নাই। এত লোক যখন তোমার সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, স্বয়ং ষ্টান্সফিল্ড তোমাকে এরূপ আশা দিয়াছেন, তখন অবশ্যই কিছু না কিছু একটা হইবে। তবে কিছু দিন আগে আর পরে, এইমাত্র।" আমি বলিলাম—"আপনি একবার ষ্টান্সফিল্ডের কাছে যদি অনুগ্রহ করিয়া কোনও কার্য্য উপলক্ষ করিয়া যান।" তিনি বলিলেন—"আমি তাহা অনায়াসে পারি। প্রাইভেট সেক্রেটরি কেন, আমি লেঃ গবর্ণরের কাছেও তোমার জন্যে বলিতে পারি। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোনও ফল হইবে যে, তাহা নহে। এখন কি ভাই! আর সে দিন আছে? একদিন এমন ছিল যে, আমি কাহারও জন্যে একটুক ইঙ্গিত করিলে লেঃ গবর্ণর তাহাকে ডেঃ মাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সেরূপ সরল সহৃদয় ইংরাজ নাই। আমি কি সাধে এত বড় চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছি। ইহাদের সকলেরই মুখে এক, মনে আর। আমাদের প্রতি দিন দিন ইহাদের সহানুভূতি উঠিয়া গিয়া খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। আমি যদি সঙ্গে করিয়া লেঃ গবর্ণরের

কাছে লইয়া যাই, এবং বলি—বড় ভাল ছেলে, সদ্বংশজাত ; তিনি একেবারে মধুরে হাসি হাসিয়া তোমাকে বেশ দু চার মিষ্ট ফাঁকা কথা বলিয়া হাতে স্বর্গ দিবেন। কিন্তু সেই মাত্র। কাজে কিছুই করিবেন না। এখনকার দিনে ষ্টান্সফিল্ডের কটাক্ষে যাহা হইবে, কলিকাতার সমস্ত বড়লোক একত্র হইলেও তাহা করিতে পারিবে না। অতএব তুমি তাঁহারই অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া থাক। আর কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া দেখ। তথাপি যদি কোনও খবর পাওয়া না যায়, তখন যাহা হয় একটা করা যাইবে।" তাহার পর প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তিনি কত গল্প করিলেন। এমন সুন্দর প্রাণভরা গল্প আর কাহারও মুখে শুনি নাই। শেষে অনেক আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া আসিলাম।

কিন্তু বাসায় যাইতে ইচ্ছা হইল না। প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে ত্রৈলোক্য দাদার কাছে গেলাম। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে আর ত্রৈলোক্য দাদার পরিচয় দিতে হইবে না। যে তাঁহাকে চিনে না, সে আপনাকে চিনে না—"argues himself unknown." দাদা আমাকে অনেক মুরুব্বিয়ানার কথা বলিলেন। আমি অন্যমনস্ক হইবার জন্যে পড়িতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু একে একে কত বহি পড়িতে চাহিলাম, কিছুতেই মন লাগিল না। শেষে দেখিলাম—"মনে মানে না বারণ"। তখন 'যা থাকে কপালে' বলিয়া 'বেলভিডিয়া'র মুখে যাত্রা করিলাম। বেলা ৫টার সময়ে সেখানে পদব্রজে গিয়া পঁহুছিলাম। আমার সেই আর্দালি মুরুব্বি দেখা দিলেন। তিনি কিছুতেই আমার নাম ষ্টান্সফিল্ডের কাছে নিবেন না। তিনি বলিলেন ৩টার পর সাহেব কাহারও সঙ্গে দেখা করেন না। তিনি মিস বিবিকে লইয়া বসেন। পরে তিনি সেই মিস বিবির, গ্রে সাহেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—"আমি এত দূরে হাঁটিয়া আসিয়াছি। তুমি কাগজখানি নেও। সাহেব দেখা না করেন, চলিয়া যাইব।" অনেক অনুনয় বিনয় করিলে, চাকরি হইলে মবলক দক্ষিণায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া শেষে তিনি নাম লইয়া গেলেন। আর তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"উঃ! সাহেব নিশ্চয় তোমাকে একটা চাকরি দিবে। তুমি চল, তোমাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু দেখিও, আমার বক্‌সিসের কথা ভুলিও না।" আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি বাহিয়া উঠিলাম। আমি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র সুপ্রসন্ন হাসিতে তাঁহার মুখ রঞ্জিত হইল।

প্র। Well boy, why do you come again? ভাল, বালক! তুমি আবার কেন আসিয়াছ?

উ। আমার কি করিলেন, তাহা জানিতে আসিয়াছি।

তিনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া—"কি, তুমি ইতিমধ্যে কিছুই পাও নাই?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"কই, না।" তিনি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া—"আজও না?" উত্তর—"না।" "তুমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়াছিলে?" উত্তর—"আমি এইমাত্র তাঁহার কাছ হইতে আসিতেছি।" "Poor boy! অভাগা বালক! তুমি কলিকাতার সেই উত্তর সীমা হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছ?" তিনি বিস্ময় ও দয়ার্দ্রচিত্তে এ কথা বলিয়া একখানি শ্লিপে বড় অক্ষরে লিখিলেন—"প্রিয় ডেম্পিয়ার! নবীন কি 'নমিনেশন' পায় নাই?" আমাকে পূর্ব্ববৎ আদরে ডাকিলে আমি তাঁহার চেয়ারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিলাম। ভাবিলাম, তবে বেঙ্গল অফিসে চাকরি হইয়াছে। ডেম্পিয়ার তখন চীফ সেক্রেটারি। তিনি লেঃ গবর্ণরের কাছে বসিয়াছিলেন। তখনই সেই কাগজখানির নীচে উত্তর আসিল—"আমার স্মরণ হয়, হাঁ। তুমি রেজিষ্টার দেখ।" তিনি আমাকে wait a bit (কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর) বলিয়া পার্শ্বের কক্ষে উঠিয়া গেলেন। পরে শুনিয়াছিলাম, রেজিষ্টারিতে প্রথম নাম আমারই ছিল। সেখান হইতে হাসিতে হাসিতে আসিয়া, খস্ খস্ করিয়া এক-

খানি চিঠি লিখিয়া, আমার নাক সিদা ছুঁড়িয়া মারিলেন। কার্য্যটিতে কত নীরব স্নেহ! বলিলেন—"তুমি আন্ডার সেক্রেটরি মিঃ জোনস্‌কে চেন?" আমি বলিলাম—"চিনি। তিনিও আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেছেন।" আমি ইতিমধ্যে প্রথম হেড এসিষ্টেন্ট রাজেন্দ্র বাবুর দ্বারা জোনস্‌ সাহেবকে মুরুব্বি ধরিয়া বেঙ্গল আফিসে চাকরির উমেদারি করিতেছিলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি লোকের সঙ্গে পরিচয় করিতে বড় পটু। মিঃ জোনস্‌কে কেমন করিয়া পটাইলে? এ চিঠিখানি তাঁহাকে দিলে, তিনি তোমাকে কিছু দিবেন।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কিছুটা কি?" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি বড় কুতূহলী। আমি তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করিব না। তাহা বলিব না। এখন তোমার ভবিষ্যৎ তোমার হাতে।" আমি ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া নামিয়া আসিলে মুরুব্বি মহাশয় গ্রেপ্তার করিলেন—"সাহেব কি বলিল?" আমি বলিলাম—"কিছুই না। কেবল আশা দিলেন মাত্র।" কিন্তু মুরুব্বি মহাশয়ের "তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ"। তিনি বলিলেন—"তোমার নিশ্চয় চাকরি হইবে। দেখিতেছ, তোমার জন্যে কত পরিশ্রম করিতেছি। তুমি আমার বক্‌সিস ভুলিবে না ত? আমি বলিলাম—"তাও কি হয়?"

অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া আমার আর সহিল না। আমি পত্রখানি খুলিয়া ফেলিলাম। তাহার আঠা তখনও ভিজা ছিল। তাহাতে লেখা ছিল—"প্রিয় জোনস্‌! ডেঃ মাজিস্ট্রেট পরীক্ষার জন্যে নবীনকে যে নিয়োগপত্র পাঠান হইয়াছিল, তাহা ভুলবশতঃ অন্যত্র গিয়াছে। তুমি তাহাকে আর একখানি নিয়োগপত্র দিবে।" পড়িলাম, পড়িয়া বসিয়া পড়িলাম। আমার পা চলিতেছে না। সমস্ত বেলভিডিয়ার যেন চারি দিকে ঘুরিতেছে। আমি অতি কষ্টে এক বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলাম। ডেঃ মাজিষ্ট্রেট! ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কি? কোনও দিন প্রলাপস্বপ্নেও ত আমার আশা এত দূর উঠে নাই। ওকালতি, মুন্‌সেফি, সবজজি, এ সকল আশৈশব শুনিয়াছি। উকিল হইব, এ আশা উচ্চতম আশা ছিল। ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট ত কখনও মনেও ভাবি নাই। উহা কি, জানিতামও না। তবে জানিতাম, একটা বড় চাকরি। কিন্তু তাহার পরীক্ষা ত কখনও শুনি নাই। কিরূপ পরীক্ষা? যদি উত্তীর্ণ হইতে না পারি? তাহাই খুব সম্ভব। কারণ, এরূপ বিপন্ন অবস্থায় কি পরীক্ষা দেওয়া যায়? হা ভগবান্‌! হা ষ্টান্সফিল্ড! এরূপে আকাশকুসুম আমার হাতে দিয়া কি আমাকে বঞ্চিত করিলে?" দর দর ধারায় অবলম্বিত বৃক্ষে আমার চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। এমন সময় দ্বারস্থ অস্ত্রধারী প্রহরী হাঁকিলেন—"কোন্‌ হায়! চলে যাও।" যন্ত্রের মত চলিলাম। বেলভিডিয়ার, পৃথিবী, আকাশ, সকলই ঘুরিতেছে। আমি চলিতে পারিতেছি না। কেমন করিয়া এত দূর পথ যাইব? সেই পিতৃব্য মহাশয় খিদিরপুরে বেলভিডিয়ারের কিঞ্চিৎ দূরে বাসা করিয়াছেন। কিঞ্চিৎ মাথা স্থির করিবার জন্য তাঁহার বাসায় গেলাম। তিনি দেখিবামাত্র মুখখানি মলিন করিলেন। মনে করিলেন, বুঝি কিছু সাহায্য চাহিতে গিয়াছি। নিতান্ত মামুলী ধরণে আমার নমস্কার লইয়া বসিতে বলিয়া কোথায় গিয়াছিলাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলাম—"লাট সাহেবের বাড়ী গিয়াছিলাম।" জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইল?" আসল কথা কিছু না বলিয়া বলিলাম—"যেমন দিয়া থাকেন, তেমন আশা দিয়াছেন মাত্র।" তখন বাড়ী না গিয়া কলিকাতায় অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছি, আমার পিতার মত আমিও সংসার-জ্ঞানহীন, ইত্যাদি তীব্র ভর্ৎসনা অবনতমস্তকে শুনিলাম। ক্ষুধায় উদর জ্বলিতেছিল, পিপাসায় বুক ফাটিতেছিল। আমি অতি কাতর করুণ কণ্ঠে বলিলাম—"বড় পিপাসা হইয়াছে, এক গ্লাশ জল দিতে বলুন।" ভাবিলাম, তাহা হইলে শুধু জল আর দিবেন না। কিছু জলখাবারও দিবেন। কিন্তু হায়! ভগবান্‌! মানুষ কি সময়ের দাস! যাঁহার বাড়ীতে আমি গেলে এক দিন একটা দুর্গোৎসব হইত, আজ তিনি আমাকে এক গ্লাশ গঙ্গোদক মাত্র দিলেন।

অন্তরে অশ্রুপাত করিলাম; বাহিরে জল পান করিয়া উঠিয়া ভগবানের দিকে চাহিয়া গৃহাভিমুখে চলিলাম।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পটুয়াটোলা লেনের মোড় ফিরিতেই দেখিলাম, দ্বিতীয় চন্দ্রকুমার রাস্তার উপর দ্বিতল বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া মোড়ের দিকে চাহিয়া আছে। আমাকে দেখিবা মাত্র হাসিয়া নীচে ছুটিয়া আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"আজ ষ্টান্সফিল্ডের কাছে গিয়াছিলে?" উত্তর—"হাঁ।" "কি বলিলেন?" আমি বলিলাম—"এমন কিছু নহে। পরে বলিব।"—চন্দ্রকুমার উচ্চ হাসি হাসিয়া—"কি চালাক ছোক্‌রা! তোর যে 'নমিনেশন রোল' আসিয়াছে। তুই যে ডেঃ মাজিষ্ট্রেট হইলি।" আমি বিস্ময়ে বলিলাম—"হইয়াছি?" উত্তর—"আর হইবার বাকি কি? তুই নিশ্চয় পরীক্ষায় পাশ হইবি।" দুই জনে গলাগলি করিয়া উপরের ঘরে গেলাম। গৃহ তোলপাড়। আমি উঠিয়া আসিলেই নিয়োগপত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাপ্ত হইয়া এক আনন্দপূর্ণ পত্র সহ বাসায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। আকাশ হইতে আমার জন্য অকস্মাৎ ইন্দ্রের সিংহাসন নামিয়া আসিলে সহবাসিগণ অধিক বিস্মিত হইতেন না। চন্দ্রকুমারের আনন্দে পরীক্ষার নামে আশঙ্কা মিশ্রিত হইয়াছে। হরকুমার আনন্দে অধীর। চন্দ্রকুমার ইতিমধ্যে আমার 'বেলভিডিয়া'র উপাখ্যান বলিয়া দিয়াছেন। দাদা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আনন্দে বলিতেছেন—"এরূপ সাহস চাই। আমি ইহা আগেই জানিতাম। আমাদের কুলাচার্য্য আমাকে বলিয়াছিল, তাহার কর্ম্মস্থানে চন্দ্র। তাহার কখনও দুঃখ হইবে না।" আর ইতরবংশ-জাত সেই দুই জন! তাহারা কি বিষম অবস্থায়ই পড়িয়াছে! এত দিন এত তীব্র মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ করিয়া আজ কেমন করিয়াই বা আনন্দ প্রকাশ করিবে! অথচ না করিলেও বড় ইতরতা হয়। তাহাদের ঠিক যেন 'হরিষে বিষাদ' উপস্থিত হইয়াছে। মর্ম্মবেদনায় হৃদয় অস্থির, অথচ মুখে একটুক কণ্ঠহাসি হাসিয়া কখন একটুক আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। আবার তখনই বলিতেছে—"পরীক্ষায় পাশ হইলে ত? এরূপ পরীক্ষায় পাশ হওয়া বড় সহজ নহে। বি. এ. পরীক্ষা হইতেও শক্ত।" আমারও আশঙ্কা তাহাই। নিয়োগপত্রে লেখা আছে—সাহিত্যে, অঙ্কে, ইতিহাসে পরীক্ষা হইবে। সাহিত্যের কোন্ পুস্তক, কি ইতিহাস, কোন দেশের ইতিহাস, তাহা পর্য্যন্ত লেখা নাই। তাহার পর আরও সর্ব্বনাশ—বিজ্ঞান! বিজ্ঞানের নামে হৃদয়-শোণিত শুষ্ক হইল। আমরা বিজ্ঞান ত কিছুই পড়ি নাই। তখন বিজ্ঞান স্কুল কলেজে পাঠ্য ছিল না। তাহাতে আবার কি বিজ্ঞান, কোন্ বিজ্ঞানের পুস্তক, তাহা কিছু লেখা নাই। কি করিব? ত্রৈলোক্য দাদা বলিলেন—"Joyce's Scientific Dialogue পড়্।" কলেজ-লাইব্রেরি হইতে বহি একখানি দিলেন। দেখিলাম, এখানি বিজ্ঞানের শিশুপাঠ মাত্র।

সর্ব্বশেষ, পরীক্ষা কেবল সম্পূর্ণ নূতন, এমন নহে, competition examination (প্রতিযোগী পরীক্ষা!) লেঃ গবর্ণর সার্ উইলিয়ম গ্রে কিছু ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তৈল এবং সুকতলার উপর তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়াছিলেন। তখন ডেঃ মাজিষ্ট্রেট হইবার একমাত্র সোপান এই দুই মহাপদার্থ। অতএব তিনি ৩৪টি ডেঃ মাজিষ্ট্রেট পদাভিলাষীকে পরীক্ষার দ্বারা নির্ব্বাচন করিয়া ক্রমে ক্রমে, পরীক্ষার ফলানুসারে নিয়োজিত করিতে স্থির করিয়াছিলেন। ৩৪ জনের মধ্যে ১৭ জন ইংরাজ, এবং ১৭ জন দেশীয় লোক নিয়োজিত হইবে। তজ্জন্য ৫১ জন ইংরাজ ও ৫১ জন দেশীয় লোক নির্ব্বাচিত হইয়া পরীক্ষা দিবার জন্যে অনুমতি পাইবেন। কেবল শিক্ষিত এবং সদ্বংশীয়দিগকেই মনোনীত করা হইবে। এই ৫১ জনের মধ্যে পরীক্ষায় যে ১৭ জন প্রথম হইবেন তাঁহারা পাশ হইবেন, এবং তাঁহাদের প্রথম ৯ জন তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম পাইবেন। বাকি ৮ জন ক্রমে ক্রমে নিয়োজিত হইবেন। আমার মুদ্রিত নিয়োগপত্রের সঙ্গে নিয়মাবলী ছিল;

তাহাতে এ সকল কথা লেখা ছিল। যদি প্রথম ১৭ জনের মধ্যে হইতে না পারি, তাহা হইলে পাশের মধ্যে গণ্য হইব না ; সকল আশা ফুরাইবে। অতএব আমার ভগ্ন দেহ ও ভগ্ন হৃদয় লইয়া যে এরূপ প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, সে আশা এক প্রকার ত্যাগ করিলাম।

পরদিন দৈনিক সংবাদপত্রে উক্ত নিয়মাবলী সহ গবর্ণমেন্টের এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইল, এবং কলিকাতা সহরে, বিশেষতঃ কলেজে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আমি কলেজে গেলেই শত শত ছাত্র আমাকে ঘেরিয়া কিরূপে মনোনীত হইলাম, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা—"আরে, এ বাঙ্গাল ত কম পাত্র নহে। ভিজে বিড়াল।" শত শত বালক পথে ঘাটে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমার দেখাদেখি চেষ্টা করিয়া আরও কয়েক জন 'বি. এ.' ও 'এম. এ.' নিয়োগপত্রের যোগাড় করিলেন। বলিয়াছি, দরিদ্রের বন্ধু ষ্টার্ন্সফিল্ডের কৃপায় আমার নাম রেজেষ্টারিতে প্রথম ছিল।

পরীক্ষার দিন আসিল। ১০২ জন 'টাউন হলে' পরীক্ষা দিতে বসিলেন। পরীক্ষক—খ্যাতনামা কে এম বেনার্জ্জি, ওরফে "কৃষ্ট বন্দো" এবং প্রেসিডেন্সি কমিসনর চ্যাপমেন সাহেব। দেখিলাম, ১০২ জনের মধ্যে আমার মত নিরাশ্রয়, অল্পবয়স্ক কেহ নাই। আমার মত কাহারও সর্ব্বস্ব এ পরীক্ষার ফলের উপর নির্ভর করিতেছে না। ভক্তিভাবে পিতাকে স্মরণ করিয়া পরীক্ষা দিতে বসিলাম। দুই দিন পরীক্ষা হইল। তৃতীয় দিবস রচনা।—পূর্ব্বাহ্নে বাঙ্গালা, অপরাহ্নে ইংরাজি। ইতিমধ্যে প্রশ্ন চুরি গিয়াছে বলিয়া কলিকাতায় গুজব উঠিয়াছিল। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটি অর্দ্ধপ্রাচীন লোক ছিলেন। লোকটি পাকা রসিক। সকলকে খুব হাসাইতেন। এ সকল বালকের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তাঁহার কার্য্য নহে। তিনি প্রায়ই বসিয়া চারি দিক্ দেখিতেন ও ঠাট্টা তামাসা করিতেন। তিনি দেখিলেন, হাইকোর্টের কোন জজের জামাতা তাঁহার পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিলেন। তিনি চুপে চুপে গিয়া চ্যাপমেন সাহেবকে খবর দিলেন। সাহেব আসিয়া ধরিলেন। দেখিলেন, 'জামাইবাবু' বাড়ী হইতে রচনা রচিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া হইল। 'টাউনহলে' একটা গোল পড়িয়া গেল। চ্যাপমেন সাহেব ভ্রূকুটি করিয়া তাহা থামাইলেন।

পূর্ব্বাহ্নের পরীক্ষার পর গ্রেজুয়েট দল সকলে আমাকে বলিলেন—"তুমি পরীক্ষকদের কাছে বল যে, আমরা অপরাহ্নে পরীক্ষা দিব না ; কারণ, যখন প্রশ্ন চুরি হইয়াছে, তখন যত বড়মানুষের এঁড়ে পাশ হইবে, আর আমাদের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্ক হইবে।" আমি বলিলাম—"মন্দ নহে। বাঘের মুখে বাঙ্গালটাকেই দেও।" তাঁহারা কিছুতেই ছাড়িলেন না। বলিলেন, আমার মত তাঁহাদের সাহস নাই। আমি যেমন পরীক্ষকদের কক্ষে প্রবেশ করিলাম, চ্যাপমেন সাহেব বাঘের মত আমার উপর আসিয়া পড়িলেন। বাকি গ্রেজুয়েটেরা আমার পশ্চাতে "সম্মানজনক ব্যবধানে" ত ছিলেনই। এখন আরও সরিয়া পড়িলেন। ইহাদের মধ্যে একজন রেজিষ্ট্রি বিভাগের ভবিষ্যৎ অথর্ব্ব ইন্‌স্পেক্টার জেনেরেল মহাশয়ও ছিলেন। কলিকাতার লোকের বীরত্ব কেবল আমাদিগকে বাঙ্গাল ডাকিবার বেলায় ! রামমাণিক্য যথার্থ বলিয়াছিল—"হালার বাই হালারা বাঙ্গাল বাঙ্গাল কইবার পারেন, ভাজী মটর দিবার পারেন না।" আমরা পরীক্ষা দিব না বলাতে সাহেব চটিয়া লাল। কারণ, প্রশ্ন তাঁহার হেফাজত হইতে চুরি গিয়াছে। তাঁহার ঘোরতর কলঙ্কের কথা। তিনি প্রথম খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করিলেন। আমার সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র বাক্‌যুদ্ধ হইয়া গেল। তখন শ্বেতশ্মশ্রু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া প্রকৃত পাদরির কার্য্য করিলেন। তিনি বলিলেন—"তোমরা

গ্রেজুয়েটদের ভয় নাই। আমরা উত্তর দেখিয়া কি গ্রেজুয়েট ও অগ্রেজুয়েটের উত্তরের তারতম্য বুঝিতে পারিব না?" আমরা অগত্যা অপরাহ্নের প্রশ্ন গ্রহণ করিলাম।

পরীক্ষা শেষ হইতে না হইতেই টাউনহলে কি একটা মিটিংগের ভিড় পড়িয়া গেল। আমি উত্তরের কাগজ কে. এম. বানার্জ্জির হাতে দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইতেছি, অমনি ডাক পড়িল—Look here boy! "এই দেখ, বালক!" ফিরিয়া দেখি চ্যাপমেন বাহাদুর ডাকিতেছেন। আমি ফিরিলে তিনি এক নোটবুক বাহির করিয়া, তাহাতে আমার নাম ধাম লিখিয়া লইয়া, গ্রীবা হেলাইয়া বলিলেন—"আমি ইচ্ছা করি, তুমি পরীক্ষায় পাশ হও।" ইহার অর্থ কি? আমার মুখ শুকাইয়া গেল। আমি বুঝিলাম, ইনি আমার উপর চটিয়াছেন। আমাকে নিশ্চয় 'ফেইল' করিবেন। টাউনহল আমার চারি দিকে ঘুরিতে লাগিল। আমি পড়িতেছিলাম। একখানি টেবিল ধরিয়া দাঁড়াইলাম। পরীক্ষার্থীরা আমাকে ঘিরিয়া বিষয়টি কি, জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম। নানা জনে নানা অর্থ করিতে লাগিলেন। আমি মনে করিলাম, আর আমি নবকুমারের মত পরের জন্যে কাঠ কাটিতে যাইব না। পরদিন প্রাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি পাগল। চ্যাপমেন সাহেব বরং তোমার আলাপ শুনিয়া ও সৎসাহস দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। তিনি নিশ্চয় তোমাকে তাঁহার ডিভিশনে রাখিবেন।" আমার তথাপি বিশ্বাস হইল না। আমি বলিলাম—"অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমার কাগজগুলি দেখিবেন।" তিনি হাসিতে লাগিলেন। "শৃঙ্গিনাং দশহস্তেন"—চাণক্য ঠাকুরের এই মহাবাক্য আমি কেন মাটি খাইয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলাম? কেন চ্যাপমেন সাহেবের দশ হস্তের মধ্যে গিয়াছিলাম? তজ্জন্যে অনুতাপ করিতে করিতে গৃহে ফিরিলাম।

আজ বেঙ্গল আফিসে (Bengal office) ১২ জন এসিস্টেন্ট নিযুক্ত হইবে। বেতন ৪০্। চন্দ্রকুমার Adventures of Dr. Livingstone বইখানি কিনিয়াছিলেন। আমি তাহা হাতে করিয়া বেঙ্গল আফিসে গেলাম। এবং ডাক পড়িবার প্রতীক্ষায় বসিয়া পড়িতে লাগিলাম। বেঙ্গল আফিস তখন গঙ্গার ধারে ছিল। সেক্রেটারি ডেম্পিয়ার সাহেব আফিসে আসিলেন। প্রথমেই আমার ডাক পড়িল। জোনস্ সাহেব স্বয়ং আমাকে ডাকিয়া নিলেন। তিনি পূর্বে আমার ইতিহাস বলিয়াছেন, এবং ডেম্পিয়ার সাহেব চিনিয়াছেন, আমি ষ্টান্সফিল্ড সাহেবের 'দরিদ্র বালক'। ডেম্পিয়ার সাহেব কি সুন্দর, দীর্ঘকায়, সুপুরুষ ছিলেন। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ইংরাজ এবং মুখে এমন মনোমোহিনী হাসি যেন আমি আর দেখি নাই। তিনি বলিলেন—"আমি তোমাকে ইতিপূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।" আমি বিস্মিত হইলাম। তিনি বঙ্গেশ্বরের প্রধান সচিব, আমি পথের কাঙ্গালকে কোথায় দেখিবেন!

প্র। তোমার বাড়ী কোথায়?

উ। চট্টগ্রাম।

প্র। তুমি ষ্টীমারে বাড়ী যাও?

উ। হাঁ।

প্র। শেষ বার কবে গিয়াছিলে?

আমি উত্তর দিলে, তিনি বললেন—সেই ষ্টীমারে তিনিও সমুদ্রের বায়ু সেবন করিতে গিয়াছিলেন। ষ্টীমারে আমাকে দেখিয়াছিলেন। আমার মনে হইল, চন্দ্রকুমারের কথা বুঝি ঠিক। আমার মুখখানিতে বুঝি কিছু আছে। তাহা কি? আমার পিতার পুণ্যালোক। তিনি আবার আদরে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার হাতে কি বহি?

উ। Adventures of Dr. Livingstone.

প্র। তুমি কত মূল্যে কিনিয়াছ?

উ। আমি কিনি নাই। আমার এক বন্ধু কিনিয়াছেন।

মূল্যটা আমার এখন মনে নাই। তিনি শুনিয়া বলিলেন—তোমার বন্ধু খুব সস্তা পাইয়াছেন। আমি তাহার দ্বিগুণ মূল্য দিয়াছি। তুমি বহিখানি পড়িয়াছ?

উ। বন্ধু মোটে কাল কিনিয়াছেন। আমি এইমাত্র বাহিরে বসিয়া পড়িতেছিলাম।

তাহা শুনিয়া তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"জোন্স বলিতেছেন, তুমি এখানে এসিষ্টেণ্টি পদের প্রার্থী। কেন? তুমি ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পরীক্ষা দিয়াছ। না?

উ। দিয়াছি। কিন্তু পরীক্ষার ফল অনিশ্চিত। তাহাতে আবার প্রতিযোগী পরীক্ষা। যদি প্রথম ১৭ জনের মধ্যে হইতে না পারি, পাশ হইব না। আমার তাহা হইলে উপায়ান্তর থাকিবে না।

প্র। তুমি গ্রেজুয়েট,—না?

উ। হাঁ। আমি এ বৎসর বি. এ. পাশ করিয়াছি।

প্র। তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে। অতএব কয়েক দিনের জন্যে মাত্র তুমি কেন এ ক্ষুদ্র চাকরি গ্রহণ করিবে?

আমি অধোমুখে ছল ছল নেত্রে ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কষ্টে বলিলাম—"আমি বড় দুঃখী, বড় বিপন্ন। জোন্স সাহেব আমার সমুদায় অবস্থা শুনিয়া আমাকে এরূপ দয়া করিতেছেন। আমি যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হই; আমার মত কপালভাঙ্গা লোকের না হইবারই কথা, তবে আমার বিপদের সীমা থাকিবে না। আপনি দয়া করিয়া আমাকে একটি এসিষ্টেণ্টের কর্ম্ম দিন।" তিনি সকরুণ নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দরিদ্র বালক! তোমাকে কর্ম্ম দিতে আমার অনিচ্ছা নহে। আমি তোমাকে সন্তোষের সহিত ৪০৲ টাকার কর্ম্ম একখানি দিলাম। আমি ইহাও বলিতেছি যে, তুমি যদি পরীক্ষায় পাশ না হও, আমি তোমাকে শীঘ্র ৮০৲ টাকার কর্ম্ম একখানি দিব।"

আনন্দে, আবেগে আমার কপোল বহিয়া চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। আমি গলদশ্রুমুখে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইতে শুনিলাম, জোন্স সাহেব বলিতেছেন, —"কেমন দিব্বি ছেলে!—না?" ডেম্পিয়ার সাহেব—"আশ্চর্য্য ছেলে! হায়! হায়! আবার জিজ্ঞাসা করি, সে সকল দয়ার সাগর, দীনবন্ধু, দেবতুল্য ইংরাজ আজ কোথায়?

সেই দিন হইতে বেঙ্গল আফিসে কাজ করিতে লাগিলাম। সহকর্ম্মচারীরা আমাকে দেখিয়া, আমার ইতিহাস শুনিয়া অবাক্। হেড এসিষ্টেণ্ট বলিলেন—"তুমি দুদিন পরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইবে। তোমার আর এখানে কাজ করিতে হইবে না। নিতান্ত ইচ্ছা হয়, 'ডায়ারি' লেখ।" আধ ঘণ্টার কাজ। অবশিষ্ট কাল আমি গবাক্ষের কাছে বসিয়া ভাগীরথীর বক্ষ, তাহাতে ভাসমান অর্ণবযানসমূহ, তদূর্দ্ধে নির্ম্মল নৈদাঘ আকাশ, চাহিয়া চাহিয়া আপনার ভবিষ্যৎ ভাবিতাম ও সময়ে সময়ে কবিতা লিখিতাম।

৭ দিন এরূপে গেল। আজ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কথা। নিজে তাহা জানিতে যাইব সাধ্য নাই। পা চলিতেছে না। অনিশ্চিত আশায় নিরাশায় হৃদয় কাঁপিতেছে। একখানি পত্র সহ হরকুমারকে কে. এম. বানার্জ্জির কাছে পাঠাইয়া, বারান্দার রেইলিঙ্গে বুক রাখিয়া অদৃষ্টের প্রতীক্ষায় রহিলাম। আধ ঘণ্টা পরে হরকুমার হাসিভরা মুখে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া হৃদয়ে যেন আনন্দের তড়িৎ বিক্ষিপ্ত হইল। হরকুমার নীচে হইতে চীৎকার করিয়া বলিল—"তুমি পাশ হইয়াছ।" গৃহে কোলাহল পড়িয়া গেল। সেই কোলাহলের মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তর পড়িলাম—"তুমি পাশ হইয়াছ। তোমার স্থান কত হইয়াছে, আমার স্মরণ নাই। কাগজপত্র চ্যাপমান সাহেবের কাছে। তবে তুমি এখনই কার্য্য পাইবে।" কোথায় কলিকাতার পথের কাঙ্গাল, আর কোথায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট! হা ভগবান! তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে?

সে দিন বেঙ্গল আফিসের গবাক্ষে বসিয়া লিখিলাম—

"কিম্বা যদি নিরাশ্রয় দীন অসহায়,—
কেন কাঁদিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনীরে?
এই চিন্তা বিষধরী,
এই দুঃখ বিভাবরী,
কত দিন রবে আর? পোহাবে অচিরে,
দিবেন সুদিন যিনি দিলেন আমায়।"

আনন্দপর্ব্ব

"There is tide in the affairs of men
Which taken at the flood leads to fortune."

ছাত্রনিবাসের কোলাহল না থামিতেই যাদব আসিয়া উপস্থিত। আমার পরে যাদব প্রভৃতি কয়েক জন গ্রেজুয়েট আমার দেখাদেখি যোগাড় করিয়া নিয়োগপত্র পাইয়াছিলেন। যাদব আমাকে তাহার গাড়ীতে ডেম্পিয়ার সাহেবের কাছে যাইয়া তাহার খবরটা লইতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। একা যাইতে তাহার সাহস ও ভরসা হইল না। আমিও নিশ্চয় তত্ত্ব পাইবার জন্যে তাহার সঙ্গে চলিলাম। যাদব আমার উপরের শ্রেণীতে পড়িত। তাহার অবস্থা বেশ ভাল। আমার সঙ্গে তখন বিশেষ পরিচয় ছিল না। পরীক্ষার প্রশ্ন-চুরি বিভ্রাটে গ্রেজুয়েট সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হইবার সময়ে বিশেষ পরিচয় হয়। যাদব গাড়ীতে বলিল—"আমার যাহা হউক, তুমি যে এ ঘোরতর বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিলে, তাহাতে আমার আনন্দ শরীরে ধরিতেছে না।" যাদব বড় সহৃদয় লোক ছিল। আহা! আজ যাদব কোথায়? ডেম্পিয়ার সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র সিঁড়ি বাহিয়া আসিতেছেন ওই মূর্ত্তি কে? সর্বনাশ!—সেই চ্যাপমান সাহেব। তিনি আমাকে দেখিয়া এক বিকট হাসি হাসিয়া বলিলেন—"ভাল, বালক! তুমি কি জন্যে আসিয়াছ?"

উ। ডেম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে আমরা দেখা করিতে চাহি।

প্র। কেন?

উ। আমাদের পরীক্ষার ফল জানিবার জন্যে।

প্র। তিনি তোমাদিগকে তাহা বলিবেন কেন? মনে কর, তুমি পাশ হইয়াছ। তুমি প্রেসিডেন্সি বিভাগে থাকিতে চাহিবে। তোমার বন্ধু মনে কর, পাশ হইয়াছেন। তিনিও প্রেসিডেন্সি বিভাগে থাকিতে চাহিবেন। তবে উড়িষ্যায় ও চট্টগ্রামে যাইবে কে?"

উ। আমি সন্তুষ্টির সহিত চট্টগ্রাম যাইব।

প্র। কেন?

উ। চট্টগ্রাম আমার বাড়ী। আমি বড় বিপদস্থ। আমি পিতৃহীন হইয়া অবধি বাড়ী যাই নাই। আমার অনাথিনী মাতাকে দেখিতে আমার প্রাণ বড় আকুল।

তিনি আবার এক বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন—"অভাগ্য বালক! তবে তুমি বড় নিরাশ হইবে। যাহা হউক, ডেম্পিয়ার সাহেব তোমাদের সঙ্গে দেখা করিবেন না। তোমরা চলিয়া যাও। কাল গেজেটে সকলই দেখিতে পাইবে।"

তিনি গিয়া তাঁহার বগিতে উঠিলেন। আমরা তাঁহার কঠোর ভাব দেখিয়া ভয়ে গাড়ীতে গিয়া উঠিতেছিলাম, তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি কাছে গেলে বলিলেন—"তুমি পাশ হইয়াছ।"

আমি। তাহা ত কে. এম. বানার্জ্জি বলিয়াছেন।

প্র। তবে তুমি আর কি জানিতে চাহ?

উ। আমি প্রথম ৯ জনের মধ্যে হইয়াছি কি না?

প্র। প্রথম ৯ জনের অর্থ কি?

উ। প্রথম ৯ জনের এখনই কর্ম্ম পাইবার কথা।

তিনি। আমি যত দূর জানি, ৯ জনের বেশী এখনই নিযুক্ত হইবে। তুমি এখনই কর্ম্ম পাইবে। কিন্তু (ঈষৎ হাসিয়া) কোথায় যাইতে হইবে, তাহা আমি বলিতেছি না।

আমি। আমার বন্ধু? তিনি পাশ পাইয়াছেন ও এখনই কর্ম্ম পাইবেন কি না?

তিনি। তাঁহার নাম কি?

আ। যাদবচন্দ্র গোস্বামী।

তিনি। তিনি পাশ হইয়াছেন আমার স্মরণ হয়। কিন্তু তিনি এখনই কর্ম্ম পাইবেন কি না বলিতে পারি না। (তার পর আবার চক্ষু ঘুরাইয়া কঠোর ভাবে বলিলেন)—"দেখ, তুমি যদি ডেম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা কর, তবে তোমার ঘোরতর অমঙ্গল হইবে।"

তিনি গাড়ী খুলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু শেষ ধমকে আমার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল। যাদব তখন পাশে আসিয়া বলিল—"চল, আর গণ্ডগোল করিয়া কাজ নাই, পাশ ত হইয়াছি। আমি চাকরি যখনই পাই, তুমি যে এখনই পাইবে, তাহা নিশ্চয়। আর আমার বোধ হইতেছে. এ ব্যাটা তোমাকে তাহার ডিভিশনে রাখিয়াছে। তোমার উপর তাহার চোখ পড়িয়াছে।" কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এরূপ বলিয়াছিলেন। অতএব আমি নির্ভয়ে আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া—আকাশপটে যেন আমার পিতৃদেব অধিষ্ঠিত হইয়া আমার দিকে সুপ্রসন্নমুখে চাহিয়া রহিয়াছেন—অন্যমনে যাদবের আনন্দোচ্ছ্বাসে যোগ দিতে দিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। হৃদয়ে কি এক অবর্ণনীয় আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে, কি এক গাম্ভীর্য্য সঞ্চারিত হইয়াছিল। কেবল মনে হইতেছিল—"আজ আমার প্রেমময় পিতা কোথায়? আজ বিদ্যুৎ এ আনন্দসংবাদ বহিয়া নিয়া যখন তাঁহার হস্তে দিত, তখন তিনি কত আনন্দমিশ্রিত প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেন! একদিন পিতার হৃদয়ে এ আনন্দ সঞ্চারিত করিব, একদিন তাঁহার চিন্তার মেঘের মধ্যে এ আনন্দ-তড়িৎ সঞ্চারিত করিতে পারিব বলিয়াই কলিকাতা সহরে এত কষ্ট অম্লানমুখে সহিয়া পড়িতেছিলাম। বাবা আমার! তুমি যে আশালতা রোপণ করিয়াছ বলিয়া মাতাকে সান্ত্বনা দিতে. আজ তাহাতে তোমার বাঞ্ছিত ফল ফলিল, আর তুমি সে ফল দেখিলে না; সে ফল তোমার চরণে নিবেদিত হইল না" গৃহে ফিরিয়া আমার ভ্রাতৃপ্রতিম প্রিয়তম বন্ধু তিনটির গলায় পড়িয়া অবারিতহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলাম। তাহারা আমার অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া কত সান্ত্বনার কথা বলিল। হীনবংশীয় সহপাঠী দুটি এত দিন আমার চোখে কখনও অশ্রু দেখেন নাই। আমার মুখে একটি দুঃখের কথাও শুনেন নাই। আজ এ আকাশ-কুসুমবৎ উচ্চ পদ পাইয়া আনন্দে অধীর না হইয়া, অহঙ্কারে পৃথিবী কম্পিত না করিয়া, কাঁদিতেছি দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। এ রোদনের মধ্যে যে কি স্বর্গের আনন্দ, কি পবিত্রতা আছে, তাহা তাঁহারা বুঝিবেন সাধ্য নাই। উচ্চ শিক্ষায়ও ধমনীর রক্ত পরিবর্তন করিতে পারে না। আজ তাঁহাদের ঘোর দুর্দ্দিন। ভগবান্‌ই জানেন, এ কৃপাপাত্রদ্বয় সে দিন কি মর্ম্ম-পীড়াই পাইয়াছিল।

হৃদয়বেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে আমি আহার করিতে গিয়া দেখিলাম, নীচের ঘর ও প্রাঙ্গণ পাড়ার বৃদ্ধা ও মধ্যমবয়স্কা স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। আমি পাড়ায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতাম; অনেক বাড়ী যাইতাম। পাড়ার আবালবৃদ্ধ সকলেই আমাকে চিনিত ও আদর করিত। কারণ, বাসার আর কেহ কখনও "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" পটুয়াটোলার বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমি মধ্যে মধ্যে বাঁশী শিখিতাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার শিশু পুত্রটি আমাকে এত

ভাল বাসিত যে, আমার গলার, কি শিসের শব্দ শুনিলে সে তাহার মাতার কাছ হইতেও ছুটিয়া আসিত। আমি যতক্ষণ বাসায় থাকিতাম, সে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। আমি খাইতে বসিলে, রমণীরা সকলে আমাকে ঘেরিয়া বসিয়া, আমার কত প্রশংসা করিতে লাগিল, কত আদরের কথা বলিতে লাগিল। আর সেই পাচিকা ব্রাহ্মণী ঠাকুরাণী, যিনি আমার জন্যে লুকাইয়া মাছ তরকারি ইত্যাদি রাখিতেন, আজ তাঁহার হাতনাড়া দেখে কে? তিনি যেন গর্ব্বে পরিবেষণ করিতেছেন, মাটিতে যেন পা পড়িতেছে না। আমি মনের আবেগে কিছুই খাইতে পারিতেছি না। রমণীমহলের একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ বলিলেন—"দেখেছিস্ লা! ছেলের এখনই কেমন লক্ষ্মীশ্রী হয়েছে, কিছু খেতে পাচ্ছে না!" একটি অজাতশ্মশ্রু বাঙ্গালদেশী কাঙ্গাল ছেলে, কাল যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল, আজ একটা দিগ্‌গজ হাকিম হইয়া গেল—তাহাদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। যাহারা অনভিজ্ঞা, ততোধিক অল্পবয়স্কা ও সরলা, পরিণতবয়স্কা চতুরা মুখরারা তাহাদিগকে 'হাকিম' পদার্থটা কি, বিচিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন।

আহারের পর একবার বেঙ্গল আফিসে গেলাম। সেখানেও আমি একটা 'কেষ্ট বিষ্টু'তে পরিণত হইলাম। ইয়ারগোছের কেরানিরা বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! বাঙ্গাল কম পাত্র নয়! 'ডায়রিষ্ট' হইতে একেবারে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট!" জোন্স সাহেবের বড় আনন্দ। হেড এসিস্টেন্ট বাবুও খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—"তুমি সন্ধ্যার সময়ে আমার বাসায় আসিও। তখন গেজেটের প্রুফ দেখিতে পাইবে, সকল কথা জানিতে পারিবে।"

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অপরাহ্নে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গেলাম। তিনি ও রাজকৃষ্ণ বাবু আনন্দে অধীর হইলেন। বলিলেন—"আমরা ব্রাহ্মণ দুটিকে খুব পেট ভরিয়া সন্দেশ খাওয়াইতে হইবে।" আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। বলিলাম—"আমিই আপনাদের। আপনাদের চরণছায়া ধরিয়া এই বিপদ্‌সাগরে কূল পাইলাম। আমাকে চিরদিন চরণে স্থান দিবেন।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তীব্র তেজঃপূর্ণ নেত্রযুগল অশ্রুতে ছলছল করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"আমি অনেককে বড় বড় চাকরি লইয়া দিয়াছি। কিন্তু এমন আনন্দ কখনও অনুভব করি নাই। কারণ, তাহাদের সঙ্গে করিয়া নিয়া সুপারিশ করিয়াছি, আর চাকরি পাইয়াছে। তোমার জন্যে আমি ত কিছুই করি নাই। তুমি আপন উদ্যোগে যে এরূপ একটা উচ্চ পদ লাভ করিলে, ইহাতেই আমার এত সুখ। আমি জানিতাম, তোমাকে বনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেও তুমি আপন উদ্যোগে সেখানেও একটা দাঁড়াইবার স্থান করিতে পারিবে।" সেখান হইতে সন্ধ্যার সময়ে হেড এসিস্টেন্ট বাবুর বাসায় গেলাম। তিনি গেজেটের প্রুফ আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"তুমি প্রেসিডেন্সি ডিভিশনে নিয়োজিত হইয়াছ।" আমি বসিয়া পড়িলাম। বড় নিরাশা প্রকাশ করিয়া বলিলাম, আমাকে চট্টগ্রামে দিলে ভাল হইত। আমার একবার বাড়ী যাওয়া বড় দরকার। আমার মাকে একবার দেখা না দিলে তিনি কিছুতেই শান্ত হইবেন না। তিনি বলিলেন —"তুমি পাগল। আমার ভাগিনাকে প্রেসিডেন্সি বিভাগে রাখিতে আমি কত যত্ন করিলাম। কিন্তু চ্যাপমান সাহেব তোমাকে কি যে পাইয়া বসিয়াছে, সে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও নিবে না। সে নিজে দরবার করিয়া তোমাকে বাছিয়া নিয়াছে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে আসিতে লোক কত চেষ্টা করে, আর তুমি তাহা পাইয়াও অসন্তুষ্ট। তুমি ত আশ্চর্য্য ছেলে।" তাহা ঠিক। কলিকাতা অঞ্চলবাসীদের পক্ষে প্রেসিডেন্সি বিভাগ বৈকুণ্ঠ। আমার কিন্তু ৩৬ বৎসর চাকরির পরও সেই বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কখনও মনে উদয় হয় নাই। আমার চক্ষে এখনও আমার সরিৎ-সাগর-শৈলাম্বরা মাতৃভূমিই একমাত্র বাঞ্ছনীয় স্থান। আবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে ফিরিয়া গিয়া এ সংবাদ দিলাম। তিনিও

বলিলেন—প্রেসিডেন্সি পাইয়াছি, ভালই হইয়াছে। তিনি বলিলেন—"আর কি, এখন গেজেট বগলে করিয়া বাড়ী যাও। দেখিবে, এখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সকলেই আবার সদয় হইয়াছেন। সংসার এমনই!" শেষে পরামর্শ স্থির হইল, কার্য্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে বাড়ী গিয়া বিবাহযোগ্যা ভগিনীটির বিবাহ দিতে হইবে। তিনি বলিলেন—"তুমি কাল চ্যাপমান সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া ১ মাসের ছুটি চাও। যদি কিছু গণ্ডগোল করেন, আমি নিজে গিয়া তাঁহাকে ও ডেম্পিয়ার সাহেবকে বলিব।"

আমি তাহাই করিলাম। চ্যাপমান সাহেব আমাকে বড় সমাদরে গ্রহণ করিলেন। বলিলেন—"তুমি কাল বলিতেছিলে, তুমি বড় বিপদ্‌গ্রস্ত। বাড়ী যাওয়া বড় প্রয়োজন। তোমার কি বিপদ্? তুমি কিরূপে চট্টগ্রামের বালক হইয়া এ পরীক্ষায় নিয়োগপত্র পাইলে?" আমি বলিলাম—"সে বড় দীর্ঘ কথা। শুনিলে আপনি ধৈর্য্যচ্যুত হইবেন।" তিনি বলিলেন, তিনি তাহা শুনিবেন। তখন আমি তাঁহাকে আমার সৌভাগ্য-সীতা উদ্ধারের জন্যে বিপদ্‌সাগরের সেতুবন্ধন কাহিনী আদ্যোপান্ত বলিলাম। তিনি গম্ভীর ভাবে নিবিষ্টমনে তাহা প্রায় এক ঘণ্টা কাল শুনিলেন। আমার কাহিনী শেষ হইলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তুমি একটি আশ্চর্য্য বালক। একটি বাঙ্গালী বালকের হৃদয়ে এরূপ সংসাহস ও অদম্য উৎসাহ আছে, আমি জানিতাম না। যাহা হউক, তোমার সকল বিপদ্ এখন কাটিয়া গিয়াছে। তুমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও। তুমি যে উচ্চপদে জীবন আরম্ভ করিলে, তাহা একজন ইংরাজ পাইলেও অহংকারী হইবে। তোমাকে যশোহর যাইতে হইবে। তুমি কাল ডেম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিও। তোমাকে এক মাস ছুটি দিতে আমি বলিব। তুমি ছুটি পাইবে।"

পরদিন তদনুসারে ডেম্পিয়ার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি তাঁহার সুন্দর সুশীতল হাসি হাসিয়া বলিলেন—"কেমন বালক! আমি বলিয়াছিলাম না যে, দুদিনের জন্যে একটা ক্ষুদ্র চাকরি গ্রহণ করিও না? তোমার সেই সাধের চাকরি এখন কি করিবে?"

আমি। আপনি যেরূপ আজ্ঞা করেন।

তিনি। তাহা এস্তেফা দেও! চ্যাপমান বলিতেছেন, তুমি এক মাস ছুটি চাও। আমি ছুটি দিলাম। কিন্তু যত শীঘ্র পার আসিও; কারণ, যশোহরে কর্ম্মচারীর বড় অভাব। তোমার বড় গুরুতর প্রয়োজন বলিয়াই ছুটি দিলাম, নতুবা দিতাম না। (আমি ধন্যবাদ দিয়া আসিবার সময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন) "তোমার বেঙ্গল অফিসে চাকরি কত দিন হইয়াছে?"

উত্তর। ৭ দিন।

"তাহার বেতন চাই?"—হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অধোমুখে রহিলাম। বলিলেন—"রাজেন্দ্র হইতে লইয়া যাইও।"

মধ্যাহ্নে আমার অদৃষ্ট-দেবতা আশ্রয়দাতা ষ্টান্সফিল্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার আনন্দের ও আদরের কথা আর কি কহিব? গায়ের কাছে ডাকিয়া নিয়া কত ঠাট্টা, কত তামাসা করিলেন। আসিবার সময়ে বলিলেন—"তোমার দুঃখিনী মাকে আমার সাদর সম্ভাষণ বলিও।" হায়! হায়! ভারতবর্ষের ইংরাজ রাজপুরুষদের এই দেবভাব কোথায় গেল? ১০ বৎসর পর তিনি আবার যখন প্রাইভেট সেক্রেটারি হন, আমি সাক্ষাৎ করিতে যাই। দেখিলাম, আর সে ভাব নাই। আমাদের প্রতি আর সেই সহৃদয়তা নাই।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বিদায় হইয়া আসিতে গেলাম। সে রাত্রির ষ্টীমারে বাড়ী যাইব। তিনি বাসায় ছিলেন না। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া, একখানি রুমালে বাঁধা ২০০ টাকা আমাকে দিয়া বলিলেন—"আমি আর

টাকার যোগাড় করিতে পারিলাম না। এ টাকাটা তোমার বড় দরকার বলিয়া কর্জ্জ করিয়া আনিলাম। তুমি বাড়ী গিয়া ভগিনীর বিবাহ দিবে. খরচের জন্য যদি আরও টাকার প্রয়োজন বুঝ, তবে আমাকে টেলিগ্রাফ করিও, আমি টাকা পাঠাইব।" ইনি কি মানুষ? এই দয়া, এই নিঃস্বার্থ দানশীলতা কি মানবের? আমার কণ্ঠে একটি কথা সরিল না। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে কত উপদেশ দিলেন, কতরূপ সান্ত্বনার কথা বলিলেন। আমি গলদশ্রুনয়নে সেই গোধূলি-গাম্ভীর্য্যে তাঁহার পদধূলি লইয়া বাড়ী চলিলাম,—সংসারে প্রবেশ করিলাম।

ঈশ্বর সর্ব্বমঙ্গলময়,—শিব। তাঁহার সৃষ্টিতে এত দুঃখ, এত দরিদ্রতা, এত বিপদ্ কেন? ইহা ভাবিয়া বড় বড় দার্শনিকগণও তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন হইয়াছেন। কেহ কেহ এতদূর বলিয়াছেন, জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যদি কেহ থাকেন, তবে তিনি ঘোরতর নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, এবং ন্যায়পরায়ণতাহীন। হায়! হায়! মানুষ বুঝে না, সোনা পোড়াইলে আরও নির্ম্মল হয়। পোড়ানই কেবল নির্ম্মল করিবার উপায়। মানুষে বুঝে না যে, তদ্রূপ দুঃখও মানুষকে নির্ম্মল ও পবিত্র করে,—মানুষকে মানুষ করে। আমি দুঃখে না পড়িলে এই দেবতুল্য আদর্শসকল দেখিতাম না; মানবের মহত্ত্ব কি, প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, বুঝিতে পারিতাম না। যৎকিঞ্চিৎ যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, এবং আত্মজীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা এই ঘোরতর বিপদের ফল। আজ বুঝিতে পারিতেছি, আমার সেই বিপদের গর্ভে আমার কি মঙ্গল নিহিত ছিল,—সে অগ্নিপরীক্ষার দ্বারা ভগবান্ আমার কি উন্নতি, কি মঙ্গল বিধান করিয়াছেন। আমি আজ যাহা, সেই বিপদ্ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি আজ যাহা, সেই বিপদে না পড়িলে তাহা হইতাম না। আজ সেই বিপদের আলোচনা করিতে, পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহার ঘন ঘোর ঘটামণ্ডিত মুখছবি দেখিতে, মনে কি আনন্দ, কি গৌরব, কি পবিত্রতা সঞ্চারিত হইতেছে! তদ্ভিন্ন যে কখনও দুঃখের মুখ দেখে নাই, সুখ কি, তাহা সে বুঝিতে পারে না। সুখ দুঃখ কিছু নিত্য সনাতন পদার্থ নহে। আমি যে কুটীরে বাস করিয়া আপনাকে সুখী মনে করি, একজন কমলার বরপুত্র তাহাতে বাস করা ঘোরতর দুঃখ মনে করিবে। সুখ দুঃখ মনের অবস্থা মাত্র। মানুষের অবস্থাভেদে, প্রকৃতিভেদে ইহার অনন্ত তারতম্য। স্তরের পর অনন্ত স্তর, সোপানের পর অনন্ত সোপান আছে। যে দুঃখ ভোগ করে নাই, সে সুখের পাশব ভাব ভিন্ন, তাহার উচ্চ মহান্ ভাব বুঝিতে পারে না। ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। তিনি সর্ব্ব আনন্দের আধার। মানুষ যত তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই মানুষ হইবে, সুখী হইবে। সুখের দ্বিতীয় পথ নাই। মানুষ দুঃখে না পড়িলে তাঁহার দিকে চাহে না। তাঁহার বিপদ্ভঞ্জন মুখ কি মধুর!

"বিপদঃ সন্তু তাঃ সর্ব্বা যত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যত্র ন পুনর্ভবদর্শনং॥" —মহাভারত।

পতিতা

"যেই জন পুণ্যবান্, কে না তারে বাসে ভাল?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর?
পাপীকে যে ভাল বাসে, আমি ভাল বাসি তারে;
সেই জন দেবতা আমার।" —কুরুক্ষেত্র।

যাঁহারা পাপের নাম শুনিয়া, পাপীর নাম শুনিয়া, শত হস্ত দূরে যান, ঘৃণায় বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা সমাজের প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে মহাশয় ব্যক্তি হইতে পারেন,

মহাপুণ্যবান্ বলিয়া পরিচিত হইতে পারেন, এবং হইয়াও থাকেন, কিন্তু তাঁহারা আমার পূজনীয় নহেন। যাঁহারা পাপের মধ্যে থাকিয়া, পাপীকে প্রীতিপূর্ব্বক বুকে লইয়া, পাপকে পবিত্র করেন, পাপীর উদ্ধার সাধন করেন, সেই প্রেমাবতার আমার দেবতা। পঙ্কে পদ্ম থাকে, পাপেও পুণ্য থাকে। পঙ্কে উজ্জ্বল আলোক জন্মে, পাপীর হৃদয়েও পবিত্রতা দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোরতর পাপের মধ্যে আমি এই সময়ে একটি অতি পবিত্র ও হৃদয়গ্রাহী পবিত্রতার ছবি দেখিয়াছিলাম। সেই ছবিটি এখানে আঁকিতে চেষ্টা করিব।

আমাদের জনৈক সহপাঠী অন্যত্র ফার্ষ্ট আর্ট দিয়া ও প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন এবং আমাদের সহবাসী ও সহপাঠী হইলেন। তাঁহাকে বাল্যাবস্থায় আমরা বড় দরিদ্র বলিয়া জানিতাম। তাঁহার পিতা অন্ধ হইয়াছিলেন, এবং উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের আনুকূল্যে তাঁহাকে চট্টগ্রাম স্কুলে পড়াইতেন। তাঁহার একখানি মার্কিনের ধুতি ও চাদর মাত্র তখনকার পরিচ্ছদ। তাহাও কালিতে চিত্রিত থাকিত। তিনি স্বভাবতঃই বড় 'নোংগরা' ছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিলে দেখিলাম, তিনি একটি ঘোরতর 'বাবু' হইয়াছেন। তাঁহার এখন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ। তিনি এখন একটি নিয়মিত মদ্যপায়ী। তাঁহার সংগে তাঁহার এক সহপাঠী 'ইয়ার' আসিয়াছেন। উভয়েই সন্ধ্যার সময়ে একত্র বহির্গত হইয়া যান, এবং রাত্রি কিছুক্ষণ হইলে, বিকৃত অবস্থায়, কখন বা একা বাসায় ফিরিয়া আইসেন, কখন বা তাঁহার সেই 'ইয়ার'টি তাঁহাকে রাখিয়া যান। তখন তাঁহার কোঁচা ও কাছা প্রায় স্থানান্তরিত হইয়া থাকিত ; চাদরখানি প্রায়ই হারাইয়া যাইত। বাসায় আসিয়া কোন দিন বা কাহারও সংগে কিঞ্চিৎ সদালাপ করিতেন, প্রায়ই পড়িয়া নাক ডাকিয়া নিদ্রা যাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে, কি রাত্রি জাগিয়া পড়া প্রায়ই তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। অতি প্রভাতে উঠিয়া পুস্তক বগলে করিয়া ছুটিয়া নীচের ঘরে যাইতেন, এবং সেইখানে অপূর্ব্ব আসন করিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে রেলগাড়ীর বেগে পড়িতে আরম্ভ করিতেন। এত দ্রুত পড়িতেন যে, তিনি কোন্ ভাষায় কি পড়িতেছেন, কাহারও বুঝিবার সাধ্য হইত না। তথাপি স্মরণশক্তি এমনই প্রখরা ছিল, যে যাহা একবার পড়িতেন বা শুনিতেন, তাহা মুখস্থ হইত। কেবল স্মরণশক্তির বলে তিনি পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিতেন। আমি তাঁহাকে এক দিন একটি কঠিন "কনিক সেকশনের" অঙ্ক বুঝাইয়া দিতে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"অঙ্ক বুঝা তোমার আমার কর্ম্ম নহে ; সে চন্দ্রকুমারের কাজ। আমি কেবল মুখস্থ করিয়া থাকি। তুমিও তাই কর গে।" এখন শুনিতে পাইলাম যে, তাঁহার পিতার বেশ টাকা আছে। অতএব তিনি বাবুয়ানা করিবার জন্যে তাঁহার বৃত্তি ছাড়া বাড়ী হইতেও বেশ দশ টাকা পাইতেছেন। কিন্তু তিনি কুক্ষণে অন্যত্র কলেজে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে যে মদ্যপান শিখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে। মাতৃভূমি এমন একটি রত্ন হারাইয়াছেন।

আমি বলিয়াছি, আমি অতি কষ্টে বি. এ. পড়িতেছিলাম। আমি পাঠ্য পুস্তকগুলি পর্য্যন্ত কিনিতে পারিয়াছিলাম না। ইঁহার ও অধিকাংশ চন্দ্রকুমারের বহি চাহিয়া পড়িতাম। তাঁহার এই আনুগত্যনিবন্ধন তিনি আমাকে একদিন নিভৃতে নিয়া বলেন—"নবীন! তুমি যে ছেলেবেলা তন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছ, এবং সুরাপানে তোমার আপত্তি নাই, তাহা আমি জানি। তুমি সময়ে সময়ে আমার সংগে গিয়া যদি একটুকু মদ খাও, আমি বড় সুখী হইব। তাহাতে তোমার চিন্তাবসন্ন মনে কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি হইবে, এবং শরীরও ভাল হইবে। দেখ, আমি তোমার চাইতে কত মোটা হইয়াছি। আর আমার বিশেষ উপকার এই হইবে যে, আমার চাদর ও টাকা হারাইয়া যাইবে না। ইহাতে আমি বড় ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি।" আমি তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সুরাপান হইতে বিরত করিবার জন্যে অনেক কথা বলিলাম। তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অহো! তুমি প্যারী-

চরণী বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলে যে! তুমি সঙ্গে যাইবে কি না বল।” আমি বলিলাম, আমি গেলে আর ফল কি হইবে? তাঁহার সেই ইয়ারও ত সঙ্গে থাকে। তিনি বলিলেন, সে বড় মাতাল। তিনি আর তাহাকে সঙ্গে নিবেন না। আমি বলিলাম, যদি আমিও মাতাল হই। তিনি বলিলেন, আমি মাতাল হইবার ছেলে নহি। তিনি অনেক কাকুতি মিনতি করিলে আমি বলিলাম, বিবেচনা করিয়া পরে বলিব। আমি চন্দ্রকুমারকে এ কথা বলিলাম। চন্দ্রকুমার একেবারে শিহরিয়া উঠিল, এবং ঘোরতর অমত প্রকাশ করিল। আমি তখন বলিলাম, যদি চটিয়া আমাকে তাহার বহি না দেয়, তবে পড়িব কি প্রকারে? দুজনের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া চন্দ্রকুমার বলিল,—“তবে যাও। কিন্তু বড় সাবধান।” সন্ধ্যার সময়ে আবার উক্ত সহপাঠী আসিয়া অনুনয় করিলে আমি যাইতে সম্মত হইলাম। তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। দুজনে চলিলাম। পথে ‘ইয়ার’ মহাশয় সঙ্গে জুটিলেন। তাঁহারা আমাকে বউবাজারের মোড়ের এক শৌণ্ডিকালয়ে লইয়া গেলেন। অপূর্ব্ব দৃশ্য! শৌণ্ডিকরাজ এক আকণ্ঠ উচ্চ দীর্ঘ কাষ্ঠ-তক্তপোষের উপর অঙ্গদের মত সিংহাসনস্থ। সম্মুখে সারি সারি বোতলে নানা মূর্ত্তিতে “মা ভবানী” বিরাজ করিতেছেন। তিনি ক্ষিপ্রহস্তে পতিত-পাবনীকে বিকাইতেছেন। বৃহৎ সেঁৎসেঁতে কক্ষটির এক দিকে একখানি অর্দ্ধভগ্ন বেঞ্চ। তাহাতে কেহ কেহ বিচিত্র বেশে নির্ব্বাণের বিভিন্ন অবস্থা লাভ করিয়া কক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কক্ষের স্থানে স্থানে কেহ পান করিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ ঝগড়া করিতেছে, কেহ ঘুষাঘুষি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেহ পতিতপাবনীর কৃপায় নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। অন্য বীভৎস দৃশ্য সকল পবিত্র ভাষায় অবর্ণনীয়। বন্ধুদ্বয় অর্দ্ধ বোতল নিকৃষ্ট ব্রাণ্ডিরূপ বিষ কিনিয়া একটি ক্ষুদ্র কক্ষে গেলেন। তাহার বাষ্পে আমার শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। ইয়ার মহাশয় গিয়া সিদ্ধ জবাকুসুমসঙ্কাশ হংসডিম্ব ও অনুরূপ ‘চাট’ কিনিয়া আনিলেন। আমি নাম-মাত্র সে পানীয় ও আহারীয় কষ্টে গলাধঃকরণ করিলাম। তাঁহারা পরম প্রীতিসহকারে পান ও ভোজন শেষ করিয়া আনন্দে প্রকৃত প্রস্তাবে ‘অধীর’ হইলেন। ইয়ার মহাশয় টলটল অবস্থায় স্বধামে গমন করিলেন। আমি আমার সহবাসীকে লইয়া আসিলাম। তিনি নাসিকাধ্বনি করিয়া রাত্রি কাটাইলেন। পরদিন আমি আর এরূপ স্থানে যাইব না বলিয়া তাঁহার কাছে কবুল জবাব দিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি আমাকে একদিন বলিলেন যে, ঐরূপ স্থানে আমি যাইতে অস্বীকৃত বলিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের একটি বন্ধুর বাসায় আড্ডা করিয়াছেন। আমাকে সেখানে যাইতে বড় অনুনয় করিলে আমি একদিন চন্দ্রকুমারের অনুমতি লইয়া চলিলাম। কারণ, সহবাসী মহাশয় ইতিমধ্যেই তাঁহার পাঠ্য-পুস্তক আমাকে বড় একটা ব্যবহার করিতে দিতেছিলেন না। সেই শৌণ্ডিকালয় হইতে এক বোতল মদ লইয়া, হাড়কাটার গলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এ আর এক দৃশ্য! একটি চক-মিলান একতালা বাড়ী। এখানে সেখানে স্ত্রীলোক দেখা যাইতেছে। ইহাদিগকে ত কলিকাতার খ্যাতনামা ঝি বলিয়া বোধ হইতেছে না। পুরুষ যাহা দেখা যাইতেছে, তাহারাও ত ছাত্র বলিয়া বোধ হইতেছে না। তাহার উপর কোনও কক্ষে সঙ্গীতের ধ্বনি বামাকণ্ঠ সহ শুনা যাইতেছে। কোনও কক্ষে রমণীর উচ্চ হাসি, কোনও কক্ষে সুরা-জড়িত কণ্ঠে রমণীর ও পুরুষের কদর্য্য রসিকতা শুনা যাইতেছে। আমি ভাবিলাম, এ কিরূপ ছাত্রনিবাস। কিন্তু ভাবিবার সময় বড় পাইলাম না। সহপাঠীদ্বয় আমাকে এক কক্ষে নিয়া দাখিল করিলেন। সেখানে অর্দ্ধ-বাঙ্গালী, অর্দ্ধ-উড়ে আকৃতির একটি ত্রয়োদশ, কি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া যুবতী। অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন রৌদ্রের ন্যায় আমার হৃদয়ে তখন

স্থানটি যে কি, সে সন্দেহ প্রবেশ করিল। হৃদয় বিষাদে ডুবিল। পাপের প্রথম সংস্পর্শে তাহাতে দারুণ ব্যথা সঞ্চারিত হইল। আমি যেন আমার হৃদয়ের প্রকম্পন শুনিতে পাইতেছিলাম। বুক যেন ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল। আমি কিছু খাইতে চাহিলাম না। তাঁহারা জোর করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ পান করাইলেন। আমি উঠিয়া যাইতে বারম্বার চেষ্টা করিলাম। তাঁহারা জোর করিয়া বসাইয়া রাখিলেন। তাঁহাদের ইঙ্গিতমতে রমণী আমার অঙ্কে আসিয়া বসিয়া আমার সঙ্গে রসিকতা করিতে আরম্ভ করিল। আমি যেন ঠিক ফাঁসিকাষ্ঠের মঞ্চে অবস্থিত। যে জিহ্বার চোটে লোক অস্থির হইত, আমার সেই জিহ্বা শিলাবৎ স্থির। মুখে কথাটি নাই। আমি ইচ্ছা করিয়াও কথা কহিতে পারিতেছি না। সহপাঠীরা আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা রমণীকে বলিলেন,—আমি একজন কবি, সুরসিক ও সুগায়ক। সে তাহা বিশ্বাস করিল এবং গান করিতে ও কথা কহিতে জিদ করিতে লাগিল। পানীয় ও আহার্য্য মুখের কাছে নিয়া সাধাসাধি করিতে লাগিল। অবশেষে আমি না গাইতেছি, না খাইতেছি, না কথা কহিতেছি দেখিয়া বিষম চটিল। আমার অঙ্ক হইতে উঠিয়া গিয়া, আমার উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। বলিল,—"ও ছি! তুমি এমন নবাবপুত্র আসিয়াছ যে, আমি মেয়েমানুষ এত সাধাসাধি করিলাম, তুমি একটা কথা পর্য্যন্ত কহিলে না।" বন্ধুদ্বয়ও তখন বিরক্ত হইয়া আমাকে লইয়া উঠিয়া আসিলেন, এবং পথে আমার অবস্থা দেখিয়া অনেক ঠাট্টা করিলেন। কিন্তু আমি কিছুই বড় বুঝিতেছিলাম না, বড় বলিতেছিলাম না। আমার হৃদয়ে যেন কি এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। আমি যেন কি এক জড় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। বাসায় পঁহুছিয়া চন্দ্রকুমারকে এ সংবাদ দিলাম। চন্দ্রকুমার মহা চটিলেন, এবং বলিলেন যে, তিনি আর আমাকে কখনও সেই সহবাসীর সঙ্গে যাইতে দিবেন না।

তাহার পর আমার পিতৃবিয়োগে ও ঘোরতর বিপদে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বি. এ. পরীক্ষা দিলাম, কিন্তু আমার পাশ হইবার আশা মাত্র নাই। তথাপি ফলের প্রতীক্ষায় শঙ্কিতহৃদয়ে দিন কাটাইতেছি। একদিন দ্বিপ্রহর সময়ে হঠাৎ কলেজ হইতে সেই সহপাঠী আসিয়া বলিলেন, আমরা তিনজনেই পাশ হইয়াছি, এবং তিনি ও চন্দ্রকুমার অতি উচ্চস্থান পাইয়াছেন। সেই দিন চট্টগ্রামের কি গৌরবের দিন। এমন দিন, শিক্ষা বিষয়ে এমন গৌরব, বুঝি জননীর আর হইবে না। আমার হৃদয়ের দাবাগ্নিতে যেন অমৃতধারা বর্ষিত হইল। গভীর নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এত দিন পরে একটি আলোকের রেখা দেখা দিল। ঝটিকার মধ্যে যেন ঈষৎ শান্তির চিহ্ন দেখা দিল; সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তি যেন একটি তৃণ পাইল। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর এই প্রথম আনন্দ অনুভব করিলাম। বাসা আনন্দ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। এ আনন্দের মধ্যে সেই সহপাঠী বলিলেন,—"এখন তোমার ত সকল বিপদ্ কাটিয়া গেল। আজ চল, একটু আমোদ করিয়া আসি।" এ আনন্দোৎসাহে আমি আত্মহারা হইয়া সম্মত হইলাম। চন্দ্রকুমারও বিপদবসন্ন হৃদয়ে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাইব বলিয়া বোধ হয় বড় আপত্তি করিলেন না। কেবল বলিলেন—"শীঘ্র ফিরিয়া আসিও।"

সহপাঠীর ইয়ারও পাশ হইয়াছিলেন। তিনি আসিয়াও জুটিলেন। আমি পূর্ব্ববর্ণিত স্থানে যাইতে অসম্মত হইলে, অন্য স্থানে লইয়া যাইতেছিলেন বলিয়া অন্য এক পথে আমাকে আবার সেই স্থানে লইয়া গেলেন। বেলা তখন প্রায় ২টা। দিবালোকে সেই নরক-পুরী আরও ঘৃণিত দেখাইতেছিল। একটা বারাণ্ডায় বসিয়া পান-কার্য্য আরম্ভ হইল। বন্ধুযুগল দুইটি জীবন্ত নন্দী ভৃঙ্গী। তাঁহাদের আকৃতি যাদৃশ, প্রকৃতিও তাদৃশ, রসিকতা ও সামাজিকতাও তস্যানুরূপ। মদিরায় দুইটি রমণী অধীরা হইয়া আমাকে বড় জ্বালাতন করিতে লাগিল। তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। লজ্জার কথা দূরে থাকুক,

তাহাদের বাহ্য জ্ঞানও ক্রমে তিরোহিত হইতে চলিল। আমি মহাবিপদে পড়িলাম। এ দিকে রমণী দুটির এ ভাব, অন্য দিকে তাঁহাদিগকে রমণীরা তুচ্ছ করিতেছে বলিয়া বন্ধুরা আমার উপর মদিরাপ্রভাবে হাড়ে হাড়ে চটিতে লাগিলেন। অর্দ্ধ-উড়েনীটি কাঁদিতে লাগিল, এবং তাহার কক্ষে তাহাকে রাখিয়া আসিতে বলিল। এই সমস্যার এটিই উত্তম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, আমি তাহাকে তাহার কক্ষে লইয়া গেলাম। সেখানে সে বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। আমি বাহিরে আসিয়া সহবাসীকে তাহার কাছে পাঠাইলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—'চল!' সে তখন বড় কাতর স্বরে আমাকে ডাকিতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি কক্ষদ্বার পর্যন্ত গিয়া দেখিলাম, সে নিতান্ত জঘন্য অবস্থায় শয্যায় গড়াগড়ি দিতেছে, এবং করুণ কাতর নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কি বলিতেছে। বেলা অপরাহ্ন। প্রখর রৌদ্রতাপ। তাহার উপর বিষাধিক নিকৃষ্ট মদিরা ও অতিরিক্ত পান। আমার বোধ হইল, তাহার সন্ন্যাস-রোগ হইবে। সেও কেবল আমার নাম করিয়া—"আমি মরিতেছি, মরিতেছি" করিতেছে। আমার ভয় হইল, বুঝি সে যথার্থই মরিতেছে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। ছুটিয়া তাহার কাছে গেলাম। সে ভয়ানক বমন করিতে আরম্ভ করিল। তাহার বিছানা ও কক্ষ নরক হইয়া গেল। কিন্তু আমার মনে ঘৃণার উদয় না হইয়া কি এক অপূর্ব্ব দয়া সঞ্চারিত হইল। আমি আত্মহারা হইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে বন্ধুযুগল আসিয়া বাহির হইতে আমাকে আবার বলিলেন,—"সন্ধ্যা হইতেছে, তুমি যাইবে না? চল।" আমি বলিলাম—"তোমরা মানুষ, না পশু! ইহাকে তোমরা এতদিন ভালবাসিয়া, এরূপ অবস্থায় ফেলিয়া কি প্রকারে চলিয়া যাইবে?" সহবাসী বলিলেন—"সকল জায়গায় তোমার দর্শনশাস্ত্র। আমরা চলিলাম।" তাঁহারা সত্য সত্যই অম্লানমুখে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। হতভাগিনী বারম্বার কাতরস্বরে বলিতে লাগিল—"তাহারা বুঝি চলিয়া গিয়াছে। তুমি কোন দেবতা। আমি মরিলাম।" আমি বারম্বার তাহাকে ঘুমাইতে বলিতে লাগিলাম, এবং বাতাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু কক্ষটি এমনি দুর্গন্ধযুক্ত 'গ্যাসে' পূর্ণ হইয়া উঠিল যে, আর বসিবার সাধ্য নাই। আমি দেখিয়াছিলাম, একটি অতি কুৎসিতা অর্দ্ধপ্রাচীনাকে অভাগিনী মা বলিয়া ডাকিত। আমি কক্ষে কক্ষে তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। বেলা তখন প্রায় ৫টা। কক্ষবাসিনীগণ তখন বেশভূষা করিয়া বসিয়া আছে। তাহারা আমার উপর অজস্র রসিকতা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেক অন্বেষণের পর একটি ক্ষুদ্র ময়লা কক্ষে সেই স্ত্রীলোককে পাইলাম। তাহাকে বলিলাম—"বাছা! হতভাগিনী মরিতেছে। তুমি একবার আইস।" সে যেন গুলির নেশায় ঝুঁকিতেছিল। এক বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিল—"যেমন দিনে বসিয়া মদ খাইয়াছে, তেমনি মরুক। আমি যাইব না। তাঁহার ইয়ার দুটি কোথায় গেল? তুমি কে? তোমাকে ত কখনও দেখি নাই।" শেষে অনেক অনুনয় করিলে সে আমার সঙ্গে অনিচ্ছাক্রমে কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া, তাহার ক্ষুদ্র খাঁদা নাসিকা অঞ্চলে আবৃত করিয়া সানুনাসিক স্বরে বলিল—"ও মা! আমি এই বমি ফেলিতে পারিব না। মরুক!" আমি বলিলাম—"বাছা! এ ত তোমার মেয়ে। তোমার মনে কি একটুক দয়াও হইতেছে না।" সে তখন আমার উপর মহা চটিয়া, বিকৃত ধ্বনি করিয়া বলিল—"আমার কিসের মেয়ে রে? ও মা! আমার আর মরিবার স্থান নাই যে, আমার এমন মেয়ে হইবে!" তখন সে গড়গড় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীখানির মত চলিয়া গেল। অভাগিনী আমাকে কাতরস্বরে বলিল—"তুমি কাহাকে কি বলিতেছ? সে কি আমার প্রকৃত মা? আমার কি মা আছে? আমার কি পৃথিবীতে কেহ আছে?" সে কাঁদিতেছিল। আমারও নীরবে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে আমার মুখের দিকে চাহিয়া—আমি সেই দৃষ্টি, সেই কণ্ঠ এখনও ভুলিতে পারি নাই, বলিল—"তুমি কি আমাকে ফেলিয়া যাইবে?" আমি

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিলাম—"না। তুমি নিদ্রা যাও, আমি বাতাস দিতেছি। তুমি যতক্ষণ ভাল না হইবে, আমি কাছে থাকিব।" সে তখন বারম্বার বলিতে লাগিল—"তুমি দেবতা। তুমি কোন জন্মে বুঝি আমার ভাই ছিলে।" আমি দেখিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহার শ্বাস প্রশ্বাস যেন অবরুদ্ধ হইতেছে। আমি বড় ভীত হইলাম। সেই পিশাচিনীর কাছে আবার গিয়া বলিলাম—"বাছা! তুমি ঘর পরিষ্কার করিও না। আমি তোমাকে একটি টাকা দিব, তুমি যদি তাহাকে কূয়ার কাছে নিয়া তাহার মাথায় ২।১ কলসী জল ঢালিয়া দেও। নচেৎ সে বাঁচিবে না।" সে আবার, আমি কেন ইহার জন্যে এরূপ করিতেছি, বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সম্মত হইল। সহবাসীর একটি টাকা আমার কাছে ছিল। সে টাকাটা আমি তাহাকে দিলাম। সে তখন অভাগিনীকে গালি দিতে দিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। কিন্তু বমন বিজড়িত হইয়া অভাগিনীর এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল যে এই প্রেতিনী পর্য্যন্ত তাহাকে পাতকূয়ার কাছে নিতে সম্মত হইল না। তখন আমি তাহাকে দু হাতে তুলিয়া লইয়া গেলাম। সে তখন সম্পূর্ণ অচেতন। অতি কষ্টে থাকিয়া থাকিয়া কিঞ্চিৎ নিশ্বাস ফেলিতেছে মাত্র। তাহার মাথায় জল ঢালিতে পিশাচিনীকে বলিলাম। সে বলিল সে পাতকূয়া হইতে জল তুলিয়া মরিতে যাইবে না। আমি বলিলাম—"তুমি তবে ইহাকে ধর।" সে ধরিল। আমি সেই পাতালপ্রদেশ হইতে জল তুলিয়া তাহার মাথায় ঢালিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, এই কার্য্যে আমি এই প্রথম ব্রতী। তথাপি কোথা হইতে আমার বাহুতে এই অপরিমিত বল আসিল বলিতে পারি না। আমি দ্রুতহস্তে কলসীর পর কলসী জল ঢালিতে লাগিলাম। সে তখন সম্পূর্ণরূপে অচেতন ও বিবসনা। কূয়াটি প্রাঙ্গণের মধ্য-স্থলে। চারিদিকের কক্ষবাসিনীগণ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল :

প্রথমা।—"এ ছেলেটি কে? ইহাকে ত কখনও দেখি নাই? এ কেন ইহার জন্যে এত করিতেছে?"

দ্বিতীয়া—"আহা! কেমন ভাল ছেলেটি! উপপতি হয় ত যেন এমন উপপতি হয়। এ না থাকিলে এ আজ নিশ্চয় মরিত।"

তৃতীয়া—"উপপতি! দেখিতেছিস না ইহার আকারে ব্যবহারে কি সেরূপ লোকের কোনও লক্ষণ আছে? এ ত মানুষ নহে, দেবতা। ইহাকে বাঁচাইবার জন্যে যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। ইহার সেই সোনার চাঁদ উপপতি দুজন অক্লেশে চলিয়া গিয়াছে। হায়! হায়! আমাদের এমনই দশা!"

প্রায় ২০।৩০ কলসী জল ঢালিলে সে চক্ষু মেলিয়া একবার চাহিল। একবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তখন আরও ক্ষিপ্রহস্তে কয়েক কলসী জল ঢালিয়া, তাহার বসনাগ্র দ্বারা তাহার গা মুছাইয়া দিয়া, আবার তুলিয়া লইয়া তাহার কক্ষে লইয়া গেলাম। সৎকার্য্যও সংক্রামক। আমার এরূপ ব্যবহার দেখিয়াই হউক, কি রজত-মুদ্রার মাহাত্ম্যেই হউক, পিশাচিনীর মন দ্রব হইল। সে বিছানার চাদরটি উঠাইয়া নিল, এবং অজস্র গালি দিতে দিতে কক্ষটি পরিষ্কার করিয়া দিল। এ সময়ে অভাগিনী আর একবার চক্ষু মেলিয়া, অতি কাতর ও পবিত্র ভাবে আমার দিকে চাহিয়া ভগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কি মরিব?" আমি বলিলাম—"না। তুমি এখন নিদ্রা যাও। তাহা হইলে বেশ সারিয়া উঠিবে।" তাহার দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। বলিল—"তুমি আমাকে বাঁচাইলে। তুমি কোন জন্মে আমার ভাই ছিলে। তুমি কি আমাকে ফেলিয়া যাইবে? তাহা হইলে আমি মরিব। আমাকে এমন করিয়া কে দেখিবে?" আমি বলিলাম—"আমি যে পর্য্যন্ত না দেখিব, তুমি বেশ ঘুমাইতেছ, আমি যাইব না। তোমার কোনও ভয় নাই। আমি বাতাস দিতেছি, তুমি ঘুমাও।" সে তখন নয়ন মুদ্রিত করিল। তাহার নিমীলিত নয়ন হইতেও কিছুক্ষণ অশ্রুধারা বহিল। সে নীরব কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয়ে কি আনন্দই উথলিতেছিল। আমি

নীরবে পার্শ্বে বসিয়া, সেই ক্ষুদ্র মুখখানি চাহিয়া চাহিয়া, এই হতভাগিনীদের হত-ভাগ্যের চিন্তা করিতেছিলাম। ভাবিতেছিলাম—"ভগবান্ মানুষের কপালে এরূপ দুঃখ লেখেন কেন? মানুষ এরূপ হতভাগিনীদেরে দয়া না করিয়া ঘৃণা করে কেন? ইহার কথায় বোধ হইতেছে, ইহার মাতাও এইরূপ হতভাগিনী ছিল। অতএব এই পাপ-পথ ইহার ললাট-লিপি। এরূপ অবস্থায় জন্মিয়া কে পুণ্যবতী হইতে পারে? এ পাপ-পথ ভিন্ন ইহার আর এ জগতে গত্যন্তর কি ছিল?" তখন রাত্রি ৮টা। দেখিলাম, সে বেশ শান্তভাবে সহজে নিদ্রা যাইতেছে। তখন সেই দাসীটিকে তাহার কাছে বসিতে বলিয়া, আমি নিঃশব্দপাদক্ষেপে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া, চারিদিকের কক্ষে আমার প্রশংসাধ্বনি শুনিতে শুনিতে বাসায় চলিলাম। সেই পাপ-গৃহে সেই সন্ধ্যাকালে এ কথা ভিন্ন যেন অন্য কোন কথা হইতেছিল না। মধ্যে মধ্যে ২।৪টি স্ত্রী পুরুষ আমাকে কক্ষ-দ্বারে আসিয়া নীরবে দেখিয়া গিয়াছিল। বাসায় সহবাসী মহাশয় গিয়া নাক ডাকিয়া নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি চন্দ্রকুমারকে বলিয়াছেন যে, তিনি আমার কোন খবর রাখেন না। আমি কোথায় চলিয়া গিয়াছি। চন্দ্রকুমার অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে এই পাপ-পুণ্যভরা উপাখ্যান আমি আদ্যোপান্ত বলিলাম। দেখিলাম, তাঁহারও চক্ষু ভিজিয়া উঠিল। তিনি নিদ্রিত সহবাসীর দিকে চাহিয়া অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। যদিও আমার প্রশংসা করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এরূপ লোকের সঙ্গে এরূপ স্থানে যাইতে নিষেধ করিলেন।

তাহার কিছুদিন পরে আমি বিপদ্‌সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটি লাভ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে বিদায় হইবার জন্য যাইতেছি, সেই সহবাসী বলিলেন, তিনিও আমার সঙ্গে যাইবেন। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হইতে চাহেন। আমার সঙ্গে ঠনঠনিয়া পর্য্যন্ত গিয়া বলিলেন—"তুমি টাকা আনিতে যাইতেছ। আজ আমি তোমার সঙ্গে যাইব না। তোমাকে একটি কথা বলিতে আসিয়া-ছিলাম। সেই 'আভাগী' একটিবার তোমাকে দেখিতে পাগলের মত হইয়াছে! কাল আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিয়া বলিয়াছে, আজ এক মিনিটের জন্যে হইলেও তোমাকে যেন একবার লইয়া যাই।" আমি বলিলাম—"সে ঘটনার পর তাহাকে একবার দেখিতে আমারও বড় ইচ্ছা। কিন্তু সময় কই? আজ রাত্রিতে আমাকে ষ্টীমারে উঠিতে হইবে।" তিনি বার বার কাতরতার সহিত জিদ করিয়া এক মিনিটের জন্যে হইলেও যাইতে বলিলেন। আমি বলিলাম, যদি চন্দ্রকুমার কোন আপত্তি না করে, তবে বাসায় ফিরিয়া আমি যাইব। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিলে চন্দ্রকুমার বলিলেন, হতভাগিনী আমার সঙ্গে এখন কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা তাঁহারও জানিবার জন্যে বড় কৌতূহল হইয়াছে। কিন্তু সেই রাত্রিতে জাহাজে উঠিতে হইবে; অতএব শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে বলিলেন।

যে পাপীকে দয়া না করিয়া ঘৃণা কর, আজ একবার আমার সঙ্গে চল। পাপের অন্ধকারে পুণ্যের কেমন উজ্জ্বল ছবি ফলিতে পারে, একবার দেখিয়া যাও। একবার দেখিয়া যাও, পাপী কেমন সহৃদয় হইতে পারে, পাষাণের মধ্যেও কেমন নির্ম্মল সরসী থাকে। একবার শিখিয়া যাও, পাপীর উদ্ধারের উপায় প্রেম,—ঘৃণা নহে। পাপীকে ঘৃণা করা পুণ্য নহে, প্রেম করাই পুণ্য। মানুষকে অনেক সময়ে পাপ-পথে লইয়া যায় স্বেচ্ছাচারিতায় নহে—অনিবার্য্য অবস্থায়। আমি অভাগিনীর কক্ষে প্রবেশ করিবা মাত্র সে আমার চরণে পড়িয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিল। তাহার আর সেই কদর্য্য ভাব নাই। সেই চঞ্চলতা নাই। তাহার মূর্ত্তিখানি এখন স্থিরা, ধীরা, শান্তভাবাপন্না। সে সলজ্জভাবে ভাগিনীটির মত আমাকে স্নেহভরে জড়াইয়া আমার কাছে বসিল। যাহার স্পর্শে আমার শরীর প্রথম দর্শনের দিনে অপবিত্রতায় রোমাঞ্চিত হইয়াছিল, আজ যেন পবিত্র হইল।

আমিও তাহাকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিলাম। সে ধীরে ধীরে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে আমাকে কত কৃতজ্ঞতার কথা বলিল। আজ সে আমাকে আর পান করিতে বলিতেছিল না। সে উৎকৃষ্ট জলখাবার আমার হাতে তুলিয়া দিতেছিল, কত আদরের সহিত খাইতে বলিতেছিল, আমি পরমানন্দে খাইতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কক্ষখানি তাহার সহবাসিনীগণের দ্বারা পূর্ণ হইল। তাহাদেরও আজ সে ভাব নাই। তাহারা আমাকে কত ভক্তি করিতে লাগিল, এবং আমার উচ্চপদ লাভে কত আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল, কত আশীর্ব্বাদ করিতেছিল। সকলে বলিল—তাহারা সেই দিনই বুঝিয়াছিল, আমি একটি সামান্য বালক নহি। একটি সামান্য বেশ্যার প্রতি কে এমন দয়া দেখাইয়া থাকে? আমি না থাকিলে হতভাগিনীর সেই দিন অপমৃত্যু ঘটিত। কেহ কেহ কৌতুক করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যা গা! তুমি না কি মানুষকে বেত মারিতে পারিবে, মেয়াদ দিতে পারিবে?" যে কক্ষ আমি একদিন নরকের একটি অংশ বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, আজ আমার চক্ষে তাহার কি পরিবর্ত্তনই বোধ হইতেছিল! আত্মপ্রসাদে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইল। আমি অর্দ্ধ-ঘণ্টা কাল এরূপ আনন্দ অনুভব করিয়া উঠিলে, অভাগিনী আমাকে সেরূপ ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া সকরুণ কাতর-কণ্ঠে বলিল—"আমার একটি ভিক্ষা। তুমি আমার প্রাণদান করিয়াছ। তুমি যখন কলিকাতায় আইস, দয়া করিয়া আমাকে একবার দেখা দিয়া যাইও। আমি দুঃখিনী পাপিনী, তোমাকে চিরদিন দেবতার মত পূজা করিব। তুমি কোন জন্মে আমার ভাই ছিলে।" সে কাঁদিতেছিল। আমি উচ্ছ্বাসে কাঁদিলাম, এবং প্রতিশ্রুত হইয়া চলিয়া আসিলাম। তাহার সহবাসিনীগণও সজল নয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছিল। আমি যাইতে যাইতে অনন্ত নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া অনন্তরূপী ভগবান্‌কে ভক্তিভরে ডাকিয়া বলিলাম—"দয়াময়! তুমিই এই অভাগিনীদের এ পাপ জীবন অপরি-হার্য্য করিয়াছ। ইহাদের অন্য জীবনোপায় আর নাই, সমাজে ইহাদের স্থান নাই। অতএব তুমি ইহাদিগকে দয়া করিও। মানুষের মনে ইহাদের প্রতি ঘৃণার পরিবর্ত্তে দয়ার সঞ্চার করিও। হে পতিতপাবন! তুমি জন্মান্তরে এ পতিতাদেরে উদ্ধার করিও।" এ ঘটনার কয়েক মাস পরে আমি কলিকাতায় আসিলে প্রতিশ্রুতিমতে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম, সে আর নাই। বুঝিলাম, পতিতপাবন আমার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন, এ পতিতাকে উদ্ধার করিয়াছেন। হরি! হরি! মানুষ যখন এ হতভাগিনীদের ঘৃণা করে, একবারও কি মনে ভাবে না—ইহাদের অবস্থায় পড়িয়া কয়জন পুণ্যপথে যাইতে পারিত? উচ্চ বংশে জন্মিয়া, ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে বিরাজিত থাকিয়া, এবং উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াও, কয়জন পুণ্যপথে যাইয়া থাকে? সমাজের পাপপুণ্য ও প্রেমনীতি কি রহস্যপূর্ণ! স্মরণ হয়, আমি ক্লিওপেট্রার মুখপত্রে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"ঐ তৃণটি সমুদ্রস্রোতের প্রতিকূলে যাইতে পারিতেছে না বলিয়া যদি পাপী না হয়, মানুষ অবস্থার খরস্রোতের প্রতিকূলে যাইতে না পারিলে পাপী হইবে কেন?" কই, এই দীর্ঘকাল পরেও ত তাহার কোন সদুত্তর পাইলাম না। তবে এতাদৃশ পাপীর একটি সান্ত্বনার কথা আছে; মানুষ কর্ম্ম দেখে, ভগবান্ অবস্থা দেখেন। সেইজন্যেই তিনি বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"—গীতা।

সমুদ্রের ঝড় (Cyclone)

"Mariners. All lost! To prayers, to prayers! all lost!"
Shakespeare

বাড়ী চলিলাম। প্রাতে ষ্টীমার খুলিল। আকাশ পরিষ্কার। মধ্যনিদাঘে যেমন পরিষ্কার থাকে, তেমন পরিষ্কার। হৃদয়াকাশও তদ্রূপ। পিতার শোকানলে সন্তপ্ত, কিন্তু পরিষ্কার। ঘোর ঝটিকার পর যেমন আকাশ পরিষ্কার নীল শান্ত শোভাময় হয়, হৃদয়াকাশও বিপদ্-ঝটিকার পর শান্ত শোভাময়। ঝুরু ঝুরু নবীন আশার দক্ষিণানিল বহিতেছে। অপরাহ্নে আকাশ কিঞ্চিৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। যত জাহাজ অগ্রসর হইতে লাগিল, যত ভাগীরথী বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, তত ঘনঘটা ঘোরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। নাবিক সাহেবদের মুখ গম্ভীর হইতে লাগিল। শুনিলাম, বায়ুমান যন্ত্রে "সাইক্লোন" বা ঘূর্ণ ঝটিকা দেখাইতেছে। ক্রমে অল্প অল্প ঝড় বহিতে লাগিল, ক্রমে সাহেবদিগের মুখ গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর ও চিন্তাকুল দেখা যাইতে লাগিল। আমরা অপরাহ্নশেষে গঙ্গাসাগরে পড়িয়াছি। সিন্ধু নৃত্য করিতেছেন, জাহাজখানি তৃণের মত নাচিতেছে। আমাদের মাথা তুলিবার সাধ্য নাই। বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে। চারিদিকে সমুদ্রগর্জ্জন, ঝটিকার ঝঙ্কার ও জাহাজে ঘোর উদ্গিরণের ঘোর নাদ ও হাহাকার। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ক্রমে পবনদেব বলবৃদ্ধি করিয়া, ঘোরতর 'সাইক্লোন'-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন প্রাকৃতিক মহানাটকের কি এক ভীষণ অঙ্কই অভিনীত হইতে লাগিল। গগনমণ্ডল, অর্ণবমণ্ডল ও অর্ণবযান অস্ত্রাভেদ্য অন্ধকারসমাচ্ছন্ন ও অলক্ষ্য। তখন প্রকৃতিদেবী মহাকালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঘোর নৃত্য করিতেছেন ও অট্ট অট্ট হাসিতেছেন। জাহাজের দীপাবলী প্রায় ভাঙ্গিয়া ও নিবিয়া গিয়াছে। দুই একটি আলোক যাহা আছে, তাহাতে অন্ধকারের গাঢ়ত্ব আরও বৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। রহিয়া রহিয়া বিপুল বেগে ঝটিকাতরঙ্গের পর ঝটিকাতরঙ্গ পর্ব্বতবৎ সমুদ্রতরঙ্গ ঠেলিয়া লইয়া আসিয়া, ভীষণ গর্জ্জন করিয়া, ক্ষুদ্র জাহাজে আঘাত করিতেছে। জাহাজ প্রত্যেক আঘাতে যেন চূর্ণ হইয়া পাতালে যাইতেছে। পর্ব্বতবৎ জলরাশি তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমাদের জিনিসপত্র ভাসিয়া যাইতেছে। যাত্রীরা জাহাজের দাঁড় ও কাণ্ঠ ইত্যাদি প্রাণভয়ে অবলম্বন করিয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাদের মুখে আর শব্দ নাই। জাহাজে যে মানুষ আছে, বোধ হইতেছে না, কেবল মধ্যে মধ্যে চট্টগ্রামের নির্ভীক খালাসিগণ উঠিয়া পড়িয়া ছুটাছুটি করিতেছে, এবং তাহাদের তীব্র বাঁশীর শব্দ ও হাহাকার থাকিয়া থাকিয়া ঝটিকাপৃষ্ঠে ভাসিয়া উঠিতেছে মাত্র। এরূপে ডুবিয়া ভাসিয়া দুঃখের দীর্ঘ রাত্রি অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় কাটিয়া গেল। প্রভাতে দেখিলাম—এঞ্জিন বন্ধ, জাহাজ চলিতেছে না। গঙ্গাসাগরগর্ভে লঙ্গরে ষ্টীমার একবার এ পাশ, একবার ও পাশ, উলট-পালট খাইতেছে। একবার ডুবিতেছে, একবার ভাসিতেছে। মুহূর্ত্তমাত্র মাথা তুলিয়া এ দৃশ্য দেখিয়া পড়িয়া গেলাম। প্রাতেও ঝড় সমানভাবে বহিতেছে। মধ্যাহ্নে এত বৃদ্ধি হইল যে, লঙ্গরের শৃঙ্খল ছিন্ন হইবার গতিক দেখিয়া, জাহাজ যেন ঝটিকাতে আরও মুক্তভাবে ভাসিতে পারে, সমুদায় শৃঙ্খল ছাড়িয়া দিয়া, স্বয়ং 'কমেণ্ডার' কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন —"We have done our best. To God we leave the rest. আমাদের যাহা করিবার করিলাম। অবশিষ্ট ঈশ্বরের হস্তে।" আমি যেখানে ডেকে মৃতবৎ পড়িয়া আছি, এই আশঙ্কার বাক্য আমার কর্ণে মৃত্যুর কণ্ঠধ্বনিস্বরূপ প্রবেশ করিল। বুঝিলাম, সকলি শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর বড় বিলম্ব নাই।

দুই দিন এরূপে কাটিয়া গেল। এবার বলিয়া নহে, এ ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্র জীবনে অনেক বার ধারণা হইয়াছে, আমার স্বর্গীয় পিতা আসিয়া আমাকে আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। থিওসফিষ্টেরা বলেন, আমাদের স্বর্গীয় আত্মীয়গণেরা সংসারের স্নেহসূত্রে আকৃষ্ট হইয়া বহুদিন যাবৎ পৃথিবীতে বিচরণ করেন, এবং তাহার পরও, তাঁহাদের পুণ্য-

প্রকৃতি হইলে, আপনাদের স্নেহাস্পদগণকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন, এবং পুণ্যপথে প্রণোদিত করেন। আমিও তাহা বিশ্বাস করি। প্রেম আত্মার ধর্ম্ম, শরীরের নহে। আত্মার অন্যান্য ধর্ম্মাপেক্ষা প্রেম শ্রেষ্ঠ ও প্রবল, এবং কার্য্যকরী। অতএব শরীরের সঙ্গে তাহার শেষ হইবে কেন? যত দিন আত্মা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ না করেন, ততদিন ত পার্থিব প্রেমে আকৃষ্ট হইবারই কথা। পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিলেও যাঁহারা পুণ্যবান্, তাঁহারা পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোকে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইয়োরোপ, কি আমেরিকা হইতে পুণ্যবানেরা তাঁহাদের কার্য্যাবলী ও গ্রন্থাদির দ্বারা জড়সূত্রে আমাদের হৃদয়ের উপর কার্য্য করিতেছেন দেখিতেছি, তখন ঐ সকল পুণ্যলোক হইতে, শ্রেষ্ঠতর জীবন লাভ করিয়া, আধ্যাত্মিক সূত্রে তাঁহারা আমাদের হৃদয় ও অদৃষ্টের উপর কার্য্য করিতে পারিবেন না কেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস,—তাঁহারা করেন। আত্মায় আত্মায় এই প্রেমসূত্র দৃঢ় রাখিবার জন্যে আমাদের স্বর্গীয় পুণ্যবান্ আত্মীয়দিগকে সর্ব্বদা প্রেম ও স্মরণ করা উচিত। অন্ততঃ বৎসরে যেন দুই এক বারও তাহা করা হয়, এ জন্যে শাস্ত্রকারেরা শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি, দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইয়া যাইতেছি, এমন সময়ে অশ্বের পদ স্খলিত হইয়া, কি রাস্তার অদৃশ্য গর্ত্তে পড়িয়া, অশ্বারোহী উভয়েই পড়িয়া গিয়াছি। একবার ঘোড়া অদম্য হইয়া এক উচ্চ গিরিপার্শ্বস্থ জঙ্গলের মধ্য দিয়া নক্ষত্র-বেগে উঠিয়া আমাকে পর্ব্বতের সানুদেশে ফেলিয়া দিয়াছিল। পড়িবার সময়ে আমার মনে হইয়াছিল, আমার সমস্ত অস্থি ও মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কিছুই আঘাত পাইলাম না। আমার তৎক্ষণাৎ মনে হইল, যেন আমার পিতা আসিয়া আমাকে অঙ্কে লইয়াছিলেন। অথচ সে দিন, কি তাহার বহু দিন পূর্ব্বেও আমি তাঁহাকে স্মরণ করি নাই। বিগত বিপদের সময়েও আমার পদে পদে এরূপ ধারণা হইয়াছিল, যেন প্রেমময় পিতা আসিয়া আমাকে করধৃত পুতুলের মত চালাইতেছেন। না হয় ঊনবিংশবর্ষবয়স্ক বালকের হৃদয়ে এতাদৃশ বিপদে এত সাহস, এত ভরসা কোথা হইতে আসিবে, এবং সেই অকূল সাগরের এরূপ আশাতীত সুখসৌভাগ্যপূর্ণ কূল সে কোথা হইতে পাইবে?

এবারও তাহা হইল। দুই দিন এরূপে কাটিয়া গেল। দুই দিন তুমুল ঘূর্ণ বাতাসে (Cyclone) জাহাজখানি তৃণবৎ ডুবিল ও ভাসিল। আমি 'ডেকে' পড়িয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ডুবিলাম, ভাসিলাম। গঙ্গাসাগরের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ দুই দিন মৃতবৎ দেহের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আহার নাই, নিদ্রা নাই। একরূপ অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছি। তৃতীয় দিবস মধ্যাহ্নে ও কি ললিত-ভৈরব কণ্ঠ কর্ণে প্রবেশ করিল? কণ্ঠ ইংরাজি ভাষায় ইংরেজের গভীর কণ্ঠে বলিতেছে—"তুমি কেন পড়িয়া আছ? উঠ!" আমি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলাম। আমারই মত একজন তরুণবয়স্ক গৌরাঙ্গ যুবক। মূর্ত্তিখানি বড় ভদ্র, মুখখানি সুন্দর ও প্রীতিমাখা। দেখিয়া হৃদয়ে যেন হঠাৎ কি একটা আনন্দ সঞ্চার হইল। আমি একটুক ঈষৎ হাসি হাসিয়া বলিলাম—"উঠিবার শক্তি থাকিলে ত উঠিব?" যুবা হাসিয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"আমার হাত ধরিয়া উঠ।" সে আমাকে টানিয়া তুলিয়া বসাইল। বলিল—"তোমার মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে। তুমি যে আধমরা হইয়াছ। তুমি কিছু খাইয়াছ কি?" উত্তর—"দুই দিন মাথা তুলিতে পারি নাই, খাইব কেমন করিয়া? খাইবই বা কি? যাহা কিছু খাবার আনিয়াছিলাম, তাহা বরুণদেব উদরস্থ করিয়াছেন।" সে বলিল—"Poor man! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে চল। কিছু খাও, তাহা হইলে সুস্থ হইবে।" সে আমাকে ধরিয়া দাঁড় করাইল, এবং ভাইটির মত জড়াইয়া ধরিয়া,—আমার সেই লবণাক্ত কদর্য্য মূর্ত্তি এবং সিক্ত বাস!—তাহার কক্ষে লইয়া গেল, এবং জোর করিয়া তাহার দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর বসাইয়া শুইতে বলিয়া চলিয়া গেল। তখন ঝড় অনেক থামিয়াছে। ডেকের উপর আর বড় জল উঠিতেছে না। কেবল চারিদিকে

বিশাল লহরীমালা বিকট নৃত্য করিতেছে এবং তরঙ্গাহত হইয়া অমল-ধবল ফেনরাশির মধ্যে জাহাজখানিও নাচিতেছে। আমি শুইলাম না। সতর্ক হইয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম, ক্ষুদ্র কক্ষটি কি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে। তাহাতে মূল্যবান্ কিছুই নাই। তথাপি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলি স্থানে স্থানে কেমন সুচারুরূপে রাখা হইয়াছে। বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতায় এবং গৃহশয্যায় পাশ্চাত্য জাতীয়েরা মন্ত্রসিদ্ধ। এই দুই বিষয়ে আমরা তাহাদের কাছে বাস্তবিকই অসভ্য। আমার মতে আমাদের বিদ্যালয়ে বালক-বালিকাদিগকে এই দুইটি শিক্ষা দেওয়া উচিত। অনেকে বলেন, তাহা অর্থসাপেক্ষ। আমি তাহা মানি না। আমাদের অবস্থাপন্ন একজন ইংরাজের আবাসস্থানটি দেখ, এবং আমাদের আবাসস্থান দেখ; দেখিবে —স্বর্গ ও নরক। আমি এরূপ ভাবিতেছি, এমন সময়ে একজন ভৃত্যের হস্তে আহার্য্য সহ যুবকটি ফিরিয়া আসিলেন। আমি খাইতে আরম্ভ করিলাম। কার্য্যটা অবশ্য কলুটোলার হিন্দুশাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছিল না। একে সমুদ্রযাত্রা, তাহাতে আবার উদর-যজ্ঞ! যুবক পার্শ্বে একটি বিচিত্র টুলে বসিয়া কত গল্পই করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে আরো ২।৪টি শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী আসিয়া জুটিলেন। সকলে আমাকে বড় যত্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের অভ্যর্থনা—"জল খাওয়া।" ইহাদের অভ্যর্থনা—বিশেষরূপ "জল পান।" অতএব তাঁহাদের কার্য্যটা অধিক ব্যাকরণসঙ্গত বলিতে হইবে। আমার পকেটে কিছু টাকা ছিল। আমি তাহার দ্বারা তাঁহাদের 'জলপানে'র ব্যবস্থা করিলাম। সুগোল বোতলবিহারিণী উগ্রা জলদেবী আবির্ভূতা হইলেন। আনন্দময়ীর আবির্ভাবে কক্ষটি দেখিতে দেখিতে আনন্দপূর্ণ হইল। কত গল্প, কত ঠাট্টা, কত হাসি! এমন সময়ে কক্ষের সম্মুখ দিয়া একটি শান্ত গম্ভীর গৌরাঙ্গমূর্ত্তি মুহূর্ত্তেক আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ম্মচারীরা বলিল—"কেপটেন।" কিছুক্ষণ পরেই তিনি আবার ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মনে যেন একটা কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই বালকটি কে?" কর্ম্মচারীরা সংক্ষেপে আমার বিপদাপন্ন অবস্থার কথা বলিলেন। তাঁহারা বলিতেছেন, আর কাপ্তান আমাকে স্থিরনেত্রে আপাদমস্তক দর্শন করিতেছেন। কথা শুনিয়া বলিলেন— "তোমরা ইহাকে কিছু খাইতে দিয়াছ?" তাঁহারা দিয়াছেন বলিলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এখন সুস্থ হইয়াছ?" আমি সেই কর্ম্মচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া বলিলাম—"ইনি একপ্রকার আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। আমি এখন বেশ সুস্থ হইয়াছি।" কাপ্তান বলিলেন—তবে তুমি আমার সঙ্গে আইস।" আমি ভাবিলাম—ব্যাপারখানা কি? সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। আমাকে একেবারে 'কোয়াটার ডেকে'র উপর লইয়া গেলেন। সেখানে প্রায় কেহ নাই। প্রথম শ্রেণীর 'কেবিন'-যাত্রীরা প্রায় সকলেই শয্যাশায়ী। দুই একজন একবার টলিতে টলিতে উপরে আসেন। মুখের ভঙ্গি বিকট। বিকট চীৎকার করিয়া উদ্গিরণ করেন, আর অমনি সমুদ্রের ও ঝড়ের প্রতি নানারূপ সাধু সম্ভাষণ করিয়া নীচে চলিয়া যান। ইঁহাদের আহারেরও বিরাম নাই, উদ্গিরণেরও বিরাম নাই। কাপ্তান আমাকে রেইল ধরিয়া দাঁড়াইতে, এবং খুব দূর সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিতে বলিলেন। কি দৃশ্য! তরঙ্গের পর তরঙ্গ,—উত্তাল, অনন্ত, দীর্ঘায়ত, ফেনিল,—ছুটিয়া ছুটিয়া কি ভীষণ নৃত্য ও গর্জ্জন করিতেছে। আকাশের এক প্রান্ত হইতে আসিয়া অন্য প্রান্তে গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। আঘাতে ও প্রতিঘাতে আকাশ পর্য্যন্ত যেন কম্পিত হইতেছে, তরঙ্গ-ভঙ্গের জলবাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হইতেছে। সমুদ্রের বক্ষে যেন অনন্ত চঞ্চল পর্ব্বতরাশি নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। কি সাধ্য স্থির হইয়া দাঁড়াইব! আমি বসিয়া পড়িলাম। সাহেব নীচে গিয়া এক গ্লাশ সরবত আনিলেন। বলিলেন—"খাও দেখি, তোমার আর গা বমি বমি করিবে না, মাথা ঘুরিবে না। আমি তোমাকে একটি Sailor boy করিব।" আমি খাইলাম। তিনি আমার কাছে বসিয়া আমার বৃত্তান্ত জানিতে চাহিলেন। আমি সংক্ষেপে কলিকাতায়

বিদ্যাভ্যাস, পিতার মৃত্যুতে বিপদ্, সেই বিপদ্ উদ্ধার, সকল কথা সংক্ষেপে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি একটি আশ্চর্য্য বালক!" তাহার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্ববিদ্যা-প্রদায়িনী ব্যবস্থার কৃপায় কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ জানি ও তাঁহাদের নাবিক যন্ত্রাদির ব্যবহার বুঝি দেখিয়া তিনি আরও বিস্মিত হইলেন। আমাকে বড়ই আদর করিতে লাগিলেন। তিলার্দ্ধ আমাকে ছাড়েন না। পূর্ব্বপরিচিত কর্ম্মচারীরা আড়চোখে চাহিয়া চলিয়া যান। আমার সঙ্গে একটি কথা কহিবারও ফাঁক পান না। কাপ্তান একখানি পাল গুটাইয়া আমার জন্যে তাঁহার কেবিনের সম্মুখে ডেকের মঞ্চের উপর এক বিচিত্র শিবির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এত আহার যোগাইতে লাগিলেন যে, আমার খাইয়া শেষ করা অসাধ্য হইল। কখন বা আমাকে ডাকিয়া কোয়ার্টার ডেকে, কখন বা তাঁহার কেবিনে, কখন বা তিনি নিজে আমার শিবিরের সম্মুখে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। এই আলাপে দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, কিছুই বাদ যাইত না। সাহেব একটু খ্রীষ্টান। কর্ম্মচারীরা সময়ে সময়ে দাঁড়াইয়া আমাদের আলাপ শুনিত, এবং তাহাদের কাছে যে ছেলেটি এত হাসি তামাসা করিতেছিল, সে গম্ভীর-ভাবে কাপ্তানের সঙ্গে এত উচ্চ বিষয়ে আলাপ করিতেছে শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইতেছিল। কাপ্তান অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমার শিবিরের দুয়ারে বসিয়া আমার সঙ্গে এরূপ গল্প করিয়া, আমাকে নিদ্রা যাইতে বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন ফাঁক পাইয়া আমার প্রথম পরিচিত বন্ধুটি আসিলেন। তিনি যখন একটু ফাঁক পাইতেন, তখনই আসিতেন। তাঁহার আলাপ, ব্যবহার, আকার ও চরিত্র অন্য কর্ম্মচারিগণ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি যেন তাহাদের অপেক্ষা উচ্চবংশজ ও শিক্ষিত। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি এ সকল বিষয় কোথায় শিখিলাম? রাত্রি বড় বেশি হইলে, আমার আর কিছু চাই কি না, বিশেষ-রূপে তত্ত্ব লইয়া তিনিও চলিয়া গেলেন। আমি পরম সুখে নিদ্রা গেলাম। ঝড় তখনও আছে, তখনও জাহাজ টলিতেছে ও এক আধটুক জল উঠিতেছে; কিন্তু আমার মঞ্চ পর্য্যন্ত নহে।

রাত্রি প্রভাত হইল। ঝড় আরও কমিয়াছে। জাহাজ এখনও লঙ্গরে আছে। তখন আকাশ একটু পরিষ্কার হওয়াতে দেখা গেল, আমাদের ষ্টীমারের মত আরও অনেক ষ্টীমার গঙ্গাসাগরে লঙ্গরে নাচিতেছে। এই একখানি তরঙ্গশীর্ষে আমাদের মাথার উপর উঠিল, আবার মুহূর্ত্ত পরে তরঙ্গ সরিয়া গেলে একেবারে যেন পাতালে পড়িয়া অদৃশ্য হইল। আবার আমরা তরঙ্গশীর্ষে তাহার মস্তকের উপর উঠিলাম। বেলা ৯টা পর্য্যন্ত এই অভিনয় হইল। তখন ঝড় প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। দুই একখানি জাহাজ ছাড়িল। আমি কাপ্তানকে বলিলাম—"আমাদের জাহাজ এখন ছাড় না কেন?" তিনি বলিলেন—"ঐ সকল জাহাজ তাঁহার কোম্পানির জাহাজ নহে। করিঙ্গা তাঁহাদের।" কিছুক্ষণ পরে 'করিঙ্গা'ও ছাড়িল। তখন সাহেব বলিলেন।—"তবে আমি না ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু 'করিঙ্গা' ভাল করে নাই। বায়ুযন্ত্রের ইঙ্গিত এখনও ভাল নহে। এখনও সম্মুখে 'সাইক্লোন' আছে।" তাঁহার কথা ঠিক হইল। আমাদের জাহাজ কিছু দূর মাত্র গিয়াছে। আমি কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়াইয়া। এমন সময়ে পরিচালকের উচ্চ স্থান হইতে কে গৌরাঙ্গের ঘর্ঘর কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল—"সাবধান! সাবধান!" কাপ্তান সে দিকে ছুটিলেন। একটি বিশাল পর্ব্বতাকার তরঙ্গ সম্মুখে আসিয়া, জাহাজকে বজ্রাহত করিয়া, আমাদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল। আমি একগাছি দড়ি ধরিয়াছিলাম। তথাপি তাহার উপর পড়িয়া মাথায় বিষম ব্যথা পাইলাম। জাহাজ জলাকীর্ণ। ডেকযাত্রীরা সমুদ্রে পড়িয়াছে মনে করিয়া ডেকে সাঁতার খেলিয়া বেড়াইতেছে। আমার প্রথম পরিচিত বন্ধুটি পেন্টলুন জানু পর্য্যন্ত গুটাইয়া, ছুটিয়া আসিয়া, আমাকে টানিয়া তুলিয়া বলিলেন—"মজা দেখ!" কিন্তু পরের মজা কি দেখিব, আপনার মজা লইয়াই অস্থির। তরঙ্গের পর ঐরূপ তরঙ্গ

আসিতেছে। প্রত্যেকটির আঘাতে আমার বোধ হইল, যেন ষ্টীমারখানি চূর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তরঙ্গ থামিল; সূর্য্যদেব দেখা দিলেন। ঝড় তিন দিন পরে আমাদের কাছে বিদায় হইয়া গেলেন। জল নামিয়া গেলে সন্তরণকারী যাত্রিগণ টিপ টিপ করিয়া ডেকে পড়িতে লাগিলেন। সাহেবটি হাসিয়া অস্থির। আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। একটি মুসলমান সদাগর আমাকে আসিয়া বলিল—"বাবু! আমি ৫০৲ টাকার একখানি নোট রুমালে বাঁধিয়া, মাথায় জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। রুমাল শুদ্ধ ভাসিয়া গিয়াছে।" সাহেব মহা হাসিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলাম —"কি করিবে ভাই! প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তাহার জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেও।" এমন সময়ে কাপ্তান আসিয়া বলিলেন—"কেমন, আমি বলিয়াছিলাম না, 'করিঙ্গা' ভুল করিয়াছিল। যাহা হউক, আমরা রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু 'করিঙ্গা' আমাদের অপেক্ষা ছোট জাহাজ। আমি তাহার চিহ্নও দেখিতেছি না। বোধ হয়, 'সাইক্লোনে' পড়িয়া পথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। আমরাও কিঞ্চিৎ সরিয়া পড়িয়াছি।" বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 'করিঙ্গা' এক প্রকার ভগ্ন (wreck) হইয়া গিয়াছিল।

এই দিন ও পরের দিন উপরোক্ত ভাবে সাহেবদের আদরে ও আলাপে আমার ক্ষুদ্র পাল-কুটীরে পরম সুখে কাটাইয়া, তৃতীয় দিবস চট্টগ্রামে পঁহুছিলাম। পরম আত্মীয়ের মত সাহেবদের কাছে বিদায় লইলাম। যে আত্মীয়গণ আমাকে জাহাজ হইতে নিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে, চট্টগ্রামে তারে ঝড়ের খবর আসিয়াছে। জাহাজের ৩ দিন বিলম্ব দেখিয়া সকলেই তাহার আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। দুঃখিনী মাতা তিন দিন যাবৎ নিরাহারে হাহাকার করিয়াছেন, এবং দিনের মধ্যে সহরে বারম্বার লোক পাঠাইয়াছেন। অদৃষ্টের বাতাস ফিরিয়াছে। যে সকল আত্মীয় ও বন্ধুগণ এ বিপদের সময়ে আমার খবরমাত্র লন নাই, আজ সকলে সশরীরে আমার অভ্যর্থনার জন্যে 'জেঠি'তে উপস্থিত! হায় রে সংসার!

পিতৃশ্মশান

"Deserted is my own good hall,
My hearth desolate;
Wild weeds are growing on the wall,
My dog howls at the gate."

দুই এক দিন সহরে রহিলাম। জগতের মানুষ মৌমাছিগুলাকে অন্ধকারে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু দুঃখের তামসী নিশি প্রভাত হইয়া সৌভাগ্যের সূর্য্য উদিত হইলে, তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তোমার গুণের গুণ গুণ ধ্বনিতে তোমার কাণ ঝালাপালা করিয়া তুলিবে। ইহারা কৃপাপাত্র। ইহার অপেক্ষা কৃপাপাত্র—যাহারা পরশ্রীকাতর, পরের দুঃখ দেখিলে যাহারা সুখী হয়, পরের সুখ দেখিলে দুঃখী হয়। ইহারা পিতার দানশীলতায় ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে মর্ম্মাহত হইত। তাঁহার পুত্র-পরিবারের দুর্গতিতে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিল। তাহাদের আনন্দ তাহারা চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। লোকের দুঃখ দেখিয়া প্রকাশ্যে সুখ প্রকাশ করিলে বড় নীচতা প্রতিপন্ন হয়, তাই তাহারা একটুক দুঃখ প্রকাশ করিয়া, অমনি আবার বলিত—"কিন্তু এরূপ না হইবে কেন? যেমন কর্ম্ম, তেমন ফল। তিনি এত অর্থ উপার্জ্জন করিলেন। কেবল দান,

কেবল বাবুগিরি, কেবল বাহাদুরি। আর এখন পরিবারবর্গ অকূল সাগরে ভাসিতেছে। ভিটায় দূর্ব্বাটি পর্য্যন্ত নাই। আর অমুকে (সেই অমুকের মধ্যে বক্তা নিজেও একজন) —দেখ দেখি, অল্প অর্থ উপার্জ্জন করিয়া কেমন সুন্দর সম্পত্তি করিয়াছে!" আজ ইহাদের দুঃখ দেখে কে? আমাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া যাইতে লাগিল। আমি অভিবাদন করিলেও একটা কষ্টের হাসি হাসিয়া, একটুক সদাচার দেখাইয়া, বেগে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইহারা প্রায়ই আমার পিতার সেই নিন্দনীয় দান ও পরহিতৈষিতার দ্বারা উপকৃত ব্যক্তি, শত্রু নহে। পিতার শত্রু কেহই ছিল না। তিনি কখনও জ্ঞাতসারে কাহারো অনিষ্ট করিয়াছিলেন না। ইহারা নিজে তাঁহার হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিত। তবে এরূপ কৃপাপাত্রের সংখ্যা জগতে অল্প, ইহাই এক সান্ত্বনা। অধিকাংশ লোক বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিল। পিতার মৃত্যু বিরাট্ বোমের শব্দের মত দেশে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সকলে বুঝিয়াছিল, এই তাঁহার পরিবারবর্গের ভাগ্য শতধা বিদীর্ণ করিয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাহারা স্বপ্নেও মনে করে নাই যে, এ পরিবার আবার মাথা তুলিতে পারিবে। অতএব আজ আমি একটা উচ্চ রাজপদে অভিষিক্ত শুনিয়া তাহারা প্রথম বিস্মিত, পরে আনন্দিত হইল। আর যাঁহারা আমার পিতার প্রকৃত বন্ধু ছিলেন, তাঁহাদের শোকপূর্ণ আনন্দ অবর্ণনীয়, অপার্থিব। একটা দৃষ্টান্ত দিব।

*গোলোক পেস্কারকে পিতা আপনার পেস্কারি পদে নিয়োজিত করাইয়াছিলেন. এবং পরে তিনি চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে উকিল করিয়াছিলেন। গোলোক পেস্কার পিতাকে আপনার পিতা, গুরু ও দেবতার মত পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃতই পিতার পুত্র, শিষ্য এবং চরিত্রের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি ছিলেন। তাঁহার মত সরল, অমায়িক, দয়াশীল, পরোপকারক, কোমলহৃদয় ব্যক্তি আমি পিতার পর আর দেখি নাই। লোকে তাঁহাকে মাটির মানুষ বলিত। এখানেই কেবল পিতা পুত্রে ও গুরু শিষ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল। পিতা তেজস্বী ও তীব্র অভিমানী। গোলোক পেস্কার প্রকৃতই মাটির মানুষ, অভিমান-হীন। তাহার একটি কারণও ছিল। তিনি কায়স্থ; উচ্চবংশীয়ও নহেন। তথাপি তাঁহাকে নমস্কার করিতে পিতা আমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন। আমি নিজেও তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতাম। পিতৃবন্ধুর মধ্যে এমন আর কাহাকেও করিতাম না। আমি মস্তক নত করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলে, তিনি একেবারে মাটিতে পড়িয়া আমার নমস্কার লইতেন। কত আশীর্ব্বাদ করিতেন, কত স্নেহের কথা বলিতেন। কায়স্থকে নমস্কার করিতেছি দেখিয়া পাছে লোকে কিছু মনে করে, তিনি অমনি বলিতেন—"বাবু! আমিও গোপী বাবুর পুত্র। আমি তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর।" বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইত। পিতা উপস্থিত থাকিলে ছলছল চক্ষুতে ঈষৎ হাসিতেন।

আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি তখন পূজায়। বলিয়াছি, তিনি পিতার শিষ্য। পিতার মত সমস্ত দিন রাত্রি প্রায় পূজায় কাটাইতেন। এই একই কারণে দুইজনের প্রথম শ্রেণীর ওকালতি ব্যবসা নষ্ট হইয়াছিল। উকিল মহাশয়দের ঈশ্বর রজতমুদ্রা, পুষ্প চন্দন ধূর্ত্ততা ও মিথ্যা কথা, বলি মক্কেল। তাহা না হইলে ওকালতিতে সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তান্ত্রিকের পূজার স্থানে কেহ যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ডাকিলেন। পরিধানে পট্টবস্ত্র, গায়ে নামাবলী, কণ্ঠে প্রকোষ্ঠে বাহুতে রুদ্রাক্ষমালা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, হস্তে গোমুখী, জীবন্ত শিবমূর্ত্তি। আমাকে দেখিবা-মাত্র তিনি উচ্চৈঃস্বরে স্ত্রীলোকের মত রোদন করিতে লাগিলেন। আমি প্রণত অবস্থায় থাকিতেই আমাকে সজোরে টানিয়া তাঁহার বুকে নিলেন। আমি সেই স্বর্গপ্রতিম বক্ষে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তাঁহার অশ্রুজলে আমার মস্তক ভিজিতে লাগিল। দুইজনে অনাথ পিতৃহীন শিশুর মত কাঁদিলাম। পিতৃবিয়োগের পর আমার এই প্রথম প্রাণ

ভরিয়া রোদন। সেই রোদনে কি শোক, সেই শোকে কি স্বর্গ, সেই স্বর্গে কি শান্তি! তিনি একটি মাত্র কথা বলিলেন—"আজ তোমার পিতা, আমার পিতা কোথায়? আজ আমার গোপী বাবু কোথায়?" শোক কিঞ্চিৎ উপশম হইলে বলিলেন—"তোমার পিতার অনন্ত অব্যর্থ পুণ্য। আমি জানিতাম, তোমরা কখনও দুঃখ পাইবে না। আজ সেই পুণ্যফলের এই গৌরব কাহাকে দেখাইব? তিনি যে বড় সুখের সময়ে চলিয়া গিয়াছেন! তোমার এ গৌরব যদি একদিনের জন্যও দেখিয়া যাইতেন!" আবার দর দর বেগে তাঁহার অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। তিনি পুষ্পপাত্র হইতে একটি ফুল তুলিয়া লইয়া গদগদকণ্ঠে বলিলেন —"আমি মায়ের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি আমার গোপী বাবুর পুণ্যে তোমাকে দীর্ঘজীবী করিবেন। তুমি তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিবে।" ফুলটি আমার মাথায় দিলেন। আমার সর্ব্বশরীরে যেন কি অপূর্ব্ব পবিত্রতা সঞ্চারিত হইল। হায় মা বঙ্গভূমি! এ সকল দেবচরিত্র তোমার কোন্ পাপে তোমার বক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইল! তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া দেখিলাম, তাঁহার বাসাস্থ কাহারও চক্ষু শুষ্ক নাই। তাহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পথ আসিল। সকলেরই মুখে এক কথা—"আজ আমাদের গোপী বাবু কোথায়?" পথ দিয়া চলিয়া যাইতেও অনেকে বলিতেছিল—"আজ আমাদের গোপী বাবু কোথায়?" কেহ কেহ বুকে লইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল—"আজ আমাদের গোপী বাবু কোথায়?"

সহরে একদিন মাত্র থাকিয়া বাড়ী গেলাম। অপরাহ্ন সময়ে বাড়ী পঁহুছিলাম। বাড়ী,—না মহাশ্মশান? নৌকায় উঠিয়া অবধি আমার হৃদয়ে মেঘ সঞ্চার হইয়া কালবৈশাখীর মত ক্রমে ঘনীভূত হইতেছিল। দূর হইতে বাড়ীর শ্রীহীন ভাব দেখিয়া ঝড়বৃষ্টি বাড়িতে লাগিল। বাড়ীতে যেন জনমানব কেহই নাই। কোনও ঘর ইতিমধ্যেই হেলিয়াছে, কোনওখান বা পড়িয়া গিয়াছে। বাড়ীখানি যেন নীরবে দীনহীন ভাবে রোদন করিতেছে। কি এক মর্ম্মস্পর্শী নিরাশ্রয়তা প্রকাশ করিতেছে। বাড়ীর পশ্চাতের খালে নৌকা লাগিয়াছে। নৌকায় বুক রাখিয়া বড় কাঁদিলাম। এরূপে হৃদয়ের কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, বুকে পাথরের ধৈর্য্যে চাপা দিয়া, সেই শ্মশানে প্রবেশ করিলাম। শ্মশানে ভস্ম মাত্র থাকে, এরূপ জীবন্ত ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি থাকে না। নৌকা হইতে উঠিলেই ছোট ভাই ও ভগ্নীরা আসিয়া চারি দিকে ঘেরিয়া, কেহ বা কোলে উঠিয়া, অমনি তাহাদের সেই সরল আধ আধ ভাষায় পিতার মৃত্যুদৃশ্য চিত্র করিতে লাগিল। আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু পাথরে চাপা। আর দু চার পা অগ্রসর হইলে বিবাহযোগ্যা ভগিনী তারা আসিয়া পাগলিনীর মত গলায় পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। এ সময় রোদন অমঙ্গল বলিয়া, তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া, নীরবে রোরুদ্যমানা পিতৃব্যপত্নী,—আমি তাঁহাকে 'যাদু' বলি,—তাহাকে সরাইয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার পশ্চাতে কে? আমার অভাগিনী মাতা। এই ৮।৯ মাসে তাঁহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেবীমূর্ত্তিতে এরূপ রূপান্তর ঘটিয়াছে, আমি পুত্রের সাধ্য নাই যে, তাঁহাকে চিনিব। কে বলে ভারতবর্ষ হইতে সতীদাহ উঠিয়া গিয়াছে? পুণ্যভূমি ভারতভূমি হইতে তাহা কে উঠাইতে পারে? হিন্দুস্থান সতীস্থান। সতীদাহ যেদিন উঠিয়া যাইবে, সেদিন হিন্দুস্থান আর হিন্দুস্থান থাকিবে না। আমি মাতাকে দেখিয়াই বুঝিলাম, মাতাও পিতৃশ্মশানে ভস্মীভূতা হইয়াছেন। আমি হতভাগ্য পুত্রের মুখ দেখিবার জন্যই যেন মাতার কেবল ছায়াটা মাত্র আছে। পিতাকে ত হারাইয়াছি; বুঝিলাম,—দেখিয়াই বুঝিলাম,—মাতার এ ছায়াও আর অধিক দিন এ শ্মশানে বিরাজ করিবে না। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ ছায়া ৬ মাসের মধ্যেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। সকলেই নীরবে, কি গলা ছাড়িয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতেছিলেন না কেবল—মাতা। সকলেই শোকের, কি সান্ত্বনার কথা কহিতেছিল। কথা কহিতেছিলেন না কেবল—মাতা। তাঁহার

চক্ষু কোটরস্থ, নিস্তেজ, শুষ্ক। তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠ নীরব। তাঁহার হৃদয়ে যে শোক, সে শোকের আজ যে পূর্ণাবস্থা। তাহার অশ্রু নাই, উচ্ছ্বাস নাই, ভাষা নাই। নদীতে যতক্ষণ জোয়ার অপূর্ণ থাকে, ততক্ষণ তাহার স্রোত থাকে, স্রোতে বেগ থাকে, কল্লোল থাকে। জোয়ার পূর্ণ হইলে তাহার কিছুই থাকে না। নদী তখন স্থির, ধীর, গভীর। মাতার শোক-স্রোতস্বতীর অবস্থাও আজ সেইরূপ। মাতার চরণাম্বুজে প্রণত হইয়া অশ্রুজলে চরণ সিক্ত করিলে, মাতা আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, মাথায় আশীর্ব্বাদ দিয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, বুকে লইয়া কেবল একটি কথা ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"আজ তিনি কোথায়?" আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলাম। এবার মাতাও কাঁদিলেন। 'যাদু' তাঁহাকে অমঙ্গল করিতেছেন বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া, আমাকে সরাইয়া নিলেন। সকলে কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া কাঁদিলাম। দেখিতে দেখিতে পিতৃব্যগণ, পিতৃব্য-পত্নীগণ, পুরোহিতগণ ও প্রজাগণ আসিতে লাগিল। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইল। সকলে আমাকে ও মাতাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। এরূপে এ শ্মশানে আমার দিন কাটিতে লাগিল। অপরাহ্নে পিতৃদেবের নদীতীরস্থ শ্মশানে গিয়া বহুক্ষণ বসিয়া থাকিতাম, প্রাণ ভরিয়া, হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতাম। তাহাতে মনে বড় শান্তি পাইতাম। সেখানে বসিয়া ভাবিতাম—

"তরল না হতো যদি নয়নের নীর,
ছুঁইত আকাশ তব সমাধিমন্দির।" —পিতৃহীন যুবক।

বলিয়াছি, পিতা এক পাপিষ্ঠের নিকট কিছু টাকা ঋণ করেন। সুদে আসলে তাহার দ্বিগুণ, কি ত্রিগুণ উশুল করিয়া, বাকি টাকার জন্য সে পিতার চিতানল না নিবিতেই আমার সমস্ত সম্পত্তি, ভদ্রাসন বাটী সহ, সামান্য মূল্যে বিক্রয় করায়। মূল্য কম হইবার কারণ, পিতার জমিদারির অংশ সেই ধৃতরাষ্ট্র প্রমুখ পিতৃব্যদের কাছে বন্ধক ছিল। অন্য এক পিতৃব্য সেই বন্ধক সহ সম্যক্ সম্পত্তি ক্রয় করেন। মাতার নিজের ও তাঁহার পুত্রবধূর অলঙ্কারাদি পিতৃব্যগণ বন্ধক লইয়া সে মূল্যের এক অংশ দিয়াছিলেন। এখন পিতৃব্যগণ মাতাকে বুঝাইলেন, এমন অমূল্য সম্পত্তি ভূভারতে মিলিবে না ; অতএব ভগ্নীর বিবাহের জন্য আমি যে ২০০৲ টাকা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়াছিলাম, তাহা উক্ত পিতৃব্যদেরে দিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে একটা বায়নানামা করা উচিত। আমি দেখিলাম, বায়নার মেয়াদ ৬ মাসের মধ্যে সমস্ত টাকা দিয়া এ সম্পত্তি উদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অতএব অলঙ্কারগুলির মত এই ২০০৲ টাকাও এ কৌশলে হারাইব। কিন্তু সরলা মাতাকে সে কৌশল বুঝান অসাধ্য। আমি বুঝিলাম, এই ২০০৲ টাকা দিয়া বায়নানামা না করিলে মাতা বাঁচিবেন না। একদিকে ২০০৲ টাকা, অন্য দিকে মাতা। কাজেই আমি বায়নানামা করিলাম। ইহজীবনের মত মাতার হৃদয়ে যেন একটুক শান্তি, মুখে একটুক আশার হাসি দেখিলাম। তাহার প্রতিযোগিতা কোনও অর্থে করিতে পারে না। আমিও সেই শান্তি, মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার মত মাতার সেই হাসি দেখিয়া অপেক্ষাকৃত শান্ত হৃদয়ে কলিকাতায় ফিরিলাম। আর আমার মাতাকে, আমার সেই সরলা স্নেহময়ী মাতাকে দেখিলাম না। আর কি দেখিব না? দেখিব—পিতা মাতা উভয়কে দেখিব। সেই এক আশায় ভর করিয়াই ত এই জীবনপথ বাহিয়া চলিয়াছি। মিলন নিকট।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত

আমার জীবন

দ্বিতীয় ভাগ

যশোহর

কর্ম্মে দীক্ষা

কলিকাতায় পঁহুছিয়া, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার সেই চ্যাপম্যান সাহেবের কাছে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার পারিবারিক অবস্থা সকল বড় প্রীতিপূর্ণভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া, শেষে বলিলেন—"তুমি বোধ হয় জানিয়াছ যে, তুমি যশোহরে নিয়োজিত হইয়াছ।" আমি বলিলাম, ইতিমধ্যে ঐরূপ গেজেট হইয়াছে দেখিয়াছি। বাটীতে একজন আত্মীয় গেজেট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন—"তুমি যশোহরের মাজিস্ট্রেট মনরো সাহেবকে চেন?" মনরো সাহেব যশোহরের মাজিস্ট্রেট, এ সংবাদ শুনিয়াই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেন, তাহা বলিতেছি।

আমি যখন চট্টগ্রাম স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছি, তখন মনরো সাহেব চট্টগ্রামের জইন্ট মাজিস্ট্রেট। তিনি দেখিতে বেশ সুপুরুষ, তবে এক পা খোঁড়া। কিন্তু তাহা হইলে কি? তাঁহার বিক্রমে চট্টগ্রাম কম্পিত। তিনি এক খণ্ড দাবানলবিশেষ। তাঁহার হাতে যে একবার পড়িতেছে, সে দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, সে ধনী হউক, দরিদ্র হউক, তাহার আর নিস্তার নাই। যে প্রকারে হউক, একবার তাঁহার মনে ধারণা হইলেই হইল যে, এ লোকটি দুষ্ট লোক, তাহার আর নিষ্কৃতি নাই। সে তাঁহার কোপানলে সর্ব্বস্বান্ত হইবে। আমার পিতার পূর্ব্বোক্ত মাতুলভ্রাতা কাশীবাবু চট্টগ্রাম সহর হইতে প্রায় তিন দিনের ব্যবধানে এক জমিদারি কিনিয়াছিলেন। তাহাতে এক দুরন্ত তালুকদার ছিল। কাশীবাবু যেমন জিদি, সেও তেমনি। কাশীবাবু যেমন মুগুর, সেও তেমনি কুকুর। কাশীবাবু ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, তাহার ভিটায় পুকুর কাটিয়া তুলসী রোপণ করিবেন, না হয় তাঁহার নাম কাশীচন্দ্র নহে। সেও প্রতিজ্ঞা করিল, কাশীবাবুকে ফকির করিবে, না হয় তাহার নাম মতিয় রহমান নহে। সেই রাজস্থানের গল্প—"তোমার নাম যদি জয় সিংহ, আমার নামও অভয় সিংহ।" পরিণামও একইরূপ হইল। সেই 'যার্থার' ক্ষেত্রে দুইটি রাজ্য ধ্বংসশেষ হইয়াছিল। ইহাতেও দেশের দুইটি হিন্দু মুসলমানের প্রধান ঘর ধ্বংসশেষ হইল। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রত্যহ হাঙ্গামা, প্রত্যহ খুন। মনরো সাহেবের ধারণা হইল যে, কাশীবাবুই অত্যাচারী, তাঁহাকে যেমন করিয়া হউক, জব্দ করিতে হইবে। অতএব সত্য হউক, মিথ্যা হউক, দোষী হউক, নির্দ্দোষী হউক, প্রমাণ থাকুক আর নাই থাকুক, তিনি কাশীবাবুর পক্ষের লোক আসামী পাইলেই শেসনে প্রেরণ করিতে এবং শাস্তি দিতে লাগিলেন। শেসন জজ মিঃ সেণ্ডিস (Sandys) একজন বিচক্ষণ বিচারক। তিনি সমস্ত মোকদ্দমা খালাস দিতে লাগিলেন। মনরো সাহেব ক্রোধে অধীর হইলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সেণ্ডিস সাহেব পিতার করধৃত পুতুল মাত্র, এইজন্যই তাঁহার সমস্ত হুকুম রহিত হইতেছে। তিনি এক মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে পিতাকে সাক্ষীর সমন দিলেন। পিতা জজকে বলিলেন যে, তিনি সমস্ত দিন জজের সমক্ষে উপস্থিত থাকেন—পিতা তখন সেরেস্তাদার—কোথায় তিন দিবসের পথে কি ঘটনা হইতেছে, তিনি তাহার কি জানেন! মনরো সাহেব কেবল তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য সমন দিয়াছেন। জজ সমন ফিরাইয়া দিলেন। মনরো বড় অপ্রতিভ হইলেন। কিছুদিন পরে সেণ্ডিস সাহেব স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থানে র‍্যাডক্লিফ (Radcliffe) জজ হইয়া আসিলেন। র‍্যাডক্লিফের শরীরখানি যেমন স্থূল, বুদ্ধিটাও

তেমন স্থূল ছিল। কিন্তু লোক বড় ভাল। পিতা তখন জজ আদালতের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনিই প্রকৃত জজ। মনরো সাহেব সুযোগ বুঝিয়া আবার পিতার নামে আর এক সমন পাঠাইলেন। তখনও কাশীবাবুর যুদ্ধ চলিতেছিল। স্মরণ হয়, উহা ১০ বৎসরকাল চলিয়াছিল। কাশীবাবু অবশেষে জয়ী হন, এবং মতিয় রহমানের ভিটায় সত্য সত্যই এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহাতে তুলসী রোপণ করিলেন। এরূপে তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালন হইলে আবার সেই জমিদারি সেই ব্যক্তিকেই তালুকি বন্দোবস্ত দিলেন। কিন্তু তখন আর তাঁহার মাথা তুলিবার সাধ্য ছিল না। তিনি এরূপ ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনিও সর্ব্বস্ব হারাইলেন। সামান্য একটু জিদের জন্য দুটি ঘর ঐরূপে ধ্বংস হইল—কি শিক্ষার স্থল! পিতা অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কাশীবাবুর অভিমান-বহ্নি নিবাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, এবারও পিতা পূর্ব্ববৎ সকল কথা জজকে জানাইলেন। জজ সেদিন কিছু না বলিয়া, পরদিন আসিয়া পিতাকে বলিলেন—"মনরোর সঙ্গে আমার কথা হইয়াছে। তিনি তোমাকে কোনওরূপ অপমান করিতে ডাকেন নাই। তিনি তোমার অনেক সুখ্যাতির ও প্রভুত্বের কথা শুনিয়াছেন, তোমাকে একবার দেখিতে চাহেন।" পিতা বলিলেন—"আমি একজন আপনার অধীনস্থ কর্ম্মচারী মাত্র। আমার আবার সুখ্যাতিই বা কি, প্রভুত্বই বা কি?" জজ তখন উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন—তাঁহার হাস্যে পাহাড় সহিত সেই প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহ কম্পিত হইত—"না না বাবু! তুমি একজন বড় যোগ্য লোক। তুমি যাও। আমি দায়ী রহিলাম, মনরো তোমার খুব সম্মান করিবেন। আমি এক পত্রও দিতেছি। তুমি এবারও না গেলে তাঁহার বড় অপমান হয়।" পিতা আর কি করেন। তখন তাঁহার সেই সুন্দর "আনজানে"—চেয়ারের মত শিবিকা আরোহণ করিয়া, ফৌজদারী কাচারিতে গিয়া জজের পত্র পাঠাইয়া দিলেন। মনরো সাহেব এজলাস হইতে উঠিয়া, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া, একেবারে এজলাসে চেয়ার দিয়া, তাঁহার কাছে বসাইলেন। কাচারি লোকে লোকারণ্য। ইতিমধ্যেই সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে যে, মনরো সাহেব পিতাকে সমন দিয়া লইয়া গিয়াছেন, না জানি কি অপমান করেন! স্বয়ং কাশীবাবু ও দেশের প্রথমস্থানীয় বহুতর লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে টাকা ও লোক লইয়া ছুটিয়া গিয়াছেন, সাহেব পিতার কোনওরূপ অপমান করিলে একটা তুমুল কাণ্ড করিবেন। কিন্তু সাহেবের ব্যবহার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। কাচারি হইতে লোক সরাইয়া দিয়া সাহেব পিতাকে বলিলেন—"আমি জানি, আপনি একজন এই দেশের সর্ব্বপ্রধান জমিদারবংশের ও উচ্চবংশের লোক, আপনার অসাধারণ প্রভুত্ব, জজ মাত্রই আপনার হাতের পুতুল। আমি আপনার জীবনী শুনিতে চাই।" পিতা তাঁহার শেষ দুই কথার বিনীত ভাবে প্রতিবাদ করিয়া নীরব রহিলেন। শেষে সাহেব বার বার জিদ করাতে তিনি সংক্ষেপে তাঁহার চাকরির ইতিহাস বলিলেন। তাহা শুনিয়া, পিতার সেই দীর্ঘ, গৌর, তেজোময় ও মহিমাময় মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার আলাপ শুনিয়া সাহেব এতদূর মোহিত হইলেন যে, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল তিনি স্থান, কাল, কার্য্য ও পদগৌরব ভুলিয়া, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া, অতি সম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। পিতা চলিয়া গেলে তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন—"আমি ইঁহার কথা যেরূপ শুনিয়াছিলাম, সেরূপই দেখিলাম। আমি এমন যোগ্য লোক দেখি নাই।" সহর তোলপাড়। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিতে পথে পথে এ গল্প শুনিতে লাগিলাম। একেবারে জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। অর্দ্ধপথে পিতৃব্য কাশীবাবুকে বহুলোক-বেষ্টিত হইয়া কয়েকটা টাকার তোড়া শুদ্ধ আনিতে দেখিলাম। তাঁহার আর আনন্দে মাটিতে পা পড়িতেছে না। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"বাবু! তুমি শুনিয়াছ, আজ বড়দাদা মহাশয় দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছেন।"

আমি চ্যাপম্যান সাহেবের কাছে সংক্ষেপে উপরোক্ত উপাখ্যান বিবৃত করিয়া বলিলাম —"আমার ভয় হইতেছে, পাছে মনরো সাহেবের ক্রোধ উত্তরাধিকারীসূত্রে আমার উপর আসিয়া পড়ে।" চ্যাপম্যান উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষ। আচ্ছা, আমি তাঁহার নিকট এক পত্র দিতেছি। তোমার ভয় নাই।" তিনি সেই পত্র দিয়া ও আমাকে কার্য্য সম্বন্ধে বহু উপদেশ দিয়া, সস্নেহ বিদায় দিলেন। আমি তাঁহার গৃহের বাহির হইয়া পত্রখানি খুলিয়া পড়িলাম। তাহাতে লেখা ছিল—"প্রিয় মনরো! এইটি তোমার নূতন ডেপুটী বাবু নবীনচন্দ্র সেন। বড় অল্প বয়স, কিন্তু বড় মানসিক শক্তি-সম্পন্ন (very intelligent)।"

এই জয়পতাকা ললাটে বাঁধিয়া আমি যশোহর রওনা হইলাম। পূর্ব্ববঙ্গ রেলে চাকদা ষ্টেশনে নামিলাম; এখান হইতে যশোহর প্রায় ৫০ মাইল। এই দীর্ঘ পথ যে যানে অতিক্রম করিতে হইত, এ অঞ্চলের লোকেরা তাহাকে অত্যুক্ত অলঙ্কার সাহায্যে ঘোড়ার গাড়ী বলিত। সে এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সে কালের কলিকাতার কালীঘাটগামী তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীর তৃতীয় শ্রেণী যদি কল্পনা করা যাইতে পারে, তবে এ অপূর্ব্ব গাড়ীর মূর্ত্তি কতক হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। স্মরণ হয়, বেলা ৯টার সময় চাকদা পঁহুছিয়া এবং সেখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া উপরোক্ত একখানি যানে যশোহরের পাড়ি আরম্ভ করি। সমস্ত দিন তাহার মৃদু মন্থর অধঃ ঊর্দ্ধ সঞ্চালনে সর্ব্বাঙ্গের অস্থিপঞ্জর নিষ্পেষিত করিয়া এবং অপরিমাণ ধূলারাশির দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া যশোহরে অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় গিয়া কেশবলাল ধর উকীল মহাশয়ের বাসায় একখানি পরিচয়পত্রসহ উপস্থিত হইলাম। কেশববাবু অতি নিরীহ ভালমানুষ। দু এক দিন অতি যত্নে তাঁহার বাসায় রাখিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে মস্তকের ধূলিরাশি যথাসাধ্য প্রক্ষালন করিয়া মাজিষ্ট্রেট মনরো সাহেবের সঙ্গে এ জীবনে প্রথম ধড়া চূড়া যথাশাস্ত্র বান্ধিয়া সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তিনি কি লিখিতেছিলেন; তাহা শেষ করিতে লাগিলেন। আমি আমার হৃৎকম্প সামলাইতে লাগিলাম। তাহার পর কলমটি রাখিয়া আমার প্রতি তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমি চ্যাপম্যান সাহেবের পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি তাহা পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাড়ী কোথায়?" আমি গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মত ভাবিলাম—"সর্ব্বনাশ! ঐ গো, নাম চায়।" আমার মাথায় যেন পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি দিগ্‌গজ ঠাকুরের মত মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, যতদূর পারি, পরিচয়টা চাপিয়া যাইব। উত্তর করিলাম—"পূর্ব্ববঙ্গ।" প্রশ্ন —"পূর্ব্ববঙ্গ? কোথায়?" তখন অগত্যা উত্তর করিতে হইল—"চট্টগ্রাম।" প্রশ্ন—"চট্টগ্রাম? কোন্ গ্রামে?" আমি মনে করিলাম, এইবার আর ধরা না পড়িয়া রক্ষা নাই। সভয় উত্তর করিলাম, "নয়াপাড়া।" সাহেবের যেন কৌতূহল বৃদ্ধি হইল। বলিলেন—"তুমি কি নয়াপাড়ার বিখ্যাত জমিদার বংশের সন্তান? তোমার পিতার নাম কি?" আমার মস্তকের কেশাগ্র হইতে চরণের নখাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই প্রকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম —হাঁ, আমি সেই বংশের সন্তান। আমার পিতার নাম বাবু গোপীমোহন রায়।" এই বলিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"তিনি চট্টগ্রামের উকীল ছিলেন।" আমি মনে করিলাম, তাহা হইলেই সাহেব আর চিনিতে পারিবেন না; কারণ, পিতা তাঁহার সময়ে আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। সাহেব চক্ষু প্রসারিত করিয়া আমাকে যেন আপাদমস্তক দেখিয়া বলিলেন—"ওহো! তুমি সেই গোপীবাবুর পুত্র? আমি তাঁহাকে বিলক্ষণ জানি। তিনি পূর্ব্বে পেস্কার ছিলেন? আমি একটি ছোটখাট "হাঁ" বলিলাম। প্রশ্ন—"তাহার পর তিনি সেরেস্তাদার হইয়াছিলেন?" আবার ছোট "হাঁ" উত্তর হইল। প্রশ্ন—"তাহার পর

তিনি মুন্সেফ হইয়াছিলেন?" আমি আবার লঘুস্বরে বলিলাম, "হাঁ।" প্রশ্ন—"তিনি তাহার পর কি উকীল হইয়াছেন? তিনি এখন জীবিত আছেন কি?" আমি তখন বাষ্পাকুললোচনে বলিলাম—"না, তিনি এখন নাই। তিনি উকীল অবস্থাতেই আমাদিগকে অকূলে ভাসাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।" তখন সাহেব বড় সহৃদয়তার সহিত আমার পারিবারিক সংবাদ এবং দূরবস্থার কথা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"তোমার ভয় নাই, তুমি সেই গোপীবাবুর পুত্র। আমি তোমাকে এক পক্ষের মধ্যে একজন পাকা কর্ম্মচারী করিয়া তুলিব, আমি তোমার পিতার মত এরূপ বিচক্ষণ কর্ম্মচারী আমার চাকরীর মধ্যে কোথাও দেখি নাই। তুমি জান কি, চট্টগ্রামের জজগুলো তোমার পিতার হাতের পুতুল ছিল?" তখন চেয়ার-খানি আমার দিকে ফিরাইয়া, যশোহর সহরের একটি সাময়িক চিত্র অঙ্কিত করিলেন। সমস্ত সহরে কে কেমন লোক, কে হিন্দু, কে ব্রাহ্ম, কে মদ খায়, কে বেশ্যালয়ে যায়, আমি কাহার সঙ্গে মিশিব, কাহার সঙ্গে মিশিব না, ইত্যাদি বিষয়ে এক দীর্ঘ উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন—"তুমি আজ গিয়া বিশ্রাম কর। কাল কালেক্টরী কাচারিতে আমার কাছে উপস্থিত হইও।" আমার বুক হইতে যেন একটি পাহাড় নামিয়া গেল। তাঁহার গৃহের বাহিরে আসিয়া যেন এক ঘণ্টার পর আমার নিশ্বাস পড়িল। এই আনন্দের সময় আবার আশঙ্কার যে একখণ্ড কাল মেঘ দেখা দিয়াছিল, তাহা উড়িয়া গেল।

পরদিন যথাসময়ে তাঁহার আফিসকক্ষে উপস্থিত হইলাম। তিনি ডেপুটিতে দীক্ষার শপথ পাঠ করাইলেন এবং তাহাতে স্বাক্ষর করাইয়া লইলেন। তখন আমাকে তাঁহার কক্ষের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে লইয়া গিয়া বলিলেন—"এই তোমার এজলাস। তোমার টেবিলের উপর দুটি বাণ্ডিল দেখিতেছ। উহা সাবধানের সহিত পাঠ করিয়া বাড়ী চলিয়া যাইও। আজ তোমার আর অন্য কোন কাজ করিতে হইবে না।" আমি দেখিলাম—ক্ষুদ্র কক্ষ, তাহাতে একটি রেলিং পর্য্যন্ত নাই। আমি বলিলাম, "আমি এই মাত্র কলেজ হইতে আসিতেছি। ইহাতে বসিয়া কেমন করিয়া কাজ করিব?" তিনি আমাকে আবার তাঁহার কক্ষে লইয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"এইখানে রেলিং আছে কি?" আমি বলিলাম—"না, নাই ; কিন্তু আপনার নামই যথেষ্ট। তাহার ভয়ে কেহ এখানে আসিবে না।" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোমারও সেরূপ নাম করিতে হইবে। তুমি সেরূপ নাম করিতে না পারিলে যশোহরের বদমায়েসদিগকে কখনও শাসন করিতে পারিবে না—এইটি তোমার প্রথম শিক্ষা।" তাহার পর এজলাসে গিয়া দুটি বাণ্ডিল মনোনিবেশপূর্ব্বক পড়িলাম। একটিতে তাঁহার নিজের বিচার্য্য কয়েকটি কালেক্টরীর নথি ও সার্কুলার, এবং অন্যটিতে তাঁহার বিচার্য্য কয়েকটি ফৌজদারী নথি ও সার্কুলার। পাঠ করিয়া, তাঁহার আদেশমত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলাম। পরদিবস আবার আদেশমত আফিসে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন—"আজ তোমাকে বাকি খাজনার ও ফৌজদারীর মোকদ্দমা দিয়াছি,—উহা বিচার করিতে হইবে। তোমাকে একটি উপযুক্ত মুসলমান সেরেস্তাদার দিয়াছি। কিন্তু এমন বদমায়েস আর নাই। তাহাকে তোমার শাসন করিতে হইবে।" শুনিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম—"আমার এই বয়স এবং এই প্রথম কর্ম্ম। অতএব এরূপ ব্যক্তির হাতে আমাকে দেওয়া কি উচিত হইতেছে?" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন—"তুমি ইহাকে শাসনে রাখিতে পারিলে কখন কোন আমলা তোমাকে আর হাত দেখাইতে পারিবে না। এইটি তোমার দ্বিতীয় শিক্ষা।" আমি সেইদিন সেই মোকদ্দমাগুলির মাথামুণ্ড করিয়া গৃহে চলিয়া গেলাম। "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং"—যেরূপ তাঁহার বিচার্য্য নথিগুলি দেখিয়াছিলাম, ঠিক তাহারই অনুকরণ করিয়াছিলাম। পরদিন প্রথম আফিসে ডাকিয়া তিনি আমাকে বলিলেন—"তুমি কাল চলিয়া

গেলে তোমার নথি আনিয়া আমি দেখিয়াছিলাম। এই তোমার প্রথম কার্য্য মনে করিলে, তুমি উহা অতি প্রশংসনীয়রূপে করিয়াছ বলিতে হইবে। এখন আর আমার তোমাকে শিক্ষা দিবার বড় কিছু নাই। এখন যত শীঘ্র পার, ফৌজদারীর আইন দুখানি এবং দশ আইন-খানি পড়িয়া ফেল। দেখিলাম সেই প্রথম দিনের কার্য্যে লোকের কাছেও আমি একটি ক্ষুদ্র অবতার হইয়া পড়িয়াছি। চারিদিকে আমার বয়স, রূপ ও গুণের, বিশেষতঃ বড় চক্ষু দুটির জয়জয়কার পড়িয়া গিয়াছে। যে সংসার এত দিন একটি প্রকাণ্ড কল্পনার রাজ্য ছিল, এবং যাহা চিরজ্যোৎস্নাময়, শান্তিময় ও সৌন্দর্য্যময় বলিয়া মনে করিতাম, এবং যাহা পাঠ্যজীবনের দুর্গতির আরামতীর বলিয়া মনে করিতাম, এরূপে সেই সংসারে প্রবেশ করিলাম। সেই বিপদ্‌ঝটিকা বজ্রাঘাতের পর এ প্রবেশ বড়ই আনন্দময়, উৎসাহময় ও উৎসবময় বোধ হইল।

অমৃত বাজার পত্রিকা

"অমৃত বাজার পত্রিকা" ও তাহার সম্পাদক ভারতবিখ্যাত শিশিরকুমার ঘোষ ও তাঁহার কনিষ্ঠ মতিলাল ঘোষকে আজ কে না চেনেন? আমি যশোহরে অবতীর্ণ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে "অমৃত বাজার পত্রিকা" ভূমিষ্ঠ হয়। বাংগালা সাপ্তাহিক পত্রিকা; কাগজ কদর্য্য, ছাপা কদর্য্য, ভাষা কদর্য্য। শুনিলাম, উহার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, কম্পোজিটর শিশিরকুমার ঘোষ, প্রিণ্টার শিশিরকুমার ঘোষ, এমন কি, উহার প্রেস ও অক্ষরপ্রস্তুতকারক পর্য্যন্ত শিশিরকুমার ঘোষ। কাগজখানির নামটি যে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়, তাহার অক্ষর, লোকের বিশ্বাস, লাউ কাটিয়া, কি কাঠ কাটিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন শিশিরকুমার ঘোষ। শিশিরকুমার নিজ গ্রামে এক বাজার স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মাতার নাম অমৃতময়ী। বাজারের নাম রাখিয়াছেন অমৃত বাজার। আর সেইজন্য কাগজখানির নাম হইয়াছে "অমৃত বাজার পত্রিকা।" লোকের মুখে এ সকল কথা যেন উপাখ্যানের মত শুনিতে লাগিলাম। আর শুনিলাম, তিনি একজন মহাব্রাহ্ম। দিনকতক যখন এসেসার ছিলেন, তাঁহার পাল্কির বাঁশের সংগে মুর্গি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেন এবং শিশিরকুমারের কুক্কুটধ্বজ হিন্দুজগতে তারস্বরে তাঁহার ব্রাহ্মত্ব প্রচার করিত। তিনি মনরো সাহেবের আন্তরিক প্রিয়পাত্র ও তাঁহার প্রধান শাসনাস্ত্র। এহেন দুরন্ত সাহেব তাঁহার করে যেন মোমের পুতুল। সাহেব মহোদয়ের দীর্ঘ কর্ণ দুখানি শিশিরকুমারের করন্যস্ত। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়েও শিশিরকুমার অবাধে তাঁহার দাম্পত্য কক্ষে প্রবেশ করিতে পারিতেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে শিশিরকুমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"অমুক স্থানে একটা দাংগার আয়োজন হইয়াছে। প্রভাত হইলে কত লোক মারা যাইবে ঠিক নাই।" সাহেব বলিলেন—"শিশির! আমি অতি প্রত্যূষে যাইব।" শিশির বলিলেন—"তাহা হইলে হইবে না। আপনাকে এখনই যাইতে হইবে।" সাহেব আর কথাটি না কহিয়া অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলেন, এবং প্রভাতে যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে এমন সময় দুই পক্ষের মধ্যস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"বেশ বাবা! খুব যুঢ়্‌ঢ কচ্চো।" আর মুহূর্ত্তমধ্যে লাঠিয়াল সকল লাঠি ফেলিয়া পলায়ন করিল এবং উভয় পক্ষের নেতৃগণ ধৃত হইল। লোকের বিশ্বাস, মনরো সাহেবই কাগজখানি খোলাইয়াছেন এবং তিনি বাধ্য করিয়া যশোহরের আপামর সাধারণকে তাহার গ্রাহক করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" 'অতি' সবই মন্দ। অতিবন্ধুতায় ইদানীং বিষোৎপন্ন হইয়াছে। "অমৃত বাজারে"র এক সংখ্যায় "ঘোরতর অত্যাচার" নামক একটি প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখা থাকে যে, কোনও সবডিভিসনাল অফিসার একটি সাক্ষীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছেন, এবং অন্য প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় যে, তিনি উপদংশ রোগগ্রস্ত হইয়াছেন। ফৌজদারী হেডক্লার্ক রাজকৃষ্ণ মিত্র মাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া পাঠান যে, এই দুই প্রবন্ধের লক্ষ্য তাঁহার অধীনস্থ কোনও কর্ম্মচারী। সাহেব জিজ্ঞাসা করেন—সে কে! রাজকৃষ্ণ বলেন, তিনি বলিতে পারেন না। সাহেব সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কি —আমার হুকুম অমান্য! শিমুলস্তূপে অগ্নিকণা পড়িল, আর হুহুঙ্কার শব্দে সাহেবের ক্রোধানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন, দশ মিনিটের মধ্যে রাজকৃষ্ণের উত্তর দিতে হইবে। তাহার পর পাঁচ মিনিট, তাহার পর দুই মিনিট ; কিন্তু রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্ম হইতে সস্পেন্ড করিয়া, তিনি শিশিরকুমারকে পত্র লিখিলেন। শিশিরকুমার লিখিলেন যে, প্রবন্ধে যাহা আছে, তাহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছু বলিতে বাধ্য নন। এবার সাহেবের ক্রোধ দাবানলে পরিণত হইল। তিনি তখন অমৃত বাজারের সম্পাদক বা সম্পাদকগণ, মুদ্রাকর বা মুদ্রাকরগণ, প্রকাশক বা প্রকাশকগণের নামে যথাশাস্ত্র এক "অফিসিয়াল" পত্র ঝাড়িলেন। শিশিরকুমার এ পত্রেরও ঐরূপ উত্তর দিলেন। তখন সাহেব চুপ করিয়া থাকিলে কেহ তাঁহার দোষ দিত না। কিন্তু তিনি সেরূপ পাত্র নহেন। বিধাতার নীতি টলিতে পারে, কিন্তু তাঁহার হুকুম টলিবে না। তাঁহার হুকুম যতই অসঙ্গত ও নীতিবিরুদ্ধ হউক না, তাহার একটি অক্ষর যে পালন না করিবে, সে যতই তাঁহার বন্ধু হউক না, যতই নির্দ্দোষী হউক না, তিনি তাহার সর্ব্বনাশ না করিয়া ছাড়িবেন না। তিনি তখন তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের লক্ষ্য ঝিনাইদহের সবডিভিসনাল অফিসার রাইট (Wright) সাহেব। তখন উঁহার দ্বারা শিশিরকুমার ঘোষ, রাজকৃষ্ণ মিত্র, এবং একজন প্রিন্টারের নামে অপবাদ বা 'লাইবেল' অভিযোগ উপস্থিত হইল। যশোহরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল, যেন একটা খণ্ড প্রলয় হইয়াছে। এ সময়ে আমি সশরীরে যশোহরে ধর্ম্মাবতারের সিংহাসন আরোহণ করি।

মোকদ্দমা জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট ওকিনিলি সাহেবের হস্তে। যেমন মাজিষ্ট্রেট, তেমনই জইণ্ট—সোনায় সোহাগার যোগ, অনলের সহায় পবন। মাজিষ্ট্রেট যাহাকে ধরিতে বলেন, জইণ্ট তাহাকে খুন করেন। যুদ্ধরত গজকচ্ছপের পরাক্রম বিশ্বচরাচর সহিতে পারে নাই। এই সম্মিলিত গজকচ্ছপের শক্তি একটা জেলা কিরূপে সহিবে? এই যুগল রূপের—একান্ত হরিহরের শাসনে ও অত্যাচারে যশোহর টলটলায়মান। ভদ্রলোক পর্য্যন্ত অস্থির। ইঁহাদের প্রধান গোয়েন্দা একজন মর্কটরূপী কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার। তাহার যশোহরব্যাপী অভিশপ্ত নাম। সেই অখাদ্য জিনিসটার খাদকের পুত্র না বলিয়া কেহ তাহার নাম করিত না। ওকিনিলি সাহেব ছদ্মবেশে নৈশ পর্য্যটনে বাহির হইতেন ; এবং পতিতাদের পল্লী হইতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের বাড়ী পর্য্যন্ত সকলের গৃহের পশ্চাতে লুকাইয়া থাকিয়া কোথায় কি হইতেছে, তাহার খবর লইয়া আসিতেন, লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল। সকালে তাঁহার বাড়ীতে গেলে রাত্রিতে সহরে কোথায় কি হইয়াছে, তাহার খবর পাওয়া যাইত। একজন ইন্‌স্পেক্টার নাকি কোনও বেশ্যালয়ে বসিয়া প্রাণটা খুলিয়া কিঞ্চিৎ গোপন অনুসন্ধান করিতেছিলেন। উঠিয়া আসিবার সময়ে কপাটের আড়াল হইতে এক "মনোহর হাস্যমূর্ত্তি কামিজ পরিয়া" বহির্গত হইল, এবং বলিল,—"আচ্ছা বাবা! বড় মজা কল্লা!" সেদিন হইতে তাহার পুলিশলীলার উত্তর কাণ্ড আরম্ভ হইল। অল্প দিনের মধ্যে তিনি পদচ্যুত হইলেন। শ্যামাপূজার ভাসান। দড়াটানার পুলের নীচে ভৈরব নদের বক্ষে সহরের সমস্ত প্রতিমা ও নর্ত্তকী সমবেত। তীরে লোকারণ্য। ধীরে ধীরে বগির টোপ দিয়া পাঁচটার সময় জইণ্ট সাহেব পুলের উপরে উঠিয়া বগির টোপ ফেলিয়া দিলেন, এবং একবার গলা বাড়াইয়া নদীর দিকে দেখিয়া তাঁহার সেই উৎকট হাসি হাসিলেন। একটা বিপ্লব উপস্থিত

হইল। নর্ত্তকীগণ "মা গো! বাবা গো!" বলিয়া কাঁদিয়া বসিয়া পড়িল ; কেহ বা জলে ঝাঁপ দিল। নৌকারোহী ভদ্র ও অভদ্র অনেকেও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন। তীরস্থ সমস্ত লোক ব্যাঘ্রতাড়িতবৎ ছুটিয়া পালাইল। মুহূর্তমধ্যে সে উৎসবস্থান একটা হাহাকারে পূর্ণ হইল। একদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্যারত্নের বাসায় নিমন্ত্রণ। উচ্চ-পদবীস্থ সকলে মিলিয়া খুব আমোদ করিতেছেন। ইতিমধ্যে ভৃত্য আসিয়া বলিল যে, গৃহের পশ্চাতে এক শ্বেতকায় প্রেতমূর্ত্তি। বিদ্যারত্ন একজন সেকেলে পণ্ডিত ; সেকেলে পণ্ডিতের মত এই প্রেতভয় নিবারণের ব্যবস্থা করিলেন। ভৃত্য ফিরিয়া গিয়া এক হাঁড়ি তপ্ত ফেন সেই শ্বেতাঙ্গে ঢালিয়া দিল। গৃহ হইতে ভদ্রমণ্ডলী এক মহাপলায়নশব্দ শুনিলেন। বাসার ভৃত্যমণ্ডলী হাসিতে হাসিতে "চোর চোর" বলিয়া তাড়াইতে লাগিল। শুনিলাম, সে অবধি যশোহরে এই শ্বেতভূত-উপদ্রব কমিয়াছিল। যশোহরে পৌঁছিয়াই এরূপ অনেক গল্প শুনিলাম। আমি সাক্ষাৎ করিতে গেলে জইণ্ট সাহেব মহোদয় তাঁহার উদার আইরিশ-উচ্চারণসম্বলিত ভাষায় বলিলেন—"তুমি বালক। আমি তোমাকে একটি উপদেশ দিব। যে পর্য্যন্ত বিপরীত প্রমাণ না পাইবে, সে পর্য্যন্ত প্রত্যেক লোককে ষোল আনা বদমায়েস বলিয়া ধরিয়া লইবে।" ইহাই তাঁহার শাসন ও ধর্ম্মনীতির মূলমন্ত্র। তিনি একবার যাহাকে "বাদমান" (Bad man) অর্থাৎ মন্দ লোক বলিয়া সন্দেহ করিতেন, সে দেবতা হইলেও তাহার নিস্তার নাই। এই মহাপুরুষের হস্তে "অমৃত বাজারে"র মোকদ্দমা অর্পিত হইয়াছে। শিশিরকুমার কাজে কাজেই মনরো-ওকিনিলি মাহাত্ম্য লিপি করিয়া এক এফিডেভিট বা অঙ্গদরায়বার হাইকোর্টে উপস্থিত করিলেন। হাইকোর্ট আদেশ করিলেন প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা জইণ্ট নিজে বিচার না করিয়া সেসনে সমর্পণ করিবেন। প্রমাণ অনুসন্ধানের উপদ্রবে যশোহর উলটপালট হইতেছে। কাহাকে কখন ধরিয়া লইয়া পুলিশ অপমান করে, এবং তজ্জন্য কে কখন বিগ্রহযুগলের কোপে পতিত হইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, এরূপ আশঙ্কায় যশোহরে একটা মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। বলিয়াছি, এ সময়ে আমি যশোহরের শাসনাকাশে নবীন গ্রহরূপে উদিত হই। শিশিরকুমার একজন বিখ্যাত "লড়ায়ে মেড়া"। তিনি আবার এ সকল অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া যুগল রূপকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য আবেদন করিলেন। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর ধর্ম্মভীরু সার্ উইলিয়ম গ্রে। এখনকার মত তখন "প্রেষ্টিজে"র বা প্রতিপত্তির ধুয়া উঠে নাই। তখন কি হাইকোর্ট, কি লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর, সিবিল সার্ভিসের করধৃত পুতুল ছিলেন না। ১১টার সময়ে আমার এজলাসের সমক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া বলিলেন—"নবীন! আমি চলিলাম।" আমি শুনিয়া অবাক্।

আমি। আপনি কোথায় যাইতেছেন?

মা। বোর্ডের সেক্রেটারির পদে। আজ প্রাতে টেলিগ্রাম পাইয়াছি।

আ। কখন যাইবেন?

মা। এখনই।

আমি অতি বিষণ্নভাবে নিরাশ্রিতের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া অতিশয় স্নেহকরুণ কণ্ঠে বলিলেন—"ছেলে মানুষ (Poor boy)! তুমি ভয় পাইও না। যিনি আমার স্থানে আসিতেছেন, তিনি আমার কুটুম্ব (cousin)। আমি তোমার কথা কলিকাতায় তাঁহাকে বলিব। বদমায়েসদের শাসন কর। ভয় করিও না।" তিনি অতি স্নেহে আমার করমর্দ্দন করিয়া কাচারি হইতে বহির্গত হইলেন। কাচারি ভাঙ্গিয়া আমলাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তিনি জনসাধারণের অপ্রিয় হইলেও আপন অধীনস্থগণের কাছে অপ্রিয় ছিলেন না। সকলে জানিত যে, তিনি একজন মহা গোঁয়ার হইলেও অধীনস্থগণের আশ্রয়দাতা ছিলেন। যে আমলাকে তিনি ভাল

বাসিতেন, তাহার সাত খুনই মাপ। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একদিন একটা বাটোয়ারার মোকদ্দমা করিতেছেন। আমি কাছে বসিয়া আছি। পেস্কার গিরীশবাবুর সঙ্গে একটা মহা বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সাহেব চটিয়া রক্তবর্ণ হইয়া রায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। গিরীশবাবু হতাশ হইয়া বসিয়া বাঙ্গালায় বলিতে লাগিলেন—"আপনার গতিকই এই। আপনি যাহা একবার ধরেন, তাহা আর ছাড়েন না। আপনি একটা পরিবারের সর্ব্বনাশ করিতেছেন।" বারুদের স্তূপে অগ্নিকণা পড়িল। সাহেব "কি"! ("What !") বলিয়া এক চীৎকার করিয়া, কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া গিরীশবাবুর দিকে ক্রোধকম্পিত-কলেবর হইয়া চাহিয়া রহিলেন। আমি ভাবিলাম, গিরীশবাবুর পেস্কারিত্ব এই মুহূর্ত্তে শেষ হইল। কিন্তু না, গিরীশবাবু সতেজে উঠিয়া বলিলেন—"আমি আর একবার মোকদ্দমাটা আপনাকে বুঝাই। আপনি ক্রোধ ত্যাগ করিয়া শুনুন।" এই বলিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন এবং নথি উল্টাইতে লাগিলেন। সাহেব দুই হস্তে দুই বাহু ধরিয়া একটি অগ্নিঅবতারের মত শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে আগুন নিবিতে লাগিল। শেষে একটুক ঈষৎ হাসিয়া, গিরীশবাবুর দিকে চাহিয়া একটি অঙ্গুলি তাহার ললাটে ঠেকাইয়া বলিলেন—"Yes, Girish !"—"হাঁ গিরীশ!" গিরীশ তখন চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তিনি প্রায় এক দিস্তা কাগজ খস্‌খস্‌ করিয়া লিখিয়া গিরীশকে ফেলিয়া দিলেন। আমি কক্ষের বাহিরে গিয়া গিরীশবাবুকে বলিলাম—"আপনার ত ভয়ানক সাহস। আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনাকে গিলিয়া ফেলিবে।" তিনি বলিলেন—"এ কি দেখিলেন ; এক এক দিন কলম চাপিয়া ধরিতে হয়। না হয় ত খোঁড়া ক্রোধে অধীর হইয়া এতদিনে আরও কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিত। তাহার এই একটি গুণ—সে জানে যে, সে ক্রোধে বিবেকশূন্য হয়। তাই রক্ষা।" এখনকার দিনে কোন শ্রীযুতের ভ্রম হইয়াছে বলিয়া যদি সম্মানের ভাষায়ও কোন উচ্চতম ডেপুটি কোনও বিষয়ে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করেন, তাহা হইলে তাঁহার ডেপুটিত্ব সেখানেই শেষ হয়। মাজিস্ট্রেট চলিয়া গেলেন। জইণ্টও "অমৃত বাজারে"র মোকদ্দমা শেষ করিয়া এবং শিশিরকুমার, রাজকৃষ্ণ মিত্র ও প্রিণ্টারকে সেসনে দিয়া চলিয়া গেলেন। কর্ণবধের পর পৃথিবীর যেরূপ এক হস্ত উচ্চ হইয়াছিল, যশোহরেরও তাহাই হইল। যশোহরব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। ইঁহারা উত্তম শাসক হইলেও মাজিস্ট্রেটের চিত্ত এত অস্থির এবং এরূপ আশুক্রোধপরবশ যে, "অব্যবস্থিত-চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।" আর জইণ্টকে তাঁহার কুটিলতা এবং হিংসাবৃত্তির জন্য দেশশুদ্ধ লোক ভয় ও ঘৃণা করিত। ইঁহাকে রাজকৃষ্ণবাবু যোড়শোপচারে বিদায় দিয়াছিলেন। জইণ্ট অপমানভয়ে যে সময়ে যাইবেন বলিয়া লোকের কাছে বলিয়াছিলেন, তাহার বহু পূর্ব্বে অতি প্রত্যুষে যাইতেছিলেন : কিন্তু রাজকৃষ্ণ তাঁহার অপেক্ষা চতুর। তিনি সেই প্রত্যুষে ধুতির খুঁট গায়ে দিয়া, তাঁহার গৃহের সমক্ষে রাজপথে বসিয়া এরেণ্ডার দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিতেছিলেন। প্রথম পাল্কি আসিল।

প্রশ্ন। এ পাল্কি কার ?

উত্তর। বাবাদের।

হুকুম। চলিয়া যাও।

দ্বিতীয় পাল্কি আসিল।

প্রশ্ন। এ পাল্কি কার ?

উত্তর। মেম সাহেবের।

হুকুম। চলিয়া যাও।

তৃতীয় পাল্কি আসিল। রাজকৃষ্ণ হুকুম করিলেন—"রাখ।" জইণ্ট পাল্কির দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতেছিলেন। রাজকৃষ্ণের গলা শুনিয়া বলিলেন—"চালাও ! চালাও !"

তাঁহাকে সমস্ত যশোহর ভয় করিত। কিন্তু তিনি রাজকৃষ্ণকে ভয় করিতেন। রাজকৃষ্ণ "রাজার রাজা রাই কিশোরী।" গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন—ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের সঙ্গে কোন আমলার কুটুম্বিতা আছে কি না। রাজকৃষ্ণ উত্তরের মুসাবিদায় লিখিয়া দিয়াছেন—"Raj Krishna Mitter is connected with all the Deputy Magistrates by intimacy." "রাজকৃষ্ণ মিত্র বন্ধুতার দ্বারা সকল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের সম্পর্কিত। মাজিষ্ট্রেট মফঃস্বলে। জইণ্ট ভাবিলেন, বন্ধুতার দ্বারা ত আর সম্পর্ক হয় না। ওটা বাঙ্গালীর ইংরাজীর ভুল—"Babu English." তিনি intimacy (বন্ধুতা) কথাটা কাটিয়া দিয়া intermarriage (বিবাহ) লিখিয়া দিলেন। ডেপুটিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, মুসলমান পর্য্যন্ত আছেন। কমিশনর এ অপুর্ব্ব উত্তর পাইয়া এক তীব্র চিঠি ঝাড়িলেন, এবং অপরাধীর নাম চাহিলেন। জইণ্ট অপ্রস্তুতের একশেষ হইলেন। তিনি সে অবধি রাজকৃষ্ণকে ভয় করিতেন। রাজকৃষ্ণেরও যশোহরে খুব প্রভুত্ব। বিশেষতঃ বেহারাগণ তাঁহার প্রতিবেশী। তৎক্ষণাৎ পাল্কি নামাইল। রাজকৃষ্ণ পাল্কির দ্বার খুলিয়া, দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া, এক উপহাসব্যঞ্জক সেলাম দিয়া, দাঁত কয়টি ঘষিতে ঘষিতে বলিলেন—"কি সাহেব, চল্লে? তা এ মুলুকটা যেরুপ পোড়াইয়া গেলে, আর সেরুপ করিও না। কাজ কি? কাচ্চাবাচ্চা সঙ্গে থাকে!" জইণ্ট চক্ষু মুদিয়া তুষানলগ্রস্ত। রাজকৃষ্ণ তখন আবার দাঁত কয়টি ঘষিতে ঘষিতে একটি বিচিত্র "গুডবাই!" বলিয়া পাল্কি তুলিতে আদেশ দিলেন। পাল্কি চলিল, আর পশ্চাতে রাজকৃষ্ণের শিক্ষিত একপাল বুনো বালক কুলা বাজাইয়া "দুর! দুর!" করিতে করিতে বহু দুর পর্য্যন্ত বিদায় দিয়া আসিল। শুনিলাম, অপমানে ওকিনিলি ও তাঁহার পত্নী কাঁদিতেছিলেন। "অমৃত বাজার পত্রিকা"র পরের সংখ্যায় জইণ্টের বিদায়ের একটি উজ্জ্বল ছায়ালোকময় বর্ণনা বাহির হইল। সমস্ত দেশ হাসিয়া আকুল।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ

যদিও মাজিষ্ট্রেট মনরো মহোদয়ের অধীনে আমি এক পক্ষকাল মাত্র কর্ম্ম করিয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমাকে এত স্নেহ করিতেন যে, তিনি স্থানান্তরিত হওয়ায় আমি বড়ই দুঃখিত হইয়াছিলাম; এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে একটি 'সনেট' লিখিয়া "অমৃত বাজার পত্রিকা"য় ছাপাইতে পাঠাইলাম। "মনরো সাহেবের বদলিতে আর ত কেহ কাঁদিল না, কেবল নবীনবাবুই কাঁদিলেন"—এরুপ এক অন্তরটিপ্পনী সহ পত্রিকাতে কবিতাটি ছাপা হইল। আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র লিখিলাম, এবং পত্রিকা উহা না ছাপিলে উহা অন্য কাগজে ছাপাইব বলিয়া ভয় দেখাইলাম। তাহার কিছুদিন পরে বেলা তিনটার সময়ে এক অপুর্ব্ব মুর্ত্তি আমার এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। একখানি ক্ষুদ্র কাষ্ঠবিশেষ বলিলেও চলে। বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর। সমস্ত শরীরে কেবল কয়েকখানি হাড়। নাকের, মুখের—এমন কি, সর্ব্বশরীরের অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষু কোটরস্থ, কিন্তু তীব্র, উজ্জ্বল, হাস্যময়। মুখে গালভরা পান ও গালভরা কেমন একপ্রকার বিদ্রুপাত্মক হাস্য। পানের অলক্তরসে অধরপ্রান্তদ্বয় প্লাবিত। পরিধানে সামান্য সাদা-ধুতি, সামান্য পিরান, তাহারও নাস্তি বোতাম। তাহার উপর একখানি চাদরের দড়ি—বুকের উপর অঙ্কশাস্ত্রের পুরণের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রান্তদ্বয় স্কন্ধের উপর দিয়া পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। এই ত রুপ! কিন্তু মুর্ত্তিখানি দেখিলে বোধ হয়, কি যেন একটি

অদ্বিতীয় লোক। মূর্ত্তি আমার দিকে সহাস্যবদনে অগ্রসর হইতেছে, আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি। পার্শ্ব হইতে আমার সেই মুসলমান পেশকার চুপে চুপে বলিল—"শিশির-বাবু!" এবং উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বলিবার বড় প্রয়োজন ছিল না। মূর্ত্তি আমার এজলাসের সমক্ষে আসিয়া বলিল—"আপনার পরিচয় আপনিই দিই। আমার নাম শিশির-কুমার ঘোষ। আপনার কি এখন বড় কাজ?" আমি উঠিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার করমর্দ্দন করিলাম। চেয়ার আনিবার অপেক্ষা না করিয়া তিনি পেশকারের পার্শ্বে টুলের উপর বসিলেন। এজলাসে অন্য আসন ছিল না। আমাকে বসিতে বলিলেন। যদিও তাঁহার অনেক নিন্দার কথা শুনিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া কিরূপ আমার হৃদয়ে গভীর ভক্তি ও আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি বসিয়াই বলিলেন—"আপনার কাজ কখন শেষ হইবে? আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। এই অল্প দিনে যশোহরে আপনার এত প্রশংসা হইয়াছে যে, আপনাকে একবার না দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে চাহেন কেন? আমাকে ইংরাজদের সঙ্গে এত ঝগড়া করিতে হইতেছে যে, বাঙ্গালীর সঙ্গে ঝগড়া করিবার আমার সত্য সত্যই সময় নাই। যাক্, আপনি কখন বাড়ী যাইবেন?" আমি বলিলাম, যে মোকদ্দমাটি হাতে আছে, তাহা শেষ করিয়া বাড়ী যাইব। বড় দেরী নাই। তিনি গুন্ গুন্ করিয়া কি গাইতে লাগিলেন, আমি "সুবিচার" আরম্ভ করিলাম। কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলিলেন—"আপনি কাজ শেষ করুন। আমি একটুক পরে আসিতেছি।" তিনি অলপক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিলেন। তখন নানাবিধ কথা কহিতে কহিতে বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পঁহুছিয়া তিনি বলিলেন—"তোমার বয়স এত অল্প, তোমাকে আপনি বলা আমার পোষায় না। তাই 'তুমি' বলিব। তোমাকে দেখিয়াই তোমার উপর কেমন আমার ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ হইয়াছে।" আমি বড়ই প্রীত হইলাম এবং বলিলাম—আমিও সেইরূপ স্নেহ তাঁহার কাছে চাহি। তাহার পর আমার সনেটের কথা তুলিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি এখনও বালক। তুমি মনরো সাহেবকে চেন নাই। আমার মত তাঁহার বন্ধু যশোহরে কেহ ছিল না। এমন ভয়ানক লোক ভূভারতে নাই।" কথাটি আমি তখন বিশ্বাস করি নাই। ইদানীং আমার বুকের রক্ত দিয়া বিশ্বাস করিতে হইয়াছে। পরে যথাসময়ে তাহা বলিব। তখন তিনি তাঁহার মোকদ্দমার কথা ও বিপদের কথা তুলিয়া বলিলেন—"আমার এই বিপদ্। তাহাতে মনরো সাহেবের বন্ধু ছিলাম বলিয়া আমি সকলের সহানুভূতি হারাইয়াছি। তোমাদের হাকিম সম্প্রদায় আমাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। তোমাকে আমার একটা উপকার করিতে হইবে। তাঁহারা সকলে, আমি জানিতে পারিয়াছি, তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তুমি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের কাছে লইয়া যাইবে এবং যাহাতে আমার প্রতি তাঁহাদের এ ঘৃণার ভাব দূর হয়, তাহা করিতে হইবে।" বাস্তবিকই হাকিম সম্প্রদায় তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন, ততোধিক ভয় করিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে মনরো সাহেবের একজন প্রধান গোয়েন্দা বলিয়া জানিতেন। তিনি আসিতেছেন শুনিলে অমনি গান বাজনা বন্ধ হইত, পানীয় উপকরণ লুকাইবার ধুম পড়িয়া যাইত, এবং সকলে শিষ্টাচারসঙ্গত ভাব গ্রহণ করিয়া বসিতেন—ঠিক যেন একটা ব্রাহ্মসমাজ। যতক্ষণ তিনি থাকিতেন, অতি সাবধানে কথা কহিতেন। আমি বলিলাম—"আপনি যাহা সন্দেহ করিয়াছেন, তাহা অমূলক নহে। আমি কি করিলে আপনার এ উপকার হইতে পারে, তাহা বলিয়া দিলে আমি সেইরূপ করিব।"

তিনি। তাঁহাদের আমাকে ঘৃণা করিবার প্রধান কারণ এখন নাই। মনরো সাহেব এখন আমার মহাশত্রু, এবং তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আর এক কারণ, আমি মদ খাই না। আমার এই শরীর, মদ খাইলে আমি মরিয়া যাইব। তাই খাই না। আচ্ছা, এরূপ কোনও মদ আছে, যাহা খাইতে ভাল, নেশা হয় না, বুক জ্বালা করে না?

আমি। কেন?

তিনি। আমি তোমার সাক্ষাৎ একটুক খাইব। তুমি তাঁহাদের সে কথা বলিবে। তাহা হইলে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন, এবং বুঝিবেন, তাঁহারা মদ খান বলিয়া যে আমি তাঁহাদের মন্দ বলি তাহা নহে।

বাস্তবিকই তখন একদিকে তান্ত্রিকতা ও অন্য দিকে ইংরাজি শিক্ষার ফলে ইংরাজানুকরণে সুরাপান এরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, যে সুরাপান করিত না, তান্ত্রিকেরা তাহাকে 'পশু' বলিয়া, এবং ইংরাজিনবিসেরা তাহাকে Gentleman (ভদ্র) নহে বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এখন অর্থাভাবে হউক, কি অন্য কারণে হউক, দেশের শিক্ষিত সমাজে পানদোষ কমিয়াছে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সেই প্রাণে প্রাণে বন্ধুতা ও প্রাণভরা বন্ধুতাও চলিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, আমি হাসিলাম এবং শিশিরবাবুকে বলিলাম, তাঁহার মদ খাইতে হইবে না। মদ যে তাঁহার ও হাকিমদের মধ্যে অন্তরায় হইয়াছে, আমার এমন বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের সম্প্রদায়ে মদ না খান, এমন লোকও আছেন। আমি দুজনের নামও করিলাম। কিন্তু শিশিরবাবুকে যে চিনে, সে জানে যে, তিনি যাহা গোঁ ধরিবেন, তাহা কখনও ছাড়িবেন না। তিনি আমার কাছে 'রোজলিকার' মিষ্ট ও প্রায় নেশাহীন শুনিয়া জিদ করিয়া এক বোতল আনাইলেন, এবং ঘটিরামের মত একটুক মুখে দিলেন। তাহার পর বলিলেন—"চল, আমার সঙ্গে এখন চল।" উভয়ে স্কুলের হেডমাষ্টার বাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই তাঁহাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ পরিচয় ছিল। শিশিরবাবু বলিলেন—"নবীনকে জিজ্ঞাসা কর, আমি এখনই তাহার বাসায় মদ খাইয়া আসিতেছি। বল, তোমরা আর আমাকে ঘৃণা করিবে না।" হেডমাষ্টার বাবু—"ব্রেভো শিশির!" বলিয়া খুব বাহবা দিলেন। তখন অন্যান্য বন্ধুরাও আসিয়া জুটিলেন। শিশিরবাবুর পানসংবাদ শুনিয়া একটা হাসির তুফান উঠিল। তাহার পর খুব আমোদ আরম্ভ হইল। শিশিরকুমার, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একজন অদ্বিতীয় লোক। সঙ্গীতের সকল কলা তাঁহার পূর্ণরূপে আয়ত্ত। পাখোয়াজে তিনি একজন সিদ্ধহস্ত, এবং কি কীর্ত্তন, কি কালোয়াত, কি টপ্পা, সকলেই তাঁহার সমান অধিকার। সকলে তাঁহাকে গাহিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন—"তোমরা আমার সাক্ষাৎ মদ না খাইলে, আমাকে আপনার বলিয়া না জানিলে আমি গাইব না। দেখ, বড় মনের দুঃখে আজ আমি তোমাদের কাছে নবীনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; কারণ, নবীন তোমাদের বড় স্নেহের পাত্র। আজ হইতে আমারও বড় স্নেহের পাত্র; আমি তাহাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। ভরসা করি, নবীন আমাকে তোমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিতে পারিবে। আমাকে তোমরা আর দূরে রাখিও না।" কথাগুলি শিশিরবাবু এমন আগ্রহ ও সহৃদয়তার সহিত বলিলেন যে, সকলে গলিয়া গেলেন। তখন সুরাদেবী আসিয়া দর্শন দিলেন এবং সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দুপুর পর্য্যন্ত শিশিরবাবু তাঁহার সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। আমি সে দিন হইতে, সেই প্রথম পরিচয় হইতে তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখিলাম এবং সেই ভক্তি উত্তরোত্তর এক জীবন বৃদ্ধি হয়। আজ তাঁহাকে—"অমিয় নিমাইচরিতে"র আদিষ্ট ও আবিষ্ট শিশিরকুমারকে,—আমি দেবতার মত পূজা করি। তাঁহার পায়ে পড়িয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করি। এই অবধি শিশিরবাবু আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেন। যেখানে আমাদের একটু নিমন্ত্রণ হইত—প্রায় প্রত্যেক শনিবারে ও রবিবারেই হইত—তিনিও নিমন্ত্রিত হইতেন। তাহার দুইটা গল্প বলিব।

১। যশোহরে একটা সাইক্লোন হয়। তাহার কথা পরে বলিব। আমরা স্কুলগৃহে আশ্রয় লইয়াছি। পরদিন প্রাতে শিশিরবাবুও স্কুলগৃহে আসিলেন। তিনি পূর্ব্বরাত্রিতে ঝড়ের সময়ে কোথায় ছিলেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—ঝড়ের পূর্ণ বেগ যখন প্রলয়

উপস্থিত করিয়াছিল, তখন তিনি একখানি কাঁথা গায়ে দিয়া কাচারির মাঠে গিয়া পড়িয়া রহিয়াছিলেন, এবং ঝড়বেগে ভূমিতে কাষ্ঠখণ্ডবৎ তাড়িত হইতেছিলেন। সকলে শুনিয়া অবাক্। এই খেয়াল কেন হইল? তিনি একটুক হাসিয়া বলিলেন—"ঝড়ের বেগ (velocity) মাপ করিতেছিলাম।"

২। শ্রদ্ধাস্পদ দীনবন্ধুবাবু যশোহর আসিয়াছেন ও আমার বাসায় আছেন। শিশির তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। কথায় কথায় বলিলেন,—"দীনবন্ধু, তুমি এবার যদি অমৃত বাজারে পোষ্টাফিস দেখিতে যাও, তবে একবার আমার স্কুলটি দেখিয়া আসিও। দেখিও, কি কাণ্ডকারখানা করিয়াছি!"

দী। কি করিয়াছ?

উ। ছেলেদের ড্রিল (কোয়াদ) শিখাইতেছি।

দী। এত বন্দুক সঙ্গীন কোথায় পাইলে?

উ। পাকা বাঁশের লাঠি। যদি এরূপ ভাবে দেশের সকল স্কুলে 'ড্রিল' শিক্ষা দেয়, তবে তুমি দেখিবে—একটা bloodshed (রক্তপাত) না হইয়া যাইবে না।

দীনবন্ধু অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কি? Bloodshed (রক্তপাত)?—Mens-truation (রজস্বলা)?" একটা হাসির তোলপাড় উঠিল। দীনবন্ধু এরূপ ভাবে ও এরূপ কণ্ঠে কথাটি বলিলেন যে, সকলে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শিশির বড়ই অপ্রতিভ হইলেন এবং চটিয়া বলিলেন—"তোমার কাছে কোনও serious (গুরুতর) কথা বলা বৃথা।' দীনবন্ধু আবার বলিলেন, বাঙ্গালীর রজস্বলা ভিন্ন আর 'ব্লডসেড্' কি হইতে পারে? শিশির তখন মাতৃভূমির দুঃখের কথা কহিতে কহিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন, উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইতেন। সত্য মিথ্যা জানি না; শুনিয়াছি, তাঁহার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা (হীরালাল) উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং এক টুক্‌রা কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—"আমার দ্বারা যখন মাতৃভূমির কিছুই হইবে না, তখন এ জীবন রাখিয়া কি ফল?" যশোহরে লিখিত আমার খণ্ড কবিতায় ও 'পলাশির যুদ্ধে' স্বাধীনতার জন্য যে নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন আছে, তাহা কথঞ্চিৎ শিশিরকুমারের সংসর্গের ও শিক্ষার ফল। তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই প্রথম এই দেশে স্বদেশভক্তির পথপ্রদর্শক।

'অমৃত বাজার পত্রিকা'র মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। বিলাত হইতে নবাগত প্রথম বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে আমি ইতিপূর্ব্বে পরিচিত হইয়াছিলাম। আমার পরামর্শমতে শিশির তাঁহাকে তাঁহার পক্ষে নিয়োজিত করেন। তিনি অতি দক্ষতার সহিত এই মোকদ্দমা চালান। ইহাতেই তাঁহার প্রথম নাম বাহির হইয়া পড়ে। তিনি মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এরূপ জেরানলে দগ্ধ করেন যে, তিনি সাক্ষীর বাক্স হইতে খর্ব্বপদে নামিবার সময়ে ক্রোধে অধীর হইয়া আছাড় খাইয়া পড়েন। শিশিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক মতি, তাঁহার পক্ষে সাক্ষী ছিলেন। জজ স্বয়ং তাঁহাকে একটা দিন ধরিয়া জেরা করেন, কিন্তু একুশ বাইশ বৎসর বয়স্ক মতি এরূপ চতুরতার সহিত উত্তর দিয়া সেই অগ্নিপরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন যে, মনোমোহন আনন্দে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া বলেন—"এই মতির জুড়ি পাওয়া ভার।" কয়েক দিন ব্যাপিয়া সাক্ষীর জবানবন্দী হয়। তাহার পর মনোমোহন অতিশয় দক্ষতার সহিত শিশিরের পক্ষে মোকদ্দমায় তর্কবিতর্ক করেন। রাজকৃষ্ণের পক্ষে হাইকোর্টের যে উকীল আসিয়াছিলেন, তিনি পরদিন তর্ক করিবেন। রাত্রি প্রায় দশটার সময় রাজকৃষ্ণ এবং উকীল মহাশয় আমার বাসায় উপস্থিত। রাজকৃষ্ণের স্থূল, দীর্ঘ ঈষৎ গৌরবর্ণ মূর্ত্তি। আয়ত নয়নে তীব্র বুদ্ধিশক্তি ও তেজস্বিতা যেন ভাসিতেছে। তাহার সঙ্গে মুখের ঈষৎ হাসিতে যেন কি একটা বিশ্বব্যাপী ব্যঙ্গভাব। তাঁহার উকীল মহাশয়ও স্থূল, কিন্তু খর্ব্ব। তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিলে তাহাতে

বড় একখানি বুদ্ধিমত্তা আছে, এমন বোধ হয় না। দুইজনেই—উকীল মক্কেল সেইদিন অপরাহ্নে মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছেন এবং তাহার উপর অপরিমিত সুরাপান করিয়াছেন। দেখিলাম, দুই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! দিব্য জুড়ি মিলিয়াছে। রাজকৃষ্ণ যেরূপ 'খামখেয়ালি', তাঁহাকেও সেইরূপ বোধ হইল। রাজকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আমার কাছে খুব দীর্ঘ-ছন্দে একটা পরিচয় এবং তাঁহার কাছে আমারও বহুবিশেষণ-সম্বলিত পরিচয় দিয়া বলিলেন—"আমি কাল অপরাধ স্বীকার করিতে যাইতেছি। তাই তোরে একবার দেখিতে আসিলাম।' এই বলিয়া আমাকে টানিয়া বুকে লইলেন। ইঁহারা সকলে আমাকে যেন একটা শিশুপুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমি তখনই মনোমোহনের কাছ হইতে আসিতেছি ; এবং তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, শিশিরবাবু নিশ্চয় অব্যাহতি পাইবেন।

আমি। আপনি একরার করিবেন কেন ?

উ। আর গোলমাল করিয়া ফল কি ? বিদ্যারত্ন আমার মাথা খাইয়াছে। আমার ত মেয়াদ হইবেই। তখন সকল কথা খুলিয়া বলা ভাল। আমার উকীলও তাহাই পরামর্শ দিয়াছেন।

উকীল মহাশয়ও মদিরাজড়িত কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ। তা বই কি!" ইহার অধিক কিছু বলিবার তাঁহার শক্তিও ছিল না।

আমি। শিশিরবাবু কি জানেন যে, আপনি একরার করিতে যাইতেছেন ?

উ। না। তাহাকে আর বলিয়া কি হইবে ? তাহার পক্ষে ব্যারিষ্টার আছে। সে ত খালাস হইবে। আমার ত আর খালাস হইবার উপায় নাই।

আমি তখন তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া শিশিরবাবুর বাসায় চলিলাম। উকীল মহাশয়ের আইনবিদ্যার ভারেই হউক, কি সুরাদেবীর ভাবেই হউক, আর চলিবার শক্তি ছিল না। তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। শিশিরবাবু শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকলে মিলিয়া মনোমোহনের কাছে গিয়া তাঁহাকে শয্যা হইতে তুলিলাম। তিনিও শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজকৃষ্ণবাবু! আপনি কি একরার করিবেন ?' তিনি বলিলেন—"এই লিখিয়া রাখিয়াছি। কাল দাখিল করিব।' মনোমোহন পড়িলেন এবং একরার পাঠে হতাশ হইয়া বলিলেন—"তাহা হইলে শিশিরবাবুরও রক্ষা নাই।" তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলাম। তাঁহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তত কিছু প্রবল নহে। একমাত্র বিদ্যারত্নের সাক্ষ্য, তাহাও খুব পরিষ্কার নহে। একদিন বিদ্যারত্ন রাত্রি প্রায় সাতটার সময় আফিস হইতে গৃহে ফিরিতেছেন, জইণ্টের বাহন সেই কোর্ট ইন্স্পেক্টার আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইল। জইণ্ট তাঁহাকে মিষ্টমুখে খুব ধমকাইয়া বলিলেন, তিনি সকল কথা জানিয়াছেন। অতএব বিদ্যারত্ন যেন কোন কথা না লুকান। বিদ্যারত্ন মিথ্যা বলিবার পাত্রও নহেন। তিনি বলিলেন—"আমি আর কিছু জানি না। কেবল একদিন সন্ধ্যার সময়ে আমার বাসায় নিমন্ত্রণ ছিল। সে সময়ে "অমৃত বাজার" আসিলে রাজকৃষ্ণ খোলেন এবং 'ঘোরতর অত্যাচার' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রবন্ধটা পড়িতে পড়িতে মাঝে মাঝে এক এক কথা সম্বন্ধে বলিলেন—"ইহা ত আমি লিখি নাই। তাহারা কোথায় পাইল ?" ইহাই মাত্র রাজকৃষ্ণের বিরুদ্ধে প্রমাণ। অতএব কেবল এই অবস্থাঘটিত প্রমাণের উপর তাঁহার দণ্ড হইতে পারে না বলিয়া মনোমোহন বুঝাইলেন। তখন রাজকৃষ্ণ বলিলেন, যদি মনোমোহন তাঁহার পক্ষেও তর্ক করেন, তবে তিনি একরার করিবেন না। পরদিন মনোমোহন তাহাই করিলেন। মোকদ্দমার বিচার শেষ হইল। কমিশনার চ্যাপম্যান পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিলেন, এবং সকল সিবিলিয়ান একত্র হইয়া দশ দিন যাবৎ রায় লিখিয়া শিশিরবাবুকে অব্যাহতি দিয়া রাজকৃষ্ণের এক বৎসরের এবং প্রিণ্টারের ছয় মাসের বিনাশ্রমে কারাবাসের আদেশ করিলেন।

আমি কাচারিতে বসিয়া এই আদেশ শুনিলাম। যশোহরে যেন একটা মহাবজ্র পতিত হইয়াছে। সকলে বিস্মিত, স্তম্ভিত। কেহ মনে করেন নাই যে, এরূপ একটা অবস্থাঘটিত ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া রাজকৃষ্ণের মত লোককে কারাবাসের দণ্ড প্রদান করা হইবে। এমন সময় একজন লোক আসিয়া বলিল, রাজকৃষ্ণবাবু আমাকে একবার দেখিতে চাহিয়াছেন। আমার পেস্কার বলিল—"সাহেবেরা যেরূপ ক্ষেপিয়াছে, আপনি যাইবেন না। আপনি ছেলে-মানুষ, আপনার অনিষ্ট করিবে।" আমি তাহা শুনিলাম না। রাজকৃষ্ণ সেই নরাধম কোর্ট ইন্‌স্পেক্টারের কক্ষে বসিয়া আছেন। আমি যাইবামাত্র আমাকে টানিয়া কোলে লইলেন, এবং উভয়ে কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"তোর স্নেহ আমি এ জীবনে ভুলিব না। এই বিপদের সময়ে তুই আপনার মাথায় বিপদ্ টানিয়া আনিয়া আমার যেরূপ সাহায্য করিয়াছিস্, আর কেহ তেমন করে নাই। ভয় নাই। রাজকৃষ্ণ মিত্র ইহাতে মরিবে না। তুই দেখিবি, জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আমি কলিকাতায় মূলা বেগুন গাড়ী বোঝাই করিয়া গলি গলি বিক্রী করিব এবং তাহাতে এই চাকরির অপেক্ষা বেশী উপার্জ্জন করিব।" আমি বলিলাম—"আপিলে আপনি খালাস হইবেন।' তিনি বলিলেন—"বিদ্যারত্ন সে আশাও বড় রাখে নাই। বিশেষতঃ 'সিভিল সার্ভিস' দল বাঁধিয়া মোকদ্দমাটা 'পলিটিকাল' করিয়া তুলিয়াছে।' বাস্তবিক তাহাই হইল। তিনি বলিলেন—"তোর একটি কাজ করিতে হইবে। বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টল্যাণ্ডও তোকে বড় ভালবাসেন। যাহাতে জেলে আমি কতকগুলি বই নিতে পারি, তুই হুকুম করাইয়া দিবি।" আমি প্রতিশ্রুত হইয়া সাহেবের কাছে আসিতে পথে অনেকে আমাকে আবার মানা করিলেন। আমি এবারেও কিছু শুনিলাম না। সাহেবের কাছে গিয়া সজলনয়নে রাজকৃষ্ণের প্রার্থনা জানাইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাজকৃষ্ণ কি তোমার কেহ হয়?" উত্তর—"না।" তখন তাঁহার মনটা যেন আমার এ করুণাভিক্ষায় ভিজিল। তখনও 'সিভিল সার্ভিস' মনুষ্যত্বশূন্য হয় নাই। তিনি বলিলেন, তাঁহার কাছে দরখাস্ত করিলে তিনি সেরূপ হুকুম দিবেন। আমি ফিরিয়া গিয়া এ সংবাদ রাজকৃষ্ণকে দিলাম। তিনি সজলনয়নে আমার ললাট চুম্বন করিয়া হাসি-মুখে জেলে চলিলেন। এ জীবনে আর তাঁহাকে আমি দেখি নাই। কিন্তু তিনি বীর ও কৃতী পুরুষ। জেলে বসিয়া তিনি সমস্ত হোমিওপ্যাথিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, এবং বাহির হইয়া কলিকাতায় একজন প্রতিষ্ঠাভাজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হইয়া সুখে ও সম্মানে জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন বাঙ্গালীর একটা শিক্ষার স্থল। মস্তিষ্ক, ভরসা ও অধ্যবসায় থাকিলে মানুষ কখনও মারা যায় না। শিশিরবাবুও সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় আসিয়া সজলনয়নে তাঁহার বিপদে যে সামান্য সাহায্য করিয়াছিলাম, তজ্জন্য অনেক কৃতজ্ঞতা ও প্রীতি জানাইলেন।

সাহেবী বাঙ্গালা

ডেপুটিগিরিতে দীক্ষিত হইবার কিছুদিন পরে এজলাসে ধর্ম্মাবতার সাজিয়া বিচার করিতেছি, এবং সুবিচারের শ্রাদ্ধ করিতেছি, এমন সময়ে একটি লোক আসিয়া বলিল—"হুজুর! নকলনবিস আমার নকলখানি দিতেছেন না। এক আনা দিয়াছি, কিন্তু তিনি চারি আনা চাহেন। আমার কাছে আর পয়সা নাই।' আমার মুসলমান পেস্কার সাহেব তাঁহাকে ভ্রূকুটি করিয়া উঠিলেন। কিন্তু লোকটি এমন সরল ভাবে কথাগুলি বলিল যে, তাহার কথা আমার বিশ্বাস হইল। আমি নকলনবিসকে ডাকিলাম। সে কোনও পয়সা লওয়া অস্বীকার করিল। কিন্তু লোকটি বলিল—"হুজুর! তাঁহার পকেটে আমার পয়সা চারিটা এখনও আছে।" পকেট অন্বেষণে ঠিক চারিটা পয়সাই পাওয়া গেল। সেখানে আর দুই চারিজন

লোক উপস্থিত ছিল। তাহারা তাহাদের মোকদ্দমা উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। তাহারাও তদনুরূপ সাক্ষ্য দিল। নকলখানিও সেরেস্তায় প্রস্তুত পাওয়া গেল। আমি বিষম সমস্যায় পড়িলাম। তখনও বেশী দিন ধর্ম্মাবতারত্ব করি নাই। হৃদয় তখনও মনুষ্যত্ব ও দয়ামায়া শূন্য হয় নাই। গরীবের ছেলে পেটের দায়ে চারিটা পয়সা লইয়াছে, ফৌজদারিতে দিলে তাহার আর রক্ষা নাই। সে কাঁদিতে লাগিল। ছাড়িয়া দিলেও আমার আর রক্ষা নাই। ধর্ম্মাবতারত্বের অযোগ্য কার্য্য হইবে। ইতিমধ্যেই মনরো সাহেব বদলি হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্থলে মিঃ ওয়েষ্টল্যান্ড আসিয়াছেন। তিনি সুন্দর, সুপুরুষ। আমি তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি সকল কথা শুনিয়া, তাঁহার মনোমোহিনী ঈষৎ হাসিয়া, সেই নকলনবিসকে জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমি তাহার জন্য অনেক বলিলাম। বলিলেন—"তাহা হইতে পারে না। তাহাকে ছাড়িয়া দিলে একটা কুদৃষ্টান্ত দেখান হইবে। তুমি এরূপ কোমলহৃদয় হইলে এ পদোপযোগী কার্য্য করিতে পারিবে না।" কাজে কাজেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম। পূর্ব্বে জইণ্ট ওকিনিলিও চলিয়া গিয়াছেন। কুইন সাহেব তখন জইণ্ট। এই চারি পয়সার মোকদ্দমা তাঁহার হাতে গেল। আমাকেও এ জীবনে প্রথম যথাশাস্ত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া সাক্ষ্য দিতে হইল। তখনও 'সিভিল' প্রভুরা বাঙ্গালীবিদ্বেষবিষে জর্জ্জরিত হন নাই। আমাকে তাঁহার পার্শ্বে চেয়ারে বসাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সাক্ষীর সিংহাসনে বিরাজ করিতে হইল না। আর সেই দিন মাত্র, প্রায় ৩০ বৎসর পরে, আলিপুরে বিরাজ করিয়া আসিলাম। তাহা না হইলে এখনকার বাঙ্গালীবিদ্বেষী গৌরাঙ্গ প্রভুদের চক্ষে সাম্য রক্ষিত হয় না, এবং সাক্ষ্যও সিদ্ধ হয় না।

জইণ্ট। আপনি সাক্ষ্য ইংরাজিতে, কি বাঙ্গালাতে দিবেন?

উ। আপনার যেরূপ অভিরুচি।

জ। বাঙ্গালায় দিলে সুবিধা। আমি বাঙ্গালা বেশ বুঝি। ইংরাজিতে সাক্ষ্য দিলে আসামীর মোক্তারেরাও আপত্তি করিতে পারে।

আমি বাঙ্গালাতে সাক্ষ্য দিতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গালাটা একটু উচ্চ গ্রামে চড়াইলাম। সাহেবমহোদয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কোন বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া শ্বেতচর্ম্মের পক্ষে মৃত্যুর অধিক পরিত্যাজ্য। তিনি যেখানে না বুঝিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলেই পারিতেন। তাহা না করিয়া একটুক থমকাইয়া থমকাইয়া লিখিয়া যাইতে লাগিলেন। সাক্ষ্য শেষ হইল। পড়িয়া শুনাইবেন কি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি 'না' বলিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। কিন্তু আমারও মনে সাহেবের বাঙ্গালা বিদ্যার পরিচয় লইবার একটা কৌতূহল হইল। আমি বলিলাম—পড়িয়া শুনাইলে ভাল হয়। কি জানি, কোথায়ও যদি কোনও ভুল হইয়া থাকে। তিনি মুখ মলিন করিয়া পড়িতে লাগিলেন। বুঝিলেন এবার ধরা না পড়িয়া রক্ষা নাই। ও হরি! তিনি অধিকাংশ স্থানেই আমার বাঙ্গালার অপূর্ব্ব ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন। আমি ছত্রে ছত্রে আপত্তি করিতে লাগিলাম, এবং বাঙ্গালায় কি বলিয়াছি, তাহার ইংরাজি অনুবাদ করিতে লাগিলাম, আর তিনি কাটিতে লাগিলেন। শেষে সাক্ষ্যপত্রখানি একটা কুরুক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইল। তিনি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া আমাকে বিদায় দিলেন।

তাহার দিনকত পরে 'অমৃত বাজারে' সিবিলিয়ানকৃত একখানি জবানবন্দির নমুনা বাহির হইল। প্রথম বাদীর জবানবন্দি। তাহার পর তাহার বিচিত্র ইংরাজি অনুবাদ। সর্ব্বশেষে সে ইংরাজির বিচিত্র অনুবাদ করিয়া সাহেব বাদীকে যাহা পড়িয়া শুনাইলেন। বিষয়টা যতদূর স্মরণ হয়, মোটামুটি এরূপ ছিল।

১। বাদীর জবানবন্দি।

আমি মধু ধরের হাটে কারবার করি। আমি আমার ঘরে পোতায় বসিয়াছিলাম। উঠিয়া প্রস্রাব করিতে গেলাম। আসামী আমাকে আসিয়া ধরিল এবং ঘুষা মারিতে লাগিল। আমি চীৎকার করিতে লাগিলাম।

২। ইংরাজি অনুবাদঃ—

I manage my affairs through Madhu Dhar. I was sitting with my grandchild. I went out to make a proposal. Accused caught hold of me, laid me flat on my back, and offered me bribes.

৩। সাহেব বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া সাক্ষীকে পড়িয়া শুনাইতেছেন।—

সাহেব। টুমি করে কারবার মধু ধরের হাটে?

(সাহেবদের 'ত' উচ্চারণ হয় না। তাঁহার বলিবার ইচ্ছা ছিল 'হাতে'।)

বাদী। হাঁ হুজুর।

সা। তুমি বসিয়াছিলে তোমার পোটার কাছে?

বা। হাঁ হুজুর।

সা। টুমি করিটে গেলে প্রষ্টা-ব?

বা। হাঁ হুজুর।

সা। সে টোমাকে ধরিল, করিল চিট, কবুল করিল ঘুষ।

বা। হাঁ হুজুর।

সাহেব লিখিলেন, "Read over to the witness and admitted correct."

যদিও পত্রিকাতে সাহেবের নাম ছিল না, সকলে বুঝিল—জইণ্ট সাহেব এবং উহা আমার জবানবন্দির শ্লেষ। যশোহরময় কি বাঙ্গালী, কি ইংরাজ মহলে একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। জইণ্ট বড়ই অপ্রস্তুত হইলেন। তাহার দুই এক দিন পরে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছি।

তিনি। আপনি সে দিন যে জবানবন্দি দিয়াছিলেন, উহা কি ভাষায়?

উ। বাঙ্গালা ভাষায়।

তিনি। কই, এরূপ বাঙ্গালা ভাষা ত অন্য সাক্ষীরা বলে না?

উ। সাক্ষীরা প্রায় ইতর লোক। ভদ্র ও ইতরের ভাষা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের ভাষা ত এক হইতে পারে না। আপনার ভাষা ও আপনার দেশের ইতর লোকের ভাষা কি এক?

তিনি। আমি 'নীলদর্পণ' পড়িয়াছি। আমি এবার বাঙ্গালার Higher Proficiency (উচ্চ অঙ্গের বিদ্যার) পরীক্ষা দিব। কই, তাহাতে ত এরূপ বাঙ্গালা নাই?

উ। 'নীলদর্পণ' একখানি প্রহসন। তাহাও নীলকর ও এদেশের ছোটলোক লইয়া। তাহাদের মুখে ভদ্রলোকের ভাষা থাকিবার ত কথা নহে।

সা। ভদ্রলোকের ভাষা কি বহিতে পাওয়া যায়?

উ। সম্প্রতি একখানি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস বাহির হইয়াছে—বঙ্কিমবাবুর 'দুর্গেশ-নন্দিনী'। এমন সুন্দর বাঙ্গালা ভাষা আর কোনও বহিতে নাই।

সা। আপনি একখানি বহি আমাকে দিতে পারেন কি?

উ। আমি বাসায় গিয়া পাঠাইয়া দিব।

সা। তাহা হইলে আমি উহা পড়িতে আরম্ভ করিব। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া রবিবার আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, যেখানে আমি বুঝিতে না পারি, আপনার সাহায্য লইব। ভরসা করি, আপনি এ কষ্টটুক স্বীকার করিবেন।

উ। আনন্দের সহিত।

বাসায় ফিরিয়া গিয়া আমার 'দুর্গেশনন্দিনী'খানি পাঠাইলাম, এবং পরের রবিবারে প্রাতে

তাঁহার কুঠীতে গেলাম। তিনি এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড এক গৃহে থাকিতেন। তখন একই কক্ষে বসিয়াছিলেন। আমার এক সঙ্গেই যুগলরূপ দর্শন হইল। তিনি বহিখানি খুলিলে দেখিলাম, প্রথম দুই তিন পৃষ্ঠার প্রত্যেক শব্দের নীচে ও ছত্রের নীচে পেন্সিলের দাগ। পেন্সিলাস্ত্রে যেন পৃষ্ঠাগুলি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে। বুঝিলাম, সাহেব ইহার একটি অক্ষরও বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু সাহেববাচ্চা এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিতে পারেন না। কেবলমাত্র বলিলেন—"বইখানি বড় কঠিন। আর স্থানে স্থানে অসঙ্গত বোধ হয়। এই দেখুন, কাব্যকার প্রথম বলিলেন যে, পথিক একটিমাত্র অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন, তাহার পর বলিলেন দুইটা।" দুর্গেশনন্দিনী'র যে স্থানে আছে যে, পথিক তড়িত আলোকে দেখিতে পাইলেন সে অট্টালিকা এক দেবমন্দির, সাহেব সেই স্থানটি অপূর্ব্ব সাহেবী কণ্ঠে পড়িলেন। তার পর বলিলেন—"এই দেখুন, একবার একটা অট্টালিকা বলিয়া এখানে আর একটা দেবমন্দির বলিলেন।" আমি ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—যে অট্টালিকা পথিক পূর্ব্বে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাই বিদ্যুতের আলোকে দেখিলেন যে, একটা দেবমন্দির। তখন তিনি কালেক্টরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"ওয়েষ্টল্যাণ্ড! তুমিও ত আমাকে দুইটা বাড়ী বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলে। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব উচ্চ-অঙ্গের বাঙ্গালা পরীক্ষা দিয়া ২০০০৲ টাকা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। তিনি একটু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন —"নবীনবাবু কি বলেন?" উত্তর—"নবীনবাবু বলেন, সেই অট্টালিকাটাই দেবমন্দির।" "বটে।"—তিনি সলজ্জভাবে নীরব হইলেন। সে দিন ও তাহার পরের দুই তিন রবিবারে সাহেব আমার কাছে 'দুর্গেশনন্দিনী'র কয়েক পৃষ্ঠা পড়িলেন। পরে একদিন বলিলেন— 'না; এখানি বড় শক্ত। আমি 'নীলদর্পণ' পড়িব।" দীনবন্ধু! তুমিই ধন্য!

যাহা হউক, এরূপ যাতায়াতে তাঁহাদের সঙ্গে আমার একটু বিশেষ পরিচয় হইল। একদিন ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব আমাকে বলিলেন—"আপনি নিম্নতর (Lower Standard) পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন কি?" ডেপুটিদের দুইটি পরীক্ষা দিতে হয়। এইটি প্রথম পরীক্ষা। এক এক পরীক্ষায় তিন বার উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে ডেপুটিলীলা শেষ হয়। আমি বলিলাম—"না। আগামী পরীক্ষা আমার চাকরি প্রবেশের ছয় মাসের মধ্যে হইবে। অতএব গভর্ণমেণ্টের নিয়ম অনুসারে আমি উহা দিতে বাধ্য নহি।" তিনি বলিলেন—"সে কথা ঠিক। তবে চেষ্টা করিয়া দেখুন না কেন? পাশ হইতে পারেন ভালই। না পারেন, কিছু ক্ষতি নাই। আমার বোধ হয়, আপনি চেষ্টা করিলে এবারই পাশ হইতে পারিবেন।" তখন পরীক্ষার মোটে অনুমান দুই মাস মাত্র বাকি। আমি মহাসঙ্কটে পড়িলাম। যখন সাহেব এরূপ জিদ করিতেছেন, তখন পরীক্ষা না দিলে তিনি বিরক্ত হইবেন। আমার পাঠ্যজীবনে একটা নিয়ম ছিল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিবার পূর্ব্বে কিছু না কিছু পড়িতাম। এ দিনটা শুভ, এবং এ দিন পড়া আরম্ভ করিলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, এরূপ একটা সংস্কার আমার বদ্ধমূল ছিল। এবারও তাহাই করিলাম। দশমী দিন হইতে শ্রীদুর্গা বলিয়া সেই অনুপাদেয় এবং প্রাণশুষ্ককরী ও মস্তিষ্কঘূর্ণনকারী ভাষাসঙ্কুল আইনাবলী পাঠ করিতে লাগিলাম। বাগেরহাটের সবডিভিশনাল অফিসার কালীপ্রসন্ন সরকার উচ্চতর (Higher Standard) পরীক্ষা দিবার জন্য আমার বাসায় আসিয়া রহিলেন। প্রথম পরীক্ষার দিন পরীক্ষা-গৃহাভিমুখে যাত্রা করিবার সময় দেখি, তাঁহার টেবুলের উপর নবপ্রচারিত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন। তাহার আরম্ভেই ভূম্যধিকারী, প্রজা, মধ্যবিত্ত প্রজা ইত্যাদির দীর্ঘ দীর্ঘ বিচিত্র ভাষাপূর্ণ বর্ণনা (definition)। কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"আপনি এখানি পড়িয়াছেন?" উত্তর—"না।" তিনি—"এখানি আপনাদেরও আছে। নিশ্চয় এ সকল বর্ণনার প্রশ্ন থাকিবে।" আমার চক্ষু স্থির। আমি পরীক্ষাগৃহে যাইতে যাইতে পথে সেই চারিটি বর্ণনা মুখস্থ করিতে করিতে চলিলাম।

পরীক্ষার প্রশ্ন হাতে পড়িলেই দেখি, সেই চারিটিই প্রথম প্রশ্ন। আমি কালীপ্রসন্নকে সে কথা বলিয়া হাসিতেছি, ওয়েষ্টল্যান্ড আসিয়া বলিলেন—"কি? আপনারা হাসিতেছেন কেন?" কালীপ্রসন্ন বলিলেন—"ইনি বড় ভাগ্যবান্। এই মাত্র এই বর্ণনাগুলি মুখস্থ করিয়াছেন।" সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কি! এই শুষ্ক জিনিসও কি মুখস্থ করা যায়?" তিনি বহিখানি খুলিয়া, আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, আমি যে উত্তর লিখিতেছি, তাহার সঙ্গে মিলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জজ সাহেবকেও ডাকিলেন। দুজনে হাসিতে লাগিলেন যে, আমার 'কমা'টাও ভুল যাইতেছে না। আমার প্রত্যেক উত্তরের কাগজ শেষ করিয়া উপস্থিত করিলে কালেক্টর পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। 'পেনাল কোডে'র প্রশ্নেও কতকগুলি অপরাধীর বর্ণনা (definition) ছিল। তাহা পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আপনি কোনও অবৈধ পথ অবলম্বন করেন নাই ত? আপনি কি বলিতে চাহেন, পেনাল কোডেরও সমস্ত অপরাধীর বর্ণনা আপনি মুখস্থ করিয়াছেন?" আমি একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"আপনার ইচ্ছা হয়, আপনি আমার পরীক্ষা লইতে পারেন।" তিনি বলিলেন—"আচ্ছা।" তখন 'পেলান কোড' খুলিয়া কতকগুলি দীর্ঘ বর্ণনাসম্বলিত অপরাধের প্রশ্ন করিলেন।—আমার উত্তর তিনি ও জজ সাহেব শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন "আপনার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি। আমি আপনার সমস্ত কাগজের উত্তর যত্নের সহিত পড়িয়া দেখিয়াছি। আপনি নিশ্চয় পাশ হইবেন।" আমি আনন্দের সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। তাহর মাসখানেক পরে তিনি রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর সময়ে "কলিকাতা গেজেট" পাইয়াই আমাকে পত্র লিখিয়াছেন—"আপনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। আপনি এখন দেখিতেছেন, আমার পরামর্শমতে পরীক্ষা দিয়া কত ভাল কাজ করিয়াছেন।"

ক্ষুদ্র সংস্কারক

কুঞ্জ ভায়া একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র। ভায়া একটি অপূর্ব্ব জীব। ভায়ার পঞ্চ মকারের প্রতি অনুরাগ তন্ত্র ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল। তন্নিবন্ধন সেই অল্প বয়সে—কুঞ্জের আমারই বয়স—ভায়ার কীর্ত্তিকলাপ এত অধিক হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহা লিখিলে একটা প্রকান্ড ইতিহাস হইয়া পড়িত। এক এক কীর্ত্তি তাহার আবাসস্থান পল্লীগ্রাম হইতে লাহোর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল, এবং এক একটার ব্যয় সহস্র টাকা পর্য্যন্ত, পিতামহীর বাক্সকে ভগ্নকলেবর হইয়া যোগাইতে হইত। ভায়াকে কোনমতে শাসন করিতে না পারিয়া তাহার পিতা ভায়ার শাসনভার দুর্দ্ধর্ষ ওর্কিনিলি সাহেবের হাতে সমর্পণ করেন। ওর্কিনিলি তাহাকে তাঁহার পেস্কার-পদে নিয়োজিত করেন। কুঞ্জ ভায়াকে প্রভাতে উঠিয়া সাহেবব্যাঘ্রের ঘরে যাইতে হইত এবং তাঁহার সমক্ষে বেলা দশটা পর্য্যন্ত দন্ডায়মান থাকিতে হইত। তাহার পর আহার করিয়া আবার এগারটার সময় কাচারিতে উপস্থিত হইয়া রাত্রি দশটার সময়ে, কি আরও পরে বাড়ী ফিরিয়া আসিতে হইত। নয়টার সময়ে মদের দোকান —হেডমাষ্টার বাবুর 'মামার বাড়ী' বন্ধ হইয়া যাইত। কুঞ্জ ভায়া যে কোথায়ও সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের অবসাদ অপনয়ন করিবেন, তাহার উপায় ছিল না। তাহার পর বেতনের টাকা মাসে মাসে তাহার পিতার কাছে আসিত এবং 'মাতুল'দিগের উপর কড়া আদেশ ছিল যে, কুঞ্জ ভায়াকে তাহারা কখনও 'জননী'র সেবা করিতে দিতে পারিবে না। তাহার সঙ্গে দিবারাত্রি একজন কনষ্টেবল নিয়োজিত থাকিত। ভায়া আমাকে নিজে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এ শালারা এমন পাজি যে, আমাকে এক পা এদিক্ সেদিক্ হইতে দেয় না। পেসাব করিতে বসিলেও সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে। কত ঘুষ দিতে চাহিয়াছি;

মহাশয়! শালাদের পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়াছি। তথাপি সেই শালার ভয়ে এ শালারা আমাকে কিছুতে ছাড়িবে না।" ক্ষোভে, মনস্তাপে কুঞ্জ ভায়া এক এক দিন রাত্রি দশটার সময়ে, যখন তাহার পিতার বৈঠকখানায় পূর্ণমাত্রায় আমাদের আমোদ চলিতেছে, এই বলিতে বলিতে কনষ্টেবল সহচর সঙ্গে আসিতেন—"যা শালা! গলায় দড়ি দিয়ে মরবো। তর্কালঙ্কারের টাকাতে আগুন লেগেছে। এই কুড়ি টাকার জন্য আমার রক্ত না শুষিলে আর হয় না।" তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহার পিতামহ। কথাগুলি এরূপ পঞ্চম স্বরে বৈঠকখানার সম্মুখ দিয়া বলিয়া যাইতেন, যেন তাহার পিতা শুনিতে পান। একদিন হেডমাষ্টার বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কুঞ্জ! বক্‌ছ কি?" ভায়া উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে—কিছু না। এ পাজি কনষ্টেবল বেটাকে বক্‌ছি।" একদিন কুঞ্জ ভায়া কোনওরূপ কৌশল করিয়া সরিয়া পড়েন, এবং নানা অকথ্য স্থানে রাত্রিবাস করেন। চারিদিকে জইণ্ট সাহেবের কনষ্টেবল যমদূতের মত ভায়ার অন্বেষণ করিতেছে—ভায়া অনেক চিন্তার পর তাহার শাসনাতীত হইবার জন্য এক দিব্য উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বেলা দুই প্রহর। প্রখর রৌদ্র। কুঞ্জ ভায়া একখানি ময়লা দুর্গন্ধ গরুর গাড়ীর উপর চিৎ হইয়া মড়ার মত পড়িয়া আছেন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ গাড়োয়ানের একখানি ময়লা চাদরে সমাচ্ছন্ন। এইভাবে গাড়ী কিছু দূর যাইলে এক কনষ্টেবল জিজ্ঞাসা করিল—"তোর গাড়ীতে কে?" গাড়োয়ান কুঞ্জ ভায়ার তালিমমতে শোক-গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—"আমার ভাই। গুড় বেচিতে আসিয়াছিলাম। কাল রাত্রিতে ওলাউঠা হইয়া মরিয়া গিয়াছে।" কিন্তু এই মহাশোক-নাটকে পুলিশ চরের পাষাণ হৃদয় দ্রবিল না। সে হুকুম করিল—"চাদর তোল্!" গাড়োয়ান বেগতিক দেখিয়া গাড়ী ফেলিয়া অশ্ববেগে ছুটিল। তখন কুঞ্জ ভায়া কনষ্টেবলের বেটনাস্ত্রের ভয়ে হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"শালারা! ম'লেও কি তোদের হাতে উদ্ধার নাই?" ভায়া বুঝিলেন যে, খাঁটি মৃত্যু ভিন্ন উদ্ধার নাই। সে অবধি তিনি আর নকল মৃত্যুর দ্বারা, কি অন্য কোনও উপায়ে মুক্তিলাভ করার আকাঙ্ক্ষা ভৈরব নদের অতল জলে বিসর্জ্জন করিলেন। কিন্তু কুঞ্জ বড় ভাল লোক ছিল। তাহার সরল হৃদয়, কোমল প্রাণ। সে নম্র, বিনয়ী, মিষ্টভাষী, এবং পরম পরোপকারী। কেহ বিপদে পড়িয়াছে, কুঞ্জ তাহার জন্য প্রাণ দিবে। কেহ পীড়িত হইয়াছে, কুঞ্জ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে। তাহার মলমূত্র পর্য্যন্ত মুক্ত করিবে। এজন্য যশোহর শুদ্ধ সকলে তাহাকে ভালবাসিত। সে সকলেরই প্রিয়পাত্র। সর্ব্বদা তাহার মুখে হাসি। তাহাকে দেখিলে কেমন মনে একটা আনন্দ, মুখে একটা হাসি আপনি আসিত। এজন্য জইণ্টের দুরন্ত শাসনও সে কৌশলে অতিক্রম করিত। সে বন্ধুগণ হইতে ধার করিয়া, তাহাদের দ্বারা মাতুলভবনে আমন্ত্রণ পাঠাইয়া, জননীবিরহ অনায়াসে নিবারণ করিত। এরূপে ঋণের অঙ্কটা যখন বড় বেশী হইয়া পড়িত, তখন তাহার পিতার কাছে এ সংবাদ কৌশল-ক্রমে প্রেরিত হইত, এবং সম্মান রক্ষার্থ এই ঋণ তাঁহার দ্বারা পরিশোধিত হইত। ফলতঃ জইণ্টের শাসনে ভায়ার ঋণ-কৌশলটা সম্প্রসারিত হইতেছিল। অন্য কোনও উপকার হইতেছিল না। তাহার পিতা তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে তাহার পিতা বাগেরহাটে বদলি হইলেন। কুঞ্জকে বন্ধুবর্গ সকলেই আপন বাসায় রাখিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহার পিতা যে রাত্রিতে বাগেরহাটে যাইবেন, সে রাত্রিতে আমার বাসায় আহার করিবেন বলিয়া আপনি বলিয়া পাঠাইলেন এবং আহার করিতে বসিয়া আমাকে বলিলেন—"কুঞ্জকে আমি তোমার কাছে রাখিয়া যাইতে চাহি। তাহাকে যদি কেহ শুধরাইতে পারে, তুমি পারিবে। সে তোমার যেরূপ বশীভূত, এমন কাহারও আমি দেখি নাই।" কুঞ্জ বাস্তবিকই আমার বড় বশীভূত ছিল, আমাকে বড়ই ভালবাসিত। আমিও তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই, আমি

চট্টগ্রামবাসীর বাসায় তিনি তাঁহার পুত্রকে রাখিয়া যাইবেন। আমি আনন্দের সহিত স্বীকৃত হইলাম। প্রস্তাব শুনিয়া ভায়ার ত আর আনন্দের সীমা নাই। তাহার পিতাকে উভয়ে সাশ্রুনয়নে নৌকায় তুলিয়া আসিবার সময়ে, ভায়া আর আনন্দ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া বলিলেন—"এবার পাথরে পাঁচ কিল।" আমি বলিলাম—"তাহা হউক। কিন্তু তুমি তোমার পিতৃদেবের কথা শুনিলে ত? শেষে আমার অভিভাবকতার উপর কলঙ্ক আনিবে না ত?" সে বলিল—"মহাশয়! তোমার পায়ে পড়িয়া বলিতেছি, আমি তোমার কথার এক সুতা এদিক্ ওদিক্ যাইব না। আমি তোমার গোলামের মত থাকিব।" দুই তিন দিন পরে কালেক্টর ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে—ইনিই পরে Finance Member হইয়াছিলেন—দেখা করিতে গেলে তিনি তাঁহার সেই সুন্দর হাসি হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কুঞ্জ নাকি তোমার সঙ্গে রহিয়াছে?" বোধ হয়, তাহার পিতা তাঁহাকে ইহা বলিয়াছিলেন। আমি উত্তর করিলাম—"হাঁ। তাহার পিতার বিশ্বাস, সে আমার সঙ্গে থাকিলে আমি তাহাকে শুধরাইতে পারিব।" তিনি আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আমার বড় সন্দেহ, তুমি তাহাকে শুধরাও, কি সে তোমাকে নষ্ট করে।"

আমি ধীরে ধীরে কুঞ্জের সংস্কারকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। আমার চিরবিশ্বাস যে, স্নেহের শাসনের তুল্য শাসন নাই। আমার পিতার শাসন হইতে আমি ইহা শিখিয়াছিলাম। আমি কুঞ্জ ভায়ার সকল কথায় সায় দিতে লাগিলাম। সকল আব্দার আনন্দের সহিত পূর্ণ করিতে লাগিলাম, এবং তাহার সঙ্গে যেন প্রাণ বিনিময় করিতে লাগিলাম; কুঞ্জের আর আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার সংস্কারক হাত চালাইতে লাগাইলাম। কুঞ্জ যখন মদ চাহে, তখন আনন্দের সহিত প্রথম প্রথম দিতে লাগিলাম। আমি নামমাত্র তাহার সঙ্গে যোগ দিতাম। দু চার দিন পরে বলিলাম যে, দিনে সুরা স্পর্শ করিলেও আমার অসুখ হয়। অতএব আমি তাহা করিব না। কুঞ্জ ইচ্ছা করিলে খাইতে পারেন। তিনি বলিলেন—"তোমার সঙ্গে না খাইলে আমার কোনও আমোদ লাগিবে না। আমিও দিনে খাইব না।" আমিও এই উত্তর প্রত্যাশা করিতেছিলাম। ইহা সংস্কারকার্য্যের প্রথম সোপান। এই হইতে সুরাদেবীর সঙ্গে কেবল সন্ধ্যাসময়ে সাক্ষাৎ হইতে চলিল। কিন্তু দেবীকে বিতরণ করিবার ভার আমার হস্তে। যশোহরের দুই এক আমোদ-সমিতির অধিবেশনের ফল দেখিয়াই এই বিতরণভার সর্ব্বত্র আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি যদিও তন্ত্রানুসারে কৈশোরেই দেবীর সেবক হইয়াছিলাম, তথাপি আমার সেই সন্ন্যাসী গুরুদেবের কৃপায় দেবী কখনও আমাকে তাঁহার বশীভূত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেবার সময়েও মাত্রাসম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলাম। দেবীর সঙ্গে কলেজ অধ্যয়নসময়ে প্রায় চারি বৎসরই সাক্ষাৎ হয় নাই। কই, তাহাতেও আমি কখন তাঁহার বিরহ অনুভব করি নাই। তাহার পূর্ব্বে কি পরে আমি কখনও তাঁহার নিত্য কি নৈমিত্তিক উপাসক হই নাই। আর যখন তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় তখনও তাঁহার সেবা আমি অতিরিক্তরূপে করি নাই। লোকে কেন করে, তাহাও বুঝি না। জগতে কোনও বস্তুরই নিত্য, কি অতিরিক্ত সেবাতে সুখ নাই। দেবী সম্বন্ধেও এই নিয়ম। আমি দুই সময়ে দেবীর অভাব অনুভব করি—অতি সুখের ও অতি দুঃখের সময়ে। সুখের সময়ে দেবীর কিঞ্চিৎ সেবায় বোধ হয় যেন সুখানুভব অধিকতর হয়; দুঃখের সময়ে যেন দুঃখের বেগ অনেক উপশম হয়। যশোহরের বন্ধুগণ দেখিতেন যে, কেহ দেবীর প্রেমে ভূতলশায়ী হইয়া পড়িলে আমি তাঁহার সেবায় নিয়োজিত হইতাম। আমি তাঁহাদের বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও তাঁহারা আমার এ সকল অসাধারণ গুণে দেবীর বিতরণভার কেবল আমার হস্তে ন্যস্ত রাখিতেন, তাহা নহে; সময়ে সময়ে বলিতেন—"বাবা! তোর পায়ের ধুলা দে।" অতএব সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমি এই উচ্চপদে মনোনীত হইয়াছিলাম

বলিয়া কুঞ্জ ভায়া এ কর্ত্তৃত্ব হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতে সাহস করিতেন না। আমিও ধীরে ধীরে পদগৌরব রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম। ভায়ার অজ্ঞাতসারে আমি ক্রমে ক্রমে মাত্রাটা কমাইতে আরম্ভ করিলাম। তাঁহার প্রাণগত কথা সকলই আমি জানিতাম। সে সকল কথায় তাহাকে এরূপ অন্যমনস্ক করিয়া রাখিতাম যে, ভায়া যে ক্রমে ক্রমে মাত্রাচ্যুত হইতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিতেন না। শেষে অধঃপতন এত দূর ঘটিল যে, একদিন কুঞ্জ দুঃখ করিয়া বলিল—"মহাশয়! তুমি করিলে কি? যে কুঞ্জের এক বোতল মদ খাইলে নেশা হইত না, তাহার এখন মদ ছুঁইলেই নেশা হয়! এ দুঃখ কোথায় রাখিব!" আমি বলিলাম—"তোমার নেশা হওয়াই ত চাহি। তাহা যদি অল্প মদে হইল, তবে আর বেশী মদ খাইয়া অর্থ ও শরীর নষ্ট করিয়া কি ফল?" এরূপে তাহাকে আমি সংস্কারের তৃতীয় সোপানে উত্থিত করি।

বাকী রহিল কুঞ্জ ভায়ার সময়ে সময়ে নৈশ পর্য্যটন। কিন্তু তিনি আমার অনুমতি না পাইয়া বড় একখানি বাহির হইতেন না। অনুমতির সংখ্যা আমি ক্রমে ক্রমে কমাইতে লাগিলাম। আজ আমার কাল্পনিক অসুখ, অতএব কুঞ্জ কি আমাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাইবে? আজ দুজনে সন্ধ্যাটা আমোদে বাড়ী বসিয়া কাটাইব। আজ দুজনে একসঙ্গে কোনও বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে যাইব। এরূপে যখন ভায়ার এ অভ্যাসটাও খুব কমিয়া আসিল, তখন অবশিষ্ট ভাগটুকু উড়াইবার জন্য একদিন উপযুক্ত সময় বুঝিয়া আমি তোপ দাগিলাম। শরৎকাল, বড় মনোহর জ্যোৎস্না। উপরে আকাশ, নীচে পৃথিবী যেন হাসিতেছে। বাসার পার্শ্বস্থ ভৈরব নদের স্রোতহীন নীল জলে জ্যোৎস্না হীরকচূর্ণের মত কি মধুর ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মির বক্ষে শত সহস্র খণ্ড হইয়া শোভা পাইতেছে। নদী-তীরস্থ শ্যামল প্রাঙ্গণে মদিরাক্ত প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রথম যৌবন-সুলভ কত কথাই কহিতে-ছিলাম, কত হাসি হাসিতেছিলাম। শরতের জ্যোৎস্না সে হৃদয় যেন উন্মত্ত করিয়া তুলিতে-ছিল। কুঞ্জ বলিল—"মহাশয়! তুমি যা কর, তা কর; আমি আজ একবার বেড়াইতে না গিয়া ছাড়িব না।" আমি বলিলাম—"কুঞ্জ! আমিও আজ তোমার সঙ্গে যাইব।"

কু। সত্য?

আ। সত্য।

কুঞ্জের আর আনন্দের সীমা রহিল না। বলিল—"আজ দুশ মজা!" আমি বলিলাম —"এ সন্ধ্যার সময়ে ত আর আমি যাইতে পারি না। আহারের পর যাইব।" তখনই প্রায় রাত্রি দশটা। আহার করিতে ও সাজসজ্জা করিতে আমি আরও দুই ঘণ্টা কাটাইলাম। আমাকে যেন কেহ চিনিতে না পারে; কুঞ্জ আমার মাথায় উড়ানি দিয়া দিব্য এক পাগড়ী বাঁধিয়া দিল, এবং নিজেও একটা বাঁধিল। দুজনের সে শ্বেতবসন-সজ্জিত মূর্ত্তি সেই ফুল্ল জ্যোৎস্নায় অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। গৃহের বাহির হইয়া আমি বলিলাম—"কুঞ্জ, একটি কথা। আমার বোধ হয়, অনর্থক ক্লেশ পাইয়া এই দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া মরিব। রাত্রি বেশী হইয়াছে। বোধ হয়, কোনও দ্বারই অনর্গল পাইবে না।" কুঞ্জ বলিল—"কুছ্ পরওয়া নাই। আমি কুঞ্জকে দোর খুলিবে না! একবার তুমি আজ আমার প্রভুত্ব দেখ!" আমি এই উত্তর প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, এবং সেই প্রভুত্বের পরাভব দেখিতে চলিলাম। শীতল রজতামৃতের মত নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় যশোহর প্লাবিত হইয়া সেই দ্বিতীয় প্রহর নৈশ নির্জ্জনতায় কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল! রাজপথ যেন দীর্ঘ আরক্ত পুষ্প-হারের মত শোভা পাইতেছিল। সমস্ত নগর নীরব, নিদ্রিত, শান্তিময়। আমাদের পাদুকার শব্দ এত গুরুতর শুনাইতেছিল যে, প্রহরী কনষ্টেবলদের পর্য্যন্ত নিদ্রাভঙ্গ হইতেছিল। কিন্তু শুভ্রবসন-সজ্জিত সুন্দর মূর্ত্তি দুটি দেখিয়া তাহারা কিছু প্রতিশোধ লইতে পারিল না। কেবল একজন বলিল—"কোন্ হায়?" কুঞ্জ উত্তর করিল—"তোমারা বাপ!" সে নীরবে

কুটুম্বিতাটা সহিয়া রহিল। আমি এক এক স্থানে রাস্তার উপর জ্যোৎস্নায়, কি বৃক্ষছায়ায় দাঁড়াইয়া থাকি, আর কুঞ্জ ভায়া দুই চারি দশ বাড়ীতে কপাটে প্রহৃতমস্তক হইয়া, এবং তজ্জন্য নানারূপ বিকৃতকণ্ঠে অভিধানবহির্ভূত সম্ভাষণ শুনিয়া, ফিরিয়া আসেন। এই-রূপে ক্রমে ক্রমে সকল স্থানে—এমন কি, খলসে পুঁটির কাছে পর্য্যন্ত ভায়ার প্রভুত্বের অপলাপ ঘটিলে, কুঞ্জ তখন উদ্দেশে তাহাদের চতুর্দ্দশ কুল পর্য্যন্ত নানারূপ কুটুম্বিতা বিস্তার করিয়া বলিলেন—"চল মহাশয়! বাড়ী চল।" আমি সমস্ত পথে এতাদৃশ মহা-পুরুষের প্রতি তাহাদের এরূপ দুর্ব্ব্যবহার অমার্জ্জনীয়ভাবে বহু বর্ণে রঞ্জিত করিলাম। বাসায় ফিরিয়া বড়ই কাতরকণ্ঠে বলিলাম—"কুঞ্জ! এরূপ কষ্ট আমি কখনও পাই নাই।" কুঞ্জ একেই বড় অপমানিত ও মর্ম্মাহত হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে আমার এই কথা শুনিয়া ও আমার সেই ছদ্ম ক্লান্তি ও কাতরতা দেখিয়া, সে প্রাণে দারুণ ব্যথা পাইল। বলিল—"মহাশয়! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি বিদ্যারত্নের পুত্র এবং তর্কালঙ্কারের পৌত্র নহি, যদি আর কখনও এ শালীদের বাড়ী পা ফেলি।" আমি বলিতে বাধ্য যে, ইহার পর আমি আর যে কয়েক মাস যশোহরে ছিলাম, কুঞ্জ তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম যে, স্নেহের শাসনতুল্য শাসন নাই। আজ কুঞ্জ নাই। কয়েক বৎসর পরেই কুঞ্জ চলিয়া গিয়াছে। তাহার সেই সরল সুন্দর মুখখানির স্মৃতি মাত্র আমার হৃদয়ে সজীব রহিয়াছে।

ধর্ম্ম-বিপর্য্যয়

কুঞ্জ একদিন এই সংস্কারের প্রতিশোধ লইয়াছিল। পূজার বন্ধে কুঞ্জ বাড়ী গেল। আমি যশোহরে একা রহিলাম। তাহার পিতা বড় প্রীত হইয়া আমাকে পত্র লিখিলেন—"তুমি কুঞ্জকে আশ্চর্য্যরূপে শুধরাইয়াছ। কুঞ্জ এখন বেশ ভাল ছেলে।" কুঞ্জ বারটা দিন বন্ধেও আমাকে ফেলিয়া বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। উক্ত পত্র জয়পতাকার স্বরূপ লইয়া কুঞ্জ আনন্দে আটখানা হইয়া ফিরিয়া আসিল। পত্রে কি লেখা আছে, কুঞ্জ তাহার পিতার ব্যবহারের দ্বারা বুঝিয়াছিল। পত্র পড়িয়া তাহার আর মুখে হাসি, হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। সে বলিল—তাহার পিতা আহাকে এবার বড়ই আদর করিয়াছেন। সে বলিল—"বাড়ীতে যে কয়দিন ছিলাম, একটি দিনও বাবা কোনও ব্যতিক্রম দেখেন নাই। মহাশয়! তোমার পা ছুঁইয়া দিব্বি করিয়া বলিতে পারি, আমি একটি দিনও তোমার শিক্ষা ভুলি নাই। কিন্তু তুমি কাছে ছিলে না বলিয়া পূজার আমোদটা কিছুই ভাল লাগে নাই। তোমাকে এত করিয়া বলিলাম, তুমি গেলে না! বাবাও তজ্জন্য দুঃখ করিলেন।"

কুঞ্জ দ্বাদশীর দিন ফিরিয়া আসে। সন্ধ্যার সময়ে আবার প্রাঙ্গণে কাষ্ঠমঞ্চে আমরা দুজনে সেই ভৈরব নদের তীরে বিরাজ করিতেছি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না! চারি দিক্ যেন ধপ্‌ধপ্ করিতেছে! উপরে কি সুন্দর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শান্ত নির্ম্মল আকাশ, এবং আকাশে কি সুন্দর সুশীতল শশধর। দুইটি নবযুবকের নয়নে সকলই কি সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রকৃতিও যেন নবযৌবনের মদিরায় ও মাধুর্য্যে আবেশময়। দুইজনে কত গল্প করিতেছি, কত ঠাট্টা তামাসা করিতেছি, কত হাসিতেছি! জ্যোৎস্নার মত হৃদয়ের আনন্দও যেন উছলিয়া পড়িতেছে। কুঞ্জ বলিল—"আমাদের দেশে দশমীর রাত্রিতে সকলে সিদ্ধি খাইয়া থাকে। তোমার জন্যে খানিকটা তৈয়ারি সিদ্ধি আনিয়াছি। মহাশয়! তোমার বাঙ্গাল দেশে এমন সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে পারে না। তোমাকে খাইতে হইবে।" আমি বলিলাম, আমি সিদ্ধি কখনও খাই নাই। ভোলানাথ সাজিবার সাধও আমার নাই। আমি খাইব না। কুঞ্জ বলিল—"মহাশয়! তুমি একটি বার খাইয়াই দেখ না ছাই! ঠিক

সরবতের মত লাগিবে। দেখিবে কত মজা।" কুঞ্জ ভায়া তখন সেই মহাদেবের প্রিয় বস্তু বাহির করিলেন, এবং আপনি নন্দির স্থান অধিকার করিয়া, তাহা ষোড়শোপচারে প্রস্তুত করিয়া, এক গেলাস আমার সমক্ষে ধরিলেন। আমি আবার গুরুগম্ভীরভাবে প্রতিবাদ করিয়া অগত্যা অনিচ্ছায় একটুক খাইলাম। বেশ সরবতের মতই লাগিল। কুঞ্জ জিদ করিতে লাগিল। তখন গ্লাসটি নিঃশেষ করিলাম। কুঞ্জ নিজে জহ্নু মুনির মত একটি ছোট রকমের সিদ্ধিগঙ্গা গণ্ডূষ করিল। কিছুক্ষণ পরে আমার নেশা বোধ হইতেছে কি না, কুঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম—না। সে বলিল, তাহার বেশ একটু গোলাপী নেশা বোধ হইতেছে। আমি বলিলাম—ভায়ার তাহা ত বাতাসেও হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যেন থাকিয়া থাকিয়া কি রকম একটা হঠাৎ কোথা হইতে কোথায় যাইতেছি, কি ভাবিতে কি ভাবিতেছি,—এরূপ একটা অবস্থা হইল। এক এক বার দুইজনে খুব হাসি। আবার খানিকটা পরে ভাবি—কেন হাসিলাম। আহার করিতে বসিলাম। উভয়ে থাকিয়া থাকিয়া কেবল হাসিতে লাগিলাম—সে হাসি অশান্ত, অসম্বন্ধ, অর্থহীন। এক এক বার তাহা বুঝিতেছিলাম এবং আত্মসম্বরণের চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু আবার কি যেন একটা হাসির তরঙ্গ আসিয়া সব ভাসাইয়া লইতেছিল। খাওয়া কিছুই হইল না। আমার কেমন বুক শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

গ্লাসের পর গ্লাস তেঁতুলসংযুক্ত সরবত খাইলাম। কুঞ্জ ভায়ার প্রেস্ক্রিপসন। আমার তখন বড় ভয় হইল। কত আস্ত তেঁতুল গুলিয়া খাইলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছে না। শুইয়া আছি। যেন এক এক বার বোধ হইতেছিল, পালঙ্কশুদ্ধ আমি কোথায় উড়িয়া যাইতেছি। বহু ঊর্দ্ধে উঠিয়া যেন পালঙ্ক হইতে পড়িয়া গেলাম। পড়িয়া যেন জাগিয়া উঠিলাম। এক একবার বেশ জ্ঞান হইতেছিল। দেখিলাম, শয্যাপার্শ্বে আমার দেশস্থ প্রজা ভৃত্যটি ভূতলে বসিয়া কাঁদিতেছে। জ্ঞান হইলে আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। কুঞ্জও কক্ষের অন্য প্রান্তে এক পালঙ্কে পড়িয়া ঠিক আমারই মত করিতেছে। আর একবার একবার বলিতেছে—"মহাশয়! এ কি হইল! বুক ফাটিয়া যাইতেছে যে!" আবার লহর তুলিয়া হাসিতেছে। আর একবার বহুক্ষণ পরে জ্ঞান হইলে আমি ভৃত্যটিকে বলিলাম—"যদি দেখিস্, অনেকক্ষণ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছি, কি কোনও রকম বেগতিক ঘটিয়া উঠিতেছে, তবে ডাক্তার বাবুকে ডাকিয়া আনিস্।" কথা কহিতে কহিতে আমি আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। এরূপে কি যন্ত্রণায়, কি ভয়ে যে রাত্রি কাটাইলাম, এখনও মনে হইলে আমার হৃৎকম্প হয়। এই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থায় সমস্ত রাত্রি, পরদিন প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত কাটিয়া গেলে যেন কিঞ্চিৎ উপশম হইল। কি যেন কষ্টের নিদ্রা হইতে জাগিলাম। কিন্তু মাথা তুলিবার শক্তি নাই। সমস্ত শরীর অবশ ও অবসন্ন, মাথায় দারুণ বেদনা, প্রাণে দারুণ পিপাসা। শুনিলাম, ভৃত্য রাত্রিতে ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। তিনি কি ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত ভৃত্য সমস্ত রাত্রি জাগিয়া দুজনকে তাহা খাওয়াইয়াছে। কিন্তু আমার কিছুই মনে নাই। কুঞ্জ তখনও অজ্ঞান। সেদিন এরূপভাবে কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে জাগিতেছি, আবার ঘোরতর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। সংবাদ পাইয়া সন্ধ্যার সময়ে বন্ধুগণ সমবেত হইয়াছেন। হেডমাষ্টারবাবুর সেই তারকণ্ঠ ও উপহাস শুনিয়া নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। তিনি গায় মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"বেটা! তান্ত্রিকের ছেলে। শক্তিমন্ত্র ছাড়িয়া শিবমন্ত্র ধরিয়াছিস্, যন্ত্র ছাড়িয়া সিদ্ধির যষ্টি ধরিয়াছিস্। এরূপ ধর্ম্মবিপর্য্যয়, —তা ধর্ম্মে সহিবে কেন? আয় বেটা, প্রায়শ্চিত্ত কর্! এক পাত্র টান্! শক্তির ভয়ে শিব বেটার চৌদ্দ পুরুষ ছুটিয়া পালাইবে।" দেখিলাম, তিনি ইহারই মধ্যে শক্তিসেবা আরম্ভ করিয়াছেন। আমি বলিলাম—"দোহাই আপনার! ইহার উপর এই ব্যবস্থা হইলে আমি বাঁচিব না।" তখন তিনি বলিলেন—"যা বেটা! তবে প'ড়ে ঘুমা।" এবং মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া বন্ধুদের

সঙ্গে যাত্রা করিলেন। আমিও তাঁহার উপদেশ পালন করিলাম। সে রাত্রিও অর্দ্ধনিদ্রা অর্দ্ধজাগরণ—সেই অপূর্ব্ব অবস্থায় কাটাইলাম। পরদিন প্রভাতে সুস্থ হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম, এবং প্রতিজ্ঞা করিলাম, মহাদেব মাথার উপর থাকুন, তাঁহার এই প্রিয় বস্তু আর কখনও স্পর্শ করিব না।

মহাদেব সিদ্ধিভক্ত, তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ 'ভাঙ্গর', তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু জগন্নাথদেব যে সিদ্ধি, কি গঞ্জিকাভক্ত, তাহা কেহ জানেন কি? কেবল পুরী সহরেই স্মরণ হয়, বৎসরে ৮০ মণ, কি কত গাঁজা বিক্রয় হয়। সিদ্ধির বিক্রয়টাও সেইরূপ। আমি এ সকল দেবপ্রসাদের ভাণ্ডারী ছিলাম। একদিন শ্রীমন্দিরের সম্মুখে স্তূপাকার সিদ্ধি ও গাঁজা ওজন করাইতেছি। আমি রাস্তার উপর এক চেয়ারে অধিষ্ঠিত। এক পাল সিদ্ধিখোর ও গাঁজাখোর আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, এবং হাঁ করিয়া বসিয়া সেই সম্মিলিত সৌরভ উদরস্থ করিতেছে। বিনা পয়সায় এই ঘ্রাণ-লাভটুকুও যেন তাঁহারা মূল্যবান্ মনে করিতেছিল। পুলিস তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চাহিল। আমি মানা করিলাম, এবং তাহাদের নানা ভঙ্গীতে বসিয়া সেই উগ্র সৌরভপান দেখিয়া হাসিয়া অধীর হইলাম। তাহারা যেরূপ ভক্তিপূর্ণ গদ-গদ ভাবে আমার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, আমার বোধ হইল, তাহাদের চক্ষে আমার অপেক্ষা বড় লোক আর নাই। পরিমাণকার্য্য শেষ হইল। আমি চলিয়া যাইতেছি, এমন সময় একজন অগ্রসর হইয়া, হাত দুখানি জোড় করিয়া বলিল—"অবধান! মোতে কিছি দিবাকু আজ্ঞা হেউ!"

আমি।—আমি কেমন করিয়া দিব?

সে।—আপনঙ্ক এত্তে মালঅ অছি!

তাহার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া বোধ হইল, সে মনে মনে স্থির করিয়াছে, এই গোলা শুদ্ধ সিদ্ধি গাঁজার যখন আমি অধিকারী, তখন সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবীর অধীশ্বর আমার কাছে কেহই নহে। এত মাল কাহার আছে? আমি বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, এ মহামূল্য পদার্থের কিছুমাত্র দান করিবার আমার অধিকার নাই। তাহারা পাল শুদ্ধ আসিয়া পা জড়াইয়া ধরিল। তখন যে সকল চূর্ণ রাস্তায় ওজন সময় পড়িয়াছিল, গোলাদার আমার বিপদ্ দেখিয়া তাহাদিগকে দান করিল। তখন 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া মহানন্দে তাহারা উহা কুড়াইতে লাগিল। সমবেত লোকমণ্ডলীও হাসিতে লাগিল। আমি অব্যাহতি পাইয়া সরিয়া পড়িলাম।

আর একদিন মাদারিপুরে বিপদে পড়িয়াছিলাম,—আফিমখোরের হাতে। আফিম আমাদের কোনও দেবতা সেবন করিতেন কি? না করুন, এখন অপদেবতারা গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং অহিফেন কমিশনের সমক্ষে ডাক্তার ও কবিরাজবৃন্দ একবাক্যে ইহার অনন্ত গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। মাদারিপুরের আফিমের দোকান নীলামে কেহ ডাকিল না। আমি পরদিন প্রাতে মফস্বলে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিয়াছি, এক পাল আফিমখোর আসিয়া নৌকা ঘেরিয়া ফেলিল, এবং আমাকে বহুতর অমধুর সম্ভাষণ করিয়া বলিল—"সরকার বাহাদুরের মাল! তুমি কে যে দিবে না? তুমি মাল না দিয়া যাইতে পারিবে না।" মাঝিদের প্রহার সত্ত্বেও তাহারা নৌকা টানিয়া এক মাথা ডাঙ্গার উপর তুলিয়া ফেলিল। আমি এরূপ কৃপাপাত্রকে প্রহার করিতে নিষেধ করিয়া কতক্ষণ তাহাদের সঙ্গে তামাসা করিলাম। দেখিলাম, সঙ্গে পূর্ব্বদোকানদারকেও আনিয়াছে। সে বলিল, তাহাকে তাহার ভাতপাত হইতে টানিয়া আনিয়াছে। তাহার দ্বারা একটি খাজনা স্বীকার করাইয়া, 'ট্রেজারি' হইতে আমার দ্বারা আফিম বাহির করিয়া লইল, তবে তাহারা আমার নৌকা ছাড়িয়া দিল। এই দুই হাস্যকর দৃশ্য আমি কখনও ভুলিতে পারি নাই। যাঁহারা কেবল জলময়ী দেবীর একচেটিয়া নিন্দা করেন, তাঁহারা দেখিবেন, এই পত্রময় ও ক্লেদময় দেবত্রয়ও—সিদ্ধি, গাঁজা, আফিম—মাহাত্ম্যে বড় কম নহেন।

মাতৃশোক

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, বাড়ী গিয়া মাতার অবস্থা দেখিয়াই আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনিও আর বহুদিন এ সংসারে থাকিবেন না। মাতার হৃদয়ে শান্তি ও শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য আমি পিতৃব্যদের স্বার্থপরতারূপে ঋণ করিয়া ভগিনীর বিবাহের জন্য যে ২০০, টাকা লইয়াছিলাম, তাহা বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলাম। যশোহর আসিয়া ও মাতার কাছে নিয়ত দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমাদের ভগ্ন সংসার পুনঃস্থাপিত করিবার আশায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণিত করিতে চেষ্টা করিতাম। মাসে মাসে বাড়ীর নিয়মিত খরচের টাকা পাঠাইয়া দিতাম। পিতা যাহা দিতেন, তাহার চতুর্গুণ টাকা পাঠাইতাম। কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইল। মাতা যেন আমার ভগ্নী তারার বিবাহের জন্য মাত্র জীবিত ছিলেন। তাহার বিবাহের সঙ্গেই যেন মাতার সংসারবন্ধন ছিন্ন হইল। পিতা ভাদ্র মাসে তিরোহিত হন। আমি পরের আষাঢ় মাসে বাড়ী গিয়াছিলাম। অগ্রহায়ণ মাসে অকস্মাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় বিদ্যুৎ নীরব বজ্রনিনাদে ঘোষিত করিল—আমি মাতৃহীন! যে দারুণ ওলাউঠা রোগে শৈশবে দুই পিতৃব্য হারাইয়াছিলাম, সেই রোগে পূর্ব্বদিন একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা—সোনার পুতুল সাত আট বৎসরের শিশু সারদা—মাতৃ-অঙ্ক শূন্য করিয়া চলিয়া যায়। পতিশোকের উপর এই পুত্রশোকে মাতাও সেই রোগে, পল্লীগ্রামে অচিকিৎসায়, আমাদের স্নেহবন্ধন কাটাইয়া স্বর্গীয় পতিপুত্রের অনুগমন করেন। এক বৎসরের মধ্যে দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে আমি পিতা মাতা উভয় হারাইলাম। যেই দুই স্নেহস্রোতস্বতী—যেই দুই গঙ্গা যমুনা মানবজীবন সুশীতল করে, যৌবনের আরম্ভেই আমার জীবন মরুময় করিয়া অন্তর্হিতা হইল। তিরোধানসময়ে একবার আমি হতভাগ্য পিতৃমাতৃচরণ বুকে লইয়া তাহাতে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেও পারিলাম না। পুত্রের এ সান্ত্বনাটি পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। পিতা ত তাঁহার "আশালতা"র ফল পর্যন্ত দেখিয়া গেলেন না। পিতার চরণে একটি তৃণও কখন উপহার দিতে পারি নাই। মাতার চরণেও দুদিন বই পারিলাম না। এ জীবন কাহার জন্য বহিলাম! এ কথা এই জীবনে প্রতি দিন প্রতি কার্য্যে মনে পড়িয়াছে, এবং এরূপে দর দর ধারায় অশ্রুজলে বক্ষ ভাসিয়া গিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত ইহার কোনও উত্তর পাইলাম না। সেই বজ্রবাহী টেলিগ্রামখানি বুকের নীচে চাপিয়া রাখিয়া সমস্ত অপরাহ্ন, সমস্ত রাত্রি শয্যায় পড়িয়া কি করিতেছিলাম, জানিতে পারি নাই। মাতাকে সুখী করিব, এই আশায় পিতৃশোক সহিয়া রহিয়াছিলাম। এই আশার আলোকে সেই নিবিড় তিমির কথঞ্চিৎ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছিলাম। আজ অকস্মাৎ সকল আলোক নিবিয়া গেল। হৃদয়ের সকল উৎসাহ নিবিয়া গেল। মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে সংসার আমার চক্ষে যেরূপ ছিল, সেরূপ রহিল না। আর সেরূপ হইল না। আমি যেরূপ ছিলাম, আর সেরূপ হইলাম না। সেই নিরাশাসাগরে ডুবিতে ডুবিতে একটি মাত্র তৃণ অবলম্বন করিয়া ভাসিতে চাহিতেছিলাম। এ জীবন কাহার জন্য বহিব? অনাথ শিশু ভ্রাতা ভগ্নীর জন্য বহিব, পিতৃব্যপত্নীর ও পিতৃব্যভ্রাতার জন্য বহিব, সর্ব্বশেষে—পত্নীর জন্য বহিব। এই কর্ত্তব্যে ভর করিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। কিন্তু সেই ভগ্ন হৃদয় জোড়া লাগিল না, প্রাণে সেই উৎসাহ, মনে সেই আনন্দ আর থাকিল না। সেদিন সংসারের প্রতি, অর্থের প্রতি হৃদয়ে যে ঔদাসীন্য সঞ্চারিত হইল, তাহা আর অপনীত হইল না। সেই দিন হৃদয়ে যে অভাব অনুভব করিলাম, তাহা আর পূরিল না। যেই স্নেহতৃষ্ণা, প্রেমপিপাসা জ্বলিয়া উঠিল, তাহা আর পরিতৃপ্ত হইল না। কতরূপ প্রেম অনুভব করিয়াছি, কতরূপ প্রেমপুষ্পে পুষ্পে মধু পান করিয়াছি, কিন্তু কই—সেই পিপাসা মিটিল না। পরিবারস্থের প্রেম বল, পত্নীর প্রেম বল, পুত্রের প্রেম বল, সকলেই স্বার্থের গন্ধ রহিয়াছে। এই জীবনের অপরাহ্নে বুঝিয়াছি, একমাত্র নিঃস্বার্থ প্রেম পিতা মাতার। আমি যৌবনের আরম্ভে এই নিঃস্বার্থ প্রেম হইতে বঞ্চিত হইয়াছি বলিয়া আমার প্রেমের পিপাসা মিটে নাই। ভগবান্! তুমি প্রেমময়। তুমি মিটাইবে কি?

যশোহরে থাকাতে এ মহাশোকে যে শান্তি পাইয়াছিলাম, তাহা আর কোথায়ও পাইতাম না। যেই মাতৃবিয়োগের সংবাদ প্রচারিত হইল, বন্ধুগণ সকলেই আসিলেন এবং দুই এক জন করিয়া, দুই চারি দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কতরূপে আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। একটুক স্থির হইলে হেডমাষ্টারবাবু জোর করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী আমাকে শিশুটির মত বুকে লইয়া গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—"কে বলিল তোমার মা মরিয়াছে? এই যে আমি তোমার মা কাছে রহিয়াছি।" আমি তাঁহার বক্ষে মাথা রাখিয়া বড় কাঁদিলাম। এ কয়দিন তেমন কাঁদিতে পারি নাই। তাঁহাদের পুত্র-কন্যাগুলি পর্য্যন্ত কাঁদিতে লাগিল। হেডমাষ্টারবাবু কাঁদিয়া অধীর হইলেন। সে স্থান হইতে অন্যতম ডেপুটি দুর্গাদাসবাবু তাঁহার বাটীতে লইয়া গেলেন। তাঁহার স্ত্রী তখন পর্য্যন্ত আমার সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। তিনিও বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনিও আমার মা। আমি এক মা হারাইয়া দুই মা পাইলাম।

"খ্রীষ্ট্‌মাসে"র বন্ধ প্রায় উপস্থিত। দুর্গাদাসবাবুর একটি পুত্রের ওলাউঠা হইল। তাহার অনুমান আট বৎসর বয়স। ন দিবা ন রাত্রি আমরা তাহার সেবাশুশ্রূষায় লাগিয়া রহিলাম। নয় দিন এরূপে কাটিয়া গেল। শিশুটি যেন জীবনের জন্য যুদ্ধ করিতেছিল। আজ খ্রীষ্টমাসের বন্ধ। আমার এখনও কাচা গলায়। ধুতি চাদর পরিয়া আফিস করিতেছি। সন্ধ্যার সময় দুর্গাদাসবাবুর বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম, শিশুটি সে অবস্থায় আছে। তাঁহার একটি মহরার তাহার বড়ই যত্ন করিতেছিল। সে আমাকে চুপে চুপে বলিল যে, আজ রাত্রি রক্ষা পাইবে না। শীঘ্র হবিষ্য করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য সে আমাকে অনুরোধ করিল। আমি ফিরিয়া যাইতেছি—এমন সময় দেখি, হেডমাষ্টারবাবু আরো দুই একটি বন্ধ উপলক্ষে আগত বন্ধুর সঙ্গে অন্য এক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের বাড়ী ডিনার খাইতে যাইতেছেন। আমি তাঁহাকে উক্ত মহরারের আশঙ্কার কথা বলিয়া নিমন্ত্রণে যাইতে নিষেধ করিলাম। তিনি উহা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন—"আমার স্ত্রী বলিয়াছে, সে ছোঁড়ার আরো ১৫ দিনে কিছু হইবে না।" তিনি এরূপ সকল কথায় তাঁহার স্ত্রীর authority হাজির করিতেন। আমি তখন একটুক গম্ভীর ভাবে বলিলাম,—"খ্রীষ্টমাসও আবার ফিরিবে, ডিনারও ঢের জুটিবে। কিন্তু দুর্গাদাসবাবুর এ পুত্র আর ফিরিবে না। আপনি নিজে পিতা, আমি আপনাকে অধিক আর কি বলিব?" তিনি গাড়ীতে পার্শ্বস্থিত বন্ধু দুটিকে বলিলেন—"না, বেটা বড় শক্ত কথা বলিয়াছে। আমি যাইব না। তোমরা যাও।" তিনি পদব্রজে আমার সঙ্গে চলিলেন। দুর্গাদাসবাবুর বাটীতে পঁহুছিয়া দেখি, বাড়ী নীরব। পরিবারস্থ সকলে নয় দিবসের চিন্তায় ও রাত্রিজাগরণে অবসন্ন ও নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। কেবল এক পার্শ্বের এক কক্ষে মৃত্যুর ক্রোড়ে সেই শিশুটি এবং পার্শ্বে বসিয়া সেই মোহরারটি। আমরা যাইবামাত্র সে বলিল—"আর বড় বিলম্ব নাই।" হেডমাষ্টারবাবু শিশুটির পার্শ্বে আড় হইয়া ডান হাতের পাতায় তাঁহার মাথা রাখিয়া বসিলেন, এবং বাম হস্তে তাঁহার ঘড়িটি লইয়া দেখিতে লাগিলেন। পার্শ্বে মিট্ মিট্ করিয়া একটা দীপ জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে শিশুর মৃত্যুলক্ষণ সকল দেখা যাইতে লাগিল। আমি পার্শ্বে প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম। জীবনে এরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে আর দেখি নাই। পিতৃব্যদের ও পিতামহীর দেহত্যাগের সময় শোকে এত অভিভূত ছিলাম, তাহা এরূপ স্থিরচিত্তে দেখিতে পারি নাই। পা দুখানি হইতে ক্রমে ক্রমে প্রাণ কিরূপে উর্দ্ধদিকে সরিয়া আসিতেছিল, কিরূপে ক্রমে ক্রমে শরীরের অধোভাগ জড়ত্বে পরিণত হইতেছিল, আমি স্থিরনয়নে দেখিতেছিলাম। গৃহ নীরব, যেন জনমানব নাই। কক্ষ নীরব, আমাদের তিনজনের যেন নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পড়িতেছিল না। ক্রমে ক্রমে প্রাণ সর্ব্বাঙ্গ হইতে মস্তকে সরিয়া আসিল। তখন সেই নয়নঘূর্ণন, সেই মুখভঙ্গী—যাহা একবার

দেখিলে জীবনে বিস্মৃত হওয়া যায় না।—প্রকটিত হইল। মুহূর্ত্তেকে সেই ভঙ্গী অবিচল হইল,—কি যেন শরীর হইতে অদৃশ্য ভাবে চলিয়া গেল—সকলই ফুরাইল। হেডমাষ্টারবাবু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। আমাকে গৃহের বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। রাত্রি তখন দশটা। কেমন এক মলিন জ্যোৎস্না নীরবে গম্ভীর ভাবে বাহিরে পড়িয়া আছে। আমাদের হৃদয়ের মত তাহাতেও কি যেন এক শোকছায়া পড়িয়াছে। গৃহের সম্মুখস্থ ঝাউসারি সেই নীরব প্রাঙ্গণে কি যেন এক শোকগীত গাইতেছে। তাহার ছায়ায় দাঁড়াইয়া হেডমাষ্টারবাবু আমাকে বলিলেন—"তুমি কি বল? আমি বলি, কাহাকেও না উঠাইয়া আমরা শব শ্মশানে লইয়া যাই। ইহাদিগকে জাগাইলে কেবল একটা অনর্থ করিবে মাত্র।" আমি তাহাতে সম্মত হইলাম না। আমি বলিলাম যে, যখনই তাঁহারা জাগিবেন, সেই অনর্থ ত করিবেনই। অথচ শিশুটিকে একবার এ জীবনের মত শেষ দেখা না দেখিলে তাঁহারা আরও শোকাতুর হইবেন। অতএব একবার দেখাইয়া লওয়া ভাল। তখন হেডমাষ্টারবাবুও আমার পরামর্শ ভাল মনে করিলেন। আমরা শিশুটিকে বাহির করিয়া আনিয়া, একটি ঝাউবৃক্ষের তলায় রাখিয়া, তাহার পিতৃদেবকে জাগাইতে তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমি এক হাত ধরিলাম ও হেডমাষ্টারবাবু আর এক হাত ধরিলেন, এবং আস্তে আস্তে কানের কাছে মুখ দিয়া ডাকিলেন। তিনি—"কি, সব ফুরাইয়াছে বুঝি!"—বলিয়া, তড়িতচালিতবৎ শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। কক্ষ অন্ধকার। হেডমাষ্টারবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। আমি কেবল আস্তে আস্তে রুদ্যমান কণ্ঠে বলিলাম—"আপনি বাহিরে আসুন।" তিনি বলিলেন —"তুই কাঁদিস্ না। আমার হাত তোমরা ছাড়িয়া দেও—আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, তোমরা দেখ। আমি পাগল নহি। আমাদের কর্ত্তব্য যাহা করিয়াছি। ইহার উপর মানুষ কি করিতে পারে!" তাঁহার কণ্ঠ স্থির। আমরা হাত ছাড়িয়া দিলাম। তিনি বাহিরে আসিলেন। সেই ঝাউতলায় শায়িত মৃত স্নেহপুত্তলের মুখ মলিন চন্দ্রালোকে একবার নয়ন ভরিয়া দেখিলেন। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। একবার নয়নের বিগলিত অশ্রু মুছিয়া ফেলিলেন। হেডমাষ্টারবাবু বলিলেন—"আর ইহাদের জাগাইয়া কাজ নাই। আমরা ইহাকে লইয়া যাই।" তিনি স্থিরকণ্ঠে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"নবীন! তুই কি বলিস্?" আমি বলিলাম, তাহাদিগকে না দেখাইয়া লইয়া যাওয়া আমি ভাল বিবেচনা করি না। তিনি বলিলেন তাঁহারও সেই মত। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে যেই ডাকিলেন, একটা ক্রন্দনের রোল পড়িয়া গেল। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিলেন। শিশুর এক মাসী ইহাকে পুষিয়াছিলেন। তিনি একেবারে বৎসহারা গাভীর মত ছুটিলেন। আমার সাধ্য হইল না যে, তাঁহাকে ধরিয়া রাখি। তিনি আমাকে শুদ্ধ লইয়া ছুটিয়া সেই ক্ষুদ্র শবের উপর গিয়া উন্মাদিনীর মত পড়িলেন। প্রেম-মন্দাকিনী বঙ্গবিধবা ভিন্ন এমন নিঃস্বার্থ প্রেম দেখাইতে, এমন পরের পুত্রের মাতা হইতে, বুঝি জগতে অন্য কোনও রমণী পারে না।

শেষে ডেপুটি বাবু নিজে আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। তখন হেডমাষ্টারবাবু শব লইয়া শ্মশানে চলিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে যাইতে বলিলেন। ডেপুটিবাবু বলিলেন—"না, সে ছেলেমানুষ গিয়া কি করিবে? তাহাকে আমার কাছে রাখিয়া যাও।" তিনি এই বলিয়া আমাকে বুকে জড়াইয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সমস্ত রাত্র আমাকে পিতার মত বুকে লইয়া তাঁহার স্ত্রী ও শালীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন শুষ্ক, কণ্ঠ স্থির। কেবল এক একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছিলেন। এক একবার আমাকে বুকে দৃঢ়রূপে আঁটিয়া ধরিতেছিলেন। শোকের এরূপ ধীর মূর্ত্তি আমি স্বচক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। আমার 'কুরুক্ষেত্র' বুঝি সুভদ্রার শোকের ছবি আঁকিতে পারিতাম না। শোকের রাত্রি প্রভাত হইল। শ্মশান হইতে হেডমাষ্টারবাবু ফিরিয়া

আসিয়া শোকগ্রস্ত পিতাকে তাঁহার বাসায় লইয়া গেলেন। সেখানে সমস্ত বন্ধু সমবেত হইলেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। তিনি শান্ত, স্থির, অবিচল। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে বলিলেন—"স্ত্রীলোক দুটি বাড়ীতে পড়িয়া রহিল। তুমি সেখানে যাও। স্ত্রী তোমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মত জানেন। তুমি কোনরূপ সঙ্কোচ করিও না।" আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গেলাম। তাহার বয়স তখন অনুমান দশ বৎসর। আমি মাতার চরণে প্রণত হইলে তিনি আমাকে মায়ের মত জড়াইয়া ধরিয়া পার্শ্বে বসাইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"তুমি মা-হারা হইয়াছ। আমি এক পুত্র হারাইলাম ; তুমি আজ হইতে আমার আর এক পুত্র।" সদ্য শোকাতুরা মাতার এই অপার্থিব স্নেহে আমার সদ্য মাতৃশোকবিধুর হৃদয়ে কি অমৃত উচ্ছ্বাসই সঞ্চারিত হইল! আমি কাঁদিতে লাগিলাম। এই স্নেহ ভক্তি বিনিময়ে তিনি যেন তাঁহার পুত্রশোকে কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিলেন। আমিও যেন মাতৃশোকে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম। তাহার পর দশ দিন বিদায় গ্রহণ করিয়া, কলিকাতায় গিয়া, যেখানে এক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে পিতার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম, সেখানে ভাগীরথীতীরে মাতার শ্রাদ্ধ করিলাম। কে বলিল—পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের উপকরণ অর্থ? পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের উপকরণ—অশ্রুজল! কে বলিল—শ্রাদ্ধের কাল বৎসরে কেবল একদিন? পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধের কাল—প্রতিদিন!

নবীন গৃহস্থ

যশোহরে আসিয়াই স্ত্রী আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার উক্ত পিতৃব্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আমার সরলা মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, স্ত্রী আমার কাছে আসিলে আমি আর তাঁহাদের খবর লইব না ও তাঁহাদের প্রতিপালনের জন্য টাকা পাঠাইব না। মাতা তাহাই বুঝিলেন, এবং বহু পত্র লেখার পর প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন —"আমি বউকে পাঠাইব না। তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি সেখানে বিবাহ কর।" বলা বাহুল্য, উক্ত জনৈক পিতৃব্য এ পত্রের প্রণেতা। তখন স্ত্রী আনিবার আশা ত্যাগ করিলাম। প্রথম যৌবন, উচ্চ পদ, রক্ত উগ্র, হৃদয় কবিত্বময়। বহুদিন যাবৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলাম। আমার পিতৃব্য মহাশয়েরা কৈশোর হইতে আমার প্রতি যে অস্ত্ররাশি সৎ কি অসদভিপ্রায়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাদের সকল অস্ত্র হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম। এই অস্ত্রটি আমার পক্ষে মারাত্মক হইল। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—"ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ," বলবান্ ইন্দ্রিয়ের গতি রোধ করা প্রকৃতই "বায়োরিব সুদুষ্কর।" ইহা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলাম। ইহার দুই মাস পরে আমার সরলা স্নেহপ্রতিমা মাতা চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে চারিটি শিশু ভাই ও একটি শিশু ভগ্নী ও দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা পত্নী। আমার মাতার অপেক্ষা আমার খুড়ী—আমি তাঁহাকে "যাদু" বলিয়া ডাকি—অধিক বুদ্ধিমতী। তিনি লিখিলেন—"আমি বউকে লইয়া তোমার কাছে আসিতে চাহি।" স্ত্রীও সেরূপ পত্র লিখিলেন। যে স্ত্রীকে আনিবার জন্য এত লালায়িত ছিলাম, আজ তাহাকে আনা সম্বন্ধে ঘোরতর চিন্তায় পড়িলাম। মা নাই। স্ত্রীকে আনিতে গেলে সকলকে আনিতে হয়। নিরাশ্রয়া বিধবা, তাঁহার এক শিশু পুত্র রমেশ ও পত্নী, বাড়ীর অভিভাবক। ইহারা কি প্রকারে কতকগুলি শিশু লইয়া বাড়ী থাকিবে! ভাই একটিরও পড়ার সময় হইয়াছে। সকলকে আনাও বহু ব্যয়সাধ্য। হাতে কিছুই নাই। তাহার উপর নৌকায় আঠার দিনের পথ। বড়ই চিন্তিত হইলাম। কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। ওভারসিয়ার বাবুর বাসায় প্রায় নিত্য নাচ, প্রায় নিত্য নিমন্ত্রণ। এ অবস্থায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া এক সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে নাচ দেখিতেছি। একটি নর্ত্তকী নাচিতেছে। আর

একটি বসিয়া আছে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনাকে আজ এত চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন?" সে কথাটা এমন করুণকণ্ঠে বলিল যে, তাহাতে আমার প্রাণ স্পর্শ করিল। আমি বলিলাম, আমি সত্য সত্যই বড় চিন্তিত হইয়াছি। সে আবার সেরূপ সরল সস্নেহভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কিসের চিন্তা, আমাকে বলিবেন কি?" আমি একটুক ঈষৎ হাসি হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু সে জিদ করিতে লাগিল। তখন তাহাকে কথাটা খুলিয়া বলিলাম।

সে। আপনি কি স্থির করিয়াছেন?

আমি। কিছুই স্থির করিতে পারি নাই।

সে। আপনার স্ত্রীকে আনিতে হইবে। আপনি তাঁহাকে আসিতে লিখুন।

আমি। হাতে টাকা নাই।

সে। কত টাকার প্রয়োজন?

আমি। অন্ততঃ দু' শ টাকা।

সে। যদি কিছু মনে না করেন, আমি কাল দু' শ টাকার নোট পাঠাইয়া দিব; আপনি সুবিধামত উহা শোধ করিবেন।

আমি অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আমার মনের ভাব বুঝিয়া বলিল—"আমি বুঝিতেছি, আপনি আমার মত পতিতার মুখে এ কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছেন। কিন্তু পতিতা হইলেও আমি মানুষ। আপনার এই প্রথম বয়স, উচ্চ পদ। সমস্ত যশোহরে আপনার রূপগুণের প্রশংসা ধরে না। আপনি বহুদিন এরূপ ভাবে থাকিতে পারিবেন না। শেষে বড় কষ্ট পাইবেন।" সে এই কথাগুলি এমন সরল ভাবে, এমন করুণকণ্ঠে, এমন কাতরতার সহিত বলিল যে, কথাগুলি আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিল। আমি ভাবিতে লাগিলাম—"ইহারাই কি পতিতা?" আমি বলিলাম—"তোমাদের মধ্যে যে এরূপ সহৃদয়তা আছে, আমি বিশ্বাস করিতাম না। আমি শীঘ্রই বেতন পাইব। টাকা ধার করিবার প্রয়োজন হইবে না।" পরদিন প্রাতে আমার ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া হাতে দিল। দেখিলাম, তাহারই নামীর পত্র এবং তাহাতে দু' শ টাকার নোট। আমার চক্ষে একবিন্দু জল আসিল। আমি আবার ভাবিলাম—"ইহারাই কি পতিতা?" বলা বাহুল্য, তাহার লোকের দ্বারাই নোট ফিরাইয়া পাঠাইলাম।

তাহার আর একটি আচরণের কথা বলিব। হেডমাষ্টারবাবু আপনার শিশু পুত্রদের সঙ্গে বগি হাঁকাইয়া কোনও ডেপুটি বাবুর বাড়ী যাইতেছেন। এই পতিতার বাড়ীর সম্মুখে মোড় ফিরিতে গাড়ী উল্টাইয়া রাস্তার নীচে পড়িয়া গেল। পিতা ও পুত্রেরা সকলেই আঘাত পাইলেন। সে তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে আপনার মাতা ও ভৃত্যগণকে লইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ছেলেগুলিকে বাড়ীতে আনিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিল এবং ডাক্তার আনিতে লোক পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া আহত স্থানে পটি ও ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি দিলে তাঁহারা সুস্থ হইয়া অন্য গাড়ীতে বাড়ী গেলেন। হেডমাষ্টারবাবু পূর্ব্বে ব্রাহ্মভাবে মনরো সাহেবের দ্বারা কতরূপে ইহাদের নির্য্যাতন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার এ আচরণে তিনি এত প্রীত হইলেন যে, তিনি তাহাকে সেই দিন হইতে তাঁহার কন্যার মত জানিতেন; এবং যখন তখন তাহার বাড়ীতে যাইতেন। কেবল একটি মাত্র নিয়ম ছিল। তিনি উপস্থিত হইলেই তাহাকে তাহার বৈঠকের চাদরখানি বদলাইয়া দিতে হইত। তিনি তাহার গীত শুনিতেন, পড়া শুনিতেন, তাহাকে পড়াইতেন, সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার "ব্রাহ্ম ভ্রাতারা" তাঁহার উপর খড়্গহস্ত হইলেন; কারণ, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি। একদিন ভ্রাতাদের এক 'ডেপুটেশন' উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি পরিষ্কার জবাব দিলেন—"আমি আমার

মেয়েকে ছাড়িতে পারি, তথাপি তাহাকে অস্নেহ করিতে পারি না। তোমাদের আমাদের তুলনায় সে দেবী।"

সুখ দুঃখ যেরূপ সংসারনীতি, পতন উত্থান, পাপ পুণ্যও বুঝি সেইরূপ। দুঃখ ভোগ না করিলে মানুষ যেরূপ পূর্ণমাত্রায় সুখ ভোগ করিতে পারে না, পাপে পতিত না হইলে, পাপের সংস্পর্শে না আসিলেও বুঝি মানুষ পুণ্যের মাহাত্ম্য পূর্ণমাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অনেক সময়ে দুঃখের খনিতে যে সুখরত্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়—পত্নীপ্রেম, অপত্যস্নেহ, পবিত্রতা, চিত্তপ্রসন্নতা—তাহা সুখের খনিতে বিরল। তদ্রূপ পাপের খনিতে কদাচিৎ যে সকল অমূল্য রত্ন দেখিতে পাওয়া যায়, পুণ্যের খনিতে তাহার তুলনার স্থান অতি অল্প। যাহাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করি, নাসিকা কুঞ্চিত করি, তাহার অবস্থায় পড়িয়া কয়জন পুণ্যবান্ থাকিতে পারি? তাই বুঝি ভগবানের এক মধুর নাম—পতিত-পাবন। তাই খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, মেষরক্ষক তাহার মেষপাল ফেলিয়া তাহার পথহারা মেষটির অন্বেষণ করে। যিনি পাপীকে ঘৃণা করেন, তাহার কাছ হইতে শত ক্রোশ দূরে থাকেন, আমি তাঁহার কাছ হইতে সহস্র ক্রোশ দূরে থাকিতে ইচ্ছা করি। ঐ করুণাময় মেষপালক আমার দেবতা।

পরের মাসের বেতনের টাকা হইতে দেড় শত টাকা দিয়া আমার দেশীয় ভৃত্যটিকে বাড়ী পাঠাইলাম। নৌকাপথে আঠার দিনে পরিবারবর্গ নীলগঞ্জে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন বলিয়া ভৃত্য রাত্রি দশটার সময়ে সংবাদ আনিল। আমার বাসা হইতে সেই স্থান প্রায় পাঁচ মাইল। গাড়ী লইয়া আমি তাঁহাদিগকে আনিতে গেলাম। মাঘ কি ফাল্গুন মাস। নৌকায় পঁহুছিয়া যাদুর বুকে মাথা রাখিয়া, অনাথ শিশুগুলিকে বুকে লইয়া, আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার মাতৃপিতৃশোক আজ উথলিয়া উঠিল। শিশুগুলি আমাকে দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া অঙ্কে ও বুকে পড়িল। আবার তখনই আমার রোদন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রাত্রি প্রায় দুটার সময় অবোধ শিশুদের মুখে মাতার মৃত্যুর, বাড়ীর অবস্থার, পথের কষ্টের ও দৃশ্যের কথা সেই আধ আধ অমৃতপূর্ণ ভাষায় শুনিতে শুনিতে বাসায় পঁহুছিলাম। কিন্তু তাহাদের এত আনন্দেও আমার হৃদয়ে একটি আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল না। পিতৃমাতৃহীন এই শিশুগুলি কি বাঁচিবে? আমি কি ইহাদের মানুষ করিতে, সুখী করিতে পারিব? এরূপে কত আশঙ্কাই মনে উঠিতেছিল, এবং কি যেন এক অজ্ঞাত ছায়ায় আমার হৃদয় ছাইয়া রাখিল। অনেক সময়ে ভাবী অমঙ্গল এরূপে মানুষের হৃদয়ে বহু পূর্ব্বে ছায়াপাত করে।

প্রাতঃকালে পাল্কি লইয়া দুর্গাদাসবাবুর এক শিশু-পুত্র ও দাসী আসিয়া উপস্থিত। শিশু আমার কোলে উঠিয়া গলা জড়াইয়া বলিল—"দাদা! বউকে লইতে মা পাল্কি পাঠাইয়াছেন।" আমি বলিলাম—"দু দিন যাক্। তোদের বাড়ী যাইবে না ত কোথায় যাইবে?" সে বলিল—"না দাদা! তা হবে না। বউ আজই যাবে।" কতরূপ আব্দার করিতে লাগিল। চাকরাণী স্ত্রীকে স্নানের স্থানে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া তাঁহার অন্ন-প্রাশনের সময় হইতে যে মলিনতা শরীরে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা ঘাষিয়া মাজিয়া ইতিমধ্যে অপনয়ন করিবার জন্য একটা মহাব্যায়াম আরম্ভ করিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ওই রাস্তা হইতে—"কি হে!—বাবু হে!—কি কচ্চো হে! বউ এসেছে না কি হে!"—বলিতে বলিতে দুর্গাদাসবাবু স্বয়ং বগি হইতে নামিয়া আমার গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। আমি ছুটিয়া গেলে, আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"কই, বউ গিয়াছে?"

উ। না।

প্র। কেন?

উ। এই গুদামজাত মাল, আঠার দিনে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। যদিও আপনার

চাকরাণী ইতিমধ্যেই গাত্রময়লা ধুইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা যে মাসেকের মধ্যে স্রোতহীন ভৈরব নদের জলে পরিষ্কৃত হইবে, সে সম্বন্ধে আমার গুরুতর সন্দেহ আছে। অতএব একটুক গুদামের গন্ধ যাক্, পরণের কাপড়খানি পর্য্যন্ত নাই, দু দিন পরে যাইবে।

তিনি। তোমার বাপু! চিরকাল পাকামি। আমার বাড়ী যাইবে, তাহাতে আবার কাপড়ের ভাবনা উপস্থিত! তোর মা বসিয়া রহিয়াছে। বউকে পাঠাইয়া দিয়া চল্। তোরও সেখানে খাইতে হইবে।

আমার মহাসঙ্কট উপস্থিত হইল। আমি আবার একটুক প্রতিবাদ করিলাম। বলিলাম —"এখন গেলে আপনারা কথা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিবেন না। এ অপূর্ব্ব জীব লইয়া গিয়া করিবেন কি?"

তিনি আর আমার সঙ্গে কথাটি না কহিয়া একেবারে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন —"কই, নবীনের খুড়ী কোথায়, বাহির হইয়া এস। আমি নবীনের খুড়া, বউকে লইতে আসিয়াছি।" 'যাদু'ও ঘরের মধ্য হইতে ভৃত্যটির দ্বারা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"বউ আঠার দিন পথের কষ্ট পাইয়া আসিয়াছে। ছেলেমানুষ। দু দিন পরে যাইবে।" তখন ডেপুটি বাবু এত স্নেহ ঢালিয়া দিয়া জিদ করিতে লাগিলেন যে, 'যাদু' গলিয়া গেলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তিনি এত আদর করিতেছেন, এত জিদ করিতেছেন। আর কি হইবে! বউ যাক্।" সত্য সত্যই পরিধানের কাপড়খানি, তাহার সামান্য গহনাগুলি পর্য্যন্ত আমার পিতৃব্যগণ দুই কিস্তিতে জমিদারি রক্ষার নাম দিয়া আত্মসাৎ করিয়াছেন। দুই হাতে দুইগাছি শঙ্খ মাত্র আমার অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছে। দুর্গাদাসবাবু আবার সভ্যতায় শীর্ষস্থানীয় লোক। এরূপ লোকের বাটীতে এ অবস্থায় এই অপূর্ব্ব নবাগত জীবটিকে কি প্রকারে পাঠাইব! আমি ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ আমার মস্তিষ্কের আর এই গুরুতর কার্য্য করিতে হইল না। দুর্গাদাসবাবু সটান গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, গৃহের এক কোণাস্থিত একটা ময়লা কাপড়বেষ্টিত মৃৎপিণ্ডবিশেষ দুই হাতে তুলিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে একেবারে শিবিকায় পুরিয়া দিলেন, এবং বাহকগণ তৎক্ষণাৎ অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনিতে ক্রোশব্যবধান মুখরিত করিয়া যাত্রা করিল। আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি। গ্রীবানিষ্পীড়নে আমার মোহভঙ্গ হইলে বুঝিলাম, তিনি আমাকে গলাটি ধরিয়া ঠেলিয়া, উচ্চ হাসিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া, তাঁহার গাড়ীর দিকে লইয়া চলিয়াছেন। আমি আবার একটুক লঘুভাবে প্রতিবাদ করিলাম—"আর আমাকে কেন? আমি না গেলেও ইনি আজ আমার মুণ্ডটি পাত করিয়া আসিতে পারিবেন।" এ প্রতিবাদও নিষ্ফল হইল। গাড়ী ছুটিল। আমি যেন আমার বধ্য-ভূমির দিকে চলিলাম। এতদিন যশোহরে আমি একটা আদর্শ পুরুষ ছিলাম। বুঝিলাম, আজ আমি একটা হাস্যাস্পদ জীব হইতে চলিলাম।

বাড়ী পঁহুছিবার কিছুক্ষণ পরে দুর্গাদাসবাবু আমাকে টানিয়া গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। বলিলেন—"দেখ দেখি?" কাহাকে দেখিব? এক পার্শ্বে মা, অন্য পার্শ্বে দেশ হইতে নবাগতা তাঁহার কন্যা, আর মধ্যে উটি কে? তাঁহারা ইতিমধ্যেই তাহার সাজসজ্জার এত রূপান্তর ঘটাইয়াছেন, তাহাকে এরূপ সুন্দর বসন-ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন যে, আমার সহধর্ম্মিণীকে আমারই চিনিবার সাধ্য ছিল না। ডেপুটি বাবু হাসিয়া আকুল। মা বলিলেন—"নবীন! অনর্থক বউয়ের নিন্দা করিয়াছ। বউ বেশ কথা কহিতে পারে। বেশ বউ!" ঘামি দিয়া আমার জ্বর ছাড়িল। আমি হাত দিয়া দেখিলাম যে, আমার নাসিকা কর্ণের কোনওরূপ ব্যতিক্রম হয় নাই।। কি সুখে, কি আনন্দে একটা দিন সেখানে কাটাইলাম। রাত্রিতে আবার সস্ত্রীক বগি হাঁকাইয়া বাড়ী আসিলাম। তাহা না করিলে দুর্গাদাসবাবু ছাড়েন না। তাঁহারা দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন, আর আমি ঘোমটাসমাচ্ছন্না জীবটাকে লইয়া লজ্জায় অর্দ্ধমৃত অবস্থায় গাড়ী ছাড়িলাম।

যশোহরে আমোদ ও বন্ধুতা

যশোহরে পৌঁছিয়াই স্থানীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহারা সকলেই বড় আদরে গ্রহণ করিলেন। স্মরণ হয়, পৌঁছিবার পরদিনই নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাবতারের আসনে বিরাজ করিতেছি। এমন সময় যশোহর স্কুলের হেডমাষ্টারবাবুর একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানিতে এই কয়টি কথা ইংরাজিতে লিখিত ছিল—"আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। আমার একজন বন্ধু জানিতে চাহিয়াছেন, আপনি কি (Education Gazette) 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত 'শ্রীনঃ' স্বাক্ষরিত কবিতাদির লেখক?" আমি উত্তরে লিখিলাম যে, আমাকে লজ্জার সহিত উক্ত অভিযোগে দোষী স্বীকার করিতে হইতেছে। তাহার কিঞ্চিৎ পরেই তাঁহার কাছ হইতে একখানি নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। অপরাহ্নে তাঁহার অনুরোধমতে স্কুলগৃহে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি স্কুলগৃহের একাংশে বাস করিতেন। গৃহটি একটি সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত, এবং তাঁহার অবস্থিতিকালে উহা যশোহরের একটি আনন্দধাম ছিল। তিনি দেখিতে একটি নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব, অতিশয় বলিষ্ঠ এবং তেজস্বী সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিলেই শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা করিত। কথা সরল, হাসি সরল, হৃদয় সরল, তিনি সর্ব্বপ্রকারে একটি সরলতার ও স্নেহশীলতার প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। কি সঙ্গীতে, কি সাহিত্যে, কি সাহসে, কি সুরাপানে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে, এমন লোক আমি দেখি নাই। শরীরে এত বল ছিল যে, আমার মত দুজন যুবক দু দিকে তাঁহার গোঁপে ধরিয়া ঝুলিয়া থাকিলেও তিনি মস্তক ঈষৎমাত্রও অবনত করিতেন না এবং বাহুর আঘাতে গৃহের খুঁটীসকল ভগ্ন করিয়া ফেলিতেন। এক এক দিন জিদ করিয়া বন্ধুদের বাসায় এরূপ খাইতেন যে, সে পরিবারস্থ সকলকে উপবাসে রাখিতেন। তিনি সর্ব্বপ্রকারে ইংরাজীতে যাহাকে good fellow বলে, তাহার একটি খাঁটি আদর্শ ছিলেন। তিনি সঙ্গীত, সাহিত্য এবং সুরা, এ তিন সকার ভিন্ন একটি দিনও থাকিতে পারিতেন না। আমি স্কুলে উপস্থিত হইলে একজন ভদ্রলোক আমাকে স্কুলের Library (লাইব্রেরিতে) লইয়া গেলেন। সেখানে উক্ত বাবু ও আর একটি ক্ষুদ্র ঘটোৎকচাকৃতি মহাপুরুষ বসিয়া ছিলেন —দীর্ঘ, স্থূল, বলিষ্ঠ, কৃষ্ণকায়। অনাবৃত শরীরে বসিয়া একখানি সেকেলে পুঁথির পাত উল্টাইতেছিলেন। ইনি একজন খ্যাতনামা Assistant Executive Engineer। আমি কক্ষে প্রবেশ করিলে কিছুক্ষণ যাবৎ স্থিরনয়নে তাঁহারা দুজনে যেন আমার ক্ষুদ্র শরীরখানি আপাদমস্তক অধ্যয়ন করিলেন। তার পর এঞ্জিনিয়ার বাবুর সঙ্গে এরূপ আলাপ হইল।

তিনি। এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত "চট্টগ্রামের সৌভাগ্য" কবিতাটি কি আপনার লেখা?

আমি সলজ্জ ভাবে উত্তর করিলাম—"হাঁ।"

তিনি। আমি ঐ কবিতাটি পড়িয়া এডুকেশন গেজেটের গ্রাহক হইয়াছি এবং সেই অবধি আপনার কবিতাগুলি বড় আগ্রহের সহিত পড়িয়া থাকি। আপনার কবিতায় কিরূপ একটা নূতন শক্তি ও নূতন রাগিণী আছে, যাহা এ পর্য্যন্ত কোন বাঙ্গালা কবিতায় দেখি নাই।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি। আপনি সেই কবিতাটি আওড়াইতে পারেন কি?

আমি। না, উহা আমার মুখস্থ নাই।

তিনি। আমার উহা মুখস্থ আছে। একটি স্থান আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছে:

"বিষময়ী সুরা সখে! কি বলিব হায়!
ভীষণ প্রবাহপ্রায়, দিন দিন বেড়ে যায়,
বিদারিয়া জন্মভূমি বিস্তারিয়া কায়।

তটস্থ শৈলের মত কত পরিবার,
সবান্ধবে প'ড়ে তাহে হ'লো ছারখার।"

কি সুন্দর উপমা! আপনার বাড়ী কি পদ্মার সন্নিকটে?

আমি। কৈ, ভূগোলে ত সেরূপ বলে না। হেডমাষ্টারবাবু উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—"বেশ উত্তর হইয়াছে। চট্টগ্রাম যে পদ্মার পারে নহে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি সে জ্ঞানটুকু নাই?"

তিনি। বটে? আমার ভুল হইয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, পদ্মাতীরে বাসা না হইলে এরূপ উপমা মনে আসিতে পারে না।

তাহার পর হেডমাষ্টারবাবু আমাকে কক্ষান্তরে ডাকিয়া লইয়া আমার আহার্য্য এবং পানীয় সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কূট প্রশ্ন করিলেন এবং অনুকূল উত্তর পাইয়া সেখান হইতে মহা আনন্দের সহিত এঞ্জিনিয়ার বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন—"Bravo! এ আমাদের বৈদ্যের ছেলে, বাবা! জিজ্ঞাসা করাই বৃথা।" তখন মহা আনন্দের সহিত তাঁহার "এস্রাজ" বাজিয়া উঠিল, এবং সঙ্গীতে, সাহিত্যালাপে, পান-আহারে একটি সন্ধ্যা অভূতপূর্ব্ব আনন্দে কাটাইলাম।

দিবসের প্রভাতের ন্যায় সাংসারিক জীবনের প্রভাতও বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর, বড়ই সুখদ। আজ জীবনের অপরাহ্নে সেই প্রভাত কত সুন্দর, কত মধুর, কত সুখদ বোধ হইতেছে! ঠিক যেন শীতল ও নির্ম্মল কিরণদীপ্ত, চারু কুসুমে সুশোভিত, চারু সৌরভে এবং মৃদুল মলয় সমীরণে ব্যজনিত বসন্ত প্রভাত। আমার সৌভাগ্যক্রমে যশোহরে সেই সময়ে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, দোষে গুণে তাঁহাদের তুলনীয় ব্যক্তি আমি আর দেখি নাই। ডেপুটি কালেক্টর পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যারত্নকে দেখিলে আমার যেন শান্ত অনন্ত সমুদ্র মনে হইত—তেমনিই বিদ্যারত্নে পরিপূর্ণ, অথচ তেমনিই তরল ও সরল-হৃদয়। অন্যতম ডেপুটি কালেক্টর দুর্গাদাসবাবু যদিও উচ্চ অঙ্গের ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত ছিলেন না, কিন্তু যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী, তেমন তেজস্বী, তেমন জগৎতুচ্ছকারী, স্বাধীনচেতা, অথচ তেমন শিশুনিভ সরল ও স্নেহশীল লোক আমি আর দেখি নাই। যশোহর স্কুলের হেডমাষ্টারবাবু কি শক্তিধর সুপুরুষ, কি সহৃদয়, কি সঙ্গীত সাহিত্য ও আমোদপ্রিয়ই ছিলেন। সঙ্গীতে ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ফেরি-ফণ্ড ওভারসিয়ার বাবু যেন একটি সুখপ্রিয় ননীর পুতুল। তাঁহার অকাতর দান, অবারিত দ্বার, আমোদপূর্ণ গৃহ। অপরাহ্নে তাঁহার গৃহদ্বার দিয়া তাঁহার কোনও বন্ধুর চলিয়া যাইবার সাধ্য ছিল না। তাঁহাকে জোর করিয়া ধরিয়া লওয়া হইত। অপরাহ্নে এইরূপ বন্ধু গ্রেপ্তার জন্য তিনি রাস্তার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। যখনই গৃহে যাইবে, দেখিতে পাইবে যে, বন্ধুদের আপিসের পোষাক ছাড়াইবার জন্য কোঁচান কাপড়, প্রথম শ্রেণীর আহার্য্য ও পেয় সারি সারি প্রস্তুত এবং তাঁহার বৈঠকখানা সঙ্গীতে ও আনন্দে দিবারাত্রি মুখরিত। পুলিশ ইনস্পেক্টর একজন চতুর পুলিশ-কর্ম্মচারী, এবং সমাজ-বন্ধনকারী সুরসিক। আমি ইঁহাদের সকলেরই বিশেষ স্নেহের পাত্র হইলাম। আমি এমন স্নেহ এ জীবনে আর বড় পাই নাই। ওভারসিয়ার ও পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর আমার দাদা হইলেন। অবশিষ্ট তিনজনকে আমি পিতৃব্যের মত শ্রদ্ধা করিতাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে আমরা এই কয়জন আমাদের কাহারও কাহারও বাসায় সমবেত হইতাম, এবং প্রায় অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও নানা প্রকার আমোদে কাটাইতাম।

এই আমোদসাগরে সময়ে সময়ে মহা ঝড় ও উৎকট তরঙ্গও উঠিত। তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। যশোহরে দুই এক মাস অবস্থিতির পর একদিন সন্ধ্যার সময়ে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসাবাড়ীতে নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যা হইতে সকলেই সমবেত হইয়াছিলাম,

এবং সঙ্গীততরঙ্গে সুরাদেবী নৃত্য করিতেছিলেন। আমি একটি বৃহৎ রজতনির্ম্মিত বাঁশী (flute) বাজাইতেছিলাম। গোপাঙ্গনারা বাঁশের বাঁশীতে মজিয়াছিলেন, অতএব রজত-বাঁশীতে কি আর একজন শিক্ষিত পুরুষ মুগ্ধ হইবে না। এঞ্জিনিয়ারবাবু পারিতোষিকস্বরূপ দেবীকে কাচাধারে সজ্জিত করিয়া আমাকে উপহার দিলেন। দেবীর পাত্রপ্লাবী রূপ দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। বলিলাম, দেবীর এ পরিমাণ কৃপাভাজন হইলে আমাকে আর বাঁশী বাজাইতে হইবে না। তাঁহার এত প্রেম আমি সহ্য করিতে পারিব না। তিনি তখন কোপে ভ্রূকুটিকুটিলানন হইয়া পাত্র রাখিয়া দিলেন। হেডমাষ্টারবাবু আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি তাঁহার বড়ই অপমান করিলাম। আমি বড় ভীত হইলাম। বিশেষতঃ এঞ্জিনিয়ারবাবু উত্তেজিত হইলে তাঁহার সেই ক্ষুদ্র শৈলবৎ কৃষ্ণ করপদ্ম দুটি, শুনিয়াছিলাম—অতি সহজে তাঁহার বন্ধুবর্গের কণ্ঠে পৃষ্ঠে সঞ্চালিত হইত। আমি পাত্রস্থ দেবীকে বরণ মাত্র করিলাম। কিন্তু উহাতেই আমার মাত্রাধিক্য ঘটিল. আমি দেবীর একজন বড় ক্ষুদ্র সেবক ছিলাম। তখন গীতে বাদ্যে এবং গল্পে ও কবিতাবৃত্তিতে মজলিস গরম হইয়াছে। কে কাহাকে চায়! আমি ফাঁক দেখিয়া সরিয়া পড়িলাম, এবং বিদ্যারত্নের পুত্র কুঞ্জের কক্ষে গিয়া বিছানা লইলাম।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। আমার দেশীয় ভৃত্যটি আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে. এঞ্জিনিয়ারবাবু আহারের পর হেডমাষ্টার ও ওভারসিয়ারবাবু সহ আমার বাসায় গিয়া তাহাকে ও ব্রাহ্মণটিকে প্রহার করিয়াছেন, এবং ঘরের জিনিসপত্র সব উঠানস্থ করিয়াছেন। তখনও আমার পরিবার যশোহরে আসেন নাই। ভৃত্যদের অপরাধ, তাহারা বলিয়াছে—আমি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ী হইতে ফিরি নাই। জিনিসপত্রের অপরাধ কি, তাহা আমি এখন যাবৎ বুঝিতে পারি নাই। বোধ হয়, তাহারা উক্ত প্রশ্নের কোনও উত্তরই দেয় নাই। আমি বাসায় গিয়া কি করিব? তাহারা মার খাইয়াছে। গেলে সেই অনাহার্য্য জিনিসটা হয়ত আমাকেও খাইতে হইবে। অতএব "discretion better part of valour" মনে করিয়া ভৃত্যটিকে সেখানে শুইয়া থাকিতে বলিলাম। কিছুক্ষণ পরে হেডমাষ্টারবাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাকে সটান বিছানা হইতে যষ্টির মত তুলিয়া ফেলিলেন, এবং চিলে যেরূপ পায়রার বাচ্চা লইয়া যায়, সেরূপ ভাবে একেবারে উঠানে লইয়া ফেলিলেন। অতি সুন্দর শারদীয় চন্দ্রালোক। এঞ্জিনিয়ারবাবু আমাকে দেখিয়াই বলিলেন--"ছেলেটির কি নেশাই হইয়াছে! কেমন সুন্দর টেরিটি, আর কাঁধে কেমন কোঁচান চাদরখানি! আর আমাদের!"—বাস্তবিকই তাঁহার বৃহৎ উদরে বেল্ট বাঁধা বলিয়া কেবল ধুতিখানি আছে। তাঁহার বিরাট দেহে পিরান চাদর কিছুই নাই। আছে কেবল স্কন্ধে বিশ্বত্রাসকর তাঁহার ভীম যষ্টিটি। ঠিক ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে খুনীর অপরাধীকে যেরূপ লইয়া যায়, তাঁহারা সেইরূপ আমাকে বেষ্টন করিয়া লইয়া চলিলেন। এমন সময়ে পশ্চাৎদিক্ হইতে প্রহারিত রোরুদ্যমান সেই পাচক ব্রাহ্মণ ঠাকুর উপস্থিত। সে এক একবার বলিতেছে—"মহাশয়! দেখুন দেখি, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসায় ছিলেন কি না? আমি ফুলের মুখুটি বিষ্ণুদেবের সন্তান। আপনি আমাকে মারলেন।" তখনি এঞ্জিনিয়ারবাবুর ভীম যষ্টি সঞ্চালনপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ ধাবন এবং তাহার সচীৎকার কিয়দ্দূরে পলায়ন। এই বীর-করুণ প্রহসন বহুবার পথে অভিনীত হইবার পর আমার বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ভৃত্যগণ সকলেই পলাতক! আমার সাধের উপকরণাদি প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি যাইতেছে। তখন ত্রিমূর্ত্তি বসিয়া সুরাদেবীর আর এক বিভূতি (বোতল) নিঃশেষ করিতে লাগিলেন, এবং বাহিরের ঘরে রোরুদ্যমান বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানটিকে তাহার উচ্চ বংশ স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার হৃদয়ের আবেগ আরও বাড়াইতে লাগিলেন। এরূপে রাত্রি প্রভাত করিয়া ত্রিমূর্ত্তি বিজয়া করিলেন। বলা বাহুল্য যে, হেডমাষ্টারবাবুর গম্ভীর উপদেশমতে আমাকে এঞ্জিনিয়ার-

বাবুর কাছে ভৃত্য ও উপকরণাদির অশিষ্টাচারের জন্য ক্ষমা চাহিতে হইয়াছিল। আমি অবসন্নহৃদয়ে শয়ন করিলাম। বেলা ৮টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইলে সম্মুখে "ফুলের মুখুটি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান" দণ্ডায়মান। হস্তে শঙ্খও নহে, চক্রও নহে, পদ্মও নহে। দরখাস্তরূপী এক গদা। তাহাতে এঞ্জিনিয়ারবাবু আসামী। আমি এবং নিমন্ত্রিত উচ্চপদবীস্থ সকলেই সাক্ষী। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিলে তিনি আমাকে এক দিনের জন্য অভয় দিলেন। এক দিন নালিস করিবেন না বলিলেন। এঞ্জিনিয়ারবাবু ও ব্রাহ্মণাব্রাহ্মণের দ্বারা কোনও রূপে ব্রাহ্মণের ক্রোধ যদি হোমিওপ্যাথি মতে উপশমিত হয়, মনে করিয়া তাঁহার কাছে খবর পাঠাইলাম। শুনিলাম, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। মহাবিপদ্! সকলেই মহাচিন্তিত হইলেন। এমন সময় বিপদ্‌ভঞ্জন কৃপা করিলেন। বিদ্যারত্ন 'বাগের হাট' বদলি হইলেন। আমি বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তানটিকে, সে বিদ্যারত্নের স্বদেশী ও বড় স্নেহের পাত্র বলিয়া বুঝাইয়া ভজাইয়া, অতিরিক্ত বেতনের প্রলোভনে ফেলিয়া তাঁহার সহযাত্রী করিলাম। তাহাকে বুঝাইলাম, ফৌজদারি নালিসের তামাদি নাই। যদি ইতিমধ্যে এঞ্জিনিয়ারবাবু সে প্রহার ও বিদ্রূপ প্রতিহার না করেন, তবে সে পরেও নালিস করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। আর একদিন ওভারসিয়ার দাদার বাড়ী নিমন্ত্রণ। নৃত্যগীতের তরঙ্গে আমোদ উথলিয়া পড়িতেছে। এমন সময় আর একজন পূর্ত্ত-বিভাগীয় প্রভু—এ ডিপার্টমেণ্টে রত্নাকর—চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"বাবা! নাড়ী বসিয়া গিয়াছে।" নৃত্যগীত থামিয়া গেল। সকলেই দেখিলাম যে, তিনি নাড়ী ধরিয়া বসিয়া আছেন আর কাঁদিয়া বলিতেছেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্রের কি উপায় হইবে। বলা বাহুল্য যে, তিনি সুরা-সুন্দরীর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার ডিপার্টমেণ্টের নামই—D. P. W. Department of Prostitute and Wine. কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও আমরা তাঁহাকে বুঝাইতে পারিলাম না যে, তাঁহার নাড়ী সুরাপ্রবাহে সতেজ চলিতেছে, তাহাতে তাঁহার মস্তিষ্কের যদিও কিঞ্চিৎ বিপ্লব ঘটাইয়াছে, তাঁহার পরিবারবর্গের অনাথ হইবার আশঙ্কা নাই। তিনি যতক্ষণ সজ্ঞান ছিলেন, ততক্ষণ এক একবার—"বাবা! নাড়ী বসিয়া গিয়াছে" বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিলেন। আহার করিতে অনেক রাত্রি হইল। আমি ওভারসিয়ার দাদার কাছে শুইয়া রহিলাম। ইন্‌স্পেক্টর দাদাও আমাদের সঙ্গে শুইলেন। অতি প্রত্যূষে কপাটে আঘাত শুনিয়া, আমি উঠিয়া কপাট খুলিয়া দেখি—গামছাপরিহিত ইন্‌স্পেক্টর দাদা! ঠিক যেন মড়া পোড়াইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, রাত্রিশেষে কিঞ্চিৎ শৈত্যাধিক্য অনুভব করিয়া জাগ্রত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি মাতৃগর্ভ হইতে যেরূপে বস্ত্রহীন ভাবে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় একটি বড়ই অস্থানে পড়িয়া আছেন। বহু অন্বেষণে একখানি গামছামাত্র পাইয়া অশ্লীলতা-নিবারণী সভার হস্ত হইতে কোনও রূপে অব্যাহতি লাভ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। নিদ্রিত বন্ধুমণ্ডলী জাগ্রত হইয়া তাঁহার সেই মূর্ত্তি দেখিলেন, আর একটা হাসির তুফান ছুটিল। আমাদের পার্শ্বস্থ শয্যা হইতে তাঁহার সেই অপ্রীতিকর স্থানে কিরূপে যে নৈশ অভিযান ঘটিয়াছিল, তাহা এখন পর্য্যন্ত স্থির হয় নাই। সম্ভবতঃ ইহাও একপ্রকার যোগের ফল—মস্তিষ্কের সহিত মদিরার যোগ। সেই D. P. W. মহাশয় বলিলেন—"আমার নাড়ী উড়িয়া গিয়াছিল। তুমি বাবা! সশরীরে উড়িয়া গিয়াছিলে। আমার নাড়ীহরণ; আর তোমার বস্ত্রহরণ।" তৃতীয় দৃষ্টান্ত। সন্ধ্যা সমাগত-প্রায়। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। লিকলিক করিয়া শরতের শেষে একটুক বাতাস বহিতেছে। আমি হেডমাষ্টারবাবুর বৈঠক-কক্ষে তাঁহার পুত্র-কন্যা-বেষ্টিত হইয়া, একটি ক্যাম্প-শয্যায় অর্দ্ধশায়িত। তাহাদের জিদ, সে রাত্রি আমাকে আহার না করিয়া যাইতে দিবে না। মারও

সেই জিদ। ক্রমে কিঞ্চিৎ বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বাতাস বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমিও শিশুদের সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িলাম। অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। হেডমাষ্টারবাবু আমার কানের কাছে মুখ দিয়া বলিতেছেন—"বিধু ও বিধুর বউ আসিয়াছে, উঠ।" তিনি মনে করিতেছিলেন যে, কথাটা তিনি চুপে চুপে বলিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সেই মদিরা-জড়িত ধীর কণ্ঠে আমার কান ফাটিয়া যাইতেছিল। আমার রজতবাঁশীটি তাঁহার করে, তাঁহার অন্য কর আমার দক্ষিণ কর্ণে। আমাকে কক্ষান্তরে টানিয়া লইলেন। দেখিলাম, বিধু ও তাহার রোহিণী উভয়ে সুরা-কবলিত। বিধু একজন উচ্চপদস্থ লোক। রোহিণী আমাকে দেখিয়াই সেই সুরার উচ্ছ্বাসে বলিলেন—"বা! দিব্বি ছেলেটি! আমার কোলে এস!" আমার বিশ্বাস যে, আমার কোলে বসিবার বয়স অতীত হইয়াছে। আমি মহা-বিপদে পড়িলাম। হেডমাষ্টারবাবু আমাকে এক অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহার কাছে বসাইয়া দিলেন, এবং হুকুম করিলেন—"বাজা বেটা!" বিধুনী—হেডমাষ্টারবাবু তাহাকে এ নাম দিয়াছিলেন—এক হস্তে আমার গলা জড়াইয়া, আর হস্তে মুখ ধরিয়া বলিলেন—"বা! বড় সুন্দর ছেলে! বাজাও দেখি!" আমি সেই অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বাঁশীতে যথাসাধ্য ফু দিলাম। হেডমাষ্টারবাবু এস্রাজ লইলেন, এবং বিধু তাঁহার অপূর্ব্ব সানুনাসিক স্বরে গান ধরিলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ এই অপূর্ব্ব বাদ্য গীত হইতে পারিল না। তখন ঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। ঝড়ের আঘাতে জানালা সার্শি শব্দিত হইতে লাগিল। মা ঝটিকা মূর্ত্তি ধরিয়া এ সময়ে এরূপ মূর্ত্তিদ্বয়কে উপস্থিত করার জন্য কিছু মিষ্ট সম্ভাষণ করিলে, হেডমাষ্টারবাবু বলিলেন—"গোবিন্দ! কুচ্‌পরওয়া নাই।" তাঁহার স্ত্রীর নাম গোবিন্দময়ী। কিন্তু তখন আর বিধুর, কি বিধুমুখীর চলিবার শক্তি নাই। হেডমাষ্টার-বাবুর অপরিমিত বল। তিনি সেই স্থূলকায় মাংসপিণ্ড দুটিকে দুই হাতে জড়াইয়া ঝটিকার প্রতিকূলে যাত্রা করিলেন। হনুমান্ এক গন্ধমাদন বহন করিয়াছিলেন। ইঁনি বহন করিলেন দুটি। মা ইতিমধ্যে আমাকে আহার করাইয়া বাড়ী পাঠাইবার যোগাড় করিতেছেন। তখন প্রকৃত সাইক্লোন আরম্ভ হইয়াছে। হেডমাষ্টারবাবু ফিরিয়া আসিয়া, "কুচ্‌পরওয়া নাই" বলিয়া যে একখানি তক্তপোষের উপর শুইলেন, অমনি ঘোর নিদ্রায় নিমজ্জিত হইলেন। আমি একখান বৃহৎ কম্বলে জড়িত হইয়া ভল্লুকরূপ ধারণ করিয়া যাত্রা করিলাম। সঙ্গে হেডমাষ্টারবাবুর বিশ্বস্ত বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী ভৃত্য সুখলাল। প্রথম ঝট্‌কায় তাহার লণ্ঠন নিবিয়া গেল। নিরেট সূচীভেদ্য অন্ধকার। মুষলধারে বৃষ্টি। মহাঝট্‌কাবেগে কোথায় বা বৃক্ষ, কোথায় বা বৃক্ষডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মুহুর্মুহু তাণ্ডব প্রকৃতির অট্টহাসির মত বিদ্যুৎ নয়নে ধাঁধা লাগাইয়া সেই ভীষণ দৃশ্য দেখাইতেছে এবং ভীতি বর্দ্ধিত করিতেছে। ঝড়বেগে চলিবার শক্তি নাই। দুজনে মাটিতে পড়িয়া, এক একবার হামাগুড়ি দিয়া এবং মাতালের মত রাস্তায় এপাশ ওপাশ করিয়া এবং রাস্তার পার্শ্বস্থিত ঘাস স্পর্শ করিয়া রাস্তা চিনিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই অর্দ্ধমাইল রাস্তা যাইতে দুই ঘণ্টা লাগিল। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময় বাড়ী পঁহুছিয়া দেখিলাম, খুড়ীমা, বালিকা পত্নী ও শিশু ভ্রাতা ভগ্নীদের লইয়া কাঁদিতেছেন। প্রভুভক্ত সুখলাল আমাকে রাখিয়া প্রভু-পরিবারের জন্য চিন্তিত হইয়া ফিরিল। দেখিতে দেখিতে আমার তিনখানি পর্ণকুটীর ধরাশায়ী হইল। যে ইষ্টকনির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহটিতে সকলে আশ্রয় লইয়া-ছিলাম, তাহার চূণ আস্তর ভিতরে বাহিরে ঝটিকাঘাতে খসিয়া পড়িতে লাগিল। শিশু ভাইভগ্নীগুলি আমাকে জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি মাত্র এক অভিভাবক। আমার বয়স ২২ বৎসর। ভয়ে কাচারির দিকে তাহাদিগকে লইয়া ছুটিলাম। কিন্তু গৃহের বাহির হইয়া তাড়িদালোকে দেখিলাম, বৃহৎ বৃক্ষসকল পড়িয়া পথ বন্ধ হইয়াছে। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সেই গৃহে ফিরিয়া আসিলাম এবং ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলাম। সমস্ত রাত্রি,

পরদিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, ঝড় সমান ভাবে বহিয়া ক্ষান্ত হইল। হেডমাষ্টারবাবু অমনি এক বাঁশের লাঠি ও সুখলাল সমভিব্যাহারে আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সেখানে বহু গৃহহীন পরিবার ইতিমধ্যে জড় হইয়াছে। আমার বালিকা স্ত্রী পর্য্যন্ত রন্ধনকার্য্যে নিয়োজিতা হইলেন। আমরা স্কুলের সম্মুখের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বসিয়া আমোদে গা ঢালিয়া দিলাম। এক বন্ধু গাইলেন—

"এমন কাল রূপ নাই সংসারের মধ্যে অন্য,
নাই আর এমন বাঁকা নয়ন, আমার বাঁকা সখা ভিন্ন।"

রাত্রির ঝড়কে কালরূপ মনে করিয়া সকলে হাসিতে লাগিলাম। সে বিপদের পর সে আমোদ কত সুখকর।

এমন সময়ে অন্যতর ডেপুটিবাবু আমাদের খবর লইবার জন্য তাঁহার ক্ষুদ্র অশ্বারোহণে উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে নিরাপদ্ দেখিয়া সেই আমোদে গা ঢালিয়া দিলেন। দুই এক পাত্র চলিবার পর হেডমাষ্টারবাবু কথায় কথায় বলিলেন—তাঁহার ভাইয়ের মত এমন ডেপুটি আর নাই। উক্ত ডেপুটিবাবু তখন রাণাঘাটে। অন্যতর ডেপুটিবাবু হাসিয়া বলিলেন—"এক স্থানে কাজ করিলে বুঝিতাম, তিনি কেমন ডেপুটি।" তখন আর এক ঝড় উঠিল। হেডমাষ্টারবাবু আস্তিন গুটাইয়া বলিলেন,—"কি, আমার রক্তের প্রতি অবমাননা!" ডেপুটিবাবুও আস্তিন গুটাইয়া বলিলেন,—"কি, তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি বলিয়া আমার এ অপমান!" আমি দেখিলাম বেগতিক। সাইক্লোনে যাহা ঘটে নাই, এই ঝড়ে তাহা ঘটিবে। তখন একটুক সরিয়া গিয়া, মাকে খবর দিয়া, মহাব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া হেডমাষ্টারবাবুকে বলিলাম—"মা ডাকিতেছেন, শীঘ্র আসুন। কার অসুখ হইয়াছে। হেডমাষ্টারবাবু ব্যস্ত হইয়া গিয়া যেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মা একদিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, আমি বাহির দিকে কপাট বন্ধ করিলাম। হেডমাষ্টারবাবু পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত চীৎকার করিয়া আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া ডেপুটিবাবুকে তাঁহার অশ্বে আরূঢ় করিয়া দিলে, তিনি বলিলেন—"তোমার ভালবাসা বুঝিয়াছি। তুমি আমার অপেক্ষা হেডমাষ্টারকে বেশী ভালবাস।" আমার ভালবাসার তারতম্য লইয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই এরূপ বিরোধ হইত, আজ তাহা স্মরণ করিতে চক্ষে জল আসিতেছে। শেষে হেডমাষ্টারবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোরে ও তোর বাপকে যদি এক কবরে দিতে পারি, তবে আমার এ দুঃখ যাইবে।" এই সংপ্রতিজ্ঞা করিয়া অশ্ব ছাড়িলেন। পরদিন সন্ধ্যার সময়ে আমি হেড-মাষ্টারবাবুকে লইয়া তাঁহার বাড়ী গেলাম। হেডমাষ্টারবাবু নীচে হইতে বলিলেন—"কি গো * * * * বাড়ী আছ?" ডেপুটিবাবু দ্বিতল হইতে বলিলেন—"কে ও? তুমি?" ছুটিয়া নামিয়া আসিলেন। দুজনের মধ্যে যেন কিছুই হয় নাই। আমোদে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত কাটিয়া গেল। এবং সেখানেই আমাদের আহার হইল। সরল শিশুবৎ দেব-হৃদয়সম্পন্ন উভয় আজ স্বর্গে। আজ দেশে সে লোকও নাই, সেই আনন্দও নাই।

আমাদের একটা সাধারণ সমিতি ছিল, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য। ইহাতে যশোহরের উচ্চপদস্থ সকলেই ছিলেন। তাহার আবার নানারূপ শাখা-সমিতি ছিল। একটা সঙ্গীতের শাখা-সমিতি; ইহাতে হেডমাষ্টারবাবু প্রেসিডেণ্ট। ওভারসিয়ার, ইন্‌স্পেক্টর, ম্যানেজার ক্ষেত্রবাবু সভ্য। শেষোক্ত বাবু বলহরি নামক এক জমিদারের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলেই হেডমাষ্টারবাবু বলিয়া উঠিতেন—"বল হরি!" আর তাঁহার কণ্ঠ থামিলে, ওভারসিয়ার ও ইন্‌স্পেক্টর বলিয়া উঠিত—'হরি!" সেই হাস্যকর দৃশ্য যেন এখনও আমি চক্ষে দেখিতেছি এবং সেই হাস্যকর কলধ্বনি যেন এখনও শুনিতেছি। ইনি একজন বেশ সুগায়ক ছিলেন। দুর্গাদাসবাবু সঙ্গীতের উপর বড়

একখানি রাজি ছিলেন না। গান বাজনা আরম্ভ হইলে বিরক্ত হইয়া বলিতেন—"সমস্ত দিন খাটিয়া আসিয়া কোথায় একটুক গল্পসল্প করিব, আর তোমরা এই পেঁজ ভেঁজ আরম্ভ করিলে!" ম্যানেজার ক্ষেত্রবাবুর দাড়ি গোঁপ কামানো ছিল। তিনি তাঁহাকে এক দিন বলিলেন—"ওই কামানো মুখের গান আর ভাল লাগে না।" ক্ষেত্রবাবুও কম পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন—"ব্রাহ্মণী ত নিদেড়ে নিগোঁপে মজা বুঝেন নাই। তাহা হইলে মাহাত্ম্য বুঝিতেন।" দুর্গাদাসবাবু গল্প-শাখা-সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি গল্প করিতে বড় ভালবাসিতেন। সেই হুঁকা হস্তে গল্পে নিরত তেজস্বী মূর্ত্তিটি যেন আমি এখনও দেখিতেছি। তদ্ভিন্ন আর একটি সাহিত্য-শাখা-সমিতি ছিল। ইহার আমি, উকিল মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এবং জগদ্বন্ধু ভদ্র, স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, সদস্য ছিলাম। হেডমাষ্টারবাবুর তিন সমিতিতেই সমান অধিকার। কি সঙ্গীতে, কি গল্পে, কি সাহিত্যে, কিছুতেই তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। এই সমিতি হইতেই বিখ্যাত 'ছুছুন্দরী বধ কাব্য' প্রকাশিত হয়। উহার লেখক জগদ্বন্ধু। মেঘনাদবধ কাব্যের এমন উৎকৃষ্ট বিদ্রূপ (Parody) আর বঙ্গভাষায় নাই। উহা 'অমৃত বাজারে' প্রকাশিত হইয়া সমস্ত দেশকে—এমন কি, স্বয়ং মাইকেলকে পর্য্যন্ত হাসাইয়াছিল। তাহার প্রথম কয়েক লাইন স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"দুহন বাহন সাধু অনুগ্রহানিয়া,
প্রদান সুপুচ্ছ মোরে ; দেও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশলে চলে শকুন্ত দুর্জ্জয়
—পললাশী, বজ্রনখ,—আশুগতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিলা !
কেমনে কাঁপিলা ধনী নখর-প্রহারে,
যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।"

অতএব আমরা এই ঘোরতর আমোদের মধ্যেও কাজ ভুলিয়াছিলাম না। এই সমিতিতেই আমার 'পলাশির যুদ্ধ' অঙ্কুরিত হয়। সে কথা স্থানান্তরে বলিব। যশোহর-জীবনের দুএকটি আমোদের পরিচয় দিয়াছি। যশোহরে বন্ধুতার দুই একটা উদাহরণ দিব।

শরৎ কাল। পূজার বন্ধ। হেডমাষ্টারবাবু তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে রাণাঘাটে গিয়াছেন। সন্ধ্যার সময়ে আমরা সংবাদ পাইলাম, তাঁহার তৃতীয় পুত্র গোপাল গুরুতররূপে জ্বররোগে পীড়িত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ সমস্ত বন্ধুসমাজ স্কুলগৃহে সমবেত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, রোগীর অবস্থা ভাল নহে। তাহাকে সমস্ত রাত্রি দেখিতে হইবে। ডাক্তার সাহেব আসিয়াও তাহাই বলিলেন। এ রাত্রি শিশু রক্ষা পাইবে কি না, তাঁহার সন্দেহ। পালা করিয়া সকলে আহার করিয়া আসিয়া সমবেত হইলাম। কিন্তু বাড়ীতে হেডমাষ্টারবাবুর স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ অভিভাবক নাই। ছেলেকে কে সময়মতে ঔষধ খাওয়ায় এবং তাহার অবস্থার খবর আনে। বন্ধুবর্গ পরামর্শ করিয়া হেডমাষ্টার-বাবুর স্ত্রীর কাছে এ কথা বলিয়া পাঠাইলেন এবং আমাকে রোগীর কক্ষে তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া রোগীর শুশ্রূষা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তিনি প্রতিউত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন—"নবীন আমার মতির অপেক্ষা বড় বেশী বড় নহে। সে আমার পুত্রের মত। তাহার সাক্ষাতে আমার বাহির হইতে কোনও আপত্তি নাই।" এ জীবনে আমি প্রথম রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলাম, এবং তিনি আমাকে পুত্র বলিয়াছেন, আমিও তাঁহাকে মা বলিতে লাগিলাম। মা কয়েক রাত্রি জাগিয়াছিলেন, তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ কি হেডমাষ্টারবাবুর, কি দুর্গাদাসবাবুর, ছোট ছেলেমেয়েদের আমি বড় প্রিয়পাত্র ছিলাম। আমাকে শয্যার পার্শ্বে পাইয়া গোপালের বড় আনন্দ। সে আপনি তাহার মাকে বলিল—

—"মা! তুমি গিয়া ঘুমাও। দাদা আমার কাছে থাকিবে।" আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাহাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ খাওয়াইলাম ও তাহার খবর সময়ে সময়ে গিয়া বন্ধুদিগকে বলিতে লাগিলাম। সকলেই এক এক চেয়ার লইয়া নানা ভাবে বসিয়া জাগ্রত নিদ্রিত ভাবে রাত্রি কাটাইতেছেন। অথচ কেহই হেডমাষ্টারবাবুর কোনওরূপ আত্মীয়, এমন কি, পদ্মার এ পারের লোকও নহেন। রাত্রি পাঁচটার সময়ে আবার ডাক্তার সাহেব আসিলেন। গোপালকে বলিলেন—"গোপাল, ক্যাছা হায়?" গোপালের আট বৎসর আন্দাজ বয়স হইলেও সে বড় বীর পুরুষ। হেডমাষ্টারবাবু তাহাকে একটা পাথরের পুতুলের মত পা দুখানি ধরিয়া সটান সোজা মস্তকের উপর তুলিয়া ফেলিয়া দিতেন। গোপাল সোজা মাটিতে পড়িয়া, বাহুতে তাল ঠুকিয়া চলিয়া যাইত। গোপাল উত্তর দিল—"আচ্ছা হায়, সাহেব।" সাহেব একটুক হাসিলেন এবং বিশেষরূপে তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"অপেক্ষাকৃত ভাল। বেশ সবল শিশু। আর ভয় নাই।" এ সংবাদে বন্ধু-মহলে একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। সকলে বাড়ী চলিয়া গেলাম।

গোপাল ক্রমে আরও ভাল হইল। টেলিগ্রাম পাইয়া হেডমাষ্টারবাবু অপরাহ্ণে উপস্থিত হইলেন। আমি আফিসের পর গিয়া দেখি, তিনি ইতিমধ্যেই বেশ 'তয়ের' হইয়াছেন। আমি যাইবামাত্র আমাকে বুকে লইয়া, তাঁহার স্ত্রীর কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন—"দেখ গোবিন্দ! এ বেটা সত্য সত্যই কোনও জন্মে আমাদের পুত্র ছিল। ঠিক এয়েছ। একটু লর্কা মাঙতা হায়।" আমার শরীরে যেন অমৃত সিঞ্চিত হইল। রাত্রিজাগরণের সমস্ত ক্লান্তি শরীর হইতে অপনীত হইল।

বিদায়

"যা যায়, তা যায় সাথ! বড়ই মধুর!" এরূপে মনের আনন্দে, জীবনের সেই প্রথম উচ্ছ্বাসে, বন্ধুগণের অপরিমিত স্নেহে, কিশোরী ভার্য্যার নব অনুরাগে দিন কাটিয়া যাইতেছে; দিন এমন সুখে এ জীবনে আর কখনও কাটে নাই। আমি পিতৃবিয়োগে যে মহাঝটিকাসংকুল অকূল সাগরে পতিত হইয়াছিলাম, তাহা পার হইয়া কি যেন এক সুখের তীরে, কি যেন এক জ্যোৎস্নাস্নাত সুবাসিত কুসুমকাননে, কুসুমাবৃত সুখ-শয্যায় শায়িত হইয়া, কি যেন এক সুখস্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যে হৃদয় বিপদ-মেঘসমাচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহাতে একটি সামান্য চিন্তার ছায়াও ছিল না। হৃদয়ে কি এক সুখজ্যোৎস্নায় কি এক আনন্দপ্রবাহিণী বহিয়া যাইতেছিল। আমি যেন একটি কিশোর বিহঙ্গের মত কি যেন এক জ্যোৎস্না-প্লাবিত সুখের আকাশে বেড়াইতেছিলাম। প্রতি দিন রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত এক বাসায় না এক বাসায় বন্ধুগণ সমবেত হইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিতেন। আমার আদর কত! প্রত্যেক শনিবার, কি প্রত্যেক রবিবার কোনও বাসায় না কোন বাসায় সকলের সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ। রবিবার প্রাতে সস্ত্রীক সমবেত হইতাম। সমস্ত প্রাতঃকালটা কি আনন্দে, কি বাঁশী এস্রাজের সুমধুর কণ্ঠমিশ্রিত সঙ্গীততরঙ্গে কাটিয়া যাইত। দ্বিপ্রহর সময়ে সকলে মিলিয়া সমীপস্থ নদে, কি সরোবরে সন্তরণ করিয়া স্নান করিতাম। সে সন্তরণের তরঙ্গের সঙ্গে কি আনন্দের তরঙ্গ ছুটিত। আমার নানাবিধ সন্তরণপটুতা দেখিয়া বন্ধু ও বন্ধুপত্নীগণ কতই প্রশংসা, কতই তামাসা করিতেন। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা এরূপ জলক্রীড়ার পর, আহারক্রীড়া আরম্ভ হইত। সেও প্রায় দুই তিন ঘণ্টাব্যাপী। তার পর অনেক বড় বড় ভোজ উদরস্থ করিয়াছি, কিন্তু তেমন আনন্দ, তেমন তৃপ্তি যেন আর কখনও পাই নাই। তাহার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। আবার সন্ধ্যার ছায়াগম হইতে না হইতেই

নানাবিধ যন্ত্র বাজিয়া উঠিত এবং রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আর এক পালা আমোদে ও আহারে কাটাইয়া সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিতাম। দিন যে কিরূপে কাটিতেছিল, জানিতেও পারি নাই।

জুন মাসের প্রথমে একদিন কাচারিতে বসিয়া আছি। কালেক্টার তলব দিলেন। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বলিলেন যে, মাগুরার সবডিভিসনাল অফিসার অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। আমাকে তৎক্ষণাৎ মাগুরা যাইতে হইবে। তিনি আদেশ আফিসে পাঠাইয়াছেন। ঘণ্টাখানিকের মধ্যে আমি পাইব। যে সুখ-পক্ষী আকাশে বাসন্তী জ্যোৎস্নায় বিহার করিতেছিল, সে যেন একেবারে ভূতলে পতিত হইল। আমি কথাটি না কহিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। হৃদয়ে যেন কি এক গুরুতর আঘাত পাইলাম। বেদনা সম্বরণ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—"আমি কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছি মোটে এগার মাস। কেমন করিয়া একটা সবডিভিসনের কাজ চালাইব?" তিনি বলিলেন—"ভয় নাই। পীড়িত জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপাততঃ সেখানেই থাকিবেন। যখন যাহা কিছু বুঝিতে না পার, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই হইবে। আমার বিশ্বাস, তুমি বেশ কাজ করিতে পারিবে।" তখন বুঝিলাম, আর প্রতিবাদ করিয়া ফল নাই। ধীরপদে—মস্তকে যেন পর্ব্বত চাপা পড়িয়াছে—আমার এজলাসে ফিরিয়া আসিলাম। ইতিমধ্যেই কাচারিতে একটা তোলপাড় পড়িয়া গিয়াছে। আমলা, মোক্তার, অর্থী প্রত্যর্থীতে আমার কক্ষ পূর্ণ হইয়া গেল। সকলে আমি স্থানান্তরিত হওয়ায় দুঃখ, কিন্তু এত অল্প বয়সে সবডিভিসনের ভার পাওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং গুণকীর্ত্তনে কক্ষ পরিপূর্ণ হইল। দুর্গাদাসবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"কি শুনিতেছি, কথাটা কি সত্য?" উত্তর শুনিয়া তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া লইয়া তাঁহার এজলাসে লইয়া গেলেন এবং লোক সরাইয়া দিয়া কত স্নেহের কথা, কত উপদেশের কথা সজলনয়নে বলিলেন। দাবানলবৎ সংবাদ যশোহরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে:—উহা সত্য কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া বন্ধুদের পত্র আসিতে লাগিল। সে দিন দুর্গাদাসবাবু আর কোন কর্ম্ম করিলেন না। হেডমাষ্টারবাবু, ওভারসিয়ার এবং ইন্‌স্পেক্টর কিছুক্ষণ পরে ছুটিয়া আসিলেন। সকলের মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু সজল। হৃদয়ে যেন কি এক আঘাত পাইয়াছেন। আমার মাগুরা যাইবার নৌকা ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সকলে আমার বাসায় আসিলেন। পরিবারবর্গ ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়াছেন। বৃদ্ধ আরদালী আগে আসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমস্ত বাসা নিরানন্দ। চট্টগ্রাম হইতে একবার পরিবারেরা এত দূর আসিয়াছে, আবার এতগুলি অনাথ শিশু লইয়া এই প্রেমাস্পদ দেবতুল্য বন্ধুগণ ছাড়িয়া কোথায় এক অজ্ঞাত স্থানে যাইতে হইবে। আমি নীরবে সজলনয়নে বসিয়া আছি। বন্ধুরা তাহাদিগকে সান্ত্বনার কথা বলিতেছেন ও এক এক বার কাঁদিয়া ফেলিতেছেন। শেষে আমাকে লইয়া সকলে হেডমাষ্টারবাবুর বাসায় গেলেন। তাঁহার পত্নী দেখিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। আমার পরিবারস্থ সকলকে আনাইয়া লইলেন এবং সকলে সেখানে আহার করিয়া রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের পর বাড়ী ফিরিলাম। পরদিন প্রাতে ওভারসিয়ার দাদার বাসায় এবং রাত্রিতে দুর্গাদাসবাবুর বাসায় খাইয়া মাগুরা যাত্রা করিব স্থির হইয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে হেডমাষ্টারবাবুর সঙ্গে বাসায় বাসায় বিদায় লইতে আসিলাম। সেই করুণ বিদায় যখনই স্মরণ হয়, তখনই আমার নয়ন অশ্রুতে ভরিয়া উঠে। হেডমাষ্টারবাবুর স্ত্রী আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিয়াছি, আমি তাঁহাকে ও দুর্গাদাসবাবুর স্ত্রীকে মা বলিতাম। তিনি বলিতে লাগিলেন—"তুমি যত দিন ছিলে, আমার কোনও ভয় ছিল না। সমস্ত রাত্রি বাড়ী না আসিলেও আমি ভাবিতাম, তুমি সঙ্গে আছ; পাগলটিকে যেমন করিয়াই হউক, বাড়ী আনিয়া পৌঁছাইবে। আজ হইতে দুদণ্ড বাহিরে থাকিলে, আমাকে

ভয়ে অস্থির থাকিতে হইবে।” তিনি কত আশীর্ব্বাদ করিলেন, কত স্নেহের কথা বলিলেন। হেডমাষ্টারবাবু পার্শ্বে বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া অন্যান্য বন্ধুদের বাসায় গেলাম। সর্ব্বত্র সেরূপ অশ্রুবিসর্জ্জন। সর্ব্বশেষ দুর্গাদাসবাবুর বাসায় গেলাম। তিনি দেখিয়াই বলিলেন—“তুই বিদায় লইতে আসিয়াছিস্, এ কথা মনে করিতেও যেন কষ্ট বোধ হইতেছে। আমি যশোহরে এই আট বৎসর আছি, ইহার মধ্যে কত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আসিয়াছে, গিয়াছে, তাহারা কেহই তোমার মত এত অল্পবয়স্ক ছিল না। তথাপি সকলের কাছে এরূপ প্রশংসা ও এরূপ আদর কেহই পাইতে পারে নাই। কেহও স্থানান্তরিত হইলে দেশশুদ্ধ লোক এরূপ দুঃখ করে নাই। কি কাচারিতে, কি পথে পথে, যেখানে সেখানে এই দুই দিন কেবল তোমার রূপ গুণ ও চরিত্রের প্রশংসা এবং তোমার বদলীতে দুঃখ শুনিতেছি।” তিনি সে রাত্রিতেও আহার না করাইয়া ছাড়িলেন না। শেষ বিদায়ের সময় তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সেই স্নেহপূর্ণ রোদন ও অজস্র স্নেহ বরিষণ আমি এ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

হেডমাষ্টারবাবু ও ইঁহার ছেলেরাও কাঁদিয়া আকুল। “দাদা! তুমি কেন যাইবে? তুমি যাইবে না বল।”—এই কথা ভিন্ন তাহাদের আর মুখে কথা নাই। যাহারা নিতান্ত শিশু, উভয় বাড়ীতে আমাকে এরূপে জড়াইয়া ধরিয়াছিল যে, তাহাদিগকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া, তাহাদের হাত ছাড়াইয়া আসা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যখন তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হইল, তাহাদের সে রোদনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমি বহুদূর পর্য্যন্ত তাহাদের রোদন শুনিতে শুনিতে, রোদন করিয়া তাহাদের সেই স্নেহমুখগুলি দেখিতে দেখিতে চলিয়া আসিয়াছিলাম। এই শিশুদের সস্নেহ রোদন, আমার হৃদয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাতর করিয়াছিল। তাহারা আমাকে পাইলে যেন হাতে স্বর্গ পাইত। যেখানে যে অবস্থায় হউক না কেন, মাতৃকোল হইতে পর্য্যন্ত, আমাকে দেখিলে ছুটিয়া আসিত এবং যতক্ষণ থাকিতাম, ততক্ষণ আমাকে বেড়িয়া, আমার অঙ্কে ও অঙ্গে অঙ্গে লাগিয়া বসিয়া কত আব্দার করিত ও সেই সরল ভাষায় কত কথা কহিত। জানি না, কি শুভক্ষণে আমি যশোহরে গিয়াছিলাম। হেডমাষ্টারবাবু প্রায়ই তাঁর স্ত্রীকে বলিতেন—“গোবিন্দ ঠিক এয়েছে। একটু লর্কা মাঙ্‌তা।” তিনি ও দুর্গাদাসবাবু সেই বাইশ বৎসরের যুবককে শিশুটির মত কোলে লইয়া বসিতেন, এবং আদরে মুখচুম্বন করিতেন। এমন কি, পথ দিয়া চলিতে লোকে কত আদরের ও প্রশংসার কথা কহিত। আমি স্বকর্ণে কাহাকে কাহাকে বলিতে শুনিয়াছি যে—“ছেলে হয় ত যেন এমন ছেলে হয়। যেমন রূপ, তেমন গুণ, তেমন চরিত্র।” দুর্গাদাসবাবুর বাসায় সে দিন যাইতে, এমন কি, রাত্রিতে সেখান হইতে ফিরিবার সময়েও লোকে পথে পথে আমার এরূপ সমালোচনা করিতেছিল, এবং দলে দলে ঘেরিয়া কত আদরের ও প্রশংসার কথাই বলিতেছিল। দুই একজন সম্বন্ধে হেডমাষ্টারবাবু বলিতেছিলেন—“বেটা বিশ্বনিন্দুক। যখন এও তোর প্রশংসা করিতেছে, তখন এ যশোহরে মন্দ বলিবার আর কেহ নাই। তুই বাহাদুর ছেলে।”

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর সময়ে বাসায় ফিরিয়া দেখি, নৌকা প্রস্তুত। পরিবারগণ আমার অপেক্ষা করিতেছেন এবং সেই রাত্রিতেও হেডমাষ্টারবাবুর স্ত্রী ও ছেলেরা আসিয়াছে। নৌকায় উঠিবার সময় একটা রোদনের রোল পড়িয়া গেল। পরিবারস্থ সকলে নৌকায় উঠিলে হেডমাষ্টারবাবু আমাকে এরূপ দৃঢ়ভাবে বক্ষে লইয়া রোদন করিতে লাগিলেন, যেন আমাকে তাঁহার বক্ষের ভিতর, সেই সরল স্নেহস্বর্গের ভিতর জীবনের মত রাখিয়া দিবেন। আমার মুখ তাঁহার বক্ষে, আমার অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভিজিতেছে। তাঁহার দৃষ্টি আকাশের দিকে; তাঁহার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভিজিতেছে। বহুক্ষণ এভাবে উভয়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোকেরা রাত্রি বেশী হইতেছে বলিলে, তিনি বলিলেন—“যাও।” কথাটা যেন তাঁহার হৃদয়

বিদীর্ণ হইয়া বাহির হইল। আমি তাঁহাদের দুজনের পদধূলি লইয়া, শিশুগুলির মুখ চুম্বন করিয়া নৌকায় উঠিলাম। তাঁহাদের সরোদন আশীর্ব্বাদ শুনিতে শুনিতে নৌকা খুলিল। যতদূর নৌকা দেখা গেল, দেখিলাম—স্বচ্ছ অন্ধকারে নৈশ আকাশতলে প্রতিমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া তাঁহারা আমাদের নৌকার দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। ক্রমে তাঁহারা অদৃশ্য হইলেন। ক্রমে যশোহর অদৃশ্য হইল। আমার কর্ম্মজীবনের প্রথম ও উজ্জ্বল সুখদ অঙ্ক শেষ হইল। আমার জীবনেরও প্রথম ও প্রধান সুখপূর্ণ অঙ্ক স্বপ্নবৎ ফুরাইল। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা রাজকর্ম্মে পরিভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু এমন সামাজিক সুখ, এত অকৃত্রিম ভালবাসা, এত অপত্যবৎ স্নেহ আর কোথায়ও পাই নাই। মাগুরা অবস্থিতিকালে, পরীক্ষা দিতে আর একবার যশোহরে আসিয়া এই স্নেহ-পারাবার সকলকে আর একবার দেখিয়াছিলাম। বহু বৎসর পরে হেডমাষ্টার ও দুর্গাদাসবাবুকে দেখিয়াছিলাম। আর একবার—উভয়ের শেষ শয্যায়! ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে দুর্গাদাসবাবু কুমিল্লায় বদলী হইলে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিতে আমি তাঁহাকে ফেণী হইতে লিখি। ফেণী চন্দ্রনাথের পথে। তিনি লিখিলেন,—"তুমি আসিয়া পুত্রের মত, সঙ্গে করিয়া লইয়া যদি চন্দ্রনাথ দর্শন করাও, তবে দেখিব। না হয় নহে।" এই পুণ্য আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ, ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি কুমিল্লা ত্যাগ করেন। এই জীবনে আর যাহাদিগকে দেখিয়াছি, তাহারা যদি মানব হয়, ইঁহারা দুজনেই নরদেব। ইঁহাদের চরণারবিন্দ-সমীপস্থ হইবার যোগ্য লোকও আর আমি দেখি নাই। আর যে দেখিব, সে আশাও করি না।

স্মরণ হয়, দুই দিনে মাগুরায় পৌঁছি। দুই দিন ভৈরববক্ষে তরীগর্ভে ভাসিতে ভাসিতে অশ্রুজলে যশোহর হইতে বিদায় লইয়া, একটি কবিতা লিখি। উহা অমৃত বাজারের দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মাগুরায় পৌঁছিয়া পত্র লিখিলে, দুর্গাদাসবাবু তদুত্তরে আমাকে লেখেন—"তোমার পত্রখানি পৌঁছিলে ছেলেদের মধ্যে একটা মারামারি কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। আমরা স্ত্রীপুরুষ সজলনয়নে হাসিতে হাসিতে সে দৃশ্য দেখিতেছিলাম। শেষে আ——(তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র) সকলকে পরাজয় করিয়া তোমার পত্র আনিয়া আমার হাতে দিল।" আমার দুই মা এখনও দুই দেবীরূপে ধরায় অধিষ্ঠিতা আছেন। উভয়ে পুণ্যগর্ভা। উভয়ের পুত্রগণ প্রতিষ্ঠান্বিত। দুর্গাদাসবাবুর পুত্রেরা আজ দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। পূর্ব্বস্মৃতিতে গলদশ্রুনয়নে শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, তিনি তাঁহাদের দীর্ঘজীবী ও অজস্র সুখে সুখী করুন। যশোহরের সকল বন্ধুই আজ স্বর্গে। কেবল আমিই তাঁহাদের স্নেহস্মৃতিতে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতে এ পৃথিবীতে আছি।

মাগুরা

মাগুরা বড় সুন্দর ও সুখের স্থান। সুবিস্তৃতা সুপ্রসন্নসলিলা নবগঙ্গা নদীতীরে মাগুরা অবস্থিত। তীরপ্রান্তস্থিত একটি বৃহৎ সুরম্য অট্টালিকা সবডিভিসনাল অফিসরের আবাসগৃহ। চারিদিকে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে মনোহর পুষ্পোদ্যান। উদ্যানের এক প্রবেশদ্বার হইতে শ্রেণীবদ্ধ সেগুনবৃক্ষসমাচ্ছন্ন একটি রাজপথ নির্গত হইয়া চক্রাকারে তিন মাইল ব্যবধান বেষ্টন করিয়া, উদ্যানের বিপরীত দিকে নদীতীরের দ্বারে আসিয়া মিলিয়াছিল। ইদানীং ইহার এই অংশ নদীতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অট্টালিকাটিও নদীগর্ভে নিমজ্জিতপ্রায় অবস্থায় ছিল। ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়দের একটা দুর্গোৎসব। বৎসর বৎসর রাশি রাশি টাকা নদীগ্রাস হইতে গৃহটি রক্ষা করিবার নামে তাঁহাদের বিপুল উদরে যাইতেছিল। গৃহটিও প্রভুদের নির্ম্মিত সবডিভিসনাল গৃহ অপেক্ষা অনেক বড়। কারণ, উহা

একজন নীলকরের কুঠী ছিল। সেই কারণেই ইহার এত শোভা-সৌন্দর্য্য। সবডিভিসনাল অফিসার ইংরাজ সিবিলিয়ান। তিনি কোনও অকথ্য রোগে শয্যাশায়ী। যদিও আমি সবডিভিসনাল অফিসরের যাবতীয় কর্ম্ম করিতেছিলাম, তথাপি এই গৃহে থাকা আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। আমি কিঞ্চিৎ দূরে একটি উপনদীতীরে বাসা ভাড়া লইলাম। তাহাতে চারিখানি খড়ের ঘর। কিছুদিন পরে খুড়ী বাড়ী চলিয়া গেলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রাখিতে পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার পুত্র রমেশ ও আমার ছোট ভ্রাতা ও ভগিনী চলিয়া গেল। কেবল জ্যেষ্ঠ দুই ভাইকে, হরকুমার ও প্রাণকুমার, বয়স দশ ও আট বৎসর, তাঁহার অঙ্ক হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া রাখি। কারণ, তাহাদের পড়ার সময় উপস্থিত। তাহাদের আর্ত্তনাদ, বালিকা স্ত্রীর রোদন—তিনিও খুড়ীর সঙ্গে যাইবেন,—সেই দৃশ্য আমি জীবনে ভুলি নাই। হরকুমার এরূপ ছট্‌ফট্ আরম্ভ করিল যে, আমি ক্রোধে নহে, পিতৃমাতৃশোকে অধীর হইয়া তাহাকে বড়ই মারিলাম। তথাপি খুড়ীর মন ফিরিল না। তিনি এই দৃশ্যের মধ্যে নৌকা খুলিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি পিতৃ-মাতৃহীন শিশু দুটিকে বুকে লইয়া সমস্ত রাত্রি কাঁদিলাম। শয্যার এক পার্শ্বে পড়িয়া স্ত্রীও তাহাই করিলেন। কিন্তু প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য শক্তি! পরদিন প্রভাত হইতে শিশু দুটি বেশ মনের আনন্দে খেলিতে লাগিল। আর একটিবার খুড়ীর নামও করিল না। কে যেন রাত্রিতে তাহাদের ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে তাঁহার ছায়া পর্য্যন্ত মুছিয়াছিল। আমি হরকুমারের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিলাম। কারণ, খুড়ী তাহাকে প্রসূত হইবার পর হইতেই পুষিয়াছিলেন। স্ত্রীরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন। কোথায় রাত্রিতে ভাবিতেছিলাম, কাল হইতে আমার আহারই জুটিবে না। প্রভাতে উঠিয়া দেখি, ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা আমার মাতার শিক্ষার ফলে প্রাচীনা গৃহিণীর মত সুচারুরূপে গৃহকার্য্য করিতেছে। ভগবান্ এরূপেই মানুষকে আপন অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলেন। এ সময়ে তিনি আমাদের অকস্মাৎ একটা আশ্রয় জোটাইয়া দিলেন। সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তির এরূপে তৃণও আশ্রয় হইয়া থাকে। মহিমের পূর্ব্ববঙ্গের মাণিকগঞ্জের এলাকায় বাড়ী। মাগুরায় তাহার এক মিঠাইয়ের দোকান ছিল। সে আমাদের জলখাবার জোগাইত। সে হঠাৎ একদিন আমাকে আসিয়া বলিল যে, তাহার বড় সাধ হইয়াছে, সে আমার চাকর হইয়া থাকিবে। তাহার দোকান ছাড়িয়া দিবে। আমি শুনিয়া আনন্দে অধীর। ক.. গ, দেশস্থ যে ব্রাহ্মণ ও চাকরটি ছিল, তাহারাও খুড়ীর সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে আমার আরদালি করিয়া রাখিলাম। সেদিন হইতে সে আমাদের অভিভাবকের মত হইয়া আমার সমস্ত সংসারের ভার লইল। একা পাঁচজন চাকরের কাজ করিতে লাগিল এবং আমার একজন পরম আত্মীয়ের মত আমাদের যত্ন করিতে লাগিল। তাহাকে না পাইলে যে আমরা কি করিতাম, জানি না। শুধু আমার বয়স তেইশ বৎসর এবং স্ত্রীর বয়স তের, তাহা নহে; আমরা ঘর-গৃহস্থের কিছুই জানিতাম না। কেবল মহিমকে পাওয়াতেই আমরা মাগুরা-জীবন বড় সুখে কাটাইলাম। টাকা পয়সা সকলই তাহার হাতে। আমরা কেবল আমোদ করিয়া দিন কাটাইতাম মাত্র। মাগুরাতে সে সময় শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মুন্সেফ, গঙ্গাধর ঘোষ পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর এবং পীতাম্বর দাস নেটিভ ডাক্তার। শেষোক্ত দুজনেই পূর্ব্ববঙ্গবাসী। গিরীশ, গঙ্গাধর, উভয়েরই বয়স প্রায় ত্রিশ। গিরীশ নিরীহ ভালমানুষ। উভয়ে শান্ত, স্থির, গম্ভীর এবং সহৃদয়। আর ডাক্তারবাবুটি একটি অপূর্ব্ব জীব। 'পিকুইক' (Pickwick) সম্প্রদায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। বয়স পঞ্চাশের বহু ঊর্দ্ধে। মিষ্টভাষী, সুরসিক, এবং একটি পাকা ইয়ার। তাঁহার সেই শ্বেত পেণ্ট-চাপকান-মণ্ডিত, শ্বেত কেশরাশিশোভিত, কৌতুকহাসিযুক্ত মূর্ত্তিটি আমি কখনও না হাসিয়া দেখিতে পারিতাম না। আর তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ!—উহা লিখিতে হইলে হাস্যরসে 'পিকুইক পেপার'কেও পরাভূত করিতে পারে। তাঁহার সেই

ভাঙ্গা ভাঙ্গা সেকেলে উচ্চারণযুক্ত ইংরাজি আর এক অপূর্ব্ব জিনিস। গিরীশ, গঙ্গাধর মদ স্পর্শ করিতেন না। তাঁহাদের বাড়ী নিমন্ত্রণে ডাক্তার বেচারি বড়ই বিপদে পড়িত। তিনি তাঁহাদিগকে অনেক সারগর্ভ উপদেশ দিয়া বুঝাইতেন যে—'তোমরা আপনি না খাও, ক্ষতি নাই। কিন্তু পরকে যখন নিমন্ত্রণ কর, তখন অতিথিসৎকার না করাটি কি অধর্ম্ম নহে?" যখন দেখিলেন যে, এই দুইটি জীব কোনও মতে ধর্ম্ম উপদেশ গ্রহণ করিল না, তখন নাচার হইয়া তাঁহাদের বাসায় নিমন্ত্রিত হইলে আপনার বন্দোবস্তটা আপনি করিয়া, তাঁহাদের অতিথিধর্ম্মটা রক্ষা করিতেন। যেই খাওয়ার জায়গা প্রস্তুত বলিয়া চাকর খবর দিত, অমনি ডাক্তারবাবু অপূর্ব্ব মুখভঙ্গী করিয়া, গলা সান দিয়া, সেই কৌতুকহাসি হাসিয়া আমাকে বলিতেন—"ডেপুটিবাবু! তবে আমি একটুক প্রস্রাব করিয়া আসি।" তখন এক দিকে সরিয়া গিয়া, পকেট হইতে একটা ঔষধের শিশি বাহির করিয়া, ঢুক করিয়া দ্রব পদার্থটুক গলাধঃকরণ করিতেন, এবং আবার গলা সান দিতে দিতে ও পাকা গোঁপে তা দিতে দিতে হাস্যমুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেন—"আর কিছু না। একটুক কান্ট্রি (Country)।" আমিও নিত্য একটুক 'বান্ডিল' (Brandy) সেবা করি না বলিয়া তিনি দুঃখ করিতেন। বলিতেন—"যশোর জ্বরজারির জায়গা, ড্যাম্প (Damp), নিত্য একটুক 'বান্ডিল' না খাওয়াটা ভাল নহে। কারণ, আপনি ত আর কান্ট্রি খাইবেন না।" একদিন তাঁহার বড় আনন্দ হইয়াছিল। আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। আমি আর ডাক্তারবাবু একটুকু একটুক 'বান্ডিল' সেবন করিতেছি এবং আমোদের ও হাসির তুফান ছুটাইতেছি। গিরীশের গৌর মুখে কেমন একটা চিরবিষণ্ণতা মাখা ছিল। জানি না, কেন হঠাৎ গিরীশ বলিল—"নবীন! যদি তোমার মত মদ খাইতে পারিতাম, আমিও মদ খাইতাম। ভয়, পাছে তোমার মত ইহাকে ইচ্ছাধীন রাখিতে না পারি।"

আমি। সে কি গিরীশ? তোমার কেন এ সাধ হইল, বল দেখি?

গি। আমার জীবনটা বড় নিরানন্দ। আমার বোধ হয়, আমি যদি একটুক মদ খাইতে পারিতাম, তাহা হইলে মনে একটুক স্ফূর্ত্তি হইত।

আমি। সে কি গিরীশ! তোমার ত নিরানন্দ অনুভব করিবার কোনও কারণ নাই। তুমি নিজে রূপে গুণে চরিত্রে একটি দেবতাবিশেষ। তোমার অসামান্যা রূপবতী ও আনন্দময়ী ভার্য্যা। সন্তানগুলি যেন সোনার পুতুল। তোমার আবার নিরানন্দ কিসের? মদের স্ফূর্ত্তি কতক্ষণ? তোমার আর মদ খাইয়া কাজ নাই।

গি। তাহা ঠিক। তুমি কখনই বা মদ খাও, আর কিই বা খাও? কিন্তু তোমার মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন, হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। তোমাকে দেখিলে আমার হিংসা হয়।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আর আমাকে দেখিলে হয় না? উনি দিন রাত্রি হাসেন, আমোদ করেন। আর আমি কি আপনার মত মলিন মুখ করিয়া বসিয়া থাকি? মুন্‌সেফ-বাবু! আপনি ঐ ছেলেমানুষের কথা শুনিবেন না। আমি ডাক্তার এবং প্রাচীন। আপনি আমার কথা শুনুন। আপনি একটুক একটুক মদ ধরুন। দেখিবেন, আপনি আমার মত আমোদ ও ইয়ারকি করিতে পারিবেন।" ডাক্তারবাবু কথাগুলি এরূপ হাস্যকর গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, যে গিরীশ কদাচিৎ ঈষৎ হাসি মাত্র হাসিত, সে ত আজ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল।

যশোহরের সেই সামাজিক সুখ হইতে আসিয়া মাগুরায় এরূপ বন্ধু না পাইলে আমার মাগুরা-জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিত। ইঁহাদের আদরে এখনও জীবন একটি আনন্দ-স্রোতের মত কল কল স্বরে বহিতে লাগিল। প্রাতঃকালটা একটি ভালমানুষ বৃদ্ধ মৌলবীকে লইয়া পারস্য ভাষার বর্ণাবলীর সেই বিকৃতকণ্ঠ উচ্চারণে কাটাইতাম। সমস্ত দিনটা কার্য্যাধিক্য নিবন্ধন—তখন বাকি খাজনার মোকদ্দমাও ডেপুটিদের ঘাড়ে ছিল—নিঃশ্বাস

ফেলিবার সময় পাইতাম না। মাগুরার মত এত বড় একটা সবডিভিসনের কাজ একজন নবযুবক ও এক বছরের ডেপুটির দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়া বড় সহজ নহে। কারণ, জইণ্ট সাহেবের শয্যা হইতে উঠিবার শক্তিও ছিল না। এরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। তাঁহার যখন অন্যত্র যাইবার অবস্থা হইল, তিনি আমাকে একদিন বলিলেন—"আপনাকে আমি আর উৎপীড়িত করিতে চাহি না। আমি ছুটির দরখাস্ত করিতেছি। আপনি এ অল্প বয়সে যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেছেন, আমি বিস্মিত হইয়াছি। আপনিই সম্ভবতঃ সবডিভিসনের পূর্ণ ভার পাইবেন।" আমি বলিলাম—আমার কোনও কষ্ট হইতেছে না। তিনি যতদিন ভাল না হন, আমি এরূপ ভাবে কাজ চালাইতে পারিব। তিনি ছুটি লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে মিঃ উইলিয়ম মেকেনেলি ক্লে, জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট আসিলেন। আমি এমন গরীব সদাশয় সিবিলিয়ান দেখি নাই। আমরা তাঁহাকে ফকির ভাবিতাম। আমাকে তিনি ঠিক একটি বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। সিবিলিয়ান প্রভুদের আফিস-কক্ষ অতিক্রম করা এবং আফিসের কাজকর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা ভিন্ন অন্য বিষয় আলাপ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। তাঁহাদের আফিসকক্ষে সকালে গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। বড় বেশী আলাপ করিলেন ত একটুক বাতাসের সমালোচনা করিলেন। ইনি আমাকে প্রায়ই সন্ধ্যার পর যাইতে বলিতেন। তিনি তাঁহার শয়নকক্ষে দিবসের শ্রমে ক্লান্ত হইয়া, একখানি চারপায়ায় শায়িত হইয়া আমার সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানাবিধ বিষয়ে আলাপ করিতেন। একদিন বলিলেন যে, তাঁহার কিছুই নাই। তিনি ছুটি লইয়া একবার বিলাত যাইবেন মনে করিয়াছেন, কিন্তু যাতায়াতের ব্যয়ের জন্য চিন্তিত হইয়াছেন। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, তিনি একটি মাত্র প্রাণী। তাঁহার টাকা কি হইতেছে? তিনি বলিলেন—'বেহারা' সকলই খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। বাস্তবিক তাই। তাহাকে দেখিলে আমরা না হাসিয়া থাকিতে পারিতাম না। তাহার জরু আছে, গরু আছে, ঘোড়া আছে, দাস দাসী আছে। সে হাতার একদিকে ঘেরিয়া লইয়াছে। বাজার করিতে যাইবার সময় সে অশ্বারোহণে ভিন্ন ও সঙ্গে দুই একজন ভৃত্য ছাড়া যাইত না। সেই উৎকলীয় মূর্ত্তিখানি কত বেশভূষায় সজ্জিত হইত। সে রোজ তাহার পোষাক পরিবর্ত্তন করিত। অথচ গরীব ক্লের এক সুট বই পোষাক আমরা দেখি নাই। গরীবের সর্ব্বস্ব এই বেহারা চুরি করিত। তিনি বলিতেন—তিনি তাহা জানেন। তবে ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি সে তাঁহার সঙ্গে আছে। তাই কিছুই বলেন না। শুধু এই তস্কর বিশ্বাসঘাতক বেহারার উপরই তাঁহার দয়া ছিল, এমন নহে। তাঁহার দয়া সর্ব্বত্র সমান। এমন কি, অধীনস্থ একজন কেরাণী পর্য্যন্ত পীড়িত হইলে, তিনি দেখিতে আসিতেন। তাহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে কত সান্ত্বনার কথা বলিতেন। সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য পর্য্যন্ত করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে ভয়ানক ঝড় আসিতেছে। আমি গিরীশের বাসায় যাইতে পথ হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। দেখি, ফকিরের মত সেই পোষাকে সাহেব একা পদব্রজে চলিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, তাঁহার কেরাণী শ্যামাচরণের জ্বর হইয়াছে। তাহাকে দেখিতে যাইতেছেন। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম যে, ভয়ানক ঝড় আসিতেছে। তিনি তাহার বাসায় পঁহুছিবার পূর্ব্বে ভিজিয়া যাইবেন। তিনি বলিলেন—"তাতে আর কি? তবে আমি তাহার বাসা চিনি না।" আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া চলিলাম। সেখানে পঁহুছিবা মাত্র খুব একটা ঝড় বৃষ্টি আসিল। তিনি সমস্ত সন্ধ্যাটা সেখানে বসিয়া কত কথা কহিলেন, তাহাকে কত সান্ত্বনা দিলেন। হায়! এ সকল দেবহৃদয় সিবিলিয়ান কোথায় গেল?

মাগুরা-জীবন

মাগুরা অবস্থিতিকালে আমাকে একবার এক মাসের জন্য দ্বিতীয় কর্ম্মচারিস্বরূপ নড়াইল যাইতে হইয়াছিল। নড়াইল, বিখ্যাত জমিদার রতন রায়ের লীলাভূমি। এখানে সবডিভিসনগৃহ দ্বিতল, নদীতীরে অবস্থিত। দৃশ্যটি নয়নানন্দকর। আমি প্রথমতঃ বাবুদের একখানি সুন্দর "ভাউলে" নৌকায় জলচরভাবে কিছুদিন থাকি। রতন রায় ও তাঁহার বংশধরগণের কত উপাখ্যান লোকমুখে শুনিলাম। তখন বংশের এক শাখার অধিনায়ক চন্দ্রবাবু। অন্য শাখার নায়ক একজন অদ্ভুত লোক। ভ্রাতা রতন রায়ের সঙ্গে বিবাদ করিয়া কেবল লাঠির জোরে ইনি জমিদারীর অংশ দখল করিয়া এখন কিঞ্চিৎ দূরে নদীতীরে এক সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতেছিলেন। ইনি মাতা সরস্বতীর বড় ধার ধারিতেন না, এবং শিষ্টাচারের ছায়াও কখন তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই।—সহজ কথায় বলিতে গেলে, ইনি একজন সরলপ্রকৃতির নিরক্ষর লাঠিয়াল। আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা করিলে সকলে আমাকে বারণ করিলেন। তাহার কারণ, তিনি শিষ্টাচারবহির্ভূত কিছু একটা বেয়াড়া কথা বলিয়া ফেলিবেন। তাঁহারা গোটাদুই গল্প যাহা তাঁহার সম্বন্ধে বলিলেন, তাহাতে বাস্তবিক উপরোক্ত আশঙ্কা অমূলক বোধ হইল না।

তাঁহার পুত্রের গৃহশিক্ষক বলিলেন যে, তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার সময়ে উক্ত মহাপুরুষের সঙ্গে তাঁহার এইরূপ আলাপ হইয়াছিল।

প্র। তুমি কত বেতন চাও?

উ। কুড়ি টাকা।

প্র। হল্লা রে হল্লা! কু—ড়ি—টা—কা! গুরুঠাকুরের মাহিয়ানা কু—ড়ি—টা—কা! আমি যদিও লেখাপড়া শিখি নাই, গুরুঠাকুরের মাহিয়ানা ত পাঁচ শিকা দেড় টাকার বেশী শুনি নাই। একে—বারে কু—ড়ি—টা—কা। তুমি আমাকে কেটে ফেল্লেও কুড়ি টাকা আমি দিব না।

তাঁহার যেই কথা, সেই কাজ। অগত্যা তাঁহার জিদ রক্ষা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। শিক্ষক বলিলেন—"তবে আপনার যাহা অভিরুচি। আমি ত আর বাঙ্গালা পড়াইব না; কলাপাতে লেখাইব না। তাহা হইলে পাঁচ শিকা দেড় টাকায় চলিত। কিন্তু আমাকে ইংরাজি পড়াইতে হইবে। অতি পরিশ্রম করিতে হইবে। বিশেষতঃ আপনি দুটাকা না দিলে আর কে দিবে?" শেষে অনেক শিষ্টাচারবহির্ভূত অকথ্য বাগ্‌বিতণ্ডার পর একটা বেতন স্থির হইলে পর তিনি বলিলেন—"কিন্তু আমার পোলারে তিনটা কথা শিখাইতে পারিবে না।

১। আমাদের দেবদেবী-মূর্ত্তিগুলি মাটি ও খড়ের পুতুল। ২। আমি মরিয়া গেলে "মরা গরু আর ঘাস খায় না" বলিয়া আমার শ্রাদ্ধ না করা। ৩। আর আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা বলিয়া গিয়াছে—পৃথিবী তিনকুণে, তুমি গোল বলিয়া শিক্ষা দিবা না। তুমি এই তিন কথা যদি স্বীকার কর, তবে তোমাকে রাখিব।" শিক্ষক তাহাই করিলেন। শিক্ষক যদিও ছাত্রকে নিয়মিতরূপে ভূগোল শিক্ষা দিতেছিলেন, কিন্তু তাহার পিতা উপরোক্ত তিন বিষয়ে প্রশ্ন করিলে কিরূপ সদুত্তর দিতে হইবে, তাহা তালিম দিয়া রাখিয়াছিলেন। জমিদার মহাশয় মধ্যে মধ্যে তাহার পরীক্ষা লইতেন।—

প্র। কহ দিনি আমাদের দেবদেবীগুলিন কি?

উ। দেবদেবী মাটি খড় নহে।

প্র। মরা গরু ঘাস খায় কি না?

উ। খায়।

প্র। পৃথিবী কিরূপ?

উ। তিনকুণে।

পূজ্যবাদ ভূদেববাবু তাঁহারা ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার সহ নড়াইলে স্কুল-পরিদর্শনে আসিয়া উক্ত বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন। সেই দীর্ঘ-গৌর দেবমূর্ত্তিবৎ ভূদেব-বাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। কেডা ও?

উ। আমি শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

প্র। কর কি?

উ। স্কুল ইন্‌স্পেক্টার।

প্র। কও কি, বুঝলাম না।

উ। আমি স্কুল পরিদর্শন করিয়া থাকি।

প্র। গুরুগিরি কর?

ভূদেববাবু দেখিলেন, বেগতিক। বলিলেন—"এক প্রকার তাহাই।"

প্র। বেতন কত?

উ। ৭০০্ শত টাকা।

জমিদার মহাশয় বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন—"আরে বাপ্ রে! হেদিকে ত জুত্ আছে। গুরুগিরি কর্‌র্যা সাত শ টাকা ব্যেতন খাও! আরে বহ্ বহ্।" তাঁহারা বসিলে ডেপুটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর তুমি কর কি?" তিনি আর পুঁথি না বাড়াইয়া বলিলেন—"আমিও ইঁহার অধীন গুরুগিরি করি।"

প্র। তোমার বেতন কত?

উ। ১৫০্ শত টাকা।

তিনি আর এক চীৎকার করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন—"আরে! তুমিও ত কম পাত্র নহ। তুমিও গুরুগিরি কর্‌র্যা ১৫০্ টাকা বেতন খাও! হে দিকে ত কুভ জুত্। আরে, তোমরা দুজনেই বড় লোক। বহ্। বহ্।"

তাহার পর অভিনয়টা কিরূপে শেষ হইয়াছিল, তাহা জনরব অবগত নহে।

শুনিলাম, দু একজন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ও পুলিস অফিসারও তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া এরূপ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন। অতএব আমি তাঁহার দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিলাম।

একদিন তরীপার্শ্বস্থ বাবুদের বাগানে সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্নে বেড়াইতেছি। একটা বৃহৎকায় ঐরাবত-বংশধরের পৃষ্ঠে কয়েকজন লোক বাগানে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহাদের একজন হস্তিপৃষ্ঠ হইতে আমাকে লক্ষ্য করিয়া—"হেরি নবীন তাপসরূপ নয়ন ভুলিল"—গাইতে গাইতে নামিলেন। উপরোক্ত শিক্ষক মহাশয় বলিলেন—"ছোট কালীবাবু।" আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলাম। সকলে উদ্যানবাটীতে বসিলাম। সঙ্গে তাঁহার বেতনভোগী গায়ক ছিলেন। তিনি সান্ধ্য গগন উচ্চকণ্ঠে প্লাবিত ও মুখরিত করিয়া গাইতে লাগিলেন। আমি এমন উচ্চ ও ব্যাপক মধুর কণ্ঠ কখনও শুনি নাই। বাজার ও কাচারি যদিও সেখান হইতে প্রায় আধ মাইল ব্যবধান, তথাপি সেখান হইতে কণ্ঠস্বর শুনিয়া পালে পালে লোক ছুটিয়া আসিল। এই অবধি কালীচরণবাবুর সঙ্গে বেশ একটুকু বন্ধুতা হইল। 'বেশ একটুক' বলিবার অর্থ এই যে, হাকিমদিগের দুর্ভাগ্যবশতঃ স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে বন্ধুতা করিতে নাই। যশোহরের রাজা বরদা-কণ্ঠের পুত্র কুমার জ্ঞানদাকণ্ঠের সঙ্গে আমি কিঞ্চিৎ বন্ধুভাবে মিশিতাম বলিয়া ডেপুটি-মহল আমাকে ভর্ৎসনা করিতেন। হেডমাষ্টার মহাশয় বলিতেন—"বাবাজি! এই ত আরম্ভ। আর কিছুদিন পরে তোমাকেও আমার দাদার মত একটা বৃহৎ পশু হইতে হইবে।' আমি মধ্যে

মধ্যে কালীচরণবাবুর বাড়ী যাইতাম এবং তিনিও মধ্যে মধ্যে বাগানবাড়ীতে আসিতেন। তিনি আমার জলচরত্ব ঘুচাইয়া অবশিষ্ট কাল তাঁহাদের বাগানবাটীতে আমাকে অতিযত্নে ও আদরে রাখিয়াছিলেন। কালীচরণবাবুর স্নেহে নড়াইলে একটি মাস বড় সুখে কাটাইয়া মাগুরা ফিরিলাম। তাহার কিছুদিন পরে আবার সাত দিনের জন্য ঝিনাইদহের সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া যাইতে হইয়াছিল। যশোহরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার গোপাল দাদা এখানে বদলী হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে সবডিভিসনগৃহে থাকিতে না দিয়া, তাঁহার সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। এই সাত দিন আবার সেই যশোহরের বন্ধুতার সুখে ও আমোদে কাটাইয়া মাগুরা ফিরিলাম।

অকস্মাৎ খবর আসিল, ক্রে সাহেব আলিপুর বদলি হইয়াছেন। আমাদের প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনিও বড় অনিচ্ছায় চলিয়া গেলেন। তিনি আমার হাতে সবডিভিসনের ভার রাখিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, আমাকে স্থায়ী ভার দেওয়ার জন্য তিনি বিশেষ করিয়া মাজিস্ট্রেটকে লিখিয়াছেন, আমি নিশ্চয়ই স্থায়ী হইব। কিন্তু তাহা হইল না। কিছুদিন পরে আর এক ইংরাজ সিবিলিয়ান মিঃ হার্লি জইণ্ট মাজিস্ট্রেট ভারপ্রাপ্ত হইয়া আসিলেন। "অমৃত বাজার পত্রিকা" আমার মাগুরার কাজকর্ম্মের ও লোকপ্রিয়তার অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া আমাকে ভার না দেওয়ার দরুন গবর্ণমেণ্টকে তীব্র আক্রমণ করিলেন। লোকপ্রিয়তার একটি গল্প এখানে বলিব। একটি অতিশয় সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার কোনও নীল-কুঠির দেওয়ান ছিলেন। একটি নীল-মোকদ্দমায় তিনি আমার সমক্ষে বিবাদী হইয়া আসেন। আমি তাঁহার তিন মাস কারাবাসের ও গুরুতর অর্থদণ্ডের আদেশ করি। অপরাধের তুলনায় অতি লঘু দণ্ড। তখনই আদেশ প্রচারিত হইবামাত্র কাচারিতে একটি কান্নার রোল পড়িয়া গেল। তাঁহার পুত্র, পৌত্র, দৌহিত্র ও আত্মীয়াদিতে কাচারি পূর্ণ ছিল। সকলে হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমিও চক্ষের জল রুমালে মুছিতে মুছিতে কাচারি হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলাম। এই প্রথম একজন সম্ভ্রান্ত লোক আমার হাতে দণ্ডিত হইল। আমি এত ব্যথিত হইয়াছিলাম যে, কয়েকদিন যাবৎ আমার হৃদয় বিষাদে ডুবিয়া গিয়াছিল। আমার ভালরূপে আহার নিদ্রা হইত না। পরদিন প্রাতে দেখি, অন্যান্য ইতর কয়েদীর সঙ্গে ব্রাহ্মণের দ্বারাও কোথা হইতে বাঁশ বহন করিয়া আনান হইতেছে। দেখিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি সঙ্গের পাপিষ্ঠ ওয়ার্ডারকে গালি দিতে লাগিলাম। সে বলিল—ডাক্তারবাবুর হুকুম। ব্রাহ্মণ সজল করুণনয়নে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট দয়া করিয়াছেন। ভগবান্ আপনাকে দীর্ঘজীবী ও সুখী করুন। আর আমার জন্য দুঃখ করিবেন না। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে!" তখন সবডিভিসনের ভার আমার হস্তে। আমি ক্রোধে অধীর হইয়া, জেলখানায় গিয়া ডাক্তার-বাবুকে ভর্ৎসনা করিলাম। তিনি বলিলেন,—তিনি কি করিবেন, তাঁহাকে "রুল"মতে কার্য্য করিতে হইবে। আসল কথা, তিনি দক্ষিণাটা যেরূপ অতিরিক্ত মাত্রায় চাহিয়াছিলেন, তাহা পান নাই। তাহা আদায় করিবার জন্য ব্রাহ্মণকে এরূপ অপমান করিতেছেন। তিনি সতেজে আমাকে "রুল" দেখাইলেন। তখন ক্রোধ ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহাকে বন্ধুভাবে বলিলাম যে, আমার অনুরোধ, ব্রাহ্মণ যশোর জেলে যাইবার পূর্ব্বে যে কয়দিন জেলে থাকেন, যেন তাঁহার দ্বারা কোনও কর্ম্ম করান না হয়। তিনি তখন আমার ভর্ৎসনার প্রতিশোধ দিয়া, আমাকে মুরুব্বিয়ানা করিয়া দীর্ঘ উপদেশ দিয়া বলিলেন যে, আমি কয়েদীদের প্রতি এরূপ দয়া প্রকাশ করিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইব। আমি সেদিন প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের "ধর্ম্মাধিকরণের" ছায়া যে মাড়ায়, তাহার দয়া ধর্ম্ম সকলই লুপ্ত হয়। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণ আসিয়া পৌঁছিলে আমি বলিলাম,—"আপনি রায়ের নকল পাইয়াছেন কি? শীঘ্র আপীল করুন। আপনি খালাস পাইবেন।" তিনি সেরূপ সজলনয়নে বলিলেন—"না ধর্ম্মাবতার! আমার সে আশা

নাই। এমন সদাশয়, দয়ার্দ্র এবং সর্ব্বজনপ্রশংসিত বিচারক যখন আমার দণ্ড করিয়াছেন, তাহা কখনও রহিত হইবে না। এবার আমার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

আমি আবার অশ্রু মুছিতে মুছিতে গৃহে আসিলাম। তিন মাস পরে একদিন কাচারির জনতার মধ্য হইতে সেই ব্রাহ্মণ আমাকে দু হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই হইয়াছে। আপীলে আপনার হুকুম রহিত হয় নাই। আমি এই খালাস হইয়া বাড়ী যাইবার সময়ে একবার আপনাকে না দেখিয়া যাইতে পারিলাম না। আপনি কোনও দুঃখ করিবেন না। আমি পাপিষ্ঠ নীলকরের চাকরীতে অনেক মহাপাতক করিয়াছি। এতদিনে আপনার দণ্ডে নহে, আপনার দয়াতে আমার জ্ঞান চৈতন্য হইয়াছে। আমি পাপীকে আপনি উদ্ধার করিয়াছেন। আমার এত দিনে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমি বাড়ী পঁহুছিয়াই কাশী যাত্রা করিব। যত দিন বাঁচি, তীর্থধামে বসিয়া আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" আমি কাচারিতে অধোবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলাম। কাচারিতে কেহই শুষ্কনয়নে ছিলেন না। সকলেই আমার বিচারের যোগ্যতাতীত প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে আমি মর্ম্মাহত হইতেছিলাম। এই ব্রাহ্মণকে আমি নরকে পাঠাইয়াছিলাম। এ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদার নরক ভোগ করিতেছিলেন, অথচ যে নরাধম নীলকরের জন্য ব্রাহ্মণ এ অপরাধ করিয়াছিলেন, সে পরমানন্দে তাহার অট্টালিকাতে বসিয়া পানাহার করিতেছিল। ইহাই কি বিচার! সেদিন হইতে ইংরাজরাজ্যের বিচার ও শাসন-প্রণালীর উপর আমি আরও হতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলাম।

তালখড়ি গ্রামের ভট্টাচার্য্যেরা মাগুরার বিখ্যাত জমিদার ও পণ্ডিতবংশ। তাঁহাদের মাগুরার বাসাবাটী আমার বাসার পার্শ্বে। তাঁহাদের একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও বিষয়ী লোক ছিলেন। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে মাগুরা আসিতেন। কিন্তু কখনও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন না। উপরোক্ত ঘটনার পরদিন তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বলিলেন—"কাল আমি আপনার কাচারিতে কোনও কার্য্য উপলক্ষে উপস্থিত ছিলাম। যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, এ জীবনে ভুলিব না। আমি এতদিন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই। কিন্তু কাল যাহা দেখিলাম ও শুনিলাম, তাহার পর আর সাক্ষাৎ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার বয়স পঞ্চাশ বৎসর। কিঞ্চিৎ বিষয় আছে। অনেক মোকদ্দমা করিয়াছি ও দেখিয়াছি। অনেক বিচারকও দেখিয়াছি। কিন্তু উভয়পক্ষ বিচারে সন্তুষ্ট, এমন দৃষ্টান্ত দেখি নাই। কোনও বিচারকের উপর দণ্ডিত ব্যক্তি সন্তুষ্ট হয় না। কিন্তু কাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা শুনিয়া ও আপনার ভাব দেখিয়া কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারে নাই। এরূপ দয়ার সহিত শাসন কেহ কখনও দেখে নাই, শুনে নাই।"

এ অবধি তিনি আমার সঙ্গে বরাবর সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। তিনি সংস্কৃতসাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। সাহিত্যের ও অন্যান্য বিষয়ের আলাপে বহুক্ষণ কাটিয়া যাইত। একদিন বলিলেন—"আপনাকে দেখিলে আমার শ্রীকৃষ্ণকে মনে হয়। যেন তেমনি সুন্দর, তেমনি কিশোর, তেমনিই আয়ত নয়ন, তেমনিই মনোহর রূপ। ব্রজগোপীরা একদিন যশোদার কাছে এই বলিয়া নালিশ করিলেন যে, কৃষ্ণ বড় দুরন্ত বালক। তাহার উপদ্রবে তাঁহাদের ব্রজবাস করা কঠিন হইয়াছে। যশোদা বলিলেন—'সে কি! কৃষ্ণ আমার এমন সুশীল, ননীর পুতুল! সে কি, বাছা, কোনওরূপ অত্যাচার করিতে পারে?' আপনাকেও গৃহে দেখিলে আপনার এই সুশীল, সদাশয় মূর্ত্তি, আপনার এ অমায়িক ভাব, এই বিনয়, এই মধুর আলাপে—আমার সন্দেহ হয় যে, এ বালকটি কি আবার সেই বিচার-আসনে বসিয়া এই সর্ব্বাভিভসন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিতেছে? অথচ লোকের কাছে এত প্রিয় যে, লোকের মুখে প্রশংসা ধরে না। কেবল আপনাকে দেখিবার জন্য কাচারিতে কত লোক আসে। সকলের মনে যেন নন্দ-যশোদার মত এক অপূর্ব্ব বাৎসল্যভাবের উদয় হয়।"

"অমৃত বাজারে"র প্রবন্ধের কথা শুনিয়া নবাগত জইণ্ট হার্লি চটিয়া লাল—"কি! আমি গোরাচাঁদ যে আসনে অধিষ্ঠিত, তাহা একজন কালাচাঁদকে দেয় নাই বলিয়া এত কটূক্তি!" কিন্তু "অমৃত বাজার" তাঁহার ক্রোধ-শরজালের লক্ষ্যের বাহিরে, অতএব শরজাল অস্বাভাবিক গতি অবলম্বন করিয়া আমি গরীবের মস্তকে পড়িতে লাগিল। বঙ্কিমবাবুর সেই ডেপুটি পোষ্টমাষ্টার ও তাঁহার পেয়াদার প্রহসন অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। ডেপুটি পোষ্ট-মাষ্টারবাবু মনে করিতেন, তিনি পেয়াদার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। সে মনে করিত, এতই বা কি? তাঁহার বেতন ১৫৲, তাহার ৭৲ টাকা। অতএব সে তাঁহার প্রত্যেক কথার সেই ৭/১৫ টাকা হিসাবে উত্তর দিত। সেরূপ জইণ্ট সাহেব মনে করিতেন, তিনি আমার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা এবং সেরূপ ভাষায় আমার উপর হুকুম জারি করিতেন। আমি মনে করিতাম, তিনি "জইণ্ট" (সহযোগী) মাজিষ্ট্রেট, আমিও ডেপুটি (প্রতিনিধি) মাজিষ্ট্রেট, কমই বা কি? তাহাতে আবার এই মাত্র কলেজ হইতে ইংরাজি শিক্ষার ও সভ্যতার উগ্রতা অতিরিক্ত মাত্রায় মস্তকে বোঝাই করিয়া আনিয়াছি। প্রথমে অফিসিয়াল ভাবে, পরে ডেমি অফিসিয়াল ভাবে যুদ্ধ চলিল। তাহার পর প্রত্যহ আমার বিরুদ্ধে অবাধ্যতার জন্য, তাঁহার বিরুদ্ধে অশিষ্টাচারের জন্য, জেলার মাজিষ্ট্রেট বার্টন সাহেবের কাছে উভয়পক্ষে নালিশ উপস্থিত হইতে লাগিল। এখনকার দিন হইলে মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ আমার অজ্ঞাতে Confidential অর্থাৎ গুপ্তাস্ত্র ত্যাগ করিয়া গবর্ণমেণ্টের দ্বারা আমার ডেপুটিলীলা শেষ করাইতেন। কিন্তু বাঙ্গালীবিদ্বেষের তখনও সূত্রপাত হয় নাই। মিঃ ওয়েষ্টল্যাণ্ড চলিয়া গিয়াছেন। তখন মিঃ বার্টন মাজিষ্ট্রেট। তিনি স্বয়ং মাগুরা আসিয়া আমাকে ডাকাইলেন। তিনি মধ্যে বসিয়া ও আমাদের দুজনকে টেবিলের দুই পার্শ্বে বসাইয়া, উভয়কে মধুরভাবে ভর্ৎসনা করিলেন—"তোমরা দুজনই উচ্চপদস্থ, তোমাদের এরূপ ঝগড়া করা উচিত নহে। তোমরা দুজনে একবার আমার সাক্ষাতে করমর্দ্দন কর।" বোধহয়, তিনি মিঃ জইণ্টকে পূর্ব্বে তালিম দিয়া রাখিয়াছিলেন। "আমার আপত্তি নাই"—বলিয়া উঠিয়া তিনি টেবিলের উপর দিয়া আমার দিকে কর প্রসারণ করিলেন। আমিও উঠিয়া তাহাই করিলাম। করে করে—নীলমণি ও কাঁচা সোনা—মিলিত ও মর্দ্দিত হইল। এই যুগলমিলনের পর মিঃ বার্টন প্রসন্নমুখে উভয়ের শাণিত নালিশপত্রগুলি সহস্র খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ছিন্নপত্রাধারে বিসর্জ্জন করিলেন।

তাহার কিছুদিন পরে আমার উপর পশ্চিমের সাহাবাদ (আরা) জেলার ভবুয়া সবডিভিসনের ভারার্পণের আদেশ গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইল। যশোহরে যেরূপ হইয়াছিল, মাগুরাতেও তাহাই হইল। চারিদিক্ হইতে আমার উপর সহানুভূতির ধারা বহিতে লাগিল। তবে এত অল্প বয়সে সবডিভিসনের ভার পাইলাম বলিয়া সকলের আনন্দ। বাসায় বাসায় বিজয়ার নিমন্ত্রণের ধুম পড়িয়া গেল। মাগুরা ত্যাগ করিবার দিন জইণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতে গেলাম। তিনি খুব সাদর অভ্যর্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি পান করেন কি?" উত্তর—"সময়ে সময়ে এবং যৎকিঞ্চিৎ।" প্রশ্ন—"আপনি আমার সঙ্গে একটা parting peg (বিদায়ের গ্লাশ) পান করিবেন কি?" উত্তর—"আপত্তি নাই।" তখন তারস্বরে—"পেগ লাও" বলিয়া আদেশ প্রচারিত হইল। সোডাসম্বলিত 'পেগ' প্রস্তুত হইল এবং উভয়ের স্বাস্থ্যবাচনপূর্ব্বক গৃহীত হইলে, তিনি আমার কার্য্যদক্ষতার বহুতর প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনাকে একটি কথা উপদেশ দিতে চাহি।" উত্তর—"আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিব।" উপদেশ—"আপনি প্রথম এই অল্প বয়সে সবডিভিসনের ভার পাইলেন। আপনি যে দক্ষতার সহিত উহা চালাইবেন, তাহাতে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে একটি কথা মনে রাখিবেন, পশ্চিম বাঙ্গালাদেশ নহে। সেখানকার লোক বড়ই তেজস্বী। আপনি যদি সেখানে এরূপ তেজের সহিত কাজ করেন, তবে বিপদ্গ্রস্ত হইবেন। অতএব তেজ একটুক হ্রস্ব করিয়া অতি সাবধানে কার্য্য করিবেন।"

এত তেজ ভাল নহে।" আমি একটুক ঈষৎ হাসিয়া, তাঁহাকে এই উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিলাম। বুঝিলাম যে, তিনি সেই পত্রযুদ্ধ ভুলিতে পারেন নাই।

রাত্রিতে আহার করিয়া মাগুরা পরিত্যাগ করিতেছি। নদীতীরে বন্ধুগণ, আর আমি উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাঁহাদিগকে একে একে আলিঙ্গন করিতেছি। সকলে কাঁদিতেছি। ডাক্তারবাবু বলিলেন—তিনি ত্রিশ, কি কত বৎসর মাগুরায় আছেন। কাহাকেও বিদায় দিতে তিনি একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করেন নাই। আজ তাঁহার দর দর অশ্রুধারা পড়িতেছিল। আমি গিরিশ হইতে এক শত টাকা ধার করিয়া পথের খরচের জন্য লইয়াছি। হাতে কিছু ছিল না। গিরিশ বহুক্ষণ আমাকে বক্ষে আঁটিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আমার মুখ সিক্ত করিয়া বলিল—"আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠ সহোদরের মত জানি। তোমাকে একটি উপদেশ দিব। এরূপে হাত শূন্য করিয়া বিদেশে এ সকল শিশু ও পরিবার সঙ্গে থাকিও না।" হায়! গিরিশ! আমি আজ পর্য্যন্ত তোমার সেই স্নেহগর্ভ উপদেশ পালন করিতে পারিলাম না। শ্রীভগবান্ আমার মত যাহাকে সংসারে জড়িত করেন ও বহু পোষ্যের ভার যাহার স্কন্ধে দেন, সে বুঝি পারে না। পিতা পারেন নাই, পুত্র পারিবে কেন? নৌকায় উঠিলাম। তীরস্থিত ও তরীস্থিত রোদনের মধ্যে নৌকা খুলিল। তীরস্থিত বন্ধুগণ ও লোকমণ্ডলী অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। আমার জীবনের আর এক সুখদ অঙ্ক শেষ হইল।

বিপরীত ঘটকালি

বিবাহ ঘটাইবার ঘটকালির কথা সকলে জানেন। কিন্তু ভরসা করি, বিবাহ ভাঙ্গাইবার ঘটকালির কথা কেহ শুনেন নাই। আমাকে মাগুরা অবস্থিতিকালে এরূপ একটা বিপরীত ঘটকালি করিতে হইয়াছিল। আমার কোনও বন্ধুর ছোট ভাই কিঞ্চিৎ উদ্ধত-স্বভাবসম্পন্ন ও সরলপ্রকৃতি ছিল। সে কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। যাহাকে যাহা খুসি, তাহার মুখের উপর বলিয়া দিত। তাহাকে এজন্য আমরা 'পাগলা' বলিয়া ডাকিতাম। কলিকাতায় তাহার পাঠাবস্থায় বন্ধুবর কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া যান। সে অভিভাবকশূন্য অবস্থায় কলিকাতায় থাকে। সে সময়ে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতাপ বিদ্যাসাগরী ভাষায় 'অপ্রতিহত'। দেশ-শুদ্ধ ছেলেরা চোখ বুজিয়া বসিয়া টেয়া-পাখীর মত গম্ভীর ভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' প্রভৃতি জ্যেষ্ঠতাতত্বসূচক বুলি আওড়াইত। সম্প্রতি আবার একদল ব্রাহ্ম বাঙ্গালীর অন্তঃ-পুরদ্বারে স্ত্রীস্বাধীনতার তোপ দাগিতেছিলেন। গুরুগম্ভীর প্রকৃতির, পূজনীয় দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর এবম্বিধ 'কুসংস্কার' ধ্বংস করিতে অস্বীকৃত হওয়াতে প্রথমে কেশববাবু তাঁহার দল ছাড়িয়া আসিয়া নূতন দল সৃষ্টি করেন। কিন্তু কেশববাবুও সম্পূর্ণ-রূপে অন্তঃপুর তোপে উড়াইয়া দিতে ও ব্রাহ্মিকাদিগকে অনাবৃতা স্ত্রীস্বাধীনতা দিতে অস্বীকৃত হওয়াতে উপরোক্ত আর একটি দল সৃষ্টির সূত্রপাত হইতেছিল। উহাই এখন 'সাধারণ' দল নামে খ্যাত। তখন এ দলের সধবা, অধবা এবং বিধবা ব্রাহ্মিকাগণ পর্দ্দার বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে 'ব্রহ্মচিন্তা হি কেবলং' ছেলেদের মুণ্ড-নামক গোলাকার পদার্থটা, অতিরিক্ত ব্রহ্মচিন্তার হউক, কি ব্রাহ্মিকাচিন্তায়ই হউক, ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমাদের এ পাগলটাকে এই দলের ব্রাহ্ম একজন ক্ষেপাইয়া তুলিয়া-ছিলেন। সে পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্মচিন্তায় ও ব্রাহ্মিকাচিন্তায় নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাহার ভ্রাতা তাহাকে অনেক প্রকারে শাসন করিতে চেষ্টা করিলেন। সে তাঁহার কর্তৃত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া বসিল। তিনি তাহাকে বুঝাইলেন যে, তাহার পিতা কখনও তাহাকে এরূপ অধবাকে সধবা করিতে দিবেন না। সে বলিল যে, এরূপ বিষয়ে পিতার

কর্তৃত্ব মানিয়া সে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে পারে না। তখন বন্ধুবর 'ভারত-উদ্ধার' অনিবার্য্য দেখিয়া এবং নিরুপায় হইয়া আমার কাছে পত্র লিখিলেন। আমি পাগলটার হৃদয় জানিতাম। আমি তাঁহাকে লিখিলাম যে তাঁহার কোনও ভয় নাই। আমি পাগলটাকে 'ব্রাহ্মরোগ' হইতে উদ্ধার করিব। তখন কলিকাতায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ধূয়া উঠিতে-ছিল। আমিও স্থির করিলাম যে, চিকিৎসাটা সেই নূতন হোমিওপ্যাথিক মতে করিতে হইবে। আমি ব্রাহ্ম ভাবে বিভোর হইয়া 'কুসংস্কার রাক্ষসবধ কাব্যে'র ও 'ব্রাহ্মিকালাভ প্রহসনে'র প্রথম সর্গ রচনা করিয়া তাহাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলাম। তাহাকে এ পর্য্যন্ত বলিলাম—"মা ভৈ! বিবাহ হইয়া গেলে আর তোমার কুসংস্কারাপন্ন ভ্রাতা ও পিতা কি করিবেন? তখন তাঁহারা আপনিই পথে আসিবেন। বিশেষতঃ তোমার ভ্রাতা আমার যেরূপ বন্ধু। আমি আর তুমি, দুজনে কোমর বাঁধিয়া এই মহৎ কার্য্যটা করিয়া ফেলিলে আমাদের দুজনকে আর তাঁহারা ফেলিতে পারিবেন না।" পাগলা জানিত যে, আমি বড় রোখাল—আমার যেই কথা, সেই কাজ। আমার সেই অপূর্ব্ব বিবাহ উপাখ্যানও সম্যক্‌রূপে জানিত। আমিও স্বাধীন ইচ্ছা খাটাইয়া বিবাহ করিয়াছি। সে আনন্দে অধীর হইয়া গেল। আমি তাহাকে মাগুরা আসিতে লিখিয়ছিলাম, যেন দুজনে পরামর্শ করিয়া এই 'সম্মুখ-সমরে'র একটা Strategy (কৌশল) স্থির করিতে পারি। কলিকাতা হইতে মাগুরা আসা তখন একটা ক্ষুদ্র সেতুবন্ধনের কষ্টসাধ্য হইলেও সে তৎক্ষণাৎ মাগুরায় চলিয়া আসিল। তখনই আমি সেই ব্রাহ্ম মহাশয়কে পত্র লিখিয়া একেবারে বিবাহের প্রস্তাব করিলাম। তিনি তাহাতে আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন। পাগলার আনন্দের ত কথাই নাই। আমিও আনন্দে তাহার অপেক্ষা অধিক অধীর হইলাম,—এবার কুসংস্কার-রাক্ষস বা রাক্ষসীর আর রক্ষা নাই। পাপীয়সী নিশ্চয় হত হইবে। 'মেঘনাদবধে'র হনুমান্ পর্য্যন্ত প্রমীলার পীনপয়োধরা বিপুলনিতম্বা রাক্ষসী দাসীর মল্লযুদ্ধের আবাহনের কথা শুনিয়া ভীত হইয়াছিলেন; কাপুরুষ রামচন্দ্রের ত কথাই নাই। কিন্তু আমরা ভারতব্যাপী অসাগর-নিতম্ব ও হিমাদ্রি-পীনপয়োধরা কুসংস্কার-রাক্ষসীকে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলাম। পাগল তখন আমাকে এই যুদ্ধে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া দিন কাটাইতে লাগিল। 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'—ইহা কুসংস্কারের ঘরবাড়ী হিন্দুশাস্ত্রের কথা। আর সভ্য ইংরাজ কবির কথা—'বীরভোগ্যা বরাঙ্গনা'—None but the brave deserve the fair। সভ্য ঈশ্বর এখন শাস্ত্রের অপেক্ষা সভ্য ইংরাজ কবির কথা বেশী মনে করেন। তিনি আমাদের অনকূল হইলেন। ঠিক এই সময়ে আমি মাগুরা হইতে ভবুয়া বদলি হইলাম। ভবুয়ায় পঁহুছিবার জন্য যে কয়টা দিন সময় পাওয়া যাইবে, তাহা কলিকাতায় কাটাইয়া, সেই যুদ্ধটা শেষ করিয়া যাইব স্থির করিলাম। কলিকাতায় অবস্থিতিকালে বিবাহের অন্যান্য বিষয় স্থির করিয়া যাহাতে 'শুভস্য শীঘ্রং' হয়, তাহাই করিলে হইবে। জলপথে মাগুরা হইতে কুষ্ঠিয়া আসিয়া পঁহুছিলে আমাদের জন্য বাড়ী স্থির করিবার জন্য পাগলা আগে কলিকাতায় চলিয়া গেল। আমরা কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া পরের একটা ট্রেনে আসিলাম। সে আমাদিগকে শেয়ালদহ হইতে বাসাবাড়ীতে লইয়া যাইবার সময়ে বলিল যে, সেই ব্রাহ্মের বাড়ীতে আমাদের পরদিন নিমন্ত্রণ হইয়াছে। কথাটা সে বড় সন্তোষের সহিত বলিল না। সে "অসভ্য! অসভ্য!" করিতেছিল। আমি বলিলাম—"কি হইয়াছে?" সে বলিল—"ভারি অসভ্য! নিমন্ত্রণ করিবার সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—নবীন-বাবুর স্ত্রী কলিকাতার ভাষা বলিতে পারেন ত? না হয় ব্রাহ্মিকারা হাসিবে। আমি বলিয়াছি—'তোমার স্ত্রী ও কন্যা অপেক্ষা তিনি ভাল কথা বলেন।' আমি বলিলাম—'ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে এ আলাপটা ভাল হয় নাই।" আমি ও আমার স্ত্রী পরস্পরের দিকে চাহিয়া একটুক হাসিলাম। আমি যে কি গভীর খেলা খেলিতেছি স্ত্রী জানিতেন। দেখিলাম,

পাগলা কিঞ্চিৎ চটিয়াছে। ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি জানিতাম যে, অনেক ব্রাহ্ম মহাশয়ের ব্রহ্মজ্ঞান যতদূরই হউক না কেন, শিষ্টাচারজ্ঞানটা বড় অল্প। তাঁহাদের মধ্যে আবার ভাবী শ্বশুর মহাশয়টি একজন বিখ্যাত শিষ্টাচার-মূর্খ। আমার উহাই ভরসা ছিল। কারণ, অশিষ্টাচার পাগলার একেবারে অসহ্য ছিল। সে বলিল—"মিষ্টার সেন, তুমি এ অসভ্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবে কি?" আমি বলিলাম—"সেকি কথা! অবশ্য আমরা যাইব। বাপ অসভ্য হউক, মেয়ের দোষ কি?" পরদিন যথাসময়ে বেলা চারটার সময়ে সে আমাদিগকে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রথে লইয়া, তাঁহার আবাসগৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সংবাদ দিল। আমিও তাহার পশ্চাতে গাড়ী হইতে উঠিয়া গেলাম। গাড়ীতে রহিল—আমার শিশু ভাই হরকুমার ও কিশোরী ভার্য্যা। সে মনে করিয়াছিল যে, ভাবী শাশুড়ী, কি তাঁহার কন্যারা আসিয়া স্ত্রীকে গাড়ী হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু স্ত্রী গাড়ীতে প্রায় পনর মিনিট বিরাজ করিবার পর একজন চাকরাণী মাত্র আসিয়া সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। সে চটিয়া লাল হইল। তাহার পর স্ত্রী প্রায় দুই ঘণ্টা কাল একটা প্রকাণ্ড হলের কোণায় ভূতলে একাকিনী বসিয়া রহিলেন। কেহ আসিয়া একটি বার জিজ্ঞাসাও করিল না। পাগল ক্রোধে অধীর হইয়া, বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া, ভাবী শ্বশুরপরিবারবর্গের প্রতি বিজি বিজি বকিতেছিল। আমি ব্রাহ্ম মহাশয়ের কাছে স্বতন্ত্র কক্ষে বসিয়া এ দৃশ্য দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি, পাগলার "ব্রাহ্মরোগ" ছাড়িবার আর বড় বাকি নাই। তাহার পর ব্রাহ্ম মহাশয় আমার স্ত্রীকে কেশববাবুর সমাজে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার কন্যাকে আদেশ দিলেন। আমিও উঠিয়া 'হলে' গিয়া দাঁড়াইলাম। ব্রাহ্মবালা একবার এ ঘর, একবার সে ঘর করিতেছেন। বহুক্ষণ পরে তাঁহার জননী আসিয়া বলিলেন—"তুমি মোজা খুঁজিয়া পাইবে না। আজ মোজা ছাড়া যাও।' কিন্তু তাঁহার কক্ষ-ভ্রমণ তথাপি শেষ হইল না। আবার কিছু-ক্ষণ পরে জননী আসিয়া বলিলেন—"তুমি সঙ্গীতের বহি খুঁজিতে আর দেরি করিও না। সমাজে অন্য কাহারও বহি দেখিও।" তখন তিনি নীরবে কক্ষ হইতে বহির্দিকে চলিলেন। আমরা ভাব বুঝিয়া পশ্চাৎ চলিলাম। গাড়ীতে উঠিয়া আমি ও স্ত্রী বাজি রাখিলাম—দেখি, কে আগে উঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারে। কিন্তু উভয়ের সকল চেষ্টা বিফল হইল। তিনি গাড়ীর পার্শ্বের দিকে ওই যে মুখ ফিরাইয়া বসিলেন, আর সেই মুখ আমরা পৌত্তলিকের দিকে ফিরাইলেন না।

যাহা হউক, স্ত্রীরই জয় হইল। তাঁহারা উভয়ে কেশববাবুর ব্রাহ্মসমাজের প্রমীলার পুরে প্রবেশ করিলেন। উপাসনা শেষ হইয়া গেল; কিন্তু কই, সেই পুরী হইতে স্ত্রী আর আসেন না। আমি সেই পাগলাকে হাসিয়া বলিলাম—"বুঝি তোমার 'ডলসিনিয়া' আমার গোঁড়া হিন্দু স্ত্রীকেও ভজাইলেন।" কিছুক্ষণ পরে আমার শিশু ভাই হরকুমার গিয়া তাঁহাদের দুজনকে ডাকিয়া আনিল। স্ত্রী বলিলেন, তাঁহারই জয় হইয়াছে। কিন্তু জয়ের দরুন তিনি কিছু বিপদে পড়িয়াছিলেন। ব্রাহ্মবালা—তাঁহার বয়স তখন আমার স্ত্রী হইতে কম নহে—সেই ব্রাহ্মিকাপুরে প্রবেশ করিয়াই স্ত্রীকে গম্ভীরভাবে উপদেশ করেন—"এখানে কাহারও সঙ্গে কথা কহিবেন না।" এই তাঁহার প্রথম কথা। ইহাতেই স্ত্রীর জয়। কিন্তু "কথা কহিও না"—ইহার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে গুরুতর দণ্ডাজ্ঞা আর হইতে পারে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভাঙে। স্ত্রীলোক দু চার সহস্র 'ওঁ তৎ সৎ' গলাধঃকরণ করিলেও সেই 'ওঁ' যুগলের মত স্বরহীন হইতে পারে না। কেশববাবুর বক্তৃতা মাথায় থাকুক। যেই স্ত্রী প্রবেশ করিয়াছেন, অমনি ব্রাহ্মিকাদের মধ্যে সমালোচনা আরম্ভ হইল। এটি কে? কোথা হইতে আসিল?—একে ত কখনও দেখি নাই!—ইত্যাদি পুরাতত্ত্বের গবেষণাব্যঞ্জক প্রশ্নরাশি তাঁহার প্রতি চারিদিক্‌ হইতে শরজালের মত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। স্ত্রী মহাশয়ারও ঘোরতর কণ্ঠকণ্ডূয়ন উপস্থিত। কিন্তু কি করিবেন? তিনি কাহারও সঙ্গে কথা

না কহিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। অতএব তিনি নয়ন মুদিয়া, নীরবে গম্ভীরভাবে একদিকে কেশববাবু ও অন্যদিকে ব্রাহ্মিকাদিগের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু যেই উপাসনা শেষ হইল, অমনি ব্রাহ্মিকারা নিরাকার ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমার সাকার পত্নীকে একেবারে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। স্ত্রী বলিলেন—সেই সপ্তরথিবৃন্দের সঙ্গে বাক্‌যুদ্ধ শেষ করিয়া আসিতে বিলম্ব হইল। বেগতিক দেখিয়া তাঁহার 'গাইড' অর্দ্ধপথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণয়ী এই গল্পও শুনিলেন, এবং "beast, beast" (পশু, পশু) বলিতে বলিতে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। তিনি আর প্রণয়িনীর গৃহ পর্য্যন্তও আমাদের সঙ্গে গেলেন না।

তাহার পরদিন ব্রাহ্ম মহাশয় তাঁহার কন্যাগণকে আমাদের বাসায় রাখিয়া, আমাকে লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গেলেন। সার জর্জ ক্যাম্বেল উচ্চশিক্ষা-বৃক্ষটির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন বলিয়া সেদিন টাউনহলে 'রাক্ষসী সভা' হইতেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই সভায় কেন যান নাই জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"আমি ত রাক্ষস নহি। 'রাক্ষসী সভা'য় যাইব কেন?" তাহা লইয়া অনেক ঠাট্টা তামাসা করিয়া বলিলেন—"এই পোড়া শিক্ষা এই দেশ হইতে উঠিয়া গেলেই ভাল হয়। আমি আমার গ্রামে একটি স্কুল খুলিয়াছি। আর তাহার ফলে আমি দেশত্যাগী হইয়াছি। চাষাভুষার ছেলেরা পর্য্যন্ত যেই দু পাত ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করিল, আর তার পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িল। তাহাদের ভাল কাপড় চাহি, জুতা চাহি, মোজা চাহি, মাথায় টেরিটি পর্য্যন্ত চাহি। এখন আমার বাড়ী যাইবার জো নাই। গেলেই কেহ বলে—'দাদাঠাকুর! তুমি কি করিলে? ছেলেটি একবার ক্ষেতের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। আমার আধা জমির চাষ হইল না। খাইব কি? ইহারও বাবুয়ানার খরচই কোথা হইতে যোগাইব?' কেহ বলে—'আমার গরুগুলি মারা গেল। ছেলেটি তাহাদের কাছে একবারও যায় না। চরান দূরে থাকুক। আমার উপায় কি হইবে?' আমি যেমন পাপ করিয়াছি. আমার তেমন প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে। আমি আর পাড়াগাঁয়ে স্কুলের নামমাত্র করিব না। এদেশ তেমন নহে যে, লেখাপড়া শিখিয়া আপন আপন ব্যবসা ভাল করিয়া করিবে। এ লক্ষ্মীছাড়া ছেলেগুলো দু পাত ইংরাজি পড়িলেই আপনার পৈতৃক ব্যবসা ছাড়িয়া দেয়; আপনার পিতামাতাকে পর্য্যন্ত ঘৃণা করে।" কথাগুলি শুনিয়াছি আজ কত বৎসর। কিন্তু এখনও সে কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজিতেছে। তিনি এই শিক্ষাবিভ্রাটের আরম্ভে যাহা দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। আজ চাষা, ধোপা, নাপিত, জেলে, হাড়ি, সকলের ছেলেই লেখাপড়া শিখিতেছে। লক্ষ্য—পেয়াদাগিরি ও কনেষ্টবলি। এই শিক্ষার পরিণাম কি, ভগবানই জানেন।

ফিরিয়া আসিবার সময় ভাবী শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করি। তিনি বলিলেন—তিনি ত পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন, তাঁহার ইহাতে অমত নাই। তিনি পূর্ব্বে এই কন্যাকে আমার দাদা অখিলবাবুকে, চন্দ্রকুমারকে, সর্ব্বশেষ আমাকে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহার ত মত হইবারই কথা। আমি বলিলাম—"তবে বিবাহটা পাত্রের বি. এ. পরীক্ষার পূর্ব্বে হইবে, না পরে হইবে?" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন—"অবশ্য পরে। শুধু তাহা নহে। তাহার বি. এ. পাশ করিতে হইবে। তাহা না হইলে বিয়ে হইবেই না।" তাঁহার যেরূপ উদ্ধতস্বভাব, বলা বাহুল্য যে, ওরূপ উত্তর প্রত্যাশা করিয়াই আমি কথাটি উপস্থিত করিয়াছিলাম। আমি একটুক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—"এ কথাটা তাহাকে বলিব কি?" উত্তর—"অবশ্য বলিবে।" যথেষ্ট। বুঝিলাম, এ কথা শুনিলেই পাগলটা ক্ষেপিয়া উঠিবে।

তাহাই হইল। তিনি আমাকে আমার বাড়ীতে রাখিয়া, তাঁহার মেয়েদের লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি পাগলকে সুন্দর একটা গৌরচন্দ্রিকা দিয়া বলিলাম—"খুব পরিশ্রম করিয়া

পড়। বি. এ. পাশ করিতে না পারিলে তিনি তোমাকে মেয়ে দিবেন না।" বারুদস্তূপে যেন অগ্নি পড়িল, সে একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া ইংরাজিতে বলিল—"কি! মিষ্টর সেন! সে কি তোমাকে এ কথা বলিয়াছে?" আমি অতি মিষ্টভাবে একটুক ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম—"শুধু বলিয়াছেন, তাহা নহে। এ কথা তোমাকে বলিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। অতএব শীঘ্র বি. এ. পাশ করিবার চেষ্টা কর। 'None but the B. A. deserves the fair' !"

সে। বটে। আমাকে এরূপ অপমান করিয়াছে? আমি তাহার মেয়ে বিবাহ করিব না।

আমি। সে কি কথা! তাহা কখনও হইতে পারে না। তাঁহার কাছে আমি এত পত্র লিখিয়াছি, মুখেও এত বলিয়াছি।

সে। আমি তাহার মেয়ে বিবাহ করিব না।

আমি। আমাকে এরূপ অপ্রস্তুত করা কি তোমার উচিত?

সে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, আমি যদি তাহার মেয়ের আর নাম করি, তবে আমি মানুষ নহি। আমি পশু!

তখন আমি ও স্ত্রী ঠাট্টা করিয়া যত জিদ করিয়া বলিতে লাগিলাম যে. তাহাকে এ বিবাহ করিতেই হইবে, ততই তাহার প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইল। তখন আমি চন্দ্রকুমারের কাছে এ বিবাহভঙ্গের ঘটকালির কৃতার্থতার সম্বাদ প্রেরণ করিলাম।

ভবুয়া

কলিকাতায় আসিয়া এই ঘটকালির সঙ্গে বড় একটি উৎপাতে পড়িয়াছিলাম। আমাকে মাগুরার ভার না দিয়া, জইণ্টের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছি বলিয়া, দণ্ডস্বরূপ আমাকে বদলি করা হইয়াছে—"অমৃত বাজার পত্রিকা" এই মর্ম্মে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া প্রকাশ করেন। সেই তীব্র প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ কৃষ্ণদাসবাবু "হিন্দু পেট্রিয়টে" গবর্ণমেণ্টকে আমার বদলির জন্য এক শাণিত অস্ত্র ত্যাগ করেন। আমি কর্ম্মবিভাগের হেড এসিষ্ট্যাণ্ট রাজেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, তিনি আমাকে মহাভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"তুমি কেমন নির্ব্বোধ! তুমি 'হিন্দু পেট্রিয়টে' গবর্ণমেণ্টকে আক্রমণ করিয়া বড়ই অন্যায় করিয়াছ। সেক্রেটারি রিভার্স টম্‌সন্‌ আমাকে ডাকিয়া লইয়া সেদিন বলিলেন—'নবীন এখনও ছেলেমানুষ। আমি তাহাকে ভবুয়ার মত একটি স্বাস্থ্যকর সবডিভিসনের ভার দিয়াছি, তথাপি সে আমাকে এই দেখ, 'পেট্রিয়টে' গালি দিয়াছে।'" আমি বলিলাম—"আমি উক্ত প্রবন্ধের কোনও খবরই রাখি না। স্থানান্তরিত অবস্থায় 'পেট্রিয়ট' আমি এখনও পাই নাই। সে প্রবন্ধটি দেখিও নাই।" তিনি তখন আমাকে তাঁহার কাগজ হইতে উহা দেখাইলেন। দেখিলাম, 'পেট্রিয়ট' আমার মাগুরার কার্য্যের গুণগান করিয়া, এরূপ কর্ম্মচারীকে দণ্ডস্বরূপ ভবুয়া বদলি করা হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। আমি পড়িয়া বলিলাম যে, আমি ইহার কিছুই জানি না। রাজেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তোমার একথা টম্‌সন্‌ বিশ্বাস করিবেন না। তুমি তাঁহার সঙ্গে সাবধান, দেখা করিও না। 'পেট্রিয়টে' ইহার একটা প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার জন্য কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে যাও।" আমি তাঁহার কাছে গিয়া আদ্যোপান্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন—"সে কি? আমি এই প্রবন্ধ 'অমৃত বাজারে'র উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম, স্থানীয় বিষয়ের সংবাদে 'পত্রিকা'র ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, কি প্রতিবাদ ছাপিতে হইবে, তুমি লিখিয়া দাও।" আমি লিখিয়া দিলাম যে, 'পেট্রিয়ট' শুনিয়া সুখী

হইয়াছেন যে, একজন যুবক দুই বৎসরের কর্ম্মচারীকে গবর্ণমেণ্ট ভবুয়ার মত স্বাস্থ্যকর সবডিভিসনের ভার দিয়া বরং অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ভ্রান্তিবশতঃ তিনি গবর্ণমেণ্টকে তজ্জন্য দোষারোপ করিয়াছিলেন। 'পেট্রিয়টে'র পরের সংখ্যায় উহা যথাকালে ও যথাস্থানে ছাপা হইল। রাজেন্দ্রবাবু আমাকে ভবুয়ায় লিখিয়া পাঠাইলেন যে, টম্‌সন্‌ সাহেব তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাহার প্রমাণও পরে পাইয়াছিলাম। হায়! সেদিন, আর এদিন! এখন সংবাদপত্রের এ রাজসম্মান স্বপ্নের বিষয়।

যশোহর বাঙ্গালার দক্ষিণ সীমায়, এবং ভবুয়া বেহারের পশ্চিম সীমায়। রাত্রিতে যাত্রীর (Passenger) গাড়ীতে যাত্রা করিয়া, পরদিন অপরাহ্ন চারটার সময় গিয়া 'ঝমনিয়া' ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সেখানে পুলিস এক পাল্কি ও নিকটবর্ত্তী নীলকুঠির একখানি টমটম সহ উপস্থিত ছিল। আমরা সন্ধ্যার সময়ে আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া, 'দুর্গাবতী' পুলিস ষ্টেশনে পঁহুছিয়া আহার করিলাম 'দাল আউর রুটী'—এই প্রথম, এবং রাত্রি সেখানে কাটাইলাম। কথা ছিল ভবুয়া হইতে আমাদের জন্য স্বতন্ত্র পাল্কিবেহারা আসিবে। রাত্রি প্রভাত হইল।, কিন্তু কই—কিছুই আসিল না। তখন দারোগা স্ত্রীর জন্য এক পাল্কি ও শিশু ভ্রাতা হরকুমার প্রাণকুমারের জন্য একটা খাটুলির বহু কষ্টে বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমার জন্য উপস্থিত হইল এক 'এক্কা'। আমি তাহাতে চড়িব কি, তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইলাম। স্মরণ হয়, পঞ্চানন্দে কি অন্য একখানি কাগজে কবিতায় ইহার একটা জীবন্ত বর্ণনা পড়িয়াছিলাম। দুই কাষ্ঠের চক্র, তাহার উপর বংশের মঞ্চ, তাহার উপর ঠাকুরের খাটের মত চারি বংশদণ্ডে এক বিচিত্র চন্দ্রাতপ। কড়ির মালাতে ও রক্ত, পীত, নীল বস্ত্রখণ্ডে চন্দ্রাতপ ও দণ্ড সজ্জিত। উক্ত আভরণে ক্ষুদ্র টাট্টুটিও ভূষিত। তাহার গ্রীবাদেশে ক্ষুদ্র ঘণ্টা, এবং চক্রের সঙ্গে করতাল সংযোজিত। মঞ্চখানি ১৷৷০×১৷৷০ হাত অনুমান পরিমিত। তাহার অগ্রভাগ উচ্চ এবং পশ্চাৎভাগ ক্রমশঃ নীচ। অগ্রভাগে নানাবিধ রজকসংসর্গহীন বিচিত্র মলিন বসনে সজ্জিত এক্কাওয়ালার বা সারথির স্থান। তাঁহার সেই দীর্ঘ শ্মশ্রু ও ঘর্ম্মাবৃত কৃষ্ণাঙ্গ। সে যে জন্মাবধি 'আপোনারায়ণে'র কৃপালাভ করিয়াছিল, এমন বোধ হইল না। আমাকে তাহার পশ্চাতে তাহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিয়া, আমার সম্মুখ অঙ্গ ঊর্দ্ধ্ব এবং পশ্চাৎ অঙ্গ ক্রমে নিম্নতর অবস্থাপন্ন করিয়া অর্থাৎ একরূপ অর্দ্ধচিত হইয়া বসিতে হইল। আমি বসিয়াই একবার সেই আসনসুখ অনুভব করিয়া নামিয়া পড়িলাম। বলিলাম—ইহাতে আমি যাইতে পারিব না। দারোগা সাহেব বলিলেন—"হুজুর! আপ বহুত জল্দি আউর বড়ি মজেমে যায়েঙ্গে।" কি করিব! উপায়ান্তর নাই। আর ভাগ্যে যাহা থাকে বলিয়া, আবার উঠিয়া পড়িলাম। দুর্গাবতী স্থানটি বড়ই সুন্দর। শীর্ণ-শরীরা গভীরা দুর্গাবতী নদী। তাহার এক পারে সুন্দর ইষ্টকনির্ম্মিত থানাগৃহ। অপর পারে একখানি সুন্দর পূর্ত্তবিভাগের বাঙ্গালা ও একটি ক্ষুদ্র বাজার। নদীবক্ষে লৌহ-নির্ম্মিত দিল্লী ট্রাঙ্ক রোডের এক সুন্দর সেতু। আমি এমন সুন্দর রাজপথ দেখি নাই। রাস্তার পিঠ যেন ঠিক নখের মত। মধ্যভাগ উচ্চ এবং দুই দিকে ক্রমশঃ নীচ হইয়া গিয়াছে। প্রস্তরের দ্বারা এরূপ ভাবে দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে যে, সমস্ত পথটি যেন একটি বিশাল দীর্ঘ প্রস্তর বোধ হয়। দুই পার্শ্বে আম্র, অশ্বত্থাদি মহীরুহসকলের শ্রেণীবদ্ধ ঘনসন্নিবেশ। স্থানে স্থানে অমৃতনিভ বারিপূর্ণ 'ইন্দারা' ও যাত্রিবাসের জন্য 'সরাই'। প্রত্যূষে উঠিয়া স্থানটি দেখিয়া বোধ হইল, কি যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি নূতন জগতে আসিয়াছি। বঙ্গদেশের সঙ্গে কিছুরই প্রাকৃতিক সাদৃশ্য নাই। মনে বড়ই আনন্দ হইল। শিশু ভাই দুটির ও স্ত্রীর আর আনন্দ ধরে না। কিন্তু যেই 'এক্কা' চলিতে আরম্ভ করিল, মুহূর্ত্তেকে আমার আনন্দ ফুরাইল। কাংস্য করতালি বাজিয়া উঠিল। পৌরাণিক রথের জীমূতনির্ঘোষ যে কি ছিল, কেন হইত, তখন বুঝিলাম। সেই সঙ্গীতের

সঙ্গে রথ-গাড়ীতে আমি উর্ন্ধপদে একবার চিৎ, একবার উপর, একবার এ-পাশ, একবার ওপাশ করিতেছিলাম। আসনের চারিদিকে দড়ির জাল আছে। তাহা না হইলে প্রথম যাত্রাতেই ডিগবাজি খাইয়া সেই পাকা রাস্তায় পড়িয়া মানবলীলা সেখানে শেষ হইত। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা—সময়ে সময়ে সারথি এক্কাওয়ালা মহাশয় আমার কোলের উপর আসিয়া পড়িয়া আমাকে তাঁহার শ্রী-অঙ্গের আলিঙ্গনসুখে ও সৌরভে আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। বহির্জগতের এ বিপ্লব যদিও সহিতে পারিতাম, অন্তর্জগতের বিপ্লব আর সহিতে পারিলাম না। আমার বোধ হইল, যেন আমার নাড়ী ও অন্ত্রসকল ছিঁড়িয়া গিয়া একটা তোলপাড় করিতেছে। অতএব কয়েক পদ গিয়াই আমি 'ত্রাহি ত্রাহি!' করিতে লাগিলাম। পৌরাণিক কপিধ্বজ ও গরুড়ধ্বজ মাথায় থাকুন, আমি বলিলাম—আমি ক্ষুদ্র নর, আমার পৈতৃক অন্ত্রী তন্ত্রী অক্ষুন্ন রাখিয়া আমি হাঁটিয়া যাইব। তাহাই করিলাম। কিন্তু বেশীদূর হাঁটিতে হইল না। কিছু দূর গেলেই ভবুয়া হইতে পাল্কি তিনখানি ও বেহারা লইয়া রক্তউষ্ণীষধারী পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গাবতী হইতে স্মরণ হয়, আট মাইল মোহনিয়া চটি। ঝমনিয়া হইতে যে শাখা-পথটি আসিয়া ট্রাঙ্করোডে লাগিয়াছে, তাহা পাকা। মোহনিয়া হইতে যে শাখা-পথ ভবুয়া পর্য্যন্ত নয় মাইল গিয়াছে, তাহা কাঁচা। যদিও তখন বর্ষার আরম্ভ, তখনই উহার অবস্থা ভয়ানক। আমরা যাহা হউক, দ্বিপ্রহর সময় গিয়া সবডিভিসন-বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম। সঙ্গে মহিম ও দেশীয় পাচক ব্রাহ্মণ মাত্র ছিল। তাহারা এক্কাওয়ালাদের প্রতি নানাবিধ অভিধানবহির্ভূত সম্বন্ধ ও শিষ্টাচার করিতে করিতে অধিকাংশ পথ হাঁটিয়া আসিল। চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমতল শস্যক্ষেত্র। মাতা বসুন্ধরা নানাবিধ শস্যের শ্যামল আবরণে প্রাতঃসূর্য্যকরে হাসিতেছেন। মধ্যস্থলে এক প্রকান্ড প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে ইষ্টকনির্ম্মিত খাপরা-আবৃত এবং প্রস্তরস্তম্ভসারিতে শোভিত সবডিভিসন-আবাসগৃহ। তাহার প্রায় সম্মুখেই তদ্রূপ আফিসগৃহ। আবাসগৃহে কেবল দুটি কক্ষ, দুটি সজ্জাকক্ষ, দুটি অবগাহনকক্ষ, এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুই বারান্ডা। প্রাঙ্গণের চারি সীমায় বাবলার সারি। তাহাতে বসিয়া নীলকণ্ঠ এবং একপ্রকারের ঘুঘু ক্রীড়া করিতেছে ও ডাকিতেছে। তদ্ভিন্ন সকলই নীরব, নির্জ্জন। কোথাও জনমানবের সাড়া শব্দ নাই। হাতার উত্তর দিকে জেল, পশ্চিম দিকে পুলিস্ ইন্স্পেক্টর লোনি সাহেবের গৃহ, দক্ষিণ দিকে বৃক্ষ-বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র দেবালয়। দুই মাইল ব্যবধানে ভবুয়ার বাজার ও গ্রাম। এই ব্যবধানের মধ্যে কেবল মাত্র এক ইঁদারা, এক মধ্য-ইংরাজি বিদ্যালয়, এবং ডাক্তারখানা। উভয় মৃন্ময় এবং শ্রী-হীন। কোথায়ও বাঙ্গালীর নামমাত্র নাই। বাঙ্গালা ভাষার নামমাত্র নাই। রাজকার্য্যের ভাষা উর্দ্দু এবং স্থানীয় ভাষা ভোজপুরী বা গোঁয়ারি।

গৃহ ও চারিদিকের দৃশ্যাবলী পরিদর্শন করিলাম। পশ্চাতের বারান্ডা হইতে অতিদূরে এক দীর্ঘ শৈলমালা নীলাকাশে দীর্ঘ নীলতর মেঘবৎ দেখিয়া মাতৃভূমিকে মনে পড়িল এবং নয়ন ও প্রাণ যেন জুড়াইল। সেই বারান্ডায় বসিয়া সেই শৈলমালার দিকে চাহিয়া, একজন আরদালীর কাছে উপরোক্ত বিবরণ সকল জ্ঞাত হইলাম। কি যেন একটা অজ্ঞাত বিষাদে ও অবসাদে হৃদয় ডুবিয়া যাইতেছিল। অনেক সময়ে মানবের হৃদয়ে এরূপে ভাবী অমঙ্গলের ছায়া পড়িয়া থাকে। আমার জীবনে অনেকবার এরূপ পড়িয়াছে। শিশু ভাই দুটি চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের বড় আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দ দেখিয়াও যেন আমার চক্ষু সজল হইতেছিল। কেবল মনে উদয় হইতেছিল—আমি এই পিতৃমাতৃহীন শিশু দুটিকে কোথায় হইতে কোথায় আনিলাম! একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, গৃহে প্রবেশ করিয়া, একটি খাটিয়ার উপর পড়িয়া রহিয়াছি, এমন সময় বাহির হইতে একজন আরদালি ডাকিয়া বলিল —"মুন্সি গোকুলচাঁদ সরকারকে ওয়াস্তে ড্যালি ভেজ দিয়ে হে।" ব্যাপারখানা কি, কিছুই

বুঝিলাম না। উঠিয়া বাহিরে গেলাম। দেখি—নানারূপ রুটি, পুরী, দাল, তরকারি, মাংস—মৎস্য এ অঞ্চলে পাওয়া যায় না—ও আচার,—অদৃশ্যপূর্ব্ব খাদ্য। বুঝিলাম, ডালির অর্থ কি? তার পরের সমস্যা হইল আরও বিষম। বাঙ্গালায় সরকার বলিতে গবর্ণমেণ্ট, অথবা কবিদলের সরকারকে বুঝায় জানিতাম। গবর্ণমেণ্টের জন্য এই ডালি শুনিলাম। এখন ইহা আমি কি করিব? ইহা কি ট্রেজারিতে রাখিতে হইবে? না, বেচিয়া মূল্যমাত্র ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? ঘটিরামের মত আরদালি খুড়ার কাছেই 'রেফার' (জিজ্ঞাসা) করিয়া কি পঁহুছিয়াই আপনার অজ্ঞতার পরিচয় দিব? তাহা ত হইবে না। কিঞ্চিৎ পর সবইন্‌স্পেক্টার ও মুসলমান নেটিব ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদের কেহই ইংরাজি জানেন না। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সকল কি করিতে হইবে?" তাঁহারা বলিলেন—"কেন? হুজুর কি ইহা গ্রহণ করিবেন না? তাহা হইলে মুন্সিজীর বড় অপমান হইবে। সকল হাকিমই তাঁহার ডালি লইয়া থাকেন।" তখন বুঝিলাম, 'হুজুর' যাহা, 'সরকার'ও তাহা। শুধু বুঝিলাম, তাহা নহে; মুন্সিজীর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। পথশ্রমে ও পূর্ব্বরাত্রিতে বেহারের প্রথম জলপানে সকলে ক্ষুধায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম। তখন আদেশমতে ভৃত্য মহিম ডালি তুলিয়া লইল। গৌরবর্ণ, খর্ব্বাকার, তীক্ষ্ন বুদ্ধি যেন দুটি ক্ষুদ্র সতেজ চক্ষুতে ভাসিতেছে; পরিধানে চোস্ত সাদা পায়জামা, তাহার উপর হিন্দুস্থানী ধরনের সাদা চাপকান, মস্তকে ঢাকাই বুটাদার শাড়ীর এক প্রকাণ্ড পাগড়ি, তাহার প্রান্তভাগ পৃষ্ঠদেশে দুলিতেছে, পাদুকা কুঞ্চিতাগ্র 'দিল্লী নাগরা'—মুন্সী গোকুলচাঁদ আসিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ করিয়া বিদায় দিলাম। আমি কখনও পশ্চিম অঞ্চলে পদার্পণ করি নাই শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"এত অল্প বয়সে আপনি অবাধে এরূপ বিশুদ্ধ উচ্চারণসংযুক্ত হিন্দি বলিতে কি প্রকারে শিখিলেন? যদুবাবু, কি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী হাকিমেরা বহুদিন থাকিয়াও ত এরূপ সুন্দর হিন্দি বলিতে পারিতেন না।" আমার উত্তর—"আমার জন্মস্থানের সকলেই হিন্দি ভাল বলিতে পারেন।" ফলতঃই পশ্চিমবঙ্গবাসী আমাদিগকে বাঙ্গাল বলুন, সচরাচর তাঁহাদের হিন্দি বাঙ্গালের বাঙ্গালা অপেক্ষাও হাস্যকর। দেখিতে দেখিতে এ সুখ্যাতি সবডিভিসনময় ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহাদিগকে বিদায় করিয়া আমি জঠরানল নির্ব্বাণ করিতে লাগিলাম। তাহার পর সেদিনই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভবুয়ার কার্যভার গ্রহণ করিলাম।

প্রথম সবডিভিসনাল অফিসারি

প্রকৃতপ্রস্তাবে ভবুয়াই আমার প্রথম সবডিভিসন। আর ভবুয়ার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রথম কার্য্য—সমাজ-সংস্কারকগণ একবার জয়জয়কার করুন—'জেনানা'র প্রাচীর ধ্বংস। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বাবু যদুনাথ বসু বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে বি. এ. দিয়াছিলেন। তাঁহারা দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ.। তাহা হউক, কিন্তু তিনি 'স্বাধীন জেনানা'র কি সৌন্দর্য্যের বড় পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হইল না। শাসারামের সবডিভিসনাল অফিসারের কাছে চার্জ রাখিয়া আমি আসিবার পূর্ব্বে তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সবডিভিসন-গৃহের দুই দিকে এক অতি কুৎসিত মৃৎপ্রাচীর প্রস্তুত করিয়া যে এক দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহা তখনও দণ্ডায়মান ছিল। তিনি কলিকাতাবাসী; অতএব কয়েদীর মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বাস করা তাঁহার অভ্যস্ত। কিন্তু আমরা 'পাড়াগেঁয়ে', আমাদের নিশ্বাস পড়িতেছিল না। তদ্ভিন্ন এই কদাকার প্রাচীর আমার আশৈশব প্রাকৃতিক

শোভামুতে পালিত চক্ষু দুটির পক্ষে বড়ই পীড়াদায়ক হইল। ভবুয়ায় রসিক, কি ঐতিহাসিক কেহই ছিলেন না। তাহা না হইলে চীনদেশীয় প্রাচীরের পর যদুবাবুর এই প্রাচীর পৃথিবীর অষ্টম বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত হইত। যাহা হউক, আমি 'হরকুলেশে'র (Hercules) মত এই মহাপ্রাচীর ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভবুয়ায় একটা ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ডাক্তার, দারোগা, গোকুলচাঁদ ও আমলা-মোক্তারগণ সকলেই ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"আপনি করিতেছেন কি? যদুবাবু অনেক টাকা ব্যয় করিয়া এই কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে স্ত্রীলোকেরা একেবারে 'বেপর্দ্দা' হইয়া পড়িবে।" আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, বহুবচন সংজ্ঞার কিছুই আমার সঙ্গে নাই। আমার একটি কিশোরী ক্ষুদ্র ভার্য্যা। তাঁহার পর্দ্দার জন্য এত বড় মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীরের আবশ্যক নাই। তাঁহার পর্দ্দার জন্য আমি অন্য ব্যবস্থা করিব। তাঁহারা ঘাড় নাড়িয়া ও মুখ মলিন করিয়া বলিলেন—"সরকারকি যেয়েছা মর্জ্জি।" তাঁহাদের ভাবে বোধ হইল যে, আমি একটা বড় গর্হিত কার্য্য করিতেছি বলিয়া তাঁহারা স্থির করিলেন। কিন্তু যখন সেই বৃহৎ প্রাচীর ধ্বংসিত হইয়া গৃহের দুটি দিক্ আলোকময় ও বাতাসময় হইল, এবং সেই আলোকে ও বাতাসে বাঁশের চিক ও কাপড়ের পর্দ্দা দুলিতে লাগিল, তখন তাঁহারা বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"হাঁ। ইয়ে বহুত আচ্ছা হুয়া।"

গৃহের পশ্চাৎভাগে পুষ্পোদ্যান। তাহার পশ্চাতে একটি সুন্দর ইঁদারা। বংশশ্রেণীর দ্বারা ইহার চতুর্দ্দিকেও যদুবাবু আর এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা উর্দ্ধে প্রায় পনর কুড়ি হাত। কলিকাতায় তৃতীয় শ্রেণীর ছক্কর গাড়ীর ঘোড়ার মত বংশরাশির দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বড় একখানি সমতা ছিল না। এমন একটা কুৎসিত বেড়া আমি কখনও দেখি নাই। তাহার প্রয়োজন—স্থূলাঙ্গ যদুবাবুর স্থূলাঙ্গিনী কখনও কখনও সেই ইঁদারার পার্শ্বস্থিত 'হাওজে' অবগাহন করিতে যাইতেন। এই বেড়া ধ্বংস করিবার সময়ে আবার পূর্ব্বমত আর এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু ধ্বংসকার্য্য শেষ করিয়া যখন আমি একটি সুন্দর ছোট বেড়া দিয়া, তাহাতে নানাবিধ পুষ্পলতা তুলিয়া দিলাম, এবং ইঁদারার চতুষ্পার্শ্বস্থ বহুদিনসঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কৃত করিয়া, সেখানে গোলাপ ইত্যাদি সুগন্ধ পুষ্পবৃক্ষ সকল কেয়ারি করিয়া বেড়ার ভিতর দিকে রোপণ করিলাম, তখন আর এক বাহবা পড়িয়া গেল, এবং কত লোক দেখিতে আসিতে লাগিল। এই কুকবনস্থ 'হাওজে' পতি পত্নী অবগাহন করিয়া, এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে একটি স্বর্গসুখ ভোগ করিতাম।

পুলিস ইন্‌স্পেক্টার লোনি সাহেবের সঙ্গে অতি সহজেই পরিচয় হইল। তিনি আইরিশম্যান। যদিও লেখাপড়া ও পুলিসের কার্য্য কিছুই জানিতেন না, তথাপি বড় ভাল লোক। তাঁহার এক ঘটোৎকচরূপিণী ভার্য্যা ছিলেন। একটি প্রকাণ্ড উদরসংযুক্ত ধবলগিরিসন্নিভ মাংসরাশি। তাঁহাদের একটি কন্যা এভিলিনা (Evelina) ; নামটি যেমন মধুর, দেখিতেও তেমনি সুন্দরী। শান্ত, স্থিরা, হাস্যময়ী, চতুরা, নবযুবতী। তদ্ভিন্ন আর দুটি শিশু পুত্র। দুই পরিবারের মধ্যে প্রথম দিনই আলাপ পরিচয় ও শীঘ্রই আত্মীয়তা হইল। এভিলিনা প্রায় প্রত্যহই—কি পূর্ব্বাহ্নে, কি অপরাহ্নে, আমাদের গৃহে আসিত। স্ত্রীপুরুষ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইতাম। সাহেব আমাকে অশ্বারোহণ শিক্ষা দিলেন। তাহাতে আমি এত ক্ষেপিয়া গেলাম যে, মাসে মাসে নূতন ঘোড়া কিনিতাম। কোথায়ও একটা ভাল ঘোড়া আছে শুনিলে তাহা যেরূপে হউক, হস্তগত করিতাম। সবডিভিসনের প্রভু, ইচ্ছা অপ্রতিহত। কোনও জমিদারের ঘোড়া আমার পছন্দ হইয়াছে বলিয়া কেহ একটুক ইঙ্গিত জানাইলে, ঘোড়ার অধিকারী আপনি পাঠাইয়া দিতেন। প্রত্যহ

সায়াহ্নে কখনও বা সাহেবের সঙ্গে, কখনও বা এভিলিনার সঙ্গে অশ্বারোহণে বেড়াইতে বাহির হইতাম। দুজনে বহুদূর বেগে অশ্ব ছুটাইয়া গিয়া বহুক্ষণ ধীরে ধীরে সান্ধ্য ছায়াসমাচ্ছন্ন দুই পার্শ্বস্থ শস্যক্ষেত্র ও সুদূর আকাশপটে চিত্রিত শেখরমালা দেখিতে দেখিতে অশ্ব চালাইতাম, এবং প্রাণ খুলিয়া কত গল্প করিতাম। জ্যোৎস্না রাত্রি হইলে সে ভ্রমণ কি মনোহরই বোধ হইত। চারিদিকে প্রকৃতি কি শোভার ভাণ্ডারই খুলিয়া দিতেন। কখনও বা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বল্‌গা সহিসের হাতে দিয়া, দুজনে কোন বৃক্ষমূলে, কখনও বা পার্ব্বত্য নদ-নদীতীরে জ্যোৎস্নায় বসিয়া প্রাণের উচ্ছ্বাসভরা কত কথা কহিতাম। এভিলিনার আনন্দের মধ্যে কেমন একটি প্রচ্ছন্ন নিরানন্দ ছায়া ছিল। সে সাহেবের স্ত্রীর প্রথম স্বামীর কন্যা। তাহার পিতা পরলোকগত। তাহার মাতা বড় ভাল লোক ছিলেন না। তিনি এমন পুরুষপ্রকৃতির ও সংসারজ্ঞ ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকেই ইন্‌স্পেক্টার বলিত। ফলতঃ তিনি অনেক পরিমাণে তাঁহার স্বামীকে চালাইয়া লইতেন। তিনি এভিলিনার বড় একটা যত্ন করিতেন না। বর্ত্তমান স্বামীর ঔরসজাত পুত্রদিগকে সর্ব্বস্ব মনে করিতেন। আমি কোমল নবতৃণের শ্যামল শয্যায় নদনদীতীরে শুইয়া পার্শ্বস্থিতা বালিকার, কি ধীরগামী অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া পার্শ্বস্থিতা অশ্বারোহিণীর কত দুঃখের কথা শুনিতাম, তাহাকে সুখের আশা দিতাম, কত সান্ত্বনার কথা বলিতাম। স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বড় বন্ধুতা হইয়াছিল। অনেক সময়ে আমি কাচারি চলিয়া গেলেই সে বাসায় আসিয়া জুটিত। এবং রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে হাতাহাতি ছোটাছুটি করিত এবং হাসির ও আমোদের তরঙ্গে গৃহ মুখরিত হইত। অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা এরূপে সুখে যাইত। প্রাতঃকালটা উর্দ্দু পড়িয়া কাটাইতাম। মাগুরা হইতে উচ্চতর ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিয়া সকল বিষয়ে প্রথম বারেই উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। কেবল উর্দ্দুতে এক মার্কের জন্য পরীক্ষক প্রভুরা 'ফেল' করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও যদুবাবু— শুনিয়াছিলাম, সমস্ত দিন এবং রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত কাচারিতে থাকিতেন, আমার প্রথম কয়েক দিন ভিন্ন দুই তিন ঘণ্টার অধিক থাকিতে হয় নাই। তাহার কারণ, তিনি অনর্থক কাজ সৃষ্টি করিতেন, এবং ডালপালা বাড়াইতেন। যত প্রকারের দেওয়ানি বিবাদ ছলে কৌশলে গ্রহণ করিয়া অপরিমিত কার্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে, লোকেরও সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন। তাঁহার মত ফর্কা সেরেস্তা একটা সাড়ে আঠার ভাজার ডালা। তাহাতে নাই, এমন কিছুই নাই। আমি ক্রমে ক্রমে ডালাখানি নিঃশেষ করিলাম। ইহাতে চারিদিকে আমার জয়জয়কার পড়িয়া গেল, এবং সুবিচার প্রশংসার ত সীমাই নাই।

ফলতঃ লোকেরা সেই 'লর্কা হাকিম'কে একটা ছোটখাট কৃষ্ণ বিষ্ণু করিয়া তুলিল। শুধু তাহা নহে, সকলেই কেমন একটা সস্নেহ ব্যবহার করিতে লাগিল। দলে দলে মফঃস্বল হইতে জমিদারগণ চিত্রিত হস্তী ও অশ্বে আরোহণ করিয়া 'মোলাকাত' করিতে আসিতে লাগিলেন। অল্প দিন হইল, ভবুয়াতে সবডিভিসন খুলিয়াছিল। লোকেরা এখনও সরলপ্রকৃতি ছিল। ধর্ম্মাধিকরণ ও ধর্ম্মাবতার এখনও তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান বড় বেশী নষ্ট করিতে পারেন নাই। তাহাদের সরল ও সস্নেহ ব্যবহারে আমার সময়ে সময়ে বড়ই আনন্দ হইত। জমিদার দেখা করিতে আসিয়াছেন। রুমালে বাঁধা এক পুঁটলি উৎকৃষ্ট জিনারা, কি অন্য প্রকারের শস্য আমার টেবিলের উপর রাখিয়া বলিলেন— "হুজুরকে ওয়াস্তে হামারা ক্ষেতছে থোড়া আচ্ছা জিনারা লে আয়ে হেঁ।" আমি অনেক উৎকৃষ্ট ডালি ইহার পর পাইয়াছি, কিন্তু এমন আনন্দ কখনও পাই নাই। ইন্‌কম টেক্‌স করিতে কোনও জমিদারবাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছি, অমনি জমিদার বাহির হইয়া আসিয়া ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া দাঁড়াইলেন। মাথায় সেই হিন্দুস্থানী ধরনের মুণ্ডিত-তালুকা-মধ্য বাবরিছাটা চুল, পরিধান মালকোচামারা গেরুয়া রঙ্গের ধুতি, গায়ে সামান্য আঙ্গরখা।

চিনিবার জো নাই। কারণ, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে ইঁহারা বহুমূল্য বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া যাইতেন। আমি বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছি দেখিয়া বলিলেন "হাম মেঘনারায়ণ সিং।" আমি প্রতিসম্ভাষণ করিলে অমনি ঘোড়া হইতে নামিতে জিদ করিলেন। বলিলেন—"সে কি! আপনি আমার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন। আমার বাড়ীতে একটুক বসিয়া, আমার পুত্রকন্যাদিগকে দেখিয়া যাইবেন না?" আমি চিরদিন ছেলেপুলে বড় ভালবাসি। এ প্রলোভন এবং ইঁহাদিগের বাড়ীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেখিবার সাধ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কেহ কেহ বা আমাকে শিশুটির মত জড়াইয়া ধরিয়া ঘোড়ার উপর হইতে বলপূর্ব্বক হাসিয়া হাসিয়া নামাইয়া লইতেন। সেই হাসি কত সরল, কত শীতল। আত্মীয়হীন বিদেশে কত প্রীতিপদ। একখানি খাটিয়ার উপর উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী শাল পাতিয়া আমাকে বসান হইত। জমিদারের পুত্র, পৌত্র, কন্যা, দৌহিত্র. সকলকে ডাকান হইত, এবং তাহাদের জনে জনে পরিচয় দেওয়া হইত। আমি শিশুদের আমার অঙ্কে ও পার্শ্বে বসাইতাম, এবং তাহাদের সঙ্গে সস্নেহে আলাপ করিতাম। বিদেশে এই শিশুসংসর্গ কি সুখের! তাহার পর নানারূপ কাবুলি মেওয়া, এবং দুধের সরবত উপস্থিত হইত। কিছুক্ষণ এরূপে নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিয়া ও বিশ্রাম করিয়া চলিয়া আসিবার সময়ে জমিদার ও তাঁহার আত্মীয়স্বজন—এমন কি, শিশুগণ পর্য্যন্ত আমার অশ্বের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের বাহির পর্য্যন্ত আসিত। বিদায়ের সময়ে শিশুদের সেই 'সেলাম সাহেব' অভিবাদন ও ক্ষুদ্র হস্তের সেলাম পাইয়া আমি সস্নেহে প্রতিসেলাম করিয়া হাসিতে হাসিতে অশ্ব ছাড়িয়া দিতাম। যতদূর দেখা যায়, তাহারা আমার দিকে চাহিয়া থাকিত।

এইরূপে বড় আদরে ও আনন্দে দিন কাটিতেছে। এমন সময় ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের বক্সার বদলির খবর আসিল। দুটি পরিবারের প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিল। বক্সার যদিও ভবুয়া অপেক্ষা অনেক ভাল স্থান, তথাপি তাঁহারা যাইতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইলেন। আমার দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের কাছে বদলি রহিত করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষ অনুরোধ করাইলেন। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট লিখিলেন যে, বক্সারে একজন ইউরোপীয়ান অফিসারের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহাদের চলিয়া যাইতে হইল। তাঁহারা বড় কাঁদিলেন ও আমরা বড় কাঁদিলাম। সাহেব আইরিশম্যান। কিন্তু মানবহৃদয় যে এক ; দেশভেদে, অবস্থাভেদে, জাতিভেদেও যে তাহার স্বাভাবিক গতিরোধ করিতে পারে না, এই আমি প্রথম বুঝিলাম। 'এভিলিনা' স্ত্রীর গলা জড়াইয়া কাঁদিল, এবং সাশ্রুনয়নে আমার কাছে একখানি বহি আমার হস্তলিপি সহ নিদর্শন চাহিল। আমি একখানি 'বাইবেলে' তাহার নাম লিখিয়া উপহার দিলাম। এ জীবনে আর তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। কিছুদিন তাহারা বড় স্নেহমাখা পত্র লিখিয়াছিল। তাহার পর আর তাহাদের কোনও খবর পাই নাই। মনুষ্যজীবন এমনিই অনিত্য মেঘ-চন্দ্রালোকময়।

ভ্রাতৃশোক

যে অজ্ঞাত বিষাদের ছায়া, এই পরিবারের সম্মিলনে কথঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছিল, তাহাদের স্থানান্তরের সহিত যেন আবার ভাসিয়া উঠিল। স্ত্রী ও ছেলেরা শুনিয়াছিল যে, সবডিভিসনগৃহ ও হাতা পূর্ব্বে একটি সমাধিস্থান ছিল। তাহাতে সকলের মনে এমন একটা ভীতি সঞ্চারিত হইয়াছিল যে, রাত্রিতে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে পর্য্যন্ত কেহ একা যাইতে ভয় করিত। তাহার উপর ভৃত্যগণ পাঁচ রকম রূপকথাও তুলিয়াছিল। তাহারাও ভয়ে রাত্রিতে জড়সড় থাকিত। একদিকে এক মাইলের মধ্যে, এবং তিন দিকে দু এক ক্রোশের মধ্যেও জনপ্রাণী না থাকাতে, রাত্রিতে সে নির্জ্জনতা ভয়াবহ বোধ হইত। এমন কি, কাচারির তিন

চারি ঘণ্টা সময় ভিন্ন আর চতুর্দ্দিকে মানুষের সাড়াশব্দ বড় পাওয়া যাইত না। অতি দূরে দিনে কেবল ক্ষেত্রে কার্য্যরত কৃষকদের বিরল মূর্ত্তি নয়নগোচর হইত।

আমার কনিষ্ঠ হরকুমারের বয়স তখন অনুমান দশ বৎসর, তৎকনিষ্ঠ প্রাণকুমারের আট বৎসর। ভবুয়াতে একটি উর্দ্দু মধ্য-ইংরাজি হীনাবস্থার স্কুল মাত্র ছিল। অতএব তাহাদের বিদ্যাভ্যাসের কোনওরূপ সুবিধা নাই দেখিয়া আমি তাহাদিগকে দেশে পাঠাইব স্থির করিলাম। কিন্তু হরকুমার কিছুতেই দেশে যাইবে না। যে খুড়ীমা তাহাদিগকে পুষিয়াছিলেন, যাঁহাকে সে মা বলিয়া ডাকিত এবং যাঁহাকে ভিন্ন এই শিশুরা অন্য মা যে কেহ ছিল জানিত না, যাঁহার সঙ্গে বাড়ী যাইবার জন্য সে এত দূর আর্ত্তনাদ করিয়াছিল যে, আমি তাহাকে ক্রোধে, দুঃখে—কারণ, 'যাদু' আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই শিশুদের ফেলিয়া যাইতেছিলেন—বত প্রহার করিয়াছিলাম, গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলাম,—শ্রীভগবানের কি ইচ্ছা, সে আজ তাঁহার কাছে যাইতে স্বীকার হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার নামমাত্র শুনিতে পারিত না। তাহার ক্ষুদ্র শিশুহৃদয় খুড়ীর ব্যবহারে কিরূপ একটা গুরুতর আঘাত পাইয়াছিল। বাড়ী যাওয়ার কথা বলিলে সে চটিয়া লাল হইত, স্ত্রীকে কত গালি দিত। এমন কি, আমি শুনিতাম—বারাণ্ডায় বসিয়া কত শোকের ও ক্রোধের ছন্দে পিতৃমাতৃহীন তাহাদিগকে কাছে না রাখিয়া দূরে পাঠাইতেছি বলিয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিত। তাহার যত বড় চক্ষু, তত বড় অশ্রুর ফোঁটা ক্রোধারক্ত নেত্র হইতে ফেলিত। সে বড় কোপনস্বভাব ছিল। একদিন টেবিল, চেয়ার, পালঙ্গ, কাপড় ও বহি ইত্যাদির এক দীর্ঘ ফর্দ্দ সে দশ বৎসরের শিশু নিজে প্রস্তুত করিয়া আমার হাতে দিল। মুক্তার মত সুন্দর বাঙ্গালা লেখা। আমি একটুক হাসিয়া বলিলাম—"এ ফর্দ্দ কিজন্য করিয়াছিস্ ?" দৃঢ় উত্তর—"আমাকে এ সকল জিনিস কিনিয়া দিতে হইবে ; আমি হরকুমারবাবুদের বাসায় এক কামরা ভাড়া করিয়া কলিকাতায় পড়িব। বড় দাদা! আমি বাড়ী যাইব না।" আমি বলিলাম—"প্রাণকুমারের পড়ার কি হইবে? তাহাকেও তুই সঙ্গে রাখিতে পারিবি?" সে সেরূপ দৃঢ়স্বরে বলিল—"ওই বেকুবটাকে বাড়ী পাঠাইয়া দেও।" প্রাণকুমার স্ত্রীর গলা জড়াইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার সেই সুন্দর সুগোল মুখের বিশাল চক্ষু দুটি আরও বিস্তৃত করিয়া বলিল—"উঁ! আমি বাড়ী যাইব না।" আমি সেই তেজস্বী অনাথ শিশুমূর্ত্তিটি বুকে লইয়া পিতামাতার শোকে কাঁদিলাম। তাহাকে অনেক বুঝাইলাম যে, আমার কাছে থাকিলে যখন লেখাপড়ার সুবিধা হইতেছে না, তখন বাড়ী যাওয়া ভাল। সে শিশু, কলিকাতায় কেমন করিয়া থাকিবে? আমরাই বা তাহাকে একাকী কিরূপে রাখিব? কিন্তু সেই ক্ষুদ্র হৃদয়ের কি বল! সে কিছুতেই তাহা শুনিবে না। সে বলিল,—কেন, হরকুমারবাবু কলিকাতায় আছেন। তাহাকে একখানি ঘর সাজাইয়া দিলে, সে বেশ সেখানে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে, এবং নাগুরার মত বরাবর প্রথম পারিতোষিক লইবে। আমি অগত্যা বলিলাম—"আচ্ছা, হরকুমারবাবুকে আসিতে লিখিব। তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, যাহা করিতে হয় করিব।" মনে মনে ভাবিলাম—হরকুমার কলিকাতার থাকা অসুবিধা বলিলে সে বাড়ী যাইতে স্বীকার হইবে। হরকুমারের সঙ্গে শীতের বন্ধে বাড়ী পাঠাইব। কিন্তু সে যেন আমার মন বুঝিয়া, যেন ভবিষ্যৎ গণিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"বড় দাদা! আমি কিন্তু বাড়ী যাইব না।" শিশুর মনে কি ভবিষ্যৎ ছায়া পড়ে? তাহার কথা ঠিক হইল। সে বাড়ী গেল না।

কিছুদিন পরে তাহার, প্রাণকুমারের ও স্ত্রীর ভয়ানক জ্বর হইল। এক কক্ষে স্ত্রী এক খাটিয়ায়, দুই শিশু অন্য কক্ষে দুই খাটিয়ায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। দেখিবার লোক মাত্র আমি। ভৃত্য মহিম সেই দুই মাইল ব্যবধানে বাজারে একবার গেলে অর্দ্ধেক দিন যাইতে কাটিয়া যায়। একজন ইংরাজি-অনভিজ্ঞ নেটিব ডাক্তার মাত্র ভরসা, তাহাতে ঔষধাদি কিছুই নাই। কেবল 'সব-জেলে'র জন্য নামমাত্র যাহা আছে। সে কি দিয়াই বা চিকিৎসা

করিবে? তাহার ঔষধে দু দিনে কিছুই কাহারও উপশম হইল না। ইতিমধ্যেই পূজার বন্ধে যখন কাশী গিয়াছিলাম, সেখানে স্ত্রীর জ্বর হইলে বাবু লোকনাথ মৈত্র হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আসিবার সময়ে আমাকে জ্বর ইত্যাদি সামান্য সামান্য রোগের জন্য তিনি কিছু ঔষধ দিয়াছিলেন। আমি তিন গ্লাসে 'একোনাইট' কয়েক ফোঁটা জলে দিয়া তিনজনের কাছে রাখিয়া দিলাম, এবং এ ঘর সে করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বলিয়াছিল, সামান্য জ্বর, কোনওরূপ জটিলতা নাই। একোনাইটেই দুদিনে ভাল হইবে। অতএব আমিও বড় চিন্তিত হই নাই। হরকুমারকে এক মাত্রা ঔষধ দুপুরের সময়ে খাওয়াইয়া, গ্লাস তাহার খাটিয়ার নীচে ঢাকা দিয়া রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, দু ঘণ্টা পর এক ঢোক খাইতে হইবে। তিন চারি মাত্রা ঔষধ রহিল। সে বলিল—"হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ত? আমি উহার খাওয়ার নিয়ম জানি। ঘড়ি দেখিয়া দু ঘণ্টা পরে পরে খাইব। আপনি বউঠাকুরাণীর কাছে যান। তাঁহার বড় বেশী জ্বর হইয়াছে।" তাহার মনে কোনও ভয় নাই। বুক সেই তেজ ও সাহসে ভরা। সে স্ত্রীর জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। স্ত্রীর বাস্তবিক জ্বর বড় বেশী হইয়াছিল। তিনি ভয়ানক ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। আমি তাঁহার কাছে বসিয়া একখানি বহি পড়িতেছিলাম। সেদিন রবিবার, কি অন্য কোনও বন্ধ ছিল। আফিস ছিল না। সমস্ত হাতায় এক আরদালি ভিন্ন অপর লোক কেহই নাই। আমি বহি পড়িতে চেষ্টা করিলাম; পারিলাম না। যদি ইহাদের রোগ বৃদ্ধি হয়, কি করিব ভাবিতেছিলাম। দু ঘণ্টা পরে উঠিয়া স্ত্রীকে ও প্রাণকুমারকে ঔষধ খাওয়াইয়া হরকুমারের কক্ষে গেলাম। সে তখন বড় ছট্‌ফট্ এবং এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুই ঔষধ খাইয়াছিস্ কি?" সে আমার মুখের দিকে কি এক দীনভাবে চাহিয়া হাতে কি ইসারা করিল। আমি কিছু বুঝিলাম না। দুইবার, তিনবার জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুই উত্তর দিল না। কেবল ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর এক এক বার মুখের দিকে চাহিতেছে। তখন খাটিয়ার নীচে হইতে গ্লাসের ঢাকা ফেলিয়া দেখিলাম, তাহাতে ঔষধ মাত্র নাই। আমি বলিলাম—"ঔষধ কি হইল? তুই কি সকল ঔষধ একেবারে খাইয়া ফেলিয়াছিস্?" আমি মাথা কুটিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু সে কিছুই বলিতেছে না। কেবল সেরূপ ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমার তখন ভয় হইল। আমি চীৎকার ছাড়িয়া মহিমকে ডাকিলাম। সে ছুটিয়া আসিল। সে বলিল—"কেবল দুষ্টামি করিতেছে। এখনই আমার কাছে জল চাহিয়াছে। আমি দিই নাই বলিয়া, জিদ করিয়া সমস্ত ঔষধ বোধহয় খাইয়াছে। আরও জল খাইবার জন্য এ দুষ্টামি করিতেছে।" বাস্তবিক সে বড় দুষ্ট ছিল। অনেক সময়ে নানা প্রকারের ছল করিত। মহিম হাসিয়া বলিল—"কি দুষ্ট! জল খাবি?" শিশু কোনও উত্তর দিল না। কেবল শয্যায় এ-পাশ ও-পাশ করিয়া ছট্‌ফট্ করিতেছিল এবং এক প্রকার হৃদয়বিদারক যাতনাব্যঞ্জক শব্দ করিতেছিল। তাহার চক্ষু দুটি যেন রক্তজবার মত হইয়াছে। উহাদের কিরূপ বিস্তৃত অস্বাভাবিক লক্ষ্যহীন দৃষ্টি! "হরকুমার! কেন এমন করিতেছিস্"—বলিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া, তাহার খাটিয়ার পার্শ্বে জানুর উপর পড়িয়া, তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। তখন তাহার আর বাহ্যজ্ঞান নাই। আরদালি ডাক্তারকে ডাকিতে ছুটিল। স্ত্রী ও প্রাণকুমার আমার কান্না শুনিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন। মহিম বলিল—"আপনারা খামোকা এরূপ অস্থির হইতেছেন। এ কেবল জলের জন্য এ দুষ্টামি করিতেছে।" সে ছুটিয়া গিয়া জল আনিল। মুখে জল ঢালিয়া দিল। জল বাহিরে পড়িয়া গেল। তাহার জলের পিপাসা এ জীবনে আর মিটিল না। ক্রমে তাহার ছটফটি বাড়িতে লাগিল, যন্ত্রণা আরও বেশী হইল, চক্ষু আরও বিস্তৃত হইল। আমার বুকে সে যে কি করিতেছিল, আজও মনে হইলে সে বুক ফাটিতে চাহে। স্ত্রীও উন্মাদিনীর মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। মহিম

বলিল—"তাহার যে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইতেছে। আপনারা সরিয়া যান।" সে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিল। তখন তাহার মুখও গম্ভীর হইল। কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসিল। তাহার অবস্থা পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরমুখে নীরব রহিল। বলিল—"এই মাত্র এগারটার সময়ে আমি দেখিয়া গিয়াছি। হঠাৎ এরূপ অবস্থা যে কেমন করিয়া হইল, বুঝিতে পারিতেছি না।" সে যে তিন চার মাত্রা একোনাইট খাইয়াছে, তাহা বলিলাম। ডাক্তার বলিল, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এক শিশি খাইলেও কোনওরূপ অনিষ্ট হয় না। ডাক্তার মহিমকে কি বলিল। মহিম কাঁদিতে কাঁদিতে শিশুকে কোলে করিয়া বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া কোলে লইয়া বসিল। তখন বেলা পাঁচটা। এতক্ষণে ভবুয়ার বস্তিতে খবর গিয়াছিল। হাতা লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। আমলা, মোক্তার, পুলিস, জমিদার ছুটিয়া আসিল। দাই ও পাচক ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। আমি এ জীবনের জন্য জীবনপ্রতিম স্নেহের ফুলটিকে বুকে লইলাম। সে চলিয়া গেল। আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মহিম তাহাকে আমার বুক হইতে এ জীবনের জন্য কাড়িয়া লইয়া গেল। আমার আর মনে নাই। সন্ধ্যার পর দেখিলাম, চারিদিক্ অন্ধকার। গৃহ অন্ধকার। স্ত্রী ও প্রাণকুমার তখনও ক্লান্তস্বরে গৃহের মধ্যে কাঁদিতেছেন। আমার চারিদিকে ভদ্রলোকগণ নীরবে শোকার্ত্তভাবে বসিয়া দাঁড়াইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। গোকুলচাঁদ আমার মাথা তাঁহার অঙ্কে রাখিয়া বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন—"ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহা ঘটিয়াছে। বিদেশ। এখানে আপনার আত্মীয় আত্মীয়া কেহ নাই। আপনি এরূপ অধীর হইলে চলিবে কেন? আপনি এই অল্প বয়সে একটি সবডিভিসন শাসন করিতেছেন। আমি আপনাকে অধিক কি বলিব? আপনি মাতাজীর কাছে যান। আপনি পুরুষ, তিনি স্ত্রীলোক।" আমার শোচনীয় অবস্থা, আমার কর্ত্তব্য,—তাহার এই কয়টি কথায় হৃদয়ে অঙ্কিত হইল। আমি কেবল একটি মাত্র কথা জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাহাকে কি করিলেন? আমি সেখানে যাইব।" গোকুলচাঁদ বলিলেন যে, তিনি সকল ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আমি সেখানে গেলে আরও অধিক অস্থির হইব মাত্র। আমার প্রাণে সে দৃশ্য সহিবে না। তাঁহারা আমাকে যাইতে দিবেন না। তখন বিধাতার এই সদ্য বজ্র সম্বরণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহে—না, আমার জীবন্ত শ্মশানে প্রবেশ করিলাম। বুকের মধ্যে যেন সেই সুকুমার শিশুর চিতার আগুন জ্বলিতেছিল। সে আগুন যেন এখনও নিবে নাই। কিন্তু তাহার উপর পাষাণ চাপাইয়া, শিশু প্রাণকুমারকে বুকে লইয়া, সমস্ত রাত্রি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলাম। মহিম রাত্রি নয়টার সময়ে ফিরিয়া আসিল। আমার জীবনের প্রথম আশা ফুরাইল; স্নেহমন্দিরের প্রথম কক্ষ বিচূর্ণিত হইল। সে বাঁচিয়া থাকিলে বোধহয়, আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইত। অন্যথা আমারই আকৃতি, আমার প্রকৃতি। আমার মানসিক শক্তি, আমার তেজস্বিতা, এমন কি, আমার বিলাসপ্রিয়তা পর্য্যন্ত সকলই তাহার ছিল। সে যেরূপ কলিকাতায় কক্ষ সাজাইয়া থাকিতে চাহিয়াছিল, আমিও শৈশবে সেরূপ আমার কক্ষ সাজাইয়া রাখিতাম। কিন্তু আমি শিশুর সেই সাধ মিটাইতে পারিলাম না। সে বুঝিয়াছিল যে, আমি মনে মনে তাহাকে বাড়ী পাঠাইব স্থির করিয়াছিলাম, তাই কি সে এরূপে চলিয়া গেল? খুড়ী তাহার স্নেহ পর্য্যন্ত কাটাইয়া, তাহাকে ফেলিয়া মাগুরা হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাই কি সে একেবারে সেই চিরপ্রেমধামে আমার প্রেমময়ী জননীর কাছে, প্রেমস্বর্গ জনকের কাছে চলিয়া গেল? তাহাকে জীবনে আমি সেই একদিন মারিয়াছিলাম, গলা টিপিয়া খুন করিতে চাহিয়াছিলাম—তাই কি চলিয়া গেল? এ স্মৃতি হৃদয়ে মুহুর্মুহু বিষদন্ত বসাইতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহাও ত অস্নেহে করি নাই। খুড়ীর নিষ্ঠুরতায় পিতৃমাতৃশোকে বিহ্বল হইয়া করিয়াছিলাম। এরূপ কত কথা মনে পড়িতে লাগিল। আমার জীবনের প্রথম আশা তাহার উপর—একমাত্র তাহারই উপর স্থাপিত করিয়াছিলাম। প্রাণকুমার তখনই এক প্রকার সরল ও নির্ব্বোধ ছিল। আর দুটির

আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া বড় যে ভাল ছেলে হইবে বলিয়া বোধ হইত না। কিন্তু তাহার মানসিক শক্তি আমার অপেক্ষাও যেন প্রখরা ছিল। স্মরণশক্তি আমার অপেক্ষাও প্রখরতরা ছিল। সমস্ত দিন খেলিয়া বেড়াইত ও আমার মত দুষ্টামি করিত। অল্পক্ষণ মাত্র সন্ধ্যা ও সকালে পড়িত। কোনও গৃহশিক্ষকও ছিল না। তথাপি মাগুরাতে পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়েই প্রথম পারিতোষিক পাইয়াছিল। সমস্ত বিষয়ে সে প্রথম হইয়াছিল। যশোহরে তাহার হাতের লেখা দেখিয়া আমার মনে যে আশা হইয়াছিল, এই পরীক্ষার ফলে তাহা বর্দ্ধিত ও স্থায়ী হইয়াছিল। আমার ভরসায় ও সাহসে বুক ভরিয়া গিয়াছিল। আমার পরে এ শিশু নিশ্চয় এ পরিবারে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। অতএব আমার মনে কিছুমাত্র ভবিষ্যৎচিন্তা ছিল না। যাহা উপার্জ্জন করিতেছিলাম, তাহাই উড়াইতেছিলাম। আমি যৌবনের সেই প্রথম উচ্ছ্বাসে যেন একটি বিহঙ্গের মত নির্ম্মল মধুরালোকে পূর্ণ সুখের নীলাকাশে কল্পনার পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়িতেছিলাম। অকস্মাৎ চক্ষুর আড়ালে বিনা মেঘে আমার উপর এই বজ্রপাত হইল। আমি আকাশ হইতে ভূতলে পড়িলাম। আমার সকল আশা-ভরসা ফুরাইল।

তাহার উপর মনে একটা দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছিল। সেই তিন চারি মাত্রা ঔষধ খাওয়াতে কি এরূপ হইল? আমিই কি তাহার অকালমৃত্যু ঘটাইলাম? এই মনস্তাপে আমার হৃদয়ে অনিবার বৃশ্চিকদংশন হইতেছিল। লোকনাথবাবুর কাছে সকল অবস্থা বিবৃত করিয়া পত্র লিখিলাম। উত্তর পাইলাম—আমার সন্দেহ অমূলক। ডাক্তার যাহা বলিয়াছিল, তিনিও তাহাই লিখিলেন। ঐরূপ এক শিশি ঔষধ খাইলেও এরূপ কোনও অনিষ্ট হইবার কথা নহে। তখন এই মনস্তাপানল নিবিল; হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইলাম।

তখন আমার বয়স চব্বিশ বৎসর এবং স্ত্রীর চৌদ্দ বৎসর। সঙ্গে একটি আট বৎসরের শিশু এবং দেশীয় একটি ব্রাহ্মণ বালক। আর দেশীয় কেহ সঙ্গে নাই। ভবুয়া বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অধিকারের পশ্চিম প্রান্ত। তাহার পর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকার। মধ্যে কর্ম্মনাশা নদী। আর চট্টগ্রাম বাঙ্গালার অধিকারের পূর্ব্ব-প্রান্ত। অবস্থা ভাবিয়া বুকে পাষাণ চাপা দিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিলাম। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। যখন হৃদয়ের আবেগ সে পাষাণকে ঠেলিয়া ফেলিত, তখন অশ্বে ছুটিয়া গিয়া, অশ্ববল্‌গা বাহুতে জড়াইয়া 'শুরানদী'র তীরে, সেই ক্ষুদ্র শ্মশানের পার্শ্বে, সেই নির্জ্জন অশ্বত্থমূলে, ধরাতলে বুক রাখিয়া বহুক্ষণ সায়াহ্নগগনতলে শিশুটির মত আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতাম। উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইলে অশ্রু মুছিয়া, স্থির শান্তভাবে গৃহে ফিরিয়া আসিতাম, স্ত্রী যেন শোকচিহ্ন মাত্র দেখিতে না পান। ইহাপেক্ষাও কঠিনতর পরীক্ষা সম্মুখে ছিল বলিয়াই বোধ হয়, ভগবান্ আমাকে এরূপে আত্মসম্বরণে দীক্ষিত করিলেন।

উচ্চতর পরীক্ষা

এই দারুণ শোক বুকে চাপিয়া, বিদীর্ণহৃদয়ে আবার ডিপার্টমেণ্টাল উচ্চতর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। মাগুরা হইতে যশোহরে গিয়া পূর্ব্ব পরীক্ষার ছয় মাস পরে এই পরীক্ষা দিয়াছিলাম। যশোহরে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। উর্দ্দুতে কেবল এক মার্কের জন্য পরীক্ষক প্রভুগণ আমাকে ধরাশায়ী করিয়াছিলেন। তথাপি বার্টন সাহেব আমার পরীক্ষার ফল দেখিয়া লিখিয়াছিলেন যে, আমি যেন তজ্জন্য দুঃখিত না হই। কারণ, কর্ম্মে প্রবেশ করিয়া নয় মাসের মধ্যে উভয় পরীক্ষা, কেবল উর্দ্দুতে ভিন্ন, উত্তীর্ণ হওয়া সামান্য প্রশংসার কথা নহে। অতএব ভবুয়া আসিয়া আবার সে অপূর্ব্ব ভাষায় অপূর্ব্ব

কণ্ঠবিকৃতিপূর্ণ বর্ণমালাসংযুক্ত, প্রেতলোকের গল্পপূর্ণ অপূর্ব্ব গ্রন্থাদি ও মোকদ্দমার কাগজ পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এখানে আদালতের ভাষাই তখন উর্দ্দু ছিল। শিক্ষা করিবার বিশেষ সুবিধা হইল। উর্দ্দুতে সমস্ত পুলিস রিপোর্ট আমি নিজে পড়িতাম। এবং নিজে তাহাতে উর্দ্দুতে হুকুম লিখিতে এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদের কাছে পত্রাদিও উর্দ্দুতে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। ইহাতে আমি তাহাদের চক্ষে একটি ক্ষুদ্র অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হইলাম। এই শোকের অল্পদিন পরেই পরীক্ষার সময় আসিল। পরীক্ষা দিতে আমাকে আরা যাইতে হইবে। সেই প্রকাণ্ড প্রান্তরের মধ্যে, সেই সমাধিভূমিস্থ গৃহে, রোগ ও শোক-গ্রস্ত একটি বালিকা স্ত্রী ও শিশু ভ্রাতাটিকে কিরূপে রাখিয়া যাইব? তাই চন্দ্রকুমারের ভাই হরকুমারকে কলিকাতা হইতে আসিতে পত্র লিখিলাম। তাহার পৌঁছিবার পূর্ব্বে আমি আরা চলিয়া গেলাম।

পরীক্ষা হইতেছে জজ লাউইস্ সাহেবের ঘরে। কয়েকজন ইংরেজ ও আমি একমাত্র বঙ্গচন্দ্র পরীক্ষিত শ্রেণীতে উপস্থিত। আমাকে কেবল উর্দ্দুর পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইতে হইয়াছিল। প্রশ্নের কাগজ হাতে আসিল। আমি উত্তর লিখিতেছি। পেনের কলমে ও ইংরাজী কালিতে উর্দ্দু লিখিতে সুবিধা হয় না। তাই ওয়াস্তির কলম এবং এক বৃহৎ হিন্দুস্থানী 'দস্তান' লইয়া গিয়াছি। মসৃণ অমল ধবল ফুলিস্কেপ কাগজে লেখনী বামবাহিনী হইয়া চলিতেছে, আর অমল ধবলমূর্ত্তি জজ সাহেব আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই দৃশ্য দেখিতেছেন। তিনি তাঁহার অমলা ধবলা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে ডাকিয়া আনিলেন, এবং উভয়ে আমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আমার লেখা দেখিতে লাগিলেন। কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া জজ-মহিলা বাঁশরীবিনিন্দিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু! তুমি কি মুন্সি?" কানে অমৃতবর্ষণ হইল বটে, কিন্তু প্রশ্ন কিছু বুঝিলাম না। আমি মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া, মস্তক নত করিয়া, অভিবাদন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম। তখন জজ নিজে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বেহারের লোক?" উত্তর—"না মহাশয়! আমি বাঙ্গালী।" তখন মেম সাহেব মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—"বাবু! এমন সুন্দর উর্দ্দু লিখিতে কেমন করিয়া শিখিলে? তুমি যে ঠিক একজন মুন্সির মত লিখিতেছ।" আমি মুখভঙ্গীতে এবং তাঁহার প্রতি ঈষৎ হাস্যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া নিরুত্তর রহিলাম। জজ বলিলেন—"আপনি বোধ হয়, অনেক দিন বেহারে আছেন?" উত্তর—"অনুমান চারি মাস।" তিনি বিস্মিত হইলেন, এবং আমার উর্দ্দু অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া মেম সাহেব বলিলেন—"বাবু! তুমি নিশ্চয়ই পাস হইবে।" আমি তাঁহাকে এই শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ দিলাম। তখন জজ বলিলেন—"ইঁহারা ত কিছুই পড়িতে পারিতেছেন না। বড় খারাপ লেখা। আপনি পড়িতে পারিয়াছেন কি?" বাস্তবিকই বিষম ব্যাপার। একে উর্দ্দু, একটা 'নোক্তা' এ দিক্ সে দিক্ হইলেই মহাবিভ্রাট। তাহাতে টানা হাতের লেখা। তাহার উপর আবার টানা লেখা হইতে 'লিথো' করিয়া প্রশ্নের কাগজ ছাপা হইয়াছে। এবং আমাদের তাহা ইংরাজী অক্ষরে লিখিতে ও transliteratc করিতে হইতেছে। হাতের লেখার 'নোক্তা' যাহা ছিল, তাহাও 'লিথো'তে উঠে নাই। চারিদিকে পরীক্ষিত সাহেবমণ্ডলী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। কেহ বা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আমি বলিলাম—আমি দুইটি স্থান ভিন্ন আর সকল পড়িতে পারিয়াছি। একটি একজন এপ্রেন্টিসের দরখাস্ত, এবং অন্যটি একজন মৃত ব্যক্তির পুলিসের 'ছুরত্ হাল' বা শরীরের অবস্থা বর্ণনা। জজ সাহেব তাঁহার একজন আমলাকে কাচারি হইতে ডাকাইলেন; এবং বারাণ্ডায় প্রশ্নের কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—"জোর্সে পড়ো।" উদ্দেশ্য, যেন আমরা শুনিতে পাই। আমলা মহাশয় একজন 'পশ্চিমে কায়েত'; চূড়ান্ত ফাজিল। সে মনে করিল, সাহেব আর ছাইভস্ম কি বুঝিবে! তাহার যাহা খুসি পড়িয়া গেল। সাহেব ঘরে আসিয়া বলিলেন—"এখন

তুমি সেই দুই স্থান ঠিক করিতে পারিয়াছ?" আমি বলিলাম—"না। এ ব্যক্তি সেই দুই স্থান ছাড়া আরও স্থানে স্থানে ভুল পড়িয়াছে।" সে আমার উপর চটিয়া লাল হইল। যে যে স্থানে সে ভুলে পড়িয়াছিল, আমি ধরিয়া দিলে, সে মাথা চুল্‌কাইয়া 'খয়ের! খয়ের!'—ঠিক ঠিক বলিল। সাহেবমহলে একটা হাসি পড়িয়া গেল। জজ সাহেব আমার পিট চাপড়াইতে লাগিলেন। তাহার পর আমি যে দুই স্থান পড়িতে পারি নাই, সেই দুই স্থানে সে যাহা পড়িয়াছে, তাহাতে কোনও অর্থ হয় না বলিলে সে আমার উপর আরও চটিয়া গেল। বলিল—"আপনি বাঙ্গালী হইয়া এরূপ বলিলে কি করিব?" আমি বলিলাম—"তুমি অর্থ বুঝাইয়া দেও।" তখন সে বড় মুস্কিলে পড়িল। খানিকটা—"কেয়া বদ্‌খৎ! কেয়া বদ্‌খৎ!"—কি খারাপ লেখা! কি খারাপ লেখা!—করিয়া এবং লেখক ও তাহার কন্যার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ঘটাইয়া বলিল—"খয়ের! আপ্‌ যো ফরমায়ে হেঁ, ঐ ঠিক হায় সায়েদ্‌ আউর দোছরা কুচ্‌ হোগা।" আবার সাহেবরা উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিলেন। হাসির রগড় শুনিয়া, মেম সাহেব ছুটিয়া আসিয়া তাহাতে যোগদান করিলেন এবং Brave boy! Brave boy!—বাহাদুর ছেলে! বাহাদুর ছেলে!—বলিয়া আমাকে বাহবা দিতে লাগিলেন। আমলা মহাশয় আরও খানিকক্ষণ চেষ্টা করিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। জজ সাহেব বলিলেন—"সে দুই স্থানের জন্য কিছু আসিবে যাইবে না। আমি পরীক্ষকদিগের কাছে আমার রিপোর্টে এই হাস্যকর উপাখ্যান লিখিয়া পাঠাইব। তাঁহাদের এরূপ প্রশ্ন দেওয়া বড় অন্যায়।" ডেপুটির দল আমার কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। শুনিয়াছি, তাহার পরবৎসর হইতে আর ঐরূপ উর্দ্দু লেখা দেওয়া বন্ধ হইয়াছে। উত্তর-কাগজ আমি যথাসময়ে জজ সাহেবের হাতে দিলে তিনি উর্দ্দু হইতে ইংরাজী ভাষান্তর ও অনুবাদ ভাগ পড়িলেন এবং নিশ্চয় পাস হইব বলিলেন। আমি জয়পতাকা মাথায় বাঁধিয়া সুহৃদ্বর অন্য এক ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আবাসে ফিরিলাম। জজ সাহেব প্রশ্নের কাগজ কাচারিতে গিয়া অন্য আমলার দ্বারা পড়াইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আমার উর্দ্দু ভাষাজ্ঞানের গল্প করিয়াছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে এই গল্প আরা ছড়াইয়া পড়িল।

তাহা শুনিয়া পরদিন প্রাতে কালেক্টারির সেরেস্তাদার বাবু হরিহরচরণ আসিয়া উপস্থিত। মধ্যমবয়স্ক, অতি সুন্দর পুরুষ। যেন এক টুক্‌রা মার্জ্জিত হীরকখণ্ড। তিনি বেহারী। আরা জেলায় তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি। তিনি বলিলেন যে, ভবুয়ার লোকের মুখে আমার এত অল্প বয়স এবং এরূপ প্রশংসা শুনিয়াছেন যে, তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কি যে শুভক্ষণে সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমাকে লইয়া ক্ষেপিয়া গেলেন। সেই রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীতে আমার নিমন্ত্রণ হইল। সন্ধ্যার পর তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এমন সুন্দর সজ্জিত বাড়ী আমি তখন যাবৎ দেখি নাই। তাঁহার দুটি পুত্র। পুষ্যিপুত্র নহে, দুধে। বড়টির নাম—স্মরণ হয়—লালবাবু। তাহার বয়স বৎসর চৌদ্দ পনর এবং তাহার কনিষ্ঠটির বয়স নয় দশ বৎসর। তাহারা দুই ভাই আমাকে পাইয়া বসিল। আমি চিরদিন ছেলেদের ভালবাসি। আমিও তাহাদের পাইয়া বড় সুখী হইলাম। আহারের ইংরাজি মতে ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা কয়েকটি নিমন্ত্রিত বাঙ্গালী খাইতে বসিলাম। ছেলে দুটি আমার দু পাশে চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু হরিহরচরণ একখানি চেয়ার লইয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন। তাঁহারা ইংরাজি আহার স্পর্শ করেন না। আমার বড়ই কষ্ট বোধ হইল। আমি বলিলাম—"আপনি তবে এরূপ আহারের বন্দোবস্ত করিলেন কেন? আমি আপনার ও ছেলে দুটির সঙ্গে বসিয়া খাইতে পারিলে বড় সুখী হইতাম। আমার কিছুই ভাল বোধ হইতেছে না।" তিনি বলিলেন—"আমি ত আপনার মনের ভাব যে এরূপ, তাহা জানিতাম না। বাঙ্গালী বাবুরা এরূপ আহার ভালবাসেন, তাই এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি। ছেলেদের প্রতি আপনার যেরূপ আদর দেখিতেছি ও আপনাকে পাইয়া তাহারা যেরূপ

ক্ষেপিয়াছে, আপনার কথা শুনিয়া আমারও বড় দুঃখ হইতেছে।" তাঁহার ছোট ছেলে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বাবা! বাবু ইহার পর আবার আমাদের সঙ্গে খাইবেন। সকলে তাহার এই সরল স্নেহের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আহারের পর আবার সুসজ্জিত বৈঠকখানাকক্ষে (Drawing room) গেলাম। আমরা চারিদিকে কৌচে ও কুসনযুক্ত সুকোমল মকমল চেয়ারে বসিলাম। মধ্যস্থলে আরার বিখ্যাত 'ওকাওয়ালি' (বাইজি) বসিয়া গাইতে লাগিলেন। মধ্যম-যৌবনা, বিস্তৃত-বিলাস-বিলোল-নয়না, ছায়াচ্ছন্ন-জ্যোৎস্না-বরণা, সুগোল ফুল্ল তন্বী, গৈরিক বর্ণের বসনে সেই তরঙ্গায়িত চারু দেহলতা আবৃত করিয়া অস্ফুট, দর্শনীয় ও অনুভবনীয় কি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যই বিকীর্ণ করিতেছিল! সেই উদাসিনী বেশে, সেই উদাসীন নয়নে, সুগোল মুখচন্দ্রের সুগোল সুগঠিত সুন্দর ললাটের উপর দুই এক গুচ্ছ মসৃণ কেশ অযত্নে দোলাইয়া ফুল্ল লীলাকমলসদৃশ আরক্ত করকমল সঞ্চালিত করিয়া, সে গাইতেছে—"যেয়ছা যোগিনী কা সামান ফিরো।" তাহার কখন উভয় চক্ষে অশ্রুধারা, কখন বা এক চক্ষে অশ্রু, এক চক্ষে হাসি: কখন বা উভয় ভ্রূ, কখন বা একের পর অন্য ভ্রূলতা ক্ষুদ্র সর্পশিশুর মত সঞ্চালিত ও প্রকম্পিত হইতেছে। আমরা চিত্রার্পিতের মত নীরব নিশ্চল ভাবে বসিয়া তাহার সেই অতুলনীয় রূপের অনন্ত আন্দোলন ও বিস্ফুরণ দেখিতেছি, এবং অতৃপ্তপ্রাণে তাহার সেই সঙ্গীতসুধা পান করিতেছি। কেবল মধ্যে মধ্যে আমি পার্শ্বস্থিত লালবাবুকে গানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। সে কোন পদের অর্থ বলিতে পারিতেছিল, কোনও পদ 'ঠেট হিন্দি' বলিয়া বলিতে পারিতেছিল না। রজনী দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত এই সঙ্গীত মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিয়া, আমি আত্মহারা হইয়া, বন্ধু ডেপুটি বাবুর সঙ্গে তাঁহার গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমি এমন সঙ্গীত ইতিপূর্ব্বে আর শুনি নাই। আমি অবশিষ্ট রাত্রিও স্বপ্নে সেই সঙ্গীত শুনিলাম।

পরদিন প্রাতে আমি আটটার ট্রেনে আরা হইতে বাঁকিপুরে কমিশনার দর্শনে যাইব। প্রস্তুত হইয়াছি, এমন সময়ে বাবু হরিহরচরণ আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার ছেলে দুটি কাঁদাকাটি করিতেছে। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীরও নিতান্ত ইচ্ছা, আমি প্রাতে তাঁহার ছেলে দুটির সঙ্গে আহার করিয়া, অপরাহ্নের ট্রেনে বাঁকিপুর যাই। কিন্তু আমার সময় নাই। কমিশনারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ও সোনপুরের মেলা দেখিবার জন্য, মাজিষ্ট্রেট ডয়েলি সাহেব কেবল আর এক দিনের ছুটি দিয়াছেন। তিনি বলিলেন—তিনি নিজে গিয়া আর এক দিনের ছুটি লইয়া আসিবেন। কিন্তু সবডিভিসনে কেহ নাই। যদি মাজিষ্ট্রেট ছুটি না দেন! শেষে অগত্যা তিনি বলিলেন,—তাঁহার বাড়ী হইয়া, ছেলেদের আর একটিবার দেখাইয়া আমাকে ষ্টেশনে তাঁহার গাড়ীতে করিয়া পঁহুছাইয়া দিবেন। ট্রেন হারাইবার আশঙ্কায় তাহাতেও আমি ছলছল নেত্রে অসম্মত হইলাম। ছেলেদের স্নেহে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত আর্দ্র হইয়াছিল। তাহাদের আর একটিবার দেখিতে আমার হৃদয়ও আকুল হইয়াছিল। শেষে ছেলেদের ষ্টেশনে যাইতে সংবাদ দিয়া, তিনি আমাকে তাঁহার টম্‌টমে তুলিয়া লইয়া ষ্টেশনে চলিলেন। তিনি কত আদরের, কত প্রশংসার কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তিনি বিশ বৎসর চাকরি করিতেছেন, কিন্তু কোন বাঙ্গালী, কি কোনও কর্ম্মচারীকে এরূপে সকলের প্রিয় হইতে দেখেন নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি এই লোকপ্রিয়তায় বিস্মিত হন নাই। কিন্তু কোন্ পথে, কোথায় যাইতেছি? নক্ষত্রবেগে তাঁহার ঘোড়া ছুটিয়াছে কিন্তু ষ্টেশন কই? আমি বলিলাম, আমার সে দিন আসিতে ত এত বিলম্ব হয় নাই। এ পথেও যেন আমি আসি নাই। তিনি বলিলেন, সহরের দৃশ্যাবলী দেখাইবার জন্য তিনি আমাকে অন্য পথে লইতেছেন। ভয় নাই, ঠিক সময়ে ষ্টেশন পঁহুছিব। তিনি নানা উদ্যান অট্টালিকা দেখাইয়া আমাকে ষ্টেশনে লইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম, ট্রেন ছাড়ে ছাড়ে। আমি ছুটিয়া গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। আরদালি পূর্ব্বে গিয়া টিকিট করিয়াছিল।

তাঁহার মুখ বিষণ্ণ হইল। তিনি বলিলেন —"ট্রেন একটুক দেরিতে আসিয়াছে, তা না হইলে ট্রেন পাইতেন না। আমি ইচ্ছা করিয়া দেরি করিয়া আনিয়াছিলাম।" ট্রেন ছাড়িল, এমন সময়ে তাঁহার পুত্র দুটি আসিল। পিতা পুত্র তিনজন সজলনয়নে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিতে করিতে যত দূর দেখা যায়—চাহিয়া রহিলাম। তাঁহারা অদৃশ্য হইলে আমি অশ্রু মুছিয়া অবসন্ন ও বিষণ্ণ হৃদয়ে বসিয়া পড়িলাম। তাঁহাদিগকে এ জীবনে কখনও আর দেখি নাই, অথচ সেই কয় ঘণ্টার পরিচয়ে তাঁহারা আমার হৃদয়ে চিরপরিচিত পরম আত্মীয়ের মত অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি? কাহারও সঙ্গে বহুকাল সাক্ষাতেও কোনওরূপ আত্মীয়তা হয় না, আর কাহারও সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই এইরূপ চির আত্মীয়তা হয়, আবার কাহারও প্রতি প্রথম দর্শনেই কিরূপ একটা অশ্রদ্ধা জন্মে, ইহার অর্থ কি? ইহা কি শুধুই শরীরস্থ রাসায়নিক ক্রিয়ার ফল, না জন্মান্তরীণ প্রীতি-অপ্রীতির ফল? আমার বিশ্বাস—উভয়।

গাড়ীতে অশ্রুমোচন করিয়া এবম্বিধ বিষয় চিন্তা করিতেছি, অন্য দিক্ হইতে একজন ভদ্রমূর্ত্তি সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"আরায় কি আপনার বাড়ী? আপনি কি আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া কোনও দূর দেশে যাইতেছেন?" আমি বলিলাম—না। তিনি বিশেষ কৌতূহল প্রকাশ করাতে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন, আমার হৃদয় অযথা কোমল। আমি ভবুয়ার সবডিভিসনাল অফিসার শুনিয়াই তিনি আমার নাম বলিলেন ও 'এডুকেশন গেজেটে' আমার কবিতা পড়িয়াছেন বলিলেন। আমি প্রথমে মনে করিলাম, লোকটি মিশনারি। কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে আমাদের অফিসিয়াল বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, তাহা কোনও মিশনারির জানিবার কথা নহে। আমাদের সামাজিক বিষয়ে, সাহিত্য বিষয়ে, বেশভূষা বিষয়েও অনেক আলাপ ও তর্কবিতর্ক করিলেন। আমার পরিচ্ছদের ও ব্যবহারের অনেক প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে, আরার কলেক্টার ডয়েলি সাহেব আমার উপযুক্ত প্রশংসাই তাঁহার কাছে করিয়াছিলেন। আমি কয়েকবার তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন যে, বাঙ্গালীর এই একটি গুরুতর দোষ—তাহারা বড় কুতূহলপরবশ—Inquisitive। আমি বলিলাম—"আপনি আমার বাড়ী ঘর, জন্মবৃত্তান্ত পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আর আমি আপনার পরিচয় মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া কি অপরাধী হইলাম?" তিনি হাসিতে লাগিলেন। ট্রেন বাঁকিপুর পঁহুছিলে তিনি আমার সঙ্গে পথটা বড় সুখে কাটাইয়াছেন বলিয়া বিদায় দিলেন, এবং বলিলেন যে, আমি সোনপুরের মেলাতে না গেলে কমিশনর Jenkins সাহেবের সাক্ষাৎ পাইব না। তিনি কেমন করিয়া জানিলেন—তিনি কোথায় যাইতেছেন—জিজ্ঞাসা করিলেও বলিলেন, বাঙ্গালী বড় Inquisitive। কিছুদিন পরে তিনি চট্টগ্রামে গিয়া একজন বন্ধুর কাছে এ গল্প করেন। বন্ধুর কাছে জানিলাম, তিনি Mr. Grimley। তখন স্কুল ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। পরে 'বোর্ডে'র মেম্বর হইয়াছিলেন।

আমি বাস্তবিক Jenkins সাহেবকে বাঁকিপুরে পাইলাম না। গঙ্গা পার হইয়া সোনপুরে গেলাম। সোনপুর এক মাস যাবৎ পশ্চিম অঞ্চলের প্রভুদের বিলাসক্ষেত্র হইয়া থাকে। সেখানেও তিনি দর্শন দিলেন না। আমি চক্ষুর নিমিষে সেই শত শত শ্বেতাঙ্গের শোভনীয় ক্রোটনটব্ সজ্জিত, শিবির সজ্জিত, সহস্র সহস্র তুরঙ্গ-বারণ-সমাবৃত, মহামেলা-ক্ষেত্র দর্শন করিয়া ভবুয়া ফিরিলাম। শুনিয়াছি, ভারতে এত বড় মেলা আর নাই।

ভবুয়া আসিয়া সেই উর্দ্দুর কাগজ আমলাদিগকে পড়িতে দিলাম। তাহারা বহুদিন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া এবং লেখক ও পরীক্ষককে 'ছছুরা' সাব্যস্ত করিয়া, শেষে একরূপ পাঠ স্থির করিল। এপ্রিণ্টিসের দরখাস্তের অপাঠ্য স্থানে লেখা ছিল—"ফাক্‌কা পর ফাক্‌কাছে ষমকজান বাকি হায়।" অর্থ বলিলেন—অনাহারের উপর অনাহারে কিঞ্চিৎ

জীবন মাত্র অবশিষ্ট আছে। আর পুলিস 'ছুরৎ হালে'র অপাঠ্য স্থান স্থির করিলেন—"পাঞ্জরাকে হাড্ডি নেকালা হয়।" অর্থ—পার্শ্বের হাড় বাহির হইয়াছে। যাহা হউক, কিছুদিন পরে গেজেটে দেখিলাম—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এত দিন পরে, এই তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সে পরীক্ষার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

সেরগড়

আরা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই শীতের প্রারম্ভে মফঃস্বলে নির্গত হইলাম। অক্টোবর শেষ না হইতেই এ অঞ্চলে শীতের আবির্ভাব হয়। স্ত্রী, কনিষ্ঠ শিশু-ভ্রাতা প্রাণকুমার সঙ্গে শিবিরে চলিল। ভ্রাতৃপ্রতিম হরকুমারও কলিকাতায় ফিরিয়া না গিয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। জীবনের এই প্রথম শিবিরবাস বড়ই নূতন, বড়ই আনন্দদায়ক বোধ হইল। এ একপ্রকার সম্ভ্রান্ত বেদিয়াজীবন। একখানি Hill tent পশ্চিমের সুন্দর সুবিস্তৃত আম্রবাগানের কেন্দ্রস্থলে ঘনবিনিড় আম্রছায়ায় সংস্থাপিত। কারণ, এখনও দুপুরের সময় রৌদ্রের বেশ একটুক উত্তাপ হইয়া থাকে। তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে একটি 'রাউটি' এবং এই ব্যবধানের উভয় পার্শ্বে জনৈক জমিদার হইতে ধার করা কাপড়ের পর্দা। মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ। আমি সস্ত্রীক ক্ষুদ্র শিবিরটিতে এবং আর সকলে রাউটিতে থাকিত। ইহার কিঞ্চিৎ দূরে আর একটি শিবিরে কাচারি হইত, এবং এখানে স্থানীয় জমিদারবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতাম। স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার সময়ে আবাস-শিবির প্রাতে মহাদেবের মত বৃষভবাহনে চলিয়া যাইত। অন্য উপায়ে যাইবার পন্থাভাব। আহারের পর রাউটি লইয়া পরিবারবর্গ চলিয়া যাইতেন। আমি কাচারির পর অশ্বারোহণে চলিয়া গেলে দ্বিতীয় শিবির আমার পশ্চাতে যাইত। এরূপে সমস্ত সবডিভিসন চারি মাস কাল পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম। বেহার অঞ্চল এ সময় অতীব মনোহরা শ্রী ধারণ করিয়া থাকে। যত দূর দেখা যায়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুষ্ক প্রান্তর, নির্ম্মল নীল শীতাকাশের নীচে দিগন্তব্যাপী এবং নানাবিধ হৈমন্তিক শস্যক্ষেত্রে বিচিত্রিত ও পরিশোভিত। স্থানে স্থানে অহিফেনক্ষেত্রে মনোহর শ্বেত রক্ত কুসুমরাশি শ্রেণীবন্ধ হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার যে কি শোভা, না দেখিলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। প্রান্তরের মধ্যে মধ্যে সুরোপিত ও সুরক্ষিত আম্রবন। তদ্ভিন্ন আর কোথায়ও বৃক্ষের চিহ্ন মাত্র নাই। আম্রকাননের অনতিদূরে গ্রাম। গ্রামে গৃহের উপর গৃহ, তাহার উপর গৃহ। গৃহাবলী মৃন্ময়; পুরু প্রাচীরের উপর খাপরা ও খড়। দেখিতে অতি কদর্য্য। গ্রামের প্রান্তভাগে জমিদারের ইষ্টকালয়। তাহারও সম্মুখদিক্ মাত্র ইষ্টক, পশ্চাৎভাগ কর্দ্দম-নির্ম্মিত। দীন কুটীরমালার পার্শ্বে এই অট্টালিকা এক অপূর্ব্ব তুলনাব্যঞ্জক। দরিদ্রতার মধ্যে যেন কি এক ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব! যেখানে জমিদারের 'মোকামে'র অভাব, অর্থাৎ স্থানীয় জমিদার নাই, সেখানে সামান্য একটুক প্রাঙ্গণযুক্ত জমিদারের কাচারি আছে, গ্রামের কোনও স্থানে একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত 'ইন্দারা' এবং তাহার পার্শ্বে একটি বিশাল-ছায় পিপ্পলতরু। গ্রামখানি একটি ক্ষুদ্র জগৎ। ইহাতে গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় সকলই আছে। সূত্রধর আছে, কর্ম্মকার আছে, চর্ম্মকার আছে, ধোপা, নাপিত, কুমার, কাচারিতে জল তুলিবার কাঁধু, এবং 'চামাইন' (ধাত্রী) পর্য্যন্ত আছে। এমন কি, প্রত্যেক গ্রামে এক-একটি 'ডাইন' (ডাকিনী) পর্য্যন্ত আছে। কাহারও ছেলে মারা গেলে তাহারই কার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয় ও তজ্জন্য তাহাকে সময়ে সময়ে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে জমিদারের বাড়ীতে, কি কাচারিতে পাটোয়ারি আছে। এই ব্যক্তি গ্রামের প্রজাদের কর আদায় করিয়া, জমিদার যে যেখানে আছেন, তাঁহার অংশ তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেয়। গ্রামগুলি সুন্দর, দরিদ্রতাপূর্ণ, শান্তির ছবি। দেখিলে

Elphinstone তাঁহার ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে গ্রাম্য সমিতির চিত্র দিয়াছেন, তাহা মনে হয়। আমি যে সময়ে দেখিয়াছি, তখনও তাহারা পূর্ণমাত্রায় ইংরাজি সভ্যতা শিক্ষা করে নাই। সমস্ত সবডিভিসনে একজনও ইংরাজি জানিত না। একটি মুন্সেফও ছিল না। ফৌজদারি কোর্টেও সামান্য মোকদ্দমা মাত্র। তাহাও বড় বেশী হইত না। গ্রামের প্রাচীনেরা পিপ্পল-ছায়ায় বসিয়া গ্রামের সকল বিবাদ মিটাইয়া দিত। কিন্তু দেশ যেমন পরিষ্কার, গ্রামগুলি তেমনই কদর্য্য। তাহার মধ্য দিয়া একটি কি দুইটি ক্ষুদ্র অপরিসর গ্রাম্যপথ চলিয়া গিয়াছে। তাহাতে দুই পার্শ্ব হইতে গৃহের পয়োনালা আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রামের চারিদিকে কদর্য্যতার একশেষ। অনেক গ্রামে প্রবেশ করিতেই নাসিকা পীড়িত হইয়া উঠিত। ফলতঃ দেশ যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, জল যেমন নির্ম্মল, গ্রামগুলি তেমনই নরকবিশেষ। সমস্ত প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ন অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণে ও পরিদর্শনে কাটাইতাম। সেই অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে শীতকালে অশ্বসঞ্চালন যে কি প্রীতি ও স্বাস্থ্যপ্রদ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বোধ হইত যেন, সমস্ত দেহে কি এক সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চালিত হইত। ভবুয়ার এলাকায় ১৪ মাইল পর্ব্বত। শুনিয়াছি, তাহার উপরে উঠিলে ঠিক যেন সমতলক্ষেত্র। আমি সেই পার্ব্বত্য দেশ ভিন্ন আর সমস্ত স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলাম। পর্ব্বতভূমি পরের বৎসর দর্শনের জন্য রাখিয়াছিলাম। মানুষের গণনা; সকল সময়ে সফল হয় না। যে সকল স্থান দেখিয়াছিলাম, সর্ব্বস্থানে জমিদার ও প্রজাবর্গের যে অপরিসীম আদর পাইয়াছিলাম, চইনপুরের সেই প্রাচীন গগনস্পর্শী সমাধিগৃহ, ভগবান্‌পুরের ও যোধপুরের সেই পার্ব্বত্য শোভা, যোধপুরের সেই সুন্দর শৈলশ্রেণী ও তাহার পাদমূলস্থ আম্রবনে আমাদের মনোহর শিবিরসন্নিবেশ, শৈলসুতা নীলনির্ম্মলসলিলা দুর্গাবতী ও কর্ম্মনাশা নদীনদতীরে সন্ধ্যায় ও জ্যোৎস্নায় প্রথম জীবনের শিবির বিহার আমার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। ভবুয়া-উপবিভাগের একটি সীমান্ত স্থানে একদিন সন্ধ্যার সময়ে শিবিরে পঁহুছিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলাম, স্ত্রী পূর্ব্বেই শিবিরে পঁহুছিয়াছিলেন, এবং উপস্থিত পুলিস কর্ম্মচারীর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম। গ্রামের জমিদার একটি স্ত্রীলোক। তিনি 'বহুরিয়া' বলিয়া পরিচিত। তিনি বধূ অবস্থায়ই শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামিহীনা হইয়া জমিদারির ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ একটি প্রকাণ্ড নানাবিধ খাদ্যের ডালি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। সমবেত সকলেই এই রমণীরত্নের প্রশংসা করিতেছিলেন। শিবিরসমীপবর্ত্তী স্থানে দেখিবার যোগ্য কিছু আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, নিকটে কিছুই নাই। তবে সেখান হইতে দশ মাইল ব্যবধানে সাসারাম উপবিভাগের অন্তর্গত 'সেরগড়' স্থানটি দেখিবার যোগ্য। কিন্তু পথ নাই। জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া স্থানটি দেখিতে পারা যায়, তাঁহারা কেহই দেখেন নাই। তবে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা আমাকে বলিলেন। আমি স্থানটি দেখিবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা তথায় যাইবার বন্দোবস্ত করিবেন।

শীতকাল, নীলনির্ম্মল পূর্ব্বাকাশে ঊষার তপ্ত কাঞ্চনাভা উন্মেষিত হইতেছে, এমন সময়ে পুলিস কর্ম্মচারী ও 'বহুরিয়া'র প্রধান কর্ম্মচারী একটি হস্তী ও বহুতর লোকজন সমভিব্যাহারে উপস্থিত। আমি বলিয়াছি যে, ভবুয়ার সাধারণ লোক আমাকে কিরূপ একটা অপত্যস্নেহের ভাবে দেখিত। আমি সেই বয়সে শাসনকার্য্য কিছুই জানিতাম না বলিলেই হয়। শিশু যেরূপ ধূলা লইয়া খেলা করে, আমিও যেন তাহাই করিতাম। তথাপি লোকের মুখে প্রশংসা ধরিত না। যেখানে যাইতেছি, সেখানে লোকে আমাকে হৃদয়ের সহিত আদর দেখাইতেছে। 'বহুরিয়া'র কর্ম্মচারী বলিলেন যে, আমি ছেলেমানুষ। এরূপ দুর্গম স্থানে যাইব শুনিয়া 'বহুরিয়া' বড় চিন্তিতা হইয়াছেন, এবং আমাকে যাইতে

নিষেধ করিয়াছেন। যদি নিতান্ত তাঁহার বাধা ঠেলিয়া আমি যাই, তবে যেন তিনি যে সকল লোক পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে সঙ্গে লওয়া হয়। রমণীহৃদয় ভিন্ন এমন আদর কোথায় সম্ভব? আমার চক্ষে জল আসিল। আমি দেখিলাম—প্রকাণ্ড লাঠি, বর্শা, বল্লম, তরবারি এবং পুরাতন আগ্নেয়াস্ত্র হস্তে একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল উপস্থিত। ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইলে আমাকেও দাক্ষিণাত্যযাত্রী একটি ক্ষুদ্র আরঙ্গজেব হইতে হইবে। পুলিস কর্ম্মচারীও বলিল যে, এত লোক সঙ্গে লইবার কিছুই প্রয়োজন নাই। লইলে বরং অসুবিধা হইবে। আমি বলিলাম যে, এ স্থানে শিবিরে আসা পর্য্যন্ত 'বহুরিয়া' আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, মাতাও পুত্রের প্রতি তাহার অধিক স্নেহ করিতে পারে না, অতএব তাঁহার কথা আমি অবহেলা করিতে পারি না। তবে 'সেরগড়' দেখিবার আমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। তাঁহার আশীর্ব্বাদে কোনও বিঘ্ন হইবে না। শেষে কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন যে, অন্ততঃ তাঁহাকে আমার সঙ্গে যাইতে 'বহুরিয়া' বিশেষ আদেশ করিয়াছেন। অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। তিনি, আমি ও পুলিস কর্ম্মচারী একটি সুন্দর সুসজ্জিত ক্ষুদ্র হস্তিপৃষ্ঠে যাত্রা করিলাম। আমি এত হস্তী দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর ছোট হাতী দেখি নাই। একটি বৃহৎ 'ওয়েলার' অপেক্ষা বড় বেশী বড় হইবে না। শুনিলাম, হাতীটি এ অঞ্চলের হস্তীদিগের মধ্যে 'রায়বাহাদুর'বিশেষ। পশ্চিম অঞ্চলবাসীরা ঘোড়ার কদম চাল বড়ই বাঞ্ছনীয় মনে করেন। কিন্তু হাতীর কদম চাল যে সম্ভবে, আমার বিশ্বাস ছিল না। এই হাতীটি কদম চালের জন্য প্রসিদ্ধ। ঐরাবত দেবরাজের বাহন হউক, কিন্তু এমন অসুখকর বাহন আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু এই হাতীটি এমন সুন্দর কদমে পা ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিল যে, এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। কিছু দূর গেলেই জঙ্গলে উপস্থিত হইলাম। তখন পশ্চাৎ হইতে সকুঠারকর পরশুরামগণ আমাদের অগ্রবর্ত্তী হইলে উহারা জঙ্গল কাটিয়া পথ করিয়া দিয়া আগে আগে চলিল, হস্তীও ডাল ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিল। এরূপে আমরা জনমানবশূন্য বনপথে চলিলাম। স্থানে স্থানে বন-ঘুঘুর গভীর কণ্ঠ, বন-কুক্কুটের পঞ্চম ধ্বনি, গো-মহিষের কণ্ঠ-লগ্ন বংশ-ঘণ্টা, রাখালগণের উচ্চ সম্ভাষণ ও গীত, সেই নির্জ্জনতাবক্ষে ভাসিয়া উঠিতেছিল। কোথায় বা হরিণকণ্ঠে শিখরমালা প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং শার্দ্দূলের জৃম্ভণে হৃৎকম্প উপস্থিত করিতেছে। আমাদের তিনজনের হস্তস্থিত আগ্নেয়াস্ত্রে তখন অজ্ঞাতসারে হাত পড়িতেছে। কিন্তু অগ্রবর্ত্তী কুঠারধারী বন-কাঠুরিয়াগণ তাহাতে কর্ণপাতও করিতেছে না। নির্ভয়ে স্ব স্ব কার্য্য করিয়া, বন আলোড়িত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। আমরা ক্রমে 'সেরগড়' পর্ব্বতের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। একটি এরূপ বিস্তৃত পথ সুকৌশলে গিরি-অঙ্গ কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে যে, আমরা অনায়াসে হস্তীর পৃষ্ঠে গিরি-শিখরে উত্তীর্ণ হইলাম। সেরগড় একটি মনোহর পার্ব্বত্য দুর্গ। শিখরের প্রান্তভাগে যেখানে যেখানে শত্রুর আরোহণ করিবার সম্ভাবনা, সেখানে দুর্গপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। শিখরের মধ্যস্থলে কলিকাতার চকমিলান বাড়ীর মত অতি বিস্তৃত রাজপ্রাসাদ। তাহার প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি সুরঙ্গ। সুন্দর সুনির্ম্মিত সোপানাবলীর দ্বারা সুরঙ্গপথে অবতীর্ণ হইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা আর ভুলিবার নহে। উপরে যেরূপ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে, গিরিগর্ভের ও উপরিস্থ প্রাসাদের নিম্নে সেরূপ একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণের চারিপার্শ্বে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে, সুরঙ্গপথে তাহাতে সুন্দর আলোক প্রবেশ করিতেছিল, এবং গৃহাবলী পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল। পাঠান মোগলদিগের প্রবল সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অপূর্ব্ব গিরিগর্ভস্থ অট্টালিকার অমল ধবল বর্ণ, এবং বিচিত্র ফলপুষ্প-পল্লবে চিত্রিত লতার রং পর্য্যন্ত এই সাত শত বর্ষে মলিন হয় নাই। উপরিস্থ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া চারিদিকে দেখিলাম—কি মনোহর শোভা! মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়া

এমন শোভা আর দেখি নাই। সেরগড়ের চারিদিকে প্রথম বিস্তৃত অরণ্যশোভা, তাহার পর গ্রামাবলী ও নানাবর্ণের শস্য-শোভিত অনন্ত অসংখ্য প্রান্তর। স্থানে স্থানে ক্ষীণকলেবরা, পার্ব্বত্য নদী ও নদ শ্বেত পুষ্পহারের মত পূর্ব্বাহ্নের সূর্য্যকরে শোভা পাইতেছে। প্রান্তরচারী গো-মহিষাদি যেন নানা বর্ণের ক্ষুদ্র প্রান্তরজাত পুষ্পের মত বোধ হইতেছে। বহুক্ষণ নয়ন ভরিয়া এই শোভা দেখিয়া আমরা সেরগড় হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

আমাদের পথপ্রদর্শক ও পরিষ্কারক পরশুরামগণ বলিলেন যে, অনতিদূরে এক গিরি-গর্ভে একটি প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ আছেন। ভারতবর্ষের 'নওনাথে'র অর্থাৎ সোমনাথ, শম্ভুনাথ, চন্দ্রনাথ, আদিনাথ, বৈদ্যনাথ প্রভৃতির মধ্যে ইনি নবম নাথ। আমি লিঙ্গের নামটি এখন ভুলিয়া গিয়াছি। সেখানে ফাল্গুন মাসে একটি মেলা হইয়া থাকে। আমি নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে সঙ্গিগণ কিঞ্চিৎ আপত্তি করিয়া, সে পথে প্রত্যাবর্ত্তন করা স্থির করিলেন। আমরা অরণ্য পূর্ব্ববৎ ভেদ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে সেই তীর্থে উপস্থিত হইলাম। একটি শৈলশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে। তাহার পাদমূলে এক স্থানে গিরিঅঙ্গে একটি সুরঙ্গ। তাহার প্রবেশস্থান পাথরের দ্বারা বাঁধান এবং পাথরের সোপানে সজ্জিত। সোপানের এক পার্শ্বে একটি সন্ন্যাসী এই মহারণ্যের মধ্যে বসিয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে আমরা কিঞ্চিৎ আলাপ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে সঙ্গী কনেষ্টবলগণ গো-মহিষ-চারক আহিরগণ হইতে একটি মশাল ও কিঞ্চিৎ ঘৃত দধি ও দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া আনিল। আমরা সেই মশালের সাহায্যে সেই শৈল-সুরঙ্গে প্রবেশ করিলাম। অতি ভয়ানক স্থান। সুরঙ্গটি মনুষ্যকৃত নহে। তিন চার হাত ঊর্ধ্ব এবং তিন চার হাত আয়ত। উপর হইতে স্থানে স্থানে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। পথ শিলাখন্ডময় ও পিচ্ছল। উভয় পার্শ্বে নানা অবয়বে খন্ড খন্ড শিলা ভীম অঙ্গ বহির্গত করিয়া রহিয়াছে। একবার পা টলিলে পার্শ্বস্থ, কি পদতলস্থ শিলায় জীবলীলা শেষ হইবে। সঙ্গী কনেষ্টবলগণ উচ্চৈঃস্বরে "হর! হর! বম্! বম!" বলিয়া শ্রীভগবানের নাম করিতেছে, আর সকলে সেই মশালের আলোকে অতি সাবধানে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছি। সুরঙ্গটি একটি বৃহৎ মূষিকবিবর বলিলেও হয়। ঘুরিয়া ফিরিয়া অনেক সঙ্কটস্থল পার হইয়া, শিলারূপী অনেক দেব-দেবী ও 'ভয়রো'—ভৈরব দর্শন করিয়া, অবশেষে সেই নবম নাথের কাছে উপস্থিত হইলাম। বিবরের মধ্যস্থলে অনুমান দুই হাত উচ্চ একখন্ড লিঙ্গাকৃতি শৈলখন্ড। যেন গিরিবক্ষ হইতে একটি শৈলবিম্ব উঠিয়াছে। উপর হইতে অবিরল জলবিন্দু তাঁহার অঙ্গে অঙ্গে পড়িতেছে, এবং এরূপ অজস্র জল-বিন্দুপাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ও উপরিস্থ সুরঙ্গ শৈলজটায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। দেখিতে অপূর্ব্ব শোভা। কনেষ্টবলগণ নবম নাথের জটাশ্রেণীর উপর দধি দুগ্ধের ধারা ঢালিতে লাগিল, এবং বন-পুষ্প বর্ষণ করিয়া আনন্দে 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনিতে বিবর বিদীর্ণ করিতে লাগিল। একে এই ঘূর্ণাবর্ত্ত বিবরের এই দূর স্থানে বাতাস প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই. তাহাতে মশালের আগুনে স্থানটি এরূপ গরম হইয়া উঠিল যে, পশ্চিমের সেই দারুণ অস্থিভেদী মাঘ মাসের শীতেও আমাদের সর্ব্বশরীরে স্বেদধারা বহিতে লাগিল। নয়ন ভরিয়া নবম নাথকে দর্শন করিয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। যখন বিবর হইতে বহির্গত হইলাম, তখন ঠিক যেন একটা অগ্নিপরীক্ষা শেষ হইল। আমার সমস্ত পরিচ্ছদ এরূপ ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে যে, ঠিক যেন স্নান করিয়াছি। কিছুক্ষণ বিবরমুখে বসিয়া প্রচুর বিশ্রাম ও খাদ্য যাহা 'বহুরিয়া' সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহা উদরস্থ করিয়া আমরা অন্য পথে শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সমস্ত পথ পর্ব্বতময়, প্রাকৃতিক শোভার রঙ্গভূমি। অপরাহ্ন ও সান্ধ্য ছায়ায় সেই গিরিপাদমূলে, কখন বা গিরিপৃষ্ঠে, শৈলনির্ঝরিণীতীরবাহী পথে, হস্তিপৃষ্ঠে পর্য্যটনে নব-যৌবনোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম।—তাহা আজিও যেন হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে। রাত্রি প্রায় আট ঘটিকার সময়ে শিবিরে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম, শিবিরে কিশোরী পত্নী ও পার্শ্বস্থ অট্টালিকায় 'বহুরিয়া' চিন্তান্বিতা হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার লোক প্রতি মুহূর্ত্তে আসিয়া সংবাদ লইতেছিল। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে আমার নিরাপদ্ প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় আহ্নিকে বসিয়া শ্রীভগবানকে ডাকিতেছিলেন। রাত্রি হওয়াতে তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। সপ্তাহ কাল এখানে অবস্থিতি করিয়া, 'বহুরিয়া'র অপর্য্যাপ্ত স্নেহ ভোগ করিয়া, স্থানান্তরে চলিলাম। 'বহুরিয়া'র একটি মাত্র স্ত্রীর সমবয়স্কা কন্যা ছিল। তিনি মাতৃহৃদয় শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের ও বংশের নিয়মানুসারে আমার শিবিরে আসা সাধ্যাতীত। অথচ তিনি স্ত্রীকে দেখিতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দাসীগণ সমস্ত দিন শিবিরে যাতায়াত করিত এবং তাঁহার স্বহস্তের কতই খাদ্য আনিত। কিন্তু আমি এমনিই অঙ্গদের সিংহাসনারূঢ় যে, আমলাগণ বলিলেন—স্ত্রী 'বহুরিয়া'র বাড়ীতে গেলে হাকিমি সম্মানের বহির্ভূত কার্য্য হইবে। আমরা যখন চলিয়া আসি, শুনিলাম—তিনি বাতায়নে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—স্ত্রীর পাল্কি তাঁহার দেউড়ির সম্মুখে একবার এক মুহূর্ত্তের জন্য লইলে তিনি তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার কন্যার শোক ভুলিবেন। হাকিমত্ব অতল সলিলে ডুবুক! আমি আর থাকিতে পারিলাম না। স্ত্রীর পাল্কি সেখানে পাঠাইলাম। তিনি মাতার মত স্ত্রীকে বুকে লইয়া কি একটা বহুমূল্য উপহার দিয়াছিলেন। স্ত্রী তাহা লইলেন না। তিনি কাঁদিতেছিলেন। আমরাও তাঁহার স্নেহরাজ্য হইতে শুষ্কচক্ষে আসিতে পারি নাই।

রোটাসগড় বা রুহিদাসগড়

ভবুয়া উপবিভাগে জেহানাবাদ নামক একটি গ্রাম দিল্লী রাজপথের উপর অবস্থিত। তাহার সন্নিকটে রাজপথপার্শ্বে সৈনিকদিগের শিবির সন্নিবেশের জন্য একটি বিস্তীর্ণ ও পরিস্কৃত আম্রকানন আছে। এই কাননে শিবিরে থাকিবার সময় শুনিলাম যে, সেখান হইতে পঁচিশ মাইল ব্যবধানে সাসারাম উপবিভাগের রাজধানী পুরাতন সাসারাম। সেখান হইতে আরও পঁচিশ মাইল ব্যবধানে ইতিহাসখ্যাত 'রুহিদাসগড়' বা 'রোটাসগড়'। উভয় স্থান দেখিতে বড়ই কৌতূহল হইল। ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আহারের পর যাত্রা করিলাম, এবং অপরাহে সাসারামের পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টরের বাড়ীতে উপনীত হইলাম। তাঁহার একখানি খাটিয়ার উপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, আবার অশ্বপৃষ্ঠে নগরদর্শনে বহির্ভূত হইলাম। সাসারাম ঐতিহাসিক পুরাতন নগর। মুসলমান সাম্রাজ্যে ইহা এ অঞ্চলের রাজধানী ছিল, এবং মুসলমান ইতিহাসের নানা স্থানে ইহার ছায়া পড়িয়াছে। পুরাতন নগরের মত রাজপথ অতি সঙ্কীর্ণ এবং নগর অপরিষ্কার। এক সময়ে ইহার বেশ উন্নত অবস্থা ছিল। অতীত গৌরবের চিহ্ন নগরের স্থানে স্থানে শোকপূর্ণ সাক্ষীর স্বরূপ রহিয়াছে। সাসারাম —সম্রাট হুমায়ুন-পরাভবী এবং মোগল-সাম্রাজ্য-বিপ্লাবী সের সাহার সমাধিস্থান বলিয়া খ্যাত। একটি প্রকান্ড দীর্ঘিকা। তাহার কেন্দ্রস্থলে চারিদিকে সলিলরাশিবেষ্টিত একটি সুচারু সপ্রাঙ্গণ সমাধিভবন। একটি দীর্ঘ সেতুর দ্বারা উহা তীরের সহিত যেন শৃঙ্খলিত রহিয়াছে। সমাধির চারিদিকে অনতিবিস্তৃত প্রস্তরাবৃত প্রাঙ্গন ; প্রাঙ্গণের চারিদিকে নীল নির্ম্মল সলিলরাশি ; তাহার চারিদিকে শ্যামল তৃণাবৃত অনতিপ্রশস্ত প্রান্তরভূমি ; তাহার চারিদিকে চতুষ্কোণ-সমন্বিত দীর্ঘিকার প্রাচীরবৎ উচ্চ পাড়। পাড়ের উপরে স্থানে স্থানে পুরাতন কামান। শুনিলাম, সিপাহী-বিপ্লবের সময়েও উহা দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই বিদ্রোহের সময়ে এ অঞ্চলে দুই মাস যাবৎ ইংরাজ-রাজত্ব তিরোহিত হইয়া বীরপ্রবর কুমার-

সিংহের রাজ্য প্রচলিত হইয়াছিল। তাঁহার কারখানায় নির্ম্মিত বন্দুক ও বিচারাদালতের ফরমুনাদি আমি দেখিয়াছি। এখন যাবৎ এ অঞ্চল কুমারসিংহের বীরত্বের উপাখ্যানে কলকলায়িত। কত গ্রাম্য কবিতা ও গীত এখনও কথিত ও গীত হইতেছে। কুমারসিংহের বাসস্থান জগদীশপুর এই আরা জেলায়। এই সমাধিভবনের প্রাঙ্গণে ও প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে সান্ধ্য ছায়ায় স্তম্ভিতহৃদয়ে সঙ্গীদের কণ্ঠে তাঁহার কত বীর্য্যগাথাই শুনিলাম। তিনি রাজদ্রোহী ও ভ্রান্ত হউন, তিনি একজন প্রতিভাশালী বীরপুরুষ ছিলেন। গল্প শুনিয়াছি, তিনি প্রথম বিদ্রোহে যোগ দেন নাই। আরার ম্যাজিষ্ট্রেট কিজন্য তাঁহাকে 'তলব' দেন। তিনি অপমানভয়ে তাহা গ্রাহ্য করেন না। পরে যখন দেখিলেন যে, আর না যাইয়া রক্ষা নাই, তখন একখানি চারপায়া সহ একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের খাসকামরায় গিয়া উপস্থিত হন। তিনি জানিতেন যে, ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে বসিতে আসন দিবেন না এবং দিলেও তাঁহার সেই বীরদেহ ক্ষুদ্র কাষ্ঠাসনে সন্নিবিষ্ট হইবার নহে। উপস্থিত হইয়াই ম্যাজিষ্ট্রেটের টেবিলের পার্শ্বে তাঁহার চারপায়া স্থাপন করিতে আদেশ দিলেন, এবং তদুপরে আসীন হইয়া বলিলেন —"আপনি আমাকে কেন বারম্বার ডাকিতেছেন?" তাঁহার ব্যবহার, সেই বৃহৎ চারপায়া, তাহাতে বিনা অনুমতিতে উপবেশন, এবং এই প্রশ্ন। জেলার মহাপ্রভুর শ্বেতমুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"তুমি জান যে, আমি তোমাকে ইচ্ছা করিলে এখনই ত্রিশ বেত্রাঘাতে দণ্ডিত করিতে পারি?" আর না। জতুস্তূপে অগ্নি বিক্ষিপ্ত হইল। কুমার-সিংহ ব্যাঘ্রবৎ বাম হস্তে তাঁহার গ্রীবা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে চেয়ার হইতে উঠাইয়া বলিলেন— "তব্ তিস বেৎ গিণ লেও!"—তবে ত্রিশ বেত গণিয়া লও। হস্তের প্রকাণ্ড বেত্রের দ্বারা এক দুই করিয়া ত্রিশ বেত্রাঘাত গণিয়া প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময়ে বিদ্রোহীরা তাঁহার কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইল। তখন তিনি অতিবৃদ্ধ। ক্রোধান্ধ বীরপুরুষ বলিলেন—"কেন তোমরা আর ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আস নাই? তথাপি এই বৃদ্ধবয়সে এই শালা ইংরাজদিগকে ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব কি, তাহা দেখাইব।" তাহার পর তিনি অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়া এ অঞ্চল হইতে কিছু কালের জন্য ইংরাজরাজত্ব ভারতের মানচিত্র হইতে বিলুপ্ত করেন। শুনিয়াছি, শেষে সিপাইদিগের স্বেচ্ছাচারিতায় পরাভূত হইয়া যখন শত্রুসমক্ষে গঙ্গা পার হইতে থাকেন, তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত শত্রুর গুলিতে গুরুতররূপে ক্ষত হয়। সেই হস্ত কাটিয়া ফেলিবার জন্য তিনি একজন সৈনিককে আদেশ করেন। সে এ নির্দ্দয় কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হইলে, বাম হস্তে তরবারি লইয়া দক্ষিণ হস্ত অম্লানমুখে কাটিয়া ফেলেন। শুনিয়াছি, পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সার চার্লস্ ট্রেভিলিয়ান বলিয়াছিলেন—"বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য যে, কুমারসিংহের বয়স ত্রিশ বৎসর কম ছিল না।"

সাসারাম দর্শন করিয়া, কুমারসিংহের বীরত্বের উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে সেই পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রিতে দাল রুটি আহার করিয়া, আমরা রোটাসগড় অভিমুখে সেই অপূর্ব্ব যান এক্কায় যাত্রা করি। তাহার সঙ্গীতনিনাদে পরিতৃপ্ত, এবং তাহার আন্দোলনে সর্ব্বাঙ্গ ব্যথিত অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করি। একটুক তন্দ্রা আসিলে হয়ত স্থূলকায় ইন্‌সপেক্টার মহাশয় আমার অঙ্কের উপর পড়িয়া আমাকে আপ্যায়িত করিতেছেন, না হয় আমি তাঁহার অঙ্কের উপর পড়িয়া তাঁহার তৈলাক্ত অঙ্গের ও বসনের স্পর্শে ও সৌরভে কৃতার্থ হইতেছি। এরূপ সুখসম্ভোগে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রদোষ সময়ে আমরা রোটাসগড়ের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। শীতকালের শিশিরাচ্ছন্ন রোটাস-শৈল; এবং পাদমূলস্থ শোণ নদ কী সুন্দরই দেখাইতেছিল। আমরা কিঞ্চিৎ দুগ্ধের সরবত পান করিয়া পর্ব্বত আরোহণ করিতে আরম্ভ করি। আমি পার্ব্বতী মাতার সন্তান। শৈশব হইতে পর্ব্বতারোহণ আমার অভ্যস্ত ও তাহাতে আনন্দ। বহুদিন পরে ভবুয়ার স্থানে স্থানে পর্ব্বতারোহণে আমার আনন্দের সীমা ছিল না। কিন্তু কাহারও পৌষ মাস, কাহারও

বা সর্ব্বনাশ। ইন্‌স্‌পেক্টার মহাশয় একে স্থূলকায়, মাধ্যাকর্ষণশক্তিতে উৎপীড়িত; তাহাতে আবার কখনও পর্ব্বতারোহণ করেন নাই। মাঘ মাসের শীতেও তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম, এবং তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস-প্রশ্বাসে একটা ক্ষুদ্র ঝটিকা বহিতেছিল। তিনি বড়ই বিপদ্‌-গ্রস্ত। আমি খানিক দূর উঠিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করি, তিনি আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিলে ও শ্বাস প্রশ্বাসের ঝড় কিঞ্চিৎ থামিলে আবার উঠিতে আরম্ভ করি। এরূপে গিরিপার্শ্ব বহিয়া একটি সংকীর্ণ ও সংকটাপন্ন পথে আরোহণ করি। শুনিলাম, আর একটি বক্র এরূপ বিস্তৃত ও সহজ পথ আছে যে, তাহাতে হাতী, গাড়ী, ঘোড়া পর্য্যন্ত অনায়াসে উঠিতে পারে। আমরা প্রায় নয়টার সময়ে শৃঙ্গপ্রান্তস্থ প্রথম তোরণে উপস্থিত হইলাম। যেখানে যেখানে শৃঙ্গে উঠিবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে উচ্চ ও দৃঢ় তোরণ কৌশলে প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, পর্ব্বত প্রস্তরময়। প্রথম তোরণ পার হইয়া কিঞ্চিৎ দূর গিয়া দুর্গপ্রাচীরের তোরণে প্রবেশ করিলাম। এই প্রাচীরের দ্বারা একটি বিস্তৃত পর্ব্বতসানু পরিবেষ্টিত হইয়াছে। দুই দিকে স্মরণ হয়, কেবল দুইটি মাত্র তোরণ বা প্রবেশদ্বার। দ্বার অতিক্রম করিলে সুন্দর ও সুবিন্যস্ত উদ্যানের কেয়ারি সকল দেখা যাইতেছিল। প্রান্তরের কেন্দ্রস্থলে যুগল সরোবর। নির্ম্মল সলিল টলটল করিতেছে। এত উচ্চ শৈলপর্ব্বতশিরে যে সরোবর হইতে পারে, আমার বিশ্বাস ছিল না। সরোবরতীরে বিচিত্র প্রস্তরময়ী রাজপুরী। স্মরণ হয়, প্রায় সর্ব্বত্র দ্বিতল, কোথায় বা ত্রিতল। তড়াগসলিলে পুরী প্রতিবিম্বিত হইয়া পরস্পরে পরস্পরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। বাপীজলে জলজ কুসুম সকল ফুটিয়া রহিয়াছে, এবং জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে। শুনিলাম, শরৎকালে পদ্ম ফুটিলে সরসী-যুগলের নিরুপম শোভা হইয়া থাকে। রুহিদাসপত্নী এই পদ্মফুলে বসিয়া অবগাহন ও জলক্রীড়া করিতেন। তিনি এরূপ লঘুভার সুন্দরী, সতী ও পুণ্যবতী ছিলেন যে, তাঁহার ভারে পদ্মফুল পর্য্যন্ত নামিত না। রাজপুরীতে ছোট বড় এত কক্ষ যে, তাহা সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। এখনও কক্ষ সকল পরিষ্কৃত ও সুরক্ষিত। কোনও কক্ষে কপাট নাই। কখনও যে ছিল, তাহাও বোধ হয় না। প্রস্তরের দেয়াল, প্রস্তরের ছাদ, প্রস্তরের চৌকাট। বোধহয়, সে চৌকাটে বহুমূল্য বসনের পুরু পর্দ্দা ঝুলান থাকিত। কেবল একটি কক্ষে ইংরাজ কপাট লাগাইয়া, উহা সামান্য উপকরণে 'রোটাস'যাত্রীর বিশ্রামের জন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। দুর্গসানু এত বিস্তৃত যে, এখনও তাহার উপর পার্ব্বত্য জাতিবিশেষের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। সেখান হইতে ইন্‌স্‌পেক্টার দুগ্ধ আনাইয়া লইলেন। তিনি আমাদের মধ্যাহ্ন আহারের জন্য রুটি হালুয়া ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমরা সরোবরের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া অতিশয় তৃপ্তির সহিত জঠরানল নির্ব্বাণ করিলাম, এবং বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিয়া পর্ব্বত হইতে নিতান্ত অনিচ্ছায় অবতরণ করিতে লাগিলাম। স্থানটি এত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ যে, ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। রাজপুরীর ছাদ হইতে চারি-দিকে যে বন ও গ্রাম্য শোভা, ততোধিক শোণ নদের ধবল বালুকাধারে যে নীলমণিহারশোভা দেখিয়াছিলাম, তাহা অবর্ণনীয়! আমরা প্রদোষ সময়ে অবতীর্ণ হইয়া গিরিমূলস্থ পুলিস আউটপোষ্টে রাত্রির আহার নির্ব্বাহ করিয়া সাসারাম ফিরিলাম। আবার সেই এক্কা, সেই কৌতুক পথবাহন, এবং সেই অনিদ্রা। প্রাতে সাসারাম পঁহুছিয়া আমি তখনই আবার অশ্বারোহণে আমার শিবিরে ফিরিলাম। দুই দিনে এক শত মাইল পথ অশ্বপৃষ্ঠে ও এক্কাপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া আসিলাম বলিয়া আমলা, মোক্তার মহলে আমার একটা বাহাদুরির তরঙ্গ ছুটিল। প্রশংসা আর তাহাদের মুখে ধরে না। আমি এই অল্পদিনে একজন "বহুত আচ্ছা সোয়ারের" সনন্দ প্রাপ্ত হইলাম।

নবীন কবি—অবকাশরঞ্জিনী

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।"

আমি যশোহরে সংসারজীবনে প্রবেশ করিবার কিছুদিন পরে স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র যশোহরে আসিলেন। দীনবন্ধুর তখন বঙ্গসাহিত্যে একাধিপত্য। বঙ্কিমবাবুর কেবল 'দুর্গেশনন্দিনী' মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। দীনবন্ধুর নাটক সকল উগ্র হাস্যরসাত্মক হইলেও তাঁহার আলাপ ততোধিক উগ্র হাস্যোদ্দীপক ছিল। তাঁহার কাছে আধ ঘণ্টা বসিলে পার্শ্বব্যথা উপস্থিত হইত। তিনি আসিতেছেন, এ সংবাদে যেন যশোহরে একটি আনন্দ-ধ্বনি উঠিয়াছিল। একদিন আমি আফিস হইতে অপরাহ্নে গৃহে ফিরিয়া আসিলে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এক ভৃত্য আসিয়া বলিল—"দীনবন্ধুবাবু আসিয়াছেন। কর্তা আপনাকে এখনই যাইতে বলিয়াছেন।" আমি শুনিবামাত্রই আগ্রহের সহিত দীনবন্ধু দর্শনে ছুটিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে দেখিলাম, দীনবন্ধুবাবুর শ্যাম বর্ণ, স্থূল দেহ, মধ্যমাকৃতি, চক্ষু ক্ষুদ্র কোটরস্থ, কিন্তু তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃসম্পন্ন। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি। তাঁহার কথা শুনিয়া লোকে হাসিয়া গড়াগড়ি দিত, কিন্তু তিনি নিজে কদাচিৎ হাসিতেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"এ যে একেবারে ছেলে-মানুষ!" তিনি করমর্দ্দনের জন্য হস্ত প্রসারণ করিলে, আমি তাহা গ্রহণ না করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। বিদ্যারত্ন একটু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কেমন দীনবন্ধু!" দীনবন্ধু বলিলেন—"এরূপ না হইলে, এত অল্প বয়সে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে লোকের কাছে এত সুখ্যাতি হইবে কেন! বনগাঁয়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহিমবাবুর মুখে পর্য্যন্ত ইহার প্রশংসা ধরে না।" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সঙ্গে মহিমবাবুর আলাপ আছে কি?" আমি বলিলাম—"না।" তিনি বলিলেন—"তোমাকে একবার দেখিতে তাঁহার বড় ইচ্ছা। যশোহরের জইণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কুইন সাহেব তাঁহার কাছে তোমার বড় প্রশংসা করিয়াছেন।" দেখিতে দেখিতে হেডমাষ্টারবাবু ও এসিষ্টাণ্ট এন্‌জিনিয়ারবাবু আসিয়া জুটিলেন। তিনিও সে সময়ে পরিদর্শনে যশোহরে আসিয়াছিলেন। সাহিত্য বিষয়ের আলাপে সন্ধ্যা হইল। এন্‌জিনিয়ারবাবু আমাকে কবিতার হস্তলিপি বহিখানি আনিতে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে, আমি বাসায় গিয়া তাহা আনিলাম। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাসা ও আমার বাসা প্রায় পাশাপাশি ছিল।

পাঠক এন্‌জিনিয়ারবাবু; পড়িতে লাগিলেন আমার 'পিতৃহীন যুবক' কবিতাটি। তাঁহার মত এমন সুন্দর বাঙ্গালা কবিতা পড়িতে আমি কখনও শুনি নাই। তিনি এরূপ ধীরে ধীরে তাঁহার অপূর্ব্ব আবৃত্তির দ্বারা প্রত্যেক শব্দ সজীব করিয়া পড়িতে লাগিলেন যে, কবিতাটি শেষ করিতে প্রায় তিন ঘণ্টা অতীত হইল। সন্ধ্যা হইতে তিন ঘণ্টা কাল বিদ্যারত্ন, হেডমাষ্টার এবং দীনবন্ধুবাবু মন্ত্রমুগ্ধ মত শুনিতেছিলেন। কেহ একটি কথা কহেন নাই। আবৃত্তি শেষ হইল। তখনও সকলে নীরব। ভৃত্য আসিয়া বলিল—আহার প্রস্তুত। সকলে নীরবে উঠিলেন, নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মুখে কি যেন এক গাম্ভীর্য্য; হৃদয়ে কি যেন উচ্ছ্বাস, কি যেন বিষাদ। তাঁহারা কিরূপ যেন আত্মহারা। এই নীরবতা আমার পক্ষে অসহনীয় হইল। কিছুক্ষণ পরে এন্‌জিনিয়ারবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবিতাটি কেমন লাগিল?" বিদ্যারত্ন বলিলেন—"কেমন লাগিল আর কি বলিব?—আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি নবীনকে এত দিনে চিনিলাম।" দীনবন্ধু বলিলেন—"এই প্রথম বয়স। কল্পনা যেন ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। ডালপালা ছাঁটিয়া ফেলিলে একটি অপূর্ব্ব কবিতা হইবে। হস্তলিপিটি আমি লইয়া যাইব।" এন্‌জিনিয়ারবাবু অমনি বলিলেন—"দীনবন্ধু! এ তোমার মুরুব্বিয়ানা কথা হইল। আমি ইহার একটি অক্ষরও বাদ দিতে দিব না।" হেডমাষ্টারবাবু প্রতিবাদটা আরও এক ডিগ্রি চড়াইয়া বলিলেন—"কচুপোড়া খাও! সাধে

কলকাত্তিয়ার সঙ্গে বাঙ্গালের পটে না। ছোঁড়া যদি ইহার একটি অক্ষরও পরিবর্ত্তন করে, আমি ঠেঙ্গাইয়া তাহার হাড় গঁড়ো করিয়া দিব।" দুর্গাদাসবাবু তখন কিছুই বলিলেন না। আহারের পর বাড়ী যাইবার সময় বলিলেন—"নবীন! আমি কবিতা টবিতা বাপু বুঝি না, তাই কিছু বলি নাই। কিন্তু কবিতাটা শুনিয়া আমার প্রাণ কেমন আকুল হইয়াছে। তুই একবার আমার বুকে আয়।" আমাকে পুত্রবৎ বুকে লইয়া শির চুম্বন করিলেন। আমার চক্ষু সজল হইল। এন্‌জিনিয়ারবাবু নিজ ব্যয়ে বহিখানি নকল করাইয়া রাখিয়া দীনবন্ধু-বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন।

আমি যশোহর আসিবার সময়ে 'পিতৃহীন যুবক' কবিতাটি 'এডুকেশন গেজেটে' ছাপিবার জন্য প্যারীবাবুকে দিয়া আসি। কথা ছিল, তিনি সম্যক্ কবিতাটি দুই সংখ্যায় ছাপিবেন। কিন্তু তিনি আটটি দশটি শ্লোক মাত্র এক এক সংখ্যায় ছাপিতে লাগিলেন। দুই সংখ্যায় এরূপ ছাপা হইলে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় একদিন এম. এ. শ্রেণীতে পড়াইবার সময়ে এই কবিতাটির লেখক কে, কেহ জানেন কি না, এম. এ. শ্রেণীর ছাত্রদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন চন্দ্রকুমার আমার নাম করিলে, তিনি চন্দ্রকুমারকে আমার কাছে লিখিয়া পাঠাইতে বলেন যে, এমন সুন্দর কবিতাটিকে এরূপ খণ্ড খণ্ড করিয়া না ছাপাইয়া যেন একখানি বই করিয়া ছাপান হয়। তাহা না হইলে কবিতাটির সৌন্দর্য্য ও রস পাঠকের অনুভূত হইবে না। তিনি না কি কবিতাটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন। একদিকে চন্দ্রকুমারের এ পত্র পাইলাম। অন্যদিকে দীনবন্ধুবাবুরও হস্তলিপির সমস্ত কবিতার বড় প্রশংসা করিয়া, উহা পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত লিখিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান কার্ত্তিকবাবু গলদশ্রুনয়নে কবিতাগুলির প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইদানীং 'এডুকেশন গেজেটে' যশোহর হইতে যে কয়েক কবিতা পাঠাইয়াছিলাম, তদানীন্তন সম্পাদক স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাহাদের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি সেই সঙ্গে স্কুলের পাঠোপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়া একখানি বহি ছাপিতে অনুরোধ করেন এবং উহা স্কুলের পাঠ্য পুস্তক করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হন। তিনি লেখেন যে,ইহাতে স্বদেশীয় সাহিত্যের ও বালক বালিকার উপকার হইবে, এমন নহে ; আমিও কিছু অর্থ পাইব। কিন্তু তখন নব যৌবন ; কলেজ হইতে বাহির হইয়া এত বড় রাজপদ পাইয়াছি ; তাহাতে চারিদিকে আবার কবিত্বের এত প্রশংসা ; একেবারে অঙ্গদের সিংহাসনে আসীন ; আমাকে পায় কে? কপালে অনেক দুঃখ ছিল। মনে করিলাম—কি! এত বড় লোক হইয়া ও কবি হইয়া কি কাক বিড়ালের উপর কবিতা লিখিতে যাইব? ভূদেববাবুর কাছে তীব্র ভাষায় অস্বীকার করিয়া পত্র লিখিলাম। ভূদেব বাবু বোধ হয়, পত্রখানি পাইয়া হাসিয়াছিলেন। পিতা গল্প করিতেন—দুই ফকির সিরাজদ্দৌলা কাছে ভিক্ষা করিতে যাইত। একজন বলিত—"দে দেলাবে, সিরাজদ্দৌলা দেলাবে।"—'দেবে ত সিরাজদ্দৌলা দেবে।' অন্য জন বলিত—"দে দেলাবে, মৌল্লা দেলাবে।" —'দেবে ত ঈশ্বর দেবে।' সিরাজদ্দৌলা একটা কুমড়াতে সোনা ভরিয়া, উহা প্রথমোক্ত ফকিরকে দিলেন, এবং একটি কুমড়ামাত্র শেষোক্তকে দিলেন। পথে প্রথমোক্ত দেখিল যে, তাহার কুমড়াটি বড় ভারি। সে স্থির করিল, তাহারটি কাঁচা ও দ্বিতীয় ফকিরেরটি পাকা, তাই হালকা। সে বলিল—"ভাই, আমার কুমড়াটি তুমি লও এবং তোমারটা আমাকে দাও।" দ্বিতীয় ফকির বলিল—"দুটোই কুমড়া, ঈশ্বর দিয়াছেন। তোমার যেটা খুসি লও।" পরদিন তাহারা আবার নবাবের কাছে উপস্থিত হইল এবং পূর্ব্ববৎ একজন বলিল—"দে দেলাবে, সিরাজদ্দৌলা দেলাবে।" অপরটি বলিল—"দে দেলাবে, মৌল্লা দেলাবে।" কুমড়া দুটি কেমন, সিরাজদ্দৌলা জিজ্ঞাসা করিলে, প্রথমোক্ত ফকির বলিল—"সিরাজদ্দৌলার অতুল মহিমা,

এমন কুমড়া কখনও খাই নাই।" দ্বিতীয় ফকির বলিল—"সোভানাল্লা! আল্লার অতুল মহিমা। কুমড়াটা সোনাপূর্ণ ছিল।" তখন সিরাজদ্দৌলা বলিলেন—"নাহি দেনেছে মৌল্লা, কেয়া দেগা সিরাজদ্দৌল্লা।"—ঈশ্বর না দিলে সিরাজদ্দৌলা কি দিবেন?' বোধহয়, ভূদেববাবু এরূপ মনে করিয়া থাকিবেন। যাহাকে বিশ্বদেব দিবেন না, তাহাকে ভূদেব কিরূপে দিবেন? পাঠ্য পুস্তকের দ্বারা যে এক একজন দোতালা তেতালা বাড়ী কলিকাতায় করিতে পারে, তখন জানিতাম না। ভূদেববাবু তখন শিক্ষা-বিভাগের সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি যাচিয়া এই কুবেরের ভাণ্ডার আমাকে দিতে চাহিলেন, আমি লইলাম না। যদি তাঁহার অনুরোধ পালন করিতাম, তবে এই দীর্ঘ দাসত্বে নিষ্পেষিত না হইয়া শিক্ষা-বিভাগের পালিত কুটুম্বদলের মধ্যে আমিও একজন শিশুমুণ্ডমালী মহাপ্রভু হইয়া বসিতে পারিতাম। পিতার গল্পটি এ জীবনে অনেক বার মনে পড়িয়াছে।

যাহা হউক, এত প্রশংসায় হিমানীসমাবৃত স্বয়ং হিমাচলই স্থির থাকিতে পারিতেন না। একটি নবযুবকের কথা কি? দীনবন্ধুবাবু হস্তলিপিখানি বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিতে দিয়াছিলেন। তিনি উহা একেবারে তাঁহার 'সংস্কৃত প্রেসে' ছাপিতে দিলেন। আমি এরূপে "মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী" হইয়া লোহকবলে, অমরত্বের বা উপহাসের জন্য প্রথম নিপতিত হইলাম।

ভবুয়া হইতে একবার কাশীর বুড়ামঙ্গলের মেলা দেখিতে যাই। এই মেলা দোলের পরবর্ত্তী মঙ্গল বারে হইয়া থাকে। ভবুয়ার লোকেরা ইহার বড়ই গল্প করিত। কলিকাতার বর্ত্তমান রঙ্গভূমির রসিকচূড়ামণি এবং প্রহসনের খনি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর সঙ্গে সেই বার কাশীতে লোকনাথবাবুর বাড়ীতে সাক্ষাৎ হয়। উভয়ের এক বয়স, একই প্রকৃতি, একই প্রাণের গতি। প্রথম পরিচয়েই উভয়ের হৃদয় সলিলে সলিলের মত মিলিয়া মিশিয়া গেল। তাহার পর যদিও এ জীবনে উভয়ের অল্পই সাক্ষাৎ হইয়াছে, তথাপি অমৃতের বন্ধুতা আমার এ জীবন-সন্ধ্যায়ও 'অমৃত ও মদিরা'। আমরা একটা দল বাঁধিয়া বুড়ামঙ্গলের মেলা দেখিতে সন্ধ্যার পর গঙ্গার তীরে আসিলাম। মরি মরি, কি মনোহর দৃশ্য! শত শত তরণী, স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র, কি একত্র গ্রথিত ; পুষ্পে, পল্লবে, পতাকায় ও নানাবর্ণের আলোকে খচিত ও সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া ভাগীরথীগর্ভে ধীরে মন্থরে ভাসিতেছে। বিশ ত্রিশখানি নৌকা একত্র করিয়া, বিজয়নগরের মহারাজার ও কাশীর মহারাজার—কাশীবাসীরা ইঁহাকে কাশীনরেশ বলে—বিহার-তরী সজ্জিত হইয়াছে। আমরা প্রথম বিজয়নগরের মহারাজার তরীতে উঠিলাম। তখন বিরাটপর্ব্বের অভিনয় হইতেছিল। অতি কদর্য্য অভিনয় ; কিছুই ভাল লাগিল না। বিশেষতঃ রিওয়ার মহারাজা শুভাগমন করিলে তাঁহার মোসাহেবদের মন্ত্রণায় আমাদিগকে চম্পট দিতে হইল। তখন কাশীনরেশের তরী হইতে কাশীর বিখ্যাত গায়িকা ময়নার কলকণ্ঠ, তীরস্থিত দর্শকশ্রেণীর কর্ণে পর্য্যন্ত অমৃত বর্ষণ করিতেছে। আমরা এই তরীতে উঠিলাম, এবং তাহার অতুলনীয় কণ্ঠ প্রাণ ভরিয়া শুনিলাম। এমন আর শুনি নাই। গৃহে ফিরিবার সময়ে অমৃতপ্রমুখ বন্ধুগণ 'বুড়ামঙ্গল' সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিতে আমাকে বারম্বার অনুরোধ করিলেন। প্রাতে আমি আমার শিবিরে ফিরিলাম।

সে দিন বড় বাতাস বহিতে লাগিল। কাচারির তাঁবুতে কাজকর্ম্ম করা অসাধ্য হইল। বিশেষতঃ রাত্রিজাগরণে কার্য্যেও বড় প্রবৃত্তি হইল না। কাচারি বন্ধ করিয়া আমার আবাস-শিবিরে গেলাম। কিন্তু নিদ্রা হইল না। দিবানিদ্রা অভ্যাস নাই। রাত্রির সেই দৃশ্য নয়নে ভাসিতেছিল। বন্ধুদের অনুরোধও কর্ণে বাজিতেছিল। তখন এক টুকরা কাগজ লইয়া, রাত্রি জাগরণের অনিবার্য্য ফল, হাই তুলিতে তুলিতে 'বুড়ামঙ্গল' কবিতাটি লিখিলাম এবং সন্ধ্যার ট্রেনে কাশী ফিরিয়া গিয়া, সেই কবিতাটি বন্ধুদিগকে শুনাইলাম। তাঁহারা এত প্রীত হইলেন যে, লোকনাথবাবু সেই সন্ধ্যায় আমাকে কত জায়গায় লইয়া গেলেন, এবং

কবিতাটি আবৃত্তি করাইলেন। উহা আমার মুখস্থ হইয়া গেল। 'কবিবচনসুধা' নামক পত্রের সম্পাদক কাশীর খ্যাতনামা হরিশ্চন্দ্র উহা শুনিয়া এত দূর ক্ষেপিয়া গেলেন যে, তিনি উহা তখনই লিখিয়া লইলেন, এবং শুনিয়াছিলাম, তাহার হিন্দী অনুবাদ তাঁহার পত্রের পরের সংখ্যায় ছাপিয়াছিলেন।

'নিরাশ প্রণয়,' 'পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী'র প্রায় সমস্ত অংশ এবং 'মুমূর্ষু শয্যায় বাঙ্গালী যুবক' ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরে লিখিত হয়। 'শশাঙ্কদূত' মাগুরায়, এবং 'ডিউক অব এডিনবরার প্রতি' নড়াইলে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে, এবং 'হৃদয় উচ্ছ্বাস' ভবুয়াতে (মফঃস্বল যাইবার সময় হস্তিপৃষ্ঠে), 'বুড়ামঙ্গল' এবং 'কি লিখিব' ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভবুয়াতে রচিত হয়। শেষ তিন স্থানের লিখিত কবিতাও উক্ত পুস্তকের সহিত ছাপিবার জন্য সংস্কৃত প্রেসে প্রেরিত হয়। বোধহয়, ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ভবুয়া থাকিতে, উক্ত পুস্তক 'অবকাশরঞ্জিনী' নামে প্রকাশিত হয়। ইহার অবশিষ্ট কবিতা কলিকাতায় পঠদ্দশায় রচিত হইয়াছিল। 'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগের সমস্ত কবিতাই আমার আঠার হইতে তেইশ বৎসর বয়সের মধ্যে লিখিত। পিতার পক্ষে প্রথম সন্তানের এবং গ্রন্থকারের পক্ষে প্রথম গ্রন্থের মুখদর্শন একই সমান। কিন্তু সন্তান প্রসূত হইলেই যেমন এ শিশু বাঁচিবে কি না, পিতার মনে একটা আশঙ্কা হয়, গ্রন্থ মুদ্রিত হইলেও প্রথম আনন্দের পর সেরূপ উহার প্রতিপত্তি সম্বন্ধে আশঙ্কা গ্রন্থকারের মনে উদয় হয়। তবে আমাকে বহুদিন এ আশঙ্কায় থাকিতে হয় নাই। 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পরেই নানাদিক্ হইতে তাহার প্রশংসাসূচক পত্র পাইতে লাগিলাম। একজন প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী লেখেন যে, তাঁহারা কয়েকজন বন্ধু একত্র হইয়া কাব্যখানি পাঠ করেন এবং সকলে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, "এ মধু মধুসূদনের না হইয়া যায় না। তিনিই কোনও কারণে নাম না দিয়া ইহা ছাপিয়াছেন।" কাব্যে কাব্যকারের নাম ছিল না। কিন্তু পরে সহপাঠী শুনিলেন যে, এ "নবীন মধু নবীন কবির।" তাই সন্দেহভঞ্জনার্থ আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। সে সময় বাঙ্গলায় মাসিক পত্র, কিম্বা 'এডুকেশন গেজেট' ছাড়া ভাল সাপ্তাহিক পত্রও ছিল না। কিছুকাল পরে বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শন' খুলিয়া বঙ্গসাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করেন। বঙ্গদর্শনে 'অবকাশরঞ্জিনী'ই বোধহয়, প্রথম স্বতন্ত্র সমালোচনার সম্মান লাভ করে। সে সমালোচনাও স্বয়ং বঙ্কিমবাবুর রচিত। তখন আমি তাঁহার কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত।

'অবকাশরঞ্জিনী' সম্বন্ধে দুটি কথা বোধহয়, আমি বলিতে পারি। প্রথমতঃ আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা বঙ্গভাষায় ছিল না। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' ও 'ব্রজাঙ্গনা'য় খণ্ড কবিতা থাকিলেও তাহারা এক বিষয়ে। চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী—স্মরণ হয়, আমার 'এডুকেশনে' লিখিতে আরম্ভ করিবার পরে প্রকাশিত হয়। তাহাও সমস্ত এক ছন্দে। এ সম্বন্ধে একমাত্র পথ-প্রদর্শক 'প্রভাকর'। তবে 'প্রভাকর'ও কাব্যাকারে প্রকাশিত হয় নাই। হেমবাবু, স্মরণ হয়, তখনও খণ্ড কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন নাই। আমি 'প্রভাকরে'র অনুকরণে শৈশব হইতে এরূপ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। যাহা হউক, 'অবকাশ-রঞ্জিনী' বোধহয়, বঙ্গভাষায় এরূপ ভাবের প্রথম খণ্ডকাব্য। দ্বিতীয়তঃ, আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবার পূর্ব্বে স্মরণ হয়, স্বদেশ-প্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে, কি কবিতায় ছিল না। হেমবাবুর 'ভারতসঙ্গীত' আমার স্বদেশপ্রেমব্যঞ্জক বহু কবিতা প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়। এই নূতন সুর এমনই একটা নূতন উচ্ছ্বাস সকলের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়াছিল যে, যশোহরের বন্ধুরা আমার কোনও কোনও কবিতা মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বদা আওড়াইতেন। তাহার একটি কবিতা—

"ভারতের ইতিহাস শোকের সাগর
কেন পড়িলাম? আহা! কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়?
আর্য্যবংশ-কীর্ত্তিচয়—
কেন দেখিলাম? আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?"

এ কবিতাটি বন্ধুরা মুহুর্মুহু আবৃত্তি করিতেন। এ স্বদেশ-প্রেম কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, এবং যশোহরে শিশিরবাবুর সংস্পর্শে আসিয়া উহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বোধহয়, শিশিরবাবু গদ্যে 'অমৃত বাজার পত্রিকায়' এবং আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি। চত্বারিংশ বৎসর পরে সেই স্বদেশ-প্রেমের ক্ষুদ্র নির্ঝর-ধারা কলনাদিনী ভাগীরথীরূপে' কর্জ্জন ঐরাবতকে উড়াইয়া ছুটিয়াছে। এত দিনে আমরা প্রকৃতরূপে মা পতিতপাবনীর দর্শন পাইয়াছি। মা! তুই সগরবংশের ধ্বংসপ্রাপ্ত ষাট হাজার সন্তানকে উদ্ধার করিয়াছিলি। আজ মা! মহাভারত সাগরবেষ্টিত সগরবংশের তোর ত্রিশ কোটী অধঃপতিত সন্তানকে উদ্ধার করিয়া, তোর পতিতপাবনী নাম সার্থক কর মা।

ভবুয়া ত্যাগ

নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া, শিবির-জীবন শেষ করিয়া, শীত অন্তে দোলের সময়ে ভবুয়া ফিরিলাম। পশ্চিমের দারুণ শীত, দোল আসিতেই যেন অকস্মাৎ শেষ হইয়া যায়। সেখানে দারুণ শীত শেষ হইবামাত্রই দারুণ গ্রীষ্ম, আবার দারুণ গ্রীষ্ম শেষ হইবা-মাত্রই দারুণ শীত। অন্য চারি ঋতু নাই বলিলেও চলে। কেবল বর্ষার সময়ে মধ্যে মধ্যে সামান্য বর্ষা হইয়া থাকে মাত্র। তাহাতে পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র নদ নদীতে দুই চারি দিনের জন্য তীব্র স্রোত বহিয়া থাকে, এবং ইহাতেই একদিকে গৃহপতনে ও অন্য দিকে 'ছয়লাভে' (প্লাবনে) ডুবিয়া মানুষ মরিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেরূপ বৃষ্টি হয়,—অন্ততঃ আমাদের শৈশবে যেরূপ হইত,—সেরূপ বৃষ্টি হইলে বোধহয়, পশ্চিমাঞ্চল গৃহ-শূন্য ও জনশূন্য হইয়া পড়িত।

দোল পশ্চিমের দুর্গোৎসব। 'হোলি, হোলি' করিয়া সমস্ত দেশ ক্ষেপিয়া উঠে; এবং তাড়ির স্রোতে নরনারী ভাসিয়া যায়। এ সময়ে দ্বাদশটি ভৃত্য রাখিলেও এক এক-দিন নিরম্বু উপবাস করিতে হয়। কারণ, সকলেই তাড়ির নেশায় অচেতন। পথে ঘাটে, মাঠে হাটে, বাজারে গৃহে, পর্ব্বতশিখরে, নদী-নির্ঝর-তীরে, দলে দলে রঞ্জিত-বাসপরিহিত, সুরা তাড়ি পানে উন্মত্ত, বিচিত্র পুরুষপুঙ্গবদিগের অপূর্ব্ব নৃত্য ও গীত। কদাচিৎ নির্ঝর ও ইঁদারার পার্শ্বে ভদ্রমণ্ডলীর 'মোহুয়া' পুষ্পাসব ও তয়ফাওয়ালী লইয়া বসন্তোৎসব। দোলের দিন আমলা, মোক্তার, পুলিস ও জমিদার একদল আমার বাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত। সঙ্গে সসম্প্রদায় এক নর্ত্তকী বা বাইজী। তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা আমাকে ফাগুয়া না দিয়া ছাড়িবেন না। পাছে সর্ব্বাডিভসন-গৃহের কক্ষ লাল হইয়া যায়, সেইজন্য তাঁহারা আমাকে বারাণ্ডায় বাহির হইতে বলিলেন। তাঁহাদের তখন সুরা দেবীর কৃপায় যেরূপ অবস্থা, দেখিলাম—উপায়ান্তর নাই। আমি বারাণ্ডায় বাহির হইবামাত্র ভীষ্মার্জ্জুনের শরজালের মত অসংখ্য কুঙ্কুমপিণ্ড ও আবিরধারা আমার উপর বর্ষিত হইল। ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া, ব্রাহ্মণেরা মুখ মস্তক, এবং অন্য জাতীয়েরা পাদপদ্মদ্বয়, আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত করিলেন। বারাণ্ডার দেয়াল ও মেঝে রক্তবর্ণ হইয়া ক্ষুদ্র যুদ্ধ-

ক্ষেত্রের মূর্ত্তি ধারণ করিল। আমার যে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল—চুল গোঁপ পর্য্যন্ত লাল—তাহা সহজে অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন যে, আমার এরূপ অল্প বয়স ও এমন সুন্দর রূপ যে, আমাকে ঠিক 'বৃন্দাবনের কানাই'র মত দেখাইতেছিল। তাহার পর বারাণ্ডাতে সতরঞ্চ পাতা হইল, এবং তাহাতে বেলা পাঁচটা হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত নৃত্য-গীত হইল। বাইজী ছাড়া আরও দুই একটি ভদ্রলোক গাইলেন। তাহার মধ্যে দেখিলাম, আমার মুসলমান পেস্কার একজন উৎকৃষ্ট গায়ক।

কিন্তু শিবির হইতে সেই শোকের রঙ্গভূমি গৃহে ফিরিয়া আমাদের প্রাণ আবার বিষাদে ডুবিয়া গেল। চারি মাস মফঃস্বল পরিভ্রমণে যে শোক কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল, তাহা আবার জাগিয়া উঠিল। আবার পূর্ব্বের মত গৃহভীতিও উপস্থিত হইল। একা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে আরও বেশী ভয় হইতে লাগিল। তখন অগত্যা তদানীন্তন সেক্রেটারি সেই টম্‌সন্‌ সাহেব মহোদয়ের কাছে আমার ভ্রাতৃবিয়োগের কথা জানাইয়া, স্থানান্তরর প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি লিখিলেন—কটক ও চট্টগ্রামে অফিসারের প্রয়োজন, এবং এই দুই স্থানের মধ্যে কোথায় যাইতে আমি ইচ্ছা করি। আমি লিখিলাম—আমি এই শোকগ্রস্ত অস্থায় কটক যাইতে চাহি না। চট্টগ্রাম আমার জন্মস্থান, সেখানে যাইতে পারি, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বোধহয় যাইতে দিবেন না। ইহার অব্যবহিত পরে মাজিস্ট্রেট মিঃ ডইলি পরিদর্শনে আসিলেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত অনুগ্রহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা খুলিয়া বলিলে তিনি আমার স্থানান্তরের প্রস্তাব সম্বন্ধে ঘোরতর আপত্তি করিলেন, এবং অতীব স্নেহকণ্ঠে আরও কিছুদিন ভবুয়ায় থাকিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, আমার ভবুয়ার শাসনে কেবল যে তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট তাহা নহে, এই অল্প সময়ে আমি অত্যন্ত লোকপ্রিয় (popular) হইয়াছি। আমি বলিলাম—যখন সেক্রেটারি এরূপ পত্র লিখিয়াছেন, তখন শীঘ্র আমার বদলির আদেশ হইতে পারে। তিনি বলিলেন—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া গবর্ণমেণ্ট আমাকে বদলি করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি ঘোড়া ছাড়িয়া তিন চারি মাইল যাইতে না যাইতে গেজেট আসিলে দেখিলাম আমি চট্টগ্রামে বদলি হইয়াছি। সবডিভিসনে একটি হাহাকার পড়িয়া গেল। আমি তখনই বিনয় করিয়া, এ বদলির প্রতিবাদ বা করিতে মিঃ ডইলিকে লিখিলাম। তিনি তদুত্তরে আমাকে বিদায় দিয়া লিখিলেন—

"I have been very much pleased with your work generally and am glad to find you are such a zealous officer as you have shown yourself to be by working to the best of your ability both in the interest of Government and for the welfare of the people over whom Government has placed you."

মিঃ ডইলির এই প্রশংসা তাঁহার সহৃদয়তার পরিচায়ক। আমি তখন বালক বলিলেও চলে। তখন আমার বয়স তেইশ চব্বিশ বৎসর মাত্র। তাহাতে নয় মাস মাত্র ভবুয়াতে ছিলাম। তাহাতে কি কাজ করা যায়, আর কি কাজই বা জানিতাম। স্মরণ হয়, ভবুয়া যাইবার সময়ে মোহনিয়া হইতে ভবুয়া পর্য্যন্ত রাস্তা কাঁচা থাকাতে বর্ষার সময়ে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই এ রাস্তাটি পাকা করিবার প্রস্তাব করিলাম। বালকের লেখা। রিপোর্টটা কিছু উগ্র রকমের হইয়াছিল। তাহাতে এক্‌জিকিউটিভ এন্‌জিনিয়ার মহাশয় চটিয়া লাল হইলেন, এবং আমার প্রস্তাবকে বিদ্রূপ করিয়া লিখিলেন যে, এই রাস্তা পাকা করিলে 'প্লাম পুডিংগে' যেরূপ প্লাম ডুবিয়া যায়, পাকা খোয়াও ইহাতে সেইরূপ ডুবিয়া যাইবে। আমি বিদ্রূপ, সুদ সমেত ফেরত দিলে, তিনি সশরীরে ভবুয়া আসিয়া আমার সঙ্গে সন্ধি করিলেন। বলিলেন—দোষ তাঁহার নহে, আমার পূর্ব্ব-

বর্ত্তীদের। তাঁহারা রাস্তার এরূপ শোচনীয় অবস্থার কথা কখনও রিপোর্ট করেন নাই। এই সন্ধির ফলে আমি থাকিতে থাকিতে রাস্তাটি পাকা করিবার কার্য্য আরম্ভ হইয়া ছিল। আমার দ্বিতীয় কার্য্য—বর্ষার সময়ে পাহাড়ে সমস্ত দেশের গরু মহিষ 'আহিরেরা' জিম্বা লয়, এবং ইহারা পরস্পরের জিম্বায় গরু পরস্পরে চুরি করিয়া লোকের যথেষ্ট ক্ষতি করে। অথচ পাহাড়ে ইহাদের জিম্বায় গরু না পাঠাইয়াও উপায়ান্তর নাই। কারণ, পশ্চিমে মাটির কদর্য্য গৃহসমষ্টির নাম গ্রাম এবং তাহার বাহিরে শস্যক্ষেত্র। বর্ষার সময়ে উহা জলে ও ফসলে আবৃত থাকে। অতএব গরু মহিষ চরিবার স্থানাভাব। এই চুরি নিবারণ করিবার জন্য আমি পাহাড়ে উঠিবার কয়েকটি 'ঘাট' বা পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহাতে পুলিসের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলাম। ইহার ফলে এক দিকে গরু মহিষ চুরি ও তৎসম্বলিত মোকদ্দমা কমিয়া গিয়াছিল, এবং তজ্জন্য ভবুয়া সবডিভিসনের লোকের বড়ই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলাম। আর কি কি করিয়াছিলাম মনে নাই। বোধহয়, মিঃ উইলি এই দুই কার্য্যের প্রতিই তাঁহার পত্রে লক্ষ্য করিয়া আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, কার্য্যভার যথাসময়ে পরবর্ত্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া মার্চ্চ মাসের শেষ ভাগে বেলা চারটার সময়ে ভবুয়ারূপ ভ্রাতৃশ্মশান ত্যাগ করিয়া অশ্রুসিক্ত নয়নে চলিলাম। বলিয়াছি, আমি নয় মাস মাত্র ভবুয়াতে ছিলাম। এবং তখন আমার বয়স তেইশ চব্বিশ মাত্র। কি কাজই বা করিয়াছিলাম, কি কার্য্যই বা জানিতাম। তথাপি সবডিভিসনাল অফিসারের হাতা লোকারণ্য। আমি কাশী হইয়া কলিকাতায় যাইব। স্ত্রী অগ্রেই কাশী যাইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছিলেন। চইনপুর নীলকুঠীর বাঙ্গালী মেনেজার বিশুবাবু আসিয়াছেন। তাঁহার কুঠীতে রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে সেখান হইতে ঘোড়ার ডাকে ঝমনিয়া যাইয়া কাশী যাইব। পুলিস ইন্‌সপেক্টার তেজচন্দ্রও সেই কুঠী পর্য্যন্ত যাইয়া আমাকে বিদায় দিবেন। তিনজনে ঘোড়ায় উঠিয়া যাত্রা করিলাম। তাঁহারা আগে, আমি পশ্চাতে। আমাকে বেষ্টন করিয়া ও আমার পশ্চাতে দীর্ঘ স্রোতে সমস্ত ভবুয়াবাসী পদব্রজে সুবানদতীর পর্য্যন্ত প্রায় দুই মাইল পথ আসিল। তাহাদের সকলেরই চক্ষে জলধারা ও মুখে আমার প্রশংসাধারা। তাহারা সকলে কাঁদিতেছিল, আমিও কাঁদিতে-ছিলাম। নদীতীরে আসিয়া ভ্রাতৃশ্মশানের কাছে দাঁড়াইয়া বড় কাঁদিলাম। বিশুবাবু ও তেজচন্দ্রবাবু আমাকে শিশুটির মত বুকে জড়াইয়া সেখান হইতে আনিলেন, এবং সান্ত্বনা দিয়া ঘোড়ায় তুলিয়া দিলেন। এখানে ভবুয়াবাসীর কাছে বিদায় লইলাম। নদীতীর রোদনকোলাহলে পূর্ণ হইল। নদী অতিক্রম করিয়া বহু দূর আসিলেও দেখিলাম, তাহারা সমাবিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। শেষে দূরতায় ও আসন্ন সান্ধ্য ছায়ায় আমি তাহাদের ও তাহারা আমার দৃষ্টির অন্তর হইল।

তখন ঘোড়া ছাড়িয়া আমরা তিনজনে চলিতে লাগিলাম। বিশুবাবুর ঘোড়াটি একটি খাসি বলিলেও হয়—এত ক্ষুদ্র। তেজচন্দ্রেরও একটা অপূর্ব্ব টাট্টু। তাহাতে তেজচন্দ্র এরূপ দীর্ঘাকৃতি যে, তাঁহার শ্রীচরণ দুখানি প্রায় মাটি স্পর্শ করিয়াছে। দূরে হইতে বোধ হইতেছিল যেন তেজচন্দ্র ও বিশুবাবু ঘোড়া আশ্রয় করিয়া হাঁটিয়া যাইতে-ছিলেন। আমি একটি কাটিওয়ার বৃহৎ তেজী এবং বিদ্যুদ্বেগী অশ্বপৃষ্ঠে ছিলাম। আমি সেজন্য কিছু পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহাদিগকে আগে যাইতে দিয়াছিলাম। তাহা না হইলে তাঁহারা বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একে ভাল অশ্বারোহী ছিলেন না; তাহাতে তেজচন্দ্র কিছু একটা দেখিলেই হঠাৎ ঘোড়া থামাইয়া বিশুবাবুকে দেখাইতে থাকেন। আর আমি একেবারে তাঁহাদের উপর গিয়া পড়ি। বিশেষতঃ তাঁহাদের উভয়ের ঘোড়া দংশন-পটু। দুজন একটুক কাছাকাছি হইলেই ঘোড়ায় ঘোড়ায় কামড়া-

কামড়ি করিতে চাহে। আমি এজন্য তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া, অগ্রে চলিয়া গেলাম। আমার তেজস্বী উচ্চৈঃশ্রবাকে পশ্চাতে রাখা অসাধ্য হইয়াছিল। সে যেন এরূপ অপূর্ব্ব দুই ঘোটকের পশ্চাতে থাকা অপমান মনে করিতেছিল। এরূপে কিছু দূর গিয়াছি, প্রায় সন্ধ্যা, এমন সময়ে তেজচন্দ্র হঠাৎ ঘোড়া থামাইয়া বলিয়া উঠিল—"দেখ দেখ বিশুবাবু! কেমন সুন্দর সজনে গাছ। এর ডাঁটা লইতে হইবে।" কলিকাতা অঞ্চলের লোক শাক-সব্জির কাঙগাল। যেই তেজচন্দ্রের ঘোড়া থামিয়াছে এবং বিশুবাবুর ঘোড়া তাহার নিকট গিয়াছে, অমনি দুই ঘোড়ার দন্তযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এবং উভয় আরোহী চক্ষুর নিমেষে পড়িয়া গিয়াছেন। ঘোড়া দুটি কামড়াকামড়ি করিতে করিতে উচ্চ হ্রেষারবে সান্ধ্য গগন বিদীর্ণ করিয়া আমার ঘোড়ার দিকে ছুটিয়াছে। আমি নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছাড়িলাম। কিন্তু আমার ঘোড়ার পৃষ্ঠে আরোহী, আর সেই দুটা শূন্য-পৃষ্ঠ। কাজেই তাহাদের বেগ অধিক; দেখিলাম, আমার ঘোড়ার উপরে প্রায় আসিয়া পড়িল। তখন আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া, ঘোড়া ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর দেখিলাম না। তাহাই করিলাম। আমার ঘোড়া তীরবৎ মাঠের মধ্য দিয়া ভবুয়ার দিকে ছুটিল। অন্য দুই ঘোড়াও তাহার পশ্চাতে ছুটিল। তখন বন্ধু দুইজন যেখানে পড়িয়া আছেন, আমি সেদিকে পদব্রজে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। যে সকল লোক পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইলাম। যাইয়া দেখি, দুজনেই পড়িয়া আছেন। বিশুবাবুর দক্ষিণ হস্তে তেজচন্দ্রের ঘোড়ার দন্তে ক্ষত হইয়াছে, রক্ত ছুটিয়াছে। তেজচন্দ্রের বাহিরে কোনও জখম দেখা যাইতেছ না। বিশুবাবু যাতনায় চীৎকার করিতেছেন। নিকটের গ্রাম হইতে একখানি চার-পায়া আনাইয়া, তাঁহাকে অনতিদূরে একটি সরোবরতীরে লইয়া গেলাম, এবং তাঁহার কোট পিরান ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সেই ভগ্ন ও ক্ষত স্থান বাঁধিয়া জল দিতে লাগিলাম। তিনি প্রায় অজ্ঞান। কিছু পরে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তেজচন্দ্র দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর করিয়া উপস্থিত হইলে, আমি তাঁহাকে বড়ই বকিতে লাগিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আমি হতভাগার রক্ত বাহির হয় নাই বলিয়া বুঝি অপরাধ হইয়াছে। পা যেন একটা গিয়াছে, তুলিতে পারিতেছি না।"

একখানি খাটুলির যোগাড় করিয়া বিশুবাবুকে তাহাতে উঠাইলাম। কিন্তু তেজ-চন্দ্রেরও চলিবার শক্তি নাই। খাটুলিও আর পাওয়া যায় না। কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে বিশুবাবু আমাদের অভ্যর্থনার জন্য যে বাইজী—এ অঞ্চলে 'তয়ফাওয়ালী' বলে—নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তিনি একখানি 'এক্কা' করিয়া উপস্থিত। অনেক ঠাট্টা তামাসার পর বাইজীর পার্শ্বে তেজচন্দ্রকে বসাইয়া দিলাম। ইতিমধ্যে আমার সহিস, পথে আমার ঘোড়া পাইয়া ফিরাইয়া লইয়া আসিয়াছে। বিশুবাবুর খাটুলির পার্শ্বে আমার ঘোড়া এবং আমাদের পশ্চাতে এক্কায় তাঁহার সঙ্গিনী সহ তেজচন্দ্র। তাঁহার হস্তে এক ফর্সি, কখনও তিনি তাম্রকূট সেবন করিতেছেন, কখনও তাঁহার সঙ্গিনীকে উহা সেবন করাইতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া বিশুবাবু পর্য্যন্ত আপনার বেদনা ভুলিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার বেদনার দরুন সকলে ধীরে ধীরে যাইতেছিলাম; অনেক রাত্রিতে চইনপুরের নীলকুঠীতে পঁহুছিলাম। কিছুক্ষণ পরে এক্কায় ভবুয়া হইতে নেটিব ডাক্তার আসিয়া পঁহুছিলেন, এবং আমাদের বিপদের সংবাদ পাইয়া বহুতর লোকও আসিল। সর্ব্বনাশ। নেটিব ডাক্তার বলিলেন, বিশুবাবুর হাত দুই তিন খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে (Compound fracture)। অবস্থা বড় গুরুতর; তাঁহাকে কলিকাতায় লইতে হইবে। তাঁহার পরিবারের মধ্যে কান্নার রোল উঠিল। নাচের জন্য সুসজ্জিত গৃহ আমাদের যেন উপহাস করিতে লাগিল। তাঁহার যন্ত্রণা ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিল। আমাদের আর সেই রাত্রি আহার নিদ্রা হইল না। প্রাতে তাঁহার কলিকাতা যাওয়ার

বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আমি অশ্বারোহণে 'ঝমনিয়া ষ্টেশনে' যাইয়া কাশী চলিয়া গেলাম।

কাশীর কথা আমি আর নূতন করিয়া কি লিখিব? কাশী কেই বা না দেখিয়াছেন? কেই বা ব্যাসকাশী হইতে বারাণসীর অপূর্ব্ব সোপান-সৌধখচিত শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ না হইয়াছেন? ফাল্গুন মাস। বসন্তকাল। জাহ্নবী স্বচ্ছ নীলমণিমালানিভ প্রসারিতা। আর—

"পাড়ি জলনীলে ধবল সৌধ ছবি
অনুকারিছে নভ অঞ্জন ও!"

ভবুয়া অবস্থানকালে আমি কয়েকবার কাশী বেড়াইতে গিয়াছিলাম। প্রথম বার গিয়াছিলাম আশ্বিন মাসে। আসিতে ইংরাজের ভদ্রতার এবং বাঙ্গালীর ইতরতার দুইটি জীবন্ত চিত্র দেখিয়াছিলাম। 'ঝমনিয়া' আসিয়া পূজার বন্ধের ভিড় বলিয়া 'রিজার্ভ' পাইলাম না। ইংরাজ ষ্টেশন-মাষ্টার স্ত্রীর পাল্কি সঙ্গে করিয়া, কক্ষ কক্ষ পরীক্ষা করিয়া, কোথায়ও স্থান পাইলেন না। একটি প্রথম শ্রেণীর কক্ষে একজন ইংরাজ এক বেঞ্চে শুইয়া একখানি বহি পড়িতেছেন। ষ্টেশন-মাষ্টার এই কক্ষে আমাকে সস্ত্রীক যাইতে পরামর্শ দিলেন। নিরুপায় হইয়া সম্মত হইলাম। স্ত্রীকে কক্ষে উঠিতে দেখিয়া, ইংরাজ উঠিয়া, তাঁহার বেঞ্চের দূরস্থ কোণায় গিয়া মুখ ফিরাইয়া পড়িতে লাগিলেন। ট্রেন মোগলসরাই পঁহুছিলে আমরা যখন নামিলাম, আর আমরা সে কক্ষে ফিরিব না শুনিয়া, তিনি কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া আবার পূর্ব্ববৎ শয়ন করিলেন। এতক্ষণ তিনি একটা বারও মুখ ফিরাইয়া দেখেন নাই। সেই ট্রেনে কলিকাতা হইতে কোনও বিশিষ্ট লোক সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তাঁহার ও আমার পরিবার, মোগলসরাইর একটা প্রকাণ্ড স্তম্ভের আড়ালে বসিয়া কাশীর ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় ষ্টেশনের এক পাল 'ইয়ার' আসিয়া, তাঁহাদের পার্শ্বে চক্রকারে দাঁড়াইয়া রসিকতার হাট বসাইলেন। ধীরাজ ইহাদের কি তৈলচিত্রই আঁকিয়াছিলেন—

"শালাদের দুষ্মন চেহারা সব দেখ্‌তে পাই।
হাবড়া হ'তে দিল্লী যেতে
আলপাকার চাপকান গায়ে ষ্টেশনে দাঁড়ায়ে ভাই।"

আমরা দূরে দূরে থাকিয়া এ রঙ্গ দেখিতেছি। এমন সময়ে কাশীর ট্রেন আসিল। ভবুয়ার কয়েকজন জমিদার আমাকে দেখিয়া 'ডেপুটি সাহেব! ডেপুটি সাহেব!' বলিয়া ছুটিয়া সেলাম করিলে, ইয়ারের দল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চম্পট দিলেন। উক্ত বাবুটি আমাকে বলিলেন—"মহাশয়! আপনি বড় একটা রসভঙ্গের কার্য্য করিলেন।" কিন্তু ইহাতেও অব্যাহতি পাইলাম না। ট্রেনে যে কক্ষে আমাদের পরিবারেরা উঠিলেন, তাহার পার্শ্বের কক্ষে আবার এক ইয়ারের দল দেখা দিলেন। সকলের শিরে সুরাদেবী অধিষ্ঠিতা। এক একবার মুখ বাড়াইয়া কক্ষস্থ রমণীদের প্রতি অপাঙ্গবিস্ফারিত কটাক্ষক্ষেপ করিতেছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র গান ও রসিকতা চলিতেছে। সঙ্গী বাবু একবার নিষেধ করিলে অভিনয়টা আরও ঘোরাল হইল। তখন আমি 'গার্ড' ডাকিয়া এ অভিনয় দেখাইলাম। স্বদেশীয় ভদ্রলোকের ইতরতা নিবারণ করিতে নালিস করিলাম একটি সামান্য ইংরাজ 'গার্ডে'র কাছে! ইহার অপেক্ষা আমাদের আর গৌরবের কথা কি হইতে পারে? সে আসিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া তাহাদিগকে ট্রেন হইতে নামাইয়া দিল। অর্দ্ধচন্দ্রের বেগে কেহ কেহ প্ল্যাটফর্ম্মে উপুড় হইয়া পড়িলেন। ট্রেন খুলিল এবং আমরা নির্ব্বিঘ্নে কাশী পঁহুছিলাম।

তখন বাবু লোকনাথ মৈত্র, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কাশীর একজন খ্যাতনামা বাঙ্গালী। প্রথম বারেই তাঁহার সঙ্গে পরিচিত ও তাঁহার স্নেহভাজন হই। এমন মধুর-

ভাষী ও স্নেহপরায়ণ ব্যক্তি আমি কম দেখিয়াছি। তিনি চিকিৎসা উপলক্ষে আমার স্ত্রীকে দর্শন করেন, এবং মাতৃসম্বোধন করেন। সে অবধি তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। প্রথম বার ভূকৈলাসের রাজার বাড়ীতে,—অতি মনোহর অট্টালিকা,—তাহার পর একবার লোকনাথবাবুর বাড়ীতে ছিলাম। এবার স্ত্রী 'রাণামহলে' উঠিয়াছিলেন। গৃহটি গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়াছে, এবং যদিও বড় ভাল নহে, ইহার তিনদিকে গঙ্গার শোভা বড় মনোহর। আমাদের গৃহের নিম্ন হইতে অনেকে মিলিয়া সন্তরণ করিয়া, লোকনাথবাবুর ঘাটে যাইয়া উঠিতাম। কখন বা সে ঘাট হইতে আমাদের গৃহে সন্তরণ করিয়া আসিতাম। স্মরণ হয়, সপ্তাহকাল কাশীতে ছিলাম, এবং লোকনাথবাবুর আদরে বড় সুখে কাটাইয়াছিলাম। নবীন জীবন। সংসার তখন যেন আনন্দভবন বলিয়া বোধ হইত। সুখ যেন চারিদিকে উছলিয়া পড়িত। সপ্তাহ পরে কাশীস্থ বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সাশ্রুনয়নে বিদায় লইয়া কলিকাতায় আসিলাম, এবং সেখানে দুই একদিন থাকিয়া চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম।

চট্টগ্রাম

শ্বেতে কৃষ্ণে

১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল, বৈশাখী বসন্তানিলে মৃদু আন্দোলিত বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রাম পঁহুছিলাম। আত্মীয়বর্গ খুব সমাদরে বাষ্পীয় তরণী হইতে অবতরণ করাইলেন। সমুদ্রগর্ভ হইতে দৃশ্য-চিত্রের মত চট্টগ্রাম নগরের সৌধ-কিরীট-খচিত শোভা সন্দর্শন করিয়া অবধি আমার চক্ষে জলধারা বহিতেছিল। জন্মভূমিতে উচ্চপদস্থ হইয়া আসিতেছি,—কিন্তু আমার জনক জননী কোথায়? যাঁহাদের হৃদয় আজ প্রকৃত আনন্দে অধীর হইত, আজ আমার সেই প্রেমপ্রতিম জনক ও প্রেমপ্রতিমা জননী কোথায়; জন্মভূমি আজ আমার পক্ষে যে মহাশ্মশান! অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে বাষ্পীয় পোত হইতে তরীতে, তরী হইতে তীরে আসিলাম। পৈতৃক বাসাবাটীর অংশ পর্য্যন্ত পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার ঋণের জন্য বিক্রয় হইয়াছে। পিতৃব্যেরা উহা কিনিয়াছিলেন। তাঁহারা উদারতার সহিত উহা যথামূল্যে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন, এবং সেখানে গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্থানটির উপর আমার চিরবিদ্বেষ ছিল। আশৈশব শুনিতে-ছিলাম—উহা একটি অপদেবতার বিহারভূমি। শৈশবে যে ভীতি হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তাহা পূর্ণরূপে কখন অপসারিত হয় না। পিতৃব্যগণ প্রায় সকলেই এ বাসাতে ওলাউঠায় অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এক এক জনের মৃত্যুর শোকময় দৃশ্য আমার হৃদয়ে চিত্রের মত প্রকটিত রহিয়াছে। এ বাসাতে একটি বংশের অধঃপতন ঘটিয়াছে। স্থানটিও অতি কদর্য্য, ভিজা, সেঁৎসেঁতে। আমি এক রাত্রি মাত্র এক পিতৃব্যের বাসাবাটীতে অতিবাহিত করিয়া, বর্ত্তমান নব বিধান সমাজের পশ্চাতে একটি বাসা ভাড়া করিয়া, কিছুদিন সেখানে থাকি। তাহার পর প্রধান মুসলমান জমিদার ফজল আলি খাঁর কুঠী ভাড়া করি।

মিঃ ক্লে (A. St. Clay) তখন চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট কলেক্টর। তিনি ও আমি এক ষ্টীমারে আসি। কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই তিনি আমাকে মফঃস্বল যাইতে আদেশ করেন। আমি পাঁচ মাস ভবুয়াতে মফঃস্বল পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। এ কারণে বিনীতভাবে অব্যাহতির প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু ক্লে সাহেব বিনয়ে বশীভূত হইবার পাত্র নহেন। শুনিয়াছি, এক সিভিলিয়ানের ভৃত্য-প্রহার রোগ ছিল। অনেকেরই আছে। আর সহ

করিতে না পারিয়া, একদিন একজন ভৃত্য তাঁহাকে প্রতিপ্রহার করিতে আরম্ভ করে। তিনি ঘা কতক খাইয়া বলেন।—"বহুত হুয়া, বস্।" তাহার পর ভূতল হইতে উত্থিত হইয়া ভৃত্যকে পারিতোষিক প্রদান করেন এবং সেদিন হইতে ভৃত্যদের প্রতি শিষ্টাচার অবলম্বন করেন। ক্লে সাহেবও সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি উত্তরে লিখিলেন—আমাকে নিশ্চয় মফঃস্বল যাইতে হইবে। আমি অগত্যা যাইতে স্বীকৃত হইয়া তাঁবু চাহিলাম। তাহার উত্তরেও কর্কশ ভাষায় লিখিলেন, যে, এখানের ডেপুটি কলেক্টরেরা কখনও তাঁবু পায় নাই। আমিও পাইব না। আমিও তখন একটুক সুর চড়াইয়া লিখিলাম যে, গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে তিনি আমাকে তাঁবু দিতে বাধ্য। অন্য ডেপুটি কলেক্টরেরা প্রায়ই বিদেশী ও পুরাতন সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহারা লোকের দেউড়ি ঘরে গিয়া থাকেন। আমি স্বদেশে সেরূপ থাকিতে গেলে আমার পদ-গৌরব ও বংশ-গৌরব রক্ষিত হইবে না। এবার শিমুলস্তূপে অগ্নিক্ষেপ হইল। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া লিখিলেন—"আপনি আমার আদেশ মানিবেন কি না?" আমি লিখিলাম—আমাকে তাঁবু না দিলে আমি মানিব না, এবং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, আমার পত্র কর্ম্মত্যাগের পত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া, গবর্ণমেণ্টে উভয়ের পত্রাবলী সহ প্রেরণ করিতে পারেন। তখন ক্লে সাহেব বলিলেন—"বহুত হুয়া, বস্।" লিখিলেন—"আপনাকে তাঁবু দেওয়ার জন্য নাজিরকে আদেশ করিয়াছি। আপনার শেষ পত্রখানি অযথা অসম্মানব্যঞ্জক। আপনি উহা প্রত্যাহার করিবেন।" আমি উহা প্রত্যাহার করিলাম। তখন তিনি লিখিলেন—"আপনার এখন মফঃস্বল যাইবার প্রয়োজন নাই।" আফিসময় একটা হাসি পড়িয়া গেল। শিবলাল তেওয়ারি তখন কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টার, আমার পিতার বন্ধু ও অতিশয় বিচক্ষণ লোক। তিনি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বাপ্‌কা বেটা! ক্লে সাহেবকে জব্দ করিতে পারে, এমন লোক যে কেহ আছে, আমার বিশ্বাস ছিল না। যাহা হউক, তুমি সার্টিফিকেট পাইয়াছ ভাল।" সাহেব বলিয়াছেন—"He seems to be a firebrand"—'লোকটা একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বোধ হইতেছে।'—এই যে ফেউ ডাকিল, চট্টগ্রামের সকল ফেউ বা সিবিলিয়ান এ ডাক ধরিলেন এবং ক্রমশঃ উহা ব্যাপ্ত হইল। আমার চাকরির শেষ পর্য্যন্ত এ ডাক প্রভুদের মুখে ছিল।

তাহার কিছুদিন পরে আবার আর এক লড়াই (pitched battle) উপস্থিত হইয়া এ খ্যাতি আরও স্থায়ী করিয়া দিল। বলিয়াছি, ভবুয়াতে আমি কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ হইয়াছিল। কত ঘোড়া সেখানে কিনিয়াছিলাম ও বেচিয়াছিলাম। শেষে আসিবার সময়ে একটি কাঠিওয়ার ও একটি হিন্দুস্থানী (country bred) ঘোড়া লইয়া আসিয়াছিলাম। প্রথমটির নাম ছিল 'বিদ্যুৎ' (Lightning); দ্বিতীয়টির নাম 'রামলোচন'। উহা রামলোচন নামক একজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর হইতে কিনিয়াছিলাম। প্রথমটি ধূসরবর্ণ, দ্বিতীয়টি গোল সবজা (কৃষ্ণ গোলাপী)। দুইটি ঘোড়ারই চট্টগ্রামে খুব নাম পড়িয়া গিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রথমটি যে দিকে যাইত, দেখিবার জন্য লোক দাঁড়াইয়া যাইত। ঘোড়াটি এমন সুন্দর বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, নাচিতে নাচিতে চলিত, তাহার আকৃতি এত সুন্দর, এবং তাহার এমন বিদ্যুৎগতি যে, উহা প্রকৃতই দেখিবার যোগ্য ছিল। তাহার উপর আবার 'সার্কাসে'র ঘোড়ার মত শিক্ষিত ছিল। চক্রে, চারি অঙ্কে এরূপ সুন্দর চলিত, আদেশমত এমন সুন্দর নৃত্য করিত। নক্ষত্রবেগে ছুটিতেছে, এমন সময়ে আদেশ করিলে সম্মুখের দুই পায়ের উপর বসিয়া পড়িত, এবং আমি মাথার টুপি বা চাবুক ফেলিয়া দিয়া উঠাইয়া লইলে, তৎক্ষণাৎ আবার নক্ষত্রবেগে ছুটিত। আমি হাঁটিয়া যাইতেছি, ঘোড়া গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া বুক চাটিতে চাটিতে নৃত্যের মত পা ফেলিয়া আমার পশ্চাতে চলিয়া যাইতেছে। যদি বলিলাম—"যাও বেটা, ঘর্ যাও।" অমনি ছুটিয়া আস্তাবলে গিয়া উপস্থিত হইত। কোথায় বসিয়া আছি, "খাড়া রও বেটা" বলিলে প্রাঙ্গণে গ্রীবা-ভঙ্গী করিয়া

দাঁড়াইয়া বৃক্ষ চাটিতে থাকিত। এজন্য কখনই সঙ্গে সহিস রাখিতে হইত না। ঘোড়াটির এমন নাম পড়িয়া গিয়াছিল যে, স্বয়ং কমিশনার সাহেবের পক্ষ হইতে পাঁচ শত টাকাতে উহা ক্রয় করিবার প্রস্তাব আসিয়াছিল।

অন্নদা আমার সম্পর্কে খুড়া, কিন্তু সমবয়স্ক ও পরম বন্ধু। তাহার একটি অতি সুন্দর 'ওয়েলার' ঘুড়ী ছিল। বর্ণ লাল। আমরা দুজনে প্রায় একরূপ পোষাক পরিয়া পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতাম। লোকে বলিত 'মাণিকযোড়'। একদিন আফিস হইতে দুজনে এরূপ পাশাপাশি ঘোড়া ছুটাইয়া আসিতেছি, ডিস্‌পেন্সারির সম্মুখে রাস্তার কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ডাক্তার সাহেব 'এলেন'। তখন পুরাতন ডিস্‌পেন্সারির পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল। তিনি দাঁড়াইয়া উহা দেখিতেছিলেন। বেলা প্রায় পাঁচটা। শীতকাল। দুইটি বাঙ্গালী এরূপ দুই সুন্দর অশ্বে এরূপ বীরভাবে চড়িয়া যাইতেছে, আর তিনি তাঁহার পক্ষিরাজ ঘোটকের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উহা দেখিতে থাকিবেন,—এ দৃশ্য কি কখনও গৌরাঙ্গের প্রাণে সহ্য হইতে পারে? আমরা তাঁহার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছি, অন্নদা আমার অপর পার্শ্বে, তিনি ছুটিয়া আসিয়া, চোক রাঙ্গাইয়া, কি বলিয়া একটি ক্ষুদ্র ছড়ি দিয়া আমার ঘোড়ার মুখের উপর আঘাত করিলেন। ঘোড়া লাফাইয়া উঠিয়া তীরবেগে ছুটিল। আমার তেজস্বী ঘোড়া; হাতে চাবুক রাখিবার প্রয়োজন হইত না। অতি কষ্টে ঘোড়া থামাইয়া, ফিরিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"What the devil you struck my horse for?" তিনি "You! You!" বলিয়া ছুটিয়া আমার নিকট আসিলে, শ্বেত ও কৃষ্ণ বর্ণের রাসায়নিক আকর্ষণে আমার বটুমণ্ডিত দক্ষিণ পাদপদ্ম স-রেকাব তাঁহার বক্ষে উপর্যুপরি দুইবার সংশিষ্ট হইল। তিনি বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমার ঘোড়া আবার ছুটিয়া গেল। কিছুদূরে গিয়া, ঘোড়া থামাইয়া আমরা দুজনে ফিরিলাম। তিনি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে ফোঁস্ ফোঁস্ করিতেছেন। অনেক লোক জমিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন—"You, you, Nigger, you hit me"—"তুমি, তুমি, ঘৃণিত দেশী লোক, আমাকে আঘাত করিলে?" আমিও তদুপযোগী বাক্যামৃত বর্ষণ করিয়া বলিলাম যে—"তোমার ভাগ্য ভাল, আমার হাতে চাবুক নাই। তুমি এ যাত্রা অল্পে অল্পে পার পাইয়া গেলে।" আমি ঘোড়া চড়িয়া চলিয়া আসিলাম।

তিনি প্রথম পুলিসে গিয়া নালিশ করিলেন যে, আমি তাঁহাকে 'চাবুক দিয়া' অকারণ মারিয়াছি। কৃষ্ণাঙ্গের পদাঘাত সাদা মুখে কেমন করিয়া স্বীকার করিবেন? পুলিস বলিল, 'মারপিট' পুলিসের গ্রহণীয় অপরাধ নহে। তখন তিনি কমিশনরের ঘরে গেলেন। তাঁহার আদেশমতে সেখান হইতে ম্যাজিষ্ট্রেট ক্লে সাহেবের ঘরে গেলেন। সন্ধ্যার সময়ে সেখানে সাহেবদের একটি 'প্রিভি-কাউন্‌সিল' বসিল। ক্লে সাহেব বাঘ শিকার করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু বাঘ তাঁহাকে শিকার করিয়াছিল। তিনি ভূমিতলে দাঁড়াইয়া বাঘকে গুলি করেন। তাঁহার লক্ষ্যটি ঠিক 'পিকউইক সভা'র শিকারসভ্য মহাশয়ের মত ছিল। গুলি বাঘে লাগিল না। বাঘ ছুটিয়া আসিলে, তিনি তাহাকে বন্দুকের বাঁট দিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করেন। বাঘ তাঁহার দক্ষিণ হস্তে দাঁত বসাইয়া দেয়। উভয়ের মধ্যে এরূপ মল্ল-যুদ্ধের পর বাঘ চলিয়া যায়। এ ঘটনা হইতে ক্লে সাহেব এ অঞ্চলে 'বলী কলেক্টর' উপাধি প্রাপ্ত হন। এ সময়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অকর্ম্মণ্য ছিল। রাত্রি অনুমান দশটার সময়ে তাঁহার বাম হস্তের লিখিত এক পত্র পাইলাম—আমি কেন অসাবধানে (rashly) অশ্ব চালাইয়া ডাক্তার সাহেবের উপর গিয়া পড়িয়াছিলাম এবং তাঁহাকে 'আক্রমণ' করিয়াছিলাম চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। বুঝিলাম, সাহেবদের পরামর্শে স্থির হইয়াছে যে, কৃষ্ণাঙ্গ বাঙ্গালীর পদাঘাত দূরে থাকুক, কশাঘাত স্বীকার করাও শ্বেতাঙ্গের পক্ষে ঘোরতর অবমাননার কথা। অতএব অসতর্ক অশ্বচালন (rash driving) ও সাদা-সিদা আক্রমণ (assault) বলিলেই পেনেল কোডের ২৪৯ এবং ৩৫২ ধারার অপরাধ হইবে।

এদিকে সহরময় হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে যে, আমি ডাক্তার সাহেবকে মারিয়াছি। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত আমার বাসা লোকপূর্ণ। যুবকেরা বলিতেছেন—"বেশ করিয়াছ।" প্রাচীনেরা বলিতেছেন—"কাজটি ভাল কর নাই। সাহেবী চক্রান্তে ঘোরতর বিপদে পড়িবে। ফৌজদারিতে শাস্তি দিয়া পদচ্যুত করিবে। ডাক্তার সাহেবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" ইহাঁদের মধ্যে দুই একজন সাহেবদের গুপ্তচর বলিয়া আমার সন্দেহ হইয়াছিল।

প্রাতে উঠিয়া আমি এই মর্ম্মে কৈফিয়ৎ দিলাম—"আমি অসতর্ক ভাবে অশ্ব চালাই নাই। যেরূপ সর্ব্বদা চালাইয়া থাকি, সেরূপ চালাইয়াছিলাম। ডাক্তার সাহেব অকারণে আমার ঘোড়াতে আঘাত করেন ; তিনি জানেন যে, এরূপ অবস্থায় ঘোড়াকে সম্মুখ হইতে মুখের উপর আঘাত করিলে আরোহীর জীবনের বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। ঘোড়া আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ লাফাইয়া উঠিয়াছিল, আমি দৈবানুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছি। অতএব ডাক্তার সাহেবই অশ্বকে আঘাত করিয়া অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য আইনের আশ্রয় অবলম্বন করিব কি না, বিবেচনা করিতেছি।" আবার সাহেবী কাউন্‌সিল বসিল। হাসিবার কথা—মিউনিসিপাল ওভারসিয়ার রিপোর্ট করিলেন, আমি লোকের জীবনবিঘ্নকর বেগে সর্ব্বদা বৃহৎ অশ্ব চালাইয়া থাকি এবং তদ্দ্বারা মিউনিসিপাল রাস্তা নষ্ট করিতেছি! বলা বাহুল্য, ইনি চট্টগ্রামী মুসলমান। ক্লে সাহেব কমিশনরের কাছে এক দীর্ঘ রিপোর্ট করিলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"আমি যে সর্ব্বদা অসতর্কভাবে অশ্ব পরিচালন করিয়া থাকি, তাহা মিউনিসিপাল ওভারসিয়ারের রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণিত। ঘটনার দিন এরূপ ভাবে অশ্ব চালাইয়া আমি ডাক্তার সাহেবের উপর গিয়া পড়ি এবং তিনি তাঁহার হস্তস্থিত ক্ষুদ্র ছড়ির দ্বারা নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে আক্রমণ (assault) করি এবং গালি দি। এরূপ ব্যক্তিকে এরূপ উচ্চ রাজপদে রাখা উচিত নহে। অতএব আমাকে পদচ্যুত করিবার জন্য কমিশনর গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন।" সেই গুপ্তচরদের তখন আর আনন্দ হৃদয়ে ধরে না। তাঁহারা অতিশয় বিজ্ঞতার সহিত বলিতে লাগিলেন—"কেমন, আমরা বলিয়াছিলাম না যে, ক্ষমা না চাহিলে বিপদে পড়িবে? এ বয়সে এত বড় একটি পদ হারান কি সামান্য দুঃখের কথা?" শুধু ইহারা বলিয়া নহে। চট্টগ্রামবাসীর মত এমন পরশ্রীকাতর লোক বুঝি আর ভূভারতে নাই। পরের সুখের তুল্য দুঃখ, এবং পরের দুঃখের তুল্য সুখ, ইহাদের কাছে এমন আর কিছু নাই। আমি এত বড় বিপদ্ কাটাইয়া, এরূপ উচ্চপদস্থ হইয়াছি, ইহাতে অনেকেরই মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল। যদিও ইঁহারা মুখে সহানুভূতি দেখাইতেছিলেন, কিন্তু দেখিলাম, আমার পদচ্যুতির সম্ভাবনায় অনেকেই অন্তরে পরম সুখী। এমন কি, পরামর্শ করিব, এমন একটি লোক পাইতেছিলাম না। যাহা হউক, মনে মনে স্থির করিলাম যে, কমিশনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম, তাঁহার মুখ ম্লান ও গম্ভীর হইল। কমিশনর সাহেব বড় বিষম তোৎলা ছিলেন। আমি বসিবামাত্র কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"Wha—wha—wha—what—d—d—do you want? —"তু—তু—তু—মি কি চা—চা—চাহ?"

আমি। ডাক্তার সাহেব এলেনের ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি কি করিবেন, তাহা জানিতে চাহি।

উ। আমি তোমাকে বলিতে বাধ্য নহি।

আমি। না। তবে আমি আপনাদের অধীনস্থ কর্ম্মচারী। আপনাদের ভয়ে আমি ডাক্তার এলেনের নামে এ পর্য্যন্ত নালিশ করি নাই। কিন্তু আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না। আমি কেবল উচ্চপদস্থ নহি, আমি এ স্থানের উচ্চবংশজ। ফৌজদারীতে নালিশ করিলে, আমার আত্মীয়গণ, সুবিচার পাইব কি না, সন্দেহ করেন। ডাক্তার এলেন

সাহেব আমাকে অযথা আক্রমণ করিয়া আমার যে সম্মানের ক্ষতি করিয়াছেন, তজ্জন্য দশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণের দেওয়ানী নালিশ করিতে আমার আত্মীয়গণ জিদ করিতেছেন।

সাহেব বারুদস্তূপের মত জ্বলিয়া উঠিলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া, দাঁড়াইয়া—ক্রোধে তোৎলামির মাত্রা নব্বুই ডিগ্রি বাড়িয়া গেল—বলিলেন—"Y—y—you—s—s sue D—d—doctor Allen—G—g—g good bye—তু—তু—তুমি ডা—ডা—ডাক্তার এলেনের নামে না—না—নালিশ করিবে! গু—গু—গুড্ বাই।"

তিনি মহাক্রোধের এরূপ অভিনয় করিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। আমি গৃহে ফিরিলাম। সেদিন অপরাহ্নে সংবাদ পাইলাম যে, কমিশনর মাজিষ্ট্রেটের রিপোর্টের উপর 'file' (সেরেস্তায় থাকে) বলিয়া আদেশ দিয়াছেন, এবং তাহার পরদিন শুনিলাম, ডাক্তার এলেন তারযোগে ছয় মাসের ছুটি লইয়া সেই দিন বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। আজ এরূপ ঘটনা হইলে আমি নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইতাম এবং পদচ্যুত হইতাম। গবর্ণমেণ্টের কি পরিবর্ত্তন!

এ ব্যাপার ত এরূপে শেষ হইল। কিন্তু ক্রে সাহেবের আক্রোশ তাহাতে থামিল না। তাহার কিছুদিন পরে কোনও জমিদারের গাড়ীতে প্রাতে সদরঘাট হইতে আসিতেছি। ক্রে সাহেবের তখনই আফিস আরম্ভ হইয়াছে। বর্ম্মাপনির জুড়ী। গাড়ী কিছু বেগে চলিতেছিল। তিনি গবাক্ষ দিয়া দেখিলেন, আর তখনই আমাকে পাকড়াও করিতে কনেষ্টবল একজন ছুটাইলেন। আমি বাঙ্গালী পোষাকে তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম বলিয়া ক্ষমা চাহিলে তিনি সেই গোঁয়ার-গণেশ ভাবে বলিলেন—My, good man Sir, why were you driving in that rash manner—you are a Deputy Magistrate—you know rash driving is an offence—হে ভালমানুষ মহাশয়! আপনি কেন এরূপ অসাবধান-ভাবে গাড়ী চালাইতেছিলেন? আপনি নিজে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট। আপনি জানেন, উহা একটি অপরাধ।"

আমি। তাহা জানি। কিন্তু গাড়ী যে অসাবধান বেগে চলিতেছিল, আমি তাহা অনুভব করি নাই। বিশেষতঃ গাড়ীও আমি চালাইতেছিলাম না; কোচম্যান চালাইতেছিল। গাড়ীও আমার নহে।

ক্রে। আপনি কৈফিয়ৎ দিতে বড় পটু। যাহা হউক, আমি এবারও ক্ষমা করিলাম। ভবিষ্যতে আর করিব না।

আমি ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম। এ দৃশ্য দেখিয়া ও আলাপ শুনিয়া, আড়ালে দাঁড়াইয়া আমলাগণ হাসিতেছিল।

ইহার কিছুদিন পরে অন্নদার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হতভাগ্য খুড়া ত্রিপুরাচরণ রায় এক ফৌজ-দারী মোকদ্দমায় পড়েন। সন্ধ্যার সময়ে জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট জামিনের হুকুম দিয়াছেন। তখন কোথায় লোক পান। কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার শিবলাল বাবু আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আমি জামিন না হইলে ত্রিপুরাবাবু জেলে যান। আমি জামিন হইলাম। অমনি পরদিন প্রাতে ক্রে সাহেব আমার বিরুদ্ধে আর এক দীর্ঘ রিপোর্ট কমিশনরের কাছে পাঠাইলেন। তখন কক্‌রেল (Mr. H. A. Cockrell) কমিশনর। আবার বিপদে পড়িয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি বলিলেন—"তুমি বিচারক হইয়া, কেমন করিয়া একজন আসামীর জামিন হইলে?"

আমি। কোনও আত্মীয় বিপদে পড়িলে তাঁহার সাহায্য করা মানুষের ধর্ম্ম। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী হইলে আমাদের দয়াধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে, ভরসা করি, আপনাদের মত সদাশয় ব্যক্তি এরূপ বলিবেন না।

কক্‌রেল। মোকদ্দমাটি তোমার কাছেও ত বিচারের জন্য যাইতে পারে?

আমি। বরং আমি জামিন হইয়াছি বলিয়া তাহা অসম্ভব।

তিনি তখন কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"ভবিষ্যতে আর এরূপ করিও না।" আমি তাঁহাকে প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

কবিতে কবিতে

এ সকল ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে আমি ফজল আলি খাঁর কুঠীতে আসি। বলিয়াছি, খাঁ সাহেব চট্টগ্রামের সর্ব্বপ্রধান মুসলমান জমিদার, কিন্তু বিচিত্র লোক। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা আফগানিস্থানের দিক্ হইতে আসিয়াছিলেন। তিনি এবং আর একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, এক হাজার সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া চট্টগ্রাম আসেন, এবং শঙ্খনদের উত্তর তীরে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। সেইজন্য গ্রামটির নাম 'দোহাজারি' হয়। খাঁ সাহেবের রক্তে এখনও প্রভু কাবুলি ভাব ছিল। বাকি খাজনার নালিশ হইয়াছে। কর্ম্মচারী প্রমাণস্বরূপ দাখিল করিবার জন্য কবুলিয়ত চাহিল। খাঁ সাহেব তাহা কিছুতেই দিবেন না। কর্ম্মচারী বলিল—"না দিলে প্রমাণাভাবে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া কবুলিয়ত রহিত হইয়া যাইবে।" তিনি চটিয়া লাল। বলিলেন—"কি! কবুলিয়ত আমার বাক্সে রহিয়াছে ; মুন্সেফের বাপের কি সাধ্য, তাহা রহিত করিবে?" তাঁহার কুঠীটির অতিশয় শোচনীয় অবস্থা। সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়াছে। সমস্ত ঘরে জল পড়ে। পরগাছা উঠিয়া দেয়াল ও ছাদ ফাটিয়া গিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, হইবারও জো নাই ; কারণ, তিনি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত তাঁহার গ্রামস্থ বাটীর একটি ঘরে থাকেন। তাহার বাহিরে পর্য্যন্ত কখনও পদার্পণ করেন না। অতএব স্থির করিলাম, তাঁহাকে পত্র লিখিব। কিন্তু সেও বড় সহজ ব্যাপার নহে। তিনি পার্শিতে খুব 'লায়েক' হইলেও বাঙ্গালা কিছুই জানেন না। বাঙ্গালায় একখানি পত্র লিখিয়া, তাহা পার্শিতে অনুবাদ করিয়া পাঠাইতে সংকল্প করিলাম। কিন্তু অনুবাদ করে কে? তখন কালেক্টারির বৃদ্ধ মোহরার রমজান আলি মুন্‌সীকে মনে পড়িল।

এ মুন্‌সী সাহেবও আমাদের চট্টগ্রাম স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক মুন্‌সী সাহেবের দ্বিতীয় সংস্করণ। তাহার বিশ্বাস যে, সে একজন বড় 'লায়েক' লোক। শুধু তাহা নহে, সে একজন কবি। তাহার কবিত্বের নমুনা—

> "ঢেম শুয়োর বল সাহেব তাহে নাহি ডর।
> চাবুক হাতে লড় চড় তাহে লাগে ডর॥"

আমরা তাহাকে লইয়া ও তাহার কবিতা লইয়া বড় আনন্দ করিতাম। তাহাতে তাহার কবিত্বের প্রতি তাহার বিশ্বাস আরও অটল হইয়া উঠে। যাহা হউক, আমার বাঙ্গালা পত্রখানি পার্শিতে অনুবাদ করিয়া দিবার জন্য মুন্‌সী সাহেবকে দিলাম। এক দিন, দু দিন, চারি দিন, এরূপে সপ্তাহ গেল। তিনি বলেন, কিছু বাকি আছে। অবশেষে আর একদিন জুব্বা পরিহিত হইয়া আমার বাসায় উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"ফজুল আলি খাঁ একজন সায়ের (কবি) এবং পার্শিতে বড় লায়েক। অতএব আপনি যেরূপ সিদা সাদা পত্র লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার পছন্দ হইবে না। তাঁহার কাছে পত্র লিখিতে মুন্‌সীয়ানা চাহি। আমি একটি পার্শি কবিতা লিখিয়া আনিয়াছি। ইহাই পাঠাইয়া দেন।" তাহার পর গলা ফুলাইয়া, মুখের ও কণ্ঠের নানারূপ বিকৃত ভঙ্গীর সহিত 'আয়েন গায়েনে'র অপূর্ব্ব উচ্চারণ করিয়া পড়িতে লাগিলেন, এবং আমাকে বাঙ্গালায় তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। পৃষ্ঠা চার পাঁচ কেবল উপরোক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী ও পিঞ্জরাবদ্ধ খাঁ সাহেবের গুণকীর্ত্তনে পরিপূর্ণ। তাহা স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত তোষামোদ বলিয়া

পরিগণিত হইতে পারে। তাহার পর কয়েক পৃষ্ঠা বাড়ীটির শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা। উহার শেষ ভাগে লেখা আছে যে, বাড়ীর দেওয়ালে এরূপ বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে যে, তাহার শিকড় পাতালে গিয়াছে, এবং অগ্রভাগ আকাশেরও উপরে উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি ভূমিকম্প হয়, কেবল বাড়ীটি ধ্বংস হইবে, তাহা নহে—পৃথিবীটা শুদ্ধ উল্টিয়া পড়িবে। গম্ভীর ভাবে এ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, নাসিকাগ্র হইতে চশমা নামাইয়া বলিলেন—এখনও কবিতাটি শেষ হয় নাই। আমি বড় পীড়াপীড়ি করিতেছি বলিয়া, যতটুকু লেখা হইয়াছে, আমাকে শুনাইতে আসিয়াছেন। আমি দেখিলাম, ঘোরতর আতঙ্কের কথা—এ বাড়ীটির জন্য পৃথিবীটা পর্য্যন্ত একদিন ধ্বংস হইবে। অথচ পত্র এখনও শেষ হয় নাই। শেষ হইতে হইতে বোধ হইল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা পর্য্যন্ত ধ্বংস হইতে পারে। কারণ, বৃক্ষের শিকড় পাতালের নীচে ও অগ্রভাগ আকাশেরও উপরে উঠিয়াছে। অতএব মুন্সী সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা ধ্বংস করিয়া কাজ নাই। যদি বাড়ীটা এরূপই থাকে, তবু একটুক থাকিবার স্থান পাইব। পৃথিবীটা উল্টাইয়া গেলে কোথায় থাকিব! আপনার আর ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। আমি খাঁ সাহেবকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিব।" মুন্সী সাহেব একেবারে আকাশ হইতে পাতালে পড়িলেন এবং স্তম্ভিত ভাবে আমার দিকে চশমার উপর দিয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। এমন কবিত্বশক্তিটার জন্য তিনি মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, আমি কতই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব। আমি যে আমার স্থূলবুদ্ধিতে উহা একেবারে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, এ দুঃখে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। জগতের মহাকবিদিগের এরূপ দুর্গতির দৃষ্টান্ত অল্প নহে। এ সময়ে আর একজন মহাকবি আমাকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার কবিতা লিখিতে বড় সাধ হইয়াছে। তিনি এক লাইন লিখিয়াছেনও, তবে দ্বিতীয় লাইন স্থির করিতে পারিতেছেন না। লাইনটা এই—

"পিরীতির পেরাক প্রাণে ফুটেছে আমার।"

আমি অপর লাইনটা লিখিয়া পাঠাইলাম—

"কবিতা রচনা তবে হবে না তোমার।"

মুন্সী সাহেব বড় বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। মুখের ভাবটা এরূপ—শূকরের কাছে মুক্তা ছড়াইতে নাই।

"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।"

যাহা হউক, আমি খাঁ সাহেবকে বাঙ্গালায় পত্র লিখিলাম যে, বাড়ীটি হয় আমাকে তালুক করিয়া দিন, আমি মেরামত করি; না হয় তিনি মেরামত করিয়া আমাকে নিয়মিত ভাড়া দেন। তিনি একজন কর্ম্মচারীর দ্বারা কেবল বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি উভয় প্রস্তাবে অসম্মত। তবে আমার যত দিন ইচ্ছা, বাড়ীতে থাকিতে পারি। তখন অগত্যা কি করিব, একটা ভাড়া স্থির করিয়া এবং তদ্দারা প্রয়োজনানুরূপ সংস্কার করিয়া এ বাড়ীতেই রহিলাম।

কবিতে অকবিতে

এ সময়ে দেবীদাস দত্ত আসিয়া আমার সঙ্গে জুটিল। দেবীদাস আমার পিতৃদেবের সময় হইতে কলেক্টারিতে মোক্তারি করিত। সে আমাদের বাসায় থাকিত। পিতা তাহার অপূর্ব্ব চরিত্র দেখিয়া, তাহার অপূর্ব্ব আলাপ শুনিয়া হাসিতেন এবং তাহাকে বড় ভালবাসিতেন। দেবীদাস দত্ত বাস্তবিকই একজন ছোটখাট ভাড়ু দত্ত। তাহার অফিসিয়েল পোষাক ধুতি, তাহার উপর আ-চরণবিলম্বিত সাদা দীর্ঘ চাপকান; মাথায় থান কাপড়ের

এক প্রকাণ্ড পাগড়ি। তাহা বাঁধিবার সময়ে ক্ষুদ্র এক আর্শির সমক্ষে বসিয়া মুখের ভঙ্গীই বা কতরূপ! সে সকল ভঙ্গী দেখিলে কাঠখানিও না হাসিয়া থাকিতে পারিত না। এই অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া দেবীদাস যখন তাহার মোক্তারি কার্য্যে যাত্রা করিত, তাহা দেখিলে বাবা পর্য্যন্ত না হাসিয়া গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। অবশ্য তাঁহাকে কিছু বলিবার জো ছিল না; কিন্তু অন্য কেহ হাসিলে দেবীদাস ক্রোধে অস্থির হইয়া, মুখের বিকৃত ভঙ্গী করিয়া বলিত—"কি রে বেটা! হাসিলি কেন! বেল্লিক!" তাহার পর মোক্তারি মাথায় থাকুন, উক্ত অপরাধীর সঙ্গে তাহার দুই ঘণ্টা কাল বাক্‌বিতণ্ডা। দেবীদাস প্রমাণ করিবে যে তাহার মত সুপুরুষ ভুভারতে নাই, এবং সে পোষাকের তুলনাও নাই, উহাতে তাহার আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে। প্রায় দুই ঘণ্টা তর্কের পর হাস্যকরী বিপক্ষকে পরাস্ত করিয়া দেবীদাস 'দুর্গা, দুর্গা' বলিয়া যাত্রা করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে একজন নাকে কাঠি দিয়া হাঁচিল। দেবীদাস একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া ফিরিল, এবং বলিল—"বেটা বেল্লিক! তুই আমার যাত্রার সময়ে হাঁচিলি কেন?" আবার দুই ঘণ্টা গালি দিয়া এবং তর্ক করিয়া, সেই হাঁচিটা যে একটা গুরুতর অপরাধের কার্য্য হইয়াছে, তাহা সাব্যস্ত করিয়া, অবশেষে দেবীদাস 'দুর্গা, দুর্গা' বলিয়া আবার যাত্রা করিল। তার পর দেবীদাস দত্তের মোক্তারিও ঠিক সেই ভাড়ুদত্তগিরির অভিনয়। মাথা নাড়িয়া, চোক ঘুরাইয়া, অন্যান্য মোক্তারদিগকে তাহাদের অযোগ্যতার জন্য অভিধানবহির্ভূত গালি দিয়া, যদি একটা শিকার কোনও দিন জুটিল, সেদিন অপরাহ্নে বাসায় ফিরিয়া আসিতে দেবীদাসের বাহারই বা দেখে কে! সঙ্গী মোক্তার, কিম্বা তদভাবে রাস্তার লোক, কাহাকেও পাকড়াও করিয়া, তাহার সঙ্গে সে দিনকার মোক্তারির গল্পটাই বা কত! পারিতোষিক চারটা, কি হদ্দ আটটি পয়সার অধিক জুটিত না। কিন্তু পকেটে হাত দিয়া, তাহা দেবীদাস এরূপ ভাবে নাড়াচাড়া করিতে করিতে আসিত যে, সে সকল তাম্রফলকের কলরবে রাজপথ কলকলায়িত হইত। বাসাটির সমক্ষে আসিয়াও সেই গল্প, হাসি ও ধাতব নিনাদ থামিত না। এ সময়ে আমার ইঙ্গিতমতে কোনও কোনও দিন আমার পিসতুত ভাই জগৎ চুপে চুপে গিয়া, তাহার পার্শ্বে ভালমানুষটির মত দাঁড়াইয়া, এক মুঠো হাঁড়িভাঙ্গা চাড়া তাহার সেই পকেটের মধ্যে দিয়া আসিত। দেবীদাস তাহার সে দিনকার মোক্তারির গল্পে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানশূন্য। গল্প শেষ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দেবীদাস. আজ শিকার ফলিয়াছে না কি? মুখে যে আর হাসি ধরে না। আজ কি পাইয়াছ দেখি।" দেবীদাস আনন্দে অধীর। পয়সা দেখাইতে গিয়া মুঠো ভরিয়া এক মুঠো চাড়া বাহির করিল। সকলে হাসিয়া উঠিল। জগৎ বলিল -"মক্কেলের কাছে আজ এই পাইয়াছ না কি?" দেবীদাস ক্রোধে একেবারে অধীর হইল, এবং জগতের প্রতি সেই দেবীদাসি ঢঙ্গের হিন্দি ছুটিল। তাহাতে কতক হিন্দি কতক চট্টগ্রামী ভাষা এবং কতক ভাল বাঙ্গালা। সে এক অপূর্ব্ব খিচুরী—"তোম্ তোম্ ভারি বেয়াদপ। তুমি ইছ্ ওয়াস্তে আমার কাছে গিয়া খাড়া হুয়া থা।" ক্রমে ক্রমে যত পয়সা বাহির করিতে লাগিল, ততই, পয়সামিশ্রিত চাড়া বাহির হইতে লাগিল। ততই ক্রোধের মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। সর্ব্বশেষ যখন পকেটটি উল্‌টাইয়া ফেলিয়া দেখিল যে. উহা লাল হইয়া গিয়াছে, তখন আর তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না।

"অঙ্গে নহে, বস্ত্রে লেগেছে দাগ,
বিরাট রাজার এই ত রাগ।"

কি জানি, যদি অন্য পকেটেও কিছু দিয়া থাকে, দেবীদাস সেটাও উল্টাইয়া ফেলিল। তখন গৃহে বহু লোক জমা হইয়া গিয়াছে, এবং হাসির তরঙ্গ লহরে লহরে ছুটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দেবীদাসি হিন্দি-মিশ্রিত গালের তরঙ্গ এবং ক্রোধের তরঙ্গও ছুটিয়াছে। পকেট দুটি প্রকাণ্ড ভিক্ষার ঝুলির মত দুই দিকে ঝুলিয়া দেবীদাসের বেশভূষার অপূর্ব্ব শোভা আরো

দ্বিগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়া রহিল যে, বাবা আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলে জগতের নামে এক নম্বর প্রকাণ্ড নালিশ দায়ের করিবে। তাহাই হইল। বাবা আফিস হইতে আসিলে দেবীদাস আট বছরের শিশুর মত কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"আজ্ঞা! আজ্ঞা! এই দেখুন, জগৎ আমার পকেটে কতকগুলি চাড়া পুরিয়া দিয়াছে এবং আমার পকেট দুটা একেবারে নষ্ট করিয়াছে।" বাবা হাসিতে হাসিতে জগৎকে তলব দিলেন। জগৎচন্দ্র অদৃশ্য।

এরূপ একদিন নহে। নিত্য রূপান্তরিত ভাবে এই অভিনয় হইত। আমি ডেপুটি কলেক্টর হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, দেবীদাস এখনও সেই দেবীদাস॥ কিন্তু সে লোক বড় ভাল, বিশ্বাসযোগ্য। আমি তাঁহাকে আমার বাসাবাটীতে আনিলাম এবং সংসারের ভার তাহার হস্তে দিলাম। বলিয়াছি, মোকদ্দমার পর আপোষে পিতা যে ভূমি-সম্পত্তি পাইয়াছিলেন, তাহাও পিতৃব্যদের কাছে আবার বন্দক দিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা 'বরবাদ্ সিদ্ধি' করিয়া উহা দখল করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন বাতাস ফিরিয়াছে। আমি ডেপুটি কলেক্টর হইয়া দেশে আসিয়াছি। চঞ্চলা লক্ষ্মী আবার আমাকে কৃপাকটাক্ষ করিয়াছেন। পিতৃব্যেরা উহা ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। দেবীদাসের পরামর্শে কর্জ্জ করিয়া আমি উহা উদ্ধার করিলাম। হায় মা! তুমি এই ক্ষুদ্র সম্পত্তির জন্য কতই লালায়িতা ছিলে, উহার জন্য কতই মনস্তাপ পাইয়া চলিয়া গেলে! সম্পত্তির কবালা লেখা শেষ হইলে আমি বাড়ী ফিরিয়া সেই শোকস্মৃতিতে উদ্বেলিতহৃদয়ে শিশুটির মত কাঁদিলাম। এ জীবনে যখন যাহা সম্পত্তি করিয়াছি, এই স্মৃতিতে, এই শোকে কাঁদিয়াছি। পিতা দেবতা। পিতার ত কথাই নাই। হায় মা! তুমি যদি একদিন আমার এ অবস্থা দেখিয়া যাইতে, তাহা হইলেও যে আমার এ জীবন সার্থক হইত। তুমি কি দেখিতেছ না? দেখিতেছ। তোমার মত সরলা পুণ্যবতীর পুনর্জ্জন্ম নাই। তুমি কোনও পুণ্যলোকে বসিয়া দেখিতেছ। অথচ আমি সেই সান্ত্বনাটুকু পাইতেছি না।

বিষয় উদ্ধার করিলাম। কিন্তু এই ঋণ কিরূপে শোধ করিব! সেই ভারও দেবীদাস গ্রহণ করিল। তখন মাত্র দুই শত টাকা বেতন। বেতন আসিলে সে এক শত টাকা সেই ঋণশোধে দিত। বাকি এক শত টাকার দ্বারায় সে কিরূপে সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিত আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। তখন আমি একজন প্রণয়টপ্পাবাজ বাবু, নবযৌবনের উত্তেজনায় উন্মত্ত। দুটি বড় তেজস্বী ঘোড়া। নিত্য গৃহে পানাহারের উৎসব ও সঙ্গীত। প্রায় প্রত্যেক শনিবারে এক নিমন্ত্রণ। পোষাকের বাবুগিরি প্রকৃতপ্রস্তাবে আমার তত বেশী যে ছিল, তাহা নহে। জানি না কেন, আমি সামান্য কাপড় পরিয়া বাহির হইলেও লোকে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া থাকিত। বলিত—"কি বাবু!" কেহ বলিত—"যেমন রূপ, তেমনি পোষাক!" ফলতঃ যে কাপড় পরিতাম, যেরূপে পরিতাম, যেরূপে চলিতাম, তাহাই দেশে ফ্যাসান হইয়া পড়িত। চাদরখানি ছেঁড়া। তাই একটুক ভঙ্গী করিয়া, যাহাতে ছেঁড়াটুকু দেখা না যায়, সেরূপ ভাবে একদিন পরিয়াছি। তাহার পরদিন দেখি, সেরূপ চাদর পরা ফ্যাশান হইয়াছে। আমার শিশটুকুর পর্য্যন্ত এমন অনুকরণ হইত যে, এক এক দিন স্ত্রীরও শুনিয়া ভ্রান্তি হইত। আর আমি বাঁশী বাজাইতাম। কাজে কাজে পথে ঘাটে বাঁশী। এই আমোদের সঙ্গী খুড়া অন্নদা। বাসায়ও বহুতর পোষ্য। অতএব এ সকল প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় দেবীদাস কিরূপে চালাইত, আমার এখনও ভাবিতে গেলে বিস্ময় বোধ হয়।

এক বাবুর রামচরণ নামক এক চাকর ছিল। বাবু তাহার সঙ্গে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, রামচরণ অন্য লোক আসিলে তাঁহাকে তামাক সাজাইয়া দিত। আর যখন কেহ না থাকিত, তখন বাবু রামচরণকে সাজাইয়া দিতেন। দেবীদাসও সে বন্দোবস্ত

করিল। মাসের প্রথমে রাজা ও মন্ত্রী বসিয়া একটা বিনা সূতার হার গাঁথিবার ব্যবস্থা করিতাম। যে খরচটায় নগদ টাকা না দিলে নহে, তাহা নগদ দিতাম. এবং অবশিষ্ট দোকানে বাকি করা যাইত। মাসের প্রথমে লম্বা লম্বা খাতা লইয়া দোকানদারগণ উপস্থিত হইলে আমি লম্বা লম্বা হুকুম দিতাম। সে হুকুমের মোট দিলে দুই শত টাকায়ও কুলায় না। দেবীদাসের হাতে আছে পঁচিশ কি ত্রিশ টাকা মাত্র। যাহাকে কুড়ি টাকা দিতে বলিয়াছি, দেবীদাস তাহাকে পাঁচ টাকা মাত্র দিয়া, গম্ভীরভাবে তাহার অজ্ঞাতে মোক্তারি কার্য্য করিতে বসিয়াছে। দোকানদার যদি বলিল—বাবু কুড়ি টাকা দিতে বলিয়াছেন, দেবীদাস তখন চীৎকার করিয়া বলিল—"বাবুকা হুকুম হাম্ নাহি মান্‌তা হায়। তোম্ দেখছ না, হাম্ কাজে ব্যস্ত আছি ? চলে যাও।" তাহার পর ভীম কীচকের যুদ্ধ। দেবীদাসের সে অপূর্ব্ব হিন্দির স্রোত ও দোকানদারের গালিস্রোত। শেষে দোকানদার পরাস্ত হইয়া, পাঁচটি টাকাই লইয়া চলিয়া গেল। আমার কক্ষ হইতে এই বাক্‌বিতণ্ডা, বিশেষতঃ দেবীদাসের হিন্দি শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে আমার পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হইত। দেবীদাস এরূপে আপনি লোকের কাছে শত নিগ্রহ ভোগ করিয়া, আমার সম্মান রক্ষা করিত। লোকে মনে করিত—বাবুটি বেশ. যত নষ্টের গোড়া এই দেবীদাস দত্ত। দুই তিন মাস এরূপ চলিলে শেষে দোকানদারগণ বুঝিল, দেবীদত্তের সঙ্গে পারিবার জো নাই। যাহা দিত, তাহারা তাহা লইয়া যাইত। কখনও বা দোকানদার আমার কাছে আপিল করিত। আমি দেবীদাসকে ভর্ৎসনা করিতাম। দেবীদাস নিজেই আমাকে এই অভিনয় শিক্ষা দিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে সমস্ত কর্জ্জ শোধ হইয়া গেল। তখন দেবীদাস আবার অল্প সুদে একজন আত্মীয় হইতে টাকা কর্জ্জ করাইয়া একটি সুন্দর দোতলা বাড়ী সহরের সাহেবী অঞ্চলে কিনিয়া দিল। এত দিনে বিস্তৃত হাতা-সম্বলিত আমার নিজের একটি সুন্দর বাড়ী হইল। তাহার তেতালায় একটি সুন্দর কক্ষ ছিল। সেইটি আমার কবিকক্ষ।

এই সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ (বর্ত্তমান সম্রাট্) ভারতদর্শনে শুভাগমন করেন। সেই উপলক্ষে হেমবাবু হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কান পাতিবার জো নাই। কিন্তু আমি এরূপ 'হুজুগে' কবিতা কখনও লিখি নাই। এবারও লিখিলাম না। এমন সময়ে বিলাতের 'Crown Perfumery Co. ভারতীয় ও ইংরাজী ভাষায় তিনটা কবিতার জন্য তিনটা পারিতোষিক ঘোষণা করিলেন। আমার বন্ধু মুনসেফ পি. এন. (প্রাণনাথ) বানার্জ্জি উহার বিজ্ঞাপন 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় দেখিয়া, আমাকেও একটি কবিতা লিখিতে জিদ করিলেন। সকলের ধারণা এরূপ হইল যে, যুবরাজের, কি বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ইঙ্গিতে এই ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। প্রাণনাথ আমার পরম বন্ধু। তাঁহার অনুরোধে ও তাড়নায় অগত্যা আমিও এক কবিতা লিখিয়া, তাঁহার কৃত ইংরাজি অনুবাদ সহ বিলাতে পাঠাইলাম। উহার নাম 'ভারত-উচ্ছ্বাস'। প্রথম পারিতোষিক পঞ্চাশ গিনি আমি পাইলাম। উক্ত কোম্পানি আড়াই শত, কি তিন শত কবিতা ভারত ও বিলাত হইতে পাইয়াছিলেন। তাহা হইতে আটটি কবিতা বাছিয়া গুণানুক্রমে একখানি বড় সুন্দর বহিতে ছাপিয়াছিলেন। প্রথম আমার কবিতা, দ্বিতীয় মহারাষ্ট্র অঞ্চলের একটি সংস্কৃত কবিতা, এবং তৃতীয় বিলাতের একজন ইংরাজের একটি ইংরাজি কবিতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই পঞ্চাশ গিনি. এবং দেবীদাস ইতিমধ্যে আর যাহা কিছু জমা করিয়াছিল, তাহার দ্বারা মহাজনি করিল। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"—ঠিক কথা। এ সংসারে মহাজনদের পথই পথ।

কিন্তু কেবল দোকানদারেরা নহে, আমার বুদ্ধিহীন পরিবারস্থেরাও দেবীদাসের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ দেবীদাস এরূপ কর্কশভাষী ও কর্কশব্যবহারী ছিল যে, সমস্ত দেশে আমি ভিন্ন কেহ তাহার বড় পক্ষপাতী ছিল না। শেষে পরিবারস্থের বিদ্বেষ-

স্রোতে আমার স্ত্রীও যোগ দিলেন। ইঁহারা তাঁহার অভিমানবহ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন,—তিনিও কি একজন চাকরের অধীনা হইয়া থাকিবেন? তখন একদিন সন্ধ্যার সময়ে দেবীদাস আমাকে বলিল—"আমি এতদিন অন্য লোকজনের কথা গ্রাহ্য করি নাই। কিন্তু এখন ঠাকুরাণী পর্য্যন্ত আমার উপর চটিয়াছেন। অতএব আর আমার আপনার সংসারে থাকা উচিত নহে।—বিশেষতঃ আমি আপনার বিষয় উদ্ধার করিয়াছি, বাড়ী করিয়া দিয়াছি। আপনি স্থির হইয়া বসিয়াছেন। আমার এখন বিশেষ কোনও কাজ নাই। এখন সকল ভার ঠাকুরাণীর হাতে দেন। তিনি খুব বুদ্ধিমতী। আর কোনও গোলযোগ হইবে না। আমি মোক্তারিতে আর কিছুই পাইতেছি না। আমাকে সেট্‌ল্‌মেন্ট আফিসে একটা কাজ লইয়া দেন।" আমিও দেখিলাম, তাহার কথা ঠিক। তাহাকে সেট্‌ল্‌মেণ্টের আমিন করিয়া দিলাম। তাহার কিছুদিন পরে প্রভুভক্ত দেবীদাস ইহলোক হইতে চলিয়া গেল। এই জীবনে তাহার উপকার আমি ভুলিতে পারি নাই। তাহার আমি কিছুই প্রতিদান দিতে পারি নাই। তাই তাহার এই উপকারের কথা আত্মজীবনীতে গলদশ্রুনয়নে লিখিয়া রাখিলাম। সে আজ জীবিত থাকিলে আমার অবস্থা আরও অনেক ভাল হইত। তাহার অভাব আমি একটি জীবন পদে পদে অনুভব করিয়াছি।

পিতার ভক্ত

চট্টগ্রামের 'বাটোয়ারা' বিভাগের অবস্থা বড় শোচনীয় বলিয়া, ক্লে সাহেব তাঁহার নিজ-হস্তে উহা আর না রাখিয়া, আমার হস্তে দিলেন। দেখিলাম, এক এক মোকদ্দমা ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে চলিতেছে। এক এক নথি তিন চার টুকরি (basket) দেখিয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইত। আমি রিপোর্ট করিলাম যে, একজন ডেপুটি কলেক্টরকে এক বৎসরের জন্য মফঃস্বল ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহাদের নিষ্পত্তি করিবার ভার না দিলে, এই সকল দ্রৌপদীর বসনের অন্ত পাওয়া যাইবে না। সে রিপোর্ট সোপানে সোপানে গবর্ণমেণ্টে গিয়া গৃহীত হইল এবং আমি বাটোয়ারে ডেপুটি কলেক্টর হইলাম। এই উপলক্ষে চট্টগ্রামের পূর্ব্বসীমাস্থিত গিরিমালা হইতে পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত এমন স্থান নাই, যাহা আমি দেখি নাই, এমন কুটুম্ব নাই, যাহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাই নাই। এই এক বৎসরের জীবনের সঙ্গে অনেক সুখ ও স্নেহস্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কত কত সুন্দর স্থানে শিবির স্থাপন করিয়াছিলাম, কত নৈসর্গিক শোভা দর্শন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। কোথায়ও বা পুলিস ষ্টেসনের খাটিয়ার উপর শুইয়া, কোথায় বা শিবির উত্থিত হইতেছে, এমন সময়ে কোনও তরুতলে শ্যামল তৃণোপরে অর্দ্ধশায়িত হইয়া সম্মুখে যে কাগজ পাইতাম, তাহাতে কবিতা লিখিতাম, এবং উহা যথাসময়ে 'বঙ্গদর্শনে', 'আর্য্যদর্শনে' ও 'বান্ধবে' বাহির হইত। প্রত্যেক বন্ধে যেখানে থাকি না কেন, সেখান হইতে অশ্বপৃষ্ঠে বা নৌকায় আমার পল্লীগ্রামস্থ বাড়ী যাইতাম, এবং নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতাম। এ সময়টি কি এক আনন্দের সময় ছিল। যেখানে যাইতেছি, সেখানে রূপের প্রশংসা, গুণের আদর, এবং কৃতিত্বের জন্য ধন্যবাদ, লোকমুখে শুনিতে পাইতাম। নবীন যৌবন, প্রাণ নবীন উৎসাহে ভরা, এবং সংসার আনন্দময়। যেখানে যাইতাম, সেখানেই 'গোপীবাবুর পুত্র' বলিয়া কত লোক দেখিবার জন্য আসিত। বিশেষতঃ কোনও মুনসেফির কাছে তাঁবু পড়িলে দলে দলে উকিলগণ সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। ইঁহারা সকলেই আমার পিতৃদেবের সৃষ্ট উকিল। তাঁহাদের মুখে পিতার গুণানুবাদের ও দয়ার আখ্যান শুনিয়া প্রাণ আনন্দে অধীর হইত।

একদিন সাতকানিয়া থানার দক্ষিণ প্রান্তে গৌরস্থান নামক একটি গ্রামে যাইতে হইল।

ব্যবধান কুড়ি মাইল। প্রথম দশ মাইল আমার সেই চট্টলখ্যাত 'বিদ্যুৎ' নামক 'কাঠিওয়ার' ঘোড়ায় গেলাম। তাহার পর একজন তালুকদারের জিম্মায় সেই ঘোড়া রাখিয়া, তাহার একটি টাট্টু ঘোড়াতে অবশিষ্ট দশ মাইল গেলাম। ফাল্গুন মাস। মধ্যাহ্নে আতপে ও পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া একটি দীর্ঘিকার তীরে নিরবচ্ছিন্ন তরুছায়ায় নয়নানন্দকর স্নিগ্ধ দুর্ব্বাদলে শুইয়া পড়িলাম। হাতে অশ্বের বল্গা জড়ান রহিয়াছে। অশ্ব, পার্শ্বে যদৃচ্ছাক্রমে কোমল দুর্ব্বা খাইতেছে এবং এক একবার নাসিকার ধ্বনি করিয়া ও ডাকিয়া তাহার আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। স্থানটি পর্ব্বতবেষ্টিত। দীর্ঘিকাটি অতীব মনোহর। চারি পাড় বৃক্ষে এরূপ সমাচ্ছন্ন যে, মধ্যাহ্নসূর্য্যও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। জল নীল, নির্ম্মল, শীতল! অশ্রুজলের মত টল্‌টল্‌ করিতেছে। মধ্যভাগে জলক্রীড়া-বাটীর কয়েকটি স্তম্ভ এখনও পরিলক্ষিত হইতেছে। স্থানটি দেখিলে বোধ হয় মুসলমানদের আমলে কোনও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি এখানে বাস করিতেন, এবং উহার বড় উন্নত অবস্থা ছিল। আমি বাম বাহুর উপর মস্তক রাখিয়া, শুইয়া পরিতৃপ্তমনে এই শোভা দেখিতেছিলাম। অশ্বের কণ্ঠরবে আকৃষ্ট হইয়া, একটি অশীতিবর্ষীয় মুসলমান আসিয়া উপস্থিত হইয়া আমাকে সেলাম করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার আমলারা কোথায় আছে, তুমি বলিতে পার কি?" উত্তর—"ধর্ম্মাবতার! তাহারা এক নাপিতবাড়িতে আছে। আমি ডাকাইয়া দিতেছি। আপনি ততক্ষণ আমি-দরিদ্রের পর্ণকুটীরে একটুক বিশ্রাম করিবেন কি?" আমি বলিলাম—"আমার সময় বড় কম। ঘোড়ার ডাক বসাইয়া আসিয়াছি। তদন্ত শেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে সাতকানিয়া ফিরিতে হইবে।" বৃদ্ধ তখন বলিল—"বাবু! তুমি আমাকে চিনিতেছ না। তুমি যেমন গোপীবাবুর পুত্র, আমিও তেমন। হায়! আমার বাপ গোপীবাবু কোথায় গেল! তোমার এ গৌরব যে একবার দেখিয়াও গেল না, এ দুঃখ কোথায় রাখিব!" বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পার্শ্বে বসিয়া, আমার মাথায় ও মুখে কি আদরে হাত বুলাইতে লাগিল। তাহার উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। তখন বৃধ ধীরে ধীরে বলিল যে, সে এক মোকদ্দমায় পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। শেষে নিরুপায় হইয়া আমার পিতার আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তাঁহাকে 'বাবা' বলিয়া ডাকে। আমি তখন শিশু, স্কুলে পড়িতেছি। পিতা তাহাকে অভয় দিয়া সেই মোকদ্দমায় জয়ী করান, এবং তাহাকে রক্ষা করেন। সে একজন সম্পত্তিশালী তালুকদার। সে বলিল—তাহার যাহা কিছু আছে, সকলই পিতার দত্ত। তাহার চর্ম্ম দিয়া পিতার জুতা প্রস্তুত করিয়া দিলেও ঋণ পরিশোধ হইবে না। এই স্থানটি চট্টগ্রাম জেলার প্রায় শেষ সীমা। এখানে আসিয়া পিতার এই পুণ্য গীত শুনিব, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার হৃদয় শোকোচ্ছ্বাসে ভরিয়া গেল। আমি বড় কাঁদিলাম। বহুক্ষণ পর অশ্রুমোচন করিয়া উঠিলাম, এবং তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম—"চল ভাই! আমি তোমার বাড়ী যাইব।" ইতিমধ্যে অন্যান্য লোক আসিয়াছিল। একজনের হাতে অশ্বের বল্গা দিয়া আমি বৃদ্ধের বাড়ী গেলাম। বাড়ী নিকটে। তাহার একটি বৃহৎ পরিবারের আনন্দ দেখে কে! বৃধ একেবারে আত্মহারা। সে কেবল আমাকে বারম্বার বুকে লইয়া পিতার নাম করিয়া কাঁদিতেছিল। সে আমাকে নানাবিধ 'মেওয়া' খাইতে দিল। আমি পরম আহ্লাদে খাইলাম এবং একরূপ আত্মহারা ভাবে তদন্ত শেষ করিয়া সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে আবার অশ্বারোহণে ছুটিলাম।

অর্দ্ধপথে যে কনেষ্টবল ছিল, সে পার্শ্বস্থ তালুকদারবাড়ী হইতে আমার ঘোড়া আনিতে গেল। ঘোড়া এরূপ লাফালাফি করিতেছে যে, তাহাকে তিন চারজন লোক চেষ্টা করিয়াও জিন দিতে পারিতেছে না। অনেক কষ্টে আমার কাছে আনিলে, আমি 'বিদ্যুৎ' বলিয়া ডাকিলে ঘোড়া দাঁড়াইল, এবং নাসিকাধ্বনি করিয়া ডাকিতে লাগিল। আমি স্বহস্তে জিন

লাগাম পরাইয়া আরোহণ করিলে এরূপ নক্ষত্রবেগে ছুটিল যে, আমার সমস্ত অশ্বচালনা-বিদ্যা নিঃশেষ করিয়া থামাইতে পারিলাম না। মাঠ, রাস্তা, পগার, নালা, কিছুই জ্ঞান নাই। অশ্বের গতিতে আমার কপাল বহিয়া ঘাম পড়িতে লাগিল, এবং সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মে সিক্ত হইল। আমি নিরুপায় হইয়া, আসন দৃঢ় করিয়া বসিয়া, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ঘোরতর বিপদ্ আশঙ্কা করিতে লাগিলাম। এই দশ মাইল পথ যাইতে এক ঘণ্টাও লাগিল না। ঠিক সন্ধ্যার সময়ে শিবিরে পঁহুছিলাম এবং সহিসের হাতে লাগাম ফেলিয়া দিয়া এ কথা বলিলাম। সে বলিল যে, আস্তাবলের দিকে দানা খাইবার সময়ে আসিতেছে বলিয়া এরূপ বেগে আসিয়াছে। আমি অবসন্ন ভাবে একখানি কেম্প লাউঞ্জ চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। ঘণ্টা দুই পরে সহিস আসিয়া কাঁদিয়া শিবিরের বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"সরকার! হামরা ঘোড়াছে কোন শালা তালুকদার নে জোড় লিয়া। ঘোড়া বিলকুল বিগড় দিয়া।' সে বলিল যে, মোতায়েনি কনেষ্টবলের কাছে সে এ কথা শুনিয়াছে। সে ঘোড়ার সঙ্গে ভবুয়া হইতে আসিয়াছে। সে ঘোড়াটিকে পুত্রবৎ স্নেহ করিত এবং পুত্রশোকাতুর যেরূপ রোদন করে, সেরূপ রোদন করিতে লাগিল। সে বলিল—দু দিন পরে ঘোড়ার দু কড়া মূল্যও হইবে না। পুলিস সবইন্‌সপেক্টার সে তালুকদারকে ধরিয়া আনিয়া, খুব এক প্রস্থ প্রহার দিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে আমার কাছে উপস্থিত করিল। বুঝিলাম, ঘোড়ার এরূপ নাম পড়িয়াছে যে, এ পাপিষ্ঠ প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাহার আস্তা-বলে কোনও ঘুড়ী আছে কি না, আমি জিজ্ঞাসা করাতে সে বারম্বার অস্বীকার করিয়াছিল। সবইন্‌সপেক্‌টার বলিল—সে ত্রিশ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার অধিক দিবার তাহার শক্তিও নাই। কারণ, তাহার বাড়ীখানি পর্য্যন্ত ঋণের জন্য বিক্রীত। এরূপ স্বাভাবিক কার্য্যের দ্বারা ঘোড়া নষ্ট হইবে, আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। আমি টাকা লইলাম না। তাহাকে তিরস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। এক মাস যাবৎ ঘোড়ার কোনওরূপ ব্যতিক্রম দেখিলাম না। আমি রোজ সেই সহিসকে ঠাট্টা করিতাম। সে বলিত—"আচ্ছা, দু দিন অপেক্ষা করুন।" সত্য সত্যই তাহার পর ঘোড়াটি একেবারে বিগড়াইয়া গেল। পথে অন্য ঘোড়া—এমন কি, গরু দেখিলেও, পশ্চাতের দু পায়ের উপর দাঁড়াইয়া উঠিত, এবং যদৃচ্ছাক্রমে তাহার দিকে ছুটিত। যে ঘোড়ার জন্য সাহেবরা পাঁচ শত টাকা মূল্য দিতে চাহিয়াছিলেন, এখন তাহার নাম রাখিলেন—"Nabin Babu's beast" (নবীন বাবুর পশু) তথাপি আমি দু বৎসর এরূপ অবস্থাতেও উহার ব্যবহার করিয়াছিলাম। পরে সার্ত্তিতে দিয়া নব্বই টাকা মাত্র পাইলাম। কিন্তু এরূপ দুষ্ট ঘোড়াও চালাইতেছি দেখিয়া, সাহেবরা আমার অশ্বরোহণ-বিদ্যায় বিশেষ আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। এজন্য লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর কেম্বেল যখন ডেপুটি মাজিস্ট্রেটদের অশ্বারোহণের পরীক্ষা লইতে আদেশ প্রচার করেন, ক্রে সাহেব আমার পরীক্ষা না লইয়া লিখিয়াছিলেন—"A very clever rider, decidedly active for a native··" —খুব দক্ষ অশ্বারোহী, দেশীয় লোকের পক্ষে বিশেষ দক্ষ।'

এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলিব। একজন প্রাচীন সম্প্রদায়ের ডেপুটিকে ক্রে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবু! আপনি চড়িতে জানেন?" উত্তর—জানি।

প্রশ্ন।—কি চড়েন (অর্থাৎ বড় ঘোড়া, না পনি।)

উত্তর।—পাল্কি !!

ক্রে সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে, লেঃ গবর্ণর ডেপুটি মাজিস্ট্রেটদের ঘোড়া চড়ার পরীক্ষা লইতে আদেশ করিয়াছেন। তবে তিনি চড়িতে জানেন না বলিয়াই রিপোর্ট করিবেন। বৃদ্ধ দেখিলেন বেগতিক। একে ত বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বেতনবৃদ্ধি বন্ধ। এত দিন দুই শত পাইতেছেন। এখন যদি

এরূপ রিপোর্ট যায়, তবে হয় ত চাকরিটিও যাইবে। লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর আবার যে-সে নহে—সার জর্জ্জ কেম্বেল। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন—"হুজুর! আমি খুব ঘোড়া চড়িতে জানিতাম। কিন্তু এখন কাচ্চাবাচ্চা অনেক হইয়াছে। দু শ টাকা মাত্র বেতন। ঘোড়ার খরচ চলে না।" সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, কাহারো একটা ঘোড়া ধার করিয়া লইয়া আসিবেন।" বৃদ্ধ সহর খুঁজিয়া একটা গর্দ্দভ-নির্বিশেষ টাট্টু সংগ্রহ করিয়া নিরূপিত দিবসে উপস্থিত। ক্রে প্রথমতঃ ঘোড়ার আকৃতি দেখিয়াই হাসিয়া আকুল। বৃদ্ধকে উঠিতে বলিলেন। তিনি অতিশয় হাস্যজনক ভাবে টাট্টু প্রবরের পৃষ্ঠে উঠিলেন, এবং সম্মুখে নগ্নশরীর, নেঙ্গটিমাত্র পরিহিত যে সহিস এই উচ্চৈঃশ্রবার গলার দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে বলিলেন—'টান বেটা! টান!' সে যথাশক্তি টানিতে লাগিল, এবং ডেপুটি মহাশয় তাঁহার হস্তস্থিত বৃহৎ যষ্টির দ্বারা ঘোটকের পশ্চাৎদেশে প্রহার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অশ্বরাজ সেই যে গ্রীবা ঊর্দ্ধ করিয়া, দুই পাটি দন্ত বাহির করিয়া রহিলেন, তিনি আর চলেন না। সেই উলঙ্গ সহিসের দড়ির টান, আরোহীর যষ্টিপ্রহার, এবং 'চল বেটা! চল' সম্বোধন, তিনি সকলই ব্যর্থ করিলেন। ক্রে সাহেব হাসিয়া আকুল হইয়া বলিলেন—"বাবু! আপনার আর পরীক্ষা দিতে হইবে না।"

'পলাশীর যুদ্ধ কাব্য'

বলিয়াছি, যশোহরে আমাদের আমোদ ও আহারের জন্য একটা সাধারণ সমিতি ছিল। তদন্তর্গত আবার কয়েকটি শাখা-সমিতি ছিল—সঙ্গীত-সমিতি, সাহিত্য-সমিতি, ইয়ার্কি-সমিতি। সাহিত্য সমিতির সভ্য তিন জন—আমি, জগবন্ধু ভদ্র ও মাধবচন্দ্র চক্রবর্তী। জগবন্ধু যশোহর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক, এবং মাধব তখন উকিল ছিলেন। একদিন এই সমিতিতে স্থির হইল যে, আমরা তিনজনে তিনটি বিষয় লইয়া তিনখানি বহি লিখিব। কলেজে অধ্যয়ন সময়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশীর যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার সর্ব্বদা মনে পড়িত, এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্ব্বদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাসিত। আমি বলিলাম—আমি পলাশীর যুদ্ধ লিখিব। এরূপে কি কার্য্যের অঙ্কুর শ্রীভগবান্ কোথায় আমাদের অজ্ঞাতভাবে স্থাপন করেন, তাহা তিনিই জানেন। জগবন্ধু রাজস্থানের এবং মাধব সিপাহীবিদ্রোহের কোনও ঘটনা লিখিবেন স্থির হইল। আমার যেই কথা, সেই কাজ। আমি চিরদিনই একজন ব্যস্তবাগীশ। আমি তখনই 'পলাশীর যুদ্ধ' একটি দীর্ঘ কবিতাকারে লিখিলাম। জগবন্ধু বহুদিন পরে 'দেবলদেবী' নামক একখানি নাটক লিখিয়াছিলেন। মাধব তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছেন কি না, আমি অবগত নহি। ইহার কিছু দিন পরে হেডমাষ্টার বাবুর শিশুপুত্র পীড়িত হয়, এবং কিরূপে রাত্রি জাগিয়া আমি তাহার শুশ্রূষা করি, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রভাতসময়ে এসিষ্টাণ্ট এন্‌জিনিয়ারবাবু আসিয়া রোগীর শয্যার পার্শ্বে আড় হইয়া বসিলেন। শরৎকালের রাত্রি প্রভাত হইতেছে। পূর্ব্বগগনে ঊষার প্রবালমুকুটজ্যোতিঃ ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে। আমি গবাক্ষের কাছে জাগরণ-ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে বসিয়া পা দুখানি গবাক্ষের কাষ্ঠের উপর রাখিয়া, সেই ঊষার মনোহর বিকাশশোভা দেখিতেছিলাম, এবং ধীরে ধীরে সদ্যরচিত এই কবিতাটি একরূপ অজ্ঞাতসারে জাগরণ-সুখ-কণ্ঠে আওড়াইতেছিলাম।

"পোহাইল বিভাবরী পলাশী প্রাঙ্গণে,
পোহাইল ভারতের সুখের রজনী,
চিত্রিয়া ভারত ভাগ্য আরক্ত বিমানে,
উঠিলেন দুঃখভরে ধীরে দিনমণি।

শান্তোজ্জ্বল কররাশি চুম্বিয়া অবনী
প্রবেশিল আম্রবনে ; প্রতিবিম্ব তার
শ্বেতমুখ শতদলে ভাসিল অমনি ;—
ক্লাইবের মনে হ'ল স্ফূর্ত্তির সঞ্চার।
সিরাজ স্বপ্নান্তে রবি করি দরশন,
ভাবিল এ বিধাতার রক্তিম নয়ন।”

এন্‌জিনিয়ারবাবু নিদ্রোত্থিতের মত বলিয়া উঠিলেন—‘কি! কি! আহা! বড় মিষ্ট লাগিল! কবিতাটি আবার আওড়াও ত শুনি।” আমি আবার আওড়াইলাম।

তিনি। এ কাহার কবিতা?

আমি। (সলজ্জ ভাবে) আমার।

তিনি। কই, এ কবিতা ত আমি আগে শুনি নাই।

আমি। এই মাত্র লিখিয়াছি।

তিনি। কি বিষয়ে?

আমি। পলাশীর যুদ্ধ।

তিনি। পলাশীর যুদ্ধ! কবিতাটি কত বড় হইবে?

আমি। সত্তর আশী শ্লোক হইবে।

তিনি। তুমি ছেলেমানুষ, রাত্রিজাগরণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ। তুমি বাড়ী যাও। কবিতাটি এখনই আমার বাসায় পাঠাইয়া দিবে।

আমি তাহাই করিলাম। কিছুদিন পরে তিনি এক দীর্ঘ পত্র সহ কবিতাটি ফেরত পাঠাইলেন। পত্রে কবিতাটির অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া, শেষে লিখিয়াছেন যে, এরূপ কবিতা সাপ্তাহিক পত্রে ছাপিলে উহা মাটি হইবে। উহা আরও বিস্তৃত করিয়া পুস্তকাকারে ছাপিতে তিনি পরামর্শ দিয়াছেন। আমি সে পরামর্শ গ্রহণ করিলাম। কবিতাটি পড়িয়া রহিল। এই গেল ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের শরৎকাল।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে আমি তিন মাসের বিদায় গ্রহণ করি। পিতার পরলোক-গমনের পর পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীখানিও ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। উহা নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিবার জন্য এই বিদায় লইয়াছিলাম। সেই সময়ে একদিন ঐ কবিতাটি চক্ষে পড়িল। মনে করিলাম, এন্‌জিনিয়ারবাবুর উপদেশ মতে এই কবিতাটি বিস্তৃত করিতে পারি কি না, একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। সেই চেষ্টার ফল ‘পলাশীর যুদ্ধ কাব্য’। একখানি ভগ্নাবশেষ বাঁশের দেউড়ির ঘরের এক কক্ষ কাপড়ের পর্দ্দার দ্বারা সজ্জিত করিয়া আমার কবি-কক্ষ করিয়া লইলাম। গৃহ নির্ম্মাণের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া প্রাতঃকালে মধ্যে মধ্যে যে সময়-টুক পাইতাম, সে সময়ে ‘পলাশীর যুদ্ধ’ লিখিতাম। প্রাতঃকালে ভিন্ন লিখিতে পারিতাম না। কত দিন লিখিয়াছিলাম মনে নাই। বড় বেশী দিন নহে। ছুটির মধ্যেই কাব্যখানি শেষ হয়। কিন্তু গ্রামে এমন কেহ নাই যে, সাহিত্য সম্বন্ধে একটি কথা বলি বা পরামর্শ করি। তখন স্ত্রীও বালিকা-বিশেষ। লেখাপড়ার বড় বেশী ধার ধারিতেন না।

ছুটির পর সহরে আসিয়া বাবু কাশীচন্দ্র সেনকে উহা নকল করিতে দিলাম। কাশী নিজেও একজন কবি। আমরা কলেজে থাকিতে সে ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দে কতগুলি খণ্ড কবিতা ‘কুসুমাঞ্জলি’ নাম দিয়া ছাপিয়াছিল। তাহাতে বেশ একটুক শক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। সে পর্য্যন্ত ‘অমিত্রাক্ষর’ ছন্দে মধুসূদনের অনুকরণে এরূপ কৃতিত্ব আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই। তাহার হাতের লেখা বড়ই সুন্দর। এমন সুন্দর লেখা আমি আর দেখি নাই। ঠিক যেন ছাপা। সে নকল করিতে প্রায় ছয় মাস সময় লইয়াছিল। সে আমার অধীনে কেরানিগিরি করিত। কাজেই তাহার অন্যান্য কার্য্যের অবসরে নকল

করিতে হইত। কাশী সময়ে সময়ে কাব্যখানির বড়ই প্রশংসা করিত। যে দিন নকল শেষ করিয়া আনিল, সে দিন অত্যন্ত প্রশংসা করিল। কিন্তু এ কাব্যখানি যে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, সে আমি স্বপ্নেও মনে করি নাই।

ইতিপূর্ব্বে 'একদিন' কবিতাটি লিখিয়া আমি 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকের কাছে প্রেরণ করি। বঙ্কিমবাবুর প্রতিভায় তখন বঙ্গসাহিত্য উদ্ভাসিত। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তখনও এ ক্ষুদ্র জীবের পরিচয় হয় নাই। পরিচয় করাও বড় স্পর্দ্ধার কথা মনে করিতাম। কিন্তু 'একদিন' কবিতাটি পাইয়া তিনি আমাকে জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ এক পত্র লেখেন, এবং 'বঙ্গ-দর্শনে' নিয়মিতরূপে লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—আমি কোথায় আছি, সমালোচনার জন্য একখণ্ড 'অবকাশরঞ্জিনী'ও চাহিয়া পাঠাইলেন। 'একদিন' বঙ্গদর্শনে সমালোচনার জন্য এক খণ্ড 'অবকাশরঞ্জিনী'ও চাহিয়া পাঠাইলেন। 'একদিন' বঙ্গদর্শনে যথাসময়ে প্রকাশিত হইল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পর্য্যন্ত উহার বড় প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে, পত্নীবিধুর পতির হৃদয়-তন্ত্রী উহাতে বাজিয়া উঠিবে। আমার নাম ছিল না; 'শ্রীনঃ' মাত্র ছিল। তাহার পর 'বঙ্গদর্শনে' 'অবকাশরঞ্জিনী'র অতিশয় সারগর্ভ সমালোচনা প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমবাবু উহার আশাতিরিক্ত প্রশংসা করিলেন। এ সময়ে 'বান্ধব' ও 'আর্য্যদর্শন'ও আমাকে পাকড়াও করেন। আমি তিনখানি মাসিক পত্রিকায় সমান ভাবে লিখিতে লাগিলাম। বঙ্গসাহিত্যের সে কি এক উৎসাহের যুগ। ক্ষুদ্র বঙ্গসাহিত্যের নদীতে চারিদিক্ দিয়া বন্যা ছুটিতেছিল।

একবার বঙ্কিমবাবু কবিতা চাহিয়া পত্র লিখিলে আমি 'পলাশীর যুদ্ধে'র রচনার কথা লিখিলাম। তিনি উহা চাহিয়া পাঠাইলেন এবং পাইয়া লিখিলেন, 'বঙ্গদর্শনে' ছাপিলে উহার অগৌরব হইবে। উহা পুস্তকাকারে ছাপিতে উপদেশ দিলেন এবং লিখিলেন যে, সমালোচনার সময়ে তিনি প্রমাণিত করিবেন যে, 'পলাশীর যুদ্ধ' বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান কাব্য—"next, if at all, to Meghnad"—'মেঘনাদবধে'র সমকক্ষ না হইলেও তাহার পরবর্ত্তী স্থান পাইবার যোগ্য।" আমি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইলে, তিনি লিখিলেন, উহা 'বঙ্গদর্শন' প্রেসে মুদ্রিত করিবেন। আরও প্রায় ছয় মাস চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমবাবু লিখিলেন,—তাঁহার প্রেসে ছাপিবার সুবিধা হইল না, অতএব 'সাধারণী প্রেসে' ছাপিতে হস্তলিপি অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়কে দিয়াছেন।

এমন সময়ে আমার কৈশোর বন্ধু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—তিনি পরে Dr. U. C. Mookherjce হইয়াছিলেন, কেমন করিয়া 'পলাশীর যুদ্ধে'র খবর পাইলেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধে উহা কলকাতার কোনও মাসিক পত্রিকার প্রেসে মুদ্রাঙ্কণের জন্য প্রেরিত হইল। প্রেসাধ্যক্ষ উহা দেখিয়া নিজের ব্যয়ে ছাপিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু তাহার পর সময়ে সময়ে তাঁহার বিপদ্ জানাইয়া মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ের সমস্ত টাকা অগ্রিম আদায় করিলেন। তথাপি ছাপা শেষ হইল না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর প্রায় এক বৎসরে 'পলাশীর যুদ্ধ' ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল।

বঙ্গসাহিত্যজগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে বঙ্কিমবাবুর 'সুর' ফিরিয়াছে। তিনি আমাকে লিখিলেন—"It is unfortunate Hem should have made his *debut* before you." —'তোমার দুর্ভাগ্য যে, হেম তোমার পূর্ব্বে আসরে নামিয়াছে।' কথাটা বুঝিলাম। পরে শুনিলাম, হেমবাবুর 'বৃত্রসংহারে'র প্রথম ভাগ বাহির হইয়াছে। উহা পড়িলাম, এবং যখন 'বঙ্গদর্শনে' উহার—

'পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।"—সম্বলিত দীর্ঘ সমালোচনা পড়িলাম, এবং শুনিলাম, এমন একটা লাইন সেক্সপিয়ার, কি মিল্টনও লিখিতে পারেন নাই, তখন বুঝিলাম। কিন্তু বঙ্কিমবাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন। আমি ত কখনই হেমবাবুর প্রতিযোগিতা করি

নাই। আমি তাঁহার পুত্রস্থানীয়। কলেজে তাঁহার 'চিন্তা-তরঙ্গিণী' আমার পাঠ্য পুস্তক ছিল। যাহা হউক, 'বঙ্গদর্শনে' 'পলাশীর যুদ্ধের'ও খুব উচ্চ রকমের সমালোচনা বাহির হইল। উহাতে বঙ্কিমবাবু আমাকে 'বাঙ্গলার বাইরণ' বলিয়া পরিচিত করিলেন। কাব্যখানির একটি মাত্র দোষ দেখাইয়াছিলেন—হেমবাবুর 'বৃত্রসংহারে' চরিত্রচিত্র আছে, 'পলাশীর যুদ্ধে' তাহা নাই। কিন্তু চরিত্র চিত্র করা কি 'পলাশীর যুদ্ধ'-রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল? 'আর্য্য-দর্শনে' একটি অন্তঃসারশূন্য অতিরিক্ত প্রশংসামূলক সমালোচনা বাহির হইল। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমালোচনা বাহির হইল 'বান্ধবে'। আমি তখনও বঙ্কিমবাবু, কালীপ্রসন্নবাবু এবং 'আর্য্যদর্শনে'র সম্পাদকের সঙ্গে কেবল পত্রের দ্বারা পরিচিত। কালীপ্রসন্নবাবুকে এই শেষ জীবন পর্য্যন্তও চর্ম্মচক্ষে দেখি নাই। 'বান্ধবে'র সমালোচনায় পশ্চিম ও পূর্ব্ব-বঙ্গে যেন একটুক দলাদলির ভাব উঠিল। 'সাধারণী'-সম্পাদক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমাকে পত্রের দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি 'পলাশীর যুদ্ধ'কে মহাকাব্য কি খণ্ড-কাব্য বলেন?" আমি লিখিলাম—"আমি উহাকে অকাব্য বলি।"

'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়া মাত্র নবস্থাপিত 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে শুনিয়াছি, খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাটকরচয়িতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ ক্লাইভের অভিনয় করিয়া প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। এরূপ চারিদিকে 'পলাশীর যুদ্ধ' লইয়া তোলপাড়। বন্ধুবান্ধবদের কত পত্রই পাইতেছি। কিন্তু প্রেসের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে পত্র লিখিলে, তিনি প্রথম লিখিলেন যে, কেবল রঙ্গভূমিতে অভিনয় জন্য বারখানি 'পলাশীর যুদ্ধ' মাত্র বিক্রীত হইয়াছে। কথাটা বিশ্বাসই করিতে পারিলাম না। তাহা হইলে চারিদিক্ হইতে 'পলাশীর যুদ্ধ' সম্বন্ধে এত পত্র আসিল এবং এত লোকের মুখে 'পলাশীর যুদ্ধে'র কথা উঠিল কিরূপে? কিন্তু ইহার পর পত্র লিখিলে আর অধ্যক্ষ মহাশয় উত্তরই দেন না। এরূপে এক বৎসর চলিয়া গেল। তখন কলেজের একজন ছাত্রকে তাঁহার কাছে পাঠাইলাম। তিনি দুই শত টাকার এক রসিদ লিখাইয়া লইয়া, তাহার পর দিবস যাইয়া টাকা লইতে বলিলেন। সে রসিদ ফেরত চাহিলে তাহাকে বলিলেন—"তুমি ত বড় অভদ্র লোক। চলিয়া যাও। অন্যথা চাকর দিয়া বাহির করিয়া দিব।" সে ভদ্রলোকের ছেলে কাঁদিতে কাঁদিতে পার্শ্বের বাড়ীতে আমার পরিচিত এক কর্ম্মকারের কাছে গিয়া এই উপাখ্যান বিবৃত করিল। সে অধ্যক্ষ মহাশয়কে কিছু সুবচন শুনাইয়া দিয়া পুলিস ডাকিতে উদ্যত হইলে, অধ্যক্ষ মহাশয় অগত্যা রসিদখানির মায়া ত্যাগ করিলেন। আমার দাদা অখিলবাবু তখন হাইকোর্টের উকিল। নিরুপায় হইয়া এক ওকালতনামা তাঁহার কাছে নালিশ করিবার জন্য পাঠাইলাম। তিনি অধ্যক্ষ মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইলে, অধ্যক্ষ কাঁদিয়া বলিলেন যে, সমস্ত 'পলাশীর যুদ্ধ' একচোটে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু টাকাটা তিনি খরচ করিয়াছেন বলিয়া আমার পত্রের উত্তর দেন নাই। অথচ তখন ইনি একজন আলোক-প্রাপ্ত নামজাদা ধার্ম্মিক। বিধবাবিবাহ পর্য্যন্ত করিয়াছেন। দাদা লিখিলেন যে, ঋণের জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রেস পর্য্যন্ত আবদ্ধ ; নালিশ করিয়া টাকা পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কমিশন ইত্যাদি অতিরিক্ত হিসাবে বাদ দিয়া ছয় শত টাকার একখানি হেণ্ডনোট মাত্র পাঠাইয়া দিলেন। এই টাকাও দশ পনর টাকা করিয়া প্রায় তিন বৎসরে আদায় হইল। শুধু তাহা নহে, যদি উচিত সময়ে সংবাদ পাইতাম, তবে আরও দুই এক সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধ' ইতিমধ্যে উঠিয়া যাইত।

'অবকাশরঞ্জিনী' বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রেসে ছাপিয়াছিলেন। অতএব মুদ্রা-যন্ত্রের ভূতের সঙ্গে আমার এই প্রথম প্রীতিজনক পরিচয়।

পোতন ফকির

এখন আমার কৃতিত্বে ক্লে সাহেবের কিছু অতিরিক্ত বিশ্বাস হইল। তিনি এখন আমাকে একপ্রকার 'ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা'র মত করিয়া তুলিলেন। যে কাজেই হউক না কেন সর্ব্বত্র আমাকে নিয়োজিত করিতেন। পুলিস কোনও খুন, কি অন্য কোনও গুরুতর মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া নিষ্ফল হইলে, তিনি আমাকে তদন্তের জন্য পাঠাইতেন। কোনও দিকে বড় গৃহদাহের উৎপাত আরম্ভ হইলে—ইহা চট্টগ্রামের একটি প্রধান কলঙ্ক—আমাকে তাহা নিবারণ করিতে পাঠাইতেন। চট্টগ্রামে গৃহদাহ একটা শিল্পবিদ্যার মধ্যে পরিণত হইয়াছে। দুজনে মোকদ্দমা চলিয়াছে ; যে পরাজিত হইল, সে অপর পক্ষের গৃহদাহ করিয়া তাহার সর্ব্বস্বান্ত করিল। গৃহদাহের নাম 'বেনাকানুন' ও 'লালবলদ'। বহু দূর হইতে ধনু ও তীরের দ্বারা চালে অগ্নি নিক্ষিপ্ত হইল এবং বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে নিশীথ অন্ধকার আলোকিত করিয়া, অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল, একটি গ্রাম ভস্মীভূত করিল। এরূপ ভাবে দিনে অগ্নি দেওয়াও কিছু কষ্টকর বিষয় নহে। কোনও বৃক্ষ, কি জঙ্গলের আড়াল হইতে অলক্ষিতে তীর নিক্ষেপ করিলেই হইল। যাহা হউক, আমার এমনই নাম পড়িয়া গিয়াছিল যে, আমি যে অঞ্চলে গিয়া তাঁবু ফেলিয়া থাকিতাম, সে অঞ্চলে আর গৃহদাহ হইত না। সাতকানিয়া অঞ্চলে গিয়া, আমি শিবির স্থাপন করিয়া, এ কারণে একবার এক মাস ছিলাম। কোনও বিষয়ের বিশেষ তদন্ত করিতে হইলেও ক্লে আমাকে নিযুক্ত করিতেন, এবং কোনও বিশেষ রিপোর্ট লিখিতে হইলে, সে ভারও আমার উপর অর্পিত হইত।

দুটি খুনি মোকদ্দমার উল্লেখ করিব। শারদীয় উৎসব। অষ্টমী পূজার দিন দ্বিপ্রহরে এক কনেষ্টবল ক্লে সাহেবের পত্র লইয়া উপস্থিত। তাহাতে দেখিলাম, পোতন ফকির এক খুন করিয়াছে। পুলিস ভয়ে মোকদ্দমার উচিত তদন্ত করিতে পারিতেছে না। পত্র পাওয়া মাত্র আমাকে উক্ত তদন্তকার্য্যে যাইতে আদেশ করিয়াছেন। গ্রামময় পোতন ফকিরের নামে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। কর্ণফুলী নদীর তীরে ছন্দারিয়া, কি একটা গ্রামে—এখন ঠিক মনে নাই—পোতন ফকিরের আড্ডা। তাহার দেশপ্রচলিত নাম ও প্রতিষ্ঠা। তাহার এত দূর প্রতিপত্তি যে, কেহ হাইকোর্টে মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াছে, অপর পক্ষ পোতন ফকিরের আদালতে উপস্থিত হইল, এবং পোতন ফকির যদি তাহাকে বিরোধীর ভূমি দখল করিতে আদেশ দিল, তবে অন্য পক্ষ প্রাণান্তে সে ভূমির নিকটে আর যাইবে না। হিন্দু মুসলমান সমানভাবে তাহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া মনে করিত, এবং প্রত্যেক দিন শত শত লোক তাহার কাছে নানাবিধ অভিলাষ করিয়া যাইত। আমি তাহার বিরুদ্ধে তদন্ত করিতে যাইব? পরিবারস্থ সকলে কাঁদিতে লাগিলেন। কোনও মতে যাইতে দিবেন না। পিতৃব্যগণ বলিলেন —"নিতান্ত যদি যাও, তবে লাঠিয়াল সঙ্গে লইয়া যাও।" আমি বলিলাম—ফকির ত আমার সঙ্গে আর লাঠি ধরিবে না। যদি আমাকে মারে, তবে আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা মারিবে। লাঠিয়াল তাহা হইতে আমাকে কিরূপে রক্ষা করিবে? না গেলে আমার চাকরি থাকিবে না। 'না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।' এরূপ সংকটে পড়িয়া, সেই কনেষ্টবলটি মাত্র সঙ্গে লইয়া, বেলা অনুমান তিনটার সময়ে ঘটনার স্থানে পঁহুছিলাম। সেখানে দক্ষ পুলিস সবইনস্‌পেক্টার উপস্থিত ছিলেন। শুনিলাম যে, একটা লোক ফকিরকে কি একটা বিষয় লইয়া বড়ই ত্যক্ত করিতেছিল, তাহার পায়ে পড়িয়া রহিয়াছিল। ফকির বহু বার তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিলেও তথাপি সে ছাড়িল না। ফকির কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় গঞ্জিকা-দেবীর সেবক। নেশার চোটে তাহাকে দা দিয়া আঘাত করেন, এবং সে আঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেও তিনি এরূপ বহুতর খুন করিয়াছেন। মোকদ্দমা বেশ প্রমাণ হইয়াছে। তবে প্রধান সাক্ষী তাঁহার পোষ্য পুত্র ও তস্য স্ত্রী। তাহারা পরে সাক্ষ্য প্রতিহার করিতে পারে। অতএব সাক্ষ্য তখনই লিখিয়া লওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয় কথা, কোনও

কনেষ্টবল ফকিরকে স্পর্শ করিতে চাহে না। তাহাদের বিশ্বাস ফকিরের গায়ে হস্তক্ষেপ করিলে ছয় মাসের মধ্যে তাহাদের দুর্লভ কনেষ্টবলি লীলা শেষ হইবে। দেখিলাম, দারোগা মহাশয়েরও সেই আশঙ্কা। অতএব সেই মৃত্যুটা অন্যের স্কন্ধে চাপাইবার জন্য একজন 'জুডিসিয়াল অফিসার' পাঠাইতে তিনি রিপোর্ট করিয়াছিলেন।

আমি সপুলিস ফকিরের গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহখানির বিচিত্র অবস্থা। বাঁশের ঘর। প্রকাণ্ড কাঠের খুঁটি। কিন্তু ফকির দা দিয়া কোপাইয়া খুঁটিগুলির গোড়া প্রায় নিঃশেষ করিয়াছেন। মেঝের মাটিও সেরূপে সমস্ত খুঁড়িয়া রাখিয়াছেন। একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক তাঁহার সিংহাসন। সেটাও কোপাইয়া কোপাইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন। সর্ব্বদা তাঁহার হস্তে প্রকাণ্ড দা। তখনও তিনি সেই ভীষণ দায়ের দ্বারা সিন্দুক কোপাইতেছিলেন। গঞ্জিকাদেবীর কৃপায় দীর্ঘ শরীরখানি একটি কাষ্ঠদণ্ডবিশেষ হইয়াছে। বুঝিলাম যে, সেই দা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করেন তবে আমার ডেপুটিলীলা সেখানেই শেষ হইবে। সবইনস্‌পেক্টারকে বলিলাম, দাটা কাড়িয়া লইতে হইবে। কিন্তু কোনও কনেষ্টবল তাহা করিবে না। তাহারা বলিল, বরং পেটি খুলিয়া রাখিয়া তাহারা চলিয়া যাইবে। তখন সবইন্‌সপেক্টার ভক্তিপূর্ব্বক সেলাম করিয়া বলিলেন—"ফকির সাহেব! হাকিম আসিয়াছেন। আপনি দা ফেলিয়া দেন।" ফকির কাষ্ঠছেদনকার্য্য হইতে কঙ্কালাবশিষ্ট মস্তক উত্তোলন করিয়া, দুই তীব্র চক্ষুর দ্বারা আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। আমি নিঃশ্বাসহীন অবস্থায় প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমার দিকে সেই ভীষণ দায়ের গতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। জানি না, কি মনে করিয়া তিনি ভালমানুষের মত দা মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন। তখন স্বয়ং দারোগা উহা তুলিয়া লইলেন। উহা নররক্তে রঞ্জিত ছিল। দুই একটা খুঁটি ওই দ্বারের কপাটেও নরশোণিত ছিল। তখন আমি কনষ্টেবলদিগকে বলিলাম—"ফকিরকে বাহিরে লইয়া যা। ফকির ছয় মাসের মধ্যে মারেন ত আমাকে মারিবেন। তোরা আমার হুকুমমতে কার্য্য করিতেছিস্ মাত্র। তোদের মারিবেন কেন? তোদের অপরাধ কি?" তখন তাঁহার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিল—"ফকির সাহেব! হাকিম বাহিরে যাইতে হুকুম দিয়াছেন, চলুন।" ফকির আপনি সিন্দুক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তাহারা কোলাকুলি করিয়া, তাঁহাকে বরের মত বাহিরে লইয়া. এক বৃক্ষতলায় উপবিষ্ট করাইয়া তাঁহাকে মহাভীতির সহিত বাতাস করিতে লাগিল। প্রায় সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছে। কেহ ফকিরের পদধূলি লইতেছে, কেহ বাতাস করিতেছে, কেহ গায়ে হাত বুলাইতেছে, কেহ কিছু খাবার খাওয়াইতেছে। সে এক অপূর্ব্ব ভক্তির মহাপ্রদর্শন! আমারও চক্ষু সজল হইল। দারোগা ইতিমধ্যে টেবিল ও এক চেয়ার সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি উক্ত দৃশ্যের মধ্যে সাক্ষীর জবানবন্দি লিখিয়া লইলাম. এবং সায়াহ্ন সময়ে তাঁহার হাজতের হুকুম দিয়া, সহরে লইতে আদেশ করিলাম। কিন্তু তাঁহাকে হাতকড়ি দিবে কে? দারোগা ও কনেষ্টবলেরা কবুল জবাব দিল যে, তাহারা এ কর্ম্ম পারিবে না। তখন আমি নিজে হাতকড়ি দিয়া. চাবি বন্ধ করিয়া, চাবি দারোগার হাতে দিয়া, সজলনয়নে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সহস্র কণ্ঠে একটা ক্রন্দনের রোল উঠিল।

শারদীয় উৎসবের পর আফিস খুলিলে দেশব্যাপী একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। যে দিন আমার কোর্টে এই মোকদ্দমার তারিখ থাকিত, সেদিন কাচারির মাঠে পর্য্যন্ত লোক ধরিত না, এবং জেলখানা হইতে পোতন ফকিরকে আনিবার সময়ে এত লোকে হাত পাতিয়া দিত যে, তাহার পা আর মাটিতে পড়িত না। এ দিকে সাহেবমহলেও তোলপাড়। তাঁহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন যে, ইহাকে ফাঁসি দিতে হইবে। পোতন ফকির একটি কথাও সংলগ্নভাবে বলে না। তাহার অবস্থা দেখিলে একটি বালকও বুঝিতে পারে যে, অতিরিক্ত গাঁজাতে

তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে। তাহাকে ফকিরই বল, আর পাগলই বল—সামান্য লোকের কাছে পাগলই ফকির। কিন্তু সিবিল সার্জ্জন শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিলেন যে, পাগল নহে। কিন্তু আমি এরূপ জেরা করিলাম যে, তিনি উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না। তখন তাহাকে আরও কিছু দিন পরীক্ষাধীন রাখিয়া, পাগল কি ভালমানুষ, স্থির করিবার জন্য আবার সময় চাহিলেন। এ সময়ের অন্তেও আবার স্থির ভাবে সাক্ষ্য দিলেন যে, ফকির পাগল নহে। সে আপনার কর্ম্মের জন্য দায়ী। তখন তাহাকে সেসনে অর্পণ করিলাম। যদিও সমস্ত সাক্ষী সেখানে তাহাদের পূর্ব্বসাক্ষ্য প্রত্যাহার করিয়াছিল, তথাপি ফিল্ড (Field) সাহেব ফাঁসীর হুকুম দিলেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, হাইকোর্টও উহা বাহাল রাখিলেন। আমি তাহাকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া, পাগলের জেলে পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। সকল চেষ্টা বিফল হইল। শুনিলাম, ফাঁসীর দিবস তাহার একেবারে চলিবার শক্তি ছিল না। তাহাকে কাঁধে করিয়া আনিয়া ফাঁসীকাষ্ঠের মঞ্চে উঠান হয়, এবং সে অবস্থায় তাহার গলায় দড়ি দেওয়া হয়। সহরে একদিন আগে হইতে লোকের ভিড় হইয়াছিল। সকলের প্রথম বিশ্বাস ছিল, ফকির জেল হইতে অদৃশ্য হইবে। সেরূপ কত গল্পই কতবার উঠিল। তাহার পর বিশ্বাস হইল, সে দড়ি ছিঁড়িয়া পড়িবে, তাহা হইলে আর তাহার ফাঁসী হইবে না। যখন ফাঁসী হইয়া গেল, তখন সকলের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, ছয় মাসের মধ্যে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। তাহাও হইল না। কারণ, তখনও সংসারের ও 'সার্ভিসে'র অনেক দুর্গতি আমার ভোগ করিবার বাকী ছিল। তখন সাব্যস্ত হইল—"বেটা ফকির নহে, গাঁজাখোর ছিল।" কিন্তু এই কাষ্ঠখণ্ডের ফাঁসী না হইলে বৃটিশরাজ্য উঠিয়া যাইত না। আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম।

দ্বিতীয় খুনটির বিবরণ এইরূপ।—একদিন আমাকে আফিস হইতে ক্লে সাহেব ডাকিয়া লইয়া, কক্ষের সমস্ত দ্বার ও গবাক্ষ বন্ধ করিয়া, জজ সাহেবের একখানি দীর্ঘ পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। মাদারসা গ্রামে একটি লোক খুন হইয়াছে। সেসনে মোকদ্দমা এরূপ গিয়াছে যে, বিবাদীর সঙ্গে মৃত ব্যক্তির ক্ষেত লইয়া বিবাদ হয়, এবং বিবাদীর একটি ক্ষুদ্র মাদারের ডালের বাড়িতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু তাহার শিশুপুত্র—বয়স দশ বার বৎসর—সেসনে সাক্ষ্য দিবার সময়ে বলিয়াছে যে, পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টার ঘটনার স্থানে যান নাই। গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে এক গ্রামে বসিয়া তিনি মোকদ্দমা এরূপ চালান দিয়াছেন। তাহার পিতা বাস্তবিক এক বৃহৎ মাদারের ডালের দ্বারা আহত হইয়া খুন হইয়াছে। সেই ডাল সে তাহার ঘরে তুলিয়া রাখিয়াছে এবং পুলিসের শিক্ষামতে পূর্ব্বে মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে। জজ সাহেব বিচার স্থগিত রাখিয়া, আমাকে পাঠাইয়া পুনর্ব্বার তদন্ত করাইতে আদেশ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে সেই ছেলেটিকেও পাঠাইয়া দিয়াছেন। ক্লে সাহেব বলিলেন যে, আমাকে তৎক্ষণাৎ রওনা হইতে হইবে। সে ইন্‌সপেক্টার আমার একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি বড় যোগ্য লোক। ক্লে সাহেবেরও বিশ্বাসভাজন প্রিয় পাত্র। আমি বুঝিলাম যে, এই তদন্তে তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা। অতএব তাঁহার তদন্তের সকল কথা না জানিয়া মফঃস্বল যাওয়া হইবে না। আমি বলিলাম—আমার বুকে ব্যথা, ঘোড়ায় যাইতে পারিব না। পাল্কির বন্দোবস্ত করিয়া পরদিন প্রত্যূষে যাইব। সাহেব বলিলেন, তবে সেই ছেলেটিকে আমার সঙ্গে সমস্ত দিন রাত্রি রাখিতে হইবে, যেন কাহারও সঙ্গে কথা বলিতে না পারে। জজ সাহেবও তাহাই লিখিয়াছিলেন। সেই একদিন, আর পুলিসের অপ্রতিহত প্রভাবের এই এক দিন। আমি স্বীকৃত হইলাম। যতক্ষণ কাচারিতে ছিলাম, তাহাকে এজলাসের উপর আমার পায়ের কাছে বসাইয়া রাখিলাম, এবং রাত্রিতেও আমার পালঙ্কের নীচে শোয়াইয়া রাখিলাম। আমার সঙ্গে একবার অবিলম্বে দেখা করিতে ইন্‌স্‌পেক্টারকে সংবাদ দিলাম। কিন্তু 'মৃত্যুকালে রোগী না গেলে ঔষধি'। তিনি আসিলেন

না। আমি প্রাতে রওনা হইয়া, মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিলাম। ছেলেটি জজ সাহেবের কাছে যে জবানবন্দি দিয়াছিল তাহাই ঠিক। মোট কথা ঘটনার পরে উভয় পক্ষ আপোষ করিয়াছিল। একটা ক্ষুদ্র মাদারের ডালের বাড়িতে একটি লোক মরিতে পারে না। অতএব এরূপ সাক্ষ্য দিলে আসামী খালাস পাইবে। এ কারণে পরামর্শ করিয়া ইন্‌স্‌পেক্টারের কাছে এরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিল। কিন্তু মোকদ্দমা সেসনে অর্পিত হওয়াতে, আসামী যে টাকা দিবে বলিয়াছিল, তাহা দিতে অসম্মত হইল। তখন শিশুর পশ্চাতে 'টর্ণি' রকমের তাহার যে এক মামা ছিল সে প্রকৃত কথা জজ সাহেবের কাছে খুলিয়া বলাইয়াছিল।

গ্রাণ্ট সাহেব জজ। ইতি ভূতপূর্ব্ব লেঃ গবর্ণর গ্রাণ্টের পুত্র। আমাকে এজলাসের উপর তাঁহার পার্শ্বে এক চেয়ার দিয়া বসাইলেন। মোকদ্দমা শেষ হইলে তিনি জবানবন্দির জন্য ইন্‌স্‌পেক্টার তলব দিয়া তখনই আনাইয়া লইলেন। আমি দেখিলাম, গতিক ভাল নহে। ছল করিয়া দুই মিনিটের জন্য বিদায় লইয়া, নীচে যাইয়া ইন্‌স্‌পেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এত করিয়া ডাকিয়া পাঠাইলাম, আপনি আসিলেন না কেন?" তিনি অভিমান-ভরে উত্তর দিলেন—"আপনি জুডিসিয়াল অফিসার। তদন্ত করিতে যাইতেছেন। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করা অনুচিত।" আমি—"বিপদ্‌সময়ে মানুষের ঐরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে।"

এমন সময়ে জজ আমাকে ডাকাইলেন। খুব সাবধান হইয়া জবানবন্দি দিতে বলিয়া আমি ছুটিয়া আসিলাম। জজ সাহেব তাঁহার তদন্ত সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পায়ে পীড়া হইয়াছিল বলিয়া তিনি মোটেও ঘটনার স্থানে যান নাই। কাজেই সমস্ত প্রশ্নের আন্দাজে উত্তর দিতে লাগিলেন। অনেক উত্তর মিথ্যা হইল। জজ তাঁহাকে মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য তৎক্ষণাৎ ফৌজদারি সোপর্দ্দ করিলেন। তিনি সাক্ষীর বাক্সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কাচারি ভাঙ্গিয়া গেলে আমার বাসায় গিয়া, আমার গলা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মূল মোকদ্দমায় আসামীর কয় বৎসর কারাবাস হইল এবং মিঃ গ্রাণ্ট রায়ে আমার তদন্তের অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। তাহা করুন এ দিকে ঘোরতর বিপদ্। বন্ধুকে কিরূপে উদ্ধার করিব, সে ভাবনায় অস্থির হইলাম। তাঁহার প্রতিকূলে অভিযোগ এই যে, তিনি ঘটনার স্থানে না গিয়াও গিয়াছেন বলিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। সাক্ষীরাও অপ্রতিভ হইল। এমন হইবে জানিলে এবং তাহারা একটুক ইঙ্গিত পাইলে তিনি গিয়াছিলেন বলিয়া সাক্ষ্য দিত। দেশশুদ্ধ লোক তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। কারণ, তাঁহার দক্ষিণা গ্রহণ রোগ ছিল না। তিনি যে ডাইরিতে ঘটনার স্থানে গিয়াছিলেন বলিয়া মিথ্যা লিখিয়াছিলেন—সকল পুলিস অফিসার বাধ্য হইয়া প্রায় ডাইরি আমূলে মিথ্যা লেখেন—তাহারা কিরূপে জানিবে? কিছুদিন পরে তিনি আমাকে আসিয়া বলিলেন যে, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার মোকদ্দমা তদন্ত করিতে পরদিন ঘটনার স্থানে যাইবেন এবং তাঁহাকে সেখানে হাজির থাকিতে আদেশ দিয়াছেন। আমি কিছু বলিলাম না। এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমায় পুলিসসাহেব তদন্ত করিবেন কেন? তিনি চলিয়া গেলেন, অমনি ক্রে সাহেব আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং বলিলেন যে, তিনি পরদিন প্রাতে ঘটনার স্থানে তদন্ত করিতে যাইবেন। উক্ত ইন্‌স্‌পেক্টার যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, তিনি সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না। কারণ, তিনি একজন অতিশয় প্রাচীন বিশ্বস্ত ও সুযোগ্য কর্ম্মচারী (আমিও তাহাতে সায় দিলাম)। তিনি বলিলেন, অশ্বারোহণে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। আমি আবার ছল করিয়া বলিলাম, আমার সেই বুকের ব্যথা সারে নাই। আমি রাত্রিতে পাল্কিতে রওনা হইয়া, প্রত্যূষে ঘটনাস্থলের নিকটে মুন্‌সেফের কাচারিতে তাঁহার অপেক্ষা করিব। বাসায় ফিরিয়া এই কথা জানাইতে ইন্‌স্‌পেক্টারকে ডাকাইলাম।

কিন্তু তিনি চলিয়া গিয়াছেন। আমি প্রভাতে গিয়া তাঁহাকে উক্ত স্থানে পাইলাম এবং উক্ত চাতুরির কথা বলিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমিও ভয়ানক চিন্তিত হইলাম। দেখিতে দেখিতে ক্লে সাহেব আসিলেন। সেখান হইতে হাঁটিয়া, কাদা ভাঙ্গিয়া ঘটনার স্থানে গেলাম। শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির মধ্যে একটা পুষ্করিণীপাড়ে বৃক্ষতলায় বসিয়া ক্লে সাক্ষীর জবানবন্দি লইলেন। তিনি ও আমি পুকুরের পাড়ে ঘাসের উপর বসিলাম। তাঁহার ভাবে বুঝিলাম, তিনি সকল সাক্ষীর জবানবন্দি অবিশ্বাস করিলেন। তাহারাও ইচ্ছা করিয়া সেরূপভাবে জবানবন্দি দিতেছিল। শেষকালে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী জ্বর শুদ্ধ আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জবানবন্দি দিলে, দেখিলাম—ক্লে সাহেব তাহা বিশ্বাস করিলেন, এবং তাঁহার মুখ মলিন ও গম্ভীর হইল। সমস্ত দিন সকলের অনাহারে গেল। সন্ধ্যার সময়ে রওনা হইয়া, রাজপথে আসিয়া, সাহেব আমাকে রাজপথের নির্জ্জন স্থানে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার মত কি?" আমি যত দূর পারি, ইন্‌স্‌পেক্টারের অনুকূলে বলিলাম। কিন্তু দেখিলাম, তাহাতে তাঁহার মনের ভাবের ব্যতিক্রম হইল না। পরদিন ১৯৩ ধারার অপরাধে মোকদ্দমা সেসনে দিলেন। ইন্‌স্‌পেক্টার হুকুম শুনিয়া, আসামীর বাক্সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বলিয়াছি, তাঁহার অপরাধ—তিনি ঘটনাস্থানে না গিয়া, গিয়াছেন বলিয়া ডাইরিতে লিখিয়াছিলেন, এবং কাজে কাজে বাধ্য হইয়া সেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ঘোরতর বর্ষা; তাঁহার পায়ে রোগ; ঘটনার স্থানে এক জলাকীর্ণ প্রকাণ্ড মাঠ। তাঁহার সেই মাঠে যাইবার বিশেষ প্রয়োজনও কিছু ছিল না। তিনি নিকটের গ্রামে বসিয়া তদন্ত করিয়াছিলেন। তাহাতে এ বিপদ্‌। এমনি পুলিসের চাকরি, এবং এমনি সূক্ষ্ম রাজনীতি। আর যে তিনি যান নাই, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সাক্ষীরা সেসনে এইরূপ বলে—

প্র। তুমি ইন্‌স্‌পেক্টারবাবুকে পূর্ব্বে চিনিতে?

উ। না।

প্র। তবে কিরূপে জানিলে—তিনি যান নাই?

উ। বড় দারোগা কি আর চোরের মত যাইবেন? সঙ্গে কত লোক, কত কনষ্টেবল থাকিত, একটা মহাগোলমাল হইত।

প্র। সে দিন খুব বৃষ্টি ছিল?

উ। হাঁ।

প্র। কেহ সেই বৃষ্টির সময়ে বাহির হইতে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

উ। সে ত' কত লোকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

প্র। তুমি সকলকে দেখিয়াছিলে?

উ। না।

বস্‌। ইন্‌স্‌পেক্টার বলিয়াছিলেন যে, তিনি বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি খালাস পাইলেন। বলা বাহুল্য, এ সকল জেরা আমি লিখাইয়া দিয়াছিলাম, এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলাম। খালাস হইয়া আসিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। এরূপে পালা শেষ হইল।

গৃহ-রক্ষা

ক্লে সাহেব ক্রমে ক্রমে সমুদয় বিভাগের কার্য্য—খাসমহল, কোর্ট অফ ওয়ার্ডস, ইত্যাদি আমার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমার কার্য্যের প্রতি তাঁহার অচল বিশ্বাস। একটা

দৃষ্টান্ত বলিব। চড়কগাছ উপলক্ষে কোনও প্রতিষ্ঠাভাজন উকিলের মেলাতে একটি দাঙ্গা (riot) হয়। মোকদ্দমা আমি বিচার করিয়া, অপরাধিগণের দণ্ড করি। তাহারা আপিল করে। আত্মগরিমাপূর্ণ ফিল্ড (Field) সাহেব জজ। আমার সহপাঠী এবং ফিল্ড সাহেবের প্রিয় একজন উকিল তর্কের সময়ে বলেন যে, উক্ত মেলাস্বামী উকিল, বাদীর পক্ষে সাক্ষী ছিলেন বলিয়া, আমি পক্ষপাত করিয়া বিবাদীদের দণ্ড দিয়াছি। বড় গুরুতর অভিযোগ। ফিল্ড সাহেব উকিলকে তিনবার সতর্ক করেন, কিন্তু তিনি তিন বারই বলেন, তাঁহার মক্কেল তাঁহাকে এরূপ উপদেশ দিয়াছে এবং তিনি উহা প্রমাণ করিতে পারিবেন। রক্তের এমনই মহিমা! তখন ফিল্ড বিচার স্থগিত রাখিয়া, মাজিস্ট্রেট ক্লে সাহেবের কাছে উহার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিতে আদেশ প্রেরণ করেন। কিন্তু ক্লে সাহেব ব্যাঘ্রহন্তা বীর। তিনি লেখেন—আমার ন্যায়বিচারের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। অতএব তিনি তদন্ত করিবেনই না। অপিচ তিনি ঘটনাক্রমে ঘটনার অব্যহতি পরে উক্ত মেলাস্থানে পঁহুছিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন এবং তাঁহার ডাইরিতে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়া আমার বিচারের দৃঢ়রূপে পোষকতা করিলেন এবং উপসংহারে সে উকিল মিথ্যাবাদী বলিয়া, তাহার বিরুদ্ধে একজন বিচারকের (Judicial officer) নামে অপবাদের জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে উকিলের নাম চাহিলেন। আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই রিপোর্ট শুনিয়া উকিল মহাশয় লাঙ্গুল গুটাইলেন, এবং সেই অবধি আমার একজন পরম শত্রু হইয়া রহিলেন। ফিল্ড সাহেবও অকণ্টবন্ধে পড়িয়া, তখন অগত্যা আমার বিচারের খুব প্রশংসা করিয়া আমার হুকুম বাহাল রাখিলেন।

আর এক দিবস আফিসে ডাকিয়া, ক্লে সাহেব তাঁহার কক্ষের চারিদিকের কপাট বন্ধ করিয়া কমিশনর হেস্কি সাহেবের একখানি পত্র আমার হস্তে দিলেন। পত্রে লেখা আছে যে, চট্টগ্রামের একজন প্রধান হিন্দু জমিদারের কাশীতে পুত্রহীন অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী সম্পত্তি শাসনে অক্ষম, কলেক্টর যদি এরূপ বিবেচনা করেন, তবে তাঁহার ষ্টেট কোর্টে আসিবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবেন। কমিশনর এ কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করিতে লিখিয়াছেন এবং আরও লিখিয়াছেন যে, ঠাকুরাণীর বৈবাহিক মহাশয় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর সঙ্গে যোগ দিয়া সম্পত্তিটা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মৃত জমিদারের আত্মীয় নবচন্দ্র রায় তখন কমিশনের সেরেস্তাদার। তাহারই প্ররোচনায় কমিশনর উক্ত পত্র লিখিয়াছিলেন। ক্লে সাহেব আমাকে বলিলেন—আমাকে এখনই রওনা হইতে হইবে। আমি বলিলাম—এই কার্য্যে যাইতে আমার দুটি আপত্তি আছে। প্রথম—অল্পদিন পূর্ব্বে এই জমিদারের কন্যার সঙ্গে আমার একজন খুড়তুত ভাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে তিনি আমাকে সামাজিক ভাবে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। আমি পিতৃব্য মহাশয়ের অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া, বরযাত্রী হইয়া গিয়া, তাঁহার বাড়ীতে খাইতে অস্বীকার করি। তখন মহাগোলযোগ উঠে। সকলেই খাইতে অসম্মত হন। শেষ রাত্রিতে জমিদারের মাতা আমাকে ডাকিয়া লইয়া, আমার দু হাত ধরিয়া আহার করিতে বলেন। তখন আমরা খাইতে যাই। কিন্তু তখনই রাত্রি প্রভাত হয়। আমাদের বরযাত্রী ব্রাহ্মণ ও প্রজা—প্রায় তিন হাজার লোক উপবাসী ফিরিয়া আসে। জমিদার মহাশয়ের প্রায় দশ হাজার টাকার খাদ্য সামগ্রী ইত্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। এখন আমি তাঁহার ষ্টেট কোর্টে আনিতে গেলে তাঁহার স্ত্রী মনে করিবেন, আমি শত্রুতা উদ্ধার করিতে গিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার বৈবাহিক আমার খুড়া। অতএব আমার পক্ষে উভয় সঙ্কট। কিন্তু ক্লে সাহেব গোঁয়ার গোবিন্দ। তিনি এ সকল আপত্তি গ্রাহ্য করিলেন না।

সন্ধ্যার পর আহার করিয়া, আমার সহপাঠী নবনিয়োজিত ম্যানেজারকে সঙ্গে লইয়া, আমি রওনা হইয়া, ঠিক ঊষাসময়ে জমিদারের বাড়ী গিয়া পঁহুছি। আমি নববাবু হইতে

বাড়ীর এক নক্সা আঁকিয়া লইয়াছিলাম। দ্বারে দ্বারে কনেষ্টবল ও পেয়াদার পাহারা নিযুক্ত করিয়া, (যেন কোনও লোক কোন জিনিসপত্র লইয়া বাহির হইয়া যাইতে না পারে), আমি বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে পাল্কিতে উপস্থিত হইলাম। গোলযোগ দেখিয়া সেই প্রধান কর্ম্মচারীর নিদ্রাভঙ্গ হয়, এবং সে বাহির হইয়া আসে। নববাবু বলিয়াছিলেন যে, লোকটি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনিই দুষ্ট। পঁহুছিয়া তাহাকে জব্দ করিতে না পারিলে সে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিবে। আমিও কনেষ্টবলদিগকে সেরূপ rehearsal (শিক্ষা) দিয়া অভিনয়-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে গৃহের বারাণ্ডা হইতে জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা কে?"

উ। একবার আসিয়া দেখ না।

প্র। আপনারা কিজন্য আসিয়াছেন?

উ। তোমার মুণ্ডটা লইবার জন্য।

আমি। না, না। শুনিয়াছি, আপনি একজন খুব বড়লোক, এ সংসারটা ধ্বংস করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তাই, আমরা কিছু অংশ পাইতে পারি কি না, আপনার সঙ্গে বন্ধুতা করিতে আসিয়াছি। আপনি একবার অবতীর্ণ হউন।

সে বুঝিল—গতিক ভাল নহে। অন্তঃপুরে যাহাতে ঠাকুরাণী সংবাদ পাইয়া, অলঙ্কার ইত্যাদি সরাইতে পারেন, সেজন্য সে খুব চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা কোর্টের পক্ষে আসিয়াছেন?"

অমনি একজন কনষ্টেবল গর্জ্জন করিয়া বলিল—"তোর বাবার পক্ষে তোর বাবা আসিয়াছে। বেটা ষাঁড়ের মত চেঁচাইতেছিস্ কেন? যদি ভাল চাহিস্ ত নামিয়া আয়।"

কনেষ্টবল অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া সে বুঝিল যে, বীরত্বের অপেক্ষা বুদ্ধি ভাল। নামিয়া আমার পাল্কির কাছে বসিয়া—"এই যে, আমাদের বাবু যে?" বলিয়া এক ভক্তিপূর্ণ নমস্কার দিয়া বলিল—"আমার প্রতি কি আদেশ?"

উ। আপাততঃ এই আদেশ—তুমি যেখানে আছ, সেখানে দাঁড়াইয়া থাক।

দুই কনেষ্টবল গিয়া তাহার দুই পার্শ্বে দাঁড়াইল, এবং বলিল—"হুকুম শুনিলে ত? এক পা নড়িবে, তবে আমাদের হাতের কোমলতা দুই কানে বুঝিবে।"

আমি। নন্দী মহাশয়! (তাহার নাম কি নন্দী ছিল—) আপনি এই কনেষ্টবলদের সঙ্গে সহরে গিয়া, কলেক্টর সাহেবের কাছে হাজির হইবেন।

প্র। আমার কি অপরাধ?

উ। তাহা তিনি জানেন। আমি তাঁহার আজ্ঞাবহ মাত্র।

প্র। আমি খড়ম পায়ে দিয়া এত দূর পথ কি প্রকারে যাইব?

আমি। তবে খড়ম ছাড়িয়া যান।

প্র। খালি পায়?

উ। খালি পায়।

প্র। আমি যদি না যাই?

উ। কনেষ্টবলেরা কি বলিয়াছে, শুনিয়াছেন ত?

প্র। আপনার কি একজন ভদ্রলোককে এরূপে অপমান করিবার অধিকার আছে?

উ। একবার তবে দেখিবেন কি?

নন্দী। আমি যাইতেছি। তবে আপনার খুড়া মহাশয়ের কাছে একখান পত্র লিখিতে চাহি।

আমি। আপত্তি নাই।

তখন নন্দী একজন মোসাহেবকে ডাকিলেন।

আমি। কেন? তাহাকে প্রয়োজন?

উ। আমি চক্ষে এ আঁধারে দেখিতে পাই না। তাহাকে বলিলে সে লিখিবে।

আমি ভাবিলাম ভাল। কি লেখে, আমিও শুনিতে পাইব। তখন সে খুব চীৎকার করিয়া—উদ্দেশ্য, ঠাকুরাণী অন্তঃপুর হইতে শুনিয়া জিনিসপত্র সরান—বলিতে লাগিল—"অদ্য প্রাতে কোর্টের পক্ষ হইতে—"

আমি তখন গর্জ্জন করিয়া বলিলাম—"আবার চেঁচাচ্ছ?" ইঙ্গিতমাত্র এক কনষ্টেবল এক ঠেলা দিয়া বলিল—"চল্, বেটা চল্! তোর আর পত্র লিখে কাজ নাই।"

নন্দী। আমার একটা ঔষধের বাক্স আছে, তাহা লইতে চাহি।

ভৃত্য বাক্স আনিল। আমি বলিলাম—"উহাতে কি ঔষধ আছে, আমি দেখিব।"

নন্দী। অনেক ঔষধ। আমি তাহা দেখাইব না।

আমি। কনষ্টেবল! তবে মার লাথি বাক্সে।

নন্দী। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আপনি হিন্দু। বাক্সে আমার পূজার বাণেশ্বর লিঙ্গ আছেন।

আমি। তাই ত ভদ্রলোকের মত বলিতেছিলাম—বাক্সটি খোল। আমরা সমস্ত রাত্রি হিম খাইয়াছি। দেখি, আমরাও একটু ঔষধ খাই।

তখন নন্দী দ্রুতহস্তে বাক্স খুলিয়া, এক তাড়া কাগজ সরাইয়া লইতেছিল। আমি বলিলাম—"ওগুলি কি?"

উ। আমার গোপনীয় চিঠি।

আমি। আমি একবার ও সকল প্রণয়-লিপি পড়িব।

প্র। আপনার কি গোপনীয় চিঠি পড়িবার অধিকার আছে?

উ। তবে তাহা দেখাই।

কনষ্টেবল একজন কুটুম্বিতাবাচক সম্বোধন করিয়া, উহা কাড়িয়া লইল। দেখি, কতকগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ এবং খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে কালনিমের লঙ্কাভাগের জন্য যে সকল ষড়্যন্ত্রমূলক পত্র লেখা হইতেছিল, তাহা সেই তাড়াতে আছে। তখন কনষ্টেবলেরা নন্দী মহাশয়কে লইয়া উক্ত বাক্স সহ যাত্রা করিল। আমি ক্রে সাহেবের কাছে লিখিলাম যে, যে পর্য্যন্ত আমি কার্য্য শেষ করিয়া না ফিরি, তিনি ইহাকে তাঁহার চক্ষের উপর রাখিবেন। লোক বড় দুষ্ট।

ইতিমধ্যে গ্রামস্থ যে সকল ভদ্রলোকদের আমি ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। একদিকে তাঁহারা এ দৃশ্য দেখিয়া ও শুনিয়া আকুল। অন্য দিকে ঠাকুরাণী দোতালাস্থ গবাক্ষের কাছে আসিয়া, আমাকে আকুলপ্রাণে অজস্র গালি বর্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহি বলিয়া, তাঁহার জনৈক পুরোহিতের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলে সেই গালাগালির স্রোতে বন্যা ছুটিল; আমি মহাশত্রু, বিধবা পাইয়া শত্রুতা উদ্ধার করিতে আসিয়াছি—ইত্যাদি কত অমৃতই বর্ষিত হইতেছিল। আমি অবিচলিতহৃদয়ে সে অমৃত পান করিয়াও হাসিতেছি দেখিয়া, বোধ হয় তাঁহার দয়া হইল। তখন ডাকিয়া পাঠাইলেন। সমবেত তাঁহার আত্মীয়গণ সমভিব্যাহারে আমি তাঁহার দ্বিতল কক্ষের বহির্ভাগে বসিয়া, ধীরে ধীরে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে লাগিলাম। ষ্টেট শাসন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অন্তরাল হইতে কবুল জবাব দিলেন যে, তিনি জমিদারি শাসন করিতে পারিবেন না। তখন জিনিসপত্রের তালিকা করিতে চাহিলে, তিনি কতকগুলি ছেঁড়া কাপড় বাহির করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম—সংসারে এই ছেঁড়া কাপড় কয়খানি মাত্র সম্বল বলিলে, কলেক্টর আমাকে ও তাঁহাকে পাগল মনে করিবেন। তখন তিনি হাসিয়া সুপ্রসন্নকণ্ঠে

বলিলেন—"আপনিও ত আমার কুটুম্ব। আপনি ঘরের মধ্যে আসিয়া জিনিসপত্রের তালিকা করিয়া লউন।" গৃহে প্রবেশ করিয়াই আমার জলধর মন্ত্রীর মহাবাক্য মনে পড়িল—"মেয়েমানুষ যখন বাপান্ত করিল, তখন জানিবে—সে মুঠের ভিতর।" তিনি আমাকে দেখিয়াই এক মোহিনী হাস হাসিলেন। আমি বলিলাম—"ঠাকুরাণি! আপনি ত বড় বিচিত্র লোক। আমাকে এই তিন ঘণ্টাকাল গালি দিয়া এখন হাসিতেছেন?" তিনি বলিলেন—"এরূপ না করিলে আপনার খুড়ো আমার বেহাই আমার উপর বড় রাগ করিতেন। আপনি যেরূপে পারেন, জমিদারিটা কোর্টে দিয়া, এ ঘরটি রক্ষা করুন।" এ বলিয়া আমাকে সমস্ত চাবি ফেলিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া হাস্য কৌতুক করিতে করিতে সমস্ত জিনিসপত্রের তালিকা করাইয়া দিলেন। এ কার্য্যে প্রায় পনর দিন লাগে। ঠাকুরাণীটি বড় সুন্দরী ছিলেন। এমন সুন্দর বিস্তৃত নয়ন ও আবেশময় নয়নতারা আমি দেখি নাই। কুটুম্বিতাবলে তাঁহার সঙ্গে আমার পরিহাস চলিত। তালিকা শেষ হইলে বলিলাম—"কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য সম্পত্তি যাহা, তাহা ত তালিকাভুক্ত হইল না।" তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি?" উত্তর—"আপনার দুই নয়নতারা। উহার মূল্য দুই লক্ষ।" দোষের মধ্যে বড় স্থূলাঙ্গিনী ও স্থূলবুদ্ধি-শালিনী ছিলেন। তাঁহার মধ্যম বয়স। বড় ভাল মানুষ।

সহরে আসিয়া, জমিদারি কোর্টে আনিবার জন্য রিপোর্ট করিলাম। উহা বোর্ডে চলিয়া গেল। আমি জমিদার মহাশয়ের গ্রামে থাকিবার সময়ে আমার খুড়ো মহাশয় ও ঐ নন্দী আমলা পূর্ব্বোক্ত উকিল মহাশয়ের দ্বারা আমার নামে নানা কুৎসাপূর্ণ দরখাস্ত করিয়াছিলেন। ক্লে সাহেব তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া, ছিন্ন কাগজের আধারে বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি সেখান হইতে আসিবামাত্র খুড়ো মহাশয় আবার সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্লে সাহেব আমাকে আমার গ্রামস্থ বাড়ী যাইবার সময়ে পথ হইতে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহাকে উক্ত কর্ম্মচারীর মত গ্রেপ্তার করিয়া পাঠাইতে ও যে পর্য্যন্ত বোর্ডের অর্ডার না আসে, আমাকে সেখানে থাকিতে আদেশ দিলেন। আমি সেখানে গিয়া খুড়ো মহাশয়ের দর্শন পাইলাম। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় দিলাম। ঠাকুরাণীটির কাছে গেলে তিনি বলিলেন যে, খুড়ো মহাশয়ের রোদন সহ্য করিতে না পারিয়া, একখানি কি কাগজ দস্তখত করিয়া দিয়াছেন। উহা একজন কর্ম্মচারী তাহার বাড়ীতে পূর্ব্বরাত্রিতে লইয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাড়ী হইতে কনষ্টেবলের সুকোমল করে সে কাগজখানির সহিত গ্রেপ্তার করাইয়া আনিলাম। কাগজখানি উকিল মহাশয়ের নূতন অস্ত্র—আমি 'ছলে বলে নাগরালি' করিয়া ঠাকুরাণীকে বশীভূত করতঃ জমিদারি কোর্টে আনিতেছি। অতএব বোর্ড যেন তাহা গ্রাহ্য না করেন। সে দরখাস্ত সহ সেই লোকটিকে সাহেবের কাছে পাঠাইলাম, এবং আরও পনর দিন সেই গ্রামে আমার পিসিমার অন্ন ধ্বংস ও ঘোরতর জ্বর ভোগ করিয়া, বোর্ডের হুকুম আসিলে এই পালা শেষ করিয়া সহরে আসিলাম।

সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ ও 'ক্লিওপেট্রা' কবিতা

বলিয়াছি যে, একে একে ক্লে সাহেব সমস্ত বড় বিভাগের ভার আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। খাসমহল বিভাগও এরূপে আমার হস্তে পড়ে। তখন খাসমহল—চট্টগ্রামে তাহার নাম নওয়াবাদ—ইজারাদারগণ লোকের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। চট্টগ্রামের

এই 'নওয়াবাদে'র ইতিহাস যথাস্থানে বলিব। যে সকল তালুক অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সে সকল একত্র করিয়া, এক এক 'সার্কেল ফার্ম' বা ইজারা-চক্র গঠন করা হইয়াছিল। এই ইজারাদারেরা তহসিলের উপর শতকরা কুড়ি টাকা পাইত। আমার নিজগ্রামের লোকেরা সর্ব্বদা আমাদের অঞ্চলের Circle Farmer বা ইজারাদারের নামে আমার কাছে তাহার উৎপীড়নের কথা বলিত। এ সময়ে এ সকল ইজারার মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছিল। আমি তাহা উপলক্ষ্য করিয়া এক বৃহৎ রিপোর্ট করি যে, আর ইজারা না দিয়া, ইজারা-মহলের শাসন বেতনভোগী কর্ম্মচারীর দ্বারা নির্ব্বাহিত করাইলে প্রজারা ইজারাদারদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাইবে, ইজারাদারদের অপেক্ষা আমাদের আপন কর্ম্মচারীদের উপর আমাদের অধিক অধিকার থাকিবে, এবং এ সকল কর্ম্মচারীর দ্বারা কেবল রাজস্ব উশুল ভিন্ন আমরা আরও অনেক কাজ করাইতে পারিব। কিঞ্চিৎ red tapism বা লাল ফিতার ধ্বংসর পর বোর্ড আমার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। যেই এক একটি ইজারার মেয়াদ শেষ হইতে লাগিল, আমি এক একজন তহসিলদার নিযুক্ত করিতে লাগিলাম। অতএব চট্টগ্রামের খাস তহসিল-প্রণালীর প্রবর্ত্তক আমি। তবে আমার নিয়োজিত তহসিলদারদের বেতন ছিল চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা মাত্র, এবং তাহারা সংখ্যায় অনেক ছিল। এখন তাহাদের সংখ্যা কমাইয়া দুই শত হইতে তিন শত বেতনে পাঁচ জন তহসিলদার রাখা হইয়াছে। লোক সেই সম্প্রদায়েরই। বরং এখন কাহারও কাহারও যেরূপ উৎকোচ গ্রহণের ও প্রজাপীড়নের অপবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তখন সেরূপ পাওয়া যাইত না। একজন ডেপুটি কলেক্টরের অধীনে থাকাতে, এবং তাহাদের তহসিল অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট হওয়াতে, তাহাদের এরূপ সুযোগও ছিল না। এখন তহসিলদারেরা কটন সাহেবের কৃপায় নিজে ডেপুটি কলেক্টর, এবং তাহারা কলেক্টরের অধীনে। সংখ্যায় অল্প হওয়াতে কার্য্যকারিত্বও কমিয়াছে। বর্ত্তমান প্রণালীতে গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে, এবং তহসিলদারগণ 'উচ্চজাতি' বা উচ্চপদস্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রজাদেরও 'উচ্চশূলে'র ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাদের শাসনের কঠোরতা ক্ষুদ্র তহসিলদারগণ অবলম্বন করিতে সাহস করিত না।

বাঁশখালি আউটপোণ্টে খাসমহলের সমুদ্রতীরস্থ বাঁধ বহু দিন হইল, সমুদ্রপ্লাবনে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। প্রজাদের কষ্টের সীমা ছিল না। খাসমহলে খাজানা মাত্র আদায় হইতেছিল না। কারণ, সমুদ্রপ্লাবনে সমস্ত ফসল নষ্ট হইত। এমন কি, লবণজলে ক্ষেতে তৃণগাছটিও জন্মাইত না। পূর্ত্তবিভাগের প্রভুরা—স্মরণ হয়, এই বাঁধের (embankment) জন্য এষ্টিমেট্ করিয়াছিলেন পঁচাত্তর হাজার টাকা। এই অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়া, প্রজাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া, আমি ব্যথিত হই। প্রজারা বলে—বিশ হাজার টাকা হইলে বাঁধ প্রস্তুত হইবে। আমি একজন ওভারসিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহা সম্ভব বোধ করিলাম। তখন আমি বিশ হাজার টাকার এক এষ্টিমেট্ প্রস্তুত করিয়া এক দীর্ঘ রিপোর্ট করিলাম। পূর্ত্তবিভাগ দলে বলে 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা কতরূপ বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ করিলেন। এরূপ অস্ত্রের প্রতিঅস্ত্র নিক্ষেপে আমিও বড় অসিদ্ধহস্ত নহি। যুদ্ধ গড়াইতে গড়াইতে 'বোর্ডে' যায় এবং সেখানে আমার জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠে। আমার প্রস্তাব গৃহীত হয়, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতে আমি বাঁশখালি আউটপোণ্টের সম্মুখে শঙ্খনদ ও কুমিরাছড়ার সঙ্গমস্থলে সমুদ্রাভিমুখে করিয়া শিবির স্থাপন করি। পশ্চাতে চাঁদপুরের ও কালীপুরের পর্ব্বতমালা। স্থানটি অতীব মনোহর। এখানে সস্ত্রীক তিন মাস শিবিরবাসী থাকিয়া কাজ শেষ করি। বাঁধ অনুমান দশ মাইল লম্বা। সমস্ত কার্য্য পদব্রজে প্রত্যহ প্রাতে পরিদর্শন

করিতে হইত; কারণ, এরূপ স্থানে অশ্বারোহণ চলে না। মধ্যাহ্নে কখন কখন বা এ অঞ্চলের ফৌজদারি মোকদ্দমা করিতাম। একটি মোকদ্দমা কিঞ্চিৎ আদিরসঘটিত পাইয়াছিলাম। নিকটবর্ত্তী একজন প্রাচীন জমিদার মহাশয়ের একটি যুবতী অবিদ্যা ছিল। 'বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।' তাহা ঠিক। তাহার সোহাগের সীমা নাই। কিন্তু 'মিষ্টহাসি, মিষ্টভাষী, অবিশ্বাসী নারী।' একদিন সে শিকল কাটিয়া চাঁদপুরের চা-বাগানের এক কেরাণীর কাছে অভিসার করে। জমিদার রাজদ্বারে কেরাণীর বদ্‌রসিকতার জন্য অভিযোগ উপস্থিত করেন। মোকদ্দমা আমার কাছে আসে। ভজন সিং এখানকার একজন কনষ্টেবল। তাহার মূর্ত্তি হাস্যপ্রদ। তাহার ভাষা ততোধিক। সে না হিন্দী, না বাঙ্গালা, বদ্‌হিন্দি ও বদ্‌বাঙ্গালা-মিশ্রিত এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে শিবিরের সম্মুখে নদীতীরে বসিয়া, তাহার অপূর্ব্ব ভাষা ও আলাপ শুনিয়া হাসিতে হাসিতে দিবসের শ্রম অপনোদন করিতাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"তোম আওরতকু দেখা হায়?"

উত্তর। দেখা বাবু!

প্র। উয়ে বড়ি খুবছুরত হায়?

উ। বাবু, ছালির নাউক ভি নাই আছে।

আমি নিজে গিয়া কেরাণীর আশ্রয় হইতে তাহাকে লইয়া আসি। অবশেষে বৃদ্ধ জমিদার মহাশয়ের 'চোকের জলের বাঁধনে সে বাঁধা পড়িয়া' আবার তাঁহার হৃদয়পিঞ্জরে ফিরিয়া যায়।

বৈশাখ মাসে বাঁধের কার্য্য শেষ করিয়া সহরে ফিরিয়া গেলাম। আষাঢ় মাসে ক্রে সাহেব বাঁধ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। কি মনোহর দৃশ্য! নবশ্যামদূর্ব্বাদলাবৃত বাঁধ দীর্ঘায়ত একটি বিশাল ভুজঙ্গের মত স্থানে স্থানে অঙ্গ বাঁকাইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছে। একদিকে নবশস্যশোভিত প্রান্তর এবং বর্ষাবিধৌত গ্রামশোভা। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের অনন্ত সলিলরাশি। আকুলপূরিত সেই প্রাবৃট্‌সিন্ধুর কি ভীষণ মূর্ত্তি! সিন্ধুর কি ভীষণ নৃত্য! কী ভীষণ গর্জ্জন! তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁধের দীর্ঘ নবদূর্ব্বাদলরাশি ভাসিতেছে, নাচিতেছে, এবং শ্বেত ফেনপুঞ্জে রজত-মণ্ডিত হইতেছে। নৃত্যশীল দ্রুতগামী তুরঙ্গের গ্রীবার কেশরাশির মত তৃণরাশি নৃত্য করিতেছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইল, সেই শোভা দেখিয়াছিলাম। আজিও যেন উহা সদ্যোবৎ দেখিতেছি। ক্রে সাহেব আনন্দে অধীর হইলেন। স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিতে লাগিলেন ও তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি ফিরিয়া গিয়া সেই বাঁধের ও বাঁধনির্ম্মাতার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া রিপোর্ট করিলেন। পূর্ত্তবিভাগ হেঁটমুণ্ড হইলেন।

এই বাঁধের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে 'কুতুবদিয়া'। উহা বঙ্গোপসাগর-গর্ভস্থ একটি অতীব মনোহর দ্বীপ। এখানে একটি সুন্দর গগনস্পর্শী বাতিঘর (Light house) আছে। এই দ্বীপও খাসমহল। বহু বৎসর হইল, ইহাও ইজারাদারের হাতে বাঁধহীন হইয়া গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিয়াছে। ইহার আয় বাইশ হাজার টাকা ছিল। এখন তিন হাজার চার হাজার টাকাও উশুল হয় না। সমস্ত দ্বীপ সমুদ্রপ্লাবনে লবণাক্ত হইয়া পড়িয়া আছে। এই দ্বীপ পরিদর্শন করিতে গিয়া এবং ইহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। ইহার বাঁধের জন্য পূর্ত্তবিভাগের মহাপ্রভুরা ১,৫০,০০০্ দেড়লক্ষ টাকা এষ্টিমেট করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের পূর্ব্ববাঁধ ভাসিয়া যাইবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দ্বীপটি সমুদ্রগর্ভে বসিয়া যাইতেছে। তাঁহাদের বিশ্বাস, উহা শীঘ্র

বিলুপ্ত হইবে ; অতএব এত ব্যয় করিয়া বাঁধ প্রস্তুত করা তাঁহারা উচিত বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ের তর্কে বিতর্কে, বহু বৎসর গিয়াছে। লাল ফিতার গ্রন্থি কখন যে শেষ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই দ্বীপটি উদ্ধার করিবার জন্য আমি যুগপৎ দুইটি প্রস্তাব করিলাম। প্রথমতঃ, গবর্ণমেণ্ট ৬০,০০০, ষাট হাজার টাকা দিলে আমি বাঁশখালির মত বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দিব। দ্বিতীয়তঃ, দ্বীপ লুপ্ত হইতেছে মনে করিয়া গবর্ণমেণ্ট নগদ এত টাকা দিতে অসম্মত হইলে, পাঁচ বৎসরের খাজনা ছাড়িয়া দিন, আমি তালুকদারদের দ্বারা বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া লইব। পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়া, পূর্ত্তবিভাগ এবার একটা পানিপথের সঙ্কল্প করিলেন। Executive Engineer ক্লে সাহেবের সঙ্গে স্বয়ং দেখা করিয়া, বোধ হয় এ প্রস্তাবের প্রতিকূলে এত বলিয়াছিলেন ও বিভীষিকা দেখাইয়াছিলেন যে, ক্লে সাহেব আমার প্রস্তাব সেরেস্তায় ফেলিয়া রাখিলেন। কক্‌রেল (Mr· H· A· Cockrell) সাহেব তখন চট্টগ্রামের কমিশনর এবং ইডেন সাহেব (Sir A· Eden) তখন বর্ম্মার চিফ্ কমিশনর (Chief Commissioner)। উভয়ে বড় বন্ধু। তাই সে সময়ে ইডেন সাহেব চট্টগ্রামে বেড়াইতে আসেন। আমি মাগুরা থাকিবার সময়ে বাবু মহিমচন্দ্র পাল এক পত্র দিয়া, তাঁহার সঙ্গে মাগুরা হইতে ভবুয়া যাইবার পথে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। শুনিয়াছিলাম, তিনি চট্টগ্রামের দক্ষিণ-অংশ বৃটিশ-বর্ম্মাভুক্ত হওয়া উচিত কি না, তাহার সিদ্ধান্ত করিতে আসিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে সে অংশ সম্বন্ধে অনেক আলাপ হইল। তাহাতে কুতুবদিয়ার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা ও আমার বাঁধের প্রস্তাবের কথা আসিয়া পড়িল। তিনি বলিলেন—"তুমি এখনই কক্‌রেল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, সেই প্রস্তাবের কথা আমার নাম করিয়া বলিবে।" একখানি চিঠিও দিলেন। আমি কক্‌রেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া সে সকল কথা বলিলে তিনি বলিলেন—"তুমি এখনই আমার কাছে তোমার প্রস্তাবসম্বলিত রিপোর্ট প্রেরণ করিবে।" আমি বলিলাম, কলেক্টর আবার তাহা না পাঠাইলে আমি কেমন করিয়া পাঠাইব? তিনি বলিলেন—"তুমি রিপোর্টের আরম্ভে লিখিও, কমিশনরের আদেশমতে তুমি এ রিপোর্ট করিতেছ।" আমি তাই করিলাম, এবং অন্য কাজের জন্য কুতুবদিয়া চলিয়া গেলাম। ক্লে সাহেব পত্র লিখিলেন যে, তিনি আমার রিপোর্ট লইয়া স্বয়ং কুতুবদিয়া আসিবেন। তাঁহার না আসা পর্য্যন্ত আমাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে লিখিয়াছিলেন। অতএব আমি এবার কুতুবদিয়াতে তাঁহার অপেক্ষায় বহুদিন রহিলাম। অবশেষে তিনি আসিলেন। বরঘোপ্ কাচারির পার্শ্বে সমুদ্রতীরে আমি তাঁবু ফেলিয়াছিলাম। তিনি ক্রমান্বয়ে দুইদিন প্রাতে সেই কাচারিতে আসিয়া রিপোর্ট লইয়া বসিলেন। আমি দুইদিনই আমার প্রস্তাব তন্ন তন্ন করিয়া বুঝাইলাম। কিন্তু শুনে কে? সঙ্গে নববিবাহিতা পত্নী আসিয়াছেন। তিনি সমুদ্রতীরে এক বটবৃক্ষতলায় বিরাজিতা, এবং ক্লে সাহেবের নয়ন ও মন সেখানে পড়িয়া আছে। আমার কথা শুনে কে? দুজনের মধ্যে ঘন ঘন প্রেমালাপও চলিতেছে। কিছুক্ষণ এ ভাবে কাটাইয়া, পরদিন আমাকে তাঁহার 'পিনেছে' (pinnace) যাইতে বলিলেন। আমি ও কলেক্টারির সেরেস্তাদার সেখানে গিয়া মাঠের মধ্যে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর সাহেব বজরা হইতে ডাঙ্গায় আসিলেন। নয়নযুগল সুরারাগে রঞ্জিত। আর একবার আমার প্রস্তাব বুঝাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি আবার উহা ব্যাখ্যা করিলাম। তখন তিনি বলিলেন—"আমি নিতান্ত নির্ব্বোধ হইতে পারি, কিন্তু এখনও বুঝিলাম না।" আমি দ্বীপের একটা নক্সা মাঠের মাটিতে বিছাইলাম এবং তাহার পার্শ্বে তিনজনে হাঁটুর উপর ভর করিয়া বসিয়া, আর একবার বুঝাইলাম।

এবারে সাহেব বলিলেন যে, তিনি বুঝিয়াছেন। কিন্তু আমার সে সম্বন্ধে তখনও কিঞ্চিৎ সন্দেহ রহিল। নবোঢ়া পত্নীপ্রেম ও সুরাপ্রেম বুঝিবার পথে বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল। যাহা হউক, তিনি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া কামশনরের কাছে লিখিলেন এবং পরে এ প্রস্তাবানুসারেই কুতুবদিয়ার বাঁধ নির্ম্মিত ও কুতুবদিয়া পুনর্জীবিত হইয়াছিল।

কুতুবদিয়ার সঙ্গে আমার জীবনের অনেক সুখস্মৃতি গাঁথা রহিয়াছে। যাহাদিগকে লইয়া সেখানে কত আনন্দ করিয়াছিলাম, তাহারা সকলে এ সংসার-রঙ্গভূমি হইতে তিরোহিত হইয়াছে। আর তাহাদের স্নেহস্মৃতিতে উদ্বেলিতহৃদয়ে শোকাশ্রু বর্ষণ করিবার জন্য আমি মাত্র আছি।

এই কুতুবদিয়াতে শিবিরে থাকিবার সময়ে 'ক্লিওপেট্রা' কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। উহার সূচনা-পত্রে যাহা লেখা আছে, তাহার প্রত্যেক অক্ষর সত্য। বঙ্কিমবাবু 'বঙ্গদর্শনে' ছাপিবার জন্য চাহিয়া লইয়া লিখিলেন যে, উহা মাসিক পত্রিকার জন্য বেশী বড় হইয়াছে। তিনি উহা 'বঙ্গদর্শন' প্রেসে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে ছাপিবেন লিখিলেন। তাহার কিছুদিন পরে অকস্মাৎ কবিতার অর্দ্ধেক 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লিখিলেন যে, তাঁহার পীড়ার সময়ে প্রবন্ধাভাবে তাঁহার অজ্ঞাতসারে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। আর ছাপা হইবে না। তিনি হস্তলিপি ফেরত পাঠাইলে কবিতাটি কিছুদিন পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'বঙ্গদর্শনে' যে সময়ে উহার অর্দ্ধেক প্রকাশিত হয়, ঠিক সে সময়ে 'বান্ধবে' কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের—তখনও তিনি রায় বাহাদুর হন নাই—'ক্লিওপেট্রা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধের প্রথমাংশ বাহির হয়। আশ্চর্য্য সমবায়িতা। তাঁহাতে আমাতে তাহার পূর্ব্বে 'ক্লিওপেট্রা' সম্বন্ধে একটি অক্ষরও লেখালেখি হয় নাই। তিনি ভীষণ ব্রাহ্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার গুরুগম্ভীর ভাষায় তাহার উপর অজস্র গালি বর্ষণ করিয়াছিলেন। আমার কবিতার প্রথমার্দ্ধ পড়িয়াই তিনি আমার কাছে ক্ষমা চাহিয়া এক পত্র লেখেন। স্মরণ হয়, তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—"আমি এতদিনে বুঝিলাম যে, কবিতে এবং একজন সামান্য প্রবন্ধলেখকে কি গুরুতর প্রভেদ! আমি অকিঞ্চিৎকর ধর্ম্মাভিমানে অন্ধ হইয়া, 'ক্লিওপেট্রা'কে কি ঘৃণিতভাবে চিত্রিত করিয়াছি! আমি পাপকে কি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছি, আর আপনি উহাকে কি পুণ্যের চক্ষে, দয়ার চক্ষে, করুণার চক্ষে দেখিয়াছেন! আপনার কবিতাটি পড়িয়া আমি বড়ই লজ্জিত হইয়াছি। আমার প্রবন্ধ আর প্রকাশিত হইবে না।" তদনুসারে, স্মরণ হয়, উহা আর প্রকাশিত হয় না। ঐরূপ মহত্ত্ব কেবল কালীপ্রসন্নবাবুর মত মনস্বী ব্যক্তির সম্ভবে। কালীপ্রসন্নবাবু লিখিয়াছিলেন—ধর্ম্মাভিমানে অন্ধ না হইলে কখনও এরূপ লিখিতেন না। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মধ্বজী, ভরসা করি—কালীপ্রসন্নবাবুর এই একটা ক্ষুদ্রকার্য্যের দ্বারা তাঁহাদের চক্ষের আবরণ খুলিবে এবং বঙ্গদেশের একদিক্ হইতে যে সময়ে অসময়ে ধর্ম্মের একটা 'বেজায আওয়াজ' শুনা যায়, তাহা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইবে। শ্রীভগবানের একটি মধুর নাম 'পতিতপাবন'। তুমি আমি কে, যে পাপীকে ঘৃণা করিব! মানুষ মাত্রই অপূর্ণ। পাপী নহি কে?

চট্টগ্রামের রোডসেস্

প্রথম অধ্যায়

ক্রে সাহেব স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মিঃ ভিজি (J· C· Veasey) তাঁহার স্থানে অস্থায়ী কলেক্টর। আমি কুতুবদিয়ার খাসমহলের কার্য্যে আবার সেখানে শিবিরে অবস্থিতি করিতেছি। একদিন অকস্মাৎ ভিজি সাহেবের আদেশ উপস্থিত—"আমি আপনার হাতে রোডসেস্ আফিসের ভার অর্পণ করিয়াছি। অতএব এ পত্র পাওয়া মাত্র আপনি সদরে ফিরিবেন।" কুতুবদিয়া বাস আমার বিশেষ আনন্দের বিষয় ছিল। যখন তাহার পশ্চিম দিক্‌স্থ সমুদ্রশোভা দেখিতাম, যখন তাহার নীল লহরীমালায় নৃত্যশীলা তরণীতে যাতায়াত করিতাম, যখন সেই দ্বীপবাসীদের অকৃত্রিম ভালবাসা পাইতাম, তখন আমি জগৎ ভুলিয়া যাইতাম। আমার এই আনন্দের আখ্যান শেষ হইল। আনন্দের দিন ফুরাইল। সমস্ত দ্বীপ ব্যাপিয়া একটা কান্নার রোল উঠিল। একটি লোককে বড় ভাল বাসিতাম। সে আমার কাছে কিছু নিদর্শন চাহিল। আমি তাহাকে নানাবিধ জিনিস দিতে চাহিলাম, সে একে একে সকলই অস্বীকার করিল। শেষে অশ্রুসিক্তমুখে বলিল—"আমি আর কিছু চাহি না। টাকা, পয়সা, জিনিসপত্র আর কিছু চাহি না। তোমার পরিধানের এই পুরাতন কাপড়খানি চাহি। উহাতে তোমার শরীরের সঙ্গ আছে। আমি উহা বহুমূল্য মনে করিয়া রাখিব।" এমন অকৃত্রিম, কোমল, স্নিগ্ধ, মৃদু-সৌরভ-গর্ব্ব স্নেহকুসুম সভ্যতার আলোকে ফুটে না। আমি গলদশ্রুলোচনে কাপড়খানি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে দিলাম, এবং তাহার অশ্রুর মধ্যে কি আনন্দই দেখিলাম।

চট্টগ্রামে প্রায় লক্ষ মহাল। ত্রিশ বত্রিশ হাজার কেবল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারি, এবং ত্রিশ বত্রিশ হাজার নাখরাজ মহাল, এবং ত্রিশ বত্রিশ হাজার নওয়াবাদ মহাল। এ কারণে এখানে রোডসেস্ আইন প্রচলিত করা অসম্ভব বলিয়া কলেক্টর, কমিশনর, বহুকাল আপত্তি করিয়া উহা প্রচলিত করিতে দেন নাই। কিন্তু বঙ্গদেশের আর সমস্ত জেলায় উহার কার্য্য হইয়াছে বা আরম্ভ হইয়াছে, একা চট্টগ্রাম উহার গ্রাস হইতে মুক্ত হইতে পারে না বলিয়া, শেষে সার জর্জ কেম্বেল সেই ভীষণ কেম্বেলি ধরণের আদেশ প্রেরণ করিয়াছেন। এ সকল কথা বলিয়া ভিজি সাহেব বলিয়াছেন—"আপনি স্থানীয় লোক, অতএব এই কঠিন কার্য্য যদি সম্ভব হয়, তবে আপনিই কেবল পারিবেন। সেজন্য আপনার উপর আমি এ ভার দিয়াছি। আমি আড়াই শত কেরাণী এবং আড়াই শত মোহরর নিযুক্ত করিয়াছি। ইহার মধ্যে অনেক মুসলমান আছে। তাহারা বোধ হয়, কলম অপেক্ষা লাঙ্গলে বেশী পারদর্শী। অতএব ইচ্ছা করিলে এ সব লোক ছাড়াইয়া দিয়া অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন।"

রোডসেস্ আফিসে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটা বাজার বসিয়াছে। প্রায় পাঁচশত প্রকারের পাঁচশত লোক। একটি কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডবিশেষ। লোক দেখিয়া এবং কার্য্যের জটিলতা বুঝিয়া, কার্য্যদক্ষ হেডক্লার্ক মহাশয় প্রথমেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তিনি এ কাজ পারিবেন না বলিয়া, তাঁহার পূর্ব্বকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কেহই এ কাজে আসিতে চাহে না। তেমন লোকও দেখিতেছি না। বড় সঙ্কটে পড়িলাম। চট্টগ্রামের গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে যিনি আমার শিক্ষক ছিলেন, সেই উমাচরণ দত্ত মহাশয়ের দিকে আমার চক্ষু পড়িল। বুঝিলাম, সেরূপ একটি পাকা স্কুলমাষ্টার না হইলে এই কেরাণীবাহিনীর কাপ্তানি আর কেহ করিতে পারিবে না। অথচ কেমন করিয়া গুরুমহাশয়কে শিষ্যের অধীনে কাজ করিতে বলি। তাঁহার কঠোর কর্ণমর্দ্দনের চিহ্ন বুঝি তখনও নবীন যুবকের কর্ণে ছিল, এবং পৃষ্ঠেও তাঁহার মসৃণ বেত্রের প্রেমস্পর্শচিহ্নও

থাকিবার কথা। বড় সন্তর্পণে তাঁহার কাছে প্রস্তাব করিলাম। তখন তিনি জজের অফিসে চল্লিশ টাকা বেতন পাইতেছিলেন। এখানে আশী টাকা পাইবেন। তিনি স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু ভিজি সাহেবের কাছে এ প্রস্তাব উপস্থিত করিলে এবং শিক্ষক মহাশয়ের গুণপণার ব্যাখ্যা করিলে তিনি হাসিয়া বলিলেন—"এ স্কুলমাষ্টারের কাজ নহে। পাকা কেরাণী চাহি।" যাহা হউক, আমি জিদ্ করিলে, তিনি বলিলেন—তবে না হয় পরীক্ষাধীন রাখিতে পার। তিনি প্রথমদিন মাষ্টার মহাশয়ের মূর্ত্তি দেখিয়া, এবং মাষ্টার মহাশয়ও সাহেবের বিকৃত মুখভঙ্গী দেখিয়া, পরস্পর নিরাশ হইলেন। আমি উভয়কে ভরসা দিতে লাগিলাম।

এ দিকে রোডসেস্ আফিসে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি প্রকাণ্ড স্কুল বসিল। প্রত্যেক দিন প্রথমে আফিসে গুরু শিষ্যে মিলিয়া কোন্ রেজিষ্টার কিরূপে পূরণ করিতে হইবে, কোন্ কার্য্য কিরূপ প্রণালীতে করিতে হইবে, কোন্ রুলের কিরূপ ব্যাখ্যা হইবে, তাহা স্থির করিতাম। তারপর মাষ্টার মহাশয় আসরে অবতীর্ণ হইতেন। তিনি এক প্রকাণ্ড কালোবোর্ড প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। কখন সেই বোর্ডে অংকপাত করিয়া, কখন বা আমাদিগকে স্কুল পড়াইবার সময়ে যেরূপ অঙ্গুলির উপর অঙ্গুলি দিয়া বুঝাইতেন, সেরূপ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সৈন্যদলটিকে শিক্ষা দিতেন, এবং স্কুলমাষ্টারের মত ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহারা কিরূপে রেজিষ্টার পূরণ করিতেছে, কিম্বা অন্য কাজ করিতেছে, তাহা সমস্ত দিন পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। সময়ে সময়ে সেই মাষ্টারি কণ্ঠে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেন, এবং কর্ণমর্দ্দনের ধমক পর্য্যন্ত দিতেন। আমার কক্ষে বসিয়া, এই দৃশ্য দেখিয়া আমি এক এক সময়ে খুব হাসিতাম। ঠিক স্কুলমাষ্টারের মত আমলাদের পাঠ (task) দিতেন। কোন্ রেজিষ্টারের কত ঘর রোজ পূরণ করিতে হইবে, কোন্ নোটিশ রোজ কত লিখিতে হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, বোর্ডে খুব বড় অক্ষরে লিখিয়া দিতেন। ভিমরুলের বাসায় ঢিল পড়িলে যেরূপ হয়, সেরূপ কতক্ষণ মহা গোল হইত। এত কাজ তাহারা পারিবে না বলিয়া আপত্তি করিত। কতক মিষ্টহাসি ও মিষ্টকথা, কতক ধমক দিয়া তিনি আপত্তি ভঞ্জন করিতেন। এরূপে তাহাদের সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খাটাইতেন। যে দিন বেতন পাইত, সে দিন প্রত্যেকের বেতন হইতে চাঁদা তুলিয়া মিঠাই আনাইতেন এবং সন্ধ্যার সময়ে লালদীঘির পাড়ে পংক্তিভোজনের ব্যবস্থা হইত। তিনি তাহার অধ্যক্ষগিরি করিয়া বেড়াইতেন। লোকে চারিদিকে দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিত, এবং খাদক ও দর্শকের হাসিতে দীঘির জল কাঁপিয়া উঠিত। কখনও বা ভিজি সাহেব স্বয়ং আফিস হইতে বা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া হাসিতেন, এবং আমোদিত হইতেন। তিনি কিছু দিন পরে আমাকে বলিলেন—"আপনি ঠিক লোকই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। এমন স্কুলমাষ্টার না হইলে এ দুরূহ কার্য্য এরূপ সুশৃংখলা করিয়া চালাইতে পারিতেন না।"

এরূপ আনন্দের সহিত কার্য্য চলিতেছে, এমন সময়ে চট্টগ্রামের লোক যাঁহাকে 'কালকূট' বলিত, তিনি চট্টগ্রামের কলেক্টর হইয়া আসিলেন। এমন ক্ষুদ্রাশয় ইংরাজ বুঝি সিভিল সার্ভিসে কখনও আসে নাই। মূর্ত্তিখানি সরল দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। মুখের ও নাসিকার এমন এক বিকৃত ভঙ্গী যে, উহা দেখিলেই এবং তাঁহার সানুনাসিক কণ্ঠ শুনিলেই প্রাণে কেমন একরূপ আতঙ্ক উপস্থিত হইত, এবং চাণক্য ঠাকুরের সতর্কবাণী মনে পড়িত—"শৃঙ্গিনাং দশহস্তেন"। আসিবামাত্রই কীর্ত্তি ছড়াইয়া পড়িল। গৃহসজ্জার মধ্যে সামান্য কয়েকটা মোড়া ও চেয়ার। শুনিয়াছি, মফস্বলে গেলে

কনষ্টেবলের উরু উপাধান করিয়া শিবরের গালিচায় শয়ন করিতেন, এবং বৃক্ষাশিকড়ে বসিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেন।

আমার অদৃষ্ট মন্দ। এতাদৃশ মহাপুরুষের আবির্ভাবের পর গবর্ণমেণ্ট, চট্টগ্রামে রোডসেস্ কত টাকা হইবার সম্ভব, তাহার একটা এষ্টিমেট্ চাহেন। আমার বংশ চট্টগ্রামের একটি বিখ্যাত জমিদারবংশ। আমার নিজেরও কিঞ্চিৎ জমিদারি—বিশ্বাসঘাতক আত্মীয়গণের দ্বারা পিতা হৃতসর্ব্বস্ব হইবার পরও, আছে। তাহার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া, আমি গড়ে কাণি প্রতি আড়াই টাকা, কৃষকের দত্তখাজনা স্থির করিয়া, পঁচাত্তর হাজার, কি আশী হাজার টাকার এষ্টিমেট্ করি। কুড়ি বিঘায় ষোল কাণি। মিঃ ম—তখন চট্টগ্রামের কমিশনর। তিনি শিকার করিতে রাঙ্গানিয়া অঞ্চলে গিয়া শুনিয়াছিলেন যে সেখানের চরের জমির কাণি প্রতি দশ টাকা পর্য্যন্ত খাজনা আছে। তাহার তুল্য উর্ব্বরা ভূমি যে চট্টগ্রামে নাই, তাহা সাহেব মহোদয়ের জ্ঞান ছিল না। তিনি তদ্রূপ গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের যে সকল নওয়াবাদ তালুকের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছে, তাহার পুনরায় জরিপ ও বন্দোবস্ত করিলে অপর্য্যাপ্ত খাজনা বৃদ্ধি হইবে। কাজেই আমি দশ টাকার স্থলে আড়াই টাকা খাজনার গড় ধরিয়াছি দেখিয়া তিনি চটিয়া লাল হইয়া কলেক্টরকে লিখিলেন যে, আমি কলেক্টরের ভ্রম জন্মাইয়াছি, এবং আমার রিপোর্ট অবিশ্বাসযোগ্য। কালকূট চিঠি পাইবামাত্র আমাকে ডাকিলেন। তিনি এরূপ রাগিয়াছিলেন যে, কথা কহিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। যে মিষ্টালাপ হইল, তাহার অর্থ এই যে, তাঁহার যদি ক্ষমতা থাকিত, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে পদচ্যুত ত করিতেনই, আমার ফাঁসি পর্য্যন্ত দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কাঁপিতে কাঁপিতে আদেশ করিলেন যে, অবিলম্বে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—কেন আমার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রিপোর্ট করা হইবে না। যত জেলাতে রোডসেস্ কার্য্য শেষ হইয়াছিল, তাহাদের বিজ্ঞাপনী হইতে অঙ্ক তুলিয়া এবং যেখানে কাজ চলিতেছিল, সেখানের ডেপুটি কলেক্টরদের কাছে পত্র লিখিয়া অঙ্ক আনাইয়া, আমি দিস্তাখানি কাগজ কৈফিয়ৎ লিখিয়া প্রমাণ করিলাম যে, বঙ্গদেশের কোনও স্থানে গড়ে আড়াই টাকার অধিক কাণি প্রতি খাজনা পাওয়া যায় নাই।

রিপোর্ট পাইয়া কালকূট এবার আর আফিসে নহে, আমাকে ঘরে ডাকাইলেন। রিপোর্টের এক এক 'প্যারা' পড়েন, আর ক্রোধে অধীর হইয়া আমার উপর অগ্নি বর্ষণ করেন। এক এক বার চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়ান। হাতাহাতির গতিক মনে করিয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াই। আবার তিনি বসিলে আমিও বসি। এরূপ ভাবে আটটা বেলা হইতে দুইটা বেলা হইল। রিপোর্ট পড়া শেষ হইল। তখন শ্রীমুখের ভঙ্গী ভীষণ শার্দ্দুলোপম। দাঁতে দাঁতে কাটিয়া শার্দ্দুলের মত ক্রোধে ঘর্ঘর-কণ্ঠে অর্দ্ধস্পষ্ট, অর্দ্ধ অস্পষ্ট ভাবে সানুনাসিক স্বরে বলিতে লাগিলেন—"আপনি কমিশনরের অপেক্ষাও বড়লোক—আপনি কমিশনরকেও মানেন না,—আপনি কমিশনরের উপরও হাত চালাইতে চাহেন। আপনার যুক্তি চাহি না,—আমার আদেশ, আপনি কাণি প্রতি আট টাকা খাজনা ধরিয়া এষ্টিমেট প্রস্তুত করিয়া দিবেন।" আমি বলিলাম—"আমি লিখিত আদেশ চাহি।" এবার একেবারে শিমুলস্তূপে অগ্নি পড়িল—"কি! কি! আপনি এত বড়লোক যে, আমার মৌখিক হুকুম মানিবেন না?" সানুনাসিক ধ্বনি ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়াছে। আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম—"না। কারণ, এরূপ এষ্টিমেট পরে ঘোরতর অসঙ্গত প্রমাণিত হইবে। আমি গবর্নমেণ্টের কাছে দায়ী হইব।" সাহেব চেয়ার হইতে উঠিয়া, দ্বারের প্রতি হস্তপ্রসারিত করিয়া ব্যাঘ্রের মত গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"আপনি চলিয়া যান।

আমি আপনার নামে গবর্নমেণ্টে রিপোর্ট করিব।' আমি 'গুড্‌বাই' বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, তিনি বলিলেন—"দাড়ান।" আমি দাড়াইলাম। তখন একটুকরা কাগজে লিখিয়া দিলেন—"ডেপুটি কলেক্টরের যুক্তি আমি চাহি না। সে কাণি প্রতি পাঁচটাকা খাজনা ধরিয়া এষ্টিমেট্ করিয়া দিবে।" বলিলেন—"এই আমার লিখিত আদেশ। এখন আপনি উহা পালন করিবেন কি না?"—আমি দেখিলাম, দশটাকা হইতে প্রথম আটটাকা, আবার এক নিশ্বাসে পাঁচ টাকা হইয়াছে। বলিলাম—"করিব"। আফিসে গিয়া ১,৫০,০০০্ টাকার এষ্টিমেট পাঠাইলাম। উহা কমিশনরের কাছে পাঠাইবার সময়ে 'কালকূট' লিখিলেন—"আমি নূতন লোক বলিয়া ডেপুটি কলেক্টর যথার্থই অবিশ্বাস্য রিপোর্ট দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিলাম।"

দৃষ্টিটা বেশ প্রখর রকম রহিল। একদিন পাঁচটার সময়ে আমি বাড়ী চলিয়া গিয়াছি। ইচ্ছা করিয়া তাহার পর রোডসেস্ আফিসে গিয়া, তিনি আমার কাছে এক টুকরা কাগজে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আমি পাঁচটার পূর্ব্বে আফিসে আসিয়া দেখিলাম, ডেপুটি কলেক্টর চলিয়া গিয়াছেন। রোডসেস্ কার্য্য অতি গুরুতর। অতএব ডেপুটি কলেক্টর তৎক্ষণাৎ আফিসে আসিবেন।' আমি তাহার নীচে লিখিয়া দিলাম—"আফিসের ঘড়িতে পাঁচটা বাজিলে আমি চলিয়া আসিয়াছি। আমার শরীর অসুস্থ, আমি এখন আফিসে ফিরিতে পারিব না।"

তার পরদিন আফিসে গিয়া দেখি যে, অর্ডারবুকে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন—"আমি পাঁচটার পূর্ব্বে আফিসে আসিয়া দেখিলাম, ডেপুটি কলেক্টর চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে লিখিয়া পাঠাইলেও তিনি আসিলেন না। আমলাগণ অধিকাংশ রাউজান ও পটিয়া থানার লোক কেন, তিনি কৈফিয়ৎ দিবেন।" শুনিলাম, প্রত্যেক আমলাকে তাহার বাড়ী কোন্ থানায় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই আদেশের হুলটুকু (Sting) এই যে, আমার বাড়ী রাউজান থানার এলেকায়, এবং পটিয়া থানার এলেকায় আমার সমস্ত আত্মীয়কুটুম্ব। আমি তাহার নীচে কৈফিয়ৎ লিখিলাম—"আমি কালই কলেক্টরকে জানাইয়াছি যে, আমি আফিস ঘড়িতে পাঁচটা বাজিলে আফিস হইতে বাড়ী গিয়াছিলাম এবং শরীর অসুস্থ বলিয়া ফিরিয়া আসিতে পারি নাই। অধিকাংশ আমলার বাড়ী রাউজান ও পটিয়া কেন, সে কৈফিয়ৎ ভিজি সাহেব দিবেন; কারণ, তিনি তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি করিনাই। তবে কারণ এই যে, রাউজান ও পটিয়ার মত ভদ্র ও শিক্ষিত লোক অন্য কোনও থানায় নাই।"

মফঃস্বল যাইবার সময়ে রাস্তার পার্শ্বের জমির খাজনা কত, লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যদি কোথায়ও শুনিলেন যে, উহা আড়াইটাকার বেশী, অমনি আমার কাছে এক চিরকুট প্রেরিত হইল—"অমুক জমির খাজনা লোকে বলিল আড়াইটাকার বেশী। ডেপুটি কলেক্টর কি বলিতে চাহেন?" উত্তর—"ডেপুটি কলেক্টর কিছুই বলিতে চাহেন না। তবে সেই রাস্তার জন্য জমি গবর্নমেণ্ট লইবার সময়ের কাগজ দৃষ্টে দেখা যায় যে, খাজনা আড়াইটাকার কম ধরিয়া প্রজাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছিল।" শেষে আর ইংরাজি ভাষায় কুলাইল না। একদিন এক বাঙ্গালা রোবকারি এ মর্ম্মে 'কালকূটী' বাঙ্গালায় আসিল—"দেখিল কলেক্টর সাহেব খাজনা তিনটাকা মাইলের রাস্তার দশ কাণি প্রতি। ডেপুটি কলেক্টর চিন্তা করিয়া করিয়া পাইল না দেখিতে বেশী আড়াইটাকা হইতে। ডেপুটি কলেক্টর দিবে কৈফিয়ৎ তাহার ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ।" আমি তাহার নীচে লিখিয়া দিলাম—"আমি ইহার অর্থ বুঝিলাম না।" 'কালকূটে'র দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি বাঙ্গালায় একজন দিগ্‌গজ পণ্ডিত।

কেরোসিনের কুণ্ডে আগুন পড়িল। কলেক্টরি আফিসের গৃহ শুদ্ধ কালকূটের ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিল। আমাকে 'তলব' হইল। আদেশ হইল—Sit down (বঁসুন)—বলিয়াছি, সাহেবের সমস্ত বর্ণের উচ্চারণই সানুনাসিক। আলাপের বাঙ্গালা অনুবাদ এরূপ।

সা। এই বেয়াদপি আপনার?

আমি। বেয়াদপি কি সাহেব?

সা। আপনি বাঙ্গালা বুঝেন না?

আ। যৎকিঞ্চিৎ বুঝি।

সা। আমি শুনিয়াছি—আপনি বাঙ্গালার কবি। আপনি এ বাঙ্গালা বুঝিলেন না কেন?

আ। উহা বাঙ্গালাই নহে।

সা। তবে কি?

আ। আমি বলিতে পারি না।

সা। আচ্ছা, আমি দেখাইতেছি যে, উহা বাঙ্গালা।

কলেক্টরির সেরেস্তাদার উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে সাহেব সে কাগজখানি দিয়া বলিলেন—"পড়িয়া ইহার অর্থ এ বাবুকে বুঝাইয়া দাও।" সেরেস্তাদার মহাশয় পড়িলেন; কষ্টে হাসি চাপিয়া, শেষে নীরব রহিলেন।

সা। চুপ করিয়া রহিলে যে?

সে। মোহরর লিখিতে বোধহয় ভুল করিয়াছে। (তিনি জানিতেন না উহা সাহেবের নিজের বাঙ্গালা)।

'কালকূটে'র ক্রোধে মলিন শ্বেতারক্ত শ্রীমুখখানি আরও মলিন ও ভয়ংকর হইয়া উঠিল। নাসিকার শব্দ একেবারে প্রবাদের ভূতের মত ঘোরতর সানুনাসিক করিয়া একজন মুসলমান মোহররকে ডাকিলেন। তাঁহার সন্দেহ যে, সেরেস্তাদার হিন্দু বলিয়া তাঁহার এমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা বুঝিয়াও আমার খাতিরে মুখ ফুটিয়া বলিতেছে না।

মুসলমান মোহরর আর কেহ নহে, আমার সেই পুরাতন কবি মুন্সী। সাহেব তাহাকে বলিলেন—"ইঁয়ে বাঁবু ইঁয়ে বাঁঙ্গাঁলা রোঁবকাঁরি নেঁহি সঁমঁজঁতোঁ হাঁয়। তোঁম পঁড়কেঁ ইঁনকুঁ সঁমঁজাঁ দেঁও।" শুনিয়া মুন্সী সাহেবের আতঙ্ক উপস্থিত। আমি যে বাঙ্গালা বুঝি নাই, সে উহা বুঝাইবে! সে তাহার চশমার উপর দিয়া স্থিরনয়নে সাহেবের ভীষণ মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"হুজর, আগর বন্দাকো মাপ কিয়া যায় তো একঠো বাত কহনে চাতে হেঁ।"

সা। কেয়া।

মু। হুজুর! বাবু বাঙ্গালামে বহুত লায়েক হায়, উন্‌কা বরাবর হিন্দোস্থানমে কুই নেহি হায়। বাবু সায়েব হায়। যো বাঙ্গালা বাবু নেহি বুঝেঙ্গে তো বন্দা কেয়া বুঝে গা?

সাহেব সানুনাসিক গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তোঁম পঁড়োঁ।" গরীব কাঁপিতে কাঁপিতে সে অদ্ভুত রোবকারি কষ্টে পাঠ করিল। পাঠ করিয়াই তাহার আক্কেল গুড়ুম। সেও চুপ্ করিয়া রহিল।

সা। বাঁতলাও—ইঁসকাঁ মঁতঁলঁব বাঁবুঁকেঁ বাঁতঁলাঁও।

সেও জানিত না যে, এ অপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহেবের নিজের প্রসূত। সে ভয়ে কাঁপিতে

কাঁপিতে বলিল—"কুই মোহরর জল্‌দি লেখনেসে থোড়া থোড়া গলদ কিয়া। মতলব ঠিক মালুম হোতা নাই।"

সাহেব "চ'লে' যাও" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া—বাঙ্গালাদেশের দুরদৃষ্ট, বাঙ্গালা ভাষার দুরদৃষ্ট, সেই মহামূল্য বাঙ্গালা রোবকারিখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং আমাকে এ যাত্রায় বিদায় দিলেন। তাঁহার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখি, কাচারিময় একটা হাসির রোল পড়িয়াছে। রোবকারিটা আমার বহুদিন যাবৎ কণ্ঠস্থ ছিল। বন্ধুমহলে উহা একটা বহুকালব্যাপী আমোদের জিনিস ছিল।

এরূপে পালা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। আমাকে কেমন করিয়া ধরাশায়ী করিবেন, 'কালকূট' বরাবর সে চেষ্টায় থাকিতেন। আমিও পাকা পালোয়ানের মত আপনার গা বাঁচাইয়া রঙ্গভূমিতে ঘুরিতে লাগিলাম। তাঁহার বড়সাধের একটা ফৌজদারি মোকদ্দমায় আসামী ছাড়িয়া দিয়াছি। খবর পাইবামাত্র প্রথম নথি তলব, এবং কিঞ্চিৎপরে বিচারকের তলব। যখনই আমার এরূপ নিমন্ত্রণ হইত, তখনই কলেক্টরি ফৌজদারির আমলাগণ মজা দেখিতে কপাটের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইত। সাহেব সানুনাসিক কণ্ঠে—"আপনি এ মোকদ্দমায় আসামী ছাড়িয়া দিয়াছেন কেন?"

উ। তাহার কারণ আমার 'জজমেণ্টে' লেখা আছে।

সা। উহা আমি যথেষ্ট মনে করি না।

উ। আমি তজ্জন্য দুঃখিত।

সা। এরূপ গুরুতর মোকদ্দমা অকারণে ছাড়িয়া দিবার জন্য আমি আপনার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিব। আপনি কি বলিতে চাহেন?

উ। কিছুই না। কেবল রিপোর্টের সঙ্গে মোকদ্দমার সম্যক্ নথিটি পাঠাইয়া দিবেন।

ক্রোধে সেই বিকৃত মুখখানি আরও বিকৃত হইল। কিছুক্ষণ কথা সরিল না।

সা। আপনি মনে করেন যে, আপনার জজমেণ্ট্ এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, আমার রিপোর্টে আপনার কিছুই হইবে না?

উ। আমি এমন কথা বলি নাই।

সা। আমি আপনার মত এমন অবাধ্য কর্ম্মচারী দেখি নাই। আপনি মাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, গবর্ণমেণ্ট, কিছুই মানেন না।

উ। আমি সকলকে সম্মান করি।

সা। এই আপনার সম্মান করা? এই মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচারের জন্য আমি আদেশ দিব। এই প্রতিবাদীকে আপনার শাস্তি দিতে হইবে।

উ। আমি তাহা পারিব না। বিশেষতঃ এরূপ আদেশ দিবার আইনমত আপনার ক্ষমতা নাই। আমি অভিযোগ (charge) করিয়া প্রতিবাদীকে অব্যাহতি দিয়াছি।

সা। আপনি আমাকে আইন শিখাইতে চাহেন?

উ। না।

এবার মুখবিকৃতি আরও ভীষণ হইল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি যাও। আমার ক্ষমতা আছে কি না, দেখিবে।"

আমি ভক্তিভরে অভিবাদন করিয়া কক্ষের বাহির হইলে কোর্ট ইন্‌স্পেক্টার শিবলাল তেওয়ারি বলিলেন—"বাপকা বেটা! 'কালকূট' সাহেবকে এরূপ নাস্তানাবুদ করা আর কার সাধ্য!" শুনিলাম, তার পর এক দীর্ঘ রিপোর্ট আমার বিরুদ্ধে কমিশনর পর্য্যন্ত গিয়া নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

নয়মাস এরূপে কাটিয়া গেল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কমিশনরের পার্শ্ন্যাল

এসিষ্টেণ্ট স্থানান্তরিত হইলেন। জনরব উঠিল যে, কমিশনর আমাকে সে পদে লইতে চাহেন, কিন্তু 'কালকূট' ঘোরতর বিপক্ষতা করিতেছে। কমিশনর তখন লাউইস্ (E· E· Lowis) সাহেব। গতিকটা কি, বুঝিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি আমাকে লইতে চাহেন, কিন্তু 'কালকূট' বলিয়াছেন যে, আমার অনেক নওয়াবাদ তালুক আছে। আমি পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইলে নওয়াবাদ বন্দোবস্তির ঘোরতর বিঘ্ন হইবে। আমি বলিলাম যে, আমার যে সকল নওয়াবাদ তালুক আছে, তাহা এত সামান্য যে, আমি তাহা মিঃ কালকূটকে বক্‌সিস্ করিতে পারি। সে দিনই তিনি আমাকে নিযুক্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ প্রেরণ করেন।

আদেশ পাইয়া 'কালকূট' আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আজ শেষ পালা। মুখ দেখিয়া বোধ হইল, সাহেব কমিশনরের পত্র ত পড়েন নাই, চিরতার আরক খাইয়াছেন। তিনি পত্রখানি আমার হাতে দিলেন, এবং তিক্তমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কার্য্যভার কাহাকে দিব?"

উ। সে নির্ব্বাচন ত আমার কর্ত্তব্য নহে।

কা। এ কাজ কে পারিবে?

উ। আমি কেমন করিয়া বলিব? আমার সমকক্ষ কর্ম্মচারীর দোষগুণ বিচার করা ত আমার উচিত নহে।

কা। আমি এসিষ্টেণ্ট কলেক্টর মিঃ পার্গিটার (Pargitar) সাহেবকে দিতে চাহি।

উ। যথা অভিরুচি।

কা। আপনার মত কি?

উ। আমি এ সম্বন্ধে কি মত দিব? তবে একটি কথা, আজ পর্য্যন্ত কোন ইউরোপীয়ান রোডসেস্ কার্য্যের ভার পান নাই।

কা। আপনি মনে করেন, মিঃ পার্গিটার আপনার অপেক্ষা কম উপযুক্ত?

উ। না। আমি তাঁহাকে আমার অপেক্ষা শতগুণ বেশী উপযুক্ত মনে করি।

মিঃ পার্গিটার তাঁহার অপর পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন। তিনি এ সময়ে বলিলেন— "নবীনবাবু যাহা বলিতেছেন, তাহা আমার কাছে সঙ্গত বোধ হইতেছে। রোড়সেসের কাজ দেশীয় লোকের হস্তে দেওয়া উচিত।"

কা। (আমার দিকে প্রেমকটাক্ষ করিয়া) আপনি ত আর অনেক দূরে যাইতেছেন না। পাহাড়ে বই ত নহে। (কমিশনরের আফিস তখন গির্জ্জার পশ্চিম দিকের পুরাতন কলেক্টরির নিকটস্থ পাহাড়ে ছিল)। আবশ্যকমতে আপনি মিঃ পার্গিটারের সাহায্য করিতে পারিবেন।

উ। তিনি যেরূপ যোগ্য ব্যক্তি, আমার কোনও সাহায্যেরই প্রয়োজন হইবে না। হইলে আমি সন্তোষের সহিত তাঁহার সাহায্য করিব।

কা। বিশেষতঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন যে, আমি নিশ্চয় আপনাকে টানিয়া আনিতেছি।

আমি মনে মনে উত্তর করিলাম—তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও যে, আর আমার—

"এ জনমে তোমার সনে হচ্ছে না দেখাদেখি।"

চট্টগ্রামের রোডসেস্

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই আমাকে পুলিসের সালতামামির মুসাবিদা করিতে হয়। কারণ, কমিশনর লাউইস সাহেব কোনও সালতামামি নিজে লিখিতেন না। এ মুসাবিদা দেখিয়া তিনি বড় প্রীতি প্রকাশ করিলেন। আমি সে সময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি আমার ভবিষ্যৎ কিরূপ স্থির করিয়াছেন?" তিনি বলিলেন যে, তিনি আমাকে রাখিতে চাহেন, কিন্তু 'কালকূট' আমাকে আমার পূর্ব্বকার্য্যে ফেরত পাঠাইবার জন্য জিদ করিতেছেন। 'কালকূট' এখন সুর বদলাইয়াছেন। আমি যেদিন আসি, সেদিনই কমিশনরের কাছে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহার মর্ম্ম এই যে, আমি একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারী। আমার হাতে সমস্ত গুরুতর ডিপার্টমেণ্টের ভার ছিল। অন্য কেহ এতগুলি বিভাগের কাজ এরূপ বিচক্ষণতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ চট্টগ্রামের রোড্সেস্ কার্য্য বড় গুরুতর ব্যাপার। উহা এরূপ জটিল যে আমার মত একজন স্থানীয় বিচক্ষণ কর্ম্মচারী ভিন্ন উহা সুনির্ব্বাহিত হইবে না। অতএব কমিশনর যদি আমাকে ফেরত না পাঠান, তবে তিনি চট্টগ্রাম ডিস্ট্রীক্টের কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে দায়ী থাকিবেন না। পত্রখানি চার কি ছয় পৃষ্ঠা ছিল। আমি বলিলাম—আমি ফাঁসীকাষ্ঠে যাইতে স্বীকৃত হইব, তথাপি আর 'কালকূটে'র অধীনে কাজ করিতে যাইব না। নয়মাসে আমার শরীরের নয়সের রক্ত শুকাইয়া গিয়াছে। যদি কমিশনর আমাকে রাখিতে না চাহেন, তবে আমি বদলির প্রার্থনা করিব। কমিশনর একটুক হাসিয়া বলিলেন—"বাবু! তুমি কেন এরূপ বলিতেছ; কালকূট যে তোমাকে খুব ভাল কর্ম্মচারী বলিয়া চাহিতেছে। তুমি কি তাহার সেই দীর্ঘ পত্র দেখ নাই?" আমি বলিলাম—"তাঁহার কাছে আমি তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। কিন্তু আমি তাঁহার অধীনে আর কার্য্য করিব না।" কমিশনর তখন বলিলেন—"আচ্ছা, তবে তোমাকে এ পদে স্থায়ী করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে লেখ।" কেরাণী একজন তৎক্ষণাৎ এক পত্রের মুসাবিদা করিয়া, লাল নিশান দিয়া, কমিশনরের কাছে পাঠাইল। সাহেব নিজে তাহাতে আমার প্রশংসা করিয়া লিখিলেন যে, এই কয়েক দিনেই তিনি আমার কার্য্য দেখিয়া বড় প্রীত হইয়াছেন।

এরূপে আসন দৃঢ় হইলে, আমি 'কালকূটে'র কীর্ত্তি একে একে উদ্‌ঘাটিত করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ রোডসেস্। চট্টগ্রামের জমিদারি এত ক্ষুদ্র, এত বিভক্ত, এবং এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে নানা স্থানে অবস্থিত যে, সমস্ত অংশীদার একত্র হইয়া 'রিটার্ণ' দেওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহাদের নামে, এবং যাহাদের রাজস্ব একশত টাকার কম, তাহাদের নামে, কালকূটের উপরোক্ত আদেশমতে পাঁচটাকা নিরিখে প্রজার খাজনা (valuation) ধরিয়া নোটিশ জারি হইতেছিল। এরূপ অতিরিক্ত খাজনার নিরিখে নোটিশ দেখিয়া দেশে একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। যত নোটিশ জারি হইতেছিল, ততই আপত্তি দাখিল হইতেছিল। কেহ কেহ বা 'রিটার্ণ' দাখিল করিতেছিল। ক্রমে আপত্তির সংখ্যা পাঁচহাজার, দশহাজার, বিশহাজার, ত্রিশহাজার দাঁড়াইয়াছিল। রোডসেসের যে মাসিক হিসাব (Return) বোর্ডে যায়, তাহাতে কত নোটিশ জারি হইল, তাহা দেখাইবার জন্য ঘর আছে। কিন্তু কত আপত্তি হইল, তাহা দেখাইবার জন্য ঘর নাই। আমি তাহা 'রিটার্ণে'র নিম্নভাগে লিখিয়া দিতাম। কিন্তু উহা দেখিলে কমিশনর ও বোর্ড বুঝিবেন যে, পাঁচটাকা হিসাবে কৃষক-প্রজার খাজনা ধরাতে সমস্ত কার্য্য ভুল হইতেছে। অতএব কূটবুদ্ধি কালকূট নিম্নভাগের সেই নোটটি কাটিয়া দিয়া, 'রিটার্ণ' দস্তখত করিয়া দিতেন। এরূপে এতকাল যাবৎ এ গুরুতর বিষয় চাপা পড়িয়াছিল। আমি পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইয়া প্রথম যে 'রিটার্ণ' পাইলাম, তাহার উপর কত আপত্তি

দাখিল হইয়াছে, তাহা কিরূপে নিষ্পত্তি করা হইবে, এবং আরও অনেক কথা, যাহার দ্বারা 'কালকূটে'র সমস্ত লীলা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, জিজ্ঞাসা করিয়া মন্তব্য (Resolution) প্রেরণ করিলাম।

'কালকূটে'র মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে এই ভয়েই আমাকে কমিশনরের আফিস হইতে টানিয়া লইতে চাহিয়াছিল। তাহার কূটবুদ্ধি অশেষ। সে জানিত, লাউইস সাহেব বড় ভালমানুষ। তাঁহার বড় চক্ষুলজ্জা। সে আরও বুঝিয়াছিল যে, এ মন্তব্যের তিনি কিছুই খবর রাখেন না। অতএব ইহার লিখিত উত্তর না দিয়া, একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে জপস্তব করিয়া দুকথা বুঝাইয়া দিলেই তিনি চক্ষুলজ্জায় চুপ করিয়া থাকিবেন। সে তাই একদিন একরাশি কাগজের গন্ধমাদন লইয়া ও তাহার হেড কেরাণীকে সঙ্গে করিয়া কমিশনরের আফিসে উপস্থিত হইল। আমি কপাটের আড়ালে থাকিয়া এ অভিনয় দেখিতে লাগিলাম। অভিবাদন ও দু চার খোশামুদির কথার পর, সে তাহার সানুনাসিক সুরকে আরও বৃদ্ধি করিয়া বলিল—"এই মন্তব্যের দ্বারা আপনি কি চাহেন, আমি বুঝিতে পারি নাই।" কমিশনর উত্তরে বলিলেন—"বটে।" তাহার পর মন্তব্যটি পড়িয়া বলিলেন—"কেন, ইহার অর্থ ত বেশ পরিষ্কার।" তারপর সে রোডসেস্ সম্বন্ধে কতকগুলি জটিল কথা তুলিল। সে জানিত, লাউইস্ তাহা কিছুই বুঝিবেন না। তার পর হযবরল কতকগুলি কথা বলিয়া প্রায় আধঘণ্টা কাটাইয়া বলিল—"আমি সকল কথা বুঝাইয়া দিয়া গেলাম। অতএব ভরসা করি, এই মন্তব্যের লিখিত উত্তর পাঠান নিষ্প্রয়োজন।" কমিশনর তখন একটুক সেয়ানামি করিয়া বলিলেন —"না। লিখিত উত্তর না পাঠাইলে আমার আফিসের কাজ যে অপূর্ণ থাকিবে।" তখন 'কালকূট' ম্লানমুখে একটা ছোটখাট (Very well) 'আচ্ছা' বলিয়া, গন্ধমাদন লইয়া চলিয়া গেল। তথাপিও সে এই মাত্র লিখিত উত্তর দিল যে, সে সকল কথা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কমিশনরকে বুঝাইয়া দিয়াছে। কমিশনর পত্র পাইয়াই তাহার উপর লিখিয়া দিয়াছেন—"সেরেস্তায় থাক্।" তাহার পরের মাসের 'রিটার্ণে'র উপর আমি আবার সেরূপ মন্তব্য লিখিলাম। কিন্তু কমিশনর তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, তাহার উপরও এইরূপ হুকুম লিখিয়া দিলেন।

এরূপে কয়েক মাস চলিয়া গেল। লাউইস সাহেব তিন মাসের ছুটি লইলেন, এবং স্মিথ সাহেব (A·Smith) তাঁহার স্থানাভিষিক্ত হইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"রোডসেস্ কার্য্যের কি গোলযোগ হইতেছে?"

আ। আপনাকে সে কথা কে বলিল?

ক। মিঃ লাউইস্।

আ। মিঃ লাউইস্! আমি ত এ সম্বন্ধে যত নোট দিয়াছি, তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। আর আপনাকে এরূপ বলিয়াছেন!

ক। আপনার নোট ও সমস্ত কাগজপত্র আমি দেখিতে চাহি।

তিনি তাহা দেখিয়া, আমাকে পরদিন ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি যেরূপ 'নোট' দিয়াছেন, সেরূপ বৃত্তান্ত চাহিয়া কলেক্টরের কাছে পত্র লিখুন।" আমি তাহাই করিলাম। তখন 'কালকূট' আপন লীলায় আপনি অপদস্থ হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছেন। সে কথা পরে বলিব। আবার ভিজি সাহেব অস্থায়ী কলেক্টর। তিনি উহার উত্তরে কালকূটের সমস্ত কীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দিলেন। তিনি লিখিলেন—ত্রিশহাজার রোল বা নোটিশ জারি হইয়াছে, আর ত্রিশহাজারেই আপত্তি পড়িয়াছে। উহার নিষ্পত্তি করিতে বারজন ডেপুটি কলেক্টরের আবশ্যক। তাহা হইলেও কার্য্য শেষ কবে হইবে তিনি বলিতে পারেন না। যদি পাঁচটাকা নিরিখে কার্য্য চলিতে থাকে, তবে আরও

হাজার হাজার আপত্তি পড়িতে থাকিবে। উত্তর পাঠ করিয়া স্মিথসাহেব স্তম্ভিত হইলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"কি আশ্চর্য্য! কমিশনরের নাকের উপর এত কাল এরূপ কার্য্য চলিয়াছে! এ যে রোডসেসের সমস্ত কার্য্যই ভুল হইয়াছে, এবং সকলই নূতন করিয়া করিতে হইবে। সমস্ত কার্য্য রহিত করিয়া, আবার তোমার নির্দ্ধারিত আড়াইটাকা হিসাবে কৃষকের খাজনা ধরিয়া, নূতন করিয়া কার্য্য করিবার জন্য বোর্ডে রিপোর্ট কর।" সেরূপ রিপোর্ট বোর্ডে গেল। আমি তাহাতে কালকূটের সমস্ত কীর্ত্তিকলাপ ঘোরাল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছিলাম। বোর্ড স্তম্ভিত, বিস্মিত এবং কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরহিত হইয়া উত্তর লিখিলেন যে, বড় আশ্চর্য্যের কথা, কমিশনর এতদিন পর্য্যন্ত এরূপ অবৈধ কার্য্যের প্রতিবাদ করেন নাই। যাহা হউক, যে ত্রিশহাজার আপত্তি পড়িয়াছে এবং যে সকল জমিদারির নোটিস জারি হয় নাই, তাহাদের খাজনার নিরিখ কমাইয়া, আড়াই টাকা হিসাবে ধরা হউক।

মিঃ স্মিথ পূর্ব্বে চট্টগ্রামের কলেক্টর ছিলেন। আমি বোর্ডের চিঠির উপর 'নোট' দিয়া বুঝাইয়া দিলাম যে, যাহারা আপত্তি করিয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে বোর্ড এরূপ আদেশ দিলেন। আর যে সকল লোক—তাহাদের মধ্যে অনেক দরিদ্রা ও নিরাশ্রয়া বিধবা ও অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু আছে, যাহারা বহু অংশীদার, কি দারিদ্রতানিবন্ধন 'রিটার্ণ' কি আপত্তি দিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য পাঁচ টাকা নিরিখ থাকিবে এবং তাহারা দ্বিগুণ রোডসেস্ দিবে, এ কেমন ধর্ম্মের কথা? স্মিথ সাহেব একজন ধর্ম্মভীরু নিরপেক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন। ইঁনিই একজন ইংরাজ নীলকরকে ছয়মাস মেয়াদ দিয়া, এংলো-ইণ্ডিয়ান জগতে একটা খণ্ডপ্রলয় ঘটাইয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমি বোর্ডের এরূপ অন্যায় বিচার গ্রহণ করিব না। তুমি আবার প্রতিবাদ কর।" বোর্ডের সঙ্গে লড়াই, বিশেষ আমি স্থানীয় লোক, লাউইস্ সাহেব ফিরিয়া আসিবেন, এ সকল মনে করিয়া, এ প্রতিবাদের মুসাবিদা তাঁহাকে করিতে বলিলাম। তিনি একটুক হাসিলেন এবং নিজে এক তীব্র প্রতিবাদ আমার 'নোটে'র মর্ম্মানুসারে লিখিলেন। বোর্ড বড়ই বিপদে পড়িলেন। এবার নিতান্ত কাতরভাবে লিখিলেন যে, যে সকল জমিদার ও তালুকদার আপত্তি করিতে পারেন নাই, তাঁহাদের প্রতি অবিচার হইবে তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন। কিন্তু উপায় কি? দুইবৎসর কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের অনুমান একত্রিশহাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সমস্ত কার্য্য নূতন করিয়া করিতে হইলে আরও দুইবৎসর ও আরও ত্রিশহাজার টাকা লাগিবে। এরূপ প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে গেলে গবর্ণমেণ্টই বা কি মনে করিবেন। অতএব যাহারা আপত্তি করিতে পারে নাই, তাহাদের জন্য পাঁচটাকা নিরিখ থাকুক। বারান্তরে যখন রোডসেসের কার্য্যের Revision হইবে, তখন উক্ত নিরিখ কমাইয়া আড়াইটাকা করা যাইবে।

বোর্ড কাঁদাকাটা করিয়া কমিশনরকে একখানি ডেমি-অফিসিয়ালও ভিতরে ভিতরে লিখিয়াছিলেন। স্মরণ হয়, মহাপুরুষ মেঙ্গলস্ (R· D· Mangles) সাহেব তখন বোর্ডের মেম্বর ছিলেন। অতএব তাঁহার অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কোথায় তাঁহার সেই দশটাকার নিরিখ, আর কোথায় আমার সেই "অবিশ্বাসযোগ্য" আড়াইটাকার নিরিখ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল! ইহার উপর আর প্রায়শ্চিত্ত কি? কমিশনর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে এখন কি করিতে বল?"

আমি। আর কি বলিব। আপনি আমার হতভাগ্য দেশের লোকের জন্য যাহা করিলেন, চিরকাল তাহারা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

তিনি। তুমি যদি বুঝ—কিছু ফল হইবে, আমি গবর্ণমেণ্টে লিখিতে পারি। বোর্ড আপনি লেজে গোবরে হইয়াছেন।

আমি। গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াও যে এতকালের পর কোনও ফল হইবে, বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট কি সহজে বোর্ডের প্রতিকূলে যাইবেন? আবার এ কাজের জন্য কি ত্রিশবত্রিশ হাজার টাকা দিবেন?

তিনি। সম্ভব নহে। তবে কলেক্টরের কাছে বোর্ডের আদেশ পাঠাইতে লিখিয়া দিও—আমি বোর্ডের এ আদেশ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করি না। যে হতভাগারা আপত্তি করিতে পারে নাই, কলেক্টর যদি কোনও উপায়ে তাহাদের এ আদেশের ফল দিতে পারেন, তবে আমি বড় সুখী হইব।

ছাত্রিশবৎসর দাসত্বে আমি সিবিলিয়ানসম্প্রদায়ে এরূপ নিরপেক্ষ সদ্‌বিবেচক লোক দেখি নাই। ইঁহার নিরপেক্ষতার আরও দৃষ্টান্ত ক্রমশঃ পাইব।

বোর্ডের আদেশ প্রচারিত হইল। তিন ভাগের দুইভাগ জমিদার ও প্রজা রক্ষা পাইল। আমি এরূপ করিয়া আত্মবলিদান দিয়া, উপরিস্থ কর্ম্মচারীর সঙ্গে যুদ্ধ না করিলে, চট্টগ্রামবাসীরা আজ যে রোড্‌সেস বা পথকর দিতে ঘোরতর কষ্ট অনুভব করিতেছে,—এমন কি, অনেকের ঘটিবাটি পর্য্যন্ত বিক্রয় হইতেছে—তাহার দ্বিগুণ দিতে হইত। আত্মবলিদান কিরূপ, সে কথা পরে বলিব। কিন্তু হায়! দেশের কয়জন লোক আমার এই আত্মবলিদানের কথা জানে?

গোরাচাঁদ ও লালচাঁদ

কালকূটের আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল যে, তিনি চট্টগ্রামে একটি চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া যান, এবং সেই কীর্ত্তিধ্বজা স্থির করিয়াছিলেন,—সাধারণ পায়খানা (Public Latrine)! তাঁহার যুক্তি অকাট্য। বিলাতে যদি সাধারণ আহারের স্থান হইতে পারে, তবে ভারতে সাধারণ পায়খানা হইতে পারিবে না কেন? তাঁহার স্থির সঙ্কল্প যে, সাধারণ পায়খানা নির্ম্মাণ করিয়া, তিনি দরিদ্র নগরবাসী নরনারী সকলকে তাহাতে যাইতে পুলিসের দ্বারা বাধ্য করিবেন। এই লোকটির কি রাশি ছিল, জানি না। কিন্তু লোকটি ভাল কার্য্য করিতে গেলেও, এমনভাবে করিত যে, দেশশুদ্ধ লোক বিগড়াইয়া যাইত। চট্টগ্রামে বাস্তবিকই পায়খানা সম্বন্ধে একটা সুবন্দোবস্তের বড়ই অভাব ছিল। উহা এভাবে না করিয়া, অন্যভাবে করিলে 'কালকূট' সকলের ধন্যবাদার্হ হইতেন। কিন্তু সে যাহা বুঝিবে, তাহাই করিবে। সাধারণ পায়খানায় নরনারীগণকে জোর করিয়া লইবে, এ সংবাদে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সে সময়ে চট্টগ্রাম সহরের উপর অধিকাংশ দরিদ্র মুসলমানের ভদ্রাসন বাড়ী। হিন্দুদের বাসাবাড়ী মাত্র। তাহাদের ভদ্রাসন বাটী পল্লীগ্রামে। তখন পৈতৃক বাসস্থান ছাড়িয়া, সহরে বাড়ী করা কি হিন্দু, কি মুসলমান, ভদ্রলোকের পক্ষে নিন্দনীয় বিষয় ছিল। সেইনিয়ম এখনও সর্ব্বত্র থাকিলে আজকাল দেশের সুন্দর পল্লীগ্রামগুলি শ্রীহীন ও ম্যালেরিয়ার রঙ্গভূমি হইত না। মুসলমান দরিদ্র হইলেও তাহার পর্দ্দা চাই। অনেকে শুনিয়াছি, আপনার স্ত্রীর স্নানের জল পর্যন্ত বহন করে, তথাপি স্ত্রীকে গ্রামের পুষ্করিণীতে পর্য্যন্ত যাইতে দেয় না। অতএব এ মুসলমান স্ত্রীলোকদের প্রকাশ্যস্থানে, প্রকাশ্য পায়খানায় যাইতে হইবে, ইহার অপেক্ষা ঘোরতর বিপ্লবের বিষয় আর কি হইতে পারে? দু একজন মিউনিসিপাল কমিশনর ছাড়া সকলে ঘোরতর আপত্তি করিলেন। কালকূট কিছুই শুনিল না। মুসলমানেরা শতে শতে মিউনিসিপাল আফিস ঘেরিয়া ফেলিল, প্রস্তাবের অনুকূল কমিশনরদের ঠেঙ্গাইল, জনতায় সহর কম্পিত করিল। কালকূট তথাপি স্থিরভাবে কার্য্য করিতে লাগিল। সহরের

চারিদিকে চারিটি দিব্বি বাঁশের 'বাংগলো' ঘরের মত পায়খানা প্রস্তুত হইল। প্রত্যেকের শুনিয়াছি, আটশত টাকা করিয়া খরচ পড়িয়াছিল। পশ্চিম হইতে দলে দলে মেথর আসিয়া পৌঁছিল। কমিশনরের কাছে মুসলমানেরা আপিল করিল। কমিশনর মিঃ লাউইস। তিনি কলেক্টরদের প্রতিকূলে বড় সহজে যাইতে চাহিতেন না। কালকূট মফঃস্বলে থাকিলে তাহার অনেক অবৈধ কার্য্য আমি নোট দিয়া রহিত করাইতে পারিতাম। কিন্তু সে সহরে থাকিলে নিজে সাক্ষাৎ করিয়া, আগে কমিশনরকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া সকল কাজ করিত। মিঃ লাউইসের এত চক্ষুলজ্জা ছিল যে, সে সাক্ষাতে গিয়া যাহা বলিত, তাহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না। অতএব এ বিষয়ে আমার সকল চেষ্টা বিফল হইল। তখন মুসলমানেরা নিরুপায় হইয়া চট্টগ্রামের বিখ্যাত 'বেনা কানুন' (Torch Law) জারি করিল। একদিন কমিশনারের আফিস-পাহাড়ে, আমার কক্ষ হইতে দেখি যে, সহরের তিন দিকে ঘোরতর অগ্নিকাণ্ড। বাতাসে অগ্নির সংগে সংগে জনরব বহিল যে, কালকূটের প্রিয় পায়খানা জ্বলিতেছে। প্রথম একদিকে আগুন দেখা গেলে, কালকূট দলে বলে সে দিকে ছুটিল। তখন অন্যদিকের পায়খানা জ্বলিয়া উঠিল। কালকূট আবার সে দিকে ছুটিল। তখন তৃতীয়দিকের পায়খানা জ্বলিয়া উঠিল। সহরময় একটা হাসিতামাসার রোল উঠিল। স্বয়ং মিঃ লাউইস্ সাহেব পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া, মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিলেন। কালকূট—'শালা ব'দমাঁয়ে'স' লোঁগ' বলিয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে চক্ষুর নিমিষে তিনটি কীর্ত্তিধ্বজাই ভস্মীভূত হইয়া গেল। চতুর্থটিমাত্র কাচারির সম্মুখে ছিল বলিয়া রক্ষা পাইল।

একে ত কীর্ত্তিধ্বংস, তাহার উপর লোকের হাসি-টিট্‌কারি। কালকূট ক্ষেপিয়া আহত শার্দ্দুলের মত হইল। লালচাঁদ চৌধুরী একজন জমিদার, সদাগর ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনর, তিনি 'হিন্দুস্থানীয়' বংশজ। হিন্দুদের মধ্যে কেবল তাঁহারই সহরের উপর বাড়ী। কাজে কাজে মুসলমানদের সংগে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। লোকটিও বড় বিচক্ষণ, চতুর ও বুদ্ধিমান্। তিনি মিউনিসিপ্যাল মিটিংএ পায়খানার আপত্তিকারীদের নেতা এবং মুসলমানদের মুখপাত্র ছিলেন। কালকূটের মনে মনে সন্দেহ হইল যে, তিনি এই অগ্নিকান্ডের পশ্চাতে আছেন। তাহার পক্ষে যে সন্দেহ, সেই কাজ। অমনি মুসলমানদলপতি কতকগুলির সংগে লালচাঁদ চৌধুরীও সহরের শান্তি রক্ষার জন্য বিশেষ কনেষ্টবল (Special constable) নিয়োজিত হইলেন। তিনি এই প্রহরিত্ব অস্বীকার করিলে, হুকুম অমান্যের জন্য এবং পায়খানা-খাণ্ডবের সহায়তার জন্য ফৌজদারীতে অর্পিত হইলেন। এরূপ জামিন দিতে আদিষ্ট হইলেন যে, অতিকষ্টে তিনি জেলবাস হইতে রক্ষা পাইলেন। সন্ধ্যার সময়ে সহর এ সংবাদে তোলপাড় হইল।

লালচাঁদ চৌধুরী আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। তিনি কাচারী হইতে একেবারে আমার বাড়ীতে আসিয়া, গলদশ্রুনয়নে আমাকে বলিলেন—"আমি আপনার আশ্রয় লইলাম। এ বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে আমার আর উপায় নাই। কালকূটের ভয়ে অন্য কেহ আমার সংগে কথা কহিতে পর্য্যন্ত সাহস করিতেছে না।" আমি একটুকু হাসিলাম। কারণ, ডাক্তার সাহেবের সংগে আমার সেই ব্যাপারের সময়ে তিনিই সর্ব্বাগ্রে আমার বাড়ীতে আসিয়া, অতীব বিজ্ঞতার সহিত বলিয়াছিলেন যে, আমি যখন সরকারী চাকর, তখন সাহেবের সংগে বিবাদ করা ভাল নহে। অথচ আজ তিনিই আবার স্বয়ং ভীষণ কালকূটের সংগে যুদ্ধে আমাকে সারথ্যে বরণ করিতে আসিয়াছেন! আমি বুঝিলাম, এ সারথ্যে আমি ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত হইব। কিন্তু তিনি যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সাহায্য চাহিতেছেন, এরূপ অবস্থায় সাহায্য না করা আমার পিতৃরক্তগত ধর্ম্ম নহে। আমি সারথ্য গ্রহণ করিলাম এবং তখনই টেলিগ্রামের দ্বারা মিঃ মনোমোহন ঘোষকে কাউন্‌সেল নিযুক্ত করিলাম। কারণ, পরদিনই

মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইবে। তখন রেল ছিল না। সাপ্তাহিক ষ্টীমার। মিঃ ঘোষের আসিতে দুই তিন দিন বিলম্ব হইবে। তিনি মোকদ্দমা স্থগিত রাখিবার জন্য কালকূটের কাছে টেলিগ্রাম করিলেন। সে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, পরদিন মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিল। শুধু তাহা নহে, আপনি বিবাদীর বিপক্ষে সাক্ষী হইয়া আপনার জবানবন্দী আপনি লিখিল, এবং বিবাদীর উকিল কাউন্‌সেলের পঁহুছিবার অপেক্ষায় জেরা করিতে অস্বীকার করিলে, সে আপনাকে আপনি জেরা করিতে লাগিল, এবং তাহা লিখিয়া লইতে লাগিল।

এদিকে বিবাদী বেচারির বিপদের উপর বিপদ্। মিঃ মনোমোহন ঘোষ যে ষ্টীমারে আসিতেছিলেন, সে ষ্টীমার সমুদ্রের এক চড়ায় ঠেকিয়া গেল। মনোমোহন ও অন্যান্য যাত্রিগণের ঘোরতর বিপদ্। তাঁহারা প্রাণভয়ে জালিবোটে (Life Boat) উঠিয়া, সমস্ত রাত্রি সমুদ্রে কষ্ট ভোগ করিয়া, পরদিন অপরাহ্ণে আসিয়া পঁহুছিলেন। ইতিমধ্যে কালকূট মোকদ্দমা বাদীর পক্ষে শেষ করিয়া, বিবাদীর প্রতিকূলে এক রাশি অপরাধের অভিযোগ (Charge) করিয়াছে। সমস্ত সন্ধ্যা ও রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমি ও মনোমোহন কিংকর্ত্তব্য স্থির করিলাম। পরদিন তিনি সমস্ত 'কালকূটী' লীলা ব্যাখ্যা করিয়া, এফি-ডেভিট লইয়া, লাউইস্ সাহেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, হাইকোর্টে প্রার্থনা করিয়া মোকদ্দমা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইবার জন্য মোকদ্দমার বিচার স্থগিত থাকুক্। লাউইস্ তখন উভয়—হরি ও হর—কমিশনর ও জজ। মধ্যে গবর্ণমেণ্টের এক খেয়াল হইয়াছিল—কুমিল্লা জেলা ঢাকা-ডিভিসনভুক্ত করিয়া কমিশনরকে জজ করিয়াছিলেন, এবং মিরেশ্বরী থানা নোয়াখালী জেলাভুক্ত করিয়া নোয়াখালীতে একজন জজ নিয়োজিত করিয়া-ছিলেন। মিঃ লাউইস্ যেরূপ গোবরগণেশ, তিনি বড় অকষ্টবন্ধে পড়িলেন। একদিকে কালকূটকে বাঁচাইতে হইবে, অন্যদিকে এফিডেভিট পড়িয়া বুঝিলেন যে, উহা যদি হাই-কোর্টে যায়, তবে কালকূটের রক্ষা নাই। তিনি তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন, এবং পরদিন আদেশ দিবেন বলিলেন। পরদিন মনোমোহন তাঁহার কাছে যথাসময়ে উপস্থিত হইলে, কালকূটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার তর্ক করিবার জন্য মনোমোহনকে তিনি অনুরোধ করিলেন। মনোমোহন বলিলেন—উহা বড় হাস্যকর কার্য্য হইবে। কারণ, কালকূট যখন চার্জ্জ বা অভিযোগ করিয়া বসিয়াছেন, তখন তাঁহার কাছে আর তর্ক করিয়া কি ফল হইবে? লাউইস্ বড় কাতরতার সহিত বলিলেন যে, কালকূট তাঁহাকে বলিয়াছে যে, কাউনসেলের তর্ক শুনিয়া সে যদি তাহার নিজের কার্য্যে ভ্রম বুঝে, তবে বিবাদীকে ছাড়িয়া দিবে। মনোমোহন বলিলেন যে, তিনি বিবেচনা করিয়া যদি তাহা উচিত মনে করেন, তবে পরদিন কালকূটের কাছে উপস্থিত হইবেন। না হয় মিঃ লাউইসের কাছে আবার উপস্থিত হইয়া, মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার জন্য হাইকোর্টে রিপোর্ট করিতে প্রার্থনা করিবেন। সন্ধ্যার সময়ে আবার আমরা দুজনে একত্র হইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শ করিলাম। মোকদ্দমাটি এখন কালকূটের নীলকণ্ঠের বিষ হইয়াছে। সে উহা গিলিতেও পারিতেছে না, ফেলিতেও পারিতেছে না। মনোমোহনের ও আমার মত হইল যে, মোকদ্দমা অন্যত্র উঠাইয়া লইয়া তাহাকে অপদস্থ করা উচিত। মনোমোহনের আদৌ তাহার কাছে উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। চৌধুরী মহাশয় সেসময়ে একরূপ খুব সাহস দেখাইয়া, আমাদের মতে সায় দিলেন। কিন্তু আবার কাহার সঙ্গে কি পরামর্শ করিয়া তিনি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর সময়ে আমাকে নিদ্রা হইতে উঠাইয়া কাঁদিয়া কহিলেন—"আর, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে ঘটিবে। কাল মিঃ ঘোষকে কালকূটের কাছে উপস্থিত হইয়া তর্ক করিতে বলুন। মিঃ লাউইস্ সাহেব ত বলিয়াছেন যে, কালকূট তাহা হইলে আমাকে খালাস দিতেও পারে।" ইতিমধ্যে, মোকদ্দমার সূত্রপাত হইতে আমি কলিকাতার দৈনিক কাগজে টেলিগ্রাম ও দীর্ঘ দীর্ঘ পত্র

পাঠাইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলাম। মনোমোহন আসিয়া অবধি সেই আন্দোলন দাবানলবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। আমরা দুজনে ভাগ করিয়া দৈনিক কাগজে দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রত্যহ লিখিয়া পাঠাইতেছিলাম। সে আগুন ভারত ছাইয়া পড়িয়াছিল। সমস্ত ভারত-ব্যাপী কাগজ তখন সেই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল, এবং বিবাদীকে একটি মহাবীর পুরুষ স্বরূপ চিত্রিত করিতেছিল। ইহার পূর্ব্বে কোনও বিষয়ে সমস্ত ভারতের একপ্রাণতা দেখি নাই। সেই একপ্রাণতা বহুদিন পরে কংগ্রেসে পরিণত হয়, ইহাই তাহার প্রথম উন্মেষ। এইখানে ভারতের নবযুগের ও নবজীবনের সূত্রপাত। আমি চৌধুরী মহাশয়কে বুঝাইলাম যে, এখন এরূপভাবে লাঙ্গুল সঙ্কুচিত করিলে সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি উপহাসভাজন হইবেন। বিশেষতঃ ডাক্তারসাহেবী বিভ্রাটের সময়ে তিনিই আমাকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, যদি আমার হাতে টাকা থাকিত, তবে তিনি বিলাত পর্য্যন্ত লড়িয়া, পঞ্চাশহাজার টাকার ডেমেজের মোকদ্দমা করিয়া, ডাক্তার সাহেবকে জব্দ করিতে আমাকে পরামর্শ দিতেন। তাঁহার হাতে ত টাকা আছে। বিশেষতঃ দেশে তিনি একজন মহাকূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত। সকলে মনে ভাবিয়াছিল, এবার কালকূট ও লালকূট, গোরাচাঁদ ও লালচাঁদের পালা। কিন্তু তাঁহার সে সকল বীরত্ব এখন জল হইয়া গিয়াছে। তিনি কিছুই শুনিলেন না। আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"হাইকোর্ট কি করে, ঠিক নাই। টাকাও আরো বিস্তর খরচ হইবে। অতএব কালকূটের সমক্ষে যাহাতে মনোমোহন উপস্থিত হইয়া তর্ক করেন, তাহা করুন।" তিনি আমার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সেই দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে ডাকবাঙ্গলায় গিয়া মনোমোহনকে জাগাইলাম। তিনি জমিদার মহাশয়ের বীরত্বের এ পরিণাম দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। তিনিও আমার মত অনেক বুঝাইলেন। চৌধুরী মহাশয় কিছুই বুঝিলেন না।

অগত্যা মনোমোহন পরদিন কালকূটের কাছে উপস্থিত হইলেন। এবার পালা চতুরে চতুরে। মনোমোহনকে যিনি ভালরূপে জানেন, তিনি জানেন যে, মনোমোহনের ব্যারিষ্টারিতে উন্নতির কারণ তাঁহার চতুরতা ও ধৈর্য্য (shrewdnecs and patience)। তাঁহার সূচীভেদ্য সূক্ষ্ম চতুরতায়, বিচারক যেমন সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সুচতুর হউন না কেন, তাঁহার মুষ্টিমধ্যে আসিতেন। আর তাঁহার এমন অসাধারণ ধৈর্য্য ছিল যে, নিতান্ত পাজি বিচারকও তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিত না। তিনি নামমাত্র তর্ক করিয়া বলিলেন যে, বিবাদীর বিরুদ্ধে যেসকল প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহাতে কোনও অপরাধই সাব্যস্ত হয় নাই, অতএব তিনি অব্যাহতি পাইবার যোগ্য। কালকূট স্থিরভাবে সমস্ত তর্ক শুনিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, বিবাদীর পক্ষে সাক্ষী দেও।" মনোমোহন বলিলেন, বিবাদীর প্রতিকূলে যখন কোনও অপরাধই প্রমাণিত হয় নাই, তখন তিনি কোনও সাক্ষী, কি প্রমাণ দিবেন না। কালকূট বিষম সঙ্কটে পড়িল। সে যে প্রমাণের দ্বারা বিবাদীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া অভিযোগ করিয়াছে, আবার কেমন করিয়া সেই প্রমাণের দ্বারাই তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিবে? সে দেখিল, বাজী মাত্। তখন সে এক নূতন চাল চালিল। সে মনোমোহনকে তাহার খাস কামরায় ডাকিয়া লইয়া, অনেকক্ষণ মোকদ্দমা সম্বন্ধে গল্প করিল। এবং পরদিন তাঁহাকে আসিতে বলিয়া বিদায় দিল।

এই শিষ্টাচারের অর্থ কি, সন্ধ্যার সময়ে আমি ও মনোমোহন বসিয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে মনোমোহনের কাছে কালকূটের এক দীর্ঘ মেমোরেণ্ডাম (memorandam) বা মন্তব্য আসিয়া উপস্থিত। তাহার সঙ্গে খাস কামরায় মনোমোহনের সঙ্গে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা নাটকাকারে প্রশ্নোত্তর ভাবে লিখিত। উহা ঠিক লেখা হইয়াছে, কি না, কালকূট জিজ্ঞাসা করিয়া, বড় এক শিষ্টাচার এবং মনোমোহনের গুণানুবাদপূর্ণ পত্র লিখিয়াছে। মন্তব্যটি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, তাহাতে মনোমোহনের

মুখে এরূপ কথা আরোপিত হইয়াছে, যেন মনোমোহন স্বীকার করিয়াছেন যে, বিবাদী আইনতঃ (technically) দোষী। তবে তিনি একজন সম্মানভাজন দেশহিতৈষী (Respectable and public-spirited gentleman) বলিয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিতে বলিয়াছেন। এতক্ষণে কালকূটের চালটা কি, সেই খাস কামরার আলাপের অর্থ কি, বুঝা গেল। বিবাদীকে সে লঘুদণ্ড দিবে এবং তাহার কাউন্‌সেলও তাহার technical দোষ স্বীকার করিয়াছেন দেখিলে গবর্ণমেণ্টে কালকূটের রক্ষা পাইবার পথ হইবে। মনোমোহন এই মেমো পাইয়া আনন্দিত হইলেন, এবং বিবাদীকে বলিলেন—আর ভয় নাই। মাকড়সা আপনার জালে আপনি পড়িয়াছে। মনোমোহন তৎক্ষণাৎ সেই মহামূল্য নোটের নকল করাইয়া লইলেন, এবং উত্তরে লিখিলেন যে, কালকূট তাঁহাকে বড়ই ভুল বুঝিয়াছেন। তাঁহার মুখে যেসকল কথা আরোপিত হইয়াছে, কোনও কাউন্‌সেল তাহা স্বীকার করিতে পারে না। অতএব কালকূটের সঙ্গে তাঁহার কি আলাপ হইয়াছিল, তিনি তাহার আর এক নূতন ও শুদ্ধ সংস্করণ পাঠাইলেন। এই সংস্করণের অর্থ এই হইল যে, কালকূট পায়খানা জ্বলিয়া যাওয়ার দরুন বিচলিত হইয়া এরূপ মোকদ্দমা সংস্থাপন করিয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল এবং বিবাদী technical অপরাধ করিয়াছে বলিয়া মনোমোহনকে কোনওরূপ সাফাই উপস্থিত করিতে বার বার বলিয়াছিল। সেই রাত্রিতেই উভয় সংস্করণের সারাংশ কলিকাতার কাগজে টেলিগ্রাম গেল, এবং উভয়ের নকলসম্বলিত দীর্ঘ প্রবন্ধও পরদিন প্রাতে প্রত্যেক কাগজে প্রেরিত হইল।

পরদিন মনোমোহন আর কালকূটের কাছে না গিয়া, একেবারে জজ লাউইস্‌ সাহেবের কাছে উপস্থিত হইয়া, মোকদ্দমা অন্যত্র উঠাইয়া দিতে হাইকোর্টে রিপোর্ট করিবার জন্য আবার আবেদন করিলেন, এবং পূর্ব্বদিনের প্রহসন শুনাইয়া, সেই মহামূল্য মন্তব্য দুটি দেখাইলেন। লাউইস্‌ সাহেবের মুখ আতঙ্কে শ্বেতবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কালকূটকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ের মধ্যে পত্র লেখালেখি হইল। তাহার পর কালকূট বিবাদীকে তলব দিলেন, এবং তাঁহাকে অব্যাহতি দিলেন। দেশময় একটা হাসির তুফান ছুটিল ; আর সমস্ত ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ সে হাসি বহন করিলে, বিবাদী চৌধুরী মহাশয় মহাবীরপুরুষ বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

অব্যাহতি পাইয়াই বিবাদী আমার গৃহে আসিয়া, আমাকে বুকে লইয়া গলদশ্রুনয়নে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তিনি অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু এই অব্যাহতি আমার অদৃষ্টাকাশে একটা ঘোরতর মেঘসঞ্চার করিল। আমি ঘোরতর বিপদে পড়িলাম।

একে ত মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার ও মিঃ ঘোষের লিখিত প্রবন্ধাবলী ইংরাজী দৈনিকে প্রকাশিত হইয়া, সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া আন্দোলন তুলিয়াছিল, তাহাতে আবার দুটি ঘটনা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল। ঢাকার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট অভয়বাবু দীর্ঘকাল চট্টগ্রামে ছিলেন। তিনি আমার পিতার বন্ধু ছিলেন ও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি আমার কাছে এই মোকদ্দমার সময়ে উহার একটা প্রকৃত ইতিহাস চাহিলেন। আমি আফিসে বসিয়া দৈনিকের মত উহা লিখিয়া তাঁহাকে পাঠাইলাম। কিছুদিন পরে কমিশনর আমাকে ডাকিয়া, ঢাকার 'ইষ্ট' পত্রের এক সংখ্যা আমার হাতে দিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ প্রবন্ধ কি তোমার লেখা ?" আমি দেখিলাম, উহা উক্ত দৈনিক! কি উত্তর দিব ? আমি পাশ কাটাইয়া বলিলাম—"উহা আমার লেখা, আপনাকে কে বলিল ?" তিনি বলিলেন—"এমন সুন্দর ইংরাজী চট্টগ্রামে বাঙ্গালীদের মধ্যে আর কে লিখিতে পারে ?" আমি বলিলাম—"এই চট্টগ্রামেই আমার মত গ্রাজুয়েট অনেক আছে।" তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"কই, তাহাদের মধ্যে কে এমন ইংরাজী লিখিতে পারে ?" আমি দেখিলাম, তাঁহার মনে দৃঢ় সন্দেহ হইয়াছে।

ইহার পর মোকদ্দমা শেষ হইলে, আমার ও মনোমোহনের লিখিত এক 'মেমোরিয়েল'

(দরখাস্ত) বিবাদী চৌধুরীর পক্ষে গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইল। তখন বিচক্ষণ সাঁর রিচার্ড টেম্পল্ বঙ্গের লেঃ গবর্ণর। তিনি যেরূপ সিভিলিয়ান-সম্প্রদায়কে শাসন করিতেন, এমন আর কোনও লেঃ গবর্ণরকে করিতে দেখি নাই। এখন সেরূপ শাসন স্বপ্ন হইয়াছে এবং তাহাতে দেশে সিভিল সার্ভিসের অত্যাচারে ঘোর অশান্তি ও অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছে। এখন প্রত্যেক সিভিলিয়ানই দেশের সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা। যথাসময়ে উক্ত দরখাস্তের উপর গবর্ণমেণ্টের কঠিন আদেশ (Resolution) আসিল। কালকূট ঘোরতর তিরস্কৃত অপমানিত ও ডিগ্রেড হইয়া জইণ্ট-পদে স্থানান্তরিত হইলেন। মনোমোহন আমার কাছে এই আদেশের একটা নকল গোপনে চাহিলেন। আমি তাঁহার কাছে অতি গোপনে উহা পাঠাইলাম, এবং উহা যেন অন্য কেহ না দেখে, বিশেষ সাবধান করিয়া পত্র লিখিলাম। কিছুদিন পরে দেখি, সেই আদেশ 'হিন্দু পেট্রিয়টে' ছাপা হইয়াছে। আমার কণ্ঠতালুকা শুষ্ক হইয়া গেল। যদিও সার রিচার্ড টেম্পল্ সিভিলিয়ানদের শাসন করিতেন, তথাপি এরূপ একটা গোপনীয় আদেশ প্রচারিত হওয়া অহঙ্কারপ্রিয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নীতিবিরুদ্ধ। কারণ, তাহাতে সিভিলিয়ানদের প্রেষ্টিজ বা প্রতিষ্ঠার ক্ষতি হয়। দার্জিলিঙ্গশৃঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, এবং কিরূপে এরূপ গোপনীয় আদেশ প্রকাশিত হইল, তাড়িত বেগে কমিশনরের কৈফিয়ৎ তলব হইল। কমিশনর ভারতচন্দ্রের কোতোয়ালের মত—"কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে', মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আমি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলাম যে, আমার আফিস হইতে উহা 'হিন্দু প্রেট্রিয়টে' যায় নাই। দার্জিলিঙ্গ, কলিকাতা, চট্টগ্রামে ঘোরতর তদন্ত হইতে লাগিল। আমার আহার নিদ্রা নাই। কিছুদিন পরে কমিশনর বলিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার আফিসকে অব্যাহতি দিয়াছেন। তদন্তে দেখা গিয়াছে যে, বাইশদিনের উক্ত আদেশ দার্জিলিঙ্গ হইতে কলিকাতায় পঁহুছিয়াছিল। অতএব গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস হইয়াছে, ইত্যবসরে উহা উক্ত উভয়স্থানের মধ্যে কেহ নকল করিয়া 'হিন্দু প্রেট্রিয়টে' পাঠাইয়াছে। কিন্তু কমিশনর যেভাবে আমাকে এ কথা বলিলেন, তাহাতে বোধ হইল যে, আমার প্রতি তাঁহার সন্দেহ হইয়াছে। কারণ কালকূট তাঁহাকে বলিয়াছে যে, আমিই উক্ত মোকদ্দমার পশ্চাতে ছিলাম এবং আমিই তাহার এই বিপদের ও অপদস্থের কারণ। এ সময়ে আরও একজন চট্টগ্রামের বিশিষ্টলোক এক ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়েন, এবং সমস্তদেশ—শ্বেত-কৃষ্ণ—তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইলেও আমি একা তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহাকে রক্ষা করি। তাহাও কমিশনর শুনিয়াছিলেন। এরূপে পরকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া, আমার অদৃষ্টাকাশ ক্রমে মেঘাচ্ছন্ন হইল, এবং একদিন তাহা ঝড়ে পরিণত হইল। সে কথা পরে বলিব।

শিশুহত্যা

পূর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দু জমিদার মহাশয়ের ষ্টেট কোর্ট অফ ওয়ার্ডসে আনিতে গিয়া কিরূপে তাঁহার পত্নীর সঙ্গে আমি পরিচিত হই। কালকূট কলেক্টর হইয়া আসিবার কিছুদিন পর তিনি পীড়িতা হন। আমি তখনও উক্ত ডিপার্টমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কলেক্টর। কালকূট আদেশ করিল যে, তিনি তাঁহার সহরের বাড়ীতে আসিয়া সিভিল সার্জ্জনের দ্বারা চিকিৎসিত হইবেন। তাহার যে হুকুম, সেই তামিল। কাহার সাধ্য অন্যথা করে। আদেশ পাইয়া আমার পরামর্শমতে ঠাকুরাণী সহরে আসিলেন। তিনি চট্টগ্রামের একটি প্রধান গৃহের কুলবধূ। তিনি সিভিল সার্জ্জনের সাক্ষাতে বাহির হইলে তাঁহার কলঙ্ক হইবে, ইত্যাদি আপত্তি করিয়া বারম্বার দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু 'চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'। তিনি যতই আপত্তি করিতে লাগিলেন, কালকূটের ততই জিদ বাড়িতে

লাগিল। তিনি কিছুতেই সিভিল সার্জ্জনের চিকিৎসাধীন হইবেন না। কালকূটের আদেশ-মতে সিভিল সার্জ্জন দুইবার গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শেষে কালকূট আমাকে ডাকিয়া বলিল—"তাঁহাকে আপনি নিজে গিয়া বুঝাইয়া বলুন যে, তাঁহাকে সিভিল সার্জ্জনের সাক্ষাতে বাহির হইতে হইবে।" এরূপ গর্হিত কর্ম্ম হইতে নিরস্ত হইবার জন্য তখন আমি তাহাকে কিঞ্চিৎ বুঝাইলাম। তাহার ফলে সে আমার উপর চটিয়া লাল হইল। আমি অগত্যা 'হুকুম তামিল' করিলাম। হুকুম ঠাকুরাণীটিকে শুনাইয়া দিলাম এবং সে সম্বন্ধে কিছু ঠাট্টা তামাসা করিয়া, 'যোগিবরটিকে' অর্দ্ধচন্দ্র দিতে পরামর্শ দিয়া, কালকূটের কাছে রিপোর্ট করিলাম যে, হুকুম তামিল করিয়াছি। জমিদারজায়া সিভিল সার্জ্জনের সম্মুখে বাহির হইতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না দেখিয়া, কালকূল ডাক্তার সাহেবকে লিখিল যে, তিনি জোর করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবেন। পরদিন ডাক্তার সাহেব জোর করিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে, ভৃত্যেরা তাঁহার মুখের উপর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তিনি অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া, কালকূটের কাছে নালিশ করিলেন। সে ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল এবং পেনেল কোড উল্টাইতে লাগিল। কিন্তু তাহার কোন ধারা ত খাটে না। শেষে হুকুম অমান্যের জন্য ঠাকুরাণীকে ফৌজদারীতে দিবার এক অর্ডার আমার কাছে পাঠাইল। আমি তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়া লিখিলাম যে, আইনমতে এরূপ মোকদ্দমা হইতে পারে না। আমি উহা উপস্থিত করিতে পারিব না।

ইহাতে বিফলমনোরথ হইয়া, সে আর এক প্রতিহিংসার পথ অবলম্বন করিল। ঠাকুরাণী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বয়স আট, কি নয় বৎসর। ছেলেটি বড় সুন্দর, বড় শান্ত। আমি বাছিয়া দিয়াছিলাম। কালকূট পরদিন আমার কাছে হুকুম পাঠাইল যে, সে ছেলের শরীর ভাল নহে বলিয়া ডাক্তার সাহেব তাহাকে বলিয়াছেন, এবং তাহার মায়ের কাছে থাকিলে তাহার সৎশিক্ষা হইবে না। অতএব তাহাকে কাশীতে তাহার পিতামহীর কাছে পাঠাইতে হইবে আমি এ হুকুম ঠাকুরাণীকে অবগত করাইলে তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া দরখাস্ত করিলেন যে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার শাশুড়ীর সদ্ভাব নাই। তাঁহার শাশুড়ীর আত্মীয় একটি ছেলেকে পোষ্য গ্রহণ না করাতে তিনি বিশেষরূপে অসন্তুষ্ট হইয়া কাশীবাসিনী হইয়াছেন! অতএব তাঁহার কোলের শিশুকে কাশী পাঠান দূরে থাকুক, ঠাকুরাণী তাহাকে স্থানান্তর হইতেও দিবেন না। কালকূটের পাপের পালা শেষ হইয়া আসিতেছিল। সে আমাকে আদেশ দিল যে, শিশুকে সেই সপ্তাহের ষ্টীমারে কাশী পাঠাইতে হইবে। আমি লিখিলাম যে, জোর করিয়া তাহার মাতার অঙ্ক হইতে কাড়িয়া লইয়া না পাঠাইলে, অন্য কোনও রূপে পাঠান হইতে পারে না। আমি মনে করিয়াছিলাম ইহাতে কালকূট নিরস্ত হইবে। কিন্তু সে সেইরূপ পাত্রই নহে। সে আদেশ দিল—"if necessary physical force should be used" (আবশ্যক হইলে জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইবে)। আমি এই হুকুমটি আমার নিজ বক্ষে রাখিয়া, নাজিরের কাছে তাহার প্রত্যেক কথা অনুবাদ করিয়া আদেশ প্রেরণ করিলাম। চিলে যেরূপে পারাবতশাবককে লইয়া যায়, নাজির পরদিবস পেয়াদা লইয়া, জোর করিয়া শিশুকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিল। ঠাকুরাণী কমিশনরের কাছে আপিল করিলেন। মিঃ লাউইস্ কিছুই করিলেন না। কারণ, কালকূট কৈফিয়ৎ দিল যে, ছেলের স্বাস্থ্য বড় মন্দ। জল-বাতাস পরিবর্ত্তন আবশ্যক। বিধাতার এমনই নির্ব্বন্ধ! শিশুটি তাহার পিতামহীর কাছে কাশীতে পঁহুছিবার অব্যবহিত পরেই অকস্মাৎ মরিয়া গেল। এই খবর তারে চট্টগ্রাম আসিলে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বহু তদন্তের দ্বারা কেবল এই মাত্র জানা গেল যে, দুই তিন ঘণ্টার পেটের ব্যথায় তাহার জীবন শেষ হইয়াছে। একজন এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন মাত্র তাহাকে একবার দেখিয়াছিলেন। তিনিও রোগ নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

ঠাকুরাণী অতীব শোকব্যঞ্জক এক আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলেন। উহা আমারই

লেখা ছিল। সংবাদপত্রেও আবার আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি এ সময় 'হিন্দু পেট্রিয়টে' নিয়মিতরূপে লিখিতাম। কৃষ্ণদাস পাল তখন রাজনীতিক্ষেত্রে একমেবাদ্বিতীয়ম্। তাঁহার ও তাঁহার 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র তখন গৌরবের মধ্যাহ্নপ্রভা। 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র চট্টগ্রাম সংবাদদাতা একজন খ্যাতনামা লোক হইয়া পড়িয়াছেন। তদ্ভিন্ন 'অমৃত বাজার পত্রিকা' ও 'ষ্টেটস্ম্যানে'ও লিখিতাম। সার রিচার্ড টেম্পল্ তৎক্ষণাৎ তীব্র ভাষায় উক্ত আবেদনের উপর কলেক্টরের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। সে ইতিমধ্যে সেই 'হিন্দুস্থানী' জমিদারের মোকদ্দমায় 'ডিগ্রেড' হইয়া স্থানান্তরের অর্ডার পাইয়াছে। সে এরূপ অপদস্থ হইয়াছে যে, একটি পেয়াদা পর্য্যন্ত তাহাকে গ্রাহ্য করিতেছে না। একটি প্রাণী তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যায় না। তাহার অপমানের একশেষ হইয়াছে। সে আমার কাছে বড় বিনয় সহকারে পত্র লিখিয়াছে—"আমি চট্টগ্রাম ছাড়িয়া চলিলাম। এ সময় স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয় যে, আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হয়। অতএব কল্য প্রাতে আটটার সময়ে আপনি যদি আমার সহিত একবার সাক্ষাৎ করেন, তবে বড় অনুগৃহীত হইব।" এমন মহাপুরুষের এরূপ বিনয় ও শিষ্টাচার! ইহার অর্থ কি? আমার সন্দেহ হইল, তাহার কোন কূট অভিসন্ধি আছে। অতএব কি করা উচিত পরামর্শ করিতে আমার সম্মুখস্থ পাহাড়বাসী বন্ধুবর বাঙ্গালী এক্‌জিকিউটিভ ইন্‌জিনিয়ারের কাছে গেলাম। দেখিলাম, তাঁহার কাছেও ঠিক সেইরূপ এক পত্র আসিয়াছে। তিনিও বলিলেন—"বেটার কি একটা মৎলব আছে।" শেষ পরামর্শ স্থির করিয়া, আমরা দুজনেই পরদিন প্রাতে তাহার গৃহে একসঙ্গে উপস্থিত হইলাম। সে নিতান্ত ভদ্রতার সহিত আমাদের করমর্দ্দন করিয়া দক্ষিণের বারান্ডায় লইয়া বসাইল এবং নদীর দিকে চাহিয়া নানা গল্প করিতে করিতে যেন হঠাৎ একটা কথা মনে হইল, এরূপ ভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"By the by, did I give you any order to send away the child to Benares by force"—(ভাল কথা, আমি কি সেই ছেলেটিকে জোর করিয়া কাশী পাঠাইতে আপনাকে কোন আদেশ দিয়াছিলাম?) আমি স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলাম—"হাঁ, মহাশয়। (Yes, Sir.)"। তাহার মুখ ছাই হইল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—'আপনি কি সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, ছেলেকে কাশী পাঠাইলে তাহার কোনওরূপ জীবনের আশঙ্কা আছে?" আমি আবার স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলাম—"আমার মনে সেরূপ সন্দেহ হইয়াছিল, এবং আমি উহা আপনাকে জানাইয়াছিলাম।" সে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করিল—"কই, এরূপ কোন কাগজ ত আফিসের ফাইলে নাই।" আমি বলিলাম—"বড় গুরুতর বিষয়। আমার ঘোরতর বিপদ হইতে পারে বলিয়া, আমি সে সকল কাগজ নিজ বাক্সে রাখিযাছিলাম। আমার কাছে আছে। আপনি চাহিলে আমি নকল পাঠাইব।" এবার তাহার মুখ একেবারে মৃতবৎ হইল। সে আর কথাটি কহিল না। উঠিয়া আমাদের দুজনকে বিকৃত অনুনাসিক স্বরে বলিল—"গুড্ বাই, বাবু।" আমরাও উঠিয়া আসিয়া যেন নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। পাহাড় হইতে নামিয়া আমি ইন্‌জিনিয়ারবাবুকে বলিলাম—"এখন পাপিষ্ঠের এত বিনয়ের অর্থ কি বুঝিলেন ত? সে এই ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিল যে, আমার নিকট হইতে যদি ভয়ে, চক্ষুলজ্জায় বা অসাবধানতায় কোনওরূপ অনুকূল উত্তর বাহির করিতে পারে, তবে আপনাকে সাক্ষী করিয়া তাহার কৈফিয়তে সে কথা সে লিখিয়া দিবে।" তিনি বলিলেন—"তুমি বড় রক্ষা পাইয়াছ। বেটার অসাধ্য কিছুই নাই।"

সেদিন আফিসে আসিয়া, কমিশনর সটান আমার কক্ষে ভয়ানক ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কালকূট সেই শিশুহত্যার দরখাস্ত সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম—"না।" তিনি আরও ব্যস্ত হইয়া—"তবে তাহাকে এখনই লিখিয়া পাঠাও, সে যেন কৈফিয়ৎ না দিয়া চট্টগ্রাম পরিত্যাগ না করে।" আমি বলিলাম—"প্রাতে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বোধ হয়, এতক্ষণে ষ্টীমারে উঠিয়াছেন।"

সাহেব অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"এখনই তুমি ষ্টীমারে তাঁহার কাছে ঐরূপ হুকুম পাঠাইয়া দেও।" আমি দূতহস্তে এক D. O. লিখিয়া আর্দালি একজন ছুটাইলাম। সে ঘাটে পঁহুছিবামাত্র ষ্টীমার খুলিয়া গিয়াছে বলিয়া চিঠি ফেরৎ আনিল। সংবাদ শুনিয়া লাউইস্ সাহেবের যেন ঘর্ম্ম ছুটিল। তিনি একেবারে বসিয়া পড়িলেন। বোধহয়, গবর্ণমেণ্ট কোনওরূপ কড়া টেলিগ্রাম, কি ডেমি অফিসিয়েল চিঠি পাঠাইয়াছেন। হায়! সেইদিন, আর এইদিন! তিনি বলিলেন—"এখনই গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ কর যে, কালকূট কৈফিয়ৎ না দিয়া পলায়ন করিয়াছে।" বলা বাহুল্য যে, পরম আনন্দের সহিত আমি তাহাই করিলাম। কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্টের তীব্র ভর্ৎসনাপূর্ণ আর এক দীর্ঘ 'রিজলিউশন' আসিল। কালকূটের শাসনলীলা শেষ হইল। তিনি শাসনবিভাগ (Executive Service) হইতে তাড়িত হইয়া, জজিয়তির দিকে (Judicial Service) সুবিচার বিতরণ করিয়া, অর্থিপ্রত্যর্থীর মুণ্ড ভক্ষণ করিতে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু সেই হতভাগ্য শিশুটি আর তাহাতে পুনর্জীবিত হইল না। তথাপি তদানীন্তন লেঃ গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পলকে ধন্যবাদ। এখনকার দিন হইলে কালকূটের এক গ্রেড প্রমোশন হইত।

সাইক্লোন—১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে, কি ৩১শে অক্টোবর, এখন ঠিক মনে নাই, শনিবার প্রাতঃকাল হইতে একটু একটু বৃষ্টি ও বাতাস হইতেছিল। ঘোড়ায় আফিসে যাইতে না পারিয়া, পাল্কীতে গিয়াছিলাম। অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি ও বাতাস ক্রমে বাড়িতে লাগিল, এবং চারিটার সময় আকাশ এরূপ খণ্ড মেঘাচ্ছন্ন হইল, এবং বৃষ্টিসহ এরূপ বেগে বাতাস রহিয়া রহিয়া বহিতে লাগিল যে, আমার মনে 'সাইক্লোনে'র আশঙ্কা হইল। বলিয়াছি, ইহার পূর্ব্বে আমি চারিটি 'সাইক্লোন' ভুগিয়াছি। ১৮৬৪ এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায়, ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইয়া কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইবার সময়ে গঙ্গা-সাগরে, এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ যশোহরে। এইটি পঞ্চম 'সাইক্লোন'। আশঙ্কা হইবামাত্র আমি কমিশনর মিঃ স্মিথ সাহেবকে যাইয়া বলিলাম। তিনিও বলিলেন যে, তাঁহার মনেও আশঙ্কা হইয়াছে যে, হয় ত এখানে 'সাইক্লোন' হইবে, কিম্বা 'সাইক্লোনে'র পুচ্ছ আমাদের উপর দিয়া যাইতেছে। কিন্তু তিনি তথাপি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আফিস ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার অভ্যাসই ছিল, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এবং সময়ে সময়ে রাত্রি আট নয়টা পর্য্যন্ত আফিসে থাকিতেন। কেরাণীরা সন্ধ্যার পর জলখাবার আনিয়া খাইত, এবং নাচ গান আরম্ভ করিত। যেদিন নিতান্ত সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কখনও উঠিতেন, বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গল্প করিতেন। আফিস হইতে অতিকষ্টে বাহকস্কন্ধে বাসায় পোঁছিয়া দেখি যে, বৈঠকখানায় 'থিয়েটার কমিটি' বসিয়া গিয়াছে। দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। তাহাদের ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম যে, এদিকে 'সাইক্লোনে'র গতিক। তাহাদের থিয়েটারের বাতিক এতদূর বাড়িয়াছে যে, তাহারা ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। সাইক্লোনের নাম শুনিয়া তাহাদের আতঙ্ক হইল, এবং সকলে ভিজিয়া বাড়ী ছুটিল। ক্রমে বৃষ্টি ও বাতাস আরও বাড়িতে লাগিল। আমরা খাইয়া শুইলাম। এগারটার সময়ে ঝড় থাকিয়া থাকিয়া এমন বেগে বহিতেছিল যে, আমার খুড়তুত ভাই রমেশ ছুটিয়া আসিয়া, উপরের ঘরে আমাদিগকে জাগাইয়া, নীচের ঘরে যাইতে বলিল। আমি দেখিলাম যে, উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ হইতে প্রকৃত সাইক্লোন বহিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং প্রত্যেক আঘাতে ঘর কাঁপিয়া উঠিতেছে। আমরা শয্যা হইতে উঠিতে না উঠিতে জানালা একখানি উড়াইয়া দিল এবং মহাবেগে ঝড় ও বৃষ্টি

ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন যে, তাঁহার ঝাড়-ফানুস, ছবি, বিছানা ও 'কুশন্‌ড্‌' চেয়ার ইত্যাদি নষ্ট হইতেছিল। তিনি কিছুতেই জিনিস ফেলিয়া নীচের ঘরে যাইবেন না। আমরা তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে, তিনি ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জিনিস রক্ষা করিতে পারিবেন না; মানিনীদের মানের, কি ক্রোধের চাপে ঝড়ের ঘাড় ভাঙ্গে না। অগত্যা তাঁহাকে জোর করিয়া টানিয়া নীচের ঘরে আনিলাম। ইতিমধ্যে উপরের ঘরের জানালা আরও দুই একখানি উড়িয়া গিয়াছে। তিনি নীচের ঘরে বসিয়া—'ওরে, আমার ছবি গেল, ঝাড় গেল, আমার সব গেল রে' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে ঝড়ের বেগ এত বৃদ্ধি হইল যে, তখন জিনিস ছাড়িয়া প্রাণের আশঙ্কায় তাঁহাকেও নীরব হইতে হইল। যত তোলপাড় উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে হইতেছে। পশ্চিম দিকে কিছুই নাই। আমি নীচের ঘরের পশ্চিম দিকের একটি গবাক্ষ খুলিয়া, প্রকৃতির সেই ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে লাগিলাম। সেই প্রলয়ঙ্কর দৃশ্য একবার দেখিলে তাহা আর জীবনে ভুলিবার নয়। দেখিতেছি—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল ধরাশায়ী হইতেছে। তাহাদের ডালপালা উড়াইয়া দিতেছে, এবং সুপারিগাছগুলিকে দড়ির মত পাকাইয়া গিরা দিতেছে। স্থানে স্থানে গৃহে আগুন লাগিতেছে, এবং সে অগ্নি উড়িয়া গিয়া, মেঘের স্তরে স্তরে বিচিত্র আলোক প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতির সেই ভীষণতার মধ্যে সে সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, তত ঝড়ের বেগও বাড়িতেছিল এবং মনে আশঙ্কা হইতেছিল যে, উপরের ঘর পড়িয়া সকলেই চাপা পড়িয়া মরিব। পরিবারস্থ সকলেই তখন কাঁদিতেছিল, এবং থাকিয়া থাকিয়া শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতেছিল। আমি কাঁদিতেছিলাম না, স্থিরনয়নে আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলাম। গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবারও সাধ্য নাই। চারিদিকে গাছ পড়িয়া সমস্ত পথ বন্ধ হইয়াছে এবং এখনও পড়িতেছে। গৃহের বাহির হইলেই গাছ চাপা পড়িবার সম্ভাবনা। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া বসিয়া আছি, এবং সেই বিপদ্‌ভঞ্জনকে ডাকিতেছি। মনের সে অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

রাত্রি প্রভাত হইল, এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় থামিয়া গেল। উপরের ঘরে গিয়া জিনিসপত্রের শোচনীয় অবস্থা দেখিতেছি, এমন সময়ে একজন আরদালী আসিয়া আমাকে বলিল যে, কমিশনর আমাকে ডাকিয়াছেন। কিন্তু যাইব কিরূপে? সে আমাকে বলিল—গাছ পড়িয়া সমস্ত রাস্তা বন্ধ হইয়াছে: সে বহু কষ্টে একপ্রকার বুকে হাঁটিয়া আসিয়াছে। কি করিব, প্রভু ডাকিয়াছেন, যাইতে হইল। আমাকেও প্রায় সেরূপ ভাবেই যাইতে হইয়াছিল, এবং সে পোয়া মাইল পথ যাইতে প্রায় দু ঘণ্টা লাগিয়াছিল। কমিশনরের ঘরে উপস্থিত হইলে দেখিলাম, তিনি চিন্তাকুল অবস্থায় সমুদ্রের দিকে চাহিয়া বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বাঙ্গালাতে বলিলেন—"নবীন! কি হল?" আমি উত্তর করিলাম—"আর কি হল! সর্ব্বনাশ হল।" তখন তিনি বলিলেন—"কি করা কর্ত্তব্য?"

আমি। ষ্টেশনে যত অফিসার আছে, সকলকে পাঠাইয়া দিয়া, চারিদিক্‌ হইতে সংবাদ সংগ্রহ করাই প্রথম কর্ত্তব্য।

আমি। অফিসারেরা যাইবে কিরূপে? পথঘাট সমস্তই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বড় নদী ভিন্ন ছোট খালেও যাইতে পারিবে না। আর বড় নদীতেই বা যাইবে কিরূপে? নৌকা পাইবে কোথায়? তুমি মনে কর কি, নৌকা কোথায়ও আছে? আমাদের ষ্টীমারের কি কোনও খবর পাইয়াছ?

আমি। না, চাপরাসি পাঠাইয়া এখনি খবর লইতেছি। আমার বোধ হয় না যে, ষ্টীমার রক্ষা পাইয়াছে।

তিনি। সম্ভব নহে। আর আমার মনে আর একটি ঘোরতর আশঙ্কা হইয়াছে। এক 'সাইক্লোনে'র সময়ে আমি মেদিনীপুরে ছিলাম। সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া তটভূমি

ধোয়াইয়া লইয়াছিল, এবং তাহাতে বহুতর মানুষ মরিয়াছিল। শুধু তাহা নহে, তাহার পর কয়েক মাস যাবৎ এরূপ ওলাউঠা হইয়াছিল যে, তাহাতেও জেলা জনশূন্য করিয়াছিল। আমার আশঙ্কা হইতেছে, যদি এখানেও সেইরূপ সমুদ্রতরঙ্গ উঠিয়া থাকে।

এমন সময়ে একজন আরদালি আসিয়া বলিল যে, কতকগুলি লোক সন্দ্বীপ দ্বীপ হইতে ভাসিয়া আসিয়াছে। তখন বেলা প্রায় দশটা। সে লোকগুলি সম্মুখে আসিলে যে দৃশ্য দেখিলাম এবং যাহা শুনিলাম, তাহাতে হৃৎকম্প হইল। সন্দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে একটি দ্বীপ, চট্টগ্রাম হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল ব্যবধান। তাহারা বলিল—সমুদ্রপ্লাবনে যখন তাহাদের ঘর পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল, তখন তাহারা চালের উপর উঠিয়াছিল। তাহার পর কি হইয়াছে, তাহারা আর জানে না। অল্পক্ষণের মধ্যে সে চাল ঝড়বেগে ভাসিয়া আসিয়া কিসে লাগিল এবং প্রাতঃকালে দেখিল যে, তাহারা চট্টগ্রামের চড়ায় পড়িয়া আছে। কোনও পরিবারের একজন, কোনও পরিবারের বা দুজন মাত্র বাঁচিয়া আছে। অবশিষ্টের কি হইয়াছে, তাহারা জানে না। তাহাদের মুখ শুষ্ক, চক্ষু শুষ্ক ও কোটরস্থ এবং তাহারা অতিকষ্টে কথা কহিতেছিল। ঠিক যেন কয়টি কাঠের পুতুল! তাহারা কি যেন এক ভীষণ বিপ্লব দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সমস্ত মূর্ত্তিতে কি একটা ঘোরতর আতঙ্ক, কি এক অবর্ণনীয় শোক যেন অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহারা বিবস্ত্র ছিল। বাজারের দোকানদারেরা এক এক খণ্ড ন্যাকড়া দিয়াছে। তাহা জড়াইয়া আসিয়াছে। তাহাদের দাঁড়াইবার শক্তি নাই। বসিয়া পড়িল এবং তাহারা যে কমিশনরের সম্মুখে বসিয়াছে, এ জ্ঞান তাহাদের নাই। তাহাদের এক প্রকার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। একটি লোক তাহাদের এখানে আনিয়াছে। তাহারা কলের পুতুলের মত আসিয়াছে মাত্র। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কমিশনরের চক্ষুও সজল হইল। আমি বলিলাম, "ইহাদের কি করা যাইবে"? আসুন এক সভা করিয়া, ইহাদের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করি। কমিশনর চুপ করিয়া রহিলেন, এবং বলিলেন—'হঠাৎ কিছু করা উচিত নয়। আগে দেশের সমস্ত অবস্থা অবগত হই। ইহাদের বাজারে গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইতে বল।" দেখিতে দেখিতে পালে পালে সেরূপ লোক আসতে লাগিল। সাহেব তাহাদিগকে পাহাড় হইতে নামাইয়া দিতে আদেশ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমি ভগ্নহৃদয়ে তাহাদের সঙ্গে করিয়া পাহাড় হইতে নামিলাম। নামিবামাত্র কি ভীষণ সংবাদ—লোকেরা বলিতেছিল যে, কর্ণফুলী নদীর সৈকতে সহস্র নর, নারী, শিশু, গো, মহিষ, পক্ষী ইত্যাদির শব পড়িয়া রহিয়াছে। ছুটিয়া সদরঘাটের দিকে গেলাম। হা ভগবান্! যাহা দেখিলাম, তাহা কি তোমারই ক্রীড়া! কোথায় বা মৃত পুত্র অঙ্কে লইয়া মাতা পড়িয়া আছে, কোথায়ও বা পুত্র কন্যাকে কাপড়ের দ্বারা আপনার বুকের সঙ্গে বাঁধিয়া পিতা পড়িয়া আছে। আর এক স্থানে যাহা দেখিলাম, তাহা মানুষের প্রাণে সহিতে পারে না। পতি পত্নীকে কাপড়ের দ্বারা আপনার দেহের সঙ্গে বাঁধিয়াছে, এবং উভয়ে গলাগলি করিয়া পড়িয়া আছে। রমণীর দীর্ঘ কেশ, কাদায় জড়িত হইয়া রহিয়াছে। দুটি যেন প্রেম-স্বপ্নে বিভোর হইয়া নিদ্রা যাইতেছে। দুটির রূপ সৈকতভূমি আলো করিয়া রাখিয়াছে। যেদিকে দেখা যাইতেছে, যতদূর দেখা যাইতেছে, এরূপ করুণ দৃশ্য,—শবের পর শব, তাহার পর শব, তাহার পর শব, মৃত পশু-পক্ষীর শবের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

খণ্ডপ্রলয়

সেদিন আফিসে গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কমিশনর মিঃ স্মিথ 'সাইক্লোন' সম্বন্ধে এক টেলিগ্রাম লিখিয়া আমার হাতে দিলেন। টেলিগ্রাফ আফিস উহা ফেরৎ পাঠাইয়া লিখিল যে, টেলিগ্রাফের তার সব ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কোনও দিকে টেলিগ্রাফ যাইতেছে না। কমিশনর

বলিলেন—"এখন কি করিবে?" আমি বলিলাম যে, টেলিগ্রাম চিঠির মধ্যে দিয়া, কুমিল্লায় কলেক্টর ও ঢাকায় কমিশনরের কাছে পাঠাইলে, সেদিকে যদি ঝড় না হইয়া থাকে, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিতে পারিবেন, এবং ডাকেও গবর্ণমেণ্টে একটি রিপোর্ট পাঠান উচিত। আমি আরও বলিলাম—চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেটকে ডেমি-অফিসিয়াল পত্র লিখি যে, তিনি সমস্ত কর্ম্মচারীদিগকে পাঠাইয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, মফঃস্বলের অবস্থা জানিয়া যেন রিপোর্ট করেন। কমিশনর বলিলেন—"কেবল ইংরাজ কর্ম্মচারী পাঠাইতে লেখ, বাঙ্গালী পাঠাইলে কিছু হইবে না। কারণ, তাহারা বিপদের সময় মাথা স্থির রাখিতে পারে না।" আমি কথাটা শুনিয়া কিছু চটিলাম, এবং বলিলাম যে, আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আমি যাই, এবং বাঙ্গালী মাথা ঠিক রাখিতে পারে কি না, একবার চেষ্টা করিয়া দেখি। তিনি স্থূল উদর প্রকম্পিত করিয়া একটি গম্ভীর হাসি হাসিলেন এবং বলিলেন—"তুমি বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যতিক্রম হইতে পার।" যাহা হউক, উপরোক্ত মতে কার্য্য করা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যেই জনরব শোচনীয় সংবাদ বহন করিয়া আনিতে লাগিল। পুলিসের রিপোর্ট এবং নোয়াখালীর ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্রে প্রকাশ পাইল যে, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলার সমুদ্রতীরস্থ এবং দ্বীপস্থ গ্রামসকল এরূপ ভাবে ভাসিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই এবং সমস্ত তটভূমি মানুষের ও পশুপক্ষীর মৃতদেহে এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে। হাতিয়ায়, সন্দীপে ও সমুদ্রতটে স্থানে স্থানে ত্রিশ বত্রিশ হাত উচ্চ সমুদ্রতরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল এবং বৃক্ষাদির শিরোভাগে পর্য্যন্ত শব পড়িয়া আছে। দুদিন পরে সীতাকুণ্ডের মুন্সেফ, আমার এক শৈশববন্ধু কমিশনরকে পত্র লিখিলেন যে তাঁহার কাচারি-ঘরের চিহ্নমাত্র নাই এবং সমস্ত স্থান শবাকীর্ণ হইয়া এরূপ দুর্গন্ধ হইয়াছে যে, সেখানে থাকা অসাধ্য হইয়াছে। অতএব তিনি আফিস সহরে উঠাইয়া আনিতে অনুমতি চাহিয়াছেন। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া পত্র দেখাইলেন এবং বলিলেন—"বাঙ্গালী অফিসারের কীর্ত্তি দেখ। একজন মাত্র অফিসার সীতাকুণ্ডে আছে। সে কোথায় এ ঘোরতর সঙ্কটের সময় লোকের সাহায্য করিবে, না সে আপনি পলাইবার চেষ্টা করিতেছে।" কমিশনর তখনও জড় ছিলেন।

ক্রমে খবর আসিল যে, বরিশালের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের এবং দ্বীপেরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছে এবং লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর শ্রদ্ধাস্পদ সার রিচার্ড টেম্পল পরিদর্শনে আসিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে গিয়া নোয়াখালিতে সাক্ষাৎ করিতে কমিশনরের প্রতি আদেশ উপস্থিত হইল। কিন্তু কমিশনর যাইবেন কিরূপে? ষ্টীমার ঝড়ে ডাঙ্গায় তুলিয়া রাখিয়াছে। তিনি বলিলেন—"হাতী দিয়া টানাইয়া ষ্টীমার নামাইয়া ফেল।" হাতী দিয়া টানিলাম, দড়ী ও লোহার শিকল পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া গেল। অষ্টমীতে সাইক্লোন হইয়াছিল। পূর্ণিমার সময় জোয়ার বৃদ্ধি হইলে ষ্টীমার আপনি ভাসিয়া উঠিল এবং কমিশনর এক কেরাণী লইয়া চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে বরাবর বলিয়াছিলাম যে, গবর্ণমেণ্টে প্রথম যে টেলিগ্রাম ও ঝড়ের বর্ণনাসম্বলিত রিপোর্ট গিয়াছে, তাহার পর আর কোন রিপোর্ট পাঠান হয় নাই। ইতিমধ্যে যে সকল অবস্থা জানা গিয়াছে, আর এক রিপোর্টের দ্বারা তাহা গবর্ণমেণ্টে জানান উচিত। না হইলে গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইতে পারেন। তিনি তাহা শুনিলেন না। বলিলেন—সম্পূর্ণ বিষয় অবগত না হইয়া আর রিপোর্ট করিব না। কিন্তু আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক হইল। লেফটেনাণ্ট গবর্ণর তাঁহাকে ঘোরতর ভর্ৎসনা করেন এবং যত দূর জানিতে পারিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিয়া, তখনই এক রিপোর্ট লিখিয়া দিতে আদেশ করেন। স্মিথ সাহেব ষ্টীমারে বসিয়া কম্পিতকলেবরে তাড়াতাড়ি এক রিপোর্ট লিখেন এবং তাহা নকল করিবার জন্য কেরাণীর উপর মহশিল দিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। উহা শেষ হইলে পড়িয়া, দস্তখত করিয়া, লেঃ গবর্ণরকে দিতে যাইতেছেন, এবং কেরাণী বেচারী জলযোগ করিবার জন্য ডাঙ্গায় উঠিয়াছে, এমন সময় ষ্টীমার খুলিয়া লেঃ গবর্ণর চলিয়া

গেলেন এবং সেই সঙ্গে কমিশনরও তাঁহার ষ্টীমার খুলিয়া চলিয়া আসিলেন। তিনি এত ব্যস্ত হইয়া চলিয়া আসিলেন যে, কেরাণীর নৌকা, যাহা জাহাজের সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন, ফেলিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া রাত্রি দশটার সময় আমাকে ডাকিলেন এবং তাঁহার রিপোর্ট পাঠান হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি শুনিয়া অবাক্! বলিলাম, আমি ত কোন রিপোর্ট পাই নাই। তিনি ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তোমার কেরাণী আমার রিপোর্ট কি করিল?" আমি বলিলাম—"সে কেরাণী কোথায়? সে আপনার সঙ্গে আসে নাই?" তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি তাহাকে সমুদ্রের চড়ায় ফেলিয়া আসিয়াছেন। সে আরও পাঁচ সাত দিনে আসিতে পারিবে না শুনিয়া, তিনি এক দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"তাহার কাছে টেলিগ্রাফ কর।" কিন্তু সে সমুদ্রের চড়ায় টেলিগ্রাফ পাইবে কিরূপে? পাইলেও সে আসিবেই বা কিরূপে? তাহার নৌকায় একটি মাঝি মাত্র আছে, মাল্লা মোটেই নাই; কারণ, নৌকা ষ্টীমারে বাঁধিয়া লইয়াছিল। তিনি তখন বলিলেন—"তবে তুমি একটা রিপোর্ট লিখিয়া দাও।" কাগজপত্রও সমস্ত সে নৌকায় পড়িয়া আছে। আমি কি দেখিয়া রিপোর্ট লিখিব? যাহা হউক, কেরাণীটিকে শীঘ্র পাঠাইবার জন্য নোয়াখালির কলেক্টরকে টেলিগ্রাফ করিলাম। কিন্তু তাহার পরদিন হইতেই সে আসিয়া পঁহুছিয়াছে কি না, কমিশনর দিনে পাঁচ সাতবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সে অকথ্য কষ্ট পাইয়া, পাঁচ কি ছয় দিন পরে আসিয়া পঁহুছিল। তখন দেখিলাম যে, কমিশনর এক বিচিত্র রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সমস্ত অবস্থা লেখা ত হয়ই নাই, তাহা ছাড়া অনেক ভুল আছে। এখন এ কথা আমি তাঁহাকে কেমন করিয়া বলি? কেবল এই মাত্র বলিলাম যে, তাঁহার রিপোর্ট লেখার পর আরও অনেক খবর আসিয়াছে। অতএব সে সকলও গবর্ণমেণ্টে জানান উচিত। তিনি বলিলেন—"সে রিপোর্ট চুলায় যাক্। তুমি নূতন করিয়া একটি রিপোর্ট এখনই লিখিয়া আন।" তাহার পর প্রত্যেক পাঁচ মিনিট পরে তাহার শেষ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি কোনরূপে মুশাবিদা শেষ করিয়া দিলে তিনি তাহা স্বাক্ষর করিয়া দিয়া, নিজে কেরাণীখানাতে দাঁড়াইয়া, তিন চারজন কেরাণীর মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া, উহা নকল করাইয়া লইলেন। কেরাণীদের শোচনীয় অবস্থা! তখন কমিশনরেরা পর্য্যন্ত লেঃ গবর্ণরকে এত ভয় করিতেন! আর এই প্রেষ্টিজ বা প্রতিপত্তির দিনে একজন এসিষ্টেণ্টও লেঃ গবর্ণরকে গ্রাহ্য করে না। সে জানে, লেঃ গবর্ণর সিভিল সার্ভিসের করধৃত পুতুল মাত্র। ভয়ে বা প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্য শত অপরাধ করিলেও তিনি কাহারও গায়ে হাত দিবেন না। এখন ফিরিঙ্গি মাত্রই ভারতবর্ষের রাজা!

দেখিতে দেখিতে ঘোরতর ওলাউঠা আরম্ভ হইল এবং উহা মহামারীতে পরিণত হইল। তিন মাস ছুটির পর মিঃ লাউইস্ ফিরিয়া আসিলেন। মিঃ স্মিথ চলিয়া গেলেন। মহামারী নিবারণ করিবার জন্য সে অমূল্য 'কলেরা পিল' মাত্র বিতরিত হইতেছিল। দরিদ্র 'নেটিভে'র জন্য উহাই যথেষ্ট। যিনি উহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং ধন্বন্তরীবিশেষ। ওলাউঠায় যাহার মৃত্যুসম্ভাবনা ছিল না, সেও এ মহৌষধি খাইয়া, পেট ফুলিয়া শীঘ্র শীঘ্র মরিতেছিল। চারিদিকে একটা হাহাকার পড়িয়াছিল এবং লোকেরা আমাকে অস্থির করিয়া ফেলিতেছিল। অগত্যা একদিন সাহস করিয়া, আমি মিঃ লাউইসের কাছে 'কলের পিলে'র মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া ফেলিলাম। তিনি বলিলেন—"এখনই সিভিল সার্জ্জনকে চিঠি লিখিয়া, ইহা সত্য কি না জিজ্ঞাসা কর এবং যদি সত্য হয়, তবে কি ঔষধ ও কতজন ডাক্তার চাই, তাঁহার কাছে তাহার 'এষ্টিমেট' চাহ।" সিভিল সার্জ্জন উত্তরে লিখিলেন যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক এবং ঔষধের ও ডাক্তারের এক দীর্ঘ তালিকা পাঠাইয়া দিলেন। আমরা উহা গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিলাম। যত মহামারী বাড়িতে লাগিল, তত তালিকাও বৃদ্ধি

হইতে লাগিল এবং প্রত্যেক সপ্তাহের ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে বাক্স বাক্স ঔষধ ও ডজনকে ডজন এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন ও নেটিভ ডাক্তার আসিতে লাগিল। তখন আমার আর এক বিপদ্। ইহারা চিকিৎসা করিবে কি, মহামারীর প্রাদুর্ভাব শুনিয়া, আসিয়াই আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। কেহ মাতার দোহাই দিয়া, কেহ পিতার দোহাই দিয়া, কেহ নিজের পীড়ার দোহাই দিয়া, তাহাদের কোনও মতে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য হাহাকার করিতে লাগিল। কতগুলি কর্ম্মে এস্তেফা দিয়া চলিয়া গেল। যাহারা নিতান্ত চাকরীর মায়া ছাড়াইতে পারিল না, তাহারা প্রাণ হাতে করিয়া স্থানে স্থানে গেল। কিন্তু চিকিৎসা করা দূরে থাকুক, ভয়ে আপনি অনাহারে অনিদ্রায় গাছতলায় মড়ার মত পড়িয়া থাকিত। তাহার উপর আবার সেনিটারি কমিশনরের উৎপাত। তিনি আসিয়া এক রাশি নিয়মাবলী লিখিলেন। উহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া চারিদিকে ছড়াইবার ভার আমার স্কন্ধে পড়িল। এ নিয়মাবলীতে লেখা ছিল যে, গরুর ঘরের পাকা ভিটা করিয়া, তাহাতে পাকা ড্রেণ দিতে হইবে। খুব ভাল জল গরম ও ফিল্টার করিয়া খাইতে হইবে,—দেশের সমস্ত দীর্ঘি পুষ্করিণী সমুদ্রপ্লাবনে লবণাক্ত! বাড়ীর আশে পাশে গোবর পর্য্যন্ত থাকিতে পারিবে না, উৎকৃষ্ট বস্তুসকল আহার করিতে হইবে এবং যে কাপড়, বিছানার সহিত ওলাউঠারোগীর সংশ্রব মাত্র হইয়াছে, উহা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। বলা বাহুল্য, এ চিকিৎসায় কিম্বা এ নিয়মাবলীতে কাহারও কিছু উপকার হয় নাই। শ্রীভগবানের সংসারে রাত্রির পর দিন আছে ; শোকের পর শান্তি আছে ; বিপদের পর উদ্ধার আছে। ক্রমে ওলাউঠা থামিয়া গেল। চট্টগ্রাম ও ঢাকা-বিভাগ হইতে ,সাইক্লোনে'র শেষ রিপোর্ট গেলে যখন তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য বাহির হইল, দেখা গেল—সমুদ্রপ্লাবনে ৪০,০০০ সহস্র এবং ওলাউঠায় আরও ৪০,০০০ সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। কি ভীষণ খণ্ডপ্রলয়!

চট্টগ্রাম কলেজ

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামে বদলি হইয়া আসিয়া দেখিলাম, চট্টগ্রামের শিক্ষার অবস্থা অতীব শোচনীয়। আমাদের alma mater গবর্ণমেণ্ট স্কুল ছাড়া সহরের উপর আরও দুটা স্কুল হইয়াছে। একটার নাম কুইন্স স্কুল (Queen's School), আর একটার নাম এলবার্ট স্কুল (Albert School)। এরূপ লোক ইহাদের অধ্যক্ষ হইয়াছেন যে, তাঁহারা ইংরাজি ত জানেনই না, অন্যরূপেও তাঁহারা মা সরস্বতীর কাছে কোনও অংশে ঋণী নহেন। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, এক স্কুলে শিক্ষা, কি শাসন সম্বন্ধে কিছু পীড়াপীড়ি হইলে ছাত্রেরা সে স্কুল হইতে অন্য স্কুলে চলিয়া যায়। অতএব কোনও স্কুলেই শিক্ষা নিয়মমত হইতেছে না। যে চট্টগ্রাম স্কুল হইতে ছাত্রেরা প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কম্পিটিশান স্কলারশিপ বা প্রতিযোগী বৃত্তি পাইয়াছে, সে স্কুলে এখন কোনও মতে দুই একটি ছাত্র তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ হইতেছে। অন্যদিকে ছাত্রদিগের উৎপাতে কোথায়ও গান, বাদ্য, কি কোনও আমোদ হইবার সাধ্য নাই। দেশে কয়েকটি যাত্রার দল হইয়াছে ; এবং ছাত্রেরা এক দল না এক দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছে। এক দলের গান কোথায়ও হইলে অন্য দলের পৃষ্ঠপোষক ছাত্রেরা ঢিল ছুঁড়িয়া ঝাড় লণ্ঠন এবং গায়কদের ও শ্রোতাদের মাথা ভাঙ্গে, কিম্বা ঘরে আগুন লাগাইয়া দেয়। দেখিলাম, প্রথমতঃ কোন মতে এ যাত্রার দলগুলি ধ্বংস করিতে না পারিলে দেশের রক্ষা নাই। ভদ্রলোকদের মধ্যেও এ সকল দল লইয়া ঘোরতর দলাদলি উপস্থিত হইয়াছে। আমার বাসায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় গান বাদ্য ও আমোদ হইত। একদিন গায়ক এক দলের একটি বিচিত্র গান গাইলেন। গানটি এই—

"যুদ্ধে চলিল বীর রাম ভগবান,
হনুমান, জাম্বুবান, নল, নীল, সুগ্রীবসেন।"—ইত্যাদি

সে ছাই ভস্ম এখন মনে নাই। রচনা ত এই ; গানের ভাবটিও এরূপ ;—রামচন্দ্র যুদ্ধে যাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাৎ বড় বড় বানরসকল, এবং তাহাদের পশ্চাৎ ছোট ছোট বানরসকল চলিয়াছে। এরূপে বড় ও ছোট বানরের নামের তালিকা আছে। আমরা এ বিচিত্র গানটিতে বড় বড় বানরের নামের স্থলে যাত্রার দলের অধিকারীদের নাম, এবং ছোট ছোট বানরের নামের স্থানে তাহাদের প্রধান প্রধান গোঁড়াদের নাম যোজনা করিয়া গানটিকে আরও বিচিত্র করিলাম।

এ গীত ভারতযুদ্ধের একাঘ্নী অস্ত্রের কার্য্য করিল। ইহা পথেঘাটে গীত হইতে লাগিল এবং একটা দেশব্যাপী হো হো হাসি উঠিল। এ মহাঅস্ত্রের আঘাতে একে একে সমস্ত দল বিলুপ্ত হইল।

এমন সময় চট্টগ্রাম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সেক্রেটারির পদে আমি নিয়োজিত হইলাম। আমাদের সময় জেলার কর্ত্তৃপক্ষীয় সাহেবদের লইয়া যে কমিটি ছিল, শিক্ষাবিভাগের কল্যাণে এখন আর সে কমিটি নাই। আছেন এক সেক্রেটারি। এতদিন সে কার্য্যও স্কুলের হেডমাষ্টারের উপর অর্পিত ছিল। আমি সেক্রেটারি হইয়াই যাত্রার দলের সঙ্গে সঙ্গে স্কুলের দলও ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলাম। এ কার্য্যেও উপহাস আমার মহাস্ত্র। ঠাট্টার চোটে প্রতিযোগী স্কুল দুটির সেক্রেটারিদ্বয় পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। তখন আমি সে দুটি স্কুল ভাঙ্গিয়া, সমস্ত ছাত্র গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আনিলাম। সে দুই স্কুলে যে দুই একটি ভাল শিক্ষক ছিল, তাহাদের আমি পূর্ব্বেই হস্তগত করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আনিয়াছিলাম। এ সময়ে দেশের অমূল্য রত্ন ডাক্তার অন্নদাচরণ কাস্তগিরি চট্টগ্রামের এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন ছিলেন।—তিনি চট্টগ্রাম স্কুলকে কলেজে পরিণত করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম সে কথা আমি পূর্ব্বে চিন্তা করিয়াছি। কিন্তু আমার মতে কলেজ করিলে চট্টগ্রামে শিক্ষার উন্নতির পক্ষে বড় মঙ্গল হইবে না। কারণ, কলিকাতায় পড়া ও চট্টগ্রামে পড়া, উভয়ে অনেক তারতম্য হইবে। তথাপি তিনি জিদ করিতে লাগিলেন, এবং আমি তাঁহাকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতাম বলিয়া সম্মত হইলাম। কিন্তু টাকা পাই কোথায়? তখন আমি 'রায়বাহাদুর' উপাধির প্রলোভন দেখাইয়া, চট্টগ্রামের উত্তর সীমাবাসী কোনও জমিদার মহাজনকে দশ হাজার টাকা দিতে সম্মত করাইলাম। এ টাকার দ্বারা প্রথমতঃ চট্টগ্রামে F. A. ক্লাশ পর্য্যন্ত কলেজ খোলা হয়। আমি নিজে এক দীর্ঘ রিপোর্ট মুসাবিদা করিয়া এবং কমিশনর দ্বারা উহা পাশ করাইয়া, উক্ত মহাজনকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দেওয়ার জন্য গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিলাম।

ইহার কিছু দিন পরে 'লিটনী দিল্লীদরবারে'র হুজুগ উঠে। মিঃ লাউইসের ছুটির সময় কমিশনর মিঃ স্মিথের সঙ্গে আমরা দলে বলে নোয়াখালি গিয়াছি। সেখানে গবর্ণমেণ্টের গোপনীয় অৰ্দ্ধ অফিসিয়েল (Confidential D. O.) পত্র আসিল যে, দিল্লীদরবার উপলক্ষে, চট্টগ্রাম-বিভাগে এক রাজা, এক নবাব, দুই রায়বাহাদুর ও দুই খাঁ বাহাদুর উপাধি দেওয়া হইবে। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সকল উপাধির জন্য কাহাকে মনোনীত করা হইবে। আমি উত্তর দেওয়ার জন্য আধ ঘণ্টা সময় চাহিলাম, এবং তাহার পর গিয়া কমিশনরকে বলিলাম যে, পার্ব্বত্য চাক্মা রাজাকে 'রাজা' উপাধি এবং উক্ত মহাজনকে কিম্বা তাহার পুত্রকে 'রায়বাহাদুর' উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। নবাব ও খাঁ বাহাদুর উপাধির উপযুক্ত লোক চট্টগ্রাম-বিভাগে কেহ নাই। স্মিথ সাহেব বলিলেন—চাক্মা রাজার নির্ব্বাচন ঠিক হইয়াছে। তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক ইংরাজরাজ্যের বহু পূর্ব্বে রাজা। কিন্তু উক্ত মহাজনকে তিনি চিনেন না। আমি তাঁহার পুত্রের উল্লেখ করিলে তিনি ঘোরতর আপত্তি করিলেন। আমি বলিলাম—উহা করিতে মিঃ লাউইস প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি কাগজ

দেখিতে চাহিলেন। আমি উল্লিখিত রিপোর্ট লইয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি বলিলেন —"এ ত তোমার হাতের লেখা।" আমি উত্তর করিলাম—"স্বাক্ষর ত আমার নয়—লাউইস্ সাহেবের।" তখন তিনি বলিলেন—"পুত্র নয়, পিতার নামে রিপোর্ট কর।"

আমি তদনুসারে ডেমি অফিসিয়েল চিঠির উত্তর মুসাবিদা করিয়া দিলাম। তিনি স্বাক্ষর করিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠাইলেন। পিতা পুত্র উভয়ের নাম করিবার কারণ এই ছিল, তখন পর্য্যন্ত উপাধি তাঁহারা কে লইবেন, পিতা পুত্র স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ক্রমে দিল্লীদরবার ঘনাইয়া আসিলে পিতা পুত্রের মধ্যে এ বিষয় লইয়া একটা মহাতর্ক উপস্থিত হইল। পিতার ইচ্ছা ছিল যে, উপাধিটি তিনিই গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি তাঁহার সম্পত্তির স্রষ্টা। পুত্র বলেন—পিতা বৃদ্ধ, শীঘ্র মরিয়া যাইবেন, তাহা হইলে উপাধিটিও তাঁহার সঙ্গে মারা যাইবে এবং তাহা হইলে দশহাজার টাকা একেবারে জলে যাইবে। আমি মহাসঙ্কটে পড়িলাম। এক বেলা পিতা আমার কাছে আসেন ও একরূপ বলেন। অন্য বেলা পুত্র আসেন ও অন্যরূপ বলেন। এরূপে কয়েক দিন চলিয়া গেল। আর একদিন পিতা আসিয়া বলিলেন—যখন পুত্রের উপাধি লইবার এত সাধ হইয়াছে, এবং তিনি বৃদ্ধ, শীঘ্র মরিয়া যাইবেন, তখন পুত্রকেই উপাধি দেওয়া হউক। বৃদ্ধ একটি প্রকাণ্ড সম্পত্তির স্রষ্টা, বুদ্ধিজীবী, সদাশয়, এবং দেখিতেও ভক্তিভাজন ছিলেন। তিনি এরূপ কষ্টের ভাবে কথাটি বলিলেন যে, শুনিয়া আমারও বড় কষ্ট হইল। যাহা হউক, সনন্দ পুত্রের নামে দেওয়ার জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলাম, এবং তদনুসারে পুত্রই উপাধি পাইলেন। কলেজ খুলিবার পূর্ব্বক্ষণেই একজন নূতন লোক চট্টগ্রাম স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়া আসিলেন, এবং কলেজের প্রিন্সিপ্যালের পদপ্রার্থী হইলেন। কিন্তু আমি ইতিমধ্যে আমার পিতৃব্যপ্রতিম সেই যশোহর স্কুলের খ্যাতনামা হেডমাষ্টারবাবুকে মনোনীত করিয়াছিলাম। শুনিয়া নূতন হেডমাষ্টার কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন যে, তিনি এ পদের আশায়ই চট্টগ্রামে আসিয়াছিলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহই আমার কাছে গিয়া তাঁহার মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেন। যাহা হউক, আমার বন্ধু এ কার্য্য গ্রহণ করিলেন না। তখন নূতন হেডমাষ্টারের কাতরতায় অগত্যা তাঁহাকে এ পদে নিয়োজিত করি। তাঁহার সময় কলেজ বেশ ভাল চলিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরে যখন একদিন তাঁহার সঙ্গে কলিকাতায় সাক্ষাৎ হইল, তিনি এরূপ গুরুগৌরবের সহিত আমার সহিত কথা কহিলেন যে, আমি পূর্ব্বকথা মনে করিয়া হাসিয়াছিলাম।

এরূপে কলেজ স্থাপিত হইল, এবং এখনও চলিতেছে। কিন্তু আমার ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই। যদিও ইতিমধ্যে অনেক ছাত্র এণ্ট্রান্স্ ও এফ্. এ. পাশ করিয়াছে, তাহারা কেহই পূর্ব্বছাত্রদিগের ন্যায় গৌরবের সহিত পাশ করিতে পারে নাই, এবং সংসারে সেরূপ কৃতিত্বও দেখাইতে পারে নাই। অধিকাংশই কলিকাতা গিয়া, দুই তিনবার ফেল না হইয়া, বি. এ. কি বি. এল. পাশ করিতে পারিতেছে না।

দিল্লীদরবার ও রায়বাহাদুরি প্রতিদান

দেখিতে দেখিতে দিল্লীর দরবারের দিন নিকট হইয়া আসিল এবং চট্টগ্রামে তাহার আয়োজন হইতে লাগিল। তখন ইহুদি ডিজরেলি বা লর্ড বেকন্স্ফিল্ড ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী বা প্রকৃত রাজা। ইহুদিরা খ্রীষ্টকে হত্যা করিয়াছিল। সে জন্য তাহারা খ্রীষ্টানদের দ্বারা চিরদিন ঘৃণিত এবং সর্ব্বত্র উৎপীড়িত। কিন্তু এই কূটবুদ্ধি ইহুদির দ্বারায় সমস্ত ইংরাজ জাতি মেষপালের মত চালিত হইতেছিল। তিনি এক এক খেয়াল তুলিতেন, এবং সমস্ত ইংরাজ জাতি ক্ষেপিয়া উঠিত। তাঁহার বিপক্ষদলের নেতা গ্ল্যাডষ্টোন অতুল বাগ্মিতার

দ্বারাও তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিতেন না। সিন্ধুনদ চিরদিনই ভারতবর্ষে শত্রুসৈন্যের পথে গুরুতর সীমা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু ডিজরেলি বলিলেন—উহা বৈজ্ঞানিক সীমা নহে। সে অবধি আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালা আছে, ইংরাজ রাজপুরুষেরা করভারপীড়িত নিরন্ন ভারতবাসীর অজস্র শোণিতে তাহা রঞ্জিত করিয়া, বৈজ্ঞানিক সীমা (Scientific Frontier) খুঁজিতেছেন। উহা ভারতবাসীর সর্ব্বনাশের একটি প্রধান কারণ হইয়াছে। প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা এই সাপের পাঁচ পা অন্বেষণে ব্যয়িত হইতেছে। সেই রূপ ডিজরেলির খেয়াল হইল যে, মহারাণী Empress of India বা ভারতসাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করিলে রুশ জাতি আর ভয়ে ভারতবর্ষের দিকে কর বাড়াইবে না। ডিজরেলির এই খেয়াল ভারতবর্ষে প্রচারিত হইল। লর্ড লিটন তখন বড়লাট। তিনি নিজেও খেয়াল ও আমোদপ্রিয়। স্থির হইল, ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী হিন্দুদের ইন্দ্রপ্রস্থে ও মুসলমানদের দিল্লীতে এক বৃহৎ দরবার হইবে ও সেখানে এ উপাধি বিঘোষিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে নগরে নগরে দরবার করিয়াও রাজপুরুষেরা ইহা প্রচার করিবেন। তাহার জন্য টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে দেওয়া হইয়াছিল। স্মরণ হয়, চট্টগ্রাম-বিভাগ সাতহাজার টাকা পাইয়াছিল। এই কার্য্যের ভার কমিশনার আমার ও চট্টগ্রামের নবাগত কলেক্টরের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রাম সহরের পুলিস লাইনের মাঠে সামিয়ানা গ্রথিত করিয়া দরবারের কার্য্য আরম্ভ করি।

তখনও সেই বাঙ্গালী বন্ধু চট্টগ্রামের 'এর্কজাকিউটিব ইন্‌জিনিয়ার' ছিলেন। তিনি এ কার্য্যে আমাদের সাহায্য করিতেছিলেন। একদিন আমি সেই দরবার-সামিয়ানায় যাইতেছি, দেখি—ইন্‌জিনিয়ারবাবু ক্রোধে টঙ্ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে. একজন কনেণ্টবল তাঁহার ঘোরতর অপমান করিয়াছে। অতএব তিনি কলেক্টরের কাছে পত্র লিখিয়া, কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। আমি তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া ফিরাইয়া লইলাম এবং সেই কনেণ্টবলটিকে আমাকে দেখাইয়া দিতে বলিলাম। ফিরিয়া গিয়া তিনি সামিয়ানার নীচে সেই কনেণ্টবলটিকে দেখাইলেন। সে আমাদিগকে দেখিয়াও একটা টুলে নবাবপুত্রের মত বসিয়াছিল, এবং গোঁফে তা দিতেছিল। তাহার ব্যবহার দেখিয়া আমারও সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। আমি অগ্রসর হইয়া হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুই ইন্‌জিনিয়ারবাবুকে এইরূপ অপমানসূচক কথা বলিয়াছিস্ কেন?" সে একটু হাসিয়া বলিল—"বাবু মিথ্যা কথা বলিয়াছে।" বন্ধু বলিলেন—"দেখিলেন?" আমি আর সামলাইতে পারিলাম না। বাঘের মত তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে মারিতে লাগিলাম। সে পঞ্জাবী, ইচ্ছা করিলে আমার হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু সে মার খাইয়া পলাইতে লাগিল। আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে মারিতেছিলাম। তখন আর একজন কনেণ্টবল বলিল যে, সে লাইন সব-ইনস্‌পেক্টরের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি তখন বুঝিলাম যে, সে এ কারণে এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে। তখন আরও মারিলাম। তাহার মাথার পাগড়ী উড়িয়া গেল। এমন সময়ে তাহার পিতৃব্য ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"আপনি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এরূপ করিয়া মারিতেছেন কেন? আপনি কি লাট সাহেব হইয়াছেন?" আমি বলিলাম—"তুমি আর এক পা অগ্রসর হইলে আমি তোমাকেও মারিব।" ইন্‌জিনিয়ারবাবু এমন সময়ে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"চল কলেক্টর সাহেবের কাছে। এখানে আর থাকিয়া কাজ নাই।" আমরা দুজনে সামিয়ানা হইতে বাহির হইবামাত্র কলেক্টরের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি ইন্‌জিনিয়ারবাবুর পত্র পাইয়া আসিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—তিনি কনেস্টবলের ও তাহার খুড়ার সমুচিত দণ্ড করিবেন, এবং আমাদিগকে কাজ ফেলিয়া না যাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন।

পরদিন দ্বিপ্রহর সময়ে আফিসে কোর্ট সব-ইন্‌স্‌পেক্টর—তিনিও হিন্দুস্থানী—আমাকে পত্র লিখিলেন যে, সেই কনেষ্টবল আমার নামে ফৌজদারীতে অভিযোগ করিয়াছে এবং আমার নামে সমনের হুকুম হইয়াছে। তখন কলেক্টরটি কি প্রকৃতির লোক বুঝিলাম এবং কমিশনরের কাছে গিয়া সমস্ত কথা বলিয়া পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি আমাকে কেবল একটি কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"মোকদ্দমা কাহার কাছে হইয়াছে?" আমি বলিলাম, জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছে। তিনি আমাকে বলিলেন—"তুমি ডিষ্ট্রিক্‌ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে দেখা করিয়া এ সকল কথা বলিও, এবং তিনি কি বলেন, কাল আমাকে জানাইও।" আমি পরদিন প্রাতে পুলিশের প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একজন দুরন্ত লোক, এবং পুলিশের মা বাপ। তিনি আমাকে দেখিয়াই ক্রোধে গরগর করিয়া বলিলেন—"আপনি সে দিন স্কুলের মিটিঙ্গে আমার কনেষ্টবল একজনকে মারিয়াছেন, এবং লাইনে আমার সব-ইন্সপেক্টারের ভ্রাতুষ্পুত্রকে মারিয়াছেন।" আমি বলিলাম যে, আমি জীবনে কাহারও গায়ে হাত তুলি নাই। কিন্তু পুলিশে যদি ভদ্রলোকের প্রতি এরূপ দুর্ব্যবহার করে, তবে দুবার কেন, দু' শ বার মারিব। আমি আরও বলিলাম যে, কমিশনর তাঁহাকে এ সকল কথা বলিতে বলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি, না হয় আসিতাম না। আফিসে গেলে সেদিন আবার কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টর পত্র লিখিলেন যে, কনেষ্টবল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছে। আমি কমিশনরকে গিয়া এ খবর দিলাম। তিনি একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তবে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছে? আচ্ছা।" বোধ হইল, তিনি ভিতরে ভিতরে কলেক্টরকে অন্তরটিপনি দিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিবসে দরবার হইল। দরবার-সামিয়ানার সম্মুখে, দুদিকে দুখানা তাঁবু ফেলিয়াছিলাম। একদিকে আমার আফিস এবং অন্যদিকে কমিশনরের অপেক্ষার স্থান। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি আসিয়া সেই শিবিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেখিলাম, ভয়ে তাঁহার একপ্রকার ঘর্ম্ম ছুটিয়াছে। সেইখানেই তিনি ও অন্যান্য সাহেবরা আচ্ছা করিয়া 'পেগ' (মদের গেলাস) টানিলেন। তাহার পর দরবারে সকলেই উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমি বলিলে, কমিশনর সজ্জা করিয়া দরবারের দিকে চলিলেন। মিলিটারি ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল, এবং বোমের বিরাট্ শব্দে পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যে কমিশনর, তাঁহার চারিদিকে উলঙ্গ কৃপাণ করে চারিজন ডিষ্ট্রিক্‌ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পশ্চাতে জেলার মাজিষ্ট্রেটগণ ও আমি। কলেক্টর আমার কাণে চুপি চুপি বলিলেন—"আপনি এ সমারোহ করিয়া আপনার কমিশনরকে লইতেছেন, কিন্তু তিনি এ ভাবে যাইতেছেন—যেন ঠিক তাঁহার ফাঁসীকাষ্ঠে যাইতেছেন। কমিশনর বেদীর উপরিস্থিত সজ্জিত আসনে এরূপ ভাবে বসিলেন—যেন পড়িয়া যান। বেদীর চারি কোণাতে চারি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নগ্ন অসিহস্তে দাঁড়াইলেন। আমি বেদীর এক পার্শ্বে দাঁড়াইলাম। ব্যাণ্ড থামিল। বোম্ থামিল। কমিশনর কোনও মতে দাঁড়াইয়া ঘোষণাপত্র এরূপ ভাবে পাঠ করিলেন যে, তিনি ভিন্ন তাঁহার একটি কথাও আর কেহ শুনিল না। তিনি বসিলে উহার অনুবাদ পাঠ করিবার ভার ছিল আমার উপর। গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রবিন্‌সনি' বাঙ্গালায় তাহার এক বিচিত্র অনুবাদ আসিয়াছিল। আমি উহা পড়িতে অসম্মত হইয়াছিলাম। কমিশনর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে আমার একটুক নাম আছে; আমি ঐ 'সাহেবী বাঙ্গালা' পড়িলে লোকে গায়ে ধূলা দিবে এবং কেহই উহা বুঝিবে না। অতএব তিনি আমার নিজের অনুবাদ পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। আমি বেদীর সমক্ষে গিয়া তাহাই পাঠ করিলাম। মিঃ লাউইস্ এক বক্তৃতা লিখিয়া আনিয়াছিলেন। কম্পিত অস্ফুট কণ্ঠে উহা পাঠ করিলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ স্মৃতির সাহায্যে উহার অনুবাদ করিয়া সকলকে শুনাইলাম। চারিদিকে, সাহেবমহলে পর্য্যন্ত করতালির ধুম পড়িয়া গেল।

দরবার ভঙ্গ হইল। আবার সেইরূপ সজ্জা করিয়া কমিশনর চলিয়া গেলেন। তখন সাহেবেরা আমাকে ঘেরিয়া, পিঠে চাপড়াইয়া বলিলেন—"আপনার কমিশনরের একটি কথাও বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এমন সুন্দর বাঙ্গলায় ও এমন পরিষ্কার কণ্ঠে আপনি বলিয়াছেন যে, আমরাও আপনার অনুবাদ বুঝিতে পারিয়াছি। কমিশনরের আসনে আপনারই বসা উচিত ছিল।" সন্ধ্যার সময়ে সমস্ত বিস্তীর্ণ মাঠ ও পার্শ্বস্থ গিরিমালা অতি সুন্দররূপে আলোকিত করিয়াছিলাম। পর্ব্বতের গায়ে গায়ে বাজি পুঁতিয়া দিয়াছিলাম। যখন বাজিতে আগুন দেওয়া হইল, তখন যে শোভা হইয়াছিল, যিনি দেখিয়াছেন, তিনি বোধহয় ভুলিতে পারেন নাই। রাত্রিতে দরবারস্থলে বাই খেম্‌টার নাচ হইয়াছিল। আর নাচ হইয়াছিল একজন ছোট পুলিশ সাহেবের। লোকটি বড় আমোদ-প্রিয় ছিল। মদে চুর হইয়া এক 'বেঞ্জু' বাজাইতে বাজাইতে সাহেবদের সঙ্গে আসরে প্রবেশ করিয়া, অমনি বাইজির পেশওয়াজ অঙ্গে জড়াইয়া 'বেঞ্জু' বাজাইয়া নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। তিন চারিহাজার দর্শক চারিদিকে হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

এইরূপে দরবার শেষ হইল, এবং দিল্লীতে মহাসমারোহে ডিজ্‌রেলির খেয়াল প্রচারিত হইল। আমরা দরবার-সামিয়ানা সাজাইবার সময়ে একটি চাষা একদিন জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিল—"এখানে কি হইবে?" একজন চাপরাশি উত্তর দিয়াছিল—"মহারাণী ভারতেশ্বরী উপাধি লইবেন।" সে কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া বলিল—"ও আবার কেন? মহারাণীই বা কি মন্দ ছিল; তাহার উপর আবার ভারতেশ্বরী কেন?" চাপরাশী মহাশয় তাহার কোনও সদুত্তর দিতে না পারিয়া, তাহাকে ধমক দিয়া তাড়াইয়া দিলেন। আমরা শুনিয়া হাসিতে লাগিলাম এবং বলিলাম যে, কথাটা ঠিকই বলিয়াছে। লোকটা রসিক বটে। ইহার ফলে যে রুশিয়ার হৃৎকম্প কি ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহা শুনি নাই। ইংরাজী খবরের কাগজ সকল যখন এ উপাধি লইয়া বড় বাহবা দিতেছিল, তখন একটি রুশ কাগজ মিঠা সুরে বলিয়াছিল—"রুশেরা মনে করে যে, পৃথিবীতে আর একটি সাম্রাজ্ঞী বেশী হইল; এইমাত্র। (So far as the Russians are concerned there is one Empress more in the world and that's all.) আর ভারতবর্ষ? কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় সেই সময়েই গাহিয়াছিলেন—

> "পরদীপমালা নগরে নগরে
> তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।"

বলা বাহুল্য, এই দরবারে উক্ত মহাজনপুত্র 'রায়বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে চট্টগ্রামের নবাগত কলেক্টর চট্টগ্রামের উচ্চবংশীয়দের, বিষেশতঃ আমার বংশকে একটুক জব্দ করিতে চেষ্টা করেন। শুনিয়াছিলাম, তিনি ছয় মাসের জন্য চট্টগ্রাম আসিয়া-ছিলেন। তাহা সত্য কি না, আমি তাঁহাকে প্রথম দর্শনে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়া-ছিলেন—"আপনার ভয়ে কেহ চট্টগ্রামের কলেক্টর হইয়া আসিতে চাহে না। গবর্ণমেণ্ট আমাকে জোর করিয়া পাঠাইয়াছেন। তবে আপনি যদি কলমের চোটে আমাকে না তাড়ান, আমার এখানে কিছু কাল থাকিবার ইচ্ছা আছে।" ইহাতে বুঝা যাইবে, আমার প্রতি তাঁহার বড় শুভদৃষ্টি ছিল না। বিশেষতঃ ইদানীং যে সকল ইংরাজ ভারতের বিধাতা-পুরুষ হইয়া আসিতেছেন, শুনিয়াছি—তাঁহারা না কি অধিকাংশ ইংলণ্ডের নিম্ন ও মধ্যশ্রেণীর লোক। এতাদৃশ লোকের যে ভারতের উচ্চশ্রেণীর প্রতি একটা রক্তগত বিদ্বেষ হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ইনি উক্ত মহাজনপুত্রকে সকলের শীর্ষস্থানে আসন দিয়া, আমাদের উচ্চবংশীয়দের স্থান তাহার নীচে দিয়াছিলেন। তাহাতে ইহাঁদের মধ্যে একটা ঘোরতর

আন্দোলন উঠিয়াছিল, এবং তাঁহাদিগকে এই প্রকাশ্য অবমাননা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকলে আমাকে ধরিয়াছিলেন।

"পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়?
যে জিনিতে পারে পণে সেই নিয়া যায়।"

তেমনি—"রায়বাহাদুরিতেও জাতি কেবা চায়?
যেই টাকা দিতে পারে সেই লয়ে যায়।"

ইংরাজেরা জাত-বণিক্‌; বৃটিশ সাম্রাজ্য একটা বিরাট্‌ বাণিজ্য। টাকাই ইংরাজের অখণ্ড মণ্ডলাকার ঈশ্বর। ইহাদের মান, সম্মান, উপাধি, সকলই টাকার দরে বিকায়। রায়-বাহাদুরি, রাজাবাহাদুরি, সর্ব্বপ্রকারের বাহাদুরির একটা একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে। ইহাতে জাতি বা গুণের সম্পর্ক নাই। এই কারণে চট্টগ্রামের উচ্চবংশীয়দের মধ্যে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। তাঁহারা কেহ কেহ কমিশনরের কাছে প্রতিবাদ করিলেন। কমিশনর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, আমি বলিলাম যে, আসনের এরূপ বন্দোবস্ত হইলে চট্ট-গ্রামের উচ্চবংশীয়েরা—তাঁহারাই দেশের প্রধান লোক,—কেহই এই দরবারে আসিবেন না। উহা একটা হাস্যকর ব্যাপার হইবে। তখন তিনি আসন ব্যবস্থার সম্যক্‌ ভার আমার হাতে দিয়া, আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিতে কলেক্টরকে আদেশ করিলেন। তাঁহার মুখ চূণ হইল, এবং সেই দিন হইতে তিনি আমার মহাশত্রু হইলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক নাম মধ্যপথ। সংসারের সকল মধ্যপথ উৎকৃষ্ট পথ,—Golden mean। আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া এই মধ্যপথ অবলম্বন করিলাম, এবং মহাজনপুত্রের জন্য পৌরাণিক ত্রিশঙ্কু রাজার ব্যবস্থা করিলাম। নিমন্ত্রিত ইওরোপীয়ান শ্রেণী কমিশনরের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং নিম-ন্ত্রিত দেশীয় ভদ্রলোকদের শ্রেণী বাম পার্শ্বে দিয়া, মহাজনপুত্র এবং যাঁহারা 'অনার সার্টিফিকেট' পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের স্থান বেদীর সম্মুখে দিলাম। এরূপে শ্যাম ও কুল অথবা তাঁতিকুল ও বৈষ্ণবকুল, উভয়ই রক্ষা হইল। রায়বাহাদুরি পোষাক একে একটা মহাহাস্যকর পরিচ্ছদ, সাটিনের আলখাল্লা এবং কোমরবন্ধ। আলখাল্লার পরিসরে রায়-বাহাদুরদের কীর্ত্তিপূর্ণ উদর-কুম্ভ অল্প কথা, গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা স্থান পাইতে পারে। একবার কমিশনরের আফিসের কেরাণীরা এক আরদালিকে এই পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া, একটা দিন হাসিয়াছিল। এই ত পোষাক, তাহাতে মহাজনপুত্রের মূর্ত্তিখানিও আরও হাস্যকর ছিল। কৃশাঙ্গ, কৃষ্ণবর্ণ; চক্ষু দুটি কোটরস্থ, এবং বিপরীত দৃষ্টিবিশিষ্ট। দেহখানি দগ্ধ কুলবৃক্ষবিশেষ। অতএব দরবারের কেন্দ্রস্থলে তাঁহার যে শোভা হইয়াছিল, ইংরাজ নরনারী হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছিল।

যাহা হউক, এ ঘটনা হইতে তাঁহার সহিত আমার কিঞ্চিৎ বন্ধুতা হইয়াছিল। আমার সাহায্যে এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, আমাকে হাজার টাকা মূল্যের একখানি গাড়ী কলিকাতা হইতে আনাইয়া, আমাকে তাঁহার কৃতজ্ঞতাচিহ্নস্বরূপ দিতে চাহিয়া-ছিলেন। আমি উহা লইতে অস্বীকার করিলাম। এই হইতে তিনি তাঁহার সকল গুরুতর কার্য্যে আমার পরামর্শ লইতেন। এমন কি, আমি তাঁহার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে ফেণীর তীরে শিবিরে থাকিতে তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, আমার পরামর্শমতে তাঁহার সম্পত্তির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করেন। তবে কি এ সকল উপকারের প্রতিদান আমি পাই নাই? পাইয়াছি বই কি! উপকারের প্রতিদান না হইলে যে বিধাতার একটা সৃষ্টি-নীতি নিষ্ফল হয়। আমার জীবনে যেরূপে অন্যত্র পাইয়াছি, এখানেও তাহার বিপরীত হয় নাই।

"হৃদয়ের রক্ত দিয়া কর পর উপকার;
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদান তার।"

ইহার বহু বৎসর পরে আমি চট্টগ্রামে শেষ বার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইয়া আসিয়া,

একটা পাহাড়ের বন্দোবস্তির জন্য কলেক্টরের কাছে প্রার্থনা করি। এই পাহাড়টি উক্ত বন্ধু মহাশয়ের ক্রয় করা একটি পাহাড়ের সংলগ্ন। তাহার এক অংশ তাঁহার পাহাড়-ভুক্ত বলিয়া তিনি আপত্তি উপস্থিত করেন। তাঁহার দুই পরিবার। তাঁহার শুক্লপক্ষের শ্যালক তাঁহার সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা। শ্যালক বাহাদুর এবং তাঁহার ইঙ্গিতমতে তাঁহার পাহাড়ের বাড়ীর ইউরোপীয় ভাড়াটিয়া এক বাঁশ কাঁধে অবতীর্ণ হইয়া বড় বড় বাঁশের দ্বারা, আমার পাহাড়ে যে রাস্তা করিয়াছিলাম, তাহা বন্ধ করিয়া দেন। তদন্তে তাঁহার আপত্তি অমূলক প্রমাণিত হইলে, তিনি উক্ত অংশটুকু বন্দোবস্তি না লইতে আমাকে অনুরোধ করিয়া এই পত্রখানি লেখেন। ১৭ই ফাল্গুন ১৩০৪।

সবিনয় নিবেদনমিদম্

আমার মালিকী দখলী ৳ নং জোতের অতিরিক্ত জমা ধার্য্যের জন্য আমার প্রতি নুটিশ হইয়াছে ঐ জমি আমার জোতের অন্তর্গত ঐ জোতের শামিল বরাবর আমার দখলে আছে, এবং উক্ত জমি আমার নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জানিতে পারিলাম আপনি ঐ জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার বন্দোবস্তের দরখাস্তখানা উঠাইয়া লইয়া বাধিত করিবেন। ইতি—নিবেদক

শ্রীগোলকচন্দ্র রায়

আমি তখন বলি যে, উহা ছাড়িয়া দিলে আমার বন্দোবস্তপ্রাপ্ত পাহাড়ে যাইবার পথ এবং তাহার অস্তাবল ইত্যাদির স্থান থাকিবে না। তখন তিনি আমাকে তাঁহার মোক্তার শ্যালক বাহাদুর দ্বারা এই পত্র লেখেন। ২০শে মে, ১৮৯৮ ইং।

সবিনয় নিবেদনমিদম্

আপনার সহিত আলামসা কাঠগড় মৌজায় ৮।১ নং জোতের সংলগ্ন ১৫৯ দাগের জমি নিয়া শ্রীযুক্ত রায় গোলকচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের সঙ্গে যে বিবাদ তাহা আপুসে মীমাংসা হওয়ায় আপনি ঐ দাগের জমির নিম্নভাগ দিয়া রাস্তা করিবার জন্য যে জমিটুক ৭২ নং জোতের লামছী বলিয়া বন্দবস্ত নিয়াছিলেন ঐ জমি আপনার বন্দবস্ত হইতে বাদ দিয়া রায় বাহাদুর বাবুকে ১৫৯ দাগের শামীল বন্দবস্ত দেওয়ার জন্য এসিষ্টাণ্ট সেটেল্‌মেণ্ট অফিসারকে নিবেদন লিখিয়াছেন, আমি রায় বাহাদুরের পক্ষে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে ঐ লামছী জমি ১৫৯ দাগের শামীলে রায় বাহাদুরবাবু বন্দবস্ত পাইলে আপনার চলিবার জন্য রাস্তার জমি এবং বর্ত্তমান পীলারের নিকটস্থ ১৬ নং দাগের জমি আপনাকে বন্দবস্ত দেওয়া যাইবে। ইতি—নিবেদক

শ্রীযামিনীমোহন গুহ

এই রায়বাহাদুরি প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, আমি আমার বন্দোবস্তির প্রার্থনা হইতে উক্ত অংশ বাদ দিতে কলেক্টরকে পত্র লিখি, এবং কলেক্টরের সাক্ষাতেও উক্ত শ্যালক বাহাদুর পত্রের লিখিত জমি আমাকে দিতে রায় বাহাদুর প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বলে। ইহার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কিছু দিন পরে আমি আমার বন্দোবস্তির পাহাড়ে একখানি বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার কোনও পুত্রের কাছে, তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতার প্রতিশ্রুতিমতে উক্ত জমিটুক আমাকে দেওয়ার জন্য এই পত্রখানি লিখি। চট্টগ্রাম, নবেম্বর, ১৯০৭।

কল্যাণবর,

তোমাদের পাহাড়ের বাড়ীর পশ্চাতে যে পাহাড় আছে আমি তাহার বন্দোবস্তির প্রার্থনা করিলে তোমার পিতা উহা তোমাদের বন্দোবস্তিভুক্ত বলিয়া, আপত্তি করেন। তদন্তে আপত্তি ভ্রান্তিমূলক প্রতিপন্ন হইলে এবং এই পাহাড় অন্যে বন্দোবস্তি লইলে তোমাদের বাড়ীর পক্ষে ক্ষতিজনক হইবে বলিয়া তোমার পিতা উক্ত প্রার্থনা উঠাইয়া লইতে

বন্ধুভাবে আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তদুত্তরে বলি যে, আমার পাহাড়ে যাইবার পথের জন্যই আমি উক্ত পাহাড়ের বন্দোবস্তি চাহিয়াছি। তখন তোমার পিতা আমার পাহাড়ের পথের জন্য এক খণ্ড ভূমি আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হন, এবং তদনুসারেই আমি উক্ত পাহাড়ের বন্দোবস্তির আবেদন প্রতিহার করি। ইহার অব্যবহিত পরে আমি চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হই এবং তোমার পিতাঠাকুরও লোকান্তর গমন করেন। তখন আমি ফেণীর উকিল বসন্তকুমার দত্ত মহাশয়কে তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের কাছে উক্ত প্রতিশ্রুতিমতে উক্ত জমিটুক লেখাপড়া করিয়া দিবার জন্য প্রেরণ করি। তাহার পর গবর্ণমেণ্ট আমার পাহাড় গ্রহণ করিবার জন্য বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া সম্প্রতি উহা রহিত করিয়াছেন। এখন আমি আমার পাহাড়ে একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিবার উদ্যোগ করিতেছি। অতএব তোমাদের পিতার প্রতিশ্রুতিমতে যে জমিটুকু এখন পতিত জঙ্গলাকীর্ণ পড়িয়া আছে, আমাকে তোমরা যে ভাবে ইচ্ছা কর, সে ভাবে দিয়া তোমাদের স্বর্গীয় পিতৃদেবের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলে অনুগৃহীত হইব। এমন কি, উপযুক্ত খাজনায় বন্দোবস্তি দিলেও আমি গ্রহণ করিব। তোমার পিতার ও তাঁহার পক্ষে তোমার মাতুলের এবং বসন্তবাবুর পত্রের নকল এ সঙ্গে পাঠাইলাম। তুমি বোধ হয় জান যে, তোমার পিতা আমার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, এবং আমার সাহায্যে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।

পিতার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা দূরে থাকুক, রায়বাহাদুরাত্মজ পত্রখানি উত্তর দিয়াও তাঁহার পিতৃভক্তির ও রক্তের অবমাননা করেন নাই। অথচ তিনি মূর্খ নহেন, যাহাকে এখন শিক্ষিত বলা যায় তিনি সেইরূপে শিক্ষিত। ইহার পর আর দুটি কথা বলিলেই সোনা সৌরভযুক্ত হইবে। জমিটুকুর মূল্য দশ পনর টাকার বেশী হইবে না। উহা এখন জঙ্গল ও মলমূত্রাকীর্ণ। শালা বাহাদুরের বা মহাজনপুত্রের মাতুল বাহাদুরের নিবাস শুনিয়াছি বাখরগঞ্জে।

"শ্যালকো গৃহনাশায় সর্ব্বনাশায় মাতুলঃ।" ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

> "কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, ইন্দ্রধনু চিত্র করে?
> করিলে কি বাড়ে তার শোভা?"

রক্ষা যে, মাথার উপর একজন নিয়ন্তা আছেন! তাঁহার লীলা বিচিত্র। এক নরাধম আমার পুত্রের সহিত তাহার কন্যার বিবাহ দিতে আমাদের অনেক সাধ্যসাধনা করে। আমি তাহাতে অসম্মত হওয়াতে সে আমার মহাশত্রু হয়। আমার বন্দোবস্তিপ্রাপ্ত পাহাড়ের সংলগ্ন এক পাহাড়ের বাড়ী আমি ভাড়া ও বন্ধক লইয়া, উহা ক্রয় করিবার চেষ্টায় ছিলাম। এই পাপিষ্ঠ গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া বাড়ীখানি একজন টি-প্লাণ্টারের কাছে বিক্রয় করায়। সে আমার পাট্টা রহিত করাইবার জন্য চার বৎসর কাল মোকদ্দমা করিয়া হাইকোর্টে পরাজিত হয় এবং শেষে উপযুক্ত মূল্য দিয়া আমার পাট্টা কেনে ও আমার যে রাস্তা শালা বাহাদুর সেই গৌরাঙ্গকে সম্মুখীন করিয়া বন্ধ করিয়াছিল সেই রাস্তাই আমাকে ছাড়িয়া দেয়। রায়বাহাদুরি বাঁশের বেরা ও পীলার কি হইল, জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, সে উহা লাথি মারিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

এই রায়বাহাদুরি উপাখ্যানে আমাদের ভাবিবার ও বুঝিবার অনেকটা বিষয় আছে বলিয়া উহা এখানে বিবৃত করিলাম। এই উপাখ্যান দ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কিরূপে কি সম্প্রদায়ের লোক, এই পোড়া দেশের রায়বাহাদুর হইতেছে। আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত পরে দিব। আরও বুঝিতে পারিবেন যে, যে 'উচ্চশিক্ষা'র ও 'স্বদেশী'র আন্দোলনে বঙ্গদেশটা টলমল হইতেছে, তাহার মূল্য কি? বুঝিতে পারিবেন—আমরা স্বদেশীর কাছে কেমন ব্যাঘ্র, আর ইউরোপীয়দের কাছে কেমন কুকুর। এরূপ স্বদেশী

বন্ধু হইতে কি বিদেশী শত্রু বাঞ্ছনীয় নহে? সর্ব্বশেষ, অভ্রভেদী হিমাচলের মত জগৎ-বিস্ময়কর ও অমর যেই দুই মহাকাব্যে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের নিম্নতম শ্রেণীরও জাতীয় জীবন গঠিত করিয়াছে, তাহার মূল শিক্ষা সত্যপালন। পিতৃসত্য পালনার্থ রামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসর বনবাসী হইয়াছিলেন, এবং কপট পাশায় পরাজিত হইয়া আত্মসত্য পালনার্থ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসর বনে বনে কি দুর্গতিই ভোগ করিয়াছিলেন! পাঠক! একবার সেই চিত্র, আর এই চিত্র, সেই শিক্ষা, আর এই শিক্ষা দেখ, আমাদের কি অধঃপতন হইয়াছে বুঝিতে পারিবে।

লোকহিত

তখনকার পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট বাস্তবিক একজন ক্ষমতাসম্পন্ন কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং ইচ্ছা করিলে দেশের ও লোকবিশেষের যথেষ্ট উপকার করিবার সুযোগ পাইতেন। কিন্তু প্রায় সকলেই তাহা না করিয়া, কিসে আপনার আত্মীয় স্বজনের চাকরী করিয়া দিতে পারিবেন, সে চেষ্টাতেই থাকিতেন। আমি কখন আমার কোন আত্মীয়কে একটি এপ্রেন্টিসও দিই নাই। আমার নীতি অন্যরূপ ছিল। তাহার দুএকটি দৃষ্টান্ত এখানে দিব।

১

আমি রোডসেস ডেপুটি কলেক্টর থাকিতে একজন বিদেশীয় লোক আমার অধীনে সব-ডেপুটি ছিলেন। ইহাঁদিগকে লোকে 'শব ডেপুটি' বলিত। ইনি একজন হস্তিমূর্খ, কেম্বেলি সব-ডেপুটি। লেখাপড়া কিছুই জানেন না বলিলে চলে। আমি তাঁহাকে গোবর্দ্ধন বলিতাম। যখন কোন বিষয়ের রিপোর্ট লিখিতে হইত, তিনি হয় আমার কাছে, না হয় কলেক্টরির হেড কেরাণীবাবুর কাছে হাজির হইতেন। তবে তখন তাঁহাকে আমি বড় ভাল মানুষ বলিয়া জানিতাম। কালকূট রোডসেস কার্য্যের যেরূপ বিভ্রাট ঘটাইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বে কথিতমতে আমার চেষ্টার ফলে যদিও অনেক নিরাকরণ হইয়াছিল, তথাপি কিছু কালের জন্য আর একজন ডেপুটির প্রয়োজন হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট একজন স্থানীয় লোক মনোনীত করিতে কমিশনরকে টেলিগ্রাম করিলে, গোবর্দ্ধন আমার কাছে কাঁদাকাটা আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, কলেক্টর যদি তাঁহার নাম পাঠান, আমি কমিশনরের দ্বারা তাহা মঞ্জুর করাইব। তিনি আফিসে আমার কক্ষে গিয়া বলিলেন যে, কলেক্টর তাঁহাকে আশা দিয়াছেন। কিন্তু তখনই কলেক্টরের চিঠি আসিল যে, তাঁহার অধীনে এমন লোক নাই, যাহাকে তিনি মনোনীত করিতে পারেন। এই চিঠি দেখিয়া, গোবর্দ্ধন কাঁদিয়া ফেলিলেন। তিনি টেবিলের নীচে মাথা দিয়া, আমার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'আপনি এবার আমাকে উদ্ধার না করিলে, আমার আর উপায় নাই।" অগত্যা বহু কষ্টে পা ছাড়াইয়া লইয়া আমি একটা চাতুরী করিয়া, কমিশনরকে যাইয়া বলিলাম যে, কলেক্টর যে ষ্টেট্‌মেণ্ট পাঠাইয়াছেন, তাহাতে একটা ভুল আছে। সাহেব বলিলেন যে, এখনই D.O. লিখিয়া, তাহা সংশোধন করিয়া আনাও। আমি তদ্রূপ কলেক্টরের কাছে, D.O. লিখিলাম এবং গোবর্দ্ধনকে বলিলাম, তুমি এই বেলা গিয়া কলেক্টরকে ধরিয়া পড়, এবার যেন তোমার নাম লিখিয়া পাঠান। সে বলিল, সে সমস্ত প্রাতঃকাল কলেক্টরের সাধ্য-সাধনা করিয়াছে। তাহাতে যখন কিছু ফল হয় নাই, তখন তাহার সাধ্যসাধনায় কিছু ফল হইবে না। তবে আমি দয়া করিয়া কলেক্টরকে সুপারিশস্বরূপ যদি কিছু এই D.O. পত্রে লিখিয়া দি, তবে কলেক্টর নিশ্চয় তাহাকে মনোনীত করিবেন। আমি বলিলাম—"এ একটা সামান্য কেরাণীগিরির কথা নহে। আমি নিজে একজন ডেপুটি। আর একজনকে

ডেপুটি করিবার জন্য সুপারিশ করা যে বড় অসঙ্গত ও দুঃসাহসের কথা হইবে।' সে বলিল—"আপনার মত সাহস কার আছে?" আবার পায় পড়িতে যাইতেছিল, আমি বারণ করিয়া তখন অগত্যা কলেক্টরকে তাহার নামে দুটো কথা লিখিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সংশোধিত ষ্টেটমেণ্ট ফিরিয়া আসিল, এবং ঠিক আমারই ভাষায় তাহার মন্তব্যের ঘরে গোবর্দ্ধনের নাম মনোনীত হইয়া আসিল। আমি উহা হাতে করিয়া কমিশনর সাহেবের কাছে গেলাম। সাহেব গোবর্দ্ধনের নামে ডেপুটিগিরির সুপারিশ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি কিছুতেই উহা অনুমোদন করিবেন না। আমি অনেক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইলাম যে, গোবর্দ্ধন আমার অধীনে রোডসেসের কার্য্য করিয়াছে। কমিশনর তাহাকে যত নির্ব্বোধ মনে করিতেছেন, সে তত নহে। বিশেষতঃ সে রোডসেস্ কার্য্যে এত দিনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, নূতন একজন আসিয়া তাহা লাভ করিতে বহু সময়-সাপেক্ষ। সাহেব তখন একটুক মাথা চুলকাইয়া বলিলেন—"তবে তুমি যদি ভাল বুঝ, তাহারই জন্য গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাম কর। কিন্তু জবাবদিহি তোমার রহিল।" আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া গোবর্দ্ধনকে এ সংবাদ দিলে সে আবার আমার পায়ে পড়িয়া কৃতজ্ঞতা জানাইল। গোবর্দ্ধন এরূপে ডেপুটি হইল, এবং সে দীর্ঘকাল চট্টগ্রামে থাকিয়া আমার এ উপকারের প্রতিদানে আমার মাতৃভূমিকে জ্বালাইয়াছিল। আর এক পাপিষ্ঠের পর চট্টগ্রামে তাহারও অভিশপ্ত নাম। কিন্তু সে যখন নানারূপে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহার উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতেছিল, তখন সেই কলেক্টর ও সেই লাউইস্ সাহেবের কাছে তাহার বাহবা কত!

২

তাহার পর আর এক গরুর বা কেম্বেলি গো বা কাননগোর পালা। এটি আমার পিতার বড় একজন বন্ধুর পুত্র। সে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া, পলায়ন করিয়া কলিকাতায় যায় এবং কেম্বেলি হুজুগে Native civil service পরীক্ষা দিয়া, কাননগো পাস হইয়া দেশে আসে। কিন্তু তাহাকে কেহ একটি এপ্রেণ্টিসিও দিতে চাহে না। সে তখন লাউইস্ সাহেবকে ডালি খাওয়াইতে আরম্ভ করে। 'ডালি' ইংরাজ প্রভুদের বশীভূত করিবার জন্য শক্তিসম্পন্ন মহাস্ত্র। ডালি নহে জয়কালী। মিঃ লাউইস্ তাহাকে কুড়ি টাকার এক কেরাণীগিরি দিলেন। কিন্তু কমিশনরের আফিসের একে একে সকল কার্য্যে তাহার পরীক্ষা করা হইল, কোনটাই তাহার বিদ্যায় কুলায় না। এমন কি, হাতের লেখাও এত কদর্য্য যে, নকল কার্য্যও চলে না। তখন মিঃ লাউইস্ বাধ্য হইয়া তাহাকে ছাড়াইয়া দিলেন। সে সর্ব্বদা আমার কাছে আসিয়া কাঁদাকাটা করিত এবং বলিত—বিক্রমপুরী পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট থাকাতে সে কাজ করিতে পারিল না। আমি পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইলে সে আমাকে পাইয়া বসিল। পার্ব্বত্যাঞ্চলে একজন কাননগোর প্রয়োজন হওয়াতে আমি তাহাকে মনোনীত করিলে, মিঃ লাউইস্ আনন্দের সহিত তাহাকে নিয়োজিত করেন। সে জরিপ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার রিপোর্ট আমি লিখিয়া দিলাম। কমিশনর সে রিপোর্ট পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

তাহার কিছু দিন পরে নোয়াখালির জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন সবডেপুটি মনোনীত করিতে কমিশনরকে লেখেন। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া মহা আনন্দের সহিত তাহার নাম রিপোর্ট করিতে বলেন। আমার চক্ষু স্থির। আমি বলিলাম—"সে এখনও অপরিপক্ক এ কাজ পারিবে না। আরও কিছু দিন কাননগোর কাজ করুক।" সাহেব বলিলেন—"কেন? সে ত সে বার বেশ রিপোর্ট দিয়াছিল?" আমার মুখ বন্ধ হইল। আমি ত বলিতে পারি না যে, সে রিপোর্ট আমি লিখিয়া দিয়াছিলাম। কাজেই তাহার নাম রিপোর্ট করিলাম,

এবং তাহাকে কার্য্যে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইতে আদেশ প্রেরণ করিলাম। সে আদেশ পাইয়া অর্দ্ধমূর্চ্ছিতাবস্থায় ছুটিয়া আমার কাছে আসিয়া কাঁদিতে লাগিল যে, সে সব ডেপুটির কাজ কিছুতেই পারিবে না। বিশেষতঃ আমি ত নোয়াখালিতে তাহার রিপোর্ট লিখিয়া দিতে পারিব না। তাহার বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে, এবং তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলাম যে, তাহার কোনও ভয় নাই। আমি নোয়াখালির সেরেস্তাদারের কাছে লিখিয়া পাঠাইব। তাঁহারা তাহার সাহায্য করিবেন। সে তখন বাধ্য হইয়া নোয়াখালি গেল। বৎসরখানেক পরে আমি মাদারিপুরের এলেকায় বোটে বসিয়া এস্‌লি ইডেনি ডেপুটিদলের গেজেটে প্রকাশিত দীর্ঘ তালিকার মধ্যে তাহার নাম দেখিয়া বুঝিলাম—যথার্থই 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং।" আমি বড় আনন্দিত হইলাম। আমার অক্ষুন্ন আনন্দের একটা বিশেষ কারণ এই যে, এ জীবনে যত লোকের উপকার করিয়াছি, প্রায় সকলেই আমার ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে। এ লোকটি করে নাই।

৩

আমি একবার কমিশনরের আফিসের দল সহ কমিশনর স্মিথ সাহেবের সঙ্গে নোয়াখালি যাই। সেখানে কয়েকটি দিন বড় আনন্দে কাটাই। সে সময়ে কমিশনরের আফিসে আগাগোড়া মাতাল ছিল। লেঃ গবর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল্ চট্টগ্রামে শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনা দেখিবার জন্য কর্ণফুলীর তীর লোকারণ্য এবং নগর তোপধ্বনিতে প্রকম্পিত। নদীতীর হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে হেড ক্লার্ক মহাশয় আফিসের পাহাড়ের নীচে এক বৃক্ষতলায় পড়িয়া আছেন।

প্র। তুমি এখানে কেন?

উ। লেঃ গবর্ণরের অভ্যর্থনার জন্য বসিয়া আছি।

গম্ভীর ভাবে এ উত্তর শুনিয়া বড় মুস্কিলে পড়িলাম। সঙ্গের আর্দ্দালিটিকে বলিলাম যে, ইহাকে ধরিয়া বাড়ী লইয়া যা। কিন্তু হেডক্লার্ক মহাশয় কিছুতেই যাইবেন না। বলিতে লাগিলেন—"বেটা, তুই কি মাতাল হইয়াছিস্? আমি হেডক্লার্ক।" ইহাকে সকলেই সঙ্গে লইয়াছিল। নোয়াখালিতে সে সময়ে বড় একটি ডেপুটির লড়াই চলিতেছিল। একজন ঊর্ণনাভপ্রকৃতির ঘোরতর স্বার্থপর ষড়যন্ত্রী। তিনি সেখানকার সেটেল্‌মেণ্টের ডেপুটি কলেক্টর। অন্যজন আকৃতি ও প্রকৃতিতে সেখানকার কলেক্টর সাহেবের 'জলধর মন্ত্রী' ও 'মালিনী মাসী'। তিনি লেখাপড়া কিছুই জানেন না বলিলেও চলে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর প্রশংসা করিতে গিয়া বলিতেন—"My wife is a man"—আমার স্ত্রী একটা পুরুষ। তিনি জানিতেন—man অর্থে মানুষ। ঊর্ণনাভ একজন যোগ্য লোক। ঊর্ণনাভ বন্দোবস্তি সম্বন্ধে যে সকল রিপোর্ট করিতেন, তাহা কলেক্টর জলধরের কাছে সমালোচনার জন্য প্রেরণ করিতেন। তিনি "my wife is a man" রকমের ইংরাজিতে তাঁহার প্রভুত্বপূর্ণ এক মন্তব্য লিখিয়া ঊর্ণনাভের কাছে ফেরত পাঠাইতেন। ঊর্ণনাভ আমার কাছে এরূপ অপমানের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি সেদিনই কমিশনরের কাছে গিয়া বলিলাম যে, নোয়াখালির বন্দোবস্তির কার্য্য ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমল হইতে চলিতেছে বলিলেও হয়। কোনটাই শেষ হয় না। অতএব তিনি যখন নোয়াখালি পদার্পণ করিয়াছেন, তখন উহা একবার দেখা উচিত। সাহেব বিস্মিত হইয়া তাহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে আমি উপরোক্ত অবস্থা তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন—"এখনই কলেক্টরকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লেখ, এবং পাঁচটি নথি চাহিয়া পাঠাও।" আমার পত্রমতে ঊর্ণনাভ বাছিয়া পাঁচটি অপূর্ব্ব নথি পাঠাইলেন। তাহার কিছুক্ষণ পরে কলেক্টর আসিলেন। তিনি যখন ফিরিয়া যাইতেছেন, দেখিলাম—তাঁহার প্রিয় পাত্রটির বর্ণের মত তাঁহার মুখখানি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন যে, আমি

যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা ঠিক এবং এ বিষয় তাঁহার গোচর করিয়াছি বলিয়া ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, আর গোলযোগ হইবে না।

সন্ধ্যার সময়ে আমাদের আবাসগৃহে স্থূল কৃষ্ণকায়, গোঁপ দাড়ী এবং চুলশূন্য এক প্রকৃত 'পিকউইক' (Pickwick) মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত। তিনিই সেই জলধর। আমার হেড ক্লার্ক ও সেরেস্তাদার উভয়েই তখনই সুরাদেবীর প্রভাবে আকাশে বিচরণ করিতে-ছিলেন। তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিখানি দেখিয়াই বলিলেন—"শা—চুকলিখোর, এত দিন আমাদের সঙ্গে দেখা করিতেও আসে নাই। আজ বেটাকে জব্দ করিতেই হইবে।" তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন। তিনি কলেক্টরের দক্ষিণহস্ত। পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট একজন কেরাণী বই ত নহে। তাই বাস্তবিকই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন নাই। আমার সেই তাল-বেতাল-যুগল একেবারে একসঙ্গে উঠিয়াই বলিল—"কেবলা। সেলা—ম!" তিনি বলিলেন—"যা! যা! মাতলামি করিস্ না!" সেরেস্তাদার একটা গেলাস ধান্যেশ্বরী ঢালিয়া বলিল—"মাতলামি! তুমি যদি এ গেলাস না খাও, তবে আমি এক কিলে তোমার 'কেবলা'-ডেপুটি-গিরি চূর্ণ করিয়া দিব।" কেবলা প্রথম বলিলেন—তিনি মদ খান না। কিন্তু সেরেস্তাদার মহাশয়ের ভীম দেহ ও ততোধিক ভীম মুষ্টি দেখিলেন, এবং জানিতেন যে সেরেস্তাদার মহাশয়ের মস্তক-সেরেস্তাটি সুরাদেবী অধিকার করিলে, তিনি উক্ত মুষ্টির পরিচালনে বড় সঙ্কোচ করিবেন না। তখন জলধর এক বিকৃত মুখের ভঙ্গী করিয়া সমস্ত গেলাসটি গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন—"এখন ত হলো? যা, আর মাতলামি করিস্ না। আমি একটুক কথা কহি।" এই দৃশ্য দেখিয়া আমি হাসিয়া আকুল। তিনি আমাকে বলিলেন—তিনি, বলা বাহুল্য, শ্রীপাট ঢাকা অঞ্চলের লোক, অতএব তাঁহার নিজ ভাষায় না লিখিয়া সাধু ভাষায় লিখিলাম—"আপনি কেবল ছেলেমানুষ। আমি যে আপনার খুড়ার বয়সি।" অমনি তাল-বেতাল বলিয়া উঠিল—"কেবলা আমাদের সকলেরই খুড়া।" খুড়া তখন আমাকে বলিলেন যে, আমি ঊর্ণনাভকে চিনি নাই—এইটা ঠিক—এক পক্ষের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অবিচার করিয়াছি। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, যদি তাঁহার রিপোর্ট ও কার্য্য সমালোচনার জন্য অন্য একজন ডেপুটি সয় তাঁহার কেমন বোধ হইবে। তখন তিনি কথাটা বুঝিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখিও ভাইপো! আমার যেন কোনও অনিষ্ট না হয়।" আমি বলিলাম—"খুড়ো! ভাইপো থাকিতে তোমার ভয় কি?" তিনি মহাসন্তুষ্ট হইলেন, এবং সেই সন্তোষের এবং সুরাদেবীর উচ্ছ্বাসের সময়ে তাঁহাকে লইয়া আমরা দেওয়ালির দীপাবলী দেখিতে বাহির হইলাম। তাল-বেতালেরা তাঁহাকে সে রাত্রিতে না লইয়া গিয়াছিল, এমন স্থান নাই; তাঁহার দ্বারা না করাইয়াছিল, এমন কার্য্য নাই। কিছু দিন পরে তাঁহার রোডসেসের কার্য্য লইয়া গোলযোগ উঠিলে, রোডসেস আফিসটাই পুড়িয়া যায় এবং তন্নিবন্ধন কুমিল্লায় বদলি হইয়া গেলে, সেখানে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রোড-সেস-কর্ম্মচারীর দোষ দেখাইয়া বাহাদুরি লইতে গিয়া দুইজনে এমন লড়াই লাগান যে, উভয়ে আমার কাছে নালিস করিতে লাগিলেন, এবং শেষে গবর্ণমেণ্ট এক কমিশন বসাইয়া, উভয়ের জন্য উত্তম-মধ্যম ব্যবস্থা করিয়া, তাহার নিরাকরণ করিলেন।

৪

এবার 'সিদ্ধাবিদ্যা'র পালা। ইনি সাহেববশীকরণে 'সিদ্ধহস্ত' বলিয়া, এবং তাঁহার নামটি কোনো সিদ্ধাবিদ্যার নামানুযায়ী বলিয়া, আমি তাঁহার নাম 'সিদ্ধবিদ্যা' রাখিয়াছিলাম। প্রবাদ যে, তিনি সাহেব বশীভূত করিবার জন্য না করিতেন, এমন কার্য্য নাই। আমাদের নোয়াখালি অবস্থানকালে আমারও যথেষ্ট সেবা ও খোসামুদি করেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে এক বোতল মদ চুরির অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সাহেবসেবার

বলে উহা কাটাইয়া, সব-রেজিস্ট্রার পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা, আমি তাঁহাকে একটি ডেপুটি করিয়া দিই। আমি তাঁহার সেবাতে পরিতুষ্ট হইয়া প্রতিশ্রুত হই, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার জন্য সিঁড়ি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করি। প্রথমতঃ, দিল্লী-দরবারের সময়ে তাঁহাকে একখানি সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রস্তাব করি। তাহাতে নোয়াখালির কলেক্টর তাঁহার দণ্ডের কথা উল্লেখ করিয়া আপত্তি করেন। তখন ইহার সঙ্গে তাঁহার ভাঙ্গাভাঙ্গি হইয়াছিল। কিন্তু আমি কমিশনরকে বলিয়া তাহা কাটাইয়া দি. এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের 'সাইক্লোনে'র পর আর্ত্তদিগের সাহায্য কার্যের জন্য তাঁহাকে 'ডেপুটি' করিয়া দি। তিনি বহুদিন আমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু বহুবৎসর পরে তিনি ফেণী গিয়া আমার সমস্ত কার্য্যগুলি প্রায় ধ্বংস করেন. এবং তাহার পর যখন চট্টগ্রামে তাঁহাকে দেখি. তখন তিনি একজন মহাপুরুষ। তাঁহার অপূর্ব্ব বেশ—টাইট্ পেণ্ট, তাহার নিম্নভাগটি পায়ের আট আঙ্গুল উপরে. এবং স্ফীতোদরেব উপর পেণ্টের ঊর্দ্ধাংশের পরিধি কম হওয়াতে দুটা বোতামের মধ্যে এক এক 'প্যারাবোলা' (Parabola)! তদুপরি তদুপযোগী এক টাইট কোট। কোটের গলা উল্টান. এবং সার্টের কলারটি 'নেক্‌টাই'বিহীন। মস্তকে এক অপূর্ব্ব টুপি। যাত্রার গানে ধনঞ্জয় বলিয়া একটি লোক সাহেব সাজিত। আমি ইঁহার নাম 'ধনঞ্জয় সাহেব' রাখিয়াছিলাম। তাঁহার চরিত্র ও কীর্ত্তিকলাপও উক্ত বেশোপযোগী।

৫

নোয়াখালির একজন প্রাচীন ডেপুটি কলেক্টর চট্টগ্রামে উকিল ছিলেন, এবং আমার পিতার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল.—যদিও তিনি আমাদের জমিদারি মোকদ্দমায় আমাদের বিপক্ষের উকিল ছিলেন। আমি নোয়াখালি থাকিতে তিনি একদিন প্রাতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সঙ্গে সেরেস্তাদার মহাশয়ও ছিলেন। কারণ, তাঁহারা উভয়ে ঢাকা জেলার লোক। খাইতে বসিয়া দেখি. একজন ভদ্রমহিলা পরিবেশন করিতেছেন। বৃদ্ধ ডেপুটি মহাশয় আমাদের পাতের সম্মুখে বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন—"ইনি তোমার খুড়ী।" আমি পাত হইতে উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। আহারের পর তিনি আসিয়া, আমাকে মাতার মত বুকে লইয়া বসিয়া. অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বাবা! তুমি কি আমাদের কোন উপায় করিবে না?" আমি প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"আপনি কি বিষয়ে আমার সাহায্য চাহিতেছেন?" তখন ডেপুটি মহাশয় প্রথমতঃ আমার পিতার অনেক গুণ কীর্ত্তন করিয়া ও তাঁহাদের বন্ধুতার কথা বলিয়া, বলিলেন যে, তিনি ইংরাজি জানেন না বলিয়া ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। সে জন্য তের বৎসর যাবৎ দুইশত টাকা বেতনে কর্ম্ম করিতেছেন। তিনি অনেক বার বেতন বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন, অনেক সাহেবের খোসামুদি করিয়াছেন. কিন্তু কিছু ফল হয় নাই। আমি বলিলাম, তবে আমি আর কি করিতে পারি? তিনি বলিলেন যে. তিনি শুনিয়াছেন যে, আমার হাতের এমনই যশ যে, আমি লিখিয়া দিলে কোনও দরখাস্ত নিষ্ফল হয় না। বাস্তবিকই চট্টগ্রামে এ বিশ্বাস এরূপ দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল যে. অনবকাশবশতঃ নিতান্ত যাহার দরখাস্ত নিজে লিখিয়া দিতে পারিতাম না. সে আমার কলম লইয়া দরখাস্তে ছোঁয়াইয়া লইত। তিনি বলিলেন, আমি যদি একখানি দরখাস্ত লিখিয়া দি ও একটুক চেষ্টা করি. তবে তিনি নিশ্চয় উদ্ধার লাভ করিবেন। আমি হাসিয়া স্বীকৃত হইলাম এবং তাঁহার মুখে তাঁহার চাকরির সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া গিয়া. তখনই একখানি দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। পরদিন এ জন্য কলেক্টরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম. কলেক্টর তাঁহার দরখাস্ত উপরে পাঠাইতেই নারাজ। আমি অনেক বলাতে শেষে স্বীকার করিলেন, কিন্তু বিশেষ কিছুই লিখিলেন না। কমিশনর লাউইস্‌ তখন ছুটী হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি

দরখাস্ত পাইয়াই শুধু Forward (পাঠাও) লিখিয়াছেন। আমি দেখিলাম, শুধু কপি পাঠাইলে কিছুই হইবে না। সেরেস্তাদারের সঙ্গে পরামর্শ করিলাম। সে বলিল, যখন কমিশনর এরূপ অর্ডার দিয়া রাখিয়াছে, তখন কেবল Copy Forward বা নকল মাত্র পাঠাইতে হইবে। আমি যদি তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া Draft বা পত্রের মুসাবিদা করিয়া দি, তবে কমিশনর আমার উপর বড় অসন্তুষ্ট হইবেন। আমি বলিলাম—হইলেনই বা। আর যদি মুসাবিদা পাস করিয়া দেন, তবে একটি ভদ্রলোকের কত উপকার হইবে। আমি হেড কেরাণীকে ডাকিয়া বলিলাম, তুমি একটি মুসাবিদা করিয়া আন। মুসাবিদায় কি লিখিতে হইবে, আমি বলিয়া দিলাম। সেও বলিল যে, কমিশনরের হুকুমের বিরুদ্ধে সে মুসাবিদা করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তাহার চাকরির বিঘ্ন হইতে পারে, এবং সেও আমাকে নিরস্ত হইতে বলিল। তাহারা উভয়ে বলিল, কোনও পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট এরূপ সাহস করে নাই। তাহারা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে হেড কেরাণী আবার আসিয়া বলিল—"আপনি এ বিক্রমপুরী সেরেস্তাদারের কথায় এক বেটা বিক্রমপুরীর জন্য এত সাহস করিবেন না। বিক্রমপুরী শা—রা আমাদের কে?" চট্টগ্রামে ঢাকা অঞ্চলের লোক মাত্রকে বিক্রমপুরী বলে, এবং ইহাদিগকে ঘোরতর স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্রকারিতার জন্য ঘৃণা করে। এ ঘৃণা যে সমূলক, আমি তখন জানিতাম না। আমি তথাপি সাহস করিয়া এক মুসাবিদা করিয়া এবং তাহাতে 'জরুরি' চিহ্নের লাল কাগজ দিয়া ফাইলটি কমিশনরের কাছে পাঠাইয়া, বড় চিন্তিত হইয়া বসিয়া রহিলাম। অমনি কমিশনর আমাকে ডাকাইলেন। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল! তিনি তখন সে বিষয় লইয়া আমার সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিলেন। এবং যখন গবর্ণমেণ্ট বারম্বার উক্ত বাবুর বেতন বৃদ্ধি করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, তখন ঐরূপ পত্র পাঠান সম্বন্ধে অনভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অবশেষে আমি তাঁহার পক্ষে করুণভাবে আরও দুই চার কথা বলিলে, দুই একটি অত্যুক্তিব্যঞ্জক কথা কাটিয়া, মুসাবিদা পাস করিয়া দিলেন। আমি আনন্দে ফাইলটি লইয়া কক্ষে ফিরিয়া, সেরেস্তাদার ও হেড কেরাণীকে ডাকিয়া দেখাইলাম। তাহার কিছুদিন পরে পিতৃবন্ধু ডেপুটিবাবুর বেতন বৃদ্ধি হইলে আমার কাছে কত কৃতজ্ঞতাপূর্ণ পত্র লিখিলেন যে, যাহা আঠার উনিশ-জন কলেক্টর কমিশনরের খোসামুদি করিয়া হয় নাই, আমি তাহা করিলাম। মন্দ কি?

৬

নোয়াখালিতে সে সময়ে একজন ইংরাজ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় সুরাদেবীর সেবক। সাহেব হইলেও লোকটি তান্ত্রিক ধর্ম্মাবলম্বী—"পিত্বা পিত্বা পুনঃ পিত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।" তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সঙ্গে কলেক্টর ও তাঁহার পত্নীর ঘোরতর মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে, এবং তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া পদে পদে অপমানিত হইতেছেন। আমি নোয়াখালি পঁহুছিলে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন। এ ত নূতন কথা! ইংরাজ বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা করিতে চাহিতেছে! আমি আফিসে যাইবার পথে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার এক বগলে ব্রাণ্ডির বোতল, অন্য বগলে সোডা, এবং দুই হস্তে দুই গ্লাস। এরূপ প্রহরণে সজ্জিত হইয়া উপরের তলা হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে সুরাদেবীর সহসেবক হইতে অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহার শিষ্টাচারের জন্য ধন্যবাদ দিয়া অস্বীকার করিলাম। পরে তাঁহার পত্নীও উপস্থিত হইলেন। তখন দুজনে গলদশ্রুনয়নে তাঁহাদের প্রতি সপত্নী মাজিষ্ট্রেটের দুর্ব্যবহারের কথা বলিলেন। আমি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী, এ সকল পারিবারিক কলহের কি প্রতিকার করিব? তাঁহারা আমার এই ওজর গ্রহণ করিলেন না। আমি নিশ্চয় ইহার প্রতিকার করিতে পারি, ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। কমিশনরকে নিমন্ত্রণ করিয়া সকল কথা বলিতে আমি পরামর্শ দিলাম।

আফিসে গিয়া কমিশনরকে আমি রাখিয়া ঢাকিয়া এই অত্যাচারের কথা বলিলাম। কমিশনর তখন মিঃ স্মিথ। তিনি তখনই নিমন্ত্রণ পাইলেন ও গ্রহণ করিলেন। পরদিন আমাকে বলিলেন যে, মাজিস্ট্রেটকে ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পরে আবার ইহাদের পারিবারিক লড়াই আরম্ভ হইল, এবং উভয়পক্ষ হইতে ডেমি-অফিসিয়াল নালিশ কমিশনরের কাছে আসিতে লাগিল। স্মিথ সাহেব বলিলেন, তিনি উহার কিছুই করিবেন না। তিনি আবার নোয়াখালি গিয়া থামাইবেন। তাঁহার এক্‌টিন অতীত হইলে লাউইস্‌ সাহেব ফিরিলেন। তিনি কলেক্টরদের হাতধরা। গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। মাজিস্ট্রেট কেবলমাত্র স্থানান্তরিত হইলেন। পুলিশ সাহেব স্থানান্তরিত ও তিরস্কৃত হইলেন। রাজ্য সিবিলিয়ানদের। পুলিশ সাহেব তথাপি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখিলেন।

চট্টগ্রামের নওয়াবাদ

চট্টগ্রামের 'নওয়াবাদ' ত নহে—বিধাতার বাদ। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে প্রথম ইংরাজরাজ্য চট্টগ্রামে স্থাপিত হয়। অতএব চট্টগ্রাম একপ্রকার ইংরাজের ভারতে সর্ব্বপ্রথম ও প্রাচীন অধিকার। তাহার শাসনের জন্য আরম্ভে এক 'কাউন্সিল' (সভা) নিয়োজিত হয়। কলিকাতার উপনগরস্থ ভূকৈলাসের রাজাদের পূর্ব্বপুরুষ গোকুলচন্দ্র ঘোষাল উক্ত কাউন্সিলের দেওয়ান হইয়া চট্টগ্রামে পদার্পণ করেন। যে সকল পতিত জমি জরিপের দ্বারা কোনও জমিদারিভুক্ত পাওয়া যায় নাই, তাহার একটা আনুমানিক পরিমাণ লিখিত হইয়া কাউন্সিল হইতে তিনি 'নওয়াবাদ' বা নূতন আবাদ নামে এক বন্দোবস্তি প্রাপ্ত হন। ক্রমে যখন এই সকল পতিত জমি আবাদ হইয়া জেলাব্যাপী ঘোষাল মহাশয়ের একটা বিস্তৃত জমিদারি হইয়া পড়িল, তখন চট্টগ্রামের কর্তৃপক্ষীয়দের চোখ খুলিল। তাঁহারা বলিলেন, ঘোষালের বন্দোবস্তিতে যে পরিমাণ জমি লেখা আছে, তিনি তাহা মাত্র পাইতে পারেন। ঘোষাল বলিলেন, যখন সমস্ত চট্টগ্রাম জেলার পতিত ভূমি তাঁহাকে বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছে, তখন আনুমানিক পরিমাণ যাহাই হউক, তিনি সমস্ত পতিত জমির অধিকারী। সদর দেওয়ানী আদালত পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হইয়া ঘোষাল পরাজিত হইলেন। তখন তাঁহার বন্দোবস্তির পরিমাণ জমি তাঁহাকে বুঝাইবার ছলনায় সমস্ত চট্টগ্রামের দ্বিতীয় জরিপ আরম্ভ হইল। যদিও প্রথম জরিপের পর ইতিমধ্যে জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ হার্ভি জমিদারির প্রত্যেক দাগ (Plot) জরিপ করিয়া, তাহাতে এক ইঞ্চি জমিও বেশি পাইলে তাহা কাটিয়া লইয়া, একটা নওয়াবাদ তালুক সৃষ্টি করিলেন। এই জরিপও এত অন্যায়রূপে করিতেছিলেন যে, দক্ষিণ দিকের জমিদারগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে এরেণ্ডার দ্বারা খুব একপ্রস্থ প্রহার করিয়া (হার্ভির) দেহটা জরিপ করিয়া লইল। কি বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে! সিংহের স্থান কি মূষিকেরা অধিকার করিয়াছে! তিনি পলায়ন করিয়া, তাঁহার নৌকাতে আসিয়া, গুলি করিয়া কয়েক জনকে হত্যা করিলেন। এরূপে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে কলিকাতার কর্তৃপক্ষীয়দের চৈতন্য হইল। এতদিন তাঁহারা প্রজার আবেদন কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু উহা যখন 'এরেণ্ডার দ্বারা দুরন্ত হার্ভির পৃষ্ঠে লিখিত হইল, তখন আর অগ্রাহ্য করিবার জো নাই। এখনকার দিনে এরূপ একটা ঘটনা হইলে গবর্ণমেণ্ট গুর্খা পাঠাইয়া, এরেণ্ডাধারীদের ফাঁসীকাষ্ঠে বা মেণ্ডেলে পাঠাইয়া, ভীষণ হইতে ভীষণতর এস্তেহার জারী করিয়া, আবালবৃদ্ধ জেলে দিয়া, চট্টগ্রামের মাটি পর্য্যন্ত উল্টাইতেন। তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট একা সার হেনরী রিকেট্‌স্‌ (Sir Henry Ricketts) মহোদয়কে বোর্ডের ক্ষমতা দিয়া এ বিদ্রোহ নিবারণ করিতে

পাঠাইলেন। ইংরাজরাজ্যের রাজস্ব বিভাগে সার হেন্‌রী রিকেট্‌সের মত এমন বিচক্ষণ লোক বোধহয় ভারতবর্ষে আর কখনও আসেন নাই। তিনি জমিদারদিগকে কতক কতক জমি 'তৌকি'র (অতিরিক্ত) নামে ফেরত দিয়া একটা মিট্‌মাট্‌ করিয়া ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই বন্দোবস্তি শেষ করিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জমিদারেরা চাঁদা করিয়া কলেক্টরির কাছারীর সম্মুখের দীর্ঘিকায় তাঁহার নামে একটা পাকা ঘাট প্রস্তুত করিলেন। তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। হায়! ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ চিরকাল যদি এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শনের দিকে চক্ষু রাখিয়া কাজ করিতেন! ঘোষালের বন্দোবস্তির পরিমাণ জমি, 'তরফ জয়নারায়ণ ঘোষাল', নামে তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াও ত্রিশহাজার নওয়াবাদ তালুক সৃষ্ট হইল। বত্রিশজন ডেপুটী কলেক্টর একটা আমলার সৈন্য লইয়া দশ বৎসরে এই জরিপের কার্য্য শেষ করেন। এ সকল তালুক এত ক্ষুদ্র যে, এক পয়সা পর্য্যন্ত রাজস্ব হইয়াছিল। এ জমাতে তালুকি স্বত্বে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য বন্দোবস্তি দিয়া রিকেট্‌স্‌ উক্ত বন্দোবস্তি চিরস্থায়ী করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে গবর্ণমেণ্টের অধোগতি আরম্ভ হইয়াছিল। যে যে তালুকে বেশী পতিত জমি ছিল, তাহার জন্য পঞ্চাশ বৎসর এবং অবশিষ্ট তালুকের জন্য ত্রিশ বৎসর মেয়াদ গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দিলেন। এই আদেশও প্রজাদিগকে অবগত করান হইল না, এবং সার হেনরী রিকেট্‌স্‌কৃত কায়েমি বন্দোবস্তি রহিত করিয়া, আর নূতন বন্দোবস্তিও লওয়া হইল না। কিছুকাল অনেক লেখালেখির পর যে তালুক যে জমিদারি হইতে কাটিয়া লওয়া হইয়াছিল, উপস্থিত জমায় সে জমিদারীভুক্ত করিবার জন্য এক বৎসর মধ্যে জমিদারগণ প্রার্থনা করিলে উহার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তি দিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলেন। কিন্তু চট্টগ্রামের দুর্ভাগ্যবশতঃ কলেক্টরির পর্টুগীস্‌ বংশসম্ভূত হেড ক্লার্ক উহা ভুলক্রমে তাঁহার ডেস্কে বন্ধ করিয়া রাখেন। বৎসর শেষ হইবার অল্পদিন পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট উক্ত ঘোষণার ফল জিজ্ঞাসা করিলে এই ভুল ধরা পড়িল এবং উক্ত আদেশ প্রচারিত হইল। এই অল্প সময়ের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক জমিদার ইহার ফল লাভ করিতে পারিয়াছিল। পরবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট উক্ত আদেশ রহিত করিলেন। এরূপে চট্টগ্রামের লোকের কপাল পুড়িল। চট্টগ্রামে আজ পর্য্যন্ত হার্ভি সাহেবের নাম অভিশপ্ত।

এ সময়ে ত্রিশ বৎসরের তালুক সকলের মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছিল। হার্ভি সাহেব যখন জমিদারদের গলা কাটিয়া জমি বাহির করিতে আরম্ভ করেন, তখন জমিদারগণ ভাল জমিগুলি জমিদারিভুক্ত রাখিয়া, নিকৃষ্ট জমিগুলি নওয়াবাদ বলিয়া জরিপ করাইয়া দিয়াছিলেন। এ জন্য চট্টগ্রামের গড়, রাস্তা, শ্মশান, কবরস্থান, দীঘি, পুষ্করিণী, সকলই নওয়াবাদ! রিকেট্‌স্‌ মহোদয় তাঁহার মুদ্রিত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন যে, এ সকল ভূমির কানি প্রতি গড়ে চৌদ্দ আনার বেশী জমা কোনও মতে হইতে পারে না এবং যে জমা ধার্য্য করা হইয়াছে, তাহাও অতিরিক্ত। কিন্তু পূর্ব্বে রোডসেসের বিভ্রাটের ইতিহাসে লিখিয়াছি যে, মিঃ মেঙ্গল্‌স্‌ (R. D. Mangles) শিকার করিতে গিয়া, এক চরের জমির দশটাকা কানি খাজনা শুনিয়াছিলেন, এবং এই মহাভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছিলেন যে, নওয়াবাদ জমি আবার জরিপ হইলে ছয় লক্ষ টাকা জমা বৃদ্ধি হইবে! ইনি চট্টগ্রামের দ্বিতীয় হার্ভি ও সর্ব্বনাশের কারণ। গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে তৃতীয়বার নওয়াবাদের জরিপ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

আমি পার্শ্বন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইয়া প্রথম বৎসরের বার্ষিক রাজস্ববিজ্ঞাপনী (Land Revenue Administration Report) মুসাবিদা করিবার সময়ে দেখাইলাম যে, সার হেনরী রিকেট্‌সের বন্দোবস্তিমতে নওয়াবাদের মোট রাজস্ব একলক্ষ বিশহাজার টাকা। তাহার একতৃতীয়াংশের মাত্র অর্থাৎ চল্লিশহাজার টাকা রাজস্বের মেয়াদ শেষ হইতেছে। অতএব উপস্থিত জমা পনর গুণ না বাড়াইলে চল্লিশহাজার টাকার রাজস্ব ছয়লক্ষ হইবে না।

অর্থাৎ কানি প্রতি চোদ্দআনা জমা, যাহা সার হেনরির মত রাজস্বসচিব অতিরিক্ত বলিয়াছেন, তাহা কানি প্রতি পনরটাকা করিতে হইবে। এ রিপোর্ট পাইয়া কমিশনরের চোখ কপালে উঠিল। তিনি আমাকে ডাকিয়া, আমি এ সকল অঙ্ক কোথায় পাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার আফিসে সার হেনরী রিকেট্‌সের যে মুদ্রিত রিপোর্ট এবং যে Statistical Account আছে, আমি তাহা হইতে পাইয়াছি বলিলে, এবং উহা দেখাইয়া দিলে, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল।

তিনি। তবে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ মেঙ্গল্‌স্‌ এরূপ রিপোর্ট করিলেন কি প্রকারে?

উ। আমি বলিতে পারি না।

তিনি। আমি তাঁহারই প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া গবর্ণমেণ্টে বরাবর লিখিয়াছি। তিনি এতকাল এখানে কমিশনর ছিলেন। তিনি এরূপ ভুল করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব।

কমিশনর মহা অকষ্টবন্ধে পড়িলেন। তিনি তিনদিন পর্য্যন্ত বার্ষিক বিজ্ঞাপনী লইয়া ভাবিতে লাগিলেন। রোজ আমাকে ডাকিয়া এ সম্বন্ধে আলাপ করিতেন। শেষে আমার মুসাবিদার এ অংশ কাটিয়া, পার্শ্বে লিখিয়া দিলেন—'জরিপের কার্য্যের দ্বারা যত দূর বুঝা যাইতেছে, রাজস্ববৃদ্ধির যে এষ্টিমেট দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অতিরিক্ত (Over-sanguine) হইয়াছে।"

এরূপে জরিপের আরম্ভেই তাহার মূলে আঘাত করিয়া, আমি ক্রমে ক্রমে আরও হাত দেখাইতে লাগিলাম। তাহার পরবৎসরের চট্টগ্রাম জেলার রাজস্বের বিজ্ঞাপনীতে দেখিলাম, 'কালকূট' চতুরতা করিয়া জরিপের ফল কিছুই দেখায় নাই। আমি তাহাতেই বুঝিলাম যে, জরিপের ফল উক্ত মতের বড় অনুকূল হয় নাই। আমি কমিশনরকে বলিলাম যে, জরিপ এক বৎসরের অধিক হইয়াছে। অতএব এ বৎসরের বার্ষিক রাজস্ববিজ্ঞাপনীতে তাহার ফল না দেখাইলে বোর্ড ও গবর্ণমেণ্ট অসন্তুষ্ট হইবেন। তিনি বলিলেন—'কালকূটের কাছে D. O. লিখিয়া, প্রয়োজনীয় বিষয়ের রিপোর্ট আনাইয়া লও।" আমি একটা Statement প্রস্তুত করিয়া, তাহার কাছে উহা পূরণ করিয়া পাঠাইতে লিখিলাম। সে বুঝিল—গতিক ভাল নহে, আমি তাহাকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছি। কারণ, সে যে মিঃ মেঙ্গল্‌সের মতাবলম্বী, তাহা রোডসেস্‌ অধ্যায়ে দেখাইয়াছি, এবং সেও বরাবর এ মত সমর্থন করিয়া কমিশনরের চক্ষে ধূলা দিয়াছে। কিন্তু সে ধরা দিবার পাত্র নহে। সে উত্তর লিখিল যে, জরিপের সেরূপ একটা নক্সা পূরণ করিবার বৃত্তান্ত তাহার আফিসে নাই। তখন আমার অভিপ্রায়মতে কমিশনর উহা সেটেল্‌মেণ্ট অফিসার মিঃ ভিজি সাহেবের কাছে পাঠাইতে আদেশ দিলেন। ভিজি কিছু নিরপেক্ষ রকমের লোক ছিলেন। তিনি তাহা পূরণ করিয়া পাঠাইলেন ও তাঁহার রিপোর্টে লিখিলেন, এ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ তালুক জরিপ হইয়াছে, তাহাতে কিছুই রাজস্ববৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কমিশনর তটস্থ। এ বারও জবস্থব ভাবে বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে আমার মুসাবিদার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। আমি তখন দেখাইতে লাগিলাম যে, রিকেট্‌স্‌ পরিষ্কার বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার বন্দোবস্তির মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে আবার জরিপ না করাইয়া, কেবল পঞ্চাশ বৎসরের তালুকগুলির পতিত জমি মাত্র জরিপ করাইয়া, তাহা যে পরিমাণে আবাদ হইবে, তাহার উপর তাঁহার রিপোর্টের লিখিত প্রচলিত নিরিখমতে মাত্র রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে হইবে। ত্রিশ বৎসর মেয়াদি তালুকে পতিত জমি অতি সামান্য ছিল। তিনি বজ্রনিনাদে আরও ঘোষিত করিয়া গিয়াছিলেন যে, চট্টগ্রাম জরিপে জরিপে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, অতএব আর যেন উহাকে জরিপ-রাক্ষসীর গ্রাসে নিপতিত করা না হয়। আমি

কমিশনরকে বুঝাইতে লাগিলাম যে, সমস্ত নওয়াবাদ তালুক জরিপ না করাইয়া, কেবল একটি সামান্য জরিপের এণ্টারিশমেণ্ট (আফিস) নিয়োজিত করিয়া, যে সকল তালুকে পতিত জমি বেশী আছে, তাহার জরিপ করাইলে গবর্ণমেণ্টের খরচও অনেক কম পড়িবে, এবং রাজস্বও যাহা ন্যায্যরূপে বৃদ্ধি হওয়া উচিত, তাহা হইবে। অন্য দিকে প্রজারাও উৎপীড়িত হইবে না। কমিশনর ধীরে ধীরে আমার মতে আসিতেছিলেন। ইতিমধ্যে দুটি অন্তরায় উপস্থিত হইয়া চট্টগ্রামের সর্ব্বনাশ ঘটাইল।

সত্য মিথ্যা জানি না, চট্টগ্রামের অনেকের মনে সন্দেহ ছিল যে, কোন 'চা-বাগানে' কমিশনর সাহেবের অংশ ছিল। জরিপে তাহার নিকটবর্ত্তী নওয়াবাদ তালুকের অংশ সে চা-বাগানে পাওয়া গেল। বাগানের ম্যানেজার কমিশনরের কাছে নালিশ করিল। সাহেব চটিয়া লাল। আমাকে আদেশ করিলেন যে, সে অঞ্চলের জরিপের ডেপুটি কলেক্টরকে এখনি একজন পেয়াদার দ্বারা আদেশ প্রেরণ কর যে, আদেশ পাওয়া মাত্র সে যেন চলিয়া আইসে। তিনি আমার একজন বন্ধু। তিনি আসিলেন, এবং আমার আফিসকক্ষে বসিয়া, তাঁহার তলবের কারণ শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার অপরাধ কিছুই নাই। চা-কর প্রভুরা আশে পাশে যাহার জমি যত পারিয়াছেন, ততই গ্রাস করিয়া তাঁহাদের বাগানভুক্ত করিয়াছেন। কাজেই বাগানে তালুকের জমির দাগ (Plot) পড়িতেছে। গরিব ডেঃ কলেক্টর তাহা কিরূপে বারণ করিবে? কিন্তু কমিশনরকে বাগানের ম্যানেজার বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, তালুকদারেরা নিতান্ত দুষ্ট লোক। তাহারা ডেঃ কলেক্টরকে ঘুষ দিয়া—ইংরাজ ঘুষি ভিন্ন ত আর ঘুষ দিতে পারে না—তালুকের জমি অবৈধভাবে চা-বাগানে লইয়া ফেলিয়াছে। কমিশনর ডেপুটিকে দেখিয়াই এরূপ ক্রোধে অস্থির হইলেন, ডেপুটি মহাশয় যে উত্তম মধ্যম কেবল কথায় প্রাপ্ত হইয়া গলদশ্রুনয়নে আমার কক্ষে ফিরিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের ভাগ্য। বোধহয় ডেপুটি মহাশয়ের পরিধেয় বসনে অকর্ম্ম করিবার আর বড় বেশী বাকী ছিল না। বেচারি এত ভীরু যে, একটা কথাও বলিতে পারে নাই। অথচ তিনি এখন 'দুর্ভিক্ষ' (Famine) রায়বাহাদুর। তিনি আমার কক্ষে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এবং কোনও মতে এ বিপদ্ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিতে আমাকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। কমিশনর আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—"লোকটি একেবারে অকর্ম্মণ্য (worthless)। তাহার উপর dishonest (ঘুষখোর)"। আমি উভয় প্রস্তাব সম্বন্ধে একটুক নম্রভাবে প্রতিবাদ করিলাম এবং বলিলাম, তিনি একজন ভাল কর্ম্মচারী, তবে তাঁহার ভুল হইতে পারে। সাহেব মাথা নাড়িলেন তাঁহার আনীত একজন মুসলমান সব-ডেপুটির নাম করিয়া বলিলেন যে, তাহাকে এ অঞ্চলের জরিপের ভার দিয়া আদেশ প্রেরণ কর। আমি আসিয়া ডেপুটি ভায়াকে আনন্দের সহিত সে খবর দিলে, তিনি বহু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন। উক্ত মুসলমান সব-ডেপুটি সে সকল তালুক আবার জরিপ করিল, এবং বলা বাহুল্য যে, তাহার জরীপে বরং চা-বাগানের জমি তালুকের অন্তর্গত পাওয়া গেল! সোভানাল্লা! তাহাতেও কমিশনরের ক্রোধ থামিল না। এ ঘটনা হইতে তিনি নওয়াবাদ তালুকদারদের উপর খড়্গহস্ত হইলেন। তাহার উপর আবার এই চা-বাগানের এক মোকদ্দমায় তাঁহার সেই ক্রোধ দাবানলে পরিণত হইল। সে কথা পরে বলিতেছি।

চা-বাগানের মোকদ্দমা

"নীলকর-বিষধর বিষ-পোরা মুখ
অনল শিখায় ফেলে দিল যত সুখ।" —নীলদর্পণ

এই চা-বাগানের নিকট দিয়া একটি ক্ষুদ্র গিরি-নির্ঝরিণী প্রবাহিতা। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাহাকে 'ছড়া' বলে। বৃষ্টির অভাব হইলে, ক্ষেতে জল লইবার জন্য কৃষকেরা তাহাতে বাঁধ বাঁধিয়া থাকে। বাঁধের দ্বারা স্রোত অবরুদ্ধ হইলে উভয় তীরস্থ জমি প্লাবিত হইয়া শস্যের জীবন রক্ষা করে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দেও প্রজারা সেরূপ বাঁধ বাঁধিয়াছিল। চা-বাগানের সাহেবরা দেখিলেন যে, এ উপলক্ষে তাঁহাদের কিছু টেক্স আদায় করিবার সুযোগ হইয়াছে। তাঁহারা দলে বলে বাঁধের কাছে গিয়া বলিলেন যে, বাঁধের দ্বারা তাঁহাদের চা-বাগিচার ক্ষতি হইতেছে। যদি প্রজারা কিছু দক্ষিণা না দেয়, তবে তাঁহারা বাঁধ কাটিয়া দিবেন। তখন সে পুরাতন ব্যাঘ্র ও মেষের গল্প অভিনীত হইল। প্রজারা বলিল—চা-বাগিচা পাহাড়ের গায়ে। অতএব 'ছড়া'তে বাঁধ দেওয়াতে তাহার কি প্রকারে ক্ষতি হইতে পারে। জল ত আর পাহাড় বাহিয়া উঠিতে পারে না। তখন সাহেবরা এ দুর্ব্বলের তর্কে ক্রোধান্বিত হইয়া বাঁধ কাটিবার জন্য কুলিদিগকে আদেশ করিলেন। কুলিরা কোদালি লইয়া বাঁধ কাটিতে গেলে প্রজারা বাঁধের উপর শুইয়া পড়িল, এবং বলিল—"সাহেব, বাঁধ না কাটিয়া আমাদের গলা কাট। এ অনাবৃষ্টির দিনে বাঁধ কাটিয়া দিলে আমরা গরিবেরা ছেলেপুলে সহ না খাইয়া মরিব।" সাহেবরা যখন দেখিলেন যে, তাহারা কিছুতেই বাঁধ হইতে উঠিল না, তখন তাহাদের উপর গুলি করিলেন। এগার জন প্রজা আহত হইয়া সে বাঁধের উপরই পড়িয়া রহিল। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট স্বয়ং গিয়া তাহাদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেন এবং ডাক্তার সাহেব তাহাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে ত্রিশ চল্লিশটি করিয়া ছড়া বাহির করিলেন। পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিজে ইংরাজ হইয়াও এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। দুইজন ইংরাজকে চালান দিলেন। তাহাতে সাহেবমহলে একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। সন্দেহ—স্বয়ং কমিশনর চা-বাগিচার অংশীদার। দুইজন ইংরাজকে এরূপে চালান দেওয়ার জন্য তিনি পুলিস সাহেবের খুঁটিনাটি ধরিয়া লম্বাচৌড়া কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। মোকদ্দমার বিচার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট করিলেন। তিনি ১৪৭ ধারার মতে চা-করযুগলের কয়েকটি টাকা মাত্র জরিমানা করিলেন। কমিশনর তাহাদিগকে কোর্ট হইতেই আপনার গাড়ীতে তুলিয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া আনিলেন। লোকে বুঝিল যে, ইহার অর্থ—কালা বাঙ্গালী দেখ, শ্বেতপুরুষেরা এরূপ অত্যাচার করিলেও ইহার বেশি দণ্ড হইতে পারে না! সুবিচারের এখানে শেষ হইলেও ক্ষতি ছিল না। কিন্তু এরূপ একটি ব্যাপার এখানে শেষ হইতে দিবে, এমন পাত্রই কালকূট নহে। সে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নথি তলব দিয়া আনিয়া, এক লম্বা 'প্রসিডিং' লিখিয়া সাব্যস্ত করিল যে, প্রজারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছিল, অতএব সেই গুলিক্ষত প্রজাদিগকে ১৯৩ ধারার অপরাধে বিচারের জন্য অন্য এক জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের হাতে সমর্পণ করিল। তিনি সুবিচার করিয়া ইহাদিগকে কঠিন পরিশ্রম সহ ছয় ছয় মাস কয়েদ করিলেন। ক্ষত-বিক্ষত শরীরে হতভাগারা জেলে গেল। আপিলে জজ এ কঠোর আদেশ বহাল রাখিলেন। তাহারা এমন দরিদ্র যে, একটি সামান্য মোক্তারও দিতে পারে নাই। আমি নিজে কত উকিল মোক্তারকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু মাজিষ্ট্রেট কমিশনরের ভয়ে কেহ তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করিল না।

এরূপ অত্যাচার মানুষের প্রাণে সহিতে পারে না। আমি মোকদ্দমার কাগজপত্র, খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার সুহৃদ্বর মনোমোহন ঘোষের কাছে পাঠাইয়া দিলাম, এবং দৈনিক সংবাদপত্রে—ষ্টেটস্‌ম্যান, হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃতবাজার ও ইণ্ডিয়ান মিরারে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলাম। মনোমোহন হাইকোর্টে হতভাগ্য প্রজাদের পক্ষে 'মোশন' উপস্থিত করিলেন, কিন্তু উপস্থিত করিবার সময়ই সিবিলিয়ান জজ তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি যাহা বলিয়াছেন, উহা (misrepresentation) অসত্য কথা মাত্র। তাঁহার এরূপ অপমানে সমস্ত ব্যারিষ্টারগণ স্তম্ভিত। তিনি আমার কাছে টেলিগ্রাফ করিলেন যে, মিঃ উড্রফকে

ব্যারিষ্টার না দিলে, এ মোকদ্দমার কিছুই হইবে না। তাঁহার এ দারুণ অপমানের কথা শুনিয়া, চট্টগ্রামে দুই এক দিনের মধ্যে আমি ছয়শত টাকা চাঁদা তুলিয়া, কলিকাতা যাইবার স্থির করিলাম। কিন্তু ছুটি পাই কিরূপে? একদিন জানুয়ারি মাসে আফিসে বসিয়া আছি, এমন সময় কলিকাতা হইতে কোন এক রমণী বন্ধুর পত্র পাইলাম। তাঁহার সঙ্গে আমার বহুবৎসর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের (মহারাণীর বড় পুত্রের) কলিকাতা দর্শন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—"আপনাকে এ উপলক্ষে দেখিব বলিয়াই কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। বহু লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু আপনাকে দেখিলাম না।" তিনি আমাকে কদাচিৎ পত্র লিখিতেন। তাঁহার এ স্নেহভরা পত্র পাইয়া প্রাণে কিরূপ আর এক আবেগ উপস্থিত হইল। হৃদয়ের এরূপ আবেগ আমার বহু সুখ-দুঃখের কারণ। আমি কমিশনরকে গিয়া বলিলাম যে, সেরেস্তাদারকে আমার স্থানে একটিং রাখিয়া কোন বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরিসাপেক্ষ দুইমাসের ছুটির জন্য আমি গবর্ণমেণ্টকে টেলিগ্রাফ করিতে চাহি। কমিশনর প্রথমতঃ অসম্মত হইলেন। তিনি সেরেস্তাদারের উপর বড়ই নারাজ ছিলেন। তবে আমার বড় আগ্রহ ও জিদ দেখিয়া, আমার প্রস্তাবে অগত্যা সম্মত হইলেন। টেলিগ্রাফে সে দিনই ছুটি মঞ্জুর হইয়া আসিল। আফিস হইতে গিয়া পরিবারস্থ সকলকে এ কথা বলিলে সকলেই বিস্মিত হইল। চট্টগ্রামের জ্বরে কুইনাইনে শরীর বড় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহাদের বলিলাম যে, একবার কলিকাতা গিয়া জল বায়ু পরিবর্ত্তন করিয়া আসিব। পরদিনের ষ্টীমারেই কলিকাতা চলিয়া গেলাম।

মনোমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাঁহার বিশাল নয়ন আরও বিস্তৃত করিয়া, আমাকে সেই সিবিলিয়ান জজকৃত অপমানের বিষয় বিবৃত করিয়া বলিলেন, এবং বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন, যেন মিঃ উড্রফকে ব্যারিষ্টার দিয়া, তাঁহাকে এ অপমান হইতে উদ্ধার করি। কিন্তু আমি এত টাকা কোথায় পাইব? তথাপি মিঃ উড্রফকে ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হইল। সংবাদপত্রের আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেণ্টও চা-করদিগের উপযুক্ত দণ্ড হয় নাই বলিয়া, দণ্ডবৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে মোশন উপস্থিত করিলেন। তখনও সৌভাগ্যক্রমে সার্ রিচার্ড টেম্পল্ (Sir Richard Temple) বঙ্গেশ্বর ছিলেন। ইনিই বাঙ্গালার প্রকৃত শেষ গবর্ণর বলিলেও চলে। উভয় মোকদ্দমায় একসঙ্গে হাইকোর্টে বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম দিন কোর্ট লোকারণ্য। তিনজন জজ বিচারে বসিলেন,—চিফ জষ্টিস, সেই সিবিলিয়ান জজ, এবং আর একজন ব্যারিষ্টার জজ। মিঃ উড্রফ তর্ক আরম্ভ করিয়াই দাঁত কাটিয়া কাটিয়া, মনোমোহনের প্রতি যে দোষারোপ করা হইয়াছিল, সে বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, উক্ত জজের প্রতি তীক্ষ্ণ শরবৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তখনই চিফ জষ্টিস তাঁহার সহযোগীদের সঙ্গে একটু কাণাকাণি করিয়া গলা বাড়াইলেন, এবং বলিলেন যে, মোকদ্দমার পূর্ব্ববিচারের দিন কোন জজের দ্বারা যে কোনও কথা বলা হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, সে কথা অমূলক। মনোমোহন অমনি আবার ফিরিয়া বলিলেন—"দেখিলে বেটা কেমন জব্দ হইল? আমি এ জন্য মিঃ উড্রফকে নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম।" সমবেত ব্যারিষ্টারমধ্যে একটা চাপা টিটকারি উঠিল, এবং সিবিলিয়ান জজের মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। মিঃ উড্রফ তখন জজদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, জজেরা তাঁহাকে বড় একটি অপ্রীতিকর কার্য্য হইতে উদ্ধার করিলেন। অন্যথা এ মোকদ্দমার এমনি শোচনীয় অবস্থা যে, তাঁহাকে বিচারক মাজিষ্ট্রেটের প্রতিকূলে অনেক গুরুতর কথা বলিয়া, উক্ত জজের কথার প্রতিবাদ করিতে হইত। তারপর তিনি এরূপ বিচক্ষণতার সহিত তর্ক করিতে লাগিলেন, এবং এরূপ নূতন নূতন কথা উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন, এ মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত আমার যে কণ্ঠস্থ ছিল,

আমিও এক এক সময় বিস্মিত হইলাম। একটা দৃষ্টান্ত দিব। তিনি বলিলেন, "কালকূট এতদূর বৈধজ্ঞানহীন যে, এ মোকদ্দমার নথি হাইকোর্টে পাঠাইবার সময় নথির রূপান্তর ঘটাইতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই।" শুনিবা মাত্র সিবিলিয়ান জজ আবার জ্বলিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে, মিঃ উড্রফ একজন জেলার মাজিস্ট্রেটের প্রতিকূলে গুরুতর অভিযোগ করিতেছেন। উড্রফ ঠোঁট কাটিয়া ও তাঁহার দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন যে. তিনি না বুঝিয়া এরূপ অভিযোগ করিবার পাত্র নহেন, এ কথা উক্ত জজের জানা উচিত ছিল। সমস্ত কোর্ট যেন কাঁপিয়া উঠিল। তখন মিঃ উড্রফ চিফ জষ্টিসের দিকে চাহিয়া. এবং নথির পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখাইতে লাগিলেন যে. মধ্যে মধ্যে প্রায় পৃষ্ঠায় অঙ্কের অমিল। এক স্থানে এক স্থানে কয়েকটি পৃষ্ঠায় মোটেই অঙ্ক ছিল না। এইটি কালকূটের সেই ১৯৩ ধারার প্রসিডিং। হাইকোর্টে নথি পাঠাইবার সময়ে সে উহার একাংশ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল এবং তাহার নম্বর দিতে ভুলিয়াছিল। মিঃ উড্রফ রহস্যজনক মুখের ভঙ্গি করিয়া. নথির পৃষ্ঠাঙ্কের পর পৃষ্ঠাঙ্কের ভুল দেখাইতে লাগিলেন, এবং হাইকোর্টে হাসির তরঙ্গ ছুটিল। সর্ব্বশেষে মিঃ উড্রফ নথি রাখিয়া দিয়া এবং উক্ত জজের দিকে মুখভঙ্গি করিয়া, গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"My Lord, are you satisfied now? আপনি এখন সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন কি?" তাঁহার মুখ আবার চূর্ণ হইল। তিনি উড্রফের কাছে ক্ষমা চাহিয়া অধোবদনে রহিলেন।

এইরূপে তিনদিন এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত মিঃ উড্রফ তাঁহার বিপুল ব্যবসা ফেলিয়া, এ মোকদ্দমায় তর্ক করিলেন। তিনদিনই কোর্টে উকিল ব্যারিষ্টারের ও দর্শকের বিষম ভিড় হইত। শেষদিন কোর্টের পর আমাকে বলিলেন যে. আমি তাঁহাকে দুদিনের ফিসও পুরা দিতে পারি নাই। একদিন তিনি বিনা ফিসে খাটিয়াছেন. এবং এ তিনদিন অন্য মোকদ্দমা সব ছাড়িয়া দেওয়াতে তাঁহাব বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। আমি তখন সজলনয়নে তাঁহাকে বলিলাম যে এ হতভাগারা এত দরিদ্র যে, দিনান্তে তাহাদের আহার মিলেনা আমি আটশত টাকা অতি কষ্টে চট্টগ্রাম হইতে চাঁদা তুলিয়া আনিয়াছিলাম। তিনি যখন এতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন. তখন আর একটি দিনের জন্য তাহাদের প্রতি দয়া না করিলে উপায়ান্তর নাই। তিনি বলিলেন—"কলিকাতায় কিছু চাঁদা তুলিতে পার কি না চেষ্টা কর।" এ মোকদ্দমায় কলিকাতায়ও খুব আন্দোলন উঠিয়াছে। আমি হাইকোর্ট হইতেই সেই ব্রতে বহির্গত হইলাম। কলিকাতায়ও সত্য সত্যই এ মোকদ্দমা লইয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়াছিল। 'ইণ্ডিয়ান লিগে'র (Indian League) পক্ষ হইতে বাবু শিশিরকুমার ঘোষ একশত টাকা দিলেন, এবং বাবু কৃষ্ণদাস পালের পত্রে বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু দিগম্বর মিত্র—ইঁহারা কেহই তখন রাজা মহারাজা হন নাই—প্রভৃতিও আমার বিশেষ সাহায্য করিলেন। ইঁহাদের সঙ্গে, বিশেষতঃ বাবু দিগম্বর মিত্রের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ ছিল. তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি এতদুপলক্ষে আমাকে যে উপদেশ দিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন. তাহা অক্ষরে অক্ষরে তৎক্ষণাৎ ফলিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"আমি তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি. তুমি যে সাহেব-বিরোধী এরূপ একটি ভারতব্যাপী আন্দোলনের মোকদ্দমায় এমন করিয়া চাঁদা তুলিয়া বেড়াইতেছ, এবং এ হতভাগাদের উদ্ধারের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ, তাহা তোমার উপরিস্থ কর্ম্মচারীরা ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলে তোমার সর্ব্বনাশ। তুমি ছেলেমানুষ, এখনও ইংরাজ জাতিকে চিন নাই। তোমার হৃদয় যে এরূপ দেশহিতৈষী ও পরদুঃখে কাতর হইবে তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম। তাই তোমাকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটিতে না গিয়া, ওকালতিতে যাইতে আমি এত জিদ করিয়াছিলাম।" এ কথাগুলি দৈববাণীর মত কেবল তৎক্ষণাৎ নহে, আমার সমস্ত দাসত্ব-জীবনে ফলিয়াছে, সে সকল কথা যথাস্থানে বলিব।

সেই এক সন্ধ্যায় কলিকাতায় আরও আটশত টাকা চাঁদা তুলিয়া, পরদিবস গিয়া উড্রফকে দিলাম। তিনি এ টাকার কাহিনী শুনিয়া বলিলেন—"তুমি অদ্ভুত ছেলে! তুমি 'বারে' না আসিয়া চাকরিতে গিয়াছিলে কেন?" আমি বলিলাম—অদৃষ্ট। তিনি আরও দুইদিন মোকদ্দমায় তর্ক করিলেন। এ ঘোরতর অত্যাচার তাঁহারও প্রাণ স্পর্শ করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারে এ গরীবেরা অব্যাহতি পাইল, এবং সাহেবযুগলের দুইমাস করিয়া কয়েদ হইল। তাঁহাদের পক্ষেও ভাল ভাল ব্যারিষ্টার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম এখন আমার মনে নাই। সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া একটি আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। চা-বাগান হইতে সাহেব যুগল জেলে প্রবেশ করিলেন। শুনিয়াছি, কমিশনরের কৃপায় তাঁহাদের জেলে বড় বিশেষ কষ্ট হয় নাই, এবং যেদিন খালাস হইলেন, সেদিন কমিশনর জেলের দ্বার হইতে তাঁহাদিগকে তাঁহার নিজ গাড়ীতে তুলিয়া নিজ বাড়ী লইয়া গেলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র

"The observed of all observers."—*Hamlet.*

এ যাত্রায় কলিকাতায় অনেকগুলি বড় লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। একে একে বলিতেছি। টাউনহলে উক্ত মোকদ্দমার দুই একদিন পরে কি জন্য একটি বিরাট্ সভা হইয়াছিল। সে সভা দেখিতে গিয়ে এক স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে কে আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। ফিরিয়া দেখিলাম যে, তিনি হাইকোর্টের তদানীন্তন উকিল এবং পরবর্ত্তী জজ পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি। আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন কি?

আমি। (নমস্কার করিয়া) শিষ্য গুরুকে চিনিবে না কেন?

তিনি। (হাসিয়া) এখন সে সম্বন্ধের বিপরীত হইয়াছে। আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রের মধ্যে একজন এরূপ কবিখ্যাতি পাইয়াছেন মনে করিলে আমার হৃদয় অহঙ্কারে পূর্ণ হয়। আপনাকে আমার আর একটি বন্ধু দেখিতে চাহিয়াছেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিয়া একটি প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তির কাছে লইয়া গেলেন। তাহার ছায়ায় তাঁহারই মত একটি খর্ব্বাকৃতি লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। গুরুদাস বাবু বলিলেন—"ইনি আমার বন্ধু চ—বসু।" 'আর্য্যদর্শনে' যে 'আর্য্যদর্শন' কবিতাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তিনি তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন এবং উহা আমার মুখস্থ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অস্বীকার করিলে তিনি উহা মুখস্থ আওড়াইলেন।

"তবে যদি আর—আর কোন মহারথী
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ধরি তরবার,
করি সিন্ধুনাদ ধ্বনি,
আনে রক্ত তরঙ্গিণী,
আর্য্যরক্তে—আর্য্যাবর্ত্ত ভাসায় আবার!
তবে যদি আর্য্যজাতি জাগে পুনর্ব্বার।"

এ কবিতাটি আওড়াইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি রাজকর্ম্মচারী হইয়া এ কবিতা কিরূপে লিখিলেন?"

আমি। আমি ত ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বলি নাই। আর্য্যজাতি ইংরাজ সৈন্যে প্রবেশ করিয়াও আপনার রক্তে আর্য্যাবর্ত্ত ভাসাইতে পারে।

তিনি। এ উত্তর আপনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের মত দিয়াছেন।

আমি। আপনিই বা কোন্ উকিলের মত প্রশ্ন করেন নাই?

তিনি সে সময়ে বোধহয়, কোথায়ও মক্কেলশূন্য ওকালতি করিতেছিলেন।

তাহার পর কোনও বন্ধুর বাসায় শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ইন্দ্রনাথ তখন গোঁড়া হিন্দু এবং অক্ষয়চন্দ্র গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন না। সেখানে পানাহার কিঞ্চিৎ অহিন্দু ও অবৈষ্ণব ভাবে হইয়াছিল স্মরণ হয়। অক্ষয়বাবু তখন 'সাধারণী'র সম্পাদক। তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া, হুগলী দেখিবার জন্য পরদিন তাঁহার বাড়ী লইয়া চলিলেন। হাওড়া ষ্টেশনে রেলের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"'আর্য্যদর্শনে'র 'এবার' কবিতাটি কি আপনার লেখা?" উহা 'সাধারণী'র কোন অদ্ভুত সমালোচনার শ্লেষাত্মক প্রতিশোধ। আমি বলিলাম, তিনি যখন নিমন্ত্রণ করিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ী লইয়া যাইতেছেন, তখন প্রশ্নটা না করিলেই ভাল ছিল। তিনি তাঁহার সেই সদাশয় হাসি হাসিয়া বলিলেন যে, প্রথম তিনি উহা শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কারণ, তাহার কিছু দিন পূর্ব্বে শিবনাথ বঙ্কিমবাবুর 'সুন্দরী-সুন্দর' কবিতার অনুকরণে একটি বড় সুন্দর শ্লেষাত্মক কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিলেন যে, আমার কবিতাটি এত সুন্দর যে, তিনি গালি খাইয়া এমন সন্তুষ্ট আর কখনও হন নাই। তাঁহার বাড়ীতে একদিন অতিথি থাকিয়া হুগলী দর্শন করি। তিনি এবং তাঁহার আদর্শ পত্নী আমাকে ঠিক তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত আদর করিয়াছিলেন, এবং কি সুখেই একটি দিন কাটিয়াছিল! সে কথা মনে করিয়াও আজ চক্ষে জল আসিতেছে। কারণ তাঁহার সেই পতিপরায়ণা পত্নী তাঁহার জীবন, হৃদয় ও গৃহ শূন্য করিয়া বহুদিন হইল চলিয়া গিয়াছেন।

তাহার পরদিন বর্দ্ধমান যাই, এবং সেখানে এক উকিলবাবুর বাসায় থাকি। তাঁহার সঙ্গে সমস্ত বর্দ্ধমান দেখিয়া আসিয়া বলিলাম যে, আমি সঞ্জীববাবুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিব। তিনি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন যে, আমি সঞ্জীববাবুর এরূপ 'দেমাকি' লোক যে, বর্দ্ধমানে এমন কেহ নাই যে, আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার কাছে যাইবে। তিনি নিজে কবুল জবাব দিলেন—"হেবো না অবধড়।" পরদিন প্রাতে আমি জজ ফিল্ড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, দেখিলাম—রাস্তার পার্শ্বে বৃহৎ 'হাতা'-শোভিত একটি 'বাঙ্গলো'র বারাণ্ডায় একজন তেজঃপুঞ্জ গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণ অনাবৃত দেহে বেড়াইতেছেন। মূর্ত্তিখানি দেখিয়া কোচওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ লোকটি কে?" সে বলিল—"সঞ্জীববাবু।" আমি প্রলোভন ছাড়িতে পারিলাম না। গাড়ীখানি হাতায় লইয়া টিকেট পাঠাইয়া দিলাম, এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—কি জানি, তিনি কিরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কার্ড পাইবামাত্রই তিনি ছুটিয়া আসিয়া, চিরপরিচিতের মত আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন। আমি মনে ভাবিলাম, এই কি সেই দেমাকি সঞ্জীববাবু! দুই ঘণ্টাকাল দুজনে কি আনন্দে কথোপকথন করিলাম, এবং তিনি কি আদরই করিলেন! সে দিন শনিবার ছিল। তিনি বলিলেন, বঙ্কিমবাবু আমাকে দেখিতে বড়ই উৎসুক। বলা বাহুল্য, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তদপেক্ষা শতগুণ বেশী উৎসুক ছিলাম। সঞ্জীববাবু আমাকে তখনই কয়েদ করিয়া, সন্ধ্যার ট্রেণে নৈহাটী লইতে চাহিলেন। আমি অসম্মত হইলে তিনি বলিলেন যে, সে রাত্রির ট্রেণে তিনি নৈহাটী যাইবেন, এবং পরদিন তাঁহাদের এক জায়গায় নিমন্ত্রণে যাইবার কথা আছে, তাহা বারণ করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিবেন। আমি বলিলাম—পরদিন প্রত্যাবর্ত্তনপথে অক্ষয়বাবুর বাড়ীতে আর একদিন থাকিয়া যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি। তিনি বলিলেন—"আমি সে ওজর শুনিব না। আমি নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়া ট্রেণের সময়ে হুগলী ষ্টেশনে

আসিয়া আপনার অপেক্ষা করিব। যদি না যান, অভদ্রতার একশেষ হইবে।" উকিলবাবুর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে প্রায় এগারটা হইয়াছিল। তিনি না খাইয়া বসিয়া আছেন। আমি ফিরিয়া গিয়া যখন বলিলাম যে, সঞ্জীববাবুর বাড়ীতে বিলম্ব হইয়াছে, তখন তাঁহার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি সকল কথা শুনিয়া বলিলেন—"আপনি একজন না মস্ত কবি, তাই সঞ্জীববাবুর কাছে কল্‌কে পাইয়াছেন।" পরদিন প্রাতের ট্রেণে হুগলী ষ্টেশনে পঁহুছিয়া সঞ্জীববাবুকে দেখিলাম না। তৎপরিবর্ত্তে দেখিলাম, অক্ষয় দাদা আমার অপেক্ষা করিতেছেন। সঞ্জীববাবুর অপেক্ষা করিবার কথা তাঁহাকে বলিলে, তিনি বলিলেন—"চাটুয্যেদের দেমাকের খবর রাখ না, তাই মনে করিয়াছিলে যে, সঞ্জীববাবু ষ্টেশনে আসিবেন। এখন নৈহাটী যাওয়া হইবে না। সোজা পথে আমার বাড়ী চল। তোমার বৌ-ঠাকুরাণী রাঁধিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।" তাহাই করিলাম, এবং আর একটি মধ্যাহ্ন পরম আনন্দে কাটাইয়া, অপরাহ্ন চারিটার সময় গঙ্গা পার হইয়া নৈহাটী চলিলাম।

তখন অপরাহ্ন পাঁচটা। সান্ধ্য রবির মৃদুল কিরণে চুঁচুড়ার কলেজের, হুগলীর ইমামবাড়ীর এবং গঙ্গাতীরস্থ অন্যান্য প্রাসাদাবলীর শীর্ষদেশ সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। নদীগর্ভ হইতে সে শোভা যেন একখানি চিত্রের মত দেখা যাইতেছিল। অর্দ্ধ গঙ্গার বক্ষে নগরের ছায়া পড়িয়াছিল, এবং অপরার্দ্ধের বক্ষে ক্ষুদ্র হিল্লোলরাশি রবির মৃদুল কিরণে জ্বলিতেছিল, হাসিতেছিল, নাচিতেছিল। মনে পড়িল—

"হাসিছে একটি রবি পশ্চিম গগনে
ভাসিছে সহস্র রবি জাহ্নবী-জীবনে।"

কল্পনার চক্ষে ভাগীরথীর যে শোভা দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম। নদীগর্ভে নগরের ছায়া, এবং ভাগীরথীর এই শোভা দেখিয়া আমরা দুজনেই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে গাইতেছিলাম,—

"পড়ি জল নীলে ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।"

গাইতে গাইতে নৌকা নৈহাটীর ঘাটে পঁহুছিল, এবং আমরা বঙ্কিমবাবুর বাড়ীর দিকে চলিলাম। রেলের লাইন পার হওবামাত্র সঞ্জীববাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রের ওলাউঠা হইয়াছিল বলিয়া তিনি প্রাতে ষ্টেশনে যাইতে পারেন নাই বলিয়া, আমার কাছে যথেষ্ট ক্ষমা চাহিলেন। তিনি আমাকে দক্ষিণ হস্তে আদরে জড়াইয়া একটি ঘরে লইলেন, এবং ফরাস বিছানায় বসাইয়া বঙ্কিমবাবুকে খবর দিলেন। শুনিলাম, সেটি বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানা। একটি শিবালয়ের সঙ্গে লাগান একটি হল্‌, এবং তাহার উপর পার্শ্বে দুটি কক্ষ। হলের চারি দিকে প্রাচীরের কাছে কাছে দুই চারিখানি কৌচ ও কুসন-ওয়ালা চেয়ার ; ফরাস বিছানার উপর ছিল। প্রাচীরের গায়ে কয়েকখানি ছবি, এবং হলের এক কোণায় একটি হারমোনিয়াম্‌। আমি কক্ষের সজ্জা দেখিতে দেখিতে সঞ্জীববাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম। অক্ষয়বাবু পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। অকস্মাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিল। আমি চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, একটি একহারা গৌরবর্ণ পুরুষ। মাথায় কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশ, চক্ষু দুটি নাতিক্ষুদ্র নাতি-বৃহৎ, কিন্তু সমুজ্জ্বল ; নাসিকা উন্নত, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র ও রহস্যব্যঞ্জক ঈষৎ হাসিযুক্ত : তাহার উপর দুই প্রকাণ্ড গোঁফের তাড়া,—অগ্রভাগ কুঞ্চিত। দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবা, মুখও ঈষৎ দীর্ঘ এবং সুগঠিত। অঙ্গে বাহু পর্য্যন্ত একটি সামান্য পিরান, এবং পরিধান নয়নসুকের ধুতি। দেখিবামাত্রই মূর্ত্তিখানি সুন্দর, সতেজ এবং প্রতিভান্বিত বোধ হয়। সঞ্জীববাবু হাসিয়া বলিলেন—"বলুন দেখি লোকটি কে?" আমি ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া

প্রণাম করিতে যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে নমস্কার করিতে অবসর না দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং হাসিয়া বলিলেন—"সত্য সত্যই বলুন দেখি আমি কে?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"বঙ্কিমবাবু।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমাকে কিরূপে চিনিলেন?" আমি উত্তর করিলাম—"শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন, এবং বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"বটে! আমার গোঁফের উপরই আপনার প্রথম নজর পড়িয়াছে? আমি বলিলাম—"পড়িবার কথা নয় কি?" আবার সকলে হাসিলেন, এবং সঞ্জীববাবু বলিলেন—"দেখা যাক্ কার জিৎ হয়।" তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"ছোকরাদেরই চিরকাল জিৎ হইয়া থাকে। সত্য সত্যই আপনি যে এত ছেলেমানুষ, আপনার লেখা দেখিয়া ও পত্র পড়িয়া মনে করি নাই।" সঞ্জীববাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন —"আপনি ইঁহার কবিতা পড়িয়াছেন; ইংরাজি পত্র দেখেন নাই। আমি এমন সুন্দর ইংরাজি অতি অল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি।" আমি অক্ষয়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—"দাদা শুনিলেন কি? এঁর মুখে আমার ইংরাজির প্রশংসা! তাঁর সাক্ষাৎ আমি কলমটি ধরিবারও যোগ্য নহি।" অক্ষয়বাবুকে দাদা ডাকিতে শুনিয়া বঙ্কিমবাবু হাসিয়া বলিলেন —"বটে! অক্ষয় আপনার দাদা; অক্ষয় আমার নাতি, এবং অসাধারণী আমার নাতবৌ। অতএব তুমিও আমার নাতি। এত ছেলেমানুষকে আর আপনি বলা যায় না।" অক্ষয়-বাবুর কাগজের নাম 'সাধারণী', তাই বঙ্কিমবাবু তাঁহার স্ত্রীর নাম রাখিয়াছিলেন—'অসাধারণী'। ইহার পর অনেক গল্প চলিল। সঞ্জীববাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিয়া বলিলেন—"বঙ্কিম! তুমি এঁর কবিতার ও ইংরাজির প্রশংসা করিলে, কিন্তু আমি এঁর কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়াছি। এঁর বাড়ী চাট্‌গাঁ বলিতেছেন, অথচ কথায় বাঙ্গাল দেশের গন্ধমাত্র নাই, ঠিক আমাদের মত বলিতেছেন।" তখন আমার কথার, চট্টগ্রামের ভাষার, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার একটি সমালোচনা হইল। তাহার পর বঙ্গসাহিত্যের কথা, 'পলাশীর যুদ্ধ', 'বৃত্রসংহার' ইত্যাদির কথা, 'বঙ্গদর্শনে' উহার প্রথম ভাগের সমালোচনার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"এ সমালোচনার জন্য অনেকে আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তোমার কাছে 'বৃত্রসংহার' কেমন লাগিয়াছে?" আমি বলিলাম—"আমি হেমবাবুর শিষ্য-স্থানীয়, আমার আবার মত কি? আমার বেশ লাগিয়াছে।" অক্ষয়বাবু নাছোড়বান্দা। তিনি বলিলেন—"মন্দ কাহারও লাগে নাই। তবে 'পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ' এই লাইনে যে কি অদ্ভুত কবিত্ব আছে, অনেকে বুঝে না। এ সমালোচনায় আপনার অগৌরব হইয়াছে।" বঙ্কিমবাবু বড় অপ্রতিভ হইয়া আমার কাছে আপীল করিলে, আমি তাঁহার মত সমর্থন করিয়া আপীল ডিক্রি দিলাম। সন্ধ্যা হইল, ভৃত্য আসিয়া বঙ্কিম-বাবুর সম্মুখে দুটি মোমবাতির শেজ রাখিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুরাদেবী অধিষ্ঠিতা হইলেন, এবং অক্ষয়বাবু ছাড়া আমরা তিন জন তাঁহার সেবা আরম্ভ করিলাম। বঙ্কিম-বাবু আমার পড়া শুনিতে চাহিলেন, আমি তাঁহার পড়া শুনিতে চাহিলাম। উভয়ের গ্রন্থাবলী আসিয়া উপস্থিত হইল। জিদ করিয়া প্রথম আমার একটি কবিতা পড়াইলেন, এবং পড়ার সকলেই বড় প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তিনি কি পড়িবেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয়বাবু আমাকে আগেই শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমি বলিলাম —'বিষবৃক্ষ'। তিনি—"কোন্ স্থান পড়িব?" আমি—"যে স্থান আপনার অভিরুচি।" তিনি 'বিষবৃক্ষ' খুলিয়া, যেখানে কমলমণির কাছে সূর্য্যমুখী তাঁহার পতি-প্রাণতা দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছেন, সে স্থান পড়িতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন"'বিষবৃক্ষ' আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।" আমাকে অক্ষয়বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন যে, বঙ্কিমবাবুর স্ত্রীর চরিত্রই তাঁহাকে 'নভেলিস্ট' করিয়াছে। তিনিই সূর্য্যমুখী। তখন বঙ্কিমবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা

পূর্ণবাবু আসিলেন। আমি 'মৃণালিনী'র গানগুলি শুনিতে চাহিয়াছিলাম। পূর্ণবাবু হারমোনিয়ামের সঙ্গে তাহার দুই একটি গান গাইলেন। কাণে যেন অমৃত বর্ষণ করিল।

তাহার পর আমরা তাঁহার বাড়ীর ভিতর উপরের বারাণ্ডায় গিয়া খাইতে বসিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"বামুনবাড়ীর রান্না মাছ মাংস তুমি খাইতে পারিবে না; নিরামিষ তরকারি যাহা আছে, তাহাতে দুই এক গ্রাস খাইতে পার কি না দেখ!" আমি তাহার প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু মাংস একটুক মুখে দিয়াই বুঝিলাম যে, বাঙ্গালা পুস্তকের সমালোচনার মত তাঁহার এ সমালোচনাও 'বঙ্গদর্শনে'র উপযুক্ত। মাংসে পেঁয়াজ মসলা কিছুই নাই। যেন খালি খানিকটা জল সিদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আমি তথাপি শিষ্টাচারের অনুরোধে বলিলাম—"কেন, মাংস ত বেশ হইয়াছে?" তিনি বলিলেন—"তোমার ঠানদিদির খোসামুদি করিবার প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ব্ববঙ্গের স্ত্রীলোকদিগের রান্না খাইয়াছি। আমাদের এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা মাছ মাংস তেমন রাঁধিতে পারে না।" খাওয়ার পর বৈঠকখানায় আসিয়া তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে গল্প করিলেন, এবং আমাদিগকে শোয়াইয়া নিজে শুইতে গেলেন। পরদিন প্রাতে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। 'বঙ্গদর্শন' অল্প দিন পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবু, অক্ষয়বাবুর ভাষায়, 'গলা টিপিয়া মারিয়াছিলেন।' উহা পুনঃপ্রচারিত করিবার চেষ্টা করা, আমার এইবার বিদায় লওয়ার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। কারণ, 'বঙ্গদর্শনে'র অদর্শনের সহিত বঙ্গসাহিত্যে এবং আমাদের হৃদয়ে যেন একটা নিরানন্দ ও নিরুৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছিল। অতএব চুঁচুড়ায় অক্ষয়বাবুর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার অনেক কথা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতে আমি 'বঙ্গদর্শনে'র পুনঃপ্রচারের প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"বটে! 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ করাটা তোমাদের বড়ই প্রাণে লাগিয়াছে। লাগিবারই কথা। কিন্তু কি করিব? আমি একে ত দাসত্বভারে পীড়িত, তাহার উপর স্বাস্থ্যের এবং পরিশ্রমশক্তিরও সীমা আছে। ইদানীং 'বঙ্গদর্শনে'র প্রায় তিন ভাগ লেখার ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। কাজেই আমি আর পারিলাম না। তাহা ছাড়া নিরপেক্ষ সমালোচনায় একটা দেশ আমার শত্রু হইয়া উঠিতেছিল। শুনিয়াছি, কোন কোনও গ্রন্থকার আমাকে মারিতে পর্য্যন্ত সংকল্প করিয়াছিল। গালাগালির ত কথাই নাই। সার্ জর্জ কেম্বেলের পর বোধ হয়, আমি এ বাঙ্গালার গালাগালির প্রধান পাত্র (I am the worst abused man in Bengal next only to Sir George Campbell)। তোমরা 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রচার করিতে চাহ, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি আর সম্পাদক হইব না।" আমরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, অনেক অনুনয় করিলাম; কিন্তু তিনি কিছুতেই টলিলেন না। তিনি অক্ষয়-কি-সঞ্জীব-বাবুকে সম্পাদক প্রস্তাব করিলেন। সমস্ত দিনটা তর্কে বিতর্কে ও পরামর্শে কাটিয়া গেল। অক্ষয়বাবু বলিলেন, তিনি বৈতনিক সম্পাদক মাত্র হইতে পারেন, কার্য্যাধ্যক্ষ তিনি হইবেন না। সঞ্জীববাবু কার্য্যাধ্যক্ষ হইতে স্বীকার করিলেন। তখন অক্ষয়বাবু মাসিক দুই শত টাকা বেতন চাহিলেন। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—এত বেতন চলিবে না; কারণ, 'বঙ্গদর্শনে'র দুই শত টাকার অধিক আয় কখন হয় নাই। তখন স্থির হইল যে, সঞ্জীববাবু উভয় সম্পাদক ও কার্য্যাধ্যক্ষ হইবেন, এবং এ ভাবে 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রচারিত হইবে। তখন বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"একটি কথা। শিবনাথ শাস্ত্রীকে কখনও 'বঙ্গদর্শনে' লিখিতে দিবে না বল।" আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। আমি বলিলাম—"আপনি এত লোকের মাথায় লঙ্কার হাঁড়ি ঝাড়িলেন। আর শিবনাথ শাস্ত্রী আপনার 'সুন্দরী-সুন্দর' কবিতাটির অনুকরণে একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিয়াছিল বলিয়া কি তাহার প্রতি এই ক্রোধ উচিত?" তিনি বলিলেন—"বিদ্রূপের জন্য নহে। সে উহা maliciously (অসরল ভাবে) করিয়াছিল।"

অক্ষয়বাবু বলিলেন— "চাটুয্যেদের অহঙ্কার দেশে একটা প্রবাদের মত দাঁড়াইতেছে।" আমিও হাসিতে হাসিতে বর্দ্ধমানে সঞ্জীববাবুর সম্বন্ধে সে ধারণার কথা বলিলাম। বঙ্কিমবাবু বলিলেন—"নবীন! কথাটা ঠিক। এই অহঙ্কারটুকু না থাকিলে মরিয়া যাইতাম। দুইটা গল্প শুন। বহরমপুরে বদলি হইয়া গেলাম। একে ত রোডসেস ইত্যাদি এক রাশি কার্য্যের ভার কলেক্টর বেটা জিদ করিয়া, 'বঙ্গদর্শন' ও আমার লেখা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে maliciously আমার ঘাড়ে চাপাইল। তাহাতে দর্শকের জ্বালায় অস্থির হইলাম। যে আসে, সে যে হুঁকা লইয়া বসে, আর উঠে না। আমি দেখিলাম, আমার লেখাপড়া বন্ধ হইল। তখন আমার গৃহদ্বারে এক নোটিশ দিলাম যে, কেহ আমার সাক্ষাৎ পাইবেন না। তার পরদিন হইতে সমস্ত বহরমপুরে রাষ্ট্র হইল—'বটে! বেটার এমন দেমাক! থাক্, তার বাড়ীর আশে পাশে কেহ যাইব না।' আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম! দ্বিতীয় গল্পটি এরূপ। এক গুলির আড্ডায় আমার উপন্যাসের সমালোচনা হইতেছিল। এক গুলিখোর বলিল—"বঙ্কিমটা নিশ্চয় গুলিখোর। তাহা না হইলে বাবা, এমন রসিকতা কি তার কলম হইতে বাহির হয়?" সকলেই হাসিলাম। বুঝিলাম, এই শেষ গল্পটা অক্ষয়বাবুর উপকারার্থ। অক্ষয়বাবু বলিলেন—"আমি গুলিখোর হই, আর যা হই, কিন্তু আপনাদের দেমাকে দেশটা যে টলটলায়মান, তাহা আমি এক শ বার বলিব।"

এ বার, কি ইহার পরের বারের সাক্ষাতে, ঠিক স্মরণ নাই, অহঙ্কারের একটা ঘটনা আমার সাক্ষাতে ঘটিয়াছিল। আমরা প্রাতে বসিয়া আছি, একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত গঙ্গাস্নান করিয়া নামাবলি গায়ে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বসিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কি একটা চরের বন্দোবস্তের ভার তাঁহার হাতে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। অমনি যেন শিমুলস্তূপে অগ্নি পড়িল, তিনি ফরশির নলটি মুখ হইতে নামাইয়া সক্রোধে বলিলেন—"বটে! তুমি এ জন্য আসিয়াছ? বের হও!" ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ ও অপমানিত হইয়া আমার দিকে কাতরভাবে চাহিয়া চলিয়া গেল। বঙ্কিমবাবু তখন তামাক খাইতে খাইতে আমাকে বলিলেন—"দেখিলে তামাসা?" আমি বলিলাম—"কাহার? আপনার, না ব্রাহ্মণটির?" তিনি বলিলেন—"আমার কেন? ভদ্রলোক আসিল, আত্মীয় বলিয়া আমি অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। তারপর তার ব্যবহারটা দেখিলে? সে কেন আফিসের কথা ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল?" আমি বলিলাম—"তাহার জন্য তাহাকে এই অকথ্য অপমান না করিয়া, মিষ্টভাবে বলিলেই হইত —'আপনি আফিসে গিয়া তাহার খবর লইবেন'।" তিনি বলিলেন—"তুমি ছেলেমানুষ, জান না; এরূপ লোকের সঙ্গে এরূপ ব্যবহার না করিলে, বাড়ীর কাছে হুগলীতে আমার কাজ করা চলিবে না।"

যাহা হউক, তাঁহার ভীষ্মবাক্যে আমরা সম্মত হইলাম যে, শিবনাথ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শনে' কখনও লিখিতে পারিবেন না। আমি আরও প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, 'আর্য্যদর্শনে'র সম্পাদক বিদ্যাভূষণ ও 'বান্ধবে'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে এই 'বঙ্গদর্শনে' যোগ দেওয়াইতে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। তাহা হইলে একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকা বেশ সুন্দর চলিবে। 'আর্য্যদর্শন' বন্ধ হইয়াছিল, 'বান্ধব'ও সাময়িক অবস্থা ত্যাগ করিয়া অসাময়িক হইয়াছিল। তাহার পরে বন্ধ হয়। কিন্তু স্মরণ হয়, তাঁহারা উভয়ে লিখিলেন যে, তাঁহাদের দেনার ভার যদি 'বঙ্গদর্শনে'র অধ্যক্ষ গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাদের আপত্তি নাই। আমার ইচ্ছা ছিল, তাঁহাদের এবং সঞ্জীববাবুর, তিন জনের সম্পাদকতায় 'বঙ্গদর্শন' পুনঃপ্রচারিত করিব। তাহা হইল না। উহা কেবল সঞ্জীববাবুর সম্পাদকতায় পুনঃ-প্রচারিত হইবার স্থির হইল। তদনুসারে হইয়াও ছিল। কিছুদিন পরে চন্দ্রনাথ বসু

সম্পাদক হন। কিন্তু কোথায় সূর্য্য ও কোথায় জোনাকি! কিছু কাল অর্দ্ধমৃত অবস্থায় চলিয়া 'বঙ্গদর্শন' আবার বন্ধ হইল।

আরও একটি দিন এরূপে বড় আনন্দে কাটিল। পরদিন আমি সকালের ট্রেণে কলিকাতায় যাইব এবং অক্ষয়বাবু হুগলী যাইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবু আর বাড়ীর মধ্য হইতে আসেন না। তিনি পূর্ব্বরাত্রিতে আরও একটা দিন তাঁহার বাটীতে থাকিবার জন্য বড়ই জিদ্ করিয়াছিলেন। আমার সন্দেহ হইতেছিল যে, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমার ট্রেন মিস্ করাইবার জন্য দেরি করিতেছিলেন। অক্ষয়বাবুরও সে সন্দেহ হইল। অবশেষে আমি চলিয়া যাইতেছি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আবার থাকিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। আমি আবার অসম্মত হইলে, এবং কলিকাতা যাইবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখাইলে, তিনি অগত্যা সম্মত হইলেন, এবং চা আনিতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম যে, আর এক ষড়যন্ত্র। বলিলাম—আমি চা খাই না। তিনি বলিলেন যে, তখনও ট্রেণের ঢের সময় আছে, দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িলেও তাঁহার বাড়ী হইতে গিয়া ট্রেণ পাওয়া যায়। নিতান্ত আমি চলিয়া আসিতেছি দেখিয়া, হলের দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া, আমার সঙ্গে করমর্দ্দন করিয়া বিদায় দিয়া অমনি বলিয়া উঠিলেন—"ভাল কথা মনে হইয়াছে। তোমাকে ত আমার বহি এক সেট দিই নাই।' চাকরকে বহি এক সেট শীঘ্র আনিতে বলিলেন, এবং কিছুতেই আমাকে আসিতে দিলেন না। আমার হাত ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। বহি আসিলে বলিলেন যে, প্রত্যেক বহিতে তাঁহার হাতের উপহার লিখিয়া তবে ত দিবেন? আমি বলিলাম—"দোহাই আপনার, আমার ট্রেণটা মিস্ করাইবেন না।" তখন বলিলেন—"অন্ততঃ 'বিষবৃক্ষটা'য় লিখিয়া দি।" এবং বড় কায়দা করিয়া ধীরে ধীরে লিখিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে ঠন্ করিয়া নৈহাটী ষ্টেশনে দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল। আমি বহিগুলি কুড়াইয়া লইয়া সটান দৌড় দিলাম। গাড়ী চলিয়াছে, এমন সময় গিয়া ট্রেণের এক কক্ষে লাফাইয়া উঠিলাম। তিনি গবাক্ষে দাঁড়াইয়া ট্রেণের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। মনে করিয়াছেন—আমি ট্রেণ মিস্ করিয়াছি। কিন্তু আমাকে ট্রেণে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে রুমাল ঘুরাইতে লাগিলেন। আমিও তাই করিলাম। ট্রেণ তাঁহার গবাক্ষপথ ছাড়িয়া আসিলে পর আমার জীবনের একটি সুখস্বপ্ন ভোর হইল। এ আনন্দ উচ্ছ্বাসের প্রতিক্রিয়ায় আমি অবসন্ন হইয়া গাড়ীতে বসিয়া পড়িলাম, এবং ভাবিতে লাগিলাম—এই স্নেহবান্ সুরসিক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি কি লোকের কাছে ঘোরতর অহঙ্কারী বলিয়া পরিচিত? তখন বঙ্কিমবাবুর প্রতিভার ও প্রতিষ্ঠার মধ্যাহ্ন। তাঁহার উপন্যাস ও প্রবন্ধাবলী পড়িবার জন্য সমস্ত বঙ্গদেশ 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া থাকিত। 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গভাষায় নবযৌবন সঞ্চারিত করিয়াছে! সেই যৌবনের সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে সমস্ত দেশ মুগ্ধ। গাড়ীর এক দিকের বেঞ্চে বসিয়া বঙ্গের এই বরপুত্রের, এই অমর নক্ষত্রের রূপ, প্রতিভা ও সহৃদয়তার কথা চিন্তা করিতেছি, অন্যদিকের বেঞ্চে একটি ভদ্রলোক বসিয়া আমাকে স্থিরচক্ষে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি বঙ্কিমবাবুর বাড়ী হইতে আসিতেছেন?" সংক্ষেপে উত্তর করিলাম—"হাঁ।' তিনি আবার একটুক নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাইতেছেন?" আমি আবার সংক্ষেপে উত্তর করিলাম —"কলিকাতায়।" তিনি আবার চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু যেন কৌতূহল চাপিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। আবার প্রশ্ন—"আপনি কলিকাতায় কি জন্য যাইতেছেন?" উত্তর—"বেড়াইতে।" প্রশ্ন—"আপনি কোথায় থাকেন?" উত্তর—"চট্টগ্রামে।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন—"আপনি চট্টগ্রামে কি করেন?" আবার উত্তর—"এমন কিছু নয়, একটা সামান্য কাজ করি।" কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন—"কি কাজ?" উত্তর—

"চট্টগ্রামের কমিশনরের পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট।" এবার উত্তর শুনিয়া তিনি যেন স্তম্ভিত হইলেন। আবার বহুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার নাম জানিতে পারি কি?" উত্তর—"নবীনচন্দ্র সেন।" তিনি এবার যেন আরও স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন—"আপনার নাম যেন আমি শুনিয়াছি।" আমি বলিলাম—"আমার মত সামান্য লোকের নাম আপনি কি প্রকারে শুনিলেন?" তিনি আবার বহুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন—"আমি আপনার নাম যেন কি একখানি বহি সম্বন্ধে শুনিয়াছি। আপনি কি 'পলাশীর যুদ্ধে'র কবি নবীনবাবু?" উত্তর—"লোকে তাহা বলে।" তিনি মহা আনন্দের সহিত উঠিয়া আমার সঙ্গে 'সেকহ্যান্ড' করিলেন, এবং ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন যে, তিনি আমাকে আমার চেহারা দেখিয়া একজন কলেজের ছাত্র মনে করিয়াছিলেন। আমি হাসিয়া বলিলাম, ক্ষমা চাহিবার কারণ কিছুই নাই। তবে আমি কলেজ ছাড়িয়াছি নয় বৎসর। তখন দুজনের মধ্যে বেশ একটুক আলাপ চলিল, এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে জানিলাম যে, তিনি 'শীলদের ফ্রি কলেজে'র খ্যাতনামা প্রিন্সিপাল যদুবাবু। তিনি আমাকে এতই আদর করিতে লাগিলেন যে, ট্রেণ শিয়ালদহ পহুঁছিলে, আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমার দাদা আমার প্রতীক্ষায় আছেন বলিয়া, অনেক চেষ্টায় তাঁহার হাত ছাড়াইয়া ভবানীপুরে গেলাম।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদিন ভবানীপুর আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঈশান দেখিতে যেমন সুন্দর, তাহার হৃদয়ও তেমন সুন্দর। প্রথম দর্শনেই দুজনের মধ্যে পরম বন্ধুতা হইল। ঈশান বলিল, সে আমার কবিতার পক্ষপাতী, এবং আমার কবিতা অনুকরণ করা তাহার আকাঙ্ক্ষা। তাহার অনেক কবিতা পড়িয়া শুনাইল। ঈশান সে হইতে প্রায়ই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত। একদিন বলিল, হেমবাবু আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। আমারও তাঁহাকে দেখিবার বড় সাধ। অতএব একদিন সায়াহ্নে ঈশান আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার খিদিরপুর পদ্মপুকুর বাটীতে লইয়া গেল। একটি সুন্দর সরোবরতীরে, সুন্দর দ্বিতল চকমিলান বাড়ী। তাঁহার বৈঠকখানা-কক্ষটি বেশ বিস্তৃত। তাহার এক প্রান্তে একটা পর্দার আড়ালে তাঁহার আফিস কক্ষ। তিনি তখন সেখানে ছিলেন। সে কক্ষে একটা আফিস-টেবিল, খান দুই চেয়ার, ও একটা মক্কেল বসিবার বেঞ্চ। হেমবাবুও ঈশানের মত গৌরাঙ্গ, স্থূল খর্ব্বাকৃতি; জ্ঞানোজ্জ্বল দুই আয়ত লোচন। তিনি আমাকে খুব আদর করিলেন। জলযোগ করাইলেন। তাহার পর তাঁহার কক্ষে লইয়া গেলেন। ফরাস বিছানায় কয়েকটা তাকিয়া, দেয়ালে কয়েকখানি ছবি ও দেয়ালগিরি, ছাদে ঝাড় ও টানাপাখা। তিনি বলিলেন, সেই দিনই তাঁহার 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় ভাগ প্রেস হইতে আসিয়াছে। তাহার স্থানে স্থানে আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি সুর করিয়া পড়িলেন; আমার হাসি পাইতেছিল। পড়া শেষ হইলে, আমার কেমন লাগিল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, আমি তাঁহার ছাত্রস্থানীয়। কলেজে তাঁহার 'চিন্তাতরঙ্গিণী' আমার পাঠ্য ছিল। অতএব তাঁহার বহির সমালোচনা করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে একটা কথা বলিতে পারি। বৃত্রাসুর মরিল কি বাঁচিল, আমাদের তাহাতে কিছু যায় আসে না। আমার মতে এ সকল পৌরাণিক উপাখ্যান ছাড়িয়া, তিনি ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া যদি তাঁহার শক্তি সঞ্চালন করিয়া কাব্য লেখেন, তবে লোকের হৃদয় অধিক স্পর্শ করিবে। অসুরের সহিত মানুষের সহানুভূতি হয় না। তিনি কিঞ্চিৎ দুঃখের সহিত বলিলেন—"পৌরাণিক উপাখ্যান সকলেই জানে। তথাপি 'বৃত্রসংহারে'র প্রথম ভাগ কিছুই কাটিল না। ভারতের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া লিখিলে কি আর কেহ তাহা পড়িবে?" আমি বলিলাম, এ উত্তর তাঁহার মুখে প্রত্যাশা করি নাই।

তাঁহার মত প্রতিভাশালী লেখক কোথায় লোকের রুচি সৃষ্টি করিবেন, তাহা না করিয়া কি তিনি লোকে যাহা চাহে কেবল তাহাই লিখিবেন? তাহা হইলে 'দাশু রায়ের পাঁচালি' লিখেন না কেন? প্রত্যেক দোকানদার উহা পড়িবে। আমার মতে কলিকাতাবাসী হওয়া তাঁহার একটা দুর্ভাগ্যের কথা হইয়াছে। কলিকাতায় যাহা একটা হুজুগ উঠে, তিনি তাহাই লেখেন। তাহাতে তাঁহার শক্তির অপচয় হয়। তিনি বলিলেন, তাঁহার লেখা শেষ হইয়াছে। ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া আমাকে লিখিতে হইবে। আমার মত ভাষার উপর তাঁহার অধিকার নাই। আমার ভাষা যেন জলের মত বহিয়া যায়। আর তাঁহার এরূপ কষ্টে লেখা যে, তাঁহার হস্তলিপি দেখিলে আমি পড়িতে পারিব না, উহা এত কাটা। আমি বলিলাম, সে কথা ঠিক। আমার জন্মস্থান চট্টগ্রাম, বাঙ্গালা একরূপ আমার মাতৃভাষা নহে বলিলেও চলে। তাঁহার জন্মস্থান নিজ কলিকাতা। অতএব তাঁহার অপেক্ষা আমার বাঙ্গালা ভাষার উপর অধিক অধিকার হইবারই কথা! আর তাঁহার হস্তলিপি কাটা হইবারই কথা। তিনি যাহা লেখেন, তাহা তাঁহার বন্ধু বঙ্কিমবাবু, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়েরা সমালোচনা করিয়া কাটান। আমার লেখা কাটাইবে কে? আমি দেশের নিভৃত স্থানে বসিয়া লিখি। সেখানে সাহিত্যের 'স'ও কাহারও মুখে নাই। লিখি আমি, পড়েন ও সমালোচনা করেন স্ত্রী, তাহার পর ছাপিতে যায়। অতএব আমার হস্তলিপিতে একটা শব্দও কাটা নাই। তিনি তাহার পর বলিলেন, তাঁহার অপেক্ষা আমার লিখিবার অবসর অনেক বেশি। তিনি মোটে লিখিবার সময় পান না। আমি বলিলাম, সে কথাও ঠিক। হাইকোর্ট বৎসরে প্রায় ছয় মাস বন্ধ। আর আমি তিন বৎসর হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর পীড়িত হইয়া, মেডিকাল সার্টিফিকেট দিলে তবে তিন মাস ছুটি পাই! তিনি এবার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"আপনি আমাদের ব্যবসার দুর্গতি জানেন না। আপনারা মাস শেষ হইলেই একটা নির্দিষ্ট বেতন পান, অতএব কোনও ভাবনা থাকে না। আর আমাদের যে দিন মক্কেল জুটিল, সে দিন নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাই না। আর যে দিন না জুটিল, সে দিন হাহাকার করিয়া কাটাইতে হয়। বন্ধের সময়ও সে ভাবে যায়।" আমি এবার হাসিয়া বলিলাম—"এ বিচার মন্দ নহে। আপনি একজন হাইকোর্টের প্রথম শ্রেণীর উকিল। মাসে দুই তিনহাজার টাকা পান। আর আমি সমস্ত মাস খাটিয়া পাই তিনশত টাকা। অতএব আমার অপেক্ষা আপনার হাহাকারটা বেশী হইবার কথাই বটে!" বিদায় হইয়া আসিবার সময় ঈশান হাসিতে হাসিতে বলিল—"তুমি দাদাকে বড়ই অপ্রস্তুত করিয়াছ। কিন্তু উনি যাহা বলিলেন, সকল কথাই ঠিক।" আমি বলিলাম—"ঈশান, জগতে বুঝি তৃপ্ত একটা জিনিস নাই। প্রত্যেক গোলাপেরই কাঁটা আছে।"

শুনিয়াছিলাম, হেমবাবুর বিশেষ অনুরোধেও বঙ্কিমবাবু 'বৃত্রসংহারে'র দ্বিতীয় ভাগের সমালোচনা করেন নাই। সঞ্জীববাবুই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' উহার এক অতিরিক্ত প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ করেন। উহাতে 'বৃত্রসংহারে'র সাহিত্যিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বশেষ 'বঙ্গদর্শনে'র ঘটকালিতে দর্শন-বিজ্ঞানের 'বৈবাহিক'—কত প্রশংসাই ছিল। কিন্তু তাহাতেও সমালোচকের তৃপ্তি হইল না। সর্ব্বশেষ লিখিলেন, 'বৃত্রসংহার' এক শ্রেণীর কাব্য, 'পলাশীর যুদ্ধ' আর এক শ্রেণীর কাব্য। তবে 'বৃত্রসংহার' 'পলাশীর যুদ্ধ' অপেক্ষা ভাল!! কেহ কেহ বলিলেন, এটি 'বান্ধবে'র 'পলাশীর যুদ্ধে'র সমালোচনার উত্তর।

জ্যোৎস্না ও মেঘ

ভবানীপুরে দাদার বাসায় পঁহুছিয়া আমার সেই স্ত্রী বন্ধুটির কোন আত্মীয় হইতে এক নিমন্ত্রণপত্র পাইলাম। আমি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার কাছে পত্র লিখিয়াছিলাম, সে পত্র পাইয়া তিনি আত্মীয়ের দ্বারা নিমন্ত্রণপত্র পাঠাইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেও তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড় অনুগ্রহ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার দশ বৎসর পূর্ব্বে একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি, তাঁহার পিতা ও মাতা, আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়াছিলেন। এমন কি, আমি তাঁহার পিতাকে আমার পিতৃতুল্য এবং মাতাকে মাতৃতুল্য শ্রদ্ধা করিতাম। আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে বড়ই বন্ধুতা হইয়াছিল এবং তাঁহার ও আমার স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ ভালবাসা হইয়াছিল। কিন্তু দশ বৎসর তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। অতএব পত্রখানি পাইয়া মনে বড় আনন্দ হইল। আমি তাঁহাদের বাড়ী যাত্রা করিলাম। তাঁহারা কলিকাতা হইতে কোন দূরবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার সময় উহা কোন বাঙ্গালীর বাড়ী বলিয়া আমার বোধ হইল না। আমার মনে সন্দেহ হইল, গাড়োয়ান ভুল করিয়া কোন ইংরাজের বাড়ী লইয়া যাইতেছে।

অতি সুন্দর বাড়ী, এবং চারিদিকে সুন্দর প্রশস্ত উদ্যান। একটি গবাক্ষ হইতে ঠিক মেমের মত একখানি মুখ দেখা যাইতেছিল। তাহাতে আমার ভ্রম আরও দৃঢ়তর হইল। গাড়ী হইতে নামিল দেখিলাম, একটি সুসজ্জিত 'হল' (Hall)। ঠিক যেন ইংরাজের 'ড্রইঙ্গ রুম'। আমি প্রবেশ করিতে শঙ্কা করিতেছিলাম। এমন সময় একটি রমণী ও দুই তিনটি বালক বালিকা আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া কক্ষে প্রবেশ করাইলেন। সে রমণীর মুখই আমি গবাক্ষে দেখিয়াছিলাম। এবং তিনি আমার পরিচিতা বন্ধু। তাঁহাদের বাড়ীতে এক, কি দুইদিন ছিলাম, এবং কি যে স্বর্গীয় আদর পাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ হইলে এখনও চক্ষে জল আসে। তাঁহাদের স্নেহের দুটি দৃষ্টান্ত দিব। পরদিন প্রাতে তাঁহার লিখিবার টেবিলের কাছে বসিয়া সকলে গল্প করিতেছি, দেখিলাম— নিকটে প্রাচীরে একটি চিঠির ফাইল ঝুলান রহিয়াছে। আমি ফাইলটি লইয়া দেখিলাম, তাহাতে বহু লোকের পত্র আছে, কিন্তু আমার কোন পত্র নাই। তাঁহার একজন আত্মীয় হাসিয়া বলিলেন—"দেখিলেন, ইঁহার কেমন অন্যায়! এত লোকের পত্র রাখিয়াছেন, আপনার একখানিও পত্র রাখেন নাই।" তাঁহারা দুজনে হাসিতে লাগিলেন। আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম যে, আমি পত্র লিখিয়াছি বা কই? আর রাখিবার যোগ্য কোনও পত্র ত আমি লিখি নাই, তিনি রাখিবেন কি? রাখিবেনই বা কেন? তাহার পর দুপুরবেলা খাইয়া শুইয়া আছি, তিনি হাতীর দাঁতের অতি সুন্দর একটি ক্ষুদ্র বাক্স লইয়া আসিয়া পাশে একটি কুসনযুক্ত টুলে বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি আমাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছেন, তাহা দেখিতে চাহেন কি?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম— "কৈ, তুমি ত আমার কোনও পত্র রাখ নাই?" তিনি তখন বাক্স খুলিয়া একখানি সাটিনের রুমালে বাঁধা কতকগুলি পত্র বাহির করিলেন। দেখিলাম, আমারই পত্র। লেফেফাগুলি পর্য্যন্ত এরূপভাবে খুলিয়াছেন যে, লেফেফার উপরের লেখা একটি অক্ষর পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। তিনি বলিলেন, একটি অক্ষর ছিঁড়িতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হয়। তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর তাঁহার মাতা আমার জন্য এক দিন নানারূপ জলখাবার পাঠাইয়াছিলেন। উহা পাইয়া সামান্য কাগজে পেন্সিলের লেখা যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তিনি তাহা দেখাইয়া বলিলেন—"এটি আপনার প্রথম পত্র।" এরূপে সমস্ত পত্রগুলি ক্রমান্বয়ে নম্বর দিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছেন। এতাদৃশ নিঃস্বার্থ স্নেহের নিদর্শন দেখিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। এবং বলিলাম, আমি উহার সম্পূর্ণ অযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ, আমার চলিয়া আসিবার সময় হইয়াছে। তাঁহাদের কাছে বসিয়া বিদায়ের

কথা কহিতেছি, এমন সময়ে তিনি বারাণ্ডায় গিয়া আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখিলাম, একটি স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়াইয়া একটি শিশু কাঁদিতেছে। সে কাঁদিতেছে কেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে হাসিয়া বলিলেন—"আপনি উহাকে জিজ্ঞাসা করুন, বুঝিবেন—এ শিশু পর্য্যন্ত আপনাকে কত ভালবাসে।" আমি ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বুকে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"দাদা, তুমি চলিয়া যাইবে কেন? তুমি আর একটা দিন থাকিয়া যাও।" আমি তাহাকে বুকে লইয়া কক্ষের মধ্যে আসিলাম এবং তাহার স্নেহের উচ্ছ্বাসে সকলেই কাঁদিলাম।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আমার খুড়তত ভাই রমেশের পত্রে জানিলাম যে, কোন একজন উকিল কমিশনরকে বলিয়াছেন যে, চট্টগ্রামে যত কিছু আন্দোলন হইয়াছে এবং যাহার ফলে 'কালকূট' প্রভৃতি অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছে—বিশেষতঃ চা-বাগিচার মোকদ্দমা, সকলেরই মূলে আমি। অতএব বড় বিপদ্। রমেশ আমাকে শীঘ্র চট্টগ্রাম ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছে।

বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি জিদ করিয়া লিখিয়াছিলেন। কোনও সুহৃদ্ হুগলীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। নিমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল যে, বঙ্গের প্রধান উপন্যাসলেখক ও প্রধান কবিকে তিনি এক টেবিলে খাওয়াইয়া গৌরবান্বিত হইতে চাহেন। আমি উত্তরে লিখিয়াছিলাম যে, তাহা হইলে একা বঙ্কিমবাবুকে নিমন্ত্রণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। নৈহাটীর ঘাটে পঁহুছিয়া দেখিলাম যে, বংপুর কথামতে কোন লোক আমাকে পার করিয়া লইতে আসে নাই। তখন অগত্যা কি করিব! আমার সঙ্গে আমার একটি ভ্রাতৃপ্রতিম নবযুবক বন্ধু ছিলেন। তখন অগত্যা বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে গেলাম। তিনি বাড়ীর মধ্যে ছিলেন। সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন যে, তিনি এত সকালে বাড়ীর মধ্যে যান না, সে দিন তাঁহার স্ত্রীর অসুখ বলিয়া সকালে গিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, তাঁহার যখন অসুখ, তখন আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব। তিনি একটুক মৃদু হাসিয়া এবং মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন—"কেন? তোমার ঠানদিদির সঙ্গে তোমার কিছু প্রয়োজন আছে কি যে, তাঁহার অসুখ শুনিয়া তুমি চলিয়া যাইবে?" আমি অপ্রতিভ হইলাম। তখন তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া, আমাকে টানিয়া লইয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন। সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার পরিচয় পাইয়া বলিয়াছিলেন—"এ ছেলেটি নিশ্চয় বড়লোক হইবে।" তিনি বাস্তবিকই আজ বাঙ্গালার একজন শীর্ষস্থানীয় লোক। আর একটি সন্ধ্যা কি আনন্দে কাটাইলাম, বলিতে পারি না। সে সন্ধ্যায় তিনি কথায় কথায় বলিলেন যে, আমার যেরূপ জ্বলন্ত উৎসাহ, আমি তাঁহার কাছে থাকিলে তাঁহার জড়ভরত অবস্থা ঘুচিয়া, তাঁহার হৃদয়েও কিঞ্চিৎ উৎসাহ সঞ্চারিত হইবে। আমি বলিলাম, আমার মত ক্ষুদ্র জীবের সংস্পর্শে তাঁহার কোন উপকার হইবে না, তবে আমি একটি মানুষ হইতে পারিব। তখন হুগলী বদলি হইবার চেষ্টা করিতে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়া, হুগলীর কমিশনর কক্‌রেল (Cockrell) সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। স্মিথ সাহেব চট্টগ্রাম হইতে যশোহর গিয়া আমাকে নড়াল এষ্টেটের ম্যানেজার মনোনীত করিয়াছিলেন। কক্‌রেল সাহেব আমাকে সে পদ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং আমার পরিচিত একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সাতক্ষীরায় ম্যানেজারিতে যে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। আমি সে সুযোগ পাইয়া হুগলী বদলির প্রার্থনা করিলাম। আমার কমিশনরের আমি অনুমতি পাইলে, বদলি করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। আমি চট্টগ্রাম ফিরিলাম, এবং তখনই কমিশনরের কাছে এ কথা বলিলাম। লাউইস্ সাহেব শুনিয়া, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞসা করিলেন—

"চট্টগ্রামে তোমার বাড়ী, অতএব চট্টগ্রাম ছাড়িয়া কেন যাইতে চাহিতেছ?" আমি শরীরের অসুস্থতাই কারণ বলিলাম। তখন তিনি বলিলেন যে, সাইক্লোনের (cyclone) শেষ রিপোর্ট আমার জন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সেরেস্তাদার পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট যে মুসাবিদা (draft) করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সেই রিপোর্ট এবং বাৎসরিক রিপোর্ট (Administration Report) সকল গেলে, তিনি আমাকে ছাড়িতে পারিবেন কি না, বিবেচনা করিবেন। তখন বুঝিলাম, উকিল পৃষ্ঠদংশকের বিষ বড় একটা লাগে নাই।

তাহার কিছুদিন পরে চট্টগ্রামের কষ্টম্ কলেক্টর (Custom Collector) মার্সেল সাহেবের উপর একটি নীচ মুসলমানের পৃষ্ঠদংশনে (চুকলিখুরিতে) কমিশনর অকস্মাৎ ভয়ানক চটেন এবং তাহার প্রতি ঘোরতর উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। বৃদ্ধ সাহেব আমার বড় বন্ধু ছিলেন। আমি অনেক সন্ধ্যা তাঁহার বাড়ীতে কাটাইতাম এবং সে সময় তাঁহার কৈফিয়ৎ ইত্যাদি লিখিয়া দিতাম। তিনি হঠাৎ মরিয়া যান, এবং এই উৎপীড়নে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া 'ইন্ডিয়ান ডেলি নিউজে' একটি করুণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইংরাজ মহলে তাহা লইয়া একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য, সে প্রবন্ধ আমার লেখা ছিল। একদিন কমিশনর এ প্রবন্ধ আমার লেখা কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আরও বলিলেন যে, চট্টগ্রামে যত আন্দোলন হইয়াছে, তাহার কারণ আমি, এবং চা বাগানের মোকদ্দমাও আমি চালাইয়াছি, তিনি এরূপ শুনিয়াছেন। আমি কোনও উত্তর না দিয়া, কে তাঁহাকে এরূপ বলিয়াছে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, সেই উকিল ব্যাঙ্কের সাহেবকে এরূপ বলিয়াছে। তখন চট্টগ্রামে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একটি শাখা খুলিয়াছিল। সেই উকিলকে আমার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ মোকাবিলা করিয়া এ কথার পরীক্ষা করিতে আমি প্রার্থনা করিলাম। উকিল মহাশয় বহুদিন হইতে আমার এরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। জজ ফিল্ড সাহেবের কাছে তিনি যে আমার প্রতিকূলে সেই গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলাম। কমিশনর বলিলেন, তিনি ব্যাঙ্কের সাহেবের দ্বারা উকিল-পুঙ্গবকে সংবাদ দিবেন। সে অবধি কমিশনরকে রোজ একবার সে কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। তিনি কয়েক দিন সংবাদ দিতে মনে নাই বলিলেন। আর একদিন বলিলেন যে, উকিল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন, এবং মিথ্যুক সাব্যস্ত হইয়াছেন। আমি দেখিলাম, কমিশনর যদিও মুখে এরূপ বলিলেন, তথাপি উপর্যুপরি পৃষ্ঠদংশনে তাঁহার হৃদয়ে মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছে। এই মেঘ ক্রমে মহাঝড়ে পরিণত হয়। সে কথা পরে বলিতেছি। আমি উকিল মহাশয়ের কখনও কোনও অনিষ্ট করি নাই। আমার প্রতি তাঁহার হিংসার একমাত্র কারণ—আমার বংশ উচ্চ, পদ উচ্চ, এবং তাঁহার অপেক্ষা দেশের গৌরব ও সম্মান উচ্চ। কেবল এ অপরাধেই তিনি আমার সর্ব্বনাশের এই সূত্রপাত করেন।

আত্মবিসর্জ্জন

আমার কোনও পিতৃব্য চট্টগ্রামের সুদূর প্রান্তে এক জমিদারি কিনিয়া, জনৈক তালুকদারের সঙ্গে যে ঘোরতর মোকদ্দমা-যুদ্ধে পড়িয়াছিলেন, এবং আমার পিতা, তাঁহাকে রক্ষা করিতে গিয়া যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পিতৃব্য সমস্ত মোকদ্দমার জয়ী হইয়া, সে তালুকদারের ভিটায় এক ক্ষুদ্র পুষ্করিণী কাটিয়া, এবং তাহার পাড়ে তুলসী রোপণ করিয়া তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরেই আবার সমস্ত জমিদারির তালুক করিয়া তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জিদ, পরোপকারিতা, এবং কুটুম্ব-বাৎসল্যের কথা এখনও চট্টগ্রামে প্রবাদের মত

প্রচলিত। তিনি এ মোকদ্দমায় কিছু ঋণগ্রস্ত হন, এবং সে জন্য খাস তহসিলদারের পদ গ্রহণ করেন। ইহাতে লাভের মধ্যে তাঁহার এই হইয়াছিল যে, তিনি একশত টাকা বেতন পাইতেন, এবং প্রত্যেক মাসে তাঁহার জমিদারি হইতে দুই তিনশত টাকা লইয়া তাঁহার কর্ম্মস্থানে খরচ করিতেন। এক দিকে তাঁহার ঋণ বাড়িতেছিল, অন্য দিকে দূর স্থানে গিয়া থাকা নিবন্ধন, তাঁহার নিজের জমিদারির শাসন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছিল। এ কারণে আমি ডেপুটি কলেক্টর অবস্থায় খাসমহলের ভার পাইয়া, তাঁহাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিবার জন্য যথেষ্ট জিদ করিয়াছিলাম, এবং তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত পর্য্যন্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার উচ্চ বংশ-গৌরবে ও চরিত্র-গৌরবে ক্লে সাহেব তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিতেন যে, আমি কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। আমি পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট হইলে মিঃ ভিজি রিপোর্ট করিলেন যে, তাঁহার কোন হুকুমই তহসিলদার গ্রাহ্য করেন না, এবং 'মাসকাবার' পর্য্যন্ত দেন না। কথাটা ঠিক। তিনি সমস্ত দিন প্রজাদের লইয়া একটা প্রকাণ্ড দরবার করিতেন, এবং পুরুষানুক্রমিক জমিদারের মত তাহাদের গৃহ-বিবাদ এবং মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদি মিটাইয়া দিতেন। অতএব কলেক্টরের হুকুমই বা তামিল করে কে, এবং 'মাসকাবার'ই বা দেয় কে? আমি এ সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে কমিশনরের দ্বারা সস্পেন্ড করাইলাম, এবং কমিশনরের আফিসের আমার অধীনস্থ একজন কেরাণীকে সে কাজে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলাম। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে পিতৃব্য মহাশয় যে প্রকৃতির লোক, তিনি যে কাগজপত্র ঠিকমতে রাখিয়াছেন, আমি বিশ্বাস করি না। অতএব কেরাণী যেন তাঁহার কার্য্যভার খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া লন, এবং কোনও কাগজ প্রস্তুত না থাকিলে তাহা প্রস্তুত করাইয়া লন। তিনি বলিলেন, তিনি পিতৃব্যকে দেবতার মত জানেন। কাগজপত্র না থাকিলেও তিনি প্রস্তুত করাইয়া লইবেন। তিনি কিছু দিন পরে কার্য্যভার লইয়া সহরে ফিরিয়া আসেন, এবং কলেক্টরির কোনও উচ্চ কর্ম্মচারীর সঙ্গে,—ইনি আমারও একজন বিশিষ্ট বন্ধু— আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কাগজপত্র ঠিক পাইয়াছেন কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সকলই ঠিক পাইয়াছেন। তবে দুই একটি কাগজ বোধহয়, পূর্ব্বে প্রস্তুত ছিল না, সম্প্রতি প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বলিলাম, তাহা খুব সম্ভব। কিন্তু তাঁহার কথায় যেন তাঁহাদের মধ্যে কিছু মনোমালিন্য হইয়াছে বোধ হইল। আমি শুনিয়াছিলাম, একটি রমণী এ মনান্তরের কারণ। এইরূপ সন্দেহ হওয়াতে আমি উক্ত বন্ধু মহাশয়কে আমার পার্শ্বের কক্ষে লইয়া উক্ত মনান্তরের কথা সত্য কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা দুজনে পরম বন্ধু। ঐ কেরাণী তাঁহারই বাসায় থাকিত। দেশের লোক তাঁহাদের রূপ দেখিয়া তাঁহাদিগকে 'নন্দি ভৃঙ্গি' বলিত। তিনি বলিলেন যে, তিনিও সেরূপ শুনিয়াছেন, কেরাণীর ভাবে তাহা সত্য বলিয়া তাঁহার বোধ হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে, যাহাতে কেরাণী এ কারণে হিংসাবশতঃ পিতৃব্যের অনিষ্ট না করেন, তিনি তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবেন।

তাহার কয়েক মাস পরে একদিন আফিসে তিনি আমাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নবাগত কলেক্টর পিতৃব্যের প্রতিকূলে দুইটি পরিষ্কার রাজস্ব অপব্যয়ের মোকদ্দমা পাঠাইবার জন্য সব-ডেপুটির প্রতি আদেশ করিয়াছেন। কেরাণী ইতিমধ্যে আমারই সাহায্যে তহসিলদারের পদে সব-ডেপুটিরূপে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন। বন্ধুপ্রবর আরও লিখিয়াছিলেন যে, সব-ডেপুটির মনের ভাব পিতৃব্যের প্রতি ভাল নহে, অতএব তাঁহার ও আমার সব-ডেপুটিকে লেখা উচিত, যেন তিনি বিদ্বেষবশতঃ পিতৃব্যের প্রতিকূলে এরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত না করেন। অক্টোবর মাসে 'সাইক্লোন' হইয়া গিয়াছে। আমি সে 'সাইক্লোনে'র কার্য্যে বড় ব্যস্ত ছিলাম। একটি 'ডেমি অফিসিয়াল' কাগজ লইয়া এরূপ একখানি পত্র লিখিলাম—

"My dear * * * *,

I understand you have been directed by Mr. * * * * to send up two clear cases of embezzlement against * * * * Babu. Whatever may be the state of his papers, I hope you will admit that he is incapable of a thing like that. Fortune has already turned her wheel against him, and there is no use chasing a man who has a down-hill descent.

Yours Sincerely,
N. C. Sen.

P. S. The matter would drop if you simply report that no such cases are forthcoming and that any such charge would be hard to prove.

প্রিয়——

আমি শুনিতে পাইলাম, * * বাবুর বিরুদ্ধে দুইটি তহবিল তস্‌রুপের পরিষ্কার মোকদ্দমা পাঠাইবার জন্য মিঃ * * * * তোমাকে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহার কাগজের অবস্থা যাহাই হউক, আমি ভরসা করি, তুমি স্বীকার করিবে যে, তিনি এরূপ কার্য্য করিতে অক্ষম। অদৃষ্টচক্র ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার প্রতিকূলে আবর্ত্তিত হইয়াছে। পর্ব্বত হইতে যে পতিত হইতেছে, তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। তোমার সরল ভাবের,

এন্. সি. সেন।

পুঃ যদি তুমি রিপোর্ট কর যে, এরূপ পরিষ্কার মোকদ্দমা পাওয়া যাইতেছে না, এবং এরূপ মোকদ্দমা প্রমাণ করা বড় কঠিন হইবে, তবে এ বিষয়ের শেষ হইবে।

পত্রখানি লিখিয়া আমি বন্ধু মহাশয়ের কাছে প্রেরণ করিলাম, এবং তিনিও সেরূপ অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পত্রখানি আমাকে দেখিবার জন্য পাঠাইলেন। তাহার পর উহা ডাকে সব-ডেপুটির কাছে প্রেরিত হইল। তাহার পর শীতের শেষ ভাগে আমি ছুটি লইয়া কলিকাতা যাই, এবং ফিরিয়া আসিয়া লাউইস্ সাহেবের অনুরোধমতে সাল-তামামির কার্য্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত হুগলীতে বদলি হওয়ার প্রস্তাব স্থগিত রাখি। ইহার অব্যবহিত পরে একদিন আফিসে শুনিয়া বজ্রাহত হইলাম যে, পিতৃব্যের নামে এত মাস পরে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া, গ্রেফ্‌তারির ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। কথাটা সত্য কি না, উক্ত বন্ধু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে, তিনি নিজে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, এবং বলিলেন যে, তিনিও জনরব শুনিতেছেন মাত্র, তাহার বেশী আর কিছুই জানেন না। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, যখন ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে, তখন অবশ্য কাগজপত্র কোর্টে দেওয়া হইয়াছে। অতএব অভিযোগটা কি, তিনি যেন দেখিয়া আমাকে জানান। তিনি চলিয়া গেলেন। আমি প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিলাম। তাহার পর আরদালি পাঠাইলে কলেক্টরের দ্বিতীয় কেরাণী লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বন্ধু মহাশয় জ্বর হইয়া বাসায় চলিয়া গিয়াছেন। তখন অভিযোগটা কি, দ্বিতীয় কেরাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, কাগজপত্র কলেক্টর বন্ধু মহাশয়ের হাতে হাতে দিয়াছেন, এবং তিনি উহা ডেস্কের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তখন আমার আর বুঝিবার বাকি রহিল না যে, এ ষড়যন্ত্রে তিনিও আছেন। অথচ বড় বিস্মিত হইলাম ; কারণ, তাঁহাকে পিতৃব্যেরও একজন বন্ধু বলিয়া জানিতাম।

পিতৃব্য সে সময় কাশীতে বসিয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিবার জন্য আমি তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিলাম, এবং মিঃ মনোমোহন ঘোষ অন্য মোকদ্দমায় নিয়োজিত বলিয়া টেলিগ্রাফ করিলে, ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসুকে টেলিগ্রাফ দ্বারা নিয়োজিত করিলাম।

পিতৃব্য আসিবামাত্র মাজিস্ট্রেট তাঁহাকে হাজত দিলেন। তাঁহার প্রাতকূলে কি অভিযোগ, তাহার নকল চাহিলে নকল পর্য্যন্ত দিলেন না। বলিলেন, অভিযোগ এখনও স্থির হয় নাই। জজের কাছে 'মোসন' করিয়া, এক রাত্রি হাজতবাসের পর তাঁহাকে উদ্ধার লাভ করাইলাম।

তখন তিনি আমাকে সাবধান করিয়া বলিলেন যে, এ ষড়যন্ত্রের মূলে সেই বন্ধু মহাশয়। অতএব তাঁহাকে যেন কোন কথা না বলি। তখন আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার প্রতিকূলতাব কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, উক্ত বন্ধু মহাশয় তাঁহারও বন্ধু বলিয়া, তাঁহার কাছে সময় সময় বায়ু ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত যাইতেন। সে সময়ে একবার দু হাজার 'আড়ি' ধান লইয়া আসেন। এতকাল তাহার মূল্য পিতৃব্য লন নাই। সস্‌পেন্ড হইবার পর গলা টিপিয়া সে টাকা উশুল করিয়াছেন। ইহাই এই মোকদ্দমার প্রধান কারণ।

মোকদ্দমার নিরূপিত দিবসে আনন্দমোহন আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন দেখা গেল যে, সব-ডেপুটি দুই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। একটির বিচারের ভার জইণ্ট মাজিস্ট্রেট রেডককের উপর, এবং অন্যটির জনৈক ইয়োরোপিয়ান ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রথম মোকদ্দমাটি অতি অদ্ভুত। উক্ত তহসিল সমুদ্রগর্ভস্থ দ্বীপ। সেখান হইতে টাকা পাঠাইতে সকল সময়ে, বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে নৌকা পাওয়া যায় না। অতএব যে সকল টাকা এ কারণে পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে, বিচক্ষণ সব-ডেপুটি তাহার মোট করিয়া পিতৃব্যের প্রতিকূলে চল্লিশ হাজার, কি পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহার জবানবন্দিতে যখন প্রকাশ হইল যে, ইহার প্রত্যেক পয়সা কালেক্টরিতে পরে দাখিল হইয়াছে, তখন কোর্টে একটা হাসির তুফান উঠিল, এবং এ অপূর্ব্ব তহবিল তসরূপের মোকদ্দমা জইণ্ট তৎক্ষণাৎ ডিস্‌মিস্ করিলেন। দ্বিতীয় মোকদ্দমায়ও সব-ডেপুটি দাখিলা জাল করিয়াছেন, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া ডিস্‌মিস্ হইল। ইহাতে আরও প্রমাণ হইয়াছিল, তিনি কোন নায়িকার প্রেমপিপাসায় অধীর হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রেম নিষ্কণ্টক হয় না। তহসিলদার মহাশয় সে প্রেমের পথে ভীষণ কণ্টক হইয়াছিলেন। এ কারণেই নিরাশ প্রেমিক এই দুই অপূর্ব্ব অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর একটি অভিসন্ধি এই ছিল যে, ইঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার কোন কারণ উদ্ভাবিত করিতে না পারিলে সব-ডেপুটি সে পদে পাকা হইতে পারেন না। সাক্ষীর বাক্সে তাঁহার অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তাঁহার সে শোভার একটা ফটোগ্রাফ বাহির হইয়াছিল। তিনি রূপে প্রকৃতই ভৃঙ্গি ঠাকুরের দ্বিতীয় সংস্করণ ছিলেন। তবে ভৃঙ্গি মহাশয়ের বর্ণ বুটের মত এমন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং তাঁহার দুই চক্ষুর দুই বিপরীত দিকে দৃষ্টি ছিল কি না সন্দেহ। তাঁহার বন্ধু কালেক্টরির উক্ত উচ্চ কর্ম্মচারী মহাশয়ও আকৃতিতে একটি জীবন্ত নন্দি। মাদল ও করতাল হাতে দিয়া এ উভয়কে দশভুজার উপরের কাঠামে তুলিয়া দিলে আর পুতুলের আবশ্যক হইত না। উপরোক্ত বিষয়ে ভৃঙ্গির উপর জেরা হইলে, তিনি সাক্ষীর বাক্সে দাঁড়াইয়াই অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। দর্শকেরা মনে করিয়াছিল যে, টেরা নয়নযুগল হইতে আলকাত্‌রা ঝরিতেছিল।

যাহা হউক, পিতৃব্য মুক্ত হইলেন : কিন্তু ভৃঙ্গি মহাশয় বড় একটা মুস্কিলে পড়িলেন। পিতৃব্য তাঁহার প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষীর মোকদ্দমা আনিবেন বলিয়া ধম্‌কাইতে লাগিলেন। তখন ভৃঙ্গি মহাশয় সাক্ষীর বাক্সে যে 'মাদল' বাজাইয়াছিলেন, তাহার জন্য ঘোরতর অনুশোচনা আরম্ভ করিলেন। আমি আফিস হইতে অশ্বপৃষ্ঠে ডাকবাঙ্গালায় আনন্দমোহনের কাছে যাইতেছি, ফৌজদারি কোর্টের সম্মুখে কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয় আসিয়া আমাকে গ্রেফ্‌তার করিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভৃঙ্গি মহাশয় * * *

বাবুরে ধমকে তাঁহার বসনে অকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি সকাল বেলা সমস্ত কাগজপত্র লইয়া আমার বাসায় গিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহার কোন দোষ নাই : কেবল কলেক্টরের তাড়নায় তিনি এ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। * * বাবু যদি মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমা না করেন, তবে তিনি * * বাবুর ও আমার পায়ের উপর পড়িয়া ক্ষমা চাহিবেন এবং আমার যে এক পত্র তিনি মোকদ্দমার সময় কলেক্টরের হাতে দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাহা তিনি শত খণ্ড করিয়া আমার সাক্ষাতে ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।"

এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে আমার সমস্ত ডেপুটি-জীবনের গতি অন্যরূপ হইত এবং এ জীবনের বহু বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইতাম। কিন্তু তখন নবযৌবন। শরীর ও মন উভয়ই তেজে ও উৎসাহে পূর্ণ, এবং নীচতার প্রতি ঘোরতর ঘৃণা। আমি গর্ব্বিতভাবে কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টরকে বলিলাম—"* * বাবু আমার পিতৃব্য। তাঁহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধারকরা আমার ধর্ম্মতঃ কর্ত্তব্য। তিনি মুক্ত হইয়াছেন, আমারও কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। অতএব তিনি যদি নরাধমকে ক্ষমা করেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু আমি এরূপ বিশ্বাস-ঘাতকের সংস্রবে আর আসিব না। আমি তাহাকে চাকরি দিয়াছি, আর সে আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিয়াছে! আমি তাহাকে কখনও যে কোন অন্যায় পত্র লিখিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। অতএব সে যদি এরূপ নীচতা করিয়া আমার পত্র কলেক্টরকে দিতে চাহে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।" আমি ঘোড়া ছুটাইয়া ডাকবাঙগালায় আনন্দমোহনের কাছে গেলাম। তিনি বলিলেন, ভৃঙ্গ তাঁহার কাছে গিয়াও এরূপ প্রস্তাব করিয়াছে, এবং আমাকে অনুরোধ করার জন্য তাঁহার হাতে পায়ে ধরিয়াছে।

অন্য দিকে এ মোকদ্দমা লইয়া সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছি এবং পিতৃব্যের দ্বারা এক আবেদন গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিয়াছি। ইতিমধ্যে চা-বাগানের মোকদ্দমার আন্দোলনে, এবং হাইকোর্টের বিচারের ফলে কালকূট প্রভৃতি ডিগ্রেড হইয়া স্থানান্তরিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট নূতন কলেক্টরের কাছে এরূপ দুটি অমূলক মোকদ্দমা উপস্থিত করার, এবং এরূপ উচ্চশ্রেণীর একজন জমিদারকে হাজতে দেওয়ার জন্য, কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। চট্টগ্রামে আবার একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল, এবং নব কলেক্টর একেবারে বসিয়া পড়িলেন। তখন আমার প্রতিকূলে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হইল। কলেক্টর নিরুপায় হইয়া আমাকে বলিদান দেওয়া স্থির করিলেন, এবং ভৃঙ্গ আমার যে এক পত্র তাহার আছে বলিয়া বলিয়াছিল সেই পত্র চাহিলেন। কিন্তু ভৃঙ্গ আমাকে বাঘের মত ভয় করিত। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তখন কমিশনরের সেরেস্তাদার মহাশয় তাহার সঙ্গে যোগদান করিলেন, তাঁহাকে আমি সহোদরের অধিক শ্রদ্ধা করিতাম। তাহার কারণ, তাঁহার এক ভ্রাতা আমার শিক্ষক ছিলেন এবং আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কমিশনর লাউইস্ তাঁহাকে দুচক্ষে দেখিতে পারিতেন না এবং সেরেস্তাদার বি. এল. পাশ করিবার পর হইতে আমাকে সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতেন যে, কবে তিনি ওকালতিতে যাইবেন। আমি সর্ব্বদা কমিশনরের মতের প্রতিবাদ করিতাম, এবং তাহা অপনয়ন করিবার জন্যই গতবার ছুটিতে জিদ করিয়া তাঁহাকে আমার স্থানে গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিয়া 'এক্‌টিং' নিযুক্ত করাইয়াছিলাম। ইহাতেই আমি আমার সর্ব্বনাশের আর একটি সূত্রপাত করি। তিনি বুঝিলেন যে, আমাকে কোনও রূপে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া বদলি, কি পদচ্যুত করিতে পারিলে, তিনি ও পদে স্থায়ী হইতে পারিবেন। তাঁহার প্ররোচনায় ভৃঙ্গ চিঠি কলেক্টরের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত হইল। কিন্তু সে চিঠিতে নন্দিরও লেখা ছিল বলিয়া, তিনি কলেক্টকে বলিলেন যে, চিঠি দাখিল করিলে নন্দিও বিপদে পড়িবেন। নন্দিকে রক্ষা করিবেন বলিয়া কলেক্টর প্রতিশ্রুত হইলে, ভৃঙ্গ পত্রখানি দাখিল করিয়া দিলেন। এই কলেক্টরই আমার বিরুদ্ধে দিল্লীদরবারের সময়ে কনেষ্টবলের দ্বারা সেই ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত করাইয়াছিলেন।

পিতৃব্যের মোকদ্দমার অব্যবহিত পরে আমি গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়ি। পীড়া এত গুরুতর যে, পনরদিন যাবৎ আমি আফিসে যাইতে পারি নাই। এমন কি, একদিন বুকের ব্যথা দেখিয়া সিভিল সার্জ্জন শ্বাস-যন্ত্রের পীড়া (Pleurisy) বলিয়া কবুল জবাব দিলেন যে, আর আমার জীবনের আশা নাই। বাড়ীতে রোদনের রোল উঠিল। আমি এক দিনরাত্রি সম্পূর্ণ অজ্ঞান ছিলাম। প্রিয় সুহৃদ্ তারাচরণ কবিরাজের চিকিৎসায় চৈতন্য মাত্র লাভ করিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ মাথায় বজ্রাঘাত হইল। ভৃত্য একখানি চিঠি আনিয়া হাতে দিল। খুলিয়া দেখিলাম, ভূঙ্গ মহাশয়ের কাছে পূর্ব্বপরিচ্ছেদে উদ্ধৃত যে পত্রখানি লিখিয়াছিলাম, কমিশনর তাহার স্বহস্তে এক নকল পাঠাইয়া, কেন আমার পিতৃব্যের অনুকূলে এইরূপ মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার ইঙ্গিত (suggest) করিয়া তাঁহার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট-পদের অপব্যবহার করিয়াছি, অবিলম্বে তাহার কৈফিয়ৎ চাহিয়াছেন। আমি বুঝিলাম, তিল তিল করিয়া উকিল মহাশয়ের চুকুলি হইতে যে মেঘ সঞ্চার হইতেছিল, তাহা হইতে মহাঝড় বহিতে আরম্ভ হইল। আমার এ মৃত্যুবৎ পীড়ার, এবং আফিস হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া, বুঝিলাম—কলেক্টর ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছেন, এবং তাঁহার রক্ষার জন্য আমার প্রতি এ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন। আমি আফিসে উপস্থিত থাকিলে পত্রখানি পাওয়া মাত্র কমিশনর নিশ্চয় আমাকে ডাকিতেন, এবং এ ব্রহ্মাস্ত্র আমি তখনই বায়বাস্ত্রে, অর্থাৎ দু কথায় উড়াইয়া দিতে পারিতাম। এই পীড়াই আমার সর্ব্বনাশের আর এক কারণ হইল।

পত্রখানি পাঠ করিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। আমার কথা কহিবার শক্তি নাই, অবিলম্বে কৈফিয়ৎ দিবে কে? বিশেষতঃ ভৃঙ্গের কাছে এরূপ যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার কিছুই মনে ছিল না। সে আমাকে তাহার একজন মরুব্বি বলিয়া জানিত। অতএব সময় সময় তাহাকে তাহার পত্রের উত্তরে অনেক পত্র লিখিয়াছিলাম। একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বন্ধুকে ডাকাইয়া, কমিশনরের এ পত্রের উত্তরে আমার পত্রখানির আসল দেখিতে চাহিলাম। কমিশনর একদিন পরে উত্তর দিলেন যে, তাহা দেখিতে দিবেন না। তিনি আবার অবিলম্বে কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি তখন উক্ত ডেপুটির দ্বারায় এই মাত্র কৈফিয়ৎ লিখাইয়া দিলাম যে, পত্রখানি দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা আমি (private) ব্যক্তিগত ভাবে লিখিয়াছি, (Official) কর্ম্মচারী ভাবে লিখি নাই। এ উত্তর পাইয়া সাহেবী বাঙ্গালী ষড়যন্ত্র আর এক পদ অগ্রসর হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে, আমাকে চট্টগ্রাম হইতে সরাইতে না পারিলে তাঁহাদের ষড়যন্ত্র সফল হইবে না। কারণ, চট্টগ্রামে আমার অসাধারণ ক্ষমতা। সকলে আমাকে শ্রদ্ধা ও ভয় করে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিবে না। অতএব Civil Surgeon সে দিন আসিয়া বলিলেন যে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি চট্টগ্রাম পরিত্যাগ না করিলে, তিনি আমার জীবনের জন্য দায়ী হইবেন না, এবং তখনই তিন মাসের ছুটির জন্য অযাচিত এক সার্টিফিকেট দয়া করিয়া লিখিয়া দিলেন। বাড়ীতে আবার রোদনের ধ্বনি উঠিল। আমি সেই মৃতবৎ অবস্থায় পাল্কি করিয়া আফিসে গেলাম। কমিশনর আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন যে, Civil Surgeon তাঁহাকে আমার অবস্থা বড় শোচনীয় বলিয়া বলিয়াছেন, এবং সেই সেরেস্তাদার মহাশয়কে আমার স্থানে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করিয়া, আমাকে তিন মাস ছুটি দেওয়ার জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন। আমি তখন তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি নিজে বদলি হইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম; তিনি জোর করিয়া রাখিলেন। এখন এ মড়ার উপর খাঁড়ার প্রহার করা কি তাঁহার উচিত? তাঁহাকে সংক্ষেপে উক্ত পত্রের ইতিহাস বলিলাম। তিনি উহা শুনিয়া বলিলেন যে, এরূপ অবস্থায় উহাতে আমার কিছুই অনিষ্ট হইবে না। তাহার জন্য চিন্তা না করিয়া, আমি যেন পরদিনের ষ্টীমারে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় চলিয়া যাই। আমি তখন বলিলাম, তবে আমার আর

লিখিত কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না? তিনি উত্তর করিলেন যে, এ বিষয় যখন তিনি গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, লিখিত কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। বুঝিলাম যে, ষড়যন্ত্র শেষ সীমায় পঁহুছিয়াছে। তখন আমি আহত ফণীর মত মস্তক তুলিয়া তীব্র ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম —"বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে নরাধম এরূপ একখানি বন্ধুতামূলক পত্র এতাদৃশ নীচ ভাবে অন্যকে দিতে পারে, কোন ইংরাজ কি এরূপ ঘৃণিত নীচাশয়ের প্রশ্রয় দিতে পারেন? আপনি আমার উপরিস্থ কর্ম্মচারী, আমি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াছি, সে সময় আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা না করিয়া, আমার প্রতিকূলে এরূপভাবে গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করা কি আপনার উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে? তিনবৎসর যাবৎ আপনি আমার কার্য্যের প্রশংসা করিয়া, অন্ধকারে আমার পৃষ্ঠে এরূপ ভাবে ছুরিকা প্রহার করা কি আপনার উচিত হইয়াছে?" এই তীব্র ভৎর্সনায় তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি অধোবদনে বলিলেন, তিনি কলেক্টরের প্ররোচনায় এরূপ করিয়াছেন এবং উহাতে আমার কোন ক্ষতি হইবে না। তাই বলিতেছিলাম, আমি আফিসে উপস্থিত থাকিলে এই ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম। আফিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া গেলে একবন্ধু আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, নন্দি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। তবে আমি অপমান করিব বলিয়া তিনি আমার বাটিতে আসিতে অনিচ্ছুক। আমি হাসিয়া বলিলাম যে, তিনি যদিও বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে এই ঘোরতর বিপদে ফেলিয়াছেন, তথাপি আমি এত নীচত্ব প্রাপ্ত হই নাই যে, একজন ভদ্রলোক আমার বাড়ীতে আসিলে তাহার অপমান করিব। যাহা হউক, আমাকে অনেক বলিয়া কহিয়া বন্ধু পাল্কি করিয়া তাঁহার নিজ বাসায় লইয়া গেলেন। নন্দি মহাশয় সেখানে পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে এই আলাপ হইল।

আমি। আমার স্মরণ হয়, এ পত্র তুমি ও আমি এক সঙ্গে লিখিয়াছিলাম। তোমার অংশও কি দাখিল হইয়াছে?

তিনি। হাঁ।

আমি। তবে তোমারও কি কৈফিয়ৎ তলব হইয়াছে?

তিনি। না। আমাকে রক্ষা করিবে বলিয়া ভৃঙ্গি কলেক্টরকে আগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল। অতএব আমার কৈফিয়ৎ তলব হয় নাই।

আমি। আমি তবে এখন এ পত্রের প্রকৃত ইতিহাস লিখিয়া তোমাকে সাক্ষী মান্য করিলে তুমি তদনুরূপ বলিবে ত?

তিনি। কলেক্টর সাহেব ইতিমধ্যেই আমার জবানবন্দি লইয়াছেন।

আমি। তুমি কি বলিয়াছ?

তিনি। আমার মনে নাই। কলেক্টর আমাকে এরূপ ধমকাইয়াছিলেন যে, আমি ভয়ে কি বলিয়াছিলাম, কিছুই জ্ঞান ছিল না।

আমি। তবে ত সবই ফুরাইয়াছে। তুমি আমার গলায় ছুরি দিয়া, আবার কি জন্য আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছ?

তিনি। ভৃঙ্গি বড় ভয় পাইয়াছে। সে তোমাকে বাঘের মত ভয় করে। সে বলিতেছে যে, তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমা উপস্থিত না করিলে এবং কলেক্টরের বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে যে (memorial) দরখাস্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার করিলে, সে কলেক্টরের দ্বারায় এ গোলমাল থামাইতে পারিবে, এবং তোমার ও * * বাবুর পায়ে পড়িয়া ক্ষমা চাহিবে।

ইহাতে সম্মত হইলেই হইত। কারণ, বাস্তবিক আমাদের কোন মোকদ্দমা উপস্থিত

করিবার বিশেষ বাসনা ছিল না। কিন্তু ভৃঙ্গির কথায় কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করি? বিশেষতঃ লোকটির বিশ্বাসঘাতকতায় আমি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম যে, আমি উত্তেজিত ভাবে বলিলাম—"ভগবান্ যাহা করেন করিবেন, আমি সে নরাধমের মুখ আর দেখিব না।"

পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া আমার এই বন্ধু অনুনয় বিনয় করিয়া, ভবুয়া হইতে চট্টগ্রাম বদলি হইতে জিদ করিয়াছিলেন। বুঝিলাম, আর ইনিই দুটি পূর্ব্ববঙ্গবাসীর এই ষড়যন্ত্রে পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছেন। পরদিবস প্রাতে কমিশনরের সেরেস্তাদার আমাকে বিদায় দিতে আসিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাকে আমি সহোদরের অধিক ভালবাসিতাম ও বিশ্বাস করিতাম। আমি তাহাকে বলিলাম—"আমার এ বিপদের সময় একটি বিশেষ সান্ত্বনার বিষয় এই যে, তুমি আমার স্থানে আবার একটিং হইয়াছ। এখানে যাহা হয়, তুমি আমাকে সর্ব্বদা জানাইও। তাহা হইলে আমার যথেষ্ট সাহায্য হইবে।" সে তদ্রূপই প্রতিশ্রুত হইল এবং বিদায়কালে আমি শিশুটির ন্যায় তাহার গলায় পড়িয়া কাঁদিলাম এবং সেও কাঁদিল। বিপদের বিষয় চিন্তা না করিয়া, আমার জীবনের চিন্তা করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিয়া, সে চলিয়া গেল। তখনই সেই বাঙ্গালী Executive Engineer আসিয়া বলিলেন—"তুমি যে এ লোকটাকে এত বিশ্বাস করিতেছ, ভাল করিতেছ না। উহার প্রতি আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। সে তোমার কাছে একরূপ বলে এবং তোমার অসাক্ষাতে তোমার ভবিষ্যৎ ঘোর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করে। সেদিন সে বলিতেছিল যে, তুমি কর্ম্মচ্যুত ত হইবেই, তাহা ছাড়া ফৌজদারীতেও অভিযুক্ত হইবে, এবং গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলিল যে, তুমি কর্ম্মচ্যুত হইলেও তোমার বহি দ্বারা সুখে জীবন কাটাইতে পারিবে। তখন সে হাসিয়া বলিল—"গবর্ণমেণ্ট বহি কি আর বেচিতে দিবে? তাহাও বন্ধ করিবে।" এই তৃতীয় বিশ্বাসঘাতকতার এবং কৃতঘ্নতার সংবাদ শুনিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। পূর্ব্বদিন আফিসেও তাহার একটি কথায় আমার কিছু সন্দেহ হইয়াছিল। আমি তাহাকে বলিলাম—"আজ যদি আমার নামের সঙ্গে তোমার মত বি, এল, দুটি অক্ষর থাকিত, আমি এই দুর্গতির চাকরী ছাড়িয়া দিতাম।" সে কট্ করিয়া উত্তর দিল—"সংসারেই এরূপ। তুমি আমার দুটি অক্ষর চাহ! আর আমি তোমার তিনশন টাকা চাহি।" তখন আমার বেতন তিনশত টাকা ছিল। যাহা হউক, আমি তাহাকে এত বিশ্বাস করিতাম যে, এনজিনিয়ারবাবুর কথাও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলাম—"আপনি উহাকে অন্যায় সন্দেহ করিতেছেন। সে জানে, আমি বড় উদ্ধত স্বভাবের লোক। পাছে এ বিপদকে উপেক্ষা করি, তাই আমাকে সতর্ক করিবার জন্য আপনাদের কাছে ইহার ফল এত কালো রঙ্গে চিত্রিত করিয়াছে।" যাহা হউক, সেদিন মধ্যাহ্নে ষ্টীমারে উঠিলাম। সম্মুখের গোলবাগানে বড় বড় উৎকৃষ্ট গোলাপ ফুটিয়া প্রাঙ্গণ আলো করিয়া রাখিয়াছে। স্ত্রী সে গোলাপের দিকে চাহিয়া চাহিয়া তত বড় চক্ষের ফোঁটা ফেলিতেছিলেন। কি জন্য কমিশনর ষ্টীমারে গিয়াছিলেন। তিনি আমার 'কেবিনে' গিয়া বড় স্নেহকণ্ঠে বলিলেন—"নবীন! তুমি তোমার কৈফিয়তের জন্য ভাবিও না। তুমি যাহাতে শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পার, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিও।" ষ্টীমার যথাসময়ে কলিকাতা পঁহুছিল। ষ্টীমার হইতে নামিয়া, দাদা অখিলবাবুর বাসায় গিয়া, আমার খুড়তত ভাই রমেশের এক টেলিগ্রাম পাইলাম,—আমার স্থলাভিষিক্ত মহাশয়কে যেন বিশ্বাস না করি, তাঁহার বাসায় নিত্য ষড়যন্ত্রের কমিটী বসিতেছে। মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। বুঝিলাম, বিশ্বাসঘাতকতার একটা ত্র্যহস্পর্শ যোগ হইয়াছে। নন্দি, ভৃঙ্গি ও এই ভুজঙ্গ, তিনজনই এই ষড়যন্ত্রের মূল মন্ত্রী। ভৃঙ্গির উদ্দেশ্য, পিতৃব্যের পদ স্থায়িভাবে লাভ। নন্দির উদ্দেশ্য, প্রতিহিংসা ও আত্মরক্ষা। এবং এই ভুজঙ্গের উদ্দেশ্য, আমার পদপ্রাপ্তি।

মানুষ যে এতদূর কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক হইতে পারে, এবং ইচ্ছা করিয়া উপকারের এরূপ প্রতিদান দিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ভুজঙ্গ ইহার পর আমাকে একখানি চিঠি মাত্র লিখিয়াছিল। তাহাতে এই অমূল্য সংবাদ মাত্র ছিল—কমিশনর সমস্ত বৃত্তান্ত রিপোর্ট করিয়াছেন।'

ঘোর গর্জ্জন

"When misfortunes come, they come not single, but in battalions."

ইংরাজ কবি বলিয়াছেন, বিপদ্ একা আসে না বিপদ্ যখন আসে, একটা সৈন্য লইয়া আসে। আমাদের দেশীয় কথায় বলে—'কানা চোকে কুটা পড়ে'। আমারও তাই হইল। একে ত জ্বরে ও শ্বাসযন্ত্রের রোগে মরণাপন্ন হইয়া কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তাহাতে কলিকাতা পঁহুছিবা মাত্রই পশ্চাৎদেশে এক ফোড়া হইল। ডাক্তার প্রায় ছয় আঙ্গুল কাটিয়া দিলেন। বসিবার সাধ্য নাই। প্রায় ১৫।২০ দিন উপুড় হইয়া শুইয়া রহিলাম। অথচ সে অবস্থাতেই বিলম্ব হইতেছে বলিয়া কৈফিয়ৎ লিখিতে হইল। কিঞ্চিৎ ভাল হইলে কৃষ্ণদাস পালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তিনি বলিলেন, কৈফিয়ৎ তিনি নিজে লিখিয়া দিবেন। এ সময় তাঁহার সমকক্ষ লেখক কলিকাতায় আর কেহ ছিল না। তাঁহার আদেশমতে একদিন সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলাম। তাঁহার হাঁটু পর্য্যন্ত পরিধান একমাত্র মোটা ধুতি। তাঁহার অপূর্ব্ব ফরাস বিছানায় স্থূল কৃষ্ণ দেহখানি প্রসারিত করিয়া এবং একটা তাকিয়ায় মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়াছেন। তাঁহার বিশাল চক্ষু দুটি মুদিত, এবং সমস্ত দিনের পরিশ্রমে দেহ তন্দ্রাগত। তিনি অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় ২।৪ মিনিট পরে এক এক কথা বলিতেছেন, এবং আমি লিখিয়া লইতেছি। মধ্যে মধ্যে তাঁহার নাসিকার ধ্বনি হইতেছে। এ ভাবে প্রায় রাত্রি দশটা হইল। বলা বাহুল্য যে, কৈফিয়ৎ কিছুই লেখা হইল না; শেষে আমাকে এক রসগোল্লা খাওয়াইয়া বিদায় দিলেন, এবং পরদিন প্রাতে যাইতে বলিলেন। আমি বুঝিলাম, তাঁহার দ্বারা কৈফিয়ৎ লেখান একপ্রকার রাবণের স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধান ব্যাপার। অতএব প্রাতে আমার লিখিত কৈফিয়ৎটি লইয়া গেলাম। তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক পড়িলেন, এবং স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"হিন্দু পেট্রিয়টে তোমার লেখা দেখিয়া আমার বোধ হইয়াছিল যে, উপহাস ও শ্লেষপূর্ণ (light and humourous) লেখাতে তোমার বিশেষ অধিকার। তুমি যে গুরুতর বিষয়েও এমন সুন্দর লিখিতে পার, তাহা আমি জানিতাম না। এ কৈফিয়ৎ পড়িয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, তোমার কিছুই ক্ষতি হইবে না।" বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যে একদিন অকস্মাৎ পথে দেখা হইল। এ কৈফিয়ৎটি তাঁহাকে একবার দেখাইতে তিনি বিশেষ জিদ করিয়া বলিলেন। আমি বলিলাম, কৃষ্ণদাসবাবু লিখিয়া দিবেন বলিয়াছেন। লেখা হইলে তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখাইয়া আনিব। বঙ্কিমচন্দ্র কাহাকেও মানুষ বলিয়া গ্রাহ্য করিতেন না বলিলেন—"ঐ লোকটা একটা 'হাম্বাগ' (Humbug)। ও যত দেখায়, তত পদার্থ, কি গবর্ণমেণ্টে তত হাত ওর কিছুই নাই।" আমি পরদিনই আমার লিখিত কৈফিয়ৎ লইয়া কাঁটালপাড়ায় গেলাম, এবং আর একটি সন্ধ্যা এ বিপদ্ মাথায়ও বড় সুখে কাটাইলাম। বঙ্কিমবাবু প্রায় তিন ঘণ্টা কাল ইহার প্রত্যেক শব্দ লক্ষ্য করিয়া অতি সাবধানতার সহিত পড়িলেন। পাঠ সমাপন করিয়া বলিলেন—"আমি জানিতাম, তুমি কেবল কবিতা ও সুন্দর ইংরাজী চিঠি লিখিতে জান। তুমি যে এমন সুন্দর 'অফিসিয়েল'

ইংরাজী লিখিতে পার, তাহা আমার ধারণা ছিল না। আমার মনে একটু অভিমান আছে যে, আমি একটু ইংরাজী লিখিতে জানি। আশ্চর্য্য যে, আমি একটি কথাও কাটিতে পারিলাম না। তবে আমি শেষ ভাগে একটি 'প্যারা' লিখিয়া দিব।" লিখিলেন, এবং পড়িয়া শুনাইলেন। আমি দেখিলাম, 'প্যারা' নয় ত, লঙ্কার ঝাল।

তিনি আরও বলিলেন—"এ কৈফিয়তের পর গবর্ণমেণ্ট তোমার কেশ স্পর্শ করিতেও পারিবেন না।" পরদিন কৃষ্ণদাসবাবুর হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেসে কৈফিয়ৎটি ছাপাইতে লইয়া গেলাম। তিনি আর একবার পড়িলেন। প্রশ্ন—"এ লেখা কার?" উত্তর—বঙ্কিমবাবুর। তিনি বলিলেন—"বল কি! আমি জানিতাম, বঙ্কিম শান্ত স্থির লোক। তিনি কি এমন গোঁয়ার্! একে ত তোমার ভাষা জ্বলন্ত আগুন। আমি উহা নরম করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু পারিলাম না। বঙ্কিম তাহার উপর আবার আগুন ঢালিয়াছেন। এই প্যারা কখনও দেওয়া হইবে না।" এই বলিয়া তিনি উহা কাটিয়া দিলেন, এবং তাঁহার প্রেসম্যানকে ডাকিয়া ছাপিতে দিলেন। সে মুদ্রিত কৈফিয়ৎ যথাসময়ে চট্টগ্রাম কমিশনরের কাছে প্রেরিত হইল।

কৈফিয়তের সারাংশ এইরূপ—পত্রখানি সব-ডেপুটির কাছে বন্ধুভাবে লিখিয়াছিলাম, আফিসিয়েল ভাবে যে লিখি নাই, পত্রই তাহার প্রমাণ। সব-ডেপুটি যে আমাকে বলিয়াছিল যে, তহশিলদার * * বাবুর হিসাবে টাকার কোন গোল নাই, কেবল কাগজ কতক নূতন তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও পত্রের দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে। কারণ, পত্র লেখা আছে যে, * * বাবুর কাগজের অবস্থা যেরূপ হউক, তিনি যে এরূপ একটি কার্য্য করিতে পারেন না, তাহা তুমিও স্বীকার করিবে। পুনশ্চ পত্রে কোন মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আমি সব-ডেপুটিকে ইঙ্গিত করি নাই। উহার 'পুনশ্চ' ভাগের পরিষ্কার অর্থ এই যে, * * বাবুর হিসাবে টাকার কোন গোল নাই বলিয়া তুমি আমাকে যেরূপ বলিয়াছিলে, সেরূপ রিপোর্ট করিলে, এবং তহবিল তছরূপ প্রমাণ করা কঠিন বলিয়া,—উহা বাস্তবিকই কঠিন, —রিপোর্ট করিলে, এ গোল মিটিয়া যাইবে। আমি জানিতাম যে, একটি স্ত্রীলোক লইয়া * * বাবুর সঙ্গে সব-ডেপুটির মনান্তর ছিল। পাছে সে ঈর্ষাবশতঃ তাঁহার প্রতিকূলে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া নিজে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, সেজন্য বন্ধুভাবে আমি তাহাকে এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এ চেষ্টা সত্ত্বেও সে যে ঈর্ষাবশতঃ মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছিল এবং উহা সমর্থন করিবার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিল, এমন কি—জাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল, তাহা বিচারকের রায়েই প্রকাশ। পিতৃব্য মহাশয় তাহার প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য ফৌজদারি মোকদ্দমা করিবেন বলিয়া ধমক দেওয়াতে, সে নীচতা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক এ 'প্রাইভেট' চিঠি উপস্থিত করিয়া, ইহার এরূপ মিথ্যা অর্থ কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে। বিচারালয়ে প্রমাণিত একজন মিথ্যুকের কথা, সমস্ত ঘটনার এবং পত্রের লিখিত বৃত্তান্তের প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টের বিশ্বাস করা উচিত নয়।

এ কৈফিয়ৎ যে নকল করিয়া দিব, সে শক্তি আমার ছিল না, আমি তখনও এত গুরুতররূপে পীড়িত ছিলাম। তাই কৃষ্ণদাসবাবু উহা হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেসে ছাপিয়া দিলেন। সে মুদ্রিত কৈফিয়ৎ চট্টগ্রামে পৌঁছিবামাত্র একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। কলেক্টরের কাছে রিপোর্টের জন্য কমিশনর উহা পাঠাইলেন। কলেক্টর বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, তিনি শপথ করিয়া বলিতে পারেন যে, ঐ কৈফিয়ৎ ব্যারিষ্টারচূড়ামণি মিঃ উড্রফ, কি মিঃ এভেন্সকে আমি বহু টাকা দিয়া লিখাইয়াছি। মোট কথা, উহাতে দাঁত ফুটাইতে না পারিয়া, তিনি চট্টগ্রামে একটি অরাজকতা উপস্থিত করিলেন। আমার বন্ধু-বান্ধব, ইষ্ট-কুটুম্ব ও চট্টগ্রামের উচ্চপদবীস্থদিগকে পথ হইতে

ধরিয়া আনিয়া জবানবন্দি করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং এ মহাপুরুষেরা মাথা ধুইয়া কলেক্টরের অভিপ্রায়মতে আমার প্রতিকূলে যথাসাধ্য সাক্ষী দিয়া আসিলেন। কোন কোন নরাধম আমার খুড়তত ভায়ের গলা ধরিয়া, তাহার পর আমার প্রতি এ অত্যাচারের জন্য কাঁদিলেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত সাক্ষী দিয়াছিলেন যে, তাঁহারা জানেন যে, এ মোকদ্দমা সব-ডেপুটি ও পিতৃব্যেতে হয় নাই, সব-ডেপুটিতে ও আমাতে হইয়াছিল ; চট্টগ্রামের সকল আন্দোলনের মূল আমি ; দেশব্যাপী খবরের কাগজে যাহা কিছু বাহির হইয়াছে, তাহা আমার লেখা ; এবং সব-ডেপুটি আমার ভয়ে ভাল করিয়া মোকদ্দমা না চালাইয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আমার পিতৃব্যকে রক্ষা করিয়াছে। আমার একজন কুলোজ্জ্বলকারী খুড়া, যাঁহাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলাম, আমার কি কি জমিদারি ও মহাজনী আছে, তাহার এক তালিকা দাখিল করিয়া দিয়াছিলেন। কলেক্টর আমার প্রতিকূলে একটা ক্ষুদ্র মহাভারত রচনা করিয়া পাঠাইলেন, এবং সর্ব্বশেষ লিখিলেন যে, এ সকল অসংখ্য অপরাধেও নিতান্ত যদি আমাকে কর্ম্মচ্যুত করা না হয়, তবে চট্টগ্রামে কেবল আমার জমিদারি ও মহাজনী আছে বলিয়া, আমাকে স্থানান্তরিত করা নিতান্ত প্রয়োজন। অন্যথা আমি আবার পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইলে চট্টগ্রামের নওয়াবাদ জরিপ ও রোডসেস্ অসম্ভব হইবে, এবং আমি চট্টগ্রামের লোককে বিদ্রোহী করিব। এ রিপোর্টে কিন্তু কমিশনরের চক্ষু খুলিয়া গেল। কলেক্টর তাঁহাকে আগে বুঝাইয়াছিলেন যে, চট্টগ্রামে আমার এরূপ একাধিপত্য যে, কেহ আমার প্রতিকূলে প্রাণান্তেও কিছু কহিতে চাহে না, এবং সে জন্যই সব-ডেপুটি আমার পিতৃব্যের প্রতিকূলে মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন কমিশনর দেখিলেন যে, আমার বন্ধু-বান্ধব সকলেই শ্রীবিষ্ণু বলিয়া, আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছেন। তখন তিনি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন যে, কলেক্টরের রিপোর্টের লিখিত একটি কথাও তিনি বিশ্বাস করেন না। সে সকল বিষয় তিনি ইতিপূর্ব্বেই তদন্ত করিয়াছিলেন, এবং জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সকলই মিথ্যা। তিনি এ পর্য্যন্ত লিখিলেন যে, যাহারা আমার প্রতিকূলে এরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে, এবং তিনি বুঝিয়াছেন যে, তাহারা আমার প্রতিকূলে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র করিয়াছে। উপসংহারে এই লিখিলেন যে, সব-ডেপুটির কাছে পত্র লেখাই আমার একমাত্র দোষ, এবং কেবল উহাই গবর্ণমেণ্টের বিবেচ্য বিষয়।

কলেক্টর-প্রমুখ ষড়যন্ত্রকারীরা দেখিলেন যে, সকলই ফস্‌কাইয়া গেল। তাহাদের মুখ ভয়ে শুকাইয়া গেল। ষড়যন্ত্রকারীরা তখন আর এক চাল চালিলেন। চট্টগ্রাম হইতে আমার কাছে যত পত্র আসিতেছিল এবং আমি চট্টগ্রামে যত পত্র লিখিতেছিলাম, সকলেরই লেফাপা কেহ খুলিয়া, আবার লাগাইয়া দিয়াছে, এইরূপ পরিষ্কার দেখা যাইত। ভয়ে বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে পত্র লেখা বন্ধ করিলেন এবং তাঁহাদের কাছে পত্র লিখিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। সে অবধি আমার স্ত্রীর ও খুড়তত ভায়ের চিঠি ভিন্ন আর কাহারও চিঠি পাইতাম না, এবং কাহারও কাছে লিখিতাম না। এ দিকে কে একজন 'ইংলিশম্যানে' আমার উপর রাজদ্রোহিতা পর্য্যন্ত আরোপ করিয়া পত্র লিখিতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিলেন, উহা স্বয়ং কলেক্টরের লেখা। আমি সে সকল পত্রের আশী শিক্কা ওজনে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলাম। 'ইংলিশম্যানে'র সম্পাদক ফরেল সাহেব অকণ্টবন্ধে পড়িলেন। শ্বেত পুরুষের প্রতিকূলে ইঙ্গিতটি পর্য্যন্ত না করা তাঁহার কাগজের ধর্ম্মনীতি। তিনি কেমন করিয়া মাজিষ্ট্রেট কমিশনরের প্রতিকূলে এরূপ তীব্র অভিযোগ সকল ছাপিবেন! আমার দু তিন পত্র ছাপিয়া, আর এক পত্র ছাপিলেন না। আমার প্রতিকূলে এক পত্র ছাপিয়া, নীচে নোট লিখিয়া দিলেন যে, এ বিষয়ে আর পত্র ছাপিবেন না। আমি তাহার উত্তর লইয়া তাঁহার কাছে সশরীরে উপস্থিত হইলাম। সাদায় কালায় একটি তুমুল

যুদ্ধ বাধিল। আমি বলিলাম যে, তিনি যদি আমার পত্র না ছাপেন, তবে পত্রের উপর সেরূপ লিখিয়া দিন, আমি 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' লইয়া ছাপিয়া দিব। আমি 'ষ্টেটস্‌ম্যানে' বরাবর লিখিতাম। মিঃ রবার্ট নাইটের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। ফরেল সাহেব রাগে গর গর করিয়া তখন পত্র রাখিলেন, এবং বলিলেন যে, আর ভবিষ্যতে কোন পত্র ছাপিবেন না। আমি বলিলাম, আমিও তাহা চাহি। সে পত্র ছাপা হইল। এত দিন যুদ্ধটা ছদ্ম নামে চলিতেছিল। আমি তৎক্ষণাৎ নিজ নাম দিয়া এক পত্র লিখিলাম যে, আমার বিষয় যখন গবর্ণমেণ্টের বিচারাধীন, তখন আমার প্রতিকূলে এরূপ পত্র ছাপা 'ইংলিশম্যানে'র পক্ষে ঘোরতর কাপুরুষতার কার্য্য। এ পালাও এখানে শেষ হইল।

তখন কলেক্টর আর একদিকে হাত বাড়াইলেন। তিনি আণ্ডার সেক্রেটারি মেকলি সাহেবের কাছে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বেঙ্গল আফিসে আমার কুটুম্ব আছে এবং আমি তাহা হইতে আফিসের গোপনীয় বিষয় সকল জানিয়া 'ইংলিশম্যানে' ছাপিতেছি। মিঃ মেকলি আমার কুটুম্ব খুঁজিয়া বেঙ্গল আফিস তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। বেঙ্গল আফিসের কেরাণীরা আমাকে দেখিলে পঞ্চাশ হাত দূর হইতে নমস্কার করিত। শেষে মিঃ মেকলি সাব্যস্ত করিলেন যে, রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের হেড এাসিষ্টেণ্ট মিঃ মরিনো আমার কুটুম্ব। কারণ, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ চট্টগ্রামে ছিলেন। মিঃ মরিনো বেচারি শপথ করিয়া বলিল যে, সে খ্রীষ্টান, আমি হিন্দু; আমাদের মধ্যে কুটুম্বিতা হইতে পারে না, এবং সে তাহার জীবনেও কখন চট্টগ্রামে যায় নাই। কাজেই এ চালটাও নিষ্ফল হইল।

'ভিন্দিপাল' পাত

ঈশ্বর বিপন্নের সহায়। তাঁহার নামই বিপদ্‌ভঞ্জন। এ ঘোরতর বিপদেও তিনি আমার সহায় সংঘটন করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম সহায় মিঃ ককরেল (Horace Cockrell)। তিনি তখন বর্দ্ধমানের কমিশনর। কিন্তু তিনি লেঃ গবর্ণর এস্‌লি ইডেনের পরম বন্ধু বলিয়া কলিকাতায় থাকিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি ও তখন প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর মিঃ স্মিথ, উভয়ে আমাকে মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, আমার বিপদের পরিণাম যাহাই হউক, ভদ্রলোক মাত্রই আমার প্রতি সহানুভূতি হইবে। কারণ প্রাইভেট চিঠি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিলে, কাহারও সুনাম ও সম্মান রক্ষা হইতে পারে না। মিঃ ককরেল আমাকে অনেক ভরসা ও সান্ত্বনা দিতেন, এবং আমিও তাঁহার কাছে সকল কথা খুলিয়া বলিতাম। পোষ্ট আফিসে আমার চিঠি খোলা হইতেছে শুনিয়া, তিনি বলিলেন,—তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন না যে, কোনও সিবিলিয়ান এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করিতে পারেন। আমার পকেটে দুই একখানি চিঠি ছিল। তাঁহাকে দেখাইলে তিনি স্তম্ভিত হইলেন, এবং বলিলেন যে, যখন আমার শত্রুরা এরূপ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আমার কিছুই হইবে না। দ্বিতীয় সহায় জুটিয়াছিলেন—লেঃ গবর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারি কেপ্টেন বইলো (Captain Boileau) ইনিও কেমন প্রথম সাক্ষাৎ হইতে আমাকে সুচক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারায় লেঃ গবর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, যখন আমার মাথার উপর এরূপ গোলযোগ আছে, তখন লেঃ গবর্ণর আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারেন না। কিন্তু তিনি বলিলেন, লেঃ গবর্ণর বলিয়াছেন যে, তিনি আমাকে বেশ জানেন, এবং কাগজপত্র বিশেষরূপে দেখিবেন। কেপ্টেন বইলোও বলিলেন যে, আমার কিছুই হইবে না। কারণ, প্রাইভেট চিঠি দাখিল করার তুল্য বিশ্বাসঘাতকতা ও গর্হিত কার্য্যের কোন ভদ্রলোক প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তিনি আরও বলিলেন, তিনি আমার কৈফিয়ৎ দেখিয়াছেন। উহা

এরূপ সন্তোষজনক যে, গবর্ণমেণ্ট কখনও আমার প্রতিকূলে আদেশ করিতে পারিবেন না। মিঃ ষ্টুয়ার্ট বেইলি তখন কর্ম্মবিভাগের সেক্রেটারি। কাগজ তাঁহার কাছে পেশ হইলে, আমি একদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই চটিয়া লাল হইলেন, এবং বলিলেন—"তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" আমি ইতস্ততঃ না করিয়া স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলাম—"আপনি আমার মোকদ্দমার বিষয় কি মত স্থির করিয়াছেন, তাহা জানিতে আসিয়াছি।" তিনি আরও রুক্ষকণ্ঠে বলিলেন—"সে কথা আমি তোমার কাছে বলিতে বাধ্য নহি, কেবল লেঃ গবর্ণরের কাছে বলিতে বাধ্য।" আমি আবার অবিচলিতকণ্ঠে বলিলাম—"তাহা আমি জানি। তবে আপনি দেখিতেছেন, আমি এখনও যুবক। সমস্ত জীবন আমার সম্মুখে পড়িয়া আছে। আপনি যদি আমার প্রতিকূলে মত স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া বলিলে, আমি এখনই এ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিব, এবং জীবিকার জন্যে অন্য পথ অনুসরণ করিব।" তিনি তখন একটু আর্দ্র হইলেন, এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি কৈফিয়ৎ না দিয়া চট্টগ্রাম হইতে পলাইয়া আসিয়াছ, এবং কলিকাতায় আসিয়া কোনও ব্যারিষ্টারের দ্বারা সতেজ কৈফিয়ৎ লেখাইয়া দিয়াছ।" আমি তখন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—"এ কি কথা! আমি রোগে মরণাপন্ন হইয়া চট্টগ্রামের সিবিল সার্জ্জনের তাড়নায় তিন মাসের সার্টিফিকেট দিয়া, এবং কমিশনের অনুমতি ও উপদেশমতে, কলিকাতায় আসিয়াছি। বাবু কৃষ্ণদাস পাল আমার সাক্ষী যে, আমি দারুণ রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া এ কৈফিয়ৎ লিখিয়াছি, এবং নকল করিবার আমার শক্তি ছিল না বলিয়া, তিনি তাঁহার প্রেসে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন।" তিনি তখন বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কই, কমিশনর ত এ সকল কথা কিছুই রিপোর্ট করেন নাই! তোমার ছুটির দরখাস্ত ও ডাক্তারের সার্টিফিকেট কোথায়?" এই বলিয়া তিনি ফাইলটি আমাকে ফেলিয়া দিলেন। আমি দরখাস্ত ও সার্টিফিকেটখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি আরও বিস্মিত হইলেন, এবং কি ভাবিতে লাগিলেন। মোট কথা, আমি চট্টগ্রাম ছাড়িবার পর, কমিশনরকে ধরিয়া আমি কৈফিয়ৎ না দিয়া পলাইয়া আসিয়াছি বলিয়া কলেক্টর যে রিপোর্ট করাইয়াছিল, উহাই কেবল মিঃ বেইলির মনে ছিল, এবং পরে শুনিয়াছিলাম, তিনি এ অপরাধে আমাকে সস্‌পেণ্ড করিতে কমিশনরের কাছে আদেশ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার কৈফিয়ৎ গিয়া কমিশনরের হাতে পৌঁছিলে, তিনি বেগতিক দেখিয়া উক্ত আদেশ চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। আমাকে জানিতেও দেন নাই। যা হউক, মিঃ বেইলি চুপ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া আমি আবার বলিলাম—"এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রাইভেট চিঠি ব্যবহার করিলে বোধ হয় এ সংসারে এমন লোক কেহই নাই, যিনি আমার মত বিপন্ন হইবেন না। আমার প্রথম যৌবন মাত্র। কর্ম্মচ্যুত করিয়া আমার সর্ব্বনাশ না করিয়া, যদি আমাকে চাকরি এস্তেফা দিতে দেন, তাহা হইলেই আমি আপনার কাছে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইব।" হৃদয়ের আবেগে আমার কণ্ঠ কাঁপিতেছিল। তাহাতে যেন তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি তখন আমার দিকে চাহিয়া সুপ্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন—"যুবক! তুমি নিশ্চিন্ত হও। গবর্ণমেণ্ট এবার তোমাকে কেবল সাবধান করিয়া দিবেন—"Young man! make yourself easy. You will have only a warning this time." শরীরে যেন কি বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হইল। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া টেলিগ্রাফ আফিসে ছুটিলাম, এবং বাড়ীতে ও অন্য বন্ধুদের কাছে টেলিগ্রাফ করিলাম। Every thing blown away. Bailey promises warning. God is good"—"সব উড়িয়া গিয়াছে। মিঃ বেইলি বলিতেছেন, আমাকে কেবল সতর্ক করিয়া দিবেন। ঈশ্বর মঙ্গলময়।" তার পর আমার বন্ধু চট্টগ্রামের টি-প্লাণ্টার মিঃ ফুলারের বাড়ীতে গিয়া, উভয়ে আনন্দে কিঞ্চিৎ সুরা সেবন করিয়া

'বেলভেডিয়ারে' যেন উড়িয়া গেলাম। আমাকে দেখিবা মাত্র কেপ্টেন বইলো বলিলেন—"তোমার আপনার লোক মিঃ ককরেল সেক্রেটারি হইয়াছেন।" তিনি বড় আনন্দিত হইয়া এ কথাগুলো বলিলেন। কিন্তু আমার মনে সেরূপ আনন্দ সঞ্চারিত হইল না। তিনি আরও বলিলেন—"সিমলা হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে। বেইলি লর্ড লিটনের প্রাইভেট সেক্রেটারি হইয়া আজ সন্ধ্যার সময় চলিয়া যাইবেন। বোধ হয়, এতক্ষণে ককরেল চার্জ লইয়াছেন।" আমি বিষণ্নমুখে বলিলাম—"এটি আমার পক্ষে বড়ই অমঙ্গল সংবাদ। কারণ, এই মাত্র মিঃ বেইলি আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি আমাকে কেবল সতর্ক করিয়া দিবেন।" বইলো শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলেন, এবং বলিলেন—"ককরেল তাহাও করিবেন না। তোমাকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিবেন।" আমি বলিলাম—"আমার বড় সন্দেহ হইতেছে। কারণ, মিঃ বেইলির সাহস মিঃ ককরেলের নাই।"

পরদিন মিঃ ককরেলের সঙ্গে আফিসে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। আমার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইল। তিনি আমাকে ধমকাইয়া প্লীহা উল্টাইয়া দিলেন। বলিলেন—"তোমার মোকদ্দমার অবস্থা যে এত মন্দ, আমি জানিতাম না।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এত মন্দ কি পাইলেন?" উত্তর—"তুমি সব-ডেপুটির কাছে এরূপ পত্র লিখিয়াছিলে কেন?" আমি বলিলাম, সে বিষয়েই ত আমার কৈফিয়ৎ দিয়াছি। কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"তাহা ঠিক। কিন্তু লিখিয়াছিলে কেন? মুখে এ সকল কথা বলিলে ত কোনও গোল হইত না।" আমি তখন মিঃ বেইলির সঙ্গে যে কথা হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে বলিলাম। প্রশ্ন—"মিঃ বেইলি তোমাকে এ সকল কথা কখন্ বলিয়াছিলেন?"

উত্তর—"কাল ৪টার সময়ে।" তিনি ফাইল খুলিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, এবং বলিলেন—"কই, বেইলি ত এরূপ কিছু লিখিয়া যান নাই।" আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি বুঝিলাম, ইহাই আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছে। তখন আরাম মুখে আর কথা বাহির হইতেছিল না, শরীর কাঁপিতেছিল। অতি কষ্টে বলিলাম যে, মিঃ বেইলির অপেক্ষাও আমি তাঁহার কাছে অধিক দয়ার আশা করি। তিনি ম্লানমুখে বলিলেন—"আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিব।" ভগ্নহৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় চট্টগ্রাম হইতে টেলিগ্রাফ পাইলাম যে, গবর্ণমেণ্টের টেলিগ্রাম পাইয়া কমিশনর সে দিনের ষ্টীমারে কলিকাতা রওনা হইয়াছেন। অনেক অনুসন্ধান করিয়া আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইলাম।

তিনি। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর আমাকে কি জন্য আসিতে 'টেলি' করিয়াছেন, তুমি জান কি?

আমি। আমার বোধ হয়, আমার মোকদ্দমার জন্য।

তিনি। তুমি কিরূপে বুঝিলে?

আমি। যে দিন আমার মোকদ্দমার কাগজপত্র লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কাছে উপস্থিত হইয়াছে, সে দিনই আপনার কাছে 'টেলি' গিয়াছে।

তিনি। আমার তাহা বোধ হয় না। আমি তোমার মোকদ্দমার কথা ত সকলই খুলিয়া লিখিয়াছি, এবং তোমার অনুকূলে রিপোর্ট করিয়াছি। সেজন্য আমাকে তলব হইবে কেন? বোধ হয়, 'নওয়াবাদে'র কোন বিষয়ের জন্য হইবে।

আমি। নিশ্চয় আমারই বিষয়ের জন্য। আমার অনুকূলে রিপোর্ট দিয়া আপনি আপনার কর্ত্তব্য-কর্ম্মই করিয়াছেন। কারণ, তিন বৎসর আমি প্রাণপণে আপনার অধীনে কার্য্য করিয়াছি। এখন আপনি স্বয়ং যখন আসিয়াছেন, আমি আমার কমিশনরের মত উকিল আর কোথায় পাইব? আপনি আমার জন্য যেরূপ ওকালতি করিতে পারিবেন, এমন আর কে পারিবে?

সে দিন রাত্রি ১১টার সময় কৃষ্ণদাসবাবুর এক চিঠি লইয়া একজন লোক ভবানীপুরে

উপস্থিত। তিনি লিখিয়াছেন যে, সন্ধ্যার সময় মিঃ বইলো তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, সব উড়িয়া গিয়াছে ; গবর্ণমেণ্ট আমাকে কেবলমাত্র সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। হা! সহৃদয় বইলো! তুমি অর্ডার না পড়িয়াই মিঃ বেইলির কথামত কার্য্য হইয়াছে মনে করিয়া কৃষ্ণদাসবাবুকে এরূপ বলিয়াছিলে!

আমি পরদিন ককরেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি সাক্ষাৎ না করিয়া আমার কার্ডের পিঠে লিখিয়া দিলেন—"তুমি পুরী বদলি হইয়াছ। আফিসে গিয়া অর্ডার দেখিও।"

আমি ১১টার সময় আফিসে গেলাম। গাড়ী হইতে নামিবা মাত্র আর একখানি গাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। কমিশনর নামিলেন। দেখিলাম, তাঁহার মুখ সাদা হইয়া গিয়াছে। আমি পুষ্পচন্দন যাহা পাইয়াছিলাম, তাহা কাগজে পাইয়াছিলাম। তিনি লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের কাছে নগদ পাইয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়া, তিনি মাথা হেঁট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি আদেশ হইয়াছে, তুমি জানিতে পারিয়াছ কি?" আমি বলিলাম—"না। যখন আপনি আসিয়াছেন, আপনার মুখেই শুনিব।" তিনি তখন বলিলেন—"আমি যত দূর সাধ্য, তোমার জন্য লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরকে বলিয়াছি।" আমি বলিলাম—"আপনি আমার সহৃদয় প্রভুর মত কার্য্য করিয়াছেন। আমি এখানে অপেক্ষা করিব। আপনি সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে, আপনার মুখেই আদেশ শুনিব।" তিনি মিনিট পাঁচ পরে অধোমুখে ও বিষণ্ণভাবে নামিয়া আসিলে আমি তাঁহাকে আবার পাকড়াও করিলাম। তিনি বলিলেন, অর্ডার এখনও প্রকৃত আকারে লিখিত হয় নাই।

আমি। গবর্ণমেণ্ট আমাকে কি কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন?

তিনি। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর কর্ম্মচ্যুত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি অনেক বলাতে করেন নাই।

আমি। তবে কি আমাকে ডিগ্রেড করিয়াছেন?

তিনি। করিতে পারেন। আমি ঠিক জানিতে পারি নাই।

আমি। তাহা হইলে আমি এ মুহূর্ত্তেই চাকরি এস্তেফা করিব।

তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তুমি তিন শত টাকার চাকরি ত্যাগ করিয়া কি করিবে?" কি করিব! আমি দলিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিলাম—"কি করিব!! আমার মত যুবকের জন্য শত উপায় আছে। রূপার শিকল ছাড়ান কষ্টকর, কিন্তু একবার ছাড়াইতে পারিলে পরম মঙ্গল। আর কিছু উপায় না থাকে, যে সমুদ্র পার হইয়া বাড়ী যাইব, তাহাতে ত যথেষ্ট জল আছে, কিম্বা একখানি সামান্য ছুরীতে যথেষ্ট ধার আছে, যাহার দ্বারা এ জীবন শেষ করা যাইতে পারে।" তিনি চমকিয়া বলিলেন "নবীন! তুমি বড় সতেজ কথা বলিতেছ।" আমি দৃঢ়ভাবে উত্তর করিলাম—"আমার হৃদয়ে তদপেক্ষায়ও বেশী তেজ আছে।"

কমিশনর চলিয়া গেলেন। আমি তখন উপরে গিয়া, ফিরিঙ্গি হেড এসিষ্টেণ্টকে আমার টিকেটের উপর ককরেল সাহেবের অর্ডার দেখাইয়া, কি অর্ডার হইয়াছে, তাহা দেখিতে চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"মিঃ ককরেল নূতন সেক্রেটারি হইয়াছেন, তিনি আফিসের নিয়ম জানেন না। আফিসের কোনও কাগজ কাহাকেও দেখান নিয়মবিরুদ্ধ।" আমি তখন বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"আপনি দেখিতেছেন, এত বিচারবিচারি করিবার অবস্থা আমার নহে। আপনি অর্ডার দেখাইতে না পারিলে এ টিকেটে লিখিয়া দেন যে, মিঃ ককরেলের আদেশ নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিয়া আপনি দেখাইলেন না ; আমি মিঃ ককরেলের কাছে যাইব।" তখন তিনি বড় চটিলেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন, আমিও ছাড়িবার পাত্র

নহি, তখন বড় মুস্কিলে পড়িলেন। একটু নরম হইয়া বলিলেন—"আমি তবে আণ্ডার সেক্রেটারি মিঃ মেকলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"মিঃ মেকলি আপনাকে হুকুম মুখে বলিতে বলিয়াছেন। আপনি পুরী বদলি হইয়াছেন।" আমি তখন আবার বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"সে সংবাদ জানিবার জন্য ত আমি আপনার কাছে আসি নাই। তাহা ত স্বয়ং মিঃ ককরেল আমার টিকিটের পিঠে লিখিয়া দিয়াছেন।" তখন তিনি একটু ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—"আপনাকে আপনার গ্রেডের শেষ স্থানে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

আমি বজ্রাহত হইলাম। বেইলি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর হৃদয়ে যে, আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা এক মুহূর্ত্তে বোমের মত যেন বিরাট্ শব্দে বিদীর্ণ হইয়া গেল। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া আমি ক্ষীণকণ্ঠে এক টুকরা কাগজ চাহিলাম।

হেড এসিষ্টেন্ট। কেন?

আমি। এ মুহূর্ত্তেই এ জঘন্য চাকরির এস্তেফা দিব।

তিনি। কি! এস্তেফা দিবেন!!

আমি। (স্থিরকণ্ঠে) দিব।

তিনি। আপনি কি পাগল হইয়াছেন?

আমি। না।

আমি কাগজ লইতেছিলাম। তিনি আমার হাত ধরিলেন। দেখিলাম, আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট লোকটির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে। তিনি বড় সহানুভূতির কণ্ঠে বলিলেন—"আপনি এমন পাগলামি করিবেন না। আপনি যেরূপ মাজিষ্ট্রেট কমিশনরকে নক্ড়া ছক্ড়া করিয়াছেন, মিঃ ককরেল আপনার সৌভাগ্যক্রমে সেক্রেটারি না হইলে আপনি নিশ্চয় কর্ম্মচ্যুত হইতেন। এরূপ অবস্থায় কাহাকেও বেঙ্গল আফিস হইতে চাকরি লইয়া যাইতে আমি দেখি নাই। আপনাকে গবর্ণমেণ্ট ডিগ্রেড পর্যন্ত করেন নাই। মিঃ ককরেল আপনাকে বাঁচাইয়াছেন।

আমি। আপনার বড় ভুল। মিঃ বেইলি থাকিলে আমার কিছুই হইত না। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি আমাকে কেবল সতর্ক করিয়া দিবেন।

তিনি। এ কথা আপনাকে কে বলিল?

আমি। স্বয়ং মিঃ বেইলি।

তিনি। তিনি কখন বলিয়াছিলেন?

আমি। যে দিন তিনি সিমলা যান।

তিনি। মন্দভাগ্য লোক! মিঃ বেইলি ফাইলে সে কথা লিখিয়া যান নাই। কমিশনরের প্রথম রিপোর্ট পাইয়া তিনি আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তখন বুঝিলাম যে, বেইলি সাহেবের অকস্মাৎ স্থানান্তরিত হওয়াই আমার এ বজ্রপাতের কারণ। দৈব কি প্রবল! কোথা হইতে কি এক ঘটনা আসিয়া আমার সমস্ত জীবন ও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা এক মুহূর্ত্তে নিষ্ফল করিয়া দিল। হেড এসিষ্টেন্ট আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন, এবং বুঝাইয়া বলিলেন—"আপনি এত নিরাশ হইবেন না। মিঃ ককরেলের আপনার সম্বন্ধে বড় উচ্চ ধারণা (high opinion)। কমিশনরের প্রথম রিপোর্ট পাইয়া, এবং আপনি কৈফিয়ৎ না দিয়া পলাইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া, মিঃ বেইলি আপনাকে সসপেণ্ড করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, আপনাকে কর্ম্মচ্যুত করা উচিত। অতএব মিঃ ককরেল কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছিলেন। তিনি অনেক লিখিয়া লেঃ গবর্ণরকে বুঝাইয়াছেন যে, এরূপ অপরাধের

জন্য কর্ম্মচ্যুতি বড় কঠিন দণ্ড হইবে। অথচ একেবারে কিছু দণ্ড না করিতে লিখিলে, মিঃ বেইলির অভিপ্রায়ের অবমাননা করা হয়। সে জন্য তিনি, আপনার যাহাতে একটি পয়সাও ক্ষতি না হয়, এইরূপ দণ্ড প্রস্তাব করিয়াছিলেন। লেঃ গবর্ণর আপনার কৈফিয়ৎ বড় দক্ষতার সহিত লিখিত বলিয়া, (very cleverly written) প্রশংসা করিয়া, মিঃ ককরেলের মত অনুমোদন করিয়াছেন। আপনার কিছুই দণ্ড হয় নাই বলিতে হইবে। মিঃ ককরেল আপনাকে যেরূপ ভাল জানেন, যে কয়টি স্থান আপনাকে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, উহা শীঘ্রই আপনি কাটাইয়া উঠিতে পারিবেন।"

আমি সেখান হইতে ভগ্নহৃদয়ে কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে গেলাম। তিনিও গবর্ণমেণ্টের আদেশ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন—"এই মাত্র ককরেলের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল। তোমার সম্বন্ধে তাঁহার খুব ভাল মত, এবং তুমি এ উৎপাতে পড়িয়াছ বলিয়া অনেক দুঃখ করিলেন।" তিনিও হেড এসিষ্টেণ্টের মত বুঝাইয়া বলিলেন যে, নয় বৎসরের চাকরি এস্তেফা দেওয়া ভাল নয়। যখন ককরেল সেক্রেটারি, এ মেঘ শীঘ্রই কাটিয়া যাইবে। "পাঁচ পোয়াও নহে, সাত পোয়াও নহে, দেড় হেতে এক খেটে।" কর্ম্মচ্যুতও নহে, 'ডিগ্রেড'ও নহে, এরূপে আমার নিজ গ্রেডের শেষ স্থানে নামাইয়া দিয়া গবর্ণমেণ্ট আমার মস্তকে এক 'ভিন্দিপাল' প্রহার করিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, 'ডিগ্রেড' করিলে আমি চাকরি ছাড়িয়া দিব। অদৃষ্টে আরও দুর্ভোগ বাকি ছিল—তাই দিলাম না।

পতিতঃ পর্ব্বতঃ লঘুঃ

যখন এ ঝড় বজ্র মাথার উপর গর্জ্জন করিতেছিল, আমি তখন যে ভয়ে মাটির ভিতর প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা নহে। এ জীবনে যত বার বিপদে পড়িয়াছি, তাহার সংখ্যা বড় কম নহে,—আমি কখনও হাল ছাড়িয়া দিয়া বসি নাই। প্রথমতঃ বিপদের পরিমাণ স্থির করিয়া, মনে মনে একটা কর্ত্তব্য অঙ্কিত করিয়াছি এবং সে কর্ত্তব্যের রেখা অনুসরণ করিয়াছি। তাহার পর সে বিপদ্-বক্ষে এরূপ আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছি যে কেহ কখনও আমাকে বিষণ্ণ বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। এ বিপদের সময়ও কৈফিয়ৎ চট্টগ্রামে পাঠাইয়া, একপ্রকার মনে মনে ভাবিয়াছিলাম যে, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনর যেরূপ পিছনে লাগিয়াছেন, তখন এ সাধের ডেপুটিগিরি ফসকিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জীবনে কি করিব? একটা উপায় মনে মনে স্থির করিলাম, এবং অবিলম্বে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন এফ. এ. পাশ করিয়াই 'ল লেকচার' শুনিতে হইত। অতএব বি. এ. পাশ করিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইবার পূর্ব্বে আমি দু বছর লেকচার শুনিয়াছিলাম। আর এক বছর লেকচার শুনিতে পারিলে বি. এল. দিতে পারিতাম। তখন স্থির করিলাম, আরও কিছু দিন ছুটি লইয়া এক বৎসরের লেকচার হাত করিয়া রাখিতে হইবে। যদি শ্বেতাঙ্গেরা নিতান্তই অর্দ্ধচন্দ্র দেন, তবে কৃষ্ণাঙ্গের যে অমোঘ ব্যবসায় আছে, তাহারই অনুসরণ করিব,—উকিলি। আশৈশব সকলেই বলিয়াছিলেন যে, আমি উকিল হইলে খুব একটা কেষ্ট বিষ্টু হইতাম। ডেপুটি হইয়া যখন দেশে গিয়াছিলাম, তখন সকলেই এ জন্য নিরাশ হইয়াছিলেন। এমন কি, এ বিপদের সময়েও একদিন হাইকোর্টের কোনও বাঙ্গালী জজের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, অল্পক্ষণ তাঁহার সঙ্গে এ বিপদ্ সম্বন্ধে আলোপের পর তিনি বলিয়া বসিলেন—"আমি ইচ্ছা করি, আপনি কর্ম্মচ্যুত হন।" এমন মঙ্গল কথাটি শুনিয়া আমি হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনিও ডেপুটি ছিলেন, এবং এরূপ অবস্থায় পড়িয়া চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাহা না হইলে তিনি তখন ৫০০৲।৬০০৲ শত টাকা বেতন পাইতেন, যাহা তখন তাঁহার আস্তাবলের খরচ!

তিনি আরও বলিলেন—"আপনি এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন, আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম। আপনি হাইকোর্টের উকিল হইলে একজন শীর্ষস্থানীয় উকিল হইবেন।" কৈশোর রাজা দিগম্বর মিত্রও যে এরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এ সকল কথা মনে করিয়া স্থির করিলাম যে, উকিল হইব। কিন্তু এক বৎসর লেক্‌চার শুনা ত পোষায় না। কর্ম্মচ্যুত হইলে আরও বেগতিক। সংসার চলিবে কিরূপে? আমার দেশস্থ পিতৃব্যপ্রতিম আহদালি খাঁ এ বিপন্ন অবস্থায় কলিকাতা আসিবার সময় বলিয়াছিলেন—"তুমি চাকরে ছাড়িয়া দাও। তুমি উকিল হইয়া আইস। তুমি মাসে হাজার টাকা পাইবে।" উকিল হইতে যে অন্ততঃ দুই হাজার টাকা চাই? তিনি বলিলেন, সে টাকা তিনি তখনই পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু মনে করিলাম, কেন পরের কৃপাপ্রত্যাশী হইব! অন্য দিকে অর্থভাণ্ডারও শূন্য। এমন সময়ে একজন বন্ধু বলিলেন যে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন জেলাতে একজন 'ল লেক্‌চারা'র আছেন, তিনি বড় সদাশয় লোক। দুই চারি বার তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিয়া, সমস্ত বছরের ফিসটা দিলে তিনি অকাতরে সার্টিফিকেট দেন। সেখানে আমার বন্ধু নিজে সপরিবারে থাকেন। ইহাদের অপেক্ষা এ জগতে আমার আত্মীয় আর কেহ নাই। কাজেই উক্ত লেক্‌চারার মহাশয়ের সঙ্গে দুই এক বার সাক্ষাৎ করায় বিঘ্ন বড় হইল না। বোধ হয়, দুই বার সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, এবং বন্ধুপরিবারের আদরে আমার সমস্ত বিপদ্ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সে পরিবারের সকলেই দেব দেবী, তাঁহাদের গৃহখানি ত্রিদিব। আমি বিপদে পড়িয়া যদি সর্ব্বদা এরূপ শান্তি, এরূপ আদর, এবং এরূপ আনন্দ পাইতে পারি, তবে প্রত্যহ বিপদে পড়িতেও আপত্তি করিব না। এ বিপদের সময় এক দিন চট্টগ্রাম হইতে সংবাদ পাইলাম যে, রাজবিদ্রোহিতার জন্য চট্টগ্রামে আমার বিরুদ্ধে 'ষ্টেট্ প্রসিকিউসন' আরম্ভ হইয়াছে। আমার নিশ্চয় ফাঁসি, না হয় জেল হইবে। এ জনরব শুনিয়া আমার দেবীপ্রতিমা কোনও রমণী বন্ধু অশ্রুসিক্ত এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আপনি যে জেলে যাইবেন সে জেল ত্রিদিব হইবে। আমি যদি তাহার ভিত্তি দুই বিন্দু অশ্রুতে সিক্ত করিতে পারি, আমার রমণীজীবন সার্থক মনে করিব।" ইনি দেবী, না মানবী! মানবজীবন অন্ধকারে আলোকে, মেঘে জ্যোৎস্নায়, সুখে দুঃখে, বিপদে আনন্দে জড়িত বলিয়া বোধ হয় এত সহনীয় ও বাঞ্ছনীয়। এ স্মৃতিতে এত বৎসর পরেও আমার হৃদয় কি পবিত্র, শীতল ও অমৃতময় হইতেছে! যাহা হউক, সার্টিফিকেট হাত হইল।

ইহার উপর আবার আর এক এক খেয়ালও ধরিয়াছিলাম। এ সময়ে চা-বাগান সম্বন্ধে যত বহি আছে, আমি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া, একদিন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভাঘরে কৃষ্ণদাসবাবুর কাছে উপস্থিত হইলাম। তাঁহাকে বলিলাম—"যদি এ ষড়যন্ত্রে আমি বিনা অপরাধে কর্ম্মচ্যুত হই, তবে স্থির করিয়াছি, বি. এল. পাশ করিয়া চট্টগ্রামে উকিল হইব।" তিনি প্রথম বিস্মিত হইলেন। পরে উপরের সার্টিফিকেট প্রাপ্তির উপাখ্যান শুনিয়া, হাসিয়া সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত করিলেন। তিনি বলিলেন—"তোমার হৃদয়ে কি অগ্নি আছে, আমি জানি না; তুমি কিছুতেই নিরুৎসাহ হও না।" আমি বলিলাম—"তবে উৎসাহের আর একটি কথা শুনুন। আমি স্থির করিয়াছি—উকিল হইয়া চট্টগ্রামে একটি চা-বাগান খুলিব। তাহার জন্য আপনি আমাকে ২৫০০০ টাকা চাঁদা তুলিয়া দিবেন।" তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন—"তুমি নিজে ম্যানেজার হইলে, ২৫০০০ টাকা আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে বসিয়া তুলিয়া দিব। তবে কথাটা এই যে, তুমিও কর্ম্মচ্যুত হইবে না, চা-বাগানও খুলিবে না। তুমি 'হিন্দু পেট্রিয়টে' চট্টগ্রাম হইতে যে আন্দোলন করিয়াছ এবং অগ্নি বর্ষণ করিয়াছ, তাহাতেই গবর্ণমেণ্ট অস্থির হইয়াছেন। তোমাকে তাঁহারা কখনও হাতছাড়া করিবেন না।"

তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইল। মোকদ্দমার চূড়ান্ত আদেশ শুনিয়া তিনি

বলিলেন—"আমি ত পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, তোমার মত তুখড় লোককে কর্ম্মচ্যুত, কি গ্রেডচ্যুত করিয়া কখনও গবর্ণমেণ্ট হাতছাড়া করিবে না।" উকিল হওয়া সম্বন্ধেও তিনি ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। বঙ্কিমবাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করিলে, তিনিও বলিলেন—"অবশ্য তুমি উকিল হইলে ঢের টাকা পাইবে। যদি টাকাই জীবনের সর্ব্বস্ব বুঝিয়া থাক, তবে যাও। কিন্তু তাহা ভিন্ন আর কিছু আছে বুঝ. তবে যাইও না। যে দিন উকিল হইবে, সে দিন তোমার সাহিত্য-জীবন শেষ হইবে।" স্ত্রীও উকিল হওয়া সম্বন্ধে বড় নারাজ। তাহাও যেমন তেমন নহে। তাহার স্থির সংস্কার যে. উকিল হওয়া আর গলিত-কুষ্ঠরোগী হওয়া এক কথা। কাজেই আমার উকিল হওয়া হইল না। বাড়ীতে পত্নী ও আত্মীয় স্বজন মৃতপ্রায় পড়িয়া রহিয়াছেন। নীচাশয়েরা ষড়যন্ত্র করিয়া কত প্রকার কুকথাই রাষ্ট্র করিতেছে। স্ত্রী তখনও তেজস্বিনী বালিকা হইলেও, অপমানভয়ে অহর্নিশ অশ্রুসিক্তা ও ধূল্যবলুণ্ঠিতা। আমি সে সপ্তাহের ষ্টীমারেই চট্টগ্রাম ছুটিলাম। নরাধমেরা দেশে কখনও রাষ্ট্র করিতেছিল—আমি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছি, কখনও কলিকাতায় আমাকে জেলে দিয়াছে, কখনও বা আমার রাজদ্রোহিতার জন্য ফাঁসি হইবে। এরূপ নানা জনরব রাষ্ট্র করিয়া আমার পরিবারবর্গকে দারুণ মনোবেদনা দিতেছিল। এ দুই মাস যাবৎ আমার বালিকা পত্নীর নয়নের জল অবিরাম বহিয়া আমার জন্মস্থানের মাটি ভিজিতেছিল। এ জন্য তৎক্ষণাৎ চট্টগ্রাম যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছিল।

সে সময় আমার জনৈক স্বদেশবাসী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সুহৃদ্ বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া, সেই ষ্টীমারে বাড়ী যাইতেছিলেন। তিনি আমার 'কেবিনে' আসিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন যে, কমিশনর আমার কথা তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমার একবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত। শরীরের ও মনের অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া আমি বড় একটা 'কেবিনে'র বাহির যাইতাম না। দুই দিন এরূপে সমুদ্রে কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবস ষ্টীমার যখন কর্ণফুলিতে প্রবেশ করিতেছিল. বন্ধু আবার আসিয়া আমাকে বলিলেন—"কমিশনর নিতান্ত আপনাকে একবার দেখিতে চাহিতেছেন। লোকটা যেন বড় অনুতপ্ত হইয়াছে।" আমি বলিলাম—"আমি আর ঐ কাপুরুষের মুখ দেখিব না।" তখন তিনি বড় পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলেন যে, এরূপ অবস্থায় না গেলে আমার পক্ষে বড় অভদ্রতার কার্য্য হইবে। তখন আমি একটা গ্লাস ঠুকিয়া, বেশ একটু উত্তেজনা লাভ করিয়া, তাঁহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তিনি বড় করুণ কণ্ঠে প্রথমতঃ আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া. গবর্ণমেণ্টের অর্ডার জানিতে পারিয়াছি কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন।

আমি হাঁ বলিয়া, কি অর্ডার হইয়াছে, তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বিষণ্নমুখে বলিলেন —"তবে গবর্ণমেণ্ট আপনাকে কিছুই শাস্তি দেন নাই বলিলেও হয়। আমি যেরূপ আপনার অনুকূলে লেঃ গবর্ণরকে বলিয়াছিলাম, আমি জানিতাম যে, ইহার বেশী কিছু হইবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে আপনি আপনার বন্ধুদিগকে বিশ্বাস করিতে সাবধান হইবেন।" আমি তাহার উত্তরে বলিলাম—"আমি যখন যশোরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ছিলাম. জনৈক সিভিলিয়ান আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, যতক্ষণ বিপরীত প্রমাণ না পাইবে. পৃথিবী বা সমস্ত লোককে villain (বদমাইস) বলিয়া জানিবে। কিন্তু আমি তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি নাই। আপনার উপদেশও পারিব না। আমার চারি দিকে যত লোক আছে, সকলেই পাজি, এরূপ বিশ্বাস করিয়া মানুষ কেমন করিয়া থাকিতে পারে, আমি বুঝিতে পারি না। আমি সরলতাই ধর্ম্ম বলিয়া জানি, এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, শত বিপদে পড়িলেও বাকি জীবনে যেন এ সরলতা রক্ষা করিয়া যাইতে পারি। তবে আমি জানি, ভারতবর্ষে আসিলে ইংরাজদের এরূপ অধঃপতন ঘটে যে, তাঁহারা সরলতাকে (sincerity) একটা মহাপাপ

বলিয়া জানেন, এবং কুটিল বিশ্বাসঘাতকতার প্রশ্রয় দেন। তাহা না হইলে আপনার মত সদাশয় লোক আমাকে এরূপ বিপদে ফেলিবেন কেন?" তাঁহার শ্বেত মুখ আরও শ্বেত হইল। তিনি মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। আমি তখন আরও তীব্রভাবে বলিলাম—"আমি প্রায় তিন বৎসর প্রাণপণে আপনার অধীনে কাজ করিয়াছি। আপনি সর্ব্বদাই আমার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। আমি এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে সব-ডেপুটিপুঙ্গব ও তাঁহার ষড়যন্ত্রকারীদের প্রশ্রয় দিয়া, আমার এরূপ সর্ব্বনাশ ঘটান কি আপনার পক্ষে উচিত প্রতিদান হইয়াছে?" তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ ষড়যন্ত্রকারীরা কে?" আমি বলিলাম—"এরূপ পাপিষ্ঠদের নাম করাও পাপ। আপনি পরে জানিবেন।" ষ্টীমার ঘাটে লাগিল, এবং আমি হাসিতে হাসিতে, যে সকল বন্ধুগণ আমার অভ্যর্থনায় আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দিকে ছুটিলাম। আমার সে অবস্থা দেখিয়া কে বলিবে যে, আমি এত বড় একটা বিপদে পড়িয়াছিলাম। "পতিতঃ পর্ব্বতঃ লঘুঃ।"

বিদায়

"My native land good night."—*Byron*

চট্টগ্রামে পঁহুছিয়াই যে বন্ধুরা আমার প্রতিকূলে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল যে, তাহা দেখিয়া আমার মনেও দয়া হইল— প্রত্যেকেরই মুখ কালো হইয়া গেল। ঠিক যেন যম দেখিয়াছেন। আমি তাঁহাদের দেখিবামাত্র ছুটিয়া গিয়া গলায় পড়িলাম, এবং পূর্ব্বের মত হাসিতে হাসিতে কত বন্ধুতার কথাই বলিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহাদের মুখে কথাটিও নাই, যেন কণ্ঠরোধ হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে কষ্টের সহিত জনে জনে বলিলেন—"তুমি ত কলিকাতায় চলিয়া গেলে। আমরা কি অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, তাহা বলিলে বিশ্বাস করিবে না। কলেক্টর আমাদের উপর ঘোরতর উৎপীড়ন করিয়াছেন। জানি না, তুমি আমাদের কি মনে করিতেছ।" আমি গলা জড়াইয়া বলিলাম—"আমি কিছুই মনে করি নাই। তোমরা আমার পরম বন্ধু। চিরদিন তোমাদিগকে বন্ধু বলিয়া জানিব।"

তাহার পর গ্রামের বাড়ীতে যাই, এবং সেখানে কিছু দিন থাকিয়া সহরে ফিরিয়া আসি। আমার বদলির সম্বন্ধে দেশময় একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া গিয়াছিল। কত লোকই দেখা করিতে আসিয়াছিল। আমার আহার-নিদ্রা বর্জ্জিত হইয়া গিয়াছিল। একটি বন্ধুর কথা এখানে বলিব। বাবু গণেশচন্দ্র চৌধুরী তখন চট্টগ্রামের সব-জজ। তিনি আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার দশ বছরের মেয়ে 'পরম'কে আমি মা বলিয়া ডাকিতাম। সে এবং তাহার মা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহারা তিনটিতে জিদ করিয়া বসিলেন যে, আমি কলিকাতা গেলে, স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী গিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অতএব স্ত্রীকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কারণ, আমাদের দুই জনকে আবার একত্র না দেখিলে ও আমাদিগকে লইয়া আবার দু দিন আমোদ আহ্লাদ না করিলে তাঁহাদের সে দুঃখ যাইবে না। স্ত্রী আসিলেন, এবং দুটি দিন তাঁহাদের অতিথি হইয়া কি আনন্দেই কাটাইলাম!

কলিকাতা যাইবার দিন কমিশনরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি গবর্ণমেণ্টের অর্ডার পাইয়াছেন?" আমি বলিলাম, না। তিনি তখন গবর্ণমেণ্ট-অর্ডারটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"উহা আজ ডাকে আসিয়াছে।" আমি অর্ডারটি পড়িলাম। তাহার শেষ ভাগে লেখা ছিল—সব-ডেপুটিকে কর্ম্মে রাখা উচিত কি

না, কমিশনর রিপোর্ট করিবেন। কমিশনর বলিলেন—“আপনি যেরূপ যোগ্য লোক, আপনার ত কিছুই হইল না। সব-ডেপুটিটি মারা গেল।” আমি তখন আবেগের সহিত বলিলাম—“আমি তিন বৎসর আপনার অধীনে কার্য্য করিয়াছি। যদি আমার কার্য্যে আপনি কিছুমাত্র প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন, তবে আমার আন্তরিক প্রার্থনা এই যে, আপনি সব-ডেপুটিকে রক্ষা করিবেন।” তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“সে কি কথা! সব-ডেপুটি আপনার এরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, আর আপনি তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন?” আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম যে, সব-ডেপুটির প্রতি আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। সে আমার গলা না কাটিলে, তাহার গলা রক্ষা করিতে পারিত না। বিশেষতঃ সে উপলক্ষ্য মাত্র; অন্য স্বার্থপরায়ণ লোকেরা তাহাকে শিখণ্ডীস্বরূপ সম্মুখে রাখিয়া, আমার উপর এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। কমিশনর আবার বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহারা কে?” আমি আবার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—“এরূপ পাপিষ্ঠদের নাম করিলেও পাপ হয়। আমি তাহাদের নাম বলিব না। আপনি সময়ে সকলই জানিতে পারিবেন। মাথার উপর ভগবান্ আছেন। তিনি তাহাদের বিচার করিবেন। আপনার কাছে আমার শেষ প্রার্থনা এই যে আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। আপনি সব-ডেপুটিকে রক্ষা করিবেন।” তাঁহার মুখ মলিন হইল। তিনি অধোমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনি তাহাকে যেরূপ মিথ্যাবাদী ও বিশ্বাসঘাতক প্রমাণ করিয়াছেন, আমি তাহাকে কিরূপে বাঁচাইব?” আমি আবার আবেগের সহিত বলিলাম—“আপনি বিভাগীয় কমিশনর। আপনি তাহার অনুকূলে দুই কথা লিখিলেই তাহার বিপদ্ কাটিয়া যাইবে।” তিনি অধোমুখে বসিয়া রহিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। বোধ হইল, যেন আমার ব্যবহার তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল, এবং আমাকে অকারণে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার মনে অনুতাপ সঞ্চার হইয়াছিল। ইতিমধ্যে গল্পও উঠিয়াছিল যে, তিনি আবার আমাকে তাঁহার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি তিন বৎসর তাঁহার অধীনে সুখে কাজ করিয়াছি বলিয়া, ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

উক্ত ব্যারিষ্টার বন্ধু রেঙ্গুনে যাইতেছেন, আমিও চট্টগ্রাম ত্যাগ করিতেছি, আমাদের উভয়ের অভ্যর্থনার জন্য জনৈক সুহৃদ্ কর্ণফুলিতীরস্থ তাঁহার সদাগরি আফিসে এক প্রকাণ্ড ‘ডিনার’ দিয়াছিলেন। তাহাতে চট্টগ্রামের মান্য গণ্য প্রায় সমস্ত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। আহারের পর ব্যারিষ্টার বন্ধুর নামে টোষ্ট (অভিনন্দন) প্রস্তাব করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইল। সে কার্য্য সমাপন করিবার পর, যে সকল নরাধম, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে এরূপ বিপন্ন করিয়াছিল, একটি কলা হাতে করিয়া তাহাদের জন্য আর একটি ‘টোষ্ট’ প্রস্তাব করিলাম। বলা বাহুল্য, এই ‘রম্ভা টোষ্ট’ শেষ হইবার পূর্ব্বেই উচ্চ হাসির মধ্যে মৃতবৎ হইয়া তাঁহারা পিট্‌টান দিয়াছিলেন। তাহার পরদিন আমি কলিকাতা চলিয়া যাই। আমার অভ্যর্থনার জন্য এত লোক আসিয়াছিল যে, সদরঘাটে ও ষ্টীমারে লোক ধরিতেছিল না। গলদশ্রুনয়নে তাঁহাদিগকে ও জন্মভূমির কাছে সাত বৎসর রাজকার্য্যে অবস্থানের পর বিদায় গ্রহণ করিলাম। হায় মা! এ সাত বৎসর কাল তোমার জন্য ও তোমার পুত্রদের উপকারার্থ কত বুকের রক্তই ঢালিয়াছিলাম!! তাহার ফলে আপনার দাসত্ব-জীবনের ভবিষ্যৎ আশা অতল জলে ডুবাইয়া নির্ব্বাসনে চলিলাম। সমুদ্রগর্ভ হইতে যত দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, স্থির নয়নে জননীর শৈল-কিরীট-খচিত মনোহর শোভা দেখিয়া মাতৃকোলভ্রষ্ট শিশুর মত কাঁদিয়াছিলাম।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত

আমার জীবন

তৃতীয় ভাগ

শ্রীক্ষেত্রযাত্রা

কিছুদিন পরে কনিষ্ঠ শিশু ভাই তিনটিকে সঙ্গে করিয়া, সুহৃদ্বর গণেশবাবুর পরিবারের সঙ্গে স্ত্রী কলিকাতায় আসিলেন। তিনি আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা; তথাপি তিনি কিছুতেই চট্টগ্রামের বাড়ীতে রহিলেন না। এত দীর্ঘপথ তাঁহাকে লইয়া কি প্রকারে যাইব, মনে গুরুতর ভাবনা উপস্থিত হইল। প্রসবসময় পর্য্যন্ত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোনস্থানে আমাকে রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে বারম্বার কাতরকণ্ঠে আবেদন করিলাম। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট একটি কলবিশেষ। কলের ত হৃদয় নাই! বারম্বার নির্দ্দয় উত্তর আসিল, আমাকে ছুটির অবসানে শ্রীক্ষেত্রে যাইতেই হইবে। মহিষের পিঠে যে উঠে, সেও যম হয়। যে ককরেল সাহেব আমাকে এত অনুগ্রহ করিতেন, তিনি এখন এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। আমার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, আমার একজন বন্ধুর স্ত্রী ও কন্যা প্রসব পর্য্যন্ত স্ত্রীকে তাঁহাদের কাছে রাখিয়া যাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই থাকিবেন না। অন্য দিকে 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন কটকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে এমন উন্নতমনা সদাশয় ভদ্রলোক সকল ছিলেন যে, রঙ্গলালবাবুর সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও তিনি আমাকে উপর্য্যুপরি পত্র লিখিয়া, শ্রীক্ষেত্রে যাইবার জন্য কত মতে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন, এবং লিখিলেন যে, সমস্ত পথের তিনি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন যে, আমার কোনও কষ্ট হইবে না। তিনি উৎকলের কত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিলেন,—উৎকল কবির যোগ্য স্থান, এবং বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মহানদীর তীরে সম্মিলন আশায় তিনি আমার পথ চাহিয়া আছেন।

তখন অগত্যা শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলাম। রঙ্গলালবাবুর উপদেশমতে কলিকাতা হইতে দুখানি পাল্কি লইয়াছিলাম। গভীর রাত্রিতে ষ্টীমারে এক পাল্কিতে স্ত্রী ও শাশুড়ী উঠিলেন, অন্য পাল্কিতে আমি উঠিলাম। প্রভাতে ষ্টীমার খুলিলে আমি আমার পাল্কির দ্বার খুলিলাম। পার্শ্বের 'ডেকে' ও কি দৃশ্য! গৈরিকবসনা, মধ্যযৌবনা, উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা, আকর্ণস্পর্শি-পদ্মপলাশনয়না, সুগোলতন্বী, চন্দ্রাননী, একটি অলোকসামান্যা রূপসী হিন্দুস্থানী রমণী মদালস কটাক্ষে আমার দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইল! পূর্ণচন্দ্র উদয়মাত্র মেঘে লুকাইয়া গেল। সমস্তদিন এ অভিনয় চলিল। অপরাহ্ন পাঁচটার সময় রমণী একবার আমার পাল্কির নিকটে দাঁড়াইয়া, কিছুক্ষণ সমুদ্রের শান্ত লহরলীলা দেখিতে দেখিতে কি ভাবিল। পরে স্ত্রীর পাল্কির পার্শ্বে গিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিল। রাত্রি আসিল, কিন্তু সে নিদ্রা যাইতেছিল না। একবার শয্যায় শুইতেছিল, একবার উঠিতেছিল।

"ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়,
ক্ষণেক সখীর কোলে—"

তাহার যেন ঠিক সেই অবস্থা। আমার কনিষ্ঠ দুটি শিশুভ্রাতা ও ভৃত্য তাহার পার্শ্বে শুইয়াছিল। সে তাহাদের বড় আদর করিতেছিল। ষ্টীমারখানি আগাগোড়া উড়িয়াদের অপূর্ব্ব মূর্ত্তিতে এরূপ বোঝাই ছিল যে, শস্য পড়িবার স্থান ছিল না। রাত্রিতে কোন কারণবশতঃ আমি কেবিনের দিকে যাইতেছিলাম। তখন একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। কেহ বলিল,—'মোর ছাতি ফটাই দেলা', কেহ বলিল,—'মোর ঘাড় ভাঙ্গছি', কেহ বলিল,—'মোর গোড় ভাঙ্গছি', ইত্যাদি অপরূপ চীৎকারে জাহাজ পরিপূর্ণ হইল। রমণীর সঙ্গে একটি গঞ্জিকাসেবক বাবাজি ছিলেন। তিনি সমস্ত রাত্রি দেবীর সেবা করিলেন এবং 'সৎকর্ম্মমে শতেক বাধা হ্যায়, ভগবান্‌কো ইয়াদ করো' বলিয়া রমণীকে ও নিকটস্থ উড়িয়াদিগকে সমস্ত রাত্রি সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিলেন। পরদিন প্রাতে নয়টার সময় ষ্টীমার চান্দবালি গিয়া পঁহুছিল। ষ্টীমার-হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া দিতে আমি ছুটাছুটি করিতেছি, এমন সময়ে আমার গায়ে

একখানি বড় কোমল হাত পশ্চাৎ হইতে লাগিল। ফিরিয়া দেখি, একটি 'কেবিনে'র আড়ালে দাঁড়াইয়া সেই রমণী।

সে। আপনি শ্রীক্ষেত্র যাইতেছেন?

উ। হাঁ।

সে। আপনি সেখানে আমার খবর লইবেন কি?

উ। তুমি কোথায় থাকিবে? আমি কিরূপে খবর লইব?

সে। আপনি 'হাকিমি' করিতে যাইতেছেন, আর আমি রমণী, আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? (তাহার সেই ঈষদ্বিদ্রূপকুঞ্চিতাধর ভঙ্গী কি সুন্দর!) আমার সঙ্গে ঐ বাবাজি যাইতেছে; আমি কোথায় থাকিব, আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন; এবং আপনার শাশুড়ী, চাকর ও ভাইদের সঙ্গে গরুর গাড়ীতে আমরা যাইব। আমার আবাসস্থান দেখিয়া যাইতে আপনার চাকরকে বলুন।

একজন অপরিচিতার কি আশ্চর্য্য আব্দার! আমি বাবাজির কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, সে শ্রীক্ষেত্রের গোকুলিমঠের মোহন্ত। রমণী বড়বাজারের একজন বড় ধনীর স্ত্রী ও তাহার শিষ্যা। সে এবং রমণীর দেবর রমণীকে শ্রীক্ষেত্রদর্শনে লইয়া যাইতেছে। রমণী তাহারই মঠে থাকিবে। আমি হাকিম হইয়া শ্রীক্ষেত্রে যাইতেছি। অতএব বাবাজিও আমাকে বড় অনুনয় করিয়া তাহার মঠ দর্শন করিতে ও তাহাকে অনুগ্রহ করিতে বলিল।

রঙ্গলালবাবুর যে কথা, সে কাজ। ষ্টীমার ঘাটে লাগিবামাত্র দুই রক্তবীজের বংশধর (constable) আমাকে হস্তসঞ্চালনের দ্বারা অভিবাদন করিয়া বলিল যে, কেন্দ্রাপাড়ার সবডিভিসনাল অফিসরের আদেশমতে তাহারা হাজির হইয়াছে। আহার করিবার জন্য তাহারা আমাদিগকে 'যাত্রিক' থাকিবার একখানি ঘরে লইল। সে ঘরখানি যেমন কদর্য্য, রান্না যাহা হইয়াছে তাহাও তথৈবচ। তখন একটি আমবাগান দেখিয়া আমরা সেখানে গেলাম, এবং দুই দিকে দুই পাল্কি ও দুই পাশে দুই কাপড়ের পর্দ্দা দিয়া একটি ক্ষুদ্র উঠান সৃষ্টি করিলাম। সেখানে স্ত্রী রন্ধন করিলেন। কি আনন্দে খাইলাম ও দিনটি কাটাইলাম! বেলা চারিটার সময় এক পাল্কিতে আমি অন্য পাল্কিতে স্ত্রী রওনা হইলাম এবং শাশুড়ী শিশু ভ্রাতা তিনটি ও দাস দাসী লইয়া গো-যানে যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে শ্রীক্ষেত্র একশত পঞ্চাশ মাইল। অতএব আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে লইয়া এ দীর্ঘ পথ কিরূপে যাইব, সে চিন্তায় হৃদয় ছাইয়া গেল। উড়িয়া বাহকদিগের যেমন অপূর্ব্ব সঙ্গীত, তেমন অপূর্ব্ব পাল্কির গতি। আমাদিগকে এরূপ আছড়াইতে লাগিল যে, স্ত্রী কাঁদিয়া ডাকিয়া বলিলেন—"একটু শান্তভাবে লইতে ইহাদিগকে বলিয়া দাও। আমার কথা তাহারা বুঝিতেছে না।" আমি বলিলাম,—"আমার কথা কি বুঝিবে?"

'সীতা নাড়ে হাত, বানরে নাড়ে মাথা'—তাহাদিগকে আমি সে ভাবে বুঝাইতে কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। কিছুক্ষণ পরে এক পুলিশ-ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। সবইন্‌স্‌পেক্টর বাঙ্গালী, তিনি খাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা অপরাহ্নে খাইয়া আসিয়াছি বলিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমাকে পাতে বসিতে হইল, এবং স্ত্রীর জন্য এক গাম্‌লা দুগ্ধ পাল্কির দ্বারে উপস্থিত করিয়া, তাহার কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ না করাইয়া ছাড়িলেন না। তখন তাঁহাকে স্ত্রীর অবস্থার কথা বলিয়া পাল্কি শান্তভাবে লইতে বেহারাদের বলিতে বলিলাম। তিনি কট্‌মট্‌ করিয়া কি বলিলে, তাহারা বলিল—"হাউ," কিন্তু সে "হাউ" কতক্ষণ! আট মাইল অন্তর ডাক, এখন অন্য বেহারাদের একথা কে বুঝায়? একদিকে এ বেহারাদের অত্যাচার, অন্য দিকে আহারের আব্দার। যেখানে একটা পুলিশ-ষ্টেশন কিম্বা জমিদারি কাছারি আছে, সেখানে খাবার প্রস্তুত। মানুষ একরাত্রিতে কতবার খাইতে পারে! যেখানে কর্ম্মচারী বাঙ্গালী, তাঁহাকে

কোনমতে বলিয়া কহিয়া থামাইতাম, কিন্তু যেখানে কর্ম্মচারী উড়িয়া, তাহাকে থামায় কে? কোনমতে পেট বাজাইয়া যদি বুঝাইয়া দিলাম যে, পেট ভরা রহিয়াছে, আর খাইতে পারিব না, সে বলিয়া বসিল—"মামুনি! সে হেব না। কিছু দুধ ইচ্ছা হেউ।" এরূপে সমস্ত রাত্রিটা দুধ ইচ্ছা করিয়া কাটাইলাম। উড়িয়া বেহারাদের সংগীতের সংগে আমার উদরস্থ দুধের ঢক্-ঢক্ সংগীত সমস্ত রাত্রি হইল।

প্রভাতসময় দেখি যে, পাল্কি একটি হাতার মধ্যে লইয়া যাইতেছে। আমি পাল্কি হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিলাম—কোথায় লইয়া যাইতেছিস্? উত্তর—"কেন্দ্রাপাড়া হাকিমকে ছোটি যাউছি মো!" আমি দেখিলাম, আমার মাথাটা খাইতেছে। এ অবস্থায় স্ত্রী লইয়া কোথায় যাই। আমি সংগীয় কনেষ্টবলকে বলিলাম যে, ডাকবাংগালা থাকিলে, সেখানে গিয়া মুখ হাত ধুইয়া, তাহারপর তাহার হাকিমের বাসায় যাইব। সে তখন আমাদিগকে ডাকবাংগালার সম্মুখে একটি ইন্দারার কাছে লইয়া গেল। সেখানে মুখ ধুইতে ধুইতে দুইজনে পরামর্শ করিতেছিলাম—কি করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী সেখানে যাইতে অসম্মত। এমন সময়ে এক দীর্ঘকায় বিরাট্ কৃষ্ণমূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত। বেহারারা বলিয়া উঠিল—"হাকিম আসুছন্থি।" বুঝিলাম, সর্বডিবিসনাল অফিসার বাবু অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ আসিতেছেন। আমি পাল্কি হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"কি মহাশয়! এখানে পাল্কি নামাইয়াছেন কেন?" ছুটি শেষ, স্ত্রীর এই অবস্থা, এবম্বিধ নানা কারণ দেখাইয়া, তাঁহার এরূপ আদর অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতে পারিব না বলিয়া ক্ষমা চাহিলাম। তিনি বলিলেন—"ক্ষমা করিতেছি" ;—"পাল্কি উঠা।" অমনি উড়িয়া বেহারা স্ত্রীর পাল্কি লইয়া বিকট ধ্বনি করিতে করিতে চলিল। আমার কথা কে শুনে? তখন অন্নদাবাবু বলিলেন—"ও সকল কথা পরে হইবে, এখন চলুন।" কাজেই চলিলাম। তিনি চিরপরিচিত বন্ধুর মত যে আদর করিতে লাগিলেন, তাহা আর কি বলিব! তাঁহার মাজিষ্ট্রেট প্রভু পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি সকালে চারটি খাইয়া আফিসে গেলেন, এবং বলিলেন যে, আমার চারিটার সময় রওনার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তাঁহার এক খুড়তত ভ্রাতার সংগে দিন কাটাইলাম। তিনটা বাজিল, চারটা বাজিল, তাঁহার কোনও খবর নাই। আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম। তখন তাঁহার ভ্রাতা হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি সন্ধ্যার আগে আসিবেন না। 'ডিনারে'র অর্ডার দিয়া গিয়াছেন, এবং রাত্রি নয়টার সময় বেহারারা আসিবে। তিনি সত্য সত্যই সন্ধ্যার সময় আসিলেন এবং হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মহাশয়! আপনার যাওয়া হয় নাই?" আমি যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করিলাম এবং ছুটি শেষের দোহাই দিলাম। তিনি বলিলেন—"সে ভার আমি ও রংগলালবাবু লইয়াছি। ঠিক সময়ে আপনাকে শ্রীক্ষেত্রে পোঁছাইয়া দিব। এখন ট্রাংক খুলিয়া বাঁশী বাহির করুন।" সমস্ত সন্ধ্যাটি কি আনন্দেই কাটাইলাম! আমার সংগে একটি বড় রূপার ফ্লুট ছিল। খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে রাত্রি প্রায় এগারটা হইল। খাওয়ার আয়োজনই বা কত! তখন তাঁহার ভাই আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, অন্নদাবাবুর স্ত্রী আমাকে ডাকিতেছেন। আমি বিস্মিত হইলাম। তখন অন্নদাবাবু বলিলেন—"তুমি একটি ছেলেমানুষ। তোমাকে ডাকিয়াছেন—যাও।" হাকিমি ভাবে হুকুম প্রচার করিলে, আমি গেলাম। তাঁহার স্ত্রী বলিলেন—"আমার সন্তানাদি নাই। তুমি আমার সন্তানের মত। আমি এ অবস্থায় বৌকে এত দূর যাইতে দিব না : প্রসব হইলে আমি সংগে লইয়া পোঁছাইয়া দিয়া আসিব।" এ অপ্রত্যাশিত স্নেহের উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু ছল-ছল হইল এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। আমি আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—"আমি যে এরূপ স্নেহ এই নির্ব্বাসনের পথে পাইব, স্বপ্নেও মনে করি নাই।" তখন তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া নানা কারণ দেখাইলাম। তিনি কিছুই শুনিলেন না। সর্ব্বশেষ বলিলাম, স্ত্রীও এরূপ অবস্থায় থাকিতে সম্মত হইবেন না। তখন স্ত্রীকে আমার কাছে ডাকিয়া

দিলেন, স্ত্রীও আমাকে চুপে চুপে বলিলেন যে, তিনি এত স্নেহ করিতেছেন যে, তিনিও বড় অকণ্টবন্ধে পড়িয়াছেন। অন্নদাবাবুর স্ত্রী কিছুতেই তাঁহাকে যাইতে দিবেন না। তাঁহার ট্রাঙ্ক এক কুঠুরিতে তালা দিয়া বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি তখন অন্নদাবাবুর কাছে গিয়া আপিল করিলাম এবং বলিলাম—"আপনি তাঁহাকে বুঝাইয়া আমাদিগকে বিদায় দিন।" তিনি বলিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর কার্য্যের উপর আপিলের অধিকার তাঁহার নাই, এবং নিজে হাকিম, ওকালতি ত জানেনই না। ওকালতি করিলে কোন ফলও হইবে না।" পরে যখন দেখিলেন যে, আমি কিছুতেই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইব না, তাঁহার স্ত্রীকে যাইয়া অনেক করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। তখন আমরা বিদায় লইলাম, এবং সে অপার্থিব স্নেহের স্মৃতি চিরদিনের জন্য হৃদয়ে গভীর রেখায় অঙ্কিত করিয়া, উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে কটকাভিমুখে চলিলাম। অন্নদাপ্রসাদবাবু আজ স্বর্গে। ইতিমধ্যে ত্রিশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে ; কিন্তু এই স্নেহপূর্ণ দৃশ্যটি আজও চোখের উপর ভাসিতেছে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে তখন অনেকেই এরূপ সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। সে চিত্রে ও এখনকার চিত্রে কত প্রভেদ !

কটক

চান্দবালি হইতে কেন্দ্রাপাড়া পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছিল, কেন্দ্রাপাড়া হইতে কটক পর্য্যন্তও তাহার পুনরভিনয় হইল। পথে যেখানে পুলিস-ষ্টেশন কিম্বা জমিদারি কাছারি আছে, সর্ব্বত্র খাবার ষোড়শোপচারে প্রস্তুত। একে ত অন্নদাবাবু এত খাওয়াইয়াছিলেন যে, পথ চলা কষ্টকর, তাহাতে আবার স্থানে স্থানে কি প্রকারে খাইব ? কিন্তু তাহারা কিছুতেই সে কথা বুঝিবে না। অন্ততঃ "কিঞ্চিৎ দুগ্ধ মুখে দিবাকু আজ্ঞা হেউ"—এ ভাবে আমাদের সমস্তরাত্রি কাটিল। শেষরাত্রিতে এ সৎকার হইতে অব্যাহতি পাইয়া এবং উৎকলবাসী বাহকদিগের সুমধুর সঙ্গীতে অভ্যস্ত হইয়া নিদ্রাগত হইলাম। বেলা আটটার সময় একটা জল-কল্লোল শুনিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইলে, কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলাম ! দেখিলাম, আমরা এক বিস্তৃত বিশুষ্ক নদীগর্ভ পাল্কিতে অতিক্রম করিতেছি। সঙ্গে যে কনষ্টেবল ছিল, সে বলিল,—উহা মহানদী। দেখিলাম, প্রকৃতই মহানদী বটে। নদীবক্ষ প্রায় একমাইল পরিসর। কিন্তু ডানদিকে ও কি দেখা যাইতেছে ? নদীব্যাপী জলধারা, বালসূর্য্যকিরণ শতসহস্র খণ্ডে প্রতিফলিত করিয়া ২০।৩০ হস্ত ঊর্দ্ধ্ব হইতে পতিত হইতেছে। এ জলপ্রপাতের শোভা অবর্ণনীয়। স্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ও কি দেখা যাইতেছে ?" আমি বাহক ও কনষ্টেবলদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—ও কি দেখা যাইতেছে ?—অথচ তাহারা উৎকলভাষায় কি বলিতেছে, কিছুই বুঝিতেছি না। স্ত্রী কিছুতেই ছাড়িবেন না। আমি বলিলাম,—আমি নিজে বুঝিতেছি না, তোমাকে কি বুঝাইব ! যাহা হোক, সে রবিকরসমুজ্জ্বল চঞ্চল সলিলরাশির শোভা দেখিতে দেখিতে মহানদী পার হইয়া কটকে প্রবেশ করিলাম, এবং রঙ্গলালবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও যে আদর অভ্যর্থনা করিলেন, তাহা মনে হইলে অশ্রুতে চক্ষু ভিজিয়া উঠে। হায় ! আমাদের দেশের এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়ের সে সকল সদাশয় লোক কোথায় গেল ! তিনি তখনই তাঁহাদের কলেক্টর বিডন (Beadon) সাহেবের কাছে ট্রেজারির চাবি পাঠাইয়া দিয়া, সে দিনের মত কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং একটা সমস্তদিন কবিতা ও সাহিত্য লইয়া দুইজনে কি আনন্দে কাটাইলাম ! সে সময়ে তিনি তাঁহার "কাঞ্চিকাবেরী" রচনা শেষ করিয়াছিলেন। উহা আমাকে আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি মাইকেলের বড় পক্ষপাতী ছিলেন না এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর খড়্গহস্ত ছিলেন। সায়াহ্নে কটকপরিদর্শনে গাড়ীতে দুজনে বাহির হইলাম। প্রাতে

যে অপূর্ব্বদৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাঁহার বাড়ী পোঁছিয়াই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—উহা কি? তিনি বলিয়াছিলেন—উহা মহানদীর 'এনিকাট' (anicut)। উহাও আমার কাছে উৎকলবাসী বাহকের ব্যাখ্যার মত বোধ হইল, কিছুই বুঝিলাম না। অতএব সায়াহ্নে সর্ব্বপ্রথম সেই (anicut) এনিকাট দেখিতে গেলাম। কি বিস্ময়কর ব্যাপার! সমস্ত মহানদীবক্ষোব্যাপী এক বিশাল প্রস্তরময় বাঁধ তাহার অনন্ত জলরাশিকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছে। বাঁধের ভিতরদিকে মহানদী আকূল পূরিতা। উদ্‌বৃত্ত জলরাশি বাঁধের উপর দিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে, এবং সান্ধ্য রবিকরে আর এক অপূর্ব্বশোভা বিকাশ করিতেছে। অবরুদ্ধ জলরাশি উৎকল ব্যাপিয়া বহুতর লহরে বা 'ক্যানালে' ছুটিয়াছে, এবং উৎকলকে শস্যশালিনী করিতেছে। বাঁধ দেখিয়া, কটক নগরে বেড়াইলাম। কটক উৎকলের প্রয়াগ। বিপুলকলেবরা মহানদীর ও কাটযুড়ীর সঙ্গমস্থলে কটক অবস্থিত। এ সঙ্গমশোভা অতীব মনোহর! কটক উৎকলের রাজধানী এবং বিস্তৃত নগর। সন্ধ্যার পর আমরা রঙ্গলালবাবুর বাটীতে ফিরিলাম। সেখানেও একপ্রকান্ড সঙ্গম। এ সঙ্গম কটকের উৎকৃষ্ট গায়িকা ও নর্ত্তকীদিগের। তাহারা তাহাদের তৈল-হরিদ্রা-মন্ডিত বিপুল কলেবরে বৈঠকখানা আলো-করিয়া, কি কালোকরিয়া বসিয়াছে। প্রথমে নৃত্য, তারপর গীত আরম্ভ হইল। রঙ্গলালবাবুর আমোদ দেখে কে! তাঁহার তখন বয়স পঞ্চাশের উর্দ্ধে। আমি তাঁহার কাছে বালক বলিলেও চলে। কিন্তু তাঁহার আমোদ, উদ্যম, উৎসাহ ও আনন্দের কাছে আমিই বৃদ্ধ হইয়া পড়িলাম। বাইজী ঠাকুরাণী যদিও উৎকলরমণী, তিনি গাহেন বাঙ্গালা। সে স্রুশ্রুতপূর্ব্ব বাঙ্গালায় আমি জ্বালাতন হইয়া, তাঁহাকে একটি উড়িয়া গীত গাইতে বলিলাম। তিনি আমার উপর চটিয়া লাল হইলেন। রঙ্গলালবাবু আমাকে ব্যস্ত হইয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, আমি একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছি।

বঙ্গদেশের বাঙ্গালী বাইজীদিগকে বাঙ্গালা গাইতে বলিলে, যেরূপ তাঁহারা অপমান মনে করেন, উৎকলীয় বাইজীদিগকে উড়িয়া গাইতে বলিলে, তাঁহারাও সেইরূপ ঘোরতর অপমানিত মনে করেন। যা হোক্, আমি ক্ষমা চাহিয়া এ অপরাধ হইতে অব্যাহতি চাহিলাম। কিন্তু হইতে হইতে রাত্রি প্রায় দুইটা হইল। তখন আমার শরীর কবুল জবাব দিল। কিন্তু সেখানে যে একটু ঘুমাইব, তাহাও রঙ্গলালবাবুর জন্য সাধ্য নাই। একবার তিনি যখন বাইজীর সঙ্গীতে আনন্দে আত্মহারা, আমি তখন চুপে চুপে সরিয়াগিয়া, পার্শ্বের একটি কক্ষে শয়ন করিলাম। কিন্তু তাহাতেও পরিত্রাণ নাই। তিনি তাহা টের পাইয়া, আমাকে সেখান হইতে চুরির আসামীর মত টানিয়া আনিলেন, এবং ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"নাতি! আমার এতবয়স, আর আমি এ আমোদ করিতেছি, আর তুই ছোঁড়া নতুন রসিক, তুই ঘুমাইতে গিয়াছিস।" তিনি নর্ত্তকী ও গায়িকাদিগকে মুঠে মুঠে টাকা দিতেছিলেন, শুনিলে বোধ হয় এখনকার ডেপুটিদের আতঙ্ক হইবে। আমার বোধ হয়, আমি অপরিচিত—আমার অভ্যর্থনায় তাঁহার সে একদিনে একশত টাকার কম ব্যয় হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া, রাত্রি তিনটার সময় সঙ্গীত বন্ধ করিয়া, দুজনে পাশাপাশি দুইপালঙ্কে শয়ন করিলাম। আমার চরিত্রে অসংখ্য দোষের মধ্যে প্রাতর্নিদ্রা দোষটা নাই, কিন্তু তাহাতেও বা বুড়ার কাছে কোথায় লাগি! রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে তিনি বাগানে গিয়াছেন, এবং শনৈঃ শনৈঃ আমাকে ডাকিয়া গাইতেছেন—

"রাই জাগো! রাই জাগো! শারি শুকে বলে,
কত নিদ্রা যাও কালোমাণিকের কোলে!"

এ বিচিত্রগান শুনিয়া, আমি উঠিয়া বাগানে গেলে, রঙ্গলালবাবু আমার মুখধরিয়া সে গান গাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, বুড়া তিনটা পর্য্যন্ত রাত্রি জাগিয়াছেন, তাহাতে মুখে অবসাদের চিহ্নমাত্র নাই। তাঁহার বাড়ীতে পোঁছিয়া যে শান্ত সৌম্য সমুজ্জ্বল আনন্দময়

মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এখনও সেই মূর্ত্তি। মাথার একগাছিও অর্দ্ধপক্ক বাবরিচুল বিশৃঙ্খল হয় নাই।

কথা ছিল যে, প্রভাতেই আমরা শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিব। বাহকগণ এখনও আসে নাই কেন, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কি ইয়ার ছেলে গো! এ বুড়াটি সারা-রাত্রি জাগিয়াছে, আর রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে, তাহাকে এ কাঁচ চাঁদপানা মুখখানি দেখাইয়া তুমি চলিয়া যাও!" আমি বুঝিলাম, কেন্দ্রাপাড়ার মত আর একটি পালা এখানেও অভিনীত হইবে। আমি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, আমার ছুটির সে দিন শেষ। পরদিন শ্রীক্ষেত্রে কার্য্যভার গ্রহণ না করিলে কোন মতে চলিবে না। তিনি বলিলেন —"আমি একটা এতকালের পাপী, তাহা কি আর আমি জানি না? আমি তোমাকে এমন সময়ে রওনা করাইয়া দিব যে, কাল তুমি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া পৌঁছিবে এবং তোমার আহার প্রস্তুত পাইবে।" সে দিনও তিনি আর আফিসে গেলেন না। দুজনে সমস্ত দিনটা কি আনন্দে গল্পে কাটাইলাম! বেলা চারিটার সময়ে আমাদের বাহকেরা আসিলে, রঙ্গলালবাবুর স্ত্রী আমাকে বাড়ীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"আমি নাত-বৌকে এ অবস্থায় যাইতে দিব না। তুমি একা চলিয়া যাও।" আবার সে কেন্দ্রাপাড়ার বিভ্রাট! উহা মিটাইতে প্রায় ৫টা বাজিল। অবশেষে দুদিনের গুরুতর আহারের পর, দুইপাল্কি খাবার বোঝাই করিয়াদিয়া, এই সদাশয় স্নেহময় পরিবার আমাদিগকে বিদায় দিলেন। রঙ্গলালবাবুর দশ বৎসর বয়স্কা একটি নাতিনী ছিল, তাহার নাম নুটী। তাঁহার স্ত্রী পীড়িতা, দুদিন যাবৎ আমাদের সমস্ত সৎকারের ভার এই দশবর্ষীয়া বালিকা গ্রহণ করিয়াছিল। রঙ্গলালবাবু বলিলেন, এই বালিকাই তাঁহার সংসারের অবলম্বন। এমন একটি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, কার্য্যক্ষম, অথচ শান্ত স্থির বালিকা আমি আর দেখি নাই। সে আমাদের কি আদরই করিয়াছিল! তাহার ছবিখানি এখনও যেন আমার চক্ষের উপর ভাসিতেছে। এ পরিবারের অভ্যর্থনা ও স্নেহে হৃদয় পূর্ণ এবং নয়ন সিক্ত করিয়া, আমরা শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলাম।

শ্রীক্ষেত্র

সে রাত্রিতেও সমস্ত পথে খাবার প্রস্তুত ছিল এবং কোথায়ও কিছু না খাইয়া অব্যাহতি লাভ করিতে পারি নাই। এরূপভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল। যখন প্রভাত হইল, তখন বাহকগণ 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং আমাদিগকে দূরস্থিত জগন্নাথের মন্দিরেরচূড়া দেখাইয়া পারিতোষিক চাহিল। তাহারা আনন্দে অধীর। আমরাও সেই চূড়া দর্শন করিয়া, ভক্তিতে ও আনন্দে অধীর হইলাম। হৃদয় কি যেন এক আনন্দ উৎসাহে নাচিয়া উঠিল, এবং সে অবস্থায় প্রাতে আটটার সময় শ্রীক্ষেত্রে পঁহুছিলাম। রঙ্গলালবাবুর একজন পেন্‌সনপ্রাপ্ত বন্ধু আমাদের জন্য জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে 'বড় ভাণ্ডে'র (বড় রাস্তার) উপর একটি ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ী স্থিরকরিয়া, তাহাতে আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাড়ীখানি মন্দ নহে, কিন্তু উহা যে শমনের করাল ছায়ার অন্তর্গত, তাহা তখন জানিতাম না। আমরা বাসাতে নামিয়াই জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলাম, এবং মন্দিরা-বলীর প্রথম দৃষ্টিতে যেরূপ বিস্ময়সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিলাম, তাহা আর কি বলিব! প্রথমে মন্দিরের সমক্ষে 'অরুণস্তম্ভ'। উহা বহু কোনসমন্বিত, ষাট কি সত্তর ফিট দীর্ঘ একটি-মাত্র কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত। শীর্ষস্থানে অরুণের প্রস্তরমূর্ত্তি, এবং পদতলে কারুকার্য্যে খচিত একটি মনোহর বেদী। স্তম্ভটি এমন অদ্ভুত শিল্পকৌশলে নির্ম্মিত যে, বহুক্ষণ দেখিয়াও নয়নের তৃপ্তি হয় না। একজন ইংরেজ District Superintendent (ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট) আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখনই এই স্তম্ভটি দেখেন, তখনই উহা

চুরি করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। হায়! সে সকল সুনিপুণ দেশীয়শিল্পী কোথায় গেল! অরুণ জগন্নাথের বাহন নহেন, তিনি সূর্য্যের বাহন। এই স্তম্ভ কণারকে সূর্য্যের মন্দিরের সম্মুখে ছিল। সে মন্দির ধ্বংস হইবার পর উহাকে এখানে আনিয়া স্থাপিত করা হইয়াছে। স্তম্ভের পশ্চাতেই 'সিংহদ্বার'। তাহাতে বিরাট্ কপাটদ্বয়, এবং কপাটের সম্মুখে দুইপার্শ্বে দুইটি চতুষ্পদ মূর্ত্তি। উহাদিগকে সিংহ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতির জগতে এরূপ পাগাড়িদার সিংহ যে আছে, তাহা ত শুনিও নাই। বোধ হয়, শিল্পী সিংহ না দেখিয়াই আপনার কল্পনা হইতে এ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাহার অমানুষিক শিল্পপ্রতিভার কেবল এ সিংহমূর্ত্তিই কলঙ্ক।

সিংহদ্বার অতিক্রম করিলেই প্রথম প্রকোষ্ঠে পতিতপাবন এবং কাকচতুর্ভুজ নামধেয় দুই খণ্ড প্রস্তর। অন্ত্যজজাতীয়েরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পায় না। তাহারা এই পতিত-পাবনমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই উদ্ধার লাভ করে। এ জন্যই এ বিগ্রহের নাম পতিতপাবন। এ প্রকোষ্ঠ পার হইলেই মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, ভূমিতল হইতে অনুমান ত্রিশ ফিট উচ্চ, ডবল প্রাচীরের উপর প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত। শুনিয়াছি, দুইপ্রাচীরের মধ্যে কিছুস্থান ব্যবচ্ছেদ আছে, এবং সেই জন্যই বোধ হয়, সমুদ্রের গর্জ্জন এ প্রাচীর-অভ্যন্তর হইতে শুনা যায় না। প্রাঙ্গণটি এত বিস্তৃত যে, তাহাতে প্রায় পঞ্চাশহাজার যাত্রী অবলীলাক্রমে স্থান পাইতে পারে। এ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থান হইতেই শ্রেণীবদ্ধ চারিটি মন্দিরের চূড়া গগন স্পর্শ করিতেছে। প্রথমটি ভোগমন্দির, দ্বিতীয়টি নাটমন্দির, তৃতীয়টি দর্শনমন্দির, চতুর্থটি শ্রীমন্দির। এ মন্দিরাভ্যন্তরেই মস্তকসমান উচ্চ এক কৃষ্ণপ্রস্তর, বেদীর উপর বিরাট্ ত্রিমূর্ত্তি অবস্থিত—জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। মন্দিরের অভ্যন্তর দ্বিপ্রহর সময়েও তিমিরাচ্ছন্ন। 'পুনাং' নামক একরূপফলের তৈলেরমশাল ভিন্ন দিবাভাগেও মূর্ত্তির দর্শন পাওয়া যায় না। তাহাতে আবার যাত্রিগণ প্রায় মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারে না। দর্শন-মন্দিরের মধ্যভাগে একটি বৃহৎ চন্দনকাঠ আড়করিয়া রাখা হইয়াছে। যাত্রিগণ মেলার সময় মুহূর্ত্তমাত্র সেখানে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করে। বড় সন্দেহের বিষয়, তাহারা ত্রিমূর্ত্তির কিছুমাত্র দর্শন পায় কি না। প্রাঙ্গণের চারিদিকে সারিসারি ক্ষুদ্র কক্ষে নানাবিধ বিগ্রহ বিরাজ করিতেছেন, এবং চারিদিকে চারিটি প্রকাণ্ড দ্বার। প্রাঙ্গণের এক কোণায় রন্ধনশালা। তাহাতে এক এক উনানের উপর দশপনরটি হাঁড়ি সাজান, এবং এ ভাবেই সময় সময় লক্ষ যাত্রীর রন্ধন প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রাঙ্গণের অন্য কোণায় জগন্নাথের সমাধিক্ষেত্র। দ্বাদশ-বৎসর অন্তর ত্রিমূর্ত্তি কলেবর ত্যাগ করেন এবং উহা সেখানে প্রোথিত হয়। মন্দির সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, সত্যযুগে উহা স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কালক্রমে উহা সমুদ্রের বালিতে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া গিয়াছিল। এক দিন রাজা—স্মরণ হয়, তাঁহার নাম ললাটেন্দুকেশরী—সে স্থানের উপর দিয়া অশ্বারোহণে যাইবারসময় অশ্বের চরণ স্খলিত হয়। কিসে ঠেকিয়া স্খলিত হইল, তাহা দেখিতে গিয়া মন্দিরের চূড়া দৃষ্ট হয় এবং এরূপে মন্দির আবিষ্কৃত হয়। বোধ হয়, এ উপাখ্যানের অর্থ এই যে, মন্দিরের এক স্তর নির্ম্মিত হইলে তাহা বালিতে আচ্ছন্ন করা হইত এবং তাহার উপর দাঁড়াইয়া আর এক স্তর নির্ম্মিত হইত এরূপে না জানি, কত শত বর্ষে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র-বিপ্লবে নির্ম্মাণকারীর রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং এ কারণে মন্দির বালি-চাপা হইয়া পড়িয়া থাকে। মন্দিরাবলী কেবল প্রস্তরের উপর প্রস্তর স্থাপিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, অন্যরূপ মালমশলা কিছুই ব্যবহৃত হয় নাই। কেবল ইস্পাতের শিকের দ্বারা স্থানে স্থানে প্রস্তরে প্রস্তর গ্রথিত হইয়াছে মাত্র।

কেবল মন্দিরের নির্ম্মাণ-ইতিহাস কেন, ইহার ধর্ম্ম-ইতিহাসও অতীতের নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। ত্রিমূর্ত্তির এরূপ বিকৃত রূপ কেন হইল? যে অমর শিল্পী এ জগদ্বিস্ময়কর

মন্দিরাবলী নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সে কি আর তিনটি সুন্দর দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই? বিশ্বকর্ম্মার উপাখ্যান যে একটা আষাঢ়ে গল্প, তাহা আর এখনকার দিনে কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তারপর আরও বিস্ময়ের কথা, জাতিভেদমূলক হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান তীর্থে জাতিভেদহীনতা। ব্রাহ্মণও অম্লানমুখে চন্ডালের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করেন এবং তাহার পরও হস্ত মুখ প্রক্ষালন করেন না। ইহারই বা তাৎপর্য্য কি? তাহার পর জগন্নাথ স্বয়ং জগদীশ্বরস্বরূপে, কিম্বা বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণরূপে পূজিত হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার পার্শ্বে সুভদ্রা বলরাম কেন? ইঁহারা ত কাল্পনিক দেবমূর্ত্তি নহেন। দুইজনই ঐতিহাসিক চরিত্র। অথচ পূজিত হইবার যোগ্য কোনও কার্য্যই যে করিয়াছেন, তাহা কোনও পুরাণে, কি মহাভারতে নাই। আবার কৃষ্ণের পার্শ্বে তাঁহার কোনও পত্নীর, কি সর্ব্বত্র প্রচলিত রাধার মূর্ত্তি না থাকিয়া, তাঁহার ভগিনী সুভদ্রার মূর্ত্তিই বা কেন! সুভদ্রা তাঁহার সহোদরা ভগিনীও নহেন। খ্যাতনামা রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—শ্রীক্ষেত্র হিন্দুতীর্থই নহে, বৌদ্ধতীর্থ। বৌদ্ধদের ত্রিরত্নের—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ—তিন মণ্ডল ছিল। উহা প্রথমতঃ হিন্দুদের দেবদেবীর সম্মুখে রচিত মণ্ডলের মতই ছিল। পরে সে মণ্ডলের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া বৌদ্ধেরা তাঁহাদের পূজা করিত। মানুষ যে 'রূপকল্পনা', কি প্রতিমাভিন্ন নিরাকারের, কি শূন্যের ধ্যান করিতে পারে না, ইহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? কারণ, কোনও মূর্ত্তি বা প্রতিমাপূজা দূরে থাকুক, বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পর্য্যন্ত নীরব। যাহা হউক, প্রত্নতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, শ্রীক্ষেত্রের ত্রিমূর্ত্তি সেই ত্রিমণ্ডলের আকৃতি মাত্র। শংকরাচার্য্যের অভ্যুত্থানের পর যখন ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ নিরীশ্বর-অবস্থা-প্রাপ্ত মূর্ত্তি-পূজক বৌদ্ধধর্ম্ম অধঃপতিত ও বৈষ্ণবধর্ম্মে রূপান্তরিত হয়, তখন বুদ্ধমণ্ডল জগন্নাথে, ধর্ম্মমণ্ডল সুভদ্রাতে, এবং সঙ্ঘমণ্ডল বলদেবে, এবং শ্রীক্ষেত্র বিষ্ণুক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়। এখনও জগন্নাথ বুদ্ধাবতার বলিয়া পরিচিত। অতএব উক্ত প্রত্নতত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে ইহাই অকাট্য প্রমাণ। বোধ হয়, এ সময়েই বুদ্ধদেব হিন্দুদের নবম অবতার বলিয়া গৃহীত হন। কারণ, তাহা না হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম তখন ভারতবর্ষে এরূপ ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তৎস্থলে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের উপায়ান্তর ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মে জাতিভেদ নাই। শ্রীক্ষেত্রে এই জাতিভেদ এরূপ বিলুপ্ত হইয়াছিল যে, উহা পুনঃস্থাপিত করা অসম্ভব বলিয়া শ্রীক্ষেত্রে আর উহা প্রচারিত হয় নাই। প্রত্নতত্ত্বের সত্যতার ইহা দ্বিতীয় প্রমাণ। কেবল শ্রীক্ষেত্রে বলিয়া নহে,—কি পুষ্কর, কি গয়া, কি বিন্ধ্যাচল, কি কাশী, সর্ব্বত্র হিন্দুদের বর্ত্তমান দেবীমূর্ত্তি পর্য্যন্ত পুরুষ বুদ্ধমূর্ত্তি। পুষ্করের সাবিত্রী, গয়ার সর্ব্বমঙ্গলা, শৈলশেখরস্থিত বিন্ধ্যবাসিনীর গিরিকক্ষে এখনও বুদ্ধমূর্ত্তি। কে বলিল—ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছে? বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম, বিশেষতঃ অহিংসামূলক বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল সেশ্বর বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু ধর্ম্ম ও সঙ্ঘমণ্ডলের নাম সুভদ্রা ও বলরাম হইল কেন? বুদ্ধদেবের প্রধান সহায় তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। তদ্রূপ মহাভারতের ও ভাগবতের কৃষ্ণলীলার সহায় সুভদ্রা ও বলদেব। আমার এই ধারণাই আমার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের সুভদ্রার ও বলরামের চরিত্রের ভিত্তি।

শ্রীমন্দির দর্শন করিয়া সেদিন কার্য্যভার গ্রহণ করি এবং অপরাহ্নে ও পরদিন অন্যান্য তীর্থ দর্শন করি। শ্রীমন্দিরের পর উল্লেখযোগ্য 'চন্দনতালাও'। এটি একটি বিস্তৃত দীর্ঘিকা। তাহার কেন্দ্রস্থলে এক মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত। স্থানটি মনোমুগ্ধকর। এখানে প্রতি বৎসর একটা মেলা হইয়া থাকে, তাহাকে 'চন্দনযাত্রা' বলে।

তাহার পর 'মার্কণ্ডেয় সরোবর'। ইহাতে যাত্রীরা অবগাহন করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করে এবং পিণ্ড জলে নিক্ষেপ করে। ইহার ফলে সরোবরটি প্রায় জলশূন্য, একরূপ সবুজ তরল কর্দ্দমে পরিপূরিত। তাহা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ উত্থিত হইতেছিল যে, তাহার কাছে যাইতে নাসিকা আচ্ছাদিত করিতে হইয়াছিল।

পুরীর প্রধান শোভা সমুদ্র। যাত্রীদিগকে পাণ্ডারা সমুদ্রতীরে লইয়া, অনন্ত সমুদ্রের দিকে দেখাইয়া, বলে—ওই স্বর্গদ্বার দর্শন কর। বাস্তবিকই শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রশোভা স্বর্গীয় শোভাবিশেষ। নগরের প্রান্তের পর প্রায় অর্দ্ধক্রোশব্যাপী অনন্ত অমল শ্বেত বালুকা-রাশিপূর্ণ সাগরবেলা। তাহার পর অনন্তনীললীলাময় অনন্ত সাগর সুদূর আকাশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সেই শোভা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই প্রাতে গভীর কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চল সলিলক্রীড়া; তাহার পর বালসূর্য্যকিরণে প্রোদ্ভাসিত আর এক শোভা। আবার মধ্যাহ্নে প্রখর রবি-কিরণ-প্রতিবিম্বিত আর শোভায় নয়ন ঝলসিয়া যাইতেছে। তাহারপর আবার সান্ধ্য রবিকিরণে সিন্দূরমণ্ডিত নয়নমুগ্ধকর শোভা। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, আবার তাহার পর তরঙ্গ, লহরে লহরে বেলায় আসিয়া প্রহত হইতেছে এবং ফেনরাশি উদ্গীর্ণ করিয়া, দিবসে যূথিকামালার এবং নিশীথে অনন্ত নক্ষত্রমালার দীর্ঘ কণ্ঠভূষণে বেলাভূমিকে ভূষিত করিতেছে। সৈকতপ্রান্তে দাঁড়াইয়া যে একবার এই শোভা দর্শন করিয়াছে, সে উহা কখনও ভুলিতে পারিবে না। সৈকতপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকনির্ম্মিত রাস্তা। তাহার পার্শ্বে স্থানে স্থানে বেঞ্চ পাতা রহিয়াছে। এই বেঞ্চে বসিয়া যখন প্রভাতে ও সায়াহ্নে সমুদ্রশোভা দেখিতাম, তখন যেন সংসার ভুলিয়া যাইতাম। এই বিস্তীর্ণ সৈকতভূমিতে বিচারালয় ও কয়েকটি সুন্দর বাংলা শোভা পাইতেছে।

শ্রীক্ষেত্রের এই শোভা দেখিয়া দুইটাদিন বড় আনন্দে কাটাইলাম। তৃতীয়দিবস ছোটভাই তিনটিকে ও দাসদাসীগণকে লইয়া শাশুড়ী পঁহুছিলেন। ভাই তিনটি গাড়ী হইতে নামিয়াই মন্দিরে গিয়াছিল। আমিও সায়াহ্নে সেইখানেই বেড়াইতে গিয়াছিলাম। নিবারণ আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুভ্রাতা। সে আমাকে দেখিয়া 'বড দাদা, বড় দাদা' বলিয়া ছুটিয়া গেল। আমি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। এই কান্না এবং প্রাণে এ উচ্ছ্বাস কেন যে আসিল, আমি তখন বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের দুইভায়ের এই দৃশ্য দেখিয়া, যে সকল ভদ্রলোক আমার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের চক্ষুও সজল হইল। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া, আমি অকারণ কাঁদিতেছি বলিয়া, আমাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—"তাহারা নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পঁহুছিয়াছে, আপনি এখন এত অধীর হইলেন কেন?" আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম—"আমি এই পিতৃমাতৃহীন শিশুদিগকে কোথায় আনিয়া ফেলিলাম!" মোহান্ত নারায়ণদাস গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—"এরূপ ভ্রাতৃস্নেহ বড় বিরল। জগন্নাথ তাহাদিগকে রক্ষাকরিবেন।" তিনি আমার ও তাহাদের মাথায় হাত দিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমাদিগকে শ্রীমন্দিরের মধ্যে লইয়া জগন্নাথকে প্রণামকরাইয়া চরণামৃত খাওয়াইলেন। আমি সেদিন যে ভক্তিভরে শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলাম, সেই ভক্তি আমার হৃদয়ে তৎপূর্ব্বে কখনও উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু শ্রীভগবানের কাছে প্রণত হইয়া যে ভিক্ষা চাহিয়াছিলাম তিনি তাহা দিলেন না।

দারুণ শোক

ভাইদের পঁহুছিবার দ্বিতীয়দিন প্রাতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহানন্দবাবু আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন এবং বলেন যে, আমার এ বাড়ীতে এবং সহরের মধ্যে থাকা তিনি ভাল বিবেচনা করেন না। সহর নরকবিশেষ, এবং যাত্রীদিগের নিত্য সমাগমে নানাবিধ রোগের ক্রীড়াভূমি। তিনি নিজে সে জন্য সমুদ্রতীরে একটি ক্ষুদ্র বাংলায় থাকেন। কিন্তু স্ত্রী সে কথা কোনও মতে শুনিলেন না। এটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পাকাবাড়ী, প্রশস্ত বড় 'ডাণ্ড'-এর উপর, পশ্চাতে বেশ একটু ফুলের বাগান আছে, এবং ঠিক শ্রীমন্দিরের সম্মুখে। তাঁহারা নিত্য জগন্নাথ দর্শন করিতে পারিবেন, সেজন্য এ বাড়ী তাঁহার ও তাঁহার মাতার বড়

পছন্দ হইয়াছিল। সঙ্গে তিনটি শিশুভাই—প্রাণকুমার, অতুল ও নিবারণ। নিবারণের বয়স দশবৎসর মাত্র। তাহারাও এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে না। কারণ এ বাড়ী হইতে সহরের সকল তামাসা দেখা যায়। সমুদ্রতীর সহর হইতে প্রায় দুইমাইল ব্যবধান। তৃতীয়দিবস প্রাতে নিবারণ স্ত্রীকে লইয়া পিছনের বাগান দেখাইল এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার কাছে বাগানের কতগল্প করিল। স্ত্রীও বলিলেন—"তুমি যাইয়া দেখ কেমন সুন্দর বাগান। মহানন্দবাবুর কথায় আমরা এ বাড়ী ছাড়িয়া সমুদ্রতীরে সে বালির ভিতর যাইব না। সেখান হইতে বাজারও বহুদূর হইবে।" এমন সময় কে একজন আমার সঙ্গে দেখাকরিতে আসিলেন। স্ত্রী নিবারণকে লইয়া সরিয়া গেলেন। আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতেছি, এবং শুনিতেছি ভাইতিনটি ছাদেরউপর ছুটাছুটি করিতেছে এবং কত আনন্দ করিতেছে। একটু পরেই স্ত্রী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, নিবারণ একবার পাত্‌লা বাহ্যে গিয়াছে ও তারপর বমি করিয়াছে। শুনিয়াই চোক কপালে উঠিল। আমি ছুটিয়া গেলাম। সে আবার বাহ্যে ও বমি করিল এবং তাহার চেহারা কেমন বিকৃত হইয়া উঠিল। তখনই ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইলাম এবং আমার সঙ্গে যে কেম্ফার, ক্লোরোডাইন ও কলেরা পিল ছিল তাহা খাওয়াইতে লাগিলাম। স্ত্রী তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়াছেন। সে দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইয়া তাঁহার বুকের উপর মাথা ফেলিয়া রহিল। ঔষধ কোনটিই রাখিতে পারিতেছে না। যাহা খাওয়াইতেছি, তাহাই বমি করিতেছে। আমি কাঁদিতে লাগিলাম। কিন্তু শিশুর প্রাণে এত সাহস, সে আমাকে বলিতে লাগিল,—"বড় দাদা, তুমি কাঁদিও না। আমার কোনও অসুখ হয় নাই, ডাক্তার আসিলে এখনই ভাল হইব।" দেখিতে দেখিতে নেটিভ ডাক্তার আসিয়া পেঁছিলেন এবং একটু পরে সিভিল সার্জ্জন বঙ্কুবিহারী গুপ্ত আসিলেন। তাঁহারা বলিলেন—'কলেরা'। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। এ সুদূর প্রবাস, আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, সবে ছয় দিন মাত্র পেঁছিয়াছি, সঙ্গে দুইটি স্ত্রীলোক ও একটি ভৃত্য মাত্র। আমি আত্মহারা হইলাম, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের অনেক ভদ্রলোক আসিলেন ও চিকিৎসার পরাকাষ্ঠা করাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। ১০টার সময়—তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে—নাড়ি লুপ্ত হইল, এবং সে সবল, সুন্দর শিশুমূর্ত্তি ছায়ামাত্রে পরিণত হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। দারুণ পিপাসা। আমি আর সে দৃশ্য দেখিতে পারিলাম না। অন্য কক্ষে আসিয়া গৃহভিত্তির পাথরে বুক রাখিয়া কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। আর সমবেত ভদ্রলোকদিগকে বলিতে লাগিলাম—"আপনারা আমাকে এ পিতৃমাতৃহীন শিশুকে ভিক্ষা দিন। আমি কেন এ অনাথ শিশুকে এ দূরদেশে আনিয়াছিলাম!" তাঁহারা আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। শীতকালের তুষারশীতল পাষাণেও আমার বুক শীতল হইতেছিল না। বুকের ভিতর পাঁজারআগুন জ্বলিতেছিল। নিবারণ কেবল মুহুর্মুহু আমাকে ডাকিতেছিল, এবং পিপাসায় বুক ফাটিয়া যাইতেছে বলিয়া জল চাহিতেছিল। কারণ ডাক্তারেরা জল দিতেছিলেন না। বলিতেছিল—"দাদা! তুমি আমার মুখে একটু জল দাও, ও আমাকে একবার বুকে নেও, তা হইলে আমি ভাল হইব।" স্ত্রীও শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছেন, তাঁহাকেও বলিতেছিল —"মা! (সে পূর্ব্বে কখন তাঁহাকে মা ডাকে নাই) তুমি আমাকে জল দাও, বুকে নেও।' এরূপে একবার তাঁহাকে ও একবার আমাকে বুকে লইতে বলিতেছিল। তাহার সে কাতর-উক্তি ও রোগযন্ত্রণায় এবং সে শোকদৃশ্যে পাষাণ গলিয়া যাইতেছিল। সমবেত ভদ্রলোকেরা পর্য্যন্ত কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছিলেন। আমাকে অস্থির দেখিয়া শিশু এক একবার বলিতেছিল—"দাদা! তুমি অন্য ঘরে যাও, আমি বেশ ভাল হইয়াছি, তুমি কাঁদিও না।" আবার এক মুহূর্ত্ত পরে ডাকিয়া পাঠাইতেছিল। এরূপে দিন কাটিতে লাগিল। কি শোকের দিন! যেন এক এক মুহূর্ত্ত এক এক বৎসর। সে এক এক মুহূর্ত্তে যেন শতবার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। পিতৃব্য দুইজনের ওলাউঠা রোগশয্যা ও রোগযন্ত্রণা দেখিয়াছি, কিন্তু

১০ বৎসরের শিশুর সে সাহস, সে রোগযন্ত্রণা, সে পাষাণ-দ্রবকারী স্নেহাভিনয়, তাঁহারাও দেখাইতে পারেন নাই। অপরাহ্নে ক্রমে অজ্ঞান হইয়া আসিতে লাগিল। শরীর উষ্ণ রাখিবার জন্য ডাক্তারেরা গায়ে নানাবিধ পাউডার মাখাইতে লাগিলেন ও ব্র্যাণ্ডি দিতেছিলেন। নেশায় তাহার আকর্ণবিস্তৃত প্রশস্ত নেত্র ঢুলু ঢুলু করিতেছিল, এবং সময় সময় অজ্ঞান হইয়া শিবনেত্র হইতেছিল। মুখে তখন আর কোন কথা ছিল না, কেবল এক একবার স্ত্রীকে বলিতেছিল—"মা!—আমাকে বাঁচাইতে পারিলে না!" আর আমাকে ডাকিয়া লইয়া কেবল বুকে লইতেছিল, আর ভগ্নকণ্ঠে বলিতেছিল—"দাদা , তুমি ও আমি।" ইহার অর্থ কি? এ দুটি কথার ভিতর কি গভীর স্নেহ, কি করুণ উচ্ছ্বাস! দশমবর্ষীয় শিশুর হৃদয়ে এ গভীরতা, এ উচ্ছ্বাস, কোথা হইতে আসিল? আর থাকিয়া থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছিল —"জয় জগন্নাথ!" শিবনেত্র করিয়া শয্যায় যেন শিশু-শিব পড়িয়া আছে ও থাকিয়া থাকিয়া তারকব্রহ্ম নাম ডাকিতেছে। এ নামই বা এ শিশুকে কে শিক্ষা দিল! ইহা কি তাহার জন্মান্তরীণ সংস্কার নহে? কোন নরদেবের জীবাত্মাতে বুঝি কর্ম্মফলের একটিমাত্র রেখা ছিল, তাহা মুছাইতে বুঝি কেবল ১০ বৎসরের জন্য তিনি এ ধরাধামে পাপিষ্ঠ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া আসিয়াছিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সেই তারকব্রহ্ম নাম ডাকিতে ডাকিতে শিশু তাঁহার চরণতলে, আমার ত্রিদিবস্থ পিতামাতার কোলে, চলিয়া গেল। এ দাসত্ব-জীবনের দুর্গতিতে এক শিশুভ্রাতাকে সুদূর পশ্চিমে, সুরনদীর সলিলে ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। আর একটিকে এ পবিত্র শ্রীক্ষেত্রের স্বর্গদ্বারে অনন্ত সাগরে ভাসাইয়া দিলাম! যে নরপিশাচদিগের ষড়যন্ত্রে আমি জন্মভূমি হইতে এ অনাথ শিশুদের লইয়া নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম, আজ তাহারা আমাকে দেখিলে বোধ হয় তাহাদের পশু-হৃদয়েও দয়ার উদ্রেক হইত। তথাপি শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে ক্ষমা করুন। এ হতভাগার সম্বন্ধে আরও একটি বিস্ময়কর কথা আছে। পিতা তাহাকে ৫ মাসের ও মাতা বৎসরেকের মাত্র রাখিয়া যান। আমার পিতৃব্যপত্নী তাহাকে প্রতিপালন করেন, এবং সে তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিত, মা বলিয়া জানিত। আমার বিপদের পর শ্রীক্ষত্রে বদলি হইলে, স্ত্রী যখন কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তখন সে ধরিয়া বসিল যে তাঁহার সঙ্গে সেও আসিবে। খুড়ীমা তাঁহাকে রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিলেন, কত কাঁদিলেন, সে কিছুতেই রহিল না। কলিকাতায় স্ত্রী পেঁৗছিলে, তাহাকে সঙ্গে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম, এবং স্ত্রীকে ভর্ৎসনা করিলাম। কিন্তু সে আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"বড়দাদা! আমি বাড়ীতে থাকিব না, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া পড়িব।" আমি তাহাকে বুকে লইয়া ষ্টীমারেই কাঁদিলাম। তাহার পরে তাহাকে কতবার বাড়ী পাঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই গেল না। আমি মনে করিয়াছিলাম, সে খুড়ীমাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে পারিবে না, কোন দিন তাঁহার জন্য কাঁদিতে আরম্ভ করিবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাদের বুকে বজ্রাঘাত করিয়া চলিয়া যাইবার সময় পর্য্যন্ত কখনও তাঁহার নাম করে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রী তখন সসত্ত্বা। তাহা লইয়া তাহার আনন্দ কত! সে সর্ব্বদা গঙ্গাস্নান করিতে ও কালীদর্শন করিতে যাইত, এবং ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে বলিত যে, সে সর্ব্বদা কালীমার কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকে যে তাহার যেন একটি ভ্রাতুষ্পুত্র হয়। স্ত্রী একদিন বলিলেন যে, তাহাকে কে বিদেশে খাওয়াইবে, রাখিবে। শিশু বলিল—"কেন, আমি তাহাকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া রাখিব, তুমি তাহাকে খাওয়াইবে" সর্ব্বদা তাহার মুখে এ কথাই ছিল। তাহার মনের ভাব এরূপ আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তিত কেমন করিয়া হইল, এবং এ সকল ধারণা তাহার মনে কোথা হইতে আসিল! সত্য সত্যই কি সে কোনও পুণ্যাত্মা, কর্ম্মফলের রেখা কাটাইতে আসিয়াছিল, এবং শ্রীক্ষেত্র তীর্থস্থান বলিয়া এরূপ জিদ করিয়া স্ত্রীর সঙ্গে আসিয়াছিল! জগন্নাথ! তোমার লীলা অনন্ত অজ্ঞেয় রহস্যপূর্ণ! আমি ক্ষুদ্র অন্ধ কীট, তাহার কি বুঝিব?

আমরা সে রাত্রি কি ভাবে কাটাইয়াছিলাম, তাহা লিখিবার ভাষা নাই। এ সময়েও একটি আশ্চর্য্য ঘটনা হয়। সে সকালবেলা ছাদের উপর যেরূপ ছুটোছুটি করিয়াছিল, সেরূপ সমস্ত রাত্রি ছাদের উপর এবং যে কক্ষ হইতে সে চলিয়া যায়, সে কক্ষে ভয়ানক ছুটোছুটির শব্দ হইতেছিল। যেন কত লোক ছুটাছুটি করিতেছে! চোরের আশঙ্কা করিয়া ভৃত্যেরা সে ঘরে ও ছাদে কয়েক বার গিয়া দেখিয়া আসিল, কিন্তু কিছুই দেখিল না। আমরা সকলেই শোকে ও ভয়ে জড়সড় হইয়া একটি রাত্রি কাটাইলাম। সকালে মহানন্দবাবু আসিয়া বলিলেন যে, বাড়ীটা ভূতাশ্রিত (Haunted house) বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। যে সে বাড়ীতে রহিয়াছে তাহারই এরূপ বিপদ হইয়াছে। বিশেষতঃ বাড়ীটির সংলগ্ন একটি ধর্ম্মশালা. তাহাতে ভিক্ষুকেরা থাকে. ও প্রায় ওলাউঠা হইয়া থাকে। এমন কি আমি আসিবার পূর্ব্বদিনও ওলাউঠায় সেখানে লোক মরিয়াছে। এজন্যই এখানে না থাকিয়া সমুদ্রতীরে গিয়া থাকিতে তিনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই দণ্ডেই এ বাড়ী ছাড়িয়া সমুদ্রের তীরে গিয়া থাকিতে বিশেষরূপে অনুরোধ করলেন। কিন্তু সমুদ্রের তীরে বাড়ী কোথায় যে, সেখানে গিয়া থাকিব? শেষে অনেক চিন্তার পর, সেখানে যে একটি 'ইন্‌স্পেক্‌সন্‌ বাঙ্গালা' আছে, টেলিগ্রাফের দ্বারা মফঃস্বল হইতে মাজিস্ট্রেটের অনুমতি আনাইয়া আমরা তখনই সে গৃহে চলিয়া গেলাম। কিন্তু সে গৃহটিও শ্রীক্ষেত্রের মহাশ্মশান, স্বর্গদ্বার হইতে অর্দ্ধ মাইল ব্যবধান। সে স্বর্গদ্বারেই আমার হতভাগ্য শিশুভ্রাতার পাকা সমাধি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলাম। তাহা প্রায় এ গৃহ হইতে দেখা যাইত। অতএব সে স্থানটিও আমাদের পক্ষে শান্তিপ্রদ হইল না। তদ্ভিন্ন সে ঘরের সম্মুখস্থ সমুদ্রতীরে অনেক সময়ে শবের অস্থি পঞ্জর সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া লাগিত, এবং ঘরটিতে বড়ই ভয় বোধ হইত। কিন্তু যাই কোথায়? এরূপ সংকটাবস্থায় একদিন ভ্রাতৃশোকে কাঁদিতে কাঁদিতে পুরীর জনৈক জমিদার লোকনাথ রায়কে বলিলাম,—"আপনারা যদি দয়া করিয়া নির্ব্বাসিত আমাদের জন্য দুইএকখানি ঘর সমুদ্রসৈকতে নির্ম্মাণকরেন, তাহা হইলে আমরা এরূপ বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতে পারি।" প্রথম সাক্ষাৎ হইতেই তাঁহার ও আমার মধ্যে কেমন একটি আন্তরিক সহানুভূতি হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা আমাকে দেখিতে আসিতেন এবং এ দিন আমার এ শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ কথা শুনিয়া তিনিও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন—"আমি আপনার জন্য একখানি বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিব। কিরূপ বাড়ী হইলে সুবিধা হইবে, আপনি আমাকে একটি নক্সা আঁকিয়া দিবেন, এবং সে বাড়ী প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্ত যে একটি পুরাতন বাংলা আছে, তাহার মালিকের সঙ্গে ভাড়া ঠিক করিয়া ও বাসোপযোগী সংস্কার করাইয়া দিব, আপনি সেখানে গিয়া থাকুন।" আমি তখনই তাঁহার সঙ্গে বহির্গত হইয়া সেই বাড়ীখানি দেখিতে গেলাম। বেশ বড় বাংলা, কিন্তু জীর্ণ শীর্ণ এবং সমুদ্রের বালিতে কতকাংশ নিমজ্জিত। শুনিলাম পুরীতে নিমকমহাল থাকিতে এরূপ অনেক বাংলা ছিল। তাহার মধ্যে যে তিনটি বাংলাতে মাজিস্ট্রেট, পুলিশ সাহেব ও ডাক্তার সাহেব থাকেন, সে তিনটি মাত্র এখন আছে। অবশিষ্ট সকলই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অতি সুন্দর সুন্দর বাংলার শূন্যভিত্তি এখনও স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিয়াছে। এ বাড়ীটির নিকটেই একটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম সৈকতভূমির উপর একটি সুন্দর বাড়ীর ভিত্তি পড়িয়া আছে। তাহার উপর দাঁড়াইলে বহুদূর পর্য্যন্ত সমুদ্রশোভা চিত্রপটের মত দেখায়। আমি লোকনাথবাবুকে এ ভিত্তির উপর একটি বাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিলাম এবং সেখানেই ছাতার অগ্রভাগ দিয়া বালিতে একটি ঘরের নক্সা আঁকিয়া দেখাইলাম। লোকনাথবাবু কণ্ট্রাক্টার। তাঁহার সঙ্গে কাগজ, পেন্সিল ছিল, তিনি সে ছবিটি কাগজে আঁকিয়া লইলেন এবং সেখানেই তাঁহার নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করা স্থির হইল। ইহার দুইদিন পরে সে ভগ্ন বাংলাটি তিনি বাসোপযোগী করিয়া দিলে আমরা ভগ্নহৃদয়ে সে গৃহে প্রবেশ করিলাম। সে বাংলাটিও

সমুদ্রের উপরে। যখন ভ্রাতৃশোকে বড় অধীর হইতাম, তখন সেই অনন্ত সমুদ্রসলিলে সে শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়া হৃদয় কিছু শান্ত হইলে গৃহে ফিরিতাম। স্ত্রী আসন্নপ্রসূতি। ভগবান্ এমন সঙ্কটে ফেলিয়াছিলেন যে, গৃহে আমার কাঁদিয়া শোক নিবারণ করিবারও উপায় ছিল না। আপনার শোক চাপিয়া রাখিয়া স্থির ধীরভাবে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে হইত। হায় দাসত্ব-জীবন!

ইন্‌স্পেক্‌সন্ বাঙ্গলায় থাকিবার সময়ে আমি যখন বড় শোকে কাতর, একদিন স্ত্রী আসিয়া তাঁহার অশ্রু মুছিয়া আমাকে বলিলেন—"যে হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোকটি আমাদের সঙ্গে ষ্টীমারে আসিয়াছিল, এবং মার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পথ আসিয়াছিল, সে প্রত্যহ আসিয়া আমাদের খবর লইয়া যায়। তাহার তীর্থ-দর্শন শেষ হইয়াছে, কাল চলিয়া যাইবে। সে একবার তোমাকে দেখিতে চাহে।" কি বিচিত্র কথা! তাহাকে আসিতে দিতে বলিলে স্ত্রী তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। সে আমার কক্ষদ্বারের এক কপাটে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ আমার দিকে শান্ত স্থির করুণ-নয়নে চাহিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কক্ষদ্বারে যেন ঠিক একটি করুণাময়ী দেবীমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। আমিও তাহার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া আছি, এবং দুইধারায় অশ্রু আমার উপাধান সিক্ত করিতেছে। এরূপে কিছুক্ষণ করুণ, কাতর, বিষণ্ণ নয়নে আমাকে চাহিয়া দেখিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, এবং তাহার পুষ্পনিভ করদ্বয় ললাটে সংযুক্ত করিয়া, আমাকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। যতদূর দেখা যাইতেছিল, সে বারম্বার মুখ ফিরাইয়া আমাকে সতৃষ্ণনয়নে সৈকতভূমি হইতে দেখিতেছিল। হায় ভগবান্! অপরিচিত আমার প্রতি এ রমণীর এই প্রীতি বা প্রেম, এই স্নেহ বা সহানুভূতি কোথা হইতে আসিল! এখনও একটি সুখ-স্বপ্নের মত তাহার স্মৃতি আমার হৃদয়ে নীল সরোবরগর্ভে চন্দ্ররেখার মত ভাসিয়া উঠে। আমি তাহাকে এ জীবনে আর দেখি নাই। মনুষ্যজীবন কি বিচিত্র প্রহেলিকা ও মরীচিকা!

অশ্রু-অন্তরালে হাসি

নভেম্বরমাসের শেষভাগে অমেঘে বজ্রের মতন এ শোকহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া পতিত হয়। অগ্রহায়ণমাসের শেষভাগে সেই সিন্ধুসৈকতস্থ ভগ্ন গৃহে একটি পুত্র, আমার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই স্ত্রী বলিলেন, নিবারণ ফিরিয়া আসিয়াছে। আমিও দেখিলাম, নিবারণ ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার মুখ চোখ দেখিয়াই নিবারণকে মনে পড়িল। শ্রীভগবানের জগতে সুখ দুঃখ চক্রের মত আবর্ত্তিত হয়। অশ্রুর অন্তরালে হাসি, এবং হাসির অন্তরালে অশ্রু থাকে। তাহা না হইলে বুঝি মানুষ হাসিয়া আনন্দ পাইত না, কাঁদিয়া শান্তি পাইত না। আমার রচিত একটি গান আছে :-

> "হাসি-কান্না-ভরা এই ধরাতল,
> হাসি-অন্তরালে থাকে অশ্রুজল ;
> অশ্রু-অন্তরালে হাসি সমুজ্জ্বল,—
> সূক্ষ্ম নীতি নিয়ম তার।"

১৮৭৭ সনের জুনমাসে রোগগ্রস্ত ও বিপদস্থ হইবার পর ১৮৭৮ সনের ফেব্রুয়ারিমাসে হৃদয়ে এই প্রথম একটি সুখের আলোকরেখা সঞ্চারিত হয়। তাহাও অবিমিশ্র কি? জেলার মাজিষ্ট্রেট আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ সাহেব এ সংবাদ শুনিয়াই আনন্দ প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্র লিখিলেন। আমি চিরকালই কিছু বিবেচনাশূন্য এবং অসংযতহৃদয়। আমি তাহার উত্তরে লিখিলাম—"আপনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সুখী এবং কৃতজ্ঞ হইলাম। কিন্তু

আমি হাসিব কি কাঁদিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যখন শিশুর মুখ দেখি তখন আনন্দিত হই ; কিন্তু যখন তাহার ভবিষ্যৎ ভাবি তখন হৃদয় বিষাদে ডুবিয়া যায়।" তিনি তাহাতে চটিয়া গেলেন, এবং কেন এরূপ বিষাদের কথা লিখিয়াছি, আমাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তখন আমাদের বাঙ্গালী-জীবনের দুর্গতির একটি ছবি আঁকিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এ শিশুর ভবিষ্যৎ যখন এরূপ দুর্গতিপূর্ণ হইবে বুঝিতেছি, তখন কি করিয়া আনন্দিত হইব? এরূপ দুঃখীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি সুখ? তিনি বলিলেন, এ কথা মনুষ্যমাত্রকেই খাটে। আমার সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যেমন আমি চিন্তিত হইতেছি, তাঁহার সন্তানদের সম্বন্ধে তাঁহারও সে অবস্থা। তিনি একটি গোঁয়ার গণেশ হইলেও সদাশয় লোক ছিলেন। তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিব।

আমি ত সেই ঘোরতর ঝড় বজ্র উত্তীর্ণ হইয়া পুরীতে আসিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমি চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছি, শুনিয়া তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'হিন্দু পেট্রিয়টে'র চট্টগ্রামের পত্রলেখক কে? আমিও গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মত ভাবিলাম—"ঐ গো নাম চায়।" সে প্রাণের ভয়ে উত্তর দিয়াছিল—"আজ্ঞা! এখন সেখ দিগ্‌গজ।" আমিও চাকরীর ভয়ে উত্তর দিলাম—"আমি কেমন করিয়া বলিব? যে সংবাদপত্রে লেখে, সে তাহার নাম তাহার গৃহিণীর নিকটেও প্রকাশ করে না।" তিনি তখন বলিলেন, তিনি উক্ত পত্র-প্রেরকের একজন খুব গোঁড়া। তাঁহার রোডসেস্‌-হেডক্লার্ক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' লইয়া থাকে। তিনি তাহাকে বলিয়া রাখিয়াছেন যে, কাগজখানি আসিলেই যেন তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দেয়। তিনি খুলিয়াই চট্টগ্রামের পত্র আছে কি না সর্ব্বাগ্রে দেখেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার বিশ্বাস সে পত্রগুলি কোন ইংরেজের লেখা, কারণ এমন সুন্দর ও রসিকতাপূর্ণ ইংরাজী কোনও বাঙ্গালীর লেখা সম্ভব নয়। লাক্‌ টাকা দিলেও তিনি চট্টগ্রামে মাজিষ্ট্রেট হইবেন না। শেষ পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিলেন, এবং বলিলেন যে, পত্র-প্রেরকটি ইন্দুরের মত গর্ত্তে লুকাইয়া কেবল নাকটি মাত্র নিউবেরিকে দেখাইয়া, তাহাকে পঞ্চাশ রকমের "বেরি" ডাকিয়াছে। তিনি খুব হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ভয় হইল, এ কি কোনও মতে লেখকের নাম জানিতে পারিয়াছে! বলা বাহুল্য যে, লেখক আর কেহ নহেন, এ পক্ষ। সে সকল পত্রে দেশে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণদাসবাবু স্বয়ং আমাকে এক দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি পত্রপ্রেরক বলিয়া কি লোকের কাছে বলিয়া থাকি! আমি বলিলাম—তিনি কেন এমন কথা বলিলেন! তিনি বলিলেন যে, তিনি যেখানে যান, সকলেই তাঁহাকে এ পত্রপ্রেরক কে, জিজ্ঞাসা করেন। এমন কি, লাহোরে একজন আমার নাম করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি কে! শুনিলাম—প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি এখন লাহোর চীফ কোর্টের জজ। আমি বলিলাম, প্রতুল আমার সহপাঠী ও সহোদরসম বন্ধু। তিনি আন্দাজে বলিয়া থাকিবেন। একদিন কৃষ্ণনগর বেড়াইতে গিয়াছি। সেখানে একজন ছাত্র—তিনি এখন বিখ্যাত লোক—মিঃ এ. চৌধুরী, বার-এট্‌-ল—হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কি হিন্দু পেট্রিয়টের চট্টগ্রাম-পত্রলেখক? এ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহাদের কলেজের প্রিন্সিপাল রো সাহেব চট্টগ্রামের পত্র বাহির হইলেই কলেজে লইয়া তাঁহাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন, এবং অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলেন যে, কৃষ্ণনগরের ইংরাজ মহলে এ পত্রপ্রেরক বড় Popular (প্রশংসিত)। যাহা হউক, আমি কোনও মতে সেখ বিদ্যাদিগ্‌গজের মত মানে মানে আরম্‌-ষ্ট্রঙ্গ সাহেবের কাছে বিদায় হইয়া আসিলাম। লোকটি সদাশয় না হইলে অন্য সিবি-লিয়ানদের নিন্দায় এরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেন না অন্য ইংরাজ হইলে 'হিন্দু পেট্রিয়ট ছিঁড়িয়া, তাহার উপর সপ্তবার পদাঘাত করিত।

আমার ৩০ বৎসর বয়সের সময়ে, এবং বিবাহের ১৩ বৎসর পরে, এই প্রথম সন্তান

হইল। সমুদ্রতীরে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলাম 'নীরেন্দ্র'। এ হইতে শ্রীক্ষেত্র-জীবন একটু বেশ আনন্দে কাটিতে লাগিল। দিল্লী-দরবারের সম্বৎসর উপস্থিত হইলে আমোদপ্রিয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন আদেশ প্রচার করিলেন—তাঁহার সেই অপূর্ব্ব কীর্ত্তির সাম্বৎসরিক উৎসব করিতে হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল হইতে সে আদেশপত্র আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া, উৎসবের আয়োজন করিতে লিখিলেন। আমি তদনুসারে পুরবাসী-দিগের একসভা আবাহন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিলাম, এবং তাহার দ্বারা শ্রীমন্দির ও তাহার সম্মুখস্থ অরুণস্তম্ভ আপাদমস্তক আলোকরাশিতে খচিত করিয়াছিলাম। মন্দিরের কিছু দূরে 'বড় ডাণ্ডে'র মধ্যস্থলে আর একটি সুন্দর আসর নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। শ্রীক্ষেত্রে এমন আসর কেহ কখনও দেখে নাই। কাশীর মহারাজার প্রদত্ত জগন্নাথদেবের একটি অতিশয় সুন্দর ও মূল্যবান্ তাম্বু আছে। মকমলের উপর সোনার জরি। আসরের এক সীমায় সেই তাম্বু সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। তাহাতে আসরের আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব শোভা দেখাইতেছিল। তাম্বুর কাণাতে যেন শতসহস্র নক্ষত্র ঝলসিতেছিল। সে তাম্বুর মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য উচ্চ বেদীতে সুন্দর আসন স্থাপিত করা হইয়াছিল। তিনি সেখানে বসিয়া অভিনন্দন-পত্র গ্রহণ করেন, এবং সংস্কৃত ও উড়িয়া ভাষার কবিতা শ্রবণ করেন। অনেকে অনুরোধ করাতে আমিও সে ভাষাতে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। সে কবিতাটি 'উৎকলদর্শন' কাগজে মুদ্রিত হইয়াছিল। একটু জিদে পড়িয়া সে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার উপর মন্দিরের ভার দেওয়াতে মন্দিরের কার্য্যাদির উন্নতিকল্পে আমি একটি মন্দির-কমিটি গঠিত করিয়াছিলাম। তাহাতে শ্রীক্ষেত্রের শীর্ষস্থানীয় জমিদার ও মোহান্তগণ সভ্য ছিলেন। এক-দিন মন্দির-কমিটিতে কি একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রস্তাব হয়; এবং একজন উড়িয়া আম-লাকে উহা লিখিতে বলি। সে উহা লিখিয়া আনিলে আমি অনুমোদন করিনা এবং হাসিয়া বলি—"আচ্ছা, বিজ্ঞাপনটি আমি উড়িয়া ভাষায় লিখিতেছি।" সকলে শুনিয়া বিস্মিত হন। কারণ, আমি কেবল সম্প্রতি মাত্র শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছি। মোহান্ত নারায়ণদাস বলেন—'আপনে লিখিতে পারিবে ত মুই আপনঙ্ক গোটিয়ে পারিতোষিক দিবে।' তখন আমি জগন্নাথদেবের মুখের মত গোলাকৃতি শ্রীঅক্ষরমালা সাজাইয়া সে বিজ্ঞাপনটি লিখি এবং বলি যে, আমি উড়িয়া ভাষায় কবিতা লিখিব। মোহান্ত নারায়ণদাস তাহার জন্য একটি বাজি রাখেন যে, তাহা পারিলে তিনি আমাকে একটা প্রকাণ্ড নিমন্ত্রণ দিবেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আলো ও আসরসজ্জা দেখিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠেন। তাহার পরদিন প্রথম আফিসে আমাকে বলেন যে, এ উৎসবের বর্ণনা করিয়া 'ইংলিশম্যান' ও দেশীয় দৈনিক পত্রে পত্র লিখিতে হইবে। আমি আবার ভাবিলাম—ঐ গো, নাম চায়। বুঝি আমাকে ধরিবার জন্য একটা ফিকির করিতেছে। আমি বলিলাম—"মু পারিবি না অবধর।" আমি খবরের কাগজে লিখিতে সাহস করি না। তিনি বলিলেন—"ভয় নাই, আমি স্বাক্ষর করিয়া দিব।" শেষে 'ইংলিশম্যান', 'ডেলি নিউস' ও 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে' তিনটি প্রবন্ধ আমি লিখি, এবং 'মিরারে' বন্ধু মহানন্দ দ্বারা লেখাই। সকল প্রবন্ধ সাহেব স্বাক্ষর করিয়া দিলেন।

এরূপে দিন বেশ কাটিতেছিল। শ্রীক্ষেত্র বড় উৎসবের স্থান। প্রায় প্রত্যেকমাসে একটি উৎসব আছে। আমাদের পঁহুছিবার দুইচারিদিন পরেই কার্ত্তিক-পৌর্ণমাসীর উৎসব হয়। তাহাতে জগন্নাথদেবকে রাজবেশে সোনার হস্তপদ ইত্যাদি সংযুক্ত করিয়া সজ্জিত করা হইয়া থাকে। দেখিতে অতিশয় নয়নানন্দকর হইয়া থাকে। তাহার কিছুদিন পরে পদ্মবেশ হয়। শোলার পদ্মের দ্বারা ওই হস্তপদহীন মূর্ত্তি তিনটিকে এমন সুন্দর সজ্জিত করা হয় যে, চাহিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। তাহার পর গিরিগোবর্দ্ধনবেশ। জগন্নাথের হস্তে একটি কৃত্তিম পর্ব্বত স্থাপন করা হয়। তাহাও দেখিবার যোগ্য।

তাহার পর কালিয়দমনবেশ। আবার জগন্নাথদেবকে হস্তপদে সজ্জিত করিয়া, প্রকাণ্ড

কালিনাগের ফণার উপর সজ্জিত করা হয়। প্রত্যেক উৎসবেই বহুযাত্রীর সমাগম হয়, এবং প্রত্যেক উৎসবেই জগন্নাথদেবের এক একটি নূতন পিষ্টক-ভোগ দেওয়া হয়। স্মরণ হয়, Hunter সাহেব বলিয়াছেন—মন্দিরে যে সকল মিঠাই হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ পচা ঘি, এক-তৃতীয়াংশ পচা চিনি ও আর এক-তৃতীয়াংশ ওলাউঠার পরমাণু। প্রকৃতপ্রস্তাবেই মন্দিরের বাসীভোগ ও মিঠাই ওলাউঠাকে শ্রীক্ষেত্রের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়া রাখিয়াছে। 'দন্ত-ভাঙ্গা' ইত্যাদি মিঠাই প্রকৃতই দন্তভাঙ্গা। উহারা এক একটি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তোপের গোলা এবং তোপের গুলির মত ব্যবহার করিলে দেওয়াল ভেদ করিতে পারে। তাহাতে উড়িয়া বামনেরা এ সকল অপূর্ব্ব মিঠাই লুকাইয়া ২।৪ বৎসর রাখিয়া দেয়। মন্দিরে গিয়া এক এক বার বহু অনুসন্ধানের পর আমি গাড়ী গাড়ী মিঠাই ও পর্য্যুসিত অন্ন সমুদ্রে লইয়া ঢালিয়া ফেলিতাম। আমরা ইংরাজি-শিক্ষিতেরা উহা ভ্রমেও কখনও স্পর্শ করিতাম না। কিন্তু একদিন আমার সে ভ্রম ঘুচিল।

পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন স্ত্রী ব্রাহ্মণভোজন করাইলেন। সমস্ত আহারের বন্দোবস্ত মন্দিরে হইয়াছিল। সেখান হইতে প্রস্তুত করিয়া আনিয়া ব্রাহ্মণেরা আমাদের বাড়ীতে খাইয়া যাইতেছে। আমি আফিস হইতে বাড়ী ফিরিলাম। দেখিলাম, কোন গোলযোগ নাই। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলেই একসঙ্গে বসিয়া খাইল, এবং মাটিতে হাত মুছিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। মহাপ্রভুর প্রসাদ—উহা খাইয়া হাত মুখ ধুইতে নাই। এ সাম্যের দৃশ্য, ভারতবর্ষের আর কুত্রাপিও লক্ষিত হয় না। ইহাই শ্রীক্ষেত্রের বিশেষ মাহাত্ম্য। স্ত্রী বলিলেন—বড় সুন্দর রান্না করিয়াছে, আমাকে ও মহানন্দকে খাইতে হইবে। আমরা বলিলাম, এ ওলাউঠার পরমাণু না খাইয়া, বরং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মরা ভাল। মহাপ্রভু মাথার উপরে থাকুন, আমরা খাইব না। কিন্তু তিনি কিছুতে ছাড়েন না। বিশেষতঃ আহার্য্যাদি দেখিয়াও বেশ চমৎকার বোধ হইতে লাগিল। স্ত্রীর জিদ ছাড়াইতে না পারিয়া, দুজনে খাইতে বসিলাম। মুখে দিয়া দুজনেই অবাক্। কি চমৎকার রান্না! মন্দিরে বিদেশীয় কোন তরকারি—এমন কি, বিলাতি আলু পর্য্যন্ত অপবিত্র বলিয়া রন্ধন করা হয় না। দেশীয় ডাল কুমড়া ইত্যাদিই সম্বল। কিন্তু ডাল হইতে পিষ্টকাদি পর্য্যন্ত যাহা খাইলাম, তাহা এত ভাল লাগিল যে, তাহার আস্বাদ এখনও ভুলিতে পারি নাই। বিশেষতঃ ডালের রান্না এমন চমৎকার, ইচ্ছা করে—'পার্শেল' করিয়া যদি আনাইতে পারিতাম। উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা দুটি বিষয়ে সিদ্ধহস্ত—ঠাকুরসজ্জা ও রান্না। ঐ ত জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি! বিশেষ উৎসবের দিন ছাড়াও প্রত্যহ রাত্রি ৯টার সময় জগন্নাথদেবের যে শৃঙ্গারবেশ হইয়া থাকে, তাহা এত সুন্দর যে, আমরা বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিতাম।

দেখিতে দেখিতে লোকনাথের মেলা উপস্থিত হইল। যশোহরে হেডমাষ্টারবাবু তাঁহার একটি উড়িয়া ভৃত্যের উপর রাগ করিয়া বলিয়াছিলেন—'বেটার মুখ কেমন দেখ।' তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতি স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বলিলেন—'তাহার দেশের দেবতার মুখই ঐ, তাহার আর অপরাধ কি?' কিন্তু তাঁহারা পতি-পত্নী কখনও যদি শ্রীক্ষেত্রে আসিতেন এবং উৎসবের সময়, বিশেষতঃ এ লোকনাথের মেলার সময় উৎকলবাসিনীর রূপ দেখিতেন তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন করিতেন। লোকনাথ একটি শিবলিঙ্গবিশেষ। তাঁহার বসতি এক গভীরকূপের গর্ভে। কূপটি নির্ঝরবিশেষ। সমস্ত দিন জলসেচনের পর রাত্রে ৮।৯টার সময় লোকনাথের দর্শন লাভ করা যায়। স্থানটি সমুদ্রসৈকতে একটি সুন্দর উপবন। কূপটি একটি মন্দিরের মধ্যে এবং মন্দিরের চারিদিকে বহুদূর ব্যাপিয়া নানাবিধ বৃক্ষের উপবন। আমাদের জন্য সেই উপবনের একঅংশে একটি তাম্বু ফেলা হইয়াছিল, এবং সেখানেই রাত্রির আহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আমরা সন্ধ্যার পর মেলাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। মরি মরি—কি শোভা! সারি সারি প্রদীপ জ্বালাইয়া উৎকলবাসিনীরা মেলাভূমি ব্যাপিয়া আলোক-

মালার সম্মুখে বসিয়া জীবন্ত আলোকমালাবৎ শোভা পাইতেছে। কেহ গাইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ গল্প করিতেছে। স্থান স্থানে পুরুষেরা সংকীর্ত্তন করিয়া মেলাভূমি পরিক্রমণ করিতেছে। অসংখ্য বৃক্ষতলে সহস্র সহস্র আলোকশ্রেণীর শোভা, এবং সে আনন্দোৎসব, যে একবার দেখিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। কবি বলিয়াছেন,—

"উৎকল-অঙ্গনা উরু আনন্দ-আলয়।"

তাহার কারণ বোধ হয় আর কিছুই নয়, উৎকলবাসিনীদের বস্ত্র পরিধানের প্রণালীনিবন্ধন তাহাদের এক উরুর অধিকাংশ নয়নগোচর হয়। হলুদতৈলের অতিরিক্ত সেবনে যদিও অঙ্গ কিছু অতিরিক্ত তৈলাক্ত দেখায়, এবং কিঞ্চিৎ সদ্‌গন্ধও বিস্তার করে, তথাপি উৎকলরমণীদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। আমরা লোকনাথ দর্শন করিয়া, এবং বহুক্ষণ বড় আনন্দে মেলাভূমি বেড়াইয়া, আহারের জন্য তাম্বুতে উপস্থিত হইলাম। সেখানে ইতিমধ্যেই অভ্যাগত বন্ধুগণ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের সঙ্গে লোকনাথমহিষী বারুণীদেবীর সেবা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি সে কালের পূর্ব্ববঙ্গীয় ডেপুটি ছিলেন। দেশী মদের ইংরাজি নাম Country Spirit। তিনি একটু অতিরিক্ত মাত্রায় উহা সেবন করিতেন বলিয়া, আমি তাঁহার নাম 'হিন্দু পেট্রিয়ট' রাখিয়াছিলাম। দেখিলাম, ইতিমধ্যেই তাঁহার পেট্রিয়টিজমের মাত্রাটা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছে। গীত, বাদ্য ও পানাহার আরম্ভ হইল। কিছুক্ষণ পরে দেখি, ডেপুটিবাবুটি গান ধরিয়াছেন—

"ও ভাই তিনু রে! ধর্ম্ম রেখ রে!
বিধবা রমণী, তারে অন্ন দিও রে!

তাঁহার 'পেট্রিয়টিজম' বা দেশীয় সুরাভক্তি চরম মাত্রায় উঠিল। তিনি তাঁহার অপূর্ব্ব কণ্ঠে মধু কাণের মৃত্যুসময়ের এই গান ধরিতেন। কিন্তু আজ এ আমোদের মধ্যে তাম্বুর এককোণা হইতে তাঁহার অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় ঐ মৃত্যুসঙ্গীত শুনিয়া সকলেই হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। খানিকপরে দেখি—তিনি নাই। আমরা খুঁজিতে বাহির হইলাম। দেখি, তিনি সৈকতের বালির উপর গড়াইতে গড়াইতে চলিয়াছেন। আমরা যাইয়া তাঁহাকে ধরিলে তিনি বলিলেন—"তোমরা আমাকে ধরিও না। আমি খরপোদা বন্দোবস্তি করিতে যাইতেছি।" খরপোদা নিকটস্থ একটি গ্রামের নাম এবং তিনি বন্দোবস্তির হাকিম ছিলেন। আমরা তাঁহাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে, তখন তাঁহার বন্দোবস্তি করিতে যাইবার সময়, কি অবস্থা নহে। তিনি বলিলেন—"আমি আমার কলম ভুলিব না।" তিনি কিছুতেই আসিলেন না। সমস্ত রাত্রি সে বালিতে গড়াইতে গড়াইতে খরপোদার বন্দোবস্তি করিলেন।

পুরী-রাজার মোকদ্দমা

একদিন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাইতেছিলাম ; আরদালি ডাক লইয়া আসিয়া বলিল যে, এক ভীষণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাত্রিতে পুরীর রাজা সত্যবাদীর বাবাজিকে খুন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিল : সে বাঁচিয়া উঠিয়া হাঁসপাতালে গিয়াছে, এবং সহর তোলপাড় হইতেছে। মহানন্দ এ খবর শুনিয়া এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ সাহেব অশ্বপৃষ্ঠে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া যাইতেছেন। আমরাও তাঁহার পশ্চাতে পদব্রজে হাঁসপাতালে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম—একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ প্রৌঢ় সন্ন্যাসী একখানি তক্তপোষের উপর অর্দ্ধ-জাগ্রত অর্দ্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। আমি এমন দীর্ঘ বলিষ্ঠ বীরমূর্ত্তি কখনও দেখি নাই। ঘটনাটি পরে মোকদ্দমায় যেরূপ প্রমাণিত হইয়াছিল, তাহা এই ;—বাবাজির আস্তানা সত্যবাদী গ্রামে। তিনি উৎকলবাসী। উড়িয়াদিগের বিশ্বাস যে, বাবাজি কেবল হনুমানের

দ্বারা সমস্ত রোগ আরাম করিতে পারেন, এবং সমস্ত বিপদ্ হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে পারেন।

পূর্ব্ববৎসর রথের সময় রাজবাড়ীতে কয়েকটি লোকের ওলাউঠা হয়। বাবাজি সে সময়ে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছেন শুনিয়া, রাণী তাঁহার কাছে লোক পাঠান। বাবাজি তাঁহার ধুনি হইতে কিঞ্চিৎ ভস্ম দিয়া, উহা খাওয়াইতে বলেন এবং রোগীদের মধ্যে কত জন বাঁচিবে কত জন মরিবে বলিয়া দেন। ফলেও তাহাই হইয়াছিল। ইহাতে বাবাজির প্রতি রাণীর প্রগাঢ় ভক্তির সঞ্চার হয়। রাজা রাণীর পোষ্যপুত্র, তাঁহার জন্ম দক্ষিণাপথে, তাঁহার বয়স ২৪।২৫ বৎসর মাত্র। তিনি একজন গণ্ডমূর্খ, এবং সর্ব্বপ্রকার মাদকসেবক। তাহার মধ্যে সিদ্ধি-দেবীর সেবা কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। তিনি একজন বলবান্ যুবক এবং কুস্তিতে নিতান্ত পটু ছিলেন। প্রত্যহ সিদ্ধি খাইয়া বহুক্ষণ কুস্তি করিতেন, এবং সেখান হইতে দুইটা সোটা হাতে বাহির হইয়া সম্মুখে যাহাকে পাইতেন, সে ব্রাহ্মণই হউক, আর ভদ্রলোকই হউক, আর ক্ষুদ্র লোকই হউক, তাহার মাথায় উহা প্রহার করিতেন। সিদ্ধির নেশায় তিনি প্রায়ই ক্ষিপ্তবৎ থাকিতেন। পুরী সহরের যত নরাধম ইতরলোক তাঁহার ইয়ার জুটিয়াছিল। এ সকল অত্যাচার দেখিয়া রাণীর মনে সন্দেহ হইল যে, রাজা উন্মাদ হইতেছেন। তিনি সেই জন্য রাজাকে আরোগ্য করিতে বাবাজির কাছে লোক পাঠাইলেন। বাবাজি বলিলেন যে, রাজা সিদ্ধি খাইয়া উন্মাদ হইতেছে ; এ কোন পীড়া নহে, তিনি কি আরাম করিবেন! তথাপি রাণীর অনুরোধ রক্ষার জন্য তিনি কিঞ্চিৎ ভস্ম এবারও পাঠাইয়া দেন। এই কথা রাজার কানে গেল, এবং মনে সন্দেহ হইল যে, বাবাজির দ্বারা ঔষধ করাইয়া রাণী তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করাইতেছেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া বাবাজিকে মারিবার জন্য পাল্কি করিয়া ছুটেন। তাঁহার পারিষদেরা 'আঠার নালা' হইতে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনে. এবং নরাধমেরা মিলিয়া মন্ত্রণা করিয়া, রাজবাড়ীতে পীড়া হইয়াছে বলিয়া বাবাজিকে ডাকিয়া পাঠায়। বাবাজি চারিজন লোক সঙ্গে করিয়া, সন্ধ্যার পর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলে, সে লোকদিগকে বসাইয়া, রাজার জনৈক ভৃত্য বাবাজিকে রাজবাড়ীর এক প্রান্তসীমায় রাজার কুস্তির স্থানে লইয়া যায়। সেখানে রাজা ও তাঁহার ১৫ জন বলবান্ পরিচর সজ্জিত ছিল। বাবাজি যাইবামাত্র রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কই, তুমি আমাকে আরাম করিলে না?" বাবাজি উত্তর করিলেন।"তুমি দক্ষিণী লোক, সিদ্ধি খাইয়া তোমার মাথা বিগড়াইতেছে, আমি কি আরাম করিব?" রাজা তখন ক্রোধান্ধ হইয়া বাবাজিকে মারিতে পরিচরদিগকে হুকুম দিলেন। তাহারা ১৫ জন একসঙ্গে সিংহবিক্রমে বাবাজির উপর পড়িল। বাবাজিও অমিতবিক্রমে ও অদ্ভুত কৌশলে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া, কুস্তির স্থানের প্রাচীর ডিঙ্গাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রাচীরের গায়ে এরূপ ভাবে লোহার পেরেক পোঁতা হইয়াছিল যে, তাহাতে হাত দেওয়ার জো নাই। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বৃক্ষ ছিল। বাবাজি তখন সেই বৃক্ষে উঠিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সে বৃক্ষের গায়েও ঐরূপ ভাবে লোহার পেরেক পোঁতা ছিল, তাহাতেও উঠিতে পারিলেন না। তখন রাজা সুদ্ধ ১৫ জনে আক্রমণ করিয়া নিষ্ঠুরভাবে প্রহারের পর তাঁহাকে ভূতলশায়ী করে। রাজা স্বয়ং তাঁহার বুকের উপর উঠিয়া বসেন এবং পরিচরগণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ চাপিয়া ধরে। প্রথমতঃ তাঁহার গুণ-জ্ঞান নষ্ট করিবার জন্য মুখে মল-মূত্র দেওয়া হয়। এমন সময় এক নরপিশাচ বলে—"মামুনি! এ সব করিলে কি হইবে? শালার প্রস্রাবের পথে শলা মারিয়া দি এবং গুহ্যদ্বারে শোলা ভরিয়া দি।" উড়িয়াদের ইহা একটা প্রচলিত গালি। তখন তাহাই করা হইল এবং শোলা আর সহিতেছে না দেখিয়া, তাহার অবশিষ্টাংশে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল। সেই আগুনে তাহার সেই অঙ্গসকল দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যন্ত্রণায় হতভাগ্য অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, সে মরিয়াছে মনে করিয়া কুস্তি-ঘরের পশ্চাতে নরকসদৃশ একটি অন্ধ গলিতে তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সেইখানে

বহুক্ষণ পরে তাহার চেতনা হইলে, সে হামাগুড়ি দিয়া, মন্দিরের সম্মুখের অরুণস্তম্ভের কাছে উপস্থিত হয়। তখন রাত্রি দ্বিতীয়প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সেইখানে বিটের দুইজন কনষ্টেবল ছিল। তাহারা ইহাকে একজন বিবস্ত্র পাগল মনে করিয়া তাড়াইয়া দিতেছিল, তখন বাবাজি আপনার পরিচয় দিল, এবং রাজার সিংদরজা হইতে তাহার সঙ্গী ৪ জনকে ডাকিতে বলিল। এই ৬ জন তাহাকে ধরাধরি করিয়া, রাজবাড়ীর সম্মুখস্থ থানায় লইয়া গেল, এবং দারোগা তাহার এজাহার লইয়া, হাঁসপাতালে গিয়া ডাক্তারকে জানাইল। অবস্থা শুনিয়া ডাক্তার তাহাকে জোলাপ দিল, এবং যন্ত্রণা নিবারণ করিবার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় অহিফেন সেবন করাইল। সেই রাত্রিতেই মলের সঙ্গে ৩৫ টুকরা শোলা বাহির হইয়াছিল। প্রাতে আমরা যখন গেলাম, তখন অহিফেনের নেশা সত্ত্বেও বাবাজি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল—না বসিতে পারিতেছিল, না শুইতে পারিতেছিল। পুরীর মাজিষ্ট্রেট আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ। তাঁহার মাথার বিলক্ষণ ছিট ছিল। পুরী জেলা সুদ্ধ তাঁহাকে একপ্রকার ঊনপঞ্চাশ বলিয়া জানিত। তিনি সে অবস্থায়ই বাবাজির অনাবশ্যক জবানবন্দি লইতে বসিলেন। অহিফেনের নেশা ও যন্ত্রণায় তাহার বাহ্যজ্ঞান একপ্রকার তিরোহিত হইয়াছিল। এক এক প্রশ্ন, দারোগা তাহার কানের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বহুবার জিজ্ঞাসা করিলেও সে এখন এককথা ঘুমন্তভাবে বলিতেছিল এবং কিছুক্ষণ পরে তাহার ঠিক বিপরীত বলিতেছিল। আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া এ পাগলামি দেখিতেছিলাম। পুলিশ সাহেবের মুখ শুখাইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন যে, এ পাগলামির দ্বারা এত বড় গুরুতর মোকদ্দমা সূত্রপাতেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—উপায় কি? আমি বলিলাম, এ অবস্থায় বাবাজির জবানবন্দি লওয়া ভাল হইতেছে না বলিয়া, তিনি বলুন। তিনি বলিলেন—"আমি পুলিশ কর্ম্মচারী, মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সম্বন্ধে কেমন করিয়া বলিব! আপনি মাজিষ্ট্রেট, এবং ইনি আপনাকে বেশ মান্য করেন। অতএব আপনি এই পাগলাকে কথাটা বুঝাইয়া বলিয়া, আমাকে এই বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন।" আমার দুর্ব্বুদ্ধি হইল। আমি আরম্‌ষ্ট্রঙ্গকে সে কথা বলিলাম। সে তখনি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া সক্রোধে বলিল—"তুমি আমার চেয়ার গ্রহণ করিবে?" আমি অকষ্টবন্ধে পড়িয়া বলিলাম যে, মোকদ্দমাটি এই এজাহারের দ্বারা নষ্ট হইবে বলিয়া পুলিশ সাহেব আশঙ্কা করিতেছেন। আমাকে এই বাঘের মুখে দেখিয়া, পুলিশ সাহেবও অশ্বত্থামা হত ইতি গজ ভাবে সভয়ে দুই কথা বলিলেন। পাগল তখন ক্রোধে গরগর করিয়া, আরও বেশী বেশী প্রশ্ন করিয়া এজাহার লইতে লাগিল। আমরা তখন মানে মানে সরিয়া পড়িয়া, ঘটনাস্থান দেখিতে গেলাম।

শ্রীক্ষেত্রের রাজাদিগের রাজধানী খড়দহ ছিল। শুনিয়াছি, সেখানে এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। বৃটিশসিংহ উৎকল অধিকার করিয়া, রাজার জন্য মাসিক ২০০০ টাকা মাত্র পেন্‌সন ব্যবস্থা করিলে, রাজধানী হইতে বিতাড়িত হইয়া, রাজা শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি সামান্য বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন; উহা কলিকাতার একটি আস্তাবলবিশেষ। তাহার এককোণাতে একটি খোলার ঘরই কুস্তি-ঘর। ঘরের ভিত্তি ও সম্মুখের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণ বালুকাময়। তাহাতে রাত্রির ঘটনার রক্ত ও অন্যান্য চিহ্ন, এবং গাছে ও প্রাচীরে লোহার পেরেক পোঁতা তখন পর্য্যন্ত ছিল।

মহামতি আরম্‌ষ্ট্রঙ্গ মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ করিলেন, এবং তাহার পরেও এবং বাবাজির অবস্থা আরও শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও দুইবার জবানবন্দি করিয়া এক অপূর্ব্ব মোকদ্দমা সেসনে প্রেরণ করিলেন। সেসন আদালত কটকে। মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া সেখানে সরকারি উকিল ও কমিশনরের চক্ষুঃস্থির। সরকারি উকিল কমিশনরের কাছে রিপোর্ট করিলেন, মোকদ্দমার অবস্থা এরূপ শোচনীয় যে উহা সেসনে কোন মতে টিকিবে না। কমিশনর মাজিষ্ট্রেটের উপর খড়্গহস্ত হইলেন, এবং মোকদ্দমাটি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়াছেন

বলিয়া, তাঁহার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন না কেন, তাহার কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। পাগল এদিকে চটিয়া লাল। কমিশনরের বাপান্ত করিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিল। উড়িষ্যাময় একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। বিপদে পড়িলেন—আমার বন্ধু পুলিশ সাহেব বাহাদুর। তিনি দিব্যচক্ষে দেখিলেন যে, আসামীরা খালাস হইলে সকল বিপদ্ তাঁহারই হইবে। তখন সমস্ত সিবিল সার্বিস একদিকে হইয়া একস্বরে বলিবে যে, পুলিশের তদন্তের দোষেই মোকদ্দমা নষ্ট হইয়াছে। তাঁহার আহার নিদ্রা রহিত। তিনি রোজ আমার কাছে আসিয়া কাঁদেন। একদিন তিনি হঠাৎ আমাকে আসিয়া বলিলেন—"আপনাকে এ বিপদ্ হইতে আমাকে উদ্ধার করিতে হইবে। আপনি স্বীকার করুন যে, আপনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন।' আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট হইতে পর্য্যন্ত এরূপ অস্ত্রবৃষ্টি হইতেছে যে, আরমৃষ্ট্রঙ্গ বাহাদুরের বীরত্ব জল হইয়াছে, এবং তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। এ মোকদ্দমা চালাইবার ভার তিনি আমার উপর দিতে চাহেন; আমাকে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে। আমার চক্ষুঃস্থির। আমি বলিলাম—এই অবস্থায় ভার গ্রহণ করিয়া আমি এই গুরুতর মোকদ্দমা কেমন করিয়া কিনারা করিব! পুলিসসাহেব তখন আমার হাত দুখানি ধরিলেন, এবং আমার অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, আমি ইতিমধ্যে যেরূপ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমি তাঁহাকে ও মাজিস্ট্রেটকে বাঁচাইয়া, এ মোকদ্দমার কিনারা করিতে পারিব। তিনি তখন আমাকে টানিয়া পাগলের কাছে লইয়া গেলেন। বলিলেন, তিনি আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র পাগল ছুটিয়া আসিয়া, এক মহাকরমর্দ্দন করিয়া বলিল—"আমি এইমাত্র কমিশনরের কাছে পত্র লিখিলাম যে, সেসনে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য আমি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছি। আপনি দেখিবেন যে, মোকদ্দমার অবস্থা খুব ভাল। আমি অতি বিচক্ষণরূপে মোকদ্দমা সেসনে 'কমিট' করিয়াছি। আমি জানি যে, আপনার মনস্বিতায় ও বাগ্মিতায় কট্‌কি শালারা অবাক্ হইবে, এবং আপনি মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া আসিবেন। ইহাতে আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ আশাতীতরূপে খুলিয়া যাইবে।" পাগল আমার পিঠ চাপড়াইয়া, মাথা চাপড়াইয়া, এবং নথিটি আমার হাতে দিয়া সটান চলিয়া গেল।

উদ্যোগপর্ব্ব

আমি একনিশ্বাসে নথি পড়িলাম। একজন জেলার মাজিস্ট্রেট যে এরূপ একটি গুরুতর মোকদ্দমা এভাবে নষ্ট করিতে পারে, তাহা এ নথি না দেখিলে আমি কখনও বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। আমি বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। মোকদ্দমার অবস্থা যেরূপ, উহা সেসনে কোন মতেই টিকিবে না, এবং না টিকিলে এ পাগল আমার সর্ব্বনাশ করিবে। অথচ যদি বলি যে, মোকদ্দমা আমি চালাইতে পারিব না, তাহা হইলেও সে আমার সর্ব্বনাশ করিবে। দাসত্ব-জীবনের এ উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া আমি বড় চিন্তাকুল হইলাম। অগ্রসর হইলেও বিপদ্, পশ্চাৎপদ হইলেও বিপদ্। তাহাতে এইমাত্র দাসত্বের এক মহাঝটিকা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এখনও অদৃষ্টাকাশ ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা লুপ্তপ্রায়। চিন্তাকুল অবস্থায় সমুদ্রের তীরে গিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক বেঞ্চে বসিয়া, অনন্ত সমুদ্রের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। অস্তগামী রবি সমুদ্রতরঙ্গের উপর ভাসিতেছিল, এবং তরঙ্গরাশি তরল সুবর্ণময় করিতেছিল। সেই শোভা—চাহিয়া চাহিয়া আরও বহুক্ষণ ভাবিলাম। এই রবি-কর-মণ্ডিত অনন্ত সিন্ধু যাঁহার লীলা, তাঁহাকে বহুবার ডাকিলাম।

বলিলাম,—"দয়াময়! তুমি আমাকে এক মহাবিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া, আবার এই বিপদে ফেলিলে!"

যখন দেখিলাম যে, অব্যাহতির কোন উপায় নাই, তখন মোকদ্দমার বৃত্তান্তগুলি আবার মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, মোকদ্দমার তদন্তে মাজিষ্ট্রেটের দুটি মহাভুল হইয়াছে। প্রথমতঃ তিনি বাবাজির তিনবার তিনটি জবানবন্দি করিয়াছেন। তাহার শারীরিক যন্ত্রণার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া, ১৫ দিন যাবৎ জীবনের জন্য যুদ্ধ করিয়া, মোকদ্দমা সেসনে দেওয়ার পর সে মরিয়া গিয়াছে। অতএব সেসনে তাহার আর জবানবন্দি করাইবার উপায় নাই। অথচ এ তিনটা জবানবন্দিতে অনেক কথা বেশ-কম হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে তাহার জবানবন্দিই মোকদ্দমার জীবন। কারণ, কুস্তি-ঘরে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার আর কোনও সাক্ষী নাই। থাকিতেও পারে না। অতএব জবানবন্দির বিভিন্নতার জন্যই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, রাজা সুদ্ধ ৯ জন আসামী সেসনে অর্পণ করা হইয়াছে। ৮ জনের প্রতিকূলে একমাত্র প্রমাণ এই যে, বাবাজি তাহাদিগকে সনাক্ত করিয়াছে। কিন্তু পুলিশ কেমন করিয়া জানিল যে, এই ৮ জন লোকই রাজার সঙ্গে ছিল, যে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া বাবাজির সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল! তাহার কোন প্রমাণ নথিতে নাই। এই দোষেও আসামীরা খালাস হইবে। তখন বুঝিলাম যে, এদুটি দোষ যদি কোন মতে কাটাইতে পারি, তবে মোকদ্দমা টিকিবে। মনে মনে স্থির করিলাম, পরদিন হইতে আমি নিজে সমস্ত মোকদ্দমা আর একবার তদন্ত করিয়া, কোনও প্রমাণের দ্বারা এইদুটি দোষ ক্ষালন করিতে পারি কি না, চেষ্টা করিব। সমুদ্রতীর হইতে ফিরিয়া, গৃহে আসিয়া দেখি যে, একটা হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রী কাঁদিতেছেন। তাঁহাকে ভৃত্যগণ বলিয়াছে যে, আমি এ মোকদ্দমা চালাইলে রাজার লোকেরা নিশ্চয় আমাকে খুন করিবে। তিনি বলিলেন, আমাকে কোন মতে এ মোকদ্দমা চালাইতে দিবেন না। আমি বলিলাম—বেশ কথা, চাকরি ত্যাগ করিয়া বাড়ী চল। অন্যপরে কা কথা, আমার পরম সুহৃদ্ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মহানন্দ পর্য্যন্ত মহাব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি সংবাদ শুনিয়াই ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"না, এ মোকদ্দমা কোনমতে ছাড়াইয়া দেওয়াই ভাল।" আমি বলিলাম—"তাহা ত বুঝি, ছাড়াই কিরূপে? না ধরিলে রাজা বধে, ধরিলে ভুজঙ্গ।" দুইবন্ধুতে বসিয়া অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত পরামর্শ করিলাম, কিন্তু ছাড়াইবার ত কোন পথ পাইলাম না। মহানন্দ শেষে বলিলেন—"এ উৎপাত আমার ঘাড়ে পড়িলে, আমি হয় ত চাকরি ছাড়িয়াই পালাইতাম। কিন্তু তোমার যেমন অদ্ভুত শক্তি ও সাহস, তুমি হয় ত ইহার একটা কিনারা করিয়া ফেলিবে।" তিনি চলিয়া গেলেন। আমি দারুণ চিন্তায় রাত্রি কাটাইলাম। কোনদিকে কবাটের শব্দ হইলেই স্ত্রী চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার ভয় হইতেছিল যে, রাজার লোক আমাকে খুন করিতে আসিয়াছে। আমি হাসিতে লাগিলাম। জানি না কেন, আমার মনে কোন ভয় হইতেছিল না।

এই মোকদ্দমা একজন তৈলিঙ্গ পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টর রামরাও তদন্ত করিয়াছিল। লোকটি খুব চতুর। রাত্রি প্রভাত হইবা মাত্র আমি তাহাকে ডাকাইলাম। তাহাকে সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল যে, মাজিষ্ট্রেট শেষ দুইবার যখন বাবাজির জবানবন্দি লন, তখন তাহার যন্ত্রণা ও অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছিল যে, তাহার একরূপ বাহ্যজ্ঞানই ছিল না। সে মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইতেছিল। কি বলিতেছিল, তাহাও অনেক সময় বুঝা যাইতেছিল না। তাহার এরূপ মতিভ্রম হইতেছিল যে, এখন এককথা বলিয়া, পরক্ষণ তাহা অস্বীকার করিতেছিল, এবং তাহার বিপরীত বলিতেছিল। এই জবানবন্দির সময় ইন্‌স্‌পেক্টর, স্বয়ং সিবিল সার্জ্জন ও নেটিব ডাক্তার ছিলেন। তাহারপর সে বলিল যে, সে সন্দেহ করিয়া এক একবারে ১০।১২ জন রাজার চাকর ও পারিষদ্‌দিগকে গ্রেপ্তার

করিয়া আনিতেছিল, এবং বাবাজি তাহাদের মধ্য হইতে দুইতিন জন করিয়া সনাক্ত করিতেছিল। এরূপে ঘটনার দুইতিন দিনের মধ্যে সে অবশিষ্ট ৮। জন আসামী সনাক্ত করিয়াছিল। সে বলিল—এই সময় অনেক লোক উপস্থিত থাকিত। আমি তখনই তাহার সঙ্গে ছুটিলাম। প্রথমতঃ সিবিল সার্জ্জন ও নেটিব ডাক্তারের জবানবন্দি করিলাম। তাহাতে রামরাওয়ের প্রথমকথা প্রমাণিত হইল। তাহার পর সনাক্তের সময় যে সকল লোক উপস্থিত ছিল, তাহাদের কয়েক জনের জবানবন্দি করিলাম। তাহাদের কথার দ্বারা এবং আংশিক নেটিব-ডাক্তারের কথার দ্বারা রামরাওয়ের উল্লিখিত সনাক্তের বিবরণটিও প্রমাণিত হইল। আমার বুক হইতে একটা পাহাড় নামিয়া গেল। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম, যেদুটি দোষের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা এ সকল নূতন প্রমাণের দ্বারা কাটাইতে পারিব। কিন্তু এই প্রমাণের কথা মাজিষ্ট্রেটকে কিছুই বলিলাম না। বলিলে হয় ত সে আমাকে মারিত। কারণ, তাহার তদন্তের আমি এরূপ দোষ বাহির করিতেছি। বরং আমি তাহাকে বলিলাম—আমি নথি পড়িয়াছি, মোকদ্দমার অবস্থা খুব ভাল। তাহার আনন্দ দেখে কে? সে পুরী সহর গুলজার করিয়া তুলিল।

কিন্তু আরমষ্ট্রঙ্গ যেমন পাগল, কমিশনর রেভেন্‌সও (Ravenshaw) তেমনি গোঁয়ার। আমি এ সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি, এমন সময় তাঁহার পত্র আসিল যে, তিনি আমাকে মোকদ্দমা চালাইতে দিবেন না, কটকের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 'প্রীভ' সাহেব মোকদ্দমা সেসনে চালাইবে। পাগল ক্ষেপিয়া আগুন হইল। সে বলিল, সে 'কট্‌কি শালাদের' গ্রাহ্য করে না। বলা বাহুল্য, এই সুমধুর বিশেষণ রেভেন্‌স বাহাদুরেরও প্রাপ্য ছিল। সে বলিল—"আইনমতে পরিচালক (prosecutor) নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা আমার; কমিশনর কে? আমি তাহার কথামত 'প্রীভ'কে নিয়োজিত করিব না।" সে এই মর্ম্মে রেভেন্‌সকে পরিষ্কার উত্তর লিখিয়া দিল। এবার রেভেন্‌স জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি লিখিলেন, তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে, তিনি গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। পাগল পরিষ্কার জবাব দিল—কর। গবর্ণমেণ্ট তখন শ্যামও রাখিলেন, কুলও রাখিলেন। বলিলেন যে, আমি ও প্রীভ, দুইজনেই মোকদ্দমা চালাইব। বিচারের দিন উপস্থিত হইলে আমি দলে বলে কটক গিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং প্রথমেই কটকের খ্যাতনামা সরকারি-উকিল বাবু হরিবল্লভ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনিও উপরোক্ত দুইদোষ দেখিয়া নিরাশ হইয়া বসিয়াছিলেন। আমার সংগৃহীত নূতন প্রমাণের কথা শুনিয়া তিনিও নাচিয়া উঠিলেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া কমিশনরের কাছে গেলেন। সেই মহাপুরুষ আমাকে দেখিবামাত্র ব্যাঘ্রবৎ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন—"যদিও গবর্ণমেণ্ট তোমাকেও পরিচালক রাখিতে আদেশ দিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিবাদ করিতেছি; তোমাকে মোকদ্দমা চালাইতে দিব না, তুমি পুরী ফিরিয়া যাও।" আমি বলিলাম,—যেআজ্ঞা, আমি আজই প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তখন তিনি আমাকে সদয় হইয়া বসিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ হরিবল্লভবাবু বলিলেন—"ইঁহাকে যদি আপনি ছাড়িয়া দেন, তবে এ মোকদ্দমার আসামীরা নিশ্চয় খালাস পাইবে। কারণ, এ মোকদ্দমার আভ্যন্তরীণ অবস্থা যাহা, এবং ইহার গুরুতর দোষসকল সারিবার জন্য ইনি যে সকল নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, আমি, কি প্রীভ সাহেব তাহার কিছুই জানি না।" তখন রেভেন্‌স বাহাদুর দমিয়া গেলেন, এবং তা-তা করিয়া, মাথা চুলকাইয়া, আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ত-ত-তবে আপনিও পরিচালক থাকুন। তবে আপনাদের তিনজনের মধ্যে প্রীভ সাহেব প্রধান হইবেন।" আমি কটকের উকিল-সরকার হইলে, উক্ত উকিল-সরকারি তখনই রেভেন্‌সকে উপহার দিয়া চলিয়া আসিতাম। হরিবল্লভবাবুর মুখ ম্লান হইয়া গেল, কিন্তু তখন তিনি আর কিছুই বলিলেন না। আমরা চলিয়া আসিলাম। তাহার পরদিনই রেভেন্‌স বাহাদুর উৎকলে তাঁহার কমিশনরি লীলা উদযাপন করিয়া

স্থানান্তরে বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থলে চট্টগ্রামের সেই তিন মাসের একটিং কমিশনর 'স্মিথ' আসিলেন। আমার বুক হইতে আর একটি পাহাড় নামিয়া গেল।

সেসনের বিচার

সেসনে বিচার আরম্ভ হইল। প্রথম বিচারেরদিন জজকোর্ট লোকে লোকারণ্য। তাহার বিস্তীর্ণ হাতায় পর্য্যন্ত লোক ধরে না ; অনুমান, দশসহস্র উৎকলবাসীর সমাবেশ হইয়াছে। কান পাতে সাধ্য কার! যেই জেল হইতে রাজাকে ও অন্য আসামীদিগকে কোর্টের হাতায় আনা হইল, অমনি সে দশসহস্র কণ্ঠে 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিত হইতে লাগিল। সমুদ্রকল্লোলবৎ এরূপ কোলাহল উঠিল যে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জজ কাজ করিতে পারিলেন না। বাদীর পক্ষে সেই পুলিশ সাহেব, গবর্ণমেণ্ট উকিল ও আমি এবং বিবাদীদের পক্ষে কলিকাতা হইতে দিন ১০০০্ টাকা ফিসে আগত বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ এভান্‌স্ (Mr. Evans) এবং স্থানীয় সমস্ত উকিল। প্রথমদিন সন্ধ্যার সময়ে নবাগত কমিশনর মিঃ স্মিথ (Smith) আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। লোকারণ্য সাহেব মহলে ভীতি-সঞ্চার করিয়াছিল। তাহাদের ভয় হইয়াছিল যে, উড়িষ্যায় একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব হইবে। বিচারের সময় কোর্টে সৈন্য রাখা উচিত কি না, কমিশনর আমার মত চাহিলেন। আমি বলিলাম—"প্রথমদিন এত লোক হইয়াছে বলিয়া আপনারা ভয় পাইবেন না। আমার বোধ হয়, উকিলদিগের ইঙ্গিতে এ সকল লোক সংগ্রহ করা হইয়াছে। অন্যথা আমি জানি, পুরী জেলার লোকেরা রাজার চরিত্রের জন্য তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। সেখানে মোকদ্দমা বিচারের সময় সামান্য দর্শকের জনতা মাত্র হইত। আমার বোধ হয়, কাল হইতে লোক কমিবে।" ফলে তাহাই হইল। তার পরদিন হইতে কাছারি লোকশূন্য হইল।

তা হউক, অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন হইল। আমি যেদিন কটক গিয়া পেঁছি, তাহার পরদিনই আমার অনুপস্থিতিতে রাজার পক্ষের প্রধান উকিল—ইনি রঙ্গলালবাবুর একজন বন্ধু, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাকে কোনরূপে বাদীর পক্ষ হইতে সরান যায় কি না, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন।

রঙ্গ। তিনি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, কেমন করিয়া সরিয়া যাইবেন? তাঁহার চাকরি থাকিবে কেন?

উকিল। যাহাতে তাঁহাকে আর চাকরি করিতে না হয়, আমরা সেরূপ করিয়া দিব।

রঙ্গ। তোমরা কত টাকা দিবে?

উকিল। তিনি কত হইলে সরিয়া যাইবেন?

রঙ্গ। লাখ টাকা।

উকিল। আমরা তাহাই দিব।

রঙ্গ। তিনি সরিয়া গেলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আরও দুজন থাকিবে, তাহারা মোকদ্দমা চালাইবে।

উকিল। তাঁহাদের আমরা ভয় করি না। তাঁহারা মোকদ্দমার কিছুই জানেন না। ভয় করি কেবল নবীনবাবুকে ; কারণ, তিনি যেসকল নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, তাহার আমরা কিছুই জানি না। সে সকল প্রমাণের দ্বারা মোকদ্দমায় যে যে দোষ আছে, তাহা সংশোধিত না হইলে আমরা রাজাকে খালাস করিতে পারিব। নবীনবাবু নিতান্ত সরিয়া না যান, যদি কেবল সে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিবেন না, এবং অন্তরের সহিত মোকদ্দমা চালাইবেন না বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তাহা হইলে তিনি যত টাকা চাহেন, আমরা দিব।

রঙ্গ। তোমরা নবীনকে এখনও চিনিতে পার নাই। লাখ ছাড়িয়া সে দশ লাখেও টলিবার পাত্র নহে। ছোক্‌রা ত নয়, যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। খবরদার, তুমি আমার কাছে বলিয়াছ ত বলিয়াছ, তাহার কাছে এরূপ কথা কখনও উল্লেখ করিও না। সে তোমাকে ছাড়িবে না। আমি উকিল-সরকার হরিবল্লভবাবুর বাসায় গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলে রঙ্গলালবাবু হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তুমি যদি ইচ্ছা কর, আজই বড়মানুষ হইয়া চাকরি ছাড়িয়া দিতে পার।" শুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তখন তিনি উপরের উপাখ্যান বলিলেন।

একদিন রঙ্গলালবাবুর সঙ্গে তাঁহার বন্ধু অন্য এক উকিলের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছি। যাইব বলিয়া রঙ্গলালবাবু আগে সংবাদ দিয়াছিলেন ; আমরা যাইয়া বসিবামাত্র এক বৃহৎকায় মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শুনিলাম, তিনি একজন শিক্ষা-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী এবং রঙ্গলালবাবুর বন্ধু উকিলের একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি একথা সেকথার পর পুরী-রাজার মোকদ্দমার গল্প তুলিলেন। এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়! ভিতরের কথাটা কি? রাজা খামাকা একটা সন্ন্যাসীকে খুন করিবে কেন? তাহার পর দেবীতুল্য পবিত্রা রাণী সম্বন্ধে, অর্থাৎ রাজার মাতা সম্বন্ধে কতকগুলো অকথ্য কথা বলিলেন। দেখিলাম, গতিক ভাল নয় ; আমি ও রঙ্গলালবাবু পরস্পরের দিকে চাওয়া-চায়ি করিয়া উঠিলাম। আমরা সকলে উঠানে বসিয়া ছিলাম। যেই আমরা উঠিলাম, অমনি ঘর হইতে কয়েক জন উকিল বাহির হইয়া আসিলেন, এবং আমাদের ঘেরিয়া আবার বসিবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। আমরা চলিয়া আসিলাম। তাহার কিছুক্ষণ পরে রঙ্গলালবাবুর উকিল বন্ধুটি আসিলেন, এবং আমাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। রঙ্গলালবাবু তাঁহাকে খুব ভর্ৎসনা করিয়া বিদায় দিলেন। তখন রঙ্গলালবাবু আমাকে বলিলেন যে, আমি এক ঘোরতর বিপদ্ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছি। লোকটি তাঁহার বড় বন্ধু। কিন্তু সে যে এত বড় পাজি, তিনি এতদিন টের পান নাই। তাঁহার বাসায় আমাকে লইয়া বড় অন্যায় করিয়াছেন। উকিলেরা কোন ষড়যন্ত্র করিয়া ঘরে লুকাইয়া ছিল। আমি যদি কোন কথা বলিতাম, তাহারা এ মোকদ্দমায় রাজার পক্ষে তাহার সাক্ষ্য দিয়া, আমাকে ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্ত করিত।

আর একদিন তদপেক্ষাও শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজের আমার একটি সহপাঠী বন্ধুও রাজার পক্ষে উকিল ছিলেন। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলেন। আমি ও রঙ্গলালবাবু পূর্ব্বের উপাখ্যান বলিয়া, তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই ছাড়িবেন না। বলিলেন যে, আমরা দুজন ভিন্ন তিনি আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করিবেন না এবং উকিলেরা কোনমতে টের পাইবেন না। তিনি কলেজে আমার একটি বড় বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রেসিডেন্সীতে যতদিন পড়িয়াছিলাম, দুজন পাশাপাশি বসিতাম, এবং আমি তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতাম ও তাঁহাকে বড়ই ভালমানুষ বলিয়া জানিতাম। তিনি এত অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন যে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া পারিলাম না।

আহারের সময়ের অল্প পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে আমরা গেলাম, এবং কিছুক্ষণ পরেই একটি পাল উকিল এবং সে জলধরবৎ অঙ্গার-পর্ব্বতনিভ বৃহদাকার মনুষ্যটি হুড়মুড় করিয়া উপস্থিত হইলেন। আমরা বুঝিলাম যে, গতিক ভাল নয়। তাঁহারা সকলেই বাঙ্গালী। রস-শূন্য ইতর রসিকতার স্রোত খরতরভাবে বহিতে লাগিল। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা না খাইয়া যাইবেন না। কেহ রান্নাঘরে ছুটিলেন, কেহ বেড়াইতে লাগিলেন ও কাণাকাণি করিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কেহ বা সুরা-বিজড়িত কণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধরিলেন। রঙ্গলালবাবু চুপে চুপে আমাকে বলিলেন যে, গতিক ভাল বোধ হইতেছে না, পুলিসে খবর দি। আমি বলিলাম, একটু অপেক্ষা করুন—দেখি, শ্রাদ্ধ কত দূর গড়ায়। তখন তাঁহার সে

বন্ধু উকিলটি বলিলেন—"আপনারা কি পরামর্শ করিতেছেন, আমি বুঝিতেছি। আমরা একটু আমোদ করিতেছি বলিয়া, আমাদের এত ইতর মনে করিবেন না।" যা হোক, আমরা চুপ করিয়া রহিলাম, এবং আহারের সময় হইলে তাহাদের সঙ্গে চুপে চুপে আহার করিলাম। বুঝিলাম, উকিল, হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। তাঁহারাও আমার বন্ধুর নিমন্ত্রিত ছিলেন। আহারের পর আমরা শীঘ্র চলিয়া আসিতেছি, এমন সময় সেই 'কালা পাহাড়' আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন, এবং অতি রুক্ষভাবে বলিলেন যে, আমরা যাইতে পারিব না। তখন অন্য উকিলেরাও আসিয়া ঘেরিলেন, এবং আমরা তাঁহাদের অপমান করিয়া চলিয়া যাইতেছি বলিয়া, এবং আমি পুরী-রাজার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা করিতেছি বলিয়া, একটা ঝগড়া উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি শান্ত স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছি, কিন্তু বুড়া ক্ষেপিয়া উঠিল। বুড়ার শরীরখানিও সে কালা পাহাড় অপেক্ষা বড় কম নহে, এবং হাতেও একটি ভীষণ যষ্টি ছিল। বুড়া চোক ও যষ্টি ঘুরাইয়া ২।৪টা ধমক দিলে তাঁহারা আমাদের পথ ছাড়িয়া দিলেন। কালা পাহাড়টি আমাকে মারিবার জন্য প্রায় গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাদের ষড়যন্ত্রও তাহাই ছিল যে, আমাকে খুব একচোট প্রহার করিয়া তাঁহাদের গাত্রদাহ এবং হতভাগ্য রাজার অর্থগ্রাস সার্থক করিবেন। কিন্তু রঙ্গলালবাবুর ক্রোধ ও আমার স্থির ও দৃঢ় ভাব দেখিয়া তাঁহাদের সে রসটুকু ভঙ্গ হইল। আমরা চলিয়া আসিলাম। তখন বোধ হয়, তাঁহাদের জ্ঞান—চৈতন্য হইল। রঙ্গলালবাবুর সে বন্ধু মহাশয় আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া আর এক প্রস্থ ক্ষমার পালা গাহিলেন, এবং যাহাতে এই বিষয়টি কটকের ম্যাজিস্ট্রেট বিডন (Beadon) সাহেবের কানে না উঠে, তজ্জন্য আমাকে বিশেষ অনুনয় করিলেন। পরদিন প্রাতে রঙ্গলালবাবু এ বীরত্বের কথা বিডন সাহেবের কাছে লিখিয়া পাঠাইলেন। বিডন আমার রক্ষার জন্য গুপ্ত পুলিস প্রহরী নিযুক্ত করিলেন, এবং আমাকে বলিলেন, তিনি উক্ত মহাপুরুষের ডিপার্টমেণ্টাল শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি ইচ্ছা করিলে তিনি ফৌজদারি অভিযোগও স্থাপন করিবেন। তাহাতে বড় গোলযোগ হইবে এবং বাঙ্গালী জাতির বড় কলঙ্ক ও নীচতা বাহির হইয়া পড়িবে বলিয়া, আমি অসম্মত হইলাম।

এ সকল ষড়যন্ত্র নিষ্ফল হইলে, রাজার পক্ষীয়েরা অন্যদিকে হাত চালাইলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাবাজীর সঙ্গে ৪টি লোক রাজবাড়ীতে আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন সমস্ত অস্বীকার করিয়া সাক্ষ্য দিল। আমরা স্তম্ভিত হইলাম। জজ ডিকেনস্‌ও আশ্চর্য্য হইয়া শনৈঃ শনৈঃ আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। সেই তৈলিঙ্গ পুলিস ইন্‌সপেক্টর রামরাও এ মোকদ্দমার সাক্ষী ছিল। এবং অন্য সাক্ষীরা তাহার সঙ্গে আসিত। যাহাতে রাজার পক্ষীয়েরা কোন সাক্ষী হাত করিতে না পারে, তাহাকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে আমি বলিয়া দিয়াছিলাম। রামরাও কাছারি হইতে নামিয়াই এ সাক্ষী কিরূপে অন্য পক্ষের হস্তগত হইল, তাহার অনুসন্ধানে ছুটিয়াছিল, এবং রাত্রি ১০টার সময় সে সাক্ষীকে ও আনুষঙ্গিক প্রমাণ লইয়া আমার কাছে উপস্থিত হইল। তখন দেখা গেল যে, পাঁচশত টাকা নগদ লইয়া, সে ঐরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। সে নিজেও তাহা স্বীকার করিল। আমি সে রাত্রিতে বিডন সাহেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিলাম, এবং তাঁহার আদেশমত পরদিবস প্রাতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, মোকদ্দমার অবস্থা এত ভাল, একটি মাত্র সাক্ষী বিগড়াইলে কিছু ক্ষতি হইবে না। অন্য দিকে এ মোকদ্দমাতে সমস্ত উৎকল এরূপ তোলপাড় হইতেছে যে, আমরা যদি এ সাক্ষীকে এখন ফৌজদারীতে দি, তাহা হইলে লোকে বলিবে যে, রাজাকে আমরা জিদ করিয়া শাস্তি দেওয়াইতেছি।

আমার সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ—আমার পাগলা ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁহার আদেশমতে আমাকে প্রত্যেকদিন কাছারির পর একদীর্ঘ পত্র লিখিতে হইত, এবং তিনি রোজ আমাকে ২।৩ খানি করিয়া পত্র লিখিতেন। কোন পত্রে বা আমার খুব প্রশংসা থাকিত। আবার তার পরপত্রেই

লেখা থাকিত যে, মোকদ্দমাটি আমি একেবারে নষ্ট করিয়াছি। কি দারুণ ভাবনাতে যে আমাকে দিনরাত্রি কাটাইতে হইত, তাহা বলিতে পারি না। সমস্তদিন আমাকে সাক্ষীর জবানবন্দি করাইতে ও লিখিতে হইত এবং তাহারপর মাজিস্ট্রেটের ভাবনা ভাবিতে হইত। যা হোক, ১৭ দিনে মোকদ্দমা শেষ হইল, এবং এভানস্ বাহাদুর তাঁহার তর্কের আরম্ভেই আমাকে এ মোকদ্দমা চালাইতে নিয়োজিত করা হইয়াছে বলিয়া আমার মাজিস্ট্রেটকে খুব একচোট আক্রমণ করিলেন। তিনি একটি সাক্ষীকেও জেরায় লাচার করিতে পারেন নাই। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, আমার শিক্ষার ফলে তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ জানেন, আমি পুরীতে নূতন সাক্ষীদের জবানবন্দি লওয়ার সময় ভিন্ন সাক্ষীদের অন্য কোনদিন চেহারাও দেখি নাই।

জজ রায় লিখিতে ১০ দিন সময় লইয়াছিলেন, এবং রায় প্রকাশ করিবার জন্য একটিদিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে কমিশনর আমাকে আর একদিন ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রাজার যদি শাস্তি হয়, তাহা হইলে হুকুম শুনাইবারদিন কোর্টে সৈন্য রাখা উচিত হইবে কি না? আমি আবার বলিলাম—এরূপ একটা হাস্যকর কার্য্য করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তথাপি তাঁহারা এত ভয় পাইয়াছিলেন যে, নিরূপিত দিবসের পূর্ব্বদিন আমি আহার করিয়া শয়ন করিতে যাইতেছি, এমন সময় এক কনষ্টেবল ছুটিয়া আসিয়া বলিল যে, মাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সাহেব নিজে রাজাকে ও অন্য আসামীদিগকে কোর্টে হাজির করিয়াছেন, এবং জজ সাহেব আপনাকে ডাকিয়াছেন। আমি ব্যস্ত হইয়া কাপড় পরিয়া যেই রাস্তায় পড়িলাম, অমনি কটকময় রব উঠিয়াছে—'দায়মল—দায়মল'। রাজার দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে।

আমি যখন কাছারিতে পঁহুছিলাম, তখন জজ এজলাসে উত্তেজিতভাবে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন—"নবীনবাবু! আমি রাজার মোকদ্দমায় হুকুম প্রচার করিয়াছি। রাজা এবং তাহার অনুচর ৪ জনের দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছে। অবশিষ্ট অনুচর ৪ জনের সনাক্তের প্রমাণ সন্তোষজনক নহে বলিয়া আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছি।" আমি বলিলাম—"আদালতের আদেশ আমাদের শিরোধার্য্য।" এ কথা বলিয়া আমি ফিরিয়া আসিতেছিলাম, এমন সময় তিনি আমাকে আবার ডাকিয়া বলিলেন—"আপনি পুরী ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

আমি। উহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কখন্ সুবিধামত আপনার সাক্ষাৎ পাইব, জানিতে পারি কি?

জজ। এখন আমি ত আপনার মোকদ্দমার আর বিচারক নহি। আপনার যখন ইচ্ছা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। কাল আটটার সময় আপনার সুবিধা হইবে কি?

আমি। হইবে।

আমি আবার চলিয়া আসিতেছি, তিনি আমাকে আবার ডাকিয়া বলিলেন—"আপনার সঙ্গে আমার এখন সাক্ষাৎ হইলে ক্ষতি কি? আপনি আমার খাস কামরায় আসুন।" আমি খাস কামরায় প্রবেশ করিলে তিনি বড় প্রীতির সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"এ মোকদ্দমা হাইকোর্টে চালাইবার জন্য আপনাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম, আমি একটি সদ্যঃপ্রসূত শিশু—আমার প্রথম সন্তান—পুরীর বালির উপর ফেলিয়া আসিয়াছি আজ ১৮ দিন। সেখানে আমার দুটি শিশু ভাই ভিন্ন আর কেহ নাই। আমি নিজেও এ মোকদ্দমায় গুরুতর পরিশ্রম ও চিন্তায় কয়েকদিন হইতে জ্বর ভোগ করিতেছি। অতএব দয়া করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিন, এবং হরিবল্লভবাবুকে, কিম্বা পুলিস সাহেবকে এ কার্য্যে নিয়োজিত করুন।

জজ। তাঁহারা মোকদ্দমার কিছুই জানেন না। কেবল আপনি যেভাবে বলিয়াছেন, তাঁহারা

সেভাবে চালাইয়াছেন মাত্র। অতএব তাঁহাদের পাঠাইয়া কোন ফল হইবে না। কাল রাত্রিতে কমিশনরের সঙ্গে পরামর্শ হইয়া স্থির হইয়াছে যে, আপনাকেই যাইতে হইবে। তবে এ মুহূর্ত্তেই আপনার যাওয়ার প্রয়োজন হইবে না। তাহারা আপিল দাখিল করিলে মোকদ্দমার তারিখ পড়িবে। আপনার তখন গেলেই হইবে।

আমি বিষণ্ণভাবে চুপ করিয়া রহিলাম।

জজ। আপনি স্মরণ রাখিবেন যে, এ মোকদ্দমায় আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং আমিও অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত এ মোকদ্দমার বিচার করিয়াছি ও দশদিন যাবৎ রায় লিখিয়াছি। যদি উহা রহিত হয়, কেবল আমার পরিশ্রম নহে, আপনারও সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে। আর আপনি যদি আমার রায় হাইকোর্টে বাহাল রাখিতে কৃতকার্য্য হন, তবে আপনি যথেষ্ট পুরস্কার লাভ করিবেন, এবং আপনার অশেষ উন্নতি হইবে। অতএব আপনি আর কোন আপত্তি করিবেন না। আমি চিঠি লিখিয়া দিতেছি, আপনি উহা লইয়া এখনই কমিশনরের কাছে যান।

তাহাই হইল।

কমিশনর স্মিথ সাহেব আমার সঙ্গে যথেষ্ট রসিকতা করিতেন। আমাকে দেখিয়াই উদরের অন্তস্তল হইতে স্তরে স্তরে একহাসি তুলিয়া বলিলেন—"কেমন! রাজা এক খুন করিয়া অব্যাহতি পায় নাই। এখন তোমাকে যদি খুন করে, তা হইলেও অব্যাহতি পাইবে না।" আমি এ রসিকতার উত্তরে বলিলাম, উহা আমার পক্ষে বিশেষ সান্ত্বনার কথা বটে। তখন জজ যাহা আমাকে বলিয়াছিলেন, তিনিও সে সকল কথা বলিলেন। আমি আবার আপত্তি করিলাম। তিনিও তাহা শুনিলেন না। তিনি বলিলেন—"তুমি এখন পুরী ফিরিয়া যাও। হাইকোর্টে মোকদ্দমার তারিখ পড়িলে আমি তোমাকে টেলিগ্রাফ করিব।"

তাঁহার কাছে বিদায় হইয়া বাসায় আসিবামাত্র মাজিস্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাফ করিলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধন্যবাদ ও আনন্দপূর্ণ উত্তর পাইলাম। তিনি আরও লিখিলেন যে, তিনি কটকের মাজিস্ট্রেটের কাছে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন যে, যে পর্য্যন্ত তাঁহারা উভয়ে আমার নির্ব্বিঘ্নে পুরী ফিরিবার বন্দোবস্ত না করেন, সে পর্য্যন্ত যেন আমি কটক না ছাড়ি। আমি পুরী ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া রহিয়াছি, আর কোথায় পাগল এরূপে টেলিগ্রাফ করিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিল! তখনই আবার বিডন সাহেবের এক চিঠি এই মর্ম্মে উপস্থিত হইল যে, সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে তিনি আমাকে রওনা হইবার আদেশ পাঠাইবেন। তাহার পূর্ব্বে যেন আমি কটক হইতে রওনা না হই। বুড়া রঙ্গলালবাবুর আনন্দের সীমা নাই। ১৮ দিন যাবৎ ষোড়শোপচারে অতিথি-সৎকার করিয়াও তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। বলিলেন—"বেশ হইয়াছে, আর দুটোদিন নাতি-ঠাকুরদাদাতে আর একচোট আমোদ করা যাইবে।" আমি বলিলাম—"তা হউক, কিন্তু আবার যেন সেই উড়ে বাইজী লক্ষ্মী ঠাকুরাণীটির আবির্ভাব না হয়।"

দুদিন পরে সন্ধ্যারপর উদর পূর্ণ বোঝাই করিয়া অতি কষ্টে রঙ্গলালবাবু হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। হায়! এমন কাব্যপ্রিয়, আমোদপ্রিয়, সুরসিক, সদাশয় লোকসকল কোথায় গেল! কাটযুড়ী নদী পার হইবার পর খুব মেঘ হইয়া আসিল। আমার পাল্কির চারিদিকে সশস্ত্র কনষ্টেবল ছিল। তাহাদের হস্তে বন্দুক, কটিবন্ধে অসি। এমন সময় এক-জন কনষ্টেবল আমাকে চুপে চুপে বলিল যে, রাজার একজন কর্ম্মচারী বহুতর লোক সঙ্গে আমাদের পশ্চাৎ আসিতেছে। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। আমি পাল্কি হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম যে, একখানি পাল্কি এবং লাঠিহস্তে বহুতর লোক। আমি সেখানে পাল্কি রাখিয়া অপেক্ষা করিলাম। দেখিলাম, তাহারাও পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মনে একটা খুব সন্দেহ হইল যে, গতিক ভাল নহে। তাহারা কে এবং কি জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা

দেখিয়া আসিতে দুইজন কনষ্টেবল পাঠাইলাম। আর দুজন কনষ্টেবলকে দুটো বন্দুক আওয়াজ করিতে বলিলাম। প্রেরিত কনষ্টেবল ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, আমি অপেক্ষা করিতেছি বলিয়া, তাহারা আমার আগে গেলে পাছে আমি অসম্মান মনে করি, সে জন্য আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাদের চলিয়া যাইবার জন্য আদেশ পাঠাইলাম, এবং পাশ দিয়া যাইবার সময় পাল্কি-আরোহীকে নামাইয়া, তাহার গ্রাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং কনষ্টেবলদিগকে বলিলাম—"ইহাকে তোমরা বিশেষ করিয়া চিনিয়া লও।" আমার ভাব দেখিয়া, এবং অস্ত্রাদি দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে কিছু দূর চলিয়া গেলে, আমরা রওনা হইলাম। কনষ্টেবলকে বলিয়া দিলাম, তাহাদের গতি-বিধি যেন তাহারা বরাবর লক্ষ্য করে, এবং সম্মুখের থানায় পৌঁছিলে যেন আমাকে জাগাইয়া দেয়। তাহারা তাহাই করিল। জাগিয়া দেখিলাম, থানার সব-ইন্‌স্‌পেক্টর পাল্কির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সঙ্গীয় কনষ্টেবলেরা বলিল যে, রাজার লোকেরা কিছুদূর আসিয়া, রাস্তার পার্শ্বস্থিত একটি গ্রামে চলিয়া গিয়াছে। আমি সব-ইন্‌স্‌পেক্টরকে বলিলাম, তাহাদিগকে যদি আমার পশ্চাতে আসিতে দেখে, তবে তাহাদিগকে রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত যেন আটক করিয়া রাখে। এবং দুইজন কনষ্টেবল যেন সে গ্রামের দিকে পাঠাইয়া তাহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখে। সব-ইন্‌স্‌পেক্টর আমাকে রাত্রিতে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু স্ত্রী-পুত্রকে দেখিবার জন্য তখন আমার এত আগ্রহ যে, আমি সে বাধা না শুনিয়া, ভগবানের নাম করিয়া চলিলাম। রাত্রিতে আর কোন গোলযোগ হইল না। প্রভাতে নির্ব্বিঘ্নে শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছিলাম।

হাইকোর্ট

বাসায় পৌঁছিয়া শুনিলাম যে, আমার পাগ্‌লা মাজিষ্ট্রেট রোজ দুবেলা নিজে আসিয়া সে নব-প্রসূত শিশুর এবং পরিবারস্থ সকলের খবর লইয়া যাইতেন। আমার কাছেও রোজ সে খবর লিখিয়া পাঠাইতেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি আনন্দে অধীর। বলিলেন যে, তিনি শুনিয়াছিলেন যে, রাজার লোকেরা আমাকে পথে আক্রমণ করিবে ; সে জন্য তিনি বড় চিন্তিত ছিলেন। আমি পূর্ব্বসন্ধ্যার ঘটনা তাঁহার কাছে বিবৃত করিলে তিনি চটিয়া লাল হইলেন, এবং টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন যে, সে লোকগুলাকে ফৌজদারিতে দিবেন এবং তিনি কি রকম Armstrong (নামের অর্থ 'দৃঢ়বাহু') তাহাদিগকে দেখাইবেন। আমি তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া থামাইলাম। কটক হইতে আমি জ্বর শুদ্ধ আসিয়াছিলাম। তাহারপর আরও প্রায় পনরদিন সে জ্বরে ভুগিলাম। সে রোগশয্যায় কমিশনরের টেলিগ্রাফ আসিল যে, আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। আমি পীড়িত বলিয়া, মোকদ্দমার অন্যদিন ধার্য্য করাইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট কমিশনরের নিকট টেলিগ্রাম করিলেন। তদনুসারে অন্যদিন পড়িল এবং তাহার একসপ্তাহ পূর্ব্বে আমি আবার সশস্ত্র পুলিস-বেষ্টিত হইয়া কলিকাতায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমতই জুনিয়ার গবর্ণমেণ্টের উকিলমহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া দেখা করিলাম। তিনি তখন সদ্যস্নাত এবং শ্যামবর্ণের উপর একখানি মখের 'লুঙ্গি' পরিহিত। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মনোমোহন ঘোষ কি আপনার একজন বন্ধু?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"হাঁ, আপনি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন?" তখন তিনি বলিলেন যে, সেদিন মনোমোহন এড্‌ভোকেট জেনারেলের কাছে যাহা বলিলেন, তাহাতে তিনি আমার বন্ধু বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। আমি আরও বিস্মিত হইলাম। কিন্তু তখন আর কিছু বলিলাম না। আহারের পর হাইকোর্টে গেলাম। এড্‌ভোকেট জেনারেল মিঃ পল আমাকে দেখিবামাত্র মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন—"তোমার কট্‌কি মত কি, আমি জানি না, কিন্তু 'ইংলিশম্যানে' সেসন জজের যে রায় প্রকাশ হইয়াছে, আমি তাহা

পাঁড়য়াছি। মোকদ্দমাটি ছাই ভস্ম। উহা হাইকোর্টে কখনও টিকিবে না। আমি নিজেই আসামীদিগকে খালাস দিতে বলিব।" আমি অবাক্। আমি আগাগোড়া এ মোকদ্দমাটায় পাগলের পাল্লায় পড়িয়াছিলাম। যেমন ম্যাজিস্ট্রেট, তেমনি জজ, তেমনি জুনিয়ার উকিল মহাশয়, এবং সকলের সেরা এড্ভোকেট জেনারেল মিঃ পল সাহেব। তাঁহার কথা শুনিয়া আমার গলা শুকাইয়া গেল॥ আমি বলিলাম, মোকদ্দমার অবস্থা তিনি কেন মন্দ বলিতেছেন, তাহা আমাকে বলিলে, তৎসম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, বলিব। তিনি পরদিন প্রাতে তাঁহার গৃহে যাইতে আমাকে আদেশ করিলেন।

পরদিন আমি তাঁহার চৌরঙ্গিস্থ সুরম্য হর্ম্ম্যে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি 'ইংলিশম্যান' হইতে সেসনের রায় কাটিয়া লইয়া, একখানি বহিতে লাগাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি সে রায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। আমি বলিলাম, আগে নথির কাগজপত্র না দেখিলে রায় বুঝিতে পারিবেন কেন? তিনি বলিলেন, নথি পরে পড়িবেন। ব্যবস্থা মন্দ নহে, ঘোড়ার আগে গাড়ী। অনুমান ৫।৭ মিনিট পড়িয়া, আমার দিকে চেয়ার ঘুরাইয়া বসিলেন, এবং বলিলেন—"তুমি জান কি, আমি একবার হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলাম?" তাহারপর সে জজিয়তির গল্পে সমস্ত সকালবেলা কাটিয়া গেল, এবং এই বলিয়া শেষ করিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট বড় কৃপণ। জজের যেরূপ অল্প বেতন, তাহাতে তাঁহার আস্তাবলের খরচও কুলায় না। তাহারপর আমাকে আবার পরদিন যাইতে বলিয়া বিদায় দিলেন। পরদিন আবার যথাসময়ে উপস্থিত হইলে, আবার ৫।৭ মিনিট সেই রায় পড়িয়া, আমার দিকে ফিরিয়া বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি জান কি, আমি একবার গবর্ণর জেনারেলের কাউন্সিলের মেম্বর হইয়াছিলাম, এবং প্রেস আইন সমর্থন করিয়া, তোমার দেশবাসীর বড় অপ্রিয় হইয়াছিলাম? কেন এরূপ করিয়াছিলাম, তাহা তোমাকে দেখাইতেছি।" এই বলিয়া, টেবিলের এক ড্রয়ার খুলিয়া, এক রাশি পুরাতন কাগজ বাহির করিলেন। ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া কোন্ কোন্ অশ্রুতপূর্ব্ব ও অজ্ঞাত সংবাদপত্র সকল কি কি রাজদ্রোহিতার কথা লিখিয়া, বৃটিশ রাজ্য উল্টাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই সাংঘাতিক উক্তিসকলের সমালোচনায় এ সকালবেলাও কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও সেরূপ ৫।৭ মিনিট রায় পড়িবার পর বলিলেন—"তুমি আমার ছেলেকে দেখিয়াছ?" তখন সে ছেলের ডাক পড়িল এবং ৬।৭ বৎসরের ছেলের অদ্ভুত গুণপণার কথায় এ সকালবেলাও কাটিয়া গেল। এরূপে দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। আমার বিপদের সীমা নাই। রোজ ম্যাজিস্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করিতে হইতেছে যে, এখনও রায় পড়া শেষ হয় নাই, এবং আমি সময় নষ্ট করিতেছি বলিয়া তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ঠে আমাকে ধমক পাঠাইতেছেন। মোকদ্দমার পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে আমি বড় কান্নাকাটী করিলে তিনি রায়টি কোন মতে শেষ করিলেন, এবং মাঝে মাঝে আমাকে দুইএকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষ করিয়া, টেবিলে এককিল দিয়া বলিলেন—"আমি এখন বুঝিলাম, মাষ্টার ডিকেনস (Dickens) উপযুক্ত বাপের উপযুক্ত পুত্র।" জজের নাম ডিকেনস্ এবং তিনি বিখ্যাত উপন্যাস-লেখক ডিকেনসের পুত্র। তিনি রায়টি এমন সুন্দর লিখিয়াছিলেন, যেন ঠিক একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস। মিঃ পল আজ বলিলেন যে, মোকদ্দমার অবস্থা খুব ভাল, কোনও ভয় নাই। কিন্তু নথির একখানি কাগজও দেখিলেন না। পরদিন মোকদ্দমার আপিল আরম্ভ হইল। চিফ জাষ্টিস স্যার রিচার্ড গার্থ এবং স্মরণ হয়—জজ এনস্লি ও জ্যাক্সন আপিল শুনিয়াছিলেন। আসামীদের পক্ষে মিঃ ব্যানসন, এভানস্ এবং মনোমোহন ঘোষ এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কেবলমাত্র মিঃ পল। ব্যানসন তিনদিন, এভানস্ একদিন, এবং মনোমোহন একদিন মোকদ্দমার তর্ক করিলেন। ব্যানসন তর্ক আরম্ভ করিতেই চিফ জাষ্টিস জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ মোকদ্দমায় রাণীর জবানবন্দি হইয়াছে কি না? ব্যানসন সুযোগ দেখিয়া, নিতান্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"হয় নাই। আসামীর পক্ষে ত আর তাঁহার জবানবন্দি হইতে পারে

না। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা যে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও হয় নাই।" তখন চিফ জাষ্টিস রাঙ্গাটোপে ঢাকা সম্মুখস্থ গ্লাস হইতে কি একটু তরল দ্রব্য পান করিয়া অতি গম্ভীরভাবে বলিলেন—"মফঃস্বলের মাজিষ্ট্রেটদের কার্য্যই এরূপ। ইহারা কখনই সম্পূর্ণ করিয়া কোন মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠায় না।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া পল সাহেবের কানে কানে বলিলাম যে, রাণী রাজার মাতা, অতএব গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কি বলিয়া জবানবন্দি করাইবেন? বিশেষতঃ এ মোকদ্দমায় কিছুই তাঁহার জানিবার সম্ভাবনা নাই। পল সাহেব আমাকে বলিলেন—"গার্থের গতিকই এই। ফুস্ করিয়া সোডাওয়াটার-বোতলের কর্কের মত ছুটে। আমি তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিতে যাইতেছি না। তিনি আপনি ঠাণ্ডা হইবেন।" বাস্তবিক তাহাই হইল। তিনি কিছুক্ষণ চক্ষু নিমীলিত করিয়া, ব্র্যানসনের বক্তৃতা শুনিয়া বলিলেন—"ও মিঃ ব্র্যানসন! রাণী যে রাজার মা, গবর্ণমেণ্ট কেমন করিয়া তাঁহাকে সাক্ষী মানিবেন!" মিঃ পল আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"কেমন, সোডা-ওয়াটারের বোতল আপনি ঠাণ্ডা হইয়া গেল।"

প্রথম আপিলেরদিন টিফিনের সময় আমি বার-লাইব্রেরীতে পল সাহেবের কাছে দাঁড়াইয়া আছি, মনোমোহন আমাকে হাতে ধরিয়া টানিয়া লইয়া স্নেহের সহিত বলিলেন—"স্ত্রী আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, তুমি কলিকাতা আসিয়াছ এতদিন, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে একটিবারও যাও নাই। আজ আমাদের সেখানে খাইতে হইবে।" আমি উত্তর করিলাম—"আমি যেরূপ পীড়িত, খাওয়ার ত কথাই নাই, এবং আমার সম্বন্ধে তাঁহার কিছু মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে শুনিয়া, সাহস করিয়া যাই নাই।" মনোমোহন তাঁহার সেই বিস্তৃত চক্ষু আরও প্রসারিত করিয়া বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় জুনিয়ার উকিল ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"জানেন কি—সে দিন এডভোকেট জেনারেলের কাছে আপনি ইঁহার সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, আমি উঁহাকে তাহা বলিয়া দিয়াছি।" মনোমোহন আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা! আমি কি বলিয়াছিলাম? আপনার চরিত্রই এইরূপ। আপনি এককথা আর করিয়া, লোকের মধ্যে এরূপে ঝগড়া বাধাইয়াছেন।" উকিল মহাশয় চম্পট দিলেন। মনোমোহন আমাকে টানিয়া পল সাহেবের কাছে লইয়া গেলেন এবং সমস্ত কথা তাঁহাকে বলিলেন। পল সাহেব বলিলেন—"উকিলবাবুটি ঘোরতর মিথ্যাবাদী। আমি মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, এ বড় লোকটি কে, যাহার জন্য হাইকোর্টে এরূপ তোলপাড় করিয়া একটা মোকদ্দমার অন্য তারিখ লইতে হইতেছে? মনোমোহন তাহার উত্তরে বরং তোমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন।"

মিঃ এভানস্ জানিতেন যে, মিঃ পল নথি দেখিবার পাত্র নহেন। অতএব তিনি নথির প্রতিকূলে একটি গুরুতর কথা তাঁহার তর্কের সময় বলিতেছিলেন। আমি সে কথা মিঃ পলের কানে পড়িয়া বলিলাম। পল বলিলেন—"কই, তুমি নথিতে দেখাইতে পার?" আমি নথি উল্টাইয়া সে স্থানটি দেখাইলাম। পল তখন বাম হস্তে তাঁহার ললাট হইতে কুঞ্চিত কুন্তলগুচ্ছ সরাইয়া, উঠিয়া মিঃ এভানসের কথার প্রতিবাদ করিলেন। মিঃ এভানস্ তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য বলিলেন যে, তিনি ভরসা করেন যে, এডভোকেট জেনারেল নথি দেখিয়া তাঁহার প্রতিবাদ করিতেছেন, কেবল অন্যের কথা শুনিয়া করিতেছেন না। তিনি আমার দিকে তীক্ষ্ন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তিনি জানিতেন যে, আমিই তাঁহার পরম শত্রু। সেসন আদালতে আমার প্রতিকূলে আধঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যা হোক্, পল যখন নথি দেখাইতে চাহিলেন, তখন এভানস্ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন।

মনোমোহন ঘোষ পঞ্চমদিবস বক্তৃতা করিতে উঠিলে, জাষ্টিস জ্যাক্সন তাঁহার প্রত্যেক কথায় তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মনোমোহনের চিরমিত্রতা। কারণ, মনোমোহন সিভিলিয়ানদের মহাশত্রু, সর্ব্বদা তাঁহাদের কেলেঙ্কারি বাহির করেন। একস্থলে তিনি মনোমোহনের প্রতি অসার তর্ক করিয়া কোর্টের সময় নষ্ট করিতেছেন

বলিয়া দোষারোপ করিলেন। মনোমোহনের মুখ কালো হইয়া গেল, এবং সমস্ত কাউন্সেলগণ স্তম্ভিত হইল। মনোমোহন একটু থতমত খাইয়া, স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"কাউন্সেলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে, সামান্য তৃণটুকু পর্য্যন্ত যদি সে মক্কেলের অনুকূলে পায়, তাহা কোর্টে উপস্থিত করিবে। সার অসার বিচার করিবার ভার কাউন্সেলের উপর নহে, কোর্টের উপর।" মিঃ পল আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ঘোষকে দেখিলেই লুই জ্যাক্‌সন খেঁকি কুকুরের মত খেউ খেউ করিয়া উঠে। যা হোক্, আজ বেশ জব্দ হইয়াছে।" টিফিনের সময় ঘোষ নিতান্ত কাতর অবস্থায় পলকে বলিলেন—"আপনি দেখিলেন, লুই জ্যাক্‌সন আমার প্রতি কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করিল।" পল সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"অতি অন্যায়। তুমি উচিত তর্ক করিতেছিলে। আমি বিবাদীদের কাউন্সেল হইলে, আমিও ঠিক সেরূপ করিতাম।" হাইকোর্টে আপিল শুনানির সময়ও পল আমাকে প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে টানিতেন। কাছারির শেষে কোনদিন আমাকে বলিতেন এভানস্, কোনদিন বলিতেন ব্র্যানসন, কোনদিন বা ঘোষ বড় কঠিন তর্ক বাহির করিয়াছেন, পরদিন প্রাতে আমার সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে। অথচ পরামর্শের মধ্যে কেবল বাজে কথার গল্প। সে যা হোক্, ৫ দিনে বিবাদীদের পক্ষে তর্ক শেষ হইল। তখন তিনজজে একটু কাণাকাণি করিয়া চিফ জাষ্টিস পলকে বলিলেন যে, রাজা ও দুজন চাকরের সম্বন্ধে পলের কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। অবশিষ্ট দুজন আসামীর সম্বন্ধে যদি তিনি কিছু বলিতে চান, তবে বলিতে পারেন। তখন খর্ব্বকায় পল বাহাদুর তাঁহার সম্মুখের অলকগুচ্ছ দক্ষিণহস্তে ললাট হইতে সরাইয়া উঠিলেন, এবং প্রথমতঃ জজদিগকে তাঁহার পরিশ্রম লাঘব করিয়াছেন বলিয়া ধন্যবাদ দিলেন। তারপর অবশিষ্ট বিবাদী দুজন সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলিয়া পরিষ্কার বলিয়া বসিলেন যে, তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রতিভূ। কোন নির্দ্দোষী দণ্ডিত হউক, ইহা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হইতে পারে না। অতএব জজদের এ দুজন আসামীর অপরাধ সম্বন্ধে যদি কোনরূপ সন্দেহ থাকে, তবে তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে খালাস দিতে বলিতে বাধ্য। তাহার পরদিন জজেরা সে দুজন আসামীকে খালাস দিয়া, রাজা ও অবশিষ্ট দুজনের দণ্ড স্থিরতর রাখিলেন। আমি তাহার পরদিনই শ্রীক্ষেত্র যাত্রা করিলাম, এবং আবার সমস্ত পথ পুলিস-পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া পঁহুছিলাম।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের নবযৌবনের মেলা

কিছুদিন পরেই জগন্নাথের রথযাত্রা। ৭ দিন মাত্র বাকি থাকিতে ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, রথের ভার তিনি আমাকে দিয়াছেন। আমি বিস্মিত হইলাম। বিস্ময়ের প্রথম কারণ, রথের ভার তিনি কখনও কোন ডেপুটিকে দিতেন না, নিজের হাতেই রাখিতেন। দ্বিতীয়তঃ, জগন্নাথের রথ এক ভীষণ ব্যাপার। প্রত্যেক বৎসর তিনখানি রথ নূতন প্রস্তুত করিতে হয়, এবং পুরাতন রথের দ্বারা সমস্ত বৎসর শবদাহনকার্য্য সম্পাদিত হয়। তাহার মূল্যে রথ নির্ম্মাণের ব্যয় সংকুলিত হয়। আমি তাঁহাকে বলিলাম—৭ দিনের মধ্যে আমি কেমন করিয়া তিনখানি রথ নির্ম্মাণ করাইব? তিনি বলিলেন—"বাপ্ রে বাপ! জগন্নাথ জিউর রথ বন্ধ হইতে পারে না। কার্য্য কঠিন বলিয়াই তোমার উপর ভার দিয়াছি।" আমি উত্তর করিলাম—তাহাই যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, আমি তাহার ভার লইলাম। আপনি কিন্তু কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। তিনি বলিলেন—"করিব না।" আমি তখনই সমস্ত ডিষ্ট্রীক্টের পুলিসের উপর হুকুম জারি করিলাম, যেখানে ছুতারমিস্ত্রী পাইবে, তৎক্ষণাৎ ধরিয়া তাহার যন্ত্রাদি সহ পাঠাইয়া দিবে। দেখিতে দেখিতে ৩০০ সূত্রধর সমবেত হইলেন। উড়িয়াদের যেমন হইয়া থাকে,—কত ওজর আপত্তি, কত চীৎকার ফুৎকার, কত

কান্নাকাটা হইল, তাহারপর কাজ আরম্ভ হইল। প্রত্যেক কার্য্যের জন্য সময় নিরূপণ করিয়া দিলাম এবং সে সময়ের মধ্যে তাহা শেষ হইয়াছে বলিয়া আমাকে সংবাদ দিবার জন্য পুলিস নিযুক্ত করিয়া দিলাম। না দিবা না রাত্র কাজ চলিতে লাগিল। লোকের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, রাজা যখন দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন, তখন আর এ বৎসর জগন্নাথের রথও প্রস্তুত হইবে না, রথযাত্রাও হইবে না। যখন তাহারা দেখিল যে, ইন্দ্রজালের মত রথ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইল, তখন সহর ভাঙ্গিয়া লোকে এ কৌতুক দেখিতে আসিতে লাগিল, এবং আমার জয়নাদে শ্রীক্ষেত্র পূর্ণ হইল।

আমি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিলে, রাজমাতা—যিনি হতভাগ্য রাজাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমার কাছে এক প্রকাণ্ড মহাপ্রসাদের ডালি তাঁহার প্রধান আমলার দ্বারা পাঠাইয়া দিয়া, এরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"রাজার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে। এখন হইতে আমি আপনাকে পুত্র বলিয়া জানিব। আপনি এ রাজসংসার চালাইবেন।" আমিও সেরূপ স্বীকৃত হইয়াছিলাম। তিনি সে অবধি সময় সময় আমাকে নানা বিষয়ে পরামর্শ করিতেন। স্নানযাত্রার সময়ে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি, মন্দিরের প্রাঙ্গণের এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আনিয়া স্নান করান হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এক একটি মূর্ত্তি এক একটি প্রকাণ্ড কাপড়ের বস্তা। তাহার উপর রঙ্গের দ্বারা চিত্রিত। স্নানের সময় কাই ও নানা বর্ণের রং ধুইয়া যে জল পড়ে, তাহা বহুমূল্য পদার্থের মতন লোকে ঘটি বাটি করিয়া লইয়া যায়, এবং হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের হিন্দু রাজাদিগের কাছে তাঁহাদের পাণ্ডাদের দ্বারা প্রেরিত হয়। জগন্নাথের বৎসরের মধ্যে এই একদিন স্নান। এ স্নানে তিনি এরূপ ভিজিয়া যান যে, রথের সময় পর্য্যন্ত তিন মূর্ত্তিকে মন্দিরের এক স্থানে ফেলিয়া রাখা হয়। সে যাবৎ এ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে পট প্রদর্শন হইয়া থাকে। সে পটও এক অদ্ভুত জিনিস। খেজুরপাতার বেড়া, তাহাতে ত্রিমূর্ত্তি চিত্রিত। দেবতা তিন জনের যেমন রূপ, তেমনি উড়িয়া চিত্রকর। রথের পূর্ব্বদিবসের রাত্রিতে মূর্ত্তি তিনটিকে উঠাইয়া, আবার তাহাতে বস্তা বস্তা কাপড় জড়াইয়া এবং তাহার উপর আবার নূতন রঙ্গ দিয়া স্থাপন করা হয় এবং প্রভাতে 'নবযৌবনের দর্শন' হয়। রাণী-মা আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, নবযৌবনের দিবস রথ প্রস্তুত হইয়া তাঁহার সিংহদ্বারে উপস্থিত হওয়াই শ্রীক্ষেত্রের নিয়ম। অতএব সেদিন যদি আমি তাঁহাকে তিনখানি রথ দেখাইতে পারি, তবে তিনি তাঁহার জীবন সার্থক মনে করিবেন। কারণ, তিনি এরূপ কখনও দেখেন নাই। আমি বলিয়া পাঠাইলাম, তাহাই হইবে। আমার বোধ হয়, তাঁহার মনেও আশঙ্কা হইয়াছিল, এ অল্পসময়ের মধ্যে তিনখানি রথ প্রস্তুত হইবে না।

মোহন্তগণও আমাকে বলিলেন, নবযৌবন-দর্শনের শাস্ত্রোক্ত সময় ঊষা। আমি যদি ঊষার সময় তাঁহাদিগকে জগন্নাথ দর্শন করাইতে পারি, তবে তাঁহারা দুহাত তুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কারণ, ঊষার সময় নবযৌবনের দর্শন তাঁহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। প্রায়ই মূর্ত্তিত্রয় প্রস্তুত ও চিত্রিত করিতে নবযৌবনের দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। আমি তাঁহাদের কাছেও প্রতিশ্রুত হইলাম যে, তাহাই হইবে। তাঁহারা ঊষার সময় জগন্নাথদেবের দর্শন পাইবেন। বেলা চারিটার সময় রথ তিনখানি প্রস্তুত হইল, এবং আমি নিজে গিয়া রাণীমাতার বহির্দ্বারে তাহাদের উপস্থিত করিলাম। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি আমাকে কত আশীর্ব্বাদ বলিয়া পাঠাইলেন। অন্য দিকে আমার পাগ্‌লা ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া যখন রথ প্রস্তুত দেখিলেন, তাঁহারও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনিও আমার কত প্রশংসা করিলেন। আমি তখন রাত্রিতে ত্রিমূর্ত্তির প্রস্তুতের ও চিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যবস্থা করিয়া, পুলিশ নিযুক্ত করিলাম, এবং সেই তৈলঙ্গ ইন্‌স্‌পেক্টরের উপর সমস্ত ভার দিলাম। নিজে বরাহূত হইয়া সুহৃদ্‌বর জমিদার লোকনাথ রায়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত

হইলাম, এবং রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত বন্ধুদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে ও আহারে কাটাইয়া মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

লোকনাথবাবুর বাড়ী মন্দিরের খুব নিকট, এবং আমার আবাসস্থান সমুদ্রতীরে, সেখান হইতে প্রায় দু মাইল ব্যবধান। এ জন্য এ নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। আমি রাজাকে দ্বীপান্তরিত করিয়া আসিয়াছি বলিয়া, উড়িয়ারা আমাকে বাঘের মত ভয় করিত, এবং আমার কথা বিধাতার বাক্যের মত পালন করিত। এত অল্পসময়ে রথ নির্ম্মাণই তাহার প্রমাণ। অতএব রাত্রের ব্যবস্থাও সেইরূপই প্রতিপালিত হইবে বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু মন্দিরে আসিয়া দেখি, কোথাও কাহারও সাড়াশব্দ নাই। সকলেই নীরব। কনষ্টেবলেরা একস্থানে বসিয়া গঞ্জিকাদেবীর সেবা করিতেছে। দেবীর সঙ্গে সঙ্গে আমার হস্তের যষ্টিও মস্তকে অধিষ্ঠিত হইতে লাগিল। একচোট মার খাইয়া তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল। ইন্‌স্‌পেক্টর মহাশয়ও কোথায় বসিয়া দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিতেছিলেন। কনষ্টেবল একজন ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে, তিনি আমাকে ক্রোধে অধীর দেখিয়া বলিলেন যে, তাঁহার উপর রাগ করিলে কি হইবে. দ্বৈতারা কাজ করিতে চাহে না। তাহাদের পাঁচবৎসরের প্রাপ্য রাজার কাছে বাকী আছে। তখন আমি বলিলাম—"তাহারা কোথায় আছে, ডাকিয়া আন। এ জন্য তুমি কার্য্যটি ফেলিয়া রাখিয়াছ?" জগন্নাথদেব যখন নীলমাধবরূপে বনে লুক্কায়িত ছিলেন, সে সময়ে তিনি একসম্প্রদায় অনার্য্য জাতির অধিকারে ছিলেন। ইহাদের নাম 'দ্বৈতা'। তাহারা জগন্নাথের আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে পরিগণিত। জগন্নাথ কলেবর ত্যাগ করিলে তাহারা অশৌচ গ্রহণ করে, এবং পুরাতন মূর্ত্তির কক্ষ হইতে অমৃত পদার্থ চোখ বান্ধা অবস্থায় বাহির করিয়া নূতন মূর্ত্তির বক্ষে স্থাপন করে। সে অমৃত পদার্থ কি, তাহা কেহ বলিতে পারে না। প্রত্নবিদেরা মনে করেন, উহা বুদ্ধদেবের শরীরের অংশবিশেষ। হিন্দুরা বলেন—কালাপাহাড় দারুভূত মূর্ত্তি পোড়াইলে দ্বৈতারা চুরি করিয়া তাহার তিন টুক্‌রা রাখিয়াছিল, এবং তাহাই চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া এখন অমৃত বলিয়া পরিচিত। প্রত্যেক কলেবর পরিবর্ত্তনের সময় শুষ্ক চন্দন ঝাড়িয়া, তাহা নূতন চন্দনে চর্চ্চিত করা হয়। পুরাতন চন্দন, শুনিয়াছি—বহুমূল্য রত্নের মূল্যে বিক্রীত হয়। রথের পূর্ব্বে এ দ্বৈতারাই ত্রিমূর্ত্তিকে নূতন বস্ত্ররাশিতে আবৃত ও চিত্রিত করিয়া থাকে। তাহারা ভিন্ন অন্যে মূর্ত্তিত্রয় স্পর্শ করিতে পারে না। অনার্য্য জাতির সঙ্গে এ সম্পর্কও জগন্নাথদেবের বৌদ্ধত্বের আর এক প্রমাণ।

দ্বৈতারা নানা স্থানে লুকাইয়া বসিয়াছিল। পুলিশ কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম দিয়া তাহাদিগকে আমার কাছে উপস্থিত করিল। তাহাদের উপস্থিত প্রাপ্যের জন্য আমি দায়ী হইলে, তাহারা 'মামুনির জয় হোক' বলিয়া আনন্দের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিল। অনুমান, রাত্রি ৫টার সময় তিনমূর্ত্তি নূতন বস্ত্রে আবৃত ও চিত্রিত হইল। ইতিমধ্যেই দুই একজন প্রধান পাণ্ডা ও মোহন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ভক্তিতে অধীর হইলেন, এবং আমাকে টানিয়া লইয়া বলিলেন—"একবৎসরের মধ্যে আর ছুঁইতে পারিবেন না। মহাপ্রভুকে এখন একবার আলিঙ্গন করুন।" হিন্দুদের বিশ্বাস, জগন্নাথদেবের এ নবযৌবন যে প্রথম দর্শন করে, এবং তাঁহাকে এ সময় যে আলিঙ্গন করে, সে সশরীরে স্বর্গে যায়। তাঁহারা জোর করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করাইলেন। অকস্মাৎ আমার হৃদয়েও কি এক ভক্তির উচ্ছ্বাস উঠিল, যাহা জীবনে কখনও অনুভব করি নাই। সমস্ত জগৎ ও আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন কি এক অমৃতে সিক্ত হইল। তাঁহাদের মত আমারও কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। ত্রিমূর্ত্তিকে তাহারপর রত্নবেদীতে অধিষ্ঠিত করিয়া, স্থানে স্থানে যাত্রীর ভীড় নিবারণের জন্য পুলিশ নিয়োজিত করিয়া, পূর্ব্বদিক্ যেমনই ঊষার প্রথমরাগে রঞ্জিত হইল, অমনি সিংহদ্বার খুলিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে প্রায় মোহন্তেরা আসিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে কতই

আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার হৃদয় কি এক অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইল। আমি সে পূর্ব্বগগনের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চিত্রিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিলাম। বোধ হইতেছিল, যেন এমন পবিত্র, সুন্দরী ও মহিমময়ী ঊষা আমি আর কখনও দেখি নাই। নবযৌবনের দর্শন আরম্ভ হইল।

রথের সময় অন্যূন লক্ষযাত্রীর ভীড় হইয়া থাকে। তাহা নিবারণ করিবার জন্য সিংহ-দ্বারের সম্মুখে একটা বড় বড় গাছের বেড়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার যে একটু পথ থাকে, সে পথে এক সময় একজন লোকের বেশী প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু এক এক সময় যাত্রিগণ এরূপ ক্ষেপিয়া উঠে যে, এ বেড়া উড়াইয়া, এবং লোকের ঠেলায় প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের কপাট খুলিয়া ফেলিয়া, যাত্রিস্রোতঃ এরূপ ভীমবেগে ছুটে যে, সে ভীড়েতেই কখন কখন মানুষ মারা পড়ে। পূর্ব্ববৎসর এ সিংহদ্বারেই নাগা সন্ন্যাসীদিগের পদে দলিত হইয়া ১৪ জন যাত্রী মারা পড়িয়াছিল। লক্ষ যাত্রীর বিশ্বাস, জগন্নাথকে যে প্রথম দর্শনকরিবে, সে সশরীরে স্বর্গে যাইবে। অতএব সকলেই প্রথম দর্শনের জন্য প্রাণপণ করিতে থাকে। মেলার কার্য্যাধ্যক্ষের পক্ষে এ সময়টি বড়ই সঙ্কটের সময়। আমি নিজে বহুতর পুলিশ লইয়া বেড়ার পথের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলাম। বেড়ার বাহিরে লক্ষ যাত্রী। 'জয় জগন্নাথ' রবে আকাশ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমার ভয় হইতে লাগিল যে, প্রথম বেগেই বেড়া উড়িয়া-যাইবে। কিন্তু বেড়ার ভিতরে ও বাহিরে আমি এরূপভাবে পুলিশ সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম যে, প্রথম বেগ জগন্নাথদেবের কৃপায় থামাইতে পারিয়াছিলাম। বেলা ৯টা পর্য্যন্ত অবিরল স্রোতে যাত্রী প্রবেশ করিলে পর ভীড় কিছু কমিয়া আসিল। দেখিলাম, আমি যে প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলাম, তাহা সুচারুরূপে চলিতেছে।

সমস্ত রাত্রি জাগরণে ও দারুণ পরিশ্রম ও চিন্তায় আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমি আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলাম না। তখন দর্শনমন্দিরের দক্ষিণ দ্বারের একটি পাগ্‌ড়িদার সিংহে অঙ্গ হেলাইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। চক্ষের সম্মুখ দিয়া দর্শন-মন্দির হইতে মানবস্রোতঃ বহিয়া যাইতেছে। তাহাদের কত ভাষা, কত পরিচ্ছদ, কত বিচিত্র রূপ, হিমাদ্রি হইতে কুমারিকাবাসী এবং চট্টগ্রাম হইতে গান্ধারবাসী সমস্ত ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি একস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রমান্বয়ে চারিটি মন্দির। সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশকরিয়া প্রথম ভোগ-মন্দির, তাহার সংলগ্ন নাট-মন্দির, তাহার সংলগ্ন দর্শন-মন্দির, তাহার সংলগ্ন শ্রীমন্দির। যাত্রিগণ নাট-মন্দিরের পার্শ্বস্থ দ্বার দিয়া প্রবেশকরিয়া দর্শন-মন্দিরে উপস্থিত হয়। সেখানে একটি বৃহৎ চন্দনকাষ্ঠ দুটি লোহার তম্ভের উপর স্থাপিত আছে। যাত্রিগণ এ চন্দন-অর্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শ্রীমন্দিরস্থিত ত্রিমূর্ত্তি দর্শন করে। শ্রীমন্দির দ্বিপ্রহর সময়ও নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। আলোর মধ্যে পুনাং তেলের মশাল। তাহাতে আলো অপেক্ষা ধূঁয়া বেশী হইয়াথাকে। যাত্রিগণকে চন্দন-অর্গলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জগন্নাথ দর্শন করিতে হয়। তাহাও মুহূর্ত্তেকের বেশী সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবার সাধ্য নাই। পশ্চাতে যাত্রিস্রোতঃ ঠেলিতেছে, দুইপার্শ্ব হইতে কনষ্টেবল ও মন্দিরের পড়িহারীরা (প্রতিহারীরা) চোটপাট করিতেছে। পড়িহারীদের হাতে বেত থাকে, এবং সে বেতের দ্বারা প্রাচীরের গায়ে এমন কৌশলে তাহারা আঘাত করে যে, ঠিক বন্দুকের মত শব্দ হয়। অতএব শ্রীক্ষেত্রে গিয়া কেহ লাউ দেখিল, কেহ কুমড়া দেখিল বলিয়া যে গল্প শুনা যায়, তাহা অলীক নহে। যাত্রীরা মুহূর্ত্তমাত্র দাঁড়াইয়া, সেই ঘোর অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে আর যাহা কিছু দেখুক, জগন্নাথের প্রায় কিছুই দেখিতে পায় না, অথচ ভক্তির এমনই মাহাত্ম্য যে, তাহারা উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হইয়া, করতালি দিয়া, দুবাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে এবং গলদশ্রুনয়নে ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে 'জয় জগন্নাথ' বলিয়া বাহ্যজ্ঞানহীন অবস্থায় যেরূপে বাহির হইয়া আসে, তাহা দেখিলে বোধ

হয় যে, তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহারা স্বয়ং শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া আসিয়াছে। এ দৃশ্য দেখিলে পাষাণও দ্রব হয়। আমি নিজে স্তম্ভিত ও আত্মহারা হইয়া গলদশ্রুনয়নে এ দৃশ্য দেখিতেছি, এমন সময় একটি ষোড়শবর্ষীয়া অনিন্দ্যসুন্দরী বিধবা যুবতী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া পবনচ্ছিন্ন পুষ্পবল্লরীর মত আমার গলায় পড়িল। তাহার মুখে কেবল একমাত্র কথা—"আমি বড় অভাগিনী, আমি অনেক দূর হইতে আসিয়াছি, আমার ভাগ্যে জগন্নাথ দর্শন হইল না। বাবা! তুমি আমাকে জগন্নাথ দর্শন করাও।" তাহার আলুলায়িত কেশরাশি আমার অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার দেবীতুল্য মুখখানি আমার বক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে, এবং তাহার নয়নজলে আমার বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে। তাহার অঙ্গের বসন পর্য্যন্ত স্খলিত হইয়া গিয়াছে। তাহার কান্নায় আমিও কাঁদিয়া বলিলাম—"তুমি আমার গলা ছাড়িয়া দাও। আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া জগন্নাথ দর্শন করাইতেছি।" কিন্তু তাহার বাহ্যজ্ঞান নাই। কেবল মুখে সেই এক কথা—"আমি বড় অভাগিনী।" একজন কনষ্টেবলকে বলিলে সে আমার গ্রীবার পশ্চাৎ হইতে তাহার দুইকরের মুষ্টি খুলিয়া দিল। আমি তখন তাহাকে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, এবং উত্তর দিকে মন্দিরে যাত্রীর প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়া, পথ পরিষ্কার হইলে, আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অর্দ্ধ-চেতন অবস্থায় শ্রীমন্দিরে লইয়া গেলাম। তখন মশালের আলো ভাল করিয়া জ্বালাইয়া দিয়া তাহাকে বলিলাম—"তোমার সম্মুখে জগন্নাথ, তুমি প্রাণ ভরিয়া দর্শন কর।" সে তখন নিদ্রোত্থিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া স্থির অনিমেষ বিস্তৃত নয়নে জগন্নাথের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া ক্রমে তাহার বাহ্যজ্ঞান হইল, এবং তখন সসম্ভ্রমে অবগুণ্ঠন দিয়া বলিল—"আমি কোথায় আসিয়াছি! ও মা! আমার কি হইবে?" আমি বলিলাম—"তোমার কোনও ভয় নাই। আজ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে তোমার মত জগন্নাথদেবের ভক্ত কেহ আসে নাই। তুমি যদি ইচ্ছা কর, রত্নবেদী প্রদক্ষিণ করিতে পার।" একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে সে সাতবার বেদী প্রদক্ষিণ করিল, এবং পুনর্ব্বার কিছুক্ষণ অনিমেষনয়নে জগন্নাথ দর্শন করিল। আমি সে ভক্তির প্রতিমূর্ত্তি এ জীবনে কখনও ভুলিব না। তখন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে তাহারা ১১ জন আত্মীয় ও আত্মীয়া সহ মন্দিরের হাতায় প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারপর তাহার আর কিছুই মনে নাই। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আমার পূর্ব্বস্থানে ফিরিলাম, এবং তাহাকে আমার পাশে বসাইয়া রাখিয়া, তাহার আত্মীয়গণের অন্বেষণার্থ পুলিশ নিয়োজিত করিলাম। কিছুক্ষণপরে তাহারা আসিল। যুবতী তাহাদিগকে দেখিয়া এবং তাহারা যুবতীকে দেখিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং লুটাইয়া লুটাইয়া তাহাদের জাতি রক্ষাকরিয়াছি বলিয়া আমার পায়ে পড়িতে লাগিল। সে আর এক পবিত্র দৃশ্য।

তাহারা চলিয়া গেল। আমি সেই সিংহে অবসন্ন মস্তক রাখিয়া ভাবিতে লাগিলাম—এ ব্যাপারটি কি? একটি অজ্ঞাতকুলশীলা এরূপ ভাবে আসিয়া আমার গলায় পড়িল। তাহার ভয় নাই, লজ্জা নাই, বাহ্যজ্ঞান নাই। রমণী কেবল জগন্নাথমূর্ত্তি দর্শনের জন্য যদি এরূপ ভক্তিতে অধীরা ও আত্মহারা হইতে পারে, তবে ব্রজগোপীরা স্বয়ং শ্রীভগবানকে কিশোর-বালকরূপে সম্মুখে পাইয়া, রাসের শেষে যে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবে তাঁহার শ্রীমুখ চুম্বন করিবে, এবং তাঁহার দর্শনের জন্য পতি-পুত্র ত্যাগ করিয়া আসিবে, তাহা আর বিচিত্র কি? আমার হৃদয়ে একটি নূতন স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং সেখানেই রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস অঙ্কুরিত হইল। মেলা শেষ হইলে দুইপ্রহর সময়ে আমিও আত্মহারা অবস্থায় আবাসে ফিরিলাম।

শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা

ভারতবর্ষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অঞ্চলের জন্য শ্রীক্ষেত্রে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মেলা আছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা উৎকলবাসীদের, দোল উত্তর-পশ্চিমবাসীদের, এবং রথ বাঙ্গালীদের প্রধানমেলা। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথের খ্যাতি সমস্ত ভারতব্যাপী। আমি তাহার আর নূতন পরিচয় কি দিব? যাহা চক্ষে দেখিয়াছি, তাহাও যে বর্ণনা করিতে পারিব, এরূপশক্তি আমার নাই। স্নানযাত্রা হইতেই যাত্রীর সমাগম আরম্ভ হয়, এবং 'নবযৌবনে'র মেলার পূর্ব্বদিবস তাহা পূর্ণতা প্রাপ্তহয়। রথের সময় সচরাচর লক্ষ যাত্রীর সমাগম হইয়াথাকে। কোন বিশেষ পুণ্যযোগ থাকিলে তাহার দ্বিগুণ ত্রিগুণও হয়। গোবিন্দ-দ্বাদশীর মেলাতে পূর্ব্ববৎসর ৩ লক্ষ যাত্রী সমবেত হইয়াছিল। অতএব শ্রীক্ষেত্রের রথের মত এরূপ বৃহৎ সমারোহ সচরাচর প্রতিবৎসর অন্য কোন তীর্থে হয় কি না সন্দেহ। তাহাতে জগন্নাথদেবের সেবাপ্রণালী এত ক্রিয়াবহুল যে, তাহাতে রথযাত্রা সুনির্ব্বাহকরা একরূপ অসাধ্য ব্যাপার। রাত্রি প্রভাতে আরতি, তাহারপর শয্যাত্যাগ, তাহারপর মুখপ্রক্ষালন, তাহারপর বাল্য-ভোগ, তাহারপর স্নান, তাহারপর বেশবিন্যাস ও দর্পণ দর্শন, তারপর পূজা, তারপর মধ্যাহ্ন 'ধূপ' অর্থাৎ মধ্যাহ্ন-ভোগ। এ ভোগে লক্ষ যাত্রীর, এবং সমস্ত শ্রীক্ষেত্রবাসীর আহারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। ইহাতে সহজে বুঝা যায় যে, এ ভোগটি কি বৃহৎ ব্যাপার। ইহার রন্ধনের জন্য এক এক উননে উপর্য্যুপরি ৩০।৪০টি হাঁড়ি সজ্জিত হইয়া থাকে। এরূপ শতশত উনন আছে, এবং রন্ধনের জন্য ছয়শত ব্রাহ্মণ নিয়োজিত আছে। এ ভোগের অন্ন বিক্রয়ের দ্বারা ইহারা সপরিবারে প্রতিপালিত হয়, এবং জগন্নাথদেবের সমস্ত সেবা নির্ব্বাহিত হয়। তদ্ভিন্ন যাত্রীরা রত্নবেদীর উপর যাহা প্রণামী দিয়া থাকে, এবং অনুমান দশহাজারটাকা আয়ের যে একটি জমিদারি আছে, তাহাই জগন্নাথের নিজস্ব সম্পত্তি। পাণ্ডামহাশয়দের কৃপায় রত্নবেদীতে যাত্রীরা কদাচিৎ কিছু দিয়াথাকে। এ জন্য বহু যাত্রীর সমাগমেও জগন্নাথদেবের সেবার বড় সচ্ছল অবস্থা নহে। অন্যদিকে পাণ্ডা মহাশয় ও তাঁহাদের গোমস্তারা যাত্রীদিগকে প্রহার করিয়াও তাঁহাদের টেক্স আদায় করিয়া থাকেন। একদিন মন্দিরে বেড়াইতে গিয়া এরূপ একটি শোচনীয় ঘটনা আমার চক্ষে পড়ে। দুরাচার পাণ্ডা আমাকে দেখিয়াই পিট্‌টান দেয়। আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া, ফৌজদারিতে অর্পণ করিব বলিয়া প্রায় একমাস যাবৎ তাহার আহার নিদ্রা বঞ্চিত করিয়াছিলাম। শুনিয়াছি, তাহার ফলে আমি যতদিন শ্রীক্ষেত্রে ছিলাম, এরূপ অত্যাচার আর হয় নাই।

থাক্ সে কথা। মধ্যাহ্নে 'ধূপে'র পর জগন্নাথদেবকে রথে তুলিতে হয়। এ কারণে রথের দিবস শুনিয়াছি, জগন্নাথদেবের রথসঞ্চালনও যাত্রীদের ভাগ্যে প্রায় ঘটিয়া উঠে না। তাঁহার রথে উঠিতে উঠিতেই দিন ফুরাইয়া যায়। অতএব মোহন্তরা, বিশিষ্ট যাত্রীরা এবং রাণী স্বয়ং আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, নবযৌবনের যেরূপ সুচারুরূপে ঊষায় দর্শন হইয়াছে, রথেরদিন কিছু বেলা থাকিতে দেবতাদিগকে রথে তুলিয়া দর্শন করাইতে পারিলে তাঁহারা বড় কৃতজ্ঞ হইবেন। অতএব রথের পূর্ব্বদিবস রাত্রিতে মন্দিরে অধিকরাত্রি পর্য্যন্ত থাকিয়া আমার কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার জন্য সময় নিরূপণ করিয়া দিয়াছিলাম। যেই রাত্রি প্রভাত হইল, অমনই এক কনষ্টেবল আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল—"জগন্নাথজীকা আরতি হো গেয়া।" তাহার ৫।৭ মিনিট পরে আর একজন আসিয়া সেরূপভাবে বলিল—"জগন্নাথজীকা শয্যাত্যাগ হো গেয়া।" এরূপে ঠিক কলের মত আমার কার্য্য-প্রণালী চলিতেছে দেখিয়া, আমি নিশ্চিন্তে কোর্টে গিয়া একটি খুনি মোকদ্দমা লইয়া বসিয়াছি, এমন সময় আমার ক্ষেপারাম মাজিষ্ট্রেট আসিয়া আমার এজলাসে উপস্থিত হইলেন এবং বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"কি, তোমার হাতে রথের ভার, আর তুমি এখনও বসিয়া কাচারি করিতেছ।" আমি বলিলাম—আপনি ২টার সময় গেলে দেখিবেন যে, তিন-মূর্ত্তিই আপন আপন রথে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বলিলেন—"তুমি পাগল, জগন্নাথদেবের

রথযাত্রা কি ভীষণ ব্যাপার, তাহা তুমি জান না। এতক্ষণে হয় ত কয়টা খুন হইয়া গিয়াছে।" তিনি আমার বাম বাহুতে ধরিয়া, চেয়ার হইতে টানিয়া তুলিয়া, একেবারে রাস্তায় লইয়া ছাড়িয়া দিলেন। আমি হাসিতে হাসিতে ঘোটকে আরোহণ করিয়া ছুটিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে বড় 'ডাণ্ডে' গিয়া উপস্থিত হইলাম, তখন মোটে বেলা ১২টা, কিন্তু সত্য সত্যই কি ভীষণ ব্যাপার! যতদূর দেখা যাইতেছে, একটি তরঙ্গিত উদ্বেলিত নরনারী-সাগর! সে রাস্তা পার হইয়া মন্দিরে প্রবেশ করা আমার পক্ষে পর্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। বহু কনষ্টেবলের সাহায্যে এবং বহুকষ্টে হাতায় প্রবেশ করিলে দেখিলাম, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে স্থানে স্থানে আমার নিয়োজিত পুলিস ভিন্ন আর যাত্রী বড় প্রবেশ করিতে পারে নাই। পুলিসেরা এবং মন্দিরের পরিচালকেরা অক্ষরে অক্ষরে আমার কার্য্যপ্রণালী প্রতিপালন করিয়াছে। কিন্তু নাট-মন্দিরে প্রবেশকরিয়া দেখিলাম, সে স্থানে স্ত্রীলোক মাথায় মাথায় লাগিয়াছে। ইন্‌স্‌পেক্টরের উপর তজ্জন্য রাগ প্রকাশ করিলে সে বলিল—"আমি কি করিব? এ সকলই আপনাদের হাকিমদের ও বড় আমলাদের পরিবার ও তাঁহাদের চাকরাণী।" জগন্নাথকে বাহির করিবার পথটুকু পর্য্যন্ত নাই। একটু সরিয়া বসিয়া পথ করিয়া দিতে বলিলে তাহারা কর্ণপাতও করিল না। অগত্যা পুলিসকে হুকুম দিলে তাহারা কোনও মতে একটু সঙ্কীর্ণপথ করিয়া লইল। দাসীগুলি পর্য্যন্ত পাথর কামড়াইয়া পড়িয়া আছে। কনষ্টেবলেরা মড়ার মত কাঁধে করিয়া বাহির করিল। কিন্তু কি ভক্তির উচ্ছ্বাস! সমস্ত রমণীরা জয় জগন্নাথ, বলিয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতেছিল। আমি মোজা খুলিয়া ফেলিয়া, প্যাণ্টুলন গুটাইয়া এবং পড়িহারীর বেত একটি হাতে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। বলিয়াছি, নাট-মন্দিরের পর দর্শনমন্দির, তাহারপর শ্রীমন্দির। তাহাতে একমাথা উচ্চ একটি অতিসুন্দর চিক্কণ কৃষ্ণবেদীর উপর ত্রিমূর্ত্তি অবস্থিত। ইহারই নাম রত্নবেদী; কারণ, বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন ইহার উপর স্থাপিত। বেদীর শিরোদেশ হইতে কক্ষতল পর্য্যন্ত তক্তা লাগান হইয়াছে। আমি মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মূর্ত্তি তিনটি ফুলে পত্রে অতিশয় মনোহর বেশে সজ্জিত হইয়াছে। তিনটির মাথায় পুষ্পপত্রনির্ম্মিত তিনটি কি মনোহর চূড়া! বহুমূল্য রত্নখচিত চূড়া তাহার কাছে কিছুই নয়। আমার আদেশ পাইবামাত্র দৈতাগণ তিনমূর্ত্তির হাতে কোমরে রক্ত-বস্ত্রমণ্ডিত দড়ি লাগাইল এবং বহুলোকে নীচে হইতে টানিয়া এবং উপর হইতে ঠেলিয়া তক্তার উপরদিয়া একে একে নামাইল। এ প্রকরণের কারণ এই যে, মূর্ত্তি এত ভারি যে, অন্য কোন প্রকারে নামাইবার সাধ্য নাই। তাহারপর প্রথম জগন্নাথদেবকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া লইয়া চলিল। প্রত্যেক টানে মাথার চূড়া কি লীলা করিয়াই দুলিতেছিল! যে একবার সেশোভা দেখিয়াছে সে ভুলিতে পারিবে না। মূর্ত্তি যখন নাটমন্দির দিয়া চলিতেছিল, তখন রমণীগণের হুলুধ্বনিতে মন্দির পরিপূর্ণ হইল এবং তাহাদের ভক্তি-উচ্ছ্বসিত রোদনে প্রস্তরভিত্তি ভিজিয়া উঠিল। সে ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার পাষাণ প্রাণও বিগলিত হইল। আমি একটি অষ্টমবর্ষীয় শিশুর মতন আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলাম। মন্দিরের প্রাঙ্গণে বড় বড় মোহন্ত ও পাণ্ডারা সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারাও আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"বাবা! তুমি জগন্নাথদেবের বড় ভক্ত। মহাপ্রভুর তোমার প্রতি বিশেষ কৃপা। তাহা না হইলে আমরা বেলা ১টার সময় জগন্নাথদেবকে রথে যাইতে কখনও দেখি নাই। প্রাঙ্গণ ও সিংহদ্বার পার হইয়া জগন্নাথদেব যেই বড় 'ডাণ্ডে' উপস্থিত হইলেন, তখন যাহা ঘটিল, তাহা বর্ণনা করিবার আমার শক্তি নাই। লক্ষ যাত্রী এককণ্ঠে সমুদ্র-গর্জ্জনবৎ 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনি করিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উন্মত্তবৎ দুইবাহু তুলিয়া নাচিতে লাগিল। সেই ভক্তি-সাগর-কল্লোলে শ্রীক্ষেত্র যথার্থই একটি মহাতীর্থ হইয়া উঠিল। যাত্রিগণ ধূলায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছিল এবং অশ্রুজলে বালুকারাশি সিক্ত করিতেছিল। এ ভক্তিপ্লাবনে মানুষ কখনও ভাসিয়া না গিয়া

স্থির থাকিতে পারে না। তীর্থ-মাহাত্ম্য কি এবং তীর্থে গেলেই কেন মানুষের পুণ্য হয়, আমি তখন বুঝিলাম। উচ্ছ্বাসে আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। আমার ইচ্ছা হইতেছিল যে, আমিও যাত্রীদের সঙ্গে বালিতে গড়াগড়ি দিয়া এ পতিতদেহ পবিত্র করি এবং এই কঠোর হৃদয় কোমল করি। কিন্তু দারুণ অভিমানের জন্য পারিতেছিলাম না। আমি এত কাঁদিতে লাগিলাম যে, বোধ হইতে লাগিল, যেন আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইবে। মোহন্তগণ ও বন্ধুগণ আমাকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হৃদয়ের আবেগ থামাইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলাম। রথ সপ্তবার প্রদক্ষিণ করাইয়া, জগন্নাথদেবকে যেমন তক্তার উপরদিয়া টানিয়া রথে তুলিলাম, অমনই লক্ষ যাত্রীর 'জয় জগন্নাথ' ও 'হরি বোল' রবে শ্রীক্ষেত্র কম্পিত হইয়া উঠিল। এ রথ-প্রদক্ষিণ ও রথারোহণও এক বিষম ব্যাপার। বড় 'ডান্ডে' বালুকাময় সমুদ্রসৈকতমাত্র। সে বালিরাশির উপর এতাদৃশ গুরুভার মূর্ত্তি সাতবার টানিয়া প্রদক্ষিণ করান যে কি কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। রথের চতুর্দ্দিকে যেন একটি শৃঙ্খল হইয়াগেল। এরূপে ক্রমে বলদেবের ও সুভদ্রার মূর্ত্তি আনিয়া ও রথ প্রদক্ষিণ করাইয়া তাহাদের আপন আপন রথে তোলা হইল।

তাহারপর রথ টানা। মূর্ত্তি রথে তুলিতে প্রায় ৩টা হইল। যাত্রিগণ বোঁচকা পিঠে বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। জগন্নাথের রথ দুইহাত চলিলেই "রথে চ বামনং দৃষ্টা" হইয়া গেল। অধিকাংশ যাত্রী তখনই বাড়ী ছুটিবে জগন্নাথের রথে ষোলগাছি দড়ি। রথের চাকাতে করাতের মত একহাত দেড়হাত লম্বা দাঁতকাটা আছে, তাহাতে বালি ভেদ করিয়া চাকা চালিত হয় এবং এ কারণে রথ চালান কঠিন ব্যাপার। তদ্ভিন্ন রথের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড কাঠ ঝুলান থাকে। যাত্রী ছাড়া ক্ষেত্রবাসিগণও নিজে দড়ি ধরিয়া অন্ততঃ একহাতও জগন্নাথের রথ টানে। তাহাতে রথ এরূপ দ্রুতবেগে ছোটে যে, রথের সমক্ষে ঝুলান প্রকাণ্ড কাঠটি ফেলিয়া দিলেও তাহা ডিঙ্গাইয়া গিয়া রথ মানুষের উপর পড়ে এবং তাহাতে সময় সময় মানুষ মারা পড়ে। এ জন্যই শ্রীক্ষেত্রের রথযাত্রা এত ভীষণব্যাপার বলিয়া ইউরোপীয়দের কাছে বহুকাল হইতে ঘৃণিত এবং এ জন্যই যাহার উপর রথের ভার থাকে, সে কর্ম্মচারীর ঘোরতর বিপদ্। আমি এ সকল কথা পূর্ব্বেই পুস্তকে পড়িয়াছিলাম এবং শ্রীক্ষেত্রে গিয়া অবধি শুনিয়াছিলাম। জগন্নাথের রথ যেরূপ সকলে টানিতে চাহে, কিন্তু বলদেব ও সুভদ্রার রথ কেহই টানিতে চাহে না। অতএব প্রতিবৎসর সে দুইখানি রথ টানিয়া লইতে রথযাত্রার প্রায় ৭ দিন সময় অতিবাহিত হইয়া যায়। আমি আদেশ করিলাম যে, বলদেবের ও সুভদ্রার রথ 'গুণ্ডিচা-বাড়ী'তে পৌঁছিলে, তবে জগন্নাথদেবের রথে দড়ি দিব। ইহাতে যাত্রীদিগের মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এ কৌশল শুনিয়া অনেকে আবার হাসিয়া আমার চাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রথ টানিবার জন্য জগন্নাথদেবের প্রায় ৩০০০ সহস্র নান্‌কারভোগী ভৃত্য আছে, ইহাদিগকে 'কলা বেঠীয়া' বলে। ইংরাজরাজ্যে অন্যত্র যেরূপ হইয়াছে, এখানেও সেরূপ। তাহারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করে, কিন্তু রাজার সাধ্য নাই যে তাহাদের আনাইয়া রথ টানাইবেন। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারীরা এ খবর কেহ রাখিতেন না। আমার এইটা কু-অভ্যাস আছে যে, এরূপ কোনকার্য্যে নিয়োজিত হইলে তাহার সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া একটি কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া লই। অতএব আমি পুলিস আদেশ প্রেরণ করিয়া এই 'কলা বেঠীয়া' মহাশয়দিগের প্রায় ৭০০।৮০০ জনকে রথের সমক্ষে উপস্থিত করাইয়াছিলাম। কাজেই রথ টানাইতে আমার আর বড় কষ্ট পাইতে হয় নাই। আমি প্রথম সুভদ্রার রথে দড়ি দিলাম। ৬ গাছি দড়ি টানিবার জন্য ৬০০ শত লোক নিয়োজিত করিয়া দিলাম। আমি নিজে রথের উপর আসীন। আমি ছাড়াও রথের উপর বহুতর লোক। রথ চলিতে লাগিল। মোহন্তগণ ও যাত্রিগণ আমাকে 'আমানি' ও নানাবিধ ফল খাওয়াইয়া আপ্যায়িত করিতে লাগিলেন। রথের অগ্রভাগে শূন্যে

এক অপূর্ব্ব ক্ষুদ্র কাষ্ঠঘোটক, তাহার পশ্চাতে সারথি। তাঁহার নাম উড়িয়া ভাষায় 'ডাহুক'। এ 'ডাহুক' মহাশয় 'গীত্য' না গাইলে বেঠীয়ারা কিছুতেই রথ টানে না। তাহার গীত্যও এক অপূর্ব্ব জিনিস। যত রকমের কুৎসিত গালি আছে তাহা এক ভাণ্ডে ফেলিয়া এবং মন্থন করিয়া এ গীত্যামৃত রচিত। 'ডাহুক' এক এক গীত্য শেষ করিয়া 'কলা বেঠীয়া'দের মা মাসি তুলিয়া গালি দিয়া রথ টানিতে আদেশ করেন, এবং তাহারা সেই গাল খাইয়া, আনন্দে অধীর হইয়া, রথ টানিতে আরম্ভ করে। তাহাতে সময়ে সময়ে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা আছে। হয় ত রথের সম্মুখে কলা বেঠীয়ারা ডাহুকের মুখের দিকে চাহিয়া খিলখিল করিয়া হাসিতেছে, আর দড়ির অগ্রভাগে যাহারা আছে, তাহারা টান দিয়াছে। ইহার অনিবার্য্য ফলে সম্মুখের লোকগুলি রথের ধাক্কা খাইয়া যায় এবং সেখানেই হত হয়। আমি এ সকল ভীষণ হত্যা নিবারণের জন্য রথের দুই কোণা হইতে দুইটি প্রকাণ্ড দড়ি রাস্তার দুইসীমা পর্য্যন্ত দিয়াছিলাম। উহা কেবল কনষ্টেবলদের হাতে ছিল। ইহার দ্বারা অন্য লোক রথের সম্মুখে আসিবার পথ বন্ধ করিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন রথের দড়ির মধ্যে মধ্যে কলা বেঠীয়াদের সঙ্গে কনষ্টেবল রাখিয়াছিলাম, এবং আদেশ দিয়াছিলাম যে, যতক্ষণ আমি রথ হইতে হুকুম না দিব, ততক্ষণ তাহার গীত্যের উপর রথ টানিতে পারিবে না। পুলিসদের উপর আরও হুকুম ছিল যে, তাহারা নিরন্তর আমারদিকে চাহিয়া থাকিবে এবং আমার ইঙ্গিতমতে রথ টানিবে ও রাখিবে। এরূপ সাবধানতার সহিত রথ চালাইতে লাগিলাম। সে দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সুভদ্রার রথ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে পৌঁছিল। পরদিন অপরাহ্নে সেরূপভাবে বলদেবের রথও পৌঁছিল। তৃতীয় দিবস অপরাহ্নে জগন্নাথদেবের রথে দড়ি সন্নিবেশিত করিলে যাত্রী ও ক্ষেত্রবাসীরা আসিয়া সে দড়ি ধরিবার জন্য একটা ক্ষুদ্র কুরুক্ষেত্র উপস্থিত করিল। সেদিন আর কলা বেঠীয়ার আবশ্যক হইল না। ষোল দড়িতে অনুমান ১৬০০ শত লোক ধরিয়া এরূপ বেগে টানিয়া লইল যে, ২ ঘণ্টার মধ্যে এ রথ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। এ রথ চালানই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক। কারণ, দড়ির টান একদিকে বেশী পড়িলে রথ পথপার্শ্বস্থ কোন বাড়ীতে গিয়া উঠিয়া পড়েন, এবং উহা ভগ্ন না করিলে আর চলিতে পারেন না। এরূপে ২॥০ দিনে তিনখানা রথ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে পৌঁছিল। সেখানে আমার জয়জয়কার পড়িয়া গেল। কারণ, শ্রীক্ষেত্রের ইতিহাসে এমন সুশৃঙ্খলামতে ও এত শীঘ্র রথ কখনও গুণ্ডিচা-বাড়ীতে যায় নাই।

গুণ্ডিচা-বাড়ী ও ধনীর স্বর্গ

রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব যে বাড়ীতে যাইয়া থাকেন, তাহার নাম 'গুণ্ডিচা-বাড়ী'। উড়িয়া ভাষায় গুণ্ডিচা শব্দের অর্থ কি, তাহা জানি না : বোধ হয় বাগান-বাড়ী। লোকেরা সচরাচর উহাকে জগন্নাথের শ্বশুরবাড়ী বলিয়া ব্যাখ্যা করে। শ্রীমন্দির হইতে এ বাড়ী অনুমান একক্রোশ ব্যবধান। মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত ছোট হইলেও বড় সুন্দর। উহা শ্রীমন্দির-চতুষ্টয়ের একটি ক্ষুদ্রসংস্করণ এবং স্থানটি অতি মনোরম। প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বৃহৎ পাদপসমাচ্ছন্ন এবং পশ্চাতে ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর। তাহার চারিপাড় প্রস্তরে বাঁধান। বোধ হয়, এ মন্দির উৎকলের ইন্দ্রদ্যুম্ন নরপতির নির্ম্মিত। রথ এ মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলে তিন-মূর্ত্তিকে পূর্ব্বকথিত প্রকারে রথ হইতে মন্দিরের বেদীতে স্থাপিত করিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনরথই তৃতীয় দিবসে গুণ্ডিচা-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। যাত্রীদের ও মোহন্তদের কাছে অশেষ ধন্যবাদ পাইলাম। তাহার কারণ, জগন্নাথ যতদিন রথে থাকেন, সে কয়দিন খই, চিড়া ইত্যাদি ভাজা জিনিস মাত্রেরই ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে ; অন্ন-ভোগ হয় না। কাজেই যাত্রী ও ক্ষেত্রবাসীদের পক্ষে এ কয়দিন অন্ন জোটে না। অতএব রথ পৌঁছিতে

যত দেরী হয়, ততঃ তাহাদের কষ্ট হয়। শুনিয়াছি, এক এক বৎসর সাতদিনেও রথ গুণ্ডিচা-বাড়ীতে পৌঁছে না এবং জগন্নাথ পথ হইতে শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া যান। কাজেই লোকের কষ্টের সীমা থাকে না।

রথ আসিয়া পৌঁছিবামাত্র গুণ্ডিচা-বাড়ী বৎসরের মধ্যে এ কয়দিন লোকারণ্য হইয়া যায়। যাত্রী ও মোহন্তরা গাছতলায় কাপড়ের আচ্ছাদন টাঙ্গাইয়া এ কয়দিন এখানে বাস করেন এবং অহর্নিশি সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের শব্দে গুণ্ডিচা-বাড়ীর উপবন কলকলায়িত হয়। তখন ইহার এক অপূর্ব্ব শোভা হয়। অন্য সময় নিৰ্জ্জনতা আর এক গাম্ভীর্যপূর্ণ শোভা বিকাশ করে। এ কয়দিন মালপো-ভোগের বড় ধূম পড়িয়াযায় এবং সময়টি বড় আনন্দে অতিবাহিত হয়। আমি দুইবেলা তত্ত্বাবধানের জন্য যাইতাম এবং আনন্দে উৎসবে হৃদয় চরিতার্থ করিয়া গৃহে ফিরিতাম। এরূপ সুচারুভাবে রথযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমার বাড়ীতে প্রত্যহ কত মহাপ্রসাদের নানা বিচিত্র ভোগপূর্ণ ডালি আসিয়াছিল।

চারিদিন পরে উল্টারথের পর্ব্ব আসিল। আবার পূর্ব্ববৎ প্রথমদিনে সুভদ্রার, পরদিন বলদেবের রথ শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে নীত হইল। তৃতীয় দিবস ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে জগন্নাথদেবের রথ সেখানে উপস্থিত হইল। এখানে একটু ঘোরাল রকমের রঙ্গ হইয়া থাকে। জগন্নাথের সেবাদাসীগণ—শ্রীক্ষেত্রে তাহাদিগকে 'মাহুরী' বলে—সিংহদ্বার বন্ধ করিয়াদিয়া, জগন্নাথদেব ৭ দিন কোথায় ছিলেন, লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পক্ষ হইতে কৈফিয়ৎ তলব করেন। লক্ষ্মী ঠাকুরাণীও এ সময় মন্দির হইতে বহির্গতা হইয়া সিংহদ্বারের পার্শ্বে প্রাচীরের উপর বিরাজ করেন। পাণ্ডাগণ জগন্নাথদেবের পক্ষ হইতে মানিনী লক্ষ্মীদেবীর কাছে এই কৈফিয়ৎ পেশ করেন যে, গরিব বেচারী আর কোথাও যান নাই, কেবল পতিত উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন। তখন মাহুরী ঠাকুরাণীরা জয়দেব ঠাকুরের গীতগোবিন্দ কিছুক্ষণ অপূর্ব্ব-ভাবে গাহিয়া সিংহদ্বার খুলিয়া দেন। তখন পতিতপাবন ৭ দিবস পতিত উদ্ধার করিয়া স্বমন্দিরে প্রবেশ লাভ করেন। তাঁহাদিগকে রত্নবেদীর উপর স্থাপিত করিবার পর আবার কিছুক্ষণ মাহুরী ঠাকুরাণীরা জয়দেবগোস্বামীর মুণ্ডপাত করেন। সে সঙ্গীত যে একবার শুনিয়াছে, তাহার আর কলিকাতায় উড়িয়াদের ঝগড়া দেখিবার সাধ হইবে না।

মূর্ত্তিত্রয় বেদীস্থ হইলে আমার উপর চারিদিক্ হইতে আর একপ্রস্থ জয়-জয়কার ও আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইল। সকলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এমন সুচারুরূপে জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা কখনও সম্পাদিত হয় নাই। এমন কি, রাণীমাতা পর্য্যন্ত অন্তঃপুর হইতে তাঁহার আনন্দ ও আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। একদিকে মাহুরীদিগের সে বিচিত্র সঙ্গীত, অন্যদিকে সে বিচিত্র উৎকলভাষায় আমার অজস্র প্রশংসা ও কোলাকুলির মধ্যে আর একবিচিত্র ঘটনা ঘটিল। রথের সময়টি শ্রীক্ষেত্রে ওলাদেবীর আবির্ভাবের একটি বিশেষ সময়—মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলেও চলে। সেজন্য এবং অন্নপ্রাশনের অন্ন উত্থানকারী নানা গন্ধ-সম্বলিত যাত্রিব্যূহ ভেদকরিয়া আমাকে যাতায়াত করিতে হইত বলিয়া একটি ক্ষুদ্র লেভেণ্ডারের শিশি আমার পকেটে থাকিত। কোলাকুলির ও সাদর অভ্যর্থনার মাত্রার কিঞ্চিৎ আধিক্যবশতঃ উহা আমার পকেট হইতে পাথরের উপর পড়িয়া সহস্রখণ্ডে ভাঙ্গিয়া সৌরভ ছড়াইল। উৎকলবাসীরা গঞ্জিকাদেবীর সেবক, কিন্তু তাঁহারা তস্য সপত্নী সুরাদেবীর ঘোরতর বিদ্বেষী। লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপা একসঙ্গে কাহারও প্রতি হয় না। তাহারা দেখিল, ভাঙ্গিয়াছে যাহা, তাহা এক বিলাতী শিশি এবং গন্ধ যাহা ছুটিয়াছে, তাহাও বিলাতী। গঞ্জিকাদেবীর সৌরভের সঙ্গে তাহার বড় সাদৃশ্য নাই কাজে কাজে তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, উহা তাঁহার সপত্নী সুরাদেবীই হইবে। গঞ্জিকাসেবকদিগের দেবতার মন্দিরে তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ। অতএব আমার যে তখন কি শোচনীয় অবস্থা হইল, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। উড়িয়ারা সকলে নাসিকা আপন আপন তৈল-হরিদ্রা-মিশ্রিত

সুগন্ধযুক্ত বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া আমার ধৃষ্টতায় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল। কেবল মোহন্ত নারায়ণদাস আসিয়া আমাকে এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিলেন। তিনি ক্রোধান্ধ গাঞ্জাসেবকদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উহা বিলাতী সুরা নহে, বিলাতী সুরভি। তখন অনেকে স্বীয় বস্ত্রে সেই নিষিদ্ধ পদার্থটি লাগাইবার জন্য একটা ঠেলাঠেলি মারামারি লাগাইয়া দিলেন, এবং আমি এ অবসরে অব্যাহতি লাভ করিয়া ১২ দিবসের ঘোরতর পরিশ্রমে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রথযাত্রা শেষ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

রথ ফুরাইল। ১২ দিবসের চিন্তায় ও পরিশ্রমে শরীর ও মন অবসন্ন। একদিন অপরাহ্নে এ অবস্থায় আমার বাঙ্গলার সম্মুখে সমুদ্রের তীরে একখানি বেঞ্চে বসিয়া অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত শোভা ও সান্ধ্য রবিকরে অনন্ত লহরীর অনন্ত লীলা দেখিতেছি। আমি প্রায়ই প্রভাত ও অপরাহ্ন এবং জ্যোৎস্নারাত্রির অর্দ্ধাংশ সমুদ্রতীরে বেড়াইয়া ও এখানে বসিয়া কাটাইতাম। পার্শ্বে বসিয়া আছেন চট্টগ্রামের প্রধান ধনী ব্যবসায়ী। তাঁহার জন্মস্থান পূর্ব্ববাঙ্গালা। চট্টগ্রামে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের একটা সামান্য আড়ত বা কারবারের স্থান ছিল। তিনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সে তাহার ভারপ্রাপ্ত হইয়া চট্টগ্রামে আসেন এবং চট্টগ্রাম স্কুলের এন্‌ট্রান্স ক্লাসে আমাদের সঙ্গে পড়েন। কি শুভক্ষণে তাঁহার ও আমার সাক্ষাৎ হয়, প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে পরম বন্ধুতা হয়। তিনি দেখিতে খর্ব্বাকার হইলেও সুন্দর। বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, সুগোল মুখ, সে মুখে সুন্দর হাসি। সেই প্রথমদিনই স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই, কি জানি কেন, সকল ছাত্রের দিকে চাহিয়াই আমার কাছে আসিয়া বসেন, এবং তখনই আমার সঙ্গে আলাপ করেন। দু'চার কথার পরই উভয়ে উভয়ের দিকে এত আকৃষ্ট হই যে, একটার সময় বিশ্রামের জন্য আধঘণ্টা ছুটি হইলে, তিনি আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্কুলের দারওয়ানের ঘরে লইয়া যান এবং তাঁহার জন্য রূপার রেকাবিতে যে জলখাবার প্রস্তুত ছিল তাহা হইতে সর্ব্বাগ্রে আমার মুখে একটা সন্দেশ তুলিয়া দেন। উভয়ে নানা গল্প করিতে করিতে বড় আনন্দে জলখাবার খাই এবং সেইদিন হইতে পরস্পরের মধ্যে এমন বন্ধুতা হয় যে, স্কুলে তিনি প্রায়ই আমার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত থাকিতেন। খেলার সময় আমি খেলিতাম, তিনি দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেন। আমি যেরূপ খেলা-প্রিয়, তিনি তেমনই সেই বয়সে ব্যবসায়-প্রিয়। আমি চঞ্চল, তিনি শান্ত। তিনি খেলা কাহাকে বলে, জানিতেন না। তাঁহার আমোদ আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া, কি বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার ব্যবসায়ের গল্প করা। চাউলের কারবার, ডালের কারবার, তেলের কারবার, এরূপে কত কারবারের কথাই বলিতেন এবং আমার মত জিজ্ঞাসা করিতেন। আমি মত দিব দূরের কথা, ছাই ভস্ম কিছুই বুঝিতাম না। উভয়ের মধ্যে বাল্যকালে এই যে বন্ধুতা হয়, উহা তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সমান ভাবে থাকে। বাল্যকালের বন্ধুতার মত এমন স্থায়ী আর কিছুই বুঝি এ অস্থায়ী জগতে নাই। কয়েকমাস পরে এন্‌ট্রান্স পাশকরিয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া যাই। তিনি পাশ হইয়া ছিলেন কি না, স্মরণ নাই। তিনি স্কুল ছাড়িয়া ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। আমি কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিলে তিনি আমার সঙ্গে প্রায় দেখা করিতে আসিতেন এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহার ব্যবসায়ের গল্প করিতেন। আমি যখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া চট্টগ্রামে বদলি হইয়া আসিলাম, তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তখন তিনি কারবারের এতদূর উন্নতি করিয়াছেন যে, তখন তিনি চট্টগ্রামের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী। একদিন যে চট্টগ্রামের নদী দেশীয় সদাগরদের সুলুপে (ছোট ছোট জাহাজে) এবং নদীতীর তাহাদের ব্যবসায়ের স্থানে পূর্ণ ছিল, এখন তাহা স্বপ্নবৎ অদৃশ্য হইয়াছে এবং দেশের সমস্ত বাণিজ্য ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ অধিকার করিয়াছে। তাহাদের প্রতিযোগিতায় দেশীয় বাণিজ্য ও বণিক্ ধ্বংস হইয়াছে। একমাত্র বন্ধুই তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া দেশের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে, ইউরোপীয় বণিকেরা তাঁহার প্রতি বড়

সুপ্রসন্ন ছিল না। ইহারা এরূপ স্বার্থপর যে, তাহাদের বন্যার মত ধনস্রোত বৃদ্ধির পথে, একটা সামান্য কণ্টকও তাহারা সহ্য করিতে পারে না। তবে বন্ধুবর যেমন অতিশয় চতুর ও তীক্ষ্ন-বুদ্ধি-সম্পন্ন, ব্যবসায়ে তেমনই মন্ত্রসিদ্ধ। তাহাতে বিচক্ষণ প্রৌঢ় লালচাঁদ তাঁহার মন্ত্রী ও অংশী। তথাপি ইউরোপীয় বণিকদের ষড়্যন্ত্রে তিনি ঘোরতর বিপদস্থ হইলেন।

সেই সময়ে চট্টগ্রামে একজন ফরাসি বণিক্ ছিল। তাহার ব্যবসায় সামান্য বলিয়াই হউক, কি ফরাসি জাতির প্রকৃতিবশতঃই হউক, সে বাঙ্গালীদের সঙ্গে বড় মিশিত। একদিন সে শিকারে যাইবার সময়ে তাহার কার্য্যের ভার বন্ধুর হস্তে দিয়া যায়। কোথা হইতে একটা টেলিগ্রাম তাহার নামে আসে, এবং বন্ধু তাহা গ্রহণ করিয়া, তাহার উত্তর দেন। কিন্তু সে উত্তর তিনি তাহারই নামে লিখিয়া দেন। তাহার স্থলে তিনি দিতেছেন, এরূপ লেখেন না। সে ফিরিয়া আসিয়া সেই টেলিগ্রামের মুসাবিদা দেখিয়া বলে যে, তিনি তাহার নাম জাল করিয়াছেন। তাহাকে ২৫০০০৲ টাকা না দিলে সে তাঁহার নামে জালিয়াতের নালিশ করিবে। যে ধনী, তাহার মত ধনের কাঙ্গাল এই পৃথিবীতে আর কেহ নাই। ২৫০০০৲ টাকা দূরের কথা, ২৫৲ টাকা দেওয়া বন্ধুর পক্ষে অসম্ভব কার্য্য। তিনি অসম্মত হইলেন। এই সুযোগ পাইয়া চট্টগ্রামের সমস্ত ইউরোপীয় বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারী ষড়্যন্ত্র করিয়া বন্ধুর নামে উক্ত জালের জন্য ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করে। বন্ধু আসিয়া কাঁদিয়া আমার গলায় পড়েন। আমার বিষম সমস্যা। এইমাত্র লালচাঁদের সাহায্য করা ও অন্যান্য দেশহিতকর কার্য্যের জন্য আমি কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিষচক্ষে পড়িয়াছি। লালচাঁদের মোকদ্দমায় তাঁহারা ঘোরতর অপমানিত হইয়া আমার প্রতি ব্যাঘ্রবৎ ক্ষেপিয়া রহিয়াছে। আমাকে কোনরূপে ফাঁকে পাইলেই গ্রাস করিবেন। এদিকে আমার একজন আবাল্য বন্ধু বিপদ্‌গ্রস্ত। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, মোকদ্দমা কিছুই নহে। তিনি নিশ্চয় অব্যাহতি পাইবেন। আমি তখনও পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্ট। যদি কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা টের পান—এ কথা ছাপা থাকিবে না—যে, আমি তাঁহার সাহায্য করিয়াছি, তবে আমার নিজের বিপদের সীমা থাকিবে না। কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না। তিনি আমার পায়ে পড়িতে চাহিয়া বলিলেন—"তুমি আমাকে রক্ষা না করিলে আমার এবার রক্ষা নাই। আমাকে নিশ্চয় সমস্ত ইংরাজ মিলিয়া জেলে দিবে।" তাঁহার মন্ত্রী লালচাঁদও আমার দুইহাত ধরিয়া বলিলেন—"আমি আপনার পিতার বয়সী ও পিতার বন্ধু; আমি আপনার পায়ে পড়িতে পারি না। কিন্তু আমাকে যেমন রক্ষা করিয়াছেন, আপনার বন্ধুকেও সেইরূপ রক্ষা করুন। সমস্ত দেশ ইহার শত্রু হইয়াছে।" তাহার কারণ আছে। বন্ধু চট্টগ্রামের প্রধান মহাজন। পূর্ব্বেকার মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, উহা সুপথ হইলেও এখনকার মহাজনেরা যে পথগামী, তাহার তুল্য ঘৃণিত পথ আর দ্বিতীয় নাই। ইহাতে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়। কাজেই লালচাঁদ ভিন্ন দ্বিতীয় এমন কেহ নাই যে, বন্ধুর পার্শ্বে দাঁড়াইবে। লালচাঁদও একে আপনার স্বার্থ না দেখিয়া পা ফেলিবার পাত্র নহেন। তাহাতে আপনি প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া এখন ঘোরতর সাহেব-ভীতিগ্রস্ত। আমার সঙ্গে যে কথা কহিতেছেন, বরাবর এ দিক্ সে দিক্ দেখিতেছেন, পাছে কেহ শুনে। বন্ধুর অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিতেছে। কি করিব, আবার বিপৎসমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। সমস্ত চট্টগ্রাম তোলপাড় এবং একটা আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে। বন্ধুর বিপদে কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, সকলেই সন্তুষ্ট। সকলের মুখে এক কথা—"বেটার এবার শিক্ষা হইবে। বেটা কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, ভিটাশূন্য করিয়াছে।" তাঁহার কোনওরূপ সাহায্য করিতে বন্ধু অবন্ধু সকলেই আমাকে নিষেধ করিল। সকলে বলিল যে, ইংরাজেরা ইহার উপর যেরূপ খড়্গহস্ত হইয়াছে, তাঁহার সাহায্য করিলে সে খড়্গ আমার মাথায় পড়িবে। আমিও তাহা জানিতাম। যাহা হউক, চট্টগ্রামের একজন প্লিডারের দ্বারা মোকদ্দমা আমি চালাইতে লাগিলাম। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার গৃহে ইহার পরামর্শ চলিছে

লাগিল। অন্য দিকে স্বয়ং কমিশনর বণিক্‌দলের সেনাপতি। যদিও আমরা দেখাইলাম যে, মোকদ্দমা কিছুই নয়, উক্ত ফরাসি বণিকের নাম স্বাক্ষর করাতে বন্ধুর কোনরূপ কুঅভিসন্ধি ছিল না, এবং তদ্দ্বারা সে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, অতএব এরূপ স্বাক্ষর করা আইনমতে জাল হইতে পারে না, তথাপি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা সেসনে পাঠাইলেন। বন্ধু একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। তাঁহার আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিনরাত্রি রোদন। আশ্চর্য্য! যাহার ব্যবসায়ে এত সাহস, তাহার বিপদে এত ভয়! এবারও মিষ্টার মনোমোহন ঘোষকে আমি নিযুক্ত করিয়া আনিলাম। বলিয়াছি, মোকদ্দমা কিছুই নহে, সেসনে বন্ধু সহজে অব্যাহতি পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আমার গলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কৃতজ্ঞতার কথা, তাঁহার জীবন ও জীবনাধিক সম্মান ও সম্পত্তিরক্ষার কথা বলিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে আমার সেই পিতৃব্য মহাশয়কে রক্ষা করিতে গিয়া শেষে আমি এ সকল দেশহিত ও লোকহিতের ফলে ঘোরতর বিপদস্থ হইলাম। বলা বাহুল্য, তখন লালচাঁদ কালাচাঁদদের মূর্ত্তিও দেখি নাই। বন্ধুর সঙ্গে কখনও ঘটনাক্রমে সাক্ষাৎ হইলে দুটা শুষ্ক সহানুভূতির কথা বলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেন, পাছে তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয়দের বিষচক্ষে পড়েন। হায় রে সংসার! যাহা হউক, সে বিপদের পর বদলি হইয়া পুরীতে আসি। এই রথযাত্রার সময়ে বন্ধু এই সুযোগ বুঝিয়া, সপরিবারে জগন্নাথ দর্শনে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ঠিক পূর্ব্বের মত ব্যবহার করি। এই কয়েকদিন তিনি ছায়ার মত আমার সঙ্গে থাকিয়া অত্যন্ত সম্মান ও সুবিধার সহিত সপরিবারে মেলাদর্শন করিতেছেন। এ সময়ে ভারতবর্ষীয় স্বাধীন রাজারা আসিলেও এরূপ সম্মান পান না, এবং এরূপ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দর্শন করিতে পারেন না। সমস্ত পুলিশ তাঁহার আজ্ঞাবহের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। এ সময়ে পুরীস্থ একবন্ধুর পুত্রের বিবাহেও তিনি রাজসম্মানে নিমন্ত্রিত হইয়া নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি কাল চলিয়া যাইবেন। অতএব বিদায় লইতে আসিয়া, আমাকে গৃহে না পাইয়া, সমুদ্রের তীরে আসিয়া পূর্ব্ববৎ আমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। আমার ব্যবহারে তাঁহার হৃদয়—এ সম্প্রদায়ের যদি হৃদয় থাকে—যেন একটু স্পর্শ করিয়াছে। তিনি আমার কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া শেষে বলিলেন—"তুমি বড খরচে ; যাহা পাও, তাহাই খরচ কর। এখন হইতে তুমি আমার কাছে তোমার বেতন পাওয়া মাত্র ১০০্ টাকা পাঠাইয়া দিবে। আমি আমার টাকার সঙ্গে মহাজনি করিয়া তোমাকে কিছুটাকা করিয়া দিব।" আমি বলিলাম—"তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিক। যাহা পাই, তাহাই খরচ হইয়াযায়, কিছুই থাকে না। তাহার কারণ, ভগবান্ আমার স্কন্ধে অনেকগুলি পরিবারের ভার অর্পণ করিয়াছেন। আমি অপব্যয় বড়কিছু করি না। যাহা হউক, তুমি যদি আমার এই সাহায্যটুকু কর, তবে আমি বড়ই উপকৃত হইব। আমি সংসারে বড়ই নিঃসহায়। ভাইগুলি এখনও শিশু, কখনও যে মানুষ হইবে, সে বিশ্বাসও নাই। খুড়তত ভাইটিও নির্ব্বোধ ও সংসারজ্ঞানহীন, সিকি পয়সার সাহায্য করে, এমন এ জগতে আমার কেহ নাই।" আমি কথাগুলি এরূপ হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সহিত বলিলাম যে, তাঁহার প্রাণ যেন আরও দ্রব হইল। উভয়ে কিছুক্ষণ আপন আপন হৃদয়ের আবেগে নীরবে সিন্ধু পানে চাহিয়া রহিলাম। সন্ধ্যার ছায়ায় সমুদ্রের দৃশ্য কি গাম্ভীর্য্যপূর্ণই হইয়াছে। সেই গাম্ভীর্য্যের ছায়া যেন আমার হৃদয়েও পড়িয়াছে। তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—"তোমার মত এই হৃদয় চট্টগ্রামে কাহার আছে? এখনকারদিনে তোমার বড়লোকেরা পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে অন্ন দিতেছে না। আর তুমি এতগুলি দরিদ্র পরিবার প্রতিপালন করিতেছ। কাজেই কিছু থাকে না। যাহা হউক, এ অতি সামান্য সাহায্য। আমি তোমার এ সাহায্য করিব।" উত্তরে বাল্যকালের মত গলাগলি করিয়া উভয়ের কাছে সেই সমুদ্রসৈকতে বিদায় হইলাম। ইহার কিছুকাল পরে

স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা হইলে, আমি বন্ধুবরের কাছে তাঁহার প্রতিশ্রুতিমতে উহা তাঁহার কাছে পাঠাইতে চাহিলাম। তাঁহার উত্তর পাইয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার কারবারের অবস্থা শোচনীয়। মহাজনিতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। অতএব আমার টাকা লইয়া তিনি মহাজনি করিতে স্বীকৃত নহেন। কারণ, টাকা মারা যাইতেপারে!! বলা বাহুল্য, কথাগুলি ছলনামাত্র। তখন তাঁহার কারবার সমুদ্রমুখী নদীস্রোতের ন্যায় দিনদিন বৃদ্ধি হইতেছিল এবং তিনি জমিদারীর পর জমিদারী জলের মূল্যে মহাজনির ফাঁদে ফেলিয়া কিনিতেছিলেন। হা সংসার!! আমি কেবল তাঁহার আশৈশব বন্ধু নহি, তাঁহার ঘোরতর বিপদের দিনে আত্ম-বলিদান দিয়া কেবল তাঁহাকে রক্ষা করি নাই, কেবল শ্রীক্ষেত্রে তাঁহাকে রাজ-সম্মান প্রদান করি নাই, চট্টগ্রামে সাতবৎসর চাকরী করিবার সময় এমন বিষয় নাই, তিনি আমার পরামর্শ লইতেন না, এমন দিন নাই, আমার দ্বারা তাঁহাদের কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া লইতেন না। তাঁহার কত দরখাস্ত, কত গুরুতর চিঠি পত্র লিখিয়া দিয়াছি। কর্তাবিষয়ে কতপ্রকার যথাসাধ্য তাঁহার উপকার করিয়াছি। কোনও দিন প্রতিদান চাহি নাই। তিনি অযাচিত এই সামান্য সাহায্যটুকু করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও এরূপে তাঁহার সামান্য স্বার্থের ক্ষতি হইবে বলিয়া, তীর্থস্থানের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন। আমি বিদেশে জীবন অতিবাহিত করাতে সময়ে সময়ে আমার নির্ব্বোধ ভ্রাতাদের কল্যাণে তাঁহার কাছে টাকা ধার করিতে হইয়াছে। এ টাকার তিনি একপয়সা সুদ কখনও ছাড়েন নাই। কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া লইয়াছেন। খৃষ্ট এ জন্যই বুঝি বলিয়াছেন—"উট সূচের ছিদ্র দিয়া যাইবে, তাহাও সম্ভব ; তথাপি ধনী স্বর্গে যাইতে পারিবে না।"

গরুড়-সংবাদ

শ্রীক্ষেত্রে সে সময়ে একজন 'পেন্‌সেন'প্রাপ্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি একটি অপূর্ব্ব জীব। শুনিয়াছি, কর্ম্মে থাকিতেও পাঁচরকমে বিলক্ষণ অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ৩০০্ কি ৪০০্ শত টাকা পেন্‌সেন পাইতেন। ইহাও পূর্ণ মাত্রায় সঞ্চিত হইত। তিনি সেখানে একজন অনারারী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাহাতে এবং মোহন্ত হইতে প্রত্যেকমাসে কিছুকিছু আদায় করিয়া তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে পর্য্যন্ত সম্পর্ক ছিল না। স্ত্রীকে মাত্র তার পিত্রালয়ে দশটাকা করিয়া পেন্‌সেন পাঠাইতেন। এরূপ পাপিষ্ঠ বলিয়া শুনিয়াছি, তাঁহার সুযোগ্য পুত্র তাঁহার সঞ্চিত অর্থের একপয়সাও স্পর্শ করিতেন না। খর্ব্বাকৃতি, তৈলাক্ত, মসৃণ মূর্ত্তি। দেখিলেই বোধ হইত, যেন কবিকঙ্কণের মূর্ত্তিমান্ ভাঁড়ু দত্ত। তাঁহার শ্রীক্ষেত্রবাসের উদ্দেশ্য ছিল—জগন্নাথদেবের সেবা নহে, মাজিষ্ট্রেটের সেবা। শুনিয়াছি, যাবজ্জীবন সাহেব-সেবাই তাঁহার ব্যবসায় ছিল। মাজিষ্ট্রেট মফঃস্বল হইতে আসিবেন। তিনি ঘণ্টারপর ঘণ্টা নিদাঘ-মধ্যাহ্নে রবিকরে প্রতপ্ত বালুকা-সৈকতে রাস্তার পার্শ্বে ঘণ্টার গরুড়ের মত করযোড়ে দণ্ডায়মান আছেন। এ জন্য তাঁহার নাম আমি গরুড় রাখিয়াছিলাম। তাহারপর হইতে শ্রীক্ষেত্রে তিনি এইনামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের রায় বাহাদুর অপেক্ষা কি এই উপাধিটি মন্দ? অধিকাংশ রায় বাহাদুর, রাজা, মহারাজা বাহাদুরই ত এইরূপ গরুড়। তাঁহার এ তপস্যার উদ্দেশ্য আর কিছু নহে। কেবল মাজিষ্ট্রেট অশ্বারোহণে যাইবার সময় তিনি ধনুকাকারে একটি সেলাম দিবেন এবং মাজিষ্ট্রেট হাসিয়া একটি কথা কহিবেন। অতএব বলা বাহুল্য, মাজিষ্ট্রেটের সহিত তাঁহার বেশ একটুক ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি প্রায়ই তাঁহার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন এবং তাহাতেও তাঁহার বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন হইত। কারণ, উড়িয়াদের কাছে তিনি বলিতেন—সাহেব তাঁহার হাতের পুতুল। তিনি যাহা বলেন,

সাহেব তাহাই করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের প্রভুরা সর্ব্বত্র এরূপ সৎপাত্রেরই হাতের পুতুল। তাঁহাদিগকে বশীভূত করিবার এরূপ গরুড়ত্বই অমোঘ অস্ত্র। এই এক শিক্ষার অভাবেই এ দাসত্ব-জীবনে কত দুর্গতিই ভোগ করিলাম।

আমি শ্রীক্ষেত্রে প্রথমতঃ ইহাঁর অভিভাবকত্বেই উপস্থিত হই। তিনি আমাকে করায়ত্ত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত কৌশল বিস্তার করেন। আমিও তাহাতে কথঞ্চিৎ মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু একমুহূর্ত্তে আমার সে মোহ ঘুচিল। একদিন সন্ধ্যার পর তাঁহার বাসায় বসিয়া আছি, একটি উড়ে ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—"আমি মোকদ্দমা হারিলাম, আমার টাকাগুলো ফেরত দিন।" আমি পার্শ্বে বসিয়াছি, গরুড় মহাবিপদে পড়িলেন। তিনি তাহাকে বলিতেছিলেন—"যা! যা! এখন নয়; আর এক সময়।" তাহাকে তাড়াইয়া দিবার জন্য চাকর ডাকিতে লাগিলেন। উঠিয়া যাইবার সময় আমি দেখিলাম যে, সে দিন সে বেঞ্চের এক মোকদ্দমায় আসামী ছিল। গরুড় তাহাকে খালাস দিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা না শুনিয়া, অন্য এক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে একমত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিয়াছিলাম। আমি গরুড়কে জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ লোকটি সেই আসামী না? এ কি টাকা ফেরত চাহিতেছিল?" তিনি থতমত খাইয়া বলিলেন—"তুমি নূতন আসিয়াছ। শ্রীক্ষেত্রের লোক যে কত দুষ্টামি জানে, তাহা কি বলিব।" আসল কথাটি কি আমি বুঝিলাম, এবং পরদিন স্থানীয় বন্ধু লোকনাথ রায়কে জিজ্ঞাসা করিলে শুনিলাম যে, উহাই গরুড়ের উপজীবিকা, এবং তাহা ছাড়া কোন মোহন্ত হইতে তাহার মাসের চাল, কোন মোহন্ত হইতে দাল, ঘোড়ার দানা ইত্যাদি সকল প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য মাসিক বৃত্তির স্বরূপ আদায় করিয়া থাকেন। তিনি নারীজাতিকে ঘৃণা করিতেন, কাজে কাজেই অন্যরূপেও তাঁহার চরিত্র পশুবৎ ঘৃণিত। আমি সেইদিন হইতে আর তাঁহার দ্বার স্পর্শ করিতাম না। এবং তিনিও তাহা বুঝিয়া, সেদিন হইতে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুই একটি বিষয় বলিতেছি।

মন্দিরের কার্য্যাবলীর উন্নতির জন্য আমি একটি কমিটি গঠিত করিয়াছিলাম। তাহাতে এ নরাধম এবং কয়েকজন শ্রীক্ষেত্রের অগ্রণী মোহন্ত ও জমিদার সভ্য ছিলেন। একদিন আমরা কি একটা গুরুতর বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সেই ধ্যানেশ্বরীপ্রিয় 'প্রেষ্ট্রিয়ট্' ডেপুটি মহাশয় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গীয় ভাষায় ইতর রসিকতা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। আমি একটু বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"You are fond of cracking jokes in season and out of season." অর্থ—"আপনি সময় অসময় না বুঝিয়া রসিকতা করেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চলিয়া গেলেন এবং তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গরুড় ছুটিলেন। সেদিন সন্ধ্যার সময় মহানন্দ আমার বাসায় আসিয়া বলিল—"তুমি ডেপুটি—বাবুকে কি অপমান করিয়াছ? গরুড় তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া তাঁহার গায়ে হাত-বুলাইতেছিল এবং বলিতেছিল—'নবীনবাবু তোমার অপমান করেন নাই। আমার অপমান করিয়াছেন।' ডেপুটিবাবুটি যে ভারি চটিয়াছেন।" আমি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম —"কে? আমি তাঁহাদিগের ত কোন অপমান করি নাই।" মহানন্দ বলিল—"দুটিই ভয়ানক লোক, অতএব ডেপুটিবাবুর বাসায় গিয়া ব্যাপারখানি কি, জানিয়া আসা ভাল।" তখন আমরা দুইজনেই ধ্যানেশ্বরীবল্লভের আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। সুসৌরভে বুঝিলাম যে, ইতিমধ্যেই তিনি দেবীর অধরসুধা দুই এক পাত্র টানিয়াছেন। মহানন্দ কথা তুলিলে তিনি বলিতে লাগিলেন—"আমি বুড়া-হাবড়া, লেখাপড়া কিছুই জানি না, আপনারা অতি বড়লোক, B. A. পাশ করছেন, আমাকে তো গাইল দিতে পারেনই।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম —"আমি আপনাকে কি গালি দিয়াছি?" তিনি উত্তর করিলেন—"গাল দেওয়ার বাকী রাকছেন আর কি? আমাকে cracked অর্থাৎ fool ডাকছেন।" মহানন্দ উচ্চ হাসি হাসিয়া

উঠিল। তিনি ভারি চটিলেন এবং বলিলেন—"তুমি যে হাস্ দিলা?" তখন মহানন্দ বলিলেন—"তিনি ত আপনাকে cracked বলেন নাই, cracking jokes বলেছেন।"

তিনি—হেইডা আবার কি?

ম—cracking joke মানে ঠাট্টা করা।

তিনি—ওই ত গোল লাগাইছেন। আমি ত তা জানি না। আমি ত আপনারগো মত বি. এ., এম. এ. পাশ করি নাই।

ম—এখন ত জানলেন। তবে আর বিরক্ত হবার কথা কিছু নাই।

তিনি—কিন্তু একটা গোল লাগছে! বোধহয়, গরুড় এতক্ষণে এ কথা আরমষ্ট্রঙ্গ সাহেবের কানে তুলছে।

মহানন্দের মুখ মলিন হইয়া উঠিল। আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। আমি তখনই উঠিলাম। তখন ধান্যেশ্বর মহাশয় আমার হাত ধরিয়া বলিলেন,—"গোস্বা হবেন না, যা হবার তা ত হইছে, এখন যাতে এটা মিটে, তাই করুন।" মহানন্দ বলিল—"আপনি সকালে আরমষ্ট্রঙ্গের কাছে একপত্র লিখুন যে, আপনার বুঝিতে ভুল হইয়াছিল।" তিনি তখন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন যে, পত্র লিখিয়া আমার কাছে পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু পরদিন সমস্ত প্রাতঃকাল গেল, তাঁহার কোন সাড়া শব্দ নাই। কাচারিতে আসিয়া তিনি মহানন্দকে বলিলেন যে, গরুড় বলে যে, আমি এরূপ লিখিলে সাহেব মনে করিবে যে, আমি ইংরাজী Grammarটাও (ব্যাকরণটা) জানি না। এমন সময় Armstrong হইতে আমার কাছে একচিঠি আসিয়া উপস্থিত যে, তিনি শুনিয়া বড় দুঃখিত হইয়াছেন, আমি প্রকাশ্য সভায় ডেপুটি মহাশয়কে cracked ভাবিয়া অপমান করিয়াছি। আমি তখন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া লিখিলাম। সাহেবও আমার উত্তর পাইয়া উচ্চহাসি হাসিলেন এবং আমার পত্রখানি ডেপুটি বাবুর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার গ্রামারের অজ্ঞতা আমি সাহেবের কাছে এরূপে বিদিত করিয়াছি বলিয়া তিনি আমার উপর এরূপে চটিলেন যে, আমার গ্রামারজ্ঞ মুখ আর তিনি কখনও দর্শন করেন নাই। পরে শুনিলাম যে, গরুড় আরমষ্ট্রঙ্গকে এ কথাটি পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন এবং সাহেবকে বুঝাইয়াছিলেন যে, পুরীর রাজার মোকদ্দমায় তিনি আমাকে এত বাড়াইয়াছেন বলিয়া আমি মানুষকে মানুষ জ্ঞান করিতেছি না এবং এতবড় একটা বুড়া ডেপুটির অপমান করিয়াছি।

সুহৃদ্বর লোকনাথ রায় তাঁহার পুত্রের বিবাহে আমাকে কার্য্যাধ্যক্ষ করেন। জগন্নাথদেবের মন্দিরের পার্শ্বে একটি বিস্তৃত বিতানে আর একটি সুন্দর আসর নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম এবং গঞ্জাম ও কলিকাতা হইতে ভালভাল গায়িকা ও নর্ত্তকী আনাইয়াছিলাম। কলিকাতার গায়িকা ও নর্ত্তকীরা এ অঞ্চলে আর কখনও আসে নাই। স্মরণ হয়, সাতদিন ব্যাপিয়া পুরী শহর নৃত্যগীতে ও নানাবিধ আমোদে পূর্ণছিল। সেই আসর ও নৃত্যগীত লইয়া সমস্ত পুরীজেলায় একটা হুলুস্থূল পড়িয়াছিল। একদিন বড় 'ডাণ্ডে'র পার্শ্বে একজন ডেপুটির বাসায় বসিয়া আছি, আর কয়েকটি উড়ে রাস্তা দিয়া গাইতে গাইতে বলিতেছে—"নবীনবাবু কলিকাতা ঠু জোড়ে মাইকিনা আনুছন্তি। আর ছে মানে গাউন্তি—আয়লো অলি! কুসুম তুলি, ভরিয়ে ডালা। এ কোন্ মো!" অর্থ, নবীনবাবু কলিকাতা হইতে দুটি নর্ত্তকী আনাইয়াছেন, আর তারা গায়—আয় লো অলি ইত্যাদি—এ আবার কি?" একরাত্রিতে আরমষ্ট্রঙ্গ ও অন্যান্য সাহেবদিগের নিমন্ত্রণ ছিল। ঊনপঞ্চাশ আরমষ্ট্রঙ্গ বিলক্ষণ সুরেশ্বরীর সেবা করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে নটেশ্বরীদিগের নৃত্যে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া যে ফুলের মালা তাঁহার গলায় দেওয়া হইয়াছিল, নাচিতে নাচিতে যেই নর্ত্তকীরা তাঁহার সম্মুখে আসিল, তিনি সে মালা খুলিয়া

তাহাদের একজনের গলায় পরাইয়া দিলেন, আর প্রায় ৫০০০ হাজার উড়িয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি কিছু অপ্রতিভ হইয়া আমার হাতে আর একছড়া মালা দিয়া বলিলেন—"তুমি এ মালা অন্য নর্ত্তকীকে দিবে।" নর্ত্তকীরা যখন আবার নাচিতে নাচিতে আমাদের কাছে আসিল, আমি তদনুসারে 'By order'—যো হুকুম বলিয়া সে মালা দ্বিতীয়ার গলায় পরাইয়া দিলাম। সম্প্রতি পার্শন্যাল এসিষ্টাণ্টের পদ হইতে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়াছি, কাজেই 'বাই অর্ডার'টি আমার বেশ অভ্যাস ছিল। এবার স্বয়ং সাহেব পর্য্যন্ত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে 'নবযৌবনে'র মেলা উপস্থিত। বলিয়াছি, সিংহদ্বারের ভীড় থামিলে আমি দর্শনদ্বারের দক্ষিণধারে সিঁড়িরউপর বসিয়া ছিলাম, এমন সময় পদ্মনাভ ঘুটিয়া শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বপ্রধান পাণ্ডা আসিয়া আমাকে বলিল যে, কলিকাতার নর্ত্তকীদিগকে রাজার কর্ম্মচারীরা গুরুতররূপে প্রহার করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। আমি সিংহদ্বারের দিকে চলিলাম এবং যাইতে যাইতে দেখিলাম, ২।৩টি বৃদ্ধা রমণী পথের ধারে পড়িয়া কাঁদিতেছে, এবং কনষ্টেবলগণ তাহাদিগকে ধমকাইতেছে। আমাকে দেখিয়া তাহারা সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন দেখাইল এবং কাঁদিতে লাগিল। কনষ্টেবলেরা বলিল—কে মারিয়াছে, তাহারা কিছুই জানে না। সিংহদ্বারে পেঁছিলে দেখিলাম, সে নর্ত্তকী দুটিও সেরূপ অবস্থায় বাহিরে কাঁদিতেছে এবং তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। সিংহদ্বারে পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে রাজার একটি বাঙ্গালী কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া আছেন। আমি তাঁহাকে একটি পাকা বদমাইস বলিয়া জানিতাম। বুঝিলাম, তাঁহার সঙ্গে পুলিশ প্রভুরা যোগ দিয়া, এ নিরাশ্রয়া স্ত্রীলোকদিগের উপর এরূপ অত্যাচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন—মন্দিরে বেশ্যার প্রবেশ নিষিদ্ধ বলিয়া তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেন নাই। মারিয়াছে কে, তাহা তাঁহারা বলিতে পারেন না। এ গোলমাল শুনিয়া মন্দিরস্থ সমস্ত পাণ্ডা, মোহন্ত ও লোকনাথবাবু প্রভৃতি বড় বড় জমিদার ও ভদ্রলোক একত্রিত হইলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন—কলিকাতা হইতে প্রকাশ্য বেশ্যারা আসিয়াও সর্ব্বদা জগন্নাথ দর্শন করিয়া যাইয়া থাকে। ইহাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করা হইয়াছে। তখন আমি উহাদের প্রবেশ করিতে দিলাম এবং তাহাদের পাণ্ডা পদ্মনাভকে এ অত্যাচারের কারণ কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—তাহারা শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া অবধি তাঁহার বাড়ীতে আছে এবং রাজার ও পুলিশের কর্ম্মচারীদের বহু চেষ্টাতেও তাহারা তীর্থস্থানে বেশ্যাবৃত্তি করিতে অস্বীকৃতা হইয়াছিল। সে কারণে তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবে বলিয়া ইহারা এতদিন ধমকাইয়াছিল। কিন্তু পদ্মনাভের ক্ষমতাধীন তাহারা রহিয়াছে বলিয়া, এতদিন তাহাদের কিছু করিতে পারে নাই। তাহারা সর্ব্বদা পদ্মনাভের সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিয়া গিয়াছে। আজ এ গোলযোগের সময়ে সুবিধা পাইয়া তাহাদিগকে ও পদ্মনাভের গোমস্তাকে এরূপ প্রহার করিয়াছে। যখন অত্যাচারীরা দেখিল যে, তাহারা ঘোরতর বিপদস্থ হইবে, তখন গরুড়ের কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ মাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠাইয়া দিল। তিনিও দেখিলেন যে, আর এক সুযোগ জুটিয়াছে। পরে মাজিষ্ট্রেটের কাছে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মাজিষ্ট্রেট আমাকে বাড়াইয়াছেন বলিয়া আমার এতদূর স্পর্দ্ধা হইয়াছে যে, রাজার কর্ম্মচারী ও পুলিশকে প্রহার করিয়া, আমি কতকগুলি বেশ্যাকে মন্দিরে প্রবেশ করাইয়া, জগন্নাথদেবকে পতিত করিয়াছি এবং সমস্ত শ্রীক্ষেত্র তাহাতে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। আমি বাসায় ফিরিলেই মাজিষ্ট্রেট উপরোক্ত মর্ম্মে আমাকে পত্র লিখিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। আমি যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিয়া দিলাম। তিনি উল্লিখিত মোহন্ত প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন যে, গরুড়-সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। গরুড় এবারও পরাজিত হইলেন। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে যথেচ্ছা গালি দিয়া, আমার কাছে একরূপ ক্ষমা চাহিলেন।

চিল্কা উপসাগরের ধারে লোকনাথবাবুর লবণ প্রস্তুতের কারখানা ছিল। একজন হেড কনষ্টেবল তাঁহার লবণ মাপিয়া বেশী পাইয়াছে বলিয়া, ৩০০ মণ লবণ বাজেয়াপ্ত করিয়া, তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতিকূলে এক ফৌজদারীর মোকদ্দমা উপস্থিত করে। উহা আমার কাছে বিচারের জন্য অর্পিত হয়। বিচারে প্রমাণিত হইল যে, যদিও এ ঘোরতর বর্ষার সময় সামান্য আচ্ছাদনে গরুর গাড়ীতে করিয়া, এবং দুইতিনটি নদী পার করিয়া ঐ লবণ ৩০ মাইল পথ আনা হইয়াছে, তথাপি মফঃস্বলে যত মণ বেশী হইয়াছিল, শ্রীক্ষেত্রে ওজন করাতে তাহার অপেক্ষা আরও বেশী হইয়াছে। কাজেই বৃষ্টিতে ও নদী পার করিতে যাহা ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা পূরণ করিতে গিয়া মাত্রাটা হেড কনষ্টেবল বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বিবাদীদের পক্ষে পরিষ্কার প্রমাণ উপস্থিত করিল যে, হেড কনষ্টেবলের অতিরিক্ত দক্ষিণা দিতে বিবাদী অসম্মত হওয়াতে এ মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে। আমি বিবাদীকে অব্যাহতি দিয়া হেড কনষ্টেবলের প্রতিকূলে রায় প্রকাশ করিলাম। গরুড় মাজিষ্ট্রেটের প্রিয়পাত্র বলিয়া জেলাময় রাষ্ট্র। হেড কনষ্টেবল তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল এবং উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করিলে তাহার শিক্ষামতে সে মাজিষ্ট্রেটের কাচারির কাছে দণ্ডবৎ হইয়া বালির উপর পড়িয়া রহিল। পুরীতে এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। বাসা হইতে কাচারি যাইবার সময় প্রত্যহ হাকিমগণ দেখিতে পাইবেন যে, সে দিন যে সকল মোকদ্দমা হইবে, তাহার বাদী প্রতিবাদী ঠিক ঢেঁকীর মত তাঁহার কাচারির পথে দুই পার্শ্বে বালির উপর প্রচণ্ড রৌদ্রে পড়িয়া আছে এবং সমুদ্রের প্রচণ্ড বাতাসে তাহাদের গায়ের উপর একটা বালির স্তর বাঁধিয়া দিয়াছে। তাহারা এরূপ কৌতুককর ভাবে একএক বার হাকিম আসিতেছেন কি না, মাথা তুলিয়া রাস্তার দিকে দেখে এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলে এরূপ-ভাবে বালিতে ললাট ঘষিতে থাকে যে, তাহা দেখিলে পুতুলও না হাসিয়া থাকিতে পারে না। মাজিষ্ট্রেট আফিসে আসিবার সময় পুলিসের পোষাক-পরা একটি ঢেঁকী বালির উপর পড়িয়া আছে দেখিয়া দাঁড়াইলেন এবং সে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার বুটবিমণ্ডিত চরণ দুখানির উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া গরুড়ের শিক্ষামতে বলিতে লাগিল যে, লোকনাথবাবুর বন্ধু বলিয়া আমি ৩০০ মণ বিজরা লবণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছি এবং তাঁহার বিরুদ্ধে রায় লিখিয়াছি। বলা বাহুল্য, গরুড় সে সময় মাজিষ্ট্রেটের গৃহে গিয়া তাঁহার চরণে যথেষ্ট তৈল মর্দ্দন করিয়াছে। সে তাঁহাকে মহারাণী ডাকিত এবং তিনি আনন্দে অধীর হইতেন। এখন সে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছিল এবং ঠিক সে সময় বলিল যে, শ্রীক্ষেত্রময় রাষ্ট্র যে, লোকনাথবাবুর খাতিরে আমি প্রকৃতই বড় অবিচার করিয়াছি, এবং সেই হেড কনষ্টেবলটির মত সাধু পুরুষ তিনি পুলিসে কখনও দেখেন নাই। যে ক্ষেপা মাজিষ্ট্রেট পুরীর রাজার মোকদ্দমার পর আমার অত্যুক্তি প্রশংসা করিয়া রিপোর্টের পর রিপোর্ট করিয়াছিলেন এবং যিনি লোকের কাছে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন যে, আমাকে হাইকোর্টের জজ করিলে আমার যোগ্যতার পুরস্কার হয়, এ ষড়্‌যন্ত্রে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এ জন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—'অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ।' তিনি কাচারিতে আসিয়া, অমনই তাঁহার পেস্কারকে পাঠাইয়া দিয়া, আমি কেন সে, মোকদ্দমা ছাড়িয়া দিয়াছি, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি স্থিরভাবে বলিলাম যে, তাহা আমার রায়ে লেখা আছে। তৎক্ষণাৎ নথি তলব হইল এবং কমিশনরের কাছে আমার প্রতিকূলে একদীর্ঘ রিপোর্ট গেল যে, এ অবিচারের প্রতিকূলে হাইকোর্টে আপিল করা হউক। কমিশনর স্মিথ-সাহেব এরূপ রিপোর্টে টলিবার পাত্র নহেন। তিনি তাহার উত্তরে লিখিলেন যে, আমি যদি অবিচার করিয়া থাকি, নথিতে তাহার কোন প্রমাণ নাই। অতএব তিনি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। তখন পাগল ক্ষেপিয়া, লিগাল রিমেমব্রান্সের কাছে সেরূপ আমার প্রতিকূলে একদীর্ঘ রিপোর্ট করিল। তিনিও একটু রসিকতা করিয়া উত্তর দিলেন—হাইকোর্টে এরূপ

মোকদ্দমার মোসন করা আমার কার্য্য নহে। মাজিষ্ট্রেট অন্য কাউন্সেলের চেষ্টা করিলেন। এ উত্তর পাইয়া পাগল পূর্ণমাত্রায় ক্ষেপিয়া উঠিল। সে যাহাকে তাহাকে বলিতে লাগিল—দেখ, এ বেটা গভর্ণমেণ্টের ৩০০০্ টাকা মাহিনা খাইতেছে। আর আমি তাহার কাছে গভর্ণমেণ্টের এমন একটি ক্ষতিজনক মোকদ্দমা পাঠাইলাম, আর সে আমাকে ঠাট্টা করিয়া উত্তর দিয়াছে। এবার গরুড়ের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। ক্ষেপারাম এরূপ অপ্রতিভ হইয়া আমার উপর দ্বিগুণ ক্ষেপিয়া উঠিল।

শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ

যখন এরূপ মেঘ-গর্জ্জন হইতেছিল, সে সময়ে একদিন শহরের মধ্যে কোন নিমন্ত্রণ হইতে সমুদ্র-সৈকতে বাসায় ফিরিয়া আসিলে রাত্রি এগারটার সময় ভৃত্য আমার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি দাদা অখিলবাবুর লেখা। খুলিয়া দেখিলাম, তিনি লিখিয়াছেন যে, আমি মাদারিপুর সবডিভিসনে বদলি হইয়াছি। এই অকস্মাৎ বদলির সংবাদ পাইয়া আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। হায় রে মানুষের আশা! তাহার একদিন পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্রের প্রধান জমিদার চৌধুরী বিশ্বনাথ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৭০ বৎসর হইবে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লোকনাথবাবু আমার জন্য যে বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, আমি সে বাড়ী মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দিলাম কেন? আমি বলিলাম—মাজিষ্ট্রেট বাড়ী চাহিলে আমি কেমন করিয়া রাখিব? তখন কথায় কথায় বাড়ীর কষ্টের কথা তুলিলে তিনি বলিলেন যে, আমার জন্য তিনি একটা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন এবং আমাকে তাহার সম্পূর্ণ ভার দিলেন। আমি তখন কাচারির নিকটে একটি ছোট ঘরে ছিলাম। তাহার পশ্চাতে নিমকমহালের সময়ের একটি অতি সুন্দর বাংলার পাকা ভিত্তি ও কতক কতক দেয়াল ছিল। আমি তাঁহাকে লইয়া সে স্থানটি দেখাইলাম। স্থানটি তাঁহারও মনোনীত হইল। তখন দুইজনে অনুমান করিলাম যে, তিনচারি হাজার টাকাতে একটি সুন্দর বাংলা হইবে। তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপাততঃ কার্য্যারম্ভ করিবার জন্য তিনি দুইএক দিনের মধ্যে একহাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন এবং অবশিষ্ট টাকা আবশ্যকমত পাঠাইবেন। তিনি আরও বলিলেন যে, আমার বড় কষ্ট হইতেছে। অতএব টাকা কিছু বেশী খরচ হইলেও বাড়ীটি শীঘ্র প্রস্তুত করাইয়া আমি সে বাড়ীতে গেলে তিনি বড় সুখী হইবেন। বৃদ্ধের স্নেহে ও সহানুভূতিতে আমার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল এবং বোধ হইল যে, আমার কোন পিতৃব্য আসিয়া আমার প্রতি এতদয়া প্রকাশ করিতেছেন। কিছুক্ষণ পরে লোকনাথবাবু আসিলেন। দুজনে বসিয়া তখন বাড়ীর নক্সা ও এষ্টিমেট্ প্রস্তুত করিয়া দেখিলাম যে, তিনহাজার টাকাতে বেশ সুন্দর বাংলা হইবে। লোকনাথবাবু বলিলেন যে, তিনি দুমাসের মধ্যে উহা প্রস্তুত করাইয়া দিবেন। আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অনন্ত সমুদ্রতীরে এরূপ একখানি সুন্দর গৃহে থাকিতে পারিব, এ কল্পনায় আমি সমস্তদিন কাটাইয়া নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম এবং উহা ভাবিতে ভাবিতে অর্দ্ধনিদ্রাবস্থায় বাসায় ফিরিয়াছিলাম। আর তখনই এ পত্র পাইলাম! তাই বলিতেছিলাম—হায় মানুষের আশা! কিন্তু আমি এ সংবাদ চাপিয়া রাখিলাম। রাত্রি প্রভাত হইলে চৌধুরী বিশ্বনাথের লোক ১০০০্ হাজার টাকা লইয়া উপস্থিত। সে দিনের ডাকেই মাজিষ্ট্রেট, সেক্রেটারীর নিকট হইতে বদলির সংবাদ এবং আমাকে শীঘ্র ছাড়িয়া দিবার জন্য আদেশ পাইলেন। তখন বদলির সংবাদ পুরীময় ছড়াইয়া পড়িল এবং দেখিতে দেখিতে আমার গৃহ বন্ধুবান্ধবে পূর্ণ হইল। এমন কি, গরুড়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের সঙ্গে তিনিও আমার স্থানান্তরে বদলির

জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"এমন যোগ্য লোক শ্রীক্ষেত্রে আর আসে নাই, আসিবেও না।" কিছুক্ষণ পরে চৌধুরী বিশ্বনাথও আসিলেন। তিনি আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি বাড়ীখানি প্রস্তুত করিবার জন্য তাঁহাকে জিদ করিতে লাগিলাম এবং লোকনাথবাবুর উপর ভার দিতে বলিলাম। বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"আমি তোমারই জন্য বাড়ী প্রস্তুত করাইতে চাহিয়াছিলাম। তুমি চলিলে, আমি বাড়ী কাহার জন্য প্রস্তুত করিব? তোমাকে দেখিয়া অবধি তোমার প্রতি আমার যেরূপ স্নেহ হইয়াছিল, আমার আপন সন্তানের প্রতিও সেরূপ স্নেহ কখনও হয় নাই।" তিনি তাহারপর আমার কতই প্রশংসা করিলেন। তাঁহার পত্যেক কথা তাঁহার সরল হৃদয়ের মর্ম্মস্থল হইতে বহির্গত হইতেছিল। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম যে, ঐ দিকে বসিয়া গরুড়, আর এ দিকে নারায়ণ। বৃদ্ধের সে স্নেহস্মৃতিতে আজও আমার চক্ষু সজল হইতেছে।

এ অকস্মাৎ বদলিতে আমি নিজেও বড় দুঃখিত হইয়াছিলাম। শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া প্রথমেই ভ্রাতৃশোকে বজ্রাহত হইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহারপর যে সাতমাস মাত্র সেখানে ছিলাম, তাহা যেরূপ শারীরিক ও মানসিক সুখ শান্তিতে কাটাইতেছিলাম, সেরূপ এ জীবনে আর বড় পাই নাই। শ্রীক্ষেত্রকে আমি বড়ই ভালবাসিতাম ও শ্রদ্ধা করিতাম। রাজাকে দ্বীপান্তরিত করিয়াছিলাম বলিয়া সরলপ্রকৃতি উড়িয়ারা আমাকে যেরূপ একদিকে বাঘের মত ভয় করিত, সেরূপ অন্যদিকে একটা কৃষ্ণবিষ্ণু মনে করিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের ধারণা হইয়াছিল যে, শ্রীক্ষেত্রে আমার জীবন নিরাপদ্ নহে। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, রাজার পক্ষীয়েরা আমাকে নিশ্চয় খুন করিবে। পরে শুনিয়াছিলাম, উহাই আমার অকস্মাৎ বদলির কারণ। কিন্তু আমার ক্ষেপা প্রভুর ধারণা অন্যরূপ হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইল যে, তিনি সেই লবণের মোকদ্দমা লইয়া গোলযোগ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমি সেক্রেটারীর কাছে পত্র লিখিয়া, আপন ইচ্ছায় বদলি হইয়াছি। পাগল অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া, সেক্রেটারীর চিঠিহস্তে একেবারে আমার এজলাসে আসিয়া উপস্থিত। রাগে গরগর করিয়া বলিল—"আমি তোমাকে যেরূপ বাড়াইয়াছিলাম, তুমি আমাকে সেরূপ প্রতিদান দিয়াছ! আমি জানি, বাঙ্গালী বাবুরা বদলি হইবার ফিকির বেশ জানে।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম যে, আমার বদলির বিষয়ে আমি কিছুই জানি না। আমার কথা তাঁহার বিশ্বাস না হয়, তিনি সেক্রেটারী কক্‌রেল সাহেবের কাছে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন। তখন তিনি একটু নরম হইলেন এবং আর কিছু না বলিয়া, আমাকে জব্দ করিবার জন্য বলিলেন—"আপনি বদলি হইয়াছেন, ভালই হইয়াছে। আমি এখনই চার্জ লইব।" আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—"আমি এখন চার্জ দিয়া কি করিব? আমার কটক হইতে 'বোঁড়' গাড়ী আনাইতে ও যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতে অন্ততঃ সাতদিন সময় আবশ্যক হইবে।" তিনি বলিলেন—তিনি সে সব কথা কিছু শুনিবেন না, তখনই চার্জ লইবেন। আমি বলিলাম, তাহা তিনি নিতান্ত লইলে আমি কি করিব। তবে আমি সাতদিনের মধ্যে রওনা হইতে পারিব না বলিয়া সেক্রেটারীর নিকট টেলিগ্রাফ করিব। তখন কি ভাবিয়া, সাতদিন সময় দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি এদিকে কটক হইতে গাড়ী আনাইয়া লইলাম এবং সমস্ত বন্দোবস্ত করিলাম। তিনি তখন বলিয়া বসিলেন যে, আমাকে যাইতে দিবেন না। কারণ, আমার স্থানে অন্য অফিসার তখন পর্য্যন্ত উপস্থিত হয় নাই। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম এবং আমার যে কত ক্ষতি হইবে, তাহা অনেক করিয়া বুঝাইলাম। কিন্তু তিনি কিছুই শুনিলেন না। ঠিক এমন সময়ে কক্‌রেল সাহেব হইতে, আমি রওনা হইয়াছি কি না, না হইয়া থাকিলে তৎক্ষণাৎ রওনা হইতে এক টেলিগ্রাফ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি আবার ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"আমি এই মুহূর্ত্তে চার্জ লইব।"

আমি একটু মজা করিয়া বলিলাম—আমি গাড়ী ফেরত দিয়াছি এবং সমস্ত বন্দোবস্ত রহিত করিয়াছি। আমি তৎক্ষণাৎ কি প্রকারে রওনা হইব এবং একটু ধমক দিয়া বলিলাম—এ সমস্ত অবস্থা মিঃ কক্‌রেলকে জানাইতে আমি পত্র লিখিতে বসিয়াছি। তখন তিনি বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন এবং বলিলেন যে, তিনি পুলিস পাঠাইয়া গাড়ী ফিরাইয়া আনাইবেন এবং সে দিন রওনা হইতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য. আমি গাড়ী বিদায় করি নাই। পরদিনই যাওয়া স্থির করিলাম। প্রাতে মাজিস্ট্রেটের কাছে বিদায় লইতে গেলাম। তিনি আমাকে বড়ই সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং অনেক হিতোপদেশ দিয়া বলিলেন যে, আমি এখন সবডিভিসনে যাইতেছি। সেখানে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পাইব। তবে মাদারিপুর ভয়ানক স্থান বলিয়া তিনি শুনিয়াছেন। সেখানে এত তেজের সহিত কাজ করিলে আমি বিপদস্থ হইব। তিনি এত তেজ কোন বাঙ্গালী কর্ম্মচারীর দেখেন নাই। সর্ব্বশেষ আমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যে সম্প্রতি কিছু অপ্রীতি হইয়াছিল, তাহা ভুলিয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া পরম সমাদরে বিদায় দিলেন।

এ কয়দিন যাবৎ রাণী হইতে সামান্য রাস্তার লোকটি পর্য্যন্ত শ্রীক্ষেত্রবাসীরা আমার প্রতি কিবে স্নেহ প্রকাশ করিতেছিল, তাহা বলিতে পারি না। এতস্থান হইতে নানাবিধ মহাপ্রসাদের ডালি আসিতেছিল যে, ঘরে রাখিবার স্থান হইতেছিল না। তাহাছাড়া মোহন্তদের মঠ হইতে সকালে বিকালে গৃহ-প্রাঙ্গণ 'আনজানে' (একপ্রকার শিবিকা) পরিপূর্ণ থাকিত এবং কোন্ মঠে যাইব, তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি হইত। এরূপ সপ্তাহ যাবৎ সকালে, বিকালে, মধ্যাহ্নে, তিন তিন মঠে আতিথ্য গ্রহণ করিতেছিলাম। মোহন্তদের সে সরল সমাদর, সে প্রাণভরা অভ্যর্থনা,এবং অজস্র আশীর্ব্বাদে আমার চক্ষু সজল হইত। তাঁহাদের চক্ষেও জল আসিত। প্রত্যেকে আমাকে সজলনেত্রে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে. আমি আবার শ্রীক্ষেত্রে ফিরিয়া যাইব। রাণীমাতাও আতিথ্য গ্রহণ করাইয়া, অন্তরালে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"আপনি ত চলিলেন, এখন আমার উপায় কি হইবে? আপনি যতদিন ছিলেন, আমি সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম।" আমি তাঁহার একমাত্র পালিত পুত্রকে দ্বীপান্তরিত করিয়াছি, অথচ আমার প্রতি তাঁহার এই স্নেহ!! ইহা কি অপার্থিব নহে? আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া অনেক সান্ত্বনা দিয়া চলিয়া আসিলাম। সেই বৃদ্ধ ভূম্যধিকারী বিশ্বনাথ চৌধুরী, যিনি আমার জন্য আর একটি গৃহ প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে বিদায় হইতে গেলে তিনি আমার গলায় পড়িয়া একটি শিশুর মত কাঁদিতে লাগিলেন।

সাতদিন যাবৎ গৃহে গৃহে, মঠে মঠে এ দৃশ্য অভিনীত হইবার পর আমি নিশীথ সময়ে গৃহ হইতে যাত্রা করিলাম। প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। ইঁহারা সকলেই কাঁদিতেছিল। আমরাও কাঁদিতে কাঁদিতে মন্দিরের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। সেখানেও এত রাত্রিতে আর এত লোকের জনতা। ইহাঁরা সকলেই শ্রীক্ষেত্রের মোহন্ত ও ভদ্রলোক। জগন্নাথদেবের চরণারবিন্দ এ জীবনের মত দর্শন করিয়া, যখন আমরা সিংহদ্বারে ফিরিয়া আসিয়া গাড়ীতে উঠিতেছিলাম, সে সময়ে আর একবার রোদনের রোল উত্থিত হইল। মোহন্তরা ও অন্য বন্ধুরা প্রত্যেকে আমাকে বক্ষে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমিও ইহাঁদের স্নেহ-উচ্ছ্বাসে অধীর হইয়া এত কাঁদিতেছিলাম যে, আমার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছিল। আমি 'বোগি' গাড়ীতে উঠিবার পরও তাঁহারা কিছুতেই আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। প্রায় ৪০০।৫০০ শত লোক সেই দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে আমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। আমি আবার গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িলাম। স্ত্রী, শাশুড়ী এবং ভাই দুটি গাড়ীতে রহিল। তাঁহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আঠার নালার পোল পর্য্যন্ত আসিলেন এবং আমি অনেক করিয়া বলাতে অধিকাংশ লোক গলদশ্রুনয়নে এখান হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহাঁদের মধ্যে সে নরাধম

পৃষ্ঠদংশক ঘৃণিতবৃত্তি গরুড়ও ছিল এবং সে এখানেও কাঁদিয়া বলিতেছিল যে, এমন লোক আর পুরীতে আসিবে না। ইহার পরও প্রায় শতাধিক লোক আমার গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে তিনমাইল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। সেখানে আর এক করুণ দৃশ্য অভিনয় করিয়া তাহারা গৃহে ফিরিল। আমি পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র হইতে একটি দারুণ শোক এবং শতশত স্নেহ ও সুখস্মৃতি বক্ষে লইয়া এ জীবনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। যে শ্রীক্ষেত্র দর্শন করে নাই, তাহার জীবন বৃথা। আমি পাপী, কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ হৃদয়দ্রবকরী ভক্তির ক্রীড়া দেখিয়াছি, এমন আর কোথায়ও দেখি নাই। উৎকলের ইতিহাস-লেখক খ্যাতনামা হাণ্টার সাহেব বলিয়াছেন—যাজপুর হইতে চিল্কা পর্য্যন্ত উৎকলের প্রত্যেক ইঞ্চি ভূমি পবিত্র। সে কথা ঠিক।

ভুবনেশ্বর

বেলা সাতটাআটটার সময় আমরা ভুবনেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। কটক শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা হইতে, স্মরণ হয়, ভুবনেশ্বর অনুমান একমাইল ব্যবধান। প্রভাত হইতে উহার মন্দিরের উচ্চ চূড়াবলি দেখিয়া প্রাণ আকুল হইয়াছিল। সে অল্প পথ বাহিয়া আমরা দেখিতে দেখিতে ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হইলাম। হাণ্টারকৃত উড়িষ্যার ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম যে, একসময় ভুবনেশ্বরে অনুমান সাতশত মন্দির ছিল। এখন সে সকল স্বপ্নের কথা। ভারতের হিন্দুরাজ্যের সঙ্গে সে সকল স্বপ্নও ভোর হইয়াছে। ভুবনেশ্বরের সে গৌরব এখন না থাকিলেও, এখনও বহু মন্দির আছে, যাহা দেখিলে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়। চারি তীর প্রস্তরে বাঁধান সুনীল সুধাপূর্ণ মনোহর একটি মহাসরোবর। তাহার চারি তীরে আয়ত পথ এবং পথের পার্শ্বে বহুবিধ মন্দির। শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ চারিটি মন্দির শৃঙ্খলে গাঁথা, ভুবনেশ্বরেও তদ্রূপ। তবে ভুবনেশ্বরের মন্দিরাবলী শ্রীক্ষেত্রের মন্দির অপেক্ষা বহু পুরাতন, এবং ভুবনেশ্বরের মন্দিরে যেরূপ কারুকার্য্য আছে, শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরে তাহা নাই। কৃষ্ণ-কঠিন প্রস্তরের এরূপ সূক্ষ্ম সূচ্যাঙ্কিতবৎ কারুকার্য্য গগনস্পর্শী মন্দিরাবলীর বিপুল অঙ্গ সমাচ্ছন্ন করিয়া আছে যে, তাহা দেখিলে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা করে না। মন্দিরের কোণায় কোণায় নাগকন্যাদিগের ব্র্যাকেট্। অধোভাগ সর্পকক্ষা হইতে রমণীমূর্ত্তি এবং মস্তকোপরি প্রসারিত বহুফণা। কি সর্প এবং কি রমণীমূর্ত্তি, কি মন্দিরের অন্য কারুকার্য্য-সকল এরূপ অদ্ভূত শিল্পকৌশলে প্রস্তরে নির্ম্মিত যে, এক্ষণকার কোন দক্ষ ইউরোপীয় শিল্পী তাহা গঠন করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। এরূপ এক মন্দির, দুই মন্দির নহে, এখনও বহু মন্দির কালের করাঘাতে বিকৃত হইয়া ভারতের অতীত শিল্প-গৌরবের নীরব সাক্ষীর মত দাঁড়াইয়া আছে। হাণ্টার বলিয়াছেন—এরূপ এক একটি মন্দির লক্ষ টাকার কমে, এবং বহু বর্ষের শ্রম ভিন্ন প্রস্তুত হইতে পারে নাই। আর এইরূপ সাতশত মন্দির কেবল এই স্থানেই ছিল। হায় ভারতের সেই দিন! সেই সম্পত্তি ও সেই শিল্পী কোথায় গেল? এ কথা মনে করিয়া স্থানে স্থানে অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। উৎকলে পঞ্চক্ষেত্র। প্রথম যমক্ষেত্র বৈতরণীতীরে। দ্বিতীয় শক্তিক্ষেত্র যাজপুরে। তৃতীয় অর্কক্ষেত্র কণারকে। চতুর্থ শিবক্ষেত্র ভুবনেশ্বরে। পঞ্চম বিষ্ণুক্ষেত্র বা শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তমে। অতএব বলা বাহুল্য যে, ভুবনেশ্বরে অধিকাংশ মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। স্বয়ং ভুবনেশ্বরও শিবলিঙ্গ। তবে লিঙ্গের আকৃতি অনেকটা কল্পনাসাপেক্ষ। এক সময় এ সকল যে বৌদ্ধ মন্দির ছিল, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক শিবলিঙ্গই বুদ্ধদেবের 'বৈতা' মাত্র। একটি মন্দিরে একটি নির্ঝর হইতে সলিল নির্গত হইয়া ও শিবলিঙ্গকে প্রক্ষালন করিয়া মন্দিরের বহির্ভাগে নাতিপ্রশস্ত চতুষ্কোণ একটি কুণ্ডে পতিত হইতেছে। কুণ্ডটি জলে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, এবং

জলের বর্ণ ঈষৎ দুগ্ধনিভ। কুণ্ডে দুইশ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরবেদী সলিল-মধ্যে বিরাজ করিতেছে। শুনিলাম, একসময়ে এ সকল আসনে ঋষিরা আসীন হইয়া তপস্যা করিতেন। কুণ্ডের চারিদিকে বিশাল বৃক্ষাবলি শোভা পাইতেছে এবং কুণ্ডকে ছায়া দান করিতেছে। স্থানটি এরূপ মনোহর, নির্জ্জন ও শান্তিপ্রদ যে, উহা দেখিলেই একটি প্রকৃত তপস্যার স্থান বলিয়া মনে হয়।

সেখান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে খ্যাতনামা 'খণ্ডগিরি'। এ ব্যবধানটি যদিও এখন সমতল, তথাপি উহা সম্যক্ প্রস্তরময়। কেহ যেন প্রস্তর কাটিয়া সমস্ত স্থানটি সমতল করিয়াছে। প্রবাদ—এ অঞ্চল ব্যাপিয়া খণ্ডগিরির মত শৈল পর্ব্বতমালা এক সময়ে ছিল এবং সে সকল পর্ব্বত কাটিয়া তাহার প্রস্তরে ভুবনেশ্বরের এবং বহুদূরস্থিত কণারকের ও শ্রীক্ষেত্রের মন্দির-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এখান হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড কেমন করিয়া যে এতদূর নীত হইয়াছিল, তাহা মনে হইলে প্রকৃতই এ সকল মন্দির বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। খণ্ডগিরির পাদমূলে একটি ক্ষুদ্র আশ্রম আছে। তাহাতে তখন একটি সন্ন্যাসী ছিলেন। আমরা তাঁহার আশ্রমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া, এবং সেখানে পাল্কি রাখিয়া, খণ্ডগিরি আরোহণ করিলাম। তাহার 'গুহা' ও প্রস্তরকক্ষ-সকল দেখিতে লাগিলাম। বাবাজী নিজে পথপ্রদর্শক এবং বেহারারা সঙ্গে ছিল। এই পর্ব্বতটি নৈবেদ্যের মধ্যস্থিত সন্দেশের মত একক বলিয়া ইহার নাম খণ্ডগিরি। চারিদিকে ইহার নিকটে অন্যকোন পর্ব্বত নাই। এই বিশাল পর্ব্বতের কঠিন শৈলাঙ্গ কাটিয়া এরূপ সুন্দর সুন্দর একতল ও দ্বিতল কক্ষসকল নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহাতে বিস্মিত হইতে হয়। এরূপ শতশত কক্ষ। সমস্ত পর্ব্বতটি যেন মধুমক্ষিকার চক্রের মত শোভা পাইতেছে। কক্ষের প্রাচীর এরূপ মসৃণ করিয়া কাটা যে, তাহাতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে। একটি প্রাচীর যেন এক একটি বৃহৎ নীলদর্পণ এক এক কক্ষে নানাবিধ মূর্ত্তি প্রাচীরের অঙ্গে কাটা রহিয়াছে। এ সকল কক্ষ হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দিরমালার শোভা এবং চারি দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা বিভক্ত গ্রামাবলীর ও সজ্জিত শ্যাম শস্যক্ষেত্রের শোভা অনির্ব্বচনীয়। ত্রিশবৎসরের কথা : সকল মনে পড়িতেছে না। তবে এইমাত্র মনে পড়িতেছে, যেন কি এক স্বপ্নরাজ্য দেখিতেছিলাম। যাঁহারা এই সকল কক্ষ কঠিন পর্ব্বতের অভ্যন্তরে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ইহাতে বসিয়া ধ্যান করিতেন এবং বুদ্ধদেবের অপূর্ব্ব লীলা কীর্ত্তন করিতেন, তাঁহারা আজ কোথায়? অতীতের এ সকল অদ্ভুত কীর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের নির্ব্বাক্ ভাষায় সে কীর্ত্তিগাথা শুনিয়া আমি আত্মহারাবৎ ভুবনেশ্বরে ফিরিলাম, এবং সেখানে আহার করিয়া অপরাহ্নে কটকাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ভুবনেশ্বরের পূর্ব্বদিকে সরকারি রাস্তা হইতে কিছু ব্যবধানে সমুদ্রতীরে অর্কক্ষেত্র বা 'কণারক'। পুরী অবস্থিতিকালে আমি একবার 'কণারক' দেখিতে গিয়াছিলাম। কণারক সূর্য্যক্ষেত্র,—সুবিস্তৃত সমুদ্রতটভূমি। সূর্য্যদেবের রথ একচক্রবিশিষ্ট। এ জন্য প্রবাদ এইরূপ যে, কণারকের প্রস্তরমন্দির একটি চক্রের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার শিরোদেশে একটি চুম্বক পাথর ছিল, আর চক্র হইতে চারিদিকে লোহার শিক্ উঠিয়া উক্ত প্রস্তরে সংযোজিত হইয়াছিল এবং এইরূপে মন্দির একটি চক্রের উপর রক্ষিত হইয়াছিল। আর এক প্রবাদ এইরূপ যে, সমুদ্রপথে অর্ণবযান সকল যাইবার সময় এই চুম্বকের দ্বারা আকর্ষিত হইত এবং তীরে পতিত হইয়া ধ্বংস হইত। এ জন্য মুসলমান অধিকারের সময় চুম্বক পাথর অপসারিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে মন্দির বালকের ক্রীড়নকের মত ভাঙ্গিয়া পড়ে। এখনও যেরূপ প্রস্তরস্তূপ পড়িয়া আছে, তাহাতে বোধ হয়, এই মন্দিরও ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মত সমুন্নত ও কারুকার্য্যসম্পন্ন ছিল। এই মন্দিরও যেন প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের উপর প্রস্তরখণ্ড মাত্র স্থাপিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল; কোনরূপ যোড়াই

বা আস্তর ছিল না। এ মন্দিরের হাতায়ও চারি দ্বার। এক দ্বারে শ্রীক্ষেত্রের সেই অদ্ভুত পাগড়ীধারী সিংহ। অন্যদ্বারে একখানি প্রস্তরে নির্ম্মিত দুইটি জীবন্ত হস্তী। তৃতীয় দ্বারে একখানি প্রস্তরনির্ম্মিত একটি জীবন্ত অশ্ব এবং তাহার পৃষ্ঠে ভর করিয়া দণ্ডায়মান একজন বীর পুরুষ। চতুর্থ দ্বারে কি ছিল, আমার মনে নাই। সম্মুখে সিংহদ্বারের উপর একখানি প্রস্তরে নবগ্রহের মূর্ত্তি অতি সুন্দররূপে খোদিত ছিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বাষ্পীয় কলের সাহায্যে সেই প্রস্তরখণ্ড কলিকাতায় আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্দির হইতে অনুমান দুইশত হাত মাত্র আনিয়া আর আনিতে পারেন নাই। তাহার পর প্রস্তরখানি চিরিয়া কেবল গ্রহাঙ্কিত দিক্‌টা আনিতে চাহিয়াছিলেন। খানিকদূর কাটিয়া সে সংকল্পও ত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, তাহারপর কাটা শেষ করিয়া, কেবল সেই দিক্‌টা কলিকাতায় আনা হইয়াছিল। বিস্ময়ের কথা এই যে, এরূপ বিশাল প্রস্তরখণ্ড মন্দির-নির্ম্মাতারা কোথা হইতে আনিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের শৈলমালা ভিন্ন আর অন্য কোন শৈলশ্রেণী কণারকের নিকটে নাই। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের মন্দিরের সমক্ষে শিল্পকরগণেরও বিস্ময়জনক যে অরুণস্তম্ভ আছে, উহা এই কণারকের মন্দিরের সিংহদ্বারের সমক্ষে ছিল এবং শ্রীক্ষেত্রের ভোগ-মন্দিরও শুনিয়াছি, কণারকের মন্দিরের প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভোগ-মন্দিরের প্রস্তরে যেরূপ কারুকার্য্য, জগন্নাথদেবের মন্দিরের অন্য অংশে তাহা নাই। হায়! ভারতের সেই দিন, সেই শিল্পকর, সেই দেব-ভক্তি, সে অধ্যবসায় কোথায় গেল? তাহারা আর কি ফিরিবে না?

মাদারিপুর যাত্রা

কটক হইতে চাঁদবালি পর্য্যন্ত যে 'ক্যানেল' বা কাটা খাল আছে, তাহাতে 'ক্যানেল ষ্টীমার' খুলিয়াছিল। ছোট 'ষ্টীমলঞ্চ' ও তাহার পশ্চাতে একখানি 'বজরা'। আমরা 'বেণ্ডি' গাড়ী হইতে নামিয়া সেই বজরাখানিতে উঠিলাম। উহা আমি সম্যক্‌ ভাড়া করিয়াছিলাম। উৎকলের ক্যানেল এক অপূর্ব্ব কাণ্ড। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ক্রোশব্যাপী মহানদীতে এক প্রস্তরের বাঁধ নির্ম্মিত হইয়া, তাহার বিশাল জলপ্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়াছে ; এবং সেই রুদ্ধ সলিলরাশি উৎকল ব্যাপিয়া ক্যানেলে ক্যানেলে চাঁদবালি পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। ক্যানেলের স্থানে স্থানে দৃঢ় কপাট (Lock-gate) আছে, এবং সেই কপাটের দ্বারা জল রুদ্ধ করা হইয়াছে। কপাটের একদিক্‌ হইতে অন্যদিকের জল বহু হস্ত উর্দ্ধে বা নিম্নে। ষ্টীমলঞ্চ কপাটের কাছে আসিলে কপাট খুলিয়া দেওয়া হয়, এবং জলরাশি ভৈরব গর্জ্জনে ছুটিয়া, অন্যদিকে জলপ্রপাতের মত পড়িতে থাকে। যখন দুইদিকের জল সমান হয়, তখন ষ্টীমলঞ্চ কপাট পার হইয়া অন্যদিকে যায়। তখন আবার কপাট বন্ধ করিয়া জল অবরোধ করা হয় এবং অবরুদ্ধ জল আবার বাড়িতে থাকে। এইরূপে প্রত্যেক কপাট পার হইতে হয়। সেই দৃশ্য অতীব মনোহর এবং বিস্ময়কর এবং দেখিলে গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। এই সকল ক্যানেল হইতে জল ক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়া সমস্ত উৎকল শস্যশ্যামল হয়। ক্যানেল দিয়া লঞ্চে ভ্রমণ বড়ই আনন্দদায়ক। লঞ্চখানি সমস্ত ক্যানেল ব্যাপিয়া চলে। বোধ হয়, যেন হাত বাড়াইলে দুইদিকের কূল ধরা যায়। কটক হইতে চাঁদবালি যাওয়ার সময় স্মরণ হয়, এক কপাট হইতে অন্য কপাটে ক্রমশঃ নামিয়া যাইতে হয়। ঠিক যেন লঞ্চখানি জলের এক সিঁড়ি হইতে অন্য সিঁড়িতে নামিয়া যাইতেছে। চাঁদবালি হইতে ফিরিবার সময় তদ্রূপ কপাটের পর কপাট ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিয়া আকূলপূরিত মহানদীতীরস্থ কটকে উপস্থিত হয়। চাঁদাবালিতে পৌঁছিয়া লঞ্চ ছাড়ি, এবং সমুদ্রগামী ষ্টীমারে উঠিয়া পরদিন কলিকাতা পৌঁছি।

মাদারিপুর ঢাকা-বিভাগের অন্তর্গত ; ফরিদপুরের উপরিভাগ। শুনিলাম, ঢাকার কমিশনর মিঃ পিকক্ (Peacock) সে সময় কলিকাতায় আছেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, তিনি বলিলেন যে, মাদারিপুরের অবস্থা বড় শোচনীয়। তিনবৎসর যাবৎ কোটালিপাড়ার পুলিসের নাকের নীচে হাঙ্গামা ও খুন হইতেছে, কিন্তু একটি আসামীও বিচারে আসে নাই। সে জন্য তিনি গবর্ণমেণ্টের কাছে মাদারিপুরের জন্য একজন বিশেষ দক্ষ কর্ম্মচারী চাহিয়াছিলেন, এবং তিনি আশা করেন যে, গবর্ণমেণ্ট যে উপযুক্ত লোক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, আমি তাহা প্রমাণ করিতে পারিব। তাহারপর কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি মাদারিপুরের নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—বড় বিষম স্থান। তাঁহার একজন বন্ধু সেখানে সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া গিয়া, মার খাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার নৌকা টানিয়া, ডাঙ্গায় তুলিয়া, তাঁহার বিরাট্ শরীরের অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। একজন বলবান্ হিন্দুস্থানি দেহরক্ষক ও অস্ত্র ছাড়া মাদারিপুরে গৃহের বাহির হইতে তিনি আমাকে বিশেষরূপে নিষেধ করিলেন। কলিকাতা হইতে রেলে গোয়ালন্দ গিয়া, মাদারিপুর হইতে আমার জন্য যে নৌকা আসিয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করিলাম। আশ্বিনমাস, বিশালকলেবরা পদ্মার তরঙ্গ-শোভা দেখিতে দেখিতে ফরিদপুরে পৌঁছিলাম, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেফ্রির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। জেফ্রি দেখিতে একটি অতি সুন্দর পুরুষ। মুখে সদাশয়তাপূর্ণ সুন্দর হাসি, এবং আলাপ শিষ্টাচার ও সদাশয়তাব্যঞ্জক। তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াই একটি ভাললোক বলিয়া বোধ হইল। এই প্রথম দর্শনে তাঁহার সম্বন্ধে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহার ব্যত্যয় পরেও ঘটে নাই। তিনি আমাকে বলিলেন,—"আপনি যে কি ভয়ঙ্কর সবডিভিসনের ভার পাইয়াছেন, তাহা বোধহয় জানেন না। তাহা হইলে আপনি এতদিন বিলম্ব করিয়া আসিতেন না। মেকলেতে বাঙ্গালীর বর্ণনা পড়িয়াছেন? মহিষের যেরূপ শৃঙ্গ, মধুমক্ষিকার যেরূপ হুল, গ্রীক কবিদের মতে স্ত্রীলোকের যেরূপ সৌন্দর্য্য—তদ্রূপ বরিশালের লোকের পক্ষে বজ্জাতি। এবং সে বরিশালের হৃদয় মাদারিপুর। উহা পূর্ব্বে সেই জেলার অন্তর্গতই ছিল। এখন উহার চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে। কোটালিপাড়ায় হাঙ্গামার পর হাঙ্গামা ও খুনের পর খুন হইতেছে। পালঙে রুদ্রকরের চক্রবর্ত্তীরা এক পত্তনি জাল করিয়া, তাহাদের এক খুড়তত ভ্রাতাকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। আমি তাহাদিগকে সেসনে দিয়াছি। সবরেজিষ্ট্রারের মোকদ্দমা আপনাকে বিচার করিতে হইবে।" তিনি এই মোকদ্দমার কথা এবং সবডিভিসনের অবস্থা যেরূপ ঘোরাল বর্ণে চিত্রিত করিলেন, আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

এই সকল আশঙ্কা বুকে করিয়া ফরিদপুর হইতে নৌকা খুলিলাম, এবং পদ্মার অবর্ণনীয় শোভা দর্শন করিতে করিতে এবং অবর্ণনীয় ইলিশ মাছের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে মাদারিপুর চলিলাম। কিন্তু নৌকায় কিছুদূর যাইতে না যাইতেই স্ত্রীর কম্পদিয়া ভয়ানক জ্বর আসিল এবং ক্রমে তিনি জ্বরে অজ্ঞান হইয়া গেলেন। শিশু পুত্রটি কাঁদিতে লাগিল। সঙ্গে বৃদ্ধা শাশুড়ী ও দুই শিশুভ্রাতা। যতদূর চক্ষে দেখা যায়, পদ্মার তরঙ্গিত জলরাশি এবং যতদূর শুনা যায়, তাহার ঘোর কল্লোল ও তরঙ্গভঙ্গ। মহাবিপদে পড়িলাম, কেবল শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলাম। নদীবক্ষে এরূপ একদিন এক রাত্রি অতিবাহিত করিয়া, পরদিন প্রত্যুষে মাদারিপুরে উপস্থিত হইলাম। সর্ব্বাগ্রে ডাক্তারবাবু, তাহারপর এডিসন্যাল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আসিলেন। তাঁহাদের কাছে শুনিলাম, এই জলপ্লাবিত স্থানে পাল্কী পাওয়া যায় না। বিষম সংকটে পড়িলাম। নদীর ঘাট হইতে সবডিভিসন-গৃহ তিন চারিশত হস্ত ব্যবধান হইবে। বাবুদের মুখে শুনিলাম যে, ভদ্রলোকের পরিবারেরা চলন্ত মশারির দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ঘাট হইতে বাসাবাটীতে উঠেন। মশারির চারকোণাতে চারজন লোক ধরিয়া চলিতে থাকে এবং তাহার ভিতর পরিবারেরা চলেন। এই মশারি-

পর্য্যটনের কথা শুনিয়া আমি সেই বিপদের সময়ও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্ত্রীর তখন জ্ঞান হইয়াছে; আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, এরূপ মশারি-সমাবৃতা হইয়া না গিয়া, শাল আলোয়ানে জড়িতা হইয়া যাওয়া বরং ভাল। ভদ্রলোকেরা সরিয়া গেলেন। শাশুড়ী স্ত্রীকে জড়াইয়া ধরিয়া সবডিভিসন-গৃহে লইয়া গেলেন। গৃহের অবস্থা দেখিয়া আমার চক্ষুঃস্থির হইল। একতলা পাকা বাড়ী। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজ প্রায় একমাস হইল এডিসন্যাল ডেপুটিবাবুর হাতে চার্জ্জ রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যাইবার সময় কালাবাঙ্গালী আসিতেছে শুনিয়া, মাটি হইতে ফুলের চারাগুলা পর্য্যন্ত তুলিয়া বিতরণ করিয়া গিয়াছেন এবং সেই অবধি সবডিভিসন-গৃহ বিরাটরাজার গো-গৃহে পরিণত হইয়াছে। একজন ভদ্রলোক সপরিবারে আসিতেছেন বলিয়া এডিসন্যালবাবু জানিতেন, তথাপি তিনি গৃহখানির প্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করেন নাই। শুনিলাম তাঁহাকে সবডিভিসনের ভার না দেওয়াতে তিনি কিছু মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছেন এবং এইরূপে সেই শোক নিবারণ করিয়াছেন। গৃহোপকরণের মধ্যে একখানি 'রাইটিং' টেবিল মাত্র আছে। একটিস্থান পরিষ্কার করিয়া, স্ত্রীকে শোয়াইয়া রাখিলাম এবং গৃহ পরিষ্কার করাইতে লাগিলাম। সেদিন এ কার্য্যে কাটিয়া গেল। সেইদিনই কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম।

মাদারিপুর স্থানটি দেখিতে সুন্দর। অনন্তবিস্তৃত পদ্মার শাখা আড়িয়ালখাঁ পদ্মারই মত বিস্তৃত। তাহাতে একটি ক্ষুদ্র নদ পড়িয়াছে, তাহার নাম কুমার। এই কুমার ও আড়িয়ালখাঁর সঙ্গমস্থলে মাদারিপুর অবস্থিত। সবডিভিসন-গৃহের সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, তাহার অপরপারে কুমার-তীরবাহী মাদারিপুরের একমাত্র রাজপথ এবং তাহার অপর পার্শ্বে কুমারের প্রশস্ত বাঁধা ঘাট এবং ঘাটের দুইপার্শ্বে নদতীরে ঝাউশ্রেণী। ফলতঃ স্থানটি দেখিতে বড় সুন্দর। দেখিয়া প্রাণে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিলাম। তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না।

পরদিন প্রাতে 'মাদারিপুর-হিতৈষী সভা' (Patriotic Association) হইতে এক বিচিত্র বেনামা পত্র ডাকে পাইলাম। তাহাতে লেখা আছে যে, উক্ত সভা স্ত্রীস্বাধীনতা বিষয়ে অশেষ তর্ক করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উহা ভারতবর্ষের উপযোগী নহে। অতএব মশারি ছাড়া স্ত্রীকে নৌকা হইতে উঠান সভার মতে আমার বড়ই গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। তাহার জন্য সভার একবিশেষ অধিবেশনে আমার উপর পুষ্প-চন্দন বৃষ্টি করিয়া এক 'রেজিলিউসন' (উহার মাথামুণ্ডু বাঙ্গালা কি, জানি না) পাশ হইয়াছে, আমি একজন বিখ্যাত কবি বলিয়া সভা মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইয়াছেন এবং উচ্চজাতি বলিয়া আমার জন্য এই উচ্চ শূলের বন্দোবস্ত। করিয়াছেন। সবেমাত্র মাদারিপুরে পা দিয়াছি, তাহাতে এই বেনামা ব্রহ্মাস্ত্র। মনেমনে স্থির করিলাম, আমাকে প্রথমেই একটু হাত দেখাইতে হইবে। পত্রখানি পড়া শেষ হইয়াছে, এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিলেন। তাঁহাকে খামটি দেখাইয়া, লেখাটি চিনেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কিছুক্ষণ ঠাওরাইয়া দেখিয়া বলিলেন যে, স্থানীয় একজন বড় মোক্তারের একটি ছেলে B. A. পড়িতেছে। উহা তাহারই লেখা বোধ হইতেছে।

আমি। আপনি কেমন করিয়া চিনিলেন?

তিনি। সে আমাকে সময় সময় পত্র লিখিয়া থাকে।

আমি। তাহার লেখা পত্র আপনার কাছে আছে কি?

তিনি। আমি পত্র রাখি না, বোধ হয় নাই।

আমি। সে এখন কোথায়?

তিনি। কলেজ বন্ধ, সে এখন মাদারিপুরে আছে। আপনার কাছে কি লিখিয়াছে?

আমি। কিছু না। আপনি তাহার কাছে বি. এ. পাঠ্য সাহিত্য বহিখানি চাহিয়া একখানি পত্র লিখুন।

তিনি পত্র লিখিলেন। আমি তাঁহার ডিস্পেনসারির চাকরকে ডাকিয়া আনিয়া পত্রখানি তাহার দ্বারা পাঠাইলাম। আমার আরদালি পাঠাইলাম না। সে তৎক্ষণাৎ পত্রের উত্তর দিয়াছে যে, বহিখানি তাহার সঙ্গে নাই। বাড়ীতে আছে। ডাক্তারবাবুর বিশেষ প্রয়োজন হইলে আনাইয়া দিতে পারে। আমি দেখিলাম, আমার কাছে যে চিঠি আসিয়াছিল, সেই কাগজ, সেই লেফাফা, সেই কালি, এবং সেই লেখা। আমি চিঠিখানি রাখিলাম। ডাক্তারবাবু কিছু বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেলেন। আমি আফিসে গিয়া আসন গ্রহণ করিয়াই মোক্তারদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। বলিলাম যে, মাদারিপুরের বড়ই দুর্নাম, কিন্তু আমি সে কলঙ্ক মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান দিব না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করিব। ভরসা করি, তাঁহারাও তাহাই করিবেন। মোক্তারেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে, আমার বিখ্যাত নাম, তাঁহারা আমাকে পাইয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন এবং তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহাদের কাছে কোন অভদ্র ব্যবহার আমি পাইব না। আমি বলিলাম—আমি ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ পুষ্প-চন্দন পাইয়াছি। তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। আমি পত্রখানি পাঠ করিয়া শুনাইয়া বলিলাম যে, আমি প্রমাণ পাইয়াছি যে, একজন প্রধান মোক্তারের পুত্রের এই কীর্ত্তি। তৎক্ষণাৎ সেই মোক্তারটি দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমার পুত্র ভিন্ন অন্য কোন মোক্তারের পুত্র ইংরাজি জানে না। ধর্ম্মাবতার মোটে কাল আসিয়াছেন, অতএব জানেন না যে, আমি কিঞ্চিৎ স্বাধীনচেতা বলিয়া আমার অনেক শত্রু। বোধ হয়, তাহারা কেহ ধর্ম্মাবতারকে বলিয়াছে যে, এই জঘন্য পত্র আমার পুত্রের লেখা। আমার পুত্রের কিরূপ চরিত্র, তাহা সকলেই জানেন। আমার কাছে তাহার হাতের লেখা আছে, আমি আনিয়া দেখাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার গৃহে ছুটিয়া গিয়া, একখানি নোটবুক আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি নোটবুকখানি খুলিয়াই একটু হাসিলাম। আর একজন বড় মোক্তার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ধর্ম্মাবতার হাসিলেন যে?" আমি ধীরে উত্তর করিলাম—"এই নোটবইখানির প্রথম পৃষ্ঠাতেই সেই বেনামা চিঠির মুসাবিদা আছে।" তখন নোটবহি-দাতা মোক্তারটি মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহাকে সকলে ধরাধরি করিয়া নদীর তীরে লইয়া গেলেন। মাথায় জল দিতে জ্ঞান হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন—"আমি যে ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতাম, বোধ হয় আপনি বিশ্বাস করেন না। তবে আমি যখন এরূপ কুলাঙ্গারের পিতা, তখন আমিও অপরাধী। আপনি পিতা-পুত্র দুজনকেই একসঙ্গে জেলে দেন।" আমি বলিলাম—"আপনি এখন বাসায় যান, স্থির হউন। সে সকল কথা পরে হইবে।" তাঁহাকে কয়েকজন মোক্তার ধরাধরি করিয়া বাসায় লইয়া গেলেন।

সেই দিন হইতে মাদারিপুর সবডিভিসন ব্যাপিয়া একটা হুলুস্থুলু পড়িয়া গেল। সকলের মুখে একই কথা যে, মাদারিপুরে এতদিনে ইহার উপযুক্ত হাকিম আসিয়াছে। এইরূপে লোকের মনে মহাভীতি সঞ্চার হইয়া গেল, ইহাতেই আমার মাদারিপুর সুশাসনের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

পরে জানিলাম, মোক্তারটি মাদারিপুরের সর্ব্বপ্রধান মোক্তার এবং তাঁহার পুত্রও একটি 'তুখড়' ছেলে। অতএব মাদারিপুরে পা দিয়াই এরূপ কৌশলে তাঁহাদের ধরিয়া ফেলিয়াছি, ইহাতে লোকের মনে যুগপৎ ভক্তি ও ভয়ের সঞ্চার হইল। সে মোক্তারটি বড় 'দেমাকি,' স্পষ্টবাদী ও স্বাধীনচেতা বলিয়া বাস্তবিক সকলেই তাঁহার শত্রু। কাচারি হইতে ফিরিয়া আসিলে এডিসনাল ডেপুটি, মুন্সেফ, পুলিশ ইনস্পেক্টর, ডাক্তার, সকলেই আমার উপর পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে, এ সুযোগ যেন না ছাড়ি এবং পিতা-পুত্র উভয়কে ফৌজদারিতে দিয়া জব্দ করি। আমি মনে মনে প্রথম হইতে যদিও অন্যরূপ কার্য্য-স্থির করিয়াছি, তথাপি তাঁহাদের অনুরোধ স্বীকার করিলাম। কাজেই সবডিভিসনময় রাষ্ট্র হইল যে পিতা-পুত্র ফৌজদারিতে পড়িবে। তাহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে। এরূপে

সাতদিন চলিয়া গেল, আমি কিছুই করিলাম না। বাঘে খাওয়ার অপেক্ষা খাইবার ভয় অধিক। সাতদিন পরে পূজার বন্ধ। বন্ধের পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়ে সেই মোক্তারটি আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, এবং গলবস্ত্র হইয়া আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন —"সাতদিন পিতা-পুত্র অন্নজল গ্রহণ করি নাই, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হইতেছে না, লোকে কতরূপ কথা প্রচার করিতেছে এবং কত টিট্‌কারি দিতেছে। সে যন্ত্রণা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহারা বলিতেছে, পূজার সময় বাড়ীতে ওয়ারেণ্ট পাঠাইয়া পিতা-পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইবে। সেরূপ অপমান অপেক্ষা বরং এখন জেলে দেওয়া ভাল। আমি আমার পুত্রকে আনিয়া হাজির করিয়া দিতেছি।"

এতাদৃশ প্রৌঢ় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির রোদনে আমার হৃদয় আর্দ্র হইল। আমি বলিলাম—"আপনার কোন ভয় নাই। আপনি আপনার পুত্রসহ বাড়ীতে যাইয়া পূজার উৎসব করুন, আমি পূজার বন্ধের মধ্যে কিছুই করিব না।" আমার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকরিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পূজার বন্ধ কাটিয়া গেল। পুত্র কলিকাতায় যাইয়া আমার কাছে করুণাভিক্ষাপূর্ণ একখানি দীর্ঘপত্র লিখিলেন। পিতা রোজ গলবস্ত্র হইয়া একবার আমার কাছে আসিয়া চক্ষের জল ফেলিতেন এবং আর বিলম্ব না করিয়া যাহা আমার ইচ্ছা হয় করিতে বলিতেন। এরূপে আরও একমাস চলিয়া গেল। তাহার পর একদিন সমস্ত মোক্তার দলবলে কোর্টে কাঁদাকাটি করিতে লাগিলেন। সে মোক্তারটির এমন শোচনীয় চেহারা হইয়াছিল যে, এখন তাঁহার শত্রুদেরও তাঁহার প্রতি দয়া হইল। তখন ডেপুটিবাবুরা পর্য্যন্ত বলিলেন যে, ফৌজদারিতে দেওয়া অপেক্ষা তাহার বেশী শাস্তি হইয়াছে। তথাপি তাঁহারা এখনও তাহাকে ফৌজদারীতে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। আমি সেদিন কোর্টে বলিলাম যে, আমি ইহাদিগকে ফৌজদারীতে দিব না, তবে বেনামা চিঠিখানি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে পাঠাইব। মোক্তারটি হাহারব করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন-ছেলেটিকে যাবজ্জীবনের জন্য নষ্ট না করিয়া, বরং যতদিন ইচ্ছা জেলে দেওয়া ভাল। আমি আর কিছু বলিলাম না।

এই দুর্ভাবনায় আবার তাহাদের কয়েকদিন চলিয়া গেল। একদিন সন্ধ্যারপর পিতা পুত্র উভয়ে আমার গৃহে উপস্থিত হইয়া, আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি উভয়কে সস্নেহে তুলিয়া বসিতে আসন দিলাম। এবং ছেলেটিকে খুব স্নেহের সহিত উপদেশ দিলাম। আমি যত আদর দেখাইতেছি, পিতা পুত্র তত বেশী কাঁদিতেছে। আমি সর্ব্বশেষে ছেলেটিকে বলিলাম—"তোমরা কি পাগল? তোমাদের কোন অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা আমার থাকিলে আমি এতদিন কি কিছু করিতাম না? আমি কিছুই করিব না। তুমি মনের আনন্দে গিয়া পড়াশুনা কর এবং খুব ভাল ছেলে হইবার চেষ্টা কর। তুমি যখন বাড়ী আসিবে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি তোমাকে আমার ছোট ভাইটির মত আদর করিব।" সে এবার আত্মহারাবৎ আমার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে একটি কথাও তাহার মুখে বাহির হইল না। তাহার পিতার অবস্থাও তদ্রূপ হইল। সেই দৃশ্য অপার্থিব, পবিত্র, শান্তিপ্রদ। মানুষ এরূপ শিক্ষার পথ ছাড়িয়া, কেন যে কেবল কঠোর দণ্ডের দ্বারা শাসন করিতে চাহে আমি বুঝিতে পারি না। সে ছেলে তাহারপর আমার সঙ্গে বরাবর সাক্ষাৎ করিত। সে বড় ভাল ছেলে। আজ সে একজন ডেপুটি মাজিস্ট্রেট। তাহার ভাগ্যবান্ পিতা এখনও জীবিত কি না জানি না। আমি তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতাম।

মাদারিপুরের অবস্থা

যদিও মাদারিপুর একটি প্রাচীন সবডিভিসন, তথাপি ইহার অবস্থা বড় শোচনীয়। দ্বিতীয়শ্রেণীর একটি মিউনিসিপালিটি আছে, তাহার পরিচয় কেবল একটিমাত্র নদীতীরবাহী

পাকারাস্তা। কিন্তু তাহাতেও বাহির হইয়া দুইপা বেড়াইবার জো নাই। চারিদিক্ হইতে দুর্গন্ধ আসিয়া নাসিকা পূর্ণ করিয়া তোলে। স্থানটি ইউক্লিডের সরলরেখাবিশেষ। ঐ পাকা রাস্তার একপার্শ্বে কুমার নদ, অন্যপার্শ্বে উকিলমোক্তার প্রভৃতির বাসাশ্রেণী। প্রত্যেক বাসার পার্শ্বে একটি গর্ত্ত, তাহাতে পচা জল, তাহার একপার্শ্বে পায়খানা এবং তাহাতে এক-শতাব্দীর সঞ্চিত মলরাশি। তাহার দুর্গন্ধে কোনদিকে নাক বাহির করিবার সাধ্য নাই। এই রাস্তার একপ্রান্তে কুমার ও আড়িয়ালখাঁর মোহনায় একটি খুববড় হাট এবং ব্যবসায়ীদের বৃহৎ বৃহৎ বাঁশের ঘর, হোগলাপাতার বেড়া। তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ১২ মাস ভিজা থাকে। পাকাঘরের মধ্যে কেবল সবর্ডিভিসনাল অফিসারের গৃহ। আমার প্রথম ভাবনা হইল—এই দুর্গন্ধের হাত হইতে কিরূপে উদ্ধারলাভ করিব। আমার ঘরের সম্মুখে একটি ছোটপুকুর, তাহার জলের গন্ধে গৃহে পর্য্যন্ত থাকা কষ্টকর বোধ হইল। সর্ব্বপ্রথম একটি তালগাছের নল তৈয়ার করিয়া, ঐ পুকুরের সঙ্গে নদীর যোগ করিয়া দিলাম। তাহাতে দেখিতে দেখিতে পুকুরের জল ভাল হইয়া উঠিল এবং মাদারিপুরে আমার কবি-কল্পনার বাহবা পড়িয়া গেল। তাহারপর গোয়ালন্দের সবর্ডিভিসনাল অফিসারের কাছে পত্র লিখিয়া তিনজন মেথর আনাইলাম এবং বিজ্ঞাপন দিলাম যে, সকলের বাসার পায়খানা প্রত্যহ পরিষ্কার করিতে হইবে, না করিলে দণ্ডবিধিমতে তাহার জন্য দণ্ডিত হইতে হইবে। যদিকেহ মেথর চাহেন, আমি এই নিয়মে মেথর যোগাইব—প্রত্যহ পরিষ্কারের জন্য মাসে ১৲ টাকা, একদিন অন্তর আট আনা, সপ্তাহে দুইদিনের জন্য চার আনা। বিজ্ঞাপন বাহির হইবামাত্রই একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল এবং আমার প্রতিকূলে জেলার মাজিস্ট্রেটের কাছে মাদারিপুরবাসীর একদীর্ঘ আবেদনপত্র যাইয়া উপস্থিত হইল যে, আমি তাঁহাদের আজীবন-সঞ্চিত ধন হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছি। দরখাস্ত আমার কাছে রিপোর্টের জন্য আসিল। মাজিস্ট্রেট জেফ্রি সাহেবের একদীর্ঘ ডেমি-অফিসিয়াল পত্রও আসিল। তিনি লিখিয়াছেন যে, মাদারিপুর দ্বিতীয়শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি, তাহাতে বাই-ল অর্থাৎ উপনিয়ম প্রচলিত করিয়া, স্থান পরিষ্কার করাইবার আমার কোন অধিকার নাই। তিনি আমার উদ্দেশ্যের খুব প্রশংসা করিয়াছেন, তবে কার্য্যটি আইনবিরুদ্ধ এবং মাদারিপুর বড় ভয়ানক স্থান বলিয়া আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। আমি আমার রিপোর্টে লিখিলাম যে, আমি কোন উপনিয়ম প্রচারিত করি নাই। কেবল পায়খানা পরিষ্কার রাখিবার জন্য মাজিস্ট্রেটস্বরূপ নোটিশ জারি করিয়াছি মাত্র, এবং আমি নিজে তিনজন মেথর নিযুক্ত করিয়াছি। যাহারা আমার ভৃত্যের দ্বারা কার্য্য করাইতে চাহে, তাহাদের নিয়মানুসারে বেতন দিতে হইবে। ডেমি-অফিসিয়াল চিঠিতেও এই সকল কথা আরও বিস্তারিত লিখিলাম। শুনিলাম, তিনি আমার রিপোর্ট পাইয়া এক উচ্চহাসি হাসিয়াছিলেন এবং মাদারিপুরবাসী উকিল মোক্তার-দিগকে আমার রিপোর্টের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"বড় চতুরলোক। ইহাকে ধরা বড় কঠিন ব্যাপার।"

মাদারিপুরের আন্দোলন থামিয়া গেল এবং ক্রমে ক্রমে সপ্তাহে দুইদিন পরিষ্কার করাইবার জন্য আমার কাছে দরখাস্ত পড়িতে লাগিল। আমি তাহাই গ্রহণ করিলাম। কিছুদিন পরে সকলে বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা দ্বিতীয়শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে চাহেন। আর চারি-গণ্ডা পয়সা বেশী বই ত নয়, উহা তাঁহারা দিবেন। আর কিছুদিন পরে, যাঁহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল, তাঁহারা বলিলেন যে, আর আটগণ্ডা পয়সা বেশী বই ত নয়, তাঁহারা একটাকা করিয়া দিবেন ; যেন প্রত্যহ পরিষ্কার হয়। তখন আমাকে আবার মেথর গোয়ালন্দ হইতে আনাইতে হইল এবং দেখিতে দেখিতে সকলেই দৈনিক পরিষ্কারের জন্য খুনাখুনি করিতে লাগিলেন। এখন আমার প্রতিশোধের পালা। আমি বলিলাম—আমি এত মেথর কোথায় পাইব? আর তাঁহারা যখন এত নারাজ হইয়া আমার উপর অমৃতরাশি বর্ষণ

করিয়াছেন, তখন আমি একার্য্য ছাড়িয়া দিব। ইহারপর আমার বাহাদুরি দেখে কে? তখন জনে জনে আমার খোসামুদি করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, এবে কি আরাম, তাঁহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, কি নরক হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়াছেন।

তাহারপর হাটটিতে হাত দিলাম। উহার সমস্ত স্থানে প্রায় একফুট কাদা, কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। তাহার জল এরূপ দূষিত যে, উহা কতখানি সবুজবর্ণ কাদা বলিলেও চলে। গন্ধের জন্য তাহার পাড়ে দাঁড়াইবার সাধ্যনাই। হাটের মালিক একঘর ব্রাহ্মণ জমিদার। দেবতাদের ডাকাইয়া, অনেককরিয়া বুঝাইয়া বলিলাম যে, যখন তাঁহারা এই হাট হইতে বৎসর অনুমান তিনহাজার টাকা পাইতেছেন, তখন পুষ্করিণীটির পঙ্কোদ্ধার করিয়া এবং হাটে খোয়া ঢালিয়াদিয়া, স্থানটি হাটের উপযোগী করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। মাদারিপুরের লোক, হাড়-অস্থি পর্য্যন্ত পাকা। তাঁহারা পরিষ্কার উত্তর দিলেন—হাটের এইঅবস্থা তাঁহাদের পরুষানুক্রমিক, তাঁহারা গরীব ব্রাহ্মণ, হাটের উন্নতির জন্য তাঁহারা একপয়সাও খরচ করিতে পারিবেন না। আমার সমস্ত কথা তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহারা যে এরূপ জবাব দিবেন, তাহারজন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম এবং তাহার প্রতিকারের পথও স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। ঢাকা জেলার স্বনামখ্যাত লোহজঙ্গের ধনী পালদিগের একটি কাচারি-বাড়ী মাদারিপুরে ছিল এবং তাহার একটি বিস্তৃত হাতা ছিল। আমি তখনই কাচারির বৃদ্ধ নায়েবকে ডাকাইয়া আনিলাম।

আমি। আপনার কাচারি-বাড়ীর হাতায় আমি একটি হাট বসাইতে চাহি, যদি আপনি আমায় সাহায্য করেন।

তিনি। আমি ধর্ম্মাবতারের তাঁবেদার। যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিব। সাহায্য কি কথা, একটি হাটের জন্য আমার মনিবেরা দশবিশ হাজার টাকাও অকাতরে খরচ করিবেন।

আমি। বেশ কথা। আপনি আগামী হাটবারের দিন সকাল হইতে ঢোল পিটাইয়া দিবেন যে, আপনার কাচারিতে হাট বসিবে। বৃদ্ধ তখন অবাক্ হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল এবং বলিল—ধর্ম্মাবতার! তাহাতে কি ফল হইবে? আমি হাসিয়া বলিলাম, তিনি সেইদিনই তাহা দেখিবেন। তাঁহাকে বিদায় দিয়া, পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারকে ডাকাইয়া, আমার কার্য্য-প্রণালী স্থির করিলাম। কাদারজন্য লোক হাটে বসিতে পারে না। এই বর্ষার সময় সকলেই মিউনিসিপাল রাস্তার উপর বসে, উহা আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমি ইন্‌স্‌পেক্টারকে বলিলাম—আগামী হাটেরদিন রাস্তার উপর কনষ্টেবল মোতায়েন রাখিতে হইবে, যেন কেহ সেখানে বসিতে না পারে এবং যে যে জল ও স্থলপথে লোক হাটে আসে, সেখানে দূরে দূরে কনষ্টেবল মোতায়েন রাখিয়া, লোকদিগকে পালের কাচারির হাটে যাইতে বলিয়া দিতে হইবে। হাটবারদিন সকাল হইতে পালের ঢোল বাজিতে লগিল এবং মাদারিপুরের সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, ব্যাপারখানা কি? আমি স্থির গম্ভীরভাবে কাচারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, এমন সময় সেই দেবতা দুজন দূর হইতে দোহাই দিতেদিতে আসিয়া, এজলাসের উপর হাত বাড়াইয়া আমার পা ধরিতে চাহিতেছেন। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম—"সে কি ঠাকুর! তোমরা ব্রাহ্মণ হইয়া একি করিতেছ!" তাহারা এজলাসের রেলে মাথাকুটিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! লোহজঙ্গ পালের নায়েব আমাদের সাতপুরুষের হাট ভাঙ্গিয়া দিল, আমাদের সর্ব্বনাশ করিল।"

আমি। সে কি কথা?

তাহারা। আমাদের হাটে একটি লোকও নাই। সমস্ত লোক পালের কাচারির হাতায় গিয়া বসিয়াছে।

আমি। আমি কি করিব! তোমরা সামান্য ব্রাহ্মণ। তোমরাই আমাকে গ্রাহ্য কর না।

পালেরা ধনকুবের, তাহারা কি আমার কথা শুনিবে? তোমরা আইনমতে তাহাদের সঙ্গে মোকদ্দমা করিয়া, তাহাদের হাট ভাঙ্গাইয়া দেও। আমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।

তাহারা। দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমাদের রক্ষা করুন। আমাদের খুব আক্কেল হইয়াছে। আপনি নায়েবকে ডাকাইয়া দুটিকথা বলিলেই তাহারা হাট ছাড়িয়া দিবে। আর আমাদের যাহা আদেশ করেন, তাহাই করিব।

তখন আমি বৃদ্ধ নায়েবকে ডাকাইলাম। সে আমার পূর্ব্বশিক্ষামতে বলিল—"লোকেরা আপনি গিয়া আমাদের হাতায় বসিতেছে, কাদার জন্য হাটে বসিতে পারে না। আমি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিব কেন? যখন হাট একবার বসিয়াছে, আমার মনিবেরা ইহার জন্য লক্ষটাকা ব্যয় করিবেন। প্রিভি কাউন্সেল পর্য্যন্ত না লড়িয়া আমরা ছাড়িব না।"

আমি ঠাকুরদের দিকে চাহিয়া বলিলাম—"শুনিলে ত বাপু, লক্ষটাকা!! এখন আমি ইহাতে আর কি করিব? তখন তাহারা ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সেইবৃদ্ধ নায়েবকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল—"দোহাই হাকিমের! দোহাই নায়েববাবুর! এ গরীব ব্রাহ্মণদের সর্ব্বনাশ করিও না।" আমি তখন কোর্টের কনষ্টেবলকে ইঙ্গিত করাতে, সে যাইয়া বলিল—"ঠাকুর! কোর্টে আর গোলমাল করিও না, চলিয়া যাও।" তখন তাহারা মড়াকান্না কাঁদিতে কাঁদিতে নদীর তীরে বসিয়া কেবল "দোহাই ধর্ম্মাবতারের!" বলিতে লাগিল। এরূপে সপ্তাহ চলিয়া গেল, রোজ এই অভিনয়। শেষে মোক্তারেরা সকলে দল বাঁধিয়া আসিয়া বলিল যে, দেবতাদের আচ্ছা শিক্ষা হইয়াছে। তাহাদের সাতদিন সময় দিলে তাহারা হাটের পুকুর কাটাইয়া, পাকা ঘাট বাঁধিয়া দিবে এবং যাহাতে বিন্দুমাত্র কাদা না হয়, তাহা করিয়া দিবে। আমি বলিলাম—"ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।" আগে তাহারা সেরূপ কার্য্য করুক, তখন ইহার কোনরূপ প্রতিবিধান করা যাইতে পারে কি না, চেষ্টা করা যাইবে। তবে অবস্থা এখন বড় গুরুতর হইয়াছে। শুনিয়াছ ত, পালদের লক্ষটাকা।" দেখিতে দেখিতে হাট পাকা হইল এবং পুকুরও কাটান হইল। আমি তখন পালদের নায়েবকে ডাকাইয়া অন্যদিকে কল টিপিলাম। সে লোকটি বড় ভাল ছিল। সে বলিল—"ব্রাহ্মণদের বাস্তবিকই সর্ব্বনাশ হইবে। অতএব ধর্ম্মাবতার যদি হাট আবার সেখানে উঠাইয়া লইতে চাহেন, আমার তাহাতে আপত্তি নাই।" আমি তাহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিলাম এবং এই সাহায্যের জন্য যাহাতে পালদের অন্যরূপে সুবিধা হয়, অথচ মাদারিপুরের উন্নতি হয়, সেরূপ আর একটি প্রস্তাব করিলাম।

আল্লার চিজ

পালঙ্গ থানার অধীনে কোনও একটি গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ জমিদার-পরিবার ছিলেন। তাঁহারা তিন সহোদর ;—জ্যেষ্ঠ শিষ্ট শান্ত, মধ্যম মধ্যম প্রকারের লোক এবং কনিষ্ঠ এতদূর অত্যাচারী যে, তিনি সে অঞ্চলে কংসাবতার বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইহাঁদের এক খুড়তত ভ্রাতা ছিল। সে তাঁহাদের জমিদারির অর্দ্ধাংশের অধিকারী, কিন্তু সে এরূপ নিরীহ ভাল মানুষ যে, জমিদারি হইতে কিছুই পায় না ; তাহার গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। দীর্ঘকাল স্বীয় সম্পত্তি হইতে এরূপে প্রবঞ্চিত হইয়া, সে শেষে 'ফরাজি'দিগের অধিনায়ক বিখ্যাত দুদু মিয়ার পুত্র নোয়া মিয়ার কাছে তাহার অর্দ্ধাংশ 'পত্তনি' দিতে প্রস্তাব করিল। নোয়া মিয়ার কথা পরে লিখিব। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই চলিবে যে, সে অঞ্চলের মুসলমান প্রজা সমস্তই তাহার শিষ্য ও ধর্ম্মশাসনাধীন বলিয়া তাহার এতদূর প্রভুত্ব ও এরূপ অকথ্য অত্যাচার ছিল যে, উক্ত পত্তনির প্রস্তাবে স্বয়ং কংসাবতারের হৃৎকম্প হইল। সে দিনেদিনে তাহাদের তিনভ্রাতার নামে এককালে পত্তনি লিখিয়া, তাহা পালঙ্গ সবরেজেষ্ট্রি আফিসে গভীর রাত্রিতে রেজেষ্ট্রি করাইয়া লইল। কিছুদিন পরে এ

কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাহার খুড়তত ভাই হাহাকার করিয়া, রেজেষ্ট্রি আফিসে গিয়া, সেই দলিলের নকল লইয়া ডিষ্ট্রীক্ট রেজিস্ট্রার সহৃদয় জেফ্রি বাহাদুরের কাছে নালিস করে। তিনি স্বয়ং তাহা তদন্ত করিয়া, কংসাবতারকে সেসনে অর্পণ করিয়াছেন এবং সবরেজিস্ট্রারের নামে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া, বিচারার্থ সর্বাডিভিসনাল অফিসারকে দিয়াছেন। মাদারিপুর আসিবার সময় তিনি এই ইতিহাস আমাকে ডাকিয়া বলিলেন এবং অনুরোধ করিলেন যে, মোকদ্দমা আমাকে বিচার করিতে হইবে, আর যাহাতে চক্রবর্তীদের অত্যাচার নিবারণ হয়, তাহার চেষ্টা আমাকে বিশেষরূপে করিতে হইবে।

আমি মাদারিপুরে আসিয়া সবরেজিস্ট্রারকে সেসনে অর্পণ করিলাম। উভয় মোকদ্দমা একসঙ্গে বিচার হইল এবং আশ্চর্য্যের বিষয়, উভয় মোকদ্দমাতেই বিবাদী অব্যাহতি পাইল। সমস্ত সর্বাডিভিসন বিচারের ফলে স্তম্ভিত হইল এবং সাধারণ লোকে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, জেফ্রি সাহেবের সঙ্গে জজের মনোবাদ এই বিচার-বিভ্রাটের কারণ। কংসাবতার গৃহে ফিরিয়া সে অঞ্চলে অরাজকতা আরম্ভ করিল। প্রত্যহ তিনভ্রাতার প্রতিকূলে নালিস হইতে লাগিল, এবং তাহাদের শাস্তি হইলেই জজ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। অবস্থা ভয়ানক হইয়া উঠিল। আমিও, এক মোকদ্দমায় অব্যহতি হইলে, দ্বিতীয় মোকদ্দমায় তাহাদিগকে জেল দিতে লাগিলাম। কনিষ্ঠের কার্য্যে লিপ্ত হইয়া অপর ভ্রাতা দুইজনও সময়ে সময়ে জেলে যাইতেছিলেন। এক মোকদ্দমায় খালাস হইলে, তাহাদিগকে জেলের দ্বার পর্য্যন্ত মুক্তি দিয়া, অন্য মোকদ্দমায় গ্রেপ্তার করিয়া, আবার জেলে দিতে লাগিলাম। এইরূপ কঠোরভাবে প্রায় ছয়মাস তাহাদিগকে শাসন করিলাম। কিন্তু একেএকে সকল মোকদ্দমায় জজ তাহাদিগকে ছাড়িয়া ছিলেন। তখন তাহারা তাহাদের খুড়তত ভ্রাতার জমিদারী কাচারিতে এক প্রকাণ্ড কালীপূজা করিল এবং ঢাকা হইতে বাই খেম্‌টা আনিয়া, তিনদিন যাবৎ ঘোরতর উৎসব করিল। ইহার অর্থ, সর্বাডিভিসনাল মাজিষ্ট্রেট যে তাহাদের কিছুই করিতে পারিল না, তাহা ঘোষণা করা ও তাঁহাকে অপদস্থ করা। উৎসবান্তে তাঁহার একজন অত্যাচারী গোমস্তা ও এক পেয়াদা খাজনা উশুলের জন্য রাখিয়া, বিজয়ী যোদ্ধার মত মহা আড়ম্বরে গৃহে ফিরিলেন। গোমস্তা প্রজাদের গরু-বাছুর প্রকাশ্য নিলাম করিয়া খাজনা উশুল করিতে লাগিল এবং নানাবিধ অসহনীয় অত্যাচার করিতে লাগিল। প্রজারা বুঝিল যে, সর্বাডিভিসনাল অফিসার তাহাদের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিল না। তখন তাহারা শাসনভার আপনার হস্তে লইল। চতুর ও সাবধান গোমস্তা ডাঙ্গার কাচারিতে না থাকিয়া নৌকায় থাকিত। একদিন পালঙ্গ থানাতে সংবাদ আসিল যে, নৌকা সহিত গোমস্তা ও পেয়াদাদিগের চিহ্নমাত্র পাওয়া যাইতেছে না। পুলিস তদন্তে গেলে মুসলমান প্রজাগণ—মাদারিপুর অঞ্চলে মুসলমানই প্রজা—একবাক্যে বলিল যে, গোমস্তাকে তাহারা দেখেও নাই। 'আল্লার চিলে' তাহাকে লইয়া গিয়াছে। তখন আর বুঝিবার বাকী রহিল না যে, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া, নৌকা সহ মেঘনায় লইয়া প্রজারা ডুবাইয়া দিয়াছে। তখন প্রজারা রাষ্ট্র করিল যে, জেলার ও উপবিভাগের মাজিষ্ট্রেট যখন চক্রবর্তীদের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিল না, তখন তাহারা তিনভ্রাতাকে খুন করিয়া, তিনজন ফাঁসিতে গিয়া দেশ রক্ষা করিবে। চক্রবর্তীরা তখন বুঝিলেন যে, "বীরত্ব অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ" (Discretion is the better part of valour.)। তাঁহারা রাবণের পরিবার লইয়া, এবং ভদ্রাসন বাড়ী শূন্য করিয়া, প্রাণভয়ে ফরিদপুরে পলায়ন করিলেন এবং সরকারি উকীল তারানাথবাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

আমি মাদারিপুর যাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ণ রায় নামক একজন ভূম্যধিকারীকে প্রজাগণ রাত্রিতে নৌকায় আক্রমণ করিয়া পশুবৎ হত্যা করিয়াছিল। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর পক্ষে জমিদারি কোর্টে আনা হইয়াছিল এবং স্বয়ং জেফ্রি ও তারানাথ পিতার শোচনীয়

হত্যার দরুণ শিশুকে বড় ভালবাসিতেন। তাহার ষ্টেট চক্রবর্ত্তীদের কাছে গুরুতররূপে ঋণী ছিল। তারানাথ তাঁহাদের সাহায্য করিবেন বলিয়া একটা সামান্য সম্পত্তি তাঁহাদের কাছে বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করিয়া লইলেন। তাহারপর জেফ্রি সাহেবকে সেই কথা বলিয়া, হাত করিয়া, তাহাদিগকে তাঁহার সমক্ষে লইয়া গেলেন। তাঁহারা জেফ্রির চরণতলে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের শোচনীয় অবস্থা ও নির্ব্বাসনের কথা বলিলেন। তাহার পরদিন আমি জেফ্রি সাহেবের এক ডেমি-অফিসিয়াল (অর্দ্ধ সরকারি) পত্র পাইলাম। তাহার মর্ম্ম—"চক্রবর্ত্তীদের যথেষ্ট শাসন হইয়াছে। এখন আর Giving a dog a bad name and then hanging him (কুকুরকে দুর্নাম দিয়া ফাঁসি দেওয়া) নীতিতে কার্য্য করা ভাল নহে।" আমি দেখিলাম, তাঁহার ইহাদের প্রতি দয়া হইয়াছে। ইহার কয়েকদিন পরে তিনি তাহাদের সঙ্গে করিয়া মাদারিপুরে আসিলেন। আমি সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে উপরোক্ত মর্ম্মে চক্রবর্ত্তীদের জন্য সুপারিস করিলেন, এবং গোমস্তা পেয়াদা খুন মোকদ্দমাটার প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম—"শুনিয়াছি, পূর্ণ রায়ের মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টার মনোমোহন এই অঞ্চলের প্রজাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, যদি খুন কর, তবে যেন তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত রাখিও না। তাহারা এবার সেই উপদেশমতে কার্য্য করিয়াছে। অতএব খুন প্রমাণ করা বিধাতাপুরুষেরও সাধ্য নাই। তবে চক্রবর্ত্তীরা যদি আর অত্যাচার করিবে না বলিয়া তাঁহার ও আমার সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করে, তবে তাহারা বাড়ী চলিয়া যাউক। কেহ তাহাদের যাহাতে কেশস্পর্শ না করে, আমি তাহা করিব। জেফ্রি তাহাদিগকে ডাকাইলেন। তাহারা তাঁহার বজরায় আমার হাতে পৈতা জড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোনও কার্য্য করিবে না। আমি তখন তাহাদিগকে বাড়ী যাইতে বলিলাম। তাহারা সঙ্গে একজন সবইন্‌স্‌পেক্টার ও পুলিস চাহিল। আমি বলিলাম—আমি একটি চৌকিদারও তাহাদের সঙ্গে দিব না। তাহারা তখন গলদশ্রুনয়নে জেফ্রি সাহেবের কাছে বিদায় চাহিয়া বলিল—"হুজুর! আমাদের সঙ্গে এই শেষসাক্ষাৎ।" তাহারা চলিয়া গেলে জেফ্রি আমাকে বলিলেন—"আপনি কি অন্যায় সাহস করিতেছেন না?" আমি গর্ব্বিতভাবে উত্তর দিলাম—"আমাদের হুকুমকে যদি লোকে ভয় না করে, তবে পুলিসকে কি ভয় করিবে? আমি ইহাদের সঙ্গে অজ্ঞাতভাবে পুলিস পাঠাইব; কিন্তু সেকথা ইহারা, কি অন্যলোক জানিবে না। লোকে জানিবে যে, ইহারা কেবল আমাদের হুকুমের জোরে বাড়ী গেল" আমি কাচারিতে গিয়া, উভয় পক্ষের মোক্তারদিগকে ডাকিয়া এবং প্রজাদের মোক্তারকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম—"চক্রবর্ত্তীরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আর তাহারা প্রজার উপর উৎপীড়ন করিবে না। আমি তাহাদিগকে বাড়ী যাইতে আদেশ দিয়াছি। তুমি জান, আমি এতদিন প্রজাদের জন্য কত কি করিয়াছি। কিন্তু এখন প্রজারা যদি তাহাদের ছায়াও স্পর্শ করে, তবে আমি তাহাদের প্রতিকূলে যাইব।" মোক্তার বলিল যে, সে প্রজাদের সংবাদ দিবে। তাহারা আমার আদেশের কখনও অন্যথাচরণ করিবে না।

তাহার কয়েকদিন পরে আমি সেই কালীপূজার ও নৃত্যগীতের রঙ্গভূমি কাচারিতে গিয়া শিবির স্থাপন করিলাম। প্রথমে চক্রবর্ত্তীদের খুড়তত ভাইকে ডাকিয়া বলিলাম—"তোমার সন্তানাদি নাই। তুমি এরূপ সরল প্রকৃতির লোক যে, তোমার দ্বারা জমিদারি শাসন অসম্ভব। অতএব তুমি চক্রবর্ত্তীদের এখন একটা প্রকৃত 'পত্তনি' দেও।" সে তাহাতে সম্মত হইয়া বলিল যে, তাহার ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়, এরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিলে সে সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতাদিগকে দিয়া কাশী চলিয়া যাইবে। সে তাহার সম্পূর্ণ ভার আমার হস্তে দিল। চক্রবর্ত্তীদের ডাকাইয়া, আমি তদ্রূপ 'পত্তনি' সম্পাদিত করিয়া, তাহাদের খুড়তত ভ্রাতাকে সস্ত্রীক কাশীযাত্রা করাইয়া দিলাম। চক্রবর্ত্তীরা কেবল এক আপত্তি করিল যে, প্রজারা যেরূপ বিদ্রোহী হইয়াছে, তাহাতে তাহারা আমাদিগকে খাজনা দিবে না।

আমি তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, প্রজাদের দলপতিগণকে ডাকাইলাম। দেখিলাম, চক্রবর্ত্তীরা কিছু অতিরিক্ত নিরিখে খাজনা চাহিতেছিল। কিন্তু সে খুনের কিছুই কিনারা হইল না দেখিয়া, এবং চক্রবর্ত্তীদের পলয়ানবৃত্তান্ত অবগত হইয়া, প্রজাদের এত সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল যে, আমার স্থিরীকৃত নিরিখেও তাহারা কিছুতেই খাজনা দিতে স্বীকার করিল না। তখন আমাদের যে অমোঘ অস্ত্র আছে, তাহা ত্যাগ করিলাম। এই বিদ্রোহের দলপতিগণকে Special constable (বিশেষ কনষ্টেবল) নিযুক্ত করিয়া আদেশ দিলাম যে, তাহারা প্রত্যহ সেখান হইতে পালঙের থানায় শান্তিরক্ষার সংবাদ দিবে, সেখান হইতে সেই সংবাদ মাদারিপুরে অতিরিক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া যাইবে, এবং তাহার পর আমার শিবিরে সংবাদ লইয়া আসিবে। তাহাদিগকে পোষাক দেওয়া হইল। Baton (বেটন) দেওয়া হইল। আমার তাঁবুর সম্মুখে সে 'বেটন' বুকে লাগাইয়া দাঁড়াইত। একদিন একজন মোক্তার তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিল যে, সে উহা রাত্রিতেও বুকের উপর রাখিয়া শুইয়া থাকে! কারণ, উহা মাটিতে রাখিলেও নাকি জরিমানা হয়। এরূপ দিনকয়েক কনষ্টেবলি করিবার পর তাহাদের রোখ থামিল। তাহারা বুঝিল যে, কেবল চক্রবর্ত্তীদের নহে, তাহাদের শাসন করিবারও অস্ত্র আছে। তখন সমস্ত প্রজা সেই নিরিখ স্বীকার করিল এবং আনন্দে বন্দোবস্তি করিল। তখন জমিদার প্রজার মধ্যে সেই সম্প্রীতি এবং আমার প্রতি উভয়ের কৃতজ্ঞতা দেখিয়া আমার হৃদয়ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সমস্ত বন্দোবস্তি রেজেষ্ট্রি করাইয়া দিয়া, আমি শিবির উঠাইয়া মাদারিপুরে ফিরিলাম। জেফ্রি সাহেবকে সমস্ত সংবাদ অবগত করাইলে, তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়া ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া দীর্ঘপত্র লিখিলেন।

নোয়া মিয়া

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, নোয়া মিয়া স্বনামখ্যাত দুধু মিয়ার পুত্র এবং 'ফরাজি' মুসলমানদের অধিনায়ক। তাহার নামে স্বয়ং কংসাসুর চক্রবর্ত্তী যে ভীত হইয়া জাল পর্য্যন্ত করিয়াছিল, তাহাতে তাহার পরাক্রম প্রমাণিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের, বিশেষতঃ ফরিদপুর অঞ্চলের প্রজা অধিকাংশই 'ফরাজি' মুসলমান। নোয়া মিয়ার মুখের কথা তাহাদের পক্ষে বেদ। ধর্ম্মগুরুর এমন দাসত্ব অন্য কোনও জাতিতে নাই। এ অঞ্চলে নোয়া মিয়া ইংরাজ-রাজ্যের উপর একপ্রকার আপনার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে তাহার এক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পেয়াদা নিয়োজিত ছিল, এবং ইহাদের দ্বারা সে ফরাজিদিগকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত রাখিত। গ্রামের কোনও বিবাদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ভিন্ন দেওয়ানী, কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত না। অগ্রে তাহার কাছে বিচার হইত এবং সে অনুমতি দিলে ইংরাজ পুলিসে, কি বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইত। ইহার অন্যথা কেহ করিলে তাহাকে ধর্ম্মচ্যুত 'কাফের' হইতে হইত। ইহার ফলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে পক্ষ অবলম্বন করিত, সে পক্ষ মিথ্যা হইলেও প্রমাণিত হইত। তাহার আদেশমত লোকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিত, এবং সে যাহার বিপক্ষে যাইত, তাহার অভিযোগ সত্য হইলেও শত পুলিসে, কি বিচারকে চেষ্টা করিয়াও বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাইত না। পূর্ব্ব অধ্যায়ের 'আল্লার চিলে'র দ্বারা খুন তাহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। এইরূপে মাদারিপুরের বিচারকার্য্য একরূপ হাস্যকর ব্যাপার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদের লীলা হইয়া উঠিয়াছিল। শুধু তাহা নহে। বিচারালয়ে বহুব্যয়ে যদিকোন সম্পত্তি কেহ ডিক্রী পাইল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার প্রতিকূলে গেলে, তাহার সাধ্য নাই যে, সেই সম্পত্তির নিকটে যাইবে। মাদারিপুর যে এত গুরুতর হাঙ্গামা ও খুনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, এই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টগণ তাহার একটি প্রধান কারণ। অথচ ইহারা ঠিক যেন আয়নার ছবি। ধরিবার জো নাই। ধরিবে

কি, তাহাদের ও তাহাদের পেয়াদাদের নাম পর্য্যন্ত গ্রামের কেহ প্রাণান্তে প্রকাশ করিবে না। যাহাদের সর্ব্বনাশ করিত, তাহারা পর্য্যন্ত নোয়া মিয়ার ভয়ে ইঁহাদের নাম প্রকাশ করিত না। কারণ, তাহা হইলে গ্রামান্তরে পলাইয়া গিয়াও তাহার রক্ষা নাই। সেখানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহার প্রতিশোধ লইবে। এরূপ অবস্থায় কোনকোন প্রজা দেশত্যাগী হইয়া অন্যদেশে চলিয়া যাইত, তথাপি তাহার ধর্ম্মগুরুর প্রতিকূলতা করিত না।

আমি সবডিভিসনের ভার লইয়া নোয়া মিয়ার শাসনের গল্প শুনিয়াছিলাম, এবং চক্রবর্ত্তীদের মোকদ্দমায় তাহার প্রমাণও পাইলাম। কিন্তু তাহাকে দণ্ডবিধি, কি কার্য্যবিধির দ্বারা স্পর্শ করিবারও জো নাই। কারণ, আইন প্রমাণের অধীন। নোয়া মিয়ার কার্য্যাবলী প্রমাণের বাহিরে। তাহার প্রতিকূলে কে প্রমাণ দিবে? পুলিস এই বলিয়া কবুল জবাব দিত। আমি তখন বুঝিলাম যে, তাহাকে শাসন করা দণ্ডবিধি, কি কার্য্যবিধির কার্য্য নহে। ইহারজন্য অন্যবিধি অবলম্বন করিতে হইবে। মাদারিপুর শাসনকার্য্যে বিধাতা আমাকে অনেক সময় সাহায্য করিয়াছেন, অনেক সময় আমার জীবন পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছেন। হঠাৎ একদিন এক পুলিস রিপোর্ট আসিল যে, পশ্চিম অঞ্চলের জৌনপুর হইতে এক মৌলবী আসিয়া নোয়া মিয়ার প্রতিকূল মত প্রচার করিতেছে। স্মরণ হয়, তর্কের বিষয় এইরূপ একটি কি ছিল—নোয়া মিয়াদের মতে যেখানে মুসলমানরাজ্য নাই, সেখানে "জুম্মা নেমাজ" অসিদ্ধ। জৌনপুরের মৌলবীর মতে মুসলমানরাজ্য হউক, আর অন্য রাজ্যই হউক, রাজা যেখানে আছে, সেখানে জুম্মা নেমাজ সিদ্ধ। পুলিস রিপোর্ট করিয়াছে যে, এই বিতণ্ডা এত ভীষণরূপ ধারণ করিয়াছে যে, তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিবিধান না করিলে সমস্ত সবডিভিসনে ঘোরতর হাঙ্গামা ও খুন আরম্ভ হইবে। এমন কি পরের শুক্রবার একদল নেমাজ পড়িতে গেলে অন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে এবং প্রত্যেক মসজিদ্ নররক্তে প্লাবিত হইবে। বিষম সঙ্কট। এখন প্রচলিত শাসনপ্রণালী অনুসারে দুই মৌবলীকে তলব দিয়া যেন শান্তিরক্ষার জামিন-মোচলকা লইলাম। কিন্তু তাহাদের মতের ত আর জামিন-মোচলকা লওয়া যাইতে পারে না। মতকে ত আর পুলিশ, কি ওয়ারেণ্টের দ্বারা গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে না। ভূগর্ভস্থ বিবরবাসী দীনহীন রুশোর একটি মত হইতে ফরাসী বিপ্লব ঘটিয়াছিল। ফরাসী-সম্রাট্ তাঁহার সমস্তশক্তি সঞ্চালিত করিয়াও তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। বরং তাহার প্রথম সূচনায় তাঁহারই শিরশ্ছেদ ঘটিল। অনেক চিন্তা করিয়া আমি পুলিশের দ্বারা উভয়ের নিকট এক আদেশ প্রেরণ করিলাম যে, পরের রবিবার মাদারিপুরে মুসলমানদের একটি মহতী সভা আহূত হইবে। মৌলবীরা অশান্তির কার্য্য করিয়া, দণ্ডিত না হইয়া, সেই সভায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আপন আপন মত সমর্থন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করুন। এই কৌশলে যুদ্ধ স্থগিত হইল, এবং উভয় মৌলবী বহুসংখ্যক 'কেতাব' ও অনুচর সঙ্গে করিয়া নিরূপিত সময়ে সভায় উপনীত হইলেন। এক প্রকাণ্ড সামিয়ানাতলে ফরিদপুর অঞ্চলের সমস্ত আবক্ষ-চুম্বিত-শ্মশ্রু মৌলবীগণ বড় বড় 'মুড়াচ্ছা' বাঁধিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন। আমাদের শ্রাদ্ধসভায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের যেরূপ পণ্ড বাক্‌বিতণ্ডায় মেদিনী কম্পিত হইয়া থাকে, আমি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলাম। আমি অগ্রেই জানিয়াছিলাম যে, এই জুম্মা-যুদ্ধের শেষ নাই। অতএব যুদ্ধ ১০টার সময় আরম্ভ করাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তে সমস্তদিন দিবানিদ্রায় কাটাইলাম। ইন্‌সপেক্টারকে বলিয়া দিলাম যে, তিনি যেন পাঁচটার সময় রক্তউষ্ণীষধারী অনুচরগণ সমভিব্যাহারে সশস্ত্র বীরবেশে সভায় উপস্থিত হন। নিদ্রান্তে পাঁচটার সময়ে গিয়া দেখিলাম, সবডিভিসন ভাঙ্গিয়া যেন সমস্ত কাছাবিহীনবিরাটমূর্ত্তি ফরাজিগণ সমবেত হইয়াছে। মৌলবীযুগলকে আমি সভায় দুই বিপরীতপ্রান্তে বসাইয়াছিলাম। এখন দেখিলাম, তাঁহারা পশ্চাৎদেশ ঘর্ষণ করিতে করিতে প্রায় সম্মুখীন হইয়াছেন, এবং আর কিছু বিলম্ব করিলে ঘন বিলোড়িত জিহ্বা ও ঘন আন্দোলিত শ্মশ্রুজাল হইতে বাহুচতুষ্টয়ে বিতণ্ডা সঞ্চালিত হইবে ; এবং তখন প্রায়

পাঁচসহস্র মুসলমানের সেখানে একটা "করবল্লা" হইবে। আমি কিছুক্ষণ অতিশয় গম্ভীরভাবে সেই কণ্ঠতালু ও মূর্দ্ধা হইতে অপূর্ব্বরূপে উচ্চারিত আরব্য শব্দাবলি শ্রবণ করিয়া, তাহাদের অপরিজ্ঞাত অর্থে আপ্যায়িত হইয়া বলিলাম—"আপনারা উভয়ে বিখ্যাত মৌলবি, (তাঁহারা উভয়ে প্রসন্ন হইয়া আমাকে সেলাম করিলেন)—আপনাদের এই তর্ক আজ যে শেষ হইবে, বোধ হইতেছে না। কারণ, বিষয় বড় গুরুতর।—(তাঁহারা উঠিয়া আবার আমাকে সুপ্রসন্নভাবে সেলাম করিলেন)—বেলাও শেষ হইয়া আসিয়াছে। আপনারা ক্লান্ত হইয়াছেন। অতএব আজ সভা ভঙ্গ হউক। সুবিধামতে আর একদিন বিচার হইবে।" সমবেত মুসলমান মৌলবী ও ভদ্রমণ্ডলীর পিত্তও অজ্ঞাত আরব্য ভাষার ৭ ঘণ্টাবাহী প্রবাহে তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারাও আমার প্রস্তাবে সায় দিলেন। তখন আমার পূর্ব্বসঙ্কেতমত আমি নোয়া মিয়াকে ও তাঁহার শতশত সহচরকে সঙ্গে করিয়া উত্তরমুখে চলিলাম। ইন্‌স্‌পেক্টার অন্য মৌলবী ও তস্য শতশত সহচরকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণমুখে গেলেন। আমি নোয়া মিয়াকে বলিলাম যে, তিনি যেন সেদিন আর দক্ষিণমুখে না যান। কারণ, এ অঞ্চলে তাঁহার অশেষ সম্মান। যদি সেই বিদেশীয় মৌলবীর সঙ্গে দেখা হয়, এবং সে তাঁহাকে কোনরূপ কটু কথা বলে, তবে তাঁহার লাখটাকার সম্মান নষ্ট হইবে। তিনি বলিলেন, আমার কথা ঠিক। সেই 'নাদান' (অজ্ঞানী) মৌলবী যেদিকে গিয়াছে, সেদিকে তিনি যাইবেন না। তবে আর একদিন সভা হইলে, তিনি নিশ্চয় তাহাকে পরাজিত করিবেন। পূর্ব্ব rehearsal (শিক্ষা) মতে ইন্‌স্‌পেক্টারও অন্য মৌলবীকে ঠিক এরূপ বলিলেন, এবং সেই মৌলবীও এরূপ সায় দিয়া—বিশেষতঃ সে বিদেশীয়—অন্যদিকে ছুটিল। পরদিন সমস্ত সর্বডিভিসনে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, নোয়া মিয়া হারিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাও আমার পূর্ব্বতালিমের ফল।

নোয়া মিয়া তাহার পরদিন বুক কুটিতে কুটিতে আমার কাছে সহচর-শূন্যভাবে উপস্থিত। "হাম্ এক দমছে বরবাত গেয়া। হামারা লাখো রুপেয়াকা ইজ্জত গেয়া।"—ইত্যাদি শোকসূচক বাক্যাবলি উদ্‌গিরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাকে জেলে দিলেও তিনি বোধহয় এতকাতর হইতেন না। অতএব পেনেল কোডের উপরেও দণ্ড আছে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"এ কি কথা! এমন কথা কে রাষ্ট্র করিল?" তিনি গলদশ্রুনয়নে বলিলেন যে, উহা সেই 'দুষমন' মৌলবীর কাজ। অতএব এ জনরব মিথ্যা বলিয়া পুলিসের দ্বারা রাষ্ট্র না করাইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে। ইহা অপেক্ষা তাঁহার মৃত্যু ভাল। আমি বলিলাম —উত্তম কথা। তিনি যদি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন, আমিও তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিব। আমি তখন তাঁহাকে খুব বাড়াইয়া বলিলাম—"আমি আপনার এ অঞ্চলে অমোঘ প্রভুত্বের ও আপনার শাসন-প্রণালীর কথা সকলই অবগত হইয়াছি। আমি আপনার শাসনের প্রতিকূলতা করিব না। আসুন, উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করি। আমি আপনার সাহায্য করিব, আপনি আমার সাহায্য করিবেন। প্রথম কথা, আপনি আমাকে গোপনে আপনার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পেয়াদাদের এক তালিকা দিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাহাদের বলিয়া দিবেন, যেন তাহারা ধর্ম্মতঃ কার্য করে। যে সকল মোকদ্দমা আপোষে হইতে পারে, তাহারা সে সকল মোকদ্দমা আপোষ করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিবে। আমি নিজে তাহাদের কাছে সেরূপ মোকদ্দমা পাঠাইব। তাহাদের মধ্যে কেহ যদি অন্যায় কার্য্য করে, কাহারও প্রতি আমার সন্দেহ হয়, তাহাদের কাহারও এলাকায় শান্তিভঙ্গের কার্য্য হয়, আপনি তাহাদের পদচ্যুত করিবেন। তৃতীয়তঃ, যাহারা 'জুম্মা নেমাজ' করিতে চাহে, আপনি তাহাদের কোনরূপ ক্ষতি করিবেন না। আপনি কোরান স্পর্শ করিয়া, আমার এই অনুরোধ ধর্ম্মতঃ রক্ষা করিবেন বলিয়া বলুন, আমি আপনার বিপক্ষতা না করিয়া, যাহাতে আপনার প্রতিপত্তি আরও বর্দ্ধিত হয়, তাহা করিব; এবং এ জনরবের তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিব। তিনি তাঁহার বজরা হইতে কোরান আনাইয়া অতিশয় সন্তুষ্টির সহিত এই প্রতিজ্ঞা করিলেন। এবং আমার অনেক প্রশংসা

করিয়া বলিলেন—"এতদিনে মাদারিপুরে একজন বিচক্ষণ লোক আসিয়াছে। অতঃপর আমার কোনকার্য্যে অপ্রীত হইবার আপনি কোনও কারণ পাইবেন না। আমি ঠিক আপনার একজন তাঁবেদারের মত কার্য্য করিব।" আমি যে দুইবৎসর মাদারিপুরে ছিলাম, তিনি এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। আমার মাদারিপুর সুশাসনের ইহাই একটি নিগূঢ় তত্ত্ব। যে ডেপুটিরা বিশ্বাস করেন যে, কেবল বেত পিটিলে ও মেয়াদ দিলে শাসন হয়, তাঁহারা এই উপাখ্যান পাঠ করিয়া মতপরিবর্ত্তন করিবেন কি? জেফ্রি সাহেব "জন্মা-যুদ্ধের" সংবাদ পাইয়া, মহাব্যস্ত হইয়া আমার কাছে রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন। তিনি আমাকে পরে বলিয়াছিলেন যে, আমার রিপোর্ট পাইয়া তিনি যেরূপ হাসিয়াছিলেন, এরূপ আর কখনও হাসেন নাই।

পুত্রশোক

শ্রীক্ষেত্রে আমার প্রথমপুত্র জন্মিয়াছিল। আমার বিবাহ হয় ইংরাজী ১৮৬৫ সালে এবং প্রথম সন্তান হয় ১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিমাসে। সমুদ্রতীরে বালির উপর জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলাম 'নীরেন্দ্র'। চট্টগ্রামের ষড়্যন্ত্রকারীদের কৃপায় এবং গবর্ণমেন্টের অনুগ্রহে আমাকে যে চাঁদবালি হইতে শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত ১২০ মাইল পথ ডাকের পাল্কিতে যাইতে হইয়াছিল, তাহার ফলে, এবং হতভাগ্য নিবারণের মৃত্যুতে স্ত্রী যে হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহার ফলে শিশুর যকৃৎ জন্মাবধি ভাল কার্য্য করিত না। শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রের বাতাস শিশুদের পক্ষে বড়ই উপকারী। সেজন্য শ্রীক্ষেত্রে থাকিতে তাহা বড় অনুভব করি নাই। কলিকাতা হইয়া মাদারিপুর আসিতে আমার বয়োজ্যেষ্ঠ খুড়তত ভাই অখিলবাবু তাহা টের পাইয়া আমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। প্রথম সন্তান। কি স্ত্রী, কি আমি, সন্তান পালন সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। তাহার পালনের ভার সম্যক্‌রূপে আমার শাশুড়ীর হস্তে ছিল। তিনি অবশ্য তাহার যথেষ্ট যত্ন করিতেন, কিন্তু দিনরাত্রি ভাবিতেন—তাঁহার বাড়ী হইল না, তাঁহার পুত্রের বিবাহ হইল না, ইত্যাদি। শিশু দেখিতে এত বৃহৎ ও বলিষ্ঠ ছিল যে, ফরিদপুরের পুলিস সাহেব তাহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার দশমাসের শিশু তাঁহার আড়াই বৎসরের শিশু অপেক্ষা বড়। দশমাসের শিশু কাহারও কোলে থাকিতে চাহিত না। আপনি হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে ভালবাসিত, এবং গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে চেষ্টা করিত। আমি লিখিতে বসিয়াছি, সে চুপে চুপে আসিয়া আমার চেয়ারের পশ্চাৎ দিক্ ধরিয়া দাঁড়াইত। আমি টের পাইয়া ফিরিয়া দেখিলে সে ঈষৎ হাসিয়া —সে হাসি যেন স্বর্গের জ্যোতিঃ—অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িত। আমার সাড়া পাইলে, শিস্ শুনিলে, সে যেখানে থাকুক, সেখান হইতে ছুটিয়া আসিত, এবং যতক্ষণ আমি গৃহে থাকিতাম আমার নিকটে থাকিয়া, আমাকে কাজে বিব্রত দেখিলে খেলা করিত। অন্যথা আমার কোলে উঠিয়া বসিত। তাহার আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়ই বড় গম্ভীর ছিল। একটুক ঠোঁট ফাঁক করিয়া ঈষৎ হাসিত। কিছু ধরিতে যাইতেছে, কি কিছু মুখে দিতে যাইতেছে, আমি "খোকা, কি কচ্ছিস্?"—বলিলে অপ্রতিভ হইয়া মুখ হেট্ করিত। সমস্তদিন কোনও সাড়া শব্দ নাই, খেলিয়া বেড়াইতেছে; কেবল শেষরাত্রিতে চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিত এবং বাহ্যেকরিতে অত্যন্ত বেগদিত। তাহাতে প্রত্যহ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইত। শাশুড়ীকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"তোমার ছেলে এমন সেয়ানা, শীতকালে একটুক শৌচের জল লাগিলে কাঁদিয়া উঠে।" আমি কিছুই বুঝিতাম না। তাহার অত্যন্ত ক্ষুধা ছিল। স্ত্রী মাদারিপুর যাইবার পথেই পীড়িত হইয়া পড়েন। অতএব ডাক্তার তাঁহার স্তন্য-পান শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অতএব মাতৃস্তন্য তাহাকে বড় বেশী দেওয়া হইত না। তাহাতে তাহার জন্মাবধি উদরপূর্ত্তিও হইত না। সে তাহাছাড়া

বোতলকে বোতল 'ফিডিং বটল' ভরা দুধ খাইত। শেষ রাত্রিতেও ক্ষুধায় কাঁদিত বলিয়া শাশুড়ী দুধ রাখিয়া দিতেন এবং এই বাসিদুধে তাহার যকৃৎ দিনদিন রুগ্ন হইয়া পড়ে। আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলেই শাশুড়ী উপরোক্ত উত্তর দিয়া আমাকে নীরব করিতেন।

আগষ্টমাসে মাদারিপুরের কার্য্যভার গ্রহণ করি। কমিশনর পিকক্ ও মাজিষ্ট্রেট জেঙ্কি, উভয়েই কোটালিপাড়ার শোচনীয় অবস্থা বলিয়াছিলেন। অতএব নভেম্বরমাসে মফঃস্বলে বাহির হইতেই প্রথম কোটালিপাড়া গেলাম। কোটালিপাড়া থানায় যাইতে "বাঘিয়া" নামক একটি প্রকাণ্ড "বিল" পার হইতে হয়। স্মরণ হয়, উহা প্রায় একপ্রহরের পাড়ি। বিলের উপর দাম হইয়া, তাহার উপর গরু মহিষ চরিতেছে। এমন কি, স্থানেস্থানে গাছ উঠিয়াছে, গ্রাম পর্য্যন্ত বসিয়াছে। একটাখাল সেই বিল ভেদকরিয়া গিয়াছে। তাহাদিয়া নৌকা যাতায়াত করে। তাহার জল দুর্গন্ধ ও বর্ণ দোয়াতের কালি। কোটালিপাড়ার একজন মোক্তার বলিল যে, বিলের মধ্য দিয়া আর একটা খাল আছে, তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলে আমি যে খালে গিয়াছি, তাহা অপেক্ষা সোজা রাস্তা হইবে, এবং লোকের ও বাণিজ্যের অশেষ সুবিধা হইবে। আমি এরূপ কাজই চাহি। ফিরিবার সময় প্রাতে তাঁহার সঙ্গে ছপ্পরশূন্য একখানি ছোট ডিঙ্গিতে উঠিলাম এবং সমস্ত প্রাতঃকালটা সেই ডিঙ্গিতে রৌদ্রে ঘুরিতে ঘুরিতে দ্বিপ্রহর সময়ে বিলের মধ্যে একস্থলে আমার নৌকাতে গিয়া উঠিলাম। ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছিলেন, সেস্থানে আমার বজরা গিয়া থাকিলে তিনি দুইঘণ্টার মধ্যে আমাকে সেখানেগিয়া তুলিয়া দিবেন। পঁহুছিলাম প্রায় ছয়ঘণ্টা পরে। বলা বাহুল্য, তাঁহার কথাতে খাল সম্বন্ধেও সেরূপ সত্য পাই নাই। নৌকাতে উঠিয়া শরীর কেমন অসুস্থ অসুস্থ বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যা হইলে নৌকার ছাদে উঠিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম এবং দ্বিতীয়প্রহর রাত্রিতে মাদারিপুরে পোঁছিয়া দেখিলাম, স্ত্রী জ্বরে প্রায় অচেতন। শিশুপুত্র সেইরূপ রোদন করিতেছে। উত্তরও সেইরূপ পাইলাম। স্ত্রী চেতনা পাইয়া বলিলেন যে,তাঁহার স্তনে দুধ মাত্র নাই। শিশু কি খাইবে? তাই কাঁদে। একজন দুগ্ধধাত্রী চেষ্টা করা উচিত। কিছু খাইবার প্রবৃত্তি আমার হইল না। শুইলাম, ভাল নিদ্রা হইল না। প্রভাতে অতিরিক্ত ডেপুটি, ডাক্তার ও ইন্‌স্‌পেক্টার আসিয়া ডাকিতেছেন। আমি শয্যা হইতে উঠিয়া যাইতে অমনি ঘুরিয়া গিয়া দেয়ালের উপর পড়িলাম। আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন ঘোরতর ভূমিকম্প হইতেছে এবং কানে ঘোরতর ঝটিকার শব্দ শুনা যাইতেছে। আমি অতি কষ্টে 'হলে' গেলাম এবং তাঁহাদিগকে আমার অবস্থার কথা বলিলাম। তাঁহারা হাসিলেন, ডেপুটিবাবু বলিলেন —কোটালিপাড়ার ভূতে আমাকে পাইয়াছে। ডাক্তার বলিলেন—অম্বল, একটুক সোডা খাইলেই সারিবে। সারা দূরে থাকুক, তাহার উপর একরূপ মন্দ মন্দ জ্বর হইয়া আমি মাদারিপুরে সমস্ত অবস্থানকাল এরূপ পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, সকলপ্রকার চিকিৎসা—এলোপথী, শাস্ত্রপথী, হৈমপথী, সকলই জবাব দিয়াছিলেন। প্রায় কোর্টে যাইতে পারিতাম না। বাড়ীতে বসিয়া কোর্ট করিতাম, এবং এরূপ শয্যাশায়ী অবস্থাতেই আমি সেই ভয়ানক স্থান মাদারিপুর লৌহ-হস্তে শাসন করিয়াছিলাম।

একদিন প্রাতে কাজ শেষকরিয়া স্নানকক্ষে যাইতেছি, বারাণ্ডায় শিশুর বাহ্যে দেখিলাম ভয়ানক বিকৃত। তাহাকে কোলে তুলিয়া দেখিলাম, তাহার উদর কেমন শক্ত শক্ত লাগিতেছে। ডাক্তারকে ডাকাইলাম। তিনি বরাবর শিশুকে দেখিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কোটালিপাড়া থাকিতে তিনি টের পাইয়াছেন যে, তাহার যকৃতে রোগ হইয়াছে। তাহার ঔষধ দিতেছেন। ভয় নাই। শাশুড়ী তখনও বলিলেন,—"কিছুই না। ছেলেপিলের এরূপ হইয়া থাকে।" কিন্তু ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে মাদারিপুরের একজন বিখ্যাত কবিরাজ এক মোকদ্দমায় সাক্ষী দিতে আসিয়াছিলেন। ঘরে কোর্ট করিতেছি। শিশু কাছে খেলিতেছিল।

তাহাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ শিশু কি আপনার? ইঁহার কোনও অসুখ আছে কি?" আমি বলিয়াছিলাম—না। সে বলিয়াছিল—"না থাকিলেই ভাল।" ডাক্তারের চিকিৎসায় শিশুর দিনদিন অবস্থা খারাপ হইতেছে দেখিয়া এবং সেই কবিরাজের কথা স্মরণ করিয়া আমার বড় সন্দেহ হইল। আমি তাহাকে ডাকাইলাম। সে বলিল যে, সে যখন দেখিয়াছিল, তখনই শিশুর যকৃৎরোগের বর্দ্ধিত অবস্থা। উহা এখন একপ্রকার দুরারোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কবিরাজ জাতিতে নাপিত। তাহার শাস্ত্রজ্ঞান কিছুই নাই। কিন্তু ৭০ বৎসরের উপর বয়স। আজীবন চিকিৎসক। এবং সর্বাভিভসনে তাহার অসাধারণ প্রতিপত্তি। নেটিব ডাক্তার পর্য্যন্ত চিকিৎসার ভার তাহার হস্তে দিতে বলিলেন। সে বড় অনিচ্ছায় সম্মত হইল এবং পিতা পুত্র উভয়েরই চিকিৎসা করিতে লাগিল। তাহার চিকিৎসায় আমার এককর্ণ হইতে সেই ঝটিকানাদ দূরীভূত হইল, এবং মস্তক ঘূর্ণনেরও অনেক উপশম হইল। শিশুরও কিছু উপশম হইল। আমরা উভয়ে এরূপ পীড়িত শুনিয়া, বহুকষ্টে চট্টগ্রাম হইতে আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু স্বনামখ্যাত কবিরাজ তারাচরণ আসিয়াছিলেন। তিনিও বলিলেন যে, প্রাচীন চিকিৎসক ভাল চিকিৎসা করিতেছে। তিনি তাহার উপর হাত দিবেন না।

একদিন প্রাতে আমি গৃহের আফিসকক্ষে বসিয়া আছি। কবিরাজ তারাচরণও বসিয়া আছেন। সেই বৃদ্ধ কবিরাজ শিশুকে দেখিয়া আসিয়া আমাকে বড় আনন্দের সহিত বলিল—"কর্ত্তা! আর ভয় নাই। শিশুর অবস্থা আজ খুব ভাল। রোগ এখন আমার মুঠের ভিতর।" সংবাদ শুনিয়া তারাচরণ গিয়াও দেখিয়া আসিয়া, তাহার কথা সমর্থন করিলেন। আমাদের সকলের আর আনন্দের সীমা নাই। হা হত বিধাতঃ! কবিরাজেরা বুঝিতে পারেন নাই, শিশুর অবস্থার এ উন্নতি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের সমধিক প্রোজ্জ্বলতা মাত্র। বহুদিন পরে আমার রুগ্ন শরীরেও যেন নূতন জীবন সঞ্চারিত হইল। বড় আনন্দে আমি ও তারাচরণ একসঙ্গে আহার করিতে বসিলাম। পার্শ্বে শিশুর দোলা। সে নিদ্রা যাইতেছিল। সে আমার কণ্ঠশব্দ শুনিয়াই জাগিয়া দোলায় উঠিয়া বসিল এবং আমার দিকে চাহিয়া কেমন কাতর ঈষৎ হাসি হাসিল। আমি আদর করিয়া "খোকা" বলিয়া ডাকিলে সে আমার কাছে আসিতে দুই ক্ষুদ্রবাহু প্রসারিত করিল। আমি বলিলাম—"তারা! তাহাকে দুটো ভাত দিব কি?" তারাচরণ বলিলেন—"আজ ভাল আছে; দেও।" এত রোগেও সে এখনও এরূপ সবল যে, দোলার দাঁড় ধরিয়া উঠিয়া লাফাইয়া পড়িতে যাইতেছে। তারাচরণ বলিলেন—"বা! খোকা!" আমাকে বলিলেন—"ওর শরীরে এখনও বেশ সামর্থ্য আছে। কোনও ভয় নাই।" স্ত্রী দোলা হইতে তুলিয়া তাহাকে আমার কোলে দিলেন। আমার প্রথম সন্তানকে—সেই সোণার পুতুলকে আমি এই জীবনের মত শেষবার কোলে লইলাম। আমি তাহার মুখে ভাত দিতে যাইতেছি—সে মুখ খুলিয়াছে—অমনি দাঁতের গোড়ায় রক্ত দেখিয়া বলিলাম—"তারা! তাহার দাঁতের গোড়ায় রক্ত দেখা যাইতেছে কেন?" "কি! রক্ত দেখা যাইতেছে"—বলিয়া তারাচরণ চমকিয়া উঠিলেন। শিশু অমনি তাহার অনিন্দ্যসুন্দর ঈষৎ হাসিযুক্ত ক্ষুদ্র মুখখানি আমার বক্ষের উপর হেলাইয়া ফেলিল। বাছা আমার আর সে মুখ তুলিল না। "ও মা! খোকার এমন করিয়া মাথা হেলিয়া পড়িল কেন"—স্ত্রী চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি তাহাকে পাগলিনীর মত কোলে লইলেন। আমার বলিষ্ঠ শিশু নীরেন এ জীবনের জন্য মহাপাপী আমার বুক শূন্য করিয়া আমার অঙ্কচ্যুত হইল। তাহারপর আর কি হইল, আমার স্মরণ নাই। আমার যখন চৈতন্য হইল—বেলা প্রায় ৪টা। গৃহ লোকে ও রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ। স্ত্রী উন্মাদিনীর মত আমাকে ডাকিতেছেন এবং বলিতেছেন—"ওরে! আমার নীরেনকে আমার কোল থেকে কেড়ে নেয়! ওরে হতভাগ্য! একবার জন্মের মত দেখে যাও।" তারাচরণ আমাকে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"একবার এ দিকে আইস।" তিনি আমাকে হলে লইয়া ধরিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুইজনের অশ্রু ধারায় বহিতে লাগিল।

সম্মুখে শিশু যেন মায়ের অঙ্কে সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পশ্চিমের অস্তাবলম্বী সূর্য্যকিরণে তাহার সেই নিদ্রিত কুসুমনিভ মূর্ত্তি অলৌকিক প্রভায় আলোকিত করিয়া স্ত্রীর অঙ্কে যেন সুবর্ণ-জ্যোতিঃ বর্ষণ করিতেছে। সেই অপার্থিব আলোকে যেন আমার হৃদয়ের অন্তস্তলে সেই মৃত শিশু শায়িত পত্নীর অংক চিত্রিত করিয়া দিল। সাতাইশবৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজও সেইচিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আজ দরবিগলিত এই অশ্রুধারার মধ্যেও সেইচিত্র প্রত্যক্ষ করিতেছি। মুহূর্ত্তমাত্র আমার প্রথম শিশুকে এ পৃথিবীতে শেষদেখা দেখিলাম। তারাচরণ আমায় ধরিয়া আফিসকক্ষে লইয়া গেলেন। আমি আবার অচেতন হইয়া পড়িলাম। পরে শুনিলাম, আমার ছোটভাই বালক প্রাণকুমার অচেতনপ্রায় স্ত্রীর অংক হইতে মৃত শিশুকে কাড়িয়া লইয়া তাহাকে সমাধিস্থ করে। তাহার সমাধির উপর আমি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলাম— "বাছা রে! যন্ত্রণা তোর করিলি নির্ব্বাণ,

জ্বালি পিতা মাতা বুকে চিতা অনির্ব্বাণ!"

সে অনির্ব্বাণ চিতা ২৭ বৎসর সমান ভাবে জ্বলিয়াছে। ২৭ বৎসর তাহাতে এরূপে অশ্রু বর্ষণ করিয়াছি। কই, নিবে নাই, জীবন থাকিতে নিবিবে না। সমাধিতে লইবার সময় একজন ভৃত্য তাহার এক হাতের একটা সোণার বালা খুলিয়া লইয়াছিল। শোকে পাগলপ্রায় শিশুভ্রাতা তাহার অন্যহাতের বালা খুলিতে দিল না। উহা তাহার সঙ্গে সমাধিতে গিয়াছে। সেই বালার বিশদ সুবর্ণবর্ণের সঙ্গে শিশুর বর্ণ মিশিয়া যাইত। মানব-জীবন এমনই প্রহেলিকা যে, ধাতুময় বালাটা এখনও আছে—উহাই আমার প্রাণাধিক "নীরেনে"র পৃথিবীতে একমাত্র চিহ্ন—আর সেই বালা যাহার, সেই নন্দন-প্রসূন—সে কোথায়? না, আর কাঁদিব না। সে আমার স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতার অঙ্কে ত্রিদিবে রক্ষিত হইয়াছে। এত পবিত্র, এত সুন্দর, এমন শিশু এই কর্কশ পৃথিবীতে থাকিতে পারে না। শাস্ত্রকার এরূপ শিশুর সমাধির ব্যবস্থা করিয়া উচিত কার্য্য করিয়াছেন। এরূপ শিশুও যোগী, এতঅল্প সময় তাহারা এ পাপপূর্ণ পৃথিবীতে থাকে যে, শ্রীভগবানের সঙ্গে তাহাদের বিয়োগ হইতে পারে না। ইহারা যোগভ্রষ্ট। যোগপূর্ণ করিতে বুঝি কয়েকদিবসের জন্য এ পাপ-পূর্ণ পৃথিবীতে আসিয়া, কর্ম্মফলের ছায়া কাটাইয়া যায়। কেন আসে, কেন যায়, হা ভগবান্! তুমিই জান। তোমার লীলা আমি ক্ষুদ্র জীব কি বুঝিব?—

—"ওই সর্ব্ব-শোক-নিবারণ
দাঁড়াইয়া নারায়ণ শান্তি-প্রস্রবণ!
শান্তির ত্রিদিব বুকে, পুত্রে সমর্পিয়া সুখে,
করি আমাদের শোক চরণে অর্পণ,
গাব কৃষ্ণনাম সুখে জুড়াব জীবন।"

দাসত্ব-রাক্ষসি! হৃদয়ের রক্ত-মাংসে নির্ম্মিত তিনটি স্নেহপুতুল তুই এরূপে হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইয়া গ্রাস করিয়াছিস্!

"একে একে ভেসে গেল স্নেহের পুতুল।
দূর "সুরনদ" তীরে,
নিদ্রা যায় একটি রে!
দ্বিতীয় আমার সেই দুঃখ-"নিবারণ—"
নিদ্রা যায় 'স্বর্গ-দ্বারে',
অনন্ত জলধিপারে!
সেই তীর-জাত ক্ষুদ্র "নীরেন্দ্র"-প্রসূন
পদ্মায় ভাসিয়া গেল পবিত্র কুসুম!"

আজ এই রাক্ষসীর রজতপাশ কাটিতে বসিয়াছি নারায়ণ! হৃদয়ে বল দেও। ক্ষণস্থায়ী নির্ব্বাণোন্মুখ অবশিষ্ট জীবন তোমার লীলাধ্যান করিয়া কাটাইতে দেও।

অপূর্ব্ব বিবাহ

জগৎ বড় নিষ্ঠুর। জাগতিক যন্ত্রও বুঝি লৌহ-যন্ত্রের মত হৃদয়শূন্য। তুমি শোকে বজ্রাহত। কিন্তু তোমার জন্য জগতের কিছুই বসিয়া থাকিবে না। যে সন্ধ্যায় আমার শিশুটিকে হারাইলাম, সে নিশি পূর্ণিমা। আমার গৃহে ক্ষুদ্র আলোকটি নিবিয়া গিয়াছে। গৃহ অন্ধকার। কিন্তু সেই সন্ধ্যায় যে চন্দ্র উঠিল, বুঝি এতবড় চন্দ্র কখনও উঠে নাই। পরদিন প্রাতে যে সূর্য্য উঠিল, এমন উজ্জ্বল রবিও বুঝি কখনও উঠে নাই। বুঝি আমার হৃদয় ঘোর কালিমাময় ছিল বলিয়া তুলনায় জগতের সকলই দ্বিগুণ উজ্জ্বল বোধ হইতেছিল। শুধু জাগতিক কার্য্য বলিয়া নহে, মানবিক কোনকার্য্যও আমার জন্য বন্ধ রহিল না। বাণবিদ্ধ কপোতের মত ছট্‌ফট্‌ করিয়া তিনদিন কাটাইলাম। চতুর্থদিন কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টার আসিয়া বলিল, একটা গুরুতর পুলিসের মোকদ্দমা আসিয়াছে। এত গুরুতর যে, অতিরিক্ত ডেপুটিবাবু তাহা নিজে না করিয়া আমার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন। আর মুলতবি রাখিলে মোকদ্দমা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। বন্ধুরাও বলিলেন—কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে শোকের তীব্রতা উপশমিত হইবে। অশ্রুজল মুছিয়া, হৃদয়ের ক্ষত চাপিয়া রাখিয়া, গৃহের আফিস-কক্ষে সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিলাম। সম্মুখে একটি অসামান্য রূপসী, চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা উপস্থিত হইল। সে কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যা। সেই বাদিনী। তাহার অভিযোগ—সে তাহার কনিষ্ঠাভগিনীর সঙ্গে তাহাদের কুটীরের সম্মুখে প্রাতে উঠানেবসিয়া লেখাপড়া করিতেছিল। এমনসময়ে বিবাদী ৫০ জন লাঠিয়াল সহ তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। বিবাদী সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণ হইলেও অকুলীন এবং তাহার বয়স ৬০ বৎসরের কাছাকাছি। সে নবযুবতীর রূপে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহকরিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বাদিনীর পিতা নিতান্ত দরিদ্র-ব্রাহ্মণ হইলেও উপরোক্ত কারণে বিবাহে অসম্মত হইয়াছিল। বৃদ্ধব্রাহ্মণ তাহাতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। চিল যেরূপ পায়রার শাবক লইয়াযায়, সে ৫০ জন লাঠিয়ালের দ্বারা তাহাকে বলপূর্ব্বক অনুমান ১০ মাইল পথ লইয়া-গিয়া, একেবারে বিবাহ-বেদীতে উপস্থিত করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ বিবাহের মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলে চতুরা ও প্রখরা বালিকা অবগুণ্ঠন ফেলিয়াদিয়া সমবেত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনারা কাহার সঙ্গে আমার বিবাহ করাইতেছেন? চাটুয্যা (বিবাদী) আমার ধর্ম্মতঃ পিতা।" ব্রাহ্মণগণ তখন "রাম! রাম!" বলিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বিবাহও সেখানে শেষ হইল। তখন বালিকা বিবাদীর নীলকণ্ঠের বিষ হইয়া পড়িল। এ চতুরাকে রাখা অসাধ্য। ছাড়িয়া দিলেও বিপদ্‌। তাহাকে ৭ দিবস যাবৎ নীলকুঠীর কয়েদির মত স্থানেস্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এবং বহু অর্থের, বহু সুখের প্রলোভন দেখাইয়াছিল। কিন্তু গর্ব্বিতা বালিকা তাহা তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়াছিল। তাহার পিতা পুলিস নালিশ করিলে, পুলিসকে হাত করিয়া, বিবাদী একরাত্রিতে তাহাকে একটা মাঠের মাঝে ব্যাঘ্র-গ্রাস-ভ্রষ্ট শিকারের মত রাখিয়া যায় এবং সঙ্কেতমতে পুলিস তাহাকে সেখানে পায়।

ঘটনা-বাহুল্যপূর্ণ তাহার এজাহার লিখিতেই সমস্তদিন গেল। সে ত এজাহার দিতেছিল না, একটি দলিতফণা ফণিনী যেন ক্ষোভে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বিষ উদ্‌গিরণ করিতেছিল। তাহার দুই আরক্ত-আয়তনয়ন হইতে অনর্গল বারিধারা পড়িতেছিল। এবং সে বারিপূর্ণ বিশাল নয়ন হইতে যেন বিদ্যুৎ ছুটিতেছিল। সমস্ত কক্ষ নীরব। আমলা, উকিল, মোক্তার তাহার অদ্ভুত উপাখ্যান, গর্ব্বিত ভাব ও তেজস্বিনী বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিল। বালিকা এজাহার শেষকরিয়া বলিল যে, পুলিস যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, উহা তাহার মোকদ্দমাই নহে এবং যে সাক্ষী আসিয়াছে, তাহা তাহার সাক্ষীও নহে। ধনী ব্রাহ্মণ বিবাদীর কাছে বিশেষ দক্ষিণা পাইয়া, একটা মোকদ্দমা গড়িয়া উপস্থিত করিয়াছে। যদি আমি নিজে তদন্ত করিতে যাই, কিম্বা বিশ্বাসী একজন পুলিস

ইন্‌স্‌পেক্টার পাঠাই, তাহাকে যে পথে লইয়া গিয়াছিল, যে যে স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সে সকলেরই চিহ্ন রাখিয়াছে, সকলই দেখাইয়া দিতে পারিবে। এবং তাহার সকল কথা প্রমাণ করিতে পারিবে। আমারদিকে তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আপনার শাসনে বাঘেছাগলে একঘাটে জল খাইতেছে। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যা, আমার প্রতি যে এরূপ ঘোরতর অত্যাচার হইয়াছে, তাহার কি বিচার হইবে না? আপনি পুত্রশোকাতুর না হইলে, ব্রাহ্মণ-কন্যা হইয়াও আপনার পায়ে পড়িয়া, আপনাকে তদন্তে লইয়া যাইতাম।"

আমি মহাসঙ্কটে পড়িলাম। একদিকে পুত্রশোক, অন্যদিকে এ ঘোরতর অত্যাচার। পুলিসের সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াও বুঝিলাম, বালিকার আশঙ্কা অমূলক নহে। যাহাতে বিবাদী অনায়াসে অব্যাহিত পায়, পুলিস কিছু গুরুতররূপে দক্ষিণা গ্রহণকরিয়া এভাবেই মোকদ্দমাটা চালান দিয়াছে। কেবল বালিকার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ও তেজস্বিতার ভয়েই যেন চালান দিয়াছে, এবং যাহা তাহাকে শিক্ষা দিয়াছে, তাহার যেন ব্যতিক্রম না করে, তৎসম্বন্ধে তাহাকে খুব শাসাইয়া দিয়াছে। বালিকা সে সকল কথা পুলিসের মুখের উপর ক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিল। ভালমন্দ কিছু না বলিয়া, মোকদ্দমাটি পরদিবসের জন্য স্থগিত রাখিয়া, সন্ধ্যারপর দ্বিতীয় ডেপুটিবাবুকে উহার তদন্তে যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন যে, যাইতে তাঁহার আপত্তি নাই, কিন্তু তিনি গেলে কিছুই করিতে পারিবেন না। আমি নিজে না গেলে কিছুই হইবে না। আমি একখানি বজরা নৌকা নিজ হইতে মাসহিসাবে ভাড়া করিয়া মাদারিপুর ঘাটে বাঁধা রাখিতাম। আমার মাদারিপুরে শাসনের এই নৌকাটি প্রধান সহায় ছিল। কোনও মোকদ্দমার তদন্তে সন্দেহ হইলে, কোনও আসন্ন ঘটনার সংবাদ পাইলে, আমি আমার আবকারীর পেয়াদা কালাচাঁদকে বলিলে—সে নিজে একজন দক্ষ-মাঝি—সে মাল্লা জোটাইয়া আনিত, এবং আমি অজ্ঞাতভাবে রাত্রিতে রওনা হইয়া ঘটনার স্থানে গিয়া অকস্মাৎ উপস্থিত হইতাম। ইহার দ্বারা অনেক পুলিস-তদন্তের রসভঙ্গ হইত এবং এরূপে অনেক গুরুতর ঘটনা অঙ্কুরে নিবারিত হইত। রাত্রি ৯টার সময় আমার একজন আরদালি পাঠাইয়া বালিকাকে ও তাহার পিতাকে আনাইলাম এবং তাহাদিগকে নৌকাতে উঠিতে বলিলাম। ব্রাহ্মণ তাহার কুলীনত্বের একদীর্ঘ কাহিনী আরম্ভ করিল। কিন্তু প্রখরবুদ্ধি বালিকা তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিল—"তুমি কেন এরূপ করিতেছ? হাকিমের সঙ্গে যাইব, তাহাতে ভয় কি?" তখন পিতা কন্যা নৌকায় উঠিল। তাহাদের বৈঠককামরায় শুইতে বলিয়া আমি শয়নকক্ষে শুইতে গেলাম। নৌকা খুলিয়া উত্তরমুখে যাইতে মাঝিকে হুকুম দিলাম। আমি কোথায় যাইব, মাঝিকেও বলিতাম না। মাদারিপুর ছাড়িয়া গেলে, বালিকাকে কুমারনদীর যেঘাটে পার করিয়া লইয়াছিল, সেইঘাটে নৌকা রাখিতে বলিলাম। তখন বালিকা তাহার বাপকে চুপে চুপে বলিতে লাগিল—"কেমন, দেখিলে, হাকিম এ পুত্রশোক বুকে লইয়া আমার মোকদ্দমার তদন্ত করিতে চলিয়াছেন।" সে কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ আমাকে লম্বা-চওড়া আশীর্ব্বাদ করিল। তাহারপর তাহারা নিদ্রা গেল। আমার সমস্তরাত্রি নিদ্রা হইল না; অশ্রুজলে উপাধান সিক্ত করিলাম। প্রভাতে সেইঘাটে পঁহুছিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল—সেইঘাট পার করিয়া তাহাকে লইয়াছিল। সে বলিল—"অদূরে একটা কালীবাড়ী আছে। চাটুয্যা সেখানে আমার পাল্কী রাখিয়া, কালীর কাছে গলবস্ত্র হইয়া, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইলে জোড়ামহিষ দিয়া পূজা মানস করিয়াছিল। আপনি আসুন, আমি আপনাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছি।" আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে যথার্থই একটা কালীবাড়ীতে লইয়া উপস্থিত করিল। তাহারপর তাহাকে কোন্‌দিকে লইয়াছিল, তাহা লক্ষ্যকরিয়া একটা গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইল। এক এক বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং সে বাড়ী নহে বলিয়া আর এক বাড়ীতে আমাকে লইয়া যাইতে লাগিল। একটা বাড়ী শেষে

চিহ্নিত করিলে দেখিলাম, সমস্ত পুরুষ পলায়ন করিয়াছে। একটা বৃদ্ধা মাত্র আছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে সকল কথা অস্বীকার করিল। তখন বালিকা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমাদের ছোট বৌ যে আমাকে ঐ জায়গায় স্নান করাইয়া দিয়াছিল—সে কোথায়?" বৃদ্ধা তাহার চতুরতা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, সে তাহার বাপের বাড়ী গিয়াছে। তখন বালিকা বলিল—"তুমি আমাকে না বলিয়াছিলে—'বাছা! কেন কাঁদিতেছ, রাজরাণীর মত পরম সুখে থাকিবে।' আর এখন হাকিমের কাছে বুড়া হইয়া মিথ্যা কথা বলিতেছ যে, আমাকে দেখ নাই?" তখন বুড়ী কাঁদিয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"বাবা! গুরু ও জমিদার আসিয়াছিল। তাই জায়গা না দিয়া পারি নাই। তুমি আমার নির্দ্দোষী ছেলেদের রক্ষা কর।" আমি রক্ষা করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলে, বুড়ী আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা জবানবন্দী দিল। পরে পুত্রেরা আসিয়াও সাক্ষ্য দিল।

বালিকা তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছিল যে, এক বাড়ীতে একটি বউ তাহাকে বলিয়াছিল, বিবাদী তাহাকে আর লুকাইয়া না রাখিয়া একেবারে কাশী পাঠাইয়া দিবে। বালিকা তাহাতে ভীত না হইয়া বলিয়াছিল যে, তাহার শরীর কাশী পাঠাইলে তাহার মন ত বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। সে লেখাপড়া জানে, সে হাকিমের কাছে পত্র লিখিয়া সংবাদ দিবে। তাহাতে বউটি তাহার কলিকাতাবাসী স্বামীর একখানিপত্র আনিয়া পড়িতে দিলে বালিকা বলিয়াছিল—"বউ! আমি আজ কয়দিন পর্য্যন্ত কিছুই খাই নাই। আমার মন বড় অস্থির। আমি যাইবার সময় তোমার পত্র পড়িয়া দিয়া যাইব।" আমি তাহা শুনিয়া, বালিকা কি লেখাপড়া জানে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিয়াছিল যে, লেখাপড়া জানে না। কেবল অক্ষর লিখিতে শিখিতেছিল। তবে লেখাপড়া জানি বলিলে যদি ভয়েতে আসামীরা তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, সেজন্য মিথ্যাকথা বলিয়াছিল। সে আরও বলিয়াছিল যে, সেই পত্রখানি যে সেই বাড়ীর বেড়াতে গুঁজিয়া রাখিয়াছে। সেই বাড়ীতে সে আমাকে লইয়া গেল। যখন বাড়ীর লোকেরা সকলকথা অস্বীকার করিল, তখন বালিকা চুপে চুপে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে ডাকিল, এবং আমি গেলে আমাকে সে পত্রখানি বেড়া হইতে আনিয়া দিল। তখন বাড়ীর লোকেরা অপ্রতিভ হইয়া সকলকথা স্বীকার করিল। কোন্ কোন্ গ্রামে গিয়া কোন্ বাড়ীতে তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, রাত্রিতে আসা যাওয়ার দরুন বাহির হইতে চিনিতে না পারিয়া, সে কখন বা ভিখারিণী, কখন বা বৈরাগিণী বলিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিয়া আমাকে নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে লইয়া গেল। সর্ব্বশেষে একগ্রামে যাইতে যাইতে পথে বলিল—"আমার জবানবন্দীতে যে বলিয়াছি এক বাড়ীতে একটা পশ্চিম (কলিকাতা) অঞ্চলের স্ত্রীলোক আছে, এটা সেইগ্রাম।" গ্রামে প্রবেশ করিয়া, এরূপ কোনও স্ত্রীলোক কোনও বাড়ীতে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে গ্রামবাসীরা আমাকে একটা বাড়ী দেখাইয়া দিল। তাহার সম্মুখে আমরা দলে বলে উপস্থিত হইলে মুক্তকেশী ঘোরারাবা, মহারৌদ্রী, তাড়কা রাক্ষসীমূর্ত্তি বহির্গত হইল। তাহার হস্তে একপ্রকাণ্ড ঝাঁটা। তাহাকে দেখিবামাত্র বালিকা ভীতা হইয়া, আমার কাছে আসিয়া সভয়ে বলিল—"এই সেই পশ্চিমা মাগী।" অমনি সে গর্জ্জন করিয়া বলিল—"কে রে মাগি তুই, যে, পশ্চিমা মাগীকে দেখাইয়া দিতে আসিয়াছিস্। আয় দেখি, একবার বুকের পাটাটা এই ঝাঁটার চোটে দেখি। "কনষ্টেবলেরা গর্জ্জিয়া বলিল—"মাগি! মুখ সাম্‌লে কথা বলিস্। সম্মুখে হাকিম!" সে তখন—"রেখে দে তোর হাকিম! কত হাকিম আমি দেখেছি"—বলিয়া কলিকাতা অঞ্চলের অভিধানবহির্ভূত গালিরাশি বর্ষণ করিতে করিতে তাহার শতমুখী মহাস্ত্র যেরূপ আন্দোলিত করিতে লাগিল, তাহাতে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল, এবং সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাড়কা এরূপ দন্তঘর্ষণ করিয়া তাহার কোটরস্থ রক্তবর্ণ চক্ষুদ্বয় ঘুরাইতেছে, যেন সে সত্যসত্যই বালিকার রক্তপান করিবে। আমি তখন গর্জ্জন করিয়া, তাহার চুলে ধরিয়া টানিয়া, তাহাকে একেবারে

আমার নৌকার কাছে লইয়া যাইতে আদেশ করিলাম। সে কনষ্টেবল দুজনের সঙ্গে এক পালা যুদ্ধ করিয়া, কেশধৃতা হইয়া এবং আরও উচ্চাঙ্গের গালি বর্ষণকরিয়া ও লাট বেলাট দেবতা অপদেবতাদের দোহাই দিয়া রঙ্গভূমি হইতে অপসৃতা হইল। শুনিলাম যে, নিজেও অপদেবতার স্বরূপ বহুদিন হইল, গৃহস্বামীর সঙ্গে কলিকাতা হইতে এইগ্রামে আবির্ভূতা হইয়াছে। এ রৌদ্র-রসের অভিনয়ের ফলে বাড়ীর লোকরা সকলেই বালিকার কথামত সাক্ষী দিল। তদন্ত শেষকরিয়া আমিও মধ্যাহ্নে নৌকায় ফিরিলাম। তখন তাড়কার আর সেই "ঝগড়ার ঝড়ের আকার" নাই। এখন শান্তমূর্ত্তি। আমার পায়ে পড়িয়া, চক্ষু অন্য রকমে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ক্ষমা চাহিল, এবং বালিকাকে কত স্নেহসম্ভাষণ করিল। আমি তাহাকে অব্যাহতি দিয়া মাদারিপুর ফিরিলাম, এবং এ সকল নূতন সাক্ষীর প্রমাণ লইয়া মোকদ্দমা সেসনে অর্পণ করিলাম। বালিকার রূপের ও বুদ্ধিমত্তার গল্পে সমস্তজেলা তোলপাড় হইল। রূপের এমনি মহত্ব যে, প্রৌঢ় সেসন-জজ তাহাকে তাঁহার নিজ আসনের পার্শ্বে চেয়ারে বসাইয়া তাহার জবানবন্দী লইয়াছিলেন। মাদারিপুরের একজন সবডেপুটি বলিত যে, ভেক লইলেও যদি তাহাকে বিবাহ করাযায়, তবে সে ভেক লইতে প্রস্তুত। সেসনের বিচারে স্মরণ হয়, চাটুয্যা ও তাঁহার সহচরবর্গের পাঁচ বৎসর করিয়া এই অপূর্ব্ব বিবাহের বাসরবাসের আদেশ হইয়াছিল।

কিছুদিনপরে আর একদল আসামী ধৃত হইয়া চালান আসিল। আমি খ্যাতনামা মেঘনার তীরস্থ শিবিরে এ মোকদ্দমার বিচার করিতে বসিয়াছি। সম্মুখে দিগন্তব্যাপিনী, অনন্ত সলিলরাশি-বাহিনী মেঘনা আকাশখণ্ডের মত বিস্তৃতা। বর্ষার সময় কীর্ত্তিনাশা ও মেঘনার যে সৃষ্টিসংহারকারিণী উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুলা ও ঘোর ঘূর্ণনভীষণা মূর্ত্তি দেখিয়া গিয়াছি, যে কর্ণভেদী ঘোর গর্জ্জন শুনিয়া গিয়াছি, আজ সেই মূর্ত্তি নাই। আশৈশব কীর্ত্তিনাশা ও মেঘনার ধ্বংসকরী কাহিনী শুনিয়া, এবং রাজা রাজবল্লভের রাজনগরের ধংসাবশেষ দেখিবার জন্য বর্ষার প্রারম্ভে একবার এ অঞ্চলে আসিয়াছিলাম। তখন রাজবল্লভের সেই ঐতিহাসিক রাজনগরের চিহ্ন মাত্র নাই। যে একুশরত্নের চূড়া হইতে ঢাকা নগর দেখা যাইত, তাহা তখন গল্পে পরিণত হইয়াছে। কেবল 'রাজ-সাগর' দীর্ঘিকার একটা কোণামাত্র ছিল। আমি তাহার পর্ব্বতপ্রতিম উচ্চ পাড়ের উপর দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত-হৃদয়ে কীর্ত্তিনাশার সেই সংহারকারিণী বর্ষা-বিভীষণা মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। বর্ষান্তে গিয়া তাহার ত চিহ্নও দেখিলাম না। তদ্ভিন্ন স্থানটির যে রূপান্তর দেখিলাম, তাহা নিজ চক্ষে না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। যেখানে সরোবর দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন সমভূমি, যেখানে গ্রাম দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন নদী, যেখানে জনাকীর্ণ বাজার দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন নদীগর্ভস্থ অমল ধবল সৈকতভূমি। কিন্তু এখন কীর্ত্তিনাশার, কি মেঘনার আর সেই ভীষণা মূর্ত্তি নাই। এখন আমার শিবিরসম্মুখে সুনীল অনন্তব্যাপী স্ফটিকখণ্ডের মত মেঘনা পড়িয়া রহিয়াছে। সলিলরাশি অমৃতরাশির মত টল্ টল্ করিতেছে। শীতানিলে মৃদু মৃদু হিল্লোল তুলিয়া, মধ্যাহ্ন-রবিকরে কি মধুরলীলা করিয়া হাসিতেছে। আমি একএক বার আত্মহারা হইয়া মেঘনার সেই অবর্ণনীয়া শান্ত-শীতলা শোভা দেখিতেছি, এবং সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিতেছি। কি আশ্চর্য্য! বালিকা যে সকল আসামীর নাম পূর্ব্বে বলিয়াছিল, এবং যে জন্য পুলিস আমার আদেশমত তাহাদিগকে চালান দিয়াছে, আজ সে তাহাদের অধিকাংশকে চিনে না, তাহাদের নাম কখনও আমার কাছে বলে নাই বলিয়া অম্লানমুখে আমার মুখের উপর মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছে! তাহার সেই পিতা-পুঙ্গব মর্কটের মত তাহার পশ্চাতে মোক্তারদের সঙ্গে সতরঞ্চির উপর বসিয়া আছে। আমি যত জিদ্ করিয়া বারবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—"তুমি পূর্ব্বের জবানবন্দীতে আমার কাছে ও সেসনে ইহাদের নাম কর নাই?"—সে ততই অধোমুখে, গম্ভীর স্থির ধীর ভাবে

বলিতেছে—"না, করি নাই।" আমি কলম রাখিয়া একমুহূর্ত্ত তাহার দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিলাম। আমলা, মোক্তার ও দর্শকমণ্ডলী কিশোরী বালিকার এই অসামান্য সাহসে ও দৃঢ় মিথ্যাবাদে স্তম্ভিত, নীরব। কেবল শীতানিল-চুম্বিতা মেঘনার তর তর শব্দ। কেবল দূরস্থ নদীবেষ্টিত সৈকতে রাজহংস ও জলবিহারী পাখীদের শব্দ, এবং মধ্যে মধ্যে নদীবাহী তরণীর ক্ষেপণীর শব্দ মাত্র শুনা যাইতেছিল। আমি বুঝিলাম যে, পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সুযোগ বুঝিয়া, আপনার কন্যার প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার অর্থ-প্রলোভনে ভুলিয়া, তাহাকে এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে শিক্ষা দিয়াছে। আমি তখন বাদিনীকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হইবে না কেন, কারণ দেখাইতে জামিন তলব করিয়া মোকদ্দমা স্থগিত রাখিলাম। আদেশ শুনিবামাত্র সে বজ্রাহতাবৎ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাহার পিতা ও মোক্তারগণ তাহাকে ধরাধরি করিয়া, মেঘনার তীরে লইয়া গিয়া, তাহার মুখে ও চোখে জল সেচন করিলে সে চৈতন্য লাভ করিয়া, দলিতফণা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া তাহার পাপিষ্ঠ পিতাকে বলিতে লাগিল—"এখন টাকা লইয়া ঘরে যাও। মেয়ে জেলখানায় চলিল। এ ভদ্রলোক পুত্রশোক বুকে লইয়া আমার মোকদ্দমা তদন্ত করিয়াছিল, আর আজ তাঁহার সাক্ষাতে আমি লজ্জাহীনার মত মিথ্যা কথা বলিলাম। আমি এখন তাঁহার কাছে গিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছি বলিয়া স্বীকার করিব।" মোক্তার ও আমলাগণ ফিরিয়া আসিয়া আমাকে এ সকল কথা বলিল, এবং বলিল—"ধর্ম্মাবতার! একবার যাইয়া তাহার মূর্ত্তিখানি দেখুন। কি অদ্ভুত মেয়ে। এ পাপিষ্ঠের ঘরে কেমন করিয়া এমন মেয়ে জন্মিল?"

পরদিবস প্রাতে আমি মেঘনার তীরে বেড়াইতেছি, হঠাৎ পার্শ্বস্থিত ঝোপ হইতে কি একটা বাহির হইয়া আমার সম্মুখীন হইল। মাদারিপুরের মত স্থান। আমাকে জীবন হাতে লইয়া কাজ করিতে হইতেছিল। আমি মনে করিলাম, কেহ আমাকে গোপনে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। আমি চীৎকার ছাড়িয়া পশ্চাৎ সরিয়া পড়িলাম। তখন, "আমি হতভাগিনী!" বলিয়া বালিকা আমার পায়ের উপর পড়িল। আমি মুহূর্ত্তমধ্যে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম—"অবশ্য তোমার মহাপুরুষ পিতা কোথায়ও লুকাইয়া আছেন। ইহা তাঁহারই ষড়্‌যন্ত্র।" তখন পাপিষ্ঠ আর একটা ঝোপ হইতে তাহার শ্রীমূর্ত্তিখানি বাহির করিয়া, কৃত্রিম ক্রন্দন করিয়া বলিল—"দোহাই ধর্ম্মবতার! যে শাস্তি দিতে হয়, আমাকে দিন। মেয়ের কোন দোষ নাই। মেয়েকে আজ হইতে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম।" তাহার প্রতি ক্রোধে অগ্নিবর্ষণ করিয়া এবং সজোরে বালিকার হাত হইতে পা ছাড়াইয়া শিবিরে ফিরিলাম। পিতা ও কন্যা নিত্য শিবিরের অদূরে বসিয়া রোদন করিত। মোক্তার, আমলা, সকলে ধরিয়া পড়িলে তাহাকে অব্যাহতি দিয়া, এই আসামীদিগকেও সেসনে প্রেরণ করিলাম, এবং তাহাদেরও শাস্তি হইয়া গেল। হাইকোর্টেও সমস্ত আসামীর দণ্ড স্থিরতর রহিল।

কিছুদিন পরে কলিকাতায় গিয়া দেখি, ব্রাহ্মণ মহাশয় হাইকোর্টের উকিল আমার পিতৃব্যভ্রাতার কক্ষ আলো করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে সেখানে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। তখন শুনিলাম যে, হাইকোর্টের উকিলদের মধ্যে আমার রায় পড়িয়া একটা তোলপাড় উঠিয়াছে। মেয়েটির বিবাহের জন্য তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া ৬০০৲।৭০০ টাকা ব্রাহ্মণকে দিয়াছেন। তদ্দ্বারা তাহার বিবাহ হইয়াছিল। ভরসা করি, এই অসামান্য রূপবতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি রমণী এখন পতি পুত্র লইয়া সুখে আছে।

একটা খুন

প্রথম পালা

মাদারিপুরের পালঙ্গ থানার অধীনে একটা সামান্য গ্রাম লইয়া জনৈক স্থানীয় মুসলমানজমিদারের সঙ্গে স্থানান্তরবাসী একজন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ খ্যাতনামা শ্বেতাঙ্গ-জমিদারের কিছুদিন হইতে বিবাদ চলিতেছিল। হঠাৎ একদিন পালঙ্গ থানায় সাহেবের পক্ষে এজাহার হইল যে, স্থানীয় জমিদারের লাঠিয়ালগণ তাঁহার কাচারি চড়াও করিয়া হাঙ্গামা করিয়া, একজনকে খুন করিয়াছে, এবং তাঁহার কাচারি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। তখনও আমি পুত্রশোকে অভিভূত। আমি বড় গ্রাহ্য করিলাম না। কিছুদিন পরে ঢাকার কমিশনেরর পার্শন্যাল এসিস্টেণ্টবাবুর একপত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, এ মোকদ্দমার তদন্তে পুলিস বড়ই অত্যাচার করিয়াছে। আমার একবার স্বয়ং গিয়া তদন্তকরা উচিত॥ সে গ্রামের নিকট উক্ত বাবুর পৈতৃক বাড়ী এবং তিনি আমার একজন পিতৃবন্ধু। আমি তাঁহাকে পিতার মত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতাম। তিনি আমাদের ডেপুটি-সম্প্রদায়েও একজন প্রাচীন, খ্যাতনামা, বিচক্ষণ ও চতুর ব্যক্তি। পত্রখানি পাইয়া আমি প্রথম একটুক হাসিলাম। আমি আমার খুড়াকে মিথ্যা মোকদ্দমা হইতে রক্ষা করিবার জন্য একপত্র লিখিয়া চট্টগ্রামে সেই ঘোরতর বিপদে পড়িয়াছিলাম। অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট উহা উপলক্ষ্য করিয়া আমার সেই সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। সে সময় অনেকে আমাকে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া সেরূপ পত্র লেখার জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তাই পত্রখানি পাইয়া একটুকু হাসিলাম। ইঁহার অপেক্ষা চতুর ও ও সাবধান লোক আমাদের সার্ভিসে নাই॥ এরূপ পত্র আরও অন্যান্য বিজ্ঞ রাজকর্ম্মচারী হইতেও যথেষ্ট পাইয়াছি। আমি সেই নন্দিভৃঙ্গীদের মত স্বার্থপর, বন্ধুদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক নরাধম হইলে ইঁহার ও অনেক লোকের আমার অধিক সর্ব্বনাশ ঘটাইতে পারিতাম। কিন্তু মানুষের রক্ত যাহার শরীরে আছে, সে কি এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে? আমি তাঁহার পত্রখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলাম এবং তল্লিখিত বিষয়ে কি কর্ত্তব্য ভাবিতেছিলাম—এমন সময়ে কাননগো মহাশয়, সেই অঞ্চলে কোনও কার্য্য উপলক্ষ্যে গিয়া, ফিরিয়া আসিয়া, একদিন আমার সঙ্গে দেখাকরিতে আসিলেন। সঙ্গে অতিরিক্ত ডেপুটি মহাশয়ও ছিলেন। কাননগোও আমাকে বলিলেন যে, আমার একবার সে অঞ্চলে যাওয়া উচিত ; কারণ, পুলিস উক্ত মোকদ্দমা লইয়া লোকের উপর বড়ই উৎপীড়ন করিতেছে। অতিরিক্ত বাবুও এরূপ শুনিয়াছেন বলিয়া বলিলেন। আমি রোগ ও শোকগ্রস্ত বলিয়া, তাঁহাকে যাইতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন যে, ইন্‌স্‌পেক্টার ও তিনি একসঙ্গে পুলিসের চাকরি করিয়াছেন ; তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ আত্মীয়তা। তিনি চক্ষুলজ্জা কাটাইতে পারিবেন না। অতএব তাঁহার যাওয়াতে বিশেষ ফল হইবে না। তিনি বলিলেন যে, ইন্‌স্‌পেক্টার বড় সরলপ্রকৃতির লোক। সেজন্য অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের শাসনে রাখিতে পারেন না। সম্ভবতঃ এই কারণে এরূপকথা শুনা যাইতেছে। আমিও ইনস্‌পেক্টারকে একজন ভাললোক বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। মোকদ্দমার অবস্থা কি, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে একবার মাদারিপুর আসিতে লিখিলাম। তিনি উত্তরে লিখিলেন যে, তাঁহার তদন্ত শেষ হইয়াছে। তিনি শীঘ্র আসিতেছেন। সে সময়ে মুসলমান জমিদারের পক্ষীয় কয়েকজন আসামীর চালান আসিল। আমি তাহাদের তাঁহার বিশেষ প্রার্থনামতে, বিশেষতঃ হাঙ্গামা খুনের অভিযুক্ত বলিয়া হাজতে দিলাম। ইন্‌স্‌পেক্টার কয়েকদিন পরে আসিলেন। তিনি বলিলেন, পদ্মার উত্তর পারের একজন সাক্ষীর জবানবন্দীর অপেক্ষায়, তিনি 'এ' ফারম্‌ দিতে পারিতেছেন না। তাহারপর সাক্ষী আজ আসিবে, কাল আসিবে বলিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে আসামিগণ হাজতে পচিতেছে। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল। আর একদিন তিনি হঠাৎ আসিয়া বলিলেন যে, মোকদ্দমার সাক্ষী সকল উপস্থিত। তাহাদের

সেইদিনই জবানবন্দী করা আবশ্যক, কিন্তু 'এ' ফারম্ দিলে বিবাদীর পক্ষ সাক্ষীদের নাম টের পাইয়া, তাহাদিগকে বিগড়াইবে। অতএব 'এ' ফারম্ তাঁহার হাতে রাখিয়াছেন। পরে নথীভুক্ত করিবেন। আমার কেমন সন্দেহ আরও বৃদ্ধি হইল। যাহা হউক, আমি সাক্ষীদের জবানবন্দী লইলাম। মুসলমানজমিদারটির পতিত অবস্থা। তাহার পক্ষে মোকদ্দমার তদ্বিরও ভাল হইতেছিল না। তথাপি মোকদ্দমাটি আমার কাছে বড়ই সন্দেহজনক বোধ হইল। তাহাতে কই, পদ্মার উত্তর পারের সাক্ষী একটিও দেখিলাম না। ইন্‌স্‌পেক্টার বলিলেন—তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি কিছু না বলিয়া, মোকদ্দমাটির অন্য এক তারিখ দিয়া রাখিলাম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমার মাদারিপুর শাসনের প্রধান উপকরণস্বরূপ একখানি নৌকা ভাড়াকরিয়া ঘাটে বাঁধা রাখিতাম। রাত্রিতে আমি অজ্ঞাতসারে মাদারিপুর হইতে রওনা হইয়া, পরদিন প্রাতে ঘটনাস্থলে গিয়া পঁহুছিলাম। সেখানে গিয়া তদন্ত করাতে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইল। শুনিলাম, সে অঞ্চলে এমন একটি লোক আছে যে, তাহার অসাধ্য কোনও পাপ কর্ম্ম নাই। আমি তাহার নাম গোপন করিয়া, তাহাকে সয়তান কাজি বলিব। তাহার ব্যবসা—দুই জমিদারের মধ্যে বিবাদ হইলে, সে একপক্ষে অতিরিক্ত বেতন ও পুরস্কারের প্রতিশ্রুতিতে চাকরি গ্রহণ করে, হাঙ্গামা করে, খুন করে, গৃহদাহ করে, জাল করে, সেসনে সোপর্দ্দ হয় এবং সেখান হইতে খালাস হইয়া আইসে। সে এমন চতুর ও মোকদ্দমাবাজ, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহাকে দণ্ডিত করিবে। এই মহাপুরুষ সম্প্রতি সাহেবকে গ্রামটি দখল করাইয়া দিবে বলিয়া চাকরি লইয়াছে। একখানি সামান্য কুঁড়িয়া তুলিয়া, তাহার নাম দিয়াছিল কাচারি। থানা হাতকরিয়া, অপরপক্ষের দ্বারা শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনার ছলনায় কনষ্টেবল আনাইয়াছিল। এরূপ কনষ্টেবল মোতায়ন করিতে আমি পুলিসকে বারম্বার নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলাম। এ সকল আয়োজন করিয়া, এবং কনষ্টেবলদের হাতকরিয়া, স্থানীয় জমিদারের কাচারি লুঠকরিয়া তাহা ধ্বংস করিয়াছে, তাহার পক্ষীয় লাঠিয়াল একজনকে খুন করিয়াছে, তাহারপর তাহার নিজ কাচারি ভাঙ্গিয়া এবং হতব্যক্তির আত্মীয়গণকে বশীভূত করিয়া, তাহাকে তাহার নিজ পক্ষের চাকর সাজাইয়া, এই মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। যদিও বহুদিন চলিয়া গিয়াছে, তথাপি অপরপক্ষ যেখানে হাঙ্গামা আরম্ভ হওয়া বলে, সেখানে ও তাহার কাচারির স্থানে স্থানে তখনও রক্তের দাগ আছে। আমি আরও শুনিলাম যে, সাহেবের পক্ষে অন্যস্থানের একজন খ্যাতনামা উকিলের একটি মোহরার আসিয়া বরাবর তদন্তের সময় উপস্থিত ছিল। সে মুক্তহস্তে পুলিসের উপর রজতচন্দ্র বৃষ্টি করিয়া ইন্‌স্‌পেক্টারের সঙ্গে মাদারিপুর চলিয়া গিয়াছে। চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের নর-নারীর উপর মিথ্যা সাক্ষ্য তদন্তের জন্য যেরূপ অত্যাচার হইয়াছে শুনিলাম, তাহা আর ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সেই সয়তান তাহার দলসহ নিকটে একবাড়ীতে আছে জানিতে পারিয়া, আমি তখনই তাহাকে সদলে গ্রেপ্তার করিয়া, মাদারিপুর হাজতে প্রেরণ করি। তাহার মূর্ত্তিটি এরূপ ভীষণ কুটিল যে, দেখিলেই বোধ হয়, এমন ভয়ানক জীব বুঝি পশুজগতেও দুর্ল্লভ।

মাদারিপুরে ফিরিয়া গিয়া অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সে উকিলের মোহরারটি তখনও একজন মুনসেফির উকিলের বাসায় আছে। আমি তাহাকে ডাকাইলাম। সে এক ছাতা বগলেকরিয়া, আমার গৃহস্থিত আফিস-কক্ষের দ্বারে দণ্ডায়মান হইল। সে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর ক্রোধ-রুক্ষ কণ্ঠে বলিল—"আপনি নাকি আমাকে ডাক্‌ছেন?" তাহার রহস্যজনক মূর্ত্তি ও ক্রোধ দেখিয়া আমার একটুক তামাসা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি অতিশয় বিনীতকণ্ঠে বলিলাম—হাঁ।

সে। ক্যান্? আমার বরো দরকার আছে। কি জন্যে ডাক্‌ছেন, শীঘ্র কন্।

আমি। সে কি? ঘোড়ায় চ'ড়ে আসলেন না কি? ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক এসেছেন, বসুন, তামাক খান। এ উগ্রমূর্ত্তি কেন?

সে। আপনি ঠাট্টা কর্‌বার্ লাগ্‌ছেন। আমি তবে যাই।

আমি। না, যাইবেন না, বসুন।

সে। ক্যান্? আপনি আমায় জোর কইরা রাখ্‌বেন না কি?

আমি। যদি তাহা করি?

সে। আপনার এমন ক্ষমতা আছে না হি?

আমি। সে কথা পরে বুঝা যাবে। এখন যেখানে আছ, সেখানে দাঁড়াইয়া থাক।

সে। ক্যান্? আমি কর্‌ছি কি? আপনি এ সব্‌ডিভিসনটা রাবণের রাজ্য কর্‌ছেন? আমার উপরও জুলুম কর্‌বেন না কি? আমি যাই।

আমি। তবে রাবণের রাজ্যের নমুনা দেখ। এক পা সরবে, এই আরদালি তোমাকে কানে ধরে রাখবে।

আমি গর্জ্জন করিয়া এইকথা বলিলে সে কাঁদিয়া ফেলিল—"মশয়! মশয়! আমি বিখ্যাত উকিলবাবুর মোহরার। আমি কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। আমার বেইজ্জত করবেন না। আমি আপনি বসি।

আমি। আমিও তাই বলি। তুমি এতবড় একজন উকিলের মোহরার, কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। সেজন্যই ত তোমার সঙ্গে একটুক আলাপ করতে ডেকেছি, এবং ভদ্রলোকের মত বসতে বলছি। তা তুমি নিজে বেইজ্জত হলে আমি কি করবো?

ব্রাহ্মণ তখন কম্পিতকলেবরে পার্শ্বে একটা টুলের উপর বসিল। আমি তখন তাহাকে তন্ন তন্ন করিয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। পুলিসকে ঘুষ দেওয়া ভিন্ন সকল কথাই সে স্বীকার করিল। তাহারপর অনেক অনিচ্ছায় বলিল, তাহার সঙ্গে একটা হাতবাক্‌স মাত্র আছে। আমি মাদারিপুরস্থ উকিলের বাসা হইতে সে বাক্‌সটি আনাইলাম।

আমি। বাক্‌সটি খোল।

সে। ক্যান্?

আমি। বাক্‌সে কি আছে দেখবো।

সে। এও আপনার ক্ষমতা আছে নাহি?

আমি। তুমি একজন বড় উকিলের মোহরার। সে কথা পরে বুঝিয়া লইও।

সে। বাক্‌সে আমার ঔষধ আছে। আপনি দেখ্যা কর্‌বেন কি?

আমি। আমিও রোগী। দেখি, যদি কিছু ভাল ঔষধ পাই।

সে। মশয়! আপনি আবার ঠাট্টা কর্‌বার লাগ্‌ছেন। আমি বাক্‌স খোলমু না। আপনার যা খুসি করুন।

আমি তখন একজন আরদালিকে বলিলাম—"মার লাথি।" মহাপুরুষ তখন চীৎকার করিয়া বলিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! বাক্‌সে শিবলিঙ্গ আছে। আমি খুল্যা দি!" আমি হাসিয়া উঠিলাম। সে কাঁপিতে কাঁপিতে ব্যস্ত হইয়া, বাক্‌স খুলিয়া, একতাড়া কাগজ দ্রুতহস্তে সরাইয়া লইয়া, তাহার উপর চাপিয়া বসিল।

আমি। ওগুলা কি?

সে। আমার গোপনীয় পত্র।

আমি। আমি দেখবো।

সে। গোপনীয় পত্রও আপনি দ্যাখ্‌বেন? হ্যাও কি আপনার ক্ষমতা আছে?

আমি। কি বালাই! গোপনীয় বলেই ত দেখতে চাচ্ছি। ক্ষমতার কথা আর বারবার কেন?

সে। না। আমাকে কাইট্টা ফেল্যেও আমি দিমু না।

আমি তখন আবার আরদালিকে বলিলাম—"এ কুলীন বামনের সন্তানটাকে কিছু দক্ষিণা দিয়া কাগজগুলি কাড়িয়া লও।" সে আবার চীৎকার ছাড়িয়া বলিল—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! এত জুলুম কর্‌বেন না। আমি সত্য সত্যই কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান।" আরদালি কাগজ কাড়িয়া লইয়া আমার হাতে দিলে, সে ছুটিয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমি সত্য সত্যই কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। আমি মিথ্যা বলছি না। আমি আপনার 'পলাশির যুদ্ধ' পড়্‌ছি। আমার সাতপুরুষেও কেহ চাকরি করে নাই। আমাকে বধ কর্‌বেন না। ব্রহ্মহত্যা কর্‌বেন না। দোহাই আপনার! আপনি একজন বিখ্যাত লোক। আপনার বড় দয়া ও ক্ষমতা বলে শুন্‌ছি।" ব্রাহ্মণকে আমি হাতে ধরিয়া তুলিয়া বসাইলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে পূর্ব্ববৎ কত কাকুতি করিতে লাগিলেন। আমি ইত্যবসরে কাগজগুলি পড়িতে লাগিলাম। বিস্ময়কর ব্যাপার!

তাহার একটা জমাখরচ পাইলাম। তাহাতে সবইন্‌স্‌পেক্টারের নামে ৮০০, হেড কনষ্টেবলের নামে ৭০০, কনষ্টেবলদের নামে ১০০।১৫০।২০০, সর্ব্বশেষে ইন্‌স্‌পেক্টারের নামে ১০০০ টাকা লেখা আছে। অন্য কাগজগুলি এই ঘুষ-সম্বন্ধীয় পত্র। সেই উকিলের পিতা তখন তাঁহার মাদারিপুরস্থ বাড়ীতে ছিলেন। প্রথম প্রথম ঘুষের টাকা সেই উকিলের ব্যবস্থা-স্থান হইতে তাঁহার কাছে আসিয়াছে, এবং তিনি পত্রের দ্বারা মোহরারের কাছে ঘটনাস্থানে পাঠাইয়াছেন। সে সকল টাকা নিম্ন পুলিশ-কর্ম্মচারীদিগকে দিয়া, সে শেষে ইন্‌স্‌পেক্টারের জন্য ১০০০ টাকা চাহিয়া পাঠায়। তাহাতে উকিল মহাশয় তাহাকে এই মর্ম্মে লেখেন যে—"তোমাকে এপর্য্যন্ত অনেক টাকা পাঠনি হইয়াছে। আর অধিক টাকা পুলিসকে দেওয়া যাইতে পারে না। তুমি যে লিখিয়াছ—নবীনবাবু এই ইন্‌স্‌পেক্টারকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন এবং সে যেরূপ বলে, তিনি সেরূপ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করেন, তাহা এখনকার দিনে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বিশষতঃ নবীনবাবু একজন খ্যাতনামা ডেঃ মাজিষ্ট্রেট। তিনি যেরূপ মাদারিপুর শাসিত করিয়া তুলিয়াছেন, এমন আর কেহ পারে নাই। তবে তুমি যখন বারবার লিখিতেছ যে, আর ১০০০ টাকা না দিলে ইন্‌স্‌পেক্টার 'এ' ফারম্‌ দিতেছেন না, তখন এ পত্রে ১০০০ টাকার নোট পাঠান হইল।"

আমার পত্র পড়া শেষ হইলে ব্রাহ্মণ আবার "দোহাই আপনার! ব্রহ্মহত্যা কর্‌বেন না!" বলিয়া আমার পায়ে পড়িতে যাইতেছিল ও কাঁদিতেছিল। আমি বলিলাম—"তুমি ত এখন বুঝিলে যে, আর চালাকি করিলে চলিবে না। তুমি উকিলের মোহরার। তুমি একটা খুনী মোকদ্দমায় যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে তোমার কিরূপ শাস্তি হইবে, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিতেছ। কিন্তু তুমি যদি এখন সকল কথা খুলিয়া বল, তবে আমি তোমাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব।" ব্রাহ্মণ তখন শপথ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা স্বীকার করিয়া জবানবন্দী দিল। চতুর উকিল ঘুষের জন্য পাঠাইতেছেন বলিয়া নোটের নম্বর পত্রে দেন নাই। বুঝিলাম যে, তাহার কোনও অনুসন্ধান চলিবে না। আমি তখনই পোষ্ট অফিসে গিয়া দেখিলাম, যেদিন রেজেষ্টারী হইয়া এ চিঠিখানি মাদারিপুর পঁহুছিয়াছে, সেদিনই ইন্‌স্‌পেক্টার আমাকে মোকদ্দমার সাক্ষী উপস্থিত আছে বলিয়া বিচার আরম্ভ করিতে বলিয়াছিলেন। সমস্ত পত্রের নকল তখনই মাজিষ্ট্রেটের কাছে ফরিদপুর পাঠাইলাম। প্রাতে ডাকে পালঙ্গ থানার সমস্ত পুলিস ও ইন্‌স্‌পেক্টারের পদচ্যুতির আদেশ আসিল। পালা আরও ঘনাইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পালা

উকিল মহাশয়ের পিতার লিখিত যে সকল পত্র ছিল, তাহা সনাক্ত করিবার জন্য, এবং পুলিস রহস্য আরও উদ্ভেদ করিবার জন্য তাঁহাকে তলব দিলাম। তিনি পাশ কাটাইতে

অনেক চেষ্টা করিয়া, শেষে উপস্থিত হইলেন। ইনি একজন স্বনামখ্যাত পুরুষ। তিনি যাবজ্জীবন উক্ত সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। লোকে বলিত যে, তাঁহার যাহা সম্পত্তি, তাহা নর-রক্তে গঠিত। তাঁহার সাহেব তখনকার নীলকর-সম্প্রদায়ের লোক। কিন্তু বিধাতার আশ্চর্য্য বিধান মানুষ কি বুঝিবে? সমল সলিলেই কমল ফোটে; অন্ধকার খনিগর্ভে সমুজ্জ্বল মণি জন্মে। কর্ম্মচারী মহাশয়ের দুই পুত্রই দুটি রত্ন। প্রথমটি পিতার কার্য্যে ব্যথিত হইয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন। তিনি এ বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার পূর্ব্বকীর্ত্তির অপলাপ করিলেন না। স্বহস্ত-লিখিত পত্রাবলি পর্য্যন্ত অস্বীকার করিলেন। আমি তখন মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য ১৯৩ ধারামতে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইবেন না কেন, কারণ দর্শাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে জামিনেতে রাখিলাম। পত্রগুলি যে তাঁহার হাতের লেখা, তাহা বলা বাহুল্য, পরিষ্কাররূপে প্রমাণিত হইল। তিনি তখন বুঝিলেন যে, গতিক ভাল নহে। আমিও সংকটে পড়িলাম। তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়স। যদি ফৌজদারীতে অর্পণ করি, তবে তাঁহাকে কারাগার প্রাপ্ত হইতে হইবে। পুত্র দুজন দেশ-বিখ্যাত লোক। তাঁহাদেরও কি শোচনীয় অবস্থা হইবে! অতএব মোকদ্দমার তারিখের পর তারিখ দিতে লাগিলাম। তিনিও তারিখে তারিখে হাজির হইয়া, আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আর একদিন বড়ই অনুতপ্তহৃদয়ে গলদশ্রুনয়নে বলিলেন—"ধর্ম্মাবতার! আমি এ জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি। আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা সকলই সত্য। এই কয়েকদিনের দুশ্চিন্তায়, যন্ত্রণায় ও অপমানে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে। একবার আমার এইবয়সের দিকে এবং পুত্রদের দিকে চাহিয়া, আমাকে অব্যাহতি দেন। তাহাদের মুখে কালি দিবেন না। ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। অব্যাহতি পাওয়া মাত্র, আমি আর বাড়ী যাইব না। এখান হইতে কাশীধাম যাত্রা করিব।" আমার হৃদয় কাতর হইল। আমি তখন তাঁহাকে অব্যাহতি দিলাম। তিনি সত্য সত্যই আমার কাচারি হইতেই কাশী যাত্রা করিলেন।

তখন সেই সয়তান কাজি আর এক খেলা খেলিল। সে জেল হইতে আমার কাছে একপত্র এই মর্ম্মে লিখিল—"আপনি একজন বিচক্ষণ নিরপেক্ষ হাকিম। এ মোকদ্দমায় আপনার কোনও পক্ষাপক্ষ নাই। কেবল যে প্রকৃত অপরাধী, তাহাকে দণ্ড দেওয়াই আপনার উদ্দেশ্য। আপনি যদি আমাকে পাঁচমিনিটকাল আপনার কুঠীতে গিয়া গোপনে সাক্ষাৎ করিতে দেন, তবে আমি এমন সকল প্রমাণ আপনাকে দিতে পারিব যে, কে প্রকৃত দোষী, আপনি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিবেন।" আমি ভাবিলাম—ব্যাপারখানা কি? অতিরিক্ত ডেপুটিবাবু ও ডাক্তার প্রভৃতি সকলে তাহার পত্রমতে কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সে কি কথা বলিবে, কি প্রমাণ দিবে, তাহা জানিবার জন্য আমার বড় কুতূহল হইল। আমি সেদিন অপরাহ্নে জেলে গিয়া তাহাকে বলিলাম যে প্রহরী ছাড়া তাহাকে আমি জেল হইতে কেমন করিয়া লইব? সে বলিল—একজন আরদালি পাঠাইয়া লইলেই হইল। আমি অস্বীকার করিলাম। কারণ, তাহা জেল-নিয়মের বিপরীত কার্য্য হইবে। তখন সে বলিল যে, প্রহরীরা লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমার সঙ্গে তাহার কথা কহিবার সময়ে দূরে থাকিবে। যেন তাহারা কোনও কথা শুনিতে না পারে। শুনিলে তাহার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। আমি মনে করিলাম সে আমার কুঠী হইতে পালাইবার একটা ষড়যন্ত্র করিতেছে। আমার গৃহের আফিস-কক্ষের দুইদিকের ছোটকক্ষে কয়েকজন বলবান্ কনষ্টেবল লুকাইয়া রাখিয়া, আমি তাহাকে আনিতে একজন আরদালি পাঠাইলাম।' দুইজন প্রহরী তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। সে দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল—"ধর্ম্মাবতার! ইহাদিগকে সরিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করুন।" আমি তাহা করিলাম। তাহারা সরিয়া গেলে সে বিদ্যুৎগতিতে ছুটিয়া আসিয়া, সম্মুখের টেবিলের উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া, আমার গলা টিপিয়া ধরিতে

যাইতেছিল, আমি চক্ষুর নিমিষে চেয়ার ঠেলিয়া ফেলিয়া সরিয়া গেলাম। আর একমুহূর্ত্ত বিলম্ব করিলে, আমার ডেপুটিলীলা সেইদিনই শেষ হইত। আমার চীৎকার ও চেয়ারের পতনশব্দ শুনিয়া, পার্শ্বস্থ কক্ষ হইতে কনষ্টেবলগণ ও বাহির হইতে আরদালি ও প্রহরিগণ ছুটিয়া আসিয়া, ব্যাঘ্রবৎ তাহার উপর পড়িল। সে তাহাদের সঙ্গে একক তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। আমি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, আসন্ন-মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়া কাঁপিতেছিলাম। হল-কক্ষে স্ত্রী ও ভৃত্যগণ ছুটিয়া আসিয়া, হতজ্ঞানের মত দাঁড়াইয়া রহিল। স্ত্রী চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া, আমাকে সেই কক্ষে যাইতে ডাকিতে লাগিলেন। গুরুতর প্রহারের পর কনষ্টেবল ও প্রহরিগণ তাহাকে ভূতলে পাতিত করিয়া, তাহার হাতে হাতকাড় লাগাইয়া, তাহাকে আবার জেলে লইয়া চলিল। ইতিমধ্যে চারিদিক্ হইতে লোক ছুটিয়া আসিয়া গৃহ ও হাতা লোকারণ্য হইল। সকলে আমাকে এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যের জন্য তিরস্কার করিতে লাগিলেন। আমি তখন এদৃশ্য মনে করিয়া হাসিতে লাগিলাম। স্ত্রী অন্য কক্ষে ভূমিলুণ্ঠিতা হইয়া দেবতাদের পূজো মানস করিতে লাগিলেন। কি বিপদ্ হইতে যে শ্রীভগবান্ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়। দুরাচার তাহারপর হইতে যতদিন জেলে ছিল, রোজ আমাকে তীব্র ভাষায় গালিদিয়া একএক দরখাস্ত জজ, মাজিষ্ট্রেট, কমিশনর, হাইকোর্ট ও গবর্ণমেণ্টে পাঠাইত।

মোকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। সে নিজে সাক্ষীদের জেরা করিতে লাগিল। দেখিলাম —দণ্ডবিধি, কার্য্যবিধি ও প্রমাণের আইন তাহার কণ্ঠস্থ। সে এত মোকদ্দমায় পড়িয়া উদ্ধার লাভ করিয়াছে যে, সে একজন দক্ষ উকিলের মত মোকদ্দমা চালাইতে লাগিল। ডাক্তারবাবু বলিলেন যে, জেলের রেজেষ্টারী ও নিয়মাবলিও তাহার মুখস্থ। আমি ঘটনার স্থানে চতুঃপার্শ্বস্থ যে সকল সাক্ষী সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহাদের জবানবন্দীতে প্রমাণিত হইল যে, কাজি, কনষ্টেবল ও লাঠিয়াল লইয়া মুসলমান জমিদারের কাচারি লুঠ ও ধ্বংস করিতে যাইতে, সেই কাচারির পক্ষের লাঠিয়ালগণের সঙ্গে কাচারির সম্মুখে একটা ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহারা পরাস্ত হইয়া কাচারিতে পলায়ন করিলে, সেখানে দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়, এবং সেখানে কাচারির লাঠিয়াল একজন খুন হয়। তখন সে পক্ষের লাঠিয়াল মৃত ব্যক্তিকে ফেলিয়া পলায়ন করে। কাজি তখন সেই কাচারির চিহ্নমাত্র লোপ করিয়া, মৃত ব্যক্তিকে তাহার কাচারিতে লইয়া গিয়া এবং সে তাহার কর্ম্মচারী বলিয়া সাক্ষী দিতে তাহার আত্মীয় স্বজনকে হস্তগত করিয়া পুলিসে এজাহার দিয়াছিল। আমি বাহম হাঙ্গামা (mutual rioting) অপরাধে উভয় পক্ষকে সেসনে অর্পণ করিলাম, এবং কাজিকে হাতকাড় দিয়া ও শৃঙ্খলিত করিয়া, সেইদিনই ফরিদপুর পাঠাইলাম। সে যে কয়দিন মাদারিপুরে ছিল, মাদারিপুরের জেল অধ্যক্ষ ও ডাক্তারবাবুর আহারনিদ্রা ছিল না। কোনদিন কোনদিক দিয়া পলায়ন করে এ ভয়ে ডাক্তার ও প্রহরিগণ শশব্যস্ত ছিল। সে সমস্ত পদচ্যুত পুলিস-কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবলকে সাফাই সাক্ষী মানিল, এবং বলা বাহুল্য, যাহাতে মোকদ্দমা নষ্ট হয়, তাহাতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল।

আর অতিরিক্ত ডেপুটি ও কাননগো বাবুকে সাক্ষী মানিয়াছিল। আমি শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। ডেপুটিবাবু কিছুকাল পরে সেসনে সাক্ষী দিতে যাইবার সময় আমার সবডিভিসনগৃহে একবেলা আহার করিয়া যান। তিনি ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। আসামীরা কেন তাঁহাকে সাক্ষী মানিয়াছে, তাহা আমি কিছু জানি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—আমি কিছুই জানি না। তিনি বলিলেন—"ইন্‌স্‌পেক্টার আমার আশৈশব বন্ধু। তাই সে মনে করিয়াছে যে, আমি তাহার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিব।" আমি কিছুদিন হইতে ইঁহার চরিত্রে কিঞ্চিৎ সন্দিহান হইয়াছিলাম। আমি কোনও উত্তর দিলাম না। কিন্তু ইঁহাকে ও ইঁহার বন্ধু কাননগোকে সে সয়তান কিসের সাক্ষী মান্য করিয়াছে আমিও বুঝিতে পারি নাই।

তাহার দুইতিনদিন পরে ফরিদপুরের উকিল-সরকারের পত্র পাইয়া আমি বজ্রাহত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, উপরোক্ত দুই মহোদয় সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, তাঁহারা আমার কোর্টে মোকদ্দমার বিচারের সময় একদিন সন্ধ্যার পর আমার গৃহে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন যে, আমি কয়েকজন লোকের সহিত গোপনে এই মোকদ্দমার কথা বলিতেছি। বিবাদীর উকিল তখন বাদীর পক্ষের সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিলে বলিয়াছেন যে, সেই সকল লোকের সঙ্গেই কথা কহিতেছিলাম। সাক্ষ্য এরূপ ভাবে দিয়াছিলেন যে, তাহাতে পরিষ্কার বোধ হয়, আমি সন্ধ্যার পর গোপনে গৃহে বসিয়া সাক্ষীদিগকে 'তালিম' দিতেছিলাম। বুঝিলাম, আমার প্রতিকূলে একটা ঘোরতর ষড়যন্ত্র হইয়াছে, এবং তাহার ফলে আমার একটা ঘোরতর বিপদ্ উপস্থিত। উকিলসরকার মহাশয়ও তাহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ডেপুটিপুঙ্গব ফিরিবার পথে আর আমার গৃহে পদার্পণ করেন নাই।

তৃতীয় পালা

সমস্তদিন ও সমস্তরাত্রি ঘোরতর দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করিলাম। সমস্ত মাদারিপুরে এমন কেহ নাই যে, মহাবিপদের সময় পরামর্শ করি। নিঃসহায় হইয়া, কেবল সেই বিপদ্ভঞ্জনকে ডাকিতে লাগিলাম। আর ডাকিতে লাগিলাম—আমার নির্ভীক পিতৃদেবকে। তাঁহার মহাবাক্য স্মরণ করিলাম—"মস্কিল গির্নেসে হাস্কে উড়ানা"—বিপদে পড়িলে হাসিয়া উড়াইবে। হৃদয়ে সাহস বাঁধিলাম। "পাপ নাই শরীরে যমেরে কিবা ভয়?" জীবনের অন্যান্য বিপদের সময় যেরূপ সাহসে হৃদয় শিলাসম দৃঢ় করিয়াছিলাম, এবারও তাহা করিলাম। রাত্রিতে আমার স্মরণ হইল, এই মোকদ্দমা আমার কাছে বিচারের সময়ে আমি কাননগোকে শিবচরে কোনও একটা বিশেষ কার্য্যে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহাকে সেখানে সেই কার্য্যে বহুদিন থাকিতে হইয়াছিল। প্রভাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, কাননগোর ডায়ারি আফিস হইতে আনাইয়া দেখিলাম যে, সেইদিন সন্ধ্যার পর তিনি ও ডেপুটিবাবু একসঙ্গে আসিয়া, সাক্ষীদিগকে শিক্ষা দিতে আমাকে দেখিয়াছিলেন বলিয়া সেসনে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, সেইদিন ও তাহার বহুদিন অগ্রে ও পরে, তিনি তাঁহার নিজের ডায়ারিমতে শিবচরে ছিলেন। শিবচর থানা মাদারিপুর হইতে, স্মরণ হয়, প্রায় ৩০ মাইল। কিন্তু তিনি যেখানে ছিলেন, তাহা থানা হইতেও দূর। আমি সেইদিনের ডাকেই মর্ম্মান্তিক মনোবেদনাপূর্ণ একপত্র, ম্যাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া, এ ডায়ারি তাহার সঙ্গে পাঠাইলাম। আমি লিখিলাম যে, কাননগো ও ডেপুটিবাবু তাঁহাদের বন্ধু ইন্স্পেক্টারের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন, এই ডায়ারিই তাহার অকাট্য প্রমাণ। ডেপুটিবাবুর অন্যকথা যদি ম্যাজিষ্ট্রেট বিশ্বাস করেন, তথাপি তিনি যে বলিয়াছেন,—কাননগোর সঙ্গে আসিয়া, আমাকে সাক্ষীদিগকে শিক্ষা দিতে দেখিয়াছেন, অন্ততঃ সে কথাও এ ডায়ারির দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত হইতেছে। আমি উভয়ের প্রতিকূলে দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারামতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগ স্থাপন করিবার জন্য অনুমতি চাহিলাম। আরও আমার কাছে এই গুরুতর বিষয়ের কৈফিয়ৎ চাহিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম।

সহৃদয় জেফ্রি আমার পত্র পাওয়া মাত্র কাননগোকে কোর্টে তলব দিয়া, তাঁহার ডায়ারি শুনাইয়া, এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার কারণ কি, জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বজ্রাহতবৎ চুপ করিয়া থাকেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তখনই পদচ্যুত করিয়া, তাঁহার প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার মোকদ্দমা স্থাপন করিবার জন্য কমিশনরের কাছে রিপোর্ট করিতেছেন বলেন। এ আদেশ শুনিয়া, কাননগো সেখানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। পরদিন জেফ্রি আমাকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে এ সকল কথা লেখা থাকে। তিনি বলেন, সেসনে মোকদ্দমা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, ডেপুটিবাবুর প্রতিকূলে কিছু করা যাইতে পারে না। তিনি সকল কথা কমিশনরকে

লিখিয়াছেন। আমাকে আরও লিখিয়াছেন যে, আমার উপর তাঁহার এতদ্দূর বিশ্বাস আছে যে, তিনি আমার কাছে কোনও কৈফিয়ৎ তলব করিবেন না। তিনি বুঝিয়াছেন যে, উভয়ে ইন্‌স্‌পেক্টারের খাতিরে ঘোরতর মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছেন। কমিশনরও তাঁহার কার্য্য অনুমোদন করিয়া লিখিলেন যে, ডেপুটিবাবুর প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ উপস্থিত করা শাসন-বিভাগের পক্ষে একটি গুরুতর কলঙ্কের কথা হইবে। অতএব উহা আপাততঃ স্থগিত রাখা কর্ত্তব্য।

সেসনের বিচার শেষ হইলে, জজ রায় প্রকাশকরিবার জন্য কয়েকদিন সময় লইলেন। সময়ান্তে রায় প্রকাশিত হইল। রায় ত নহে, উহা আমার প্রতিকূলে একটা প্রকাণ্ড ভিন্দিপাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পত্নীদের মধ্যে মনোবাদ হওয়াতে জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট, উভয়ের মধ্যে একটুক বিশেষ রকম বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল। জজ প্রায় প্রতি মোকদ্দমায়ই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন যে, ফরিদপুরের শাসনকার্য্য বড়ই নিন্দনীয় ভাবে চলিতেছে। এই প্রকাণ্ড রায়ে সেই বিদ্বেষ একেবারে সপ্তমে উঠিয়াছিল। উহাতে আদ্যোপান্ত আমার প্রতি তীব্র আক্রমণ ছিল। বলা বাহুল্য যে, তিনি কাননগো ও ডেপুটিপুঙ্গবের সাক্ষ্যের প্রত্যেক অক্ষর বিশ্বাস করিয়াছেন এবং উপস্থিত মোকদ্দমা সম্পূর্ণরূপে আমার সৃষ্টি সাব্যস্ত করিয়া, আসামীদিগকে অব্যাহতি দিয়াছেন। ততোধিক ইন্‌স্‌পেক্টার যে মোকদ্দমা চালান দিয়াছিলেন, তাহাই সত্য সাব্যস্ত করিয়া উহার আসামীদিগকে আপনার কাছে আপনি 'কমিট' করিয়া, তাহাদের বিচারের জন্য তলব দিয়াছেন। শুনিলাম, যে উকিল মহাশয়ের পিতার আমি কাশীযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, তিনি সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য স্বয়ং ফরিদপুরে থাকিয়া এবং অনুমান ৪০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া, ডেপুটিবাবুদের মত বহুতর সাক্ষী আমার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে ঋণগ্রস্ত একজন প্রধান জমিদার এ পর্য্যন্ত সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে, তিনি জনরব শুনিয়াছিলেন যে, এ মোকদ্দমার তদন্তের সময়ে স্ত্রীলোকদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল। যখন সরকারী উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন, এই অত্যাচার পুলিসের, কি আমার তদন্তের সময়ে হইয়াছিল, তখন তিনি বলিলেন—"তাহা বলিতে পারি না।" এরূপ উত্তরের দ্বারা ধর্ম্মটুক রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহার দ্বারা ঋণ শোধের যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন। জজ এ সকল জনরব পর্য্যন্ত আমাকে বিপদস্থ করিবার জন্য প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমি রোগ ও শোকগ্রস্ত ছিলাম বলিয়া, ঘটনার স্থানে কেবল ২।৩ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম। স্থানটিতেও একবার পরিক্রমণ মাত্র করিয়া, নৌকাতে বসিয়া গ্রামবাসী কয়েকজন লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া মাত্র চলিয়া আসিয়াছিলাম। তাহাতে মোকদ্দমার যে সূত্র পাইয়াছিলাম, তাহার অনুসরণ করিয়া মাদারিপুরে অবশিষ্ট তদন্ত করিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে পুলিস, কি অন্যকোনও কর্ম্মচারী মাত্র ঘটনাস্থলে ছিল না। থাকিবার কথাও নহে। কারণ, যখন স্বয়ং ইন্‌স্‌পেক্টার-প্রমুখ পুলিস, তদন্তের প্রতিকূলে আমি তদন্ত করিতে গিয়াছিলাম তখন পুলিস সঙ্গে থাকিলে আমার তদন্ত সম্বন্ধে ঘোরতর বিঘ্ন হইত।

আমি বড় সঙ্কটে পড়িলাম। একদিকে ম্যাজিষ্ট্রেট দৃঢ়ভাবে লিখিয়াছেন, তিনি জজের রায়ের একটি অক্ষরও বিশ্বাস করেন নাই, এবং আমার কাছে একটি অক্ষরও কৈফিয়ৎ চাহিবেন না। অন্যদিকে আমি নিশ্চয় দেখিতেছি যে, ইন্‌স্‌পেক্টার এই রায়ের নকল লইয়া, তাঁহার চাকরি পাইবার আপিলের দরখাস্তের সঙ্গে উহা গবর্ণমেণ্টে দাখিল করিবেন, এবং আমি তাহাতে ঘোরতর বিপদস্থ হইব। ফরিদপুরের পুলিস সাহেব মিঃ বার্চ্চ (Mr. Birch) আমার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এমন কি, তিনি আমার পরামর্শ না লইয়া জেলার পুলিস সম্বন্ধে কোনও গুরুতর কার্য্য করিতেন না। উক্ত আপিল সম্বন্ধে ভবিষ্যতে রিপোর্ট লিখিবার জন্য আমার কাছে জজের রায় সম্বন্ধে আমার মন্তব্য চাহিতে আমি

তাঁহাকে পত্র লিখিলাম, তিনিও তদ্রূপ করিলেন। তখন আমি জজের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক সিদ্ধান্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া এক মন্তব্য পাঠাইলাম। তিনি সে মন্তব্য পাইয়া ইন্‌স্‌পেক্টারকে সস্‌পেণ্ড অবস্থা হইতে পদচ্যুত করিবার জন্য রিপোর্ট করিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে সেই জজ মহোদয় স্থানান্তরিত হইলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত জজ ইন্‌স্‌পেক্টারের পরিচালিত মোকদ্দমার বিচার করিলেন। আসামীর পক্ষে আমাকে সাক্ষী মানিয়া, এই মোকদ্দমা আমি সেসনে 'কমিট' (অর্পণ) করিয়াছি কি না, আসামীদের উকিল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি অস্বীকার করিলাম। কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কমিট না করিলে কোনও মোকদ্দমা জজের বিচার করিবার আইনতঃ অধিকার নাই। জজ তথাপি এই মোকদ্দমা বিচার করিলেন, এবং আসামীদিগকে দণ্ডিত করিয়া রায়ে লিখিলেন যে, 'আমার রায় একটি পুস্তকালয়বিশেষ। যদিও আমি প্রকৃত ঘটনা কি হইয়াছিল, তাহা জানিবার জন্য অশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলাম, তথাপি আমার সমস্ত সিদ্ধান্তে আমি ভ্রান্ত হইয়াছিলাম'। এই আসামীরা স্থানীয় দরিদ্র জমিদারের লোক এবং নিজেরাও দরিদ্র লোক। তাহারা হাইকোর্টে একটা "জেল আপিল" মাত্র করিয়াছিল। একজন উকিল দেওয়ার তাহাদের, কি তাহাদের জমিদারের শক্তি ছিল না। কিন্তু তখন হাইকোর্টের জজেরা বড় বিচক্ষণ ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। মোকদ্দমার গুরুত্ব ও দীর্ঘ ইতিহাস দেখিয়া, তাঁহারা উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া, জজের উপরোক্ত আইনের ভ্রান্তি ও অন্যান্য বহুতর কারণ নিবন্ধন আসামীদিগকে পরিষ্কার অব্যাহতি দিলেন। তাঁহাদের রায়ে আমার রায় সম্বন্ধে জজের উপরোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া লিখিলেন—"জজের রায়ের এ অংশ পাঠকরিয়া আমাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় পাঠ করিতে কুতূহল জন্মিল। আমরা সেই দীর্ঘ রায় পাঠকরিয়া বিস্মিত হইলাম। আমরা দেখিলাম যে, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত মোকদ্দমার সমস্ত বিষয় বিচার করিয়াছেন, এবং অকাট্য তর্কের ও প্রমাণের দ্বারা তাঁহার সমস্ত সিদ্ধান্ত স্থাপিত করিয়াছেন। জজ এ সকল সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস করিবার জন্য একটি-মাত্র তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন,—তিনি সে সকল সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করেন না! কেন করেন না, তাহার কিছুমাত্র কারণ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।" এরূপে জজ আমার জন্য যে টুপী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, হাইকোর্ট উহা তাঁহার মস্তকে পরাইয়া দিয়াছেন। হাইকোর্ট আসামীদিগকে অব্যাহতি দিবার সময়ে আরও বলিয়াছিলেন—"যে মোকদ্দমা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 'কমিট' করিয়াছিলেন, উহা যদি আমাদের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিত, তবে আমরা অন্যরূপ আদেশ প্রচার করিতাম।" অর্থাৎ উভয় পক্ষ হাংগামা করিয়াছে বলিয়া উভয় পক্ষকে দণ্ডিত করিতেন।

হাইকোর্টের রায় পাঠকরিয়া, আমি ভূতলে প্রণত হইয়া বিপদ্‌ভঞ্জনের চরণারবিন্দে গলদশ্রুনয়নে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার উপহার দিলাম। ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল চলিয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল পরে যেন আমার নিশ্বাস পড়িল। আমার হৃদয় হইতে একটা গুরুতর পাষাণ নামিল। আমি এরূপ ষড়্‌যন্ত্রে পড়িয়া এরূপ বিপদস্থ হইয়াছিলাম যে, আমার চাকরি যদি পণ্যদ্রব্য হইত, তবে সিকিপয়সা দিয়াও তাহা কেহ কিনিত না। পরামর্শ করিব, এমন একটি লোক মাদারিপুরে ছিল না। অবশ্য মাদারিপুর সবডিভিসনের আপামর সাধারণের কাছে আমার অসামান্য প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও কাহারও সঙ্গে পরামর্শ করিলে আমার পদগৌরবের লাঘব হইবে, এবং ভয় প্রকাশ পাইবে বলিয়া কাহারও সঙ্গে কোনও বিষয়ের পরামর্শ করিতাম না। এমন কি, কাহারও কাছে কখনও বিন্দুমাত্রও আশঙ্কার ভাব প্রকাশ করিতাম না। সমস্ত বিপদের সময়ে আমার মুখের স্বাভাবিক প্রসন্নতার একটি রেখা, এবং হৃদয়ের অতুল সাহসের ছায়ামাত্র ব্যতিক্রম হইয়াছিল না। সর্ব্বদা

পিতৃদেবের ভরসাপূর্ণ মহাবাক্য স্মরণ রাখিতাম—"মুস্কিল গের্নেসে হাস্‌কে উড়ানা"—"বিপদে পড়িলে দিবে হাসি উড়াইয়া।"

রোগে, শোকে ও বিপদে শরীর ও মন উভয় অবসন্ন। বিপদ্‌মেঘ-মুক্ত হইয়া দুইমাসের ছুটির প্রার্থনা করিলাম।

মেঘে বিদ্যুৎ

যখন আমি এই খুন মোকদ্দমার ন্যায্য বিচার করিতে গিয়া এরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছি, সেই সময়ে আমার অন্য বন্ধুরা—যাহাদিগকে আমি লৌহদণ্ডে রোগশয্যা হইতে শাসন করিতেছিলাম, নীরব ছিলেন না। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, এই তাঁহাদের প্রতিহিংসার সময়। অতএব প্রত্যেকদিনের ডাকে তাঁহারা ২।৪ খানি দরখাস্ত আমার প্রতিকূলে গবর্ণমেন্ট, কমিশনর ও জজের কাছে দাখিল করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার অনুকূল জানিয়া, তাঁহার কাছে বড় বেশী দাখিল হইত না। প্রত্যেকদিনের ডাকে আমার কাছে ২।৪ খানি করিয়া কৈফিয়তের জন্য আসিত। কারামুক্ত জমিদার, কর্ম্মচ্যুত পুলিস কর্ম্মচারী ও অন্য রকমের বদমায়েস প্রায় ৪০।৫০ জন এরূপ বন্ধু ফরিদপুরে সংগৃহীত হইয়া আমার প্রতিকূলে এ সকল তীক্ষ্নাস্ত্র ত্যাগ করিতেছিলেন। যখন মাথার উপর আবার এইরূপে বিপদ্‌ জীমূতমন্দ্রে গর্জ্জন করিতেছিল, একদিন ঢাকার কমিশনরের পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টবাবু হইতে আর এক পত্র পাইলাম যে, নূতন কমিশনর মিঃ পেলু (Pellew) আমার প্রতিকূলে অনুমান ১৫০ দরখাস্ত লইয়া, স্থানীয় তদন্তের জন্য মাদারিপুর আসিতেছেন। আমার ও তাঁহার প্রতি কমিশনরের মনের ভাব ভাল নহে। উক্ত ইংরাজ জমিদারের ইংরাজ কার্য্যাধ্যক্ষ কমিশনরকে বুঝাইয়াছেন যে, উক্ত বাবুর বাড়ী উক্ত খুনের ঘটনার স্থানের নিকট। তিনি উক্ত স্থানীয় জমিদারের ভূসম্পত্তি বন্ধক পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অনুরোধে আমি ইংরাজ জমিদারের প্রতিকূলতা করিতেছি। ইহাতে কমিশনরের মন বিষাক্ত হইয়াছে। এতকালের পুরাতন পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টবাবু এই কারণে একবৎসরের ফার্লো লইয়া সরিয়া পড়িতেছেন, এবং আমাকে অতিশয় সতর্কতার সহিত কমিশনরের তদন্তসময়ে আত্মরক্ষা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই ত পত্রের মর্ম্ম! বিপদের উপর বিপদ্‌! অন্যদিকে শুনিলাম, এ সংবাদ কমিশনর দরখাস্তকারিগণকে জানাইয়াছেন, এবং তাঁহারা পালে পালে মাদারিপুরে আসিয়া লোকের কাছে বলিতেছেন যে, এবার আমার আর উদ্ধার নাই। আমার মনেও কতক সেরূপ আশঙ্কা হইল। তবে জানিতাম যে, আমি সুশাসনের কার্য্য ভিন্ন অন্যকোনও পাপ করি নাই। আমার হৃদয় নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশের মত পরিষ্কার। অতএব সেই বিঘ্নহারীর দিকে মাত্র চাহিয়া রহিলাম। হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রজাহিতে দুষ্টদমনের জন্য আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য অন্ততঃ তাঁহার কাছে দণ্ডিত হইব না।

কমিশনর পিকক্‌ সাহেব ইতিমধ্যে স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। তিনি আমাকে ও উক্ত এসিষ্টেণ্টবাবুকে বেশ জানিতেন এবং আমাদের প্রতি তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ছিল। তাঁহার সময়ে সেজন্য আমি বড় নির্ভয়ে কার্য্য করিতেছিলাম। কিন্তু এই খুন মোকদ্দমার আরম্ভ হইতেই মিঃ পেলু (Pellew) সাহেব কমিশনর হইয়াছেন। ইঁহার সঙ্গে আমার, কি উক্ত বাবুর পূর্ব্বে বিশেষ পরিচয় মাত্র ছিল না। কাজেই তাঁহার মন সহজে বিষাক্ত হইয়াছে। তাঁহার ষ্টীমার আসিয়া মাদারিপুরের ঘাটে লাগিল। দেখিলাম সঙ্গে আমার বন্ধু পুলিস সাহেব (Mr. Birch) আসিয়াছেন। তাঁহার মুখ প্রসন্ন দেখিয়া আমার সাহস বৃদ্ধি হইল। আমি আরও জানিতাম যে, কমিশনর ফরিদপুর হইয়া আসিতেছেন। সহৃদয় জেফ্রি অবশ্য তাঁহাকে আমার অনুকূলে কিঞ্চিৎ বলিয়া থাকিবেন। সেরূপ ইঙ্গিতপূর্ণ এক পত্রও জেফ্রির নিকট হইতে সেই প্রাতে পাইয়াছিলাম। তাহাতেও অনেক সাহস পাইয়াছিলাম।

সার্ভিসের মধ্যেও আমি একজন বিষম সাহসী (Dare devil) প্রকৃতির লোক বলিয়া পরিচিত। কোনও দিন কোনও গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি দেখিয়া বড় ভীত হইয়া পরিধেয় বস্ত্রে অকর্ম্ম করি নাই। তবে চাণক্যদেবের নীতি অনুসারে আমি তাঁহাদের নিকট হইতে চিরদিন শতহস্ত দূরে থাকিতাম। নিতান্ত দায়গ্রস্ত না হইলে কখন তাঁহাদিগকে 'respect' (সম্মান) দিতে যাই নাই। মি পেলু দেখিতে একটি সরল দীর্ঘ যষ্টিবিশেষ। তিনি ষ্টীমার হইতে ঘাটে অবতীর্ণ হইয়া, কোমরে দুইহাত দিয়া, পা দুখানি ফাঁক করিয়া একটি প্রসারিত কোম্পাসের মত দাঁড়াইলেন। আমি অভিবাদন করিলে 'Well' ('ভাল') বলিয়া চুপ করিয়া, আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি এরূপে আমার রূপদর্শনে কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম—আপনি কি এখনই আফিস পরিদর্শন করিবেন? তিনি বলিলেন—আমি আফিস পরিদর্শন করিতে তত আসি নাই, যত তোমাকে পরিদর্শন করিতে আসিয়াছি। এই পরিহাসবাক্য শুনিয়া আমার হৃদয় ভাসিয়া উঠিল। দেখিলাম, তিনি ও বার্চ্চ উভয়ে হাসিতেছেন। আমিও সেই হাসিতে যোগদান করিয়া পরিহাসকণ্ঠে বলিলাম—আমি ত জীবন্ত (Large as life) আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আপনি যথা অভিরুচি এই বিনীত ভৃত্যকে পরিদর্শন করিতে পারেন। তখন তাঁহারা দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন। সেই হাসিতে নদীতীরস্থ সমবেত আমলা, মোক্তার ও দর্শকমণ্ডলীর মুখ প্রসন্ন হইল। ইহাদের মনেও আমার জন্য ঘোরতর আশঙ্কা ছিল। বলিয়াছি, মাদারিপুরের দুষ্টলোক ভিন্ন আর সকলেরই কাছে আমি বড় প্রিয় ছিলাম। কমিশনর তখন কাচারির দিকে গেলেন এবং বাহিরে দাঁড়াইলেন। বার্চ্চ বলিলেন—"আপনি যে সকল মিউনিসিপ্যাল উন্নতি করিয়াছেন, তাহা কমিশনরকে দেখান না কেন?" তখন বেলা ৪টা আমি বলিলাম—কিছুদূর হাঁটিতে হইবে। এখন বেশ রৌদ্র, অতএব কমিশনরের কষ্ট হইবে। পেলু বলিলেন যে, তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। তখন সেই রৌদ্রে তিনি সর্ব্বপ্রথম মাদারিপুরের সেই ঐতিহাসিক হাটের ও বাজারের স্থান দেখিতে গেলেন, এবং আমি যাহা যাহা করিয়াছি, দেখিয়া বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন। বার্চ্চ আমাকে বলিলেন—"তুমি এ নরককে উদ্ধার করিয়া এমন একটা সুন্দর স্থান কেমন করিয়া এত শীঘ্র করিলে? তুমি কি যাদুকর?" উভয়ে হাসিলেন। সেইখান হইতে ফিরিবার সময়ে পালদের কাচারির সম্মুখে আসিয়া, এবং তাহার বিস্তৃত হাতা দেখিয়া কমিশনর জিজ্ঞাসা করিলেন—এ স্থানটি কি? আমি বলিলাম—পালদের কাচারি। তখন তিনি একটু ঈষৎ হাসিয়া আমাকে বলিলেন—"আপনি আমাকে সরলভাবে বলিবেন কি? আপনি সত্য সত্যই কি এখানে একটা প্রতিযোগী হাট স্থাপিত করিয়াছিলেন?" আমিও ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলাম—সত্য সত্যই করিয়াছিলাম, এবং তাহার সেই অপূর্ব্ব উপাখ্যান সংক্ষেপে সরলভাবে বলিলাম। তিনি শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কুমার নদীতে পড়িবার উপক্রম হইলেন। আমি বুঝিলাম—ঔষধ ধরিয়াছে, আর ভয় নাই।

তাহারপর তাঁহারা আসিয়া আমার গৃহের সম্মুখের পুষ্করিণীর ঘাটে বসিলেন। কমিশনর বার্চ্চকে গোপনে কি বলিলেন। বার্চ্চ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে বসিয়া 'পেগ' লইলে (সুরাপান করিলে) আমার কোনও আপত্তি আছে কিনা? আমি বলিলাম—কিছুমাত্র না (You are quite welcome)। তখন ষ্টীমার হইতে উপকরণ সকল আসিলে তাঁহারা কিঞ্চিৎ পান করিলেন। আমি ঘাটের অপরদিকের বেঞ্চে বসিলাম। কমিশনর তখন একে একে আমার প্রতিকূলে যে যে দরখাস্ত পড়িয়াছে, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত। আমিও একে একে কয়েকটি বিষয়ের আমার কৈফিয়ৎ দিয়া, শেষে আমার পিতৃরক্ত ধমনীতে উত্তেজিত করিয়া আবেগের সহিত বলিলাম—"আমার প্রতিকূলে আপনার কাছে এত আবেদন পড়িয়াছে যে, প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র কৈফিয়ৎ

দিতে গেলে আপনার মূল্যবান্ সময় নষ্ট হইবে। আমাকেও বোধ হয়, আপনি তত সময় দিতে পারিবেন না। আমি মোটের উপর একটা কথা বলিতে চাহি। আমি যখন মাদারিপুরে আসি, কলিকাতায় আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ পিককের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে বলেন যে, মাদারিপুরে তিনবৎসর যাবৎ পুলিসের নাকের উপর হাঙ্গামা খুন হইতেছে, অথচ একটারও কিনারা হয় নাই। অতএব গবর্ণমেণ্টের কাছে তিনি একজন বিশেষ দক্ষ কর্ম্মচারী চাহিয়াছিলেন। আমাকে কার্য্যের দ্বারা দেখাইতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তদনুসারে লৌহহস্তে মাদারিপুর শাসন করিতেছি, এবং পিকক্ সাহেব আমার সকল কার্য্যে পৃষ্ঠপোষণ করিতেছিলেন। আপনি যদি এরূপ শাসন অনুমোদন না করেন, তাহা বলুন; আমি একজন মামুলী ডেপুটির (Routine Deputy Magistrate) মত কার্য্য করিব। কিন্তু তাহা হইলে আপনি আমাকে এই সবডিভিসনের শান্তির, কি মঙ্গলের জন্য দায়ী করিতে পারিবেন না।" বার্চ্চ আমার এরূপসাহস ও গর্ব্বপূর্ণ কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু মিঃ পেলু আসন হইতে আবেগের সহিত উঠিয়া আমার করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন—"আমি ইতিপূর্ব্বে পূর্ববাঙ্গলায় কখনও কাজ করি নাই। আপনি যে কি ভয়ানক সবডিভিসনের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। অতএব আমি দুঃখিত হইতেছি যে, আপনার যেরূপ পৃষ্ঠপোষণ করা উচিত, আমি এতদিন সেরূপ করি নাই। এখন হইতে আপনি আমাকে আপনার ষোলআনা পৃষ্ঠপোষক পাইবেন।" মেঘে বিদ্যুৎ ঝলসিল। মেঘ কাটিয়া গেল। আমি আবার বিপদ্ভঞ্জনকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলাম।

তাহারপর অনেক গল্প হইল। ক্রমে রাত্রি হইল। বার্চ্চ বলিলেন যে, ষ্টীমারে স্থান বড় সঙ্কীর্ণ। ঘাটে বসিয়া তাঁহাদের আহার করিতে আমার কোনও আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, ঘাটে বসিয়া খাইবেন কেন? আমার ঘরে Dining Room (আহার-কক্ষ) আছে। তাঁহারা সেখানে আহার করিতে পারেন। মিঃ পেলু—এ গৃহে আপনার পরিবার আছেন না? আমি—আছেন। পেলু—তিনি হয় ত অসুবিধা মনে করিবেন। আমি—কিছুমাত্র না। বরং তিনি অনুগৃহীত হইবেন। তখন সেই কক্ষ মার্জ্জিত করিয়া দিলে তাঁহারা আহার করিতে বসিলেন, এবং আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। আহারের পরও গল্প করিতে করিতে প্রায় রাত্রি ১১টা হইল। আমার ছুটির কথা তুলিয়া পেলু বলিলেন—"আমি আপনাকে এখন মাদারিপুর হইতে ছাড়িতে পারিব না। আমার বড় সন্দেহ যে, অন্য কেহ এই দুরন্ত সবডিভিসন এরূপ দক্ষতার সহিত শাসন করিতে পারিবে না। দিবসে, আপনাকে দারুণ পরিশ্রম করিতে হয় এবং রাত্রিতে পরদিন দুষ্ট লোকদের দরখাস্তের কি কৈফিয়ৎ দিবেন, তাহা ভাবিতে হয়। ইহাতেই আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছে। আপনি ইচ্ছা করিলে আমি কিছু কালের জন্য নারায়ণগঞ্জে, কি কুমিল্লাতে আপনাকে লইয়া যাইব। কিম্বা ফরিদপুরে গিয়া কিছুকাল আপনি বিশ্রাম করুন। আপনাকে কোনও কার্য্য না দিতে আমি মিঃ জেফ্রিকে লিখিব। অনুমান দুইমাস এরূপে অন্যস্থানে বিশ্রাম করিলে আপনার স্বাস্থ্য ভাল হইবে।" তাঁহার এরূপ অপ্রত্যাশিত অনুগ্রহবাক্যে আমার চক্ষু সজল হইল। আমি বলিলাম—"আমি এ অনুগ্রহবাক্যের কি উত্তর দিব? যখন আপনি আমার প্রতি এত দয়া প্রকাশ করিতেছেন, এবং মাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও আমাকে এত অনুগ্রহ করেন, তখন আমার এ স্থান ছাড়িয়া যাইবার কোনও কারণ নাই। তবে ডাক্তার বলিতেছেন—মাদারিপুর ভিজা (damp) জায়গা বলিয়া আমার লঘু জ্বর (low fever) ছাড়িতেছে না। ঢাকা-ডিভিসন সর্ব্বত্র ভিজা স্থান। অন্য কোথায় গিয়া কিছুদিন না থাকিলে যে শরীর সারিবে, এরূপ সম্ভাবনা কম।" তিনি

কোনও উত্তর না দিয়া ষ্টীমারে যাইতে উঠিলেন। নদীর ঘাটে আমাকে খুব সস্নেহ করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন,—"আপনি যদি প্রতিশ্রুত হন যে, বদলির চেষ্টা করিবেন না, আবার এখানে আসিয়া আপনি যেরূপ সুশাসন করিয়াছেন, তাহা স্থায়ী করিয়া যাইবেন, তবে আমি আপনাকে দুইমাসের ছুটি দিতে অনুরোধ করিব।" আমি স্বীকৃত হইয়া বলিলাম যে, যদি আমার শরীর কিঞ্চিৎমাত্রও সারে, আমি আনন্দের সহিত ফিরিয়া আসিব। তিনি ষ্টীমারে রাত্রি অতিবাহিত করিয়া পরদিন প্রাতে চলিয়া গেলেন। মাদারিপুরব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল, এবং যাঁহারা আমার ফাঁসি দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া ফরিদপুরে ফিরিলেন।

তাহারপর পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—"তুমি কি পেলু সাহেবকে কোনওরূপ যাদু করিয়াছ? মাদারিপুর হইতে ফিরিয়া অবধি তাঁহার মুখে তোমার প্রশংসা ধরে না। তিনি তোমাকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বহু পৃষ্ঠাব্যাপী এক পরিদর্শন-বিজ্ঞাপনী লিখিয়াছেন।" যথাসময়ে জেফ্রি সাহেবের নিজের এক আনন্দব্যঞ্জক (Congratulatory) পত্র সহ সেই বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হইলাম। কিছুদিন পরে ছুটিও মঞ্জুর হইল। আমি দেশে আসিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশন সমারোহে নির্ব্বাহ করিলাম।

একটি অপূর্ব্ব জীব

আমি পেলু সাহেবকে ঐরূপ বলিয়াছিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, কলিকাতায় গিয়া একবার বদলির চেষ্টা করিব। তদনুসারে চিফ্ সেক্রেটারী পূর্ব্ব-পরিচিত কক্‌রেল (Cockrell) সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি কার্ডের পিঠে লিখিয়া দিলেন—"অবসর নাই!" বড় বিস্মিত হইলাম। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, মিঃ কক্‌রেল আমাকে একটুক সুদৃষ্টিতে দেখিতেন। নিরাশ হইয়া হেড এসিস্টেণ্টের দরবারে গেলাম। তিনি বলিলেন,—কমিশনর ও কলেক্টর উভয়ে আমার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়া আমাকে আবার মাদারিপুর ফেরত পাঠাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং নিতান্ত আমাকে না পাঠাইলে একজন বিশেষ দক্ষ ইংরাজ জইণ্ট পাঠাইতে লিখিয়াছেন; অন্যথা কেহ মাদারিপুর আমার মত সুশাসিত করিতে পারিবে না। এই কারণেই আমাকে বদলি করিতে পারিবেন না বলিয়া মিঃ কক্‌রেল দেখা করেন নাই। ছুটি শেষ হইলে বাড়ী হইতে ফিরিবার সময় আমি আবার কক্‌রেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি এবার দর্শন দিলেন, কিন্তু তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র বলিলেন—"আমি তোমাকে এরূপ সুস্থ দেখিয়া বড় সুখী হইলাম।" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—সুস্থ! তিনি বলিলেন—"পুরী যাইবার সময়ে তোমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা ঢের ভাল। মোট কথা, আমি তোমাকে বদলি করিতে পারিতেছি না। কমিশনর ও মাজিষ্ট্রেট, দুজনেই তোমাকে বিশেষরূপে চান। তুমি এরূপ ভাল কাজ করিতে পারিবে বলিয়া আমি তোমাকে মাদারিপুরে পাঠাইয়াছিলাম। তুমি আমার নির্ব্বাচনের সার্থকতা করিয়াছ। কমিশনর ও মাজিষ্ট্রেট, উভয়ে তোমার কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। আমি বড় সুখী হইয়াছি যে, তুমি এরূপ দুরন্ত সবডিভিসনকে এতঅল্পসময়ে গরম করিয়া তুলিয়াছ (You have warmed up such a rascally Subdivision)"। আমি বলিলাম—কিন্তু সবডিভিসনও আমাকে warm up (গরম) করিয়া তুলিয়াছে। পুত্রটি গিয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে আমার স্বাস্থ্যও গিয়াছে। যাহা হউক, আমি বদলির জন্য আসি নাই। আমি কার্য্যে অক্ষম হইলে আপনি আমাকে বদলি

করিতে বাধ্য হইবেন। চট্টগ্রামে আমার যে সর্ব্বনাশ আপনার হাতে হইয়াছিল, আপনি জানেন। যদি আমি পুরী ও চট্টগ্রামে এরূপ ভাল কার্য্য করিয়া থাকি, আমি 'প্রোমোশন'টি পাইব কি? তিনি বলিলেন—দেখিবেন। দেখিয়াও ছিলেন, ইহার কিছুদিন পরে ৪০০৲ টাকা গ্রেডে প্রোমোশন পাই।

মাদারিপুরে ফিরিয়া চলিলাম। শিবচর থানার নিকটে নৌকা পেঁছিবামাত্র দেখিলাম, বহুলোক আমার প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং সেখান হইতে আমার প্রত্যাবর্ত্তনে নদীর দুইদিকে আনন্দের রব শুনিতে শুনিতে চলিলাম। লোকেরা বলিতেছিল যে, আমার স্থানে যিনি আসিয়াছেন, তিনি একটি অপূর্ব্ব জীব। দুইমাসের মধ্যেই তিনি সকলকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালার লোক। মাদারিপুরের এলাকায় তাঁহার আত্মীয়স্বজন আছেন, এবং তাঁহাদের কেহ কেহ আমার শাসনহস্তের মধুর পরিচয় পাইয়াছিলেন। কাজে কাজেই তিনি ফরিদপুর থাকিতেই আমার একজন ঘোরতর বিদ্বেষী বলিয়া আমি শুনিয়াছিলাম। তাঁহার বিদ্বেষের প্রধান কারণ যে, জেফ্রি আমাকে এত অনুগ্রহ করেন। ডেপুটিপুঙ্গবদের মধ্যে মাজিষ্ট্রেটের অনুগ্রহ একটা পরস্পর বিদ্বেষের প্রধান কারণ। তিনি প্রকাশ্যে লোকের কাছে বলিতেন—"ফরিদপুরের প্রকৃত মাজিষ্ট্রেট নবীনবাবু। তাঁহার কাছে প্রত্যহ মিঃ জেফ্রির এক 'ডেমি অফিসিয়াল' পত্র যায়, এবং তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও কার্য্যই করেন না।" বলা বাহুল্য, কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মাদারিপুরের সহিত অসংশ্লিষ্ট কোন কথাই জেফ্রি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন না। যাহা হউক, এই মহাপুরুষ আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিয়া বেলা ১১টা হইতে চার্জ্জ লইতে আরম্ভ করেন। চারিটার পূর্ব্বে তাহা শেষ হইবে মনে করিয়া, আমি পরিবারকে নৌকায় উঠাইয়া রাখি। কিন্তু নিজহস্তে এক একখানি করিয়া ষ্ট্যাম্প ও একটা একটা করিয়া পয়সা পর্য্যন্ত গণিতে যখন রাত্রি ১০টা হইল, তখন আমাকে বলিলেন—"মশয়! আর একটাদিন থাক্যা যান্। বড় রাত্রি হলো।" আমি বলিলাম—"পরিবার নৌকায় উঠিয়াছেন। আমার শরীর পীড়িত। আমি কেমন করিয়া কোথায় থাকিব। রাত্রি যতই হউক না, আপনি চার্জ্জ লওয়া শেষ করুন।" তথাপি নির্দ্দয়ভাবে ভদ্রলোক আমাকে রাত্রি ১২টা কি ১টা পর্য্যন্ত কাচারিতে বসাইয়া রাখিল। সেই গভীর রাত্রিতে চার্জ্জসিট্ দস্তখত করিয়া ঘাটে গিয়া দেখি, বহুতর লোক সেই নিশীথ অন্ধকারে দাঁড়াইয়া আমার বিদায়ের প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং ডেপুটি জীবটির উপর পুষ্প বর্ষণ করিতেছিল। আমি তখনই নৌকা খুলিলাম। কারণ চার্জ্জ দিয়া কোথায় মুহূর্ত্তকালও অপেক্ষা করা আমার নীতিবিরুদ্ধ ছিল।

ফিরিবার সময়ে আমার নৌকা সন্ধ্যার সময় যেই কুমার নদে প্রবেশ করিতে লাগিল, অমনি পালে পালে সবডেপুটি, ডাক্তার, উকিল, মোক্তার ও আমলাগণ আমার নৌকায় উঠিতে লাগিলেন। নৌকায় আর স্থান হয় না। তাঁহাদের সকলের মুখেই ডেপুটিটির কীর্ত্তি শুনিতে লাগিলাম। শুনিলাম, আমার নিন্দা তাঁহার আর মুখে ধরে না। কোর্টে বসিয়াও আমার প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের অভিধানবহির্ভূত রসিকতা বর্ষণ করিয়াছেন। শুনিলাম, তাঁহার মুখে 'হালা' (শালা) কথা সর্ব্বদা বিরাজিত। অজ্ঞাতসারে ও অনিচ্ছায় এই মধুর কুটুম্বিতা সর্ব্বত্র বর্ষণ করেন। পোষ্ট আফিসের সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন, আর বলিতেছেন—"পোষ্ট আফিসের হালারা সব চোর।" শুনিয়া পোষ্ট মাষ্টার চটিয়া লাল। কাচারিতে বসিয়াও মোক্তার হালা, সাক্ষী হালা, আমলা হালা,—এরূপ সকলকে 'হালা' বলিয়া আপ্যায়িত করিতেন। তবে বলা উচিত, ভদ্রলোক ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিত না। 'হালা' উহার একটা 'লব্জ' হইয়া গিয়াছিল। শুনিলাম, আমার অপেক্ষা লোকপ্রিয় হইবার জন্য তিনি সর্বাডিভসনগৃহে প্রত্যেক শনিবার নিমন্ত্রণ দিয়াছেন। তবে তাহা সকল সময়ে আপন ব্যয়ে

হয় নাই। আমলা মোক্তারেরাও ডেপুটিবাবুর নিমন্ত্রণের বদল দেওয়ার জন্য তাঁহার কাছে চাঁদাকরিয়া টাকা পাঠাইত। তিনি শুনিয়াছিলেন—আমি কোথাও যাই না, কাহারও সঙ্গে মিশি না। মনে করিয়াছিলেন, তিনি এরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে সকলের সঙ্গে মিশিলে সহজে আমার অপেক্ষা অধিকতর লোকপ্রিয় হইবেন। তবে নিজের টাকা দিয়া তাঁহার ঘরে নিমন্ত্রণ লাভ ও তাহার উপর সেই কুটুম্বিতা বর্ষণ। ফল তাঁহার আশার বিপরীত হইয়াছিল। শেষ শনিবারের নিমন্ত্রণে আমি ফিরিয়া আসিতেছি, নৌকা পাঠাইতে লিখিয়াছি, শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"এই শেষ খায়্যা গ্যালেন। আর এ ঘরে খাবেন না।" তখনই একটি আমলা তাঁহাকে শুনাইয়া নেপথ্যে বলিল—"আমাদের খায়্যা কাজ নাই। এখন তুমি গেলেই বাঁচি।" শুনিলাম, তিনি এই চক্ষুরুন্মীলক স্বগত উক্তি শুনিয়া, বাস্তবিকই চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, হাঁ করিয়া এই কৃতঘ্নের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। বোধহয় মনে মনে বলিতেছিলেন —"এত ননী ছানা খাওয়াইলাম, তবু ত পোষ মানলে না।" আমার ছুটির একদিন বাকী ছিল। কিন্তু নৌকায় সমাগত সকলেই জিদ্ করিতে লাগিলেন যে, আমাকে পরিদনই চার্জ লইতে হইবে। কেন? তাঁহারা বলিলেন—"অনেক মোকদ্দমার হুকুম দিবার ও রায় লিখিবার বাকী আছে। কাল চার্জ লইলে বেটা জব্দ হইয়া যাইবে।" আমার চার্জ লইতে আমাকে তিনি কিরূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহাও স্মরণ করাইয়া দিলেন। আমি বলিলাম—দেখা যাইবে।

আমি ইতিমধ্যে সমাগত সবডেপুটি জ্ঞানের গৃহে সপরিবারে অতিথি হইলাম। সন্ধ্যার পর সেখানে সেই অপূর্ব্ব জীবটি উপস্থিত হইয়া আমার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলেন—"আমি ফরিদপুরে হুনছিলাম, আপনি লোকের বড় অপ্রিয়। কিন্তু এয়ানে আস্যা তার ঠিক বিপরীত দ্যাখলাম্। এয়ানে হক্কলে আপনাকে দেবতার মত পূজা করে।" আমি বলিলাম—"আমি প্রশংসা কি অপ্রশংসার জন্য কোনও কাজ করি না। যাহা কর্ত্তব্য মনে করি তাহাই করি।" তিনি—"আপনি অতি বর লোক। আপনার যাামন নাম, ত্যামন কাজ দ্যাখলাম।" এরূপে খোসামুদির গোলাপী সরবতে আমার মেজজটা ঠাণ্ডা ও মোলায়েম করিয়া কাজের কথা তুলিলেন—"আপনি একটাদিন আগে আসলেন্ ক্যান?" আমি "পদ্মার পথ। তাই একটাদিন হাতে রাখিয়া আসিলাম।" তিনি—"কিন্ত মশায়! আমি যে বর বিপদে পরলাম।" কেন? তিনি—"বুরা চুরা মানুষ, বুঝেন না? কিছু কাজ বাকী আছে।" তখন আমার হাত দুহাতে ধরিয়া বলিলেন—"মশয়! আমাকে একটাদিন ক্ষমা করুতে হবে। আপনি কাল চার্জটা নেবেন না।" ভদ্রলোকের কাতরতা দেখিয়া আমি সম্মত হইলাম। সবডেপুটি ও উপস্থিত ভদ্রলোকেরা সকলে আমার উপর চটিলেন। তারপর ডেপুটি মহাশয় আমাকে সে রাত্রিতে আহারের নিমন্ত্রণ করিলে সবডেপুটি বলিলেন—"তাহা হবে না। আমার এখানে খাওয়া প্রস্তত।" পরদিন প্রাতে তিনি ছাড়িলেন না। কই মাছের ঝোল দিয়া প্রাতে এক অপূর্ব্ব নিমন্ত্রণ খাইয়া, তিনি যেরূপ নিমন্ত্রণ দিতেন, তাহার নমুনা পাইলাম। পরদিন যথাসময়ে আমি চার্জ লইতে গেলাম। চার্জ লওয়া বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা আছে। দুইঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষকরিয়া আমি এজলাসে গেলাম। তিনি তখনও সেই সকল বকেয়া রায় লিখিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আপনি আসলেন যে?" উত্তর—চার্জ লওয়া হইয়াছে। তিনি হাঁ করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সব ঠিক পাইছেন ত?" উত্তর—না। "না—আ—আ—আ!"—তিনি যেন বজ্রাহত হইলেন। উঠিয়া ট্রেজারিতে গিয়া হেডক্লার্কের কাছে শুনিলেন যে, ষ্ট্যাম্প, সিকি, দুয়ানি, কিছুরই তহবিল হিসাবের সঙ্গে মিলিতেছে না। তিনি সেখানে বসিয়া পড়িলেন। আমিও পশ্চাৎ গিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন—"মশয়! এ সব হালারা চোর। আপনি ক্যামন কর্যা এ হালাদেরে নিয়া কাজ করেন?" হেডক্লার্ক বড় ভালমানুষ। সে কাঁদ কাঁদ ভাবে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু নাজির ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল—"আমরা

ত হালা আছিই। আমাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করলে আমরা বলিব, কোথায় ৩টার সময় ট্রেজারির কাজ বন্ধকরা একাউন্টেণ্ট জেনারেলের হুকুম, আর কোথায় রাত্রি ১০।১১টার সময় ট্রেজারিতে আসিয়া, ষ্ট্যাম্প নিজের হাতে গণিয়া বাহির করিতেন, এবং সিকি দুয়ানির থলেতে হাত দিয়া 'এডা কি! এডা কি!' বলিয়া মুঠে মুঠে তুলিয়া দেখিতেন। তাহাতে দুই একখান কোথায় পড়িয়া গিয়া থাকিবে।" ডেপুটি এবার মাথায় হাতদিয়া বসিয়া পড়িলেন, আর বলিলেন—"ও হালারা! তোগো কি এই ধর্ম্ম?" রুদ্ধ হাসিতে আমার বুক ফাটিতেছিল। তাঁহাদিগকে এই প্রহসনের মধ্যে রাখিয়া আমি গৃহে চলিয়া গেলাম। স্ত্রী এতক্ষণে সেখানে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। সবডেপুটি প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। সমস্ত মাদারিপুরে একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল। এবং উক্ত প্রহসন দেখিতে কাচারির চারিদিকে লোক দাঁড়াইল।

সন্ধ্যার পর ডেপুটিবাবু আমার কাছে আসিলেন। আজ মাটি হইতেও মাটি। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং আজ আরও অতিরিক্ত মাত্রায় আমার প্রশংসা করিয়া আমাকে বলিলেন—"মশয়! আপনি অত বরলোক। এ বুড়াডাকে মারবেন না।" সবডেপুটিকে বলিলেন—"জ্ঞানবাবু! তুমিও আমার জন্য একটু সুপারিস কর।" তিনি বলিলেন—"আপনি চাৰ্জ্জ লইবার সময়ে এ ভদ্রলোককে যে কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহা মনে আছে কি? আমি কেমন করিয়া এখন তাঁহার কাছে সুপারিস্ করি?" ডেপুটিবাবু—"ও হালার অ! তুমিও আমার পেছনে লাগ্‌লে!"—বলিয়া আবার কাঁদিয়া আমাকে বলিলেন—"আমার কি উপায় করবেন বলুন। আপনি কি কলেক্টরের কাছে রিপোর্ট করবেন?" ভদ্রলোকের অবস্থা দেখিয়া আমার দয়া হইল। আমি এতক্ষণ অভিনয় মাত্র করিতেছিলাম। আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম—"আপনি কি পাগল? কি করিতে হইবে, তাহাও কি আমায় বলিয়া দিতে হইবে? আপনি হিসাব ও তহবিল আর একবার দেখুন। হয় ত আমার গণনাতে ভুল হইতেও পারে। আপনি গণিয়া দেখিয়া ঠিক আছে বলিলে আমি চার্জপত্র দস্তখত করিয়া দিব। এরূপ একটা বিষয় কলেক্টরের কাছে রিপোর্ট করিয়া কি একজন অফিসার আর একজন অফিসারের সর্ব্বনাশ করিতে পারে?" তিনি আমার ইঙ্গিত বুঝিলেন, এবং দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া উঠিয়া গেলেন। রাত্রি ১০টার সময়ে আসিয়া বলিলেন, সব ঠিক হইয়াছে। হেডক্লার্ক বলিল—কতক তহবিল পূরণ, এবং কতক হিসাবের ভুল সংশোধন করিয়া ঠিক করা হইয়াছে। আমি চার্জপত্র স্বাক্ষর করিয়া এ অপুষ্ট জীবটিকে অব্যাহতি দিলাম। বলা বাহুল্য যে, ইহার পর ফরিদপুরে ফিরিয়া গিয়া অবধি তিনি আমার অজস্র প্রশংসা করিলেন। খ্রীষ্টের মহাবাক্য ঠিক—Love thine enemies. Love thou that despitefully use thee (শত্রুকে ভালবাস। যাহারা তোমার প্রতি বিদ্বেষভাবে ব্যবহার করে, তাহাদিগকেও ভালবাস)।

কবির অভ্যর্থনা

সেই শীতের সময়ে একদিন রাজনগরে শিবিরে বসিয়া আছি। এমন সময়ে ঢাকার কমিশনর পেলু সাহেবের এক অর্দ্ধ-সরকারী পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন—"আপনার সঙ্গে কোনও বিশেষ বিষয়ের পরামর্শ আছে। অতএব এই পত্র পাওয়ামাত্র আপনি ঢাকায় আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।" আমি পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন রাজধানী ঢাকা নগরে উপস্থিত হইয়া আমার বাল-সুহৃদ্ চন্দ্রকুমারের সঙ্গে রহিলাম। পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট অভয়বাবু অবসর লইয়া ঢাকায় আছেন। অক্ষয়বাবু তখন তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত। তাঁহার সঙ্গে থাকিতে অভয়বাবু জিদ্ করিলেন। আমি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও আমার বাল-সুহৃদের সঙ্গে থাকা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিলাম। কমিশনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন যে, ইন্‌স্‌পেক্টার গবর্ণমেণ্টে তাঁহার চাকরির জন্য আপিল করিয়া, আমার বিরুদ্ধে অনেক

কথা লিখিয়াছেন। তিনি সেই আপিল সম্বন্ধে যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তাহার পর বলিলেন—"আপনি বোধহয়, ঢাকায় আর কখনও আসেন নাই। অতএব দুইদিন থাকিয়া ঢাকা দেখিয়া যাইতে আপনার বিশেষ আপত্তি না হইতে পারে। বিশেষতঃ আমি শুনিতেছি, আপনি একজন বাঙ্গালার প্রধান কবি বলিয়া ঢাকাবাসীরা আপনার অভ্যর্থনা করিতে চাহে। অতএব আপনি দুইদিন ঢাকায় থাকুন, এবং এই রিপোর্টের যদি কোনও অংশ পরিবর্ত্তন করা উচিত মনে করেন, বেশ সাবধানে পড়িয়া, উহার পরিবর্ত্তন করিয়া আমার কাছে পরশুদিন লইয়া আসিবেন। তখন দুইজনে আবার উহা বিবেচনা করিব।" এখন এই ফ্রেজার-ফুলারি দিনে কোনও কমিশনর একজন বাঙ্গালী অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত এরূপ ব্যবহার করা বোধহয়, ঘোরতর দুর্ব্বলতার কথা মনে করিবেন। আমি দেখিলাম, আমি পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ বাচের্চর কাছে জজের রায়ের উপর যে টিপ্পনী পাঠাইয়াছিলাম, তিনি তাহা তাঁহার রিপোর্টের নানা স্থানে উদ্ধৃত করিয়া জজের রায় উড়াইয়া দিয়াছেন। আমি সত্য সত্যই কমিশনরের রিপোর্টের ২।১ জায়গা পরিবর্ত্তন করিলাম। এখন একথা কোনও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বিশ্বাসই করিবেন না, কমিশনর সে সকল পরিবর্ত্তনের একটি অক্ষর মাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহার রিপোর্টভুক্ত করিয়া দিলেন। ইহারপর শুনিয়াছিলাম, ইন্‌স্পেক্টার সবইন্‌স্পেক্টারের পদে ডিগ্রেড হইয়া চাকরি পাইয়াছিলেন। পালঙ্গ থানায় আর পুলিস কর্ম্মচারী কেহ কর্ম্ম পান নাই। তাঁহাদের পদচ্যুতির আদেশ শেষ পর্য্যন্ত স্থিরতর ছিল।

ঢাকায় দুইদিন ছিলাম। ঢাকা দেখিয়া কিছুমাত্র সুখী হইতে পারি নাই। দেখিবার বড় কিছুই ছিল না। রাস্তাগুলি অতিশয় সঙ্কীর্ণ, এবং এত সেঁতসেঁতে ও দুর্গন্ধময় যে, দুটিদিন মাত্র থাকিতে আমার কষ্ট বোধ হইয়াছিল। শ্রীমতী বুড়ীগঙ্গাদেবীকে দেখিয়া আমার হাসি পাইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসী গামলায় করিয়া বুড়ীগঙ্গা পার হয় বলিয়া দীনবন্ধু যে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই। তখন বসন্তকাল। শ্রীমতীর কলেবর এত সঙ্কীর্ণ যে, তখন তাঁহাকে অতিক্রম করিবার জন্য গামলারও প্রয়োজন ছিল না। তবে ঢাকা পূর্ব্বরাজধানীর স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিতা, এবং ভদ্রস্থান। এত শিক্ষিত ও সুসম্পন্ন লোক পূর্ব্ববঙ্গের অন্য কোনও নগরে নাই। ঢাকার বিশ্রামগৃহ (Recreation Room) একটি বৃহৎ হল। এই স্থলে অভ্যর্থনার জন্য সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, বহুতর ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছেন। রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত আরও বহুতর সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল। ইহাঁরা সকলে আমার প্রতি যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলাম। আমার কেবল—'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ ও 'পলাশির যুদ্ধ' মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বান্ধবে ও বঙ্গদর্শনে আরও কতকগুলি খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। একটি ভদ্রলোক কয়েকটি সুন্দর গান হারমোনিয়াম-সংযোগে গাইয়াছিলেন। তাঁহার মধুরকণ্ঠে 'যমুনালহরী' গীত প্রথম শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সে আনন্দের মধ্যেও এই গীত যেন হৃদয়ের অন্তস্তলে কিএক নিশ্বাস তুলিয়াছিল, কিএক গাম্ভীর্য্য ঢালিয়াছিল, আমাকে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী চলিয়া গেলে তখনকার ঢাকার সবজজ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়, অভয়বাবু ও অক্ষয়বাবু-প্রমুখ কতিপয় পূজনীয় ব্যক্তি ও বন্ধু আমার কবিতার আবৃত্তি শুনিতে চাহিলেন। কি আবৃত্তি করিয়াছিলাম মনে পড়ে না। গঙ্গাচরণবাবু আমার আলাপে ও আবৃত্তিতে পূর্ব্ববঙ্গের গন্ধ না পাইয়া বড় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। তাহার পর কিছুক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনার, এবং গঙ্গাচরণবাবুর নানাবিধ সরস গল্পের পর সভা ভঙ্গ হইল। অভয়বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সহোদরসম প্রাণকুমার—আজ উভয়ে ইহলোক হইতে তিরোহিত—তাঁহার নৌকায়

আমাকে ও তাঁহার অন্য বন্ধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 'বজরা' নৌকা বুড়ীগঙ্গার তীরলগ্ন ছিল। নৌকায় যাইতে একটা অতিশয় সংকীর্ণ অন্ধকার গলি দিয়া যাইতে হইয়াছিল ; সঙ্গে আলোক মাত্র ছিল না। আমাকে একজন হাত ধরিয়া অন্ধের মত লইয়া যাইতেছিলেন। নৃত্যগীতে ও পান আহারে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া, ফিরিয়া আসিবার সময়ে সেই অন্ধকার গলিতে ঢাকার একজন খ্যাতনামা উকিল সুরাদেবীর কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত সেবায় চঞ্চল হইয়া এরূপভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন, ও আমার রূপগুণের সমালোচনা করিতে লাগিলেন যে, আমার পক্ষে উহা বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রকুমারের গৃহে পঁহুছিয়া যখন পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে গেলাম, তখন দেখিলাম—আমার ঘড়ী ও চেন নাই। চন্দ্রকুমারকে সে কথা বলিলে, সে হাসিয়া বলিল যে, উকিল মহাশয় তামাসা করিয়া লইয়া গিয়াছেন। প্রাতে পাওয়া যাইবে। আমি কখনও বহুমূল্য ঘড়ী ব্যবহার করি না। ঐ যে ইংরাজী কথাটা আছে—"He that keeps a watch has two things to do. To pocket his watch, and watch his pocket too."

তবে চেনটি আমার পক্ষে অমূল্য। যে একটি রমণী-রত্নের বন্ধুত্বে আমার জীবনের প্রথম ভাগ প্রোদ্ভাসিত ছিল, এই চেনটি তাঁহারই কুন্তলে নির্ম্মিত ও তাঁহারই স্নেহে মণ্ডিত। অতএব উকিল মহাশয়ের এরূপ রসিকতায় আমি তাঁহার উপর আরও বিরক্ত হইলাম। রাত্রিতে আমার ভাল নিদ্রা হইল না। প্রত্যূষে উঠিয়া, চন্দ্রকুমারের দ্বারায় তাঁহার কাছে পত্র লেখাইয়া পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। উত্তর আসিল—বহুক্ষণ পরে—যে, তিনি লন নাই। আমার হৃদয়ে যেন শলাকা বিদ্ধ হইল। আহারান্তে মুখ প্রক্ষালন করিবার সময়ে নদীতে পড়িয়াছে সন্দেহ করিয়া, প্রাণকুমার সেখানে অন্বেষণ করিতে গেলেন। নদীতে তখন সামান্য একটুক জল ছিল। তাহাতে জলের নিম্নের বালি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছিল। প্রাণকুমার বলিলেন, তথাপি তিনি চারিদিকের বালি পর্য্যন্ত উল্টাইয়াছেন। সেখানে পড়িলে অবশ্য পাইতেন। আমিও জানিতাম যে, সেখানে পড়া অসম্ভব। তখন সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, উকিল মহাশয় মাতলামি করিয়া, একজন সদ্যপরিচিত লোকের সঙ্গে এরূপ রসিকতা করিয়াছেন বলিয়া সঙ্কোচ করিয়া দিতেছেন না, কিম্বা তিনি সেই মাতাল অবস্থায় ঘড়ী চেন কোথায় ফেলিয়া দিয়াছেন। মাতাল কখনও প্রাণান্তে কোনও কার্য্যের দ্বারা মাতাল বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে চাহে না। এ কথার আলোচনা হইতেছে, এমন সময়ে কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া, আমার চেনটির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া, উহা দেখিতে চাহিলেন। আমি অভ্যর্থনাসভায় কেবল সাদা ধুতি চাদর ও সাদা কোট লইয়া গিয়াছিলাম। আমি দেখিতেছিলাম যে, সেই অমল কৌমুদী-ধবল কোটের উপর নিবিড় ভ্রমর-কৃষ্ণ চেনের শোভা অনেকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন কি, অনেকে কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে না পারিয়া উহা ধরিয়া দেখাইয়াছিলেন। এ ভদ্রলোকদের কি উত্তর দিব? আমি চন্দ্রকুমার ও প্রাণকুমার চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম। শেষে অগত্যা তাঁহাদিগের কাছে আসল কথা চাপা রাখিয়া বলিলাম যে, উহা প্রাণকুমারের বোট হইতে আসিতে অন্ধকারে হারান গিয়াছে। শুনিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। তাঁহাদের একজন নব্য ডেপুটিও—নিমন্ত্রিত ছিলেন, তিনি জানিতেন যে, উহা যেরূপে কোটে লাগান ছিল, পড়িতে পারে না, এবং নিমন্ত্রণের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমি প্রকৃতিস্থ ছিলাম। পানকার্য্যটা আমি কখনও এ জীবনে দোষে পরিণত করি নাই। তিনি কথাটা প্রথম উপহাস বলিয়া চেনটি দেখিতে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে উহা সত্য সত্যই হারান গিয়াছে শুনিয়া বড় দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং কিরূপে সেরূপ চেন নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে, আমার কাছে তন্নতন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। ঢাকায় এ অপূর্ব্ব রসিকতায় আমি এতদূর মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম যে, ঢাকার এত আনন্দ ও অভ্যর্থনা আমার কাছে ঘোরতর মনস্তাপে পরিণত হইল।

সেইপ্রাতে আমার অধ্যয়ন-জীবনের সুহৃদ্ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পরম-শ্রদ্ধাস্পদ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি 'মধ্য বিধান' ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ ঢাকায় আসিয়াছিলেন। আমি শিবনাথের ব্রাহ্ম শাস্ত্রি-মূর্ত্তি আর কখন দেখি নাই। আমার ইচ্ছা হইল, বালকের মত ছুটিয়া গিয়া তাঁহার গলায় পড়ি। কিন্তু তিনি আমাকে ব্রাহ্মধরণের এক নমস্কার করিলেন। আমি তাহার অনুকরণ করিয়া ঋণ পরিশোধ করিলাম। তিনি তাঁহার চির-প্রসন্ন ও স্নেহপূর্ণ মুখে হাসিয়া বলিলেন—"কলেজে পড়িবার সময়ে দুজনেই কবিতা লিখিতাম। কিন্তু আজ আপনিই বা কোথায়, আর আমিই বা কোথায়?" আমি যেন কথাটা বুঝিলাম না, বলিলাম—উভয়ে ঢাকায় চন্দ্র-কুমারের বাসায়। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তাহা নহে, আজ আপনি কে, আর আমি কে?" আমি বলিলাম—"আপনি ধর্ম্মজগতের উপাচার্য্য! আর আমি বৃটিশ ধর্ম্মাধিকরণের বা অধর্ম্মজগতের ডেপুটি। আপনি প্রচারক, আমি বিচারক। আপনি জীবন সমর্পণ করিয়াছেন ধর্ম্মে, আমি দাসত্বে। আপনার নিত্যকর্ম্ম পুণ্যের আলোচনা। আমার নিত্যকর্ম্ম পাপের সমালোচনা। আপনি অনুসরণ করেন, পুণ্যাত্মাদের, আর আমি করি পাপীদের।" তিনি আবার উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি খুব contrast (তারতম্য) দেখাইতেছেন। সাহিত্য-জগতে আপনার স্থান কোথায় আর আমার স্থানই বা কোথায়, আমি তাহাই বলিতেছিলাম। আপনি এখন আমার কত উচ্চে!" আমি বলিলাম—আপনার স্থান কলিকাতার কীর্ত্তিপূর্ণ উচ্চ সৌধ-শিখরে আর আমার স্থান নিম্নভূমি কীর্ত্তিনাশার কূলে! আমি সাহিত্য-জগতেও 'আর্য্যদর্শনে' এক বৎসরব্যাপী গালিখাইতেছি। সেই উপাদেয় ভোগ বোধহয় আপনার ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। শিবনাথ বলিলেন—"আমি তাহা শুনিয়াছি, পড়ি নাই। পড়িবার প্রবৃত্তিও নাই। ইতরের গালিতে কিছু আসে যায় না।" তাহারপর দুজনে প্রাণ ভরিয়া গল্প করিলাম। সাহিত্য ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কথায় কথায় আমি তখন কিছু লিখিতেছি কি না, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—ঢের লিখিতেছি : সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, রিপোর্ট, আর কৈফিয়ৎ। আমার কথার উত্তরে তিনি বলিলেন—তিনি সম্প্রতি একটা কবিতা লিখিয়াছেন। তিনি একদিন তাঁহার এক ব্যারিষ্টার-বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। দেখিলেন, তাঁহার পত্নী অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যারিষ্টার-পত্নী বলিলেন যে, তিনি একটা ছাগল পুষিয়াছিলেন, উহা মরিয়া গিয়াছে। করুণ শিবনাথের হৃদয় সেই শোকাবহ ঘটনায় আর্দ্র হইল, এবং তাঁহার কবিত্বের দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি তখন অতীব গম্ভীরভাবে ও করুণ-কণ্ঠে সেই tragic (মহাশোকোদ্দীপক) 'ছাগবধ কাব্য' আবৃত্তি করিলেন। আবৃত্তি শেষ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কবিতাটি আমার লাগিল কেমন? আমি উদরস্থ হাসির তরঙ্গ চাপিয়া রাখিয়া বলিলাম—চমৎকার! কিন্তু আর দুইএকজন শ্রোতা উক্তরূপ আত্মসংযমে অশক্ত হইয়া, বারাণ্ডায় গিয়া এই ছাগলের শোকে হাসিতে লাগিলেন। হাসি সংক্রামক। তাহা শুনিয়া আমি আর না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না। স্বয়ং শিবনাথ ভায়াও পারিলেন না। আমি বুঝিলাম, শিবনাথ ভায়ার কলিকাতাবাস তাঁহার কবিত্বের পক্ষে বড় সুবিধাজনক হইতেছে না। হেমবাবুর 'জুবিলি' কবিতা পড়িয়াও আমি এরূপ মন্তব্য তাঁহাকে লিখিয়া-ছিলাম। তিনি কলিকাতায় না থাকিলে বোধ হয় কলিকাতার হুজুগ সম্বন্ধে এত কবিতা লিখিতেন না। স্মরণ হয়, 'বঙ্গদর্শন' একদিন বলিয়াছিলেন যে, আর কিছুদিন পরে 'বলদ-মহিমা' নাটক হইবে। বঙ্কিমবাবু এ 'ছাগল-মহিমা' কাব্য দেখিয়াছিলেন কি না জানি না।

মুন্সীগঞ্জের সবডিভিসনাল অফিসার একটাদিন মুন্সীগঞ্জে থাকিয়া যাইতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার ভ্রাতা, যিনি তখন মুন্সীগঞ্জে

মুন্সেফ ছিলেন ও অনেক ভদ্রলোক আমাকে দেখিবার জন্য বড় লালায়িত। তিনি সেজন্য শিবির হইতে ৪০ মাইল অশ্বারোহণে আসিয়া অভ্যর্থনায় যোগ দিয়াছিলেন। আমি রাজ-কার্য্যের অনুরোধে অসম্মত হইলাম। অগত্যা তিনি বলিলেন, তিনি আমার সঙ্গে এক-গাড়ীতে,—তখন রেল ছিল না,—নারায়ণগঞ্জে, এবং সেখান হইতে আমার নৌকাতে শীতললক্ষ্যা পার হইয়া মুন্সীগঞ্জে যাইবেন। তাহা হইলে অন্ততঃ এই কয়েকঘণ্টা আমার সঙ্গ পাইবেন। তিনি বড় আমোদপ্রিয় লোক ছিলেন। উভয়ে বড় আনন্দে এই কয়ঘণ্টা কাটাইলাম। মুন্সী-গঞ্জে নৌকা পঁহুছিলে তিনি বলিলেন যে, আমাকে ঘুরিয়া, মুন্সীগঞ্জের অপরপার্শ্বে গিয়া, পদ্মায় পাড়িদিয়া রাজনগর যাইতে হইবে। ঘুরিয়া অপরপার্শ্বে যাইতে প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগিবে। অতএব এই ৬ ঘণ্টা কাল নৌকাতে না কাটাইয়া, মুন্সীগঞ্জে কাটাইয়া গেলে যখন এতগুলি ভদ্রলোক চরিতার্থ হইবেন, তখন আমার তাঁহাদিগকে নিরাশ করা উচিত নহে। তিনি আমার মাঝিকে তাঁহার কথার সাক্ষী মানিলেন, এবং সর্ব্বশেষ বলিলেন যে, আমি তাঁহার এলেকায় আসিয়াছি, অতএব তিনি জোর করিয়া নৌকা আটকাইয়া রাখিবেন। আমি তাঁহার আদরে ও আবদারে অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম। তাঁহার সবডিভিসন-গৃহে উপস্থিত হইবামাত্র উহা লোকপূর্ণ হইয়া গেল। শুধু কবি দর্শনের জন্য সকলেই আসেন নাই। অনেকেই মাদারিপুরের শাসনকর্ত্তাকেও দেখিতে আসিলেন, এবং আমার ২।১ শাসন-কাহিনীর উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, এ দুরন্ত সবডিভিসনকে কেহ এরূপ শাসন করিতে পারে নাই। কয়েকটি ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া রহিলেন। অবশিষ্ট চলিয়া গেলে ইহাঁদের, বিশেষতঃ ডেপুটিবাবুর ভ্রাতার খেয়াল হইল যে, কবির গা দেখিবেন। আমি কিছুতেই গায়ের পিরান খুলিব না। তাঁহারা তখন বাহিরে আমার স্নানের বন্দোবস্ত করিলেন। আমি বলিলাম, আমি কখনই বাহিরে স্নান করি না। আমার সদ্য জ্বর হইবে। বিশেষতঃ আমার স্বাস্থ্য ভাল নহে। কিছুতেই ছাড়িলেন না। আমি তখন পিরান সুদ্ধ স্নান করিতে গেলাম। তখন দুইভ্রাতা জোর করিয়া আমার গায়ের পিরান খুলিয়া তাঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিলেন।

কোথায় ৬ ঘণ্টা! আমাকে সমস্তদিন রাখিলেন। সেদিন তাঁহারা কেহই কাচারি গেলেন না, এবং আমাকে কিছুতেই আসিতে দিলেন না। অপরাহ্নে মুন্সীগঞ্জ বেড়াইয়া দেখিলাম। যদিও শীতললক্ষ্যা মুন্সীগঞ্জ হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়া উহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে, তথাপি সবডিভিসন-বাঙ্গলাটি একটা উচ্চস্থানের উপর নির্ম্মিত বলিয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। শুনিলাম, স্থানটি মগদের সময়ে দুর্গ ছিল। মগেরা কি এতদূর অধিকার করিয়াছিল? আনন্দ-উৎসবে প্রায় অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত অতিবাহিত করাইয়া, তাঁহারা সঙ্গে আসিয়া, আমাকে মুন্সীগঞ্জের অপরপার্শ্বে নৌকায় তুলিয়া দিলেন। একটাদিন মুন্সীগঞ্জে বড় সুখে কাটাইয়া, পরদিন প্রাতে পদ্মার তরঙ্গ ভেদ করিয়া রাজনগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন পদ্মার মনোহর শান্ত-নীল-মৃদু-তরঙ্গায়িত শোভা দেখিতে দেখিতে আমার অপহৃত চেনটির কথা মনে পড়িল। এ চেনটি জীবনের যে একটি অত্যুজ্জ্বল সুখদ স্নেহসিক্ত অঙ্কের সাক্ষী ছিল, তাহাতে যবনিকা পড়িয়া গিয়াছিল। সেই অতীত সুখ-স্মৃতিতে নয়ন সজল হইল। সেই মোহ-স্বপ্নের যে শেষ নিদর্শনও হারাইলাম, তাহাতে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল তরণীর গবাক্ষপথে পড়িয়া মহাকালীরূপিণী পদ্মার অনন্ত সলিলরাশিতে মিশিয়া গেল।

রঙ্গমতী কাব্য

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আমি চট্টগ্রাম কমিশনরের পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই, স্মরণ হয়, আমার "পলাশির যুদ্ধ" প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেশব্যাপী যেরূপ

আন্দোলন উঠে, এবং যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রকাশ হইবামাত্র উহা 'ন্যাশনাল' রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা কেবল আমার আশাতীত নহে, স্বপ্নাতীত। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া কিছুদিন পরে 'রঙ্গমতী' লিখিতে আরম্ভ করি। প্রথম সর্গ লিখিবার পর স্থির করিয়াছিলাম যে, কেবল কল্পনার চক্ষে নহে, চর্ম্মচক্ষেও 'রঙ্গমতী' দেখিয়া কাব্যখানির অবশিষ্ট অংশ লিখিব। 'রঙ্গমতী' চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য অঞ্চলের রাজধানী 'রাঙ্গামাটি' (Rangamati)। উহা চট্টগ্রাম কমিশনরের অধিকারভুক্ত। তাহার পরবৎসর 'দেবাগিরি'তে (Demagri), লুসাইদিগের মেলা উপলক্ষে কমিশনর সেখানে যাইবেন প্রস্তাব হয়। 'দেবাগিরি' 'রঙ্গমতী' অপেক্ষাও গভীরতর পার্ব্বত্য প্রদেশান্তরে অবস্থিত। সেখানে একটি বিখ্যাত জলপ্রপাত। বহুঊর্দ্ধ হইতে বিপুল ধারায় কর্ণফুলী সরলরেখায় পতিত হইতেছে। শুনিয়াছি, ইহার শোভা অতুলনীয়া। যেরূপ শুনিয়াছি, কিঞ্চিৎ 'রঙ্গমতী'তে বর্ণনা করিয়াছি। অতএব আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। আমি অনেক অনুনয় করিয়া বলাতে কমিশনর আমাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। মেলার তিনদিন পূর্ব্বে ডেপুটি কমিশনর টেলিগ্রাম করিলেন যে, রাঙ্গামাটির জেলে একজন কয়েদীর ওলাউঠা হইয়াছে। শুনিবামাত্র কমিশনর পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। আমি তাঁহাকে কত বুঝাইলাম, শেষে নিজে ডেপুটি কমিশনরকে টেলিগ্রাম করিয়া উত্তর আনাইলাম যে, ভয়ের কারণ নাই, তথাপি কমিশনর কেবল রাঙ্গামাটির পাশ্বদিয়া ষ্টীমারে দেবাগিরি যাইতে সম্মত হইলেন না। আমাকে বলিলেন—"তুমি নিরাশ হইও না। আমরা আগামী বৎসরের মেলায় যাইব।" আমিও 'রঙ্গমতী' লেখা আগামী বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিলাম। ইহার কিছুদিন পরে আমি একবার কমিশনরের সঙ্গে তাঁহার পরিদর্শন উপলক্ষে রাঙ্গামাটি গিয়াছিলাম। তাহাও অনেক সাধ্যসাধনার পর লইয়াছিলেন। কিন্তু দেবাগিরির জলপ্রপাত ও পার্ব্বত্য অঞ্চলের গভীরতর প্রদেশের অচিন্তনীয় সৌন্দর্য্য-দর্শন আমার ভাগ্যে আর ঘটিল না। যাহা দেখিলাম, তাহাতে নয়ন মন মোহিত হইল। ষ্টীমার যখন পার্ব্বত্য রাজ্যে প্রবেশ করিল, তখন নদীর উভয় পার্শ্বে প্রকৃতির শোভার ভাণ্ডার খুলিয়া গেল। কর্ণফুলীর জোয়ার এতদূর আসে না। কাজেই নদী বনরাজ্যের প্রবেশদ্বার হইতে নীল নির্ম্মলসলিলা। নদী ঘুরিয়া ফিরিয়া নীলমণি হারের মত শোভা পাইতেছে। উভয় তীর হইতে পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, পর্ব্বতের পশ্চাতে পর্ব্বত, বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন হইয়া, নীল আকাশ-পটে তরঙ্গের পর মরকত-তরঙ্গ খেলিয়া ছুটিয়াছে। স্থানে স্থানে অধিত্যকায় পর্ব্বতবাসী নানা জাতি 'জুমিয়া'দের গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতপুত্রেরা দলে দলে সমবেত হইয়া, একস্থানের বন কাটিয়া তাহা খাণ্ডবের মত পোড়াইয়া ফেলে, এবং সেইস্থানে এক এক গর্ত্ত করিয়া তাহাতে নানাবিধ দ্রব্যের বীজ রোপণ করে। পর্ব্বত এরূপ উর্ব্বর যে, সেই একই গর্ত্ত হইতে যথাসময়ে প্রত্যেক ফসল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই ক্ষেত্রকে 'জোম' বলে এবং যাহারা এরূপ কৃষি করে, তাহাদিগকে 'জুমিয়া' বলে। ইহাদের মধ্যে মগ, ত্রিপুরা, চাকমা, লুসাই প্রভৃতি নানা জাতি আছে। ইহাদের সাধারণ নাম—'জুমিয়া'।

ইতিপূর্ব্বে বন্ধুদের মুখে শুনিয়া, আমার 'জুমিয়া-জীবন' কবিতায় এই জুমিয়াদের জীবন চিত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সেই কবিতাটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমবাবুপ্রমুখ অনেকেই পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, চিত্রটি কাল্পনিক, কি প্রকৃত। তাহাদের জীবনের সরলতায় যেন পাঠকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এবার ষ্টীমারবক্ষঃ হইতে প্রথমতঃ সেই জুমিয়াদের দেখিয়া আমার যে কি আনন্দ হইল, বলিতে পারি না। ষ্টীমার দেখিবার জন্য আনন্দধ্বনি করিয়া নদীতীরে নর নারী ও শিশুগণ দাঁড়াইতেছে, আর যেন পার্ব্বত্য পটে এক একটা বিচিত্র চিত্র ভাসিয়া উঠিতেছে। স্ত্রী পুরুষদের সকলেরই দীর্ঘ মসৃণ কেশ, পুরুষদের সম্মুখে, এবং রমণীদের পশ্চাতে খোঁপায় বিন্যস্ত। স্ত্রী পুরুষ

উভয়ের পরিধান—রমণীদের স্বহস্তবুনিত "থামি"। তাহাতে শ্বেত, নীল, রক্তরেখা। তদুপরে রমণীদের বক্ষে রক্তজবাকুসুমসঙ্কাশ বস্ত্রের বেষ্টন। খোঁপায় নানাবিধ পার্ব্বত্য পুষ্পপল্লব। কর্ণে বিরাট্ পিতলের বা শঙ্খের কুণ্ডল, এবং গলায় পুঁতির মালা। তাহাদের বর্ণ উজ্জ্বল গৌর। এত উজ্জ্বল যে, রবিকিরণ তাহাতে ও বক্ষঃস্থিত রক্ত আবরণে প্রতিফলিত হইয়া অগ্নিবৎ জ্বলিতেছে। চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে। তাহাদের দৃঢ় বলিষ্ঠ সুগঠিত দেহ। হৃদয়ের তরল সরলতাব্যঞ্জক মুখভরা সরল হাসি। এই পার্ব্বতীর ও পর্ব্বতের শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা অপরাহ্নে রঙ্গমতী গিয়া পঁহুছিলাম। সেখানে আমার বহুতর আত্মীয় কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহারা আমাকে অতিশয় সমাদরে ষ্টীমার হইতে লইয়া গেলেন। যাঁহার দানশীলতা ও পরার্থ-আত্মবিসর্জ্জন চট্টগ্রামে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিত, এবং যাঁহার সুনাম এখনও রঙ্গমতীর শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রতিধ্বনিত, আমি সেই জগৎ পেস্কার মহাশয়ের অতিথি হইলাম, এবং তিনদিন রাজসুখে অতিবাহিত করিলাম। এইসময়ে বহু জুমিয়ার বাড়ী বেড়াইয়াছিলাম। তাহাদের বাঁশের মাচায় নির্ম্মিত পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলে সমস্ত পরিবার বহির্গত হইয়া তোমাকে পদতলে প্রণত হইয়া প্রণাম করিবে, এবং গৃহিণী তোমার অভ্যর্থনার জন্য তাহার স্বহস্তবিনিঃসৃত সুরা আনিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিবে। সেই সুরা এত উগ্র যে, তাহা স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। যাহার গৃহে সুরা নাই, সে অভ্যর্থনা করিতে না পারিয়া লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। সুরা মৃৎপাত্রে সম্মুখে স্থাপন করিয়া, পরিবারস্থ সকলেই তোমার সমক্ষে বসিবে এবং গৃহিণী অগ্রে পান করিয়া, তোমাকে পান করিতে অনুরোধ করিবে। তাহাদের সে সরল অভ্যর্থনা, সুরাপান, নৃত্য ও গীত যে একবার দেখিবে, সে বুঝিবে যে, সুখ ও শান্তি উচ্চ রাজপ্রাসাদে নহে, এ সকল দরিদ্র বনবাসীর পর্ণকুটীরে। ইংরাজী সভ্যতার সংঘর্ষণে তাহারা সেই সরলতা ও শান্তি ক্রমে হারাইতেছে। একটি কুটীরে বন্ধুদের পরিচিতা একটি ইংরাজ-জনকজাতা যুবতী রসিকতা করিয়া বাহির না হইয়া কুটীরের অভ্যন্তরে বসিয়া ছিল। বন্ধুগণ বাহির হইয়া আসিতে বলিলে সে বলিল—"তোমাদের শক্তি থাকে ত বাহির করিয়া লইয়া যাও।" বন্ধুগণ তিনচারি জন তাহার দুই সুগোল বলিষ্ঠ বাহু ধরিয়া দ্বন্দ্ব করিলেন, কিন্তু সে যে পদ্মাসন করিয়া বসিয়া হাসিতেছিল, তাহাকে একইঞ্চিও সরাইতে পারিলেন না। তাহার পিতা মাতা ভ্রাতাগণ দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। শেষে সে বন্ধুগণের দুর্ব্বলতায় ধিক্কার দিয়া—হায়! বাঙ্গালী-জীবন—আপনি হাসিতে হাসিতে উঠিয়া আসিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল। গৃহে সম্বলের মধ্যে দুইএকটি মৃৎ ও বংশপাত্র ও দুই একখানি চাঁচ—পুরু পাটিবিশেষ। বাহুর উপর মাথা রাখিয়া, এই চাঁচের উপর মাত্র ইহারা শুইয়া থাকে। আহার্য্যের মধ্যে মোটা চাউল, শুষ্ক মৎস্য ও পার্ব্বত্য নির্ঝরের অমৃত-শীতল নির্ম্মল জল। তথাপি তাহারা কত সুখী!

রঙ্গমতী হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই আমি বিপদস্থ হইয়া চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হইয়া পুরী যাই। সেখানে আর 'রঙ্গমতী'তে হস্তক্ষেপ করি নাই। বিপদে, তাহারপর ভ্রাতৃশোকে, তাহারপর পুরীর রাজার মোকদ্দমায় অবসর পাই নাই। মাদারিপুর আসিয়া কার্য্যভারে নিষ্পেষিতপ্রায় হইয়া প্রথমবৎসর অতিবাহিত করি। দুইমাস ছুটি লইয়া বাড়ী আসিলে তিনবৎসর পরে আবার 'রঙ্গমতী' লিখিতে আরম্ভ করি, এবং মাদারিপুর ফিরিয়া গিয়া শেষকরি। এরূপে প্রায় পাঁচবৎসরে 'রঙ্গমতী' লিখিত হয়। স্মরণ হয়, একদিন প্রাতে বসিয়া শেষঅঙ্ক লিখিতেছি। সেই শোক-দৃশ্যে আমার কপোল বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতেছে। এমন সময় প্রথমতঃ পেস্কার একরাশি সমন ও ওয়ারেণ্ট—একটা ক্ষুদ্র গন্ধমাদনবিশেষ—লইয়া উপস্থিত। সে আমার অশ্রুধারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিল—"বাড়ী হইতে কোন কুসংবাদ আসে নাই ত?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"না। সকল কাগজ কাচারি গিয়া দস্তখত করিব। এখন নহে।" সে একটু ভীতকণ্ঠে

বলিল—"সেসনের মোকদ্দমার সমন। আজ ডাকে না গেলে জারি হইবে না।" তখন কবিতা লেখা ক্ষান্ত করিয়া ঘণ্টাখানিক দস্তখত বর্ষণ করিলাম। পেস্কার চলিয়া গেল। আবার সেইরূপ গলদশ্রুনয়নে করুণভাবে বিভোর হইয়া লিখিতেছি, এমন সময়ে হেড কেরানি আর একরাশি কাগজ ও বাণ্ডিল লইয়া উপস্থিত। লোকটি বড় ভালমানুষ ও ভীরু। সেও আমার অশ্রুধারা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কি জিজ্ঞাসা করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে মনে করিল, আমি নিশ্চয় কোনও শোক-সংবাদ পাইয়াছি। তাহার সে ভাব দেখিয়া, আমি অশ্রু মুছিয়া হাসিয়া বলিলাম—"আমি বড় কাজে ব্যস্ত। কাচারি গিয়া তোমার কাজগুলি করিলে হয় না?" সেও ভয়ে ভয়ে বলিল—"কতকগুলি জরুরি রিটার্ণ ও চিঠি আছে। আজ ডাকে না গেলে চলিবে না।" তখন বিরক্ত হইয়া, কবিতার হস্তলিপিটি দূরে গৃহকোণায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম—"আন।" সে বড় ভীত হইয়া বলিল—"তবে এখন থাক্। কাচারির সময় করিবেন।" আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম—"না", এবং হাত বাড়াইয়া কাগজ লইলাম। স্নানের সময় পর্য্যন্ত কাজ করিয়া উঠিয়া গেলাম। 'রঙ্গমতী'র হস্তলিপি সেই কোণায় পড়িয়া রহিল। ভৃত্য উঠাইতে চাহিলে বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিতাম। প্রায় ১৫ দিন যাবৎ আর এক মুহূর্ত্তও অবসর পাইলাম না। অগত্যা একদিন কিঞ্চিৎ সময় করিয়া উহা উঠাইয়া আনিলাম। কিন্তু লিখিব কি? প্রাণে সেই উচ্ছ্বাস নাই, হৃদয়ের সেই ভাব নাই; নয়নে সেই অশ্রু আসিল না। কি কল্পনা করিয়াছিলাম, সকলই ভুলিয়া গিয়াছি। জোর করিয়া অঙ্কটি শেষ করিলাম। হায়! দাসত্বজীবী বাঙ্গালী কবি! এ অবস্থায়ও কি কবিতা লেখা যায়?

কাব্যখানি শেষকরিয়া স্থির করিলাম যে, বঙ্কিমবাবুকে উহা উপহার দিব। তিনি উহা গ্রহণ করিবেন কি না জিজ্ঞাসা করিয়া হস্তলিপি তাঁহার কাছে পাঠাইলাম। কিছুদিন পরে তাঁহার এই উত্তর পাইলাম।

Chinsurah
July 15/80

My dear *Nati*

I have read through your delightful poem,—and I was detaining it for the purpose of giving it a second perusal. As, however, the publication is being delayed, the second perusal may stand over till it is the property of the public.

The dedication of it would be an honour to any Bengali—and it is an honour which I certainly have done nothing to deserve. But as *undeserved* honours are the order of the day, I do not see why I should scruple to receive my share. So fire away, and glorify grandad to your heart's content.

I am afraid that History (ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা এক সময়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল) is not likely to make much progress. I have, however, got through a few chapters (সেগুলি কি হইল?) and also through a novel (আনন্দমঠ)—so to call it—but I have not the slightest idea when the latter will be ready for publication.

Trusting this will find you all serene,

I remain,
yours affectionately
(Sd) Bankim Ch Chatterjee.

কি বিষয়ে নূতন 'নভেল' (উপন্যাস) লিখিতেছেন, আমি জিজ্ঞাসা করি এবং বরাবর যেরূপ তাঁহাকে লিখিতাম, এবারও লিখি যে, ইংরাজী পীরিতের ছায়া ছাড়িয়া, তিনি যেন দেশভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃভগ্নীপ্রেম—যাহা রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা এবং আমাদের জাতিগত লক্ষণ—লইয়া যেন নূতন উপন্যাসটি রচনা করেন। তিনি তদুত্তরে লেখেন, তিনি এবার আমার অনুরোধ রক্ষা করিতেছেন। এই নূতন উপন্যাসটি ঠিক 'রঙ্গমতী'র পথে যাইতেছে—"It follows exactly the lines of your Rangamati"—এবং 'রঙ্গমতী'র দরুন তাহার কয়েক অধ্যায় তাঁহাকে পরিবর্ত্তন করিতে হইতেছে। উহাই 'আনন্দমঠ।'

এরূপে 'রঙ্গমতী' অমর বঙ্কিমচন্দ্রের পবিত্র নামে উৎসর্গ-পত্র বক্ষে লইয়া তাঁহার প্রেমাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রকাশিত হইল।

ইহার কিছুকাল পরে আমি বেহার হইতে কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়া একদিন প্রাতে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা করিতে যাই। তিনি তখন বউবাজারে একটি দ্বিতল গৃহে ছিলেন। 'রঙ্গমতী' ও তাঁহার 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। 'আনন্দমঠ' তখন বাহির হইয়াছে। আমি বলিলাম—তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' গীত ভারতবর্ষের 'মারসেলেজ গীত' হইবে। তিনি বলিলেন—"বটে! উহা তোমার এত ভাল লাগিয়াছে?" আমি তখন উহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলিলাম যে, উহার মাঝে মাঝে বাঙ্গালা লাইনগুলি বসাইয়া তিনি গীতটি মাটি করিয়াছেন। ঐ লাইনগুলি গীতটির প্রাণ ও গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছে। উহা আমার মোটেই ভাল লাগে না। কেমন খাপছাড়া খাপছাড়া বোধ হয়। আগাগোড়া সরল সংস্কৃত হইলে ভাল হইত। তিনি বলিলেন—"বাঙ্গালা লাইনগুলি তোমার ভাল না লাগে, উহাদের তুমি বাদ দিয়া পড়িও।" আমি বলিলাম—"আপনার ঐ দেমাকেই আমরা মারা গেলাম।" তখন তিনি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তুমি গানটি গাইতে শুনিয়াছ কি?" আমি বলিলাম—না। তিনি—"গাইতে শুনিলে তুমি এরূপ বলিবে না।" আমি—"সকলে ত আর গাইয়া শুনিবে না। অধিকাংশ লোক পড়িবে। বিশেষতঃ আমার যখন বিশ্বাস যে, উহা সমস্ত ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হইবে, তখন গীতটির মাঝে মাঝে বাঙ্গালা থাকিলে অন্যস্থানের লোকেরা তাহা বুঝিতে পারিবে কেন? কেবল এই কারণেই সমস্ত গীতটি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারিবে না। আমার মতে বাঙ্গালা লাইনগুলিও সরল সংস্কৃত করিয়া দিলে, এবং 'সপ্তকোটি'র স্থানে 'ত্রিংশ কোটি' দিলে ভাল হয়।" তিনি নীরবে তামাক সেবন করিতে করিতে একটুক ভাবিলেন! আর কোনও উত্তর দিলেন না। আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হইয়াছে। ২৫ বৎসর পরে আজ গীতটি বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত হইয়াছে। এবং বাঙ্গালা লাইনগুলি উহা ভারতবর্ষের জাতীয় সঙ্গীত হইবার পথে অন্তরায় হইয়াছে। এ কারণে তাহার প্রথমাংশ মাত্র সর্ব্বত্র গীত হইতেছে, এবং গীতটির উক্তরূপ পরিবর্ত্তন প্রয়োজনীয় হইয়াছে। 'বন্দে মাতরম্' শব্দদুটি আজ ভারতবর্ষের জাতীয় উত্থানের বীজমন্ত্র—প্রণব। কি শুভক্ষণে, কি ঐশী শক্তিতে এই মহাগীতটি রচিত হইয়াছিল! আমিই বঙ্কিমবাবুর প্রত্যেক উপন্যাস উপহার পাইয়া স্বদেশপ্রেমমূলক একখানি উপন্যাস লিখিতে তাঁহাকে বরাবর অনুরোধ করিয়াছিলাম। অতএব আজ আমার আর আনন্দের সীমা নাই। ভগবন্! সকলই তোমার লীলা! তুমি এই পতিত জাতির হৃদয়ে ঐক্য, সমতা ও শক্তি দেও, যেন এই মহামন্ত্র সাধনের দ্বারা এইজাতি উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

বঙ্কিমবাবু সেইদিন সান্ধ্য আহারের জন্য আমায় নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং আরও কয়েকটি বন্ধুকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করিবেন বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"রবি ঠাকুরের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি?" আমি বলিলাম—"যৎসামান্য

এবং বহুদিনের।" তিনি বলিলেন—তোমাদের পরিচয় হওয়া উচিত। He is a talented young man (তিনি একজন শক্তিশালী লোক)। সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হেমবাবু ও আরও কয়েকটি নিমন্ত্রিত উপস্থিত। বঙ্কিমবাবু বলিলেন,—"রবি কোনও কারণে আসিতে পারেন নাই।" বড় আনন্দে নানাবিধ সাহিত্যালাপে সন্ধ্যাটি কাটাইলাম। তাহার কিছুকাল পরে 'প্রচারে' "রবির ছায়া" পড়িয়া স্তম্ভিত হইলাম। বুঝিলাম, রবিবাবু কোনরূপে বঙ্কিমবাবুর শাণিত অভিমানে আঘাত করিয়াছেন। বিষয়টা কি, বুঝিলাম না।

এই সাক্ষাৎসময়ে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকতা পরিত্যাগ 'রঙ্গমতী'র দুর্ভাগ্যের কারণ হইয়াছে। 'রঙ্গমতী' ও তাঁহার 'আনন্দমঠ' উভয় কিছু অসাময়িক হইয়াছে। উহাদের appreciation (রসজ্ঞতা) সময়সাপেক্ষ। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় পর্য্যায় 'বঙ্গদর্শনে' 'রঙ্গমতী'র একটা সামান্য সমালোচনা প্রকাশিত হইল। শুনিলাম, উহা সঞ্জীববাবুর লেখা।

বহুকাল পরে নির্ব্বাপিতপ্রায় 'বান্ধবে' স্বর্গীয় প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত একটি সমালোচনা কয়েক সংখ্যায় প্রচারিত হইল। তাহাও অল্পসংখ্যক পাঠকের মাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এরূপে সূতিকা-গৃহের ঐ সকল বিঘ্নে 'রঙ্গমতী' যে চাপা পড়িল, আর তাহা কাটাইয়া উঠিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিল না। তবে সময়ে সময়ে দুই একজন পাঠক 'রঙ্গমতী'র অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছিলেন যে, 'রঙ্গমতী'র বীরেন্দ্র "অনাগত মহাপুরুষ," অতএব বর্ত্তমান সময়ে পুস্তকখানির তত প্রতিপত্তি হইবে না। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই।

বইখানি প্রকাশ হইবামাত্র সুহৃদ্‌বর ঈশান লিখিয়া পাঠাইলেন যে, বহিখানিতে কেবল পাহাড় পর্ব্বত। তাঁহার উহা ভাল লাগে নাই। প্রাকৃতিক বর্ণনা বাদ দিলে ভাল হইত। যে ডাকে তাঁহার পত্র পাই, সেই ডাকে একজন ব্যারিষ্টার বন্ধুর পত্র পাই। তিনি বইখানির, বিশেষতঃ পার্ব্বত্য প্রকৃতির বর্ণনার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে, 'স্কটে'র কাব্য ভিন্ন তিনি এরূপ বর্ণনা পাঠ করেন নাই। পাঠ করিতে করিতে স্কটলণ্ডের পার্ব্বত্য দৃশ্য সকল তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। আমি তাঁহার পত্রখানি ঈশানের কাছে, এবং ঈশানের পত্রখানি তাঁহার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। যথার্থই লোকের রুচি বিভিন্ন! 'কলিকাতা রিভিউ'তে 'রঙ্গমতী'র যে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে উহাকে Romance in verse, (কবিতায় উপন্যাস) বলিয়া সমালোচক প্রশংসা করিয়াছিলেন। কোনও ভদ্রমহিলা দার্জ্জিলিঙ্গ গিয়া আমাকে একখানি 'রঙ্গমতী' তাঁহার কাছে পাঠাইতে লেখেন। কারণ, দার্জ্জিলিঙ্গের তিনি যে দিক্ দেখিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার 'রঙ্গমতী'র বর্ণনা মনে পড়িতেছিল, এবং বহিখানি হিমালয়ের শিখরে বসিয়া পড়িতে বড় ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু আমি বঙ্গদেশের উচ্চভূমিবাসী (High Lander) হইলেও পার্ব্বত্য প্রকৃতির অচিন্তনীয় শোভা অল্প বাঙ্গালীই দর্শন করিয়াছেন। উহাই 'রঙ্গমতী'র দুরদৃষ্ট।

মাদারিপুরে আর দুইটি মাত্র খণ্ড কবিতা লিখিয়াছিলাম—'কীর্ত্তিনাশা' ও 'মেঘনা'। যাহার কীর্ত্তিকলাপ নাশ করিয়া 'ভীষণং ভীষণানাং' এই স্রোতস্বতীর নাম 'কীর্ত্তিনাশা' হইয়াছে, রাজবল্লভের সেই রাজনগরে শিবিরে বসিয়া 'কীর্ত্তিনাশা' কবিতাটি লিখিয়াছিলাম। স্মরণ হয়, ঢাকার 'বান্ধব' উহা এবং ঈশ্বর গুপ্তের কীর্ত্তিনাশা ও পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণ-সম্বলিত একটি পুরাতন কবিতা পাশাপাশি ছাপিয়া একটি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ভূমিকার দ্বারা বঙ্গ-কবিতার ও ভাষার ৫০ বৎসরের মধ্যে কিরূপ রূপান্তর হইয়াছে, দেখাইয়াছিলেন। 'মেঘনা', স্মরণ হয়, প্রথমতঃ 'সাধারণী' পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। 'মেঘনা' পূর্ব্ববঙ্গের বিশাল লীলাতরঙ্গিণী, অতএব কবিতাটি পশ্চিমবঙ্গের 'সাধারণী'তে দিয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি অবিচার করিয়াছি বলিয়া 'বান্ধব' উহা উদ্ধৃত করেন। এই কবিতাটি ডামুকদিয়া হাটের

নিকটে মেঘনাতীরস্থিত শিবিরে বসিয়া এবং মেঘনার বাসন্তীশান্ত, বিস্তৃত, অনন্ত শোভা দেখিয়া দেখিয়া লিখিয়াছিলাম। উভয় কবিতাই পুত্রশোকাতুরের হৃদয়-রক্তে-রঞ্জিত। 'মেঘনা'র শেষে ভূতপূর্ব্ব জীবনের অবিরাম বিপদ্ ও শোক স্মরণ করিয়া লিখিয়াছিলাম—

"ঝটিকায় ঝটিকায় গিয়াছে আমার
অর্দ্ধেক জীবন।
জানু পাতি মেঘনা-তীরে ভাসি আজি অশ্রুনীরে,—
এবে দয়া কর নাথ! জুড়াও জীবন!
দেও দিনেকের শান্তি, মেঘনা যেমন!"

ঝটিকায় ঝটিকায় অর্দ্ধেক ছাড়িয়া, এখন হা! নাথ! সমস্ত জীবন যাইতে চলিল। কই, একদিনের জন্যও শান্তির মুখ দেখিলাম না। এই শেষ জীবনেও মস্তকের উপর রাজকীয় বজ্র গর্জ্জন করিতেছে। রাজকার্য্য হইতে অবসর লইয়া দিনেকের শান্তির জন্য যে গৃহে আসিলাম, তাহাতেও জ্ঞাতিশত্রুর গুপ্ত জালে পড়িয়া তোমারই দিকে চাহিয়া আছি।

নৌ-ডাকাত (River Dacoits)

মাদারিপুর সবডিভিসন নৌ-ডাকাতদের জন্য বিখ্যাত। এরূপ জনশ্রুতি যে, কোন কোনও জমিদার এ ব্যবসায় করিয়া অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। আমার মাদারিপুর কার্য্যভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম যে, ফৌজদারী কাচারির সম্মুখে আড়িয়ালখাঁ নদীতে দুপুরবেলা ডাকাতেরা এক নৌকা আক্রমণ করিয়া, তাহার আরোহীদের প্রতি বন্দুক চালাইয়া, সমস্ত মাল লুটিয়া, নিরাপদে চলিয়া যায়। ঘটনা সবডিভিসন অফিসারের চক্ষুর উপর হইয়াছিল বলিলেও চলে; তথাপি একজন অপরাধীও ধৃত হয় নাই। আমার সময়ে মাদারিপুরের এলেকায় এরূপ ঘটনা হয় নাই। তথাপি অনেকের বিশ্বাস যে, এই এলেকার নমঃশূদ্রেরা দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতি করে। আমি প্রথম বৎসর মাদারিপুরের খুন, হাঙ্গামা, জখম ইত্যাদি নিবারণ করিয়া, শান্তিস্থাপনের কার্য্যে অতিবাহিত করি। তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া আমি এই নৌ-ডাকাতদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করি। মফঃস্বল পরিভ্রমণ সময়ে জানিতে পারিলাম যে, এ ডাকাতেরা আমার ভয়ে হাঁড়ি কি কুমড়া বিক্রয়ের ছল করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া, ঢাকা বরিশাল অঞ্চলে গিয়া ডাকাতি করে। আমি তাহাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র নোটবুক নিজে খুলিলাম, এবং গোপনে চৌকিদারদিগকে বলিয়া দিলাম যে, যখন ইহারা দলবদ্ধ হইয়া ঐরূপ ব্যবসায়ে বহির্গত হয়, চৌকিদারেরা যেন গোপনে পুলিসে খবর দেয়, এবং পুলিস আমাকে সংবাদ দিয়া যেন তাহাদের কার্য্যের অনুধাবন করিতে থাকে। এরূপে যখন যে দল যে দিকে যাইত, আমি সে দিকের মাজিষ্ট্রেটদের কাছে গোপনে তাহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য সংবাদ দিতাম। কিন্তু একজন বাঙ্গালী সবডিভিসনাল অফিসারের কথায় ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট কর্ণপাত করিবেন কেন? তাঁহার এলেকায় কেহ ডাকাতি করিবে সাধ্য কি? তিনি স্বয়ং দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। কাজেই কিছুদিন আমার যত্ন নিষ্ফল হইল।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে কুমার নদের বাঁধঘাটে আমরা ধর্ম্মাবতারের দল বসিয়া খোস গল্প করিতেছি, এমনসময় শিবচর থানার দারোগা আসিয়া, আমাকে ডাকিয়া লইয়া গোপনে বলিল যে, তাহার এলেকার এগারজন সন্দিগ্ধ নমঃশূদ্র যে কুমড়া বিক্রয় করিবার ছলে বরিশালের দিকে গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং বাড়ীতে খুব ধুমধাম করিয়া বিবাহ ইত্যাদি করাইতেছে। তাহাছাড়া সে এলেকার একজন মহাজন সাহু, যে বরিশালের দক্ষিণদিকে বহুকাল হইতে খুব বড় কারবার করিতেছে, তাহার বাড়ীতে সংবাদ আসিয়াছে

যে, সে চরে চরে সোণা রূপার বেপার করিতে গিয়া একুশদিন যাবত নিরুদ্দেশ হইয়াছে। দারোগা বলিল, ইহাতে তাহার মনে কিছু সন্দেহ হইয়াছে। আমি একটুক চিন্তা করিয়া তাহাকে বলিলাম যে, উক্ত এগারজনের মধ্যে সে যাহাকে অগ্রে পায়, তাহাকে ধরিয়া, কোনও কথা না বলিয়া যেন আমার কাছে লইয়া আসে। সে পরদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় সেই ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, একজন লোক ধরিয়া আনিয়াছে। তাহাকে সে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, সে বড় ভয় পাইয়াছে, এবং সকল কথা একবার করিবে। আমি উঠিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে গেলাম। দারোগা নৌকা হইতে সে লোকটাকে উঠাইয়া লইয়া সেখানে লইয়া গেল। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি। স্থূলে, বলিষ্ঠ, কৃষ্ণকায়, চক্ষু দুটি কোটরস্থ ও রক্তবর্ণ, শরীরে মাংসপেশী ফাটিয়া পড়িতেছে। তাহাকে দেখিলে ভয় হয়। সে ছুটিয়া আসিয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল—"তুমি আমার ধর্ম্মবাপ। তুমি যদি আমাকে বাঁচাইবে বল, তবে আমি সকল কথা খুলিয়া বলিব।" আমি তাহার ভয় আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য বলিলাম—"তুই সকল কথা বলিলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তোরে বাঁচাইব। কিন্তু তুই দেখিতেছিস্, আমি সকল কথা টের পাইয়াছি, না হইলে তোরে গ্রেপ্তার করিয়া আনাইব কেন? অতএব সকল কথা খুলিয়া না বলিলে তোর রক্ষা নাই।" সে আমার পা ধরিয়া কাঁদিয়া বলিল যে, সে সকল কথা একরার করিবে। আমি তাহাকে তখন আমার গৃহের আফিস-কক্ষে লইয়া, সেই সন্ধ্যা হইতে রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত তাহার একরার লিখিলাম। এমন লোমহর্ষণ কাহিনী আমি আর কখনও শুনি নাই। তাহার সারাংশ এইরূপ—

সেই মহাজনের বাড়ী তাহাদের গ্রামের নিকট। বরিশালের দক্ষিণ দিকে একস্থানে তাহার খুব বড় কারবার। তাহা ছাড়া নৌকা করিয়া অনেক টাকার সোণা রূপা ও কাপড় ইত্যাদি শাখা-সমুদ্রস্থিত চরে চরে হাটে সে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। তাহারা ছয়মাস যাবৎ তাহার নৌকায় ডাকাতি করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু সে এমন সাবধান ও চতুর যে, তাহারা কোনও মতে সুযোগ পায় নাই। শেষবার তাহারা কুমড়া বিক্রয়ের জন্য বাহির হইয়া গিয়া বরিশালের কাছে তাহাদের সেই নৌকা একস্থানে লুকাইয়া রাখিয়া, আর একখানি নৌকা লইয়া সেই মহাজনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শিকারের মত লক্ষ্য করিয়া ঘুরিতে থাকে। পূর্ব্বে কয়েকবার নিষ্ফল হওয়াতে এবার তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাদের দলের একটি লোককে—তাহার নাম আমার এখনও মনে আছে 'মদন'—মহাজনের নৌকার মাল্লা করিয়া দেয়। মহাজন এবারও একুশদিন ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার সাবধানতা ও চতুরতায় ডাকাতরা কোনও সুবিধা পায় নাই। শেষদিন আর একটা পাড়ি দিলেই তাহার আড়তে পঁহুছিবে, এমন একস্থানে আহারাদি করিতেছিল। এ সময়ে মদনা গিয়া তাহাদিগকে সংবাদ দিল যে, অল্পবেলা থাকিতে সে যেমন করিয়া পারে, নৌকা খুলিবে, এবং সন্ধ্যারসময়ে তাহারা যেন পাড়ির মধ্যভাগে গিয়া আক্রমণ করে। মহাজন আহারান্তে বেলা চারিটার সময় নৌকায় উঠিলে মদনা নৌকা খুলিতেছে দেখিয়া নিষেধ করিয়া বলিল—"বেলা নাই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আড়তে পৌঁছিতে পারিব না। অতএব রাত্রি এখানে থাকিয়া প্রভাতে পাড়ি দিব।" মদনা বলিল—"কর্ত্তা! একুশদিন ঘুরিয়া আর এখানে থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি হইবে, আমরা খুব জোরে টানিয়া সন্ধ্যার সময়ে সময়ে আড়তে গিয়া পঁহুছিব।" ক্ষুদ্র অন্ধ নরের সাবধানতাও ক্ষুদ্র এবং অন্ধ। মহাজন নীরব হইল; নৌকা খুলিল। সন্ধ্যার সময় ডাকাতদের নৌকা গিয়া এই নৌকার কাছে পঁহুছিলে সতর্ক মহাজন জিজ্ঞাসা করিল—ইহারা কে? মদন বলিল, তাহারা তাহাদের গ্রামের লোক। কুমড়ার বেপার করিতে আসিয়াছে। তাহারা আগুন চাহে। এ অঞ্চলের নদী সাগরবিশেষ। কোনও দিকে কূল কিনারা দেখা যাইতেছে না। মদন বলিল—"দেখিতেছিস্ কি—এই সময়।" তখন

নক্ষত্রবেগে দুইজন ছুটিয়া গিয়া নৌকার ছইর মধ্যে যে, মহাজন ও তাহার এক মোহরার বসিয়া হিসাব লিখিতেছিল তাহাদের গলা টিপিয়া দুইজনে দুইজনকে হত্যা করিল। ইতিমধ্যে অবশিষ্ট আটজন নৌকায় উঠিয়া যমদূতের মত মাঝি ও আর মাল্লা দুজনকে শাসাইতে লাগিল। তখন আরও দুইতিনজন নৌকার মধ্যে গিয়া মৃত ব্যক্তি দুইটিকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। তাহারপর এই নৌকার সমস্ত মাল ও মাঝি-মাল্লাদিগকে তাহাদের নৌকায় উঠাইয়া, মহাজনের নৌকার এক মাথায় সকলে দাঁড়াইয়া উহাও নদীগর্ভে ডুবাইয়া দিল। যে একরার করিতেছে, সে তখন নৌকার হালে গিয়া বসিল। তাহার সঙ্গীরা তখন ছইর ভিতর ধরিয়া লইয়া, মাঝি ও মাল্লা দুজনেরও গলা টিপিয়া মারিয়া, তাহাদিগকেও জলে ফেলিয়া দিল। তাহারপর তাহারা কি পরামর্শ করিয়া মদনাকে ডাকিল। সে ছইর বাহিরে ছিল। সে ভয়ে আসিয়া একরারকারীর কোমর ধরিয়া বসিল, এবং কাঁপিতে কাঁপিতে বলিতে লাগিল—"তাহারা আমাকেও কি মারিয়া ফেলিবে?" ছইর মধ্য হইতে ডাকাতেরা ডাকিয়া বলিল—"তোর ভয় নাই। আমরা তোরে মারিব না। তবে তুই নূতন লোক। তোরে আমাদের সঙ্গে লইব না। তুই আসিয়া বল, তুই কোথায় নাম্‌বি? তোরে নামাইয়া দিয়া আমরা চলিয়া যাইব।" সে কিছুতেই নামিল না। তখন তাহারা একরারকারীকে হাল ছাড়িয়া দিয়া, তাহাকে লইয়া ভিতরে আসিতে বলিল। আর বলিল—"আমরা দশজন তোদের দুজনকেই মারিয়া ফেলিলে তোরা কি করিবি?" তখন একরারদাতা ভয়ে নামিল, তাহার পশ্চাৎ মদনাও নামিবামাত্র, তাহাকে তাহারা ছোঁ মারিয়া ধরিয়া, গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল, এবং জলে ফেলিয়া দিল। এরূপে ছয়টা লোক হত্যা করিয়া, তাহারা বরিশালের নিকট সেই গুপ্তস্থানে আসিয়া সমস্ত মাল তাহাদের পূর্ব্বনৌকায় তুলিল, এবং এই নৌকাখানিও নদীগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া বাড়ী আসিয়াছে। সোণা রূপা নৌকাতে কিছু ছিল না। কাপড় ও টাকা ছিল। তাহা তাহারা ভাগ করিয়া লইয়াছে। প্রত্যেকের ভাগে ১০০্ শত টাকা পড়িয়াছে, এবং প্রত্যেকে টাকা ঘটী করিয়া মাটিতে পুতিয়া রাখিয়াছে। কেবল একজন তাহার বিবাহে কিছু টাকা খরচ করিয়াছে।

এই ভীষণ কাহিনী আমি সরল ভাষায় সহজে ও সংক্ষেপে বলিলাম। একরারদাতা প্রত্যেক শোচনীয় ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিয়াছিল, এবং গলা টিপিয়া মারিবার সময়ে কে কিরূপে চীৎকার করিয়াছিল, কি বলিয়াছিল, কেমন করিয়া তাহার জিহ্বা ও চোখ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ইত্যাদি লোমহর্ষণ বর্ণনা সকল শুনিয়া আমি এক একবার কলম ছাড়িয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

তখন কিরূপে মোকদ্দমাটা তদন্ত করিবে, দারোগাকে উপদেশ দিলাম, এবং একরার-দাতাকে সঙ্গে দিলাম। দারোগা তাহার দুইতিন দিন পরে আরও আটজন ডাকাতকে,—সকলেরই ভয়ানক মূর্ত্তি,—ধরিয়া লইয়া আসিল। তাহারাও সমস্ত ঘটনা স্বীকার করিয়া, টাকা ও কাপড় অংশমতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। কেবল একজন ডাকাত পলায়ন করিয়াছিল। আমি ইহাদেরও একরার লিখিয়া লইলাম। বরিশালে এ ডাকাতির কোনও এত্তেলা হইয়াছে কি না, এবং কাপড়ের নম্বর মহাজনের খাতার সঙ্গে মিলে কি না ইত্যাদি বিষয়ের তদন্ত করিবার জন্য আমি দারোগাকে বরিশালের মাজিস্ট্রেটের কাছে তাহাকে সাহায্য দেওয়ার জন্য এক পত্রসহ বরিশাল পাঠাইলাম। মহাজনের একজন কর্ম্মচারী, মহাজনের ফিরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অথচ ফিরিয়া আসে নাই বলিয়া বরিশাল পুলিসে সংবাদ দিয়াছিল। বিচক্ষণ পুলিস রিপোর্ট করিয়াছেন যে, সম্ভবতঃ নৌকা ডুবিয়া আরোহীরা মারা গিয়াছে। বিচক্ষণ মাজিস্ট্রেট উহা "সেরেস্তা" করিয়াছেন। প্রাপ্ত কাপড়ের নম্বর মহাজনের আড়তের খাতার সঙ্গে মিলিল। দারোগা এ সকল প্রমাণ সংগত করিয়া ফিরিয়া আসিলে, বরিশালের কর্তৃপক্ষীয়দের চৈতন্য হইল। তখন বরিশালের

মাজিস্ট্রেট, ঘটনা তাঁহার এলেকায় হইয়াছিল বলিয়া মোকদ্দমা তাঁহার কাছে পাঠাইতে আমাকে পত্র লিখিলেন। আমি অসম্মত হইলে তিনি ফরিদপুরের মাজিস্ট্রেটের কাছে আমার প্রতিকূলে নালিশ করিলেন। তিনি আমার পক্ষ সমর্থন করিলেন। তখন তিনি ঢাকার কমিশনরের কাছে আমার প্রতিকূলে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। এখনও মিঃ পেল্ ঢাকার কমিশনর। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? এবার যে পালা শেবতে কৃষ্ণে। বরিশালের মাজিস্ট্রেটের হুকুম অমান্য করার অপরাধে আমার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টে কেন রিপোর্ট করা যাইবে না, তীব্র ভাষায় কমিশনর দস্তুর-মোতাবেক আমার কৈফিয়ৎ চাহিলেন। আমি তীব্র ভাষায় আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় লিখিয়া, উপসংহারে শ্লেষ করিয়া লিখিলাম যে, কোথায় এরূপ একটা ডাকাতি আমি ধরিয়াছি বলিয়া পুরস্কার পাইব, না গবর্ণমেণ্টে অভিযুক্ত হইবার যোগ্য বিবেচিত হইলাম! মিঃ পেল্ তখন মেঠো সুরে লিখিলেন—মোকদ্দমা বরিশাল গেলেও এই ভীষণ ডাকাতি এরূপ দক্ষতার সহিত ধরার জন্য সম্যক্ প্রশংসা আমিই পাইব। "Oliver Cromwell! the bird has flown away." আমিও উত্তর দিলাম যে, আমি ইতিমধ্যে মোকদ্দমা ফরিদপুরের সেসনে অর্পণ করিয়াছি। বিচারে তাহাদের দ্বীপান্তরের আদেশ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি প্রথম একরার করিয়াছিল, আমি তাহাকে সাক্ষীর শ্রেণীতে লইয়াছিলাম। সে অব্যাহতি পাইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে একদিবস অধিক রাত্রিতে ইন্‌স্‌পেক্টার আমাকে জাগাইয়া সংবাদ দিলেন যে, চৌকিদার আসিয়া সংবাদ দিয়াছে যে, আর একদল সন্দিগ্ধ নৌ-ডাকাত, যাহারা হাঁড়ি ব্যবসায়ে বাহির হইয়াছিল, তাহারা সে রাত্রিতে বাড়ী ফিরিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে কোনও মালপত্র নাই, তবে তাহাদের গায়ে জখম আছে। গায়ে জখম আছে, এমন একটি লোক, যাহাকে আগে পাওয়া যায়, গ্রেপ্তার করিয়া আনিতে আমি ইন্‌স্‌পেক্টারকে তখনই পাঠাইলাম। আমি যে এরূপ জাল পাতিয়া রাখিয়াছি, ডাকাতেরা জানিত না। তাহারা বাড়ী ফিরিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রভাতের পূর্ব্বে ইন্‌স্‌পেক্টার একজনের গৃহে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে পলায়ন করিবার সময়ে ধরিলেন। এবং প্রাতে আমার কাছে উপস্থিত করিলেন। তাহার নাসিকার ও ললাটের উপর এক বিচিত্র তরবারের কোপ ; ঠিক যেন বৈষ্ণবদের ফোঁটা। তাহার কণ্ঠ তালুকা শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সেও জাতিতে নমঃশূদ্র বা চাঁড়াল। আমি তাহাকে বলিলাম—"তুমি বুঝিতেছ, আমি সকলই টের পাইয়াছি। বিশেষতঃ তোমার কপালে যে বিচিত্র ফোঁটা, তাহাতেই ব্যাপার কি, বুঝা যাইতেছে। অতএব আর গোপন করিয়া কি হইবে? সকল কথা খুলিয়া বল।" সেও ভয়ে সকল কথা স্বীকার করিবে বলিল। আমি তাহার একরার লিখিতে বসিলাম। সে বলিল যে, তাহারা পাঁচজন হাঁড়ি বিক্রয় করিবার ছলনায় ডাকাতি করিতে বরিশালের দিকে গিয়াছিল। সেখানে ঠিক বরিশাল শহরের নীচে, এক মহাজনের নৌকা আক্রমণ করে। সে নৌকাতে একজন ভাল খেলোয়াড় ছিল। সে একক তরবারিহস্তে তাহাদের গতিরোধ করে। তাহাদের হাতে লাঠি মাত্র ছিল। তাহারা কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। সেইব্যক্তি তরবারির দ্বারা এবং তাহার সঙ্গী মাঝি-মাল্লারা লাঠির দ্বারা তাহাদিগকে আক্রমণ করাতে তাহারা পলায়ন করিয়া আসিয়াছে। তাহারাও প্রহার করিয়াছিল। সম্ভবতঃ সেই তরবারি-ধারীও আহত হইয়াছে। আমি আবার পুলিস কর্ম্মচারী একজনকে বরিশাল পাঠাইলাম। সে যাইয়া দেখিল যে, ঠিক এরূপ একটা ঘটনার এজাহার বরিশাল ষ্টেশনে হইয়াছে এবং সেই লোকটা আহত হইয়া হাসপাতালে আছে। সেখানকার বিচক্ষণ পুলিস প্রভুরা আবার রিপোর্ট করিয়াছেন যে, মহাজন নৌকাতে ছিল না। মাঝিরা তাহার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ একটা ঘটনা সৃষ্টি করিয়া মিথ্যা এজাহার করিয়াছে, এবং বিচক্ষণ

শ্বেতাঙ্গ মাজিষ্ট্রেট আবার তাহাই বেদবাক্যবৎ বিশ্বাস করিয়া, সে রিপোর্টের সেরেস্তায় চিরবিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন প্রকৃত ঘটনা কি, টের পাইয়া তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আবার পূর্ব্বমোকদ্দমার অভিনয় আরম্ভ হইল। কিন্তু এবার ঢাকার কমিশনর এরূপ তীব্রভাবে আদেশ পাঠাইলেন যে, মোকদ্দমাটি বরিশালে না পাঠাইয়া রাখিতে পারিলাম না। এই মোকদ্দমায়ও আসামীদের দীর্ঘ কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল।

উপর্য্যুপরি এরূপ দুটি জল-ডাকাত ধরা পড়াতে ইহাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল। সর্বাডিভিসনব্যাপী একটা জয়জয়কার পড়িয়া গেল। আর যে সকল ডাকাতদের নাম আমার 'কাল খাতা'য় ছিল, ক্রমে সংবাদ আসিতে লাগিল যে, তাহারা এ ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছে, এবং জলযাত্রা ত্যাগ করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। তাহারপর আমি যতকাল মাদারিপুরে ছিলাম, আর তাহারা কখনও গৃহত্যাগ করিয়া কোথায়ও গিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাই নাই। বিশবাইশ বৎসর পরে এখন শুনিতেছি, এ অঞ্চলে আবার এ সকল নৌ-ডাকাতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। এখন বঙ্গের বিধাতাপুরুষ নিরীহ Sir John Woodburn; অতএব হইবারই কথা। আমার মত কর্ম্মচারীরা তাঁহার বিষ চক্ষে পড়িয়াছে, এবং যাহাদের নাম মাত্র কেহ কখনও শুনে নাই, সেরূপ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটেরা জেলায় মাজিষ্ট্রেট হইতেছে! আজ যেরূপ দেশব্যাপী চুরি, ডাকাতি ও গুরুতর ঘটনা সকলের প্রাদুর্ভাব, এরূপ অরাজকতা আমার এই তেত্রিশ বৎসর চাকরিতে কখনও শুনি নাই। ঠিক যেন আবার সেই ঠগ ডাকাতের দিন ফিরিয়াছে। অমৃতবাজার পত্রিকা যথার্থই বলিতেছেন—The Muffasil administration has fallen to pieces—মফঃস্বলে অরাজকতা উপস্থিত। তাহা হইলেই বা! 'স্যার জন' মফঃস্বলের একএক স্থানে দুইবার তিনবার করিয়া 'পরিদর্শনে' যাইতেছেন, এবং সালুর, কলাগাছের ও বাঁশের বংশ ও বৃক্ষের পাতা নিঃশেষ হইতেছে, এবং দুরবস্থাগ্রস্ত মফঃস্বল জমিদার ও গরীব আমলার চাঁদায় চাঁদায় ঋণভার বাড়িতেছে। প্রত্যেক বৎসর লক্ষটাকা এরূপে প্রভুদের অভ্যর্থনাতে ধ্বংসপুরে যাইতেছে। এ টাকায় দেশের কত কষ্ট নিবারিত হইতে পারিত! পিপাসায় কাতর লোকেরা জল চাহিলে 'স্যার জন' বলেন, জমিদারদের পুষ্করিণী খনন করিয়া দিতে বল!! অধিকাংশ জমিদারদের গৃহের চালের যে খড় নাই, তাহা প্রভুর জ্ঞান নাই। একস্থানে মুসলমানেরা প্রার্থনা করিয়াছিল যে, তাহাদের মসজিদ যে হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে, তাহা উঠাইযা লওয়া হউক। প্রভু বলিলেন—"বেশ কথা! তোমরা একটা হাসপাতালগৃহ প্রস্তত করিয়া দেও!!" দেশের সুশাসনের সঙ্গে সম্পর্কই নাই এরূপ বহুমূল্য উপদেশ দিয়া প্রভুরা দেশ পর্য্যটন করিয়া বেড়ান। তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও উপহারে যে অর্থ যাইতেছে, তাহার দ্বারা পুষ্করিণী খনিত হইলে দেশের কত জলাভাব দূরীভূত হইত। আশ্চর্য্য যে, কলাগাছ, লাল সালু ও সামান্য বাজি পোড়ান দেখিয়া, এবং পরের ব্যয়ে উদর পূর্ণ করিয়া খাইয়া কি ইহাদের পরিতৃপ্তি হয় না? এরূপ অযোগ্য লোকের হস্তে রাজ্য-শাসন পরিন্যস্ত হইলে, তাহাতে অরাজকতা না হইয়া আর কি হইবে? দেশে হা অন্ন, হা জল রব না উঠিবে ত আর কি উঠিবে? ডেপুটিরা ও পুলিসেরা বুঝিয়াছে যে, দেশ ভালরূপে শাসন করিলে, কি চুরি ডাকাতি নিবারণ করিলে তাহাদের পদোন্নতি হইবে না। বরং ছোকরা মাজিষ্ট্রেটদের সঙ্গে মতভেদ হইয়া অবনতির সম্ভাবনা। তাহারা বুঝিয়াছে, দেশের কর্ত্তা "সাবানে জন" পদোন্নতির একমাত্র উপায়—সাবান।

মাদারিপুর ত্যাগ

মাদারিপুরে এখন বেশ সুশাসিত। সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতেছে। মোকদ্দমার সংখ্যা এত কমিয়া গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট বহু পূর্ব্বে অতিরিক্ত ডেপুটিকে স্থানান্তরিত করিয়া একজন সবডেপুটি দিয়াছেন। তাঁহার ও আমার দুইতিনঘণ্টার বেশী কাজ করিতে হয় না। যে মাদারিপুরে দুইজন ডেপুটি প্রভাত হইতে রাত্রি দশএগারটা পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়াও কাজ সামলাইতে পারেন নাই, সেই মাদারিপুরে দুইতিন ঘণ্টার মাত্র কাজ, এ কথা এখনও বোধ হয়, শুনিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। বারোটার পর কাচারিতে যাইয়া প্রায় তিনটার সময় গৃহে ফিরিতাম, এবং পাঁচটার সময় একখানি ছোট নৌকায় বেড়াইতে বাহির হইতাম। এ নৌকাখানি আমি নিজে কিনিয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার নাম রাখিয়াছিলাম—'প্রমোদিনী'। তাহার বিচিত্র কাপড়ের সাজসজ্জা করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি, সবডেপুটি, ইন্‌স্‌পেক্টার, ডাক্তার এবং সময়ে সময়ে একজন পাচক থাকিত। আমরাই মাঝি, আমরাই দাঁড়ী। এই নৌকায় সন্ধ্যার সময়ে কুমার ও আড়িয়ালখাঁ নদীতে বেড়াইতাম। সংগীতের তালে তালে দাঁড় পড়িত। তীরে লোক দাঁড়াইয়া নৌকার বাহার দেখিত ও সঙ্গীত শুনিত। আমি নিজে ফ্লুট বাজাইতাম। গ্রীষ্মের দিনে সন্ধ্যার পর বিশাল নদী-গর্ভে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া, নীল আকাশ তলে নীল সলিলরাশির তর তর শব্দের সঙ্গীত শুনিতাম। শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নাস্নাত আকাশের ও নদীবক্ষের শোভা দেখিতাম। আমাদের গায়কটি একটি গান রচনা করিয়াছিলেন।

গীত

ভাসলো তরী, 'প্রমোদিনী' কুমারে।
কি বাহার চলে ধীরে ধীরে!
নবীন মাঝি, নবীন দাঁড়ী, নবীন কাণ্ডারী,
ললিত মধুর স্বরে বাজিছে বাঁশরী,
আহা! মরি, মরি!

মাদারিপুরের শেষের কয়মাস এরূপে বড় সুখে যাইতেছিল। সবডেপুটি ও ইন্‌স্‌পেক্টারের বাসাবাড়ী সবডিভিসন-অট্টালিকার দুইপাশে ছিল। পরিবারদের মধ্যে যাতায়াত ছিল। আমি আফিসে চলিয়া আসিলে—

"মালিনীর বাড়ী বুঝি দিনে হয় রাস?"

সত্য সত্যই সবডিভিসন-গৃহ এক নাট্যশালায় পরিণত হইত। স্ত্রীলোকেরা মিলিয়া খুব আমোদ করিত। সেখানে কোর্ট বসিত, পুলিস-তদন্ত হইত। এরূপে আমাদের কার্য্যকলাপের অপূর্ব্ব অভিনয় ও সমালোচনা হইত। অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত পরিবারদের ছুটাছুটিতে এবং হাসিতামাসাতে স্থানটি মুখরিত হইত। কখন কখন একটুক Practical Joke-(কার্য্যত উপহাস) ও চলিত। ছুটি হইতে ফিরিয়া যাইতে স্ত্রীকে বাড়ী রাখিয়া গিয়াছিলাম। তিনি আমার কিছুদিন পশ্চাতে আসেন। আমার যশোহর মাগুড়ায় অবস্থিতি-সময়ে সবডেপুটির পিতা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কাজে কাজে তিনি ও আমি জলে জলের মত মিশিয়া গেলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার পরিবারবর্গ আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার বাসায় খাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া, তিনি রাত্রিতে আমার সঙ্গে আহার করিয়া প্রায় এগারটার সময়ে গৃহে ফিরিলেন। আমি শয়ন করিলাম। নিশীথ রাত্রিতে খড়খড়ির শব্দ শুনিয়া আমি জাগিলাম। কে?—উত্তর নাই। কেবল খড়খড়ি নড়িতেছে। মাদারিপুরে প্রাণ হাতে করিয়া আমাকে থাকিতে হইত। কারণ, আমি বদমায়েসদের বড়ই কঠোর শাসন করিতেছিলাম। আমি মনে করিলাম, কেহ আমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। চীৎকার করিয়া ভৃত্যকে ডাকিতে লাগিলাম। তাহার সাড়াশব্দ পাইলাম না। শুনিলাম, কপাটের বাহিরে হাসির শব্দ। আমি আবার বলিলাম—কে?

উত্তর—কি বিপদ্! মহাশয়, দোর খোল না। আবার প্রশ্ন—কে তুমি? এত রাত্রিতে কেন আবার মরিতে আসিয়াছ? বাড়ীতে বুঝি শুইবার স্থান হয় নাই? উত্তর—আরে মহাশয়, দোর খুলিয়া দেখ না। আমি একা নহি। প্রশ্ন—সঙ্গে কে? যম? যাও, রাত্রিতে জ্বালাতন করিও না। উত্তর—তুমি একবার দোর খুলে দেখ না। সঙ্গে আমার স্ত্রী। সেই সঙ্গে রমণীর ঈষৎ হাস্য ও মধুর কণ্ঠ কানে গেল। আমার গায়ে কিছু নাই। আপাততঃ বিছানার চাদর টানিয়া লইয়া গায়ে উত্তরীর মত জড়াইয়া উঠিলাম এবং দ্রুতহস্তে দ্বার খুলিয়া দিলাম। দেখি, সত্য সত্যই একটি ভদ্রমহিলা অবনত ও অবগুণ্ঠিত মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। গৃহ অন্ধকার। ভৃত্যের কক্ষে একটা দীপ জ্বলিতেছিল। আমি ব্যস্ত হইয়া বেগে আনিতে উহা হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা পতি পত্নী আমার এরূপ ভাব দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। ভৃত্য উঠিল। হলঘরের টেবিলের ল্যাম্প জ্বালিয়া দিল। আমি আপনার সহোদরার মত বন্ধুর স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিয়া বলিলাম —আপনার স্বামী একটি পাগল আমি জানি। আপনি কেমন করিয়া এমন পাগলামি করিয়া আসিলেন, এবং আমাকে এরূপ অপ্রতিভ করিলেন? তিনি বলিলেন—"তিনি আসিতে বলিলেন। আপনার কাছে আসিব, তাহাতে আর পাগলামি কি?" তিনজনে বসিয়া বহুক্ষণ বড় আনন্দে আলাপ করিলাম। শেষে আমি বলিলাম—"আপনি পথক্লেশে শ্রান্ত, রাত্রি অনেক হইয়াছে; চলুন, আমি গিয়া আপনাদের গৃহে রাখিয়া আসি।" সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। তিনি যেন চিরপরিচিতার মত আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, এবং যতদিন মাদারিপুরে ছিলাম, ততদিন আমাকে সহোদরের মত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। তিনি একটি রমণীরত্ন। আমার সহধর্ম্মিণী অভিমানের একটা আগ্নেয়গিরি। আর সবডেপুটির স্ত্রী তাহার বিপরীত। আমার স্ত্রী তাহাকে কলাগাছ বলিতেন, এবং এক আধটুক অভিমানের তালিম দিতে যাইতেন। কিন্তু শিক্ষা বিফল করিয়া তিনি বলিতেন—"দিদি! অভিমান করিয়া থাকিলে স্বামীকে ভালবাসিব কখন?"

কিছুদিন পরে স্ত্রী আসিলেন। সবডেপুটির কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিল। সে নিতান্ত গো-বেচারি রকমের ভালমানুষ। তাহার বালিকা পত্নী একটি সোনার পুতুল। আমি এমন সুন্দরী বড় দেখি নাই। তাহাকে লইয়া আমরা নিত্য তামাসা করিতাম। আমি আফিস হইতে আসিয়াছি। সে চলিয়া যাইতেছে। আমি বলিলাম—"বউ! তুই যদি আর এক পা যাস্, তোর বাপের দিব্বি।" আর সে অমনি পুতুলটির মত পদ্মাসন করিয়া ঘাসের উপর বসিয়া পড়িল। যতক্ষণ না বলিব "বউ এখন যাও," সে সেখানে বসিয়া থাকিত, আর আমরা হাসিতাম। তাহার স্বামী আসিয়াছে। রসিকারা মিলিয়া তাহাকে পালঙ্গের নীচে লুকাইয়া রাখিয়া একটা বালিশ সাজাইয়া পালঙ্গে শোয়াইয়া রাখিয়াছে, এবং চারিদিকে আড়ি পাতিয়া রহিয়াছে। স্বামী বেচারি এই ফাঁদে পড়িয়া বালিশের সঙ্গে প্রেমালাপ আরম্ভ করিয়াছে, আর রসিকারা একত্র ছুটিয়া আসিয়া আমার গৃহের প্রাঙ্গণে ঘাসের উপর পড়িয়া হাসিতে হাসিতে গড়াগড়ি দিতেছে। আমি নিদ্রা হইতে জাগিয়া বুঝিলাম ব্যাপারখানা কি। আমি হাসি চাপিয়া তিরস্কার করিলে, তাহারা পলায়ন করিল। সবডেপুটি আমার গলা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল—"মহাশয়! দেখিয়াছেন, ইহারা আমার ভাইটিকে সিধে মানুষ পাইয়া কি বাঁদোর সাজাইতেছে!" তাহারা নিত্য একটা না একটা ফিকির করিয়া বেচারীকে এরূপে জ্বালাতন করিত, আর বউটি কলের পুতুলের মত তাহারা যেরূপ চালাইত, সেইরূপ চলিত।

মাদারিপুরে সেই সময় একটি মুন্সেফ ছিলেন। তিনি জাতিতে গোয়ালা ঘোষ। নিজে লোকটি বড় মন্দ নহেন। তবে মানুষ মুন্সেফ হইলে যেমন একটা কিরূপ হয়, তিনিও তেমনি ছিলেন। পেয়াদা একজনের দ্বারা মাথার পাঁচহাত উপরে ছাতা ধরাইয়া

তিনি মধ্যে মধ্যে আমাদের এদিকে বেড়াইতে আসিতেন। আমোদ আহ্লাদের বড় ধার ধারিতেন না। দেওয়ানী আইনে তাহা নাই। তাঁহার পত্নী একটা জগদম্বা। আমাদের বাড়ীতে বহু নিমন্ত্রণের পর তিনি মহাসংকটাপন্ন হইয়া একবার মেয়েদের নিমন্ত্রণ করেন, এবং আমার স্ত্রীকে যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। "নিমুর জন্মের মধ্যে কর্ম্ম চৈত্র মাসে রাস।" স্ত্রীর জন্য সর্ব্বাগ্রে পাল্কী পাঠাইয়া দেন। কিন্তু কোনও কার্য্যগতিকে তাঁহার যাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া, সেই পাল্কীতে সবডেপুটির পরিবার যান। মুন্সেফের স্ত্রী মনে করিলেন, আমার স্ত্রীই গিয়াছেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দেখিলেন—সবডেপুটির স্ত্রী। তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"ও আমার পোড়ার দশা! আমি তোমার জন্য বুঝি পাল্কী পাঠাইয়াছিলাম।" সবডেপুটির স্ত্রীও পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী নন। তিনি বলিলেন—"মর্ মাগি! ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া এরূপ অপমান করিস্! তুই কেমন ছোটলোক রে!" অতিথির এই সমাদরের কথা সবডেপুটি তাঁহার ভৃত্যের মুখে শুনিয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"মহাশয়! এ বেটী জাত-গোয়ালার মেয়ে। আমি আমার স্ত্রীকে ফিরিয়া আসিতে বলিয়া পাঠাই।" আমি নিষেধ করিলাম। তাহার পরের বার আমার পত্নী উপস্থিত হইয়া এ বিভ্রাট মিটাইলেন। কিন্তু সবডেপুটি ভুলিবার, কি ছাড়িবার পাত্র নহে। তাহার পরদিন নৌকায় বেড়াইবার সময় সে নৌকা একবারে মুন্সেফের বাড়ী ঘেঁষিয়া চালাইয়া দিল। তাঁহার বাসাবাড়ী কুমার নদের উপরই ছিল। তাহার পার্শ্বে নৌকা পৌঁছিলে সকলে গান ধরিলেন—"আমি গোপী গোয়ালিনী, ছিটে-ফোঁটা কতই জানি।" মুন্সেফ বেচারির স্ত্রী ক্ষেপিয়া, তাহাদের ধরিয়া লইবার জন্য পেয়াদা ডাকিতে লাগিল, এবং তাহাদের ও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের জন্য অযথা আহারের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আমি সেদিন নৌকায় ছিলাম না। আমি শুনিয়া সকলকে ভর্ৎসনা করিলাম। কিন্তু তাহারা ছাড়িবার পাত্র নহে। সেদিকে নৌকায় গেলেই সেই সর্ব্বনেশে গান ধরিত, আর ভদ্রলোকের স্ত্রী ক্ষেপিয়া একটা কাণ্ডকারখানা করিত। মুন্সেফ বেচারি আর সেই অবধি আমাদের এ পাড়ায় পদার্পণ করিত না।

আর এক নিত্য আমোদের জিনিস জুটিয়াছিল এক বৃদ্ধ বৈরাগী। "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।" তাহার ভাগ্যেও এক তরুণী জুটিয়াছিল, আর জুটিয়াছিল সেই বৈরাগিণীর এক বেনে নাগর। বৈরাগী তাহার বৈরাগিণীহরণের এক নালিশ উপস্থিত করিল। ব্যাপারখানা কি, তাহা বুঝিবার জন্য আমি প্রথম সাক্ষিশ্রেণীতে তাহার বৈরাগিণীকে তলব দিলাম। বেনে তাহাকে লইয়া লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। বহুদিন যাবৎ তাহাকে পাওয়া গেল না। কিন্তু বৈরাগী তাহার অপূর্ব্ব মূর্ত্তিখানি লইয়া আমার সঙ্গ লইল। তাহার বয়স ষাটের এ দিকে নহে। দেখিতে লোলচর্ম্মাবৃত একখানি শুষ্ক কাষ্ঠবিশেষ। পৃষ্ঠে কুঁজ দেখা দিয়াছে। চক্ষু এরূপ কোটরস্থ যে, তাহার অস্তিত্বের সহসা উদ্দেশ পাওয়া যায় না। গণ্ডচর্ম্ম স্খলিত; দন্ত প্রায় পতিত। হাতে যষ্টি, পৃষ্ঠে ঝুলি। আফিস এবং আমার গৃহের দ্বারে সে ২৪ ঘণ্টা ত আছেই। আমি বেড়াইতে বাহির হইলে আমার পায়ের উপর মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে। তাহার জন্য আমার পথ চলা অসাধ্য হইয়া উঠিল। সে না গ্রাহ্য করে পুলিসকে, না আরদালিকে। যখনই আমাকে দেখিবে, কাতরকণ্ঠে—"আমার বৈরাগিণী আনিয়া দেও" বলিয়া, সযষ্টি-ঝুলি আমার সম্মুখে ভূতলশায়ী হইয়া পথ বন্ধ করিয়া রাখিবে। সবডেপুটিরা তাহাকে শিখাইয়া দিত, আর সে কখনও আমাকে দুইচারি গণ্ডা পয়সা, কখন একটা পান সাধিত, আর কাকুতি করিয়া বলিত—"আমার আর কিছু নাই। এই পয়সা কয়টা নেও, আর আমার বৈরাগিণীকে আনিয়া দেও।" ঐ দিকে পুলিস-প্রভুরা বেনের কাছে কিছু প্রণামি লইয়া, বৈরাগিণীকে

কিছুতেই আনিবেন না। শেষে আমি বড় পীড়াপীড়ি করিলে আর একদিন এক মোক্তার তাহাকে কোর্টে উপস্থিত করিল। তাহার রূপে কোর্ট আলোকিত হইল। কোর্টের চারিদিক্ লোকারণ্য হইয়া গেল। সে একটি অসামান্যা সুন্দরী যুবতী। এরূপ সুন্দরী হইয়া সে বৈরাগিণী, এবং এরূপ বৈরাগীর প্রণয়িনী! বিধাতার কি নির্ব্বন্ধ! কবি মধুসূদন যথার্থই বলিয়াছেন—

"সুলোচনা মৃগী ভ্রমে নির্জ্জন কাননে,
গজমুক্তা থাকে গুপ্ত শুক্তির সদনে।
হীরকের ছটা বন্ধ খনির ভিতর।
সদা ঘনাচ্ছন্ন হয় পূর্ণ শশধর।
পদ্মের মৃণাল থাকে সলিলে ডুবিয়া।
হায় বিধি! এ কুবিধি কিসের লাগিয়া?"

তাহার তখন পূর্ণ যৌবন। সে মোক্তারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কোর্টে প্রবেশ করিবামাত্র বৈরাগী ব্যাঘ্রবৎ লম্ফ দিয়া তাহার পশ্চাৎ হইতে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, এবং সে তাহার সম্মুখের মোক্তারকে জড়াইয়া ধরিল। বৈরাগী পশ্চাৎ হইতে দন্তে জিহ্বা কাটিয়া তাহার অঙ্গের এরূপ সঞ্চালন আরম্ভ করিল, এবং সে আঘাত মোক্তার মহাশয়ের চাপকান-পায়জামা-পাগড়ি-মণ্ডিত অঙ্গে এরূপভাবে লাগিতেছিল যে, তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আমার কাছে নালিশ করিতে লাগিলেন—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আদালতের সম্মুখে এ কেমন বেইজ্জতি!" চারিদিকে একটা হাসির তুফান ছুটিয়াছে। সবডেপুটি প্রভৃতি সকলেই আসিয়া জুটিয়াছেন। বিচার করিব কি, আমারও হাসিতে ধর্ম্মাবতারত্ব লুপ্ত হইয়া পার্শ্বব্যথা হইতে লাগিল। আমি এক একবার কোর্টের আরদালি ও কনষ্টেবলকে বৈরাগীকে ছাড়াইয়া দিতে গর্জ্জন করিতেছি। কিন্তু বেচারিরা করিবে কি? তাহারা নিজে হাসিয়া আকুল; এবং বৈরাগী বৈরাগিণীকে, আর বৈরাগিণী মোক্তারকে এরূপ কাঁকড়ার মত জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, তাহারা কিছুতেই ছাড়াইতে পারিতেছে না। তাহাদের প্রহারেও বৈরাগীর অঙ্গসঞ্চালনের বেগ থামিতেছে না। ইহার বিচারের ফল আর বোধ হয়, বলিবার আবশ্যক করে না। বলা বাহুল্য, বৈরাগিণী গরিব বৈরাগীকে অস্বীকার করিল। বৈরাগী যে আর দুইচারি বৈরাগীকে সাক্ষী মানিয়াছিল, তাহারা বেনের কাছে কিঞ্চিৎ মহাপ্রসাদ লাভ করিয়া বৈরাগী, কি বৈরাগিণী, কাহাকেও চিনে না বলিল। কাজেই বৈরাগিণীকে ছাড়িয়া দিতে হইল। মোক্তার মহাশয় বলিলেন—"দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার সঙ্গে একজন কনষ্টেবল দেওয়া হউক। না হইলে বৈরাগী আবার ইহাকে পথে ধরিয়া, তাহাকে ও আমাকে বেইজ্জত করিবে।" বৈরাগীকে ধরিয়া রাখিতে আমি একজন কনষ্টেবলকে হুকুম দিলে, বৈরাগিণী সেই মোক্তারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ লোকারণ্য সহ চলিয়া গেল। আর বৈরাগী কোর্টের বাহিরে দাঁড়াইয়া তাহার উদ্দেশে এরূপ ভাবে ছন্দেবন্ধে তাহার বিরহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, সেদিন কাচারি করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। ইহার পরও মাদারিপুরে আমি যতদিন ছিলাম, কি সদরে, কি শিবিরে, এক এক দিন বৈরাগী অকস্মাৎ কোথা হইতে আসিয়া, "আমার বৈরাগিণীকে আনিয়া দেও" বলিয়া চীৎকার করিয়া আমার পায়ের উপর মড়ার মত পড়িত। হা বিধাতঃ! রূপের মোহ বুঝি মানুষ শ্মশান পর্য্যন্ত ছাড়িতে পারে না।

এরূপে মাদারিপুরে সেই ঝড় বজ্রের পরে কয়েকটি দিন বেশ আনন্দে যাইতেছিল, এমন সময় আমি আবার পীড়িত হইয়া পড়িলাম। আবার সেই পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর আমার স্কন্ধে চাপিলেন। আমি পনরদিন যাবৎ শয্যাশায়ী হইয়া রহিলাম। আর সহ্য করিতে না পারিয়া কলেক্টর জেফ্রি এবং কমিশনর পেলু সাহেবকে লিখিলাম। সে সময়ে

রাণাঘাট খালি হইতেছে শুনিয়া আমি জেফ্রির কাছে রাণাঘাটের জন্য লিখিলাম। সে সময়ে ঘটিরাম ডেপুটি মাদারিপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, বেহার সবডিভিসনের মত স্থান আর ভূভারতে নাই। তাহার জল-বাতাসের ত' কথাই নাই। উহা সবডিভিসন নহে, একটা রাজত্ব। সেখানে কিন্তু যে ডেপুটি আছেন, শুনিলাম—তিনি একজন ডেপুটিদলের টেক্কা। তিনি মাজিস্ট্রেট কমিশনরদের পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং তাঁহাদের নিত্য ডালির জন্য কলিকাতা ও এলাহাবাদ পর্য্যন্ত ডাক বসান। আমি বলিলাম, এরূপ মহৎ স্বত্বের স্থান আমি ক্ষুদ্র জীব কিরূপে পাইব। মনে মনে কিন্তু স্থানটির জন্য বড়ই লালায়িত হইলাম। জেফ্রি লিখিলেন যে, তিনি জানেন যে, রাণাঘাট বাঙ্গালি ডেপুটির ত্রিদিব, কিন্তু আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তিনি আমাকে বেহারে কোনও স্থানে বদলির জন্য লিখিলেন। সম্ভবতঃ এরূপ স্থানই পাইব। কমিশনরও লিখিলেন—"আমি আপনার মত মূল্যবান্ কর্ম্মচারীকে আর মাদারিপুরে রাখিয়া হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব কোনও সুস্থ স্থানে বদলির জন্য আমি বিশেষ করিয়া লিখিলাম।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গেজেট আসিলে দেখিলাম, আমি বেহার সবডিভিসনেই বদলি হইয়াছি। শ্রীভগবানের কি দয়া! ইচ্ছাময় এরূপে অনেকবার আমার হৃদয়ের গুপ্ত ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন। আমরা আনন্দে অধীর হইলাম। মাদারিপুরব্যাপী একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। সহৃদয় জেফ্রি গেজেট দেখিয়াই লিখিলেন—"আমার অনুরোধ সফল হইয়াছে। আপনি বেহার অঞ্চলে বদলি হইয়াছেন এবং একটা উৎকৃষ্ট সবডিভিসন পাইয়াছেন। আপনার স্থানে কে আসিবে, আমি জানি না। যে আসুক, আমি এমন কর্ম্মচারী আর পাইব না।" কমিশনরও এরূপ একখানি বিদায়পত্র লিখিলেন। মাদারিপুরে রোগ, শোক ও দুর্দ্দান্ত-সবডিভিসন-শাসন-জনিত অশান্তির মধ্যে, আমি এরূপ মাজিস্ট্রেট ও কমিশনর পাইয়া রাজকার্য্য সম্বন্ধে বড় সুখে ছিলাম।

বদলির সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে যে সকল লোককে আমি কঠোর শাসন করিয়াছিলাম, তাহারা পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া আমার বদলিতে হাহাকার করিতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিলেন—সত্য মিথ্যা জানি না—"মাদারিপুর আর কেহ এরূপ শাসন করিতে পারে নাই; পারিবেও না।" সেই জাল মোকদ্দমার দুর্দ্দান্ত চক্রবর্ত্তীরা কেহ ঢাকায়, কেহ বরিশালে ছিলেন। ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"আমাদের উপায় কি হইবে। আপনি চলিয়া গেলে আবার ফরাজিরা ক্ষেপিয়া উঠিবে। আমরা দেশে তিষ্ঠিতে পারিব না।" সেইদিন তাঁহারা বলিলেন যে, তাঁহারা আমাকে প্রথমতঃ এরূপ শত্রু মনে করিতেন যে, আমাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহারা কয়েকবার আমার মফঃস্বল যাতায়াতের পথে লোক রাখিয়াছিলেন। আমি সেই সেই রাত্রিতে সে পথে গেলে তাঁহারা নিশ্চয় আমাকে খুন করিতেন। আমার মনেও এরূপ আশঙ্কা ছিল। তাই আমি যে দিকে যাইব, ঠিক তাহার বিপরীত দিকে যাইব বলিয়া প্রকাশ্য কাচারিতে বলিতাম। ইহাতে এই সকল হত্যার ষড়্যন্ত্র নিষ্ফল হইত। চক্রবর্ত্তীরা বলিলেন যে, এখন তাঁহারা বুঝিতেছেন যে, আমি তাঁহাদের কি উপকার করিয়াছি। পূর্ব্বে বৎসর বৎসর তাঁহাদের প্রায় ১০,০০০ টাকা মোকদ্দমার খরচ যাইত এবং দুর্গতির সীমা ছিল না। সেই বৎসর তাঁহাকে একটাও মোকদ্দমা করিতে হয় নাই। যাহাদিগকে আমি পুলিস কনষ্টেবল করিতে চাহিয়াছিলাম, সেই উভয় পক্ষ জমিদার একদিন আমার সঙ্গে এক সময়ে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। উভয়ে বন্ধুভাবে বসিয়া উভয়ের সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিলেন, এবং আমার শাসনকার্য্যের শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও আমার হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিলেন। 'নগেনের পিসী' যথার্থ বলিয়াছিল যে, মানুষ না মরিলে ত প্রাণটা বাহির হয় না, তাই নগেন স্বপ্নে লাট হইয়া যে তাহার সঙ্গে কথা কহে নাই, এ অভিমানে তাহার প্রাণটা বাহির হইতেছিল না। আমারও তাই! মাদারিপুরে মৃত্যু আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল না, তাই প্রাণটা যায় নাই। আমি তাঁহাদের বলিলাম—তাঁহারা যে একসঙ্গে

দেখা করিতে আসিয়াছেন, এবং পরস্পর এরূপ বন্ধুভাবে ব্যবহার করিতেছেন, উহা দেখিয়া আমারও এই সবডিভিসন-শাসন-শ্রম সার্থক বোধ হইতেছে। মোকদ্দমার সংখ্যা বড়ই কমিয়া গিয়াছিল। মোক্তারেরা দ্বিতীয় বৎসর কোর্টের সম্মুখে মলিনমুখে বসিয়া থাকিতেন। তাঁহারাও আমার বদলিতে দুঃখ প্রকাশ করিলে আমি বড় হাসিলাম। তাঁহারা বলিলেন যে, মোকদ্দমা কমিয়া তাঁহাদের আয়ের হানি হইয়া থাকিলেও তাঁহারা মাদারিপুরবাসীরা স্ত্রী পুত্র লইয়া নির্ভয়ে ছিলেন। এমন সুখটা তাঁহাদের ভাগ্যে আর ঘটে নাই। অত্যাচারভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হইত।

এরূপ জয়জয়কারের মধ্যে আমি একদিন প্রাতে মাদারিপুর হইতে অতি প্রত্যূষে বিদায় গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম, নদীতীরে প্রায় সমস্ত মাদারিপুরবাসী সেই প্রত্যূষে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। আমরা পতি পত্নী আমাদের প্রথম সন্তান 'নীরেন'কে মাদারিপুরে চিরদিনের জন্য রাখিয়া, এবং দ্বিতীয় শিশু নির্ম্মলকে বুকে লইয়া নৌকায় উঠিলাম। কয়টি পরিবারের সঙ্গে মিশিয়াছিলাম, তাঁহাদের নরনারীর ও শিশুদের সেই সস্নেহ বিদায় ও রোদন এখনও ভুলিতে পারি নাই।

বেহারযাত্রা

উষার সময়ে নৌকা খুলিয়া দেখিলাম, কুমারের উভয় তীরে আড়িয়ালখাঁর সহিত সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত সারি সারি লোক দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। সকলের মুখে একই কথা—"এমন কেহ আর মাদারিপুর শাসন করিতে ও সুনাম লইয়া যাইতে পারিবে না।" প্রাচীন প্রাচীনারা দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। মাদারিপুর উপবিভাগের শেষ-সীমা শিবচর পর্য্যন্ত এরূপে লোকের সমানভাবে প্রীতি লাভ করিতে করিতে মাদারিপুর ত্যাগ করিলাম। মাদারিপুর আমার উভয় শোকের ও সুখের স্থান। বিবাহের ত্রয়োদশ বৎসর পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় তাঁহার মন্দির-ছায়ায় যে সন্তান পাইয়াছিলাম, শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে জন্মিয়াছিল বলিয়া যাহার নাম নীরেন্দ্র রাখিয়াছিলাম, সেই শিশু মাদারিপুরে আমাদের অঙ্কশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পতি পত্নী উভয়ের সেই দারুণ শোকে, এবং মাদারিপুরের সলিলসিক্ত জলবাতাসে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া দুইবৎসরকাল সমানভাবে রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম। সেই রোগের স্মৃতি স্মরণ করাইতে এখনও সর্ব্বদা বামকর্ণে দূর সমুদ্ররবের মত শব্দ হইতেছে। মাদারিপুর সুখের স্মৃতিতেও জড়িত। সেখানে আমার দ্বিতীয় পুত্র নির্ম্মলের জন্ম এবং রাজকার্য্য এমন স্ফূর্ত্তির সহিত কঠোরহস্তে আর কোথায়ও করি নাই এবং উপরিস্থ কর্ম্মচারীর এমন পৃষ্ঠপোষণ-সুখ আর কোথায়ও পাই নাই।

ইতিমধ্যে পাটনা হইতে বন্ধু শ্যামাধব রায় লিখিয়াছিলেন যে, বেহার সবডিভিসন একটি বড় বাঞ্ছনীয় স্থান (Prize Subdivision)। অনেকে অহা পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমি যদি শীঘ্র না যাই, তবে উহা হারাইব। অতএব গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত পালে, এবং সেখান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলে যত শীঘ্র যাইতে পারি, চেষ্টা করিতে ত্রুটি করিলাম না। কলিকাতায় পঁহুছিয়া শ্যামাধবের দ্বিতীয় পত্র পাইলাম। এবার তিনি ধমক একেবারে পঞ্চমে চড়াইয়া লিখিয়াছেন—আজ সে বন্ধুটি কোথায়?—যে বেহারের উপস্থিত সবডিভিসনাল অফিসার একজন বাঙ্গালী সিবিলিয়ান। তাঁহাকে সেখানে রাখিবার জন্য তিনি বেহারের লোকের দ্বারা গবর্ণমেণ্টে দরখাস্ত করিয়াছেন, এবং যাহাতে আমার বদলি রহিত হয়, তাহার অশেষ চেষ্টা করিতেছেন। অতএব আমি যদি কলিকাতায় বন্ধুদর্শনে ও দোকান-ভ্রমণে সময় কাটাই, তবে নিশ্চয় বেহার হারাইব। কি সর্ব্বনাশ! মহাব্যস্ত হইয়া বেহার ছুটিলাম। বেলা ৪টার সময়ে বক্তিয়ারপুর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। তখন বক্তিয়ারপুরে মেল থামিত না।

অতএব মন্থরগামী যাত্রিগাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। সেখান হইতে শুনিলাম বেহার আঠার মাইল। যান—পশ্চিমের খ্যাতনামা রথ "এক্কা," খাটুলি বা গরুর গাড়ী। সবডিভিসনের হেড কেরাণীকে এখান হইতে যাইবার বন্দোবস্ত করিতে পত্র লিখিয়াছিলাম। দেখিলাম, তিনি অনুগ্রহ করিয়া একটি প্রাণীও পাঠান নাই। ট্রেণ চলিয়া গেল। স্ত্রী, শিশু পুত্র ও দাস দাসী লইয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বড় বিপদে পড়িলাম। ষ্টেশনমাষ্টার ইন্দ্রবাবু বড় ভদ্রলোক। তিনি পরিচয় পাইয়া আমাদিগকে তাঁহার গৃহে স্থান করিয়া দিতে চাহিলেন। দেখিলাম তিনি সেই "আলপাকার চাপকান গায়ে ষ্টেশনে দাড়ায়ে ভাই!" রকমের ষ্টেশন-মাষ্টার নহেন। তাহাতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। কিন্তু কেমন করিয়া স্ত্রী পুত্র লোকজন লইয়া ষ্টেশনের একটা কক্ষে থাকি? তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ষ্টেশনের পশ্চাতে ডাকবাঙ্গলা আছে। ডাকবাঙ্গলায় যাইব শুনিয়া তিনি কিছু আপত্তি করিলেন। যাহা হউক, সেখানেই গেলাম। নিকটে পুলিস আউট-পোষ্ট। কিন্তু উহা বেহারের অধীন নহে, 'বারে'র অধীন। তথাপি হেড কনষ্টেবল মহাশয় বলিলেন—'কুচ পরোয়া নাই'। পাল্কী পাওয়া যাইবে না। তিনি খাটুলির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। খাটুলি বঙ্গদেশের দোলাবিশেষ তাহাতে কেমন করিয়া যাইব? কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হইয়া রাত্রি ডাকবাঙ্গলায় কাটাইব স্থির করিলাম। রাত্রি নয়টার সময় বেহার হইতে দুইখানি পাল্কী ও বেহারা আসিল। একটি পদাতিকও আসিয়াছিল। দেখিলাম, তাহারও তীক্ষ্ন বুদ্ধি! তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, পদাতিকও আসিয়াছিল। দেখিলাম, তাহারও তীক্ষ্ন বুদ্ধি! তাহাকে যাহা জিজ্ঞাসা করি, সে বলে—"সব বেলিসরাইমে মিলে গা।" আমি মনে করিলাম, বেলিসরাই বুঝি একটা প্রকাণ্ড বাজার। যাহা হউক, রাত্রিশেষে বেহারাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কাঁচা পথ, তাহারও অবস্থা শোচনীয়। অনুমান নয়টার সময় সবডিভিসন-বাঙ্গলার সম্মুখে পাল্কী নামিল। দেখিলাম, সেই বেলাতেও বাঙ্গলার দ্বার সকল কেবল বন্ধ নহে, শার্শিতে কাগজ মারা! কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, পথে যে একটি মিউনিসিপাল ওভারসিয়ার মিলিত হইয়াছিল, সে বলিল যে, সাহেবের ভাইয়ের চোখের পীড়া আছে। তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালী সিভিলিয়ান দেখি নাই। কার্ড পাঠাইয়া আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিলাম। তিনি একটু অপেক্ষা করিয়া তলব দিলেন। গৃহে প্রবেশ করিলাম। তিনি কিঞ্চিৎ কষ্ট-গোপ্য অশ্রদ্ধার সহিত আমার অভ্যর্থনা করিলেন। যেন মনে মনে বলিলেন—"যাক্। সব চেষ্টা বিফল হইল। এ আপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল।" অন্য দুইএক কথারপর বলিলেন যে, তিনি রাত্রি ৮টার পূর্ব্বে বাড়ী খালি করিয়া দিতে পারিবেন না। আমি বলিলাম—"আমি পরিবার সঙ্গে আনিয়াছি। আমার থাকিবার কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন?" আমি মনে করিয়াছিলাম, তিনি অন্ততঃ একটি কক্ষ আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। না, তাও নহে। তিনি বলিলেন যে, তিনি তাহা জানেন না। তবে শুনিয়াছেন যে, বাঙ্গলার সম্মুখের বাগানের অপরদিকে জনৈক ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গালী ডেপুটি যে একখানি ঘর প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেখানে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সে কিরূপ ঘর। তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উত্তর দিলেন যে, তিনি উহা কখনও দেখেন নাই। তবে তাঁহার ধারণা যে, উহা বড় সুবিধার নহে। আমি বিস্মিত হইলাম। ইনি জানেন, আমি পরিবার লইয়া আসিতেছি। তাঁহার পরিবার সঙ্গে নাই। তথাপি সবডিভিসন ঘর ত ছাড়িয়া দিলেনই না। আমরা কোথায় থাকিব, তাহার খবর পর্য্যন্ত রাখা তিনি শিষ্টাচারসঙ্গত মনে করেন নাই। অথচ ইনি একজন বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী সিবিলিয়ান। মনে করিয়াছিলাম, ইহাঁরা কত ভদ্র হইবেন। কিন্তু বুঝিলাম, বাঙ্গালী সিবিলিয়ানও দিল্লীকা লাড্ড বিশেষ। তখন আমি সেই ঘরটি দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, উহা একটি শৃগালের বিবরবিশেষ। তদ্রূপ দুর্গন্ধেও পরিপূর্ণ। বহুকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা তখনই পরিষ্কৃত হইতেছিল। আমি ওভারশিয়ারকে রোষকষায়িত নয়নে বলিলাম যে, আমি পরিবার

সঙ্গে নিয়া আসিতেছি বলিয়া লিখিয়াছি, আর তাঁহারা কেমন ভদ্রলোক যে, আমার এতটুকু দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত স্থির করিয়া রাখেন নাই! তিনি বাঙ্গালী, একটি দীর্ঘ মস্তকহীন শুষ্ক তালবৃক্ষ বিশেষ। তিনি কম্পিতকলেবরে বলিলেন যে, তাঁহাদের দোষ কি? তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, সাহেব আমাকে বাঙ্গলাতে থাকিতে দিবেন। সেদিন প্রাতে মাত্র এই ঘর পরিষ্কার করিতে বলিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে আমি উপস্থিত হইবা মাত্র, আমাকে তাঁহার বাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমি মনে করিলাম যে, তাঁহাকে তখন অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া, দেশী-বাঙ্গালী ও বিলাতী-বাঙ্গালীর একটা পালা অভিনয় করিব। কিন্তু বাঙ্গালীর এই কীর্ত্তি দেখিয়া বেহারীরা হাসিবে। অতএব ক্রোধ সম্বরণ করিয়া, আমি আবার তাঁহার কাছে গিয়া বলিলাম যে, এরূপ ঘরে আমার একঘণ্টা থাকাও অসম্ভব। তিনি অবলীলাক্রমে বলিলেন—"কেন? তাহাতে সেই ডেপুটিবাবু বরাবর থাকিতেন। উহা তাঁহার সদর এবং সবডিভিসন-গৃহ তাঁহার অন্দর ছিল।" এই শ্লেষে আমি আবার জ্বলিয়া উঠিলাম, আমিও একটুক শ্লেষব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিলাম—"সকলে ত আর সমান ভদ্রলোক নহে।" তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমার স্ত্রী পাল্কীতে তাঁহার দ্বারের সম্মুখে রহিয়াছেন। তাহা তিনি জানেন। ইংরাজ-জাতির স্ত্রীলোকদের প্রতি শিষ্টাচার অনুকরণীয়। ভাবিলাম, বিলাত গিয়া ইহারা কেমন করিয়া এরূপ পশু হইয়া আসিল? আবার আত্মসংবরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে ডাকবাঙ্গলা আছে কি?" তিনি একটুক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন? আপনি কি পরিবার লইয়া ডাকবাঙ্গলায় যাইবেন?" আমি আবার তীব্রকণ্ঠে বলিলাম—"গাছতলায় ত পরিবারকে রাখিতে পারি না।" তিনি তখনও অম্লানমুখে বলিলেন যে, ডাকবাঙ্গলা বেলি-সরাইতে। উহা সবডিভিসন-গৃহ হইতেও ভাল। আবার বেলি-সরাই! তখন আমাদের বেলি-সরাইতে লইতে ওভারসিয়ারকে বলিলাম, এবং ঠিক এগারটার সময় চার্জ লইব বলিয়া চলিয়া গেলাম।

দেখিলাম, বেলি-সরাই একটি দীর্ঘ মনোহর অট্টালিকা। বাহিরদিকে শ্বেতরেখাঙ্কিত রক্তবর্ণ ইষ্টক-শোভা। সম্মুখে নাতিপরিসর উদ্যান। পশ্চাতে চতুষ্কোণ অঙ্গন। অঙ্গনের চারিদিকে আবার ইষ্টকগৃহশ্রেণী। ইহার দুইকক্ষে ডাকবাঙ্গলা। বেশ আরামের স্থান। এতক্ষণ পরে এই সুন্দর কক্ষ দুটি পাইয়া সুস্থ হইলাম। দেখিতে দেখিতে বাঙ্গালী এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন, পুলিস ও দুই একজন জমিদার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এসিস্টেণ্ট সার্জ্জন মহাশয় বলিলেন যে, কালা সিবিলিয়ান মহাশয় আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজ সিবিলিয়ানের সঙ্গেও সেরূপ করিয়াছিলেন। তিনি অকস্মাৎ শেষরাত্রিতে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রভাতে ইংরাজ সিবিলিয়ান জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে পাল্কীতে শায়িত দেখিয়া তুলিয়া গৃহে লইয়া চা খাইতে দিয়া বলিলেন, তাঁহার স্ত্রী সেই গৃহে আছেন। বাঙ্গালী সিবিলিয়ান যে সেদিন পঁহুছিবেন, তাহা তিনি জানিতেন না। বিশেষতঃ তিনি একক, অতএব তিনি যদি একটি রাত্রি উপরোক্ত ডেপুটির সদর গৃহে থাকেন, তবে তিনি বড় অনুগৃহীত হইবেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র বলেন যে, তিনি রাত্রিতে বড় হিম খাইয়া আসিয়াছেন, অতএব আর একরাত্রি ভাল ঘরে না থাকিলে তাঁহার অসুখ হইবে। অতএব ঘরখানি তখনই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। বোধহয় তিনি মনে করিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বীর্য্যপ্রকাশের এই সময়। সাহেব শুনিয়া চটিয়া লাল। লাথি মারিয়া ঘরের জিনিসপত্র বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া, স্থানীয় জমিদারের ফৈটিঙ্গ আনাইয়া, তখনই তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া আমার মত এই ডাকবাঙ্গলায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। সাহেব সেখানে পঁহুছিয়া এসিস্টেণ্ট সার্জ্জনকে বলিলেন—"বাবু! তোমার বাঙ্গালী সিবিলিয়ানের ভদ্রতা দেখিলে?" বেহার সুদ্ধ লোক ছি ছি করিয়াছিল। ডাক্তারবাবু বলিলেন, আমার প্রতিও যে এরূপ অভদ্রতা করিয়াছেন, তাহাও ইতিমধ্যে সমস্ত বেহারে রাষ্ট্র হইয়াছে, এবং

চারিদিকে লোকে ছি ছি করিয়া বলিতেছে যে, আমারও তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে অর্দ্ধচন্দ্র দেওয়া উচিত ছিল। আমি যে তাহা করি নাই, লোকে আমার 'রেয়াসতে'র (উচ্চ রক্তের) প্রশংসা করিতেছে।

আমি ঠিক এগারটার সময় কাচারিতে গিয়া চার্জ্জ লইতে আরম্ভ করিলাম। দুইঘণ্টায় এ কাজ শেষ করিয়া এজলাসে গেলে তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আপনি এত শীঘ্র চার্জ্জ লইলেন?" আমি বলিলাম,—"চার্জ্জ লইতে কি আর ২।৪।৬ মাস লাগিবে?" প্রশ্ন—"আপনি সমস্ত টাকা ও ষ্ট্যাম্প দেখিয়াছেন?" উত্তর—দেখিয়াছি। কোর্ট সুদ্ধ সকলে শুনিয়া অবাক্। ফলতঃ চার্জ্জ লওয়া সম্বন্ধে আমার একটা কৌশল ছিল। অনেকে তাহা জানেন না বলিয়া, সবডিভিসনের চার্জ্জ লইতে সেই মাদারিপুরের প্রভুর মত দিনরাত্রি কাটাইয়া থাকেন। তখন তিনি বড় মুস্কিলে পড়িলেন। আমাকে ত আর এজ্‌লাস ছাড়িয়া না দিয়া উপায়ান্তর নাই। তখন তিনি বড় নরম হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার একটা মোকদ্দমা শেষ করিবার ও কয়েকটি রায় লিখিবার বাকি আছে। আমি যদি সেদিন কাজ না করিয়া তাঁহাকে এজলাস ছাড়িয়া দিই, তবে তিনি বড় অনুগৃহীত হইবেন। আমি একটুক হাসিয়া হেড কেরাণীকে বলিলাম, আমি ডাকবাঙ্গলায় চলিলাম। চারটার সময়ে আসিয়া ট্রেজারীর কাজ করিব।

উক্ত কাজ করিয়া ৫টার সময় ফিরিবার সময়ে তিনি আমাকে তাঁহার সঙ্গে সবডিভিসন-গৃহে যাইতে অনুরোধ করিলেন। আমি কিরূপে এ সবডিভিসনের ভার পাইলাম, উপরে আমার কেহ পৃষ্ঠপোষক আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। এতক্ষণে আমার প্রতি তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিলাম। আমি বলিলাম যে, আমি তাহা জানি না, এবং উপরেও এক শ্রীভগবান্ ভিন্ন আর আমার সহায় কেহ নাই। তখন তিনি শান্ত হইলেন এবং আমার প্রতি যে অভদ্রতা করিয়াছেন, তজ্জন্য যেন কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনেমনে ভয় হইল যে, আমি সবডিভিসনের চার্জ্জ লইয়াছি, এখন যদি তাঁহাকে তাঁহার ব্যবহারের প্রতিদান দিয়া বাহির করিয়া দিই, তবে উপায়ান্তর নাই। এবার তিনি নম্রতার সহিত বলিলেন যে, যদি আমার আপত্তি না থাকে, তবে তিনি রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত গৃহে থাকিতে চাহেন। আমি বলিলাম যে, আমি যখন অন্যস্থানে নামিয়াছি, তখন তিনি সমস্ত রাত্রি থাকিলেও আমার আপত্তি নাই। কারণ, রাত্রিতে আমি আর এ গৃহে আসিতেছি না। তখন তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। যাঁহারা তাঁহাকে বিদায় দিতে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি তাঁহাদের কাছে আমাকে বঙ্গের একজন প্রধান কবি ও খ্যাতনামা কর্ম্মচারী বলিয়া খুব প্রশংসা করিয়া পরিচয় দিলেন, তখন তাঁহার অন্যমূর্ত্তি। তাঁহার খানা (Dinner) উপস্থিত হইলে, আপত্তি না থাকিলে আমাকে তাহাতে যোগদিতে অনুরোধ করিলেন। আমি শুনিয়াছিলাম, একজন মেথর তাঁহার পাচক। যদিও আমি অগ্নিদেবের মত উদারনৈতিক, তথাপি মেথর বাবুর্চ্চি পর্য্যন্ত আমার উদারতা সম্প্রসারিত হয় নাই। আমি সে কথা চাপা দিয়া বলিলাম যে, তাঁহার জন্য মাত্রই আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে আমি অংশী হইতে গেলে, তাঁহাকে আমার পৃষ্ঠপোষকের মত, আমার শিষ্টাচারশিক্ষকেরও খবর লইতে হইবে, এবং তাঁহাকে অভুক্ত অবস্থায় বেহার ছাড়িতে হইবে। সকলে হাসিলেন। আমি চলিয়া আসিলাম। পরদিন প্রাতে সবডিভিসন-গৃহে অধিষ্ঠিত হইয়া দর্শকগণের অভ্যর্থনায় নিয়োজিত হইলাম। তাঁহারা সকলেই আমার উর্দ্দু শুনিয়া, আমি কি বেহার অঞ্চলে জন্মিয়াছিলাম, কিম্বা বহুদিন কি তথায় কার্য্য করিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার একটিও নহে শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিলেন যে, আমার এরূপ 'সাপ জবান' কিরূপে হইল? তাঁহারা বলিলেন যে, যাঁহারা বহুদিন বেহারে আছেন, এমন বাঙ্গালীও এরূপ পরিষ্কার উর্দ্দু বলিতে পারেন না। এ খ্যাতি আমার দেখিতে দেখিতে সমস্ত সবডিভিসনে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, এবং আমার প্রথম প্রতিপত্তির কারণ হইল।

আমার প্রথমদর্শক জমিদার মহাশয়কে 'বেলি-সরাই' কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ উহা তাঁহাদের 'খুনসে' (রক্তে) প্রস্তুত হইয়াছে বলিলেন। তিনি তাহারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতালি ছন্দে তাহার একদীর্ঘ উপাখ্যান বলিতে লাগিলেন—"মহারাজ! বেহার সবডিভিসনে পুরাকালে, অর্থাৎ আমার কিছুপূর্ব্বে এক নরপতি (অর্থাৎ সবডিভিসনাল অফিসার) ছিলেন। তিনি সসাগরা সম্বীপা সবডিভিসনের অদ্বিতীয় অধিপতি ছিলেন। সাহেব সেবায় তিনি অলোকসামান্য পারদর্শী ছিলেন। একদিন তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটা প্রকাণ্ড 'বেলি-সরাই' প্রস্তুত করিতে পারিলে, কমিশনর বেলি (Bayley) সাহেবের তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃপা হইবে। তাহাতে এই 'বেলি-সরাই' নির্ম্মিত হইল।" তাহার পর কিরূপ অকথ্য অত্যাচার করিয়া তিনি লক্ষটাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন, এবং ভিত্তিস্থাপন সময়ে নরবলি হইয়াছিল, জমিদার তাহার একদীর্ঘ কাহিনী বলিলেন। কিন্তু এ শ্বেত হস্তী পোষে কে? যাহা টাকা ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। আমি অগত্যা তাহার ভার মিউনিসিপালিটির স্কন্ধে অর্পণ করিলাম, এবং উহা মিউনিসিপালিটির কণ্ঠে একটা প্রস্তরবৎ ঝুলিতে লাগিল। কারণ, তাহার আয় অতি সামান্য ছিল। একটা মেলার সময়ে মাত্র যৎসামান্যসংখ্যক লোক বেহার আসিয়া উহাতে থাকিত। সাহেবেরাও বাজারের মধ্যে থাকিতে চাহেন না বলিয়া ডাকবাঙ্গলাও এখান হইতে উঠিয়া যায়। উহা একটা তালবাগানে অতিশয় সুন্দর স্থানে আমি নির্ম্মাণ করি। অগত্যা এখানে হাসপাতাল উঠাইয়া আনিবার প্রস্তাব করি। শুনিয়াছি, সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়া অট্টালিকাটির সার্থকতা হইয়াছে।

বেহার পুলিস

বেহার স্কুলের বলদেওজি নামক একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষক ছিলেন। লোকটি নিতান্ত ভালমানুষ, অবস্থাপন্ন ও উচ্চাঙ্গের পণ্ডিত। আমি তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহার একটি টোল ছিল। তাহাতে নানা দেশের ছাত্র অধ্যয়ন করিত। একজন ছাপরা জেলার ছাত্রের পুঁথির মধ্য হইতে অন্য একজন ছাত্র কুড়ি টাকা মূল্যের দুইখানা নোট চুরি করিয়া পলায়ন করে। পুলিস তাহাকে ধৃত করিয়া, ছাড়িয়া দিয়া রিপোর্ট করে যে, নালিশটি মিথ্যা। ছাপরার ছাত্রটি দরিদ্র, তাহার কাছে এরূপ নোট থাকিবার সম্ভাবনা নাই। রিপোর্ট শুনিয়া আমার সন্দেহ হয়। আমি ছাত্রটিকে আমার সমক্ষে হাজির হইতে আদেশ করি। পণ্ডিতজি তাহার দুইএকদিন পরে আমার বাঙ্গলায় আসিয়া আমাকে নিতান্ত সংকুচিতভাবে বলেন যে, ছাত্রটি বড়ই কাঁদিতেছে. দুইদিন যাবৎ কিছুই খায় নাই। সে তাহার দেশে চলিয়া যাইতে চায়। অতএব তাহাকে অব্যাহতি দিতে তিনি আমাকে বড়ই অনুনয় করিতে লাগিলেন। আমি শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। আমি বলিলাম, ছাত্রটির ত কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। আমি তাহার নোটচুরির তদন্তের জন্য তাহাকে তলব দিয়াছি। তখন পণ্ডিতজি বলিলেন যে, নোটদুইখানি পুলিস সেই চোর ছাত্রের কাছে পাইয়াছিল। সে পলাইয়া যে বাড়ীতে গিয়াছিল, সে বাড়ীর সকলেই তাহা জানে এবং তাহারা প্রাপ্তনোট দেখিয়াছিল। আমি আরও বিস্মিত হইলাম। বলিলাম ছাত্রটির কোনও ভয় নাই। তিনি তাহাকে আমার কাছে নিরূপিত তারিখে হাজির হইতে বলিবেন। তিনি নাচার হইয়া উঠিয়া গেলেন।

নিরূপিত দিবসে ছাত্রটির ডাক হইলে সে সাক্ষীর বাক্সে উঠিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"আমার পিতা মাতা কেহ নাই। আমি বিদেশী আমাকে ছাড়িয়া দেও। আমি দেশে চলিয়া যাই। আর এখানে থাকিব না।" আমি তাহার এরূপ রোদনের ও কাতরতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, সেই জমাদার সাহেব তখনই কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টারের

আফিসে তাহাকে ধমকাইয়াছে যে, সে সত্য কথা বলিলে, তাহাকে দুইবৎসর কয়েদ করাইয়া দিবে। সে আবার উচ্চৈঃস্বরে তাহার পিতা মাতা নাই বলিয়া রোদন করিতে লাগিল। আমি মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম যে, সত্য সত্যই সেই হেড কনষ্টেবল কোর্ট আফিসে বসিয়া আছে। আমি তখনই তাহার প্রতিকূলে ভয় প্রদর্শনের ও মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাহার জামিন লইলাম, এবং চুরি মোকদ্দমার আসামী সেই ছাত্রের নামে ওয়ারেণ্ট দিলাম। বেহারে আবার একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল।

বেহারের ভার গ্রহণ করিয়াই, কোন জিনিসপত্রের প্রয়োজন হইলে এবং আরদালিদিগকে উহা আনিতে বলিলে, তাহারা একবাক্যে বলিত—"বহুত খোব! দুর্গাবাবুকা পাস্ খবর ভেজ দেঙ্গে।" আমি মনে করিতাম, দুর্গাবাবু বুঝি একজন দোকানদার। দুইএকদিন পরে এক দীর্ঘকায়, বীরমূর্ত্তি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক ফোঁটা, গৌরবর্ণ পুরুষ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহার নামও দুর্গাবাবু। তিনি কথায় কথায় বলিলেন যে, যাহা জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয়, তাঁহার কাছে সংবাদ দিলে সকলই যোগাইবেন। তিনি নিকটস্থ গ্রামের জমিদার। আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে, বাজার হইতে সমস্ত জিনিস আসিবে, তাঁহার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। তিনি বলিলেন যে, বেহার বাঙ্গলা দেশ নহে, সেখানে হাট-বাজার নাই। জমিদারেরা জিনিসপত্র না যোগাইলে কোনও জিনিস, বিশেষতঃ কাঠ পাইব না। তাঁহার বাগান হইতে তিনি হাকিমদের কাঠ যোগাইয়া থাকেন। তিনি বলিলেন যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীদের সময়ে সকল জিনিস তিনি যোগাইয়াছেন। আমি আর কিছু বলিলাম না। তিনি চলিয়া গেলে বেহার থানার সবইন্‌স্‌পেক্টারকে ডাকাইলাম। সেও একটি খাঁটি 'লালা' কায়েত, অত্যন্ত চতুরলোক। বাজার হইতে আমার জিনিসপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে বলিলে সেও ঠিক দুর্গাবাবুর মত বলিল। আমি দেখিলাম, ইহারা সকলেই দুর্গাবাবুর দল। তাহারা এরূপ ষড়যন্ত্রের দ্বারা বেহারের সবডিভিসনাল অফিসারকে দুর্গাবাবুর হাতের পুতুল করিয়া রাখে। শুনিলাম যে, দারোগা সাহেবের ঘোটকটি পর্য্যন্ত দুর্গাবাবুর উপহার! অন্য জিনিসের জন্য একপ্রকার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিলাম, কিন্তু কাঠের জন্য ঠেকিলাম। বাজারে প্রকৃতই কাঠ পাওয়া যায় না। আমাকে নিতান্ত নারাজ দেখিয়া দারোগা অবশেষে বলিল যে, সে 'দেহাত' (মফঃস্বল) হইতে কাঠ কিনিয়া আনাইয়া দিবে। বেহারের প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে একটি আমবাগান আছে। সে সকল বাগানের পুরাতন বৃক্ষ সময়ে সময়ে বিক্রয় হয়। তদ্ভিন্ন আর কাঠ পাইবার উপায় নাই। সচরাচর লোকেরা ঘুঁটে ব্যবহার করে।

কয়েকদিন পরে দুর্গাপ্রসাদ আবার উপস্থিত। গ্রীষ্মকাল, অপরাহ্ণ। আমি তাঁহাকে লইয়া বাগানের অপরপার্শ্বের এক 'চবুতরা'য় বসিলাম। সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আটটা হইল, তিনি কিছুতেই উঠেন না। তিনি কতরূপ বাদসামারা গল্প, তাঁহার বাহাদুরির গল্প ও পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক সবডিভিসনাল অফিসারের সঙ্গে তাঁহার কেমন আত্মীয়তা ছিল, তাহার গল্প, ডেপুটি সাহেব কিরূপে তাঁহার বিপুল দেহ-ভারে সবডিভিসনের সমস্ত জমিদারের পাল্কী ভাঙ্গিয়াছিলেন। কিরূপে দুইবন্ধু একত্রে কিরূপ পর্ব্বতপরিমাণ রুটি আহার করিতেন ও আমোদ করিতেন, তাহার গল্প করিলেন। রাত্রি নয়টা হইল। আমি শিষ্টাচার বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম। আমি বাগান পার হইয়া গৃহে আসিতেছি, তিনি এমন সময়ে ছুটিয়া আসিয়া, বাগানের মাঝখানে আমাকে আবার গ্রেপ্তার করিয়া বলিলেন যে, উক্ত হেড কনষ্টেবলের নামে আমি যে ছাপরা জেলার দুষ্ট ছাত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছি, উহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। হেড কনষ্টেবলটি 'নেহায়েত ভালা আদমি'। আমি তাঁহার প্রতি অন্ধকারে তীব্র ভ্রূকুটি করিয়া বলিলাম—"আমি আপনার প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আবার আপনি

এরূপ করিলে বিপদস্থ হইবেন।” তিনি শুষ্ককণ্ঠে বলিতেছিলেন যে, উক্ত ডেপুটি সাহেবের কাছে সর্ব্বদা এরূপ ‘সুপারিস’ করিতেন। আমি ক্রোধভরে চলিয়া আসিলাম।

বলা বাহুল্য, সেই চোর ছাত্রের আর কোনও উদ্দেশই পাওয়া গেল না। তাহার ঠিকানা বেহারে কেহ জানিত না। হেড কনষ্টেবলের মোকদ্দমার দিন স্বয়ং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পাটনা হইতে উপস্থিত। কমিশনর ইঁহার জামাতা। একটুক খামখেয়ালী হইলেও লোকটা যোগ্য ও উৎসাহশীল। আমি তাঁহাকে এজলাসে আসন দিলাম। বাদীর জবানবন্দীর সময় তিনি বলিলেন যে, তিনি তাহাকে প্রশ্ন করিতে চান। বাদীর পক্ষে একজন বাঙ্গালী উকিল ছিলেন। তিনি বিনাপয়সায় ছাত্রটির পক্ষ পণ্ডিতজির অনুরোধে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন্‌পক্ষে প্রশ্ন করিতে চাহেন, তিনি জানিতে চাহেন। সাহেব বলিলেন—‘আমি ন্যায়বিচারের পক্ষে প্রশ্ন করিতে চাই।” উকিল বলিলেন—আইনে এরূপ কোনও পক্ষ নাই। সাহেব ক্রোধে লাল হইয়া উঠিলেন। আমি বলিলাম, তিনি যদি কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহেন, আমাকে বলিলে, আমি কোর্টের পক্ষে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু তিনি চটিয়া অগ্নিশর্ম্মা হইয়া চলিয়া গেলেন, এবং পথে একজন বাঁকিপুরের উকিলকে বলিলেন যে, বেহারের নূতন সবডিভিসনাল অফিসার একটি ভয়ানক লোক ; সে তাঁহার সমস্ত ভাল ভাল পুলিস কর্ম্মচারীকে ফাঁসি দিতেছে।

মোকদ্দমার শেষবিচারের দিন আমি সেই পরয়লপুর আম্রকাননে শিবিরে আছি। আমার আফিস-শিবিরে আবার সেই ভীষণ দীর্ঘ ফোঁটাযুক্ত দুর্গাবাবু মোলাকাৎ জন্য উপস্থিত। তিনি আবার কথায় কথায় সেই মোকদ্দমার কথা তুলিলেন এবং ‘হেড কনষ্টেবল বেচারা নেহায়েত ভালমানুষ’ বলিয়া আর একপ্রস্থ সুপারিস আরম্ভ করিলেন। আমি চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া, কোর্ট সবইন্‌স্‌পেক্টারকে ডাকাইয়া, তাঁহাকে কাচারির সময়ে আমার কাছে উপস্থিত করিতে হুকুমদিয়া, আমার আবাস-শিবিরে চলিয়া গেলাম। দুর্গাবাবু চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিলেন—‘দোহাই গরিব পরওয়ার, হামকো মাফ্‌ কিজিয়ে। আউর এয়েছা নেহি হোগা।” তিনি দুইঘণ্টা কাল এক আম্রবৃক্ষতল অশ্রুজলে ‘গর্দ্দিশে’ পড়িয়া সিক্ত করিলেন। এবং তাঁহাকে ঘিরিয়া আমলা, মোক্তার, পুলিস ও দর্শক হাহাকার করিতেছিল। আমি কাচারিতে আসিয়া বসিলে সকলে অতিশয় কাতরতার সহিত তিনি বড়খানদানের সম্ভ্রান্তলোক, এ ঘটনা তাঁহার গর্দ্দিশ বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুনয় বিনয় করিলে আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলাম। বলা বাহুল্য, এই বহু-হাকিমের বন্ধু আর আমার কাছে ঘেঁষেন নাই। মোকদ্দমাটি সেইদিনই নিষ্পত্তি হয়। কি করিয়াছিলাম, এখন ঠিক মনে নাই। স্মরণ হয়, হেড কনষ্টেবলের অর্থদণ্ড করিয়া, বাদীকে তাহার নোটের মূল্যের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়াছিলাম। বেহার ফিরিয়া গেলে ব্রাহ্মণ-সন্তান গলদশ্রুনয়নে, এবং পণ্ডিতজী আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ইডেন সাহেব বাঁকিপুর আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, বেহার ফিরিবার জন্য বাঁকিপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে আমার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিল। ফিরিয়া দেখি, হাসিভরা-মুখ সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ডিস্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টে। তিনি আমাকে টানিয়া লইয়া ট্রেনে তাঁহার কক্ষে তুলিলেন। তিনি বার (Barh) সবডিভসনে যাইতেছেন। তিনি আমার পৃষ্ঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—“You are a brave boy ! I like you !” (তুমি সাহসী ছেলে, আমি তোমাকে ভালবাসি)। তিনি ইতিমধ্যে মেটকাফ সাহেবের কর্ণ অধিকার করিয়া, উক্ত মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে উহা বিষাক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মেটকাফ আমার রায় পড়িয়া, ঠাণ্ডা হইয়া আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম—“আপনি যেমন আপনার কর্ত্তব্যের জন্য লড়াই করেন, আমিও আমার কর্ত্তব্যের জন্য তদ্রূপ করি। অতএব আমার

প্রতি আপনার সহানুভূতি হওয়া উচিত।" তিনি বলিলেন যে, অতঃপর আমরা দুজনে বন্ধু হইব। প্রকৃত প্রস্তাবেই তাহার পর হইতে তিনি আমার একজন বড় বন্ধু হইয়াছিলেন। বেহার আসিলে তিনি প্রায় প্রত্যেক অপরাহ্ণ ও সন্ধ্যা আমার গৃহে পানাহারে কাটাইতেন। এই একঘটনায় বেহারের পুলিসও এমন প্রকৃতিস্থ হইল যে, আর তিনবৎসর আমাকে একটি কথাও বলিতে হয় নাই।

বেহারের শাসন ॥ ধান ও জল বিভ্রাট

স্মরণ হয়, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টমাসে পূজার বন্ধের অল্পদিন পূর্ব্বে আমি বেহারের কার্য্যভার গ্রহণ করি। শুনিলাম, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা সমস্তদিন ও রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিতেন। পুলিসের প্রত্যেকদিনের দৈনিক রিপোর্ট (Daily report) পাইয়া আমার আতঙ্ক উপস্থিত হইতেছিল। প্রত্যেক রিপোর্টেই দুইচারিটা করিয়া হাঙ্গামা ও খুনের রিপোর্ট আসিতেছে। বোধ হইতেছিল, যেন ঠিক মাদারিপুরে প্রথম কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি। চুরির ত কথাই নাই; প্রত্যেকদিনের দৈনিক তিনচারি পৃষ্ঠা। তাহাতে কেবল পুলিসে দৈনিক যত নালিশ হয়, তাহারই সংক্ষেপ উল্লেখ মাত্র। যে সকল জমিদার ও পুলিস-কর্ম্মচারী সকল আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিল, এত হাঙ্গামা-খুনের কারণ কি, তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু কার্য্য-কারণ-জ্ঞান তাঁহাদের বড় যে আছে, তাহা বোধ হইল না। জমিদারেরা বলিলেন—"শালা বেয়ারা (প্রজারা) বড়ি বদমাইস্ হায়।" পুলিস-কর্ম্মচারীরা বলিলেন—"বেহারকা আদমি তমাম বদমায়েস।" যাহা হউক, এরূপ অনুসন্ধানে আমি দুইটি কারণ স্থির করিলাম।

বৃষ্টি হইলে পার্ব্বত্য নদ-নদী-সকলের দ্বারা পর্ব্বত হইতে বৃষ্টির জলপ্রবাহ নামিয়া আসে। বাঁধের দ্বারা এই প্রবাহ রুদ্ধকরিয়া জমিদারগণ জল আপন আপন মৌজায় একএক প্রকাণ্ড জলাশয়ে লইয়া গিয়া, বৎসরের জন্য জল সঞ্চিত করেন; এবং সেই জলই বেহারে শস্যের জীবন। সর্ব্বদা জল সেচন না করিলে সেই শুষ্কদেশে কোনও ফসলই উৎপন্ন হয় না। এই জল এত মূল্যবান্ যে, কোন্ মৌজা কতক্ষণ জল লইবে, তাহা আবহমান কাল হইতে নিয়মবদ্ধ আছে। যদি কোন মৌজা সে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অতিরিক্ত সময় জল লইতে চাহে, তবে নিম্নের মৌজার জমিদারের কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ বলপূর্ব্বক বাঁধ কাটিতে আসে, এবং ইহাতে গুরুতর হাঙ্গামা ও খুন হয়। এরূপভাবে বাঁধ কাটার একটা মোকদ্দমা, এক জমিদার অন্য জমিদারের কর্ম্মচারীর নামে উপস্থিত করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে আমার কোর্টে প্রত্যেক পক্ষে এক ব্যারিষ্টার ও দুই উকিলে দিন ১০০০্ টাকা লইতেছিলেন। তাঁহারা রূপচাঁদের মাহাত্ম্যে মোকদ্দমাটি ইচ্ছাকরিয়া এতদীর্ঘ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তিনমাস যাবৎ আমার শিবিরের সঙ্গে সঙ্গে মফঃস্বল ঘুরিয়াছিলেন। উভয়পক্ষে প্রায় ২০০০০্ টাকা ব্যয় হয়। আর বিবাদীর দণ্ড হয় ১০্ টাকা!!! আমি দেখিলাম যে, ইংরাজরাজ্যের কোনও বিধির দ্বারা ইহার প্রতিকার হইতে পারে না। আমি যদি ১০৭ ধারামতে শান্তিরক্ষার, কি ১৪৫ ধারামতে দখল সাব্যস্তের মোকদ্দমা স্থাপন করি, তাহা নিষ্পত্তি হইতে দুইতিন মাস লাগিবে। অথচ দুইতিন ঘণ্টার বেশী পার্ব্বত্য প্রবাহ থাকে না। অতএব জমিদার প্রজারা এরূপ মোকদ্দমার পথে যাইবে কেন? কাজেই তাহারা প্রাণ দিয়া বৎসরের ফসল রক্ষা করিতে চাহে। আমি প্রথম হাঙ্গামা-খুনের যে মোকদ্দমা পাইলাম, তাহাতে প্রচার করিলাম যে, এরূপ হাঙ্গামা না করিয়া, জল অন্যায়রূপে রুদ্ধ হইবামাত্র আমার কাছে ঘোড়ায় ছুটিয়া আসিয়া খবর দিলে, আমি ঘোড়ায় ছুটিয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিব। এরূপ না করিয়া, যে জমিদার-কর্ম্মচারী লাঠি ধরিবে, আমি তাহার কর্ম্মচারীকে ও ভৃত্যদিগকে কিছু

না বলিয়া, জমিদারকে ধরিব। দুইএকজন জমিদারের বিরুদ্ধে এরূপ মোকদ্দমাও স্থাপন করিলাম। তখনও বর্ষা শেষ হয় নাই। এ আদেশ প্রচার হইবামাত্র দিনে ও রাত্রিতে লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল। আমি দুইএকবার ঘোড়ায় ছুটিয়া গিয়া, উভয় পক্ষের কথা মুখে মুখে শুনিয়া, কেহ অন্যায়রূপে জল আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে বোধ হইলে, হুকুম দিলাম যে, সে যদি তৎক্ষণাৎ বাঁধ কাটিয়া না দেয়, তবে অপরপক্ষ আমার কাছে দণ্ডবিধি অনুসারে নালিশ উপস্থিত করিবে। হুকুম শুনিয়া অবরোধকারী তখনই বাঁধ কাটিয়া জল ছাড়িয়া দিল। তাহার পর আর আমাকে ঘটনাস্থানে যাইতে হইল না। দুইএক মোকদ্দমায় কাচারিতে দরখাস্ত লইয়া, সে দিন কি পরদিন অপর পক্ষকে তলব দিয়া ঐরূপ আদেশ করিলাম। এই কৌশলের আশ্চর্য্য ফল ফলিল। সে বৎসর ত আর জল লইয়া আর কোনও হাঙ্গামা হইলই না। তাহারপরও আমি যে তিনবৎসর বেহারে ছিলাম, আর একটি বিবাদও জল লইয়া হয় নাই।

বেহারে হাঙ্গামার দ্বিতীয় কারণ—ধান। বেহারে নগদ খাজনা প্রজার কাছে জমিদার অতি অল্পই পাইয়া থাকেন, অধিকাংশ স্থলে ধানের অংশই খাজনা। তৎসম্বন্ধে দুই প্রণালী আছে—'বাটাইয়া' ও 'দানাবন্দি'। বাটাইয়া ক্ষেতে ধান পাকিতে আরম্ভ করিলে জমিদার একজন প্রহরী নিয়োজিত করেন। তাহাকে 'আগোরা' বলে। সে ক্ষেতে দিনরাত্রি পাহারা দেয়। তাহারপর ধান পাকিলে উহা কাটিয়া ধান মাড়াইবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে যে একটা সাধারণ স্থান থাকে, সেখানে উহা জমা করা হয়, এবং পাহারার সমক্ষে উহা মাড়াইয়া, জমিদারের কর্ম্মচারীর সমক্ষে ওজন হয়। এই ধানের অর্দ্ধেক প্রজা ও অর্দ্ধেক জমিদার প্রাপ্ত হয়। আর 'দানাবন্দির' নিয়ম এই যে, যখন ক্ষেতে ধান পাকে, তখন প্রজার পক্ষে দুইজন ও জমিদারের দুইজন সালিস নিয়োজিত হয়। তাহারা ক্ষেত দেখিয়া কোন্‌ক্ষেতে কতধান হইবে, তাহার একটা অনুমান করে, এবং সেই অনুমিত ধানের দশ আনা জমিদার ও ছয় আনা প্রজা পায়। যদি উভয় পক্ষের সালিসের মধ্যে মতভেদ হয়, তবে এককাঠা ধান কাটিয়া, তাহা মাড়াইয়া ওজন করা হয়, এবং তদ্দ্বারা অবশিষ্ট ক্ষেতের ফসলের উৎপন্ন অনুমিত হয়। বলা বাহুল্য যে, 'দানাবন্দি' জমিদারের পক্ষে এবং 'বাটাইয়া' প্রজার পক্ষে সুবিধাজনক। 'বাটাইয়া'তে প্রজারা 'আগোরা'কে হাত করিয়া জমিদারকে ঠকাইতে পারে। তাই 'বাটাইয়া'কে জমিদারেরা 'লুঠাইয়া' বলে। এজন্য যেখানে প্রজা ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে কিছু মনান্তর, সেখানে প্রজা বলে—তাহার জমি 'বাটাইয়া', জমিদার বলে—'দানা'। জমিদার 'দানা' করিতে আসিলে, প্রজা হাঙ্গামা করিয়া তাহার লোকদিগকে প্রহার করে। অতএব ধান কাটার সময় হাঙ্গামা মোকদ্দমার আর একটা মরসুম। আমি এখানেও উপরোক্ত নীতি খাটাইলাম। জমিদার জোর করিয়া দানা করিতে আসিয়াছে, কিম্বা আগোরা না দিয়া ধান পচাইতেছে বলিয়া প্রজা দরখাস্ত করিলে, প্রথম প্রথম দুইএক স্থানে ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া, উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া, জলের বাঁধ সম্বন্ধে যেরূপ অর্ডার দিতাম, এখানেও সেরূপ অর্ডার দিতাম, জমিদার যদি 'বাটাইয়া' না দেয়, প্রজা ৪২৬ ধারা মতে ক্ষতির নালিশ করিতে পারে, কিম্বা প্রজা যদি 'দানা করিতে না দেয়, জমিদার সেরূপ নালিস করিতে পারে। বেহার অঞ্চলের লোক স্বভাবতঃ এত হাকিম-ভক্ত যে, তাহাদের কাছে হাকিম "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। হাকিমের হুকুমের তাহারা কখনও অন্যথা করে না। তবে প্রথম প্রথম তাহারা পাটনার জজের কাছে আমার জলের ও ধানের হুকুমের প্রতিকূলে 'মোশন' (আবেদন) করে। জজ বলেন যে, আমি ত কোনও নিশ্চয় হুকুম দিই নাই, তিনি কি রহিত করিবেন। কিছুদিন পরে বাঁকীপুরে গেলে জজ বেভারিজ (Beveridge) সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে, তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন যে, বেহারের হাঙ্গামা মোকদ্দমায় তিনি বড়ই জ্বালাতন হইতেন। আমি সবডিভিসনের ভার লইবার পর হইতে তিনি এ মোকদ্দমা কোনও সেসনে কি আপিলে পান

নাই। অতএব তিনি আমার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ। তবে যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া আমি উহা নিবারণ করিয়াছি, যদি আমার হুকুম হাইকোর্টে যায়, হাইকোর্ট উহা আইন-বহির্ভূত বলিয়া তাঁহাকে ও আমাকে আগুনের উপর টানিবেন (Draw both you and me over coals)। আমি বলিলাম—উপায়ান্তর নাই। শান্তিরক্ষার জামিন-মোচলকার দ্বারা, কি দখলের মোকদ্দমার দ্বারা জলের কি ধানের এরূপ বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে গেলে যে সময় লাগিবে, তাহাতে জল নদীতে, কি ধান ক্ষেতে ততদিন থাকিবে না। তিনি তাহা স্বীকার করিলেন. এবং আমার এতাদৃশ শাসন-কৌশলের জন্য, যাহা তিনি মাজিষ্ট্রেটের কাছে বহুল পরিমাণে শুনিয়াছেন, বড়ই প্রশংসা করিলেন। তাহার কিছুদিন পরে ফৌজদারী কার্য্যবিধির সংস্কারের প্রস্তাব হইলে আমি দুইটি প্রস্তাব করি। প্রথমতঃ এরূপ কার্য্য-প্রণালীর দ্বারা শান্তিরক্ষার বিধান; দ্বিতীয়তঃ কোন্ কোন্ ধারার মোকদ্দমা পক্ষেরা আপোস করিতে পারিবে, তাহার পরিষ্কার বিধান। এরূপ পরিষ্কার বিধানের অভাবে মোকদ্দমা আপোস করা একটা সঙ্কট হইয়া পড়িয়াছিল। এক মাজিষ্ট্রেট যাহা আপোস করিতে দিতেন, অন্যে তাহা দিতেন না। জজ, মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনর, উভয়ে আমার এই দুইপ্রস্তাবের বিশেষ সমর্থন করেন। তদনুসারে উপস্থিত কার্য্যবিধিতে ১৪৪ ও ৩৪৫ ধারা বিধিবন্ধ হয়। আমার মতে শেষোক্ত ধারার আরও সম্প্রসারণ আবশ্যক। কেবল খুন, রাজবিদ্রোহ প্রভৃতি কয়েকটি গুরুতর অপরাধ ভিন্ন সকলই আপোস করিতে দেওয়া উচিত। এখনও অনেক মোকদ্দমায়—এমন কি, খুনি মোকদ্দমায় পর্য্যন্ত উভয়পক্ষ মিলিয়া আপোস করে। কিন্তু বিধান নাই বলিয়া আমরা আপোস করিতে দিতে পারি না। ফলে এই হয়, আমরা একটা বিচার-প্রহসনের অভিনয় করিয়া, কালি কলম ও সময়ের শ্রাদ্ধ করি। বাদী ও তাহাদের সাক্ষীরা ইচ্ছাকরিয়া এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, তাহাতে বিবাদীর কোনও মতে দণ্ড হইতে পারে না। ইহার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমি চট্টগ্রামের ইন্‌স্‌পেক্টারের প্রতিকূলে মিথ্যা সাক্ষ্যের মোকদ্দমায় দিয়াছি।

আমাকে কার্য্যভার দিবার সময় পূর্ব্ববর্ত্তী যে মন্তব্য রাখিয়া যান, তাহাতে তিনি গোলাপ রায় নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ২১১ ধারার অর্থাৎ মিথ্যা নালিশের একটা মোকদ্দমার বিশেষ উল্লেখ করিয়া ভাষার ইঙ্গিতে উহাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমাকে একরূপ অনুরোধ করিয়া যান। মোকদ্দমাটির অবস্থা এইরূপ। বোলাকি সাহু বলিয়া বেহারের বাজারে একজন বড়ই ধূর্ত্ত দোকানদার ছিল। সে পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক সবডিভিসনাল অফিসারের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিল। সে সবডিভিসন-হাতার এক দ্বারদিয়া ঘুষের টাকা লইয়া অন্যপথে বাহির হইয়া গিয়া ঘুষ-দাতাকে বলিত যে, সে "ডিপুটি সাহেবকে" ঘুষ দিয়া আসিয়াছে। এই ডিপুটি সাহেব বহুদিন বেহারে ছিলেন, এবং বহুদিন সে এই ব্যবসা করিয়াছিল। এ ঘুষের কত অংশ সে লইত ও কত অংশ হুজুর উদরস্থ করিতেন, তাহা বিধাতাপুরুষ মাত্রই জানেন। হুজুরের বদলির আদেশ প্রচারিত হইলে একজন জৈন মহাজন তাঁহাকে গিয়া বলে যে, বোলাকি তাঁহার নাম দিয়া তাহার কাছ হইতে ৫০০্ টাকা আনিয়াছে। শুনিয়াছি, তিনি স্থানীয় জমিদার হইতে এরূপ ঋণ গ্রহণ করিতেন। অবশ্য তাহা কখনও আর পরিশোধ হইত না। শুনিয়াছি, কেবল একজন হইতেই তিনি কিস্তিতে কিস্তিতে প্রায় ৭০০০্ টাকা এরূপ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ জৈন মহাজন সে প্রকার উদার লোক নহে। সে টাকার জন্য ধরিলে 'হুজুর' বলিলেন যে, তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। বোলাকিকে তলব দিয়া আনিয়া এবং মহাজনকে পশ্চাৎকক্ষে লুকাইয়া তিনি বোলাকিকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে টাকা আনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। মহাজন বাহির হইয়া তাহার খাতা দেখাইলে বোলাকি বলে—"হাঁ হাঁ! ঠিক এয়াদ হুয়া। এ রোপেয়া হামারা ওয়াস্তে হাম লেয়ারে থা।" এতাবৎ কারণে বেহারের লোকের বিচারকের উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস ছিল না। স্কুলের

বাঙ্গালী হেডমাষ্টার আমার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন? অমনি লোকের বিশ্বাস হইল, তিনি একজন আমার "দোস্ত"। আর তাঁহার রক্ষা নাই। তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, যে, তিনি বড় বিপদে পড়িয়াছেন। তাঁহার বাসায় ও স্কুলে গিয়া লোকে মোকদ্দমার সুপারিসের জন্য তাঁহাকে জ্বালাতন করিতেছে। আমার উপদেশমতে পরদিন তিনি একটি লোককে একখানি পত্র সহ পাঠাইলেন। সে মনে করিল, উহা সুপারিস। বড় আনন্দে আমার হাতে আনিয়া কোর্টে যেমন দিল, আমি তখনই তাহাকে ফৌজদারীতে দিলাম। তাহার চীৎকার ও লোকের হাসিতে কাচারি পূর্ণ হইয়া গেল। পঁচিশবৎসর হইল, সবডিভিসন খুলিয়াছে, অথচ লোকের মনে এরূপ বিশ্বাস কেন রহিল, জিজ্ঞাসা করাতে, মোক্তার ও আমলাগণ নাম গোপন করিয়া, আমাকে বোলাকি সাহুর উপরোক্ত গল্প শুনাইল। এই বোলাকি সাহুর বিরুদ্ধে আমার পূর্ব্ববর্ত্তীর কাছে গোলাপ রায় বলিয়া এক ব্যক্তি নালিশ করে যে, সবরেজিষ্ট্রার কাজী সাহেবের সঙ্গে যোগ করিয়া বোলাকি সাহু তাহার বাড়ী নয়শত টাকাতে কিনিয়াছে বলিয়া এক জালদলিল প্রস্তুত করিয়াছে। কাজীসাহেব একজন অদ্ভুত লোক, এবং খোসামুদি-মহাবিদ্যায় এরূপ সিদ্ধহস্ত যে, বেহারের হাকিমদের বোলাকির মত তিনিও আরএক প্রিয়পাত্র। কাজেই দুইজনের মধ্যে বড়ই বন্ধুতা। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কেবল কাজী সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়া, গোলাপ রায়ের মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া ডিস্‌মিস্‌ করিয়া, তাহার প্রতিকূলে ২১১ ধারামতে মিথ্যা নালিশের অভিযোগ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহার প্রতিকূলে "চার্জ" পর্য্যন্ত করিয়াছেন। এ অবস্থায় তিনি স্থানান্তরিত হন, এবং তাঁহার মন্তব্যে এ মোকদ্দমার প্রতি আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মোকদ্দমা আমার কাছে উপস্থিত হইলে বাদীর পক্ষ হইতে আমূল পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইল। আমি আইনমতে পুনর্ব্বিচার করিতে বাধ্য হইয়া বিচার আরম্ভ করিলাম। দলিলখানি যে সত্য এবং গোলাপ রায় উহা স্বয়ং রেজেষ্টারী করাইয়া দিয়াছিল, তাহার প্রমাণ বোলাকি সাহু, কাজী সাহেব ও দলিলের লিখিত দুই একটি বোলাকির আত্মীয়।

একজন বাঙ্গালী উকিল গোলাপ রায়ের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন। কাজী সাহেব তাহার সঙ্গে একটা যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতে লাগিলেন যে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিলে তাঁহার মত 'রইসকে' (উচ্চবংশীয়কে) এরূপ বেইজ্জতি প্রশ্ন করিতে কখনও দিতেন না। তিনি কোনও মতে উত্তর দিবেন না। "আউর হাম কুচ নেহি কহেঙ্গে"—বলিয়া চুপ করিয়া থাকিতে লাগিলেন। আমি জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম এবং জেলে দেওয়ার ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে উত্তর দিতে বাধ্য করিতে লাগিলাম। দিল্লীর পুরাতন খানদানের সনন্দপত্র সকল কিনিয়া আনিয়া, উহা তাঁহার বুজরগণদের (পূর্ব্বপুরুষদের) সনন্দ বলিয়া, গবর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়া, তিনি সবরেজেষ্টারি লইয়াছেন কি না, রাত্রি দুইপ্রহর সময়েও সময়ে সময়ে দলিল রেজেষ্টারি করেন কি না, ঘুষ লইয়া অমুক অমুক দলিল রেজেষ্টারি করিয়াছিলেন কি না এবং উহা জাল প্রমাণিত হইয়াছে কি না, অমুক অমুক মোকদ্দমার দলিল সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন কি না, এবং কোর্ট উহা অবিশ্বাস করিয়াছিলেন কি না,—এরূপ রাশি রাশি প্রশ্ন হইতেছিল। অবশেষে বৃদ্ধ কাজী-সাহেবের শ্বেত শ্মশ্রু বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। কাচারি লোকে লোকারণ্য এবং সকলকে তাঁহার এ দুর্গতিতে আনন্দিত দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

কাজীসাহেব পরদিন এক প্রকাণ্ড টিনের চোঙ্গা (চার হাত দীর্ঘ এবং দুই হাত বেষ্টন) এক ভৃত্যের স্কন্ধে লইয়া আমার কাছে উপস্থিত। তাহা হইতে দিল্লীর পাদ্‌সারা তাঁহার বুজরগণদের যে সকল সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা একে একে বাহির করিয়া, অপূর্ব্ব উচ্চারণ-সম্বলিত সে সকল সনন্দ পাঠ করিতে আসিলেন, আমি এ সকল সুললিত সনন্দপত্র নীরবে শুনিলাম। তাহারপর আমাকে অজস্র খোসামুদির গোলাপজলে সিক্ত করিলেন। সে সকল

প্রশংসা সত্য হইলে, ভূভারতে আমার মত লোক জন্মে নাই ও জন্মিবেও না বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহাও নীরবে শুনিয়া আমি তাঁহাকে বিদায় দিলাম। তিনি বুঝিলেন যে, ঔষধ ধরিল না। বিমর্ষমুখে আমাকে দীর্ঘ সেলাম করিতে করিতে পশ্চাৎ হাঁটিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। পরদিন পাটনায় ছুটিয়া, তাঁহার মুরুব্বি কলেক্টর মেটকাফের (Metcalfe) কাছে গিয়া, আমার অজস্র নিন্দা করিয়া, শেষে এতকাল পরে তাঁহার এই বৃদ্ধ বয়সে আমার হাতেই 'নেহাত বেইজ্জতে'র কথা বলিলেন। সহৃদয় মিঃ মেটকাফ কাজীসাহেবের প্রতি সাবধান ব্যবহার করিতে আমাকে সতর্ক করিয়া এক ডেমি-অফিসিয়াল পত্র লিখিলেন।

অন্যদিকে যেদিন গোলাপ রায়ের দলিল রেজেষ্টারি হয়, সেদিন অন্য যাহাদের দলিল রেজেষ্টারি হইয়াছিল, গোলাপ রায় তাহাদের সাক্ষী মানিল। তাহারা সকলে সাক্ষ্য দিল যে, সেদিন বেলা ১১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রেজেষ্টারির কার্য্য হয়. তাহারা গোলাপ রায়কে কোনও দলিল রেজেষ্টারি করিয়া দিতে দেখে নাই। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গোলাপ রায়কে চিনিত। আমি পরওয়ালপুরে প্রথম শিবিরে যাই। সেখানে একদীর্ঘ রায় লিখিয়া গোলাপ রায়কে অব্যাহতি দিলে বৃহৎ আম্রবাগান ব্যাপিয়া একটা আনন্দের কোলাহল উঠিল। বেহার ভাঙ্গিয়া হুকুম শুনিতে লোক আসিয়াছিল! মোক্তারেরা ও আমলারা আমাকে বলিল—"গরিব-পরওয়ার! একবার বাহির হইয়া, লোকেরা কি করিতেছে. কি বলিতেছে শুনুন। দলিলখানি যে জাল ও দুফর রাত্রিতে রেজেষ্টারি হইয়াছিল. বেহারের আবালবৃদ্ধের মুখে এ কথা"! আর গোলাপ রায়? সে হুকুম শুনিয়া বসিয়া পড়িল ও কাঁদিতে লাগিল। সে বলিল যে, এ মোকদ্দমায় সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর ও সন্তানের অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার খরচের জন্য বিক্রয় করিয়াছে। হায় রে! ইংরাজরাজ্যের সুবিচার!

কাজী চুকুলির দ্বারা মেটকাফ সাহেবের মন যেরূপ বিষাক্ত করিয়াছিল. আমি সে বিষ প্রতিহারের জন্য আমার রায়ের একখণ্ড নকল তাঁহার কাছে ডিঃ রেজিষ্ট্রারস্বরূপ পাঠাইলাম। তিনি বেহার হইতে কাজীর বদলির জন্য ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেলের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলেন। কাজী সাহেব ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেলের বড় পেয়ারের লোক। তাহার খোসামুদি ও উপঢৌকনে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কাজী তাঁহার পায়ে গিয়া পড়িল। তিনি আমার রায় অভেদ্য দেখিয়া, কাজীর চুকুলির উপর নির্ভর করিয়া, আমাকে আক্রমণ করিয়া এক তীব্র পত্র লিখিলেন। আমি ততোধিক তীব্র স্বরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া এবং তাঁহার উক্তিসকল অমূলক সাব্যস্ত করিয়া উত্তর দিলাম। মিঃ মেটকাফ ও কমিশনর মিঃ হেলিডে (Halliday) উভয়ে আমার পৃষ্ঠপোষণ করিলেন, যদিও উভয়ে কাজীর মুরুব্বি ছিলেন। এ অবস্থায় বঙ্গের বর্ত্তমান লেপ্টেনান্ট গবর্ণর বোর্ডিলন ইন্‌স্‌পেক্টার জেনারেল হইলেন। কেবল কলেক্টর কমিশনর তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে লেখেন নাই বলিয়া, তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত না করিয়া, কাজীর প্রকাণ্ড চোঙ্গা সহ তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিলেন। বেহারে আমার একটা জয়ধ্বনি উঠিল। তখন শুনিলাম, কাজী অনেক লোকের এরূপ সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। কেবল সাহেব-সেবক ছিল বলিয়া তাহার কেহ কিছুই করিতে পারে নাই।

বেহার ভ্রমণ

নভেম্বর মাসের আরম্ভ হইতেই বেহারে বেশ শীত পড়িতে আরম্ভ হয়। সে সময়েই মফঃস্বল পরিভ্রমণে নির্গত হইলাম। প্রথম 'গিরি-এক' নামক স্থানে শিবিরে প্রেরিত হইতেছে। আমি গৃহের হল-কামরায় বসিয়া আছি। ডেরার সঙ্গে যে কনষ্টেবল যাইতেছে. আরদালি তাহাকে হুকুম করিতেছে—"জমাদার সাহেবকে বলিবে, যেন একমণ দুধ আধমণ ঘি, আধমণ আটা রোজ প্রস্তুত রাখে।" আমি শুনিয়া অবাক্! আরদালিকে ডাকিয়া বলিলাম,—রোজ এত দুধ, ঘি, আটা আমি কি করিব? সে বলিল—"বাবু! সেই দুর্গাবাবু

ও কাজী সাহেবের বন্ধু যখন মফঃস্বল যাইতেন, তখন এইরূপই হুকুম যাইত।" আমি বলিলাম—হইতে পারে, তাঁহার বহু পরিবার ছিল। আমার মাত্র স্ত্রী ও এক শিশু সঙ্গে। আমি এত জিনিস কি করিব? সে তখন আমাকে নিতান্ত ছোটলোক সাব্যস্ত করিয়া, বিরক্তভাবে কনষ্টেবলকে আমার আদেশমতে তিনচারি সের দুধ ও সেই পরিমাণ অন্য জিনিসের কথা বলিল।

অপরাহ্নে বেহারের গ্রাম্য শোভা দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহণে আমি 'গিরি-এক' চলিলাম; সুন্দর প্রশস্ত পাকা পথ, নওয়াদা সবডিভিসন হইয়া গয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। নানারূপ শস্যে আচ্ছন্ন। শীতের সময়ে অহিফেনক্ষেত্রের মনোহর শোভা যে একবার দেখিয়াছে, সে কখনও ভুলিতে পারিবে না। ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপিয়া যখন তাহার অমল শ্বেত, কিম্বা রাঁধুনিপুষ্পসন্নিভ গভীর রক্ত গোলাকার ফুল ফুটে, শোভায় নয়ন মোহিত করে। সমস্ত প্রান্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যেন ঝক ঝক করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল কূপ ও তাহা হইতে জলোত্তোলনকারী কাষ্ঠ মাত্র দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলা দেশের প্রান্তরের মত এখানে জঙ্গল, সেখানে পঙ্কিল সলিলপূর্ণ গড়, বেহার প্রান্তরে কিছুই নাই। প্রান্তরবাহী সান্ধ্য সমীরণ অঙ্গে অমৃত বর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে গ্রামের গৃহপুঞ্জ। কদর্য্য মাটির দেয়াল, তাহার উপর খড়ের ছাউনি। গৃহগুলি এরূপ পরস্পর সংলগ্ন যে, সমস্ত গ্রাম একটিমাত্র গৃহ বলিলেও চলে। মধ্যে মধ্যে গ্রামের এই গৃহবন হইতে জমিদারের গৃহ ধবল, কি চিত্রিত দেহ উত্তোলন করিয়া বল্মীকস্তূপপার্শ্বে পর্ব্বতের মত শোভা পাইতেছে। প্রান্তর যেমন পরিষ্কার, গ্রাম তেমনি নরক। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে গৃহশ্রেণী। প্রত্যেক গৃহের আবর্জ্জনা ও ময়লা জল নির্গমের 'মুড়ি' রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠিয়া পড়ে। গৃহের একটিমাত্র দ্বার। যিনি কিছু ভাগ্যবান্, তাঁহার একটা ক্ষুদ্র অঙ্গনের চতুঃপার্শ্বে একহারা মাটির ঘর। এরূপ গ্রামে কিরূপে বেহারবাসীরা সুস্থ শরীরে থাকে, তাহা এক নিগূঢ় রহস্যবিশেষ। গ্রামের বহির্ভাগে একটি ইন্দারা (জলকূপ), জল তরল অমৃত। প্রত্যেক গ্রামের বাহিরে একটি আম্রকানন শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষে শোভিত। ফল নানাবিধ, অতরল অমৃত। কাননতল শ্যাম দূর্ব্বাদলে গালিচা-মণ্ডিত। এ সকল আম্রকাননে আমাদের তাঁবু পড়িত। এ আম্রকানন ভিন্ন কদাচিৎ গ্রামের কেন্দ্রস্থলে, কি বহির্দ্দেশে ইন্দারাসমীপে বিস্তৃতশাখা 'পিপ্পল' বা অশ্বত্থবৃক্ষ। তাহার ছায়ায় গ্রাম্য পঞ্চ বা পঞ্চাইত গ্রামের যাবতীয় সামাজিক ও পারিবারিক বিবাদসকল নিষ্পত্তি করিয়া থাকে।

এ সকল গ্রাম্য শোভা দেখিতে দেখিতে আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বে গিরি-এক বাঙ্গলায় পঁহুছিলাম। স্ত্রী শিশুপুত্রকে লইয়া পূর্ব্বেই পাল্কীতে পঁহুছিয়াছিলেন। 'বাঙ্গলা'খানি পূর্ত্তবিভাগের বা পাবলিক ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টের; অতি সুন্দর ও পরিষ্কার। পাকা দেয়ালের উপর সুন্দর খাপড়ার ছাউনি। গৃহখানি যেন হাসিতেছে। তাহার সম্মুখে প্রাঙ্গণে আমার কাচারির তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর সম্মুখে গিরি-এক থানার হেড় কনষ্টেবল সপুলিস দন্ডায়মান। আমি তাহাকে আমার 'ডেরা'র সম্মুখে একটা মুদীর দোকান বসাইয়া দিতে, যেন তাহার কাছ হইতে আবশ্যক জিনিস আমাদের লোকেরা মূল্যদিয়া কিনিতে পারে, এবং আমাদের জন্য প্রত্যহ তিনচারি সের দুগ্ধের বন্দোবস্ত কোনও গোয়ালার সঙ্গে করিয়া দিতে বলিলাম। এ আদেশ দিয়া গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম যে, সেখানে "হুজুর গরিবপরওয়ারে"র বিরুদ্ধে এক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। স্ত্রী বলিলেন, আমি কি ছাই হুকুম দিয়াছি, তাহার ফলে আমার একবৎসরের শিশু দুগ্ধাভাবে কাঁদিতেছে। পুলিস জবাব দিয়াছে—এখানে দুগ্ধ কিনিতে পাওয়া যায় না। খাওয়ারও জিনিসপত্র কিছুই কিনিতে পাওয়া যায় না। সকলই পুলিসষ্টেশন হইতে যোগাইয়া থাকে। আমি তাহা লইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছি। কাজেই

রাত্রিতে আহারের আয়োজন কিছুই হয় নাই। এ দিকে অশ্বারোহণে দশমাইল পথ কাচারির পর আসিয়া, স্থান ও পরিশ্রম-মাহাত্ম্যে আমার এমন ক্ষুধা হইয়াছে যে, আমি ক্রোধে ভৃত্য-দিগের মুণ্ড খাইতে অগ্রসর হইলাম। আমি বুঝিলাম যে, অবৈধরূপে জিনিসপত্র পুলিস হইতে লইতে নিষেধ করাতে তাহারা আমাকে জব্দ করিবার জন্য পুলিসের সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছে। আমি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া, আবার পুলিসকে তলব দিলাম। হেড কনষ্টেবল আসিয়া নতশিরে আমার ক্ষুধোত্থিত ক্রোধাগ্নিতে মদনের মত ভস্ম না হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে বলিল যে, আমার হুকুম-মোতাবেক মুদীর দোকান একটা শিবিরদ্বারে স্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও ছাতু ও গুড় ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। এখন ছাতু গুড় খাইয়া আমরা যেন রাত্রি কাটাইলাম, শিশুটির উপায় কি হইবে? সে বলিল—তাহাকে বিশ্বাস না হয়, ভৃত্য একজন সঙ্গে দিলে, সে গোয়ালাদের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করিয়া কিছু দুধ সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবে। বিশ্বাসী বাঙ্গালী ভৃত্যকে সঙ্গে দিলাম। সে রাত্রি আটটার সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, গোয়ালা অনেক ঘর আছে, কিন্তু সকলেই জবাব দিয়াছে যে, দুধ নাই। তখন শ্রীক্ষেত্রের ষ্টীমারের সেই বাবাজির কথা মনে পড়িল—"সৎকর্ম্মে শত বাধা।" আমার সৎসংকল্প রক্ষা করিবার আর উপায় না দেখিয়া, আমি নিরুপায় হইয়া হেড কনষ্টেবলের হস্তে ধরা দিলাম। সে বলিল—"হুজুর মালিক! হুকুম দিলে আমি এখনই একমণ দুধ সংগ্রহ করিয়া দিব।" আমি হারি মানিয়া নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে এক গোয়ালার স্কন্ধে দশসের দুধ, আটা, ঘি ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া উপস্থিত। অন্য উপকরণ সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া, আমি গোয়ালাটাকে একটুকু "ধর্ম্মের কাহিনী" বুঝাইতে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি মূল্য দিতে চাহিলাম, তথাপি একপোয়া দুধ তাহারা দিল না; এখন এত দুধ কোথা হইতে আসিল? সে বলিল—"ব্যাপ রে বাপ! কি করিব; জমাদার সাহেব লাঠি চালাইতে চাহে। কাজেই দুধ বাহির করিয়া দিয়াছি।" আমি তখন বুঝিলাম যে, কঠোর উৎপীড়নে ইহাদের পৃষ্ঠের চর্ম্ম এত পুরু হইয়াছে যে, শিষ্টাচার তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না।

গিরি-এক আউট-পোষ্ট বেহার পুলিস-ষ্টেশনের অধীন। পরদিন প্রাতে বেহারের সেই লালাকায়েত সবইন্‌স্‌পেক্টার আসিয়া উপস্থিত। সে আসিয়া আমাকে ভর্ৎসনা কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"সরকার! আপনি কি সুরু করিয়া দিয়াছেন? আপনি নাকি হেড কনষ্টেবলের কাছে মূল্যে লইয়া জিনিসপত্র কিনিয়া আনিয়া দিতে হুকুম দিয়াছেন, এবং সে দিতে পারে নাই বলিয়া তাহার উপর 'রঞ্জ' (বিরক্ত) হইয়াছেন? এ কি বাঙ্গলা দেশ যে, হাট আছে, বাজার আছে, যেখানে সেখানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যাইবে? এখানের নিয়ম এই যে, শীতের আরম্ভে প্রত্যেক চৌকিদার প্রত্যেক গ্রামের জমিদারী কাচারি হইতে রসদ অর্থাৎ আটা, ঘি, মুর্গী, ডিম, কাঠ ও পোয়াল ইত্যাদি আনিয়া থানায় জমা করিয়া দেয়। কোন্ চৌকিদার কত রসদ আনিবে, তাহার বরাদ্দ আছে। তদনুসারে সমস্ত জিনিস থানায় জমা হয়, এবং যত হাকিম সর্‌কটে আসেন, সেখান হইতে সকলেরই রসদ আসে।

আপনি মূল্য দিয়া জিনিসপত্র কিনিতেছেন, এ কথা যদি প্রচারিত হয়, তবে আমাদের উপায় কি হইবে? আপনার জন্য ত সামান্য জিনিসপত্র আবশ্যক। কিন্তু যখন কলেক্টর, কমিশনর প্রভৃতি সাহেবেরা আসিবেন, তাঁহাদের জন্য অপরিমিত রসদ পুলিসের যোগাইতে হইবে। পুলিস তাহা কোথায় পাইবে? আপনি যদি এরূপে রসদ সংগ্রহ করিতে নিষেধ করেন, তবে আমাকে সেরূপ হুকুমনামা দেন, যেন আমি সাহেবদের দেখাইতে পারি। নতুবা আমাদের পুলিসের চাকরি থাকিবে না।

পূর্ব্বরাত্রির দুর্ভোগের বা অর্দ্ধভোগের পর যে বীরত্বটুকু শরীরে ছিল, তাহা এই কায়েত-কুল-তিলকের ধমকে জল হইয়া গেল। আমি বুঝিলাম যে, আমিও "নবীন তপ-

স্বিনী”র জলধরের মত কেউটিয়া সাপের লেজ মাড়াইয়াছি। শুধু পুলিসের নহে, এ পথের পথিক না হইলে আমারও চাকরি থাকিবে না। স্মরণ হইল, ভবুয়াতেও রসদ সংগ্রহের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। তখন “তৃণাদপি সুনীচেন” হইয়া বলিলাম যে, সাহেবদের বড় বড় উদর, তাঁহারা সকলই হজম করিতে পারেন। আমি-বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র উদরে সে পরিমাণ হজম হইবে কেন? অতএব সাহেবদের বেলায় পুলিস চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসরণ করুক। আমার বেলায় নিতান্ত যাহা কিনিতে পাওয়া যায় না তাহা যোগাইলেই হইবে। ইহার কিছুদিন পরে বেহারের প্রধান হিন্দু জমিদার আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে এই রসদ-প্রণালী হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, তিনি আমার নিষ্ফল চেষ্টার কথা শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, জমিদারেরা রসদ না যোগাইলে আমি কোথায়ও পাইব না। আর তাঁহারা দোকানদার নহেন যে, মূল্য লইয়া বিক্রয় করিবেন। বিশেষতঃ, শুধু আমি একজন হইতে মূল্য লইলেই বা কি হইবে? আমার সঙ্গে সরকটে যে সকল আমলা, মোক্তার, পুলিস যায়, সকলকে তাঁহাদের রসদ যোগাইতে হয়। অন্যথা গরিবেরা অনাহারে মরিবে। অতএব আবহমান কাল হইতে জমিদারদের প্রত্যেক কাচারিতে এই রসদের বন্দোবস্ত আছে। আমি তাহার অন্যথা করিলে চলিবে না। তবে এক-বৎসর কোনও জমিদারের এলেকায় একবারের অধিক ‘ডেরা’ পড়িলে, তাহার উপর বেশী জুলুম হয়। কারণ, প্রত্যেক স্থানে তাহাদের ৩০০৲ টাকার কম খরচ পড়ে না। আমি যদি এই ভাবে ‘সফর’ (মফঃস্বল ভ্রমণ) করি, তাহা হইলেই জমিদারেরা যথেষ্ট অনুগৃহীত হইবে, এবং এখনই যে চারিদিকে আমার এত প্রশংসা উঠিয়াছে, তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এ লোকটি বড় স্পষ্টবাদী। তিনি আমাকে আরও একটি পরামর্শ দিলেন। উপরোক্ত রসদ ছাড়া, যেখানে শিবির সন্নিবেশিত হয়, সেখানের জমিদার কাবুলি মেওয়ার একটা প্রকাণ্ড ডালি উপহার দেয়। এত মেওয়া কে খায়? সঙ্গী আমলা, মোক্তার ও পদাতিকগণও খাইতে চাহে না। এ জন্য কোনও কলেক্টর তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া লইয়া পাটনায় বিক্রয় করিতেন। আমি এরূপ ডালি দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। জমিদার বলিলেন যে, তাহাতে আমার বদনাম হইতেছে, এবং যাহাদের ডালি ফেরত দিয়াছি, তাহারা তাহাদিগকে অপমানিত মনে করিয়াছে। বলা বাহুল্য, অতঃপর উভয় বিষয়ে আমি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। তবে আমার অভিপ্রায়মতে মেওয়ার মাত্রা কমিয়াছিল। আম্র সম্বন্ধেও ডালি লইয়া বড় বাড়াবাড়ি হইত। সোনা রূপার তবকে মণ্ডিত হইয়া আম্র ও সময়ে সময়ে পাটনা হইতে আনীত মৎস্যও প্রেরিত হইত। কারণ, বেহারে মৎস্য পাওয়া যায় না। কাহার আম্র সরকার ভাল বলিয়াছিলেন, তাহা লইয়া একটা রেষারিষি হইত। এক এক জন জমিদার মালদহে বাগান কিনিয়া রাখিয়াছেন। সেখান হইতে তাঁহার আম্রের আমদানি হয়। কাহার বাগানের আম কেমন, আমাকে তুলনায় সমালোচনা করিতে হইত। এত বিভিন্ন প্রকারের এমন উৎকৃষ্ট আম্র আমি কখনও খাই নাই। একবার একজন মোক্তার কতকগুলি আম দিয়াছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম—বেল। কেবল দেখিতে নহে, আস্বাদ এবং গন্ধও ঠিক বেলের মত।

বেহার মফঃস্বল ভ্রমণ সবডিভিসনাল অফিসারের পক্ষে কি যে আনন্দজনক ব্যাপার, তাহা আর কি বলিব? রাস্তার অভাবে প্রথম দুইবৎসর শিবির ও সরঞ্জাম গরুর পিঠে এবং গরুর অধিক কুলির পিঠে লইতে হইত। আমার দুইখানি তাঁবু ছিল। একখানিতে সস্ত্রীক থাকিতাম, আর একখানিতে কাচারি করিতাম। আমি কাচারিতে বসিলে আবাস-তাঁবু ভাঙ্গিয়া, পরের শিবিরের স্থানে পাঠান হইত, এবং শিশু-পুত্রকে লইয়া স্ত্রী পাল্কীতে যাইতেন। একখানি বড় সুন্দর পাল্কী প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম। তাহার দুইদিকের দ্বারে নেটের রঙ্গিন পর্দা ছিল। দ্বার খুলিয়া রাখিয়া স্ত্রী যাতায়াত করিতেন। বেহার অঞ্চলের মহিলারা পথ চলিতে পাল্কীর রুদ্ধ দ্বারের উপর আবার আবৃত কাপড়ের ঢাকা রাখিতেন। তাঁহাদের

যে নিশ্বাস বন্ধ হইত না, ইহাই আশ্চর্য্য। যাহা হউক, আমার পাল্কী একটা নূতন ব্যাপার হইয়া উঠিল। কারণ, রঙ্গিন পর্দ্দা মাত্র থাকাতে বাহির হইতে কিছুই দেখা যাইত না। বেপর্দ্দার ভয়ে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কেহ কখনও সপরিবার শিবিরে যাইতেন না। আমি যখন সপরিবার যাইব বলিলাম, তখন আমলা, পুলিস, জমিদারগণ শুনিয়া কানে হাত দিলেন। আমার পেস্‌কার মুরব্বিয়ানা করিয়া আমাকে বলিলেন—"পরিবার সঙ্গে সফর যাইবেন, এ কেমন কথা। সেখানে বেপর্দ্দায় থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।" আমি ধৌত মারকিন কাপড়ের চারিখানি চারিহাত উচ্চ পর্দ্দা, লাল পাড় দিয়া প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম, এবং তাহার গায়ে স্থানে স্থানে খোল করিয়া রাখিয়াছিলাম। এ পর্দ্দাগুলি অন্য কাপড়ের মত ভাঁজ করিয়া লওয়া যাইত, তাহার সঙ্গে চারিহাত উচ্চ কতকগুলি কাঠের খুঁটির একটা বোঝা যাইত। আবাস-শিবির স্থাপিত হইলে তাহার একপার্শ্বে এই পর্দ্দার দ্বারা একটি সুন্দর আবৃত প্রাঙ্গণ কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইত। খুঁটিগুলি মাটিতে পুতিয়া, পর্দ্দা চারিখানি তাহার উপর বসাইয়া দিলেই হইল। এই আবৃত প্রাঙ্গণের এক-পার্শ্বে রান্নার 'রাওঠি' ও অন্য পার্শ্বে গোছলখানার তাঁবু পর্দ্দার সংলগ্ন হইয়া পড়িত। কাজেই বেপর্দ্দার কোনওরূপ সম্ভাবনা থাকিত না। তখন সকলে—সর্ব্বাগ্রে আমার পেস্কার সাহেব বলিলেন,—"হাঁ, এ বহুত আচ্ছা এন্তেজাম হুয়া!"—এ ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। ফলতঃ আমার পাল্কী ও পর্দ্দার এমনই নাম পড়িয়াছিল, যে-জমিদার দেখিতেন, তিনি বলিতেন যে, আমি বদলি হইয়া যাইবার সময় তাঁহাকে এই দুইচিজ দিতে হইবে। বাস্তবিকই আমার বদলির পর এই দুইয়ের জন্য এমন কাড়াকাড়ি পড়িয়াছিল যে, আমি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। শেষে প্রধান মুসলমান জমিদারকে পাল্কী এবং প্রধান হিন্দু জমিদারকে পর্দ্দাগুলি বিক্রয় করিয়াছিলাম।

দেখিলাম, বেহারের প্রধান অভাব রাস্তা। অতএব সমস্ত প্রাতঃকাল ও অপরাহ্ন আমি অশ্বারোহণে শিবিরের চারিদিকে নূতন রাস্তা করিবার উপযোগী লাইন, এবং প্রচলিত গ্রাম্য রাস্তা সকল যোগ করিয়া, তাহা কতদূর সাধিত হইতে পারে, তাহা অন্বেষণ করিয়া, এবং গৃহ-বিবাদ এবং জমিদারে জমিদারে বিবাদ মিটাইয়া বেড়াইতাম। একটা বিবাদের কথা বলিব। ইসলামপুর থানার সম্মুখে ক্ষুদ্র একখণ্ড জমিতে আমার শিবির পড়িয়াছে। কাচারির সময় মোক্তার ও আমলারা বলিল যে, উহা একটি পীঠস্থান। দশবৎসর যাবৎ সেই সাবেক ডেপুটি সাহেবের বন্ধু দুর্গাবাবু ও একজন মুসলমান জমিদারের মধ্যে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া, এক এক পক্ষে ১০০০০৲ টাকা পরিমাণ ব্যয় হইয়াছে। এখনও দেওয়ানী আদালতে যুদ্ধ সতেজে চলিতেছে, এবং এই মোকদ্দমায় দুর্গাবাবু ঋণগ্রস্ত হইয়া ধ্বংসপ্রায় হইয়াছেন। আমি মনে মনে একটা কৌশল স্থির করিয়া, উভয়কে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পত্র দিলাম। মুসলমান জমিদারের যদিও ইসলামপুরে প্রকাণ্ড অট্টালিকা বাড়ী আছে, তথাপি তিনি "আয়েসে"র জন্য পাটনায় থাকেন। তিনি এমন সৌখীন লোক যে, আতর গোলাপ খাইয়া এবং কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়া, কেবল কামিনী-কণ্ঠ-নিঃসৃত সঙ্গীতামৃতে ভাসিয়া জীবন অতিবাহিত করেন বলিলেও চলে। তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইল। প্রথম দুর্গাবাবু আসিলেন, এবং এই গুরুতর বিবাদের জ্ঞানপ্রদ ইতিহাস বলিতে বলিতে এক অপরাহ্ন অতিবাহিত করিলেন, এবং মুসলমান প্রতিপক্ষ যে, নাহক্ তাঁহার জমিটুকু অন্যায়পূর্ব্বক লইতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা যথাশাস্ত্র সাব্যস্ত করিলেন। আমি গম্ভীরভাবে সেই পুরাণ শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহার প্রতি অশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া বলিলাম—"আমি বুঝিয়াছি, যে, এই জমিটুকু আপনারই। পার্শ্বস্থিত মধ্য-ইংরাজী স্কুলটির স্থান ভাল নহে। আপনার কাছে উক্ত স্কুলের জন্য এই স্থানটুকু ভিক্ষা চাহিতেছি। আপনি উহা এরূপে আমাকে দান করিলে, এই যুদ্ধে আপনিই জয়ী হইবেন। কারণ, জমিটুকু

আপনারই বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। অথচ দান করাতে আপনার একটা বিশেষ বাহাদুরি হইবে।" তিনি বঁড়শি গিলিলেন, এবং এরূপে সবডিভিসনের মালিককে উহা দান করিতে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। পরদিন প্রাতে সম্মুখের রেজেষ্টি আফিসে দানপত্র রেজেষ্টি করিয়া দিয়া তিনি বাড়ী চলিয়া গেলেন। কথাটা দুই একজন আমলা মোক্তারের মধ্যেই আবদ্ধ রহিল, অন্যকেহ জানিতে পারিল না। তাহার কিছুদিন পরে মুসলমান জমিদার এক প্রকাণ্ড ডালি পূর্ব্বে পাঠাইয়া, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। দেখিলাম, তিনি একটি ক্ষুদ্র নবাব সিরাজদ্দৌলা। আমি তদনুযায়ী সুর বাঁধিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলাম। তিনি 'কাফের' ও 'কমিনা' দুর্গাপ্রসাদের অনেক নিন্দা করিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গেও এক অপরাহ্ন কাটাইয়া এবং তাঁহাকে খুব বাড়াইয়া, তাঁহার কাছেও জমিটুকু উপরোক্ত মতে দান চাহিলাম, এবং তাহাতে কাফের কিরূপ জব্দ হইবে এবং তাঁহার কিরূপ "ইনস আল্লাতাল্লা" গৌরব বৃদ্ধি হইবে, তাহা বুঝাইয়া দিলাম। তিনি হাসিয়া আকুল হইলেন এবং পরদিনই দানপত্র রেজেষ্টি করিয়া দিলেন। আমি সেখানে শিবিরে থাকিতেই পুলিসের দ্বারা স্কুলগৃহখানি সেই জমিতে স্থানান্তরিত করিলাম। বেহার অঞ্চলে একটা হাসির তুফান ছুটিল এবং উভয় জমিদারও এই চতুরতার দ্বারা তাঁহাদের অর্থনাশক এই কলহ নিবারণের জন্য আমাকে শত ধন্যবাদ দিলেন। কিছুদিন পরে পাটনার বিখ্যাত উকিল গুরুপ্রসাদবাবু বেহারের এক মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, আমি তাঁহাদের ও হাই-কোর্টের কয়েকজন উকিলের ঘোর অনিষ্ট করিয়াছি।

আমামা নামক একটি গ্রামে শিবির পড়িয়াছে। স্থানীয় জমিদার রামু সিংহ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তিনি অন্ধ এবং এরূপ সাংসারিক জ্ঞানে পরিপক্ক যে, আমি তাঁহাকে বেহারের ধৃতরাষ্ট্র বলিতাম। তিনি প্রথমদিন সাক্ষাৎ করিতে আসিলে আমি তাঁহাকে একজন বিচক্ষণ লোক দেখিয়া বলিলাম, আমি যখন ভবুয়া সবডিভিসনে ছিলাম, সেখানের জমিদারদের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় তাঁহারা পাকড়াও করিতেন এবং বাড়ীতে কত আদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া তাঁহাদের পুত্র-কন্যাদের দেখাইতেন এবং কিছু জল-যোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। কিন্তু এখানের জমিদারেরা সেরূপ করা দূরে থাকুক, শত-হস্ত দূরে থাকে, এবং সাক্ষাৎ করিতে আসিলেও চেয়ারের অগ্রভাগে সভায় বসিয়া দুইচারিটি ফাঁকা কথা কহিয়া চলিয়া যায়। তাহাদের বাড়ীর কাছ দিয়া যাইতে দেখিলেও সেইরূপ দুইএকটা ফাঁকা কথা কহিয়া, সেলাম দিয়া বিদায় করে। তাহার কারণ কি? তিনি শুনিয়া বড়ই প্রীত হইয়া বলিলেন যে, আমি সেখানে লোকের আদর চাহিয়াছিলাম ; তাই আদর পাইয়াছিলাম। এখানে আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা চাহিতেন, লোকে তাঁহাদের ভয় করুক। কাজেই এখানকার লোক হাকিমকে ভয় করিয়া দূরে থাকে। তিনি বলিলেন যে, আমি ইতিমধ্যে যেরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছি এবং শাসনকার্য্যে চতুরতা দেখাইয়াছি, তাহাতে লোকে বড় ইচ্ছা করে যে, আমার সঙ্গে সেই ভবুয়ার জমিদারদের মত ব্যবহার করে। কিন্তু ভয়ে করে না। তিনি বলিলেন, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় আমি যখন তাঁহার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম, তাঁহার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল যে, আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লন। কিন্তু সাহস পাইলেন না। তিনি বলিলেন যে, আমার মনের ভাব এইরূপ, লোকে ইহা জানিলে আমাকে দেবতার মত পূজা ও অভ্যর্থনা করিবে। বলা বাহুল্য, পরদিন তিনি আমাকে বড় সমারোহ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে লইলেন।

তাঁহার কথা ঠিক হইল। তাহারপর হইতে জমিদারেরা সর্ব্বত্র বেশ আমার আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। বেহার সবডিভিসন একটা রাজ্যবিশেষ। একটা অভ্যর্থনার কথা বলিব। নগর নহুসা গ্রামের আম্রকাননে তাঁবু পড়িয়াছে। একটি মোকদ্দমায় বাঁকিপুরের সর্ব্বপ্রধান উকিল বাবু গুরুপ্রসাদ সেন এবং আরও কয়েকটি বড় উকিল আসিয়াছেন।

তাঁহারা কয়েকদিন আম্রকাননে উভয় পক্ষের দুই তাঁবুতে বাস করিতেছিলেন। যেখানে তাঁবু পড়িত, সেখানে উকিল, আমলা ও মোক্তার প্রভৃতির রাওঠি পড়িত। আম্রকানন একটি ক্ষুদ্র পটগৃহের নগরী হইয়া উঠিত এবং রাত্রিতে বহু আলোকে আম্রকাননের বিচিত্র শোভা হইত। একদিন কাচারির পর উভয় পক্ষের উকিল আমাকে বলিলেন যে, নগর নহুসার মুসলমান জমিদার-পরিবার আমার অভ্যর্থনা করিতে চাহেন। তাঁহারা বড় দুরন্ত, কলহ-প্রিয় লোক ছিলেন, এবং সবডিভিসনাল অফিসারকে বড় গ্রাহ্য করিতেন না। আমি অসম্মত হইলাম। উকিলেরা আমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, আমার শিষ্টাচারে সবডিভিসন যেরূপ শাসিত হইয়াছে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা কঠোর শাসনের দ্বারা তদ্রূপ পারেন নাই। অতএব শুধু ইহাঁদের প্রতি কঠোর ভাব অবলম্বন করা উচিত নহে। তাঁহারা আমার শাসন-কৌশলের বড় প্রশংসা করিয়া, এখানেও তদনুরূপ করিতে বলিলেন। গুরুপ্রসাদবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার শিক্ষক ছিলেন। আমি তাঁহাকে বড় ভক্তি করিতাম। তিনিও বিশেষ জিদ করাতে আমি সম্মত হইলাম। অভ্যর্থনার দিন সন্ধ্যার সময়ে আলোকে ও সংগীতে গ্রাম তোলপাড় হইতে লাগিল। আমার শিবির হইতে জমিদারের বাড়ী পর্য্যন্ত আলোকশ্রেণী শোভা পাইতে লাগিল। সুন্দর প্রসেশন করিয়া উকিলদের সংগে জমিদার-পরিবারেরা আমাকে এক সজ্জিত মাতংগে লইতে আসিলেন। আমি তাহাতে আরোহণ করিতে অসম্মত হইলাম। গুরুপ্রসাদবাবু আমাকে শাসাইয়া তাহাতে তুলিলেন। তাঁহারা সকলে পশ্চাতে অশ্বে গজে চলিলেন। জমিদারবাড়ী পুষ্পে, পত্রে, পতাকায় এবং আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। একটি বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষে আহূত হইয়া দেখিলাম, তাহার একপ্রান্তে এক স্বর্ণ ও রজতখচিত সিংহাসন। আমার সংগে মফঃস্বল ভ্রমণের উপযোগী সামান্য পোষাক মাত্র ছিল। আমি এই পোষাক পরিয়া, কেমন করিয়া সেই রাজাসনে বসিব? গুরুপ্রসাদবাবু আবার আমাকে শাসাইলেন।—"তুমি এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র নহ। ছেলেমানুষের মত ব্যবহার করিও না। তোমার উচ্চ পদোপযোগী ব্যবহার কর। তুমি সেই আসনে গিয়া বস।" আমি গুরুর কর্ণ-মর্দ্দন-প্রাপ্ত ছাত্রের মত সেই বহুমূল্য আসনে বসিলাম। নৃত্য গীত হইল। নানাবিধ আমোদ অভ্যর্থনা হইল। উৎকৃষ্ট আতর গোলাপের গন্ধে সজ্জিত কক্ষ সুবাসিত হইল। শেষে জলযোগের কক্ষে আহূত হইলাম। সেখানে নানাবিধ দেশীয় বিদেশীয় লঘু আহার্য্য (Light refreshment) সজ্জিত। সকলে উদর পূর্ণ করিয়া, অর্দ্ধরাত্রিতে আবার সেই সমারোহে শিবিরে ফিরিলাম। সেই অভ্যর্থনার মধ্যে জমিদার-পরিবারকে মিষ্টকণ্ঠে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার ফল, এবং এই অভ্যর্থনা গ্রহণের ফল বড়ই ভাল হইয়াছিল। আমি তিনবৎসর বেহারে ছিলাম। ইহাঁরা আর কখনও দুরন্তপনা কিছুই করেন নাই। সে অঞ্চলে একটা সামান্য মোকদ্দমা পর্য্যন্ত তাহারপর হয় নাই।

বলিয়াছি, নাম্নু সিংহকে আমি বেহারের ধৃতরাষ্ট্র নাম দিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যহ অপরাহ্ণে তাঁহার গ্রামে শিবিরে থাকার সময়ে আমার সংগে দেখা করিতে আসিতেন এবং আমাকে সংসার-জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তাঁহার দুইটি শিক্ষার কথা বলিব। তিনি একদিন বলিলেন—"মনে দুঃখ হইলে মানুষ আপনার অপেক্ষা যে দুঃখী তাহার দিকে দেখিবে, এবং মনে সুখের অভিমান হইলে আপনার অপেক্ষা যে সুখী তাহার দিকে দেখিবে। আমার পুত্র-সন্তান নাই বলিয়া মনে যখন দুঃখ হয়, তখন আমি বেহার শহরের লাহিরি মহাল্লার মৌলবি সাহেবের দিকে দেখি। আমার কন্যার ঘরে দুইটি দৌহিত্র আছে, তাহার তাহাও নাই। তাহার একমাত্র কন্যাও নিঃসন্তান। আবার যখন বড় বিষয় করিয়াছি বলিয়া মনে অভিমান হয়, তখন আমি দ্বারভাঙ্গার মহারাজার দিকে দেখি এবং আপনাকে আপনি বলি —"আরে নাম্নু সিংহ! তুমি কি লইয়া এত অভিমানে স্ফীত হইতেছ? তোমার দুই লক্ষ টাকা আয়, আর দ্বারভাঙ্গার মহারাজের চল্লিশ লক্ষ। অতএব তাঁহার কাছে তুমি একটি পতঙ্গ মাত্র।"

আর একদিন নান্নু সিংহ বলিলেন—"আমার কন্যার বিবাহের সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন আমার আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, এমন কি, আমার ভাই বৈজনাথ সিংহ পর্য্যন্ত জিদ আরম্ভ করিল যে, হাতুয়ার মহারাজার পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিয়া দেখিলাম, কেবল তিলক দিতেই আমার লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে। আমি আমার টাকার তোড়ার (bag) কাছে গেলাম। বলিলাম—আরে তোড়া! তুমি আমাকে কত টাকা দিতে পারিবে? তোড়া উত্তর করিল যে, এতটাকা সে দিতে পারিবে না। আমার যখন যে অতিরিক্ত খরচ পড়ে, আমি তমসুক দিয়া তোড়ার কাছে কর্জ্জ করি এবং তাহার পরিশোধ করি। আমি ভাবিলাম, আমার একটি কন্যা, হাতুয়ায় বিবাহ দিলে মেয়েকে ত কখনও আমার বাড়ীতে আসিতে দিবেই না। যদি আমি কখনও নিজে দেখিতে যাই, সাতদিন আমাকে বাহিরের দেউড়ি-ঘরে পড়িয়া থাকিতে হইবে। তাহার পর রাজার বা রাণীর অনুমতি হইলে, একদিন তাহাকে অন্তঃপুরে গিয়া কয়েকমিনিটের জন্য দাস-দাসী-বেষ্টিত অবস্থায় দেখিতে পাইব। মন খুলিয়া পিতা ও দুহিতা দুটো কথা পর্য্যন্ত কহিতে পারিব না। কন্যাটিকে এরূপ দ্বীপান্তর করিয়া আমার ও তাহার কি সুখ হইবে? আমি বাছিয়া বাছিয়া একটি গরিব ভদ্রলোকের ছেলে নির্ব্বাচন করিলাম। নিতান্ত দরিদ্র, তাহার গৃহখানি পর্য্যন্ত নাই। সামান্য অর্থব্যয় করিয়া আমি কন্যার বিবাহ দিয়াছি এবং জামাতাকে একটি গ্রামের ঠিকাদারী (ইজারা) লইয়া দিয়া, নূতন বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি এবং কিছু টাকার মহাজনি করিয়া দিয়াছি। যখন ইচ্ছা, তখন তাহাকে আমার বাড়ীতে আনি, কি নিজে তাহার বাড়ীতে যাই এবং দৌহিত্র দুইটিকে লইয়া সংসারের সকল দুঃখ ভুলি। যখন মেয়েটির মুখ দেখি এবং ভাবি যে, আমার দ্বারা একটি পরিবার সৃষ্ট হইয়াছে, তখন আনন্দে আমার হৃদয় ভরিয়া যায়।"

নান্নু সিংহ একদিন বলিলেন—"বৈজনাথ সিংহ এখনও বালক। তিনি মনে করেন, তিনি একজন বড়লোক। কেবল রাজারাজাড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া প্রতিযোগিতা করিতে চাহেন। বৈজনাথ সিংহ জানেন না, আমি কিরূপে এ সম্পত্তির সৃষ্টি করিয়াছি। পিতার পরলোক গমনের সময়ে তাঁহার কেবল এই আমামা মৌজা মাত্র ছিল। তাহারও তখন শোচনীয় অবস্থা ছিল। 'আলঙ্গ' (বাঁধ) ও আহরা (কৃষি লোকের জলাশয়) কিছুই ছিল না। বাঁধ না থাকাতে বর্ষার প্লাবনে সমস্ত ফসল নষ্ট হইত। আবার যে বৎসর অনাবৃষ্টি হইত সে বৎসর জলাশয় না থাকাতে এবং তন্নিবন্ধন ক্ষেতে জল দিতে না পারাতে ফসল শুষ্ক হইয়া যাইত। তখন এ মৌজার আমদানী মাত্র তিনহাজার টাকা ছিল। এই যে পর্ব্বতাকার 'আলঙ্গ' গ্রামের চারিদিকে দেখিতেছেন, এবং ঐ যে প্রকাণ্ড 'আহরা' দেখিতেছেন, এ সকল আমারই সৃষ্ট। দারুণ বর্ষা আমার মাথার উপর দিয়া যায়। সমস্তরাত্রি আমি হস্তি-পৃষ্ঠে পরিক্রমণ করিয়া, কোথায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, তাহার তৎক্ষণাৎ মেরামত করাইয়া লই। সঙ্গে একদল কুলি কোদাল ও মশাল লইয়া থাকে। এরূপে যে আমামা মৌজা হইতে পিতা তিনহাজার টাকা পাইতেন, আমি বৎসরে নয়দশ হাজার উশুল করিতেছি। এই বৃদ্ধি আয়ের দ্বারা আমি ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মৌজাতে ঠিকাদারী ও মালিকী স্বত্ব লইয়া আজ দুইলক্ষ টাকা আয় করিয়াছি। কিসে ইহা করিয়াছি, ভাই বৈজনাথ সিংহ ইহা কিরূপে বুঝিবে? লোকটি এমনই বুদ্ধিজীবী যে, দুইভাই একান্নে থাকা দূরে থাকুক, একগ্রামে পর্য্যন্ত থাকিত না, পাছে কোনওরূপ মনান্তর ঘটে। নান্নু সিংহ আমামা গ্রামে থাকিতেন এবং বৈজনাথ সিংহ সেইখান হইতে প্রায় দশমাইল দূরে তেতরাঁওয়া গ্রামে থাকিয়া, সে অঞ্চলের জমিদারি শাসন করিতেন।

উত্থান পতন লইয়া জগৎ। বেহারের একজন প্রধান জমিদারের উত্থানের কথা, এবং কি নীতিতে উত্থান হইল, তাহার কথা বলিলাম। এখন আর একজন প্রধান জমিদারের পতনের এবং কি নীতিতে পতন ঘটিল, তাহার কথা বলিব। নানন্দ গ্রামের "লাখোয়া" বাগে (লক্ষ

আম্রের বাগান) শিবির পড়িয়াছে। এখন লক্ষ আম্রবৃক্ষ না থাকিলেও উহা একটি প্রকাণ্ড আম্রকানন। অশ্বপৃষ্ঠে গ্রামে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে যাইতে যাইতে আমার অভ্যাসমতে গ্রামবাসী, যাহাকে পথে পাইতেছি, তাহার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে যাইতেছি। সকলের মুখে এক হাহাকার—"আরে বাপ রে! কেয়া রাজ বিগর গিয়া!" শুনিলাম, গ্রামের জমিদারটি বাঙ্গালী। তিনি সর্ব্বস্ব হারাইয়া, বেহার সহরে একটি সামান্য গৃহে দরিদ্রাবস্থায় বাস করিতেছেন। তিনি একজন দানশীল, সদাশয় লোক, প্রজাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। তাই তাঁহার জন্য এই হাহাকার। তিনি একান্ত মাদকপ্রিয় ছিলেন, বিষয়কার্য্য কিছুই দেখিতেন না। কেবল এই নানন্দ গ্রাম হইতেই তাঁহার বাইশহাজার টাকা আমদানি ছিল, সর্ব্বসুদ্ধ তাঁহার লক্ষটাকা আয় ছিল তাঁহার অধঃপতনের দুইটি গল্প বলিব।

তাঁহার বহুতর হস্তী ছিল। তথাপি তাঁহার খেয়াল হইল, আরও হাতী কিনিবেন। একজন জাতবাণিয়া হইতে তজ্জন্য দশহাজার টাকা শতকরা আট কি দশ টাকা মাসিক সুদ হিসাবে কর্জ্জ করিয়া, নওয়াদা সবডিভিসনে তমসুক রেজেষ্ট্রি করিয়া দিতে গিয়াছেন। সবডিভিসনাল অফিসার স্বয়ং রেজিষ্ট্রারী করেন। তিনি ইংরাজ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এ টাকা কি জন্য এত অতিরিক্ত সুদে কর্জ্জ করিতেছেন? তিনি তখন নেশায় বিভোর। উত্তর—"আমি হাতী কিনিতে 'ছত্তরে'র মেলায় যাইব।" সাহেব বলিলেন যে, তাঁহার ঢের হাতী আছে। তিনি দলিল রেজেষ্ট্রি করিবেন না। পরদিন বাণিয়া নিজে তাঁহাকে লইয়া আবার উপস্থিত করিল। সেইদিন তাঁহার নেশার মাত্রা আরও চড়াইয়া লইয়াছে। সে সাহেবকে বলিল—"হুজুর! ইনি রাজা, আমি একজন দরিদ্র বাণিয়া। ইনি অল্পদিনের জন্য মাত্র টাকা লইতেছেন। 'ছত্তরে'র মেলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার টাকা দিবেন, সেইজন্য সুদ বেশী ধরিয়াছি।" সাহেব কি করিবেন, দলিল রেজেষ্ট্রি করিয়া দিলেন। উভয়ে আফিস হইতে বাহির হইয়া গেলে তিনি আমলা মোক্তারদিগকে বলিলেন—"এ বাণিয়া শালা থোরা রোজমে ইস্কু ফকির বানাওয়ে গা।" সে ধূর্ত্ত বাণিয়া নওয়াদা এলেকার লোক, তিনি তাহাকে বেশ চিনিতেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিল।

হতভাগ্য মদ্যপ হস্তী-পৃষ্ঠে টাকা বোঝাই করিয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল এবং যত গ্রামের মধ্যদিয়া আসিল, দুইহাতে মুঠে মুঠে টাকা মাতাল অবস্থায় নিজে ছড়াইতে লাগিল এবং সঙ্গীয় ভৃত্যকেও ছড়াইতে আদেশ দিল। একটি গ্রাম তাহার জমিদারি ভুক্ত ছিল। তাহার এ অবস্থায় হাহাকার করিয়া প্রজারা বলিল—"তুমি কি পাগল হইয়াছ? তুমি কেন এরূপে রাজটা বিগড়াইয়া দিতেছ, লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলিতেছ?" তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"এ শালা লোগ কমবক্ত। হিঁয়া মত দাও কুচ।" (এ শালারা হতভাগা। এখানে কিছু দিও না।) এরূপে দশহাজার টাকা হস্তীপৃষ্ঠ হইতে ছড়াইয়া অজ্ঞান অবস্থায় গৃহে ফিরিলেন।

যখন ঋণ বাইশহাজার হইয়াছে, তখন একজন বাঙ্গালী মোক্তার রাখিয়াছেন। সে হিসাব করিয়া দেখিল যে তাঁহার জমিদারীতে যতগুলি তাড়ি গাছ আছে, তাহা প্রজাদের কাছে বিক্রয় করিলে প্রায় পনর কি বিশহাজার টাকা কর্জ্জ শোধ হইবে। সে এ বৃক্ষগুলি বিক্রয় করিতে প্রস্তাব করিল। তিনি দুইমাস যাবৎ কোন উত্তরই দিলেন না। বলিলেন বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। অবশেষে একদিন বলিলেন—"দেখ! তাড়িগাছগুলি বিশ পঁচিশ বৎসরেও বড় হয় না। অতএব সেইগুলি বিক্রয় করা হইবে না।" তখন তিনি দিনরাত্রি নেশায় বিভোর থাকেন। কোনও প্রজা কিঞ্চিৎ গাঁজা কি মদ কি একটা পাঁঠা লইয়া আসিয়া কান্না কাটা করিলে তখনই তাহার কাছে প্রাপ্য খাজনা মাপ দিতেছেন। এরূপ ঘরে লক্ষ্মী থাকিতে পারে না। সে বাণিয়া ঋণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া বাইশহাজার টাকার জন্য মাত্র নালিশ করিয়া লক্ষ টাকার মুনাফার জমিদারী নিলাম করাইয়া কিনিয়া লইয়া তাহার বাড়ীখানি পর্য্যন্ত অধিকার

করিয়াছে। আমি শিবিরে যাইবার পূর্ব্বেই সেই বাড়ী দেখিতে গেলাম। একটি বৃহৎ অট্টালিকা সম্বলিত এক প্রকাণ্ড বাড়ী যেন নির্জ্জনে রোদন করিতেছে। সেই বাণিয়ার একজন কর্ম্মচারী মাত্র তাহাতে আছে। দেখিলাম, এই হতভাগ্যের কাহিনী বলিতে বলিতে তাহারও চক্ষে জল আসিল।

ইহারপর বোধ হয়, আমার সহানুভূতির কথা শুনিয়া, তিনি মধ্যে মধ্যে বেহারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। একটি নয়নসুক, কি লংক্লথের হিন্দুস্থানি চোস্ত পায়জামা, তাহার উপর সেই কাপড়ের একটা পিরান এবং মাথার উপর সেই কাপড়ের একটি হিন্দুস্থানী টুপি, দীর্ঘাকার, শ্যামবর্ণ, মূর্ত্তি দেখিলেই একটি ভূপাতিত মহীরুহের মত বোধ হইত। তাঁহার নিজের অবস্থার কথা তিনি কিছুই বলিতেন না। তিনি ব্যথিত হইবেন বলিয়া আমিও তাহা উল্লেখ করিতাম না।

একদিন সায়াহ্নে বহুলোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, একে একে সকলে চলিয়া গেলেন। পণ্ডিত বলদেও বসিয়া রহিলেন, যেন কি কথা বলিবেন, কিন্তু বলিতে পারিতেছেন না। কোন কথা আছে কি, আমি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"নানন্দের জমিদারবাবুর পরিবারের দুর্গতি আর সহ্য হইতেছে না। তিনি বেহার সহরে একটি অতিশয় সামান্য ঘরে আছেন। সময়ে সময়ে এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইতে দাল চাল পয়সা চাহিয়া লইতেন। কাল রাত্রিতে আসিয়া বলিলেন যে, সপরিবার তিনদিন অনাহারে আছেন। আমি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছি। আপনি ইহার সাহায্যার্থ কিছু করুন। হায় ভগবান। কি মানুষের কি অবস্থা করিলে!" ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিলেন। আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। পণ্ডিতজী বলিলেন যে, আমি যদি একটি মাসিক চাঁদা তুলি, সকলেই কিছু কিছু দিবেন। আমি বিবেচনা করিয়া দেখিব বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলাম। কিছুক্ষণ পরে—তখন রাত্রি নয়টা—স্ত্রী চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে একটি বালক ও একটি বালিকাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন,—নানন্দের জমিদারবাবুর স্ত্রী এই দুই সন্তান লইয়া একখানি খাটুলিতে আসিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতেছেন। তিনি আর বলিতে পারিলেন না। সন্তান দুটিকে বুকে লইয়া বসিয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। এ সময়ে অবগুণ্ঠনবতী একটি যুবতী ছুটিয়া আসিয়া "বাবা, আমাদের রক্ষা কর" বলিয়া আমার পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং সন্তান দুটিকে আমার পায়ে ফেলিয়া দিলেন। না,—আমি আর সেই শোকদৃশ্য লিখিতে পারিতেছি না। আমিও পণ্ডিতজীর মত কাঁদিয়া বলিলাম—"হায় ভগবান্! তুমি কি মানুষের কি করিলে।" আমি তাঁহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া স্ত্রীর বক্ষে দিয়া সন্তান দুইটিকে অঙ্কে লইলাম। বালকের বয়স ছয় সাত, বালিকার বয়স চারি পাঁচ। কি সুন্দরী মেয়ে! যেন একটি চম্পককলি। দুটির মুখে কি করুণার ভাব। অনাহারে মুখ শুষ্ক বিবর্ণ! পরিধান দুখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ বসন, মায়ের পরিধানও তাই; সুন্দর শরীর শীর্ণ বিবর্ণ। কিছুক্ষণ কেহ কিছু বলিতে পারিলাম না। তিনজনে কাঁদিলাম। শিশু দুইজন আমার রোদন দেখিয়া, আমার মুখের দিকে কাতরনয়নে চাহিয়া আছে। স্ত্রী তখনই তাহাদিগকে আহার করাইলেন। শিশু দুইটিকে আপনি খাওয়াইয়া দিলেন এবং তখন বাজার হইতে মাতা ও সন্তানদের জন্য কাপড় আনাইয়া দিলেন। পরদিন প্রাতে একখানি চাঁদা-বই নিজে স্বাক্ষর করিয়া, প্রধান প্রধান জমিদারদের কাছে পাঠাইয়া দিলাম। ঘণ্টাখানেক পরে বহি ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, বিশ টাকা মাসিক চাঁদা স্বাক্ষর হইয়াছে। সেই দিনই আমার হাতার নিকটে গৃহ ভাড়া করিয়া, আমি তাহাদিগকে সেই গৃহে স্থাপিত করিলাম। শিশু দুটি প্রায় সমস্ত দিবস আমার বাড়ীতে থাকিত। তাহাদের মাতাও প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার স্ত্রীর কাছে আসিতেন এবং কখন কখন দুই একদিন এখানে থাকিতেন। কখন বা স্ত্রী সন্ধ্যার পর তাঁহাদের গৃহে বেড়াইতে, কি তাঁহাদের অসুখ হইলে দেখিতে যাইতেন।

হতভাগ্য জমিদারটিও প্রায় অপরাহ্নে আমার সঙ্গে কাটাইতেন। মধ্যে মধ্যে গয়া পাটনা বেড়াইতে যাইতেন। আমি এরূপে তাঁহাদিগকে তিন বৎসর রাখিয়াছিলাম। বদলি হইয়া আসিবার সময়ে বেহারে বুঝি, ইহাঁদের মত আমাদের জন্য কেহ তেমন কাঁদে নাই। আমি তাঁহাদের আমার এক পরিবারস্থের মত জানিতাম॥ বেহার সবডিভিসন বড় ভয়ানক স্থান, বড় সাবধানে চলিতে হয়। অন্যথা ইহাঁদের জন্য চাঁদা না তুলিয়া আমি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম। আমি আসিবার সময়ে আমার পরবর্ত্তীর হাতে তাঁহাদিগকে তুলিয়া দিয়া আসিয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে আমার সঙ্গে ভাগলপুর লইতে চাহিয়াছিলাম। আমার গতিবিধি স্থির নাই বলিয়া, বিশেষতঃ আমার একার স্কন্ধে পড়িতে হইবে বলিয়া তাঁহারা আসিলেন না। শুনিলাম, আমি আসিবার পর আবার তাঁহাদের কষ্ট আরম্ভ হয়, এবং কিছুদিন পরে বেহার ছাড়িয়া চলিয়া যান। আর তাঁহাদের কোনও খবর পাই নাই। মধ্যে শুনিয়াছিলাম, হতভাগ্য জমিদারের দুঃখ শেষ হইয়াছে। তিনি মৃত্যুর অঙ্কে শান্তি লাভ করিয়াছেন। ভরসা করি, তাঁহার অভাগিনী পত্নী ও শিশু দুটিকে ভগবান্ আশ্রয় দিয়া সুখে রাখিয়াছেন।

বেহারের উন্নতি ॥ বিহার শৈল

রাত্রিতে সবডিভিসনগৃহে প্রবেশ করিয়া, প্রাতে পশ্চিমের বারান্দা হইতে দেখিলাম, বড় সুন্দর শৈলশোভা দেখা যাইতেছে। জনৈক জমিদারের একটি ঘোড়া আনিয়া উহা দেখিতে ছুটিলাম। দেখিলাম, সমতল ক্ষেত্রমধ্যে একটি মাত্র শৈল পর্ব্বত, নৈবেদ্যের উপর তিলের সন্দেশের মত দাঁড়াইয়া আছে। পর্ব্বতটি বড় উচ্চ নহে ; তাহার অঙ্গ নীল, বন্ধুর প্রস্তরময়। মধ্যে মধ্যে এক আধটি বৃক্ষ এখানে সেখানে কেমন করিয়া সে প্রস্তরে জন্মিয়াছে। শিখর-দেশে বৌদ্ধ বিহার-ভগ্নে নির্ম্মিত এক দরগা, এবং এক দিকে শৈল-অঙ্কে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার নাম বৌদ্ধ গ্রন্থে "একগিরি"। কারণ, নিকটে আর কোনও গিরিশ্রেণী নাই। পরে ইহাতে বৌদ্ধ বিহার নির্ম্মিত হইয়া, সমস্ত স্থানটির, ক্রমে সমস্ত প্রদেশের নাম বিহার বা বেহার হইয়াছে। বৌদ্ধদের সময়ে রাজগৃহের পর এখানেই বোধ হয় রাজধানী ছিল। তাহার পর উহা পাটলীপুত্রে বা পাটনায় স্থানান্তরিত হয়। এখনও বেহার সহরের কেন্দ্রস্থলের নাম কেল্লাপর। কেল্লার বা দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকারে পড়িয়া আছে এবং তাহার চারি দিকে একটা বিস্তীর্ণ পরিখার স্মৃতির স্বরূপ নিম্ন ভূমি বিরাজমান রহিয়াছে। এই "কেল্লাপর" স্থানের মধ্যদিয়া বাজারের রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্বপার্শ্বে স্তূপের উপর ইংরাজী বিদ্যালয় এবং তাহার অপর পার্শ্বের স্তূপে মিউনিসিপ্যাল আফিস, এবং কর্ত্তৃপক্ষীয়দের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর আমি মুন্সেফের বিচারালয় প্রস্তুত করি। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা উহা সবডিভিসনগৃহের পশ্চাতে প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই খণ্ড-শৈল-দর্শনে এবং উহার সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসরের অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমি আত্মহারা হইলাম। আমার যেন বোধ হইল, আমি দেখিতেছি, সানুদেশস্থিত বিহারে বসিয়া শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেব তাঁহার "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ—" প্রচার করিতেছেন এবং শৈলাঙ্ক পিপীলিকাবৎ ছাইয়া, অসংখ্য নরনারী প্রতিমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া সেই ধর্ম্ম মুগ্ধচিত্তে শ্রবণ করিতেছে। শৈলের অঙ্গে আরও দুই একটি বিহার-বেদিকা প্রস্তরের উপর প্রস্তরমাত্র স্থাপিত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। আমি উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে শৈলখণ্ড প্রদক্ষিণ করিতে চাহিলাম। কিন্তু দক্ষিণদিকে কিয়দ্দূর গিয়া আর পথ পাইলাম না ; নিরাশহৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম অধিবেশনেই ইহার চারিদিকে একটা রাস্তা নির্ম্মাণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। কমিশনরগণ সানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন।

বলিলেন—কাহারও এ কার্য্যটিতে চক্ষু পড়ে নাই। আমি যদি করিতে পারি, আমার একটা অক্ষয় কীর্ত্তি বেহারে থাকিবে। আমার যেই কথা, সেই কার্য্য। তাহার পরদিবসই রাস্তার কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিলাম। দেখিতে দেখিতে রাস্তা নির্ম্মিত হইল, কিন্তু তাহাতে এক গুরুতর বিঘ্ন, শৈলের উত্তর-পশ্চিম কোণায় একটি ক্ষুদ্র ঝিল। বর্ষাকালে তাহাতে শৈলবাহী জলধারা ভীষণ বেগে প্রবাহিত হয়। এখানে ত রাস্তা টিকিবে না। মিউনিসিপ্যাল কমিশনরেরাও আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছেমন (Salmon) সাহেবকে স্থানটি দেখাইলাম। তিনি ববলিলেন, এখানে দশহাজার টাকা ব্যয়ে একটা নিম্ন সেতু (Causeway) প্রস্তুত করিতে হইবে। বেহার মিউনিপ্যালিটির মোট আয় অনুমান বিশ হাজার টাকা। আমি এত টাকা কোথায় পাইব। যেখানে যেখানে জলধারা পড়ে, সেখানে সেখানে আমি ক্ষুদ্র সেতু নির্ম্মাণ করিলাম এবং ঝিলের দিকে মাটির বেশী সেলামী দিয়া এবং তাহাতে বেশ করিয়া ঘাস লাগাইয়া দিয়া বর্ষার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ছেমন সাহেব হাসিয়া বলিলেন যে, আমার রাস্তা একদিনেই উড়িয়া যাইবে। যাহা হউক, ইতিমধ্যে সমস্ত শীতে গাড়ী চলিতে লাগিল। সমস্ত বেহারবাসী ভদ্রমণ্ডলী প্রাতে ও অপরাহ্নে শৈল প্রদক্ষিণ করিয়া গাড়ীতে, ঘোড়ায় ও পদব্রজে বেড়াইতে লাগিলেন এবং আমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কমিশনর ও মাজিষ্ট্রেট আসিলে এই শৈলের পশ্চিমে একটি সুন্দর আম্রকাননে আমি তাঁহাদের শিবির স্থাপন করিলাম। তাঁহারা সস্ত্রীক অশ্বপৃষ্ঠে শৈল প্রদক্ষিণ করিয়া, শিবিরে পেঁীছিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং আমার অনেক প্রশংসা করিলেন। কিন্তু ঝিলের পার্শ্বে রাস্তা টিকিবে কি না, তাঁহারাও আশঙ্কা করিলেন, এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে একটা নিম্ন সেতু প্রস্তুতের জন্য সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই এককার্য্যেই আমি তাঁহাদের সুদৃষ্টিতে পড়িলাম। বর্ষা আসিল ; রাস্তা স্থানে স্থানে ভাঙ্গিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইল না। উহা ভাঙ্গিবামাত্র মেরামত করাইতে লাগিলাম। ইহার পরের বর্ষাতে আর কিছুই করিতে হইল না। ছেমন দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। দশহাজার টাকার স্থলে আমায় একশত টাকা মাত্র ব্যয় করিতে হইয়াছিল। বেহার সহরের প্রান্তস্থিত রাস্তাগুলিনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাস্তার দ্বারা গাঁথিয়া, আর একটি বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনের সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলাম।

বেহার বিদ্যালয়

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিলেন যে, তিনি বিদ্যালয়টা শোচনীয় অবস্থায় পাইয়াছিলেন। অতিকষ্টে তিনি শিক্ষকদিগের বাকী বেতন শোধ করিয়াছেন। কিন্তু তহবিলে একটা পয়সাও নাই। এণ্ট্রান্স স্কুলে মাসে প্রায় তিনশত টাকা চাঁদা আদায় করিতে হয়। সে এক ভীষণ ব্যাপার। কারণ সমস্ত সবডিভিসনেও একটি ইংরাজী শিক্ষিত লোক নাই। জমিদারগণ প্রায় নিরেট মূর্খ। অতএব চাঁদা আদায় করা যেন প্রস্তর হইতে জল নির্গত করা। স্মরণ হয়, একজন জমিদারের কাছে দশবৎসরের চাঁদা বাকী ছিল। জমিদারির আয় পাঁচছয় হাজার এবং ষাটসত্তর হাজার টাকার মহাজনী। তাহার বাড়ীর কাছে গিয়া তাঁবু ফেলিয়া দশদিন যাবৎ কত পীড়াপীড়ি করিলাম। সামান্য কয়েকটি মাত্র টাকা দিতে সম্মত হইল। অনাহারে আমার শিবিরের আম্রবাগানে পুলিসের কাছে পড়িয়া আছে, শেষদিন আমি তাহাকে ধমকাইয়া শিবিরান্তরে যাইবার জন্য ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে সে প্রায় দশমাইল পথ আমার ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে দোহাই দিতে দিতে চলিল। তখন আমি তাহার কৃপণতার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়া, সে যে একশত টাকা মাত্র দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাই লইতে বাধ্য হইলাম। এক দিকে এই। অন্যদিকে জমিদারদের আত্মীয়গণ শিক্ষক। তাহারা

কিছুই করে না। অথচ তাহাদের গায়ে হাত দিলে জমিদারগণ চাঁদা বন্ধ করে ও একটা হুলস্থুল উপস্থিত করে। আমি সেই আত্মীয়দিগকে ক্রমে ক্রমে সরাইয়া দিই, এবং তাহাতে কিছুদিন একজনের জন্য অনেক উপদ্রব ভোগ করি। কিন্তু আমার এই মহাশত্রু পরে আমার মহামিত্র হন। আমি তাঁহাকে সবরেজিষ্ট্রার করিয়া আসি। যাহা হউক, এরূপে চাঁদা আদায় করিয়া আমি তিন বৎসর বিদ্যালয়টি চালাইয়া, তিনহাজার টাকা তহবিলে রাখিয়া এবং তদ্দ্বারা একটা ছাত্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া চলিয়া আসি।

চিকিৎসালয়

চিকিৎসালয়ের অবস্থা আরও শোচনীয়। তহবিল শূন্য, ভৃত্যগণ কয়েক মাস যাবৎ অবৈতনিক ভৃত্য ; অর্থাভাবে চিকিৎসার অভাব। চিকিৎসালয়েরও মাসিক চাঁদা দুই কি তিন শত টাকা। বহুকষ্টে ইহারও সুবন্দোবস্ত করিলাম, এবং আসিবার সময়ে ইহারও তহবিলে যথেষ্ট অর্থ রাখিয়া আসিয়াছিলাম। চিকিৎসালয়টি পঞ্চানন নদী-তীরস্থিত একটি 'বারাদারি'—মুসলমান আমলের একটি প্রাচীন বিলাসগৃহ। গৃহটি চিকিৎসালয়ের সম্পূর্ণ অনুপযোগী, যদিও স্থানটি মনোরম এবং নির্জ্জন। বিশেষতঃ গৃহটিতে স্থানাভাব। অতএব আমি উহা বেলি-সরাইতে স্থানান্তরিত করিতে প্রস্তাব করি। প্রথমতঃ কোন কোন মিউনিসিপ্যাল কমিশনর সাধের বেলি-সরাই চিকিৎসালয় করিতে অসম্মত হন। পরে যখন ঐ শ্বেত হস্তীর পোষণ-ব্যয়ে মিউনিসিপ্যালিটি পীড়িত হইয়া পড়িল, তখন তাঁহারা সম্মত হইলেন।

কবরস্থান

বেহারে সে সময়ে জীবিত ও মৃত একসঙ্গে বাস করিত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তুমি যেদিকে চক্ষু ফিরাইবে সেই দিকে কবর,—রাস্তার পার্শ্বে কবর, ইন্দারার পার্শ্বে কবর, বৃক্ষতলায় কবর, গৃহপার্শ্বে কবর ; যেখানে দেখিবে, সেখানেই কবর। অনেক গৃহের প্রাঙ্গণে, বারাণ্ডায়, এমন কি, এক কক্ষে কবর। দুইদিকে সহরের বাহিরে দুইটি স্বতন্ত্র কবরস্থান আমি প্রস্তাব করি, ইহাতে বেহারবাসী ক্ষেপিয়া উঠিল। বড় বড় জমিদারগণ আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের "বুজরগণ" (পূর্ব্বপুরুষ) হইতে তাঁহাদের গৃহপ্রাঙ্গণে কবর চলিয়া আসিতেছে। তাঁহারা আমার প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্ট, কমিশনর ও মাজিষ্ট্রেটের কাছে রাশি রাশি দরখাস্ত করিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট মিঃ মেটকাফ। ইনি অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল সার চার্লস মেটকাফের পুত্র। রক্ত-মাহাত্ম্য প্রত্যেক পাদক্ষেপে প্রতীয়মান। তিনি তদন্ত করিতে আসিলেন। সকল দেখিলেন, এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে বসিয়া কমিশনরগণের সকল আপত্তি স্থিরভাবে শুনিলেন। সর্ব্বশেষে বলিলেন—" 'বুজরগণ' (পূর্ব্বপুরুষ) দিগকে শেয়াল কুকুরের মত কি রাস্তার পার্শ্বে পুতিয়া রাখা সম্মানের কথা ?" কমিশনরগণ নিরুত্তর। দুইটি সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া কবরস্থান খুলিলাম। যাহারা বড়লোক, বাড়ীর নিকটে স্থান আছে, কেবল তাহাদের 'বুজরগণে'র জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রহিল।

কুয়া পায়খানা

বেহার সহরে তখন অনুমান, চল্লিশহাজার লোকের বসতি ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতে এক এক কুয়া পায়খানা, এবং তাহাতে পুরুষানুক্রমিক পুঁজি সঞ্চিত হইতেছিল। সে যে এক ভীষণ ব্যাপার, সহজেই বুঝা যাইতে পারে। দুর্গন্ধে সময়ে সময়ে পথচলা ভার হইত

এবং ওলাদেবী চিরবিরাজিতা। একবার ঠিক আমার বাঙ্গলার সম্মুখের আম্বের মহল্লাতে তাঁহার বিশেষ কৃপা হইল। দিনে কুড়িপাঁচিশ জন করিয়া মরিতে লাগিল। প্রত্যেক পাঁচসাত মিনিট পরে কনষ্টেবল এক এক জন মাথা ঠুকিয়া বলিতেছে—"সরকার! আউর একঠো মর গেয়া।" পশ্চিমের প্রবল নৈদাঘ বায়ু ঝটিকাবেগে সেই মহাকালের ক্রীড়াভূমির উপর দিয়া সবডিভিসন-গৃহে প্রবাহিত হইতেছে। এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন ও আমি, যত প্রকার উপায় সম্ভব, অবলম্বন করিতেছি। কিছুতেই রোগের প্রাদুর্ভাব কমিতেছে না। একদিন একজন মহল্লাবাসী আমাকে একটি 'ইন্দারা' (পানীয় জলের কূপ) দেখাইয়া দিয়া বলিল যে, একজন সাধু (সন্ন্যাসী) আসিয়া সেই কূপের পার্শ্বে ছিল। মহল্লাবাসীদের নিকট চাঁদা চাহিয়াছিল। না দেওয়াতে সে ওলাউঠা চালান দিয়া গিয়াছে। উহা কিছুতেই থামিবে না। আমার সন্দেহ হইল যে, সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী ওলাউঠা রোগের কাপড় ধুইয়া, কূপের জলের সঙ্গে কোনওরূপে ওলাউঠার বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছে। আমি সেদিন হইতে পুলিস প্রহরী রাখিয়া উহার জল ব্যবহার বন্ধ করিলাম, এবং তাহার জল উঠাইয়া ফেলিয়া, তাহাতে চূন ঢালিয়া দিলাম। আশ্চর্য্যের কথা সেইদিন হইতে সেই মহল্লার ওলাউঠা কমিতে আরম্ভ হইল এবং দেখিতে দেখিতে উহা থামিয়া গেল। এই ঘটনা উপলক্ষ্যে বেহারের ডাক্তার বলিলেন যে, বেহারের গৃহস্থবাটীর সমস্ত কূপ বিষাক্ত, এবং বেহারে যে সর্ব্বদা ওলাউঠা ও বসন্তের প্রকোপ হয়, উহাই তাহার একমাত্র কারণ। তিনি বলিলেন, প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে এক কি একাধিক 'কুয়া পায়খানা' আছে। তাহাতে পুরুষানুক্রমিক মল মূত্র সঞ্চিত হইতেছে এবং তাহার নিকটেই পানীয় জলের "ইন্দারা" বা কূপ। আমি এ সকল 'কুয়া পায়খানা' উঠাইয়া দিয়া, মাটির উপর গামলা পায়খানা প্রচলিত করিবার যত্ন করিতে লাগিলাম। আবার লোকেরা এবং তাহাদের প্রতিনিধি মিউনিসিপ্যাল কমিশনরেরা ঘোরতর আপত্তি করিতে লাগিলেন। এ পোড়া দেশে কোনওরূপ প্রচলিত কুপ্রথা উঠাইতে চাহিলেই একটা হুলুস্থূলু পড়িয়া যায়। ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের দোহাইতে কর্ণ বধির হয়। তাহাতে আবার সকলের সন্দেহ হইল যে, এই পায়খানার জন্য টেক্স বসিবে। অন্যদিকে চল্লিশহাজার লোকের মল মূত্র পরিষ্কার করিবার জন্য এত মেথরই বা কোথায় পাইব? আমি দেখিলাম যে, বেহারে 'মুগুহর,' 'দুছাদ' প্রভৃতি নিম্নতম শ্রেণীর মধ্যে প্রায় দশহাজার লোক আছে; যাহাদের না আছে গৃহ, না আছে কোনওরূপ ব্যবসা। গাছতলায়, কি গ্রামের বাহিরে আড়াইহাত আড়াইহাত গোল, আড়াইহাত উচ্চ মাটির দেয়াল, তাহার উপর তালপাতার ছাউনি; ইহাই ইহাদের দৌলতখানা। বৃষ্টির সময়ে একটি পরিবার কোনও মতে জড় হইয়া বসিয়া থাকে। অন্য সময়ে গাছের তলায় পড়িয়া থাকে। বেহারে দিন-মজুরির মূল্য তিন-সের খেসারি ডাল মাত্র। মূল্য তিনপয়সা হইবে। তাহাও ইহাদের জুটে না। অতএব চুরি ভিন্ন ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের কোনও উপায় নাই। এক এক জন চৌদ্দপনর বার কয়েদ খাটিয়াছে, এবং আবার কোনও মতে জেলখানায় যাইতে পারিলে বাঁচে। জেল হইতে খালাস হইবার সময়ে অনেকে কাঁদিয়া বলে—"আরে বাপ্ রে বাপ্! তোম ত ছোড় দিয়া। হাম্ যায়েংগে কাঁহা, খায়েংগে কেয়া?" মানুষ যে এমন নিরুপায় হইতে পারে, তাহা আমি বেহারে যাইবার পূর্ব্বে জানিতাম না। মেয়াদ দিয়া ও বেত পিটাইয়া শাসনের উপর আমার বিশ্বাস তখনও ছিল না, এখনও নাই। অন্নাভাবই এ দেশের অধিকাংশ চুরি ডাকাতির কারণ। আমি স্থির করিলাম যে, ইহাদের দ্বারা মেথরের কাজ করাইব। মিউনিসিপ্যাল বজেটে কোনওরূপে ইহাদের সামান্য বেতনের সংস্থান করিয়া, আমি একশত বাছা চোর বদ্মায়েস পুলিসের দ্বারা আনাইয়া, এই কাজে প্রবৃত্ত করাইলাম। কাজ না করিয়া ইহাদের এরূপ অভ্যাস বাঁধিয়া গিয়াছে যে, কোনও সৎ কাজেই ইহাদের প্রবৃত্তি হয় না। প্রথম প্রথম পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু আমি আবার ধরিয়া আনিতে লাগিলাম। কিছুকাল এরূপ করিয়া, শেষে তাহারা

নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে লাগিল। তখন মাদারিপুরের মত এখানেও আমার প্রশংসা আর লোকের মুখে ধরে না। সকলে সানন্দে কুয়া পায়খানা বন্ধ করিয়া, তোল্য পায়খানা প্রচলিত করিল। বেহারের একটা প্রধান অভাব মোচন হইল।

কিন্তু এই একশত পাকা চোর সহরের উপর রাখি কি প্রকারে? বেতন পাইবা মাত্র সাতদিনে 'দারু' ইত্যাদিতে নিঃশেষ করিয়া আমাকে জবালাতন করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে কোন তর্ক-নীতি কি অর্থ-নীতি চলে না। তখন মাটির দেয়াল দিয়া তাহাদের জন্য আমি একছোট জেলখানা পুলিস থানার ঠিক সম্মুখে প্রস্তুত করিলাম। তাহার পার্শ্বে তাহাদের পরিবারদের জন্য উপরোক্ত মতে গোলঘর প্রস্তুত করাইয়া একপাড়া প্রস্তুত করাইয়া দিলাম, এবং তাহারই সম্মুখে এক মুদির দোকান বসাইয়া কাহাকে কি খাদ্য কি পরিমাণ রোজ দিতে হইবে তাহার নিয়ম করিয়া দিলাম। প্রত্যেককে কিছু বাঁশ কিনিয়া দিলাম। তাহারা সকলে মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্য করিত, এবং অবশিষ্ট সময়ে সপরিবার বাঁশের টুকরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিত। এগুলি বিক্রয় করিয়া তাহাদের বেতনের সহিত প্রত্যেকের নামে মাসে মাসে জমা দিতাম। তাহা হইতে মাসের শেষে মুদির প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া আরও কিছু জমা থাকিতে আরম্ভ হইল। তখন ইহাদের ভাব দেখিলে বোধ হইত যে, ইহারা বড় মানুষ হইয়াছে। রাত্রি নয়টার সময় পুলিস তাহাদিগকে গণনা করিয়া সেই ছোট জেলখানায় পুরিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিয়া রাখিত। তাহাদের এক রকম পোষাক (uniform) প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। কাল কোট, লাল কোমর-বন্ধ ও মাথায় লাল টুপি। প্রত্যেক বিশজনের উপর এক এক জন সর্দ্দার ছিল। তাহার মাথায় লাল কাল মিশ্রিত পাগড়ী। প্রত্যেক রবিবার তাহারা আমার গৃহের সম্মুখে তাহাদের ময়লা টানিবার গাড়ী ও গরু সহ যখন সজ্জিত হইয়া প্রত্যেক বিশজন শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র সেনার মত আমার পরিদর্শনের জন্য দাঁড়াইত, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। তাহাদের তখন আনন্দ দেখে কে? আমার উপর কত অজস্র কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিত। আমি তাহাতে যে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিতাম এ জীবনে কোনও কার্য্য করিয়া সেরূপ পাই নাই।

কিন্তু ইহার আর এক বিষম ফল হইল। আমি মফঃস্বলে বাহির হইলে এই শ্রেণীর লোক আমার তাঁবু ঘেরিয়া কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। তাহারা বলিতে লাগিল—"তুমি চোরদের লইয়া চাকরি দিলে। আমরা ভাল মানুষ, আমাদিগকে চাকরি দিবে না কেন? আমরা কেন না খাইয়া মরিব?" এই কথার উত্তর নাই। কিন্তু আমি এত চাকরি কোথায় পাইব? কিছুদিন পরে মিঃ হেলিডে (Halliday) কমিশনর ও মিঃ মেটকাফ্ (Metcalfe) কলেক্টর সবডিভিসনে আসিয়া আমার এই কীর্ত্তি দেখিলেন ও শুনিলেন। সে অদ্ভুত গোলঘরের গ্রাম ও তন্নিবাসী নরনারীর কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহারা হাসিয়া খুন। চিরদিন তাঁহারা জানেন যে, বদ্মায়েস শাসন করিবার একমাত্র পৈতৃক উপায় রাশি রাশি বদ্মায়েসি মোকদ্দমা স্থাপন করিয়া শতশত লোককে বৎসর বৎসর একবৎসরের জন্য শ্রীঘরে প্রেরণ করা। একবৎসরের পরে তাহারা আবার "যে তিমিরে সে তিমিরে।" আবার যে চোর, সে চোর। অতএব বদ্মায়েস শাসনের এই নূতন প্রণালী এবং প্রত্যক্ষ সুফল দেখিয়া তাঁহারা বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কেবল কমিশনর বলিলেন যে, তিনি ইহার দোষ দেখাইয়া দিতে পারেন— ইহাদিগকে রাত্রিতে মিউনিসিপ্যাল গুদামে কয়েদ করিয়া রাখা আমার অধিকার নাই। আমি বলিলাম—আছে। আমার চাকরির সর্ত্ত এই যে, তাহারা রাত্রিতে আমার মিউনিসিপ্যাল গুদামে মিউনিসিপ্যাল সম্পত্তির জিম্মায় থাকিবে। তখন তাঁহারা বড়ই হাসিলেন। আমি এ সুযোগ পাইয়া কলেক্টরকে বলিলাম,—আপনি পাটনাতেও এই পায়খানা-প্রণালী প্রচলিত করুন। তিনি বলিলেন—"তুমি পাগল। পাটনাতে এ প্রণালী চালাইতে গেলে একহাজার মেথরের প্রয়োজন। এত মেথর কোথায় পাইব?" আমি বলিলাম,—একহাজার অল্পকথা,

দশহাজার মেথর চাহিলেও আমি বেহার হইতে যোগাইব। তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। কিছুদিন পরে কলেক্টর লিখিলেন যে, তিনি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। পাটনার জন্য নয়শত মেথরের প্রয়োজন। আমি দুইদিনে এই নয়শত মেথর পাঠাইয়া দিলাম।

অবশিষ্ট লোকের জন্য আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে ও তাহার বাহিরে চা-বাগান ইত্যাদির জন্য, কিম্বা কোনও পতিত প্রদেশ আবাদ করিবার জন্য যত কুলি চাহিবেন, আমি বেহার হইতে যোগাইব। গবর্ণমেণ্ট প্রথম বলিলেন যে, আমি কখনও পারিব না। লোকেরা সম্মত হইবে না। আমি বলিলাম, তাহাদের কিছু বেতন অগ্রিম দিলে এবং পাথেয় দিলে, আমি যত ইচ্ছা কুলি পাঠাইব। প্রস্তাবের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হইতেই আমি বেহার হইতে বদলি হইয়া আসি।

রাস্তা

সেই সময়ে বেহার উপবিভাগ সম্পূর্ণ রাস্তাশূন্য ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে যে সকল রাস্তা ছিল, তাহারও অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। এ সকল রাস্তার মেরামতের ও বিস্তারের এবং স্থানেস্থানে নূতন রাস্তা প্রস্তুতের সুবন্দোবস্ত করিয়া, আমি মফঃস্বলের রাস্তার দিকে মনোনিবেশ করি। প্রথমবৎসর শিবিরে যাইবার সময়ে কি যে ক্লেশ পাইয়াছিলাম, এবং লোকের উপর কি যে উৎপীড়ন করিতে হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে পরি না। শিবির এবং সমস্ত উপকরণ কতক গরুর পিঠে বাঁধিয়া এবং কতক 'বেগারে'র মাথায় করিয়া লইতে হইয়াছিল। ইহা বেহারের চির-প্রচলিত প্রথা। অথচ এই সবডিভিসন খুলিয়াছে প্রায় পঞ্চাশবৎসর। একস্থান হইতে অন্যস্থানে শিবির লইয়া যাইতে হইলে বেগারিদের বোঝাবাহক গরু (লদ্‌নি বয়েল) এবং বেগার, পুলিস জোরকরিয়া আনিয়া আমবাগানে জমা করিত। সেখানে একটা রোদনের রোল পড়িয়া যাইত। বেগারদের মধ্যে কেহ বলিত—সে ভদ্রলোক, কখনও মোট বহে নাই। কেহ পীড়ার ছলনা করিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া থাকিত। কেহ বা বোঝা মাথায় দিলে পড়িয়া যাইত। তাহাদের সে সকল অভিনয় দেখিলে কখন মনে বড় কষ্ট হইত, কখনও বড় হাসি পাইত। আমি প্রথম প্রথম বিস্মিত হইতাম যে পয়সা দিয়াও এরূপ দরিদ্র দেশে কুলি পাওয়া যায় না কেন? দুইএকস্থানে শিবির স্থাপনের পর আমার সন্দেহ হইল যে, ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পয়সা পায় না। তাহা আমাদের পদাতিক ও কনষ্টেবলদের উদরে যায়। ইহারপর আমি নিজেই দাঁড়াইয়া পয়সা দিতে আরম্ভ করিলাম। তখন দেখিলাম যে, যাহারা আসিবার সময় কাঁদিয়াছিল, তাহারা হাসিয়া ও আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। যাহা হউক, আমি রাস্তার অভাব সম্বন্ধে একদিকে আমার মফঃস্বলের দৈনিকে তীব্র ভাষায় লিখিতে আরম্ভ করিলাম, অন্যদিকে গ্রাম্য রাস্তার জন্য আমার হাতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বৎসর যে তিনচারিহাজার টাকা দিতেছিলেন, তাহার দ্বারা দীর্ঘ রাস্তার কার্য্য আরম্ভ করাইয়া দিলাম। আমার লেখাতে ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ছেমন সাহেবের আসন টলিল, তিনি পাটনা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের তখন "একমেবাদ্বিতীয়ং"। তিনি চটিয়া লাল হইয়া আসিয়া আমার বাঙ্গালায় একদিন অপরাহ্নে উপস্থিত। তিনি আমার প্রস্তাব সকল তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন। এবং বলিতেছিলেন যে, আমি যে সকল রাস্তা প্রস্তাব করিতেছি, উহা আমার এষ্টিমেটের টাকার দশগুণ বেশী দিলেও প্রস্তুত হইবে না, এবং সমস্ত টাকা জলে যাইবে। কাজেই আমিও তাঁহাকে তাঁহার ভাষার সুদ সহিত উত্তর দিতেছিলাম। বাঙ্গালীর এ ধৃষ্টতা অমার্জ্জনীয়। তাই তিনি রাঙ্গা মুখ রাঙ্গাইয়া রাগে আমার কাছে উপস্থিত।

তিনি। আপনি আসিয়া অবধি আমার সঙ্গে ঝগড়া আরম্ভ করিয়াছেন।

আমি। তাহাতে আমার স্বার্থ বা সুখ কি?

তিনি। আপনি যে বিশত্রিশ মাইল লম্বা এক এক রাস্তা প্রস্তুত করিতেছেন, তাহার প্রত্যেকটির জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণই দশবিশ হাজার টাকা লাগিবে।

আমি এক পয়সাও লাগিবে না। আমি যদি রাস্তা করিতে চাহি, জমিদারেরা জমি বিনা মূল্যে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত।

তিনি অবাক্ হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

তিনি। বিশত্রিশ মাইল লম্বা রাস্তা ত 'রুল'মতে গ্রাম্য রাস্তা হইতে পারে না।

আমি। আমি বিশত্রিশটা গ্রাম্য রাস্তা, অর্থাৎ প্রত্যেক গ্রামের জন্য স্বতন্ত্র রাস্তা প্রস্তুত করিব। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যদি বিশত্রিশ মাইল একটা রাস্তা হয়, আমার অপরাধ হইবে না।

তিনি বলিলেন, আমি একজন আশ্চর্য্য লোক। আনন্দের সহিত হাত বাড়াইয়া আমার সঙ্গে সজোরে করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, যদি আমি এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে পারি, তিনি গ্রাম্য রাস্তার জন্য আমাকে বৎসর দুইতিনহাজার টাকা না দিয়া, বৎসর আটদশহাজার টাকা দিবেন, এবং এখন হইতে আমার ষোলআনা পৃষ্ঠপোষক হইবেন। বস্তুতই সেই হইতে তিনি আমার একজন পরম বন্ধু হইলেন, এবং তাঁহার প্রশংসামূলক রিপোর্টমতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড আমাকে মুক্তহস্তে টাকা দিতে লাগিলেন। আমি সর্ব্বপ্রথম বেহার হইতে বিশমাইল দীর্ঘ হিলসা রোড প্রস্তুত করি। এ রাস্তায় হাত দেওয়ার পূর্ব্বে একটা বড় হাস্যকর ঘটনা হইয়াছিল। যিনি বঙ্গদেশে দীনবন্ধুর কৃপায় 'ঘটিরাম ডেপুটি' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার সঙ্গে আমার একবার মাদারিপুরে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি বেহার পরিদর্শন-কার্য্যে উপস্থিত। তখন বর্ষাকাল। বেহারে এরূপ বর্ষা প্রায় হয় না। তিনি বলিলেন যে, তিনি সেই রাত্রিতে হিলসায় পরিদর্শনে যাইবেন। আমি অনেক করিয়া নিষেধ করিলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন, আর একদিন দেরি করিলে তাঁহার ভাতা (Travelling allowance) মারা যাইবে। পুলিস বেহারা যোগাড় করিয়া দিল। ঘটিরাম আহারের পর রাত্রি দশটার সময় হিলসা রওনা হইলেন। একে রাস্তা নাই, তাহাতে রাত্রি অন্ধকার, মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। মাঠে হাঁটু ও কোমর জল, স্থানে স্থানে খাল পার হইতে হইতেছে। বেহারাদের প্রাণান্ত কষ্ট। তাহার উপর তিনি ঘটিরামি ভাষায় বিলাতি গালি বর্ষণ করিতেছেন। বেহারারা একে একে গা-ঢাকা দিতে লাগিল। সর্ব্বশেষে চারিজন মাত্র বেহারা পাল্কী লইয়া যাইতেছে। তাহার একজনও পলায়ন করিতেছে দেখিয়া কনষ্টেবল তাহার পশ্চাতে ছুটিল। তখন পাল্কীখানি হাঁটু জলে রাখিয়া আর তিনজন তিনদিকে পিট্‌টান দিল, কনষ্টেবল বেচারি কোন্‌দিকে যাইবে, এবং সেই অন্ধকারের মধ্যে কেমন করিয়াই বা ধরিবে? ঘটিরাম ডেপুটি তখন হাঁটু জলে শায়িত হইয়া চীৎকার করিতেছিলেন—"পাকড়াও! পাকড়াও!" কিন্তু কে কাহাকে পাকড়ায়? তখন সমস্ত রাত্রি নারায়ণের মত সলিল-শয্যায় কাটাইয়া, প্রভাতে কনষ্টেবল নিকটস্থ গ্রাম হইতে নূতন আর একসেট বেহারা সংগ্রহ করিয়া দিলে, তিনি অপরাহ্নে হিলসা পৌঁছিলেন। পৌঁছিয়াই তাঁহার হিলসাযাত্রার এক 'ট্রেজিফ' বর্ণনা-সম্বলিত আমার বেহার শাসনের অর্থাৎ বেহারা শাসনের নিন্দা করিয়া পত্র লিখিলেন। কি করি, বেহারাদের ফৌজদারীতে তলব দিলাম। তাহারা কবুল জবাব দিল যে, একদিকে মুষলধারায় বৃষ্টি-বর্ষণ, অন্যদিকে ঘটিরামের ধমক ও গালিবর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল। তাহাদের জবাব ও ঘটিরামের হিলসাযাত্রা-কাহিনী শুনিয়া কোর্ট ও সমস্ত সবডিভিসন এক পক্ষ কাল হাসিয়াছিল।

এরূপে তিনবৎসরের মধ্যে আমি চারিদিকে এত রাস্তা খুলিয়াছিলাম যে, তৃতীয় বৎসর আমি সমস্ত সবডিভিসন ঘোড়ার গাড়ীতে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম, এবং সর্ব্বত্র শিবির

ও সরঞ্জাম ইত্যাদি গরুর গাড়ীতে গিয়াছিল। যে দিকে যাইতাম, লোকেরা হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিত।

মেল কার্ট

বলিয়াছি, তখন বক্তিয়ারপুর হইতে বেহার যাইবার জন্য পৌরাণিক এক্কা ও খাটুলি মাত্র প্রচলিত ছিল। বর্ষার সময়ে যখন পার্ব্বত্য প্রবাহ ছুটিত, তখন তাহাও সময়ে সময়ে বন্ধ হইত। প্রথমতঃ এই সকল স্রোতের উপর পুল, বিশেষতঃ পঞ্চানন নদের উপর নিম্ন সেতু (causeway) প্রস্তুত করাইয়া লই। তাহার জন্যও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সঙ্গে এক একটা ক্ষুদ্র যুদ্ধ করিতে হয়। তবে উচ্চবংশীয় কলেক্টর মেটকাফ ও কমিশনর হেলিডে মহোদয় আমার অনুকূল ছিলেন বলিয়া, এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলাম। এরূপে আঠার মাইল রাস্তা বেশ প্রস্তুত হইলে, আমি গয়ার একজন খ্যাতনামা জমিদারের দ্বারা যাতায়াতের নূতন এক বন্দোবস্ত করি। তিনি পাঁচহাজার টাকা ব্যয় করিয়া বিশটা ঘোড়া ও দুখানি প্রকাণ্ড 'ওয়াগনেট' গাড়ী কিনেন। রাস্তা পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক স্থানে চারিটি করিয়া ঘোড়া রাখা হয়। এরূপে প্রত্যহ একখানি গাড়ী প্রাতে ও আর একখানা গাড়ী অপরাহ্নে বেহার হইতে বক্তিয়ারপুর যাইত, এবং বক্তিয়ারপুর হইতে বেহার আসিত। প্রত্যেক গাড়ীতে দশজন করিয়া পেসেঞ্জার যাইতে পারিত, এবং দুইঘণ্টা মাত্র সময় লাগিত। গাড়ী এবং ঘোড়া এত ভাল ছিল যে, কলেক্টর কমিশনর পর্য্যন্ত এ গাড়ী খোলার পর উহাতেই যাতায়াত করিতেন, এবং প্রত্যেকবার এ বন্দোবস্তের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিতেন। বেহারের লোক উহার নাম রাখিয়াছিল "মেল কার্ট," কিন্তু মেল এ গাড়ীতে আসিত না। পোষ্টেল বিভাগের কর্ত্তারা যতটাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, এবং যেরূপ সর্ত্ত চাহিয়াছিলেন, তেজস্বী জমিদার সে দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। আমি ইতিপূর্ব্বেই অনেক লেখালেখির পর মেলট্রেন বক্তিয়ারপুর আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে উহারা বক্তিয়ারপুরে আসিত না, এবং আমাদের ডাক পাইতে অনেক বিলম্ব হইত। এখন জিনিসপত্র, বিশেষতঃ গ্রীষ্মের সময়ে মেল কার্টে এলাহাবাদ হইতে বরফ আনাইবার পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম। অতএব ইহার দ্বারা কি যে সুবিধা হইয়াছিল, যাহারা পূর্ব্বে অসুবিধা ভোগ করে নাই, তাহারা বুঝিবে না।

রেলওয়ে

কেবল এরূপে ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আমি ক্ষান্ত ছিলাম না। লেঃ গবর্ণর রিভার্স টমসন একবার বাঁকীপুর পরিভ্রমণে আসিলে আমি বেহারের জমিদারদের দ্বারা তাঁহার কাছে বেহারকে রেলওয়ের সহিত যোগ করিতে এক আবেদন উপস্থিত করি এবং প্রথমশ্রেণীর জমিদারদের সঙ্গে লইয়া, সেই আবেদন দরবারে তাঁহার হস্তে অর্পণ করি। তিনি বিবেচনা করিবেন বলিয়া উত্তর দেন। পরদিবস প্রাতে আমি চিফ সেক্রেটারি পিকক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিবার সময়ে আমাকে অন্য ডেপুটিরা গ্রেপ্তার করেন। তাঁহারা লাটদর্শন-প্রত্যাশী হইয়া কমিশনরের বারান্দায় তীর্থযাত্রীর মত বসিয়াছিলেন। এক এক জন করিয়া ডাক পড়িতেছে। তাঁহারা বলিলেন—আমাকেও লাট দর্শন করিতে হইবে; শুধু তাঁহারা এ কষ্ট পাইয়া যাইবেন, এরূপ হইতে পারে না। আমি বলিলাম, আমি তখন কার্ড পাঠাইলে আমার ডাক পড়িতে প্রায় একঘণ্টা বিলম্ব হইবে। বিশেষতঃ আমি জানি যে, আমাদের বিধাতা পুরুষ চিফ সেক্রেটারি। অতএব লাট-দর্শন আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে একটা বৃথা দুর্গতিবিশেষ। তাঁহারা আমার ওজর আপত্তি কিছুই শুনিলেন না।

স্বনামখ্যাত মৌলবি আবদুল জব্বর নিজে কাগজ একখানিতে আমার নাম লিখিয়া প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে পাঠাইয়া দিলেন। আমি ধরা পড়িলাম। কাজেই সকলের শেষে আমার পালা। দুইচারি জন দর্শক বাকী থাকিতে খোঁড়া প্রাইভেট সেক্রেটারি বাহিরে আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন যে, লাট দর্শন-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, আমরা অপরাহ্নে আসিতে পারিলে ভাল হয়। আমি কিরূপে জালে পড়িয়া দর্শন-যাত্রী হইয়াছি, তাঁহাকে বলিলে, তিনি হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, আমার লাট সাহেবকে জ্বালাতন করিবার কিছুই প্রয়োজন নাই। তবে আমি বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার, বেহারের জমিদারগণ রেলওয়ের জন্য যে দরখাস্ত দিয়াছেন, যদি তৎসম্বন্ধে লাট সাহেব কিছু জানিতে চাহেন, আমি অপরাহ্নে আসিব। অন্যথা আমাকে এ জাল হইতে মুক্তি দিলে লাট সাহেব এক দর্শকের হাত হইতে উদ্ধার পাইবেন। তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন,—"বটে! তুমি বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার; তবে তুমি আইস।" আর সকলকে বিদায় দিয়া, আমাকে লাটসমক্ষে দাখিল করিলেন। লাট বাহাদুরদের ডেপুটিদিগকে আপ্যায়িত করিবার জন্য যে সকল যথাশাস্ত্র বচন আছে, তিনি তাহা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—"তুমি কতদিন চাকরি করিয়াছ? কতদিন বেহারে আছ?" ইত্যাদি, ইত্যাদি। দুইএকটি প্রযুক্ত হইবার পর আমি বলিলাম যে, আমি নিজের কোনও বিষয়ের জন্য তাঁহাকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, যদি বেহার রেলওয়ে সম্বন্ধে তিনি কিছু জানিতে চাহেন, কেবল তাহার জন্যই তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছি। তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তাঁহার অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিবার আছে। তিনি একখানি পাটনা-বিভাগের পুরাতন নক্সা বাহির করিয়া, আমাকে তাঁহার পার্শ্বে যাইতে আদেশ করিলেন। আমি বিকল্পে বক্তিয়ারপুর হইতে বেহার, কিম্বা পাটনা-গয়া রেলওয়ের "মসৌড়ী" ষ্টেশন হইতে বেহার পর্যন্ত রেলওয়ের দুইটি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। আমি এই দুইটি লাইন তাঁহাকে নক্সাতে দেখাইয়া দিলাম, এবং উভয় সম্বন্ধে তিনি যাহা যাহা জানিতে চাহিলেন, সকল কথা বলিলাম। তিনি আমাকে নক্সাতে একটা লাল লাইন দেখাইয়া বলিলেন যে, দেখা যাইতেছে—তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী সার এস্লি ইডেন বক্তিয়ারপুর হইতে রেলওয়েটি করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। আমি বলিলাম যে, তিনি যখন বাঁকীপুর আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার কাছে এরূপ একটা প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। লাট বলিলেন—বোধ হয়, সে জন্যই তিনি উহা চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনেক কথার পর তিনি বলিলেন যে, আমার দুই প্রস্তাবের একটা তিনি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবেন। আমি বিদায় চাহিলে তিনি বলিলেন যে, আমাকে আমার সবডিভিসনের মঙ্গলার্থ এত উদ্‌যোগী দেখিয়া তিনি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি বলিলাম—"ইওর অনর! উহা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।" তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার নিজের সম্বন্ধে কি কিছুই প্রার্থনা করিবার নাই? আমি স্থিরকণ্ঠে উত্তর করিলাম যে, রেলওয়ের প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে আমি নিজেই বিশেষরূপে অনুগৃহীত ও পুরস্কৃত মনে করিব। তিনি হাসিয়া বলিলেন, তিনি আমার রেলওয়েকে ও আমাকে, উভয়কে মনে রাখিবেন। পরদিন মেটকাফ বাহাদুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বিদায় হইতে গেলে তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন যে, লাট সাহেব আমার উপর যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমার নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করিলে নিশ্চয় লাট সাহেব তাহা দিতেন।

চৌকিদারী

আমি মাদারিপুর হইতে বদলি হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে চৌকিদারী টেক্স আদায় সম্বন্ধে একটা নূতন প্রস্তাব করি। চৌকিদারী টেক্স যে কিরূপ কঠিন টেক্স, এবং উহা আদায় করা

যে কিরূপ কণ্টকর, তাহা সবডিভিসনাল অফিসার মাত্রই অবগত আছেন। অন্য টেক্সের জালে রুই কাত্‌লা প্রভৃতিই পড়িয়া থাকে, কিন্তু এই চৌকিদারী টেক্সের জাল হইতে খল্‌সে পুঁটিও পার পাইতে পারে না। গ্রামে যে নিতান্ত দীনহীন, তাহাকেও এ টেক্স দিতে হয়। কাজে কাজেই ইহা উশুল করা বড়ই কঠিন ও নির্দ্দয় ব্যাপার, এবং এ জন্য কেহ তহসিলদার পঞ্চাইত হইতে চাহে না। কারণ, টেক্স উশুল না হইলে এ অপূর্ব্ব আইনমতে তাহাদের সম্পত্তি বিক্রীত হইয়া টেক্স উশুল হয়। অন্যদিকে অন্য বেতনভোগী তহসিলদার নিযুক্ত করিয়া টেক্স উশুল করা হইলে, দরিদ্র প্রজাদের দ্বিগুণ টেক্স দিতে হয়। যাহা টেক্স ধার্য্য করা হয়, তাহা উশুল করিতেই অনেক পরিবারের ঘটি বাটি বিক্রয় করিতে হয়। তাহার উপর দ্বিগুণ টেক্স দিতে গেলে গরিব দুঃখীর যে কি সর্ব্বনাশ, তাহা সহজে বুঝা যাইতে পারে। অন্যদিকে দরিদ্র প্রজাদের হৃদয়-রক্ত অকারণে শোষিত হয়। চৌকিদারের দ্বারা তাহার কোনও কার্য্য হয় না। অধিকাংশের কোনও সম্পত্তি নাই—যাহার পাহারা দেওয়া আবশ্যক। আর পাহারা দেওয়া থাকুক, চৌকিদার প্রত্যেক গ্রামের কুম্ভকর্ণবিশেষ। এমন গভীর নিদ্রা বোধ হয়, গ্রামবাসী কাহারও হয় না। তাহার কাজের মধ্যে সপ্তাহে পুলিসে গিয়া কনষ্টেবলের লাথি খাওয়া ও দারোগা গ্রামে আসিলে গ্রামবাসীর উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া, তাঁহার আহারের ও আয়েসের উপকরণ সংগ্রহ করা এবং সে সময়ে আর এক লাথি ভোগ করা। কিন্তু বিনা বেতনে চৌকিদার বেচারাই বা কত দিন পুলিসের লাথি মাত্র আহার করিয়া থাকিতে পারে? স্মরণ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"হে ইংরাজ! তুমি চন্দ্র। ইন্‌কম্‌ টেক্স তোমার কলঙ্ক!" কি ভয়ানয় ভুল! ইংরাজ ও অন্যান্য ধনীরা এই একটামাত্র টেক্স দিয়া থাকে। তাঁহার বলা উচিত ছিল—"চৌকিদারী টেক্স তোমার কলঙ্ক।" চৌকিদারের বেতন আদায়ের কার্য্য একটা ঘোরতর কণ্টকর ব্যাপার ও উৎপীড়ন। এই উৎপাত ও উৎপীড়ন নিবারণের জন্য আমি একটা সহজ উপায় বাহির করি। প্রস্তাবটি মাদারিপুরেই আমি করিয়াছিলাম, কিন্তু সময়াভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। প্রস্তাবটি এই—বিশজন চৌকিদার একত্র করিয়া এক একটা 'চক্র' গঠিত করা এবং টেক্স উশুলের জন্য আইনমতে যে শতকরা ছয়টাকা কমিশন পঞ্চাইতকে দেওয়ার বিধি আছে, তাহার দ্বারা প্রত্যেক চৌকিদারী চক্রের পঞ্চাইতগণের অধীনে একজন 'বক্সি' পঞ্চাইতদের দ্বারা নিযুক্ত করাইয়া, সেই বক্সির দ্বারা সমস্ত টেক্স উশুলের কার্য্য নির্ব্বাহ করা। বেহারে পাটনার ডিঃ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বিশজন করিয়া চৌকিদারী চক্র গঠিত করিয়াছিলেন, এবং চৌকিদারী দাবা, পাশা ইত্যাদি হাস্যকর খেয়াল চালাইতেছিলেন। আমি সে চক্র সকল অবলম্বন করিয়া পঞ্চাইতদের দ্বারা প্রত্যেক চক্রে একজন করিয়া বাক্স নিযুক্ত করাইয়া লইলাম। বৎসরের আরম্ভে এ বক্সিগণ প্রত্যেক গ্রামের চৌকিদারী টেক্সের তৌজি পঞ্চাইতদের আদেশমতে প্রস্তুত করাইয়া, তাহার নকল আমার আফিসে পাঠাইত। প্রত্যেক তিনমাসের প্রথমভাগে গিয়া সেই তিনমাসের টেক্স আদায় করিয়া, তহসিলদার পঞ্চাইতের হাতে জমা দিয়া তাহার রসিদ আমার কাছে পাঠাইত, এবং প্রত্যেকমাসের প্রথমভাগে চৌকিদারদের বেতন দিয়া, তাহাদের রসিদ আমার কাছে পাঠাইত। সময় ও শিক্ষার অভাবে পঞ্চাইতেরা নিজে এ সকল কার্য্য নিয়মিত করিতে পারিত না বলিয়া, আপনারা অকথ্য দুর্গতি ভোগ করিত, এবং দরিদ্র প্রজাদের ও আমাদের ভোগাইত। এখন সমস্ত কার্য্য কলের মত চলিতে লাগিল। পঞ্চাইত-দের ও চৌকিদারদের আনন্দ দেখে কে! আমি যেখানে তাঁবু ফেলিতাম, সেখানের আম্‌-বাগানে এক নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যেক চক্রের বিশজন চৌকিদার লাইন করিয়া, তাহাদের বক্সি সুম্মুখ দাঁড়াইত। প্রত্যেক চৌকিদারের হাতে তাহার বেতনের বহি খোলা। চৌকিদার ও বক্সিদিগকে আমি সুন্দর পোষাক (uniform) প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলাম। যখন শ্রেণীর পশ্চাতে শ্রেণী দাঁড়াইত, দেখিতে বড়ই চমৎকার দৃশ্য হইত। আমি শ্রেণীর মধ্যে বেড়াইয়া

বেড়াইয়া প্রত্যেক চৌকিদারের বহি দেখিতাম এবং বেতন পাইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতাম। এইরূপ মাসে মাসে বেতন পাওয়া তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। তাহাদের কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইত। পঞ্চাইতগণও দুইহাত তুলিয়া, এ উপদ্রব হইতে রক্ষার জন্য আমাকে আশীর্ব্বাদ করিত। ক্রমে মাজিস্ট্রেট ও কমিশনর এই দৃশ্য ও আমার নূতন প্রণালী দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইলেন যে, কমিশনর উহা সমস্ত পাটনা ডিভিসনে প্রচলিত করিতে আদেশ প্রচার করিলেন, এবং চৌকিদারী আইন কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, এই প্রণালী সর্ব্বত্র প্রচলনের প্রস্তাব গবর্ণমেণ্টে করিলেন। আমি বাঙ্গালী, আমার খবর কে লয়? গবর্ণমেণ্ট পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে নূতন আইন সংগঠনের ভার দেন। তিনি তাঁহার খেয়াল সকল তাহাতে পুরিয়া দিয়া, চৌকিদারী টাকা পর্য্যন্ত পুলিস প্রভুদের হাতে জমা দেওয়ার প্রস্তাব পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করেন। 'অমৃত বাজার' তাহাতে গ্রাম্য স্বায়ত্ত-শাসন নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করেন, এবং তাঁহাদের করধৃত পুতুল আনন্দমোহন বসু মহাশয় কাউন্সিলে তোলপাড় আরম্ভ করেন। তাহার ফলে বর্ত্তমান চৌকিদারী আইনরূপ-খিচুড়ি প্রস্তুত হয়, এবং চৌকিদার বেচারিরা তিনমাসে একবার বেতন পায়। তবে কেবল এক এক বার থানায় হাজিরি দিয়া, রাইটার কনষ্টেবল মহাশয়দের দক্ষিণাটা দিয়া, এবং প্রতিদানে কিঞ্চিৎ স্বীসংঘটিত কুটুম্বিতা লাভ করিয়া যে দীন দরিদ্র প্রজাদের উষ্ণ রক্ত হইতে এ বেতন পাওয়া যায়, ইহাই তাহাদের সান্ত্বনা। এই অকর্ম্মণ্য চৌকিদারদিগকে উঠাইয়া দিলে গ্রামবাসীদের ও শাসন-বিভাগের কোনও ক্ষতি হইবে না। এখন প্রায় প্রত্যেক গ্রামের সন্নিকট ডাকঘর, প্রয়োজনীয় সংবাদ পঞ্চাইতগণ ডাকে কিম্বা বিশেষ প্রয়োজন হইলে লোকের দ্বারা পাঠাইতে পারে। অন্যদিকে এই লক্ষলক্ষ টাকা যদি গ্রামের জলাভাব অন্যান্য অভাব দূরীকরণে নিয়োজিত হয়, তবে দশবিশ বৎসরের মধ্যে গ্রামগুলি স্বর্গে পরিণত হইবে। কিন্তু যাহাতে ভারতীয় প্রজার সুখ-শান্তি বৃদ্ধি হয়, এমন কাজে রাজকর্ম্মচারীদিগের মন কৈ?

সবডিভিসন আবাস-গৃহের আয়তন বৃদ্ধি

গৃহটিতে কেবল দুইটি কক্ষ, দুইটি সজ্জা-কক্ষ ও দুইটি স্নান-কক্ষ ছিল। এরূপ স্থানাভাবের জন্য আমার পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মচারী একজন এই গৃহকে তাঁহার অন্দর করিয়া, বাগানের অপরদিকে সেই অপূর্ব্ব গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, উহা তাঁহার সদর করিয়াছিলেন। আমি এ স্থানাভাবের কথা রিপোর্ট করিলে এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাকে উপহাস করিয়া লিখিলেম যে, বেহারে আমার পূর্ব্বে বহু ইংরাজ কর্মচারীও ছিলেন, কেহ স্থানাভাব অনুভব করেন নাই; কেবল একজন বাঙ্গালী এতদিন পরে তাহা অনুভব করিলেন। আমি এ রসিকতার উত্তরে গৃহের এক নক্সা পাঠাইয়া বলিলাম যে, বাঙ্গালী বলিয়া আমার সময়ে গৃহের আয়তন কমে নাই। যদি এই আয়তন ইংরাজের পক্ষে যথেষ্ট হয়, বাঙ্গালী আমার পক্ষেও হইবে। তারপর ইংরাজ কর্ম্মচারী অন্ততঃ একজন এই আয়তন অযথেষ্ট বলিয়া তাঁহার বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীতে যাহা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, এবং তিনি যে গৃহের বারান্দায় কেম্বিস কাপড়ের দুইটি কক্ষ নির্ম্মাণ করিয়া অভাব পূরণ করিয়াছিলেন, তাহাও এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মহাশয়কে দেখিয়া যাইতে বলিলাম। মাজিস্ট্রেট ও কমিশনর আমার সমর্থন করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কাছে কোনও প্রয়োজনীয় কাজের কথা বলিলেই সেই এক ধুয়া—টাকা নাই। তাহার অব্যবহিত পরে মাজিস্ট্রেট ও কমিশনর পরিদর্শনে আসিলে আমি দেখাইলাম যে, জেলে দশহাজার টাকা ব্যয়ে কয়েদিদের 'নির্জ্জন কারাবাসে'র জন্য কতকগুলি কক্ষ প্রস্তুত হইতেছে। আর বলিলাম, আমার

সমস্ত ডেপর্টি-জীবনে একজনকেও নির্জ্জন কারাবাসের আদেশ দিই নাই। তাঁহারাও বলিলেন, কাহাকেও দেন নাই। তবে এতগর্লি কক্ষের প্রয়োজন কি? অথচ তাহার জন্য টাকা আছে, আর সবর্ডিভিসন-ঘরখানির বেলা টাকার অভাব! তাঁহারা দর্জনে এ অপব্যয় দেখিয়া, ওভারসিয়ারকে ডাকিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সে বেচারি কাঁপিতে লাগিল, এবং যে নক্সামতে এ কক্ষগর্লি প্রস্তুত হইতেছিল, তাহার ছাপাই স্বরূপ সে দেখাইল। দেখা গেল, নক্সাখানি পনরবৎসরের পর্রাতন। কমিশনর তখনই গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাফ করিয়া, সেইকাজ বন্ধ করিয়া, সেই টাকা সবর্ডিভিসন-গৃহে দিতে প্রস্তাব করিলেন। কিঞ্চিৎ লাল ফিতার শ্রাদ্ধের পর গবর্ণমেণ্ট উহা গ্রহণ করিলেন। সবর্ডিভিসন-গৃহের আয়তন ঠিক দ্বিগর্ণ হইল। যেদিন নূতন কক্ষ কয়টিতে প্রবেশ করিলাম, সেই দিনই স্ত্রী বলিলেন যে, আমি এ কার্জটি ভাল করিলাম না। এতদিন গৃহখানি অপরিষ্কার বলিয়া ইংরাজ বড় আসিতে চাহিত না। এখন হইতে দেশীয় কর্ম্মচারী এমন বাঞ্ছনীয় সবর্ডিভিসনটি আর পাইবে না। তাঁহার ভবিষ্যৎবাণী সার্থক হইয়াছে। তারপর আর কালাচাঁদেরা এ সবর্ডিভি-সনের ভার বড় পান নাই।

মগধরাজ্য ॥ ১ । গিরিব্রজপুর

যিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, যাঁহাকে সপ্তদশ বার পরাজিত করিয়াও হীন-পরাক্রম করিতে না পারিয়া, নররক্তে উত্তর-ভারত আর প্লাবিত না করিয়া, শ্রীভগবান্ পশ্চিম-ভারতে গিয়া যদুবংশের রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যিনি উত্তর-ভারত ব্যাপিয়া রাজ্য স্থাপন করিয়া, ৮৪ জন নৃপতিকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া, সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা মগধপতি জরাসন্ধ নৃপতির মগধ-রাজ্যই বর্ত্তমান বেহার। এখনও প্রবাদ—

"মগধ দেশ স্বর্ণপুরী।
আব মিঠা, ভাখা বুড়ি—"

মগধ দেশ স্বর্ণপুরী। ইহার জল মিষ্ট, কিন্তু ভাষা মন্দ। এখনও বেহার স্বর্ণপুরী। যেদিকে যে সময়ে দেখিবে, দেখিতে পাইবে—সুশস্যে ইহার বিস্তীর্ণ দিগন্তব্যাপী ক্ষেত্র সমাচ্ছন্ন। সমস্ত বৎসরে মগধের ক্ষেত্র একদিনও পড়িয়া থাকে না। এখনও উহার জল ও বায়ু অতুলনীয়, এবং এখনও উহার 'গোঁয়ারি' ভাষা এক অদ্ভুত জিনিস। বেহারে নিরক্ষর লোকদিগকে গোঁয়ার বলে। বোধ হয়, সেজন্যই তাহাদের স্থানীয় ভাষার নাম "গোঁয়ারি"। এ লক্ষ্মীর রাজ্যে সরস্বতী দেবী এখনও বড় অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। জরাসন্ধের নাম এখনও বেহারের নরনারীর কণ্ঠে বিরাজমান। যেখানে কিছু একটা দেখিবে, উহা কি জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইবে—"জরাসন্ধকা বট্কা।" জরাসন্ধের বৈঠক। যে পঞ্চ শৈল-বেষ্টিত উপত্যকায় তাঁহার রাজপুরী 'গিরিব্রজপুর' ছিল, সেই পঞ্চ শৈল ও উপত্যকা এখনও আছে। নাই কেবল সেই গিরিব্রজপুর। গিরিব্রজ শ্রীভগবানের সৃষ্টি, তাহা থাকিবারই কথা। গিরিব্রজপুর মানবের সৃষ্টি, তাহা থাকিবে কেন? এখনও শৈলনির্ঝরিণী সরস্বতী-তীরে জরাসন্ধসেনাপতি মণিনাগের একটি মন্দির আছে। এখনও সেই মহাভারত-খ্যাত মল্লভূমি—এমন কি, তাহার মসৃণ মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আছে। এখনও শৈলশিরে স্থানে স্থানে শৈলনির্ম্মিত দুর্গপ্রাচীর বর্ত্তমান আছে। যেস্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চানন নদ পার হইয়া, ভীম ও অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে জরাসন্ধবধার্থ শৈলদুর্গ অতিক্রম করিয়াছিলেন, এখনও সেই নদীতীরে প্রতিবৎসর শীতের প্রারম্ভে একটি মেলা হইয়া থাকে, এবং বহু

নরনারী সেই পবিত্র স্থানের ধূলি ললাটে মাখিয়া এবং জলে অবগাহন করিয়া আপনাকে চরিতার্থ মনে করে।

পঞ্চশৈল-বেষ্টিত উপত্যকা এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন-গুল্মে আচ্ছন্ন। তাহাকে গোলাকারে বেষ্টিয়া ভগ্ন শৈলশ্রেণী দুর্গবৎ দণ্ডায়মান। দুইদিকে দুইটি প্রবেশপথ। সিংহদ্বার-পথের উভয় পার্শ্বে বহুতর নির্ঝর শৈলাঙ্গ ভেদ করিয়া নির্গত হইতেছে। এক নির্ঝরের সপ্ত ধারা। ইহার নাম 'সপ্তধারা'। তাহার পার্শ্বে 'গঙ্গা' ও 'যমুনা' নামক দুই নির্ঝর। তদুপরস্থ একটি নির্ঝরের নাম 'ব্রহ্মকুণ্ড'। ইহার সলিল উত্তপ্ত। এ সকল নির্ঝরের জল অমৃততুল্য সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যপ্রদ। এ নির্ঝরমালা এখন হিন্দুদিগের তীর্থমধ্যে পরিগণিত। তিনবৎসর অন্তর এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে, তাহাতে বহু সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। সিংহদ্বার-পথের অপর পার্শ্বেও কয়েকটা কুণ্ড, এবং সাহা মকদুম নামক একজন মুসলমান ফকিরের একটা দরগা আছে। এই স্থানটি মুসলমানদিগের তীর্থস্থান। পর্ব্বতশিরে জৈনদিগের কয়েকটি মন্দির, এবং গ্রামে একটা সরাই আছে। গ্রামে নানকসাহি শিখদিগেরও একটা মঠ আছে। আর বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইহা আদিস্থান। এই-স্থান হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া অর্দ্ধেক পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল। অতএব এ স্থানটি ভারতীয় সমস্ত ধর্ম্মের একটা সম্মিলনস্থান। এমন বহুধর্ম্মপূজিত স্থান বোধ হয় পৃথিবীতে আর নাই।

২। রাজগৃহ

কালে গিরিব্রজপুর ও তাহার অধিপতি জরাসন্ধের মঠ বিলুপ্ত হইলে শৈলদুর্গের বহির্ভাগে সিংহদ্বারের ও কুণ্ডমালার পার্শ্বের উপত্যকাভূমিতে বৌদ্ধদিগের ইতিহাস-খ্যাত 'রাজগৃহ' নগর স্থাপিত হয়, এবং বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া মগধরাজ্যের রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয়। মগধরাজ বিম্বিসারের সময়ে শাক্যসিংহ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া, বহুকাল রাজ-গৃহে রত্নগিরিশৃঙ্গে বাস করেন, এবং তাহারপর বৌদ্ধগয়াতে গিয়া সপ্তবৎসর কঠোর তপস্যার পর বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। তাহার অব্যবহিত পরে আবার রাজগৃহে আসিয়া, সর্ব্বপ্রথম তথায় 'নির্ব্বাণধর্ম্ম' প্রচার করেন, এবং মগধরাজকে সেই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সপ্তধারা বা 'সাত ধারাওয়া' কুণ্ডের উপরে যে গুম্ফায় বা শৈলকক্ষে বুদ্ধদেব রাজগৃহে অবস্থানকালে ধ্যানস্থ থাকিতেন, এবং যাহার সম্মুখস্থ বেদি বা 'বিহার' হইতে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, সেই পবিত্র গিরিকক্ষ ও 'বিহার' এখনও ধ্বংসাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। তাহারপর কালে এ অঞ্চলে বহু বিহার স্থাপিত হইলে, মগধ নাম লুপ্ত হইয়া, এই অঞ্চলের নাম বিহার বা বেহার হয়। এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের কিরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, ইহাই তাহার অভ্রান্ত ও অক্ষয় প্রমাণ। রাজগৃহে যে প্রকাণ্ড বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ভিত্তিভূমি এখনও আছে, এবং বুদ্ধদেবের তিরোধানের পর যে 'উরুবিল্ল' গুম্ফায় তাঁহার তিনশত সন্ন্যাসী শিষ্য একত্রিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিগ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিল, সেই কক্ষ এখনও প্রায় সেই অবস্থায়ই আছে। গিরিব্রজপুরের দিকে উহার একমাত্র প্রবেশ-দ্বার। দীর্ঘ চতুষ্কোণাকৃতি কক্ষ শৈলাঙ্গ কাটিয়া নির্ম্মিত। তাহার এক প্রান্তে একটা গোলাকার কক্ষ। বোধ হয়, তাঁহাতে বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের সেই আদিস্থান থাদুড়ের ও বন্য জন্তুর আবাসভূমি! হায় ভারত-ভূমি! তোমার এরূপ মহৎ ও পবিত্র স্থানগুলিও রক্ষিত হয় নাই। ইউরোপখণ্ডে হইলে আজ এই কক্ষদুটি কি যত্নে রক্ষিত হইত, এবং উহাদের চারিদিক্ কি নয়নানন্দকর দৃশ্যে পরিণত হইত! বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই জন্মস্থানে ঐ ধর্ম্ম এরূপ প্রচলিত হইয়াছিল যে, বেহার সর্বাডিভসনে এমন গ্রাম নাই, যেখানে বুদ্ধদেবের মন্দির ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের বিহার ছিল না। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ

স্তূপাকারে, এবং তাহার নিকট বুদ্ধমূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। বেহারের ভূতপূর্ব্ব সবডিভিসনাল অফিসার জইণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এ. এম. ব্রডলি (A. M. Broadly) বহুসংখ্যক মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া, বেহারে একটি দ্বিতল গৃহ ভাড়া করিয়া, তাহার প্রাঙ্গণে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি দিবসের অনেক সময় সেই গৃহে বাস করিয়া, বৌদ্ধ গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেন ও লিখিতেন। আর সেই সময়ে তিনি যে সেই গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা জ্ঞাপনার্থ গৃহচূড় হইতে এক পতাকা উড্ডীন হইত। পরে এ সকল মূর্ত্তি 'বেলি সরাই'তে রক্ষিত হইয়াছে। আমি সেখানেই দেখি। শুনিয়াছি, এখন সে সকল কলিকাতার 'যাদু-ঘরে' মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। আর যে সকল মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় এখনও বেহারের সবডিভিসনের নানা স্থানে পড়িয়া আছে, তাহারা এখনও "কালভয়রোঁ" (কালভৈরব) বলিয়া পরিচিত, এবং মন্দির-স্তূপ ও ভগ্ন বিহার সকল "জরাসন্ধকা বট্‌কা" বলিয়া খ্যাত। কবির কি অপূর্ব্ব মহিমা! জরাসন্ধ কেবল উত্তর-ভারতের একজন রাজা মাত্র ছিলেন। তাঁহার সমস্ত রাজ্য এখন পাটনা কমিশনরের বিভাগ হইতে বড় হইবে না। আর যে বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম জরাসন্ধের বহু শতাব্দী পরে সমস্ত ভারত প্লাবিত করিয়া, ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, আজ বেহারে তাহার নাম লুপ্ত, এবং মহাভারতের কবির কবিত্ব-প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের কীর্ত্তিকলাপ জরাসন্ধের নামে পরিচিত! ব্যাস বাল্মীকির দ্বারা গীত না হইলে কে আজ রামসীতা, কৌরব পাণ্ডব ও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নাম শুনিত? অতএব কবিতাই প্রকৃত অমৃত, এবং কবি কেবল আপনি তাহার দ্বারা অমর হন, এমন নহে; তিনি যাহাকে স্পর্শ করেন, সেও অমরত্ব লাভ করে।

৩। বড় গাঁও বা নালন্দ

রাজগির হইতে পাঁচ ছয় মাইল ব্যবধান বড় গাঁও। ইহা বৌদ্ধ ইতিহাসের 'নালন্দ'। এখানে বৌদ্ধদের বিশ্ববিদ্যালয় (university) ছিল, এবং বহু সহস্র ছাত্র এখানে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করিত। পাঁচটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা, এবং তাহার মধ্যস্থলে বহুসংখ্যক মন্দির ও বিহার ছিল। দির্ঘিকা সকল প্রসন্ন-সলিলা এবং এমনই বিস্তৃত যে, তাহার চারি-পার একমাইলেরও অধিক হইবে। দীর্ঘিকা সকল এখনও বিদ্যমান। তাহাতে বহুসহস্র বিচিত্র বর্ণের রাজহংস বিচরণ করে। দীর্ঘিকার বিপুল বিস্তৃতিবশতঃ এই হংসদিগকে পার হইতে বিচিত্র জলজ কুসুমরাজি বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা এমন চতুর যে. এক পারে মানুষ দেখিলেই অপর পারে চলিয়া যায়। আমি 'মেণ্টন' কোম্পানীর উৎকৃষ্ট বন্দুক আনিয়াও একপার হইতে অন্যপার পর্য্যন্ত পাল্লা পাই নাই। অতএব ইহাদের শীকার করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। ভগ্ন মন্দিরস্তূপরাশির মধ্যে একটি অশ্বত্থ বা বোধিদ্রুমতলে এখনও কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধদেবের একটি বিরাট্ মূর্ত্তি আছে। ধ্যানস্থ মূর্ত্তি উর্দ্ধে ছয়সাত হস্ত হইবে। তেতরাঁওয়া গ্রামে বুদ্ধদেবের শিষ্য শারিপুত্রের জন্মস্থান। সেখানেও একটি দীর্ঘিকাতীরে এরূপ আর একটি মূর্ত্তি আছে। উভয়ই 'ভয়রোঁ' (ভৈরব) বলিয়া পরিচিত. এবং ইতর শ্রেণীর দ্বারা পূজিত। এই নালন্দ বিদ্যালয়ে চীন পরিব্রাজকগণ নির্ব্বাণধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। আজ ভারতের বক্ষে সেই ধর্ম্মের, কি তাহার বিদ্যালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। এই স্তূপরাশির অদূরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। তাহার নাম বড় গাঁও।

৪। পাওপুরী

জৈনদিগের শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর সমাধি এই পাওপুরী গ্রামে। একটি বিস্তৃত সরোবরের মধ্যস্থলে তাঁহার সমাধি-মন্দির বিরাজিত। তাহাতে যাতায়াতের জন্য

একপার্শ্বে তীর পর্য্যন্ত একটা প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু আছে। সরোবরটি জলজ কুসুম ও জলজ কুসুমসদৃশ বহুবিধ জলচর পক্ষী ও মৎস্যে পরিপূর্ণ। অহিংসাধর্ম্মের এমনই মাহাত্ম্য যে, এই পক্ষিকুল ও মীনকুল মানুষ দেখিলে পলায়ন না করিয়া, বরং ছুটিয়া আসিয়া তাহার হস্ত হইতে আহার্য্য বস্তু আহার করে। সরোবরে যখন কমল কুমুদ প্রভৃতি জলজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে নানাবিধ জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতে থাকে, তখন তাহার যে কি শোভা হয়, তাহা অবর্ণনীয়। জৈনদের জীবে দয়াই ধর্ম্ম। উহা তাঁহারা এতদূর কার্য্যে পরিণত করেন যে, চৈত্র বৈশাখ মাসে যদি অনাবৃষ্টিবশতঃ জলাশয়ের জল শুষ্ক হইয়া উঠে, তাঁহারা গ্রামের ইন্দারা হইতে জল আনিয়া মৎস্যাদির জীবন রক্ষা করেন। তাঁহারা এই গ্রামটি কিনিয়া লইয়াছেন, এবং প্রজাদের পাট্টাতে এরূপ নিয়ম লিখিয়া লইয়াছেন যে, তাহারা গ্রামের চারি সীমার মধ্যে মৎস্য মাংস আহার করিতে পারিবে না এবং কোনও জীব-হত্যা করিতে পারিবে না। জৈনদের এই গ্রামে আরও কয়েকটি শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত অতিশয় সুন্দর দেবালয় আছে; এবং তাহাতে শ্বেতমর্ম্মরনির্ম্মিত এবং বহু-রত্নখচিত তীর্থঙ্কর দেব-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সকল মন্দিরের সজ্জা, প্রাঙ্গণ ও উদ্যান দেখিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। ইহাদের তত্ত্বাবধারণের জন্য গ্রামে একটি 'পণ্ড' আছে, এবং যাত্রী-দের জন্য একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। সমস্ত স্থানটি পরিষ্কার, পবিত্র ও শান্তিপ্রদ। আমাদের হিন্দু তীর্থগুলি ইহার তুলনায় এক একটি নরক বলিলেও চলে।

বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের মধ্যে বিদ্বেষ বর্দ্ধিত হইলে, বৌদ্ধ যাজকেরা স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নিরীশ্বরবাদে পরিণত করেন। এ কারণে ভক্তিপ্রাণ ভারতবাসী ইহার উপর ক্রমশঃ বিশ্বাসহীন হয়। তখন ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধকে ক্রমে ক্রমে বিষ্ণুর অবতারে, তাহারপর কৃষ্ণাবতারে এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান বৈষ্ণব ধর্ম্মে ও পরে তান্ত্রিক ধর্ম্মে পরিণত করিলে, বৌদ্ধধর্ম্ম জৈনধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া ভারতবক্ষে আজ পূর্ব্বগৌরবের ও প্রাবল্যের ছায়ারূপে বিরাজমান রহিয়াছে। ইহার উপরও হিন্দুধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ এরূপ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে, এখন যাবৎ হিন্দুগণ জৈনদের তীর্থ দর্শন করা দূরে থাকুক, তাহার নামমাত্র করা মহাপাপ মনে করেন। আমার সবডিভিসনের ভার গ্রহণ করিবার কিছুদিন পরেই পাওপুরীতে জৈনদের রথযাত্রার মেলা হয়। সকলে জানেন, আমাদের রথযাত্রা বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত। আমি রথ দেখিতে যাইব শুনিয়া, আমার একজন আমলা আমাকে মুরুব্বিয়ানা করিয়া বলিলেন—"কি হুজুর! পাওপুরীর রথ দেখিতে যাইতেছেন! এমন কার্য্য কখনও করিবেন না। সে "সরাওক"দের (জৈনদের) তীর্থ। সেখানে হিন্দুর যাওয়া দূরে থাকুক, তাহার নাম করিলেও নরকে যাইতে হয়।" শীতের সময় যখন পাওপুরীতে শিবির প্রেরিত হইতেছে, তখন সেই আমলা আবার বলিলেন যে, উক্ত স্থানের সীমার মধ্যস্থিত আম্রকাননে শিবির স্থাপিত হইলে হিন্দু আমলা ও মোক্তারগণ নরকে যাইবার ভয়ে সে বাগানে তাহাদের রাওঠি কখনও স্থাপন করিবেন না। আমি এবার তাঁহার নিষেধ না মানিয়া সেইখানে তাঁবু পাঠাইলাম। শিবিরে পোঁছিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেছি, এমন সময়ে কয়েকজন জৈন ভদ্রলোক অগ্রসর হইয়া, আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন যে, এই আম্রবাগান পাওপুরীর সীমার মধ্যে। এখানে মৎস্য মাংস আহার করিলে জৈনধর্ম্মাবলম্বীরা বড় ব্যথিত হইবেন। এ কারণে কোন হাকিম পূর্ব্বে এ বাগানে তাঁবু ফেলেন নাই। আমি তাঁহাদের বলিলাম যে, আমি যে কয়দিন সেই বাগানে থাকিব, মৎস্য মাংস গ্রহণ করিব না। তাঁহাদের তীর্থের প্রতি আমার ভক্তি আছে। সস্ত্রীক তীর্থ দর্শন করিবার সুবিধা হইবে বলিয়া মন্দিরের নিকট সেই বাগানে তাঁবু ফেলিয়াছি। তাঁহারা অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বলিলেন, যদি আমার অনুমতি হয়, এ কয়দিন আমার জন্য মন্দির হইতে প্রসাদ আসিবে। আমি তাহাতে

সম্মত হইলাম এবং তাঁহাদের মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিলে, তাঁহাদিগকে দুইবেলা আসিয়া আমার রন্ধনের রাওঠি দেখিয়া যাইতে বলিলাম। আমি তাঁহাদের সঙ্গেই মন্দির দেখিতে চলিলাম। সমস্ত মন্দির ও সমস্ত স্থান দেখিয়া ও মন্দিরে মন্দিরে সায়াহ্ন-আরতি দেখিয়া ভক্তি-পূর্ণহৃদয়ে শিবিরে ফিরিলাম। এমন সুন্দর সুরক্ষিত তীর্থস্থান আমি দেখি নাই। আমি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, স্ত্রীও ইতিমধ্যে পাল্কিতে মন্দিরে চলিয়া গিয়াছেন এবং রাত্রি প্রায় নয়টার সময় ফিরিয়া আসিলেন। দেখিলাম, তিনি মন্দিরাদি ও আরতি দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন যে, সেই সরোবরাস্থিত মহাবীর স্বামীর সমাধিমন্দিরে তাঁহার সহিত কতকগুলি যাত্রী জৈন রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। তিনি এতক্ষণ সেখানে বসিয়া, আরতি দেখিয়া, তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। তাহারা কিছুতেই তাঁহাকে আসিতে দিতেছিল না। এ সকল রমণীরা পরদিবস হইতে দলে দলে আমার শিবিরে আসিত। সমস্তদিন স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করিত এবং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের সঙ্গে তাঁহাকেও যাত্রী সাজাইয়া মন্দিরে লইয়া যাইত। প্রত্যহ দুইবেলা নিরামিষ আহার ও নানাবিধ লুচি, মালপো ও পিষ্টকাদি এরূপ বহুল পরিমাণে আসিত এবং তাহা এত উৎকৃষ্ট যে, যে দশদিন সেখানে ছিলাম, আমাদের রন্ধনকার্য্য করিতে হয় নাই। আমার ও পত্নীর প্রশংসায় স্থান পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এমন কি, বেহার হইতে পর্য্যন্ত জৈন জমিদার ও মহাজনগণ আসিয়া আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। আমার দেখাদেখি হিন্দু আমলা ও মোক্তার অনেকের নরকভীতি উড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা অনেকে এবার "সরাওক"দের তীর্থ দর্শন করিয়া ও পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং তাহার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

পার্শ্বস্থ দুর্গাপুর গ্রামে দুর্গাদেবীর মূর্ত্তি আছে শুনিয়া, আমি একদিন সে মূর্ত্তি দেখিতে গেলাম। একটি ক্ষুদ্র নিকৃষ্ট মন্দির। তাহার কপাট বন্ধ। অনেক বার ডাকিবার পর পূজারী মহাশয় আসিলেন। তিনি প্রথম আমাকে খ্রীষ্টান সাব্যস্ত করিয়া, কপাট খুলিয়া দিতে নারাজ হইলেন। কারণ, আমি "সরাওক"দের তীর্থ দর্শন করিয়াছি। পরে সঙ্গীয় কনষ্টেবলের ভ্রূকুটি দেখিয়া কপাট খুলিলে দেখিলাম, মূর্ত্তির পঞ্চ ক্রোশের মধ্যেও দুর্গামূর্ত্তির গন্ধ নাই। মূর্ত্তি—মায়া দেবীর, কোলে শিশু সিদ্ধার্থ। পূজারী মহাশয় বলিলেন যে, অঙ্কের শিশু 'গণেশজি'। কিন্তু তাহার হস্তি-শুণ্ডাভাবের কথা বলিলে তিনি আবার চটিয়া লাল হইলেন। তাহার উপর কি ধ্যানে এ মূর্ত্তির তিনি পূজা করেন, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি একটুক ক্রোধের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"আপনি কি ধ্যান বুঝিবেন? আমি বলিলাম—বুঝিব। তখন তিনি একটা নূতন রকমের দুর্গার ধ্যান আওড়াইলেন। কিন্তু সেই ধ্যান গণেশজননীর। মূর্ত্তির সঙ্গে কিছুই মিলিতেছে না বলিলে তাঁহার ক্রোধ এবার পঞ্চমে উঠিল। তিনি সটান কপাট বন্ধ করিলেন। আমি যদি "সুবে বেহারকি হাকিম" না হইতাম, তিনি নিশ্চয় আমার প্রতি উত্তম মধ্যম ব্যবস্থা করিতেন। অর্থহীন 'হিন্দু'শব্দযুক্ত হিন্দুধর্ম্মের দোহাইয়ে যাঁহারা হিমালয় পর্য্যন্ত কম্পিত করেন, তাঁহারা জানেন কি যে, তাঁহাদের তীর্থস্থানের সমস্ত দেবদেবী-মূর্ত্তি,—বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী, গয়ার সর্ব্বমঙ্গলা, পুষ্করের গায়ত্রী এবং শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, সকলই এরূপ জাল এবং তাঁহাদের পূজকগণও এরূপ মহাপুরুষ! যাহা হউক, দশদিন বড় আনন্দে পাওপুরীতে কাটাইয়া আসিলাম। তাহারপর প্রত্যেক বৎসর আমি এখানে দশদিন করিয়া সেরূপ আনন্দে কাটাইতাম।

তীর্থ-দর্শন ॥ ১। গয়া

বেহারে অবস্থিতিকালে আমি একবার পূজারবন্ধে গয়া দর্শন করিতে যাই। আজ আমার সেই গয়াবাসী সহপাঠী কোথায়? তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার এক চক্ষু অন্ধ ছিল, এবং তাঁহার "মেড়ুয়াবাদী" পোষাকনিবন্ধন কলেজে তিনি একজন উপহাসের পাত্র ছিলেন। কিন্তু আমার ও তাঁহার মধ্যে বেশ একটু বন্ধুতা ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি আমার বেহারের বাঙ্গলায় উপস্থিত। আমি বিস্মিত। কি, তুমি কোথা হইতে? উত্তর—"আমি গয়ার উকিল, এক আত্মীয়ের মোকদ্দমায় আসিয়াছি।" কাচারিতে গিয়া শুনিলাম, তিনি গয়ার সর্ব্বপ্রধান উকিল, তাঁহার মাসিক আয় দুইতিন সহস্র, তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে চুরি হইয়া—চুরি যায় পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার সম্পত্তি! এ সকল আমার কাছে উপাখ্যান বোধ হইতে লাগিল। কলেজে যে আমার ছায়াতেও আসিতে পারিত না, তাহার আয় তখন দুইতিনহাজার, আর আমাকে চারিশত টাকার জন্য ডেপুটি-গিরির দুর্গতি ভোগ করিতে হইতেছে! আমি যখন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হই, তখন ইনিও কত হিংসা করিয়াছিলেন। অথচ তিনি যখন মোকদ্দমা চালাইলেন, তাহাতে কিছুই বিশেষত্ব দেখিলাম না। পাটনার উকিলগণ আমার কোর্টে আসিয়া, দিন দেড় শ দুই শ করিয়া ফিস লইতেছে দেখিয়া আমি ইতিপূর্ব্বেই ডেপুটিগিরি অতল জলে বিসর্জ্জন দিব কি না, ভাবিতেছিলাম। ইঁহার অবস্থা দেখিয়া, স্থির সংকল্প করিয়া, বাঁকীপুরে গুরুপ্রসাদবাবুর নিকটে পরামর্শ করিতে গিয়াছিলাম। তিনি বুঝাইয়া দিলেন, ওকালতিতে যেমন টাকা আছে, ডেপুটিতে তেমন পদগৌরব আছে। গোলাপেও কাঁটা আছে। ওকালতির দুর্গতির কথা ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলিলেন যে, তিনি নিজে একটা কাপড়ের কল খুলিবার চেষ্টায় আছেন। যদি কৃতকার্য্য হন, তবে ওকালতি ছাড়িয়া দিবেন। মোট কথা, একবার বঙ্কিমবাবু ও কৃষ্ণদাস পাল আমাকে থামাইয়াছিলেন, এবার তিনি থামাইলেন। আর থামাইলেন আমার পত্নী। ওকালতির উপর তাঁহার কেমন একটা চিরবিদ্বেষ। আমি গয়ায় আমার সেই বন্ধুর ও যে বিখ্যাত ভূম্যধিকারী দ্বারা বেহারে বক্তিয়ারপুর মেল কার্ট খুলিয়াছিলাম, তাঁহার অতিথি হইলাম। আমাদের দুই জনকে কি রাজ-সুখেই রাখিয়াছিলেন। সর্ব্বদা দুই জুড়ী আমার গৃহদ্বারে আমার নগরদর্শনের জন্য সজ্জিত থাকিত। অবস্থিতির জন্য ফল্গু নদের তীরে একখানি সুন্দর দ্বিতল গৃহ নিয়োজিত হইয়াছিল। প্রত্যহ দুইবেলা উভয়ের বাড়ী হইতে এত অপূর্ব্ব রকমের প্রচুর আহার্য্য আসিত যে, তাহা আমাদের উদরে বোঝাই করা অসাধ্য হইত। তাহার উপর আবার বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। "সোনার থালে দুধ ভাত"—আমাদের দেশে সুখের পরাকাষ্ঠার প্রবাদ। বাস্তবিকই আমার বন্ধুর গৃহে সোনার থালে আহার, সোনার সোরাই হইতে ঢালিয়া সোনার গ্লাসে জল পান করিয়া ডেপুটি-পত্নীর জন্ম সার্থক হইয়াছিল। শুনিলাম, তাঁহার আসনের জন্য বহুমূল্য কাশ্মীরী শাল পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কেবল তাহাতেও বন্ধুপত্নী ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কিছু উগ্র রকমের রসিকা। স্ত্রীর কাছে স্বামি-বিনিময়ের প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। এত সোনার ছড়াছড়ি দেখিয়াও তিনি নাকি সেই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাতে বন্ধুপত্নীর হার হইবে। কারণ, তাঁহার ডেপুটি স্বামীর সোনার মধ্যে তিনি। কি আনন্দেই গয়ায় কয়দিন কাটাইয়াছিলাম। আজ সেই বন্ধু কোথায়? আমি বেহার ছাড়িবার অল্পদিন পরেই তাঁহার পরলোকগমন হয়। গয়ার একটি প্রধান নক্ষত্র অস্তমিত হয়।

গয়াতে যাহা দেখিলাম, তাহাতে বড় তৃপ্ত হইলাম না। অবশ্য বিষ্ণুপদের মন্দির দর্শন-যোগ্য। কিন্তু শ্রীক্ষেত্রের মন্দিরের কাছে কিছুই নহে। শ্রীক্ষেত্র প্রেমক্ষেত্র, গয়া পিণ্ডক্ষেত্র। শ্রীক্ষেত্রের ভক্তির উচ্ছ্বাস গয়াতে নাই। তাহার উপর গয়ার সকলই কৃত্রিম। রাজেন্দ্রলাল প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, গয়া বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থ ছিল। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, গয়াসুরের উপাখ্যান কেবল কবি-কল্পনা মাত্র। গয়াসুর বৌদ্ধধর্ম্ম। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ক্রমে

ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরিণত হয়। এরূপে বিষ্ণু ব্রাহ্মণধর্ম্মের শিলাঘাতে গয়াসুরকে বধ করেন, এবং সে অসুর শত যোজন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সে সময়ে ভারতবর্ষে তত যোজন স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বিষ্ণুপদও বুদ্ধপদ। হিন্দুদিগের আর কোন তীর্থে পদ-পূজা নাই। জৈনদের এখনও আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি—সর্ব্বমঙ্গলা, গায়ত্রী, সকলই পুরুষের মূর্ত্তি—বুদ্ধমূর্ত্তি। দেবতার জল এ পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে যে, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের স্থান গ্রহণ করিয়াছে। মানুষ যখন ধর্ম্মবিশ্বাসে অন্ধ হয়, তখন সে বিশ্বাস করে না, এমন অসম্ভব কিছুই নাই। গয়ার ব্রহ্মযোনিও পার্ব্বত্যদেশবাসী আমার চক্ষে কিছুই লাগে নাই।

একদিন বন্ধুদের জুড়ীতে সস্ত্রীক বুদ্ধগয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। ফল্গু নদের তীরে কি সুন্দর সাধনার স্থান। ফল্গুরই নাম বুঝি তখন নিরঞ্জনা ছিল। তাহার অপর পারে শৈলশ্রেণী ও কয়েকটি মন্দির দৃশ্যের ন্যায় চিত্রিত দেখাইতেছিল। তখন নদ আকূল পূর্ণিত, খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। এই তীরে প্রথমতঃ মোহন্তের আস্তানা। তাহার পর তরুরাজি-বেষ্টিত সেই জগদ্বিখ্যাত তপস্যার স্থান। সে স্থানোপরি যে গগনস্পর্শী অদ্ভুত কৌশলসম্পন্ন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও বৌদ্ধধর্ম্মের অতীত গৌরবের সাক্ষিস্বরূপ বিরাজমান—নির্জ্জন, নীরব, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, সমাধিমগ্ন। মন্দিরে একটি সুন্দর ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। মন্দিরের পশ্চাৎভাগে একটি শৈলবেদিকায় এখনও একটি "বোধিদ্রুম" বা অশ্বত্থবৃক্ষ ছায়া প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকের বিশ্বাস, যে "বোধিবৃক্ষ"মূলে বসিয়া বুদ্ধদেব ছয় বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন, এই বৃক্ষ তাহার শাখা হইতে উদ্ভূত। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর যাবৎ অর্দ্ধাধিক পৃথিবী যে ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত, ইহাই তাহার জন্মস্থান। পৃথিবীতে এমন ঐতিহাসিক, এমন পবিত্র, এমন অমর স্থান আর নাই। গয়া দেখিয়া আমার হৃদয়ে কোনরূপ ভক্তিরই উদ্রেক হয় নাই। কিন্তু আমি এই বেদিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। আমার হৃদয় ভক্তিতে, গাম্ভীর্য্যে এবং কি এক অচিন্তনীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইল। আমার জীবন সার্থক বোধ হইল। মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। গবর্ণমেণ্ট একজন এঞ্জিনিয়ারের দ্বারা তাহার সংস্কার করাইতে-ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম, এ মন্দিরসংস্কার তাঁহার পক্ষে ব্যবসায়ের কার্য্য নহে। তাঁহার আন্তরিক ভক্তির কার্য্য। তাঁহার কাছে শুনিয়াছিলাম, স্মরণ হয় যে, এই প্রাচীন মন্দির কেবল কাঁচা ইটের দ্বারা নির্ম্মিত। তিনি বলিলেন যে, মন্দিরটি একটি অদ্ভুত শিল্প-কীর্ত্তি। হায়! সেই শিল্প আজ কোথায়! বৌদ্ধধর্ম্ম বৈষ্ণব ও জৈনধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমানে হিন্দুধর্ম্মে এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সকল রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সেই শিল্প সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। কে বলিবে যে, একদিন অন্নাভাবে ও জলাভাবে সমস্ত ভারতীয় জাতিই বিলুপ্ত হইবে না। কিন্তু তখনও বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম্ম থাকিবে। ভারতের ইহারা মাত্র অবিনশ্বর, আর সকলই বুঝি নশ্বর। একদিন বুঝি সমস্ত পৃথিবী শ্বেত জাতির আবাস হইবে। তাহা হইলে এই হিংসানল কৃষ্ণবর্ণ জাতিদিগকে ভস্মীভূত করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে, এবং তখন পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে—"মা হিংস্যাঃ সর্ব্বভূতানি"। তখন আবার সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে।

গয়া হইতে ফিরিবার সময়ে বন্ধু আমার সঙ্গে বাঁকীপুর পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, বাঁকীপুরে তাঁহার কোনও বিশেষ প্রয়োজন আছে; আমি তাহা ছলনা মনে করিয়াছিলাম। পাঠ্য জীবনের বন্ধুদের মধ্যে কিরূপ একটা জীবনব্যাপী আকর্ষণ থাকে। আমার বোধ হয়, বন্ধু সেই আকর্ষণে আরও কয়েক ঘণ্টা আমার সঙ্গে কাটাইতে আসিয়া-ছিলেন। তাঁহার মনে কি ছায়া পড়িয়াছিল যে, এই সাক্ষাৎই আমাদের এই পৃথিবীতে শেষ

সাক্ষাৎ; ট্রেনে পাঠ্য জীবনের, কার্য্য-জীবনের কত গল্পই উভয়ের মধ্যে হইয়াছিল। একটা গল্প লিখিবার যোগ্য। গয়া জেলার অন্তর্গত টিকারীর রাজার এক উপপত্নী ছিল। সে প্রায় আশী হাজার টাকা মুনফার সম্পত্তি রাখিয়া মরিয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট তাহা উত্তরাধিকারি-শূন্য সম্পত্তি বলিয়া দাবী করেন, এবং কে একজন উত্তরাধিকারী দাঁড়াইয়া গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বন্ধু গবর্ণমেণ্ট উকীল। তাঁহার সাহায্য করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট একজন ডেপুটি কলেক্টর নিয়োজিত করেন। বন্ধু মোকদ্দমায় জয়ী হইয়াছিলেন, এবং অনেক টাকা পাইয়াছিলেন। ডেপুটি কলেক্টর গবর্ণমেণ্টের কাছে বেহারের এলেকায় একখানি মৌজার বন্দোবস্ত পাইয়াছিলেন। এই গল্প করিয়া বন্ধু বলিলেন—"ভাই! তোমরা ডেপুটি কলেক্টরেরা না করিতে পার, এমন কাজ নাই।" কেন? উত্তর—"আমি সেই ডেপুটির কাছে যখন যেরূপ প্রমাণ বা দলিল চাহিতাম, তখনই তাহা প্রস্তুত হইয়া আসিত।" আমি বলিলাম—"ভায়া! তোমার ধর্ম্মজ্ঞানটি মন্দ নহে। তুমি তাহাকে পাপের পরামর্শ দিতে, তুমি দোষী হইলে না। আর সে বেচারি চাকরির ভয়ে তোমার পরামর্শমত কার্য্য করিত বলিয়া সে পাপী হইল।" বন্ধু হাসিয়া বলিলেন—"এরূপ পরামর্শ দেওয়া যে উকিলের কর্ত্তব্য। কিরূপ প্রমাণ ও কি দলিল আবশ্যক, তাহা বলাই ত উকিলের কার্য্য। তাহাতে তাহার পাপ হইবে কেন?" আমি বলিলাম, তুমি জানিতে যে, সে প্রমাণ ও দলিল নাই। তুমি জানিতে—তাহা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, এবং তাহা সত্য বলিয়া তুমি ব্যবহার করিয়াছিলে এবং তদ্দ্বারা একটি লোকের সর্ব্বনাশ করিলে। বন্ধু এবারও হাসিয়া বলিলেন,—"তাহা না করিলে কি উকিলি চলে?" উকিলেরা এরূপ একটা ধর্ম্ম নিজে গড়িয়া লইয়া থাকেন, এবং এরূপ কার্য্য করিয়াও আপনাকে নিষ্পাপ মনে করেন। তবে সময়ে সময়ে কাহারও মনে এ জন্য দারুণ অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠে। একজন উকিলের বৃদ্ধ বয়সে এরূপ ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি একজন মহা অপরাধী এবং সর্ব্বদা কনষ্টেবল তাঁহাকে ধরিতে আসিতেছে। তিনি এই ভয়েই জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। আর একজন উকিল-সরকারি করিয়া বহুলোকের ফাঁসি দেওয়াইয়াছেন বলিয়া তাঁহার কি উপায় হইবে,—এই চিন্তায় অস্থির, এবং কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে এ মহাপাতক হইতে উদ্ধার পাইবেন, তাহার অন্বেষণে সমস্ত ভারত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। যেখানে শুনেন যে, একটা নূতন কিছু ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত হইয়াছে, তিনি সেখানে ছুটিয়া যান। আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম—"তুমি ওকালতি করিয়াছ মাত্র। আমি ত বিচারকস্বরূপ কত লোককে ফাঁসি-কাষ্ঠে পাঠাইয়াছি। কিন্তু কই, আমার মনে ত কোনরূপ অনুতাপ নাই।" তিনি বলিলেন—"তোমার মনে অনুতাপ হইবে কেন? তুমি যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছ, সেইরূপ বিচার করিয়াছ। আর আমি যে প্রমাণ সংগ্রহ করাইয়া, প্রমাণ না থাকিলেও প্রমাণ আছে বলিয়া নানারূপ কূট তর্ক করিয়া লোকের ফাঁসির ব্যবস্থা করাইয়াছি।" এই অনুতাপে অস্থির হইয়া এখন ইনি কি একটা নূতন ধর্ম্মানুসারে সন্ধ্যা আহ্নিক করেন, এবং বলেন যে, তিনি এখন স্বর্গের ঘণ্টা পর্য্যন্ত শুনিতে পান। তাঁহার বিশ্বাস আর কিছুদিন এই খিচুড়ি-ধর্ম্মটা পাকাইলে তিনি স্বর্গ দেখিতে পাইবেন। এমন কি, এই ওকালতি-পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, সশরীরে সেই ঘণ্টা-নাদী স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

২। বরাবর

বরাবর একটি পার্ব্বত্য স্থান; গয়ার জেহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত এবং ফল্গু-তীরে অবস্থিত। এখানে অত্যুচ্চ শৈলাঙ্গ কাটিয়া বার কি তেরটি বৌদ্ধ কক্ষ। কক্ষগুলি চতুষ্কোণ এবং খুব প্রশস্ত। প্রত্যেকের এক প্রান্তে একটি চক্রাকৃতি কক্ষ। বোধ হয়, তাহাতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, এবং কক্ষে বৌদ্ধ শ্রমণ সকল বাস করিতেন।

কক্ষপ্রাচীর এরূপ মসৃণ, প্রথম দৃষ্টিতে চারিদিকে চারিটি প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ দর্পণ বলিয়া ভ্রম হয়। স্থানটি কি নির্জ্জন, কি শান্তিপ্রদ, কি ভক্তিভাবোদ্দীপক, কি সুন্দর! সৌন্দর্য্য নির্ব্বাচনের চক্ষু, এবং শিল্পে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির শক্তি, বোধ হয় বৌদ্ধদের মত পৃথিবীতে আর কাহারও ছিল না। কোন কোন কক্ষ ও শৈলসানু হইতে চারিদিকের পার্ব্বত্য ও গ্রাম্য শোভা এবং পদতলস্থ ফল্গু নদের ঘূর্ণিত ভুজঙ্গগতি কি মনোহর! যে দিকে দেখিবে, তোমার চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হইবে না। তপস্যার জন্য ইহার অধিক উপযোগী স্থান আর হইতে পারে না। আমার মত ঘোরতর সংসারদগ্ধ ব্যক্তির বুঝি শান্তির জন্য এমন স্থান আর নাই। আমার ইচ্ছা হইল, এখানে বসিয়া চারিদিকের অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া, অনন্ত-সুন্দর স্রষ্টার ধ্যানে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করি। বলা বাহুল্য, "গুম্ফা" বা শৈল-কক্ষ সকল শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সেই বৌদ্ধ তপস্বী ও তপস্যা ভারতবক্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। বোধ হয়, ভুভারত-বক্ষ হইতে বলিলেও সত্যের অন্যথা হয় না। কেবল একটি কক্ষে একজন বৈষ্ণব বরাবর-দর্শকগণ ও নিকটস্থ গ্রামবাসী হইতে কিঞ্চিৎ উপার্জ্জনের জন্য রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবী সহ বাস করিতেছেন। কি স্থানের, কি ধর্ম্মের, কি অধঃপতন! বিদেশীয় বৌদ্ধেরা বুদ্ধগয়া লইয়া তোলপাড় উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহারা কতকগুলি শ্রমণ এই বরাবর তীর্থে পাঠাইয়া, ইহার পুনর্জীবন প্রদান করিয়া, সমস্ত মানবজাতির জন্য একটি স্বর্গ সৃষ্টি করিতে পারেন।

এ সকল কক্ষ দেখিবার পর একটি স্থানীয় লোক বলিল যে, একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখরে কিছুদিন হইতে একজন সাধু বাস করিতেছেন। তিনি কখনও লোকালয়ে পদার্পণ করেন না, কেবল ন দিবা ন রাত্রি একটি ক্ষুদ্র কক্ষে যোগস্থ থাকেন। আমরা তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য বহু পরিশ্রমে সেই উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে আরোহণ করিলাম। শৈলসানুতে গর্ত্তের মত একটি কক্ষ, তাহার মধ্যে একজন কঙ্কালাবশিষ্ট যোগী যোগস্থ। কক্ষদ্বারে তাঁহার একটি 'চেলা' নন্দীর মত দ্বার রক্ষা করিতেছেন। কক্ষের চারিদিকে ভগ্ন মৃণ্ময় সুরাপাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তাহাতে বোধ হইল, যোগিবর তান্ত্রিক। স্থানীয় লোকটি বলিল যে, এই চেলাটি সময়ে সময়ে নীচে নামিয়া আহার্য্য ও সুরা ভিক্ষা করিয়া আনে। সাধু নিজে কিছুই আহার করেন না, এবং ক্বচিৎ কাহারও সঙ্গে যোগের শেষ হইলে কথা কহেন। আমাদের দেখিয়া চেলা মহাশয় চক্ষু রাঙ্গাইয়া আমরা কি চাহি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা সন্ন্যাসীর দর্শনেচ্ছু বলিয়া বলিলে, সে বলিল যে, বাবা কাহাকেও দর্শন দেন না, এবং তিনি তখন যোগস্থ। যোগ কখন শেষ হইবে জিজ্ঞাসা করিলে, সে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—সূর্য্য যখন ওখানে, অর্থাৎ অস্তাচলে যাইবে। সঙ্গী বলিল—আমি বেহারের হাকিম, বহুদূর হইতে দর্শনের জন্য আসিয়াছি। চেলা চটিয়া বলিল—তাঁহাদের কাছে সামান্য লোক যাহা, হাকিমও তাহা; আবার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা উপর দিকে দেখাইয়া বলিল, সেই এক হাকিম ভিন্ন তাহারা অন্য হাকিম চিনে না। আমি আমার কোর্ট সব-ইন্‌স্পেক্টরের হাতে কয়েকটি টাকা দিয়া, উহা 'দর্শনী'স্বরূপ দিতে বলিলাম। সে টাকা দিতে অগ্রসর হইলে চেলা মহাশয় চক্ষু আরও রাঙ্গাইয়া, তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিতে একটি শিলাখণ্ড তুলিয়া বলিলেন—"তোরা এখানে টাকা দেখাইতে আসিয়াছিস্! পালা!" আমরাও পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলাম।

৩। মথুরা, বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, বিন্ধ্যবাসিনী, প্রয়াগ

পরের বৎসর পূজারবন্ধে আমি পশ্চিমের কয়েকটি তীর্থ দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। প্রথমে বিন্ধ্যাচলে যাই। এখানে গঙ্গার শোভা চিত্তবিনোদিনী। তীরে একটি সামান্য মন্দিরে

কালীঘাটের কালীর মত এক ভীমা মূর্ত্তি। তাঁহার মন্দির-প্রাঙ্গণ ছাগ-রক্তে প্লাবিত। দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। শুনিলাম, ইঁনি নকল 'বিন্ধ্য মাই'। আসল 'বিন্ধ্য মাই' পর্ব্বতোপরে। অপরাহ্নে সস্ত্রীক সেখানে গেলাম। সম্মুখে একটি সরোবর। তাহার এক তীরে মধ্য-ভারতের কোন মহারাজার এক অট্টালিকা। তাহার উপর পর্ব্বত-অধিত্যকায় সোপান বাহিয়া উঠিলাম। একটি প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের অপর দিকে পর্ব্বতের অঙ্গে,—পর্ব্বত বলা বাহুল্য, শিলাময় একটা 'গুম্ফা'। তাহার দেয়ালে যেন পেরেক দিয়া বালকের হাতের বা আলপনার আঁকা এক মূর্ত্তি। পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—এই আসল 'বিন্ধ্য মাই'। আমার বোধ হইল, উহা নকলেরও নকল। আমি স্ত্রীকে বলিলাম—বিন্ধ্য মাই মাথার উপর থাকুন, এটিও বৌদ্ধদের গুম্ফা না হইয়া পারে না। ব্রাহ্মণ শুনিয়া বলিলেন—"নাহি বাবু সাহেব! এ বুধকো মুরত নেহি। বুধকা মুরত দেখতে চাতে হো! এই দেখো।" তিনি দেয়ালের এক স্থান হইতে একখানি গামোছা সরাইয়া লইলে দেখিলাম—বুদ্ধমূর্ত্তি! হিন্দুগণ! তোমাদের বর্ত্তমান সকল তীর্থই এরূপ জাল! স্ত্রী প্রণত হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। আমার ভক্তি সেখান হইতে দুইশত মাইল উড়িয়া গিয়াছে। আমি বিরক্ত হইয়া শৈলকক্ষের বাহির হইবা মাত্র দ্বারে বিন্ধ্য মাই না হউক, বিন্ধ্যবাসিনীর সাক্ষাৎ পাইলাম। অসামান্যা রূপসী। নাতিক্ষীণা, নাতিস্থূলা, নাতিদীর্ঘা, নাতিখর্ব্বা, গৌরাঙ্গে পূর্ণ যৌবন বিশাল তরঙ্গে ছুটিয়া ফাটিয়া পড়িতেছে। বিশাল আয়তলোচন মদিরাক্ত হইয়া পদ্মপলাশের শোভা ধারণ করিয়াছে। রক্তাধরে মনোমোহিনী হাসি হাসিয়া তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কালী মাই দর্শন করো গে?" আবার কালী মাই কোথায়? বলিলেন—"চলো!" আমি ক্রীড়াপুত্তুলের মত তাঁহার পশ্চাৎ চলিলাম। তিনি এক সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"আও।" বন্ধু তারাচরণ দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—এ সুড়ঙ্গে গিয়া কি করিব? তিনি অভয়ার মত অভয় দিয়া, আবার সেই হাসি হাসিয়া মুখে ও কটাক্ষে বলিলেন,—"কুচ পরওয়া নেই, আও!" আমি তাঁহার পশ্চাতে গেলাম। না যাইবার শক্তি নাই। তিনি আমার অংশোপরে তাঁহার সেই করকমল রাখিয়া এবং আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত করিয়া একখানি পাথর দেখাইয়া বলিলেন,—"এই কালী মাই।" তাহার পর ঢল ঢল আবেশময় নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইল, কক্ষে যেন তাঁহার বিলোল কটাক্ষে বিদ্যুৎ খেলিতেছে, এবং তাহা আমার শিরায় শিরায় তরঙ্গ তুলিতেছে। এই বৈদ্যুতিক অবস্থায় উপর হইতে স্ত্রী গলা বাড়াইয়া কঠোর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সেখানে কি করিতেছ?" উত্তর—"কালীমাই দর্শন করিতেছি।" তারাচরণ উচ্চৈঃস্বরে উপরের প্রাঙ্গণ হইতে হাসিয়া উঠিল। আমিও স্বপ্নোত্থিতের মত উপরে উঠিতে লাগিলাম। সঙ্গিনী কানে কানে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কি তোমার স্ত্রী?" উত্তর শুনিয়া বলিলেন—"তুমি আজ কোন মতে কি এখানে থাকিতে পার না?" উত্তর—না। আমার পৃষ্ঠে হাত দিয়া বলিলেন,—"প্রতিজ্ঞা কর, তুমি শীঘ্র আবার আসিবে।" আমি বলিলাম—"চেষ্টা করিব।" উপরে উঠিলে পত্নী তীব্রদৃষ্টিতে সঙ্গিনীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"তুমি এ মাতাল মাগীকে কোথায় পাইলে?" উত্তর—"বিন্ধ্য মাই যোটাইয়াছেন। ইনি তাঁহার পাণ্ডা।" বিন্ধ্যবাসিনী আমাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিলেন, এবং যখন আমরা মন্দিরের পশ্চাতে শৈলসানুতে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে বিন্ধ্যাচলের অবর্ণনীয় শোভা দেখিতেছিলাম, তিনি তারাচরণকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া আমার সমস্ত পরিচয় লইলেন এবং আত্মপরিচয় দিলেন। আসিবার সময় তারাচরণ পশ্চাৎ হইতে আমাকে ইঙ্গিত করিলে আমি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। তখন তারাচরণ আসিয়া কানে কানে বলিল—"এ মাগী ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে। সে একজন পাণ্ডার কন্যা। এ রাত্রি এখানে থাকিতে বড় অনুনয় করিতেছে।" আমরা পশ্চাতে পড়িয়াছি দেখিয়া স্ত্রী দাঁড়াইয়া বলিলেন—

"আপনারা কি কথা বলিতেছেন?" তারাচরণ বলিল—"এ ব্রাহ্মণকন্যা আপনাকে আজ রাত্রে এখানে থাকিয়া প্রসাদ লইয়া যাইতে বলিতেছে।" স্ত্রী বলিলেন—"আপনারা দুজন আগে যান।" আমরা হুকুম তামিল করিলাম। কর্ত্রী ঠাকুরাণী প্রহরীর কার্য্য করিতে পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে লাগিলেন। আর সেই বিন্ধ্যবাসিনী?—যত দূর দেখা যাইতেছে, সোপান-শিরে মদিরালস স্থির নয়নে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। আমি আর বিন্ধ্যাচলে যাই নাই, কিন্তু আজও যেন তাহাকে দক্ষ শিল্পীর নির্ম্মিত স্বর্ণ-প্রতিমূর্ত্তির মত চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি। পরে তারাচরণের কাছে শুনিলাম, সেখানে কয়েক পরিবার তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ আছে। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর হইতে সুরাস্রোতে ভাসিয়া সমস্ত রাত্রি নরনারী বীভৎস কাণ্ড করিয়া থাকে।

বিন্ধ্যাচল হইতে প্রয়াগে (এলাহাবাদে) যাই। বন্ধু তারাচরণ তখন এলাহাবাদে একজন প্রতিপত্তিশালী কবিরাজ। তাঁহার পরিচিত একজন রেলওয়ে কণ্ট্রাক্টর মহাশয়ের বাড়ীতে দুইদিন রাজসুখে থাকিয়া এলাহাবাদ দর্শন করি। তাঁহার আদর ও যত্নের কথা মনে হইলে চক্ষে জল আসে। আজ তিনিও স্বর্গে। শ্রীভগবান্ তাঁহার পরিবারকে সুখে রাখুন। এলাহাবাদ পশ্চিম রাজ্যের রাজধানী এবং কলিকাতা অপেক্ষা সুন্দর ও পরিষ্কার নগর। ইহার রাস্তাগুলি বড়ই সুন্দর। আর দেখিবার স্থান—দুর্গশোভিত ; গঙ্গা যমুনার, ভারতের জ্ঞানের ভক্তির, আশা নিরাশার সম্মিলন। গঙ্গা জ্ঞানপ্রবাহিণী,—ব্যাসদেবের বদরিকাশ্রম হইতে জ্ঞানপ্রবাহ বহিয়া আনিতেছেন, এবং যমুনা ভক্তিপ্রবাহিণী—বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ-প্রেম-লীলামৃত বহিয়া আনিতেছেন। সম্মিলনের পর জ্ঞান ও ভক্তি কিছুদূর শ্বেত ও নীল স্রোতে জ্ঞান ও ভক্তির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া, পরে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্ম্মে মিশিয়া এবং নবদ্বীপ হইতে গৌরপ্রেমে বর্দ্ধিত হইয়া সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে। বঙ্কিমবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, এই গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম যে না দেখিয়াছে, তাহার মানবজীবন বৃথা।

প্রয়াগ হইতে মথুরায় যাই, এবং 'বাবুঘাটে'র পার্শ্বে এক দ্বিতল গৃহে দুইদিন অবস্থান করি। মথুরায় দেখিবার যোগ্য বর্ষাশেষের ভরা যমুনা ; যমুনাতীরস্থ বিশ্রাম ঘাটের সান্ধ্য আরতি, এবং সেই সময়ে বানর ও কচ্ছপের কৌতুক-যুদ্ধ। যাত্রীরা ছোলা, খই ইত্যাদি ঘাটে ছড়াইতে থাকে। তাহা খাইবার জন্য কূর্ম্মাবতার সকল—এক একটি এত বৃহৎ যে, কূর্ম্মাবতারই বটে—যমুনার গর্ভ হইতে ঘাটে আসিয়া উঠে, এবং তাহাদের পৃষ্ঠের উপর বানর সকল বৃক্ষ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, সেই ছোলা ও খই লইয়া কাড়াকাড়ি আরম্ভ করে, এবং একটা কৌতুক-যুদ্ধ অভিনয় করে। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া এই ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম 'বিশ্রামঘাট'। তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্মস্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির ও তাহাতে একটি কৃষ্ণমূর্ত্তি আছে। মথুরাতে তাঁহার আর কোনও চিহ্ন বা আর কিছু দেখিবার নাই। তবে ভাগবতের "বস্ত্রহরণ" উপাখ্যানের তাৎপর্য্যটা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ঘাটে অবগাহন করিতেছি। একটি গৌরাঙ্গী রূপবতী সালঙ্কারা যুবতী কলসীকক্ষে আসিয়া, কলস ঘাটের উপর রাখিয়া, আমার পার্শ্বে জলে নামিলেন, একপ্রকার অর্দ্ধবিবসনা হইয়া ও আকণ্ঠ জলে নিমজ্জিত হইয়া গাত্র মার্জ্জন ও অবগাহন করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্ন-রবিকর যমুনার নির্ম্মল সলিলে প্রবেশ করিয়া রমণীর সমস্ত অঙ্গে প্রতিভাত হইতেছিল। রমণীর বরাঙ্গের 'কনকসম্ভবা বিভা' কালিন্দীর নীলিমায় মিশিয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। ঘাটে কেবল আমি নহি, বহু নর এবং এরূপ বহু নারী স্নান করিতে-ছিলেন। রমণীদিগের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী স্নান করিয়া উঠিয়া গেলেন। স্ত্রী ঘাটের একপার্শ্বে একটি আবৃতস্থানে স্নান করিতেছিলেন। সেখানে কেবল মহিলারা মাত্র স্নান করেন ; স্থানটির উপর একটি বিস্তৃত বৃক্ষশাখার ছায়া। আমি উঠিয়া স্ত্রীকে ডাকিতে সে দিকে যাইয়া দেখি, সেই ঘাটেও মাথুরী যুবতীরা স্নান

করিতেছেন। কেহ জলে, কেহ স্থলে, কিন্তু সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা! তাঁহাদের বস্ত্র সেই বৃক্ষশাখায় ঝুলিতেছে। এক উলঙ্গিনী ঘাটের উপর দাঁড়াইয়া, আমার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি স্ত্রীকে উঠিয়া আসিতে বলিয়া মুখ ফিরাইলাম। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইনি কে?" উত্তর,—"আমার স্বামী।" প্রশ্ন—"ইনি আমাদের উলঙ্গিনী দেখিয়া কি কিছু মনে করিতেছেন?" উত্তর—"তোমাদের দেশের নিয়ম। কি মনে করিবেন?" আমি মনে করিলাম যে, তিনি এতক্ষণে বসনে লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন। আবার মুখ বাড়াইয়া দেখি, তাঁহারা সকলে সেইরূপ উলঙ্গিনী ভাবে জলে ও ঘাটে দাঁড়াইয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন। স্ত্রী উঠিয়া আসিলে, তাঁহাদের উচ্চ হাসি ও রসিকতা শুনিতে শুনিতে আমরা চলিয়া আসিলাম। এই কুৎসিত প্রথা নিবারণের জন্য কি কিশোর শ্রীকৃষ্ণ সেই 'বস্ত্রহরণ' অভিনয় করিয়াছিলেন? তিনি একাধারে ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজ্য-সংস্কারক।

মথুরা হইতে বৃন্দাবন যাই, এবং দুইদিন কেশীঘাটে এক ব্রাহ্মণের কুঞ্জে থাকি। বৃন্দাবনে প্রত্যেক বাড়ীর নাম 'কুঞ্জ'। প্রবাদ, এ ঘাটে কেশী দানবকে কৃষ্ণ বধ করিয়াছিলেন। তাহা করুন, কিন্তু কুঞ্জে প্রবেশ করিয়াই কুঞ্জাধিকারী ব্রাহ্মণের অগ্নিশিখার মত যে তিনটি সুকেশী যুবতী কন্যাকে দেখিলাম, তাহাতে কৃষ্ণ কেশী দানবকে বধ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বাস হইল না। ইহাঁরা এবং ইহাঁদের বৃদ্ধ পিতা আমাদিগকে বড়ই যত্ন করিলেন। আমরা সায়াহ্ন সময়ে পৌঁছিয়াছিলাম। সেই সন্ধ্যায় দুইএক মন্দিরে আরতি দেখি। পরদিন সমস্ত বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া তাহার সুন্দর মন্দিরাবলী দর্শন করি। এ সকল মন্দিরের বনই বর্ত্তমান বৃন্দাবন। প্রত্যেক মন্দিরে অতিশয় সমারোহে পূজা, আরতি ও অপরাহ্নে ভাগবত পাঠ, এবং কোথায় বা কালাওতি সঙ্গীত হইয়া থাকে। প্রাতঃস্মরণীয় লালবাবুর মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রাঙ্গণে একটি স্বর্ণ-তালবৃক্ষ আছে। তমাল না হইয়া তালই বা কেন? সর্ব্বপেক্ষা লক্ষ্ণৌর শেঠের মন্দিরই সুন্দর। উহা শ্বেত মর্ম্মরে নির্ম্মিত। লোকটি বৈরাগীর মত মুণ্ডিতমস্তকে প্রাঙ্গণের এক কোণায় বসিয়া থাকেন। তিনি একজন প্রকৃত ভক্ত। মন্দিরসোপানে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, যেন ভক্ত যাত্রীদের পদধূলি তাঁহাদের মস্তকে পড়ে। শুনিলাম, তিনি এরূপ ভাবে মৃৎপাত্রে মল মূত্র ত্যাগ করেন যে, বৃন্দাবনের পবিত্র মাটি স্পর্শ না করাইয়া উহা বৃন্দাবনের সীমার বাহিরে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তিনি একজন অসাধারণ ধনী। এ মন্দিরের সমস্ত উৎসব বড় সমরোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সমস্ত দিনের নগর-ভ্রমণ-শ্রমে সেই রাত্রিতে আমার খুব জ্বর হয়। আমি পরদিন আর বাহির হইতে পারি নাই। ব্রাহ্মণের প্রথমা কন্যা মধ্যমবয়স্কা। দ্বিতীয়া কন্যা যুবতী, এবং তৃতীয়া কন্যা নবযুবতী। শেষ দুইটির রূপের তুলনা নাই, এবং ইহারা যেরূপ সুন্দরী, সেইরূপ সরলা ও স্নেহপ্রতিমা। ইহারা দুজনে সেইরাত্রি বহুক্ষণ ও সমস্ত পরদিন এবং অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্ত আমার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করে নাই। মধ্যমা এবং তাঁহার পিতাও প্রায়ই মধ্যে মধ্যে আসিয়া দেখিতেছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা দুটির স্নেহে ও শুশ্রূষায় আমার রোগশয্যা যেন সুখশয্যা হইয়াছিল। তাঁহাদের সেই সরল ও অকৃত্রিম স্নেহের কথা মনে হইলে আমার চক্ষু এখনও সজল হয়। তাঁহাদের গৃহকার্য্য ফেলিয়া আমার কাছে বসিয়া থাকিতে আমি কত প্রকারে নিষেধ করিতেছিলাম। তাঁহারা সকল যাত্রীকে এরূপ দেবকন্যার মত স্নেহ করিয়া, কেমন করিয়া কুঞ্জের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন জিজ্ঞাসা করিলে দুইটি সলজ্জভাবে নীরব থাকিতেন। ব্রাহ্মণ বলিতেন—"সকলের সঙ্গে কি আর এরূপ করে? তোমার উপর তাহাদের কেমন বিশেষ স্নেহ হইয়াছে। তোমার মত লোক যাত্রীর মধ্যে কয় জন থাকে? স্নেহ করিবে না কেন?" আমি কে, কি করিয়াছি, তাঁহারা ত আমার কিছুই

জানেন না। আসিবার সময় আমরা ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া কন্যাদের কাছে বিদায় লইতে চাহিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন, তাহারা কক্ষে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। স্ত্রী গিয়া তাহাদের জড়াইয়া লইয়া আসিলেন। তাঁহারা সত্য সত্যই কাঁদিতেছিলেন। ব্রাহ্মণ বলিল—"এখন বুঝিলে, তোমাদের উপর তাহাদের কিরূপ মমতা জন্মিয়াছে।" তাঁহারা বলিলেন—"আপনি এবার বড় কষ্ট পাইয়া পীড়িতাবস্থায় যাইতেছেন। অতএব প্রতিজ্ঞা করুন যে, আর একবার শীঘ্র বৃন্দাবনে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন থাকিবেন।" ভূতলে রমণীহৃদয়ই স্বর্গ। বুঝিলাম, হৃদয়ের এই প্রেমপ্রবণতায় বৃন্দাবন-বাসিনীরা শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন, এবং ভারতের ধর্ম্মেতিহাসে এরূপ নিষ্কাম প্রেমের জন্যই তাঁহারা পূজিতা।

গোবর্দ্ধন

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাক্ষেত্রের মধ্যে কেবল গোবর্দ্ধনই আমার চক্ষে সেই লীলার দৃশ্য প্রকটিত করিয়াছিল। বৃন্দাবন হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে আমরা একদিন প্রাতে গোবর্দ্ধন দর্শনে যাত্রা করি। স্মরণ হয়, বৃন্দাবন হইতে গোবর্দ্ধন ছয়মাইল ব্যবধান। রাস্তাটি বড়ই সুন্দর। উভয় পার্শ্বের বৃক্ষে ও ক্ষেত্রে ময়ূর ময়ূরী বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। অদূরে গোবর্দ্ধন গিরি যেন সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গুলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া ভূগর্ভে, ধসিয়া গিয়াছে। তাহার এক প্রান্ত প্রায় ভূমির সঙ্গে সমতল, এবং অন্য প্রান্ত অনুচ্চ গিরির মত উচ্চ। বোধ হয়, যেন একটি বৃহৎ অজগর ফণা তুলিয়া স্থিরভাবে রহিয়াছে একটি মাত্র হ্রদ (lake) লইয়া গোবর্দ্ধন তীর্থ। এই হ্রদটি বড়ই মনোহর। ইহার মধ্যে সলিলরাশি-বেষ্টিত এবং তরুরাজিসমাচ্ছন্ন একটি মন্দির। হ্রদের চারিদিকে মধ্য-ভারতের ভূপতিবৃন্দের দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা। তাহাদের প্রতিবিম্ব পূর্ণ বর্ষার হ্রদবক্ষে প্রতিফলিত হয়। শুনিলাম, বর্ষাকালই মথুরা, বৃন্দাবন ও গোবর্দ্ধনের বসন্ত। তখন এই হ্রদ ও যমুনা আতীব পূর্ণ হইয়া পরম শোভা ধারণ করে। শুনিয়াছি, সে সময়ে নানাবিধ ফুল ফোটে, কোকিল ডাকে, এবং সদ্য বর্ষাবিধোত বনপ্রকৃতি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। গোবর্দ্ধন স্থানটি নীরব, নির্জ্জন, শান্তিপ্রদ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা ধ্যান ও ধারণা করিবার এমন স্থান আর বুঝি দ্বিতীয় নাই। মথুরা বৃন্দাবন আমার প্রাণে বিশেষ ভক্তির সঞ্চার করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কাব্য পাঠ করিয়া যে মথুরা বৃন্দাবনের দৃশ্যাবলি মানসপটে অঙ্কিত হইয়াছিল, বরং এখনকার মথুরা বৃন্দাবন না দেখিলেই ভাল ছিল। কিন্তু গোবর্দ্ধনের যে দিকে দেখিয়াছিলাম, সেই দিক্‌ই সেই মধুর লীলার স্মৃতিতে আমার প্রাণ মাতাইয়া তুলিয়াছিল।

এ সকল স্থানে বানরের যেরূপ অত্যাচার, তাহাতে এই শাখামৃগ মহাশয়েরা উৎপাতী লোকের আদিপুরুষ হইবার উপযুক্ত। স্মরণ হয়, দীনবন্ধু মিত্র লিখিয়াছেন—

"পাহারা বিহনে জুতা রাখা নাই যায়।"

তাহা ঠিক। আর রাখিলে—

"এক লম্ফে জুতা নিয়া গাছে গিয়া চড়ে ;
খিচুয়ে পোড়ার মুখ দাঁত বার করে।"

তাহাও ঠিক। মথুরা বৃন্দাবনে কাষ্ঠাসনবিহারী বানর মহাশয়েরা কতবারই এরূপে আমাদের জুতা, কাপড় ও আহার্য্য সামগ্রী লইয়া গাছে চড়িয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, এবং কিছু বলিলে দলে বলে ভ্রুকুটি করিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। জাতীয় সঙ্গীত আছে—

"অগণিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল।"

শাখামৃগ মহাশয়েরা এই হরণ-বিদ্যায় মন্ত্রসিদ্ধ। তাঁহারা এমনি ভাবে হরণ করেন যে,

কিছুই অনুভব হয় না। গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া ক্লান্তভাবে একটি অট্টালিকার দ্বিতল অলিন্দে বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা দেখিতেছি। একহাতে একখানি দৈনিক ইংরাজি সংবাদপত্র অন্যহস্তে কিছু জলযোগ। অকস্মাৎ অলক্ষিতে এক হনুমানের বংশধর কোথা হইতে আসিয়া তাঁহার স্পর্শকোমল করে মুহূর্ত্তমাত্র আমার দুটিহাত ধরিলেন, এবং তাঁহার অন্য কুলতিলক আমার সংবাদপত্রখানি ও জলযোগের পাত্রটি হরণ করিলেন। এই কার্য্যটি এমনি যাদুকরের মত করিলেন যে, তাঁহারা কখন আসিলেন, কখন গেলেন, কেমন করিয়া আমাকে এরূপ আপ্যায়িত করিলেন, তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না। দুই করে কি যেন শীতল প্রেমস্পর্শ অনুভব করিলাম। পরমুহূর্ত্তে দেখিলাম, দুই মহাপুরুষ মস্তকোপরে উচ্চ বৃক্ষশাখায় কাষ্ঠাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া আমার দুঃখে সঞ্চিত মুখের আহার আনন্দে উদরস্থ করিতেছেন।

প্রত্যাবর্ত্তনপথে আগ্রায় কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকিয়া, সেই "মর্ম্মরের স্বপ্ন" তাজমহল দর্শন করিয়া বেহার ফিরিলাম।

প্রতিযোগী পরীক্ষা
(Competitive Examination)

ইংরাজ রাজত্বের রাম বা রিপন (Ripon) অধীন শাসন-বিভাগের (Subordinate Executive Service) উন্নতির জন্য লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। লেঃ গবর্ণর ইডেন তাহার অর্দ্ধেক টাকা "অধীন বিচার বিভাগের" (Subordinate Judicial Service) জন্য বরাদ্দ করিলে, গয়া হইতে জনৈক আশৈশব বন্ধু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমার লেখনী (able pen) ধারণ করা উচিত বলিয়া বিশেষ অনুরোধ-পূর্ণ এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রের সঙ্গে সংস্রব ছিল বলিয়া চট্টগ্রামে আমি যে বিপদে পতিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সংবাদপত্রে লেখার নামে আমার হৃৎকম্প হইত। চট্টগ্রাম হইতে পুরী যাইবামাত্র "ইণ্ডিয়ান মিরার" দৈনিকে পরিণত হয়, এবং বন্ধু কৃষ্ণবিহারী সেন উক্ত পত্রের বেতন-ভোগী লেখক হইতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। বেহারে আসিবামাত্র গুরুপ্রসাদ বাবু 'বেহার হেরল্ডে' (Behar Herald) সপ্তাহে এক প্রবন্ধের জন্য একশত টাকা বেতন দিতে চাহেন। ঘরপোড়া গরু সিন্দুরে মেঘ দেখিলেও ভয় পায়। আমি উভয় প্রস্তাব অস্বীকার করিয়াছিলাম। অতএব বন্ধুকেও লিখিলাম যে, আমি সংবাদপত্রে আর লিখিব না বলিয়া "তোবা" করিয়াছি। কিন্তু তাহারপর আমার কর-কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইল। সংবাদপত্রে যেরূপ কাগজে লিখিতাম, সেরূপ কাগজে লিখিতেছি দেখিয়া স্ত্রী বলিলেন—"এত বিপদেও তোমার শিক্ষা হইল না। তুমি আবার খবরের কাগজে লিখিতেছ?" তিনি এ বিষয়ে বড় সাবধান থাকিতেন। আমি বলিলাম—"সুপারিসে এবং তৈলমর্দ্দনে ডেপুটি নিযুক্ত হইয়া আমাদের 'সার্ভিস'টা একেবারে ঘৃণিত হইয়া উঠিতেছে। ইডেন সাহেবের সময়ে তাঁহার প্রিয় আর্দ্দালীর বংশধরগণ পর্য্যন্ত ডেপুটি হইতেছে বলিয়া লোকে বলিতেছে। কত কলঙ্কের কথা উঠিতেছে ঠিক নাই। অতএব লর্ড রিপন যে ডেপুটিদের উন্নতির জন্য নূতন বন্দোবস্ত করিতে চাহিতেছেন, এই উপলক্ষ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষার দ্বারা ভবিষ্যতে ডেপুটি নিযুক্ত করিবার ঔচিত্য দেখাইয়া কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব স্থির করিয়াছি।" স্ত্রী তাহাও নিষেধ করিলেন। আমি কিন্তু করকণ্ডুয়ন নিবারণ করিতে পারিলাম না। প্রথম প্রবন্ধ 'ষ্টেটস্‌মেন' (Statesman) পত্রে বাহির হইবামাত্র আমার সেই, গয়াস্থ বন্ধু লিখিলেন যে, আমি লিখিতে অসম্মত হওয়াতে উক্ত প্রবন্ধটি তিনি লিখিয়াছেন, এবং উহা কেমন হইয়াছে, আমার মত জিজ্ঞাসা করিতেছেন! আমি অবাক্! পত্র পড়িয়া হাসিতেছি, স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—বিষয় কি? আমি বন্ধুর লীলার কথা বলিলে, তিনিও বড়

হাসিলেন। হাসিলাম ত, কিন্তু বন্ধুকে উত্তর কি দিব? সে দিনের 'ষ্টেটস্‌ম্যেন' খুলিয়া দেখি যে, আমার দ্বিতীয় প্রবন্ধও প্রকাশিত হইয়াছে। অগত্যা বন্ধুকে লিখিলাম—"বটে! এ প্রবন্ধ তোমার লেখা! তবে দ্বিতীয় প্রবন্ধ যে তাহারপর প্রকাশিত হইয়াছে—কে লিখিল?" তিনি বোধ হয় বুঝিলেন যে, ধরা পড়িয়াছেন। আর কিছু লিখিলেন না। এ দিকে 'ষ্টেটস্‌মেনে' ক্রমশঃ বহু প্রবন্ধ এ সম্পর্কে বাহির হইল। শেষ প্রবন্ধে আমি 'ষ্টেটস্‌মেনে'র সম্পাদককে সুপারিস্ প্রণালীর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়া আমার পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমাকে লিখিলেন—"আপনার প্রবন্ধগুলি এমন বিচক্ষণ হইয়াছে (your articles have been so very able) যে, এ সম্বন্ধে আমার, কি আপনার আর কিছুই লিখিবার প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ সার্ভিসের লোক না হইলে সার্ভিস সম্বন্ধে লেখা বড় সহজ নহে।" তখন আমার হাতে আরও একটি প্রবন্ধ ছিল। প্রতিযোগী পরীক্ষা ভিন্ন শাসনপ্রণালীর উন্নতির জন্য আমি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলাম, তাহাতে যে ব্যয় বৃদ্ধি হইবে, তাহা কুলাইবার উপায় এ সম্বন্ধে দেখাইয়াছিলাম। উহা 'ইণ্ডিয়ান মিরারে' পাঠাইয়া দিই এবং তাহাতে প্রকাশিত হয়।

তাহার কিছুদিন পরে পূজার বন্ধ উপলক্ষ্যে আমি কলিকাতায় বেড়াইতে গিয়া দেখি যে, সেই প্রবন্ধগুলি লইয়া ডেপুটি ও দেওয়ানি মহলে একটা ঝড় উঠিয়াছে। আমি এক বন্ধুর গৃহে বসিয়া আছি, সেখানে সেই গয়ার বন্ধু একপাল ডেপুটি লইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"দাদা! তা—বাবু আপনাকে দেখিতে চাহেন।" কেন? উত্তর—"তাঁহার বিশ্বাস যে, 'ষ্টেটস্‌মেনে'র প্রবন্ধগুলি আপনার লেখা।" আমি বলিলাম—"তবে আমি যাইব না। তিনি প্রবন্ধলেখককে খুঁজিয়া বাহির করুন। আমি একবার সংবাদপত্রের লেখক বলিয়া বিপদে পড়িয়া প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি। তুমি এরূপ কথা বলিয়া কি আমাকে আরও বিপদে ফেলিতে চাহ?" সেইদিনের পরিচিত জনৈক ডেপুটি বলিলেন—"যখন প্রথম প্রবন্ধ বাহির হয়, আমরা সার্ভিসের দুইজন লোককে লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছিলাম—আপনি ও যাদব। কিন্তু দ্বিতীয় পত্র যখন বাহির হইল, তখন তাহার রসিকতা (humour) দেখিয়া বুঝিলাম, এ লেখা আপনার ভিন্ন আর কাহারও হইতে পারে না।" আমার প্রথম পত্র বাহির হইলে একজন মুন্সেফ ক্ষেপিয়া তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, অর্দ্ধেক টাকা মুন্সেফদের সার্ভিসে দিয়া ইডেন উচিত বিচার করিয়াছেন; কারণ, ডেপুটির অপেক্ষা মুন্সেফের খাটুনি একঘেয়ে (Monotonous) ও অনেক বেশী। আমি লিখিয়াছিলাম যে, মুন্সেফ যদি একটুক অপেক্ষা করেন, তিনি দেখিবেন যে, আমি উভয় সার্ভিসের উন্নতির কথা নিরপেক্ষভাবে লিখিব। তবে তাঁহার তর্কের উত্তরে কেবল এই কথা বলিলেই হইবে যে, এই তর্ক অনুসারে মুন্সেফ অপেক্ষা মুন্সেফের পাখাটানা কুলির বেতন অধিক হওয়া উচিত। কারণ, পাখাটানার মত এমন একঘেয়ে পরিশ্রমের কার্য্য আর জগতে নাই। মুন্সেফ এই চড় খাইয়া চুপ করেন। ডেপুটিবাবু এই রসিকতার উল্লেখ করিতেছিলেন। তাঁহার কথার উত্তরে বলিলাম যে, সার্ভিসে বঙ্কিমবাবুপ্রমুখ আমার অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর লোক ও লেখক আছেন। তাঁহারা বলিলেন যে, বঙ্কিমবাবু কখনও সংবাদপত্রে এরূপ বিষয়ে লেখেন না। তখন সপ্তরথীর ন্যায় তাঁহারা চারিদিক্ হইতে আমাকে আক্রমণ করিয়া, সেই সকল প্রবন্ধের লেখক বলিয়া আমাকে স্বীকার করাইতে চেষ্টা করেন। আমি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত ডেপুটি গিয়া আমাকে রাস্তার উপর বলিলেন—"আমি আপনাকে লেখক বলিয়া স্বীকার করিতে বলি না। কিন্তু যদি আপনি লেখক হন,—আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই—তবে প্রবন্ধগুলি দৈনিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে বিলীন হইতে না দিয়া যদি পুস্তকাকারে ছাপান, তাহা হইলে আমাদের সার্ভিসের বড় উপকার হইবে।" "কি উপকার?" তিনি বলিলেন—তাহা হইলে তাঁহারাই উহা এরূপ ভাবে

বিলাইবেন যে, 'তাহাতে গবর্ণমেণ্টের চক্ষু পড়িবে।

আমি এত ভীত হইয়াছিলাম যে সেখান হইতে আমি একেবারে 'ষ্টেটস্‌মেন' আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন মিঃ রিয়াক (Riach) খুব দক্ষতার সহিত রবার্ট নাইটের অনুপস্থিতিতে 'ষ্টেটস্‌মেন' চালাইতেছেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। আমার চট্টগ্রামের গোলযোগ উপলক্ষ্যে মিঃ নাইটকে চিনিতাম, এবং তাঁহার কাছে তাহার পরও অনেক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহার আফিস হইতে উক্ত প্রবন্ধের লেখক বলিয়া আমার নাম বাহির হইয়াছে, মিঃ রিয়াককে অনুযোগ করিলে তিনি বলিলেন—তাহা অসম্ভব। ডেপুটি-দের আমাকে আক্রমণের কথা বলিলে তিনি বলিলেন—"তাঁহারা বোধ হয়, আপনার লেখার ভঙ্গি জানেন, এবং তাহার দ্বারা আপনাকে লেখক বলিয়া স্থির করিয়াছেন।" আমি বলিলাম যে, তাঁহারা প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে ছাপিতে বলিয়াছেন। মিঃ রিয়াক বলিলেন, —বেশ কথা, তিনি তাঁহার প্রেস হইতে ছাপিয়া দিবেন। তাহার ব্যয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, আমার কিছুই দিতে হইবে না। কারণ, সে প্রবন্ধগুলির দ্বারা বিশেষতঃ ডেঃ মাজিষ্ট্রেট সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অনেক গ্রাহক বাড়িয়াছে। অতএব তিনি বিনা মূল্যে আহ্লাদের সহিত ছাপিয়া দিবেন। ইহা বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু আপনারা বন্ধুরা কেন ছাপিতে বলিতেছেন?" আমি—তাঁহারা বলেন, তাহা হইলে প্রবন্ধগুলির উপর গবর্ণমেণ্টের চোক পড়িবে।" তিনি—"যদি তাহাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে ছাপিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, গবর্ণমেণ্টের চোক এ প্রবন্ধগুলির উপর পড়িয়াছে এবং এই মুহূর্ত্তে লর্ড রিপন ও মেজর বেয়ারিঙ্গের দ্বারা প্রবন্ধগুলি বিবেচিত হইতেছে।" কি!—বলিয়া আমি চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমি মনে করিলাম, বুঝি আবার আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"আপনার কোনও ভয় নাই। লেখক কে, গবর্ণমেণ্ট জানেন না। তবে প্রবন্ধগুলি এত দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে যে, আপনি শীঘ্র দেখিবেন যে, আপনার প্রস্তাব কোনও না কোনরূপে কার্য্যে পরিণত হইবে।" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি তাহা কিরূপে জানিলেন?" তিনি আবার হাসিয়া বলিলেন—"আপনি এইমাত্র আপনার নাম আমার আফিস হইতে বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছিলেন। অথচ এখন আপনি চাহিতেছেন যে, আমি অন্য একজনের নাম আপনার কাছে প্রকাশ করি।" আমি লজ্জিত হইয়া চলিয়া আসিলাম।

তাহার কিছুদিন পরে বেহারে বসিয়া দেখিলাম, প্রথমতঃ ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কেরানিদের জন্য, তাহারপর পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট, তাহারপর পশ্চিমাঞ্চলের গবর্ণমেণ্ট, তাহারপর বোম্বে ও মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট, সর্ব্বশেষ বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ডেপুটিদের জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষা (Competitive Examination) প্রচলিত করিলেন। এই বিশবৎসর যে ডেপুটিরা এই পরীক্ষার দ্বারা নিযুক্ত হইয়াছেন, সকলেরই আমাকে কিছু দক্ষিণা (royalty) দেওয়া উচিত। প্রবন্ধগুলি এখনও আছে। ইচ্ছা আছে, চাকরি হইতে বিজয়া করিয়া, সংবাদপত্রে লিখিয়া অন্যান্য রাশি রাশি প্রবন্ধ সহ পুস্তকাকারে ছাপিব। প্রথমতঃ সাতআট জন করিয়া ডেপুটি কলেক্টর প্রতিবৎসর এই পরীক্ষার দ্বারা নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে ক্রমে মাত্রা হোমিও-পেথিক মাত্রায় পরিণত হইয়া, এখন ভারতশত্রু লর্ড কার্জ্জন উহা একেবারে উঠাইয়া দিয়াছেন। মুরুব্বিয়ানা এমনই মিষ্ট! আবার সুকতলার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, দুঃখ নাই। এ পরীক্ষার পথে যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দেখিয়া প্রতিযোগী পরীক্ষার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আমিই নিরাশ হইয়াছি। ইহাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইংরাজী শিক্ষায় এতদূর উন্নত ছিলেন না, কেহ কেহ ইংরাজি মোটেই জানিতেন না। তথাপি তাঁহাদের উদারতা, সৎসাহস, সহানুভূতি, পরার্থপরতা, আত্মসম্মান-জ্ঞান, পদোপযোগী ব্যয় ও উচ্চ অঙ্গের ভদ্রতা ইহাঁদের কাছে নাই।

অবস্থা, না বিধাতা ?

একদিন বেহারে গৃহের হল কক্ষে প্রাতে বসিয়া আছি, বেলা ৮টা, অকস্মাৎ চট্টগ্রামের পরিচিত একটি লোক উপস্থিত। কোথায় চট্টগ্রাম, কোথায় বেহার! তাহাকে দেখিয়া তাহার এতদূর আগমনের কথা বিস্ময়-বিস্ফারিতনয়নে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, বড় গোপনীয় কথা। অন্য দর্শক আসিলে বিদায় দিতে আর্দালিকে আদেশ দিয়া আমি তাহার কথা শুনিতে বসিলাম। সে আমার একজন আশৈশব বন্ধুর নাম করিয়া বলিল যে, তাহার বাসার নিকট একটি লোক সপরিবারে বাস করিত। বন্ধু এবং সে উভয়ে বিক্রমপুরের লোক। বন্ধু আমার সুন্দর, সুশিক্ষিত, তেজস্বী, পরোপকারী, সরলহৃদয় সদাশয়। তিনি চট্টগ্রামের একজন খ্যাতনামা কর্ম্মচারী। তাঁহার প্রতিবেশী সকল বিষয়ে তাঁহার বিপরীত। বন্ধু তাহার পত্নীর চক্ষে পড়িলেন। সে উন্মাদিনীর মত তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তিনি কুরূপা, স্থূলাঙ্গিনী ও পঞ্চ শিশুর মাতা। বন্ধু তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কৃতকার্য্য হইলেন না। তাহার স্বামীকে স্থানান্তর যাইতে বলিলেন। কিন্তু স্ত্রী যাইবে না। শেষে নিজে টাকা দিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। সে সীতাকুণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিল। তখন আমার বিপদের কর্ত্তা ও বিশ্বাসঘাতক বন্ধু নন্দী ভৃঙ্গ উভয়ে চট্টগ্রাম হইতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন, কিন্তু ভুজঙ্গ মহাশয় আছেন, এবং তাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব। তিনি ভুজঙ্গ জাতিতে সমস্ত আফিস পরিপূর্ণ করিতেছেন। কিন্তু আমার বন্ধু শ্রীপাটের হইলেও তিনি চট্টগ্রামের লোকের একমাত্র আশ্রয়স্থল। কারণ, তাঁহার জন্ম, শিক্ষা ও জীবন চট্টগ্রামের সঙ্গে জড়িত। এই কারণে, তিনি ভুজংগ মহাশয়ের প্রকোপে পড়িয়াছেন। ক্রমে উপরোক্ত কাহিনী ভুজঙ্গের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার প্রতিযোগীর নিপাতের জন্য, এবং চট্টগ্রামে নিষ্কণ্টক বিক্রমপুরীর আধিপত্য স্থাপনের জন্য ব্রহ্মাস্ত্র জুটিয়াছে। তিনি একদিন অপরাহ্নে দলে বলে তাঁহার সমস্ত কিষ্কিন্ধ্যা লইয়া পবননন্দনের মত যষ্টি-স্কন্ধে সেই সাধ্বী রমণী-রত্নকে উদ্ধার করিতে গেলেন। তাহাকে বলপূর্ব্বক এক পাল্কীতে উঠাইয়া, পাল্কী দলে বলে বেষ্টন করিয়া চলিলেন, আর সে তাহার প্রণয়ীর নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া এক একবার পাল্কী হইতে রাস্তায় পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং তাহার উদ্ধারকর্ত্তাদের পিতৃপুরুষদের জন্য নানারূপ অখাদ্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। চট্টগ্রাম হাসিতে তোলপাড় হইল। কিন্তু এরূপ বীরত্বের সহিত উদ্ধারের পরও সাধ্বীকে গৃহে রাখা অসাধ্য হইল। তখন তাহাকে বন্দিনী করিয়া বিক্রমপুরে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু পাখী সেখানেও শিকল কাটিল। তখন নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের মধ্যে ষ্টীমার চলিত। সতী গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া ষ্টীমারের সারেঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন। লোকটা ভুজঙ্গ মহাশয়ের অপেক্ষা রসিক ছিল। সে তাহাকে এক মশারি-আবৃতা করিয়া চট্টগ্রামে একবারে বন্ধুর গৃহের পার্শ্বস্থ রাস্তায় লইয়া তাঁহাকে সংবাদ ছিল। তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রমণী তাঁহার পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। তথাপি তিনি তাহাকে সেখানে মুহূর্ত্ত তিষ্ঠিতে না দিয়া স্থানান্তর করিলেন। এদিকে বিক্রমপুর হইতে প্রেম-প্রয়াণের সংবাদ ভুজঙ্গচন্দ্রের কাছে উপস্থিত হইল। তিনি "অবলেপী মহাজিহ্ন" বন্ধুবরকে দংশন করিতে ছুটিলেন। আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। কপিসৈন্য সজ্জিত হইল। রমণীর সেই পুরুষ-রত্ন স্বামীর দ্বারা সতীহরণের মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। কোথায় সূর্য্যবংশ, আর কোথায় অল্প-বিষয়-মতি কালিদাস! কোথায় বিক্রমপুর, আর কোথায় চট্টগ্রাম। তিনি সেখান হইতে ছুটিয়া আসিয়া এই গরীবের ঘাড়ে পড়িলেন, আর অপরাধ হইল তাহার! ঠাকুরাণী এখন বন্ধুর নীলকণ্ঠের বিষ হইয়া উঠিলেন। সে তাঁহাকে গিলিতেও পারে না—গিলিতে চাহেও না।—অথচ ফেলিতেও পারে না। সে তাহাকে রাখিলে, এবং উহা অপর

পক্ষ জানিতে পারিলে, তাহার ঘোরতর বিপদ্। আর তাহাকে না রাখিলেও সে অপর পক্ষের হস্তগত হইয়া তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে তাঁহার আরও ঘোরতর বিপদ্। অতএব তাহাকে কিছুকাল চট্টগ্রামে লুকাইয়া রাখিয়া ভয়ে পশ্চিমে পাঠাইয়া দিয়াছেন, এবং আমার এলেকার মধ্যে কোথাও লুকাইয়া রাখিতে পারা যায় কি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন। স্ত্রীলোকটিকে একটি খাটুলি করিয়া আনিয়া এ লোকটি আমার রান্নাঘরের সম্মুখে রাখিয়া আসিয়াছে শুনিয়া আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আমি বলিলাম, আমার এলেকায় একটিও বাঙ্গালী স্ত্রীলোক নাই। যেখানে রাখিবে, সেখানেই একটা গোলযোগ হইবে। অতএব এ অঞ্চলে তাহাকে লুকাইয়া রাখা অসম্ভব। এমন সময়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে উঠিয়া গিয়া দেখি, স্ত্রী 'হাওজে' বা কৃত্রিম পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছেন। বেহারে গৃহ-সংলগ্ন বড় একটি মনোহর 'হাওজ' ছিল। একটা ক্ষুদ্র পাকা পুষ্করিণী, তাহার উপর চারিদিকে গবাক্ষপূর্ণ দুই হস্ত-পরিমিত প্রাচীর এবং তাহার উপর খাপরার চাল। পার্শ্বস্থ ইন্দারা হইতে উহা আগ্রীবা জলপূর্ণ করিয়া রাখা হইত। আমি তাহাতে স্থানে স্থানে নানারূপ আসন প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলাম। কোথায় আকণ্ঠ জলে বসিয়া, কোথায় অর্দ্ধশায়িত হইয়া, কখন বা সন্তরণ করিয়া পতি পত্নী ত্বক্‌দগ্ধকারী গ্রীষ্মে জলক্রীড়া করিতাম। দেখিলাম, একটি স্থূলাঙ্গিনী, শ্যামবর্ণা, মধ্যমবয়স্কা রমণী স্ত্রীর সঙ্গে অবগাহন করিতেছে। সে ইতিমধ্যে খাটুলি হইতে উঠিয়া স্ত্রীর কাছে আসিয়াছে। বেহারে একটি বাঙ্গালী মহিলা পাইয়া স্ত্রীর আনন্দের সীমা নাই; পরিচয় দিলে স্ত্রীর আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তিনি জিব কাটিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রমণীর সঙ্গে কালো পাথরের মূর্ত্তির মত একটি পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্র। পতি পত্নী পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম, তাহাকে ও তাহার সঙ্গীকে আহারেরপর এখান হইতে বিদায় দিতে হইবে। আহারান্তে স্ত্রী আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন যে, সে যাইবার পূর্ব্বে তোমার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ করিতে চাহে। সে বলে—"শুনিয়াছি, কবি বড় রসিক, আমি তাহাকে আর একবার না দেখিয়া যাইব না।" স্ত্রী অপূর্ব্ব বিক্রমপুরী সুর করিয়া কথা কয়টা বলিলেন। ইতিমধ্যে সে আপনি আসিয়া স্ত্রীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন তাহাকে আরও দেখিবার অবসর পাইলাম। দেখিলাম যে, তাহার শরীরে রূপ কি যৌবনের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, তাহার উপর লজ্জাও নাই। সঙ্গের হতভাগ্য শিশুটিকে দেখিয়া আমার বড় দয়া হইয়াছিল। আমি তাই তাহাকে আহার পর্য্যন্ত থাকিতে দিয়াছিলাম। কিন্তু ইতিমধ্যে পাপিষ্ঠা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে শিশুটিকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করিতেছিল, এবং শিশু এরূপ নীরবে তাহা সহিতেছিল—স্ত্রী বলিলেন যে, তাহা দেখিলে পাষাণও দ্রব হইবে। আমি তাহাকে বলিলাম যে, তাহার আর বিলম্ব করা উচিত নহে। এ অঞ্চলে তাহার থাকিবার স্থান হইবে না। সে কিছুতেই যাইবে না। শেষে শিশুটিকে আর একবার খুব প্রহার করিয়া খাটুলিতে উঠিল। তাহারা চলিয়া গেলে আমার যেন নিশ্বাস পড়িল। স্ত্রী বলিলেন, পাপীয়সী চারিটি ছেলে ফেলিয়া আসিয়াছে। এটিকেও মারিয়া ফেলিবে। পরে শুনিয়াছিলাম, সে তাহাই করিয়াছিল। রমণী যে এমন রাক্ষসী হইতে পারে, আগে বিশ্বাস করিতাম না। পাপীয়সী আমার একটি পরম বন্ধুকে এরূপ বিপদস্থ করিয়াছে। অথচ তাহার সর্ব্বাঙ্গে তজ্জন্য কোনও ভয় কি চিন্তার চিহ্ন মাত্র দেখিলাম না। সে স্নান করিয়া, বহুক্ষণ সাজসজ্জা করিয়া, তাহারপর আমার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা করিতে আসিয়াছিল। পরে শুনিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গী তাহাকে কিছুদিন পাটনায় লুকাইয়া রাখিয়া, পরে কাশী লইয়া গিয়াছিল।

এদিকে বন্ধুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। নাগসৈন্যের কেহ সাক্ষী হইয়াছে, কেহ সাক্ষী সৃষ্টি করিতেছে, এবং সকলে মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মোকদ্দমার ব্যয় নির্ব্বাহ

করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা ভুজঙ্গ নিজে কমিশনর, কলেক্টর ও জইণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যন্ত সকলেরই মন অপূর্ব্ব পরদারের আখ্যায়িকা প্রস্তুত করিয়া বিষাক্ত করিয়াছেন। চট্টগ্রামে একটা ঘোরতর আন্দোলনের কোলাহল উঠিয়াছে। বন্ধু প্রত্যহ আমার কাছে উত্তরের জন্য টাকা জমা দিয়া (Reply prepaid) একাধিক দীর্ঘ দীর্ঘ টেলিগ্রাম করিয়া পদে পদে আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গদলের ভয়ে চট্টগ্রামের কেহ তাঁহার কাছে পর্য্যন্ত যাইতেছে না। তাঁহার একমাত্র সহায় আমার খুড়তত ভাই রমেশ। সে বন্ধুর দ্বারা নিয়োজিত একটি ক্ষুদ্র কেরানী। শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, এবং তাহার চাকরির আশা বিসর্জ্জন করিয়া সে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। পরামর্শ মাত্র করিবেন, তাঁহার এমন বন্ধু এখন চট্টগ্রামে কেহ নাই। সেজন্য প্রত্যহ কেবল আমার কাছে টেলিগ্রামে তাঁহার পঞ্চাশ ষাইট টাকা খরচ হইতেছিল। বলা বাহুল্য, মোকদ্দমা কিছুমাত্র প্রমাণ না হইলেও ভুজঙ্গের ষড়যন্ত্রে উহা সেসনে অর্পিত হইল।

কি একটা বন্ধ উপস্থিত হইল। রমেশ কাগজপত্র লইয়া কলিকাতায় আসিল। কলিকাতায় গিয়া মনোমোহন ঘোষকে নিযুক্ত করিতে বন্ধু আমাকে টেলিগ্রাফের পর টেলিগ্রাফ করিতে লাগিলেন। আমি কলিকাতায় গিয়া এক নিশ্বাসে সমস্ত কাগজ পাঠ করিলাম। আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল যে, এরূপ মোকদ্দমা সেসনে অর্পিত হইয়াছে। আমি বন্ধুকে টেলিগ্রাফ করিলাম যে, এরূপ মোকদ্দমা একজন সামান্য উকিল চালাইলেও তিনি মুক্তিলাভ করিবেন, অতএব বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মনোমোহনকে পাঠাইবার কিছু প্রয়োজন নাই। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। রমেশ বলিল—অনুমান পনেরশত টাকা চাঁদা চট্টগ্রামের লোকেরা বন্ধুর পক্ষে তুলিয়াছে। কিন্তু তাহাতে মনোমোহন ঘোষ যাইবেন কেন? তথাপি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া কাগজপত্র রাখিয়া আসিলাম। পরদিন তাঁহার কাছে গেলে তিনিও আমাকে বলিলেন যে, তিনি কাগজপত্র পড়িয়া বিস্মিত হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, আমি নিজে একজন ম্যাজিস্ট্রেট, আমি কি বুঝিতে পারিতেছি না যে, আমার বন্ধুর বিপক্ষে কোনও প্রমাণ নাই। অতএব এরূপ মোকদ্দমায় তাঁহাকে পাঠাইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। আমি বলিলাম—আমি তাহা বুঝি, কিন্তু আমার বন্ধু বুঝিতেছে না। সে বিপন্ন: তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে যে, তিনি না গেলে এ ক্ষমতাবান্ ষড়যন্ত্র হইতে তাহার উদ্ধার নাই। তিনি তখন বলিলেন যে, তিনি সাতহাজার টাকার কম যাইতে পারিবেন না। অতএব বলিলেন, লালমোহনকে লইলে, কিম্বা আনন্দমোহনকে লইলে অল্প টাকায় চলিবে। অনেক সাধনায় তাঁহাকে সম্মত করিতে না পারিয়া, শেষে আমি কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলাম যে, আমি চট্টগ্রাম হইতে তাঁহাকে অনেক টাকা দেওয়াইয়াছি, ভবিষ্যতেও আমি ও আমার বন্ধু দেওয়াইতে পারিব। তিনি কি একটি মোকদ্দমা আমাদের অনুরোধে অল্প টাকায় লইবেন না? আমাকে দুঃখিত ও বিরক্ত দেখিয়া তিনি সম্মত হইলেন, এবং যথাসময়ে চট্টগ্রামে গেলেন। আমি সেই তক্ষক মহাশয়ের জন্য এক বহি জেরা লিখিয়া পাঠাইলাম। তাহাতে তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তি-কাহিনী উদ্ঘাটিত হইত। তিনি নিজে একজন প্রধান সাক্ষী ছিলেন। কারণ, যষ্টি স্কন্ধে করিয়া তিনিই একবার সেই সতী-উদ্ধার করিয়াছিলেন। আমি যত জেরা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম, মনোমোহন তাহার চতুর্থাংশও জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি পদে পদে এই নিশিত জেরাস্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে জজের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছিলেন। জজ তাঁহাকে বলিলেন যে, বিবাদী অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বিপন্ন বোধ হইতেছে। কোর্টে লোকারণ্য। সকলের সহানুভূতি বিবাদীর প্রতি। কারণ, সকলে এই মোকদ্দমার ভিতরের কথা, এবং উহা যে ভুজঙ্গ-চক্রের শত্রুতা হইতে উত্থিত, এবং বন্ধুর চট্টগ্রামবাসীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব যে সেই শত্রুতার কারণ, তাহা সকলে জানিত। অতএব চারিদিকে হাসির টিটকারী চাপা শব্দ হইতেছে। বিবাদীর স্থানে দাঁড়াইয়া বন্ধু

পর্য্যন্ত হাসিতেছেন। এরূপ অবস্থায় জজের উপহাস শুনিয়া কাল সর্প কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন জজ মিঃ ঘোষকে বলিলেন যে, এরূপ অবস্থায় সাক্ষীকে তাঁহার দয়া ও ক্ষমা করা উচিত। মনোমোহন বলিলেন—জজ যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তিনি সাক্ষীকে অব্যাহতি দিলেন, যদিও তাঁহার জেরার চতুর্থাংশ মাত্র হইয়াছে। কাচারি হইতেই মনোমোহন এ সকল কথা আমাকে এক দীর্ঘ টেলিগ্রাফ দ্বারা অবগত করাইলেন। পরদিন আর দুই একজন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর জজ বন্ধুকে অব্যাহতি দিলেন। মিঃ ঘোষকে একটি কথাও কহিতে হইল না। চট্টগ্রামব্যাপী একটা আনন্দের ধ্বনি উঠিল। মনোমোহন যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ হইয়াছিল যে, ভুজঙ্গ মহাশয় বেনামি চিঠির দ্বারা পর্য্যন্ত চট্টগ্রামবাসীদের সরাইয়া তাহাদের স্থানে তাঁহার এক ডজন সর্পবংশীয় আত্মীয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সাক্ষ্যের সে অংশ উদ্ধৃত করিয়া "তাঁহার একরার" (Confession) নাম দিয়া "হিন্দু পেট্রিয়টে" প্রকাশিত করি। তাহাতে তাঁহার পতন ও বদলি হয়, এবং চট্টগ্রামে জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া সর্পবংশ নির্ম্মূল হয়। আমি তাঁহাকে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে বিশ্বাস ও স্নেহ করিতাম। আর তিনি আমার গ্রীবা ছেদন করিয়া এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভগবানের নীতি অলঙ্ঘনীয়। আমি সেই বিপদের পর হাসিতে হাসিতে চট্টগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম, আর চট্টগ্রামের সকল লোক কাঁদিয়াছিল। আর তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে চট্টগ্রাম ছাড়িলেন। আর চট্টগ্রামের লোক হাসিতেছিল।

চট্টগ্রামবাসীরা এই মোকদ্দমার জন্য তিনহাজার টাকা চাঁদা তুলিয়াছিলেন। মনোমোহনকে তাহা দেওয়া হইল। ইহাতে আমার নিজের চাঁদা ও খরচ পাঁচশত টাকার উপর হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন বন্ধুবর এরূপ মুক্তহস্তে ইহাতে টেলিগ্রাম ইত্যাদিতে টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং তিনি এরূপ অকাতরে দান করিতেন, এবং নিজে বাবুগিরি করিতেন যে, লোকের মনে সন্দেহ হইল যে, তিনি কোনওরূপে ট্রেজারির টাকা ভাঙ্গিতেছেন। ইহার কিছুদিন পরে আমি ছুটি লইয়া বাড়ী গেলে বন্ধুবর একদিন আমাকে তাঁহার গৃহে অতিথি করিয়া বড় আগ্রহের সহিত রাখিলেন। দুজন পাশাপাশি শুইয়া আছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি ট্রেজারির টাকা ভাঙ্গিতেছেন বলিয়া লোকে সন্দেহ করিতেছে। তিনি বলিলেন—"লোকে যাহা বলুক, তুমি সবডিভিসনাল অফিসার, নিত্য ট্রেজারির কাজ করিতেছ, তুমি কি জান না যে, টাকার সঙ্গে আমার কাজের কোনও সম্পর্ক নাই। অতএব আমি কেমন করিয়া টাকা ভাঙ্গিব।" তাহার পর তিনি আমাকে বলেন, লোকে তাঁহার যেরূপ খরচ বিবেচনা করে, তাঁহার তাহা নাই। তাঁহার গাড়ী ঘোড়া একজন রেঙ্গুনের সদাগর দিয়াছে এবং তাহার মাসিক খরচটাও সে দেয়। কারণ, তিনি তাহার চট্টগ্রামের জমিদারি ইত্যাদি দেখেন। তাঁহার পরিচ্ছদ সামান্য লংক্লথ মাত্র, তবে নিত্য একছুট পরেন, এই মাত্র। তাঁহার কোনও বহুমূল্য পরিচ্ছদ নাই। আহার—আমি তাঁহার বাড়ীতে একদিন কাটাইলাম, তাহাতে বুঝিতেছি যে, তাঁহার আহার মোটা চাউলের ভাত মাত্র। তিন তাহাই গোগ্রাসে, গিলেন। এরূপ ভাতের এতবড় গ্রাস কাহাকেও খাইতে আমি বাস্তবিকই দেখি নাই। তাঁহার সমস্ত উত্তর আমার কাছে সঙ্গত বোধ হইল এবং আমার সন্দেহ দূর হইল। তাহারপর তাঁহার ভূতপূর্ব্ব বিপদ্ স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহার পরিবার সঙ্গে রাখিতে আমি বিশেষ অনুরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, উহা অসম্ভব। তিনি অনেকবার চেষ্টা করিয়াছেন, পারেন নাই। তাঁহার শ্বশুরকুল ডাকাত বলিয়া পরিচিত এবং স্ত্রীও একটি ডাকাতবিশেষ। একে ত ক্রোধে একজন "চণ্ডীবতী চণ্ডিকা", তাহাতে আবার "ছুঁচ-রোগ"-গ্রস্ত। ঘরের জিনিষপত্র দিনে শতবার ধোয়াইবে, এবং গৃহে শতবার গোবর দিয়া পালঙ্গ ট্রাঙ্ক ইত্যাদি পর্য্যন্ত গোবরাক্ত করিয়া রাখিবে। দুইদিন সঙ্গে থাকিলে চাকর সমস্তই পলায়ন করে। তাহাতে বন্ধুও তাঁহার অপেক্ষা ঈশ্বরেচ্ছায় গোঁয়ার কম নহেন। এরূপ দুই

অগ্নির সংঘর্ষণে গৃহে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে একটা অগ্নিকাণ্ড হয়। কিছুদিন এরূপ হইলে চণ্ডিকা শিশু পুত্র কন্যা লইয়া ছুটিয়া একবারে শ্রীপাট বিক্রমপুরে গিয়া দাখিল হন। ব্রাহ্মরা তাঁহার মত লোকের স্খলিত চরিত্র উপলক্ষ্যে উপদেশ দিলে তিনি বলিতেন—"ভাই! নিজের স্ত্রী ত সঙ্গে রাখিতে পারি না, যদি তোমাদের স্ত্রী আমাকে দেও, তবে আমি রাজি আছি।" হতভাগ্যের অমৃতময় জীবন এই একবিন্দু বিষে—পত্নীর উগ্র চরিত্রে, বিষাক্ত হইয়া, শেষে একটা শোকাত্মক নাটকে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার পারিবারিক জীবনের শোচনীয় কাহিনী কহিতে কহিতে বন্ধু অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমিও সেই অশ্রুতে অশ্রু না মিশাইয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি পতি-পত্নী উভয়ের হৃদয় এরূপ ক্রোধপরায়ণ না হইত, যদি উভয়ের মধ্যে একজনেরও কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য থাকিত, তাহা হইলে দুইটি জীবন এরূপ ভস্মে পরিণত হইত না।

ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম, বন্ধু ছুটি লইয়া গিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। ছুটি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার কোনও খবর নাই। কলেক্টর তাঁহাকে এত ভালবাসিতেন ও বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি বলিলেন যে, বন্ধুর কোনও গুরুতর পীড়া হইয়া থাকিবে। দুইচারিদিন পরে হইলেও তাঁহার সংবাদ আসিবেই। কিন্তু সপ্তাহ চলিয়া গেল। দেশে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল যে, তিনি পলায়ন করিয়াছেন। তথাপি কলেক্টর তাঁহার গৃহে পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিলেন। বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিলেন না। বলিলেন, আরও কিছু-দিন অপেক্ষা করিয়া দেখিবেন। কই—ট্রেজারির কোনও হিসাবেও ত কিছুই গোলযোগ বাহির হইতেছে না। অগত্যা আর একদিন তাঁহার গৃহে গিয়া, তাঁহার বাক্স সিন্দুক ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করিলে এক বাক্সে, সেভিং বেঙ্কে যাহারা টাকা আমানত করিয়াছে, তাহাদের অনেকের পাশ-বহি পাইলেন। এ সকল বহি আমানতকারীদের হাতে থাকিবার কথা। তাহারা ইহাঁর বাক্সে কোথা হইতে আসিল? তখন তদন্তে এক অদ্ভুত ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িল।

চট্টগ্রামের লোক তাঁহাকে এরূপ বিশ্বাস করিত যে, সেভিং বেঙ্কে টাকা আমানত করিয়া পাশ-বুকও তাঁহার কাছে রাখিয়া আসিত। মনে কর, রাম দুইশত টাকা আমানত করিয়াছে। তিনি দুইশত টাকার পাশ-বহি রামকে দিতেন, কিন্তু কলেক্টরীতে তাহার নামে একশত টাকা মাত্র জমা দিয়া, অবশিষ্ট একশত টাকা একজন অপ্রকৃত শ্যামের নামে জমা দিয়া রাখিতেন। তাঁহার ইচ্ছামত তিনি এই শ্যামের নামের জমা হইতে টাকা লইতেন এবং রামের একশত টাকার বেশী আবশ্যক হইলে, তাহাকে এই শ্যামের নামের, কি অন্য এরূপ জাল নামের জমা হইতে দিতেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি এই খেলা খেলিতেছিলেন। তাঁহার পলায়নের পর অডিট আফিস পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তিনি এরূপে পনরবৎসরে ষাটহাজার টাকা ট্রেজারি হইতে ভাঙ্গাইয়াছিলেন। কত কলেক্টর, কত ডেপুটি কলেক্টর গিয়াছেন, কেহই তাহা টের পান নাই। কেহ যদি আমানতকারীর হাতের পাশ-বহির সঙ্গে কখনও ট্রেজারির সেভিং বেঙ্কের জমা-খরচ মিলাইয়া দেখিতেন, তবে এ চতুরতা অবশ্য ধরা পড়িত। কিন্তু সকলে ইহাঁকে এত বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করিতেন যে, কেহ তাহা করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের কাহারও কাহারও অর্থ দণ্ড দিতে হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের হিসাবের এমন কড়াকড়ি যে, তাহাতে একটা চুল চালাইবার ফাঁক নাই। তাহার ভিতর হইতে এরূপ ভাবে এতকাল এতটাকা বাহির করিয়া লওয়া সামান্য কৌশলের কার্য্য নহে। তাঁহার তীক্ষ্ন বুদ্ধি ও চতুরতার প্রশংসা শত্রু মিত্র সকলেই করিতে লাগিল। তিনি যাবৎজীবন এ খেলা খেলিলেও কেহ ধরিতে পারিত না। ধরা পড়িবার একটা বিশেষ কারণ হইল। গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিলেন যে, অতঃপর সেভিং বেঙ্কের কার্য্য পোষ্ট আফিসের হস্তে যাইবে। এখনও পোষ্ট আফিসেই আছে। বন্ধু তখন বুঝিলেন যে, পোষ্ট আফিসে হিসাব বুঝাইয়া দিতে গেলেই

তাঁহার কৌশল ধরা পড়িবে। এখন তিরোধান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অতএব তিনি ছুটি লইয়া সরিয়া পড়িলেন। তিনি এমনই লোকপ্রিয় ছিলেন যে, ষ্টীমারে যাইবার সময়ে সহর ভাঙ্গিয়া লোক তাঁহার পশ্চাতে গিয়াছিল। কেবল সামান্য ধুতি ও চাদর পরিয়া ও সামান্য চটি মাত্র পায়ে দিয়া তিনি একা হাসিতে হাসিতে চলিয়া যান। তিনি যে ভাবে গিয়াছিলেন, কেহ এখনও বিশ্বাস করে না যে, তিনি একটি পয়সাও লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বাক্স ভাঙ্গিলে কলেক্টর তাহার মধ্যে এক তালিকাসম্বলিত সমস্ত আমানতকারীর পাশ-বহি সজ্জিতভাবে লাল ফিতায় বাঁধা পান। এ সকল বহিতে যে কতটাকা আমানত করিয়াছিল ও উঠাইয়া লইয়াছিল, তাহার ঠিক হিসাব ছিল। কাজেই কাহারও একটি পয়সাও ক্ষতি হইল না। ইহাদের সমস্ত টাকা গবর্ণমেণ্টের দিতে হইল। বন্ধু বরাবর বলিতেন যে, মারিতে হয় পুলিসকে মারিবেন, চুরি করিতে হয় গবর্ণমেণ্টের ট্রেজারি হইতে চুরি করিবেন। কাজে তাহাই করিলেন। পনরবৎসরে ষাটহাজার টাকা লইয়াছেন বলিয়া অডিটার স্থির করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বের আর হিসাবই করিতে পারিলেন না। কিন্তু দেখা গেল যে, উক্ত মোকদ্দমার পূর্ব্বে তিনি টাকা ভাঙ্গেন নাই। সেই মোকদ্দমাতেই তিনি অধিকাংশ টাকা ভাঙ্গেন এবং তাহার পরেও সে অভ্যাস রাখেন। মানুষের কর্ত্তব্যের বাঁধ একবার ভাঙ্গিলে তাহা আবার বাঁধা বড় শক্ত। তিনি বিনা দোষে সেই মোকদ্দমাগ্রস্ত হইয়া বিপদস্থ না হইলে কখনও এ পথের পথিক হইতেন না, এবং একটি এমন লোকের এই পরিণাম ঘটিত না। তিনি এরূপ সদাশয়, তেজস্বী, লোকহিতপরায়ণ ও লোকপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁহার পলায়ন-সংবাদে চট্টগ্রামের সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত একটা হাহাকার উঠিয়াছিল। কত লোক কাঁদিয়াছিল। আমানতকারীরা বলিতেছিল, যদি তিনি এ বিপদের কথা তাহাদের বলিতেন, তাহারা ক্ষতি স্বীকার করিয়া যাহার নামে যত টাকা ট্রেজারিতে আছে, তাহা সত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। আমার কাছে অশ্রুপাত করিতে করিতে কত লোক এরূপ আক্ষেপ করিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—অবস্থা, না বিধাতা? অনেক সময়ে অনিচ্ছায় অজ্ঞাতসারে মানুষ কোন অবস্থাবিশেষের এরূপ খর স্রোতে পতিত হইয়া, তাহাতে তৃণের মত ভাসিয়া যায়। বিধাতা করেন কি না, জানি না ; কিন্তু অবস্থা যে মানুষের ভাগ্য গঠিত করে, তাহা অনেক সময়ে দেখিতে পাই। মানুষ মাত্রেই অবস্থার দাস।

বেহারের উৎপাত ॥ ১। পুত্রের পীড়া

একমাত্র সন্তান শিশুপুত্র নির্ম্মলকে দুইবৎসরের লইয়া বেহার গিয়াছিলাম। পূজার পূর্ব্বে বেহারে গিয়া শীত বেশ কাটিল। গ্রীষ্মের সময়ে তাহার জ্বর ও উদরাময় হইল। সেখানে প্রথম শ্রেণীর একজন এসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন ছিলেন। তিনি যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে রোগ গুরুতর হইয়া উঠিল। প্রায় পনরকুড়িদিন এরূপে গেল। কিছুই উপশম হইল না। এক শিশুকে পদ্মায় ভাসাইয়া দিয়া আসিয়াছি। আমাদের দুশ্চিন্তায় অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত শুষ্ক হইল। একদিন হঠাৎ সন্ধ্যার সময়ে ডাক্তারবাবু বলিলেন যে, রোগ তাঁহার চিকিৎসার অতীত হইয়াছে, শিশুকে তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় লইয়া যাওয়া উচিত। মাথায় বজ্র পড়িল। কয়েকদিন যাবৎই আমাদের আহার নিদ্রা ছিল না। কিন্তু এ দারুণ কথা শুনিয়া দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িল। যেন জীবনের সকল আলো নিবিয়া গেল ; সংসার অন্ধকার হইল। তথাপি বুকে পাথর চাপা দিয়া, শিশুকে লইয়া দুই পাল্কীতে পতি পত্নী কলিকাতায় যাত্রা করিলাম। ডাক্তারবাবু তৃতীয় পাল্কীতে সঙ্গে যাইবেন। তিনি এমন সময় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বড় বিপদ, তাঁহার স্ত্রী খুনাখুনি আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাকে কোনও মতে যাইতে দিবেন না।

আমাকে নিজে একবার গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইতে বলিলেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলাম, এবং আমার হৃদয়ের সেই শোচনীয় অবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিলাম, তাহাতে একখানি পাষাণও দ্রব হইত। কিন্তু তাঁহার পত্নীর মন কিছুতেই গলিল না। তাঁহার বাড়ী আমি পুলিস দিয়া ঘিরিয়া রাখিব বলিলাম, কয়েকজন নিকটস্থ জমিদার ইতিমধ্যে আসিয়া প্রহরী হইবেন বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার ভীষণ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হইল না। ডাক্তার-বাবুটির বিলক্ষণ দক্ষিণ হস্তের রোগ ছিল। লোকের বিশ্বাস, তিনি অনেক টাকা বেহারে ফৌজদারী মোকদ্দমায় সাক্ষীর দ্বারা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নীর টাকা পয়সা গহনা আমি ট্রেজারিতে রাখিতে পর্য্যন্ত চাহিলাম। কিন্তু তিনি তথাপি সম্মত হইলেন না। ডাক্তারবাবুকে ধরিয়া বসিয়া আছেন, এবং বলিতেছেন—এক পা সরিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। ডাক্তারবাবু শেষে অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি তারস্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পুত্র-কন্যারাও রোদন আরম্ভ করিল। রমণী যে এমন হৃদয়শূন্যা ভীষণ পশু হইতে পারে, আমি জানিতাম না। কিন্তু আমার বোধ হইল, তিনি একটি মস্তিষ্কহীনা (idiot) রমণী। অথচ তিনি একটি বড় ঘরের মেয়ে। শেষে ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আপনি অগ্রসর হউন, আমি আসিতেছি।" আমি ফিরিয়া আসিলাম। নিরুপায় হইয়া শিশুকে সম্মুখে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সে যেন আমাদের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছিল, এবং তাহার সেই দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে ঈষৎ হাসিয়া ও আমাদের চক্ষে হাত বুলাইয়া যেন শান্তি দিতে চেষ্টা করিতেছিল। তাহাতে আমাদের হৃদয় যেন আরও ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে ডাক্তারবাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন—"মরে মরুক! মহাশয় চলুন!" সকলে পাল্কীতে উঠিলাম, এবং শিবিকা তিনখানি দ্রুতবেগে বেহার নগরের সীমা পর্য্যন্ত না যাইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—ইহার বয়স বার কি চৌদ্দ বৎসর—উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিতেছে—"বাবা, তুমি গেলে মা গলার দড়ি দিয়া মারিবে।" ডাক্তারবাবু আবার পুত্রকে লইয়া গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। ঠিক এমন সময়ে মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। বেহারে এমন বর্ষণ আমি দেখি নাই। দেখিলাম, এই বৃষ্টিতে শিশুকে লইয়া যাওয়াও মহাবিপদের কথা। অতএব বিপদভঞ্জনকে ডাকিতে ডাকিতে আবার গৃহে ফিরিলাম, এবং পতি পত্নী দুজনে শিশুর শয্যার উভয় পার্শ্বে বসিয়া অশ্রুজলে তাহার বিছানা সিক্ত করিয়া রাত্রি কাটাইলাম। চারিটার সময়ে ডাক্তারবাবু আসিয়া বলিলেন—"মহাশয়! চলুন। মরে মরুক!" কিন্তু তখন গিয়া ট্রেন পাইবার সম্ভাবনা নাই। বাহকদেরও বিদায় দিয়াছি। তখন তিনি শিশুকে দেখিয়া বলিলেন—"এখন ইহার অবস্থা অনেক ভাল। আমি আর দুইএকদিন চিকিৎসা করি। না হয়, তাহারপর কলিকাতায় যাইব।" তখন আবার আশায় বুক বাঁধিলাম। শিশুও যেন ডাক্তারের আশ্বাসবাণী বুঝিল। আমাদের আরও হাসিমুখে ডাকিতে লাগিল, এবং ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বলিতে লাগিল, সে ভাল হইয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপায় সে সত্য সত্যই ক্রমশঃ ভাল হইয়া উঠিল। কিন্তু পরের বৎসর গ্রীষ্মের সময়ে আবার সেরূপ রুগ্ন হইয়া পড়িল। ডাক্তারবাবুর আদর্শ পত্নীর কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমরা বড়ই চিন্তিত হইলাম। এমন সময়ে একজন মুসলমান হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া শিশুকে একবার দেখিতে চাহিল, এবং দেখিয়া ও লক্ষণ শুনিয়া তিনদিন মাত্র চিকিৎসা করিতে চাহিল। ডাক্তারবাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার কথা শুনিয়া হাসিয়া আকুল। তিনি বলিলেন, গুড্‌হিব চক্রবর্ত্তী বলিতেন যে, কলিকাতায় এক ফোঁটা ঔষধ গঙ্গায় ফেলিয়া দিয়া, গঙ্গাসাগরে গিয়া একঢোক জল খাওয়া যাহা, হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাও তাহা। তবে তিনদিন মাত্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কি আশ্চর্য্য! তিনদিনে শিশু প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল। ডাক্তারবাবু তৃতীয় দিবসে তাহাকে খুব পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া

বলিলেন—"মহাশয়! এ কি! এ কি যাদু! এ যে সত্য সত্যই তিনদিনে ভাল করিয়া দিল! হোমিওপ্যাথিটা শিখতে হবে।" আমার সেই অবধি হোমিওপ্যাথির উপর শিশুর চিকিৎসার জন্য অচলা ভক্তি হয়, এবং হোমিওপ্যাথির বাক্স সঙ্গে রাখিয়া ইহার পর, শুদ্ধ আমার শিশুর নহে, অনেক শিশুর রোগ নিজে চিকিৎসা করিয়াছি। হোমিপ্যাথির কল্যাণে নির্ম্মলের শৈশব জীবনে আর কোনও গুরুতর রোগ হয় নাই।

২। বেহারের জমিদার ও প্রজা

আমি বেহার যাইবার পূর্ব্বে বহুবৎসর হইতে গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে, বেহারের জমিদারেরা ঘোরতর অত্যাচারী এবং তাঁহাদের অত্যাচারের ফলে তাঁহারা খুব ধনী ও ভোগবিলাসী ; আর প্রজারা নিঃস্ব দরিদ্র, দুইবেলা তাহাদের শাকান্নও জুটে না। সিভিল সার্ভিস শিবাপাল! এক প্রভু যদি কোনও ধুয়া ধরিলেন, তাহা সকলেই তারস্বরে ঘোষিত করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বশেষে গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহা শতকণ্ঠে শতরূপে প্রচারিত হইতে লাগিল। এরূপে এই ধুয়া উঠিয়া কমিশন বসিয়াছিল এবং তাহারপর জমিদারদিগকে নির্য্যাতন করিবার জন্য আইনের কারখানায় ভিন্দিপাল প্রস্তুত হইতেছিল। বেহারে যত সবডিভিসনাল অফিসার গিয়াছেন, ইংরাজ এবং তাঁহাদের প্রসাদভোজী দেশীয়, সকলেরই বাৎসরিক বিজ্ঞাপনীতে সেই এক ধুয়া। আমি বড় সঙ্কটে পড়িলাম। এক শীত বেহারে ঘুরিয়া আসিয়া আমার ঠিক বিপরীত ধারণা হইল। আমি সেই বারের বাৎসরিক রিপোর্টে লিখিলাম যে, বেহারের প্রজা বেহদ্দ দরিদ্র, তাহার আর সন্দেহ নাই : কিন্তু এ দরিদ্রতার কারণ জমিদার নহে। আমি বেহারের ও বাংগলার জমিদারের মধ্যে একটা তুলনায় সমালোচনা লিখিয়া দেখাইলাম যে, বাংগলার জমিদার বৃত্তিভোগীর মত পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাকেন। কিস্তিতে কিস্তিতে কলের মত খাজনা আদায় হইয়া তাঁহার গৃহে আসে। জমিদারির উন্নতি, কি রক্ষার জন্য সিকি পয়সাও খরচ করিতে হয় না। জমিদারি কোথায়, জিনিসটা কি, তাহাও বোধ হয় অনেকে জানেন না। কিন্তু বেহারের জমিদারের অবস্থা তাহার ঠিক বিপরীত। মানুষের যেরূপ সন্তান পুষিতে হয়, ইহাদেরও সেইরূপ জমিদারি পুষিতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে 'আলঙগ' (বাঁধ) গ্রাম বেষ্টন করিয়া বর্ষার জলপ্লাবন হইতে ফসল রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। প্রত্যেক গ্রামে ফসলে জলসেচন করিবার জন্য প্রকাণ্ড 'আহারা' বা ঝিল ও ইন্দারা প্রস্তুত করিতে হয়। এই উভয় না হইলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। অথচ এ সকল প্রস্তুত করিতে বহুঅর্থ ব্যয় করিতে হয়। তাহার উপর বেহারে সুবৎসর অপেক্ষা দুর্ব্বৎসর অধিক। দুর্ব্বৎসরে জমিদার কিছুই পায় না। কারণ, বেহারে নগদ খাজনা নাই বলিলেও চলে। জমিদার ফসলের অংশ মাত্র পায়। ফসল না হইলে কিছুই পায় না। এই কারণে বেহারের জমিদারেরা প্রায় ঋণজালে জড়িত। তাহাদের গৃহের সম্মুখভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। দেখিলে একটা বৃহৎ অট্টালিকা বলিয়া ভ্রম হয়, এবং তাহার পার্শ্বে দরিদ্র প্রজার পর্ণ ও মৃত্তিকাকুটীর দেখিলেই বোধ হয় যে, এই অট্টালিকাই প্রজার দরিদ্রতার কারণ। কিন্তু জমিদার-গৃহের পশ্চাৎভাগ প্রায় সমস্ত মৃন্ময়, এবং প্রজার গৃহ হইতে অভিন্ন। তদ্ভিন্ন তাহাদের পুরুষানুক্রমিক পরিচ্ছদ, এবং দায়-প্রদত্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড "ডালি" দেখিয়া সাহেবেরা তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রান্ত হন। আমি দেখাইলাম, সমস্ত বেহার সবডিভিসনে কেবল দুজন জমিদার ঋণহীন। অন্যদিকে তাহাদের অপেক্ষা তাহাদের 'বাভন', কৌরি, কুর্ম্মি প্রজাদের অবস্থা অনেক স্থলে ভাল। তাহাদের উপর অত্যাচার করিবার ক্ষমতা তাহাদের জমিদারদের নাই।

এই 'সালতামামি' পাটনা পৌঁছিলে কলেক্টরের আফিসে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া যায়।

স্বয়ং আবদুল জব্বর আমার রিপোর্ট পড়িয়া, আমার সাহসের প্রশংসা করিয়া আমাকে পত্র লেখেন। দিনকত পরে পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টবাবুর পত্র পাইলাম যে, কলেক্টর আমার রিপোর্টের এই অংশ তাঁহার 'সালতামামি'তে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, এবং তিনি কমিশনরের 'সালতামামি'তেও উহা উদ্ধৃত করিতেছেন। কিন্তু কমিশনরের উহার জন্য আমার উপর চটিবার সম্ভাবনা। তিনি আরও লিখিয়াছেন, একটা সর্ব্ববাদিসম্মত ও গৃহীত মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া বড় দুঃসাহসের কথা। দুইদিন পরে তাঁহার আর এক পত্র পাইলাম। লিখিয়াছেন—"আশ্চর্য্য! কমিশনরও আপনার মত গ্রহণ করিয়াছেন! আপনি কলেক্টর কমিশনর উভয়কে পূর্ব্বমতত্যাগী (convert) করিয়াছেন বটে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি বলেন, বলা যায় না।" আমি "ত্রাহি ত্রাহি" করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে গবর্ণমেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে সবিস্ময়ে দেখিলাম যে, বেহার সবডিভিসনাল অফিসরের বেহার ও বাংগলার প্রজার ভূম্যধিকারীর তুলনা হৃদয়গ্রাহী (interesting comparison) বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং এ সম্বন্ধে কমিশনরের নিকট হইতে স্বতন্ত্র রিপোর্ট চাহিয়াছেন। ইহার কিছুদিন পরে কমিশনর বেহার পরিদর্শনে আসিলেন। একদিন তাঁহার সঙ্গে আমি অশ্বারোহণে গিরিয়েকের পথে বেড়াইতেছি। ক্ষেত্রে প্রজাগণ ফসল কাটিতেছে। তিনি বলিলেন—"আপনার রিপোর্ট আমার মনে বড় লাগিয়াছে—(I have been remarkably struck) এখন আমারও ধারণা হইয়াছে যে, এ সকল 'বাভন' প্রজারা বাংগলার প্রজা হইতে কোনও অংশে দুর্ব্বল নহে, এবং ইহাদের প্রতি জমিদারের কোনওরূপ অত্যাচার করা অসম্ভব। আশ্চর্য্য যে, এতদিন আমরা এমন একটা মোটা কথা বুঝিতে পারি নাই।" আমি তখন তাঁহাকে দুই একটা গ্রামে লইয়া জমিদারদের অট্টালিকার পশ্চাদ্‌ভাগ দেখাইলাম। প্রজাদের কাছে তাহাদের জমিদারের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিল—"জমিদার ঋণে ডুবিয়াছে। তাহাদের গ্রামের 'আলঙ্গ' ও 'আহারা' জমিদার মেরামত করাইতে না পারাতে তাহাদের ভাল ফসল হইতেছে না।" যতই এরূপ কথা শুনিতে লাগিলেন, ততই কমিশনরের মুখ গম্ভীর হইতে লাগিল। তিনি সেই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে, এবং আমার মতের সমর্থন আমার মুখে শুনিতে শুনিতে শিবিরে ফিরিলেন। তাহার কিছুকাল পরে শুনিলাম যে, জমিদারদের গ্রীবাচ্ছেদের জন্য যে নূতন আইনের বা অস্ত্রের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইতেছিল, তাহা রহিত করা হইয়াছে। শুনিয়া আমি হাঁফ ছাড়িলাম।

৩। ইন্‌কম্‌ টেক্স

"বঙ্গদর্শন" ও ভারতপ্রবাসী এংগলো-ইণ্ডিয়ান সাহেবেরা একবাক্যে বলেন—ইন্‌কম্‌ টেক্স বৃটিশ-চন্দ্রের একমাত্র কলঙ্ক। আর "অমৃত বাজারে"র ভায়ারা বলেন—উহা বৃটিশ-চন্দ্রের প্রকৃত অমৃত। কারণ, টেক্সরাশির মধ্যে এই একটি মাত্র টেক্স ভারতীয় ইংরাজদেরও দিতে হয়। নির্জ্জল, নিরাহার, ক্ষুৎপিপাসা-পীড়িত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের উপর যে অজস্র টেক্স-শরজাল বৃষ্টি হইতেছে, তাহার মধ্যে এই একটি মাত্র অস্ত্র শ্বেতচর্ম্মকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করে। তাই ভারতীয় শ্বেত-সিংহদের এই টেক্সের বিরুদ্ধে এত গর্জ্জন। এই গর্জ্জনে একদিন চতুর কৃষ্ণদাস পাল পর্য্যন্ত ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু চতুরচূড়ামণি, ক্ষুরধার-দৃষ্টি দাদা শিশিরকুমার ঘোষ তাহাতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। এই টেক্স যে এতদিন রহিয়াছে, ইহাও তাঁহার একটি অক্ষয় কীর্ত্তি। তাহা হউক, কিন্তু এই টেক্স লইয়া সময়ে সময়ে ডেপুটি-বর্গকে যেরূপ উৎপীড়িত হইতে হয়, তাহা কেবল ভুক্তভোগীই জানেন। ভাগলপুরের টেক্সের ভার একজন সবডেপুটির উপর ছিল। সবডেপুটি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার "সবত্ব" ঘুচাইয়া, ডেপুটিত্ব প্রাপ্তির একমাত্র উপায় টেক্সবৃদ্ধি। অতএব তিনি সাদা কাপড় দেখিলেই তাহার উপর অস্ত্রত্যাগ করিয়াছেন। ভাগলপুরে একটা হাহাকার পড়িয়াছিল। তাহার তরঙ্গধ্বনি

আমরা বেহার হইতে শুনিতেছিলাম। সংবাদপত্রে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছিল এবং গবর্ণমেণ্টে রাশি রাশি দরখাস্ত যাইতেছিল। শেষে শ্রাদ্ধ এতদূর গড়ায় যে, গবর্ণমেণ্ট সবডেপুটিকে প্রকৃত প্রস্তাবে "শবত্বে" পরিণত করেন—তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু কাজির প্রসিদ্ধ বিচার এখনও লুপ্ত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট কুকুর মারিলেন, কিন্তু হাঁড়ি ফেলিলেন না। সবডেপুটি লীলা সম্বরণ করিলেন, কিন্তু টেক্স রহিয়া গেল তাহার ফলে পাটনা জেলা হইতে ভাগলপুর জেলার টেক্স চতুর্গুণ দেখিয়া, গবর্ণমেণ্ট পাটনার টেক্স কম হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য বাহির করিলেন। কলেক্টর মিঃ মেটকাফ্ বেহারে আসিয়া আমাকে সেই অপূর্ব্ব মন্তব্য শুনাইলেন। আমি তাঁহাকে ভাগলপুরের উপাখ্যান শুনাইলাম, এবং বলিলাম যে, আমি বেহার সবডিভিসনের গ্রামে গ্রামে গিয়া টেক্স পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। টেক্স আমার বেহারে আসিবার পূর্ব্বেই হইয়াছিল। তাহাতে দেখিয়াছি, বরং বৎসর পাঁচশত টাকা আয় নাই, এরূপ বহু লোকের টেক্স হইবার সম্ভব, কিন্তু যাহাদের পাঁচশত টাকার আয় আছে, তাহাদের কেহই এ জাল হইতে বাদ পড়ে নাই। আমি আরও বলিলাম, বেহার যেরূপ দরিদ্রের স্থান, বৎসর যাহার পাঁচশত টাকা আয় আছে, তাহাকে বহুদূর হইতে চিনিতে পারা যায়। মিঃ মেটকাফ্ বড় বাপের বেটা,—তাঁহার পিতা সার্ চার্লস মেটকাফ্ অস্থায়ী গবর্ণর জেনারেল হইয়াছিলেন। তিনি নিজেও বড় সদাশয় লোক। তিনিও আমার কথা স্বীকার করিলেন, এবং তদ্রূপ রিপোর্ট করিলেন। কিন্তু "চোরা নাহি শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" গবর্ণমেণ্ট পরের বৎসর ইনকম্ টেক্সের বার্ষিক বিজ্ঞাপনীতে আবার সেই ধুয়া ধরিলেন,—পাটনায় টেক্স কম হইয়াছে। এবার কমিশনরের সিংহাসন টলিল। স্বয়ং মিঃ হেলিডে বেহারে ছুটিয়া আসিয়া, আমার এজলাসে বসিয়া এই বিষয়ে আমার সঙ্গে দীর্ঘ তর্ক আরম্ভ করিলেন। আমি তাহার কাছেও উপরোক্ত মতে দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিলাম। তিনি বলিলেন—আমি যেরূপ বলিতেছি, মৌলবি আবদুল জব্বরও তাহাই বলেন। ইনি তখন পাটনার ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। মুসলমানের মধ্যে এমন যোগ্য, তেজস্বী নিরপেক্ষ এবং তৈল-মর্দ্দন-ব্যবসায়হীন লোক আমি দেখি নাই। এই অপরাধে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অস্থায়িরূপে কার্য্য করিয়াও স্থায়ী হইতে পারেন নাই। হায় বৃটিশরাজ্য! যে আবদুল জব্বরের বৃটিশরাজ্যে এই দুর্গতি হয়, সেই আবদুল জব্বর ডেপুটিত্ব হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া, ভুপালের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, গবর্ণর জেনারেলের My dear friend (প্রিয়বন্ধু) হন, এবং তাঁহার কৃতিত্বের কথা সেই বন্ধু মহাশয় পর্য্যন্ত শতমুখে গাহিয়াছেন। যাহা হউক, কমিশনর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তবে অন্য অফিসারের দ্বারা তদন্ত করাইতে গবর্ণমেণ্টকে Challenge (কোমর বাঁধিয়া আহ্বান) করিবেন কি না। আমি তাহাই করিতে বলিলাম। তিনি আমার এজলাসে বসিয়াই গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যের এক তীব্র প্রতিবাদ লিখিলেন, এবং আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। গবর্ণমেণ্ট তথাস্তু বলিয়া আমাদের কার্য্য পরীক্ষা করিবার জন্য এক গৌরাঙ্গ অবতার প্রেরণ করিলেন। এ সংবাদ আমাকে আবদুল জব্বরই দিলেন, এবং লিখিলেন, তিনি যুদ্ধে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমাকেও প্রস্তুত হইতে লিখিলেন। শ্বেতমূর্ত্তি পাটনা পরীক্ষা করিয়া বেহারে উপস্থিত হইলে দেখিলাম যে, তিনি মাদারিপুরে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে দেখি নাই। দেখিলাম, বেচারি নিতান্ত ভদ্রলোক। তিনি আমার কাছে আসিয়াই কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। আপনার ও আবদুল জব্বরের মত লোকের কার্য্য পরীক্ষা করা কি আমার কাজ? আমি অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম যে, কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কিছুই শুনিলেন না। জোর করিয়া আমাকে পাঠাইলেন। এখন আবদুল জব্বর আমার উপর চটিয়া লাল। সে আমাকে গুলি করিতে চাহে। মিঃ মেটকাফ্ ও হেলিডেরও আমি চক্ষুঃশূল। এখন আমার উপায় কি বলুন।" আমি বলিলাম, আমি তাঁহাকে চক্ষুও রাঙ্গাইব না গুলিও

করিব না। তিনি যেরূপে ইচ্ছা করেন, সেরূপে আমার কার্য্য পরীক্ষা করিতে পারেন। তিনি বলিলেন, তিনি কেবল বেহার সহর মাত্র পরীক্ষা করিবেন। তাহাই করিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্ণে আমার কাছে আসিতেন, এবং পান কার্য্যটির সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে কি বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা বলিতেন। দশবারদিন এরূপ করিয়া তিনি ছয়সাতজন টেক্সের যোগ্য ব্যক্তি বাহির করেন, এবং তাহাদের উপর দশটাকা করিয়া টেক্স ধরিয়া "নোটিশ" দেন। তিনি যেদিন বেহার হইতে চলিয়া যাইবেন, আপত্তির বিচারের তারিখ সেইদিন দিয়াছিলেন। সেইদিন আপত্তিকারীরা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে আমার কাছে পাঠাইলেন। এ সকল আপত্তি শুনিবার অধিকার আমার নাই বলিয়া আমি সমস্ত আপত্তি তাঁহার কাছে ফেরত পাঠাইলাম। তিনি লাঠি বগলে করিয়া হাসিতে হাসিতে আমার এজলাসে আসিয়া বলিলেন,—"কিছু একটা না করিলে গবর্ণমেণ্ট মনে করিবেন, আমি কিছুই দেখি নাই। চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা,— তাই আমি এই কয়খানি নোটিশ দিয়াছিলাম। এখন আপনার যাহা খুসি করুন, আমি চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি দ্রুতবেগে চলিলেন, আর আপত্তিকারীরা পশ্চাৎ হইতে— "দোহাই সাহেব! দোহাই সাহেব!" করিয়া চীৎকার করিয়া চলিল। আফিস সুদ্ধ লোক হাসিয়া অস্থির। এ সকল আপত্তি আমি কি করিব, কলেক্টরকে জিজ্ঞাসা করিলাম। মিঃ মেটকাফ্ লিখিলেন যে, পরীক্ষক মজকুর পাটনা হইতেও ঐরূপ ভাবে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা এ সম্বন্ধে বোর্ডের আদেশ চাহিয়াছেন। বোর্ড সেগুলিন খারিজ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। আবদুল জব্বরের বাহাদুরি দেখে কে? আমি তাহারপর পাটনা গেলে আমার বোধ হইল যে, তাঁহার ইচ্ছা, আমাকে লইয়া তিনি একটি নৃত্য করেন।

বোর্ডের এ আদেশের ইতিমধ্যে একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেই সবডেপুটি বা ডেপুটির, আমার ঠিক স্মরণ নাই, তিরোধানের পর ডেঃ কলেক্টর দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয় ভাগলপুরে বদলি হইয়া আসেন, এবং ইনকম্ টেক্সের ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যেমন মুক্তহস্তে টেক্স ধরিয়াছিলেন, তিনি তেমনই মুক্তহস্তে অব্যাহতি দিতে আরম্ভ করিলেন। কলেক্টর ভ্রুকুটি করিলেন, কিন্তু দুর্গাদাসবাবু তাহাতে টলিবার পাত্র নহেন। তাহারপর তাঁহার ও কলেক্টরের মধ্যে একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কলেক্টর তাঁহার বিরুদ্ধে কমিশনরের কাছে রিপোর্ট করিলেন। তিনি কমিশনরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি এরূপে টেক্সদাতাগণকে অব্যাহতি দিয়া গবর্ণমেণ্টের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছেন কেন, কমিশনর জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন—কেন, তাহা কমিশনর সমস্ত নথি তলব দিয়া দেখুন। যদি তিনি অন্যায়রূপে ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, কমিশনর তাঁহার আদেশ আপিলে রহিত করিতে পারেন। কমিশনর নাচার হইলেন। কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী সবডেপুটিকে দণ্ড দিয়া, তাঁহার কার্য্য অবৈধ হইয়াছে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। অতএব ইনি সেই অবৈধ টেক্স হইতে দরিদ্রদিগকে অব্যাহতি দিয়া অন্যায় করিয়াছেন, কমিশনর কেমন করিয়া বলিবেন। তখন তিনি বলিলেন, কলেক্টরের ও এই ন্যায়বান্ ডেপুটি কলেক্টরের একস্থানে চাকরি করা এ অবস্থায় হইতে পারে না। দুর্গাদাসবাবু বদলি হইলেন। শুধু তাহা নহে, শুনিয়াছিলাম, তাঁহাকে অবনত (degrade) করা হইয়াছিল, কি তাঁহার উন্নতি (promotion) বন্ধ করা হইয়াছিল। এরূপে তিনি অকাতরে আপনার বুকের রক্তদিয়া ভাগলপুরের দরিদ্র করদাতাগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। হায়! সেইদিন, আর এইদিন! এখন কোনও ডেপুটি কলেক্টর যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে এরূপ আত্ম-বলিদান দিবেন, আমার ত বোধ হয় না এখন no conviction, no promotion, no collection, no promotion এর দিন (শাস্তি না দিবে ত, প্রমোশন বা বেতন বৃদ্ধি হইবে না, রাজস্ব না বাড়াইবে বা আদায় না করিবে ত প্রমোশন হইবে না)। অতএব যেমন করিয়া হউক, শাস্তি দিয়া, যেমন করিয়া হউক, রাজস্ব বাড়াইয়া

বা বেশী আদায় দেখাইয়া মাজিষ্ট্রেট-কলেক্টরকে সন্তুষ্ট করিয়া, প্রমোশনের পথ পরিষ্কার রাখিতে হইবে,—ইহাই বর্ত্তমান ডেপুটিদের জপমন্ত্র! অথচ দুর্গাদাসবাবু এখনকার ডেপুটিদের মত ইংরাজিশিক্ষায় পটু ছিলেন না। না থাকুন,—তখনকার ডেপুটি অনেকেই ছিলেন না,—কিন্তু তথাপি তাঁহারা এরূপ স্বাধীনচেতা ছিলেন, এবং তাঁহাদের এরূপ দৃঢ় কর্ত্তব্যজ্ঞান ও আত্মসম্মানজ্ঞান ছিল যে, তাঁহারা শত মাজিষ্ট্রেটের ভয়ে বা প্রমোশন বন্ধের ভয়ে আপন কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইতেন না। শুনিয়াছি, এ দুর্গাদাসবাবু কতবার এরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, কতবার 'ডিগ্রেড' হইয়াছিলেন, এবং কতবার তাঁহার প্রমোশন বন্ধ হইয়াছিল। তিনি একবার মাত্র তজ্জন্য মুখ ম্লান করেন নাই। শুনিয়াছি, অবশেষে একজীবন চাকরির পর পাঁচশত টাকার গ্রেড হইতে পেন্সন গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উপরেও একটি গবর্ণমেণ্ট আছেন, রাজার উপর একজন রাজা আছেন। তিনি এরূপ অগ্নি-পরীক্ষাতে পড়িয়া তাঁহার নিজের প্রতি এবং পরের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিয়া সেই রাজ্যে, সেই রাজার কাছে পুরস্কৃত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ আজ বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র। যাহা হউক, দুর্গাদাস চৌধুরীর দুর্গতি হইল বটে, কিন্তু তিনি ভাগলপুরের অবৈধ টেক্স যে ন্যায়ের খড়্গে কাটিয়া কমাইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট তাহা আর বাড়াইতে পারিলেন না। কাজেই পাটনার টেক্স কম হইয়াছে বলিয়া আর উৎপাত করিলেন না। কারণ তখন ভাগলপুরের টেক্স দুর্গাদাসবাবুর ন্যায়পরায়ণতায় পাটনার কাছাকাছি হইয়াছিল।

৪। বেহারী বনাম বাঙ্গালী

এ সময়ে একজন বিচক্ষণ বাঙ্গালী পাটনা কমিশনরের পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্ট ছিলেন। তিনি এখন যাবৎ সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত এবং পাটনা বিভাগে তাঁহার —বিদ্যাসাগরী ভাষায় 'অপ্রতিহত প্রভাব।' ইহাতে বেহার অঞ্চলে তাঁহার বহু শত্রু হইয়াছিল। ইহাঁরা তাঁহাকে পাটনার "দুর্গতি" বলিতেন। বন্ধু শ্যামাধবের উপদেশে আমি মাদারিপুর হইতে বদলির পর উক্ত বাবুর কাছে দুই পত্র লিখিয়াছিলাম। বেহারে পৌঁছিবার কিছুদিন পরে বাঁকীপুর গেলে এক ডেপুটি বন্ধুর সঙ্গে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি আমাকে বড়ই সমাদরে গ্রহণ করিলেন। আমার যে দুইখানি পত্র পাইয়াছেন, তাহার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে, তিনি কৃষ্ণদাস পাল ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পত্র পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের পত্র যেন "হিন্দু পেট্রিয়টের" এক এক 'প্যারা' para (ক্ষুদ্র প্রবন্ধ) বলিয়া বোধ হয়। তিনি এমন পত্রের ইংরাজি কোনও বাঙ্গালীকে লিখিতে দেখেন নাই। আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কারণ, তিনি নিজেও একজন খুব ভাল ইংরাজি-লেখক বলিয়া খ্যাত। সে কথা বলিলে, তিনি বলিলেন যে, তিনি অফিসিয়াল ইংরাজি অবশ্য একরকম লিখিতে পারেন, কিন্তু ইংরাজদের পত্রের ইংরাজি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। তাহাতে কেমন একপ্রকার প্রচ্ছন্ন রসিকতা ও সরলতা থাকে যে, সে রকম ইংরাজি বাঙ্গালী কেহ লিখিতে পারে না। তিনি আমাদের দুজনকে বাধ্য করিয়া সেই প্রাতঃকালে আহার করাইলেন, এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার আফিস দেখাইতে লইয়া গেলেন। সে সময়ে তাঁহার মুসাবিদা আবকারির বার্ষিক বিজ্ঞাপনী কমিশনর হইতে ফিরিয়া আসিলে তিনি উহা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"আপনি আমার ইংরাজির প্রশংসা করিতেছিলেন। তাহার নমুনা দেখুন।" দেখিলাম, কমিশনর প্রায় কিছুই পরিবর্ত্তন করেন নাই। কেবল দুই এক স্থানে পার্শ্বে কিছু কিছু লিখিয়া দিয়াছেন মাত্র। আমি তাঁহার ইংরাজি এই প্রথম দেখিয়া আবার প্রশংসা করিলে তিনি আবার বলিলেন যে, এ ইংরাজি 'অফিসিয়াল ইংরাজি', পত্রের ইংরাজি নহে। তিনি বলিলেন, আমার দুইখানি পত্র তিনি রাখিয়া দিয়াছেন। আমার পত্রের এরূপ

প্রশংসা আমার আরও কোন কোন বন্ধু, বিশেষতঃ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করিয়াছিলেন। প্রফুল্লও বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমার সমস্ত পত্র রাখিয়াছেন। তিনি যদি আমার পূর্ব্বে মরেন, তবে উহা আমার স্ত্রীর কাছে পাঠাইবেন, এবং আমার পরে মরিলে তিনি আমার জীবনী লিখিবেন, কি জীবনী-লেখককে উহা দিবেন। আমার সেই বন্ধু প্রফুল্লও আজ স্বর্গে। তাঁহার মৃত্যুর জন্য বোধ হয় তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কই, সেই পত্রগুলিন পাঠান নাই।

পরদিনও পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টবাবু আমাকে ও শ্যামাধবকে রাত্রিতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। অপরাহ্নে পাটনার একজন বিখ্যাত ফৌজদারী উকিল আসিয়া জুটিলেন। ইনি ইতিমধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় কয়েক বার বেহারে গিয়াছিলেন এবং আমার সঙ্গে তাঁহার বেশ একটুক আত্মীয়তা হইয়াছে। তিনি বেহার অঞ্চলের "গোঁয়ারি বুলি" এমন বলিতে পারিতেন এবং তাহাতে এমন সুন্দররূপে ছোট লোকদের জেরা করিতে পারিতেন যে, অনেক সময়ে বেহারী আমলারা পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিত না। সাক্ষীদের সহিত ইহাঁর রসিকতাপূর্ণ আলাপ ও জেরা যে একবার শুনিয়াছে, সে ভুলিতে পারিবে না। তিনি যেমন সহৃদয়, তেমনি সুরসিক। তাঁহার মুখে সর্ব্বদা সুন্দর প্রফুল্ল হাসি, এবং হৃদয়ে সর্ব্বদা আনন্দের তরঙ্গ। তিনি গৌরাঙ্গ, দীর্ঘাবয়ব, বলিষ্ঠ এবং সুন্দর। তিনি এক পক্ষে নিয়োজিত হইলে আর এক পক্ষে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের শিক্ষক বাঁকীপুরের খ্যাতনামা উকীল গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় নিয়োজিত হইতেন। তাঁহার প্রকৃতি কিছু উগ্র ছিল, সহজে চটিয়া উঠিতেন। ইনি তাহা জানিতেন এবং সহজে তাঁহাকে ক্ষেপাইয়া তুলিতেন। গুরুপ্রসাদবাবু জেরা করিতেছেন, আর ইনি একবার, দুইবার আপত্তি করিলেন। গুরুপ্রসাদবাবু ক্ষেপিতে লাগিলেন। যেই তৃতীয়বার আপত্তি করিলেন, গুরুপ্রসাদবাবু ক্রোধে অধীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"Stop"—থাম। ইনি মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন—"আপনি দেওয়ানির বড় উকীল মানি। তা বলিয়া ফৌজদারীতে আপনাকে মানিব কেন? বারুদস্তূপে অগ্নিপাত হইল। গুরুপ্রসাদ জ্বলিয়া উঠিয়া, টেবিলের উপর হাতের কাগজ জোরে নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং ক্রোধে আত্মহারা হইয়া বলিলেন—I appeal to Court (আমি কোর্টের কাছে নালিশ করি)। আমি বলিয়া কহিয়া উভয়কে থামাইতাম। এ দৃশ্য বরাবর অভিনীত হইত। অথচ সন্ধ্যার সময়ে আমার নিমন্ত্রণে উভয়ে উপস্থিত হইলে তিনি গুরুপ্রসাদবাবুকে পিতার তুল্য সম্মান করিতেন এবং মাথা তুলিয়া কথা কহিতেন না। উভয়ে মাসে দুইএকবার মোকদ্দমার উপলক্ষে বেহারে আসিতেন। আমি আসিয়াছি শুনিয়া তিনি অপরাহ্নে জুটিলেন। সন্ধ্যা হইলে দেখিলাম, তিনি ও আমার পূর্ব্বোক্ত ডেপুটি বন্ধু সুরাতরঙ্গে উদ্বেলিত, 'টলটলায়িত'। আমি আমার বন্ধুকে নিমন্ত্রণে যাইতে নিষেধ করিলাম। তিনি ত যাইবেনই, উকীল বন্ধু অনিমন্ত্রিত, তিনিও বলিলেন, তিনিও যাইবেন। অনিমন্ত্রিত ভাবে যাওয়া বড় লজ্জার কথা বলিয়া কত বুঝাইলাম। কিন্তু তিনি বলিলেন, এসিষ্টেণ্টবাবু তাঁহারও বন্ধু, তাঁহার আবার নিমন্ত্রণ কি? কিছুতেই ছাড়িলেন না। দুজনে জোর করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। আমি শ্রীদুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, কি এক দৃশ্যই আজ অভিনীত হইবে। আশঙ্কা অমূলক হইল না, উভয়ই ঋষভ-কণ্ঠ। সঙ্গীত উল্লাসে বাঁকীপুরের পথপার্শ্বস্থ ষণ্ডদিগকে ভীত করিয়া গাড়ী দ্রুতবেগে এসিষ্টেণ্টবাবুর দ্বারে গিয়া লাগিল। আমি প্রথমে লাফাইয়া পড়িয়া ছুটিয়া গেলাম। দেখিলাম, তিনি ও আর একটি ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলে আমি তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া, উভয় বন্ধুর আগমন ও অবস্থার কথা বলিলাম। তিনি বরং আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে তাঁহারা যে, এরূপ merry (আমোদিত) অবস্থায় আসিয়াছেন, তাহাতে তিনি বরং সুখী হইলেন। ঠিক এমন সময়ে উভয়ে টলিতে টলিতে উপস্থিত এবং উকিল বন্ধু এসিষ্টেণ্টবাবুর পায়ে পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—"মা দুর্গতি!

তোমার পায়ে নমস্কার !" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"বটে ! তুই যে একবারে তয়ের হয়েছিস্।" এবং তাহাকে হাতে ধরিয়া তুলিতে লাগিলেন।—"এটা একবারে গোল্লায় গেছ। আমি বাবা ঠিক আছি"—বলিয়া তখন অন্য বন্ধু চরণ প্রসারিত করিয়া দ্বারের চৌকাঠের উপর বসিয়া পড়িলেন। আমি অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি—এ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আজ মাত্র পরিচয়। জানি না, কি মনে করিতেছেন। তিনি বলিলেন. আপনি ব্যস্ত হইবেন না, ঘরে গিয়া বসুন। আমি দুজনকে আনিতেছি। তিনি বিরক্ত না হইয়া তাঁহাদের সঙ্গে বেশ আমোদ করিতে লাগিলেন, এবং সাধ্য সাধনা করিয়া কক্ষে আনিয়া বসাইলেন। অবস্থা বুঝিয়া তিনি শীঘ্রই আমাদের আহারের স্থানে লইয়া গেলেন. এবং আমাকে প্রথম বসিতে বলিলেন। দুই বন্ধুই বলিলেন, তাহা হইবে না। আমাকে ধরিয়া তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে বসাইলেন, এবং এসিষ্টেণ্টবাবু ও তাঁহার ডাক্তার বন্ধুটি অন্যদিকে বসিলেন। আহারের পরিপাটি আয়োজন,—এঙ্গলো-ভার্নাকিউলার (Anglo vernacular) ! কিন্তু আমার খাওয়া হইল না। একদিকে উকিল বন্ধু আমার ডান হাত ধরিয়া. এবং গলা একহাতে বেষ্টন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"নবীন. আমি তোরে কত ভালবাসি।" একদিকে বাম হাত ডেপুটি বন্ধু ধরিয়া বলিতে লাগিলেন—"তাহা হবে না, তোর কবিতা লিখিতে হইবে।" কিছুতেই তাঁহারাও খাইবেন না এবং আমাকেও খাইতে দিবেন না। এবার এসিষ্টেণ্টবাবু বড় ব্যস্ত হইলেন। কপাটের অন্তরাল হইতে তাঁহার পত্নীও অস্থির হইয়া বলিতে লাগিলেন.—"এ ভদ্রলোককে একবারে খাইতে দিল না।" তিনি সমস্ত দিন খাটিয়া কবির জন্য এরূপ কবিত্বপূর্ণ আহার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু কার কথা কে শুনে ? পরে দুজনেই ধরিল—কবিতা লিখিতে হইবে। লিখিতেছি বলিয়া এক এক বার হাত ছাড়াইয়া লইয়া আমি যাহা পারি মুখে তুলিয়া দিতেছিলাম। এ ভাবে আহার-কার্য্য সম্পন্ন হইল। তাহারা দুটি কিছুই খাইল না। আমি আর না বসিয়া. দুটিকে লইয়া বিদায় হইলাম। আমি আহার করিতে পারি নাই বলিয়া গৃহস্বামী অনেক দুঃখ করিয়া বিদায় দিলেন। আমি দুটিকে গাড়ীতে তুলিয়া চলিলাম। দুজনে প্রস্তাব করিল যে. উকিল বন্ধুর বাড়ীতে বসিয়া আমোদ করিয়া সারারাত্রি কাটাইবে। পথে উভয়ে নিদ্রিত হইয়া পড়িলে. আমি উকিল বন্ধুকে চুপে চুপে তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে নামাইয়া, তাঁহার চাকরের কাছে রাখিয়া চলিলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্য বন্ধু জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. সেই বাড়ী যাইতেছি ত ? আমি বলিলাম. হাঁ। ডাকবাঙ্গলায় পেঁৗছিয়া তাঁহাকে নামাইলে তিনি মহা চটিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"এ ত ডাকবাঙ্গলা ! তুমি ভারি সেয়ানা। তুমি আমাদের সব আমোদ মাটি করিলে।" আমি বলিলাম—"এখন শুইয়া থাক। সে কথা প্রাতে হইবে।" তিনিও ডাকবাঙ্গলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। আমি প্রাতে আটটার ট্রেনে বেহার যাইবার সময় তাঁহাকে জাগাইলাম। কারণ, তিনি বলিয়াছেন. তাঁহাকে না বলিয়া গেলে তিনি আমার আর মুখ দেখিবেন না। প্রাতে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। আমাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল বাড়ীতে কি আমরা বড় মাতলামি করিয়াছি ? আমি বোধ হয় কিছু অন্যায় করি নাই। যাহা—করিয়াছে। 'দুর্গতি' সহজ লোক নহে। পাটনায় তাহার অসাধারণ ক্ষমতা। জানি না, আমার কি সর্ব্বনাশ ঘটায়।" আমি বলিলাম, তিনি কিছুই মনে করেন নাই। বরং বেশ আমোদ মনে করিয়াছিলেন। বন্ধু আমাকে ট্রেনে তুলিয়া দিলেন। আজ সেই আমোদ ও আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি দুই বন্ধুর কেহই এ জগতে নাই। জানি না, কেন বহু বৎসর পরে আমার সেই উকিল বন্ধু মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে আমার কাছে একখানি বড় স্নেহপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এই মর্ত্তলোকে আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই, কিন্তু সেই অল্পদিনের বন্ধুতা উভয়ের অবশিষ্ট জীবনব্যাপী হইয়াছিল।

যাহা হউক. এরূপে পার্শন্যাল এসিষ্টেণ্টবাবুর সঙ্গে আমার বেশ একটুক আত্মীয়তা হইল। তাঁহার প্রভুত্বে এবং আত্মীয় বাঙ্গালীর পৃষ্ঠপোষকতায় সমস্ত বেহারী তাঁহার উপর

খড়্গহস্ত হইয়াছিল। কেবল এই কারণে সে সময়ে বেহারীদের মুখপত্রস্বরূপ "ইণ্ডিয়ান ক্রনিকেল" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল, এবং উহার সহিত গুরুপ্রসাদবাবুর পত্রিকা "বেহার হেরাল্ডে"র সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। কিছুদিন পরে লেপ্‌-টেনাণ্ট গভর্ণর ইডেন বাঁকীপুরে পদার্পণ করেন। তিনি স্থানীয় অভিনন্দনপত্র সকলের যে উত্তর দেন, আমি গুরুপ্রসাদবাবুর অনুরোধে স্মৃতি সাহায্যে পুনরাবৃত্তি (reproduce) করিয়া দিলে উহা "বেহার হেরাল্ডে" প্রকাশিত হয়। সকলে তাহার জন্য আমার স্মরণশক্তির প্রশংসা করেন, এবং "ইণ্ডিয়ান ক্রনিকেল" উহা শুনেন। তাঁহারা উহার সারাংশ মাত্র দিতে পারিয়াছিলেন। বেহারীদের পক্ষে "ক্রনিকেলে" পার্শন্যাল এসিস্টেণ্টকে আক্রমণ করিয়া এক অভিনন্দনপত্র মুদ্রিত হয়। তাহাকে উপহাস করিয়া এক বিদ্রূপাত্মক অভিনন্দনপত্র বাঙ্গালীর পক্ষে "বেহার হেরাল্ডে" প্রকাশিত হয়। "ক্রনিকেল" শুনিতে পান, উহা আমার রচনা। পাটনা অঞ্চলে একটা হাসির তরঙ্গ উঠে। "ক্রনিকেলে"র দল তাহাতে ক্ষেপিয়া আমার উপকারার্থ বেহারে তাঁহাদের একজন "বিশেষ পত্রপ্রেরক" প্রেরণ করেন, এবং প্রত্যেক সংখ্যায় আমার প্রতিকূলে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে সৌম্যমূর্ত্তি কলেক্টর মিঃ মেটকাফ পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া তাহার কয়েক সংখ্যা আমার কাছে পাঠাইয়া দিয়া, আমাকে সস্নেহ-ভাবে সাবধান হইতে লেখেন। আমি তাহার সমস্ত লেখা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া আসল কথা খুলিয়া লিখি। তিনি সেই পত্র কমিশনর হেলিডের কাছে এক রসিকতাপূর্ণ মন্তব্য লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। এসিস্টেণ্টবাবু লিখিলেন যে, সেই মন্তব্য পাইয়া এবং অভি-নন্দনের রচয়িতা আমি শুনিয়া হেলিডেও বড় হাসিয়াছিলেন। প্রায় ছয়মাস কাল "ক্রনিকেল" আমাকে এরূপে আপ্যায়িত করিয়া, আর অরণ্যে রোদন বৃথা বুঝিয়া, 'পত্রপ্রেরক'কে উঠাইয়া লইয়া গেলেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমি বাঁকীপুর যাইতেছি। বক্তিয়ারপুর ট্রেনে উঠিয়া দেখিলাম, অপর দিকের বেঞ্চে দুইজন সম্ভ্রান্ত বেহারী ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। দুইজনেরই প্রশান্ত দীর্ঘ দেহাবয়ব ও জ্ঞানোজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, তাঁহারা উভয়ে বেহার অঞ্চলের দুটি রত্ন হইবেন। ট্রেন খুলিল। আমি গবাক্ষপথে চঞ্চল প্রাকৃতিক শোভা দেখিতেছি। তাঁহারা স্থিরনয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছেন। আমি মুখ ফিরাইলে তাঁহারা আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন। নানা বিষয়ে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সাহিত্য—যতই আলাপ হইতে লাগিল, ততই পরস্পর পরস্পরের দিকে আকর্ষিত হইতে লাগিলাম। বাঁকীপুর পৌঁছিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তাঁহারা একটু কাণাকাণি করিয়া বলিলেন—"আমরা বুঝিতেছি যে, আমরা কোন বিখ্যাত বাঙ্গালীর সঙ্গে আলাপ করিতেছি। আমরা এত মুগ্ধ হইয়াছি যে, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।" আমি বলিলাম—"বেহার অঞ্চলে যেরূপ 'বেহারী বনাম বাঙ্গালী' বিবাদ চলিতেছে, এখানে বাঙ্গালীর পরিচয় না দেওয়াই ভাল। কিন্তু বেহার অঞ্চলের এই দুটি রত্নের আমাকে পরিচয় দিতে তাঁহাদের কোন আপত্তি না হইতে পারে।" উত্তর শুনিয়া তাঁহারা কিছু অপ্রতিভ হইলেন। জ্যেষ্ঠ বলিলেন—"আমার নাম শালেগ্রাম সিংহ, আমি হাইকোর্টের উকিল, এবং ইনি আমার কনিষ্ঠ বিশ্বেশ্বরদয়াল সিংহ। পাটনা জজ কোর্টের উকিল।" আমার সাক্ষাতে হঠাৎ দুইটি নক্ষত্র খসিয়া পড়িলে আমি অধিক বিস্মিত হইতাম না। ইহাঁরা দুই ভ্রাতাই বেহারীদের নেতা, "ক্রনিকেলে"র স্বত্বাধিকারী এবং খ্যাতনামা জমিদার। আমি তাড়িতচালিতবৎ উঠিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলাম—"তবে আমি আপনাদের মহাশত্রু—বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার!" তাঁহারা উভয়েও বিস্মিত হইয়া সেরূপ বেগে উঠিয়া আমার কর ধারণ করিলেন, এবং উভয়ে আমাকে টানিয়া লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বসাইলেন। গাড়ীতে একটা বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের ও হাসির তরঙ্গ উঠিল। আমাদের হাতে হাতে ধরা আছে, ট্রেন বাঁকীপুর ষ্টেশনে থামিল। গুরুপ্রসাদ-

বাবু স্বয়ং আমাকে লইতে আসিয়াছেন। তিনি এই তিন মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুজনই আমাকে ফৌজদারীর আসামীর মত ধরিয়া, গাড়ী হইতে নামিয়া গুরুপ্রসাদবাবুকে বলিলেন—"আমরা আমাদের পরম শত্রুকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। আমাদের বাড়ী লইয়া যাইব।" গুরুপ্রসাদবাবুর বিস্ময়ের ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—"ব্যাপারখানা কি? এ যেন আরব্য উপন্যাস!" কিন্তু তাঁহারা আমাকে টানিয়া তাঁহাদের গাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। শেষে গুরুপ্রসাদবাবু বলিলেন যে, সেই সন্ধ্যা তিনি আমাকে কোনও মতে ছাড়িতে পারিবেন না। কারণ: আমার সঙ্গে আহারের জন্য তিনি তাঁহার কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তখন তাঁহারা দুই ভাইও তাঁহাদের গাড়ী ফেলিয়া, আমার সঙ্গে গুরুপ্রসাদবাবুর বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়া, পরদিন তাঁহাদের বাড়ীতে থাকিতে প্রতিশ্রুত করাইলেন। তখন আমি বলিলাম—"আপনারা দুইটি দেবতুল্য ভাই, বেহারের দুইটি মহামূল্য রত্ন। আপনারা আমার মত একটা সামান্য বাঙ্গালীকে একঘণ্টার পরিচয়ে এতদূর আদর করিতেছেন, তবে এই বেহারী-বাঙ্গালী-বিদ্বেষে এই 'সোনার' বেহার অঞ্চলকে আপনারা অশান্তিপূর্ণ করিতেছেন কেন? বিশেষতঃ বিবাদের কারণ যে পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট, তিনি ইতিমধ্যে এ আন্দোলনের ফলে স্থানান্তরিত হইয়া প্রেসিডেন্সি কমিশনরের পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট হইয়া গিয়াছেন।" তখন এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ আলাপ হইল। শুনিলাম, এই "বেহারী বনাম বাঙ্গালী" নাটকের মধ্যে আবার একটা প্রহসন আছে। শুনিলাম, একজন উকিলকে লইয়া বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতেও একটা রহস্যপূর্ণ দলাদলি হইয়াছে। একদলের নেতা সেই পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট, এবং অন্যদলের নেতা একজন সবজজ। ইহার ফলে উকিলবাবুটির কপাল খুলিয়া গিয়াছে। বেহারীদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, তাঁহাকে উকিল দিলে আর সবজজ কোর্টের মোকদ্দমায় পরাজয় নাই। গিরিজায়ার ঝাঁটার উপলক্ষে বঙ্কিমবাবু বলিয়াছেন, প্রণয় একরূপ নহে। তেমনি উকিলের ব্যবসায়-বৃদ্ধির পথও একরূপ নহে। গুরুপ্রসাদ এই দলাদলি মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বহুক্ষণ আলোচনার পর বাবু শালেগ্রাম ও বিশ্বেশ্বর হাসিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা পরদিন প্রাতে ডুমরাঁওর ভাগ্যবান ও খ্যাতনামা দেওয়ান জয়প্রকাশলালকে লইয়া আসিবেন। বলিলেন—আমি বেহার সবডিভিসনে শান্তি স্থাপন করিয়াছি, বেহার দেশেও আমার দ্বারা শান্তিস্থাপন হইবে। পরদিন প্রাতে তাঁহারা তিনজনই আসিলেন। আমি ইতিমধ্যে গুরুপ্রসাদবাবুকে হাত করিলাম। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তিনি নিজে দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, এই বিবাদের পূর্ব্বে বেহারের লোক তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা করিত। তখন আমার দূতীপনায় স্থির হইল, সেই সন্ধ্যায় ডুমরাঁও বাঙ্গলায় বেহারী ও বাঙ্গালী দলের নেতাদের সান্ধ্য সম্মিলনী ভোজ হইবে। জয়প্রকাশ কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, বেহারীরা স্বতন্ত্র গৃহে আহার করিবে। আমরা বলিলাম, আমরা তাহাতে কিছুমাত্র অপমান মনে করিব না। সন্ধ্যার সময় উভয় পক্ষের নেতাগণ উপস্থিত হইলে দেখিলাম যে, ইহাঁদের মধ্যে এরূপ বন্ধুতা যে, পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট মহাশয়ের মত চতুর লোক না হইলে ইহাঁদিগকে এই দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ও বিদ্বেষযুক্ত করিবার আর কাহারও ক্ষমতা হইত না। আমার প্রস্তাবমতে তখনই কোন্দলের ঢোল "ক্রনিকেল" বন্ধ হইল, এবং একটি 'বেহারী বাঙ্গালীর সম্মিলনী' (ক্লাব) স্থাপিত হইল। কি আনন্দে সন্ধ্যা কাটাইলাম, বলিতে পারি না। তখন আর স্বতন্ত্র গৃহও আবশ্যক হইল না। বেহার অঞ্চলে বোধ হয়, এই প্রথম বেহারী ও বাঙ্গালী একগৃহে দুই শ্রেণীতে মাত্র বসিয়া অপর্য্যাপ্ত আহার করিলাম। আমাকে সকলে কত আদর, এবং আমার বেহার-শাসনের জন্য ও অন্যান্য বিষয়ের জন্য কত প্রশংসাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। জীবনে এরূপ সুখ-সন্ধ্যা অল্পই অতিবাহিত করিয়াছি। আমি পরদিন বেহারে ফিরিয়া আসিলাম।

বেহার হইতে বিদায়

বেহারে আমার তিনবৎসর আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। কলেক্টর মিঃ মেটকাফ্ বেহারে আসিলে তাঁহাকে বলিলাম যে, এরূপ বাঞ্ছিত (Prize) সবডিভিসনে আমাকে তিনবৎসরের অধিক রাখিবে না। অতএব আমার শীঘ্র বদলি হইবে। তিনি বলিলেন, তাঁহাকে ও কমিশনরকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বেহারের মত বৃহৎ সবডিভিসন হইতে আমার মত একজন কর্ম্মচারীর বদলি হইতে পারে না। আমি তাহা বিশ্বাস করিলাম না। শরৎকাল যেন আমার বদলির সময় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শরৎকাল আসিবামাত্র আমার সত্যসত্যই ভাগলপুরে বদলির আদেশ গেজেটে প্রচারিত হইল। উহা দেখিয়াই মেটকাফ আমাকে লিখিলেন—"আমি ও কমিশনর এ বদলির কথা কিছুই জানি না। আপনি কি কিছু জানেন?" পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট সাটলওয়ার্থ (Shuttleworth)ও লিখিলেন যে, আমি থাকিতে চাহিলে কমিশনর ও কলেক্টর উভয়ে তীব্রভাবে আমার বদলির প্রতিবাদ করিবেন। তিনি লিখিয়াছেন, তিনি নিজে আর ছয়মাস পরে পাটনা ছাড়িবেন। অতএব অন্ততঃ আমি যেন আর ছয়টি মাস থাকিবার প্রার্থনা করি। তাহা হইলে দুজন একসঙ্গে যাইব। আমি সংকটে পড়িলাম। শেষে মন্ত্রিণী ওরফে পত্নী মহাশয়ার সঙ্গে অনেক পরামর্শের পর লিখিলাম যে, আমি এই বদলির বিষয় কিছুই জানি না। তাঁহারা সকলেই যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে রাখিতে চাহিতেছেন, তখন আমি এই অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া আর কি বলিব। তবে বেহারের মত উৎকৃষ্ট স্থানে আমাকে তিনবৎসরের বেশী রাখিবে না। কমিশনর কলেক্টর জিদ করিলে ছয়মাস, কি একবৎসর রাখিতে পারে। এখন আমি ভাগলপুরের মত একটি উৎকৃষ্ট স্থান পাইয়াছি। ইহার পর কোথায় লইয়া ফেলে ঠিক নাই। বিশেষতঃ গবর্ণমেণ্ট মনে করিবেন, আমি কমিশনর কলেক্টরকে ধরিয়া আমার বদলি রহিত করাইয়াছি। তখন এ কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে দণ্ড দিবার জন্য একটি মন্দ স্থানে লইয়া ফেলা আশ্চর্য্য নহে। উপসংহারে তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ ভার দিলাম। তদুত্তরে মিঃ মেটকাফ্ লিখিলেন—"আমি ও কমিশনর হেলিডে এই বিষয় পরামর্শ করিলাম। যখন আপনি ভাগলপুর যাইতে চাহিতেছেন, তখন আপনার পথে আমরা দাঁড়াইব না। কিন্তু আমি এমন যোগ্য কর্ম্মচারী আর পাইব না। আপনার বেহারের ভাল কার্য্য (good work) আমি বিশেষরূপে গবর্ণমেণ্টকে বিদিত করিব। আপনি যাইবার পূর্ব্বে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন।"

বেহারে একটা হাহাকার পড়িয়া গেল। যে দিকে অশ্বারোহণে যাই, কেবল এক কথা—"এমন হাকিম আমরা আর পাইব না। এমন 'রেয়াছত' ও 'রহম' (সৌজন্য ও দয়া) কোনও হাকিমের দেখি নাই।" মফঃস্বল হইতে জমিদারগণ ছুটিয়া আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন। একদিনেই আমার প্রায় তিনহাজার টাকার জিনিসপত্র, ঘোড়া, বন্দুক ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া গেল। উহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িল। সকলে বলিতে লাগিলেন, আমার একটি নিশান তাঁহাকে দিয়া যাইতে হইবে। লাহিরি মহল্লার মৌলবি আলি আহম্মদ সে সময়ে বেহারে ছিলেন না। তিনি আসিতে আসিতে সমস্ত জিনিস বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। আমি সেই পাল্কীখানি ও একখানি লিখিবার টেবল (writing table) নিজের পছন্দমত প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। পাল্কীখানি প্রথম চোটেই মফঃস্বলের ঘেরার বনাত সুদ্ধ উঠিয়া গিয়াছে। উহাদের জন্য সমস্ত জমিদার গ্রাহক। টেবলখানি বিক্রয় করিব না বলিয়া রাখিয়াছিলাম। সুহৃদ্‌বর আলি আমম্মদ আসিয়া বলিলেন, তাহা হইবে না। সেখানি তাঁহাকে আমার চিহ্নস্বরূপ দিতে হইবে। আমি আপত্তি করিলাম ; তিনি কিছুতেই শুনিলেন না। জোর করিয়া আমার কাগজপত্র সুদ্ধ টেবলখানি শেষদিন তুলিয়া লইয়া গেলেন, এবং তাহারপর তাঁহার একখানি দানাপুরের নির্ম্মিত সুন্দর রাইটিং টেবল আতরে সুবাসিত করিয়া ও তাহাতে আমার কাগজপত্র পুরিয়া পাঠাইয়া দিলেন। প্রকাণ্ড সান্ধ্য নিমন্ত্রণ পাইলাম,—তখনও উহা একটা কল্পিত দস্তুর হইয়া উঠে নাই এবং তাহাতে যে আদর অভ্যর্থনা পাইলাম, শুনিলাম

—বেহারে তাহা কখনও হয় নাই। বেহার হইতে সকলে প্রায় অপ্রীতিভাজন হইয়া, দুই একজন বিপদস্থ হইয়া গিয়াছেন।

বিদায়ের দিন আসিল। যিনি আমার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-খ্রীষ্টান। তিনি সপরিবারে আসিতেছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চট্টগ্রামে মুন্সেফ ছিলেন। তিনি আমার একজন পরম বন্ধু। আমি সবডিভিসনগৃহ ছাড়িয়া প্রাতে স্ত্রীকে বক্তিয়ারপুরে বাঙ্গলায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতে পাঠাইয়া, নিজে আমার নির্ম্মিত সেই তালবনস্থ সুন্দর ডাকবাঙ্গলায় গেলাম এবং তাঁহাদের জন্য প্রাতের আহার প্রস্তুত রাখিলাম। তাঁহারা প্রাতে নয়টার সময় বক্তিয়াপুর হইতে আমার দ্বারা স্থাপিত মেল কার্টে আসিয়া পৌঁছিলেন, এবং ডাকবাঙ্গলায় আমার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা পতি পত্নী ও সঙ্গে একটি সুন্দরী কন্যা। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাকে পাইয়া বসিল uncle, uncle করিয়া আমার সঙ্গে চিরপরিচিতার মত ব্যবহার করিতে লাগিল। আহারের পর নূতন কর্ত্তাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কার্য্যভার দিব স্থির করিয়া আহারে বসিলাম। আহার শেষ হইল, কিন্তু গল্প এমন জমিল, আর তাঁহাদের সঙ্গে এমন আত্মীয়তা হইয়া গেল যে, তাঁহারা কিছুতেই উঠিবেন না। অগত্যা আমি জোর করিয়া বারটার সময় তাঁহাদের মৌলবি আলি আহম্মদের ফিটনে সব-ডিভিসনগৃহে লইয়া গেলাম। মাতা কন্যা আমাকে বলিলেন যে, আমি তাঁহাদের ছাড়িয়া আফিসে যাইতে পারিব না। মেয়ে আমার গলা ধরিয়া রহিল। তাঁহারা হাসিতে লাগিলেন। শেষে আমি বলিলাম যে, নূতন কর্ত্তাকে আফিস দেখাইয়া দিয়া এবং ট্রেজারির চাবি দিয়া চলিয়া আসিব। তাহাই করিলাম। মেয়েটি আমাকে লইয়া কক্ষে কক্ষে এবং হাতার চারিদিকে বেড়াইতে এবং গল্প করিতে চাহে। মাতা স্থূলাঙ্গিনী। তিনি চাহেন, তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করি। এদিকে জমিদারগণ বাগানের অপর দিক্‌স্থ সেই বাঙ্গলাতে সমবেত হইয়া আমার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। মা মেয়ে আমাকে একটিবারও সেইখানে যাইতে দিবেন না। একবার জোর করিয়া দুইটার সময়ে ছুটিয়া গিয়া তাঁহাদের বলিলাম যে, তাঁহারা আমার জন্য আর কেন কষ্ট পাইতেছেন। আমাকে বিদায় দিয়া বাড়ী চলিয়া যাউন। তাঁহারা বলিলেন, তাহা হইবে না। আমি যে পর্য্যন্ত বেহারে আছি, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা সেখানে বসিয়া আমাকে দেখিবেন। এই স্নেহের কি উত্তর দিব? কিন্তু মেয়েটি ইতিমধ্যেই আমাকে uncle, uncle (কাকা, কাকা) বলিয়া চেঁচাইতেছিল। জমিদারেরা এ জন্য আমাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিলেন। হাতা লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তাহাদেরও কত করিয়া যাইতে বলিলাম, তাহারাও কিছুতেই যাইবে না। কর্ত্তাটি চারিটার সময় চার্জ লইয়া আফিস হইতে ফিরিয়া আসিলেন। লোক-সমাগমে তাঁহারা জ্বালাতন হইতেছেন। আমি বলিলাম, আমি না গেলে তাঁহারা তিষ্ঠিতে পারিবেন না। তাঁহারা তথাপি কিছুতে ছাড়িবেন না। এমন সময়ে আমার বদ্‌লির সংবাদ পাইয়া পাটনা হইতে বাবু শালেগ্রাম সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বেশ্বরদয়াল আসিলেন। এক-দিন তাঁহারা আমার কত অনিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই সৌজন্য ও সস্নেহ বচনে আমার চক্ষে জল আসিল। তাঁহারা আসাতে আমি আরও আটক হইলাম। তাঁহারা বলিলেন যে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে থাকিতে হইবে। তখন মা মেয়ে খুব ধরিলেন যে, সে রাত্রিতে আমাকে যাইতে দিবেন না, এবং স্ত্রীকে বক্তিয়ারপুর হইতে ফিরাইয়া আনিয়া একদিন এই বাঙ্গলায় তাঁহাদের সঙ্গে কাটাইতে হইবে। আমি আমার পত্নীর উৎকট হিন্দুয়ানীর কত উপাখ্যান বলিলাম। তাঁহারা কিছুই শুনিবেন না। মেয়েটি স্ত্রীকে ফিরাইয়া আনিতে চুপে চুপে আর্দ্দালিদের কতবার পাঠাইয়া দিল, আমি মাথা কুটিয়া ফিরাইয়া আনিলাম। সমস্ত বেহার তখন হাতায় সমবেত। আর একদিন থাকিতে সকলে অনু-নয় করিতে লাগিলেন। অগত্যা সন্ধ্যার সময় গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, মা মেয়ে দুজনে খাদ্যদ্রব্যে আমার গাড়ী ভরাইয়া দিয়া বলিল—"এটি তোমার স্ত্রীর জন্য, এটি তোমার ছেলের

জন্য।" গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছি, তখন মেয়েটি গাড়ীতে উঠিয়া আমার গলা ধরিয়া বলিল—"uncle! (কাকা), তুমি আমাকে হাতার পশ্চিম উত্তর কোণার পুকুর দেখাও নাই—(সে দিকে জমিদারেরা বসিয়াছিলেন বলিয়া লইয়া যাই নাই)—আমাকে উহা না দেখাইলে আমি ছাড়িব না।" সকলে হাসিতে লাগিলেন। আমি তাহাকে লইয়া সেই পুকুর দেখাইলাম। সে তখন সজলনয়নে বলিল—"uncle! তুমি একটি রাত্রি থাকিবে না। তুমি আমাকে এরূপে কাঁদাইয়া ফেলিয়া যাইবে।" আমি তাহাকে বুকে লইয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম, এবং মুখচুম্বন করিয়া বলিলাম—"মেবেল (তাহার নাম মেবেল রাজবালা Mabel Rajabala) পাগলি! তুই কাঁদিলে আমি যাইব না। আমাকে দুইঘণ্টা মাত্র দেখিয়া তোর কেন এত ভালবাসা হইল।" সে বলিল—"জানি না।" তাহারপর তাহাকে অনেক বুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিলাম। তখন আর একবার পতি, পত্নী, মেয়ে ও সমবেত লোকেরা আমাকে রাত্রিটি থাকিতে জিদ করিতে লাগিল। কারণ, বক্তিয়ারপুরে পৌঁছিতে অনেক রাত্রি হইবে। মেয়ে গলায় লাগিয়া আছে। এখনকার দিনে কি এরূপ সৌজন্য দেখাইয়া একজন ডেপুটি আর একজনকে বিদায় দিতে পারেন? এখনই উহা অনেকের কাছে গল্প বলিয়া বোধ হইবে। আমাদের সার্ভিসে একদিন এমনিই উচ্চ অঙ্গের সহৃদয়তা ও মনুষ্যত্ব ছিল। মা মেয়েকে বলিলেন—"আর কেন? যখন উনি থাকিতে পারিতেছেন না, তখন তাঁহার আর রাত্রি করিয়া ফল কি? তাঁহাকে ছাড়িয়া দেও।" তখন মেবেল আমার গলা ছাড়িল। আমি তাহার আবার মুখচুম্বন করিয়া গলদশ্রু-নয়নে বিদায় হইলাম। দেখিলাম, এই দৃশ্যে দর্শকমণ্ডলীর সকলের চক্ষু সজল হইয়াছে। মেবেলের সঙ্গে আমার আলিপুর থাকিবার সময়ে দশবৎসর পরে আর একবার দেখা হইয়াছিল। তখন তাহারা হাওড়ায় ছিল। আমাকে খবর দিয়াছিল। তখন সে শান্ত স্থির পরিণত-যৌবনা। তখনও সে অবিবাহিতা। ভরসা করি, তাহার পরে মেবেল পরিণীতা হইয়া সংসার-সুখে সুখী হইয়াছে।

গাড়ীর চারিদিকে জমিদার ও অন্যান্য ভদ্রমণ্ডলী ঘেরিয়া আছেন। অতএব আমি আর গাড়ীতে না উঠিয়া, উহা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে বলিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে হাঁটিয়া ডাকবাঙ্গলায় চলিলাম। প্রায় দুইসহস্র লোক আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। আমি তাহাদের কাছে বিদায় চাহিলে, যাঁহারা পার্শ্বে ছিলেন, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, আমাকে কয়েক ঘণ্টা মাত্র দেখিয়া যখন নবাগত ডেপুটি, তাঁহার পত্নী ও মেয়ে ছাড়িতে চাহিতেছেন না, তখন তিন-বৎসরের পরিচিত তাঁহারা আমাকে কিরূপে ছাড়িতে চাহিবেন। ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছিয়া দেখি, তাহার হাতা ও রাস্তাও লোকপূর্ণ। সেখানে প্রায় আরও সহস্র লোক একত্রিত হইয়াছে। ইহারা অধিকাংশ আমলা, মোক্তার, পুলিস ও সামান্য লোক। বাঙ্গলা হইতে আমার জিনিস-পত্র গাড়ীতে উঠিলে আমি সকলের কাছে শেষ বিদায় চাহিলাম। তখন যে দৃশ্য অভিনীত হইল, স্মরণ করিতে আমার চক্ষে জল আসিতেছে। আমি তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। জমি-দার ও উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকগণ প্রত্যেকে আমাকে বুকে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কত কথাই বলিয়া বিদায় দিতে লাগিলেন। কেহ যেন পুত্র, কেহ যেন ভাই, কেহ যেন চির-সুহৃদ্‌কে জীবনের জন্য বিদায় দিতেছেন। আমি নিজে একটি শিশুর মত কাঁদিতেছি। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়। বহু কষ্টে তাঁহাদিগকে ছাড়াইয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। তখন একটা কান্নার রোল উঠিল। মোক্তার, আমলা, পুলিস, গাড়ীর দুইদিক্ হইতে আমার দুই পা ধরিয়া পাগলের মত গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমাকে আবার গাড়ী হইতে নামাইয়া ফেলিল। চারিদিকে পায় পড়িয়া কত লোক গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলের মুখে এক কথা—"আমাদের মা বাপ চলিয়া যাইতেছে। এমন দয়ালু হাকিম আমরা আর পাইব না।" আমি আবার গাড়ীতে উঠিলাম। আবার সেই দৃশ্য! কোচমান শেষে বলিতে লাগিল—"এখন তোমরা ছাড়! রাত্রি হইয়া আসিল। আমি কেমন করিয়া লইয়া যাইব।" সেও কাঁদিতেছে। আমি রুমাল চোখে দিয়া

অধোমুখে কাঁদিতেছি। আমি এ দৃশ্য দেখিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। শেষে অনেক বলিয়া কহিয়া কোচমান একটু জনতা ফাঁক করিয়া গাড়ী খুলিল। তখন রোদনের রোল দ্বিগুণ হইল। বহু লোক গাড়ীর পশ্চাতে ছুটিল। কেবল বলিতেছে—"আর একটু রাখ! আমরা আর একটিবার দেখি।" আমি গাড়ী ধীরে ধীরে চালাইতে বলিলাম। লোকের জন্য বেগে চালাইবার সাধ্যও নাই। পাগলের মত প্রায় সহস্র লোক গাড়ী বেড়িয়া চলিয়াছে। এরূপে "সোহো" আউট পোষ্ট পর্য্যন্ত দুইমাইল গেলে গাড়ী হইতে আবার নামিলাম। লোকেরা আবার সেরূপ করিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। ইহারা সকলেই আমলা, পুলিস, মোক্তার ও সামান্য লোক। আমি সকলের গায়ে হাত দিয়া, আদর করিয়া, এখন ফিরিয়া যাইতে বলিতে লাগিলাম। তাহারাও কাঁদিতেছে, আমিও কাঁদিতেছি। এরূপে তাহাদের কাছে শেষ বিদায় লইয়া আমি গাড়ীতে উঠিলে এবার কোচমান নক্ষত্রবেগে গাড়ী ছাড়িল। যতদূর দেখা যায়, লোক সকল দাঁড়াইয়া দেখিল। তাহারপর অন্ধকারে তাহাদের ছায়া মিশিয়া গেল। কোচমান বলিল—"গরিব পরওর! কেবল এখানে বলিয়া নহে। আজ বেহারের নরনারী কাহারও চক্ষু শুষ্ক নাই। কোনও হাকিম এমন ভাবে এ সবডিভিসনকে কাঁদাইয়া যায় নাই।" আমি ভাবিতে লাগিলাম—কেন?—আমি ইহাদের এমন কি করিয়াছি? নান্নুসিংহের কথা মনে পড়িল। আমার পূর্ব্ববর্ত্তীরা ভয় চাহিয়াছেন, লোকে তাঁহাদিগকে ভয় করিয়াছে। আমি তাহাদের প্রীতি চাহিয়াছি, প্রীতি পাইয়াছি। হায়! মানুষ এমন স্বর্গ ছাড়িয়া কেন লোকের ভয়ের পাত্র হইতে চাহে? আর মনে নাই। আমার হৃদয় যেন ভগ্ন, অবসন্ন। আমার শরীর অবশ, আমি গাড়ীতে মাথা রাখিয়া একপ্রকার অর্দ্ধনিদ্রিত অর্দ্ধজাগ্রতবৎ পড়িয়া রহিলাম। কিরূপে আর ষোল মাইল গেলাম, তাহা আমি জানিতে পারিলাম না। ব্যক্তিয়ারপুরে পৌঁছিলে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। দেখিলাম, পথে আমার নূতন পাগড়িটি হারাইয়া আসিয়াছি। গাড়ী হইতে মৃতবৎ নামিলাম। কোচমান ও সহিসেরা ভৃত্যদের কাছে আমার শোককাহিনী বলিতে লাগিল। স্ত্রী দাঁড়াইয়া শুনিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, পথে স্থানে স্থানে তাঁহার পাল্কী ঘেরিয়া লোকে সেরূপ কাঁদাকাটা করিয়াছে। আমার কত প্রশংসা শুনিতে শুনিতে তিনি বক্তিয়ারপুরে আসিয়াছেন।

ইহার ছয়বৎসর পরে যখন আমি পশ্চিমে বেড়াইতে যাই, তখন লাহোরে বেহারের জমিদারপক্ষ হইতে কেবল একটি দিন হইলেও বেহারে গিয়া তাঁহাদের দেখা দিয়া আসিতে নিমন্ত্রণ পাই। সময়াভাবে উহা অস্বীকার করিলে, আমি কোন্ ট্রেনে কলিকাতায় ফিরিব, তাহা জানাইলে তাঁহারা আমার সঙ্গে বক্তিয়ারপুর আসিয়া দেখা করিতে চাহেন। আমি কোন্ ট্রেনে কখন ফিরিব, কিছু নিশ্চয়তা নাই, তাঁহারা ষ্টেশনে আসিয়া কষ্ট পাইবেন বলিয়া এ প্রস্তাবেও অসম্মত হই। আরও চারিবৎসর পরে আমি রাণাঘাট সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া যাইবার অল্পদিন পরে দেখিলাম, একটি উচ্চ রকমের মুসলমান ভদ্রলোক মোক্তারদের পশ্চাতে এক 'বেঞ্চে' বসিয়া আছেন। তাঁহার চেহারা পরিচিত বোধ হইতেছে, অথচ চিনিতে পারিতেছি না। তিনি রাণাঘাটের উপবিভাগের কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি না, 'বেঞ্চ ক্লার্ক'কে পরে তাহার দ্বারা মোক্তারদিগকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্রলোকটি মাথা হেট করিয়া বসিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন। তাহারা বলিল যে, তাঁহাকে কখনও দেখে নাই। তিনি এ অঞ্চলের লোক নহেন। তখন তিনি হাস্যমুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হাম্ আলি আহম্মদ!" "কেয়াঁ মৌলবি সাহেব, তস্রিপলে আপ্ কাঁহাছে আয়ে হে"—সে কি মৌলবি সাহেব! আপনি কোথায় হইতে আসিলেন—বলিয়া আমি এজলাস হইতে ছুটিলাম। তিনিও ছুটিয়া আসিয়া আমার গলায় পড়িলেন। সমস্ত কাচারি অবাক্! আজ আর কাচারি হইবে না বলিয়া আমি তাঁহাকে জড়াইয়া লইয়া গৃহে গেলাম। তিনি সেইখানে পৌঁছিয়া "বাবুয়া! বাবুয়া!" বলিয়া নির্ম্মলকে ডাকিতে লাগিলেন। পরিচিত কণ্ঠ শুনিয়া, স্ত্রী

নির্ম্মলকে পাঠাইয়া দিলে তিনি তাহাকে কোলে লইয়া বসিলেন, এবং কত আদর করিতে লাগিলেন। তখন শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে, আমি কলিকাতার কাছে রাণাঘাট আসিয়াছি শুনিয়া, কেবল আমাকে দেখিবার জন্য একজন ভৃত্য ও একটি বদনা মাত্র সঙ্গে লইয়া বেহারের এই লক্ষপতি হুগলীর পুল পার হইয়া, প্রাতে দশটার ট্রেনে রাণাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিলেন। আমি কোন্ সময়ে কাচারিতে বসি, তাহা খবর লইয়া, আমাকে অপ্রস্তুত করিবার জন্য ঐরূপ ভাবে কাচারিতে গিয়া বসিয়াছিলেন। তখন আমার একজন বন্ধু আমার পরামর্শমতে বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার হইয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে গিয়াই আমাকে পত্র লেখেন—"তোমার আশ্চর্য্য শক্তি। তুমি এখানে অমর নাম রাখিয়া গিয়াছ। এত বৎসর হইয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও তোমার নাম সকলের মুখে মুখে। যাহা দেখি, জিজ্ঞাসা করিলে বলে—"নবীনবাবুকা কিয়া হুয়া (নবীনবাবু করিয়া গিয়াছেন)।" ইনি তাঁহারই নিকট পথের খবর লইয়া আমার কাছে আসিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, কোন মোকদ্দমায় পড়িয়া, কি অন্য কোন বিষয়ের সুপারিসের জন্য তিনি আসিয়াছেন। কই, সমস্ত দিন গেল : কত গল্প, কত কথা। কিন্তু কই, সেরূপ কোনও অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিলেন না। অগত্যা রাত্রিতে আহারের সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার কি কিছু প্রয়োজন আছে?" তিনি বলিলেন—"কিছুই না। কেবল আপনি কলিকাতার কাছে আসিয়াছেন শুনিয়া আপনাকে একবার দেখিবার জন্য কেমন প্রাণ চাহিল। তাই চলিয়া আসিলাম।" তিনি বড় সাধু পুরুষ, বড় ধার্ম্মিক মুসলমান। সঙ্গে ঘোড়ায় বেড়াইতেছি : যেই নমাজের সময় হইল, ইনি অমনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, রাস্তার একপার্শ্বে রুমাল বিছাইয়া নমাজ পড়িতে বসিতেন। আমি ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে চাহিয়া থাকিতাম। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে আমার প্রতি এই অপরিসীম স্নেহ আছে, আমি জানিতাম না। রাত্রিতে কেবল একবার মাত্র বলিলেন যে, তাঁহার শ্বশুর মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। এখন কেবল তাঁহার শোকাতুরা শাশুড়ী ও তিনি মাত্র আছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, তাঁহাদের লক্ষ টাকা মুনফার ভূসম্পত্তি 'ওকফ্' করিয়া ধর্ম্মার্থে দান করিবেন। অতএব তিনি মাসেক পরে সে বিষয়ের পরামর্শের জন্য আবার আসিবেন। আমাকে তাহা স্থির করিয়া দিতে হইবে। পরদিন প্রাতে দশটার ট্রেনে তিনি চলিয়া গেলেন। আবার দুই বন্ধু বুকে বুক দিয়া গলদশ্রুনয়নে বিদায় হইলাম। ট্রেন যখন খুলিল, তখনও তিনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আছেন। যতদূর দেখা গেল, গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রুমালে অশ্রু মুছিতেছিলেন ও রুমাল উড়াইয়া আমাকে আদর জানাইতেছিলেন। আমিও তাহাই করিতেছিলাম। একজন পশ্চিমী মুসলমানের সঙ্গে আমার এ আত্মীয়তা সমস্ত ষ্টেশন স্থিরনয়নে দেখিতেছিল। শেষে ষ্টেশনমাষ্টার না জিজ্ঞাসা করিয়া পারিলেন না। ইহার এক পক্ষকাল পরে বেহারের অন্য একজন জমিদার লিখিলেন—"মৌলবি আলি আহম্মদ পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময়ে আপনাকে তাঁহার প্রীতিপূর্ণ শেষ সেলাম জানাইয়াছেন।" পত্র হাতে করিয়া পতি পত্নী পুত্র তিনজনে কাঁদিতে লাগিলাম। আমার হৃদয়ে যেন শেল বিদ্ধ হইল। হায়! মরিবেন বলিয়া জানিয়া কি এই সাধু পুরুষ আমার কাছে এত দূরে বিদায় লইতে আসিয়াছিলেন? আমার বোধ হইল, আমার একটি সহোদর হারাইয়াছি। আমরা সপ্তাহকাল তাঁহার অশৌচ গ্রহণ করিয়া নিরামিষ খাইয়াছিলাম। ভাই! তুমি আজ তোমার পবিত্র চরিত্রানুযায়ী পবিত্র লোকে দেববৎ বিরাজ করিতেছ। কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। আজ আমি এই নির্জ্জন গৃহে তোমার অতুল স্নেহের কাহিনী লিখিতে লিখিতে শোকপূর্ণ হৃদয়ে অশ্রু বর্ষণ করিতেছি। তুমি দেবলোক হইতে আমাদের তিনটির প্রতি তোমার অজস্র দেব-আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিও, যেন এ শেষ জীবনে দুটি দিন শান্তিতে কাটাইয়া তোমার কাছে গিয়া তোমার সেই অপার্থিব বন্ধুতা উপভোগ করিতে পারি। তোমারই জন্য বেহার আমার পক্ষে একটি পবিত্র তীর্থ হইয়া রহিয়াছে।

পরদিন প্রাতের ট্রেনে মিঃ মেটকাফের অনুরোধমতে তাঁহার কাছে বিদায় হইতে পাটনা গেলাম। তিনি এবার আমাকে Drawing room কক্ষে লইয়া গেলেন, এবং প্রায় দুইঘণ্টা কাল কত আদরের কথা, কত প্রশংসার কথা, আমাকে হারাইয়া কত আক্ষেপের কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন, ভাগলপুরের কলেক্টর মিঃ ডয়লি (Doylc) তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু। তিনি তাঁহার কাছে আমার কথা লিখিবেন। আমার সেখানে কোনও কষ্ট হইবে না। যখন বিদায় হইতে উঠিলাম, তাঁহার চক্ষু সজল হইল। তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার গাড়ী পর্য্যন্ত আসিলেন। গাড়ীর কপাট নিজে খুলিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন, এবং কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া সজলনেত্রে আরও কত কি বলিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। আমি রুমাল দিয়া চোক চাপিয়া অধোমুখে শুনিতেছিলাম। গাড়ী চলিল : আমার বোধ হইল, আমার একজন স্নেহময় পিতৃব্য হইতে আমি এ জীবনের জন্য বিদায় হইয়া আসিলাম। দাসত্বের ঘূর্ণচক্রে আর তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। হায়! সে সকল উচ্চবংশীয় উন্নতমনা সহৃদয় ইংরাজ কর্ম্মচারী আজ কোথায় গেল? তাহার পরও বিশবৎসর চাকরি করিলাম। কই, আর একটি লোক তেমন দেখিলাম না। 'ইলবার্ট বিলে'র ঝড়ের সময়ে একদিন সেই কথা ভুলিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"নবীনবাবু! তোমার মত লোক ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট হইলে, আমি যদি অপরাধী হই, একজন ইংরাজ মাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা তোমার কাছে আমার বিচার হইতে আমি কিঞ্চিৎমাত্র আপত্তি করিব না, বরং সন্তুষ্ট হইব। কিন্তু তোমার মত লোককে মাজিষ্ট্রেট ত গবর্ণমেণ্ট কখনও করিবেন না।" আর একদিন সন্ধ্যার পর একত্রে গাড়ী করিয়া উভয়ে বেড়াইয়া আসিলে, তিনি আমাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"নবীনবাবু! তোমার যদি বিশেষ কাজ না থাকে, এবং তুমি যদি কিছুকাল বসিতে চাহ, আমি তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ আলাপ করিতে চাহি। আমি ত্রিশবৎসর তোমাদের দেশে অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমি এখনও তোমার দেশের কিছুই জানিতে পারি নাই। ইহার একমাত্র কারণ, ইংরাজ ও দেশীয় ভদ্রলোকদের সামাজিক সম্মিলনের অভাব। তাহাতে দুইটি প্রধান অন্তরায়—তোমাদের স্ত্রীলোকের পর্দ্দাপ্রণালী এবং তোমাদের আচার ব্যবহার। দেখ, দ্বারভাঙ্গার বর্ত্তমান মহারাজা যখন বালক ছিলেন, তখন তাঁহাকে আমি ও আমার স্ত্রী অত্যন্ত ভালবাসিতাম। এমন কি, এক পরিবারস্থের মত দেখিতাম। তিনি আমার গৃহে আমার সন্তানদের সঙ্গে আমার সন্তানের মত থাকিতেন। কিন্তু তিনি যেই মহারাজা হইলেন, আমি দেখিলাম, তাঁহাকে আর সঙ্গে রাখা অসম্ভব। তাঁহার সেই তৈলমর্দ্দন, পূজা ইত্যাদি আমাদের গৃহে হইতে পারে না। সে অবধি তাঁহাকে আমি তাঁবু দিয়া স্বতন্ত্র ভাবে রাখিতে বাধ্য হই।" আমি বড় সংকটে পড়িলাম। উপরিস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সঙ্গে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, এবং সমাজনীতি সম্বন্ধে কোনও আলাপ করা আমার নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া আমি ক্ষমা চাহিলাম। তিনি বলিলেন যে, তিনি উপরিস্থ কর্ম্মচারী ভাবে নহে, বন্ধুভাবে আমার সঙ্গে এই সকল বিষয়ে আলাপ করিতে চাহেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস যে, আমি কখনও অসরল ভাবে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মন যোগাইয়া কথা বলিব না। আমি তখন বলিলাম—"আপনি যখন এরূপ বলিতেছেন, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা সাহেব সাজিলে কি আপনি শ্রদ্ধা করিবেন?" উত্তর—"না। আমি তাহাকে বরং ঘৃণা করিব।" প্রশ্ন—"তবে সাহেবি আচার ও দেশীয় আচারের মধ্যে তাঁহার দেশীয় আচার অনুসরণ করা ভিন্ন দ্বারভাঙ্গার মহারাজার উপায়ান্তর কি? • তিনি আপনার গৃহে প্রকাশ্য তৈলমর্দ্দনটা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু পূজা ত ত্যাগ করিতে পারিবেন না।" তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমি বলিতে লাগিলাম—"আর পর্দ্দা কি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নাই। ইহারা ত পরস্পরের কাছে স্ত্রী বাহির করে না। অথচ তাহাদের মধ্যেও ত বেশ বন্ধুতা ও সদ্‌ভাব আছে। মোগল সম্রাটেরা তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব

ও সেনাপতিত্ব পর্যন্ত হিন্দুদিগকে দিয়াছিলেন।" এ সকল কথা আর একদিন আর এক উচ্চ ইংরাজ কর্ম্মচারীর সঙ্গেও হইয়াছিল। অতএব উহা পরে স্থানান্তরে বলিব। তিনি আমার কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আমাকে প্রায় রাত্রি এগারটার সময়ে বিদায় দিয়া বলিলেন—"অদ্যকার আলাপে আমি আপনার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ হইলাম। আমি অনেক কথা নূতন শুনিলাম ও বুঝিলাম। আমার অনেক ভ্রান্তি দূর হইল।" আমি এই মহানুভব ব্যক্তি হইতে বিদায় লইয়া বক্তিয়ারপুর ফিরিলাম এবং সেখান হইতে সপরিবার ভাগলপুর চলিলাম।

ভাগলপুর

ভাগলপুর বড় সুন্দর স্থান। উহা ভাগীরথীর তীরে স্থাপিত। যদিও গঙ্গা এখন চড়া পড়িয়া স্থানে স্থানে ভাগলপুর হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমরা যখন ভাগলপুরে উপস্থিত হইলাম, তখন শরতের প্রারম্ভ। দেবী তখন আকুলপূরিতা, দিগন্ত-প্রসারিতা, তরঙ্গ-বিক্ষোভিতা। সৌভাগ্যক্রমে একজন বন্ধু বর্দ্ধমান মহারাজার 'পুলিনপুরী' নামক উদ্যান-বাটিকা আমার জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। গৃহখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু বড় সুন্দর। তাহাতে দুইটি বিস্তৃত কক্ষ। তাহার চারিদিকে প্রশস্ত বারাণ্ডা, এবং বারাণ্ডার চারিকোণায় চারিটি সুন্দর কক্ষ। গৃহখানি ভাগীরথীর তটপ্রান্তে অবস্থিত, এ জন্য নাম 'পুলিনপুরী', এবং তাহার চারিদিকে গোলাপ ও কামিনীফুলের কেয়ারি সজ্জিত পুষ্পোদ্যান। ইহার অতুলনীয় শোভার কথা আর কি বলিব? স্থানটি একটি কবিকুঞ্জ বলিলেও চলে। বাড়ী দেখিয়া, এবং তাহার সম্মুখস্থ ভারত-পূজিতা জননী জাহ্নবীর কল্পনাতীত লীলাময়ী শোভা দেখিয়া আমার প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। আমি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের পূজার পূর্ব্বক্ষণে আগষ্ট মাসে ভাগলপুর পৌঁছি, এবং সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষেই ছুটি লইয়া ভাগলপুর ত্যাগ করিয়া আসি। অতএব তিনচারি মাস মাত্র আমি ভাগলপুরে ছিলাম। যতক্ষণ গৃহে থাকিতাম, আমি আত্মহারা হইয়া ভাগীরথীর সলিল-শোভা মুগ্ধপ্রাণে দেখিতাম। এরূপ নদীতীরে, বিশেষতঃ গঙ্গাতীরে বাস আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

উকিলসম্প্রদায়ই ভাগলপুরের সর্ব্বস্ব। হা অদৃষ্ট! আমার সঙ্গে যাঁহারা বি. এ. পরীক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা এখানে ওকালতী করিয়া এক একজন ক্ষুদ্র কুবেরের মত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই মনোহর উদ্যান-শোভিত অট্টালিকা। আমার "পুলিনপুরী"র পার্শ্বেই উকিল-তিলক সূর্য্যকান্ত সিংহের বৃক্ষরাজি-শোভিত প্রকাণ্ড হাতাবেষ্টিত অট্টালিকা। যখন দার্জ্জিলিং ছিল না, তখন বঙ্গেশ্বর স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য ভাগলপুর আসিয়া এই অট্টালিকায় থাকিতেন। অতএব ইহার নাম ছোট "বেলভিডিয়র"। কি সুন্দর স্থান! কি সুন্দর বাড়ী! একটি রাজপ্রাসাদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শুনিলাম, সূর্য্যকান্ত উহা জলের দামে কিনিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া উকিলদের একটি ক্লব (club) আছে। তাহাতে হাকিমসম্প্রদায়ও স্থান পাইয়া থাকেন। আমিও পাইলাম। সাহেবদের ক্লব (club) দেখিয়া ভাবিতাম, বাঙ্গালীদের কখনও কি ক্লব হইবে? অতএব এখানে বাঙ্গালীর ক্লব আছে শুনিয়া আমার আনন্দের সীমা রহিল না। যেদিন এখানে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিলাম, সেইদিনই সন্ধ্যার সময়ে উহা দেখিতে গেলাম। দেখিয়া নিরাশ হইলাম। সাহেবদের ক্লবে পঞ্চ মকারের সন্নিবেশে বিদ্যুৎ খেলে। আর বাঙ্গালীর ক্লবে দেখিলাম, বড় জোর লেমোনেড, সোডা—বিদ্যুৎবিহীন বারি মাত্র। কিছুক্ষণ বসিলেই—

"ঘন ঘন উঠে হাই, না মানে দোহাই"

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত Lawn tennis খেলিয়া কোনও মতে সায়াহ্ন কাটিত। তাহার পর গৃহে প্রবেশ করিলে যেখানে উকিল, সেখানে মোকদ্দমার যেখানে, ডেপুটি, সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেটের মেজাজের এবং যেখানে সবজজ মুন্সেফ, সেখানে জজ সাহেবের বেত্রাঘাতে খাটুনির কথা। আমি কিছুক্ষণ হাই তুলিয়া, গৃহে ফিরিয়া গিয়া বরং ভাগীরথীর বক্ষে অচল ও সচল তরণীস্থ আলোক-ক্রীড়া দেখিয়া প্রাণে আরাম অনুভব করিতাম। কিছুদিন পরে দেখিলাম, যাঁহারা ক্লবে উপস্থিত হন, তাঁহাদের কাহারও মধ্যে প্রকৃত বন্ধুতা, এমন কি, সদ্ভাব পর্য্যন্ত নাই। কেবল ফাঁকা হৃদয়শূন্য শিষ্টাচার। কখন বা পরস্পরের নিন্দা। আমি এভাব দেখিয়া ক্লব হইতে বিজয়া করিলাম। তদপেক্ষা সূর্য্যনারায়ণ-বাবুর কাছে বসিয়া যেন আনন্দ অনুভব করিতাম। তাঁহার ও আমার প্রকৃতি বিপরীত হইলেও তথাপি লোকটি খাঁটি। অন্তরে বাহিরে এক। আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি আমাকে এতদূর স্নেহ করিতেন যে, সপরিবার তাঁহার বাড়ীতে গিয়া থাকিতে বরাবর অনুরোধ করিতেন। তিনি বিপত্নীক। পরিবারের মধ্যে একজন বিধবা ভ্রাতৃবধূ, কি ভগ্নী ও তাঁহার দুই শিশুপুত্র। তিনি আমাকে অর্দ্ধেক বাড়ী ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন। তিনি একদিন বলিলেন যে, তিনি উকিলির দ্বারা দশলক্ষ টাকা করিয়াছিলেন। লোকে সঞ্চয়ের কথা বলিতে চাহে না। তাঁহার সে আপত্তি নাই। তাঁহার একখানি নোটবুক আমাকে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার কি আছে, আমি দেখিয়া লইতে পারি। তবে এক জমিদারী কিনিয়া তাঁহার একলক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছিল। তাহা পূরণ করিলে তিনি ওকালতি ত্যাগ করিবেন। কিন্তু রূপচাঁদের এমন মায়া : তাহা পারেন নাই। তিনি আজ স্বর্গে। শ্রীভগবান্ তাঁহার পুত্রদের দীর্ঘজীবী করুন এবং তাহাদের দ্বারা তাঁহার মুখোজ্জ্বল করুন। ইতিমধ্যেই তাঁহারা অর্থ সৎপথে ব্যয় করিতেছেন।

১। খাসমহল বা খামখেয়াল

আমার হাতে সার্টিফিকেটের ভার পড়িয়াছে। দেখিলাম, প্রায় তিনশত মোকদ্দমা খাসমহলের দরিদ্র প্রজাদের নামে উপস্থিত আছে। বলিয়াছি, এ অঞ্চলে বৃষ্টির অভাবে সুফল-বৎসর বড় অল্প হইয়া থাকে। তাহাতে খাসমহলে ফসলের অংশের দ্বারা খাজনা আদায় হয় না। নগদ টাকা দিতে হয়। ফসল হউক না হউক, এ খাজনা দিতেই হইবে। প্রজারা তাহা পারে নাই। মানুষের ত বিধাতার উপর হাত নাই। ফসল ভাল না হইলে খাজনা কোথা হইতে দিবে? লাঠির চোটে প্রজাদের নিকট হইতে তমসুক লওয়া হইয়াছে। তাহাও রেজেষ্ট্রী করা হয় নাই। তাহার উপর এ সকল তমসুকের মেয়াদও অতীত হইয়াছে। প্রজা এমন দুরবস্থাপন্ন যে, বাকী খাজনার জন্য তমসুক দিয়া তিনবৎসরের মধ্যে তাহারও কিছু দিতে পারে নাই। তারপর তাহাদের নামে এই টাকার জন্য সার্টিফিকেট হইয়াছে। কেমন করিয়া ডেপুটি প্রভুরা এ সার্টিফিকেট-অস্ত্র গরীবদের উপর নিক্ষেপ করিয়াছেন জানি না। তমসুক আইনমতে রেজেষ্ট্রী হয় নাই, তাহার উপর মেয়াদ গিয়াছে, অতএব এই সকল মোকদ্দমা চলিতে পারে না বলিয়া আমি উপরোক্ত তিনশত মোকদ্দমা এক হুকুমে খারিজ করিয়া দিয়াছি। তাহাতে গবর্ণমেণ্টের প্রায় তিনহাজার টাকা ধ্বংসপুরে গিয়াছে। খাসমহলের ডেপুটি কলেক্টর আমার এ গুরুতর 'গোস্তাকি'র বা রাজভক্তি-বিহীনতার জন্য কলেক্টরের কাছে নালিশ করিয়াছেন। কলেক্টর আমার সেই আরার কলেক্টর মিঃ ডয়েলি (Doyle)। তিনি আমাকে খুব ভাল জানিতেন এবং এখানেও আসিবামাত্র বড় আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন যে, মিঃ মেটকাফ্ আমার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনহাজার টাকা এক হুকুমে উড়াইয়া

দিয়াছি,—অতএব অনুরোধ ও শিষ্টাচার সব উড়িয়া গেল। তিনি আমাকে তলব দিলেন। গিয়া দেখিলাম, তিনি এজলাসে ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, গতিক ভাল নহে। আজ প্রকাশ্য কোর্টে অপমানিত হইব। আমাকে এজলাসে একপার্শ্বে বসিতে দিলেন। কিছুক্ষণ ক্রোধে কথা কহিতে পারিলেন না। শেষে শ্বেত বদনমণ্ডল হইতে রক্তমেঘ কিঞ্চিৎ অপসারিত করিয়া প্রশমিতক্রোধে বলিলেন—"আপনি খাসমহলের তিনশত সার্টিফিকেট একসঙ্গে খারিজ করিয়া দিয়াছেন?"

উ। হাঁ।

প্র। কেন?

উ। তাহা ত আপনার সম্মুখস্থ আমার আদেশপত্রেই লিখিত আছে।

প্র। আপনি বলিতেছেন, তমসুক রেজেষ্ট্রী হয় নাই ও মেয়াদ গিয়াছে। আপনি কোন্ আইনমতে খারিজ করিলেন?

আমি সার্টিফিকেট আইনের ধারাটি উল্টাইয়া দেখাইলাম। তখন আবার তাঁহার মুখ জবা-কুসুম-সঙ্কাশ হইয়া উঠিল।

প্র। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তীরা কেমন করিয়া এরূপ অবস্থায় ডিক্রি দিয়াছিলেন?

উ। আমি বলিতে পারি না।

প্র। তাঁহারা যখন ডিক্রি দিয়াছেন, আপনারও দেওয়া উচিত ছিল।

উ। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সেরূপ লিখিত আদেশ দিন।

প্র। আমি কেমন করিয়া সেরূপ আদেশ দিব?

উ। আপনি জেলার কলেক্টর। আপনার যাহা আদেশ করিতে সাহস হইতেছে না, আমি কার্য্যে তাহা কিরূপে করিব? আমার ডিক্রির প্রতিকূলে সিভিল কোর্টে নালিস হইলে আপনি কি জবাব দিবেন? তখন গবর্ণমেণ্ট আমার কৈফিয়ত চাহিবেন। আমি কি জবাব দিব? গবর্ণমেণ্ট তখন বলিবেন—"তোমাকে এরূপ অন্যায় ডিক্রি দিতে কে বলিয়াছিল? এ সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে উভয় পক্ষের যাহা ক্ষতি হইয়াছে. তাহা তোমাকে পূরণ করিতে হইবে।" তখনই বা কি জবাব দিব?

প্র। তবে এ সম্বন্ধে আপনি কি পরামর্শ দেন?

উ। আপনিই কেন বুঝিতে পারিতেছেন না। আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা অনুগ্রহ মাত্র। যদি প্রজার অবস্থা শোচনীয় হয়, এবং এ সকল টাকা আদায় হইবার সম্ভাবনা না থাকে. তবে উহা আদায়ের অযোগ্য বলিয়া খারিজ করিয়া দেওয়া উচিত। আর না হয়, একবার যেরূপ গবর্ণমেণ্ট তমসুক লইয়াছেন, আর একবার লইয়া তাহা রেজেষ্ট্রী করিয়া লউন. এবং এই তমসুকের মেয়াদমধ্যেও টাকা আদায় না হইলে, তখন আইনমতে সার্টিফিকেট জারি করিতে পারিবেন।

তিনি খাসমহলের ডেপুটি কলেক্টরকে ডাকিলেন। ইনি দেখিলাম, একজন "ইম্পিরিয়েল এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান।" কলেক্টর তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। অনেক টাকা আমি উঠাইয়া দিয়াছি বলিয়া তিনি একটু গ্রীবা কণ্ডুয়ন করিয়া বলিলেন, তমসুক লইতে পারেন কিনা, চেষ্টা করিবেন। তখন কলেক্টর তাঁহাকে ও আমাকে বিদায় দিলেন। মিঃ ডয়েলিকে আমি বড় ভদ্রলোক বলিয়া জানিতাম। দেখিলাম, দেশীয় দরিদ্র প্রজার গ্রীবাচ্ছেদ করিতে ভদ্র ইংরাজেরও সর্ব্বদা দয়ার উদ্রেক হয় না।

আমি এজলাসে ফিরিয়া আসিলে কলেক্টরির বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেরেস্তাদার আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার চাপকানের অভ্যন্তর হইতে যজ্ঞোপবীত বাহির করিয়া বলিলেন—"আমি ব্রাহ্মণ। এই পৈতা ছুঁইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি। এ সাহস একদিন দুর্গাদাস চৌধুরীর দেখিয়াছিলাম: আর আজ আপনার দেখিলাম। এ গরিব প্রজাদের মুষ্টান্নও দিনান্তে

জোটে না। আমি এই সার্টিফিকেট জারির ঘোরতর প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু কলেক্টর শুনিলেন না। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটি কলেক্টরেরাও অম্লানমুখে ডিক্রি দিলেন। অথচ তাহার একপয়সাও উশুল হয় নাই। হতভাগ্যদের কিছুই নাই। কি হইতে উশুল হইবে। আজও কলেক্টরের সঙ্গে আপনার খারিজি মোকদ্দমা লইয়া আমার একহাত হইয়া গিয়াছে। তথাপি তিনি আমার প্রতিবাদ শুনিলেন না। যখন ক্রোধে মুখ লাল করিয়া আপনাকে তবল দিলেন, আমি বড়ই চিন্তিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, আপনাকে প্রকাশ্য কোর্টে কি একটা অপমান করিয়া সমস্ত বঙ্গদেশের প্রাণে ব্যথা দিবেন। আপনাতে ও অন্য ডেপুটি কলেক্টরে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কিন্তু আপনার দৃঢ় নির্ভীকতায় ও সতেজ বাক্যে সাহেবের মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। সমস্ত কাচারিতে একটা ঢি ঢি পড়িয়া গিয়াছে।" আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া দুর্গাদাসবাবুর উপাখ্যানটি শুনিতে চাহিলাম। তিনি তখন আমাকে ভাগলপুরের সেই ইন্‌কম্ টেক্সের কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনাইলেন। তাহা আমি পূর্ব্বে বিবৃত করিয়াছি। সন্ধ্যার সময়ে ক্লবে গিয়া দেখিলাম যে, এ কথার খুব আলোচনা হইতেছে। অনেক সভ্যেরা আমাকে আমার সাহসের ও সুবিচারের জন্য Congratulate করিলেন। একজন খ্যাতনামা উকিল অন্য ডেপুটিদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"বাবা! কেবল খোসামুদি কর। নবীনের কাছে একটু সৎসাহস (Courage) শিক্ষা কর।"

২। মন্দার দর্শন

উক্ত উকিল মহাশয়ের সঙ্গে আমার একটু বেশ আত্মীয়তা হইয়াছিল। তিনি বড় দরিদ্রের সন্তান। মাতুলালয়ে থাকিয়া শিক্ষা করিয়া বি. এল. পাস করিয়া ভাগলপুরে উকিল হন, এবং তাঁহার মাতুলের আদেশমতে মুন্সেফির প্রার্থনা করেন। ইতিমধ্যে কয়েক মাস চলিয়া যায়। যখন মুন্সেফির নিয়োগপত্র আসিল, তখন তাঁহার এরূপ পসার হইয়াছে যে, মুন্সেফি গ্রহণ করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন না। এরূপে চাকরির দুর্গতি হইতে তাঁহার ভাগ্যদেবী তাঁহাকে রক্ষা করিলেন। আমার সঙ্গেই বি. এ. দিয়াছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই শুনিলাম, আটদশ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। আর আমার তখনও চারিশত মুদ্রা বেতন। হা অদৃষ্ট! যাহা হউক, তিনি আমাকে ঐ অল্পদিনেই ভালবাসিতেন ও 'কবি' বলিয়া সর্ব্বদা ডাকিতেন। তাঁহার কেমন একটা গোঁ ছিল যে, তখনই আমার সময়ে সময়ে বিশ্বাস হইত যে, তিনি পাগল হইবেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে দুজনে তাঁহার গৃহে বসিয়া গল্প করিতেছি, তিনি পার্শ্বের একটি কামরার দিকে চাহিয়াছিলেন। অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন—"দেখ নবীন! আমি যখন আমার মামার বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতাম, তখন আমার একপয়সার তৈল মিলিত। সমস্ত রাত্রি তাহার দ্বারা পড়িতে হইবে। তাহা একটা মাটির প্রদীপে একটা সরু শলিতা দিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া পড়িতাম। আর ঐ দেখ, আমার পুত্রের পড়ার ঘরে ঐ বৃহৎ 'অর্গান-লেম্প' জ্বলিতেছে। এ লক্ষীছাড়া ছোঁড়ার কিছু লেখাপড়া যে হইবে না, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।" আমি কত প্রতিবাদ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সিদ্ধান্ত টলিল না। ফলেও তাহাই হইয়াছে।

আর একদিন প্রাতে "আলেষ্টার" গায়ে আমি বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার বাড়ী গিয়াছি। বেলা অনুমান আটটা। তিনি বলিলেন—"কবি! তুমি মন্দারপর্ব্বত দেখিতে চাহিয়াছিলে। আজ আমার সঙ্গে চল। আমি বাঁকা সবডিভিসনাল অফিসারের কাছে এক মোকদ্দমায় যাইতেছি। তিনি মন্দারপর্ব্বতের গোড়ায় তাঁবুতে আছেন। অতএব তুমি চল।" আমি—"তুমি কখন যাইবে?" উত্তর—"এই এখনই খাওয়া দাওয়া করিয়া রওনা হইব। তুমিও এখানে স্নান করিবে ও খাইবে, এবং আমার সঙ্গে যাইবে।" আমি—"সে কি কথা? আমি

বেড়াইতে আসিয়াছি। এখান হইতে কেমন করিয়া যাইব।" তিনি কালি কলম কাগজ দিয়া বলিলেন—"জ্বালাতন করিও না। তোমার স্ত্রীর কাছে পত্র লিখিয়া দেও। আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না।" তিনি এ কথাগুলি কেমন একটা জিদ করিয়া বলিলেন যে, আমার ভয় হইল। চক্ষে কেমন সেই এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ। কি করিব? স্ত্রীর কাছে পত্র লিখিলাম। স্নান করিলাম না। পাছে পলাইয়া যাই; তিনি হাত ধরিয়া খাইতে লইয়া গেলেন, এবং আমাকে সেই অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ সহ লইয়া এক ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বাঁকা রওনা হইলেন। তখন বেলা অনুমান দশটা। বাঁকা সেখান হইতে পঁচিশ কি ত্রিশ মাইল। বলিলেন, গাড়ীর ডাক বসাইয়াছেন, আমাকে চারি পাঁচটার সময়ে আনিয়া আমার বাসায় লইয়া আমার স্ত্রীর হাতে তুলিয়া দিবেন।

কোথায় বা গাড়ীর ডাক। সেই এক রথে শীতের সময়ের সেই দীর্ঘ পথের ধূলা গলাধঃকরণ করিতে করিতে মৃতবৎ মন্দারপর্ব্বতের পাদমূলস্থ ডাকবাঙ্গলায় পৌঁছিলাম। তখন বেলা দুইটা। আমি এক 'চারপায়ার' উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া গেলাম। বন্ধুবর চোগা, সামলা চড়াইয়া বলিলেন—"নবীন! তুমি মুখ হাত ধোও, আমি কাজটা সারিয়া আসি।" আমি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলাম—"দোহাই তোমার। তুমি কখনও ছয়টার আগে ফিরিবে না। আমি একাকিনী অসহায়া স্ত্রীকে একটি শিশু পুত্র সহ সেই ভাগীরথীর তীরে ফেলিয়া আসিয়াছি। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে না পারিলে বড় বিপদের কথা। তুমি ঘণ্টাখানেক পরে আমার ফিরিয়া যাইবার কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাও।" তিনি আবার তাঁহার সেই অস্বাভাবিক জ্যোতিঃপূর্ণ নয়নে বলিলেন—"তুমি পাগল না কি? আমি এখনি ফিরিয়া আসিতেছি। আসিয়া তোমাকে মন্দার পাহাড়ের উপর লইয়া যাইব। তাহারপর ভাগলপুর ফিরিয়া যাইব। আমি কি স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া আসি নাই।" তিনি চলিয়া গেলেন। আমি ভাবিলাম, না জানি আজ আরও কি দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। কিন্তু তিনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন—"কই কবি! তুমি প্রস্তুত?" আমি আশ্চর্য্য হইলাম। বলিলাম—"তুমি এখনই ফিরিয়া আসিলে যে? তোমার মোকদ্দমার কি হইল? তিনি বলিলেন—"আরে, মোকদ্দমা নহে। ৩২৩ ধারার একটা মোকদ্দমায় বিবাদীর পক্ষে একটা আপোসের দরখাস্ত মাত্র করিতে আসিয়াছিলাম। তাহা দিয়া আসিলাম।" আমি—"৩২৩ ধারার মোকদ্দমায় ত আপোসের দরখাস্ত দিলেই কোর্ট লইতে বাধ্য। তোমার আসিবার কি প্রয়োজন ছিল?" তিনি হাসিয়া বলিলেন—"তোমার যেমন বিদ্যা! আমি এই আসামীকে বলিয়াছিলাম, দরখাস্ত মঞ্জুর না হইলে আইনমতে তিনবৎসর মেয়াদ হইতে পারে। তাহাতেই ত সে আমাকে আনিয়াছে।" আমি—"তুমি কত টাকা লইয়াছ?" উত্তর—"আড়াই শত।" আমি স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পরে বলিলাম—"তুমি এমন করিয়া বেচারিকে ঠকাইলে! তোমার কি Conscicnce (বিবেকশক্তি) নাই? উত্তর—"উকিলের Conscience তাহার পকেটে। তুমি এখন চল।" তখন আমার ষ্টেটস্‌মেন পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক রবার্ট নাইটের একটি কথা মনে পড়িল—Bar has a morality of its own (উকিল প্রভৃতির নিজের একটা ধর্ম্মশাস্ত্র আছে)। উকিল মহাশয়েরা এরূপেই লক্ষপতি হইয়া থাকেন; এবং ভারত উদ্ধারের দলপতি হন। ভারতচন্দ্রের উকিলের পত্নী বলিয়াছেন—

"উকীল আমার পতি কিল খেতে দড়।"

আবার

"উকীল আছিল যারা, কিল খেয়ে হ'ল সারা।"

এখনকার উকিলপত্নী বলিতে পারেন—

"উকিল আমার পতি টাকা নিতে দড়।"

তবে উকিল-কুলতিলক হেমচন্দ্র উকিলদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"সারা দিন ঘুরে বেড়ায় এজলাসে এজলাসে।
তিন তের লাথি খেয়ে ঘরে ফিরে আসে।"

এরূপভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে গেলে যদি উনচল্লিশটি পাদপদ্ম উপহার পাইতে হয়, তাহা অনুচিত বলিয়া ত বোধ হয় না।

যাক। আমরা মন্দারপর্ব্বত দর্শন করিতে গেলাম। পর্ব্বতের সানুদেশে একটি সামান্য মন্দিরে কি একটা বিগ্রহ দেখিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। পর্ব্বতটি বেহারের পর্ব্বতমালার মত কৃষ্ণশিলাময়। তাহার অঙ্গ বেষ্টন করিয়া একটি সর্পের রেখা অতি কদর্য্যভাবে কাটা দেখিয়াছিলাম। পৌরাণিক উপাখ্যানমতে দেবগণ বাসুকিকে রজ্জু করিয়া, মন্দারপর্ব্বতের দ্বারা সমুদ্র মন্থন করিয়া সুধা, চন্দ্র, লক্ষ্মী, ধন্বন্তরি, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ইত্যাদি উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ভার তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের উপর। কিন্তু আত্মিক ব্যাখ্যায় এই গল্পের মাথামুণ্ডু সার্থকতা ত কিছুই বুঝিলাম না। তবে ইহা হইতে পারে যে, এককালে সমুদ্র এই শৈল বেষ্টন করিয়াছিল। ইহার দ্বারা সমুদ্রতরঙ্গ প্রহত ও সমুদ্র মথিত হইত। তখন হয় ত ইহা সর্পের উপনিবেশ ছিল। ক্রমে সমুদ্র সরিয়া গিয়া তাহার পল্বলে যে উর্ব্বরা ভূমি সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সলিল এখনও সুধা, এবং ভূমি এখনও লক্ষ্মীপ্রসবিনী। বুঝি এককালে তাহাতে চন্দ্রবংশীয় নৃপতি কেহ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং তাহা বিখ্যাত চিকিৎসক ও অশ্বের জন্য খ্যাত ছিল। যাহা হউক, পার্ব্বতী চট্টলমাতার অঙ্কে পালিত আমার পক্ষে মন্দারপর্ব্বতে দেখিবার কিছুই দেখিলাম না। কেবল সানুদেশ হইতে চারিদিকে মগধরাজ্যের আম্রকাননখচিত কৃষিক্ষেত্রের যে বিস্তৃত শোভা দেখা যায়, তাহা ভুলিবার নহে।

পর্ব্বত দর্শন করিয়া আমরা যখন নামিয়া আসিলাম, তখন বেলা পাঁচটা। সূর্য্যদেব পশ্চিম আকাশ রক্ত-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া শান্ত শ্রান্তভাবে অস্ত যাইতেছেন। পর্ব্বত হইতে নামিয়াই দেখি, বাঁকার সবডিভিসনাল অফিসার বাবু আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন যে, শুধু তিনি নহেন, তাঁহার পুত্র কন্যারাও আমাকে দেখিবার জন্য এত লালায়িত যে, আমি পৌঁছিবা মাত্র তিনি তাহাদিগকে বাঁকা হইতে আনিবার জন্য তাঁহার গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব তাঁহার অনুরোধ ঠেলিয়াও যদি আমি যাই, কোমল শিশুদিগকে নিরাশ করা উচিত হইবে না। দেখিলাম, তিনি একজন আমাদের সময়ের উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোক ডেপুটি। তাঁহার অভ্যর্থনা ও সুজনতার জন্য শত ধন্যবাদ দিয়া আমি থাকিতে অসম্মত হইলাম, এবং কি ভাবে আমি স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে অসহায় ফেলিয়া, সেই পাগলের কথায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি, তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। তখন তিনি আমাকে যাইতে বলিলেন। আমরা গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। কিন্তু ঘোড়া ও কোচমান কোথায়? তাহাদিগকে সঙ্গীয় ভৃত্যদের ডাকিতে ডাকিতে গলা চিরিয়া গেল। কোনও সাড়া শব্দ নাই। আমি উকিল বন্ধুকে তখন বড়ই তিরস্কার করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন—"তুমি আমাকে বকিতেছ কেন? তুমি দেখিতেছ না—বাবু দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। তিনি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। তুমি ওই ঘোড়ার ডিম কবি নাম করিয়াছ কেন? দোষ তোমার না আমার। তোমাকে সঙ্গে আনিয়া আমিও স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া বিপদে পড়িলাম।" আমি দেখিলাম, এই প্রহসন মন্দ নহে। আমি দুইদিকেরই রসিকতার পাত্র হইয়াছি। ডেপুটিবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আপনি জানেন, আমি এখানের সবডিভিসনাল অফিসার। যখন ইহাঁর কাছে শুনিলাম, আপনি কিছুতেই থাকিবেন না, তখন আপনারা পাহাড়ে উঠিলে আমি আপনাদের সারথি ও তাহার পক্ষিরাজযুগলকে তাহাদের বাহকের শিষ্টাচারশূন্যতার অপরাধে জেলে প্রেরণ করিয়াছি। 'সমাধি' বিচার।" তখন বিষয়টি কি, আমি বুঝিলাম। তখন

বন্ধু বলিলেন—"আরে বোকা! দিব্বি 'ডিনার' প্রস্তুত। ভালমানুষের মত চল্, পেট ভরিয়া খাইয়া, সন্ধ্যার পর রওনা হইয়া, বেশ ঠান্ডায় ঠান্ডায় রাত্রি নয়টার সময় গিয়া ভাগলপুর পোঁছিব। এখন গিয়া আবার ধুলো খাইয়া ত পেট ভরিবে না। আমার অন্তরাত্মা জ্বলিতেছে।" তখন দুজনে আমার দুহাত ধরিয়া, গাড়ী হইতে টানিয়া গ্রেফতারি আসামীর মত লইয়া চলিলেন এবং আমরা ডেপুটিবাবুর শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমলা মোক্তার প্রভৃতি বহুতর লোক কবিদর্শনের জন্য দাঁড়াইয়া আছে। বাবুটি আমাকে দেখাইলেন, এবং আমার কবি ও ডেপুটিগিরির অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া তাহাদের বিদায় দিলেন। তখন নির্জ্জন শিবিরে আনন্দের বাজার খুলিয়া গেল। সত্য সত্যই কিছুক্ষণ পরে ডেপুটিবাবুর বালক বালিকা পুত্র কন্যাগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাকে পাইয়া তাহাদের ও তাহাদের পাইয়া আমার আনন্দ দেখে কে? নয়দশবৎসরের পুত্রটি 'পলাশির যুদ্ধ' মুখস্থ আবৃত্তি করিতে লাগিল। কোথায় সন্ধ্যার পর যাওয়া—আনন্দে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাটাইয়া, এবং উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া আমরা তাঁহার কাছে বিদায় হইলাম। গাড়ী দুই এক পা আসিয়াছে। তিনি পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া থামাইলেন, এবং আসিয়া বলিলেন —"এই দারুণ শীতে তোমরা এত পথ কেমন করিয়া যাইবে। অতএব তোমাদের জন্য আমি কিঞ্চিৎ ঔষধ আনিয়াছি, লইয়া যাও।" দেখিলাম, জল মিশ্রিত করিয়া তিনি এক বোতল ব্রাণ্ডি আনিয়াছেন। বন্ধু বলিলেন, এটি বড় ভাল ব্যবস্থা হইয়াছে। আর পথের জন্য ভয় নাই। ডেপুটিবাবু তাহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। শত নিষেধ সত্ত্বেও তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। বলিলেন—"সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রি। আর কবে ইহাঁকে পাইব। আমি তোমাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকিব। কিছুদূর গিয়া নামিয়া আসিব।" তাহাই হইল। প্রায় দুইমাইল পথ আসিলে আমরা জোর করিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিলাম। গাড়ী খুব বেগে চলিল। হায়! এই শিষ্টাচার, এই অতিথিসৎকার, এবং প্রাণভরা আত্মীয়তা ও আমোদ ইতিমধ্যেই এই সার্ভিসের স্বপ্ন হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গসমাজ এক প্রকার তিরোহিত বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

বড় সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রি। কিন্তু যে শীত, গাড়ীর কপাট খুলিয়া সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ভোগ করিব সাধ্য নাই। ক্রমে রাত্রি যত গভীরা হইতে লাগিল, যেন বরফ পড়িতে লাগিল। তখন মুহুর্মুহুঃ সেই ঔষধ সেবন করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতেও শীত নিবারণ হইল না। অবশেষে শীতে আড়ষ্ট হইয়া গাড়ীতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। শীত নিবারণের জন্য উভয়ে পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। সম্মুখের আসনে একজন ওভারসিয়ার ছিলেন। উকিল বন্ধু ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ছোট কর্ত্তা। বুঝিলাম যে, কেবল আড়াইশত টাকা নহে। রাস্তা পরিদর্শন ছলনা করিয়া, পথখরচাটাও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে আদায় করিবেন। যাহা হউক, কেরাঞ্চি গাড়ীর আন্দোলনে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গে পতিত হইতে হইতে, এবং সময়ে সময়ে সম্মুখস্থ ওভারসিয়ার মহাশয় অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমাদের উভয়ের উপর পড়িয়া আমাদিগকে আপ্যায়িত করিতে করিতে, আমরা রাত্রি দুইটার সময়ে ভাগলপুর আসিলাম। এমন সুখের সন্ধ্যার পর এমন কষ্টকর রাত্রি এ জীবনে আর কাটিয়াছে কি না স্মরণ হয় না। মন্দারপর্ব্বত মাথায় থাকুন, মন্দার কুসুমের জন্যও নন্দনকাননে এত কষ্টে যাইতে আমি সম্মত নহি।

এই উকিল বন্ধুটি সত্য সত্যই কিছুদিন পরে পাগল হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিতে হইয়াছিল। পাগলামির মধ্যে কেবল তাঁহার প্রতিযোগী উকিলদের নাম করিয়া বলিতেন—"অমুক উকিল ঐ মোকদ্দমায় দেড়শত টাকা ফিস নিল। তোরা আমাকে ছাড়িয়া দে।" হা অদৃষ্ট! ইনি দশলক্ষ টাকার বেশী সঞ্চয় করিয়াছেন, কিন্তু এখনও দুষ্পূরণীয় অর্থ-পিপাসা মিটে নাই। তাহারই জন্য উন্মাদ হইয়াছেন। আমি এরূপ

আরও দুই একটি দৃষ্টান্ত জানি। আরও দুই একজন উকিল "হায় টাকা! হায় টাকা!" করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ধন্য রূপচাঁদ! তোমার মাহাত্ম্য ধন্য! তুমিই—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীরূপচাঁদে নমঃ॥"

তুমিই অখণ্ড মণ্ডলাকার। তুমিই একমেবাদ্বিতীয়ং। তুমি থাকিলে সব থাকে, অতএব তুমি সৎ। তুমি না থাকিলেই এ সংসারে চিৎ, এবং বাক্সে বিরাজ করিলেই আনন্দ। অতএব তুমিই সচ্চিদানন্দ।

১৮৯৫। ৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর সঙ্গে আমার কলিকাতায় সাক্ষাৎ হয়। তখন ইনি রোগমুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি সেই রোগ আশঙ্কায় একপ্রকার ওকালতি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আছেন। বেশী ফিস পাইলে তখনও কোন কোন মোকদ্দমা লইয়া ভাগলপুর ছুটিতেন। তখনও তাঁহার অর্থলিপ্সা এতদূর যে, তাহার একটা হাস্যকর দৃষ্টান্ত দিব। কলিকাতায় এক বন্ধুর বাড়ীতে উভয়ের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আহারান্তে আমি আসিতে চাহিলে উকিল বন্ধুটি পূর্ব্ববৎ রোখের সহিত আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—"বস। গাড়ী আনিতে পাঠাইয়াছি। একসঙ্গে যাইব। আমি তোমাকে নামাইয়া দিয়া যাইব।" আমি বলিলাম—"আমার বাড়ী এখান হইতে কয়েক পা মাত্র। জ্যোৎস্না রাত্রি। আমার গাড়ীর কোনও প্রয়োজন নাই।" তিনি আবার বলিলেন—"আর জ্বালাতন কর কেন? আমি তোমাকে নামাইয়া দিয়া যাইব। তোমার বাড়ীর সম্মুখ দিয়াই ত আমাকে যাইতে হইবে।" তিনি চৌরিঙ্গ যাইবেন। আমার বাড়ী হেরিসন রোডের পূর্ব্বসীমায়। বন্ধু থাকিতেন মেছুয়া-বাজার রাস্তার মোড়ে লোয়ার সারকুলার রোডের উপর সেই সুন্দর বিচিত্র বাড়ীখানিতে। উকিল বন্ধু আমাকে ধরিয়া রাখিলেন। গাড়ী হইতে আমার বাড়ীর সম্মুখে আমি নামিলে, তিনি গাড়ী হইতে হাত বাড়াইয়া বলিলেন—"কবি! ভাড়ার টাকাটা দিয়া যাও ত।" আমি বিস্মিত হইলাম। চৌরিঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার গাড়ীভাড়া আমি কেন দিব? তিনি কেমন করিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিয়া এমন নির্লজ্জের মত একটা টাকা চাহিতেছেন! কিন্তু আমার সঙ্গে টাকা ছিল না। আমি তাহা বলিলে, তিনি বলিলেন—"উপরের ঘরে যাও। তোমার স্ত্রীকে জাগাইয়া একটি টাকা পাঠাইয়া দেও।" তখন রাত্রি বারটা। আমার তখন প্রকৃতই তাঁহাকে নিতান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া মনে হইল। কি করিব। উপরে গিয়া স্ত্রীকে জাগাইলাম। তাঁহাকে এ কথা বলিলে আশ্চর্য্য হইয়া একটি টাকা বাক্স হইতে বাহির করিয়া দিলেন। আমি নীচে গিয়া বন্ধুর হাতে দিলে, তাহা পকেটে লইয়া চলিয়া গেলেন। ইহার সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তিনি ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে রাণাঘাটে একটি মোকদ্দমায় আমার কোর্টে ওকালতি করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ওকালতিতে এমন কিছুই দেখিলাম না, যাহাতে তিনি একটি ক্ষুদ্র কুবের হইয়াছেন। ঠিক কথা, ভাগ্যই সকল। বিদ্যা কি পৌরুষ কিছুই নহে। মনুষ্যের অদৃষ্টেরও স্রোত আছে। ঠিক জোয়ারের সময়ে নৌকা ছাড়িতে পারিলে, সৌভাগ্যের পারে যাইতে পারা যায়। ইহাদের পূর্ব্বে বি এল উকিল কোথায়ও ছিল না। সে সময়ে যিনি যেখানে ওকালতিতে গিয়াছিলেন, তিনিই কুবের হইয়াছেন। ওকালতির সেই এক স্বর্ণযুগ গিয়াছে।

৩। "কাকের ধন চালে"

আর আমার স্ত্রীর ধন গালে, না হইলেও এক হাত-বাক্সে। তিনি কোথায়ও যাইতে তাহা নিজের গাড়ীতে ভিন্ন আর কোথায়ও দিবেন না। উহা ট্রাঙ্কে তাঁহার নিজ গাড়ীতে রাখিয়াও তাঁহার বিশ্বাস হয় না। আমার ত এ ছাত্রিশবৎসর চাকরির পর কিছুই নিজের নাই। তাঁহার এই মহামূল্য ক্ষুদ্র কাষ্ঠকারাগারে কোন্ সাত রাজার ধন আবদ্ধ আছে, তাহা জানি না। উহার জন্য আমাকে এ জীবনে কতবার যে উৎপাতে পড়িতে হইয়াছে, বলিতে

পারি না। কলিকাতায় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সেই "মহাপ্রদর্শনী"। দর্শদিন করিয়া ডেপুটিরা ছুটি পাইয়াছেন, এবং পালা করিয়া যাইতেছেন। আমার পালা আসিল। আমি তিনমাসের ছুটির প্রার্থনা করিয়াছি। সঙ্গে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়াছি। ছুটি নিশ্চয় পাইব। অতএব স্ত্রী-পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছি। তাঁহাদের কলিকাতায় এক আত্মীয়ের বাড়ীতে রাখিয়া আসিব। আমি ছুটির অপেক্ষায় একা ফিরিয়া আসিব। রেলে এমনই ভিড় যে, 'রিজার্ভ' গাড়ী পাওয়া যায় না। বড় চিন্তিত হইয়া 'রেলওয়ে' ষ্টেশনে সকালে গেলাম, দেখি যদি ষ্টেশনমাষ্টারকে ধরিয়া কোনও কিনারা করিতে পারি। অনেক সাধ্যসাধনায় তিনি একটা 'রিজার্ভ' দিতে সম্মত হইলেন। প্রায় তিন ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া রাত্রি বারটার সময়ে গাড়ী আসিল। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী পর্য্যন্ত প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণীতে ঠাসা হইয়াছে। ষ্টেশনমাষ্টার একখানি কক্ষ বহু কষ্টে খালি করিয়া রিজার্ভ টিকিট লাগাইয়া দিলেন, এবং অবিলম্বে উঠিতে বলিলেন। জিনিসপত্র 'ব্রেকে' উঠাইয়া স্ত্রীকে তাঁহার মহামূল্য বাক্স সহ লইয়া আসিলাম, এবং সমস্ত গাড়ীতে উঠাইয়া আমি মালের পাস আনিতে গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি, স্ত্রী চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিতেছেন। আমার দুই ভ্রাতা দুই অবতারবিশেষ। কনিষ্ঠের কাছে বাক্স রাখিয়া, স্ত্রী গাড়ীতে উঠিয়া বিছানা করিয়া বাক্স চাহিলে ভ্রাতাপুঙ্গব বলিলেন—তিনি বাক্স তুলিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী বাক্স না পাইয়া বুকে করাঘাত করিয়া কাঁদিতেছেন। আমি বজ্রাহত হইলাম। গাড়ী খুলিয়াছে, আর দাঁড়াইবার সময় নাই। লাফাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম গাড়ী জীমূতমন্দ্রে নৈশ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ছুটিল। আর সেই মন্দ্রের উপর স্ত্রীর রোদনধ্বনি উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি হঠাৎ রেলিংএর ভিতর দিয়া পার্শ্বের কক্ষের দিকে দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ ত আমার বাক্স দেখা যাইতেছে।" দেখিলাম, একটি হিন্দুস্থানী বাক্সটি বেঞ্চের নীচে তাহার পায়ের আড়ালে রাখিয়াছে। গাড়ী পরের ষ্টেশনে আসিলে, আমি ছুটিয়া সেই কক্ষে গিয়া, তাহার পা সরাইতে বলিলে, সে মহা ক্ষেপিয়া বলিল—"কাহে"। আমি সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া, তাহাকে চোর বলিয়া পুলিস ডাকিতে লাগিলে সে পা সরাইয়া লইল। আমি বাক্স লইয়া আসিলাম। পুলিস ছুটিয়া আসিল। দেখিলাম, লোকটি নাই। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ী খুলিল। পরে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বোধ হইল যে, বুদ্ধিমান্ ভ্রাতা বাক্সটি ভার বলিয়া পায়ের কাছে নামাইয়া রাখিয়া ষ্টেশনে যাত্রীদের তামাসা দেখিতেছিলেন। এমন সময়ে সেই চোর সুযোগ দেখিয়া বাক্সটি তহার গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছিল। বড় দুঃখের উপার্জ্জন বলিয়া বোধ হয়, বাক্সটি এরূপে পাওয়া গেল। আর কিছুক্ষণ স্ত্রী দেখিতে না পাইলে সেই চোর বাক্স লইয়া পরের ষ্টেশনেই সরিয়া পড়িত। শ্রীভগবান্ কি বিপদ্ হইতেই উদ্ধার করিলেন।

তাহারপর নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পেঁছিয়া 'মহাপ্রদর্শনী' দেখিলাম। তাহাতে ত আর কিছু বড় দেখিয়াছিলাম স্মরণ হয় না। তবে স্ত্রীলোকদের দর্শনের রাত্রিতে যে একটা দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা ভুলিবার নহে। রমণীদের দর্শনের রাত্রি—কলিকাতা শহর—বলা বাহুল্য, বঙ্গদেশের চাঁদের বাজার মিলিয়াছে। বাঙ্গালী রমণীদিগের পরিধানের ব্যবস্থায় কেহ কেহ বা মেঘমুক্ত চন্দ্রের অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন, এবং ইউরোপীয় নর নারীর তীক্ষ্ন শ্লেষের অস্ত্রে রাহুগ্রস্তা হইতেছেন। ইহার মধ্যে প্রকৃত দর্শনীয় যোগ্য হইয়াছেন—বেঙ্গল আফিসের স্থূলোদর ও খর্ব্বাকৃতি এক বৃদ্ধ বড়বাবু ও তাঁহার তরুণী দ্বিতীয়া ভার্য্যা। তাঁহার বেশভূষার কথা না বলিলেও চলে। কিন্তু বৃদ্ধ পতি যেরূপ সাজিয়াছেন, এবং তাঁহাকে যুবক প্রণয়ী প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যেরূপ তাঁহার "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষমা"কে লইয়া ছুটাছুটি করিতেছেন, আমি ও আমার একজন বন্ধু এক নিভৃত কোণায় দাঁড়াইয়া কেবল তাহাই দেখিতেছিলাম। হাসিতে আমাদের দুইপার্শ্বের ব্যথা উপস্থিত হইয়াছিল। একবার আমার সঙ্গে তাঁহার চোকোচোকি হইলে তিনি একটুক সরিয়া আসিয়া বলিলেন—"এই

যে, নবীন যে! অনেকদিন পরে দেখা হলো। স্ত্রীর জন্য না আসিয়া পারিলাম না।" আমি অভিবাদন করিয়া বলিলাম—"আমাদের বুড়া স্ত্রী, তাঁহারাই ছাড়িতেছেন না। আর ইনি ছেলেমানুষ। তাঁর আর কথাই কি?" বুড়া অপ্রতিভ হইয়া, আর কিছু না বলিয়া 'বাল্য স্ত্রী'র পশ্চাতে ছুটিলেন। ফলতঃ সেইবারকার 'এর্কজিবিশনে' এমন দেখিবার জিনিস আর দুটি দেখি নাই।

স্মরণ হয়, ঠিক এমন সময়ে রসিক-চূড়ামণি বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সঙ্গে সেই কাঁটালপাড়ার সাক্ষাতের পর হইতে তাঁহার ও আমার মধ্যে ঠাকুরদাদা ও নাতি-সম্পর্ক হইয়াছিল। তিনি আমাকে ও আমার বন্ধুকে দেখিয়া বলিলেন—"কি নাতি! তোমরা প্রথমপক্ষীয়েরা বুঝি আমাদের দ্বিতীয় পক্ষীয়দের মজা দেখিতেছ?" আমি হাসিয়া বলিলাম—"আপনার দ্বিতীয়পক্ষ হইলেও শ্রীশ্রীত্রয়োদশী। তাঁহার আর মজা কি দেখিব? দেখিতেছি ত ঐ শ্রীপঞ্চমীর মজা।" আমি এই কথাটি বেঙ্গল আফিসের প্রবীণ বৃদ্ধ নাগরকে দেখাইয়া বলিলাম। তিনি তখন তাঁহার শ্রীপঞ্চমীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছিলেন। বঙ্কিমবাবু সেই দিক্ চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"লোকটা বড় ঢলানই ঢলাচ্ছে।" হেমবাবু লিখিয়াছেন—

"হায় কি হলো! আধখানি মাঠ জুবার্ট নেছে ঘেরে।
বিষয়টা কি বুঝতে নারি কান্ডখানা হেরে।"

তিনি যদি এই দৃশ্য দেখিতেন, তবে বিষয়টা কি, নিশ্চয় বুঝিতেন।

"হায় কি হলো! বুড় বর কচি বউ নিয়ে,
কচ্চে কেমন নাগরালী চুলে কলপ দিয়ে।"

৪। "জজ সাহেব নোট মাঙ্গতায়"

স্ত্রীকে কলিকাতায় রাখিয়া আমি আবার ভাগলপুরে ফিরিয়া আসিলাম। ট্রেজারির ডেপুটি 'এর্কজিবিশন' দেখিতে গেলেন। দশদিনের জন্য ট্রেজারির ভার আমার উপর পড়িল। আমি খাজাঞ্চিকে বলিলাম যে, তাঁহারা ঠিক তিনটার সময়ে হিসাব একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আদেশমতে বন্ধ করিবেন। আমি চারিটার সময় ট্রেজারিতে টাকা তুলিয়া, ও 'ক্যাশ বহি' সহি করিয়া চলিয়া যাইব। তিনি বলিলেন—তাহাও কি হয়। তাঁহারা রাত্রি নয় দশটার সময় পর্য্যন্ত কাজ করেন। কারণ, ট্রেজারির ডেপুটিবাবু সাহেবদের নোট দেওয়ার জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ট্রেজারি খোলা রাখেন, এবং যখন তাঁহাদের নোটের প্রয়োজন হয়, তখনই সকল কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া তৎক্ষণাৎ নোট বাহির করিয়া দেন। আমি বলিলাম, তিনটার পর আমি সাহেবদেরও নোট দিব না। তাঁহারা যেন ঠিক তিনটার সময়ে হিসাব বন্ধ করেন। তিনি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তিনি বলিলেন, তাহা করিতে পারিলে তিনি দুইহাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। পরদিন সাড়ে তিনটার সময় জজের আরদালি আসিয়া বলিল—"হুজুর! জজ সাহেব নোট মাঙ্গতায়—তিনহাজার রোপেয়াকা।" হিন্দীতে আলাপ চলিল। বাঙ্গালায় লিখিতেছি। আমি বলিলাম—"আমি কি নোট লইয়া এজলাসে বসিয়া আছি।" সে বলিল—"আপনার হুকুম ছাড়া খাজাঞ্চি নোট দিতেছে না। কারণ, হিসাব বন্ধ হইয়াছে।" আমি বলিলাম—"তবে আমি কেমন করিয়া হিসাব কাটিয়া নোট দিতে বলিব?" সে চলিয়া গেল। আবার মিনিট কয়েক পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"হুজুর! জজ সাহেব সেলাম দিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে, তাঁহার নোটের বড় প্রয়োজন।" আমি বলিলাম—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম। তবে জজ সাহেব যদি ট্রেজারির হিসাব কাটিয়া চারিটার সময়ে তাঁহাকে নোট দেওয়ার জন্য আমার কাছে লিখিত আদেশ পাঠান, তবে আমি দিতে পারি।" সে সেই বার যে চলিয়া গেল, আর আসিল না। এদিকে ট্রেজারি আফিসে মহা আন্দোলন উঠিয়াছে। আমি যদিও বলিয়াছিলাম, তাহারা বিশ্বাস করে নাই যে, সাহেবেরা নোট চাহিলে আমি তিনটার পর দিব

না। খাজাঞ্চি বলিলেন যে, নিশ্চয় কলেক্টরের কাছে নালিশ আসিবে। ভয়ে তাঁহার কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়াছে। আমি বলিলাম, কলেক্টর জিজ্ঞাসা করিলে আপনি বলিলেন, "আমি তিনটার পর হিসাব বন্ধ করিতে আদেশ দিয়াছি, এবং তাহারপর নোট দিতে নিষেধ করিয়াছি। তথাপি দেখিলাম যে, তাঁহার ভয় ঘুচিল না। যাহা হউক, দশদিন চলিয়া গেল। নালিশ আর আসিল না। আসিবার জোও ছিল না। কারণ, একাউন্টেন্ট জেনেরেল ইংরাজরাজ্যের চিত্রগুপ্ত। পরদিন যথাসময়ে আরদালি মহাশয় আসিয়া নোট লইয়া গেলেন। ট্রেজারি অফিসার ফিরিয়া আসিয়া আমাকে অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত বলিলেন—"আপনি নাকি চারিটার সময়ে টাকা তুলিয়া ও ক্যাশবহি সহি করিয়া চলিয়া যাইতেন?" খাজাঞ্চি বলিলেন—"তিনি পারিয়াছেন, আপনি পারিবেন না।" প্রঃ। "কেন?" তখন খাজাঞ্চি সেই জজ সাহেবের নোটের উপাখ্যান বলিলেন। ডেপুটিবাবু দুইনেত্র বিস্তৃত করিয়া বলিলেন—"সে কি! আপনি সত্য সত্যই জজ সাহেবকে নোট দেন নাই?" তিনি আমাকে যেন অপূর্ব্ব জীব মনে করিয়া বিস্মিতমুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি হাসিতেছিলাম। তখন তিনি বলিলেন,—"আপনার কি সাহস! জজ সাহেব আপিলের কর্ত্তা। এক লাইন কলেক্টর কমিশনরকে লিখিলেই সর্ব্বনাশ। 'প্রমোশনে'র দফা রফা। না মহাশয়! আমি তাহা পারিব না। আপনার এত বড় নাম, তাই আপনাকে কিছু বলে নাই। আমার সর্ব্বনাশ করিবে।" আমি ট্রেজারি হইতে বাহির হইয়া আসিতে খাজাঞ্চি বলিলেন—"দেখিলেন মহাশয়! আজ হইতে আবার আমাদের দশটা রাত্রি। এই কয়দিন কি সুখেই আমরা কাজ করিয়াছি। সমস্ত আফিসে আপনার জয়জয়কার পড়িয়াছে। আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হউন। যেমন শুনিয়াছিলাম, তেমন দেখিলাম।" আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েকদিন পরে আমার তিনমাসের ছুটি মঞ্জুর হইলে ভাগলপুর ছাড়িয়া চলিয়া আসিলাম। সকলেই ভাগলপুর ফিরিয়া যাইতে জিদ করিতেছিলেন সূর্য্যনারায়ণবাবু ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে থাকিতে জিদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে একটি নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছিল। উহা আমার পছন্দ হওয়াতে তাহার মালিককে ডাকিয়া আনিয়া আমার সাক্ষাতে তাহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন যে, আমি ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত সে বাড়ী অন্য কাহাকেও ভাড়া দিতে পারিবে না। চারিটি মাস মাত্র ভাগলপুরে বড় সুখে কাটাইয়া কলিকাতায় আসিলাম। আমার কুকুরগুলিন পর্য্যন্ত ভাগলপুরে ফিরিয়া যাইব বলিয়া এক বন্ধুর কাছে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। কলিকাতার সেক্রেটারী পিকক সাহেবও বলিলেন যে, ছুটির পরে আমি ভাগলপুর ফিরিয়া যাইব, বদলি করিবেন না। তখন আনন্দে বাড়ী চলিয়া গেলাম।

স্বদেশ ॥ ১। শিবস্থাপন

ভাগলপুর হইতে বাড়ী আসিলাম। চারিবৎসর পর জন্মভূমির শোভা সমুদ্রবক্ষ হইতে সন্দর্শন করিয়া প্রাণে কত স্মৃতি, কত সুখ, কত শোক জাগিয়া উঠিল। বহু আত্মীয় ষ্টীমার হইতে লইতে আসিয়াছিলেন। দুইএকদিন চট্টগ্রাম সহরে থাকিয়া নয়াপাড়ায় আমার পল্লীগ্রামের বাড়ীতে গেলাম, এবং তিনমাস বিদায়কাল সেখানে গ্রাম্য শান্তির ছায়ায় বিশ্রাম করিয়া কাটাইলাম। আমার কোনও আত্মীয় বলিলেন যে, আমার স্বাস্থ্যের সঙ্গে চরিত্রেরও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বেহারের উৎকৃষ্ট জলবায়ুতে স্বাস্থ্য ভাল হইবারই কথা। কিন্তু তিনি বলিলেন, আমার হৃদয়ও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদার, প্রেম-প্রবণ ও ধর্ম্ম-প্রবণ হইয়াছে। আমি তাঁহাদের সকলকে বেশ ভাল বাসিতেছি। ইহার একমাত্র কারণ হইতে পারে যে, আমি তখন শ্রীভগবানের ধ্যানে বিহ্বল। 'রৈবতক,' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' বেহারে সূচিত হয় এবং রৈবতক' সেখানে লিখিতে আরম্ভ করি। এই অবকাশ সময়েও বাড়ীতে লিখিতে-

ছিলাম। হৃদয় সত্য সত্যই কি এক অজ্ঞাত প্রেমে আর্দ্র। কি এক অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, এবং কি এক অজ্ঞাত আনন্দে পূর্ণিত ছিল। অপরাহ্নে একদিন পিতৃব্য ভ্রাতাদের এবং একজন পিতৃব্যকে—ইনি সম্পর্কে আমার পিতৃব্য, ব্যবহারে আমার বন্ধু,—লইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মগধেশ্বরী নদীতীরস্থ আমাদের বংশীয় শ্মশানে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে বংশধরগণ দুইহাত মাত্র স্থান রাখিয়া অবশিষ্ট শ্মশানস্থানটি পর্য্যন্ত চাষ করিয়াছেন। বংশও প্রাচীন হইলে বৃক্ষের ন্যায় তাহার ফলের এরূপ অধঃপতন ঘটে। এই হৃদয়শূন্যতায় প্রাণে বড় আঘাত পাইলাম। আমি বাড়ী গেলেই পিতৃশ্মশানে গিয়া সময়ে সময়ে অশ্রুবর্ষণ করিতাম। তাহাতে প্রাণে বড় শান্তি, বড় শক্তি পাইতাম। বড় ব্যথিতহৃদয়ে আমি বংশীয়গণকে তিরস্কার করিলাম। সকলে সেখানে বসিয়া স্থির করিলাম যে, স্থানটি ভবিষ্যতে পবিত্র রাখিবার জন্য তাহার মধ্যস্থলে একটি শিবালয় নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে একটি শিবমূর্ত্তি স্থাপিত করিব; এবং তাহার চারিদিকে পুষ্পোদ্যান রোপিত করিব। দেবালয় ও স্থান বংশের এই শাখার সাধারণ সম্পত্তি হইবে, এবং সকলে পূজার ও সংরক্ষণের ব্যয়ভার বহন করিব। সেখানে বসিয়াই সমস্ত কার্য্যের ব্যয়ের হিসাব করিলাম, এবং এক পিতৃব্যভ্রাতা সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সেই রাত্রিতে সমস্ত সঙ্কল্প জ্ঞাতিত্ব-বিদ্বেষে উড়িয়া গেল। সর্ব্বপ্রাচীন পিতৃব্য মহাশয়ের অমত হইল। তাঁহার পুত্র পরদিন আসিয়া বলিলেন যে, পূর্ব্বপুরুষেরা যখন এ কর্ম্ম করেন নাই, তাহার পিতা করিতে অসম্মত। বিশেষতঃ একটা শিবালয় করিলে শ্মশানের স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। হা ঈশ্বর! শ্মশানের জন্য সাড়ে তিনহাত মাত্র ভূমির প্রয়োজন। একটা দীর্ঘ নদীতীরেও কি তাহার অভাব হইবে? মোট কথা আমি বুঝিলাম যে, এরূপ একটা কার্য্য আমার প্রস্তাবমতে হইবে, ইহাই তাঁহার মনোবাদের কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, তাঁহার অমত হওয়াতে তাঁহার অংশীদার অন্য পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্রদেরও অনিচ্ছায় পশ্চাৎপদ হইতে হইল। কেহ কেহ গোপনে কার্য্যটি একা করিতে আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন। আমিও বলিলাম যে, যখন প্রস্তাবটি মুখের বাহির হইয়াছে এবং অনেক লোক শুনিয়াছে, আমি উহা কার্য্যে পরিণত করিবই। বিশেষতঃ শ্মশানের দুরবস্থা আমার প্রাণে বড় ব্যথা দিয়াছিল। দুইচারিদিনের মধ্যে একখানি গৃহ আমার পিতার শ্মশানে নির্ম্মাণ করিয়া, অশোকঅষ্টমীর দিবস শিবস্থাপনের সঙ্কল্প করিলাম। শিবলিঙ্গ আমার কাছে বড়ই ঘৃণিত বোধ হয়। আমি সেজন্য মূর্ত্তিস্থাপন স্থির করিলাম। কিন্তু মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে গিয়া শিবের ধ্যান লইয়া বিপদে পড়িলাম। "পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং"—মৃগটি কি? দেশের পঞ্চাননের দল কোন অর্থই করিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন, 'মৃগ' অর্থে হরিণ কেহ বলিলেন—'নরকপাল'।—ঈশ্বর গুপ্ত একবার লিখিয়াছিলেন,—

"তথাপিও পঞ্চানন পশু ভিন্ন নহে।"

বুঝিলাম, সে কথা ঠিক। দেশে পঞ্চাননগণ মরা গরুর ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই জানেন না। একজন অর্দ্ধপণ্ডিত আমার পিতার বড় প্রিয় ছিলেন। তিনিও পিতার মত তান্ত্রিক। অবশেষে প্রচলিত ধ্যান ছাড়িয়া দিয়া, তিনি তন্ত্র হইতে আমার অভিপ্রায়মতে একটি দ্বিভুজ মূর্ত্তির ধ্যান উদ্ধৃত করিয়া দিলেন। দ্বিভুজ মূর্ত্তি দেখিলে আমার ধ্যানস্থ পিতৃদেবকে মনে পড়িবে, এ জন্য আমি এরূপ ধ্যান চাহিয়াছিলাম। ধ্যানটি বড় সুন্দর, বড় ভাবপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। গৃহ ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। পিতৃদেব পূজায় বসিয়া যেরূপ আনন্দপূর্ণ মুখে ধ্যানস্থ থাকিতেন, মূর্ত্তিটি সেইরূপই নির্ম্মাণ করিলাম। আমার কনিষ্ঠ পিতৃব্যভ্রাতা প্রসন্ন আমায় এ সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। সব প্রস্তুত হইল। শ্মশান-সংলগ্ন একখণ্ড ভূমি শিবালয়ের উদ্যান ও প্রাঙ্গণের জন্য বংশীয়দের অজ্ঞাতে ক্রয় করিয়া লইলাম। তাঁহাদের জ্ঞাতসারে পারিতাম না। উৎসবের পূর্ব্বদিন দেখিলাম যে, আমার শিবালয়ের

নদীতীরবাহী পথের উপর আমার উক্ত প্রাচীন পিতৃব্যের লোকেরা এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া পথটি বন্ধ করিতেছে। শুনিলাম যে, তাহাতে ওলাদেবী—চট্টগ্রামে তাঁহাকে জ্বালাকুমারী বলে—স্থাপিত হইবেন। বড় দুঃখিত হইয়া তাঁহার পুত্রকে অনুযোগ দিলে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার যে এক উন্মাদ পিতৃব্য আছেন উহা তাঁহারই কার্য্য, তাঁহার পিতার কার্য্য নহে। যাহা হউক, এ সময়ে একটা গোলযোগ করিলে আমার উৎসবটি নষ্ট হইবে, এবং উহাই এই ওলাদেবী স্থাপনের উদ্দেশ্য, অতএব আমি আর কথাটি না কহিয়া অশোকঅষ্টমীর দিবস ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া উৎসব নির্ব্বাহ করিলাম। গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিবার জন্য পিতামাতার অস্থি আমার কাছে কলিকাতায় প্রেরিত হইয়াছিল। আমি তাহার একাংশ বড় যত্নে রাখিয়াছিলাম। আজ তাহা একটি রজতকৌটায় শিবের বেদিমধ্যে প্রস্তরপাত্রে রাখিতে আকুল প্রাণে কাঁদিলাম। পিতামাতার শোক যেন নূতন হইয়া উঠিল। সমস্ত গৃহ রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে পিতা স্বর্গারোহণ করেন। আজ ১৮৮৩ ইংরাজির বৈশাখমাস। ষোলবৎসর পূর্ব্বে একদিন গঙ্গার বক্ষে যেরূপে অবিরল ধারায় অশ্রু বর্ষণ করিয়াছিলাম, আজ সমস্তদিন পিতৃশ্মশানে আত্মহারাভাবে পূজা দেখিতে দেখিতে মগধেশ্বরীর স্রোতের সহিত অশ্রুস্রোত সেরূপে মিশাইয়া প্রাণে বড় শান্তি পাইলাম। শিবমূর্ত্তিতে পিতৃদেবকেই আমি দেখিতেছিলাম, আর বালকের মত কাঁদিতেছিলাম। প্রতিমা-উপাসকদের এ আন্তরিকতা ও সার্থকতা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা কেমন করিয়া বুঝিবে? প্রসন্ন বড় সুন্দর যুবা, অনুমান বিশবৎসর বয়স। শান্ত, শিষ্ট ও অমায়িক। সে নিজে বড় সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিত। তাহার অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া আমি এই শিবস্থাপন উপলক্ষ্যে সেদিন প্রাতে একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম, এবং তাহাতে এই প্রতিমূর্ত্তির ও ধ্যানের ব্যাখ্যা ছিল। প্রসন্ন আমার পার্শ্বে বসিয়া সেই কবিতা পড়িতেছিল ও নিজেও অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। সেও আমার মত পিতৃহীন। আজ সেই প্রসন্নও স্বর্গে। কবিতাটি স্মরণ হয়, "নবজীবন" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং উহার পর আমার "অবকাশরঞ্জিনী"র দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছিল।

দিবসে ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ ছিল। আমার নিজ গ্রামে আমার বিপুল পুরোহিতবংশ ছাড়া বহু ব্রাহ্মণের বাস। প্রাঙ্গণে পাঁচছয়শত ব্রাহ্মণ আহার করিতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কতজন লেখাপড়া জানেন, জিজ্ঞাসা করিলে, আমার পুরোহিত মাথা গণিয়া বলিলেন—বিশজন! ব্রাহ্মণের এতাদৃশ অধঃপতন না ঘটিলে হিন্দুদের এ অবস্থা ঘটিবে কেন? রাত্রিতে এই শাখা ভিন্ন আমার সমস্ত বংশীয়দের ও আত্মীয়দের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন, তাঁহাদিগকে নূতন ধরণে ইংরাজী ও মোগলাই রান্না খাওয়াইতে হইবে। চামচ কাঁটা ভিন্ন ইংরাজী রান্না খাওয়া অসাধ্য। তাঁহারা এ আপত্তি শুনিলেন না। স্ত্রী রন্ধনবিদ্যায় 'প্রেমচাঁদ'—সিদ্ধহস্তা, এবং দেশ-বিদেশখ্যাত। আমি অনেক ইংরাজী রন্ধনের বহি অনুবাদ করিয়া হিন্দুস্থানী, মোগল ও মুসলমান পাচক রাখিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার রন্ধন শিক্ষা দিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন আমি যেখানে নূতন যাহা খাইতাম, তাহার উপকরণ ও রন্ধনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়া আসিতাম। পরে যুগল মস্তক একত্র করিয়া, তাহার সংস্করণের পর সংস্করণের চেষ্টা কয়িয়া শেষে কৃতকার্য্য হইতাম। একস্থানে খরসুল মৎস্যসিদ্ধ খাইয়া মুগ্ধ হইয়া আসি। পাচিকা রন্ধনপ্রণালী ফরাসী বলিলেন, এবং কিছুতেই তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করিলেন না। কিন্তু আমরা উক্তরূপে চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইলাম। "ঘটিরাম ডেপুটি" বেহারে পৌঁছিয়া বলিলেন—"লাল বাদাম" রুটি খাইব, তাহা বেহারের একজন মাত্র লোক প্রস্তুত করিতে জানে। তাহাকে আনিয়া প্রস্তুত করাইলাম। সে বাদামের রুটি অপূর্ব্ব খাদ্য। তাহার প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইতে লোকটিকে টাকা, পরে চাকরি পর্য্যন্ত দিতে চাহিলাম। সে সম্মত হইল না। বলিল, উহা তাহার ওস্তাদের নিষেধ। যাহা হউক,

কয়েকবার চেষ্টা করিয়া শেষে আমরা এই রুটি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে দেখাইলাম। সে বলিল—"তাজ্জব !"। এরূপে স্ত্রী রন্ধন "ডিপার্টমেণ্টে" স্বনামধন্যা। এজন্য স্বদেশ বিদেশে আত্মীয় বন্ধুগণ আমার নিমন্ত্রণ পাইলে বড়ই আনন্দ প্রকাশ করিতেন। আমার সেই প্রাচীন অন্ধ পিতৃব্য মহাশয় পর্য্যন্ত আমার বাড়ীতে নিমন্ত্রণে আসিতে পারিতেন না বলিয়া, তাঁহার জন্য আহার্য্য পাঠাইয়া দিতে স্ত্রীর কাছে আবদার করিয়া বলিয়া পাঠাইতেন ; এবং তদপেক্ষায় উপবাসী থাকিতেন। তাঁহার মৃত্যুশয্যায় তিনি স্ত্রীর হাতের প্রস্তুত আচার চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আচারও স্ত্রী বহু 'এঙ্গলো ভার্নিকিউলার' রকম প্রস্তুত করিতে পারেন। অতএব আত্মীয়দের আবদার শুনিয়া তিনি কোমর বাঁধিয়া, এবং মাথার সম্মুখে চুলের কৃষ্ণচূড়া বাঁধিয়া রন্ধনশালায় উপস্থিত হইলেন, এবং হিন্দুস্থানী, মোগলাই এবং খ্রীষ্টীয় মতে রন্ধনের একটা "নববিধান" রচনা করিলেন। চামচ কাঁটা ছাড়া যে সকল 'ডিস' চলে, তাহাই প্রস্তুত করা হইয়াছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, 'ভিনিগার' ও 'সসের' গন্ধে নিমন্ত্রিতদের অন্নপ্রাশনের হিন্দুয়ানি পর্য্যন্ত বহির্গত হইয়া পড়িবে, এবং অনেক বিশুদ্ধ "শশধরী হিন্দু" পৃষ্ঠভঙ্গ দিবেন। রুটির স্থলে "সাইড ডিসে"র সঙ্গে লুচি দিয়াছিলাম। নিজে দাঁড়াইয়া কিরূপে খাইতে হইবে, দেখাইয়া দিতে লাগিলাম। কিন্তু তাঁহারা যেরূপ খাইতে লাগিলেন ও রন্ধনের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, আমার ভয় হইল যে, শেষে রন্ধনের হাঁড়ি সুদ্ধ পাতে দিতে না হয়। স্ত্রীর আনন্দের সীমা নাই। একবার একজন ব্যারিষ্টার বন্ধু 'ডাকবাংগলা'য় রামপাখীর পাদপদ্ম চর্ব্বণ করিয়া অস্থির হইয়া স্ত্রীর কাছে দেশীয় নিমন্ত্রণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেদিন স্ত্রী প্রভাত হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত রন্ধন করেন। বন্ধুবর ও অন্য নিমন্ত্রিতগণ নয়টা হইতে বারটা পর্য্যন্ত আহার করেন। ব্যারিষ্টার বন্ধু রাশীকৃত শাক তরকারি বোঝাই করিতেছেন দেখিয়া আমি নিষেধ করি। তিনি বলিলেন যে, তিনি কি অমৃত খাইতেছেন, তিনিই জানেন। শেষে যখন মৎস্য মাংসের ভাল ভাল জিনিস ও নানাবিধ পোলাও ও পিষ্টক আসিতে লাগিল, তিনি হাহাকার করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, খাইতে ছাড়িলেন না। তাঁহার চলিবার শক্তি নাই বলিয়া, ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া স্ত্রীকে অজস্র ধন্যবাদ ও লম্বাচোড়া সার্টিফিকেট দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু আমি রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখি যে, স্ত্রী একস্থানে বসিয়া যেন নিদ্রা যাইতেছেন। ডাকিলাম, উত্তর নাই :—তিনি সমস্তদিনের পরিশ্রমে মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। আর একজন খুব উচ্চ সাহেবী ধরণের ব্যারিষ্টার বন্ধু কলিকাতায় যাইয়া গল্প করিয়াছিলেন যে, এমন 'ডিনার' তিনি কখনও খান নাই। দেশে পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ বলিতে দশ রকমের ভাজা, পাঁচ রকমের ডাল ও মৎস্য এবং মাংসের লঙ্কারঞ্জিত ঝাল বুঝাইত। আমি প্রথম ডেপুটি কলেক্টর হইয়া দেশে গেলে স্ত্রীর দ্বারা কোর্ম্মা, কালিয়া ও পোলাও প্রচলিত হয়। এ নিমন্ত্রণে চপ্ কাট্‌লেটের চর্চা আরম্ভ হইল। দুইএকস্থানে তাহার অপূর্ব্ব প্রহসনও পাইতে লাগিলাম। এ কারণে দেশে আমার এরূপ ভোজনবিলাস খ্যাতি যে, আমাকে কেহ সহজে নিমন্ত্রণ করিতে চাহে না। কলিকাতায় দাদার বাসায় গেলে তিনি কি খাইতে দিবেন ভাবিয়া অস্থির হইতেন। আমি যেন কি আকাশের কুসুম খাইয়া থাকি। যাহা হউক, আত্মীয়েরা বড়ই প্রশংসা করিলেন।

এরূপে বড় আনন্দে এই উৎসব সমাপিত হইল। কিন্তু তাহাতে একজনের হিংসানল জ্বলিয়া উঠিল,—এরূপ বিদ্বেষ চট্টগ্রামের বিশেষ লক্ষণ। সে সময়ে চট্টগ্রামে একজন বকধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি তান্ত্রিক এবং চট্টগ্রামের দেওয়ানি বিভাগে তাঁহার একাধিপত্য। তাহার উগ্র তান্ত্রিকতার একটি গল্প পূর্ব্বে দিয়াছি, এবং আর দুইএকটা যাহা আমি জানি, তাহা অকথ্য। তাঁহার তান্ত্রিকতায় আমি বিশ্বাসহীন বলিয়া এবং অন্য কারণেও তিনি আমাকে বিষচক্ষে দেখিতেন। তিনি আমার প্রতি এক ভিন্দিপাল নিক্ষেপ করিলেন। একজন বন্ধুর দ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, আমি কোন্ শাস্ত্রানুসারে শিবমূর্ত্তি স্থাপিত

করিয়াছি, এবং তাহাও চৈত্রমাসে করিয়াছি। আমি উত্তরে বলিয়া পাঠাইলাম যে, তাঁহার পিতামাতার শ্মশানে যদি তিনি সংযুক্ত লিঙ্গ ও যোনিমূর্ত্তি স্থাপন করেন, উহা তাঁহার উপযুক্ত কর্ম্মই হইবে। আমার তাহাতে আপত্তি নাই। আর চৈত্রমাসটা তো আমি সৃষ্টি করি নাই। মাস কাল যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার পূজার জন্য সকল সময়ই শ্রেষ্ঠ। পিতামাতার শ্মশানে শিব-স্থাপনের জন্য "অশোকঅষ্টমী"র মত এমন উপযোগী সময় আর কি হইতে পারে? শুনিলাম, এই উত্তর শুনিয়া তিনি আর বাক্যব্যয় করেন নাই। আর বিদ্বেষ জ্বলিয়া উঠিল সেই আপত্তিকারী পিতৃব্য মহাশয়ের। শিব স্থাপিত হওয়াতে নয় পুরুষের পৈতৃক নদীতীরস্থ শ্মশান তাঁহার চক্ষে অপবিত্র হইয়া পড়ে। তিনি সে অবধি উহা পরিত্যাগ করিয়া সাধারণের মল মূত্রে পবিত্রিত তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের দীর্ঘিকার এক কোণায় তাঁহার পরিবারস্থের শ্মশান স্থির করেন। তাঁহার বংশধর গ্রামের লোককে পূতিগন্ধে উৎপীড়িত করিয়া, তাঁহাকে সেইস্থানে দাহন করিয়াছিল, এবং তাঁহার পরিবারস্থগণকে সেই পবিত্র স্থান প্রাপ্ত করিতেছেন। সেই ওলাদেবীর গৃহ—বলা বাহুল্য, অল্পদিন পরেই তিরোহিত হয়। কিন্তু তাঁহার সৎকীর্ত্তিস্বরূপ দীঘির পারস্থ শ্মশান এখনও রহিয়াছে। দণ্ডবিধির সাহায্যে তাহা রহিত না হইলে তাঁহার বংশধরেরা এমন কীর্ত্তি ছাড়িবেন না। হা ভগবান্! মানুষের এমন প্রবৃত্তি কেন হয়?

২। **আবার লাট টম্‌প্‌সন্** (Tompson)

এ সময়ে লাট টম্‌প্‌সন্ চট্টগ্রামে পরিদর্শনে অর্থাৎ কদলিবৃক্ষের বংশ ধ্বংস এবং বাজার শালুশূন্য করিতে আসেন। লাট প্রভুদের দর্শনে কার্য্যের মধ্যে যাহা হয়, কদলিবৃক্ষ রোপণ, নানাবিধ পতাকার লীলা-দর্শন ও বোমের শব্দে ভূকম্পন। ইহাতে প্রত্যেক বৎসর যত টাকা অনলে ও জলে যায়, তাহার দ্বারা কতশত কার্য্য সাধিত হইতে পারে। প্রভুদের যে কদলির ও শালুর পিপাসা পাঁচবৎসরেও পরিতৃপ্ত হয় না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। আর যিনি কিছু বাস্তবিকই পরিদর্শন করিতে যান, তিনিই রাজপদ হইতে একজন ইন্‌স্‌পেক্টরের পদে অবনত হন। এবং সাধারণের চক্ষে সম্মানচ্যুত হন। লাট ইলিয়টের এ অবস্থা ঘটিয়াছিল। তিনি একদিন একা চট্টগ্রামের শহরের লোকের পায়খানা পরিদর্শন করিতে যান,এবং একটি মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া প্রবেশ করেন। সে মনে করিল, জাহাজের "জেক" (গোরা) কেহ তাহার বাড়ীতে "বিবি" খুঁজিতে ঢুকিয়াছে। সে প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া লাটমস্তকে তুলিয়াছে, এমন সময়ে বিভাগীয় কমিশনর আসিয়া উপস্থিত। তিনি আর এক মুহূর্ত্ত পরে আসিলেই বাঙ্গালার লাটসিংহাসন খালি হইয়া পড়িত। মোট কথা, ইংরাজরাজ্যে আর কিছুর অভাব থাকুক বা না থাকুক, পরিদর্শকের অভাব নাই। জমাদার সাহেব হইতে গবর্ণর জেনেরেল পরিদর্শক। পুলিস থানায় যে কয়েকখানি খারুয়া-বাঁধা বালি কাগজের বহি পাঁচটাকা বেতনের লেখক কনষ্টেবলের গবেষণায় ও কৃতিত্বে পূর্ণিত হয়, ইংরাজরাজ্যে উহারা সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এত পরিদর্শন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। প্রত্যহ সবইন্‌স্‌পেক্টর, মাসে মাসে ইন্‌স্‌পেক্টর, প্রত্যেক তিনমাসে পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার মাজিষ্ট্রেট বৎসরে দুইবার এবং সবডিভিসনাল অফিসার ততোধিক বার তাহাদের পরিদর্শন ত করিবেই, তাঁহার উপর কমিশনর, ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্টর জেনেরেল, ইন্‌স্‌পেক্টর জেনেরেলেরও শুভদৃষ্টি তাহাতে পতিত হয়। এমন হাস্যকর ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে কি? গবর্ণমেণ্ট যে তাহা বুঝেন না, এমন নহে। কিন্তু বিহিত করেন না।

যাহা হউক, লাট টম্‌প্‌সন্ পরিদর্শনে আসিতেছেন। সে সময়ে চট্টগ্রামের 'নয়াবাদ' জরিপ লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। চট্টগ্রামের 'নয়াবাদে' ইংরাজের একটা ঘোরতর অপবাদ। অন্য জেলার মত চট্টগ্রামেও গবর্ণমেণ্ট জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিয়াছিলেন, এবং তাহাও এক জরিপের পর। অন্য জেলায় তাহা হয় নাই। সেই সময়ে যে সকল

জমি কোনও জমিদারের অন্তর্গত নহে, তাহা তাঁহাদের 'চট্টগ্রাম কাউন্সিলে'র তদানীন্তন কলিকাতার ভূকৈলাসবাসী দেওয়ানকে অস্থায়িরূপে বন্দোবস্তি দিয়াছিলেন। ইনি এই ছুতা ধরিয়া চট্টগ্রামের সমস্ত বন্দোবস্তিশূন্য জমি দখল করিয়া ফেলেন। কিছুকাল পরে গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, তাঁহার পাট্টায় যে পরিমাণ জমির সংখ্যা আছে, সে পরিমাণ জমি তিনি পাইবেন। হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হইয়া তাহাই স্থির হয় এবং দেওয়ান মহাশয়ের পাট্টায় লিখিত পরিমাণ জমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়ার জন্য সমস্ত চট্টগ্রামে দ্বিতীয় বার বহুবর্ষব্যাপী জরিপ হয়। হার্ভি (Harvey) নামক এক কলেক্টর বত্রিশ জন ডেপুটি কলেক্টর লইয়া এই কার্য্য করেন। তিনি জমিদারির অন্তর্গত অঙ্গুলিপরিমাণ জমিও অন্যায় জরিপের দ্বারা বেশী পাইলে উহা 'অতিরিক্ত' বলিয়া কাটিয়া লইয়া, উহা গবর্ণমেণ্টের এক "নয়াবাদ তালুক" সাব্যস্ত করেন। এ প্রকারে চট্টগ্রামে প্রায় ত্রিশহাজার 'নয়াবাদ তালুক' সৃষ্টি হয়। লোক অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হয়, এবং তাঁহাকে প্রহার করে। তাহারপর সার্ হেনরি রিকেট কলিকাতা বোর্ড হইতে আসিয়া প্রজাদের সঙ্গে একপ্রকার আপোষ করিয়া কিছু জমি ফিরাইয়া দেন, এবং কতকগুলি তালুকের পঞ্চাশ বৎসরের, আর যেগুলিতে পতিত জমি বেশী পরিমাণ ছিল, তাহাদের ত্রিশ বৎসরের বন্দোবস্তি করেন। এখন এই শেষোক্ত তালুকগুলির মেয়াদ শেষ হইয়া আসিতেছে, এবং গবর্ণমেণ্ট আবার তাহার জরিপ আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী জরিপেও রাজস্ববৃদ্ধির সুযোগ হয় নাই। হইবে না বলিয়া এ জরিপের প্রতিবাদ করাতে আমি চট্টগ্রাম হইতে ঘোরতর বিপদস্থ হইয়া ও রাজবিদ্রোহিতা অভিযোগে দণ্ডিত হইয়া পুরী বদলি হই। কমিশনর এ জরিপের সাতবৎসর যাবৎ সেই লাউইস্ সাহেবই আছেন। তিনি এখন রিপোর্ট করিয়াছেন যে, সমস্ত জেলা আবার চতুর্থবার জরিপ না হইলে রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে না। তিনি লেখেন যে, সার্ হেনরি রিকেটের রিপোর্ট পড়িয়া, তিনি ভ্রান্ত হইয়া পূর্ব্ব-জরিপের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তখন দেশপ্রিয় খ্যাতনামা মিঃ কটন (Now Sir H. Cotton) বোর্ডের সেক্রেটারী। তাঁহার সঙ্গে পত্র-যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মিঃ লাউইস্ তাঁহার নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া, উপস্থিত জরিপ রহিত করিতে কিম্বা সমস্ত জেলা জরিপ করিতে প্রস্তাব করিযাছেন। রহিত করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রায় দুই তিন লক্ষ টাকা, যাহা এই জরিপে খরচ হইয়া গিয়াছে, জলে যায়। এ সমস্যার সিদ্ধান্তের জন্য লাট টম্প্সন্ চট্টগ্রাম আসিয়াছেন।

চট্টগ্রামবাসীরা এ সম্বন্ধে এক অভিনন্দন দিয়াছেন। উহা আমার দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়াছিল। অতএব দেশাগ্রণীরা আমাকে তলব দিলেন, এবং আমাকে বাধ্য করিয়া তাঁহাদের দলে লাটসমক্ষে লইয়া গেলেন। লাট অভিনন্দন পাইয়া এক Conference (সভা) আহ্বান করিয়াছেন।

আমি দাসত্বজীবী, সকলের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পশ্চাতে গিয়া বসিলাম। লাটের সঙ্গে আলাপ চলিল। তিনি যাহা প্রশ্ন করিতেছেন, তাহার উত্তর আমাকে দিতে হইতেছে। কমিশনরকে কোনও প্রশ্ন করিলে তিনিও আমার দিকে চাহিতেছেন, যেন এখনও আমি তাঁহার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট। লাট টম্প্সন্ আমার সঙ্গে তর্ক করিতেছেন ও আমাকে ঠাহরাইয়া দেখিতেছেন। সভা ভঙ্গ হইলে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অগ্রবর্ত্তীরা অগ্রে তাঁহাকে সেলাম নামক উপাদেয় অঙ্গভঙ্গিটি উপহার দিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও মহাজন-দের 'পন্থা' অনুসরণ করিয়া যাইবার সময়ে লাট আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি আপনাকে আর কোথাও দেখিয়াছি?"

উ। Yes, Your Honour (এখন ইহার বাঙ্গালা কি করি। হাঁ, 'আপনার সম্মান'—লিখিলে ত মাথামুণ্ড কেহ বুঝিবে না। ত্রিপুরারাজ্যের এখন যে শ্রীপাটের দল-

কর্ত্তা, তাহাদের মহারাজার সম্বন্ধে কোনও কথা বাঙ্গালায় বলিতে—আর বাঙ্গালাই আগরতলার রাজভাষা—তাঁহারা বলেন—"হিজ হাইনেচ (His Highness) এরূপ আদেশ দিয়াছেন।" কাজেই আমিও এই মহাপুরুষদের অনুসরণ করিয়া আমার উত্তরের বাঙ্গালা অনুবাদ দিলাম—'হাঁ! ইওর অনার!' (ধন্য পার্ব্বত্য ত্রিপুরারাজ্য!)।

প্র। কোথায়?

উ। বেহারে, ইওর অনার!

প্র। বেহারে আপনি কি জন্য গিয়াছিলেন?

উ। আমি বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার ছিলাম, এবং বেহার-বক্তিয়ারপুর রেলের প্রস্তাব লইয়া একটা জমিদারের দল সহ এক আবেদন আপনার কাছে বাঁকিপুরে উপস্থিত করিয়াছিলাম।

প্র। হাঁ, আমার এখন স্মরণ হইল। আপনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন? (ঈষৎ হাসিয়া) ভরসা করি, জল বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য নহে।

উ। চট্টগ্রামে আমার বাড়ী। আমি তিনমাসের ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছি।

প্র। চট্টগ্রামে আপনার বাড়ী! (তিনি বিস্মিত হইয়া বিস্তৃত নয়নে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন)। আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনি কলিকাতা অঞ্চলের লোক। আপনি ছুটি হইতে কোথায় ফিরিয়া যাইবেন?

উ। এ প্রশ্নের উত্তর 'ইওর অনার'ই দিতে পারেন। আমার ইচ্ছামতে আমার কোথাও যাইবার সাধ্য নাই।

প্র। আপনি কোথায় যাইতে ভালবাসেন—বাঙ্গালায়, না বেহারে?

উ। ইওর অনার! সে প্রশ্ন না করিলেও পারেন।

প্র। কেন?

উ। বেহার ও বাঙ্গালার মধ্যে তুলনা হইতেই পারে না।

প্র। তবে কি আপনি বেহার যাইতে চাহেন?

উ। আমি বেহারে তিনবৎসর ছিলাম। আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। আর কি আপনি —(আগরতলার শ্রীপাট বিক্রমপুরী বাঙ্গালা ধনেশ্বরী প্রাপ্ত হউন—আর 'ইওর অনার' লিখিতে পারিতেছি না)—বেহার যাইতে দিবেন? আমি বেহারে যে সকল কাজের সংকল্প করিয়াছিলাম, সকলই সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি। কেবল একটি মাত্র কাজ বাকী আছে। তাহার জন্যই আবার যাইতে ইচ্ছা করে।

প্র। কি কাজ?

উ। বেহার-বক্তিয়ারপুর রেলওয়ে।

তখন তিনি বলিলেন—"উহাও সম্পন্ন হইয়াছে বলিতে পারেন। আমি উহা মঞ্জুর করিয়াছি। তবে আপনার সময়ে উহা প্রস্তুত হয় নাই এই মাত্র।" তাহার বিশবৎসর পরে বেহার-বক্তিয়ারপুর রেলওয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইংরাজরাজ্য গজেন্দ্রগামী। আমি বড় আনন্দের সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। দেখিলাম, বন্ধুরা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিয়াছেন, এবং ভাবিতেছেন, স্বয়ং বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে আমি এতক্ষণ কি আলাপ করিতেছি। আমি সেখান হইতে আসিয়াই গ্রামের বাড়ীতে চলিয়া যাই। পরদিন ডেপুটিদের লাট-দর্শন সময়ে না কি লাট তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করেন—"আমার বেহারের সবডিভিসনাল অফিসার কোথায়? তাঁহাকে যে দেখিতেছি না?" তাঁহারা বলেন, আমি বাড়ী চলিয়া গিয়াছি। সেদিন রাত্রিতে কমিশনরের বাড়ীতে 'ডিনার' হয়। পরদিন আমার বন্ধু চা-কর ফুলার (Fuller) আমার কাছে এক পত্র সহ তাঁহার নিজের একজন লোক একবারে নয়াপাড়ায় আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। পত্রে লেখা থাকে—"তুমি

fool (নির্ব্বোধ)। তাই তুমি বাড়ী চলিয়া গিয়াছ। কাল ডিনারের পরে লেঃ গবর্ণর কমিশনরের ও আমার কাছে তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় তোমাকে বেঙ্গল আফিসের হেড এসিষ্টেণ্ট, কি এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী করিবেন। তুমি পত্র পাওয়া মাত্র শহরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। আমি ফুলারকে ধন্যবাদ দিয়া লিখি—"Fool (নির্ব্বোধ) আমি নহি, তুমি। হেড এসিষ্টেণ্ট লাট সাহেব আমাকে দিলেও আমি অস্বীকার করিব। এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী হইতে বঙ্কিমবাবুর মত লোককে তাড়াইয়া দিয়া পদ পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়াছে। লাট সাহেব আমার কেহ নহে। আমার বিধাতা পুরুষ চিফ সেক্রেটারী পিকক সাহেব। আমি তাঁহাকে যথাশাস্ত্র সেলাম বাজাইয়া আসিয়াছি। আমার ছুটিও প্রায় শেষ। অতএব আমি শহর হইয়া কার্য্যস্থানে যাইতে তোমার সঙ্গে দেখা করিব।" কিন্তু ফুলারের বিশ্বাস টলিল না। তাঁহার সঙ্গে ইহার পর দেখা হইলে তিনি আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"তোমার 'ফুলিশনেস' দরুন তুমি একটা বড় চাকরি হারাইলে। লাটকে এরূপ কোনও কর্ম্মচারীর প্রশংসা করিতে আমি শুনি নাই। লাউইস্ সাহেবও এখন তোমার আর শত্রু নহেন। তিনিও বলিয়াছেন, তিনি তোমার মত যোগ্য কর্ম্মচারী দেখেন নাই, এবং তোমার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন।" আমি বলিলাম—"হায়! আমার লাউইস্ সাহেব! তিনি হয় ত কাল আবার আমার গলায় ছুরি দিবেন। তাঁহার মত বাতাসেও যে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তুমি কি আমার সেই বিপদের সময়ে দেখ নাই?" আমার বন্ধু ষষ্ঠী যেমন বলিতেন—পাঁউরুটী is a 'গুড থিঙ্গ' (ভাল জিনিস)। তেমনি কপালটাও 'গুড থিঙ্গ'। কপালে না থাকিলে কিছুই হয় না। এরূপে একবার একটি এসিস্টেণ্ট সেক্রেটারীগিরি হারাইয়াছিলাম।

নোয়াখালি ॥ ১। দুই মুরুব্বি

ছুটি শেষ হইয়া আসিতেছে, এবং ভাগলপুর ফিরিয়া যাইবার আয়োজন করিতেছি, এমন সময়ে আমার নোয়াখালিতে বদলি 'গেজেট' হইল। আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। আমি কমিশনর লাউইস্ সাহেবের কাছে গিয়া বলিলাম যে, তিনি একবার আমার গ্রীবাচ্ছেদ করিয়াছেন। অতএব আমি আবার তাঁহার ডিভিসনে বদলি হইলাম, এ কেমন কথা? তিনি বলিলেন—"তোমার সম্বন্ধে আমার ভ্রান্তি দূর হইয়াছে, এবং আমার মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ হইয়াছে। তুমি নয়াবাদ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিতে, আমি বুঝিয়াছি—তাহাই ঠিক। আমি এখন ভ্রম স্বীকার করিয়া ঠিক তোমার মতানুসারে কার্য্য করিতেছি। এই দেখ, বোর্ডের আফিস হইতে কত পুরাতন কাগজ আনাইয়া আমি দিন রাত্রি পড়িতেছি, এবং এই জরিপ রহিত করিয়া তোমার প্রস্তাবমতে যে তালুকে পতিত জমি ছিল, সে পতিত জমি যে পরিমাণ আবাদ হইয়াছে, তাহার উপর জমা ধরিয়া বন্দোবস্তি করিতে প্রস্তাব করিয়াছি, এবং এ সকল পুরাতন কাগজের দ্বারা তাহা সমর্থন করিতেছি। কিন্তু এখনও তোমার দেশের লোক নয়াবাদ জরিপের জন্য ও হাল্‌দা নদীর তীরভূমি দিয়া চট্টগ্রাম রেলওয়ের প্রস্তাবের জন্য আমার নিন্দা করিতেছে। তাহারা মনে করে, আমি কেবল 'ফেনোয়া' চা-বাগানের উপকারার্থ এরূপ রেলওয়ের প্রস্তাব করিয়াছি। কিন্তু তুমি বুঝিতে পারিবে, এরূপ ভাবে রেল গেলে যে পর্ব্বতমালা চট্টগ্রামকে দুই ভাগে দীঘল বিভাগ করিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্বই উপকৃত হইবে, এবং ভবিষ্যতে আরাকানে রেল যাইবার সুবিধা হইবে।" আমার বড় আনন্দ হইল। আমি বলিলাম, চট্টগ্রামের লোক তাঁহার এ সকল কার্য্যের কথা ও উদ্দেশ্য কিছুই জানে না। তাঁহার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট ভুজঙ্গ মহাশয় ও তস্য চেলারা এত কাল কমিশনর ও লোকের মধ্যে প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়াছিলেন। আফিসের কোনও কথা লোকে জানিতে পারে নাই। আমি

বলিলাম, আমি তাহা আজই প্রকাশ করিব, এবং তিনি ভ্রান্তি স্বীকার করিয়া ইংরাজোপযুক্ত যেরূপ সৎসাহস দেখাইয়াছেন, এবং বর্ত্তমান নয়াবাদ ও রেলওয়ে সম্বন্ধে যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, এ সকল মহৎ কার্য্যের জন্য দেখিবেন—লোকেরা কাল হইতে তাঁহাকে পূজা করিবে। কাজেও তাহাই হইয়াছিল। সে সকল কথা পরে বলিব। তাঁহার সঙ্গে এ সকল বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ আলাপ হইল। তিনি আবার আমার সেই লাউইস্ সাহেব হইয়াছেন। আমাকে কথায় কথায় সস্নেহ 'নবীন, নবীন' বলিতেছেন। আলাপের শেষে বলিলাম—"আমাকে গবর্ণমেণ্ট একখানি প্রাইভেট চিঠির জন্য যে অযথা গুরুতর দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমি তত দুঃখিত হইয়াছিলাম না, যত আমার সম্বন্ধে আপনার মত-পরিবর্ত্তনের জন্য হইয়াছিলাম। আপনি এখন যে বুঝিয়াছেন, একটা নীচ ষড়যন্ত্রের ফলে এবং এই নয়াবাদের জন্য কলেক্টর নিউবেরি (Newberry) অন্যায়রূপে আমার উপর মিথ্যা রাজবিদ্রোহিতা পর্য্যন্ত আরোপ করাতে, আমি নিরপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলাম, জগদীশ্বরকে আমি তজ্জন্য অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।" আমার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। তাঁহারও সেরূপ। আমি সর্ব্বশেষ বলিলাম—"যদি আমি আবার এরূপ অনুগ্রহভাজন হইয়াছি, তবে আমাকে কাছে না রাখিয়া নোয়াখালির মত স্থানে আনিলেন কেন?" তিনি বলিলেন—"এবার যখন লেঃ গবর্ণর আসিয়াছিলেন, আমি তোমাকে চাহিয়াছিলাম। আমি নোয়াখালির জন্য চাহি নাই। নয়াবাদ জরিপের ভার তোমার হস্তে দিবার জন্য চাহিয়াছিলাম।" আমি বিস্মিত হইলাম। আমি বুঝিলাম যে, চট্টগ্রামবাসীদের নয়াবাদ জরিপ লইয়া আমি বিদ্রোহ করিতেছি বলিয়া নিউবেরির সেই রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টে যাইবার পর গবর্ণমেণ্ট কখনও আমাকে এই কার্য্যের ভার উচ্চ বেতনে দিতে পারেন না। সেই জন্য লাউইস্ সাহেবের মান রক্ষার জন্য আমাকে তাঁহার ডিভিসনে দিয়াছেন। আমি তখন বলিলাম যে, নিতান্ত যদি আমাকে তাঁহার অধীনে রাখিতে চাহেন, তবে আমাকে ফেনী সবডিভিসনের ভার দিয়া রাখুন। "সবডিভিসন!"—তিনি আশ্চর্য্য হইলেন। "তুমি সবডিভিসনে যাইতে চাও? আমি মনে করিতাম যে, সবডিভিসনের কাজ বড় বেশী পরিশ্রমের বলিয়া কেহ সদর ষ্টেশন ছাড়িয়া সবডিভিসনে যাইতে চাহে না।" আমি বলিলাম, সদরে থাকিলে আমার যেন দম আটকাইয়া আসে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রকাণ্ড ছায়াতে আমি লুকাইয়া যাই। সবডিভিসনে আমি অনেকটা স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পারি, এবং দুই একটা লোকহিতকর কাজও করিতে পারি। এ জন্য আমি সবডিভিসন ভালবাসি। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, তাহাই হইবে। তুমি ফেনী সবডিভিসনে যাইতে প্রস্তুত থাক।" বড় আনন্দের সহিত আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সে সময়ে চন্দ্রকুমার ও আমার কয়েকজন বিশেষ বন্ধু নোয়াখালিতে মুন্সেফ, ডেপুটি, পোষ্টমাষ্টার, সেরেস্তাদার ইত্যাদি পদে ছিলেন। দুইতিন মাসের জন্য হইলেও একবার নোয়াখালি আমি যাই, তাঁহাদের বড় সাধ। তাঁহারা বড় সাধাসাধি করিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমি ইতিমধ্যে চিফ্ সেক্রেটারী পিকক (Peacock) সাহেবের কাছে আমাকে ভাগলপুর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া নোয়াখালি বদলি করাতে অনুযোগ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম। তিনি উত্তর লিখিলেন যে, একজন ডেপুটি বড় পীড়িত হইয়া ভাগলপুর চাহাতে তিনি তাহাকে অস্বীকার করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ নোয়াখালি আমার বাড়ীর নিকটে ও অন্যান্য কারণে (লাউইস্ সাহেবের অনুরোধ) আমি নোয়াখালিতে সন্তুষ্টির সহিত যাইতে চাহিব বলিয়া তিনি আমাকে নোয়াখালিতে বদলি করিয়াছেন। আমি তখন আমাকে ফেনী দেওয়ার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখি, এবং কমিশনরও লেখেন। এ সংবাদ বন্ধুরা নোয়াখালির কলেক্টরের কাছে পাইয়া তাঁহারা এক চাল চালেন। তাঁহারা কলেক্টর কুক (Cook) সাহেবের কাছে তাঁহার তাল-বেতালের দ্বারা আমার অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া

বলেন যে, আমার মত একজন "সার্ম্মারি" ক্ষমতাযুক্ত দক্ষ কর্ম্মচারীকে ফেনীর মত একটা সবডিভিসনে পাঠাইবার কিছু প্রয়োজন নাই। তিনি আমাকে সদরে রাখিলে বেশী কাজ পাইবেন। তিনি তদনুসারে ঘোরতর আপত্তি করিয়া কমিশনরের নিকট পত্র লিখিলেন। আমি ফেনী যাইবার জন্য বাড়ী হইতে আসিয়া কমিশনরের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি আমাকে সেই কথা বলিয়া আপাততঃ নোয়াখালিতে যাইতে বলেন, এবং পরে ফেনী আনিতে প্রতিশ্রুত হন। অগত্যা দশ বারখান গো-যানের ট্রেনে আমি সপরিবারে সামান্য জিনিসপত্র সহ ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে নোয়াখালি যাত্রা করিলাম ; এই পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা ঘুরিলাম, কিন্তু বলীবর্দ্দ ভ্রাতাদের (Bullock brothers) সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। শ্রীক্ষেত্র হইতে ফিরিবার সময়ে কটক পর্য্যন্ত যে 'বেণ্ডি' গাড়ীতে আসিয়াছিলাম, তাহা গো-যান হইলেও এরূপ পৌরাণিক গরুর গাড়ী নহে। তৃতীয় দিবস নোয়াখালি পৌঁছিয়াছিলাম। আমার বন্ধুগণ কিছু পথ অগ্রসর হইয়া আসিয়া আমাকে বড় আদরে গ্রহণ করিলেন।

পরদিন প্রাতে কুক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার দুই তাল-বেতাল ছিল। একজন হিন্দু ডেপুটি কোনস্থানে আমার অধীনে সবডেপুটি ছিলেন, এবং অন্যজন মুসলমান, খাসমহলের 'ম্যানেজার'। আমি পৌঁছিবামাত্রই ইঁহারা দুইজন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কুক সাহেবের কাছে আমার খুব প্রশংসা করিয়াছেন। সাহেব আমাকে খুব অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি দেখিলাম, আমার দুই মুরুব্বি জুটিয়াছে। আমি তাঁহাদের নাম ১ নং ও ২ নং মুরুব্বি রাখিয়াছিলাম। ১ নং আমাকে 'ওস্তাদ' ডাকিতেন এবং আমি তাঁহাকে 'সাকৃত' ডাকিতাম। এ সম্বোধন এখনও পত্রে চলে। যাহা হউক, আমার দুই মুরুব্বি কি বলিয়াছিলেন জানি না, ফল দেখিলাম—বিপরীত হইয়াছে। আমি কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র কুক ভ্রূকুটি করিযা বলিতে লাগিলেন—"হাঁ বাবু! আমি তোমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকলই জানি। তুমি একজন বড় জিদি ও একগুঁয়ে কর্ম্মচারী। তুমি তোমার মাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরকে তৃণবৎও গ্রাহ্য কর না। কলিকাতায় তোমার বহুতর ক্ষমতাশালী বন্ধু আছে। তুমি একজন ক্ষমতাবান্ লেখক, এবং কলিকাতার সমস্ত সংবাদ-পত্র তোমার করায়ত্ত।" আমি অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছি। তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট যাবৎ এরূপভাবে বিজি বিজি বকিয়া শেষ করিলে, আমি স্থিরভাবে উত্তর করিলাম—"আমি বড় দুঃখিত হইলাম যে, আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত আমার আগে আসিয়াছে—(My antecedents have preceded me)। ভরসা করি, আপনি আমাকে জনরবের দ্বারা বিচার না করিয়া, আমার কার্য্যের দ্বারা বিচার করিবেন।" তিনি এই শ্লেষাত্মক দৃঢ় উত্তর শুনিয়া একটুক যেন নম্র হইলেন। গোলাপজলে মাখা খোসামুদি ছাড়া তিনি বোধ হয় এরূপ কথা শুনেন নাই। একটুক থামিয়া বলিলেন—"আমি আশা করি, আমি যাহা শুনিয়াছি, আপনাকে কার্য্যের দ্বারা আমি তাহার বিপরীত পাইব।"

'কাণা চোকে কুটা পড়ে'। ইহার দুইতিনদিন পরে একটি বদমায়েসি মোকদ্দমার নথি আমার সমক্ষে পেশ হইল। আমি নিজে এরূপ মোকদ্দমার বড় বিপক্ষ। তাহা পরে বলিব। আমি নথিটি তাঁহার কাছে পাঠাইয়া লিখিলাম—"আমি এ যাবৎ সবডিভিসনে ছিলাম। সবডিভিসন অফিসারের এরূপ মোকদ্দমা বিচার করিবার আইনতঃ ক্ষমতা আছে। অতএব স্বতন্ত্র ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয় নাই। এজন্য আমি সদরে এরূপ মোকদ্দমা বিচার করিতে পারিব না।" তারপর লিখিলাম—"এরূপ মোকদ্দমা স্থানীয় তদন্তের দ্বারা প্রমাণিত হইলেই স্থাপিত হওয়া নিয়ম। কিন্তু এ মোকদ্দমার আসামী প্রায় তিনমাস জেলে রহিয়াছে, কিন্তু এখনতক স্থানীয় তদন্ত হয় নাই।" এই শেষ মন্তব্য পড়িয়া তিনি জ্বলিয়া উঠিয়াছেন। শিমুলস্তূপে অগ্নি পড়িয়াছে। আমাকে তলব দিয়াছেন। তাঁহার শ্বেত

মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছে। ক্রোধে কথা বাহির হইতেছে না। বলিলেন—"তুমি—তুমি—তুমি আমাকে আমার কার্য্য শিক্ষা দিতে চাহ?" আমি স্থিরকণ্ঠে বলিলাম—"না। আমার সেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা নাই।"

প্র। তবে তুমি—তুমি—কেন এরূপ মন্তব্য লিখিয়াছ?

উ। "কোনও একটা কাজ ভুল হইলে, তাহা আমি উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে বরাবর জানাইয়াছি। তাঁহারা সকলে তজ্জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন। কই, কেহ এরূপ রাগ করেন নাই, এবং তাঁহাদের কার্য্য শিক্ষা দিতেছি বলিয়া ভর্ৎসনাও করেন নাই। আপনি যদি ভুল পাইলেও তাহা আপনাকে জানাইতে নিষেধ করিয়া লিখিত আদেশ দেন, তবে ভবিষ্যতে আর জানাইব না।" তিনি আজও নরম হইলেন। বলিলেন—"না। আমি তাহা নিষেধ করি না। তবে আমার স্মরণ হয়, আমি লিখিত আদেশ দিয়াছি যে, স্থানীয় তদন্তের পূর্ব্বে যেন এরূপ মোকদ্দমা স্থাপন করা না হয়।" আমি বলিলাম—"আমি সমস্ত আফিস খুঁজিয়াছি। এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ পর্য্যন্ত পাই নাই।" তখন তিনি আরও নরম হইয়া বলিলেন—"তবে বোধ হয়, আমি মুখে মুখে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়াছি।" আমি বলিলাম—"তাহা হইতে পারে।" তখন তিনি বলিলেন—"আমি আপনার মন্তব্য অনুমোদন করিলাম।" আমি সেলাম দিয়া চলিয়া আসিলাম।

তাঁহার সঙ্গে তৃতীয় পালা। তিনি মাসের প্রথমে ট্রেজারি দেখিতে আসিয়াছেন। ট্রেজারি আমার ঘাড়ে পড়িয়াছে। লোকটি বদমেজাজি ও কর্কশভাষী হইলেও বড় গল্প করিতে ভালবাসিত, এবং হৃদয়ও যেন তত মন্দ ছিল না। এরূপ লোক 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ' হইতে ভাল। আমি বাসা কোথায় করিয়াছি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, ভাল বাড়ী পাইতেছি না। এখন আমার বন্ধু মুন্সেফের সঙ্গে আছি। তিনি বলিলেন—"বাঙ্গালী ডেপুটিরা ত ভাল বাড়ী চাহে না, পাইবে কেমন করিয়া। ঐ দেখ, এক ইউরেসিয়ান ডেপুটি কেমন ঘরে আছে। আর তোমাদের ডেপুটিরা কেমন ঘরে আছে।" আমি বলিলাম—"তিনি এখানে বহুবৎসর আছেন। তাঁহার শ্বশুরবাড়ী এখানে। কাজেই তিনি নিজে বাড়ী প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালী ডেপুটি অনেকেই উহাঁর অপেক্ষা ভাল বাড়ীতে থাকে।" তিনি বলিলেন—"বটে!" তাহারপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে প্রায় একঘণ্টা কাল নানা বিষয়ে গল্প করিলেন। সর্ব্বশেষ বলিলেন—"আমি জানিতাম, তোমাদের ডেপুটিয়া 'পেনেল কোড' আর 'বোর্ডের রুল' ভিন্ন আর কিছু পড়ে না। তুমি দেখিতেছি বেশ পড়িয়াছ। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া বড় সুখী হইলাম।" আমি বলিলাম—"এটিও আপনার ভুল: অনেক ডেপুটি আছেন যে, আমাকে কাটিয়া জোড়া দিতে পারেন। আমি বিদ্যায় তাঁহাদের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারি না।" তিনি বলিলেন—"কই, আমি ত একজনও দেখি নাই।" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর চতুর্থ পালা। আমি নোয়াখালি যাইবার মাসেক পরে তিনি কুমিল্লা বদলি হইলেন। সে সম্বন্ধে যে প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল, পরে বলিব। তিনি ইতিমধ্যে নোয়াখালি, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের লোকচলাচলের ডাকের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এক রিপোর্ট চাহিয়াছিলেন। আমি বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা দেখিয়াছি বলিয়া আমার কাছে এরূপ রিপোর্ট চাহিয়াছেন বলিয়া লিখিয়াছেন। আমি লিখি যে, এ অঞ্চলের বেহারার বেতন এত অতিরিক্ত যে, পাল্কীর ডাকে কেহ কখনও যাইবে না। তদপেক্ষা "ঘোঁড় গাড়ী"র ডাকের বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা হয়, যদি নারায়ণগঞ্জ কি বরিশাল হইতে নোয়াখালি হইয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ষ্টীমারের বন্দোবস্ত করা যায়। ইহাতে আমি দেখাইয়াছিলাম যে, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সাহায্য দিয়া যদি কোনও ষ্টীমার কোম্পানীকে এরূপ ষ্টীমার চালাইতে নিয়োজিত করেন, তবে উহার ব্যয় কেবল যাত্রী ও মালের দ্বারা নির্ব্বাহিত

হইয়া বেশ আয় দাঁড়াইবে। তাহা না হইলেও গবর্ণমেণ্ট যদি দশহাজার টাকা বাৎসরিক সাহায্য দেন, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। কারণ, গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র (Stationery) আনিতে ও ট্রেজারির টাকা নানা স্থানে পাঠাইতে বৎসর অন্যূন চারিহাজার টাকা ব্যয় হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট হাতিয়া দ্বীপে যে সবডিভিসন খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেও বৎসর ছয়হাজার টাকার কম ব্যয় হইবে না। ষ্টীমার হাতিয়া হইয়া নোয়াখালি আসিলে হাতিয়া নোয়াখালির এত নিকটে হইবে যে, তখন আর সবডিভিসন খুলিবার বিশেষ প্রয়োজন হইবে না। কুক যেদিন চলিয়া যাইবেন, এ রিপোর্ট তাহার পূর্ব্বদিন তাঁহার হস্তে পড়ে। আমি পরদিন প্রাতে তাঁহার সঙ্গে বিজয়ার দর্শন লাভ করিতে গেলে আমাকে দেখিয়া তাঁহার কক্ষ হইতে আমার মুরুব্বিযুগল বাহির হইয়া আসেন, এবং আমাকে বলেন যে, তাঁহারা এখনই সাহেবের কাছে আমার কত প্রশংসা করিতেছিলেন, এবং সাহেবও তদ্রূপ করিতেছিলেন। এখন সাক্ষাৎ হইলে আমি দেখিব যে, আমি সশরীরে স্বর্গে উঠিয়াছি। ইঁহাদের মধ্যেও খোসামুদিবিদ্যা লইয়া বড়ই প্রতিযোগিতা ছিল। মুসলমান মুরুব্বি বলিতেন—"ও কি মানুষ! ও কি জানে? সাহেব আমাকেই ভালবাসেন।" আবার আমার 'সাকৃত' বলিতেন—"মোস্‌লা বেটা কি জানে? সাহেব আমাকেই বেশী ভালবাসে। আমার কাছে তার কত নিন্দা করে।" যাহা হউক, কার্ড পাইয়া সাহেব আমাকে ডাকিলেন, এবং তাঁহারাও আবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্য দর্শকও ছিলেন। আমাকে দেখিয়াই মিঃ কুক বলিলেন—"আমি এখন বুঝিলাম যে, আপনি একজন খুব যোগ্য কর্ম্মচারী। আপনার ডাকের রিপোর্ট পড়িয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমার বড় দুঃখ যে, রিপোর্টটি কাল মাত্র আমার হস্তে আসিয়াছিল। দুইদিন আগে আসিলে আমি নিশ্চয় আপনার ষ্টীমারের প্রস্তাব গ্রহণ করিতাম, এবং উহা কার্য্যে পরিণত করিতাম। আমি রিপোর্টটি আমার হাতে রাখিয়াছি। আমার মন্তব্য সহ উহা আমি আমার পরবর্ত্তীর হাতে দিয়া যাইব, এবং তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইব, যেন তিনি এ কার্য্যটি করেন। আমার বড় দুঃখ হইতেছে যে, আপনার মত কর্ম্মচারী আমি মাসেকের জন্য পাইলাম।" ঘোরতর বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ও কর্কশভাষী কুক সাহেবের মুখে এ প্রশংসা! শ্রোতা ও আমি সকলে বিস্মিত। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে, আমারও বড় দুঃখ যে, আমি এত অল্পকাল তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতে পাইলাম। তবে কার্য্য-চক্রে আবার তাঁহার অধীনস্থ হওয়া অসম্ভব নহে। তিনি বলিলেন—"তাহা আর কখনও ঘটিবে কি না জানি না। তবে আপনি কুমিল্লা যাইতে চাহিলে আমি আপনাকে লইব।" আমি আবার তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম যে, সদর ষ্টেশনের চাকরি আমার ভাল লাগে না। তিনি বলিলেন, কুমিল্লার কোনও সবডিভিসন চাহিলে তিনি আমাকে আনন্দের সহিত লইবেন। আমি তাঁহাকে আবার ধন্যবাদ—তাহার অর্থ যাহাই হউক—দিয়া বিদায় হইয়া বারাণ্ডায় আসিলে মুসলমান মুরুব্বি ছুটিয়া আসিয়া আমাকে পাকড়াও করিয়া বলিলেন—"দেখিলেন মহাশয়! আপনার সম্বন্ধে কেমন সাহেবের মত পরিবর্ত্তন করাইয়াছি। এ কি ওর কাজ?" আমি বলিলাম—"ঠিক।" তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া প্রাঙ্গণে পড়িতে না পড়িতে আমার অন্য মুরুব্বি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—"দেখিলেন মহাশয়! কুক সাহেবের মত কেমন পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছি। এ কি মোস্‌লার কাজ?" আমি আবার বলিলাম—"ঠিক।" এরূপে দুটিকে লইয়া আমি সর্ব্বদা বেশ একটু রগড় করিতাম। তাহাদের দুজনেরই বিশ্বাস, খোসামুদি-বিদ্যায় তাহারা সিদ্ধহস্ত। কুক সাহেব নিজেও না কি বলিতেন—"খোসামুদির মত এমন মিষ্ট আর কিছুই নাই। তবে যদি ঠিক ওজনে ব্যবহার করা যায়।" আমার মতে এমন শক্ত বিদ্যা 'কনিক সেকসন' (Conic Section)ও নহে। আর 'ওজন' বুঝাটা আরও বিষম। আমি কখনও ইচ্ছা করিয়া যদি কোন গৌরাঙ্গকে দুটা খোসামুদির কথা বলি, তিনি মনে

করেন, আমি ঠাট্টা করিতেছি ; ফল বিপরীত হয়। হায়! আমার এমনই হতভাগ্য নাম পড়িয়া গিয়াছে। আমি সেইজন্য খোসামুদি একটা বিজ্ঞান (Science) বলিয়া জানি, এবং আমার বিশ্বাস, তাহার জন্যও একটা স্বতন্ত্র প্রতিভা(Genius)র আবশ্যক।

২। ডবল পীরিত ভঙ্গ

চট্টগ্রাম হইতে শকটের ট্রেনে আসিবার সময়ে নোয়াখালি পৌঁছিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমার ভবিষ্যৎ আরদালি মহাশয় আমার অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন। তিনি শকটের পার্শ্বে পদব্রজে যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন যে, নোয়াখালিতে বড় গোলযোগ লাগিয়াছে। আমার 'সাকৃত' মহাশয় নোয়াখালিতেই প্রথম ডেপুটি হইয়া আসেন। তিনি লোকপ্রিয় হইবার জন্য উকিল মোক্তার আমলা সকলের সঙ্গে খুব মাখামাখি ঢলাঢলি করেন। নোয়াখালিতে দুই 'বারোয়ারি' বা '১২ ইয়ারি' আছে। একটা উকিলদের বাসন্তী পূজা, আর একটা তার পাল্টা আমলাদের দোল। বাসন্তী আসরে গৌরাঙ্গিনীর সঙ্গে গৌরাঙ্গ পূজারও ব্যবস্থা হয়। তাহা না হইলে এই সভ্য ইংরাজি-শিক্ষিতদের গৌরী-পূজার সার্থকতা কোথায়? আসরে জজ ম্যাজিস্ট্রেট দুইজনের জন্য মাত্র বেদির বা চেয়ারের বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং গোরাচাঁদের বুট-মণ্ডিত নীল 'পাদপদ্ম'তলে নোয়াখালি 'বারে'র কালাচাঁদ উকিল মোক্তারেরা কৃতাঞ্জলিপুটে বার দিয়া বসিয়া যোগস্থ ভাবে খেমটার নৃত্য দেখিতেছেন। এমন সময়ে গোরাচাঁদেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের কালাচাঁদ ডেপুটি মুন্সেফ্‌দের দেখিতেছি না কেন?" উকিলের দলপতি মহাশয় করযোড়ে ব্যঙ্গ হাসিতে অধরপ্রান্ত রঞ্জিত করিয়া বলিলেন—"সার্! সার্! (Sir! Sir!) তাঁহারা আপনাদের মত চেয়ার চান! এত স্পর্দ্ধা! তাই মান করিয়া আসেন নাই। আমরা বলি—'মান নিয়ে থাক মানিনি'।" কালাচাঁদ প্রভুরা উকিল মোক্তারদের এ ধৃষ্টতার কথা শুনিয়া বলিলেন—"বটে! আর উকিল-পাড়ারূপ বৃন্দাবনে গোচারণে যাইব না।" তাঁহারা আমলাদের দোলে পাল্টা লইলেন। এখানে আমার দুই মুরুব্বিই কর্ত্তা। তাঁহারা সেখানে গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ হাকিমদের জন্য চেয়ারের বন্দোবস্ত করিলেন। গৌরাঙ্গেরা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাদের উকিলবৃন্দ বা বৃন্দাবৃন্দকে যে দেখিতেছি না?" তাঁহারা বলিলেন—"সার্! সার্! (Sir! Sir!) উকিলেরা আপনাদের মত চেয়ার চান। কি স্পর্দ্ধা! তাই তাঁহারা মান করিয়া আসেন নাই। যাহারা শালের শকট-চক্রে মস্তক বেষ্টিত করিয়া, করযোড়ে আমাদের পদতলে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের ধর্ম্মাবতার বলিয়া পূজা করে তাহাদিগকে আমাদের সঙ্গে কাষ্ঠাসনে বসিতে দিলে, আমরা আপনাদের অধীনস্থ হাকিম, আমাদের সম্মান থাকে কি প্রকারে?" সাহেবেরা হাসিয়া খুন। আর সে হাসি উকিলদের "হৃদয়ে হানল শেল।" এরূপে 'বেঞ্চ' ও 'বারের' মধ্যে যখন মানের পালাটা জমাট হইয়া উঠিয়াছে, সে সময়ে মোক্তারদের দলপতি একদিন আমার 'সাকৃত' মহাশয়ের 'বেঞ্চে' গিয়া তাঁহার কাণে কাণে কি প্রেমালাপ করেন। উভয়ের মধ্যে ঠাকুরদাদা ও নাতি সম্পর্ক হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই ঠাকুর-দাদাগিরি আজ নাতির ভাল লাগিল না। তিনি চটিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমার বেঞ্চে বিনা অনুমতিতে উঠিলে কেন?" ঠাকুরদাদা বলিলেন—"তুমি আমার নাতি, তোমার আবার অনুমতি কি?" প্রকাশ্য কোর্টে এ উত্তরে 'সাকৃত' অপ্রতিভ হইয়া, আদালত অবমাননার জন্য তাঁহার দশ টাকা জরিমানা করিলেন। অমনি লঙ্কাও জ্বলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ 'বার'-সভায় বড় বড় ঢাকোদরবিশিষ্ট উকিল হইতে ফতুল্লা মুন্সি মোক্তার পর্য্যন্ত সমবেত হইয়া 'সাকৃতে'র নামে নোটিশ জারি করিলেন যে, তিনি উক্ত মোক্তারের কাছে তাঁহার স্ত্রীর জন্য পাল্কী চাহিয়াছিলেন, তাহা না দেওয়াতে তিনি বিদ্বেষবশতঃ তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য দণ্ড করিয়াছেন। অতএব ক্ষমা না চাহিলে তাঁহার নামে দশহাজার টাকার ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে। এইদিকে জরিমানার প্রতিকূলে জজ সাহেবের কাছে "মোসন" উপস্থিত হইয়াছে। এমন সময়ে আমার নোয়াখালি বদলির গেজেট হয়,

এবং আমার 'সাকৃত' লম্ফ দিয়া বলেন—"থাক শালারা! আমার ওস্তাদ আসিতেছে। এবার দেখিব!"

আরদালি সাহেবের কাছে এই মনোরম উপন্যাস শুনিতে শুনিতে যখন নোয়াখালির সীমায় উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম—আমার বন্ধুবর্গ ও বহুতর লোক আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে বড়ই আদরে গ্রহণ করিলেন। আমার 'সাকৃতে'র আনন্দের সীমা নাই। তাঁহার মুখে হাসি ধরে না। এতগুলি বন্ধুর সহিত এত বৎসর পরে একত্রে সাক্ষাৎ পাইয়া আমারও বড়ই আনন্দ হইল। 'সাকৃতে'র স্ত্রী আসিয়া স্ত্রীকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আমারও প্রাতের আহারের সেখানে বন্দোবস্ত, যদিও আমি আমার বালসুহৃদ্ চন্দ্রকুমারের বাসায় গিয়া উঠিলাম। আহারান্তে উপরোক্ত উপন্যাসের বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত সংস্করণ বন্ধুদের ও স্বয়ং 'সাকৃতে'র মুখে শুনিলাম। আমি পূর্ব্বে একবার পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট থাকিতে নোয়াখালি আসিয়া প্রায় সকলের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলাম। অপরাহ্নে দলে দলে লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন উকিলদের মুখে উপন্যাসের অন্যরূপ ব্যাখ্যাও শুনিলাম। তাঁহারা আমার উপর এই মানভঙ্গের ভার দিলেন। আমি সেই মোক্তারকে চিনিতাম। 'সাকৃত'কে বলিলাম যে, তাঁহাকে ডাকাইয়া আমি এই উৎপাত মিটাইয়া ফেলি। কিন্তু 'সাকৃত' তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন—"তুমি মহাশয়! জান না, কুক সাহেব আমাকে কিরূপ ভালবাসে। তাহা জানিলে তুমি কখনও এরূপ বলিতে না। তিনি আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার কোনও ভয় নাই। তিনি উকিল মোক্তার বেটাদের শিক্ষা দিবেন।" তিনি আমার অধীনে এক সময়ে কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া আমাকে 'ওস্তাদ' বলিতেন। অন্যথা তাঁহাতে আমার 'সাকৃতত্ব' কিছুই ছিল না। তিনি অনেক বিষয়ে আমার ওস্তাদ হইবার যোগ্য। তিনি মোটের উপর লোক মন্দ ছিলেন না। তাঁহার পিতা আমাকে বড় স্নেহ করিতেন বলিয়া আমিও তাঁহাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করিতাম। তবে তাঁহার দোষের মধ্যে অত্যধিক 'জ্যেষ্ঠতাতত্ব' ও অতিরিক্ত চালাকি। তাহা ষোল আনা হইতে কুড়ি আনায় তুলিয়া তিনি সময়ে সময়ে বেগতিক করিয়া ফেলিতেন। উপস্থিত ক্ষেত্রেও যে তাহা হইবে, আমি বুঝিলাম। কিন্তু কি করিব, চুপ করিয়া রহিলাম। ইহার দশপনরদিন পরেই কুক সাহেবের কুমিল্লা বদলির সংবাদ আসিল। সুযোগ বুঝিয়া আমার 'সাকৃতে'র মুসলমান প্রতিযোগী তাহার উপর হাত চালাইলেন।

সাহেব-বশীকরণের প্রতিযোগিতার কত হাস্যজনক উপাখ্যানই নোয়াখালিতে শুনিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে নোয়াখালিতে এক মজুমদার ডেপুটি ছিলেন। তাঁহার ও আমার 'সাকৃতে'র মধ্যে মাঝে মাঝে দ্বন্দ্বযুদ্ধ উপস্থিত হইত। 'সাকৃত' কোনওরূপে খোসামুদি-বিদ্যায় মজুমদারকে পরাভূত করিতে না পারিয়া, শেষে তাহার স্ত্রী দ্বারা নানাবিধ মিষ্টি প্রস্তুত করাইয়া, কুক সাহেবের কাছে Present from my poor wife prepared by her own hand (আমার গরিব স্ত্রীর স্বহস্তনির্ম্মিত উপহার) বলিয়া পাঠাইয়া দেন। মজুমদারের স্ত্রী এ বিষয়ে অপারদর্শী। নিজের পয়সা খরচ করিতেও তিনি বড় নারাজ। মহাবিপদে পড়িলেন। এমন সময়ে বিধাতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। 'সাকৃত' ও তাঁহার স্ত্রী বাহাদুরি দেখাইবার জন্য কতক মিষ্টি তাঁহাদের বন্ধুদের কাছেও উপহার পাঠাইয়া দিলেন। মজুমদার মহাশয় উহা পাইবামাত্র উহাতে আরও কিছু 'সেণ্ট' ও আতর মাখাইয়া উহা তৎক্ষণাৎ কুক সাহেবের নিকট পাঠাইয়া, উহা কেবল তাঁহার গরীব স্ত্রীর স্বহস্তনির্ম্মিত বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি তাহার উপর লিখিলেন—কলিকাতা অঞ্চলের রমণীরা ভিন্ন এরূপ মিষ্টি অন্য কোনও স্থানের রমণীরা প্রস্তুত করিতে পারেন না। উভয় উপহার প্রায় এক সময়ে কুক সাহেবের কাছে পৌঁছিল। তিনি উভয়ের গরিব স্ত্রীকে ধন্যবাদ প্রেরণ করিলেন, এবং 'সাকৃত' মজুমদারের চালের খবর না জানিয়া পরদিন যখন বুকের ছাতি ফুলাইয়া কুক সাহেবের বাহাবা পাইতে গেলেন, সাহেব বলিলেন যে, তিনি যাহা পাঠাইয়া-

ছিলেন, উহা মিসেস্ মজুমদারের স্বহস্তে প্রস্তুত। কারণ, মজুমদার সেরূপ মিষ্টি পাঠাইয়া লিখিয়াছেন—কলিকাতার বাহিরে এরূপ মিষ্টি কোনও রমণী প্রস্তুত করিতে পারে না। শুনিয়া 'সাকুত'র একবারে আকাশ হইতে পতন। তিনি অনেক করিয়া কুক সাহেবকে বুঝাইলেন যে, মজুমদার তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়াছেন, এবং ডেপুটি মুন্সেফ সকলকে সাক্ষ্য মানিলেন। কিন্তু কুক সাহেব বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তিনি ইহাদের চিনিতেন এবং এরূপে বাঁদর নাচাইতেন। 'সাকুত' সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সকলের সমক্ষে কোমর বাঁধিয়া মজুমদারকে "মেচোহাটা" করিলেন, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিবার পাত্র নহে। 'সাকুত' স্বয়ং আমাকে এই উপাখ্যান বলিয়া বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! আপনি এমন নির্লজ্জ ও 'ষ্টুপিড' কি কখনও দেখিয়াছেন?" মজুমদার মহাশয় সম্বন্ধে আরও এক গল্প শুনিয়াছিলাম। তিনি বর্দ্ধমানে সবডেপুটি ছিলেন। সার্ ষ্টুয়ার্ট বেলি (Sir Stewart Bayley) লেঃ গবর্ণর হইয়া আসিতেছেন, ট্রেন গভীর রাত্রিতে পেঁছিবে। মজুমদার বাজার হইতে এক হাঁড়ি মিষ্টি কিনিয়া লইয়া ষ্টেশনে দণ্ডায়মান। ট্রেন গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে প্রকাণ্ড অজগরের মত ফোঁশ ফোঁশ করিয়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়া থামিল। মজুমদার মিষ্টির হাঁড়ি লইয়া তাহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত ছুটিতেছেন, এবং প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর অমল-ধবল বর্ণে রঞ্জিত গাড়ীর কপাটে আঘাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"সার্ ষ্টুয়ার্ট বেলি কি এ গাড়িতে আছেন?" অসময়ে ভগ্ননিদ্র কোনও শ্বেতাঙ্গসুন্দর ঘোর ঘর্ঘর কণ্ঠে তাঁহাকে—go to the devil (নরকে যাও!), কেহ বা damn your eyes (তোমার চক্ষু নরকে যাক!) ইত্যাদি মধুর অভিবাদন করিতেছেন। উহা নীরবে শুনিয়া তিনি এক গাড়ী হইতে অন্য গাড়ীর কাছে যাইতেছেন, এবং তাঁহার মিষ্টির প্রতিদানে নানারূপ মিটালাপ উদরস্থ করিতেছেন। অবশেষে এক গাড়ীর দ্বারে আঘাত করিয়া ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর শুনিলেন—"Who the devil are you? (তুই সয়তান কে)।" উত্তর —"আমি ডেভিল (সয়তান) নহি 'ইওর অনার'। আমি বর্দ্ধমানের সবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অমুক মজুমদার। অমুক বিখ্যাত লোকের ভাগিনা। আমার গরিব স্ত্রী 'ইওর অনারে'র জন্য অনাহারে অনিদ্রায় সপ্তাহকাল পরিশ্রম করিয়া কিছু জলখাবার প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহা 'ইওর অনার'কে দিতে আসিয়াছি। 'ইওর অনার' তাহা গ্রহণ না করিলে poor thing তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে।" সার্ ষ্টুয়ার্ট তখন নাচার হইয়া গাড়ীর কপাট খুলিলেন। মজুমদার আভূতল নত হইয়া সেলাম দিয়া, মিষ্টির হাঁড়ি গাড়ীর মধ্যে তুলিয়া দিলেন, এবং সার্ ষ্টুয়ার্ট তাঁহার স্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে দিতে গাড়ী খুলিল। মজুমদার সেলাম দিতে দিতে গাড়ীর সঙ্গে তাঁহার নিবিড় কৃষ্ণাঙ্গ ও স্থূল উদর লইয়া দৌড়িলেন, এবং তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে সার্ ষ্টুয়ার্টকে বলিলেন। তিনি বলিলেন—I will (আমি স্মরণ রাখিব)। তিনি নিজে অহঙ্কার করিয়া বলিতেন যে, এই নৈশ অভিযানের ফলে কিছুদিন পরে তিনি ডেপুটিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

যখন এইরূপে দুই হিন্দু খোসামুদি-বীরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতেছিল, তখন আমার মুসলমান মুরুব্বি বড় মুস্কিলে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বিবাহ হয় নাই। কাজে কাজেই "গরিব স্ত্রী" নাই, নোয়াখালিতে কোন আত্মীয়াও নাই, মিঠাই প্রস্তুত করা ত দূরের কথা। তিনি দেখিলেন যে, ইহাঁদের এই চালে তিনি একবারে ছায়াতে পড়িয়া গেলেন। অতএব কিছুদিন যোগস্থ হইয়া,—মুসলমানশাস্ত্রেও যোগ আছে—একটা ফিকির স্থির করিলেন। তিনি একদিন প্রাতে কুক সাহেবের ঘরে গিয়া একবারে তাঁহার সবুট পদাম্বুজ-পার্শ্বে বসিয়া, এবং পকেট হইতে একখানি দিব্বি সার্টিনের রুমাল বাহির করিয়া, তাঁহার শ্রীচরণের মাপ লইতে লাগিলেন। কুক সাহেব বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"মৌলবি! এ কি?" উত্তর—"আমার গরিব ভগ্নী 'ইওর অনারের জন্য এক জোড়া উলের জুতা প্রস্তুত করিতে আমার বাড়ী হইতে 'ইওর অনারে'র সোনার পায়ের (Golden foot) মাপ

চাহিয়াছে।" কুক সাহেব তাঁহার ভগ্নীকে ধন্যবাদ দিলেন। তাহারপর তিনি কলিকাতায় তাঁহার কোন বন্ধুর কাছে উহা পাঠাইয়া, কসাইটোলার চিনার দোকান হইতে এক জোড়া উলের জুতা আনাইয়া, উহা তাঁহার 'গরিব ভগ্নী'র উপহার, যাহা উক্ত ভগ্নী বহু দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়া, 'হিজ অনারে'র জন্য প্রস্তুত করিয়াছে, পাঠাইয়া দিলেন। কুক সাহেব তাঁহার ভগ্নীকে ধন্যবাদ দিয়া এক দীর্ঘ পত্র লিখিলেন, এবং ভ্রাতা উহা গৌরবের সহিত সকলকে দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একেবারে বাজী মাৎ! 'সাকৃত' আমাকে এই গল্প করিয়া বলিয়াছিলেন —"মহাশয়! মোস্‌লা বেটার ভগ্নী পর্য্যন্ত নাই। এমন মিথ্যুক!"

যাহা হউক, এবার তাঁহার মুসলমান প্রতিযোগী 'সাকৃত'কে ধরাশায়ী করিল। কুক সাহেবের বদলির সংবাদ প্রচার হইলে সে কুক সাহেবকে যাইয়া বলিল যে, তিনি যদি উকিলদের সঙ্গে 'সাকৃতে'র গোলযোগটা মিটাইয়া দেন, তবে নোয়াখালি হইতে কুক যাইবার সময়ে সে খুব একটা বিরাট্ অভ্যর্থনার যোগাড় করিয়া দিতে পারিবে। কুক সাহেব বঁড়শি গিলিলেন, এবং প্রধান উকিল তিনজনকে ডাকাইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, 'সাকৃত' যদি সেই মোক্তারের কাছে ও সম্যক্ 'বারে'র কাছে বিনীত ভাবে ক্ষমা-পত্র (apology) লিখিয়া দেন, তবে তাঁহারা এ গোলযোগ ছাড়িবেন, এবং তাঁহারা কুককে একটা বিরাট্ অভ্যর্থনা দিবেন। একদিন সন্ধ্যার সময়ে আমরা সমস্ত ডেপুটি, মুন্সেফ ও অন্যান্য বন্ধুগণ আমার বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে 'সাকৃত' বিচলিত অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"মহাশয়! আমাকে খুব বেশী করিয়া এক গ্লাস ব্রাণ্ডি দিতে বল।" আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম—"কেন? কি হইয়াছে?" উত্তর—"আর মহাশয়! কি হইয়াছে! কুক সাহেব আমাকে অপমান করিয়া অভ্যর্থনা চাহে,—আর কি হইয়াছে! দড়ি, না হয় বিষ আনিয়া দেও! এই প্রাণ ত্যাগ করি।" আমরা সকলে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হইয়াছে খুলিয়া বল না?" উত্তর—"আর খুলিয়া বলি! কই মহাশয়! ব্রাণ্ডি আনিতে বলিলে না?" ভৃত্য আদেশমতে ব্রাণ্ডি আনিয়া দিল। 'সাকৃত' অর্দ্ধগ্লাসপরিমাণ জল মিশ্রিত ব্রাণ্ডি এক নিশ্বাসে পান করিলেন। পানকার্য্যটা শেষ করিয়া বলিলেন—"দাও মহাশয়! একটা 'এপলজি' লিখিয়া দেও!" আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি. 'এপলজি' কেন? কাহার কাছে দিবে?" উত্তর—"আর কাহার কাছে দিব? সেই মোক্তারের কাছে।" আমি অতি দুঃখিত ভাবে বলিলাম—"সে কি কথা! তুমি তাহার কাছে একটা লিখিত 'এপলজি' দিয়া কি সমস্ত 'সার্ভিসের মুখে চূণ-কালি দিবে? আমি যেরূপ মিটমাট করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাতে ত তোমাকে কোনওরূপ অপমান স্বীকার করিতে হইত না।" উত্তর—"মহাশয়! এখন সেকথা বলিয়া আর কি ফল? আমি কি জানিতাম যে, কুক সাহেব এরূপ করিবে?"

প্রশ্ন। তবে কুক সাহেবই কি তোমাকে 'এপলজি' দিতে বলিয়াছে?

উ। তা নয় ত কি আমি সাধ করিয়া দিতেছি? দাও—একটা 'এপলজি' লিখিয়া দেও।

আমি তখন একটা সাধারণরূপ 'এপলজি' লিখিয়া দিলাম। 'সাকৃত' তাহা পড়িয়া বলিলেন—"না, এরূপ দিলে হইবে না। আমাকে পেন্সিল দেও দেখি!" তিনি তাঁহার পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া, তাহাতে পেন্সিল দিয়া লিখিয়া, আমাকে দিয়া বলিলেন—"দেখুন। এরূপ দিলে কেমন হয়?" আমি দেখিলাম, উহা ত 'এপলজি' নহে. দাসখত। আমি পূর্ব্বাপেক্ষাও বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"তুমি এরূপ একটা 'এপলজি' দিবে?" উত্তর—"না দিলে চাকরি ছাড়িয়া দিতে হয়। খাইব কি? তাই বলিতেছিলাম— দড়ি, না হয় বিষ আনিয়া দেও, এ প্রাণ ত্যাগ করি।" আমার মুখে আর কথা সরিল না। ইংরাজি দেখিয়া, এই 'এপলজি' যে 'সাকৃত' আপন বিদ্যায় তখনই লিখিয়া দিলেন, আমার কেমন বিশ্বাস হইল না। অসাবধানে কাগজখানি উল্টাইলে আমি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম যে, অপর পিঠে কুকের নিজের হাতে লেখা সেই 'এপলজি'র মুসাবিদা! 'সাকৃত' উহা মুখস্থ

করিয়া আসিয়া, এতক্ষণ এই অভিনয় করিতেছেন! আমি বলিলাম,—"এই যে এ পৃষ্ঠায় কুক সাহেবের হাতের লেখা এই 'এপলজি'র মুসাবিদা দেখিতেছি। তিনি তবে তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে, এরূপ দাসখত দিতে হইবে, এবং তুমি স্বীকার করিয়া আসিয়াছ?" সাকৃত বলিলেন, "তা না হইলে কি আর আমি এরূপ করি।" তারপর তিনি আর দড়িও চাহিলেন না, বিষ পানও করিলেন না। সেই 'এপলজি' অন্য কাগজে নকল করিয়া, এবং বিষের বদলে আর এক গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া চলিয়া গেলেন। বোধ হয়, তখনই গিয়া উহা কুক সাহেবকে দিলেন। আমরা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—

"পীরিতি পীরিতি তিনটি আখর
ভুবনে আনিল কে?
অমিয় ভাবিয়া ছাঁকিয়া খাইনু,
তিতায় তিতিল দে॥"

'সাকৃত' তখন কুক সাহেবের কাছে গিয়া হয় ত বলিয়াছিলেন—

"তু বড় সুজন জানি হে বঁধু!
তু বড় সুজন জানি।
কি গুণে গড়িলি, কি গুণে ভাঙ্গিলি
নবীন পীরিতিখানি?
আর কি তেমন হবে হে বঁধু!
আর কি তেমন হবে?
মোর মনে ছিল এ সুখ সম্পদ,
যাবৎ জীবন রবে॥
ভাল হ'ল কালি দিলি সমুদয়,
বুঝিনু আপন কাজে।
মুই অভাগিনী কিছুই না জানি
জগৎ ভরল লাজে॥"

বলিয়াছিলেন কি না জানি না। কিন্তু নোয়াখালি-জগৎ লাজে ভরিয়া থাকিলেও, তাহার পরদিন দেখি, তাঁহার মুসলমান প্রতিযোগীর সহিত কুক সাহেবের অভ্যর্থনার চাঁদার বহি হস্তে তিনি বাহির হইয়াছেন! দুই মুরুব্বিই বলিলেন যে, আমাকে প্রথম স্বাক্ষর করিয়া, পঞ্চাশ টাকা চাঁদা লিখিয়া দিতে হইবে। আমি বলিলাম, আমি প্রথম স্বাক্ষর ত করিবই না, এবং পঞ্চাশ টাকা দূরে থাকুক, কুকের মত লোকের অভ্যর্থনার জন্য পাঁচ টাকাও দিব না। তাঁহারা হাসিয়া বলিলেন,—"আপনি পাগল। আমরা কি সত্য সত্যই আপনার কাছে টাকা চাহিতেছি। আমরা কেহ কিছু দিব না। কেবল আপনি পঞ্চাশ টাকা ও আমরা প্রত্যেকে দশ কুড়ি টাকা লিখিয়া দিলে, অন্যলোকে বেশী বেশী টাকা স্বাক্ষর করিবে, এবং তাহাদের টাকাতেই খরচ চলিয়া যাইবে। আমাদের কিছুই দিতে হইবে না।" ঘৃণায় আমার হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, আমি এরূপ প্রবঞ্চনায় যোগ দিতে পারিব না। তাঁহারা আমার স্বাক্ষর না করাইয়া চলিয়া গেলেন। পরে শুনিলাম, তাঁহারা নিজের নামে পঞ্চাশ টাকা করিয়া লিখিয়া, কুক সাহেবকে গিয়া দেখান, এবং সে প্রবঞ্চনার দ্বারা অন্যলোককে প্রবঞ্চিত করিয়া টাকা তোলেন। এত অপমানের পরেও 'সাকৃত' এরূপ অভ্যর্থনার নায়ক হইয়াছেন কেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন—"কি করিব মহাশয়! 'স্টুপিডে'রা ত ছাড়ে না। একটুক মজা করিতেছি।"

এরূপে প্রায় তিনহাজার টাকা জমিদার ও উকিল আমলাগণ হইতে উঠিল। বাই আসিল, খেমটা আসিল, ভোলা দীঘির পারে বাজি জ্বলিল, এবং বাই খেমটার সঙ্গে আমার দুই মুরুব্বির নাচ হইল। উকিল মহাশয়েরাও শামলা মাথায় দিয়া নাচিলেন। কুক সাহেব

বাঙ্গালীদের The great B. B. nation বলিতেন শুনিয়াছি, এবং সময়ে সময়ে B. B.র ব্যাখ্যা 'বেঙ্গলি বাবু' করিতেন, কখনও বা অকথ্য বা—বাবু ব্যাখ্যা করিতেন। সেই কুক সাহেবের অভ্যর্থনা! তিনি যে বাঙ্গালী জাতিকে ঘৃণা করিতেন এই অভ্যর্থনার দ্বারা বাঙ্গালীরা তাহার সার্থকতা প্রমাণ করিলেন। তাঁহার দোষ কি? যখন নাচ চলিতেছিল, এবং বাজি জ্বলিতেছিল, আমি তখন এক বন্ধুর বাসায় বসিয়া বাঙ্গালীর অধঃপতন ভাবিতেছিলাম।

তাহারপর একদিন 'সাকৃত' আমাকে বলিলেন যে তিনি আর কোন্ মুখে নোয়াখালি থাকিবেন। চিফ সেক্রেটারী পিকক সাহেবের কাছে বদলির একখানি পত্র মুসাবিদা করিয়া দিতে বলিলেন। আমি তাহা দিলাম। তিনি দার্জিলিঙ্গের রেলের উপর কোন স্থানে বদলি হইলেন। কিছুদিন পরে তিনি 'প্রমোশন' পাইলে, তাঁহার যোগ্যতানুসারে পাইয়াছেন বলিয়া আমি আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে তিনি লিখিলেন—তাঁহার যোগ্যতার জন্য তিনি 'প্রমোশন' পান নাই। পিকক দার্জিলিংগ যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার কুকুরের জন্য মাংস যোগাইয়াছিলেন। এই কুকুরের কৃপায় ও তাঁহার খোসামুদির অভিজ্ঞতায় তিনি 'প্রমোশন' পাইয়াছেন। ইহার সমালোচনা অনাবশ্যক।

নোয়াখালির কার্য্য

কুক চলিয়া গেলেন। নোয়াখালিতে একজন কালা সিবিলিয়ান কলেক্টর হইয়া আসিলেন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ঠিক সহপাঠী নহে আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন। আমার এক বন্ধুর সঙ্গে ইনি হিন্দু হোষ্টেলে ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে বড় বন্ধুতা ছিল। উভয়ের সে সময়েই পানদোষ ছিল এবং সেই দোষেই উভয়ে অসময়ে স্বদেশকে দুইটি রত্নশূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। বন্ধু একজন নামস্থ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইনি এক বৎসর মাত্র ইংলণ্ডে থাকিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন তিনি ভিন্ন দেশবাসী ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বিধাতা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহাকে সিভিল সার্ভিসে লইয়া তাঁহার অকালমৃত্যু ঘটাইলেন। তিনি আফিসের কার্য্য দ্রুতহস্তে নিষ্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট সময়ে কেবল একটি সংস্কৃত অভিধান সংকলনে কাটাইতেন। তিনি খর্ব্বাকৃতি নাতিস্থূলকায় তাঁহার স্বদেশীয় আকৃতি ছিলেন। প্রকৃতি শান্ত। তিনি এই পূর্ণ যৌবনেও অবিবাহিত। তাহাতে চরিত্রে যে দোষ অপরিহার্য্য তাহা ঘটিয়া সময়ে সময়ে তাঁহার সম্মানহানি ঘটাইত। চরিত্রে কিঞ্চিৎ অপরিণামদর্শিতাও ছিল। নোয়াখালির ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার খেয়াল হইল একটি সর্বাভিভসনের মত ক্ষুদ্র নোয়াখালি জেলা হইতে দুইতিন লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া নোয়াখালির সহিত ইংলণ্ড ও আমেরিকার বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিবেন। যেই মুখ হইতে কথা বাহির করিলেন অমনি আমার মুরুব্বিযুগল ও অন্য চাটুকারেরা বাহাবা দিয়া তোলপাড় করিতে লাগিলেন। আমি উহা অসম্ভব বলিলে তিনি উড়াইয়া দিলেন। সভা হইল, দেশের জমিদারবর্গকে—যেমন হইয়া থাকে, কাণে ধরিয়া আনা হইল। গলা টিপিয়া চাঁদা দস্তখত করান হইল। ডেপুটিদের নামেও দুই হাজার টাকা করিয়া চাঁদা ধরা হইল। তথাপি মোট স্বাক্ষর অর্দ্ধ লক্ষ হইল না। তাহাও হাস্যকর স্বাক্ষর মাত্র। অতএব ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত নোয়াখালির বাণিজ্য এখানেই শেষ হইল। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত হিতকর কার্য্য এরূপ সভাতেই শেষ হয়।

যাক্। যদিও এই হাস্যকর কার্য্যে উৎসাহ না দিয়া আমি তাঁহার কিঞ্চিৎ অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলাম, তথাপি তিনি আমাকে প্রথম প্রথম বড় বিশ্বাস করিতেন, এবং সকল বিষয়ে আমার পরামর্শ লইতেন। এই সুযোগে আমি নোয়াখালির কয়েকটি হিতকর কার্য্য করি।

ষ্টীমার

সর্ব্বপ্রথমেই আমার ষ্টীমারের প্রস্তাব তাঁহার দ্বারা কার্য্যে পরিণত করি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডে মাসে আড়াই শত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করাইলে এক ষ্টীমার কোম্পানী ষ্টীমার

চালাইতে স্বীকার করে। আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম, নোয়াখালি হইয়া চট্টগ্রাম ও নারায়ণগঞ্জের মধ্যে ষ্টীমার চলিবে। কলেক্টর তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া বরিশাল ও নোয়াখালির মধ্যে ষ্টীমার চলার প্রস্তাব করেন, এবং সেরূপে ষ্টীমার চলে, এবং এখনও চলিতেছে। ইহাতে যে নোয়াখালির কি প্রভূত উপকার হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সাহায্যও বেশী দিন দিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে ষ্টীমার কোম্পানীর লাভ দাঁড়াইল। প্রাকৃতিক মহাশক্তিসমূহের লীলা দেখিয়া বৈদিক ঋষিরা যেমন তাহাদিগকে তাঁহাদের দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন, বৈজ্ঞানিক মহাশক্তিকেও আমাদের দেশের লোক এখন সেরূপ পূজা করে। মানব আপনার ক্ষুদ্র জ্ঞানের অতীত কিছু দেখিলে তাহার কাছে প্রণত হয়। শুনিয়াছি, যখন ষ্টীমার একটা ক্ষুদ্র খাল দিয়া যাইত, তখন বহুদূরে হইতে সমবেত নরনারী হুলুধ্বনি করিয়া শঙ্খ, কাংস্য, ঘণ্টা বাজাইত, এবং ষ্টীমারকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিয়া ভূতলে প্রণত হইয়া থাকিত। ষ্টীমার খুলিবার কয়েক বৎসর পরে আমি নিজেও একবার কলিকাতায় যাইতে এই দৃশ্য দেখি। সারেঙ্গ আমাকে বলিয়াছিল যে, তখন কিছুই নাই বলিলেই চলে, কিন্তু পূর্ব্বে ষ্টীমার-দর্শক যাত্রীর ও তাহাদের পূজকের ভয়ানক ভিড় হইত, এবং অনেকে তাহাকে টাকা দিয়া ষ্টীমারখানি থামাইতে, কি ধীরে চালাইতে অনুনয় বিনয় করিত। কেহ কেহ এ কথা শুনিয়া হাসিলেন, বিদ্রূপ করিলেন। কিন্তু আমি মনে ভাবিলাম যে, প্রাকৃতিক শক্তির বা দেবতার পূজা যেমন সেই সর্ব্বশক্তিদাতার পূজা, যিনি বাষ্পে এ শক্তি দিয়াছেন, এও কি তাঁহার পূজা নহে। এমন পূজা ভক্তিপ্রাণ হিন্দু ভিন্ন আর কেহ করিতে পারে না।

পয়োনালী

নোয়াখালি একটি ক্ষুদ্র নগর। আধ ঘণ্টায় তুমি সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতে পার। কিন্তু রাস্তাগুলি সমস্ত অবৈধভাবে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হস্তে থাকাতে, (কারণ মিউনিসিপ্যালিটি অতি দরিদ্র) দেখিতে বড়ই সুন্দর, এবং শকট-চক্রের বিশেষ সংঘর্ষণ না থাকাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সবুজ তৃণ-প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে রক্তবর্ণ প্রবালমালার মত রাস্তার শোভা বড়ই মনোহারী। কিন্তু তাহার পার্শ্বে নিয়মিত পয়োনালী নাই। তাহার উপর পার্শ্বস্থিত গৃহভিত্ত্যাদির জন্য মাটি তোলাতে স্থানে স্থানে গর্ত্ত। বর্ষার সময়ে তাহাতে আবর্জ্জনা পচিয়া, রাস্তা দিয়া স্থানে স্থানে নাসিকা রুদ্ধ না করিয়া চলা অসাধ্য করিয়া তুলিত। আমি এ পয়োনালীগুলি সমান করিয়া জল নির্গমের সুবিধা করিয়া দেওয়ার প্রস্তাব করি। মিউনিসিপ্যাল প্রভুরা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেন, এবং বলেন যে, পাকা ড্রেন ছাড়া তাহা হইবে না এবং পাকা ড্রেনের জন্য বাইশ হাজার টাকা এষ্টিমেট হইয়া রহিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি বলিতে উকিলের লীলাভূমি, এবং উকিল মহাশয়দের আইন ও নজিরের বাহিরে জ্ঞান বড় অল্প। আমি বলিলাম, তিনশত টাকাতে আমি এই কার্য্য সম্পন্ন করিব। কলেক্টর বিস্মিত হইলেন, এবং তিনি জিদ করাতে মিউনিসিপ্যালিটি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া উহা মঞ্জুর করিলেন। তিনি আমার বন্ধু ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ারবাবুর সাহায্যে পুরুষানুক্রমিক গর্ত্তগুলির স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ ভরাইয়া, এবং পয়োনালীর জন্য উচ্চ স্থান নীচ করিয়া, তাহার উভয় পার্শ্বে সুন্দর ঘাস জন্মাইয়া দিয়া এরূপ সহজে পয়োনালী প্রস্তুত করিয়া দিলাম যে, বর্ষার সময়ে এক বিন্দু জলও কোথায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। তখন কলেক্টর ও শহরবাসীরা আমায় বাহাবা দিতে লাগিলেন।

পায়খানা

গৃহের পার্শ্বে পুরুষানুক্রমিক এক গর্ত্ত, এবং তাহাতে পুরুষানুক্রমিক সঞ্চয়,—ইহাই নোয়াখালির পায়খানার বন্দোবস্ত। সময়ে সময়ে রাস্তা দিয়া পর্য্যন্ত দুর্গন্ধের জন্য চলা কষ্টকর হইত। এই পুরাতন শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা উঠাইয়া দিয়া, তোলা পায়খানার প্রস্তাব করাতে আমি আর একবার মিউনিসিপ্যালিটির কাছে উপহাসভাজন হইলাম। তাঁহারা বলিলেন, উহা বহু ব্যয়সাধ্য, এবং এরূপ দরিদ্র স্থানে অসম্ভব। এই ধুয়া আমি জানি যে, সর্ব্বত্র উঠিয়া থাকে। আমি আবার কলেক্টরকে ধরিয়া পড়িলাম, এবং উহা সহজসাধ্য বলিয়া

বুঝাইয়া দিলাম। তিনি বলিলেন, এ দেশে মেথর পাওয়া যাইবে না বলিয়া সকলে বলিতেছেন। আমি বেহার হইতে মেথর আনাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলাম। মিউনিসিপ্যালিটি তাহাদের পাথেয় মাত্র দিতে ও থাকিবার ঘর প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হইলে, আমি কয়েকজন মেথর আনিয়া প্রথমতঃ মাদারিপুরের প্রণালীমতে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। দেখিতে দেখিতে সকলেই উপকার অনুভব করিলেন, এবং মিউনিসিপ্যালিটি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। তবে পশ্চিমের মেথর যেরূপ নির্ব্বোধ, তাহাদিগকে শিশুর মত পালন করিতে হয়। আমি যে কয়েক মাস নোয়াখালিতে ছিলাম, আমি তাহাদের সেরূপ পালন করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমি চলিয়া আসিলে তাহাদের কেহ কেহ পলায়ন করিয়া ফেনীতে আমার কাছে নালিস করিতে আসিত। জানি না, সে বন্দোবস্ত মিউনিসিপ্যালিটি এখনও রাখিতে পারিয়াছেন, না আবার পৌরাণিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

রোড সেস্

আমার হাতে রোড সেসের ভার ছিল। তখন রোড সেস 'রিভ্যালুএশন' (Revaluation) হইতেছিল। প্রত্যহ শত শত নোটিশ নাজিরের কাছে যাইতেছিল, এবং নাজির মহাশয় তাহার দ্বারা দু পয়সা বেশ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। এক শত নোটিশ তাঁহার কাছে প্রেরিত হইলে, তিনি তাহার উপর শতকরা পঁচিশ টাকা হিসাবে জারির খরচ কষিতেন। মনে কর, এই এক শত নোটিশ এক গ্রামের বা মৌজার। উহা জারি করিতে একজন পেয়াদার বড় বেশী লাগিলে চারি দিন লাগিবে, এবং চারি আনা হিসাবে তাহার বেতন এক টাকা মাত্র। তিনি তাহাও দিতেন না। তিনি এই সকল নোটিশ ঠিকা পেয়াদার দ্বারা জারি করিতেন। প্রত্যহ বটতলায় তাহার নিলাম হইত। যে উমেদার সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন পারিশ্রমিকে তাহা জারি করিতে সম্মত হইত, উহা তাহাকে দেওয়া হইত। এরূপে এক টাকার কমেও এক গ্রামে এক শত নোটিশ জারি হইত। অবশিষ্ট চব্বিশ টাকা নাজির মহাশয়ের পকেটে প্রবেশ করিত। তিনি এরূপে মাসে অন্যূন দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিতেন। আমার হস্তে যে দিন রোড সেসের ভার পড়িল সেই দিনই দেখিলাম, তিনি দুই শ কতখানি নোটিশের জন্য ষাট টাকা এষ্টিমেট পাঠাইয়াছেন। সমস্ত নোটিশ সংলগ্ন দুইটা মৌজার মাত্র। আমি একজন পেয়াদার ঊর্দ্ধসংখ্যা বিশ দিনের কাজ ধরিয়া পাঁচ টাকা মাত্র মঞ্জুর করিয়া দিলাম। নাজির মহাশয় বজ্রাহত হইলেন। তিনি সশরীরে আমার সমক্ষে গম্ভীরমূর্ত্তিতে অধিষ্ঠান হইলেন। তাঁহার টেরা চক্ষু, কৃষ্ণ মূর্ত্তি। তাঁহার মুখভঙ্গি দেখিয়া ও কথার ভঙ্গি শুনিয়া আমি তখনই বুঝিলাম যে, তিনি একটি সহজ জীব নহেন। তিনি বলিলেন, আমি তাঁহাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছি। তিনি চিরদিন এই ভাবে এষ্টিমেট দিয়াছেন, এবং বহু ডেপুটি কলেক্টর তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই আমার মত বিচক্ষণ লোক ছিলেন, এবং দেশের অবস্থা জানিতেন। আমি নূতন লোক, দেশের কিছুই জানি না। ঠিকা পেয়াদা নোয়াখালিতে বড় দুর্লভ বস্তু। সকল সময়ে এক গ্রামের সমস্ত নোটিশ একত্রে দেওয়া হয় না। বহু গ্রামের নোটিশ একসঙ্গে যাইয়া থাকে। এবার ঘটনাক্রমে দুটি সংলগ্ন গ্রামের এতগুলি নোটিশ গিয়াছে। ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমি বলিলাম, এখন হইতে এক গ্রামের সমস্ত নোটিশ একত্রে পাঠাইতে আমি আদেশ দিব। আমি অবিচক্ষণ ও অপরিণামদর্শী হইলেও তাঁহার এই অদ্ভুত এষ্টিমেট পাশ করিতে পারিব না। তিনি চটিয়া কলেক্টরের কাছে গিয়া আমার নামে লম্বাচৌড়া চুকলিসম্বলিত এক নালিশ দাখিল করিলেন। কলেক্টর আমাকে ডাকিলেন, এবং বলিলেন, নাজির আমার এষ্টিমেটমত কার্য্য করিতে পারিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছে। আমি সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, নাজির না পারেন, আমি নিজে ঠিকা পেয়াদা নিযুক্ত করিয়া কার্য্য চালাইব। তখন তিনি বুঝিলেন যে, কি ভয়ানক ব্যাপার! দরিদ্র করদাতাদের অন্যূন দুই শত টাকা এরূপে প্রত্যেক মাসে বাঁকানয়ন মদনমোহন নাজির

মহাশয়ের উদরস্থ হইতেছে। কলেক্টর আমাকে বলিলেন যে, যদি আমি এ ভাবে কার্য্য চালাইতে পারি, তবে আমার এই প্রণালী তাঁহার কাছে কাগজে কলমে লিখিয়া পাঠাইলে তিনি তাহা মঞ্জুর করিয়া দিবেন। আমি তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট পাঠাইলাম, এবং তিনিও আবার নাজিরকে ডাকাইয়া, তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া, তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। নাজির বেগতিক দেখিয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। নোয়াখালিতে একটা বিপ্লব উঠিল, এবং নাজিরের পূর্ব্বলিখিত লীলা সকল উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িল। আমি যত দিন নোয়াখালিতে ছিলাম, এই প্রণালীতে কার্য্য চলিয়াছিল। আমি নাজির মহাশয়ের টেরা চক্ষুর সুনজর আর পাই নাই।

সার্টিফিকেট

ভাগলপুরের মত এখানেও 'সার্টিফিকেট'-বিভ্রাটে পড়িয়াছিলাম। আমার 'মেনেজার' মুরুব্বির হস্তে খাস মহলের ভার ছিল। গবর্ণমেন্টের রাজস্ববৃদ্ধি দেখাইয়া, এবং কুক সাহেবকে প্রসন্ন করিয়া, ডেঃ কলেক্টর হইবার তিনি এক নূতন কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। মেঘনায় এবং সমুদ্রমধ্যস্থ চরে বহু পতিত জমি পড়িয়া আছে। উহাতে চরবাসীদের গো মহিষ চরে মাত্র।• কারণ, উহা আবাদের অযোগ্য। তিনি একটা গোচারণ বা 'গোরকাটি' জমা তাহাদের কাছে আদায় করিতে চেষ্টা করেন। তাহারা অস্বীকার করে। কোনও কলেক্টর সহজভাবে জোর করিয়া এরূপ রাজস্ব আদায়ে প্রশ্রয় দিবেন না। অতএব প্রত্যেক চরে কাহার কত গরু মহিষ আছে, তাহার এক তালিকা আমলার দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া, তিনি প্রত্যেক পশুর জন্য চারি আনা হিসাবে খাজনা ধরিয়াছেন, এবং তাহারা সেই খাজনা দেয় নাই বলিয়া তাহাদের নামে শত শত সার্টিফিকেট জারি করাইয়াছেন। প্রজাদের নামে মেনেজারের ইঙ্গিতে পেয়াদারা কোনও সার্টিফিকেটই জারি না করিয়া, মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছে। কাজেই কোনও আপত্তি উপস্থিত হয় নাই। এ জন্য পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটি কলেক্টরেরা সকলেই ডিক্রি দিয়াছেন। তাহার পর 'মেনেজার' ঘোরতর অত্যাচার করিয়া এই খাজানা উশুল করিয়া, পূর্ব্ব বৎসর খুব বাহাবা লইয়াছেন। আমার কাছে এরূপ প্রথম মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, উহার নূতনত্বে আমার সন্দেহ হইলে, আমি প্রজার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও প্রমাণ চাহিলাম। খাস মহলের এক আমলা দীর্ঘ এক জমাবন্দি সম্বন্ধে 'হলপান' যথাশাস্ত্র সাক্ষ্য দিলে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রজারা এই জমা স্বীকার করিয়াছে?" অনিচ্ছায় উত্তর—"না।" প্র। তাহারা এ জমাবন্দি স্বাক্ষর করিয়াছে? উ।—আবার না। প্র। তাহারা এ জমাবন্দির জমা অবগত আছে? উ। আবার না। প্র। তবে এই জমাবন্দি কিরূপে প্রস্তুত হইল? সে বড় বিপদে পড়িল। সে একজন ক্ষুদ্র বেতনের ক্ষুদ্র জীব কর্ম্মচারী। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। আমি তাহাকে অভয় দিলে, সে জমাবন্দির সৃষ্টিপ্রকরণ উপরোক্ত মতে ব্যাখ্যা করিল। তাহার সেই জমাবন্দির মূলে যত মোকদ্দমা দায়ের হইয়াছিল, যাট কি সত্তরটি, আমি ভাগলপুরের মত এক হুকুমে খারিজ করিয়া দিলাম।

হিন্দু প্রতিযোগীর অধঃপতন অবধি 'মেনেজার' সাহেবের দীর্ঘ মূর্ত্তি আরও যেন এক হাত উচ্চ হইয়াছে, তাঁহার চস্‌মাখানি আরও যেন সমুজ্জ্বল হইয়াছে, এবং তাঁহার মস্তকের তুরস্কদেশীয় জবাকুসুমসঙ্কাশ 'ফেজ' টুপির বহু উর্দ্ধে পদাতিক-ভৃত্য যে ছত্র ধারণ করিয়া রৌদ্রের দ্বারা তাঁহার সমস্ত দেহ ও মুখমণ্ডল পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল করিত, সে ছত্র এখন যেন একেবারে গগনে উঠিয়াছে। তিনি যখন এরূপভাবে ক্ষুদ্র নোয়াখালিখানি সাহেব-সোহাগস্ফীত অভিমানে ও আত্মগরিমায় পরিপূর্ণ করিয়া চলিতেন, তখন রাস্তার লোক মনে করিত "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা"। আজ কোর্ট হইতে গৃহে ফিরিতে না ফিরিতে মেনেজার উক্তরূপে পদভরে নোয়াখালি প্রকম্পিত করিয়া আমার গৃহাভিমুখে আসিতেছেন। যদিও তখন সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, তথাপি বিলাতি সংএর টুপির

মত্ত তাঁহার দীর্ঘ রক্তবর্ণ 'ফেজে'র উপর ছত্র সুশোভিত। ক্রোধে তাঁহার মূর্ত্তিখানি ভীষণ গাম্ভীর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে। তিনি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"মহাশয়! আপনি আমার এতগুলিন মোকদ্দমা খারিজ করিয়া দিয়াছেন কেন?" স্থিরকণ্ঠে উত্তর—"সে কৈফিয়ৎ তোমার কাছে নাই বা দিলাম।" তিনি—"আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। এরূপ হইলে আমাদের বন্ধুতা থাকিবে না।" আবার স্থিরকণ্ঠে উত্তর—"বড় দুঃখিত হইলাম। না থাকে, উপায় নাই।" তিনি বুঝিলেন যে এ প্রণালীর আলাপে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। তখন হাসিয়া বলিলেন—"দোহাই তোমার! তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও ডেপুটি কলেক্টর গোলযোগ না করিয়া ডিক্রি দিয়াছে। তোমাকে আমার মুরুব্বি ও বন্ধু বলিয়া আমি কত সম্মান করি, তুমি জান। তুমি সার্ভিসের একজন অদ্বিতীয় লোক। কোথায় তুমি আমার উন্নতিতে সাহায্য করিবে, না এরূপ করিয়া আমার উপস্থিত চাকরিটিরও মাথা খাইতেছ।" বাস্তবিকই লোকটি আমাকে বড় শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত, এবং তাহার যত গুরুতর রিপোর্ট ও পত্র, এবং ডেপুটি কলেক্টরির সমস্ত দরখাস্ত ইত্যাদি আমার দ্বারা লেখাইত। তাহার পিতাও এক দিন চট্টগ্রামে সদরআলা ছিলেন এবং আমার পিতার বন্ধু ছিলেন। অতএব তাহার এই সকল দুর্ব্বলতার জন্য তাহাকে আমি কৃপাভাজন মনে করিয়া, তাহাকে কনিষ্ঠের মত স্নেহ করিতাম। আমিও এবার হাসিয়া বলিলাম—"আমিও বড় দুঃখিত। কিন্তু কি করিব? তোমার উন্নতির জন্য আমার যথাসাধ্য আমি করিতে প্রস্তুত, কিন্তু গরিব 'চরো' প্রজাদের গলা কাটিয়া উহা সাধন করা আমার দ্বারা হইবে না। পূর্ব্ববর্ত্তী ডেপুটিদের পথও আমি অনুসরণ করিতে পারিব না।" তিনি তখন এ সম্বন্ধে কি করা উচিত, আমার কাছে পরামর্শ চাহিলেন। আমি বলিলাম—হয় প্রজাদের দ্বারা জমাবন্দি স্বাক্ষর, কি স্বীকার করাইয়া লইতে হইবে, না হয় আমার হাত হইতে এ সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে হইবে। তিনি কলেক্টরের যথাসাধ্য খোসামুদি করিলেন, এবং বলিলেন যে, আমি এক জন বড় 'তেজী' লোক, আমি যেরূপ আইনসঙ্গত কার্য্য চাহি, তাহা হইতে পারে না। কিন্তু কলেক্টর শেষ পথ অবলম্বন করিলেন না। তিনিও তাঁহাকে প্রথম পথ অবলম্বন করিতে বলিলেন।

কেবল এইগুলি বলিয়া নহে, প্রায় সকল ডিপার্টমেণ্টের সার্টিফিকেটই আইন-বহির্ভূত ভাবে দাখিল হইয়াছে। আমি সার্টিফিকেট আইনের এবং সমস্ত 'রুলে'র সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া, এক মন্তব্য (resolution) লিখিয়া কলেক্টরের কাছে পাঠাইলাম, এবং তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। উহা সমস্ত বিভাগে প্রচারিত হইলে মেনেজার আর একবার ক্ষেপিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"এবার আপনি আমার একবারে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আপনি যে ভাবে চাহেন, সে ভাবে খাস মহল হইতে সার্টিফিকেট দেওয়া অসাধ্য।" উত্তর—"আমি চাহি, ইহা না বলিয়া, আইন চাহে বলিয়া বলা তোমার উচিত ছিল। আইন পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আমার নাই।" কিন্তু মন্তব্য প্রচারের ফল বাস্তবিক তাহাই হইল। খাস মহলের সেরেস্তার অবস্থা এমন শোচনীয় এবং উহা এরূপ অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারে চালিত যে, আইনানুসারে সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা অসম্ভব। কাজেই খাস মহল সার্টিফিকেট এক প্রকার বন্ধ হইল। প্রজারা বলিতে লাগিল যে আমি নোয়াখালি আসিয়া সার্টিফিকেট আইন উঠাইয়া দিয়াছি। ইহার কিছুদিন পরে কমিশনর লাউইস্ সাহেব নোয়াখালি পরিদর্শনে আসিলেন। আমি তাঁহার সংগে দেখা করিতে গেলে, আমি কোন্ কোন্ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত, তাহা জানিয়া তিনি বলিলেন—"গত বৎসর আমি সার্টিফিকেট ডিপার্টমেণ্টের বড় শোচনীয় অবস্থা পাইয়াছিলাম। ভরসা করি, আপনি তাহার উন্নতি করিয়াছেন।" আমি বলিলাম যে, এখনও করিতে পারি নাই। আমি সম্প্রতি একটি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি। তন্মতে কার্য্য হইলে সার্টিফিকেট ডিপার্টমেণ্টের অবস্থা কমিশনর অন্যরূপ দেখিবেন। আফিসে গিয়াই কমিশনর আমার সেই মন্তব্য

সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে চাহিলেন ও আমাকে ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি কলেক্টরের কক্ষে বসিয়া আমার মন্তব্য পাঠ করিতেছেন। উহা শেষ করিয়া, মুখ ফিরাইয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইহা আপনার লিখা?" আমি তিন বৎসরের অধিক তাঁহার পার্শন্যাল এসিস্টেন্ট ছিলাম। কাজেই তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। আমি বলিলাম —হাঁ। তিনি তখনই কলেক্টরের কাছে উহার ও আমার প্রশংসা করিলেন। কমিশনর চলিয়া গেলেন। ইহার কিছু দিন পরে এক দিন কি কার্য্যগতিকে কলেক্টরের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছি, অন্যথা আমি কখন কোনও প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি না। ইতিমধ্যে আমার প্রতি তাঁহার কিছু মনোমালিন্য ঘটিয়াছে। সে সময় শ্রীপাটের একজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। একে ত আমি পুলিসের উপর চিরদিন খড়্গহস্ত। তাহাতে তাঁহার বড় অনুরাগ-ভাগী নহি। দেশীয় কলেক্টরের কাছে আমার এই প্রতিপত্তি তাঁহার ও তাঁহার দেশবাসীর অসহ্য হইয়াছে। তিনি মধ্যে একবার কুমিল্লা গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাঁর মন আমার প্রতি বিষাক্ত করিতে তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, কুমিল্লার কুক সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, নোয়াখালির কলেক্টর ত ব—নহে, আমি। ইহাতে কালা সিভিলিয়ানি অভিমানে এরূপ আঘাত লাগিয়াছে যে, এক দিন গল্পছলে আমাকে তিনি এ কথা বলিয়া ফেলিলেন এবং কুক সাহেব এরূপ কথা কেন বলিয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, কুক ঐ কথা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কি? দ্বিতীয়তঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কলেক্টর, কি আমি কলেক্টর, তাঁহার মনে কি কিছু সন্দেহ আছে? তিনি বড় দুর্ব্বলহৃদয় লোক ছিলেন। আমার এই উত্তরে ধূর্ত্ত ইন্‌স্‌পেক্টর তাঁহার হৃদয়ে যে মেঘ সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা দূর হইল না। এমন সময়ে কমিশনরের ইন্‌স্পেকশন-মন্তব্য আসিল। দেশীয় সিভিলিয়ানদের অবস্থা শোচনীয়। তাহার জন্য কতক অংশে তাঁহারা নিজে দায়ী। তাঁহারা সাহেব হইতে এবং সাহেবদের সমাজভুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, এবং সে জন্য আপনার দেশীয় সমাজ হইতে দূরে থাকেন। লাভের মধ্যে উভয় সমাজ হইতে বঞ্চিত হন এবং সাহেবদের দ্বারা ঘৃণিত হন। লাউইস্ পরিদর্শনসময়ে তাঁহাকে পদে পদে অবজ্ঞা করেন। পরিদর্শনসময়ে আমাকে ডাকিয়া সঙ্গে লইতেন, তথাপি কলেক্টরকে ডাকিতেন না। তিনি ইহাতেও আমার প্রতি অপ্রীত হইয়াছিলেন। কমিশনরের 'ইন্‌স্পেকশনমেমো' আসিলে তিনি ক্রোধের সহিত আমাকে বলিলেন যে, কমিশনর তাঁহাকে ডিঙ্গাইয়া আমাকে প্রশংসা করিয়াছেন। আমি 'মেমো' দেখিতে চাহিলে অপমানসূচক ভাবে উপরিস্থের মত বলিলেন, আমি আফিসে দেখিতে পাইব। আফিসে উহা আমার কাছে আসিলে দেখিলাম যে, কমিশনর লিখিয়াছেন, সার্টিফিকেট ডিপার্টমেণ্ট তিনি পূর্ব্ববৎসর বড় শোচনীয় অবস্থায় পাইয়াছিলেন। এবার তাহার অবস্থা যেরূপ পাইয়াছেন, তাহা আমার পক্ষে বড়ই প্রশংসাজনক। তাহার পর সমস্ত চট্টগ্রাম-বিভাগে প্রচারিত করিবার জন্য আমার মন্তব্যের একটি প্রতিলিপি চাহিয়াছেন। আমি উহা হস্তে লইয়া কলেক্টরের কাছে গিয়া বলিলাম যে, এ লেখাতে তাঁহার অপমানের বা ক্ষোভের বিষয় ত কিছুই নাই। তাঁহার কোনও সেরেস্তার বা কর্ম্মচারীর প্রশংসা করিলে সেই প্রশংসা ত আংশিক তাঁহার। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কমিশনর সেই মন্তব্যটি তাঁহার না বলিয়া আমার বলিয়াছেন কেন? উহা যখন তাঁহার স্বাক্ষরে প্রচারিত হইয়াছে, তখন তাঁহার বলা উচিত ছিল। কেবল তাঁহাকে অপমান করিয়া আমাকে প্রশংসা করিবার জন্য এরূপ লিখিয়াছেন। আমি দেখিলাম, এরূপ দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রহৃদয় ব্যক্তিকে আর কিছু বলা বৃথা।

ইহার কিছু দিন পরে একটা সার্টিফিকেট মোকদ্দমায় আমার মেনেজার মুরুব্বির আর এক কীর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল। একটি প্রজার জমা পনর বৎসর যাবৎ ক্রমশ নদীসেকস্থ হইতেছে, অথচ মেনেজার প্রতি বৎসর তাহার উপর সার্টিফিকেট জারি করাইতেছেন, এবং তাহার আপত্তি অগ্রাহ্য করাইয়া, ডিক্রি করাইয়া পূরা জমা আদায় করিতেছেন। এরূপ অবৈধ ডিক্রির কারণ এই যে,তিনি কলেক্টর কুক সাহেবের খাস প্রিয়পাত্র ছিলেন, ডেপুটি

কলেক্টরেরা তাঁহার ভয়ে ডিক্রি দিতেন। ঘটিরাম ডেপুটিদের এখনও অভাব নাই আমি প্রমাণ লইয়া যে পরিমাণ জমি অবশিষ্ট আছে, তাহার অধিক ডিক্রি দিতে পারিব না প্রকাশ করাতে মেনেজার কলেক্টরের কাছে নালিশ করিলেন। এই মোকদ্দমায়ই প্রায় পনর শত টাকার জন্য দাবি ছিল। এরূপ আরও বহুতর সার্টিফিকেট ছিল। কলেক্টর আমাকে ডাকিলেন। তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

তিনি। আপনি না কি এতবড় একটা সার্টিফিকেট মোকদ্দমা উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন?

আমি। আমি যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছি, সেরূপ ডিক্রি দিতে পারি। প্রজার যে জমি নদীতে ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহার খাজনা কিরূপে ডিক্রি দিব।

তিনি। আপনার স্মরণ রাখা উচিত যে, আপনি এ সকল মোকদ্দমার আধা বিচারক এবং আধা রাজস্ব-বিভাগের কর্ম্মচারী।

আমি। আমি তাহা মনে করিতে পারি না। যেখানে শপথপূর্ব্বক প্রমাণ লইয়া বিচার-কার্য্য করিতে হইতেছে, সেখানে আমি ষোল আনা বিচারক।

তিনি। আপনার পূর্ব্ববর্ত্তীরা কেমন করিয়া এরূপ ডিক্রি দিয়াছেন?

আমি। জানি না।

তিনি। আপনি দিবেন না কেন?

আমি। আইনের প্রতিকূলে ডিক্রি দিলে প্রজা যদি গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলে দেওয়ানি মোকদ্দমা করে, এবং সেখানে জয়ী হয়, গবর্ণমেণ্টের ক্ষতির জন্য দায়ী কে হইবে?

তিনি। তবে কি এরূপ সমস্ত মোকদ্দমা আপনি এভাবে বিচার করিয়া, গবর্ণমেণ্টের গুরুতর ক্ষতি করিবেন?

আমি। নাচার।

আমি চলিয়া আসিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ এই মোকদ্দমা উঠাইয়া একজন ক্ষেপা ঘটি-রামকে দিলেন, এবং ঘটিরাম চক্ষু বুজিয়া পনর শত টাকাই ডিক্রি দিলেন, এবং আমার কাছে আসিয়া অম্লানমুখে তাহার জন্য বাহাদুরি করিতে লাগিলেন। মেনেজার ও কলেক্টরের উপ-হাসমূলক হাসি দেখে কে? ইহার দুই চারি দিন পরে এই অবৈধ ডিক্রি রহিতের জন্য প্রজা মুন্সেফের কোর্টে নালিশ উপস্থিত করিল, এবং ঘটিরামের কাছে তাহার জবাব দাখিল করি-বার ভার আসিল। গবর্ণমেণ্ট প্লিডার কবুল জবাব দিলেন যে, এরূপ মোকদ্দমার কোনও জবাব হইতে পারে না। ডিক্রি সম্পূর্ণ আইনত বৃত্তান্তবিরুদ্ধ হইয়াছে। ক্ষেপা ডেপুটিটির ছুটাছুটি দেখে কে? এক দিন যেই মুন্সেফ বলিলেন যে, এই মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের জয়ী হইবার সম্ভাবনা কম, এবং আমরা ক্ষেপাকে বুঝাইলাম যে, সকল টাকা তাহাকে দিতে হইবে, সে কাঁদিয়া ফেলিল, এবং বলিল, তাহার ত বাস্তুভিটা বিক্রয় হইলেও পনর শত টাকা উঠিবে না। সে পাগলের মত হইল। যাহাকে দেখে, বলে—"আমার উপায় কি?" শেষে সে কলেক্টরের অনুরোধ মতে মুন্সেফকে সঙ্গে করিয়া গোপনীয় পরামর্শের জন্য কলেক্টরের কাছে লইয়া গেল। মুন্সেফ বলিলেন যে, এই মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের পরাভব অনিবার্য্য। অতএব প্রজার জমা মিনাহা দিয়া আপোষ করা উচিত। তাহার পর মেনেজার, ডেপুটি ও স্বয়ং কলেক্টর তাহার বহু খোসামুদি করিয়া এবং জমা মিনাহা দিয়া, তাহার দ্বারা এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন। তাহার পর আমার ক্ষেপা ভায়া আসিয়া আমাকে বলিলেন—"বাপ! কি ঝকমারিই করিয়াছিলাম। মেনেজার বেটার ও কলেক্টরের ভয়ে ডিক্রি দিয়া কি বিপদেই পড়িয়াছিলাম! ভায়া! তুমি কবি, তাহা জানি। তুমি কি ভবিষ্যদ্‌বেত্তা? যাহা যাহা বলিয়া-ছিলে, ঠিক তাহাই কি ঘটিল?" তখন কলেক্টর আবার আমাকে ডাকাইলেন। তিনিও প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। অন্যান্য মোকদ্দমা সম্বন্ধে কি করা উচিত, আমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে, এক জন কানুনগো বা সবডেপুটি স্থানে গিয়া, খাস মহল সকলের যে যে অংশ নদী ও সমুদ্রে ভগ্ন হইয়াছে, তাহার এক নক্সা প্রস্তুত করিয়া, এবং প্রত্যেক জমার কি পরিমাণ

জমি অবশিষ্ট আছে, তাহা নিরাকরণ করিয়া কাগজ দাখিল করিয়া দিলে, সেই পরিমাণ জমা বোধ হয়, প্রজারা দিতে আপত্তিই করিবে না, এবং প্রতি বৎসর বর্ষার শেষে এরূপ এক এক জরিপ করাইলে এরূপ সার্টিফিকেট দাখিল করিবার কোনও প্রয়োজনই হইবে না। ফলে তাহাই হইল। আমি সার্টিফিকেট আইন উঠাইয়া দিয়াছি, প্রজাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল, মেনেজার মুরুব্বির সহিত বন্ধুতা না ভাঙ্গিয়া বরং আরও দৃঢ় হইল। তিনি বরং এরূপে তাঁহাকে বহু মিথ্যা মোকদ্দমার উৎপাত হইতে উদ্ধার করিয়াছি বলিয়া আমাকে ও আমার কার্য্যদক্ষতার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নোয়াখালির আমোদ ও ষষ্ঠ সাইক্লোন

নোয়াখালিতে আমি কেবল ছয় মাস মাত্র ছিলাম। বলিয়াছি, নোয়াখালি স্থানটি ক্ষুদ্র হইলেও সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। সমুদ্রজানিল সমস্ত গ্রীষ্মকাল প্রবাহিত হয়, এবং স্থানটি শীতল রাখে। পশ্চিম হইতে আসিয়া গ্রীষ্মকালটি বড়ই আরামের বোধ হইয়াছিল। তেমনি বর্ষাকালটি বড় অপ্রীতিকর। চরভরাট স্থান—কর্দ্দমের জন্য প্রাঙ্গণে পদক্ষেপ করিবার সাধ্য নাই। আহার্য্যও সুন্দর পাওয়া যায়। অভাবের মধ্যে বাসোপযোগী গৃহ। সামান্য বাঁশের ঘর ; তাহাও পাওয়া যায় না। সে জন্য আমাকে প্রায় দুই মাস কাল আমার আশৈশব বন্ধু চন্দ্রকুমারের বাসায় থাকিতে হইয়াছিল। আমার হিন্দু মুরুব্বি বা 'সাকৃত' বদলি হইলে শত মুদ্রায় আমি তাঁহার বাসাবাটী ক্রয় করি। উহা যে কিরূপ "দৌলতখানা", মূল্যেই বুঝা যাইবে। একখানি বাঁশের মাচার উপর বাঁশের বেড়ার ও খড়ের ছাউনির ঘর। ঐরূপ একখানি অতি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, বৈঠকখানা, একটি ক্ষুদ্র রান্নাঘর, ভিজা সেঁতসেঁতে এক উঠান, সকলই ৫॥ হস্ত উচ্চ 'ঝলি' বা বাঁশের বেড়ায় বেষ্টিত। একটি ক্ষুদ্র 'তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা' বলিলেও হয়। অথচ এই বাসাবাটীই নোয়াখালিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া আমার 'সাকৃত' বাহাদুরি করিতেন। আমি তাহার উপর অস্ত্রচিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। বসতিগৃহটির চারিদিকে দ্বার জানালা কাটাইয়া, তাহাকে কিঞ্চিৎ "অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া" গেলাম। চারিদিকের 'ঝলি'র দুই হাত কাটিয়া ফেলিলাম। বন্ধুগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন যে, বাড়ীটি একেবারে 'বেপর্দ্দা' করিয়া ফেলিলাম। রাস্তা হইতে আমার 'ভাগ্যধরী'কে লোকে দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আমার বড় ছিল না। তিনিও বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, তিন মুল্লুকজয়িনী। যাহা হউক, বন্ধুগণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য গৃহদ্বারের উপর বাঁশের 'জাফরি' আবরণ (sun-shade) নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তাহা সবুজ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিলাম। উহা রাস্তা হইতে দেখিতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার অন্তরালে উঠিতে নামিতে রাস্তা হইতে পত্নীকে দেখা যাইত না। তাহার পর ভূতলে মাচা হইতে অবতীর্ণ হইলে চারিদিকে যে সাড়ে তিন হাত উচ্চ 'ঝলি' রহিল, তাহাতে তাঁহার পর্দ্দা রক্ষিত হইত। কারণ, তিনি সাড়ে তিন হস্তের উচ্চ তাড়কা নহেন। তাহার পরে সোনার সোহাগা চড়াইলাম। বসতিগৃহের নানা দাগে রঞ্জিত পুরাতন বেড়া পুরাতন ধুতি ও শাড়ী ইত্যাদিতে আবৃত করিয়া, তাহার প্রান্তভাগে সালুর লাল কিম্ভূত রেখা বসাইয়া দিলাম। যেন খাম্বাজের প্রারম্ভে বেহাগ বসিল! মাচার বেড়াও সতরঞ্জির দ্বারা আবৃত করিলাম। নোয়াখালি তোলপাড় হইল। প্রত্যহ কত লোক বাড়ী দেখিতে আসিতে লাগিল, এবং তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। কবি-কল্পনা সকল সময়ে একটু কাজে লাগে।

এই কবিকুঞ্জে অধিষ্ঠিত হইয়া কিঞ্চিৎ আমোদের ব্যবস্থা করিলাম। মহানগর মহাবন। কিন্তু ক্ষুদ্র নগরে যে অল্পসংখ্যক লোক থাকে, তাহাদের মধ্যে বেশ একটুকু মিশামিশি ও আত্মীয়তা সহজে হয়। আমি কলিকাতা হইতে একটা 'লনটেনিসে'র (Lawn tennis) বাক্স আনিয়াছিলাম। আমরা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মুন্সেফেরা মিলিয়া কাচারির পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেলিতাম ও তাহার পর আমোদ করিতাম, পড়িতাম, হাসিতাম, গাহিতাম এবং সময়ে সময়ে

আহারের ও পানের কার্য্য হইত। উকিল মহাশয়দের হইতে এরূপ আমরা বিচ্ছিন্ন হওয়াতে আমার একজন উকিল বন্ধু তাঁহাদের মুখপাত্র হইয়া আমার কাছে আসিয়া দুঃখ করিয়া বলিলেন—"আপনি আসাতে আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, হাকিম-উকিলে যে দলাদলি হইয়াছে, তাহা মিটিয়া যাইবে। তাহা না হইয়া আপনি আরও দলাদলি দৃঢ় করিতেছেন।" এ কথা বলিবার একটা বিশেষ কারণও হইয়াছিল। সিবিল মেডিকেল অফিসার মহাশয় "হস্পিটালে" এক সাধারণ নিমন্ত্রণ দেন। তাহাতে উকিল, মোক্তার, আমলারাও নিমন্ত্রিত ছিল। আমাদের সম্প্রদায় এ নিমন্ত্রণে যাইবেন কি না, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, আমি যাইব না। আপনারা ইচ্ছা করিলে যাইতে পারেন। ফলে কেহ গেলেন না। পরদিন প্রাতে ডাক্তারবাবু লাঠি ঘাড়ে আসিয়া মহাক্রোধে তাঁহার নিমন্ত্রণটি মাটি করিবার অভিযোগ আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। একটু রসিকতা করিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণের ন্যায় তাঁহার ক্রোধটাও মাটি করিয়া দিলে, তিনি স্থির হইয়া চলিয়া গেলেন। তাই উকিল বন্ধু এই দ্বিতীয় অভিযোগ লইয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, শ্রাদ্ধটি যেরূপ গড়াইয়াছে, এখন আর মিটাইবার উপায় নাই। সময়ে মিটিয়া যাইবে। তাই আমি চক্রটি বিপরীত দিকে ঘুরাইয়া দিয়া, তাঁহাদের হইতে কিছুকালের জন্য হাকিম সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছি। পরস্পরের মধ্যে শিষ্টাচারের কোন ত্রুটি না হইলে এই বিষ আপনি নামিয়া যাইবে। বলিয়াছি, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমরা খেলিতাম। খেলার পর সকলে প্রায় আমার ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় একত্র হইতাম। কোনও দিন গান বাজনা, কোনও দিন গল্প, কোনও দিন কিছু একটা পাঠ হইত, এবং কোনও দিন কাহাকেও ক্ষেপান হইত। সে দিন রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হাসিতে হাসিতে পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হইত। ক্ষেপাইবার পাত্র ছিলেন তিন জন—(১) সবরেজিষ্ট্রার, (২) হেড মাষ্টার, (৩) সেই ক্ষেপারাম ডেপুটি। তিন জনকে পালা করিয়া ক্ষেপান হইত। সবরেজিষ্ট্রারের আকৃতি খর্ব্ব, বর্ণ কৃষ্ণ, মূর্ত্তি কৌতুককর, ঈষৎ স্থূল, তালুকা মসৃণ, কেশাবলি অর্দ্ধকৃষ্ণ, অর্দ্ধশ্বেত, শ্বেত কৃষ্ণ রেলিংএর মত মস্তকের তিন দিকে শোভিত, বয়স পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে, ভার্য্যা দ্বিতীয় পক্ষের সতরাং যুবতী। সবরেজিষ্ট্রার তাঁহার কাছে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, দৈবগতিকে—নচ দৈবাৎ পরং বলং—যদিও তাঁহার চুল অতিরিক্ত মাত্রায় পাকিয়াছে, তিনি বয়সে আমাদের সকলের ছোট। আমরা কেহই তখন পঁয়ত্রিশের উপর নহি। তথাপি তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিলে, বিশেষতঃ যখন তিনি 'বৃদ্ধস্য তরুণী বিষমা'র কাছে বসিয়া আছেন, সেই অসময়ে দাদা ডাকিলে তিনি ক্ষেপিয়া আগুন হইতেন। তিনি আফিস হইতে আসিয়া তাঁহার জীবন-তোষিণীর সঙ্গে আরাম ও প্রেমালাপ করিতেছেন, এই অসময়ে—বড় অসময়ে বলিতে হইবে—তাঁহাকে 'দাদা' বলিয়া রাস্তা হইতে আমরা কেহ ডাকিলে, তিনি ক্রোধে দন্ত কাটিয়া শকারাদ্য ভাষায় আপ্যায়িত করিয়া বলিতেন —"তাহাদের বয়স আমার ডবল, আর আমি তাহাদের দাদা। আমি তাদের বাপের কালের দাদা!" যে দিন এরূপ মধুর সম্ভাষণ করিয়া বহির্গত হইতেন, সে দিন আর কিছুই করিতে হইত না। তাঁহার ক্রোধের বৃদ্ধির সহিত রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হাসির তরঙ্গও বাড়িতে থাকিত। সর্ব্বশেষ তিনি অশ্রাব্য কুটুম্বিতা ইত্যাদি করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিতেন। কোনও দিন ডাক শুনিয়া গালি না দিয়া, ক্রোধে গম্ভীরভাবে নীরবে বাহির হইয়া আসিতেন। যে দিন আমি 'দাদা' বলিয়া ডাকিতাম, এ ভাব গ্রহণ করিতেন। গালাগালিটা অতিরিক্ত আমার 'সাকৃত' দাদা ডাকিলে, সর্ব্বাপেক্ষা মেনেজার ডাকিলে, কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হইত। গম্ভীরভাবে আসিয়া আমাকে বলিতেন—"মহাশয়! এ সব ফচকে ছোক্‌রারা যাহা করুক্, আপনার এ ব্যবহার শোভা পায় না। আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত আপনাকে একজন বিখ্যাত লোক বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। ইহাদের ত তিনি মানুষ বলিয়াই জানেন না। তাহাদের কথা গ্রাহ্য করা দূরের কথা।" আমি যখন ক্ষমা চাহিয়া বলিতাম যে, ওদের জন্য পারি নাই বলিয়া ঠাট্টা করিয়া নহে, আমি শ্রদ্ধা করিয়া ডাকিয়াছি। তিনি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিতেন—"তথাপি আপনার

কি আমাকে দাদা বলা শোভা পায়? আপনার 'পলাশির যুদ্ধ' আমি ছেলেবেলায় পড়িয়াছি। আমার অপরাধ, আমার কগাছি চুল পাকিয়াছে, এবং তালুর চুল ব্যারামে উঠিয়া গিয়াছে।" এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে আমার 'সাকৃত' যদি একটুক হাসিল, কি সমালোচনা করিয়া বলিল —"দাদা! রোগটা কি? উন্মাদ রোগ?—তাহা না হইলে বুড়া বয়সে যুবতী ভার্য্যা! রসিক কবিকে শ্রদ্ধা না করিবে ত কি?" আমি তখন তাহাকে শাসাইয়া বলিতাম—"ছি! রাস্তার উপর কেবল দাদা! দাদা! এ কেমন কথা?" উনি তখনই বলিতেন—"দেখুন দেখি মহাশয়! রাস্তার লোক কি মনে করে!" তার পর ক্রোধের মাত্রা ও হাসির মাত্রা রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইত।

হেডমাষ্টার মহাশয় কুমিল্লার লোক। তাঁহাকে ক্ষেপাইতে হইলে একটুক কুমিল্লার নিন্দা করিলেই, এমন কি, কুমিল্লার 'ক' অক্ষরটা একটু সজোরে উচ্চারণ করিলেই, তিনি ক্ষেপিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতেন। তাহার পর প্রত্যেক কথার উপর ক্রোধের ভাবে যে উত্তর দিতেন, তাহাতে হাসির মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিত। কিছুদিন পরে তিনি এই ষড়যন্ত্র বুঝিতে পরিলেন। অতএব তাঁহার পালা যে দিন পড়িত, তিনি বলিতেন—O! I see, to-day at my cost (আমি বুঝিয়াছি, আজ আমার খরচায় আমোদটা হইবে)।

কিন্তু ক্ষেপারাম ডেপুটি থাকিতে আর ইহাঁদের দু জনকে ক্ষেপাইবার বড় প্রয়োজন হইত না। প্রত্যহ তাঁহাকে ক্ষেপাইলে লোকটা পাগল হইবে বলিয়া, মাঝে দুই এক দিন যাহা বিরাম দেওয়া যাইত, সে সময়ে সবরেজিষ্ট্রার ও হেডমাষ্টারের পাল্লা উপস্থিত হইত। ক্ষেপারাম বড় ভালমানুষ, সরলহৃদয় ও সহজ বিশ্বাসী। দৃঢ় করিয়া বলিলে এমন বিষয় নাই যে, সে বিশ্বাস করিত না; এমন কাজ নাই যে, সে করিত না। উপরোক্ত সার্টিফিকেট মোকদ্দমাবিভ্রাট তাহার প্রমাণ। তাহার মূর্ত্তিখানি সদ্য শ্মশান হইতে স্থানান্তরিত, একটি চর্ম্মাবৃত দীর্ঘ অস্থিপঞ্জর মাত্র। চক্ষু দুটি কোটরস্থ, মুখে এমনই কি একটি হাস্যজনক গাম্ভীর্য্য ভাব যে, তাহাকে দেখিলেই ক্ষেপা বোধ হইত। ক্ষেপা আপনার দুটি বীজমন্ত্র আপনিই বলিয়া দিয়াছিল। প্রথমটি,—সে বলিয়াছিল যে, তাহাকে ছেলেবেলা "লেধা বামনা" বলিলে সে বড় ক্ষেপিত। উপাধিদাতা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা রসজ্ঞ লোক ছিলেন। উপাধিটি এখনকার "রায় বাহাদুর," "খাঁ বাহাদুর" উপাধি অপেক্ষা সার্থক ও উপযোগী। দ্বিতীয় বীজমন্ত্র, তাহার প্রথম স্ত্রী মরিয়া গেলে কলাগাছের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিয়া, তবে দ্বিতীয় পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এই পত্নীও মরিয়া গেলে এক কুকুরীর সঙ্গে শুভ উদ্বাহকার্য্য সম্পাদিত হইয়া, তাহার তৃতীয় দার-পরিগ্রহ হইয়াছিল। ইনি টিকিয়াছেন। তাহার 'লেধা বামনা' উপাধি সংক্ষেপ করিয়া L. B. (এল, বি,) করা হইয়াছিল। তাহাকে লোকসমক্ষে 'এল, বি,' বলিয়া সম্বোধন করিলে, কিম্বা কদলীবৃক্ষের, কি সারমেয়ীর সঙ্গে তাহার সম্পর্কের কথা বলিলেই সে ক্ষেপিয়া উঠিত। বিশেষতঃ মুসলমান মেনেজার তাহাকে 'এল, বি,' বলিয়া ডাকিলেই যথেষ্ট। সে তখনই চটিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বসিল। আর দুই এক কথা বলিলে, বলিয়া উঠিল—"তোমরা আমার সমকক্ষ কর্ম্মচারী। তোমরা ক্ষেপাইলে ক্ষেপাইতে পার। কিন্তু ঐ নেড়ে বেটা কে? এক শত টাকা মাত্র পায় যে, সে আমাকে এরূপ সমকক্ষভাবে ক্ষেপাইবে?" আমরা এ আপত্তি সঙ্গত বলিয়া, মেনেজারকে এরূপ অবৈধ আত্মীয়বৎ ব্যবহার (indulgence) একজন তাহার উপরিস্থ অফিসারের সঙ্গে করা উচিত নহে বলিলে, এবং সে তাহার পরও একটু ঠাট্টা করিলে, একবারে বারুদস্তূপে অগ্নিপাত হইত। তাহার পর রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত এ আগুন জ্বলিত; এবং হাসির তুফান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিত। ক্ষেপা ছুটিয়া যাইতে চাহিলে তাহাকে ধরিয়া বসান হইত। অবশেষে ধরিতে গেলে সে প্রহার করিয়া, তাহার যষ্টিস্কন্ধে কোটরস্থ চক্ষু অগ্নিবৎ করিয়া চলিয়া যাইত। ফলতঃ এমন কোনও কথা, কি বিষয় নাই, যাহা লইয়া তাহাকে ক্ষেপান যাইত না। দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব।

পূজার বন্ধ আসিলে নোয়াখালিতে বড় ওলাদেবীর প্রাদুর্ভাব হইল। ডেপুটি মুন্সেফ প্রায় সকলে বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। আমি এই অল্পকালমধ্যে দ্বিতীয় বার গো-যানযাত্রার সুখানুভবে অনিচ্ছুক হইয়া বাড়ী যাই নাই। একদিন দ্বিপ্রহর সময়ে আমার নির্জ্জন ক্ষুদ্র বৈঠকখানায় বসিয়া 'রৈবতক' লিখিতেছি, এমন সময়ে ক্ষেপা মহাব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া রোরুদ্যমান কণ্ঠে বলিল—"ভাই! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আমার ওলাউঠা হইয়াছে।" এই বলিয়া সে আমার টেবিলের পার্শ্বস্থিত সোফার উপর প্রায় শুইয়া পড়িল। আমি প্রথম কিছু ব্যস্ত হইলাম। ইহার পূর্ব্বে তিন চারি রাত্রি ক্রমাগত আমার বাসায় আমার ভৃত্যদের ওলাউঠা হইয়া কোনও মতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু তাহাকে দুই চারি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলাম যে, ক্ষেপার কিছুই হয় নাই। তাহার বাসার নিকটে জেলে ওলাউঠা হওয়াতে ভয়ে তাহার এই পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আমি মুখ খুব বিষণ্ণ ও গম্ভীর করিয়া বাড়ীর ভিতর গেলাম এবং একবার স্বামী স্ত্রী দুজনে খুব হাসিয়া, একটা গ্লাসে করিয়া নোয়াখালির খাঁটি ভোলার দীঘির জল আনিয়া, উৎকৃষ্ট হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বলিয়া তাহাকে খাইতে দিলাম. এবং বলিলাম—"ভয় নাই। তুমি এ ঔষধটি খাও। চমৎকার ঔষধ, এবং একটুক ঘুমাইতে চেষ্টা কর। ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি ভাল হইবে।" সে উহা খাইয়া চক্ষু বুজিয়া অতিশয় হাস্য-জনক ভাবে পড়িয়া রহিল। আমি ইতিমধ্যে বন্ধুদের কাছে লিখিয়া পাঠাইলাম যে, ক্ষেপার ওলাউঠা হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় আমার বাসায় পড়িয়া আছে। পুলিস ইন্‌স্পেক্টরকে লিখিলাম, তিনি যেন সৎকারের বন্দোবস্ত করিয়া আসেন। ক্ষেপা চক্ষু খুলিয়া একবার কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভাই! যদি আমার কিছু হয়, তবে আমার স্ত্রীর ও শিশু পুত্র-কন্যার কি হইবে?" আমি বলিলাম—"শ্রীভগবান্‌কে ডাক। তিনি অনাথনাথ। তাহাদের জন্য তোমার জীবন রক্ষা করিবেন। কিন্তু তুমি ঘুমাইতে চেষ্টা কর।" সে আবার সেইরূপ হাস্যজনক মুখভঙ্গি করিয়া চক্ষু বুজিল, এবং নিমীলিত চক্ষু হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হাসি চাপিয়া রাখিয়া আমার যেন পেট ফাটিতেছে। আবার কিছুক্ষণ পরে চোক মেলিয়া বলিল—"না। তোমার স্ত্রী পুত্র আছে। আমার এখানে থাকা ভাল হইতেছে না। এ যে ভয়ানক সংক্রামক রোগ। তোমার সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ। আমি এখন আপন বাসায় চলিয়া যাই। আমার যাহা হয়, সেখানে হইবে।" আমি বলিলাম—"তাও কি হয়? তুমি এমন অবস্থায় কিরূপে যাইবে? বিশেষতঃ তোমার পরিবার সঙ্গে নাই। তুমি একক। আমার বাসায় চাকর তিন জনের যে ওলাউঠা হইয়াছিল, আমরা কি পলাইয়াছিলাম? তুমি ঘুমাইবে না!" এবার আমি শাসাইয়া বলিলাম। সে চোক বুজিয়া বলিল—"তোমার কি প্রশস্ত হৃদয়। তুমি মানুষ নহে দেবতা!" কিছুক্ষণ পরে বন্ধুরা একে একে পা টিপিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং আমার হাসি দেখিয়া বুঝিলেন যে, ব্যাপারখানা কি। তখন সকলেই এই প্রহসনে যোগ দিতে লাগিলেন। ক্ষেপা তখন বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া চোক বুজিয়া পড়িয়া আছে। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"অবস্থা কিরূপ?" আমি বলিলাম, এখন বোধ হয় একটুক নিদ্রা হইয়াছে। অতএব বলিতে আপত্তি নাই। অবস্থা বড় গুরুতর।" শুনিয়া ক্ষেপার মুখ একবারে কাল হইয়া গিয়াছে। প্রশ্ন—"ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়াছেন কি?" আমি—"বহুক্ষণ। কিন্তু লোকটা কি হৃদয়শূন্য, এখনও আসিল না। এ দিকে ইহার অবস্থা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে খারাপ হইতেছে।" তাহার মুখ আরও কাল হইল। সে আমাদের মুখে প্রকৃত অবস্থা শুনিবার জন্য নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া আছে। প্র—"কয় দাস্ত হইয়াছে।" আমি—"বোধ হয় অনেক!" এবার আর ক্ষেপা চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। চোক বুজা অবস্থায় একটা আঙ্গুল দেখাইল। এই হাস্যজনক ভঙ্গিতে কেহ কেহ হাসিয়া ফেলিলেন। ক্ষেপার মুখেও হাসি আসিল। সে মনে ভাবিল, তবে রোগটা গুরুতর নহে। তখন আমি বলিলাম যে, এক দাস্তই বা হইল। আমি অনেক রোগী দেখিয়াছি যে, এক দাস্তেই শেষ। বিশেষতঃ দেখিতেছেন না

যে, ইহার চেহারা একবারে বসিয়া গিয়াছে। এবার ক্ষেপার মুখ একবারে ছাই হইয়া গেল। সে তাহার নাড়ী টিপিয়া দেখিতে লাগিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনিয়াছি, ইহার পাঁচ বিবাহ।" ক্ষেপা এবার ক্ষেপিয়াছে। চক্ষু বুজা অবস্থায় মুখে ক্রোধের ভঙ্গি করিয়া এবারও আঙ্গুল দেখাইল। আমি বলিলাম—"পাঁচ বিয়ে বটে। তবে কলাগাছ স্ত্রী ও কুকুরী স্ত্রী বাদ দিলে তিনটি।" এবার তাহার মুখভঙ্গি আরও ভয়ানক হইয়াছে। প্রশ্ন—"সৎকারের ব্যবস্থা কিছু করিয়াছেন কি?" এমন সময়ে ম্যানেজার বলিলেন—"যার কুকুরের সঙ্গে বিয়ে, তার আবার সৎকার কি। পথের ধারে ফেলিয়া দিলেই হইল।" "বটে নেড়ে! তুই আমাকে তোর মত কুকুর পাইয়াছিস্।"—বলিয়া ক্ষেপা লাফাইয়া উঠিয়া তাহার দিকে ছুটিয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে সেই ইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া বলিলেন—"এ কি! এল. বি. তুমি মরিয়াছ বলিয়া আমি কাঠ ও লোক লইয়া আসিয়াছি, আর তুমি উঠিয়া দাঁড়াইয়া আছ।" তিনি ক্ষেপার হাত ধরিয়া বলিলেন—"আমি যখন লোক লইয়া আসিয়াছি, এল. বি. তোমাকে মরিতেই হইবে। আমি 'ষ্টেশন ডায়ারি'তে তোমার মৃত্যু লিখিয়া আসিয়াছি।" তিনি বাস্তবিকই লোক লইয়া আসিয়াছেন। তাহারা অবাক্! সমস্ত সহরে ক্ষেপা ডেপুটির ওলাউঠা হইয়া মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া রাষ্ট্র হইয়াছে। একে ত বার বার 'এল. বি.' বলিয়া এ অসময়ে সম্বোধন,—ইন্‌স্‌পেক্টর এল. বি. বলিলেও সে বড় ক্ষেপিত—তাহার উপর মড়া পোড়াইবার লোক উপস্থিত! ক্ষেপার কোটরস্থ চক্ষু অগ্নিবৎ হইল। আমাকে বলিল—"আমি তোমার এই মাত্র এত প্রশংসা করিতেছিলাম। এই কীর্ত্তি তোমার! তুমি একবারে আমাকে মারিয়া ফেলিয়াছ! এ কেমন ঠাট্টা! যদি এ খবর কেহ আমার স্ত্রীর কাছে লিখিয়া পাঠায়! যাও, আমার ওলাউঠা ভাল হইয়া গিয়াছে। আমি বাড়ী চলিলাম।" সে লাঠি ঘাড়ে করিয়া যে ভাবে ছুটিল, তাহাতে রাস্তার লোক পর্য্যন্ত হাসিতে লাগিল। তাহার পরদিন কলেক্টর পর্য্যন্ত এ গল্প শুনিয়া হাসিয়া খুন।

আর এক সান্ধ্য সম্মিলনে আমি ও 'সাকৃত' পরামর্শ করিয়া একটা গুরুতর ও লজ্জাকর রোগের গল্প তুলিলাম। 'সাকৃত' বলিল, সে উহাতে বহু বর্ষ যাবৎ বড়ই কষ্ট পাইতেছে। ক্ষেপার চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহারও সেই রোগ হইয়াছে। সে ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, সে রোগের লক্ষণ কি? আমরা এমন সকল লক্ষণ বলিলাম, যাহা সকল লোকের শরীরের স্থানবিশেষে প্রত্যহই দেখা যায়। ক্ষেপা পরদিন তাহার শরীরে সেই সকল লক্ষণ দেখিয়া, মহাব্যস্ত হইয়া আমাকে একবার তৎক্ষণাৎ যাইতে পত্র লিখিয়াছে। আমি ও চন্দ্রকুমার পত্র পাইয়া ব্যাপার কি, দেখিতে গেলাম। ক্ষেপার দুই হাঁটু দুইখানি শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র। সে সেই হাঁটু তুলিয়া বসিয়া, তাহার মধ্যে তাহার মাংসশূন্য চর্ম্মাবৃত মুখপঞ্জরটি রাখিয়া, এরূপ হাস্যোদ্দীপক ভাবে বসিয়া আছে যে, দেখিয়াই আমরা হাসিয়া উঠিলাম। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—"তোমরা মানুষের দুঃখ দেখিলেও কি হাস!" আমরা ব্যস্ত হইয়া, বিষয় কি জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তাহার সেই রোগ হইয়াছে, এবং সে ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"আমার স্ত্রী বাড়ী হইতে রওনা হইয়াছে। এই সময়ে আমার এই সংক্রামক ভীষণ রোগ হইল। ভাই! আমার উপায় কি?" তাহার স্ত্রী আসিবার কথা আমরা জানিতাম। তাই এ ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছিলাম। আমি বলিলাম—"বটে! অবস্থাটি ভাল নহে। বড় সঙ্কটসময়ে রোগটা হইয়াছে। স্ত্রী আসিবামাত্র তাহাতে বিব্রান্ত (infected) হইবে।" সে আরও দ্বিগুণ গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বলিলাম—"যখন রোগ হইয়াছে, তখন আর কাঁদিলে কি হইবে? আমাদের বন্ধু ডাক্তারকে পাঠাইয়া দিতেছি। তিনি চিকিৎসা করিলে শীঘ্র ভাল করিয়া দিতে পারিবেন।" ক্ষেপা বলিল—"লজ্জার মাথা খাইয়া তাঁহাকে কেমন করিয়া দেখাইব। আমি তাহা পারিব না।" আমি বলিলাম, আমি তাঁহাকে সকল লক্ষণ বলিয়া দিব। দেখাইতে হইবে না। আমরা হাসিতে হাসিতে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া, সেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া এ

সংবাদ অবগত করাইলে তিনি হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম, তাহাকে মিকচার বলিয়া খুব কতখানি চিরতার জল খাইতে দিবেন, এবং সমস্ত দিন নিম্নাঙ্গ জলে ডুবাইয়া রাখিতে বলিবেন। সন্ধ্যার পর সকলে একত্র হইয়া খানিকটা আমোদের পর প্রহসন শেষ করিব। তাহাই হইল। ক্ষেপা সে দিন কাচারি যায় নাই। সারা দিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চিরতা খাইয়াছে, এবং সেই শীতের দিনে এক গামলা হিম জলে বসিয়া আছে। আমরা আফিসের পর যাইয়া দেখি, চিরতার মধুর আস্বাদে তাহার মুখভঙ্গি বিকট হইয়াছে, এবং নিম্নাঙ্গ প্রায় অবশ হইবার গতিক হইয়াছে। হাসি চাপিয়া, কেমন আছে সকরুণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলে বলিল—"ভাই এই মিকচারটা ভয়ানক তিতো! আমার অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত তিতো হইয়া গিয়াছে। আমি আর এ ঔষধ খাইতে পারিব না। আর সমস্ত দিন জলে বসিয়া আমার পক্ষাঘাতের মত হইয়াছে।" আমি বলিলাম—এ রোগের এই চিকিৎসা। ঔষধ একটু তিতো বটে। তবে ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বন্ধু একত্রিত হইলাম। ইন্‌স্‌পেক্টর আসিয়া যেই বলিল—"কি এল. বি. (L. B.)! তুমি আবার এমন একটি ঘৃণিত রোগ জন্মাইয়া বসিয়াছ?" ক্ষেপা চটিয়া বলিল—"তোমার যখন তখন আমাকে এল. বি. বলিবার কি অধিকার আছে? আমি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট। তুমি পুলিসের চাকর। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিতে পারি জান।" আমরাও এরূপ অবমাননার জন্য, বিশেষতঃ এই দারুণ রোগের সময়ে, ইন্‌স্‌পেক্টরকে যতই ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম, সে ততই 'এল. বি.' এল. বি.' বলিতে লাগিল এবং ক্ষেপা এক এক বার জলের গামলা সুদ্ধ ক্রোধে উল্টাইয়া ফেলিবার গতিক করিতেছিল। আমাদের হাসিতে হাসিতে পার্শ্বব্যথা হইল। শেষে ইন্‌স্‌-পেক্টর বলিল—"আচ্ছা থাক! এ কদর্য্য রোগের সংবাদ কলেক্টরের কাণে গেলে তোমার চাকরি যাইবে, এল. বি. তাহা জান?" এবার ক্ষেপা নরম হইয়া বলিল—"তোমার পায়ে পড়ি ভাই! তুমি যেরূপ চুকলিখোর, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি আমার মাথাটা খাইওনা।" এমন সময়ে ডাক্তারবাবু আসিয়া বলিলেন—"কি, আপনি এখনও জলে বসিয়া আছেন! আমি ত সমস্ত দিন বসিতে বলি নাই। চিরতাটুকও যে সব খাইয়াছেন! আমার কেমন চিকিৎসা দেখিলেন! যখন এখনও আপনার মৃত্যু হয় নাই, তখন সে রোগ সারিয়া গিয়াছে। আপনি উঠিয়া কাপড় বদ্‌লান।" "বটে! তবে এটাও বুঝি নবীনবাবুর ষড়্‌যন্ত্র!" সে যেমন গামলা হইতে ব্যাঘ্রবৎ উঠিল, আমি ছুটিয়া রাস্তায় গিয়া দাখিল হইলাম। সে চন্দ্রকুমারকে বলিতে লাগিল—"দেখুন চন্দ্রবাবু! আপনিও হাসিতেছেন। তবে আপনিও এ ষড়্‌যন্ত্রে আছেন। আপনি ত ভালমানুষ নহেন। আপনাদের এ কেমন চাটগেঁয়ে রসিকতা! একজন ভদ্রলোককে এমন একটা fool (আহাম্মক) বানান। আমি কাচারি যাই নাই। কথাটা কলেক্টরের কাণে পর্য্যন্ত যাইবে।" আমি আবার করযোড়ে ফিরিয়া, ক্ষেপার কাছে ক্ষমা চাহিয়া বলিলাম যে, ইহা আমার ষড়্‌যন্ত্র নহে। আমি সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, তাহার সে রোগ হইয়াছে। তখন সেও হাসিতে লাগিল—বলিল,—"তুমি একটা বোতল চিরতা আমাকে খাওয়াইয়াছ!" আমি বলিলাম—"এই সকল ম্যালেরিয়ার দেশে উহা এ দিনে শরীরের পক্ষে বড় উপকারী।" ক্ষেপা বলিল—"আচ্ছা থাক! আমি ইহার প্রতিশোধ লইব। তুমি কেমন চালাক দেখিব।" সেই অবধি আমাকে একবার কিরূপে জব্দ করিবে, সে বরাবর চন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরামর্শ করিত।

আর একদিন আমার বাসায় রাত্রিতে নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রণের ব্যবস্থাটা ঠিক যাজ্ঞবল্ক, পরা-শর, কি রঘুনন্দন ঠাকুরের স্মৃতিশাস্ত্রানুসারে নহে। তাঁহাদের সময়ে টেবলও ছিল না, চামচ কাঁটাও ছিল না, চপ কাটলেটও ছিল না। তাঁহাদের জীবনটা কি অসারই ছিল! সকলে উভয় হস্তে উদরদেবতার ষোড়শোপচারে পূজা করিতেছি, এবং মধ্যে মধ্যে ক্ষেপাকে এক এক বার ক্ষেপাইতেছি ও হাসির চোটে খাওয়া বন্ধ হইতেছে। এক বার, দুই বার, ক্ষেপা চটিয়া তাহার চামচ কাঁটা দুই দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"তোমার বাড়ীতে আমি আর

জলগ্রহণ করিব না।" সে চামচ কাঁটা দুই হাতে বড় কৌতুকভাবে লাঠির মত মুঠা করিয়া সোজা ধরিত। সে নিজে ব্রাহ্মণ। রঘুনন্দনের বংশধর। এই অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা তাহার আসিবে কেন? তর্কচূড়ামণি মহাশয় হয় ত বলিবেন, তাহার পুরুষানুক্রমিক আধ্যাত্মিকতা সে পথের ঘোরতর অন্তরায়। আমি ক্ষমা চাহিলে, আবার সেরূপ সোজাভাবে চামচ কাঁটা ধরিয়া অতিশয় কৌতুককর ভঙ্গিতে গম্ভীরভাবে আহার আরম্ভ করিল। আর একবার ক্ষেপাইলে সে চামচ কাঁটা একবারে গৃহের প্রান্তভাগে ফেলিয়া দিয়া, দুই হাতে তাহার নিজের গলা টিপিয়া ধরিয়া বলিল—"আমি এখনই আত্মহত্যা করিব। আর তোরা rascal (পাজিরা) সব ফাঁসিতে যাইবি।" হাসির তরঙ্গ থামিলে দেখিলাম, সে সত্য সত্যই গলা টিপিতেছে, এবং কাঁদিতেছে। আমরা ছুটিয়া গিয়া তাহার গলা হইতে হাত ছাড়াইলাম। সে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় সোফার উপর গিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ সাধাসাধির পর উঠিয়া, আহার শেষ করিয়া, ক্রোধভরে বাড়ী চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে আমি নিদ্রা হইতে উঠিবামাত্র ভৃত্য বাহিরবাটী হইতে আসিয়া একখানি পত্র আমার হাতে দিল। দেখিলাম, ক্ষেপার পত্র। তাহাতে ইংরাজীতে লেখা আছে—

"আমার প্রিয় নিষ্ঠুর কবি!

তোমার মানসিক শক্তি এত উচ্চ যে, তাহার নিকটেও আমি যাইতে পারি না। তোমার রসিকতা মার্জ্জিত। আমি তাহা কোথায় পাইব? আমি তোমাকে কদর্য্যভাবে গালি দিয়া থাকি। অবশ্য তোমার যেরূপ উদার হৃদয় ও তুমি আমাকে যেরূপ স্নেহ কর, তাহা তুমি গ্রাহ্য কর না। কিন্তু তাহাতে আমার ইতরতা মাত্র প্রকাশ পায়। আমি একরূপ পাগলের মত হইয়াছি। কাল সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হয় নাই। দোহাই তোমার! আমার স্ত্রীপুত্রদিগের দিকে চাহিয়া তুমি আমাকে আর ক্ষেপাইও না।

তোমার পাগলপ্রায় * * *

পত্রখানি পড়িয়া আমিও ব্যথিত হইলাম। চন্দ্রকুমারকে সঙ্গে করিয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া দেখি, সে হাঁটু দুইটির মধ্যে মাথা রাখিয়া সেই কৌতুককর ভাবে বসিয়া কাঁদিতেছে। আমাকে দেখিয়াই হেউ হেউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল—"ভাই! তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি কাল রাত্রিতে এক মুহূর্ত্তও ঘুমাই নাই। আমি যে পাগল হইতেছি, তাহা আমি বুঝিতেছি। আর দুই চারি দিনের মধ্যে আমার পরিবার আসিয়া পৌঁছিবে। আমি পাগল হইলে তাহাদের কি দশা হইবে।" আজ তাহার কান্না দেখিয়া সত্য সত্যই আমার দুঃখ হইল। চন্দ্রকুমারও আমাকে ভর্ৎসনা করিল। তখন ইলবার্ট বিলের কল্যাণে Concordat (আপোষ) কথাটা প্রচারিত হইয়াছে। আমিও বলিলাম—"আচ্ছা! আজ তোমার সঙ্গে আমার Concordat হইল যে, আর আমি তোমাকে ক্ষেপাইব না।"

ইহার কিছুদিন পরে আমার ফেনী বদলি হইল। আমার গৃহের মাচার নীচে কতকগুলি দেশী কুকুরের বাচ্চা হইয়াছিল। নোয়াখালি ত্যাগ করিবার পূর্ব্বদিন আমি তাহাদিগকে একখানি থালাতে রাখিয়া, তাহার উপর সাটিনের রুমাল দিয়া সাজাইলাম। আমি বেহার হইতে বার তের বৎসরের বড় দুটি সুন্দর ছেলে আনিয়াছিলাম। যেন দুটি পুতুল। একটি খুব কালো, একটি গৌরবর্ণ। আমি তাহাদের আদর করিয়া কৃষ্ণ বলরাম ডাকিতাম। দুটিই তুখোর ছেলে। আমি তাহাদের শিক্ষা দিয়া, এই অপূর্ব্ব ডালি ক্ষেপার কাছে পাঠাইলাম। স্বামী যেমন "লেধা বামনা", তাহার স্ত্রীও তেমনি "লেধা বামনী।" বড় ভালমানুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"ও কি ও!" ছোঁড়া দুটো বলিল—"কেয়া জানে, বিবিনে আপ লোগকে ওয়াস্তে কুচ ডালি ভেজ দিয়ে হেঁ।" (কি জানি, বিবি আপনাদের জন্য কি ডালি পাঠাইয়াছেন)। ক্ষেপা তখন অন্য কক্ষে ছিল। বলিয়াছি, স্ত্রীর রন্ধনবিদ্যায় একটুক খ্যাতি আছে। ক্ষেপা মনে করিল, নোয়াখালি ছাড়িবার সময়ে স্ত্রী কিছু খাবার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন। ক্ষেপা বড় আনন্দের সহিত ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"কেয়া, তোমরা বিবি কুচ জলখাওয়ার ভেজ

দিয়া?" (তাহার হিন্দিও এরূপ হাস্যজনক ছিল) এই বলিয়া, সে যেমন সাটিনের রূমাল উঠাইল, কুকুরের ছানা কিল্‌বিল্‌ করিতেছে দেখিয়া, তাহার স্ত্রী ও শালী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং ছোকরা দুটি সেগুলি ফেলিয়া থাল লইয়া দৌড়! ক্ষেপা তখনই এক বৃহৎ বাঁশ ঘাড়ে করিয়া আমাকে প্রহার করিবার জন্য বাহির হইল। আমি তাহা অনুমান করিয়াছিলাম, এবং চন্দ্রকুমারের বাসায় গিয়া বৈঠকখানার পশ্চাৎকক্ষে লুকাইয়াছিলাম। বাঁশ ঘাড়ে ক্ষেপা গম্ভীরভাবে ক্রোধভরে চন্দ্রকুমারের বাসার সম্মুখ দিয়া এমন কৌতুকাবহ বেগে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে যে, আমরা হাসিয়া আকুল। চন্দ্রকুমার তাহাকে ঘর হইতে বাহির হইয়া পর্য্যন্ত ডাকিলেন। সে মাথা নাড়িয়া সটান আমার বাসার দিকে ছুটিল। সেখানে শুনিল, আমি বাসায় নাই। "ঝুঠ! ঝুঠ!" বলিয়া সে কিছুক্ষণ চাকরদের ধমকাইয়া ফিরিল। বাসাসুদ্ধ লোক হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেছিল। ফিরিয়া যাইবার সময়ে চন্দ্রকুমার আবার বিশেষ করিয়া ডাকিলে, সে সেই বৃহৎ বাঁশস্কন্ধে ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—"তুমিও বুঝি এ পরামর্শে আছ? যাহা হয় হবে, আজই আমি তাকে নিশ্চয় খুন করিব। দেখ দেখি, আমার স্ত্রীর ও শালীর কাছে পর্য্যন্ত আমাকে fool (নির্ব্বোধ) বানান! তারা পর্য্যন্ত হাসিতেছে। এ অপমান কি মানুষ সহ্য করিতে পারে!" আমি এমন সময়ে পশ্চাতের কক্ষ হইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে সে সেই ভীম বাঁশ লইয়া আমার উপর এক প্রকাণ্ড বাড়ি তুলিল। বাঁশ চালে ঠেকিল। আমি বলিলাম—"মারিবি দাদা! মার্‌! আগে আমার কৈফিয়ৎটা শোন্‌। আমি কাল চলিয়া যাইতেছি। এই নিরাশ্রয় কুকুরের ছানাগুলি কোথায় শূন্য বাসায় ফেলিয়া যাইব? তুমি বিবাহসম্পর্কে তাহাদের কুটুম্ব! তাই তোমার কাছে পাঠাইয়াছি!" "ওঃ! আর সহ্য হয় না। This is adding insult to injury (ক্ষতির উপর অপমান)!" এই বলিয়া সে সেই দীর্ঘ বাঁশ কাঁধে করিয়া বেগে তাহার বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল। এই গল্প তখনই নোয়াখালি ছড়াইয়া পড়িল, এবং হাসির তরঙ্গ ছুটিল। সন্ধ্যার সময়ে সকল বন্ধু আমাকে দেখিতে আসিলেন। পাগলা বলিল—"তোমার অদৃষ্ট ভাল, তুমি বদলি হইয়াছ। আর কিছুদিন থাকিলে আমি নিশ্চয় প্রতিহিংসা করিয়া ইহার দাদ তুলিতাম।" তার পর আমাকে জড়াইয়া কাঁদিয়া বলিল—"তুই কাল চলিয়া যাইবি। কাল আমাদের আনন্দের বাজার ভাঙ্গিবে। আজ একটা সন্ধ্যা আমাকে ক্ষেপাস্‌ না। আনন্দে কাটাই! তোরে ত আর পাইব না। এ জীবনে তোর মত লোকই বা আর কোথায় পাইব।"

পাগলা অদ্ভুত প্রতিহিংসা করিয়াছিল। আমি পরের পূজার বন্ধেও অসুস্থতানিবন্ধন ফেনীতে ছিলাম। সে আমার কাছে লিখিয়াছে যে, সে সপরিবার চন্দ্রনাথ দর্শন করিতে যাইবে। ফেনী পর্য্যন্ত নৌকায় আসিবে। ফেনী হইতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত তাহাদের যাওয়ার বন্দোবস্ত আমাকে করিতে হইবে। তাহার নৌকা ফেনী খালের ঘাটে আসিলে আমি তাহার স্ত্রী ও শালীর জন্য এক পাল্কী ও জিনিসপত্রের জন্য গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, আমার গৃহের গোল বারান্দায় বসিয়া পতি পত্নী তাহাদের অপেক্ষা করিতেছি। এমন সময় দেখি, সে এক বৃহৎ লাঠি কাঁধে করিয়া পাল্কীর অগ্রে অগ্রে বড় কৌতুক-গাম্ভীর্য্যের সহিত আসিতেছে। স্ত্রী দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"লোকটা কি চিরকাল ক্ষেপা থাকিবে? স্ত্রীর পাল্কীর আগে আগে এরূপ ভাবে আসিতেছে কেন?" অন্দরের বেড়ার দ্বারে পাল্কী আসিলে সে "হুসিয়ারছে লে যাও! হুসিয়ারছে লে যাও!" বলিয়া চেঁচাইতেছে। স্ত্রী মেয়েদের উঠাইয়া আনিতে গিয়াছেন। আর পাগল আমার কাছে আসিয়া বলিল—"কেমন জব্দ! তোমার স্ত্রীকে কেমন শিক্ষা দিয়াছি। পাল্কীতে কেহ নাই। কেবল বালিশ সাজাইয়া দিয়াছি। পরিবারেরা গাড়ী করিয়া আসিতেছে।" তাহার এ রসিকতার কথা শুনিয়া আমার মুখ শুকাইয়া গেল। বর্ষার সময়ে গাড়ীর গরু দিয়া চাষ করায়। বর্ষার পর প্রথম গাড়ীতে যুড়িলে প্রায়ই গরু দুষ্টামি করে। আমি বলিলাম—"তুমি কি পাগল! তুমি কেন তাঁহাদের গাড়ীতে উঠাইয়া দিলে?" এমন সময়ে লোক ছুটিয়া আসিয়া বলিল, গরু দুষ্টামি করিয়া গাড়ী রাস্তার গড়ে

ফেলিয়া দিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ! দুজনেই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতেছে। ছেলে মেয়ে ভাগ্যে হাঁটিয়া আসিতেছিল। তাহার স্ত্রী বলিলেন, তিনি ডান হাতে বড় চোট পাইয়াছেন। পাল্কীতে তুলিয়া দুজনকে বাড়ীতে আনিলাম। ডাক্তার ডাকিলাম। ডাক্তার আসিল। তাহার স্ত্রীর হাতখানি তুলিয়া ধরিতে তাহাকে ডাকিল। নির্ব্বোধ আমাকে বলিল—"তুমি যাইয়া ধর।" আমি বলিলাম—"গাধা! কেমন করিয়া তাঁহার বাহুতে হাত দিয়া আমি ধরিব।" আমি ভয়ানক চটিয়াছি, এবং তাহার কান্না শুনিয়া আমরা পতি পত্নী দুজনেই কাঁদিতেছি। পাগল বেকুব হইয়া বসিয়া আছে। শেষে স্ত্রী গিয়া হাত তুলিয়া ধরিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া নিতান্ত নিষণ্নমুখে বলিলেন, —Compound comminuted fracture! (হাড় একটা ভাঙ্গিয়া আর একটা ভাঙ্গা হাড়ের সংশ্লিষ্ট হইয়াছে)। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সমস্ত পূজার বার দিনের বন্ধ ভদ্রলোকের মেয়ে কি দারুণ কষ্টেই কাটাইল! বন্ধের পরও তাঁহার বিছানা হইতে উঠিবার শক্তি নাই। পাগল চলিয়া গেল। তিনি আরও কিছুদিন পরে গেলেন, এবং প্রায় তিন মাস ভুগিয়াছিলেন।

ইহার বহু বৎসর পরে ক্ষেপা কোথায় বদলি হইয়া যাইবার সময়ে অল্পক্ষণের জন্য আমাদের সঙ্গে দেখা করিতে সপরিবার আমার রানাঘাট সবডিভিসনগৃহে উপস্থিত। আমার স্ত্রী তাঁহার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে আনিতে গিয়াছেন। সে জানে যে, আমার একমাত্র পুত্র, অন্য সন্তান নাই। সে আমার স্ত্রীকে নোয়াখালিতে সর্ব্বদা দেখিয়াছে। কারণ, আমি তাহাকে কনিষ্ঠ ভাইয়ের মত ভালবাসিতাম। অথচ স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া পাগলা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"এটি তোমার কন্যা?" আমার স্ত্রী ও তাহার স্ত্রী লজ্জায় মাথা হেট করিলে, সে বড় বিস্মিত হইয়া আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার কন্যা না?" আমি বলিলাম—"গাধা! তুই কি চিরকালই গাধা ও ক্ষেপা থাকিবি। ওটি আমার স্ত্রী। তুই ত কতবার তাঁহাকে দেখিয়াছিস্।" তখন ক্ষেপা বড়ই বিস্মিত হইয়া বলিল—"এত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, উনি যেন আরও যুবতী হইয়াছেন। কেমন করিয়া চিনিব?" তারপর আমাকে বড় গর্ব্ব করিয়া বলিল—"আমি এখন আর ক্ষেপি না।" আমি বলিলাম—"বটে! একটু পরীক্ষা করিয়া দেখিব কি?" তখন করযোড় করিয়া বলিল—"দোহাই তোমার দাদা! আমি তোমার অতিথি। দুই ঘণ্টার জন্য মাত্র তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি। এখন ক্ষেপাইলে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত হাসিবে।" আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন অনেক ডেপুটি এখন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেছে! তোমরা কেহ আমার এই ক্ষেপাকে কি একটা ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট করিতে পার না? তাহার অন্ততঃ এটুকু আত্মসম্মান-জ্ঞান আছে যে, স্ত্রীলোক লইয়া ক্ষেপা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকের কাছেও ক্ষেপিতে নাই।

নোয়াখালিতে উপর্য্যুপরি তিন রাত্রিতে আমার তিন চাকরের ওলাউঠা হইলে আমি আবার আমাকে ফেনী দেওয়ার জন্য কমিশনর লাউইস্ সাহেবকে তাঁহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়া পত্র লিখিলাম। তিনি গবর্ণমেণ্টে আমাকে ফেনীর ভার দিবার জন্য লিখিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে নোয়াখালিতে আমি ষষ্ঠ 'সাইক্লোন' (Cyclone) ভোগ করি। সকালবেলা হইতে লিক্‌লিকে বাতাসের সহিত বৃষ্টি, আকাশে ঘন ঘন মেঘের ছুটাছুটি দেখিয়া আমি 'সাইক্লোনে'র পূর্ব্বলক্ষণ মনে করিলাম। নোয়াখালি অঞ্চল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের 'সাইক্লোন' ও সমুদ্রতরঙ্গে এরূপ ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল যে, লোকেরা আকাশের এরূপ লক্ষণ দেখিলেই চিন্তাকুল হইত। ঘূর্ণী বায়ুর ক্রমশঃ বেগ বৃদ্ধি হইয়া বেলা এগারটা হইতে প্রকৃত 'সাইক্লোন' আরম্ভ হইল। আমার ত সেই বাঁশ-বেতের সৃষ্টি মুকুন্দরাম কবির কালকেতুর খড়ের কুঁড়িয়া—

"ভাঙ্গা কুঁড়িয়া, তায় পাতার ছাউনি॥

ভেরেণ্ডার থাম মোর আছে মধ্যঘরে।
প্রথম আষাঢ়ে ঘর নিত্য পড়ে ঝড়ে॥”

আষাঢ়ের নহে, এই কার্ত্তিকের ঝড়ে আমার কুঁড়িয়া খানিও মাতালের মত এপাশ ওপাশ টলিতে লাগিল। আপনাকে ও পাঁচ বৎসরের শিশু নির্ম্মলকে একখানি কম্বলে জড়াইয়া এবং স্ত্রীকে অন্য কম্বলে আবৃত করিয়া লইয়া পোষ্ট আফিসের দিকে যাত্রা করিলাম। এমন সময়ে খাসমহলের তহসিলদার বদিয়ল আলম আসিয়া জুটিল। আমার বংশের যে শাখা মুসলমান হইয়াছিল, সে সেই শাখার এক কন্যা বিবাহ করিয়াছিল। আমি তাহাকে ঠিক একজন হিন্দু আত্মীয়ের মত স্নেহ করিতাম। তাহার স্ত্রী দেখিতে একটি অপ্সরার মত সুন্দরী ছিল। সেও আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা করিত, আমি তাহা আমার সহোদরা ভগ্নীর কাছেও পাই নাই। সে এই জীবনীতে পূর্ব্বে উল্লিখিত আছদ আলি খাঁর কন্যা। আছদ আলিকে আমি ‘চাচা’ বলিয়া ডাকিতাম। ‘জমিলা খাতুন’ তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যা। তাহার কিছুদিন পরে সমস্ত নোয়াখালি কাঁদাইয়া এবং আমার একটি জীবনের সান্ত্বনা নিবাইয়া জমিলা স্বর্গে চলিয়া যায়। তাহার সেই দেবীমূর্ত্তি, পবিত্রতা ও শিষ্টাচার, তাহার সেই স্বর্গীয় স্নেহ আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই, পারিবও না। আমি ফেনী হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মিটিং উপলক্ষ্যে নোয়াখালি গেলে জমিলা আমার জন্য কতরূপ জলখাবার প্রস্তুত করিয়া দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিত, লোক দিয়া অন্বেষণ করাইয়া আমাকে লইয়া যাইত। না গেলে কত অভিমান করিত। জমিলা! এত স্নেহের বন্ধন কাটাইয়া, তুই কেমন করিয়া দিদি! পূর্ণ-যৌবনে চলিয়া গেলি। জমিলা যখন দুখানি হাত আমার ও স্ত্রীর পায়ের উপর দিয়া হিন্দু মেয়ের মত আভূতল নত হইয়া প্রণাম করিত, আমাদের বোধ হইত, যেন পায়ের উপর দুটি ‘পল নিরেন’ গোলাপ সদ্য প্রস্ফুটিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার তিরোধানের পর বদিয়ল আলম নানা স্থানে নানা কার্য্য করিয়া এখন ফকির হইয়াছে, এবং এ অঞ্চলে বহু শিষ্য করিয়াছে। সে শরীরের বৈদ্যুতিক শক্তি এরূপ বিকশিত করিয়াছে যে, সে আমাকে ও নির্ম্মলকে একদিন প্রায় মূর্চ্ছিত করিয়াছিল। শিষ্যদের কর্ণে মন্ত্র দেওয়া মাত্র শুনিয়াছি, তাহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলে গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করে। তাহার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তাহার এত শিষ্য হইয়াছে যে, সে এক টাকা করিয়া লইলে বৎসর বিশ ত্রিশ হাজার টাকা পাইতে পারে। কিন্তু সে কিছুই গ্রহণ করে না। যাহা হউক, সে সেই ঝড়ের সময়ে ব্যস্ত হইয়া আমাদের সাহায্য করিতে আসিয়াছে। জমিলা সে সময়ে নোয়াখালি ছিল না। আমরা আধ মাইল পথ গেলে পোষ্ট আফিস পাইব। ঝড়ের বেগে বৃক্ষ ও ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। পথ চলা সঙ্কট। ঝড়ে আমাদের উড়াইয়া লইতে চাহিতেছে। শিশু পুত্রটি লইয়া মহাবিপদস্থ। সেই সঙ্কটসংহরা তারাকে ডাকিতেছি। স্ত্রী আর চলিতে পারিতেছেন না। বদিয়ল আলম তাঁহাকে জড়াইয়া লইয়া চলিল। বহু কষ্টে প্রায় এক ঘণ্টা পরে পোষ্ট আফিসে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম। পোষ্টমাষ্টার আমার শৈশববন্ধু রসিক। আফিসখানি পাকা বাড়ী। রসিক আমাদের অশেষ শুশ্রূষা করিল। কাচারিতে যে একটা পাকা দ্বিতল গৃহ ছিল, অন্যান্য ভদ্রলোকেরা সেখানে গিয়াছেন। সন্ধ্যার পর ঝড় থামিল। আমরা পোষ্টাফিসে রাত্রিতে আহার করিয়া বাসায় ফিরিলাম। তখন প্রকৃতি কি শান্তমূর্ত্তি! নির্ম্মল আকাশে নক্ষত্রমালা শোভিতেছে। আশ্চর্য্য! বাড়ী আসিয়া দেখি, আমার কুঁড়িয়ার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। শহরের কত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ ও বাড়ী ঘর পড়িয়া গিয়াছে। এ ভেরেণ্ডার খুঁটিঘর যে কলেবর পরিত্যাগ না করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বড় বিস্ময়ের কথা! শ্রীভগবানের কি কৃপা!

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত

॥ ভানুমতী ॥

নবীনচন্দ্র তাঁর খুড়তুত ভাই-এর বার বছরের মেয়ে আশার অনুরোধে একটি বই লিখে দেবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলেন। ৩০ অক্টোবর ১৮৯৭ চট্টগ্রামে এক ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যা হয়। এর ফলে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ এক ভয়াবহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সম্পত্তি ও লোকক্ষয় হয় বিস্তর। এরই পট-ভূমিকায় অল্প বয়স্ক বালিকাদের উপযোগী একটি উপন্যাস লিখে গ্রন্থকার ভাইঝি আশাকে উপহার দেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের (বাংলা ১৩০৬। ইং ২৫ মার্চ ১৯০০) আগে এটি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্যে প্রথম ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়।

নবীনচন্দ্র পূর্ববঙ্গ চট্টগ্রামের অধিবাসী। চট্টগ্রামবাসীরা ঝড়-বাদলকে নিত্য-সহচর করে নিয়েছেন। ১৮৯৭-এর সাইক্লোনের সময় তিনি চট্টগ্রামে চাকরিসূত্রে ছিলেন ও ঝড়ের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার ফল তিনি এই উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন। এই রচনাবলীর দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সেটেলমেণ্ট অফিসার অ্যালেনের রিপোর্ট ভূমিকা-রূপে উদ্ধৃত করেছেন। 'আমার জীবনে'র পঞ্চম ভাগে 'ভানুমতী' প্রসঙ্গে নবীন-চন্দ্র বলেছেন :

"সপ্তাহমধ্যে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ২রা জুলাই শেষ করিলাম। এরূপে একটি বালিকার আবদারে লিখিত 'ভানুমতী'তে বড় বেশী কিছু থাকিবার কথা নহে। উহা...সাহিত্য পত্রিকায় পাঠাইলাম। সম্পাদক সুরেশ উহা আগ্রহের সহিত মাসে মাসে ছাপিতে লাগিলেন।... 'ভানুমতী' বালিকার পাঠোপযোগী সরলভাষায় একটা সরল গল্পবিশেষ...ইন্দ্রিয়জনিত প্রেম ভিন্ন বাঙ্গালা উপন্যাস হইতে পারে কি না, এবং উপন্যাসে গদ্য পদ্য উভয় ব্যবহার করিলে কিরূপ লাগে।...এই দুটি আমার উদ্দেশ্য ছিল। এইখানে ভানুমতীর নূতনত্ব।"

এই উপন্যাস রচনায় নবীনচন্দ্র তাঁর দীক্ষাগুরু শঙ্করপুরীর অলৌকিক ক্ষমতা ও বেদের পালিতা কন্যা ভানুমতীর মধ্যে বিচিত্র অলৌকিকতা দেখাইয়া বৈরাগ্য ও সেবাধর্মকে আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রচলিত উপন্যাস থেকে ভানুমতীর অভিনবত্ব আছে। কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের বিষয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাংলা-সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা গ্রন্থটিতে 'ভানুমতী'র উল্লেখও করেননি।

॥ প্রবাসের পত্র ॥

নবীনচন্দ্র সেন নোয়াখালী জেলার ফেনী মহাকুমায় ২২ নবেম্বর ১৮৮৪ থেকে চট্টগ্রামে দ্বিতীয়বার কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট (২৫ এপ্রিল ১৮৯১) হবার পূর্ব পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। 'আমার জীবন' চতুর্থ ভাগে তিনি কিভাবে প্রবাসের পত্র রচনা ও প্রকাশ করেন, সে বিষয়ে যা বলেছেন :

"আমি তিন মাসের ছুটি লইয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যাই। কতক স্বাস্থ্যের জন্য কতক বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারত, রাজপুতনা ও বোম্বাই অঞ্চল দেখিবার জন্য এই ছুটি লইয়াছিলাম। দার্জিলিং, বৈদ্যনাথ, এলাহাবাদ, কানপুর, বিঠুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লী, হরিদ্বার, লাহোর, বরদা, বম্বে, পুণা, নাসিক, নর্ম্মদা, জব্বলপুর বেড়াইয়া স্ত্রীর কাছে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলাম, উহা সুরেশ প্রথম সাহিত্যে, পরে পুস্তকে 'প্রবাসের পত্র' নাম দিয়া ছাপিয়াছেন।"

বর্তমান রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে (পৃষ্ঠা ৬৫-১১৮) প্রবাসের পত্র ছাপা হয়েছে। পৃষ্ঠা ৬৬তে উৎসর্গপত্র ও প্রকাশকের নিবেদন জ্ঞাতব্য বিষয় দেওয়া হয়েছে। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

ভ্রমণ কাহিনীর মাধ্যমে, চিঠি পত্রের মধ্যে অপরূপ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য 'প্রবাসের পত্র' একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। একে 'আমার জীবনে'র আর একটি অংশ বলা যায়। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত সাহিত্যে 'প্রবাসের পত্র' ক্রমশ প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের পর সমালোচনা-প্রসঙ্গে ক্যালকাটা রিভিউ বলেন :

"*Prabaser Patra* is in its own way or highly interesting production in which the entertaining prose of a traveller's story is sweetly blended with the enlivening poetry of the out-pouring of a feeling heat and the flight of a fervid imagination." *Calcutta Review* Vol XCVI, April 1893.

শ্রীসুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ 'বাংলার পত্র সাহিত্যে' বলেছেন :

"ঐতিহাসিক চিত্র হলেও এ পত্রাবলীর সাহিত্যিক মূল্য আদৌ নেই বলা যায় না। স্বদেশশ্রেণী কবি মানসের বিস্ময়-আনন্দ-ভাবাবেগের আন্তরিকতাটুকু দুর্লক্ষ্য নয়। মাঝে মাঝে গভীর মননেরও পরিচয় পাওয়া যায়।"

ভ্রমণ-সাহিত্যের অভিনব রচনা রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থটি ১২৮৮ সালে প্রকাশিত হয়। এর প্রায় এগারো বছর পরে নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' ১২৯৯ সালে (২৩ নবেম্বর ১৮৯২) প্রকাশিত হয়। এটি দেশ-কাল-মানুষ জানবার পক্ষে একটি বিশেষ দলিল-রূপে গণ্য করা উচিত।

—সনৎকুমার গুপ্ত

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত